সচিত্র মাসিক পত্র

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক — চৈত্র

পরিচালক ও সম্পাদক—
শ্রীঅনিলকুমার দে

বার্ষিক মূল্য—চারি টাকা আট আনা।

কার্ত্তিক—চৈত্র

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড—১৩৪০

বিষয়-সূচী

চিত্র - সূচী

পৃষ্ঠা

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

পৃষ্ঠা

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

পৃষ্ঠা

দ্বি-বর্ণ চিত্র—

এক-বর্ণ চিত্র—

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

বহু-বর্ণ ও দ্বি-বর্ণ চিত্র —

এক-বর্ণ চিত্র —

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে

ইষ্টারের ছুটিতে সুলভ ভাড়ায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের উপর ভ্রমণ করুন

স্বাস্থ্যের জন্য আপনার রেল ভ্রমণের পক্ষপাতী হইবার আটটি প্রধান কারণ—

১। প্রতি কামরা নিয়মিতরূপে বীজাণু প্রতিষেধক দ্বারা পরিষ্কৃত করা হয়।

২। পথে ষ্টেশনে বিশুদ্ধ খাদ্য ও নির্ম্মল পানীয় সকল সময়ে পাওয়া যায়।

৩। যাত্রিদের সুবিধার জন্য ট্রেনে পাইখানা ইত্যাদির বন্দোবস্ত আছে।

৪। বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাওয়া বা ঠাণ্ডা ইত্যাদি লাগিয়া শরীর অসুস্থ হওয়ার কোন ভয় নাই।

৫। রেল ভ্রমণে জল হাওয়ার পরিবর্ত্তন হয় এবং নানা বৈচিত্র্যের জন্য মনও প্রফুল্ল থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এই দুইটিরই বিশেষ প্রয়োজন।

৬। হঠাৎ প্রয়োজন হইলে সকল বড় ষ্টেশনে ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া যায়।

৭। রেলওয়ে আইন অনুসারে সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে অপর যাত্রিদের সহিত এক কামরায় ভ্রমণ করিতে দেওয়া হয় না।

৮। ষ্টেট রেলওয়ে আপনার দেশের নিজস্ব সম্পত্তি এবং এই সকল রেলে ভ্রমণ করিলে আপনাদের কর-ভার লাঘব হইতে থাকিবে।

অতএব স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সর্ব্বদা রেলে ভ্রমণ করুন—ইহাই একমাত্র যান যাহা সকল আবহাওয়াতে সমান দ্রুতগতিতে এবং নিরাপদে আপনাদের বহন করিবে।

বিষয়-সূচী

ট্রীটেক্স — "TREETEX"

ভবিষ্যতে গৃহনির্ম্মাণের কার্য্যে ট্রীটেক্স ব্যবহার করুন

হাল্‌কা ও শক্ত বলিয়া ট্রীটেক্স শীঘ্র ও সহজে গাঁথুনী করা যায়।

ট্রীটেক্স অপরিচালক এবং ইহার উপরে প্লাষ্টারের কার্য্য করা যায়।

ইহার উপর রং করা যায়, ছবি আঁকা যায় এবং রংয়ের অন্যান্য কাজও করা যায়।

ট্রীটেক্স ওয়াল বোর্ড

আকারে ইহা—

১/২ ইঞ্চি পুরু × ৩ এবং ৪ ফিট চওড়া এবং ৮, ৮॥০, ৯,১০,১২ ও ১৪ ফিট লম্বা। প্রত্যেক ক্রেটে ১২ শিট থাকে

ট্রীটেক্স—গৃহ-নির্ম্মাণের আধুনিক উপাদান—গ্রীষ্মকালে তাপ দূর করে এবং শীতকালে তাহা আবদ্ধ রাখে। অধিকন্তু ইহা শব্দ রোধ করে। অল্পব্যয়ে আধুনিক রুচি অনুযায়ী গৃহ-সজ্জা করিতে ইহা সাহায্য করে।

ট্রীটেক্স—ব্যবহার করা বেশ সহজ এবং দেওয়াল, সিলিং (ceiling) ও পার্টিশনের (partition) বিশেষ উপযোগী। প্রয়োজন হইলে ইহা তাপ-নিয়ন্ত্রণ করিতে, ময়লা জমা (condensation) দূর করিতে এবং শব্দ রোধ করিতে পারে।

ট্রীটেক্স কি করিবে—

গরম ও শীত নিবারণ করিবে,
শীত-গ্রীষ্মের সমতা রক্ষা করিবে,
আর্দ্রতা নিবারণ করিবে, ময়লাজমা রোধ করিবে,
শব্দরোধ করিবে, গোলমাল বন্ধ করিবে,
প্লাষ্টার বা থোয়ার সহিত আবদ্ধ থাকিবে,
প্লাষ্টারের দেওয়ালের কার্য্য করিবে,
গাঁথুনীর ব্যয় কমাইবে।

ট্রীটেক্স কি করিবে না—

দুমড়াইবে না বা বাঁকিবে না,
পচিবে না বা খারাপ হইবে না,
কীটপতঙ্গ আক্রমণ করিবে না,
ফাটিবে না বা চিরিবে না,
সহজে ভাঙ্গিবে না,
আলোক প্রতিফলিত করিবে না,
খরচ বাড়াইবে না,
প্লাষ্টার হইতে খসিবে না,
সহজে আগুন ধরিবে না,
গন্ধ আটকাইয়া রাখিবে না।

হিট্‌লী এণ্ড গ্রেসাম্‌, লিঃ

(ইংলণ্ডে সমবেত)

কলিকাতা : বোম্বাই : মাদ্রাজ : লাহোর
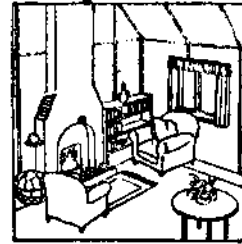
এই ঘরখানি মাকড়সার জালে ও অকেজো বাক্সে ভর্ত্তি ছিল, কিন্তু ট্রীটেক্স ব্যবহার করায় উহা এখন আরামজনক ধূমপান কক্ষে পরিণত হইয়াছে। শীতে গরম এবং গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা।
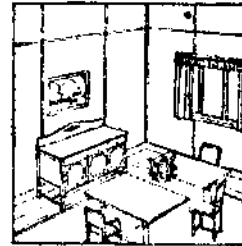
ট্রীটেক্স ব্যবহার করায় পাশের ঘরের কথা বা রান্নাঘরের গোলমাল শোনা যায় না।
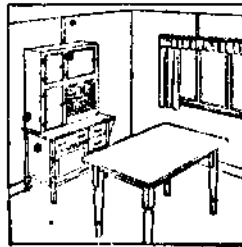
ট্রীটেক্স দেওয়ালের ময়লা জমা (Condensation) দূর করে বলিয়া রান্নাঘর পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্যকর হয়। রান্নাঘরের উত্তাপ এবং গোলমাল অপর কোন অংশে যায় না।

চিত্র-সূচী

বহু-বর্ণ ও দ্বি-বর্ণ চিত্র—

এক-বর্ণ চিত্র—

['উদ্বোধনে'র আলোকচিত্র-প্রতিযোগিতায় পঞ্চম পুরস্কারপ্রাপ্ত]

রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী

"সন্তোষ হাউস,"
৯৯, লোয়ার সার্কুলার রোড, আলিপুর
CALCUTTA.
২৪-১-৩৩

বাঙলায় "উদয়ন" এর প্রয়াস সাহিত্য-সেবা সার্থক হউক। অতীত প্রকৃতি-পাঠে কলা-নৈপুণ্য ইহার আভিজাত্যের নিদর্শন করুক। সন্তোষ-পরিচালিত এবারের অপরূপ আলোক-পাতের মত উদয়নের আলোক-রেখা দিকে দিকে উদ্ভাসিত হউক, এই আমার শুভেচ্ছা। ইতি

শ্রী মন্মথনাথ রায় চৌধুরী

কোথায় ভগবান?

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ভগবানকে খুঁজে পাও না? ভগবান নাই — আদৌ নাই? ...

কিন্তু ভগবান থাকবেন কেন? তুমি তাঁকে পাবেই বা কেন?

ভগবানের কাছে তুমি কতখানি তোমাকে অর্পণ করেছ? তোমার প্রতি অঙ্গ, প্রতি মুহূর্ত্ত ভগবানের সেবায় কতটুকু নিযুক্ত?

তোমার ডাক ত কেবল মুখের কথা! একটু অসুবিধায় পড়ে, একটু কৌতূহল নিয়ে তুমি তাঁর নাম করেছ, আর অমনি তিনি সশরীরে নেমে আসবেন?

তিনি তবু হয়ত নেমেই আসেন। কিন্তু তোমার চক্ষু কোথায় দেখবে যে?

অতল অন্ধকূপ গহ্বরের মধ্যে বসে — তার উপরে আবার জোর করে চক্ষু মুদে রয়েছ। ব্যর্থ আবেগে, অবজ্ঞার হাস্যে ঘোষণা করছ — "কোথা সূর্য্য, কোথা সূর্য্য — নাই, নাই।"

পরাধীন পদানত যে, তার কাছে স্বাধীনতা ত নাই'ই। স্বাধীনতাকে যদি সে দেখতে পেতে চায়, তবে কেবল ক্রোধে, আক্রোশে, অবিশ্বাসে, হতাশায় কি হেলায় খেলায় তা সম্ভব হবে না। স্বাধীনতা অর্জ্জন করবার যোগ্যতা লাভ করতে হবে — তার জন্য অনিবার্য্য প্রয়োজন, সাধনা — কঠোর সাধনা।

ভয় নাই —

স্বাধীনতার অভিমুখে প্রথম পদক্ষেপ হল পরাধীনতার চেতনা, পরাধীনতার উপর অসন্তোষ।

জগতের সাধারণ জীবন যদি অ-ভগবানের রাজ্য বলে অনুভব করি — ভগবান যদি থাকেন, তবে তিনি এই সৃষ্টিচক্রের মধ্যে থাকতে পারেন না, এই জাগতিক যন্ত্রের অধিপতি যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি শয়তান ভগবান, পঙ্গু ভগবান — এই হল প্রথম উপলব্ধি।

যখনই বলছ, "ভগবান কোথা, কোথা ভগবান, নাই নাই" — তার অর্থ তোমার অন্তরাত্মা জাগতে সুরু করেছে, তা যতটুকুই হোক না, — ভগবান ছাড়া যা কিছু, তার মধ্যে কি একটা অভাব অতৃপ্তি বোধ হতে আরম্ভ হয়েছে।

ভগবানকে অস্বীকার করা, ভগবানকে পাওয়ার পথে প্রথম সোপান।

সাধারণ জীবনকে যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেখে, তাতেই তৃপ্ত হয়ে মশগুল হয়ে থাকে, জীবনাতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন জীবনের মধ্যে যে আদৌ বোধ করে না — সে ত গাছ-পাথর, পশু, বনমানুষের মত।

অভিমান, আক্রোশ, অস্বীকার, অশ্রদ্ধা প্রথম ধাপ—

দ্বিতীয় ধাপ ধীর অপেক্ষা, সমাহিত শ্রদ্ধা, প্রশান্ত উন্মুখীনতা — দেহপ্রাণমনের সমর্থ স্বচ্ছতা, সম্যক্ নির্ভরতা।

কে পরাল এই বাঁধন? আমি কি সাধ করে নরকে ডুবেছি?···

নিজে প্রথমে তুমি রাজী হয়েছ, সায় দিয়েছ — তারপরে হয়ত আর সকলে মিলে তোমাকে চেপে ধরেছে।

তোমার স্বাধীনতা তুমি এইভাবে — স্বেচ্ছাচার অর্থে — ব্যবহার করতে চেয়েছিলে — তারই শেষ ফল হয়ে দাঁড়িয়েছে পরাধীনতা।

মানব-আত্মার এই স্বাধীনতা আছে — কারণ পরম স্বাধীনতা ভগবানের অংশ সে; ইচ্ছা করলে বন্ধনের মধ্যে আপনাকে সে টেনে আনতে পারে — তেমনি অন্যদিকে বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উঠবার স্বাধীনতাও তার আছে।

যে জট মানুষ পাকিয়েছে, তাকে খুলে ধরবার সামর্থ্যও মানুষের আছে। মানুষের জীবন-সাধনার লক্ষ্যই তাই।

তবে জট একদিনে পাকায় নাই, যুগ-যুগব্যাপী কর্ম্মফলের চাপে গ্রন্থি এমন জমাট কঠিন হয়ে উঠেছে, দেখে মনে হয় অটুট অচ্ছেদ্য। তাকে খুলতে হলে তেমনি যুগ-যুগান্তরই প্রয়োজন হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু বস্তুতঃ তা হয় না — এইখানেই এসেছে ভগবৎ প্রসাদ — এক অঘটনঘটন-পটীয়সী মহাশক্তি।

এই সৃষ্টির মধ্যে, এই অ-ভগবানেরই রাজ্যে একটা করুণার শক্তি রয়েছে যা সত্যত-উন্মুখী, যথার্থ-জাগ্রত অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করে — অন্তরাত্মার সুদৃঢ় অনুমতি অবলম্বনে তার যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কার থেকে, বন্ধন থেকে, অকস্মাৎ না হোক, সত্বর মুক্তি এনে দেয়।

তুমি যদি নিজের প্রয়াসে ভগবানের দিকে কোন প্রকারে একটি পা'ও অগ্রসর হতে পার, দেখবে ভগবান সেখানে তোমার জন্য এগিয়ে এসেছেন একশ পা।

তোমার সকল ক্লেদময়লা সহ ভগবান তোমাকে স্বীকার করে নিয়ে থাকেন। কিন্তু ঠিক এই ক্লেদময়লার জন্যই তুমি বুঝতে পার না তিনি তোমাকে স্বীকার করেছেন, বুঝতে পার না এই যাবতীয় আবর্জ্জনার ভিতর দিয়ে কি রকমে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর দিকে তোমাকে নিয়ে চলেছেন।

ক্লেদময়লা আবর্জ্জনা যখন দূরে চলে যাবে — আধার যখন শুদ্ধ স্বচ্ছ হয়ে উঠবে, তখনই সেখানে প্রতিফলিত হবে ভগবানের সত্তা, ভাগবত ইচ্ছা — তখনই তোমার হৃদয়ঙ্গম হবে, আয়ত্ত হবে তাঁরই জ্ঞানের, তাঁরই শক্তির আর তাঁরই আনন্দের এক কণা।

মানুষ মূলতঃ ভগবানের অংশ, ভগবানই — মানুষের অব্যর্থ গতি ভগবানেরই দিকে।
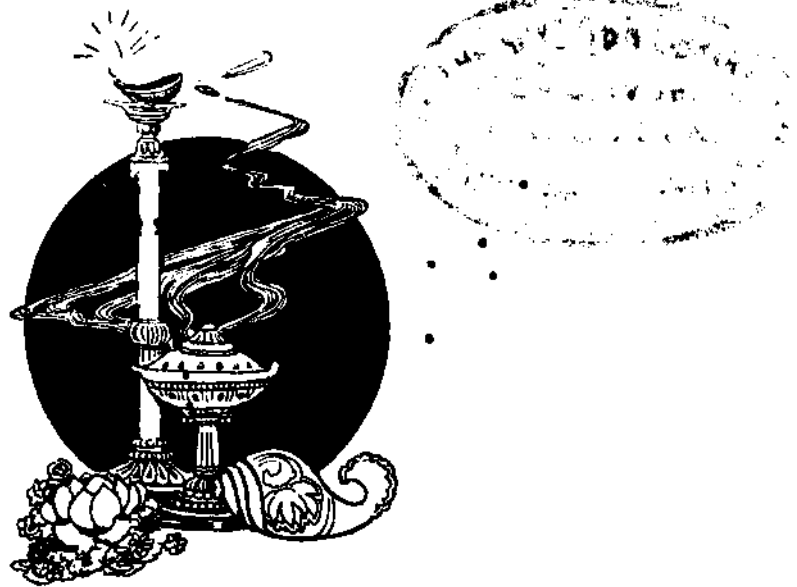
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, পি-আর-এস

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

যে সকল গল্পে অতিপ্রাকৃতের সংস্রব নাই, অথবা প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সংযোগ নাই, তাহাদের মধ্য হইতেও জানা ও অজানার সংমিশ্রণ করিয়া কবি অপূর্ব্ব রস আহরণ করিয়াছেন। তিনি প্রেমের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে প্রেম শুধু হাহাকারেই পর্য্যবসিত হয় নাই অথবা সৌভাগ্যের মরুবালুতে তাহার মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায় নাই। তাঁহার সৃষ্ট প্রেমিক-প্রেমিকারা তাহাদের জীবনে সুদূরপ্রসারী বিপুলতা উপলব্ধি করিয়াছে। 'জয়-পরাজয়' গল্পে কবি পুণ্ডরীক জয়লাভ করিয়াছে ; কিন্তু তাহার বিজয়ে একটা ইতরতা আছে। কবি শেখর যখন গান তুলিয়াছে, তখন তাহার গান শুধু বাক্যের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রহে নাই, পুণ্ডরীকের অনধিগম্য, কথার অতীত প্রেমলোকে সঞ্চরণ করিয়াছে। রাজকুমারী তাহার গৃহিণী নহে, সে তাহার পক্ষেও অপ্রাপণীয়া ; কিন্তু অপ্রাপণীয়া অপরাজিতা তাহার সমস্ত প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিকে অপূর্ব্ব শ্রীতে মণ্ডিত করিয়াছে। অথচ অপরাজিতা শুধু কবির কল্পনামাত্র নহে ; দাসী মঞ্জরী তাহাকে রাজকুমারীর সংবাদ দিত ; আর পরাজিত কবির মরণাহত কণ্ঠে রাজকুমারী অপরাজিতা বিজয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছে।

অপরাজিতার সঙ্গে কবি শেখরের পূর্ব্ব পরিচয় ছিল, এমন মনে হয় না। কিন্তু যেখানে পূর্ব্ব পরিচয়ের নিবিড়তা আছে, সেখানেও কবি অপরিচয়ের দূরত্ব আনিয়া দিয়াছেন। মহামায়া ও রাজীব ছিল দুই বাল্য-প্রণয়ী ; তাহারা একে অপরের কাছে সুপরিচিত। মহামায়া রাজীবের গৃহে আসিলও বটে ; কিন্তু সে চির-অবগুণ্ঠনের অন্তরালে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিল। যাহারা এক সঙ্গে বসবাস করিল, তাহাদের মধ্যে অপরিচয়ের কঠিন প্রাচীর উঠিল। রাজীব মহামায়াকে চিনিয়াও চিনিল না, তাহাকে পাইয়াও পাইল না। এই অবগুণ্ঠনকে সে যেদিন খুলিতে চেষ্টা করিল, সেই দিন মহামায়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া চির-অপরিচয়ের গর্ভে মিলাইয়া গেল। 'মধ্যবর্ত্তিনী' স্বামী-স্ত্রীর দৈনন্দিন সম্বন্ধ লইয়া রচিত হইয়াছে। ইহাকে ঠিক প্রেমের গল্প বলা যায় না ; কিন্তু ইহার মধ্যেও কবি অতিপরিচয়ের মধ্যে অপরিচয়ের নিবিড় পর্দ্দা টানিয়া দিয়াছেন। নিবারণ অফিসে যাইত, তামাক খাইত, পাড়ায় দু' পাঁচজনের সঙ্গে গল্প করিত ; তাহার জীবনে সুদূরের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, রোমান্সের নামগন্ধ ছিল না। নিঃসন্তান হরসুন্দরী স্বামীকে লালন পালন করিত, সংসারের আর পাঁচ কাজ করিত। স্বামী-স্ত্রীর পরিচয় বহু-কালের, কবে তাহাদের যৌবনের উন্মেষ হইয়াছিল, কবে সেই যৌবন তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তাহা তাহারা লক্ষ্য করে নাই। এই চিরাভ্যস্ত জীবনের মধ্যে আসিল শৈলবালা। এবং তাহার অভ্যাগমে নিবারণ ও হরসুন্দরীর জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হইল। শৈলবালাকে পাইয়া নিবারণ আর সব ভুলিল, আর নবাগতার প্রতি স্বামীর এই উন্মত্ত আসক্তি দেখিয়া বিগতযৌবনা হরসুন্দরীর হৃদয়ে লুপ্ত যৌবনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। কিছুদিন পরে বালিকা শৈলবালার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রী তাহাদের পূর্ব্ব অভ্যস্ত জীবন আর ফিরিয়া পাইল না। "পূর্ব্বে যেমন পাশাপাশি শয়ন করিত, এখনও

সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।" হরসুন্দরী বুঝিতে পারিল সুদীর্ঘ দিনের পরিচয়েও তাহারা একে অপরকে সম্পূর্ণভাবে চিনিতে পারে নাই। হরসুন্দরীর হৃদয়ের বহু আকাঙ্ক্ষাকে নিবারণ জাগাইতে পারে নাই, নিবারণের জীবনকে সেও পরিপূর্ণরূপে ভরিয়া তুলিতে পারে নাই।

'পয়লা নম্বর' গল্পে এই বিষয়টাকেই রূপান্তরিত করিয়া দেখান হইয়াছে। অদ্বৈতচরণ নব্য ন্যায়, গাণিতিক বিজ্ঞান, তুলনামূলক ধর্ম্মতত্ত্ব এই সব গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকিত, আর ইহাদের সাহায্যে সে নিজের ক্ষমতা জাহির করিয়া স্ত্রী অনিলার হৃদয় জয় করিতে চাহিত। তাহার স্ত্রীকে সে প্রতিদিন দেখিয়াছে, তাহার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু অনিলার হৃদয়ে যে কোন গূঢ় রহস্য থাকিতে পারে, একথা তাহার মস্তিষ্কে কোন দিন আসে নাই। অনিলার সঙ্গে তাহার অন্তরের যোগের এত অভাব ছিল যে, তাহার পরম স্নেহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সরোজ যে কবে কি ভাবে কেন আত্মহত্যা করিয়া মরিল, এবং সেই মৃত্যুতে তাহার জীবনে কিরূপ গভীর পরিবর্তন আসিল পণ্ডিতপ্রবর তাহার কোন সন্ধানই রাখিল না। সিতাংশুমৌলি তাহার দরওয়ান অযোধ্যাপ্রসাদ ও তাহার সাকরেত কানাইলালকে ভাগাইয়া লইয়া যাইতেছে মনে করিয়া অদ্বৈতচরণ চিন্তিত হইতেছিল। কিন্তু মূঢ় জানিত না পয়লা নম্বরের জমিদার তাহার সংসারদুর্গের কোন্ অন্তঃস্থলে আঘাত করিয়াছে। চিরপরিচিতা স্ত্রী তাহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর তাহার খেয়াল হইল সে কতখানি হারাইয়াছে, তাহার বহুকালের সাথী তাহার কাছে কত অজ্ঞেয় রহিয়া গিয়াছে। সিতাংশুমৌলির সঙ্গে পরিচয় করিয়া সে জানিল যে, অনিলার হৃদয়ের রহস্য সিতাংশুমৌলির কাছেও অজানাই রহিয়াছে। সিতাংশুর প্রণয় নিবেদন অনিলার মর্ম্মস্থলে যাইয়া পহুঁছিয়াছিল; তাই যে চিঠিগুলির সে কোন উত্তর দেয় নাই, তাহা সে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল। অথচ সিতাংশুমৌলিকে সে গ্রহণ করে নাই, যে স্বামীকে সে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তাহার কাছে সে যে কথা লিখিয়া গিয়াছিল, সিতাংশুমৌলিকে ঠিক সেই কথাই বলিয়া গিয়াছে। যে তাহার জীবন যাথর্তায় ভরিয়া দিয়াছে, আর যে ক্ষণিকের জন্য চরিতার্থতার আস্বাদ আনিয়াছিল, যাইবার দিনে উভয়েই তাহার কাছে একই মূল্য বহন করিল। সিতাংশুমৌলির যে চিঠিগুলি সে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল, সেই চিঠিগুলি স্বামীর দেওয়া অলঙ্কারের মতই সে রাখিয়া গিয়াছিল। সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল সাধব্যের চিহ্ন — হাতের শাঁখা ও লোহা। সিতাংশুমৌলি আসিয়া তাহার জীবনে যে আন্দোলন আনিয়া দিল, সংসারত্যাগের তাহাই প্রধান কারণ নহে। কারণ সরোজের মৃত্যুই সংসারের সঙ্গে তাহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিল। বাৎসল্যের বন্ধন গৃহিণীপনার ও প্রেমের বন্ধন অপেক্ষা দৃঢ়তর ছিল বলিয়া মনে হয়।

'অপরিচিতা' ও 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পেও পরিচয় ও অ-পরিচয়ের এই ছায়ালোক চিত্রিত হইয়াছে। এই দুই গল্পের উপক্রমণিকায় একটু সাদৃশ্য আছে। কন্যার পিতার উপর বরপক্ষীয়গণের উৎপীড়নের কাহিনী উভয় গল্পেই বর্ণিত হইয়াছে। উভয় গল্পেই পাত্রী পরিচিতা হইয়াও দূরে রহিয়া গিয়াছে। সনৎকুমার প্রথম জীবনে দুইবার বিবাহ-বিভ্রাটে পড়িয়া গিয়াছিল; প্রথমবার অন্তরায় হইল তাহার পিতা, পরে বাধা আনিল তাহার নিজের কল্পনা। কাশীশ্বরীর পিতা পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে যাইয়া সে বুঝিতে পারিল, তাহার অবিবাহিত জীবনে কত বড় দৈন্য রহিয়াছে। ইহার অনতিকাল পরেই দীপালিকে বিবাহ করিয়া তাহার শূন্য গৃহ সে ভরিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাও হইল না। দীপালিকে সে পাইয়াও পাইল না; যে আলোতে তাহার ঘর উজ্জ্বল হইল সে আলো তাহার

নিজস্ব নহে। শম্ভুনাথ সেনের কন্যা কল্যাণী অনুপমের কল্পনার সামগ্রী ছিল। সে তাহার স্ত্রী হইতে পারিত; কিন্তু হইল না। তাহার পর একদিন অন্ধকার রাত্রিতে তাহার অতুলনীয় কণ্ঠস্বর, তাহার সাহস ও শুভ্র প্রফুল্লতা লইয়া সেই মানসী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া অনুপমের সঙ্গে পরিচিত হইল। এই পরিচয় ক্রমশঃ নিবিড় হইল; কিন্তু বাসর-রাত্রিতে সেই যে অপরিচয়ের যবনিকা টানিয়া দিয়াছিল, তাহা আর ঘুচিল না। কল্যাণী মাতৃভূমির সেবা গ্রহণ করিয়াছে; কোন বিশেষ লোকের গৃহিণী হইয়া সে তাহার জীবনকে সঙ্কীর্ণ করিল না। পরিচিতা হইয়াও সে অ-পরিচিতাই রহিয়া গেল। কল্যাণী ও দীপালির জীবনের একটি বিশিষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট ধারা আছে। অনিলার চরিত্রে ও জীবনে যে সুগভীর রহস্য রহিয়া গেল, তাহা তাহাদের জীবনে নাই। কিন্তু এই দুইটি গল্পের প্রধান রস এই যে, নায়ক ও নায়িকার মধ্যে অতিপরিচয়ের অথচ একান্ত অপরিচয়ের এক বন্ধন ও ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে।

'অধ্যাপক', 'মাল্যদান' ও 'শেষের রাত্রি' এই গল্প তিনটির মধ্যে বৈষম্য যথেষ্ট। তবে এগুলি প্রেমের গল্প এবং ইহাদের প্রত্যেকটিতেই প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির একটি অপরূপ সংমিশ্রণ হইয়াছে। 'অধ্যাপক' গল্পে লেখক-যশঃপ্রার্থী মহীন্দ্রনাথ নিজের লেখক-জীবনের ব্যর্থতার কথা খুব বেশী করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছে। কিরণবালার সঙ্গে তাহার পরিচয়ের ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হইয়াছে একটা প্রচণ্ড anti-climax-এ। কিন্তু ইহা গল্পের মূল অংশ হইলেও, আর একটি রস ইহার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তাহা হইতেছে কিরণবালার জন্য মহীন্দ্রনাথের প্রেম। সে বি-এ পাশ করিতে পারে নাই, এবং যে কিরণবালাকে সে নিতান্ত অজ্ঞ বলিয়া মনে করিয়াছে, সে রি-এ'তে প্রথম হইয়াছে। সেই নির্জ্জন গঙ্গাতটে নদীর কলহাস্য, সন্ধ্যার অপূর্ব্ব শ্রীতে যে রূপসীকে সে প্রথম দেখিল, এবং প্রকৃতির বিচিত্র শোভার সঙ্গে যে তাহার চিত্তকে জয় করিল, তাহাকে সে ভাল করিয়া চিনিল না, তাহার অন্তরের বাহিরের পরিপূর্ণ পরিচয় সে পাইল না, শেষ পর্য্যন্ত সে হইল বামাচরণের প্রণয়িনী; কিন্তু নির্জ্জন নিবাসে যে জগতের সঙ্গে মহীন্দ্রনাথের পরিচয় হইল, তাহা তাহার জীবনের অক্ষয় সম্পদ হইয়া রহিল। এই গল্পের এক অংশ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে ভরা; অপর অংশ প্রেমের গীতিকাব্য; ইহাদের মধ্যে আখ্যানগত সমন্বয় থাকিলেও প্রকৃতিগত সামঞ্জস্য নাই। এই কারণে এই গল্পটি কবির শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। 'শেষের রাত্রি' গল্পটির দোষ এই যে, তাহাতে আখ্যান আরম্ভ করা হইয়াছে উপসংহারে। সুস্থ অবস্থায় যতীনের সঙ্গে মণির কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, সে সম্বন্ধে আভাসে দুই একটি কথা বলা হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এই গল্পের প্রধান রস এই যে, যতীনের কাছে মণি পরিচিত হইয়াও অজ্ঞেয় রহিয়া গিয়াছে। প্রথম যখন তাহার ভুল ভাঙে নাই, তখন সে মণির সেবা পাইত বলিয়া মনে করিত, কিন্তু সেবার অন্তরালে সেবিকাকে পাইত না। জীবনের চরম সুখকে হাতের কাছে পাইয়াও সম্পূর্ণ করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিল না। তারপর যখন ভুল ভাঙিল, তখন মৃত্যু তাহার দ্বারে উপস্থিত। মৃত্যুর ঘনায়মান অন্ধকারে তাহার নিজের জীবন, তাহার মাসীর চরিত্র, মণির চরিত্র, সবই অদ্ভুত কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল; যাহা পাইল, আর যাহা পাইল না—তাহার মধ্যে সীমা-রেখা অস্পষ্ট হইয়া গেল। 'মাল্যদান' গল্পে সরল বালিকার সঙ্কোচহীন হৃদয়ে প্রেমের নব জাগরণই সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় এবং আখ্যানের মধ্যে ইহাই প্রধান বস্তু। কিন্তু গল্পের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যের ছাপ রহিয়াছে। কুড়ানি যতীনকে তাহার মাল্য দান করিল, যতীন মালা গ্রহণ করিল; কিন্তু এই মিলন দৈনন্দিন জীবনের গল্পে পরিণত হইবার সুযোগ পাইল না, যাহা পাইল তাহা অপ্রাপ্তের মধ্যে মিশিয়া

গেল। যতীন নিজেই গল্পের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছে —

"যাঁহার ধন তিনিই নিলেন, আমাকেও বঞ্চিত করিলেন না।"

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গল্পের মধ্যে 'সমাপ্তি' ও 'দুরাশা'র স্থান অতি উঁচুতে। 'সমাপ্তি' গল্পে দুর্দ্দান্ত বন্য মৃন্ময়ীকে অপূর্ব্ব বিবাহ করিল ও তাহার চিত্তজয় করিল। এক হিসাবে ইহা পরিসমাপ্তির কাহিনী, ইহার মধ্যে অজানা, অচেনা, সুদূর ও অনন্তের স্পর্শ নাই। কিন্তু ইহার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত হইয়াছে। যে বালিকা তাহাকে বরণ করিতে আসিয়াছিল, অপূর্ব্ব তাহাকে গ্রহণ করিল না। যে অশান্ত উচ্ছৃঙ্খল শিশু তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, সে তাহার মধ্যে অজ্ঞাত, সুপ্ত নারীহৃদয়কে জাগ্রত করিতে চাহিয়াছিল। যে ভাবে সে মৃন্ময়ীর ভালবাসা পাইল তাহারও একটি বিশেষ মাধুর্য্য আছে। মৃন্ময়ীকে ঠিক shrew বলা যায় কিনা জানি না, কিন্তু বয়সের পার্থক্যের কথা বাদ দিলে, *The Taming of the Shrew*র Catherinaর সঙ্গে মৃন্ময়ীর চরিত্রের সাদৃশ্য আছে। Petruchio ব্যবসাদার লোক ; Catherinaর পিতার বিষয় তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং কূট বিষয়ীর বুদ্ধি লইয়া সে এক জাল বিস্তার করিল Catherinaকে ধরিবার জন্য। কিন্তু মৃন্ময়ীর হৃদয় স্পন্দিত হইয়াছে অন্যভাবে। অপূর্ব্ব তাহার স্বাধীন উন্মুক্ত চিত্তের অবাধ গতিকে রুদ্ধ করিতে চাহে নাই। গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া মৃন্ময়ী অপূর্ব্বের সঙ্গে তাহার বাপের কাছে চলিয়া গেল। এই যাত্রায় "কী মুক্ত! কী আনন্দ!" দুই ধারে মৃন্ময়ী যাহা কিছু দেখিল, তাহাতে তাহার অন্তর ভরিয়া গেল, আর দুই দিনের জন্য সে যে গৃহিণীর পদ পাইল, তাহাও অলক্ষ্যে তাহার সুপ্ত নারীহৃদয়কে পরিপুষ্ট করিল। শেষে যে তাহার পরিবর্ত্তন হইল, তাহা ইহা অপেক্ষা আরও অলক্ষিতে। অপূর্ব্ব চলিয়া গেলে কে যেন একদিনে সমস্ত পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া দিল। তাহার কাছে যেন মধ্যাহ্নে সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গেল। আকাশ, আলোক, বাতাস কি এক অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া উঠিল ; যেন কোন অজ্ঞাত গিরিগহ্বর হইতে এক দুর্ব্বার জলোচ্ছ্বাস আসিয়া তাহার সমস্ত হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিল। তাহার বিরহ-বেদনার যে সমাপ্তি হইল, তাহা প্রাত্যহিকের, শীঘ্রই তাহা চির-অভ্যস্ত দাম্পত্য জীবনে পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু যে নব চেতনায় তাহার মন ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দৈনন্দিনের নহে, তাহার তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াম্'।

'সমাপ্তি' গল্পে প্রেমের পরিপূর্ণ মিলন ও পরিসমাপ্তির কাহিনী, দুরাশায়, অতৃপ্ত বাসনার বেদনাময় ইতিহাস। নবাবপুত্রীর জীবন-ইতিহাস শুধু প্রেমের কথা নহে, প্রেমে সাফল্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নবাবপুত্রী ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করিবার জন্য যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহার কাহিনীও প্রণয় আদান-প্রদানের আখ্যানের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে। কেসরলাল মুসলমানীর সেবা গ্রহণ করিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছিল দেখিয়া, নবাবপুত্রী ব্রাহ্মণত্ব পাইবার জন্য অনেক তপস্যা করিলেন ; বিশেষতঃ কেসরলাল যে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল সে শুধু তাহার শৌর্য্য বা রূপের বলে নহে, তাহার অপরিসীম ধর্ম্মনিষ্ঠার তেজেও। কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব অর্জ্জন করিয়া নবাবপুত্রী দেখিলেন যে, যাহার অজেয় ব্রহ্মণ্যতেজ তাঁহাকে ঘরছাড়া করিয়াছিল, যে অব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করিত না, যে মরণের দ্বারে দাঁড়াইয়া যবনীর সেবা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সে ভুটিয়া রমণীকে বিবাহ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সংসার করিতেছে। ব্রহ্মণ্য একটী সংস্কার বা অভ্যাস মাত্র না তাহা প্রকৃতপক্ষেই ধর্ম্ম যাহাকে না ধরিয়া থাকা যায় না, এই প্রশ্ন নবাবপুত্রী তুলিয়াছেন, কিন্তু কবি ইহার কোন সমাধান করেন নাই ; কারণ বিস্তারিত আলোচনা উপাখ্যানে সম্ভব হয় না। কিন্তু কেসরলালের ধর্ম্মের স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, নবাবপুত্রীর আত্মবিসর্জ্জনের সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই। নবাব-

পুত্রী নিজেই খেদ করিয়া বলিয়াছেন, "হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, কিন্তু আমি আমার এক যৌবন, এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন-যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব?" গল্পের ট্র্যাজেডি তো এইখানে। ব্রাহ্মণ্য আচার পালন নবাবপুত্রীর পক্ষে দৈনন্দিন কাজ ছিল; ইহা তাঁহার প্রাত্যহিক জীবনের সত্য। তখন কেসরলাল ছিল দূরের আদর্শ। সেই আদর্শ যখন ধূলিতে মিশিয়া গেল, তখন তিনি দেখিলেন যে, একদিন যাহা তাঁহার আপনার ছিল, তাঁহার সেই যৌবন আজ অতিক্রান্ত, যে সুখ তিনি হেলায় ফেলিয়া আসিয়াছেন, আজ তাহা আয়ত্তের বাহিরে। যাহা পা'ন নাই, তাহা গ্রহণের অযোগ্য, যাহা অবলীলাক্রমে পাইয়াছিলেন, তাহা বাকী জীবন তপস্যা করিলেও ফিরিয়া আসিবে না।

রবীন্দ্রনাথ যতগুলি প্রেমের গল্প লিখিয়াছেন তন্মধ্যে 'নষ্টনীড়' সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই গল্পটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার জিনিস। চারু ও অমলের মধ্যে যে ভালবাসার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা প্রথমতঃ শুধু বন্ধুত্ব মাত্র ছিল। একজন আব্দার করিত, আর একজন তাহা পালন করিত; দুইজনে মিলিয়া আকাশ-কুসুম কল্পনা করিত, তারপর দুইজনে মিলিয়া সাহিত্য রচনা করিত। একে অপরের সাথী, ইহাকে নর-নারীর প্রেম বলা যায় না; অথচ যৌন প্রেমের গোপনতা ইহার মধ্যে ছিল। যেদিন সেই গোপনতা ভাঙিয়া গেল, সেই দিনই চারুর মন ভাঙিতে সুরু হইল। তাহাদের গোপন ঐশ্বর্য্য পরে কাড়িয়া লইবে, ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, সে পাপ মনে অমলকে চায় নাই; বরং মন্দা অমলকে ভুলাইয়া রাখিতে চাহিয়াছে— এই সন্দেহের কদর্য্যতায় তাহার মন তিক্ততায় ভরিয়া গিয়াছে। এই সন্দেহ মন্দাকে তাড়াইবার অজুহাত মাত্র নহে; গোপনে এই কথা কল্পনা করিয়া তাহার মনে ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে। ইহাতে তাহার হৃদয়ের পবিত্রতা প্রমাণ করে। ভূপতির প্রতি তাহার মনে কোন অবহেলার সঞ্চার হয় নাই; সে কায়মনোবাক্যে সতী স্ত্রী হইতে চেষ্টা করিয়াছে। ভূপতি যখন বাংলায় প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার হৃদয় জয় করিতে চাহিয়াছে, তখন এই ছেলেমানুষীতে সে লজ্জিত হইয়াছে। তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, ভূপতি কোন অংশেই নিজেকে তাহার অপেক্ষা ছোট না করে। কিন্তু তাহার মনের কথা তো কেহই বুঝিল না, অমলও না, ভূপতিও না। বাস্তব জগতে একটা ইতরতা আছে; ইহা কোন সূক্ষ্ম জিনিসের অস্তিত্ব সহ্য করিতে পারে না। সব জিনিসই হাতে ধরিয়া পায়ে দলিয়া চটকাইয়া ফেলিতে চায়। তাই নর-নারীর সম্বন্ধকে বুঝিতে হইলে, তাহাকে যৌন-সম্পৃক্তির পর্য্যায়ে ফেলিয়া লয়। চারু ভূপতিকে স্ত্রী হিসাবে সেবা করিতে, ভালবাসিতে চাহিয়াছিল; আর অমলকে লইয়া একটি গোপন স্বর্গ তৈরী করিতে চাহিয়াছিল, সেখানে তাহাদের মিলিত কল্পনা আকাশ-কুসুম সৃষ্টি করিবে। মানুষের মনকে এইরূপে দ্বিধা বিভক্ত করা যায় কিনা, ইহা লইয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে; চারু শেষ পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধের শুচিতা রক্ষা করিতে পারিত কি না, তাহাতে হয়ত সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু চারু তো ইহাই চাহিয়াছিল।

আর এই রহস্যকে কেহ বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই গোল বাধিয়া গিয়াছে। অমল সাধারণ বাঙালী যুবক। তাহাকে চাকুরি করিয়া খাইতে হইবে, চারিদিকে নাম জাহির করিতে হইবে। বাহিরের জগতে যাহাকে বাঁচিতে হইবে, একজনের প্রীতি ও শ্রদ্ধা লইয়া সে সন্তুষ্ট থাকিবে কি করিয়া? সে চারুর মনের কথা বুঝিতে পারিল না; তাই মন্দার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক লইয়া চারুর আপত্তি যে কোথায়, তাহা সে ধরিতে পারিল না। যে স্বর্গ সে রচনা করিয়াছিল, তাহার সাথীর কথা না বুঝিয়া সে তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিল। ভূপতিও চারুর মনের কথা একেবারেই বুঝিতে পারে নাই; যখন বিদ্যুতের মত অমল ও চারুর সম্পর্কের গোপন কথা তাহার মনে খেলিয়া গেল, তখন সে

অনেক বুঝিল, আবার অনেক বুঝিল না। একদিন চারুকে একেবারে তাহার নিজস্ব বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, আর এক মুহূর্তে তাহাকে একেবারে পরকীয়া বলিয়া মনে হইল। চারুর দুই জীবনের মধ্যে সে কোন স্বর্ণসেতু দেখিতে পাইল না। পত্রিকা-সম্পাদক ভূপতির জগতের সমস্ত বাস্তব ঘটনার অন্তরালে চারুর হৃদয়ের অন্তর্নিগূঢ় রহস্য সঙ্গোপনে আত্মরক্ষা করিল; তাই তাহার হিসাবনিকাশ অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।

'প্রতিবেশিনী' গল্পটি ঠিক প্রেমের কাহিনী নহে, কারণ, তাহার মধ্যে খানিকটা farce আছে। কিন্তু ইহাতেও সসীমের মধ্যে বৃহত্তর অনুভূতি আছে। নবীন-মাধব যাহাকে জীবনের মধ্যে পাইল, গল্পলেখকের কাছে সে চিরকালই অপ্রাপণীয়া হইয়া রহিল। অথচ নবীন-মাধব যে কবিতা দিয়া তাহাকে আবাহন করিয়াছিল, সে তো তাহারই কবিতা, যে যুক্তি দিয়া বিধবাকে বিবাহে সম্মত করাইয়াছিল, সে তো তাহারই যুক্তি, যে অর্থ দিয়া নবীন বিবাহ করিল ও তাহার স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সুরু করিল, সে তো তাহারই অর্থ। নবীনমাধব তাহাকে পাইল, সেও বঞ্চিত হইল না। 'বোষ্টমী' গল্পটিও ঠিক প্রেমের গল্প নহে, তবে তাহাতে প্রেমের গন্ধ আছে। বোষ্টমী তাহার ছেলেকে হারাইয়া সমস্ত বিশ্বসংসার ফাঁকা দেখিতে লাগিল। এই শূন্যতাকে সে ভরিতে চেষ্টা করিল গুরুকে সেবা করিয়া। গুরুর সেবা তো সেবা মাত্র নহে; তাহার মধ্য দিয়া সে তাহার ক্ষুধিত বাৎসল্যের আহার যোগাইতে চাহিত। কিন্তু গুরু তাহা বুঝিলেন না, তিনি রূপহীন সেবাকে ছাড়িয়া রূপসী সেবিকাকে চাহিলেন। তাঁহার লালসামদির একটিমাত্র কথাতেই আনন্দী বুঝিতে পারিল গুরু-শিষ্যার সম্পর্কের দীনতা, কদর্য্যতা কোথায়। এই আঘাতে সংসারের সমস্ত সম্পর্ক তাহার কাছে তুচ্ছ বোধ হইল। ঘর ছাড়িয়া সে বিশ্বপ্রেমে আপনাকে বিলাইয়া দিল, যেখানে কোন ক্ষুদ্রতা নাই, যে স্নেহ সমস্ত কদর্য্যতা হইতে দূরে। তাই বাসী ফুল তাহার কাছে হেয় নয়, কোন লোক তাহার কাছে ঘৃণ্য নয়।

(৩)

রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রেমের গল্পই লিখেন নাই, সংসারের অন্যান্য সম্পর্ক লইয়াও বহু গল্প রচনা করিয়াছেন। প্রেম দুইটী ব্যক্তির আপনার জিনিস, কিন্তু সংসার বহুর। সংসারে যাহাদের সাক্ষাৎ ও দেনা-পাওনা হয়, তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক থাকিলেও ব্যবধানও আছে। কারণ তাহাদের স্বার্থ এক নহে। সংসারের পাকা লোক তাহারাই যাহারা এই দেনা-পাওনায় ঠকে না, যাহাদের স্বার্থবুদ্ধি সম্পূর্ণ সচেতন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে, তিনি শুধু লাভালাভের মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নাই; বরঞ্চ তিনি দেখাইয়াছেন যে, সংসারের ক্ষুদ্র লাভালাভের অতীতও আর একটি জগৎ আছে, তাহা হৃদয়ের জগৎ। পার্থিব জীবনের লাভালাভ মানবজীবনের চরম কথা নহে। সাংসারিক দিক্ দিয়া রামকানাই যে নির্বুদ্ধি, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে ধর্ম্ম সে রক্ষা করিল, তাহার কাছে সাংসারিক লাভের মূল্য কতটুকু?

আমরা যখন সাংসারিক লাভালাভের বিষয় আলোচনা করি এবং তাহা লইয়া ব্যাপৃত থাকি, তখন হিসাব করিয়া দেখি না তাহার প্রভাব কতদূর যাইয়া পৌঁছে। হিমাংশুমালী ও বনমালীর পিতা গোকুল-চন্দ্র ও হরচন্দ্র একটি নালা লইয়া মোকদ্দমা করিলেন; তাঁহাদের মামলা নালার স্বত্বের মীমাংসায় পর্যাবসিত হইল; কিন্তু ইহার ফলে দুইটি স্নেহপরায়ণ হৃদয় চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। 'দানপ্রতিদান' গল্পে দেখিতে পাই রাধামুকুন্দ ও শশিভূষণের আন্তরিক সৌহৃদ্য আছে; তাঁহাদের পত্নীদের মধ্যে যে কলহ চলিত, তাহাতে তাহাদের হৃদয়ে কোন পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু শশিভূষণের স্ত্রীর দর্প ভাঙিয়া সংসারে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য রাধামুকুন্দ শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্যও সফল হইল। তিনি আর

পরাশ্রিত রহিলেন না; বরঞ্চ শশিভূষণ ও তাঁহার স্ত্রী ব্রজসুন্দরী তাঁহার উপরে নির্ভর করিতে আরম্ভ করিলেন। বড় বৌ ও ছোট বৌয়ের ঝগড়া কমিল; বাহিরের দিক দিয়া পরিবারে শান্তি ও শৃঙ্খলা আসিল। কিন্তু শঠতার আশ্রয় লইয়া রাধামুকুন্দ যে শান্তি আনিলেন তাহাতে বাহিরের শৃঙ্খলা আসিলেও শশিভূষণের অন্তর দীর্ণ হইয়া গেল। রাধামুকুন্দ হৃতসম্পত্তি পুনরায় ক্রয় করিয়া দাদাকে দিলেন, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিলেন, ঘটা করিয়া দেশের লোককে খাওয়াইলেন, কিন্তু শশিভূষণের ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগিল না। তিনি একটি কথা বলিলেন না, কিন্তু "অন্তররুদ্ধ মানসিক উত্তাপের বাষ্পযানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্দ্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পৌছিলেন।" মৃত্যুর প্রাক্কালে রাধামুকুন্দকে বলিলেন, "ভাই, ভালই করিয়াছিলে। কিন্তু যে জন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল? কাছে কি রাখিতে পারিলে?"

রবীন্দ্রনাথ স্নেহের যে সব চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহার সব কয়টিতেই এই বৈশিষ্ট্য আছে। দিদি শশিকলার ভ্রাতৃস্নেহ তাহার স্বার্থের বিরোধী ছিল; ভাইকে ভালবাসিয়া সে তাহার স্বামীর ভালবাসা হারাইল, শেষে নিজের জীবন পর্য্যন্ত হারাইল। 'আপদ' গল্পে দেখিতে পাই যে, কিরণময়ী নীলকান্তের জন্য যে গভীর স্নেহ পোষণ করিত তাহার সঙ্গে তাহার স্বার্থের কোন সংস্রব ছিল না এবং এই স্নেহ অন্য সকলের কাছে নিতান্ত অহেতুক বলিয়া মনে হইত। কিন্তু তাহার অহেতুক স্নেহের মধ্য দিয়াই তাহার নিজের হৃদয়ের সমস্ত লুক্কায়িত ধারা উৎসারিত হইত এবং যাত্রার দলের যে অশিক্ষিত বর্ব্বর ছেলে তাহার কাছে ভাসিয়া আসিয়াছিল, তাহাকে নতুন মনুষ্যত্বের সন্ধান আনিয়া দিয়াছিল। এই গল্পটির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, নীলকান্তের হৃদয়ে এই যে নতুন মনুষ্যত্ব জাগিয়া উঠিল কেহই তাহাকে বুঝিল না, কেহই তাহাকে চিনিল না। সবাই নীলকান্তকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত, তাহাকে আপদ বলিয়া মনে করিত; আর কিরণও তাহাকে স্নেহের পুতুল মাত্র মনে করিত। তাহার মধ্যে যে অভিমান, ঈর্ষা, আত্মসম্মান-বোধ জাগিয়া উঠিয়াছে, কেহই তাহা বুঝিল না, চিনিল না, ইহাই এই গল্পের ট্র্যাজেডি। ঠাকুর্দা কৈলাস-বাবুর 'বাবু'গিরি যখন চলিয়া গেল, তখন রহিল তাহার স্মৃতি, গল্প ও কল্পনা, তাঁহার সম্পত্তি চলিয়া গেলে, ইহাই হইল তাঁহার সম্পদ। ইহা একেবারে ফাঁকি, কিন্তু মেকী নহে; ইহা তাঁহাকে বর্ম্মের মত রক্ষা করিত, এবং অন্য সকলেও ইহার আনন্দ পাইত। ঠাকুর্দার জীবনের একমাত্র সম্বল ছিল, তাঁহার পিতৃহীন পৌত্রী কুসুম। যে বংশগৌরবকে তিনি এতবড় মনে করিতেন, যাহাকে তিনি কোনদিন নত করেন নাই, তিনি তাহাই ভুলিয়া গেলেন, যখন তিনি কুসুমের জন্য সৎপাত্র পাইলেন। পাত্রও নাতনীর মাতৃহৃদয়ের পরিচয় পাইয়া এক নতুন জগতের সন্ধান পাইল; বৃদ্ধের জীবনের নিরীহ ছলনার সত্যিকার স্বরূপ চিনিতে পারিল। শশীর পিতা নেটিভ্ ডাক্তার যখন দারোগার সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিল, তখন তাহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল, আর দারোগার সঙ্গে প্রণয় ভূমিসাৎ হওয়ার পর তাহাকে ভিটা ছাড়িতে হইয়াছিল। এই 'দুর্বুদ্ধি' হইয়াছিল তাহার একমাত্র কন্যার মৃত্যুর পর; এই মৃত্যুতে বিরাট বিশ্বের সমস্ত বেদনার সঙ্গে তাহার পরিচয় হইয়া গেল। "কোনো ছোট মেয়ের ব্যামো হইলেই মনে হইত (তাহার) শশীই যেন পল্লীর সমস্ত রুগ্না বালিকার মধ্যে রোগ-ভোগ করিতেছে।" শেষে এক অজ্ঞাত সন্তানহারা উৎপীড়িত মুসলমানের জন্য তাহাকে ভিটাছাড়া হইতে হইল। বাৎসল্যের আর একটি অপরূপ চিত্র দেখিতে পাই 'সম্পাদক' গল্পে। সম্পাদক তাহার প্রহসন, ও আহির গ্রাম ও জাহির গ্রামের কলহ লইয়া ব্যস্ত থাকিত। যখন বাহিরের জগতে সে ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল, তখন একদিন অকস্মাৎ একটি স্নেহপূর্ণ আহ্বানে সে বুঝিতে পারিল, তাহার জীবনের সত্যিকার

ঐশ্বর্য্য কোথায়, এবং সেই দিনই প্রভার বিমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া প্রভাকে কোলে তুলিয়া লইল। লেখাপড়ার জীবনে খেলাধুলার কোন সার্থকতা নাই; ইস্কুলের মাষ্টার মহাশয়ের কাছে তাহার কোন মূল্য নাই। তাই তিনি বালক আশুতোষকে 'গিন্নী' আখ্যা দিলেন। কিন্তু ইহাতে তাহার জীবনের কতখানি ম্লান হইয়া গেল! শিশুর স্বাধীন উন্মুক্ত হৃদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর চিত্র পাই ফটিক চক্রবর্ত্তীর কাহিনীতে। কবি নিজেই বলিয়াছেন যে, তের-চৌদ্দ বৎসরের বালকের ন্যায় এমন বালাই আর পৃথিবীতে নাই। তাহার শোভাও নাই, সে কাজেও লাগে না। কিন্তু এই সব বালকের 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। ফটিক যখন গ্রামে ছিল, তখন সে ছিল গ্রামের সমস্ত ছেলের সর্দ্দার। সেই গ্রামের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা আসিল, অমনি সে অসঙ্কোচে রাজি হইল। বাহিরের পৃথিবী দেখিবার আকাঙ্ক্ষার কাছে, ক্ষুদ্র গ্রামের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মায়া কতটুকু। রাস্তায় খালাসীদের কাজকর্ম্ম সে কৌতূহলের সহিত দেখিল এবং তাহা তাহার মনে গভীর ছাপ রাখিয়া গেল। কলিকাতার রুদ্ধ হাওয়ায়, স্নেহহীনা মামীমার সংসারে আসিয়া এই স্বাধীনচারী বালকের হৃদয় যেন মুষ্‌ড়িয়া গেল। পল্লীগ্রামের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতায় যে বালকের চিত্ত পরিপুষ্ট হইয়াছিল, কলিকাতার সঙ্কীর্ণ গলির ইস্কুলে সে ভালছেলে হইবে কেমন করিয়া?

পোষ্টমাষ্টারের সঙ্গে গ্রামের মেয়ে রতনের কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না; কোন সামাজিক বন্ধনও ছিল না। রতন কাজ করিত, আর পোষ্টমাষ্টার তাহাকে খাইতে দিত; ইহা নিতান্ত আর্থিক সংস্রব। যেদিন পোষ্টমাষ্টার চলিয়া যাইবে, সেই দিন রতনের কাজ শেষ হইবে; তখন রতনের চেষ্টা হইবে নতুন পোষ্টমাষ্টার বা অন্য কোন প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করা। পোষ্টমাষ্টার তো এইরূপ বুঝিত; কিন্তু সেই বর্ষণ-মুখর নির্জ্জন গৃহে এই দুইটী প্রাণী মিলিয়া যে একটী অপরূপ সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ভাজিয়া গেলে জোড়া দিবে কে? পোষ্টমাষ্টারের জীবনে সেই গ্রামের চাকুরী একটা ক্লেশকর অধ্যায় মাত্র, তাহার সম্মুখে বৃহৎ জগৎ পড়িয়া রহিয়াছে, সেইখানে সে তাহার স্থান করিয়া লইবে। কিন্তু রতনের ক্ষুদ্র জীবনে যে অপরূপের সংস্পর্শ আসিয়াছিল তাহা তো চিরকালের তরে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। মিনির সঙ্গে রহমৎ কাবুলিওআলার কোন সংস্রব ছিল না; কিন্তু মিনির মধ্য দিয়া সে তাহার মরুবাসিনী কন্যাকে দেখিয়া লইল; আর গল্পের শেষে মিনির পিতার সন্তান-বাৎসল্য শুধু মিনিতেই আবদ্ধ রহিল না; তিনি আফগানিস্থানের মরুপর্ব্বতে বহুদিন বিচ্ছিন্ন পিতা ও কন্যার সুখমিলনের স্বপ্ন দেখিলেন। রাইচরণের বাৎসল্যরসও একটু অদ্ভুত রকমের। সে মনিবের ছেলেকে শুধু স্নেহই দেয় নাই, তাহাকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করিয়াছে। এই শিশু তাহার মনে এমন গভীর ছাপ মুদ্রিত করিয়াছে যে সে নিজের ছেলেকেও নিজের বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। এই গল্পে অনুকূল বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রথমতঃ অনুকূল বাবুর স্ত্রী সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, রাইচরণ তাঁহার ছেলেকে হত্যা করিয়া উহার গায়ের গহনা চুরি করিয়াছে। এই সঙ্কীর্ণ সন্দেহ স্ত্রীজন-সুলভ; অনুকূল বাবুর মনে এইরূপ হীন সন্দেহের উদয় হয় নাই। কিন্তু কয়েক বৎসর পর যখন রাইচরণ নিজেই স্বীকার করিল যে, সে ছেলে চুরি করিয়াছিল, তখন অনুকূল বাবু ও তাঁহার স্ত্রীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইল। ছেলেকে পাইয়া অনুকূল বাবুর স্ত্রী সমস্ত সন্দেহ ভুলিয়া গেলেন। কিন্তু হাকিমের মন এত সহজে টলিবার নহে। যেই চুরি কবুল হইয়া গেল, অমনি রাইচরণ তাঁহার কাছে ঘৃণিত হইয়া পড়িল। ধর্ম্মাবতারের বুদ্ধি!

'কর্ম্মফল', 'রাসমণির ছেলে', 'পণরক্ষা' এই গল্পগুলি রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গল্প হইতে আয়তনে বড়। ইহাদের প্রত্যেকটি বাৎসল্য লইয়া লিখিত। "মাষ্টার মহাশয়" গল্পে বাৎসল্যের কথা খুব বেশী নাই,

কিন্তু বেণুগোপালের জন্য হরলালের যে স্নেহ, তাহা বাৎসল্যের অনুরূপ। এই গল্প কয়টির কোনটিই শ্রেষ্ঠ গল্পের স্থান পাইতে পারে না। 'কর্মফল' সতীশের ভাগ্য-বিপর্যয়ের কাহিনী। তাহার জীবনের উত্থান-পতনের যে কাহিনী লেখা হইয়াছে, তাহাতে ঘটনার পরিবর্তন এত আকস্মিক হইয়াছে এবং সতীশের শেষের দিকের বক্তৃতায় উচ্ছ্বাস এত বেশী যে, ইহা অতিরিক্ত নাটকীয় হইয়া পড়িয়াছে। সুদীর্ঘ উপন্যাসের আকারে লিখিলে এই গল্পটি কি রকম হইত বলিতে পারি না। কিন্তু ছোটগল্প হিসাবে ইহা নিকৃষ্ট। 'মাষ্টার মহাশয়' গল্পে হরলাল ও বেণুগোপালের প্রথম বন্ধুত্বের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা খুব মধুর হইয়াছে এবং শেষে গাড়ীতে বেণুগোপালের যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাহা তাহার পূর্বকৃত অপরাধের উৎকট পরিণতি। কিন্তু হরলালের শান্ত সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে বেণুগোপালকে আনিয়া যে অনর্থ ঘটান হইল, তাহা অনেকটা কৃত্রিম উপায়ে করান হইয়াছিল। তাহারা এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল যে, হঠাৎ বেণুগোপালকে আনিয়া হরলালের জীবনযাত্রায় বিপ্লব সংঘটন করার কোন কারণ পাওয়া যায় না। ইহা অসম্ভব নহে, কিন্তু আর্টে যে সুসংবদ্ধ সুশৃঙ্খলা থাকা প্রয়োজন, তাহা এই গল্পে নাই। 'পণরক্ষা' সম্বন্ধেও এই সমালোচনা খাটে। বংশীর আত্মলোপী ভ্রাতৃস্নেহের চিত্রটি অতিশয় করুণ; কিন্তু ইহাতে আবেগের আতিশয্য আছে। তাঁহার সাইকেল কিনিয়া রাখিয়া যাওয়া ও রসিকের সাইকেল চড়িয়া আসা—এই যে ঘটনার সমাবেশ, ইহা গণিতশাস্ত্রের সঙ্গতির অনুরূপ। রসিকের জীবনের যে আকস্মিক পরিবর্তন হইল, তাহাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলা যায় না। 'রাসমণির ছেলে' গল্পে রাসমণির মাতৃত্বের ও স্বামিপ্রীতির এবং ভবানীচরণের সরল স্বভাবের যে চিত্র আঁকা হইয়াছে, তাহা অতীব চিত্তাকর্ষক। কিন্তু শেষের দিকে আর্টের স্বাধীন গতি রক্ষা হয় নাই। শৈলেন্দ্রের সহিত তাহাদের যে সম্পর্ক আবিষ্কার করা হইল এবং শেষে যে শৈলেন্দ্র উইল ফিরাইয়া দিল, ইহাদের মধ্যে কবি যেন আর্ট অপেক্ষা ঘটনার আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সমাবেশের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিয়াছেন। গল্পের স্রোত তাহার স্বাধীন পথে অবাধভাবে বিচরণ করে নাই; পূর্ব হইতেই তাহার পথ নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

এই সময়ে লেখা রবীন্দ্রনাথের আর দুইটি গল্পের কথা এখানে উল্লেখ করিতে হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে, পার্থিব জীবনে আর্থিক লাভালাভ মানুষের জীবনের শেষ কথা নহে; অর্থলাভের মধ্য দিয়া মানবচিত্ত তাহার পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। 'গুপ্তধন' গল্পে দেখিতে পাই অর্থের অবিমিশ্র সঙ্গ মানবমনকে পীড়িত করিয়া এক বিভীষিকার সৃষ্টি করে। মৃত্যুঞ্জয় যখন তাহাদের পুরুষানুক্রমিক আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী সেই স্বর্ণপুরী দেখিতে পাইল, তখন উল্লাসে সে অধীর হইয়া পড়িল। কিন্তু ক্রমে তাহার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল; কারণ সোণার জড়পিণ্ডগুলি আলো চায় না, প্রাণ চায় না, মুক্তি চায় না। সে ঐ বিভীষিকার সঙ্গে তুলনা করিল গোধূলির স্বর্ণের, "যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের মধ্যে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়", এবং ঐ অচলায়তন হইতে মুক্তি ভিক্ষা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যে লিখনপত্র তাহারা তিন পুরুষ ধরিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছিল, যাহাকে সম্বল করিয়া তাহারা দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিল, তাহা সে আজ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। 'ভাইফোঁটা'তে সোনার কথা না থাকিলেও টাকার কথা আছে। ইহার শেষের দিকে অকৃতজ্ঞ অবিচারের নিরবচ্ছিন্ন কাহিনী; তাহাতে আর্টের বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু সনাতন দত্তের পুত্রের সমস্ত কৃতঘ্নতা ও অসততাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে অনসূয়ার প্রতি তাহার টান। যখন সে পরের টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে তখন অনসূয়ার ভাইফোঁটাকে ভগবানের আশীর্বাদের মত গ্রহণ করিয়াছে, আর সর্বনাশের মাঝদরিয়া

দাঁড়াইয়াও অনসূয়ার টাকা ভাঙিতে তাহার সঙ্কোচ হইয়াছে। অনসূয়া যে তাহার সমস্ত লাভলোকসানের অতীত; তাহার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অনসূয়ার স্মৃতি বিদ্যুতের আলো।

মানুষের হৃদয়ের প্রসারের অন্ত নাই; কিন্তু পরিবারের ও সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে সীমাবদ্ধ হইতে হয়। ইহার জন্য নিজের ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর হয় না; অনেক সময় নিজের সত্তাকে ডুবাইয়াই রাখিতে হয়। কিন্তু কাহারও কাহারও ব্যক্তিত্ব এত প্রখর যে, তাহারা যৌথ-পরিবারের স্বাতন্ত্র্যলোপী বিধান মানিতে চাহে না। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত, হালদার-গোষ্ঠীর বনোয়ারীলাল। সে ঐ গোষ্ঠীর বড় ছেলে, তাহাকে গোষ্ঠীর ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে হইবে। কিন্তু সে তাহাতে রাজি হইতে চাহিল না; তাহার নিজের ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্যায়-বোধ আছে; তাহাকে সে জলাঞ্জলি দিবে কেমন করিয়া? কিন্তু সে দেখিল, এই ব্যক্তিত্বকে কেহই স্বীকার করে না। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জিনিস; কিন্তু তাহার মধ্যেও বনোয়ারীলাল নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিল না। তাহার স্ত্রী কিরণও হালদার-গোষ্ঠীর বড়বৌ মাত্র, তাহার কাছেও তাহার ব্যক্তিত্বের কোন মূল্য নাই। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' ইব্‌সেনের A Doll's House নামক বিখ্যাত নাটকের ভারতীয় সংস্করণ, কারণ এখানেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা লেখা হইয়াছে। ইব্‌সেনের নোরা স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথের মৃণালের বিদ্রোহ যৌথপরিবারের বিরুদ্ধে; কারণ, আমাদের দেশের পরিবার তো শুধু স্বামী-স্ত্রীতেই পর্য্যবসিত নহে। এই গল্পেও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আছে। মৃণাল যে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তাহা তাহার নিজের জীবনের কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য নহে; এবং বিন্দুর প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছিল শুধু তাহাই তাহাকে মুক্তি দেয় নাই। সে মুক্তির আস্বাদ পাইল, প্রথমতঃ বিন্দুর মৃত্যুর মধ্য দিয়া। মৃত্যু তো অনন্ত; মৃত্যুতে বিন্দু কেবল বাঙালী ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। মৃত্যুর অসীমতা যে মুক্তির সন্ধান দিল, তাহাকে সে আরও বেশী করিয়া উপলব্ধি করিল কলিকাতার বাহিরে পুরীর মুক্ত অনন্ত আকাশের সংস্পর্শে আসিয়া।

সে তাহার স্বামীকে লিখিয়াছে, "তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র। আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ।" ছিদাম রুইর স্ত্রী চন্দরা মৃণালের মত লেখাপড়া জানিত না, তাহার অত বুদ্ধিও ছিল না। কিন্তু সে যে ভাবে কথা না বলিয়া, আপত্তি না করিয়া তাহার জা'র হত্যার দায় নিজের মাথার উপর লইল, ইহাতে মনে হয় সে নীরবে বিশ্ববিধানের সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে নালিশ জানাইয়া গেল। ভাসুরকে বাঁচাইবার জন্য একবার তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইল; তাহার স্বামী সেই মিথ্যা তৈরী করিয়াছিল। আবার তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আর এক প্রস্থ মিথ্যার উদ্ভব হইল। সে ইহা গ্রহণ করিল না। তাহার জা জীবিত থাকিতে সে অনেক কলহ করিয়াছে; কিন্তু মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সে নালিশ করিল না। সে অম্লানবদনে মৃত্যুকে বরণ করিল; "এই রহস্যময়ী রমণীর মনে বোধ হয় ভরসা ছিল যে মৃত্যুর অন্ধকারে আর যাই থাক্, মিথ্যা নাই।

(৪)

বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে তাঁহার কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান আছে। ঘটনার কৌতুকময় সন্নিবেশই যে গল্পের মূল বক্তব্য এইরূপ গল্পে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হয় নাই। আর শুধু ব্যঙ্গ বিদ্রূপও তাঁহার গল্পের প্রধান উপজীব্য হয় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির বৈচিত্র্য অপরূপ, কাজেই এই দ্বিতীয় প্রকারের গল্পও তিনি রচনা করিয়াছেন। এই সকল গল্পে তাঁহার প্রতিভার

প্রধান বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতঃ প্রকট নহে, ইহাদের গুণাগুণ অন্য রকমের।

'ফেল', 'সদর ও অন্দর', 'শুভদৃষ্টি', 'মানভঞ্জন', 'প্রতিহিংসা', 'ডিটেক্‌টিভ', 'রাজটিকা,' 'দর্পহরণ'—এই সকল গল্পের রস আহরণ করা হইয়াছে বাহিরের ঘটনা ও আবেষ্টনের সমাবেশ হইতে। ইহাতে চরিত্রচিত্রণ আছে; কিন্তু চরিত্রচিত্রণ ইহার প্রধান উপাদান নহে। রবীন্দ্রনাথের রচনায় দৃশ্য ও অদৃশ্য, সন্নিকট ও সুদূরের যে অপূর্ব্ব সম্মিলন ও প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তাহা ইহাতে নাই। 'দর্পহরণ' গল্পের প্রধান জিনিস নির্ঝরিণী ও হরিশ্চন্দ্রের একসঙ্গে গল্প লিখিয়া প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া এবং হরিশ্চন্দ্রের পরাজয়। কিন্তু এই গল্পে আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করিতে হইবে। এই গল্পের নির্ঝরিণীর আদর্শ 'স্ত্রীর পত্রে'র মৃণালের আদর্শের বিপরীত। মৃণাল পরিবারের সঙ্কীর্ণতার বিরোধী এবং তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে। কিন্তু নির্ঝর নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়াও তাহা জাহির করিতে চায় না। সে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া তাহার লেখা পুড়াইয়া ফেলিয়াছে এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক বানান ভুল করিয়া লোকের কাছে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে যে, তাহার স্বামীর গল্প সম্পূর্ণ বানান।

এই শ্রেণীর অন্যান্য গল্পের মধ্যে 'শুভদৃষ্টি' ও 'রাজটিকা' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কান্তিচন্দ্র যাহাকে প্রবঞ্চনা মনে করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য বলিয়া প্রতীত হইল। তাঁহার নবপরিণীতা স্ত্রী সুধা অন্য পাঁচ জন স্ত্রীলোকের মত সাধারণ ঘরের সাধারণ মেয়ে। কিন্তু অবস্থার, বিপর্য্যয়ে সাধারণ অসাধারণে রূপান্তরিত হইল, দূরের আশা দূর হইলে নিকটের জিনিস যে শুধু প্রত্যক্ষ হইল তাহাই নহে, তাহার মধ্যে তিনি অপরূপের সন্ধান পাইলেন। 'রাজটিকা' গল্পটিতে শুধু অবিমিশ্র কৌতুক। নবেন্দু-শেখরের দৃষ্টি রায়বাহাদুর খেতাবের উপর নিবদ্ধ। কিন্তু তাহার শ্যালিকার কৌশলে, চাতুরীতে ও ষড়যন্ত্রে তাহাকে রাজটিকা পরিতে হইল কংগ্রেসের। ঘটনার সমাবেশে একটি অপরূপ সুসঙ্গতি আছে; নবেন্দুর ম্যাজিস্ট্রেটের চাপ্‌রাশীর পশ্চাদ্ধাবনে ইহার চরম পরিণতি হইয়াছে।

'প্রায়শ্চিত্ত', 'তপস্বিনী', 'পুত্রযজ্ঞ', 'নামঞ্জুর গল্প'—ইহাদের মধ্যে কৌতুক অপেক্ষা শ্লেষ ও ব্যঙ্গের আধিক্য দেখা যায়। কংগ্রেস যখন নিতান্ত শিশু ছিল, তাহার প্রভাব যখন এত বিস্তৃত হয় নাই, তখন রবীন্দ্রনাথ লাবণ্যলেখার হাত দিয়া নবেন্দুশেখরের গলায় কংগ্রেসের বিজয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আজ কংগ্রেস প্রবলপ্রতাপান্বিত; দেশে জাতীয়তার আন্দোলনের শক্তির সীমা নাই। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সেবায় উন্মত্ত আন্দোলনের আড়ম্বরের পিছনে যে শূন্যতা আছে, তাহাও দেখাইয়াছেন। সেবাকে সভা-সমিতি করিয়া বিলাতি ঢঙে সাজাইলে তাহার লজ্জা-কুণ্ঠিত নম্রতাকে ও একাগ্রতাকে কেমন করিয়া খণ্ডিত করা হয়, তাহার চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন। নবজাগ্রত ভারত, জাতির শ্রেষ্ঠ কবির হাত হইতে জাতীয়তার এই বিকৃত চিত্র গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে না; তাই তিনি ইহার নাম দিয়াছেন 'নামঞ্জুর গল্প'। আমরাও বলি, তথাস্তু।

'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'তপস্বিনী'—এই দুইটি গল্পে বিলাত-প্রবাসী স্বামীর স্ত্রীর নিষ্ঠার ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। দারিদ্র্য ও অকৃতজ্ঞতার মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী তাহার স্বামিভক্তি অচলা রাখিয়াছিল; তাহার স্বামীর চৌর্য্যকে শিরোধার্য্য করিয়া সে স্বামীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গিনী মিসেস্ অনাথবন্ধু সরকার যখন উপস্থিত হইল, তখন শুধু যে সংহিতার তর্ক থামিয়া গেল তাহাই নহে, বিন্ধ্যবাসিনীর সমস্ত নিষ্ঠা ও একাগ্র স্বামিভক্তির উপরও অগস্ত্যের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল। 'তপস্বিনী' ষোড়শী তাহার স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন হইল কৈশোরের প্রথম আরম্ভে। তাহার জীবনের সুগভীর শূন্যতা ভরিয়া তুলিবার জন্য সে সন্ন্যাসীর সেবা ও কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ

করিল। তাহার ধারণা ছিল তাহার স্বামী সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে এবং সন্ন্যাসের মধ্য দিয়া তাহার অনুপস্থিত স্বামীকে সে পাইবে। কঠিন তপশ্চর্য্যার শেষ সীমায় পহুঁছিয়া তাহার বিশ্বাস হইল সে তাহার স্বামীকে দেখিতে পাইতেছে সুদূর হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে। ইহার পর বরদা যখন কাপড়কাচা কলের এজেন্ট হইয়া মটরগাড়ি চড়িয়া বাড়িতে আসিল তখন ষোড়শীর বারবৎসরব্যাপী তপস্তার উপর কি অপরূপ যবনিকা টানা হইল! এই শ্লেষাত্মক রচনার আর একটি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই—'পুত্রযজ্ঞ' গল্পে। ইহাতে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুকের অবকাশ কম, ইহা অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসের কাহিনী। বৈদ্যনাথ মনে করিত, 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'। বিনোদিনী স্ত্রীর সেই অবশ্যস্বীকার্য্য সর্ত্ত পালন করিতে পারে নাই। তাই বৈদ্যনাথ তাহার উপর বিরক্ত হইল এবং একদিন দাসীর অভিযোগে বিনোদিনীকে অসতী মনে করিয়া তাহাকে ঘরের বাহির হইয়া যাইতে বলিল। যখন বিনোদিনী স্বামী-গৃহ ত্যাগ করিল, তখন স্বামীস্ত্রীর কেহই জানিত না যে, বৈদ্যনাথের পারলৌকিক সদগতি বিনোদিনীর গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বৈদ্যনাথ অপুত্রক বিনোদিনীকে তাড়াইয়া পুত্রার্থে পর পর দুইবার বিবাহ করিল; কিন্তু তাহার আশা বিফল হইল। পুত্রার্থে যজ্ঞ করিয়া সে যখন প্রচুর দান করিতে লাগিল তখন তাহারই একমাত্র ক্ষুধাতুর পুত্র তাহার গৃহ হইতে অন্ন না পাইয়া বিতাড়িত হইল।

এই সকল গল্পের ঘটনা সন্নিবেশে বাহাদুরি আছে, ইহাতে মধুর হাস্য হইতে কঠোর শ্লেষ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার ব্যঙ্গরসের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু এই সব গল্পে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নিজস্ব ছাপটি নাই। সেই বিশ্ব-বিজয়িনী প্রতিভার স্ফূর্ত্তি হইয়াছে সেই সকল গল্পে যেখানে তিনি ঘরের কথাকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন, যেখানে ক্ষুদ্র ঘটনার খণ্ডরূপের মধ্যে অসীম অরূপ তাহার পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

(সমাপ্ত)

বিজয়া
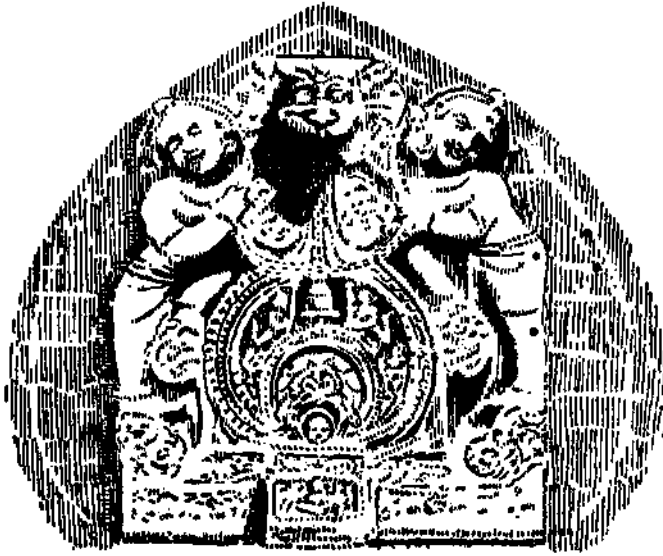
শ্রীকালিদাস রায়

আজি সেই দিন যেদিন ভিক্ষু-শ্রমণেরা ত্যজি' সংঘারাম,
ধর্ম্মপ্রচারে যাত্রা করিত শ্রদ্ধায় স্মরি' বুদ্ধনাম।
আজি সেই দিন যেদিন দেশের যত দিগ্‌গজ সারস্বত
দিগ্‌বিজয়ের অভিযানে নিত পরিব্রাজকজীবন ব্রত।
আজি সেই দিন যেদিন সাহসী রাজপুত্রেরা ত্যজিত দেশ
তাম্রলিপ্ত বন্দর পথে রচিতে নূতন উপনিবেশ।
এই সেই তিথি যেদিন এদেশে তেয়াগি' কিশোর জীবনলীলা,
বিদ্যার্থীরা যাত্রা করিত মগধ হইতে তক্ষশিলা।
এই সেই তিথি যেদিন গগনে উড়ায়ে দীপ্ত বিজয়কেতু,
যাত্রা করিত নৃপতিবৃন্দ অরাতিদর্পদলন হেতু।
আজি সেই তিথি যেদিন দর্পে বিজয়পত্রভূষণে সাজি',
দিগ্‌দিগন্তে দেশদেশান্তে ছুটিত অশ্বমেধের বাজি।
সেই দিন আজ যেদিন ক্ষাত্র উৎসব হ'তো শস্ত্রাগারে,
বিদ্যুৎসম জ্বলিত আয়ুধ, নীরাজনা লোকে বলিত যারে।
এই দিনই সেই বাঙ্গালার সাধু সাজায়ে পণ্যে সপ্ত ডিঙা,
যাত্রা করিত সিংহল চীনে বাজায়ে গর্ব্বে বিজয়-শিঙা।

সে দিন গিয়াছে। সে সব আজিকে অতীত স্বপ্নলোকের কথা,
গিরি সন্ধ্যার অভ্রের মত জাগায় কেবল স্মৃতির ব্যথা।
সব ভুলিয়াছি — ভুলি নাই শুধু মেনকা মায়ের নয়ননীর,
বাঙ্গালী দেহের শিরায় শিরায় বহিতেছে যাঁর স্তন্যক্ষীর।
ভুলি নাই সেই বিদায়দৃশ্য গিরিরাজবুকে শল্যসম,
কৈলাসে ফিরে গেলেন গৌরী, সেই দৃশ্যটি করুণতম।
সারাদিন ধরি' উমার বদন চুমিয়া মায়ের মিটে না সাধ,
ভুলি নাই সেই গৌরীর আঁখি, অশ্রুধারায় মানে না বাঁধ।
মিথ্যা মিথ্যা অতীত গরিমা, মিথ্যা তা যা আসে না ফিরে।
হোক পরাজয়া তবু এ বিজয়া সত্য উমার নয়ননীরে।
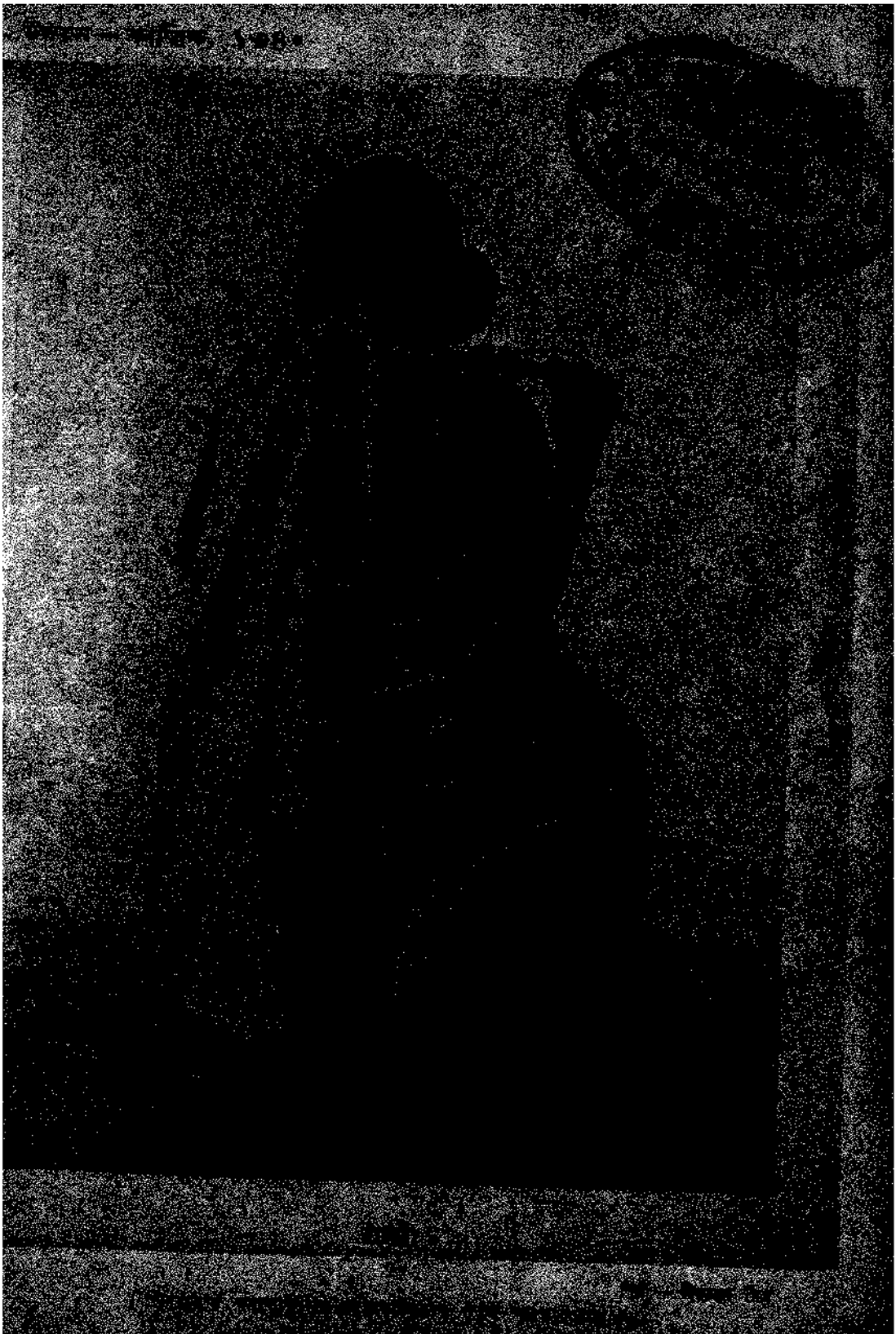
আদ্য বাংগালীর সামাজিক শক্তির উদ্বোধন

শ্রীহরিদাস পালিত

'সমাজ' বলিতে বুঝায়,—সমূহ, বহু,—অনেক কিছু, (সম্-অজ্ + অধিকরণ-ঘঞ্),—গণ, সভা; এমন এক দল গণ-সঙ্ঘ, যাহাদের গতি একসঙ্গে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। একমতাবলম্বী গণ-তান্ত্রিক সম্প্রদায়। সমাজ—একমতাবলম্বীর দল, এবং সমাজ সম্বন্ধীয় যাহা, তাহাই সামাজিকতা। বিভিন্ন সমাজের—বিভিন্ন সামাজিকতা বিদ্যমানতার জন্য, সমাজ বিভেদ করা যায়। সমাজ একপ্রকার 'সঙ্ঘবদ্ধের গণ'। সামাজিকতা একপ্রকার গণতান্ত্রিকতার নিদর্শন।

আদ্য-মানব—একত্র দলবদ্ধভাবে অবস্থান করিত যখন, তখনই সঙ্ঘ-শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। অনুকরণ-প্রিয়তাই,—মানবকে গণ-শক্তিতে আকৃষ্ট করিয়াছে। এক বংশ, কাল-সহকারে যখন বহুতে পরিণত হইল, তখন তাহাদের মধ্যে বংশ-আগত রীতি-নীতি স্বভাবেই পরিগৃহীত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বপুরুষীয় ভাবধারার বশবর্ত্তিতাই সমাজ-প্রতিষ্ঠার কারণরূপে গণ্য হইতে পারে। সমাজ যত সভ্য হইতে থাকে, ততই উহার মধ্যে নবীন ভাবপ্রবণতার বিকাশ হয়, প্রাচীন ভাব-ধারাগুলির মধ্যে উহা কাল-উপযোগী ভাবে সংস্কৃত হইয়া পড়ে, সুতরাং কিছু কিছু নূতনত্ব দেখা দেয়, পুরাতন প্রথা কিছু পরিত্যক্ত হয়। তত্রাচ প্রাচীনতর বদ্ধ-মূল সংস্কার বিলুপ্ত হইয়াও যায় না। সেই জন্য প্রত্যেক সমাজে প্রাচীনতর রীতি-নীতির কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। সেই রীতি-নীতি সু কি কু, ইহার বিচার সহজে কেহ করিতে প্রয়াস পায় না। ইহা পূর্ব্বপুরুষীয় পদ্ধতি বলিয়া সামাজিকেরা সম্মানের চক্ষে দেখেন।

আদি বাংগালী সমাজ, একেবারে সুচারু-সভ্যতা লইয়া প্রকটিত হয় নাই। সভ্যতা একটি ক্রমিক অভিব্যক্তি। 'ঠেকে শেখা'—জীবধর্ম্ম-বিশেষ। আদি বাংগালী সমাজ, প্রথমে যে প্রকার ছিল, বর্ত্তমানে তাহা নাই, এবং তদ্রূপ থাকাও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। দু-হাজার বৎসর পূর্ব্বের বাংগালী সামাজিকতা বর্ত্তমানে নাই, তত্রাচ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষাগত ভাবপ্রবণতা এখন ফল্গু নদীর মত বাংগালী সমাজের অভ্যন্তরে বহিতেছে। ভাষা, ধর্ম্ম, পদ্ধতি, রীতি-নীতিগুলির মধ্যে প্রাচীনতর ভাবধারা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই ক্ষীণ স্মৃতিজাত কর্ম্মপ্রবাহই জাতীয়ত্বের নিদর্শন। সমান আকৃতি যদ্রূপ জাতীয়ত্বের নিদর্শন, তদ্রূপ সমান ভাব-প্রবণতাও সমাজের নিদর্শন। প্রকৃত জাতি বলিতে, বিশ্বে যেমন দুইটির অধিক তিনটি নাই (নর ও নারী জাতি), তদ্রূপ সমাজ দুইটির অধিক তিনটি নাই, যথা সেশ্বর এবং নিরীশ্বর সমাজ। তৃতীয় জাতিরূপে যদ্রূপ নপুংসক (ক্লীব, হিজরা),—তদ্রূপ অর্দ্ধনাস্তিক সমাজও তৃতীয় সমাজ। ইহা অস্বাভাবিক ব্যাপারও নয়। কারণ নর-নারীর ইচ্ছার উপর ক্লীবের অভিব্যক্তি নির্ভর করে না, ইহা এক প্রকার প্রকৃতির 'খেয়াল'—বর্ত্তমান কালে বলা চলে। অর্দ্ধনাস্তিক বা নাস্তিকতা—তদ্রূপ মানসিক খেয়াল। বিরুদ্ধবাদের আবির্ভাব নিতান্ত স্বাভাবিক।

মানব-জাতিতত্ত্বের ইতিহাসে কিন্তু, আদি-মানব (উষা-মানব) সমাজে স্রষ্টা বা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অভাব ছিল,—এই উক্তি পাওয়া যায়। বিশ্বের মানব-উক্ত-ধর্ম্ম-শ্রুতি মাত্রেই দৃষ্ট হয়, নরসৃষ্টির পরে, স্রষ্টা স্বয়ং সৃষ্ট মানবদিগকে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন।

প্রবাদ এই যে, তথাকথিত আদ্য-কালে, নরগোষ্ঠীদের মধ্যে, স্রষ্টা-ঈশ্বর,* সাধারণ বন্ধু-বান্ধবগণের মতই আসিতেন, এবং উপদেশ-নির্দ্দেশ দিতেন। তাঁহার আদেশ-নির্দ্দেশ যথাযথ প্রতিপালিত না হওয়ায়, ঈশ্বরের ক্রোধের উদয় হইয়াছিল, এবং তিনি মানব-কুলকে ধ্বংস করিবার ইচ্ছা করিয়াও, পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন নাই। এই মানব-ধ্বংসের উপাখ্যান, বিশ্বের

মানবকৃত ধর্ম্মসাহিত্যে বিচিত্ররূপে চিত্রিত রহিয়াছে। এই উপাখ্যানে প্রাচীন মানবগণ ঈশ্বরকে ত্রিকালজ্ঞ রূপে চিন্তা করে নাই, প্রকৃত মানবীয় ভাবাদর্শেই বিবেচনা করিয়াছিল।

তথাকথিত ভাবপ্রবণতা, যখন আদ্য বাংগালী সমাজে বিদ্যমান ছিল, সেই সময়ের শ্রুতি-জাত উপাখ্যান, বিদ্যমান ধর্ম্মশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস হইবার পরেও, প্রাচীন উপাখ্যান-বিশেষের সম্মানরক্ষার্থে, কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেও পরিত্যক্ত হয় নাই। এই জন্য প্রাচীনতর সামাজিকদের মনোভাব অবগত হইবার উপায় হইয়াছে।

তথাকথিত আদ্য বাংগালী সমাজের পরিচয় হড়-শ্রুতিতে শুনিতে পাওয়া যায়। প্রথম নর-মিথুনের আবির্ভাবের পরে, যথাকালে পুত্র-পুত্রীর জন্ম হয়। এই হইল আরম্ভ প্রথম সমাজ-প্রতিষ্ঠার। নর-নারী লইয়াই সমাজ, সেই আদ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার মূল আদি 'নর-মিথুন' — যে নর-মিথুন স্রষ্টাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই কল্পনা ব্যতীত, প্রথমে অন্য কোন দার্শনিক তত্ত্বের আবিষ্কার, ঊষা-মানবের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইহাই আদ্য মানব-সামাজিকগণের -- মনস্তত্ত্বের প্রাথমিক দিক্।

আদ্য বাংগালী হড়-সামাজিক শ্রুতিতে উক্ত হইয়া থাকে যে—

দ্বিতীয় শ্রুতি

(প্রথম অংশ)

"এয়ায় * গোটে কুড়ী, এয়ায় * গোটে কোড়া। মিদ্ দিন্ দঁ, পিল্‌চু-বুড়্‌ডী — পিল্‌চু-হাড়াম, হাঁড়ি যুঁকে কেদাকিন্, বুলি না কিন্। কক্‌রিও এনাকিন্,— গিদ্‌রা হাটিংকে কোয়াকিন্। কোড়া উনি হাতাও কো — পিল্‌চু-হাড়াম্। বুড়ী (বুড়ী) হাতাও কো কুড়ী।"

* এয়ায় (৭ সাত) স্থলে 'গেল্‌বার্' (১২ বার) পাঠান্তর।

(দ্বিতীয় অংশ)

"কোড়া ইদির কো কোয়া—মুড়্‌ক-বিড়তে (১); কুড়ী ইদির কে কোয়া—খাড়েরা-বিড়তে (২),—সাকাম্ হেজ।"

(তৃতীয় অংশ)

"মিট্‌টাং (৩) বাড়ে দারে তাহে কানা। কুড়ী দে ঝিলো কানাকো। কোড়া দঁ মিট্টাং জিল্‌কো (৪)—তুঁইদি দিয়াকো; উনি জিল্ দো, বাড়ে দারে লাতাৎ নির্ পারো মেনা। বাড়িলতার্ জিল্ গোজনা।"

তৃতীয় শ্রুতি

(প্রথম অংশ)

সাম—

বাপ্‌লো—সেরিং (৫)

(১)

মুই (মুঞ্) দোঁ ডুঙ্গুর্ ডুঙ্গু
এনাকো চাপাতিআ (এঞা)
বাড়ে লতারো—বাপ্‌লো—
মুই (মুঞ্) দোঁ ডুঙ্গুর্ ডুঙ্গুর্।

(২)

দিঞ্ মুঞ্ কোদাকো,—ডুঙ্গুর্ ডুঙ্গুর্,
ওঁকাকো—কুড়ীকো,
সেরিং এদা বাপ্‌লো—
মুঞ্ দোঁ ডুঙ্গুর্ ডুঙ্গুর্।

(৩)

কোড়াকো মে ইদা কো,
ওঁকারে কুড়ীকো,
সেরিং এদা বাপ্‌লো—
মুঞ্ দোঁ ডুঙ্গুর্ ডুঙ্গুর্।

(১) বিড়তে, বিড়্ ও বির্ একই অর্থ, বির্ উচ্চারণে 'বিড়্' শোনায়। বির্ (বিড়্) অর্থে বন বুঝায়। (২)
(৩) 'একটা'কে 'মিৎ' বলে, (এক হইতে দশম অঙ্কের নাম,— মিৎ, বার্, পে, পোন্, মোড়ে, তুরুই, এয়ার, ইরাল্, আরে এবং গেল্) মিৎ+টাং=মিট্‌টাং হইয়া থাকে। গেল্ (দশ) বার্ (দুই) অর্থাৎ বার বলিতে হইলে 'গেল্‌বার্' বলিবে।
(৪) জিল্=হরিণ, কো=কে। (৫) মিলনের গান—বিবাহের গীত।

(৪)

দেলাবং (৬) বাপ্‌লো,—কোড়াকো চালা এনাকো,
কুড়ীঠে চালা এনাকো,
দেলাবং কুড়ী কোঠে,—
মুঞ্‌ কোঁদোকোঁ হুঙ্গুর্‌ হুঙ্গুর্‌।

(৫)

কুড়ী কোঠে, নেল্‌কো বাপো, বাপ্‌লো—
নেল্‌কো বাপো—
মুঞ্‌ দোঁ হুঙ্গুর্‌ হুঙ্গুর্‌॥

(পুনরাবৃত্তি)

চতুর্থ শ্রুতি

(প্রথম অংশ)

"এয়ায়্‌ গোটে কুড়ী, এয়ায়্‌ গোটে কোড়া। মেন্‌ ইদাকো বাপ্‌লো (লা) আবো (৭), যাৎ হাতিং ইদাকো, —এবে আপ্‌না জুরি, সারজম্‌ বুটারে রাকাৎ দিয়াকো, চাঁনদু (চাঁন্দু) লেকা জাহের্‌ এরা। মোড়েকো তুরিকো, আচার্‌ বিচার্‌ এদাকো নেতে তিরেল্‌ (৮) ভুটারে। আচার্‌ বিচার্‌ কিদাকো বাপ্‌লা হোই না।"

(দ্বিতীয় অংশ)

"আপন্‌ আপন্‌ চালা ইনাকো, বোংগা (৯)-বুরু কুড়ো এদাকো। মেরং (মেরম্‌) সাব্‌কি দিঞা, মিন্টা (মিট্টাং) সিম্‌ সব্‌কি দিঞ্‌ (ঙ্‌)। দেলাবন্‌ (দেলাবং) হাটা (১১) সাব্‌মে, দেলাবন্‌ কাপি (১০) সাব্‌মে, মেরংকো সিম্‌কো সাব্‌মে। সব্‌কিদা যৎ গের্‌। দেলাবন্‌।"

(তৃতীয় অংশ)

"গাদ্‌দা (গাড্‌ডা) পেরে ইনা, চেকা পারোম্‌ আমো চেকাতে, আদো মেন্‌ কেদা, সিন্দুর কুর্‌তোবোন্‌। সিন্দুর বাং আগু লিদা। সাদাতেঁ বোংগামা (বোঁগামা), উন্‌কু মঁতেরে বোংগা ইদা, মুকুদো সিন্দুর আপে।"

(চতুর্থ অংশ)

"মেন্‌ কিদা আম্‌ দোঁ, সাদা টুকু মিন্‌ হড়্‌ দ্‌, জিল্‌লা লেদা, জিল্‌ মেন্‌তে ভাগোআলা কিদা। মিন্‌ হড়্‌ দ্‌ আংরা জমকিদা, মারাং-বুরু মেন্‌ কেদা—আংগারিআ টুচু (টুকু)।"

(পঞ্চম অংশ)

"মারাং-বুরু মেন্‌ কেদা, চিলিংজাৎ, নিউকি দিয়া—বেস্‌রাজেৎ; মিন্‌ হড়্‌ আগু কেদা—গুয়া হেন্‌ রং।"

(ষষ্ঠ অংশ)

"ঠাকুর— মুরমু ঠকুর — আদো সিপাহী দহ্‌ কেদা, দহ্‌ কেদা সরেণ্‌-হড়্‌, মুরমু ঠকুর—সরেণ্‌-সিপাহী।"

(সপ্তম অংশ)

"হুকু (১২) কিষঁড়্‌ হড়্‌—মান্‌ডি-কিষঁড়্‌।"

(অষ্টম অংশ)

"কিস্‌কু-হড়্‌—রাজ হেনা, কিস্‌কু হড়্‌ মেন্‌ এদা, মুরমু ঠকুর (ঠাকুর) খোজ্‌ ইদা, মিট্টাং সিপাহী—এমা ইমে, রাজ এনা সিপাহী এমা ইমে।"

(নবম অংশ)

"আদঁ মারাং-বুরু মেন্‌ কেদা, মুঞ্‌ দোঁ ফারাক্‌ তাঁহে না। হুই দোঁ মিতায়া মারাং-বুরু মেন্‌ কেদা, হুই দোঁ—বিটোল্‌-মুরমু।"

(দশম অংশ)

"মিন্‌ হড়্‌ মেন্‌ কেদা, মারাং-বুরু—হুই দোঁ মান্‌-সরেণ্‌, হুই দোঁ দিশমকার উর্‌ঠাও।"*

আগু বাংলার শ্রুতিগুলির সকলই সূত্রাকারে সংক্ষেপে রচিত হইয়াছে। অধিকাংশ শ্রুতি-সূত্রে সর্ব্বাদি

(৬) উচ্চারিত হয় 'দেলাবন্‌' তুল্য। (৭) আলে, আবো অর্থ—আমাকে, আমাদিগকে; সর্ব্বনাম পদ।
(৮) কেঁদগাছ, বনগাবের গাছ (বিড়ি-পাতার গাছ)। (৯) সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা। (১০) ছোট কুড়াল। (১১) কুল্য।

(১২) হুকু অর্থে—ইহারা, ইহাদিগকে।

* কতিপয় শ্রুতি (পদবী উৎপত্তি বিজ্ঞাপক) অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল। ১২টি উপাধির ১২টি শ্রুতি আছে। চারিটি উপাধিই প্রধান, সেই চারিটি—যোদ্ধা (ক্ষত্রিয়), রাজা, বৈশ্য এবং কনিষ্ঠ পুরোহিত বিজ্ঞাপক পদবীগত বিভাগ। এই বিভাগের নাম—খুঁট, ইহা জাতিবিভাগ নয়, কেবল কর্ম্ম-বিভাগ মাত্র।

প্রভু মারাং-বুরুর (রবি-ঠাকুর) এবং তাঁহার স্ত্রী চন্দ্রিকা (সিনীবালী) চন্দ্রদেবীর বাণী মাত্র। তিনি বোংগা-বুরু অর্থাৎ পরমা সুন্দরী দেবী, তিনিই প্রেমের দেবী —প্রেমময়ী মূর্ত্তি। সূর্য্য (মারাং-বুরু) তেজোময় কঠোর প্রকৃতি, দেবী চন্দ্রমা—করুণাময়ী, প্রেমময়ী মা, তিনি পরমা সুন্দরী, সে রূপ বিশ্বে আর কাহারও নাই। ইহাই আদি বাংগালীর ধারণা।

আদি বাংগালীর শ্রুতি সূত্রের

ব্যাখ্যান (দ্বিতীয় শ্রুতি) সংক্ষেপে দেওয়া হইল। প্রথম নর-মিথুনের আবির্ভাবের পরে, যথাকালে—"সাতটি কন্যা ও সাতটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। একদিন আদি পিতা-মাতা, পাচই মদ (বারুণী মদিরা) পান করিতে করিতে, খুব মাতাল হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ঝগড়া হয়; সেই কলহ কেবল পুত্র-কন্যাদের বিষয় অবলম্বনেই হইয়াছিল। উভয়ে পুত্র-কন্যাদিগকে ভাগ করিয়া, ছেলেদিগকে একেবারে লইলেন কর্ত্তা, এবং গৃহিণীর ভাগে পড়িল মেয়েগুলি। এ বিভাগের আর অন্যথা হইবে না, কেহ কাহাকে ফেরত দিবে না, এই রকম সত্ত হইয়াছিল ('হাতাও' অর্থে প্রত্যর্পণ-উদ্দেশ্যহীন গ্রহণ বুঝায়)। কোন কোন শ্রুতিতে ১২টি পুত্র এবং ১২টি কন্যার উল্লেখ আছে। ইহাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়, কারণ 'খুঁট' বিভাগ দ্বাদশটি বলিয়া।

কোন একদিন পিতা-পিল্চু পুত্রদিগকে লইয়া 'সুড়ুক' নামক বনে গিয়াছিলেন। মাতা-পিল্চু,—কন্যাদিগকে লইয়া পাতা তুলিবার জন্য খাঁড়েরা বনে যান। খাঁড়েরা বনে একটা বড় বটগাছ ছিল। মেয়েরা সেই গাছে দোল খাইতে লাগিল। এদিকে ছেলেরা একটা হরিণকে তীরদ্বারা বিদ্ধ করে, হরিণ ছুটিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু তীরবিদ্ধ হরিণটা দৌড়াইতে দৌড়াইতে, ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে খাঁড়েরা বনের বড় বটগাছের তলায় পড়িয়া যায়। সেই বটগাছের ডালে কুড়ীরা দোল খাইতেছিল। খানিক পরে সেই মৃত হরিণের গায়ে পিপীড়া ধরে। এই ব্যাপার দেখিয়া, কুড়ীরা (যথা ছুঁড়ী) প্রেমের গান গাহিতে সুরু করিল। প্রেমের সঙ্গীতের নাম হড়-ভাষায়—'বাপ্‌লো-সেরিং' (সেরিং=সঙ্গীত)। এই বাপ্‌লো গানের অর্থ খুবই সামান্য কিন্তু ভাবটি খুবই উচ্চ-ধরণের। 'হুলুর্ হুলুর্'—শব্দ নৃত্য-গীত ব্যাপারের মহিলাগণের পরমানন্দ ধ্বনি মাত্র।

গীতের সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ—

এই বড় বটগাছে আমরা সকলেই দোল খাইতেছি, প্রেমের—মিলনের গান গাহিতেছি। এইখানেই কুড়ীদের সহিত কোড়াদের মিলন হইবে, কন্যাদের কোঠে (সীমা, অধিকার) ছোকরারা আসিবে,—আমরা আনন্দে মিলন-গীত গাহিতেছি, ইত্যাদি।

অন্যদিকে কোড়ারা (ছোকরারা) হরিণের অনুসন্ধান করিতে করিতে, ভগিনীদের গান শুনিতে পাইল, এবং আনন্দে সেই দিকে গেল। বটতলায় কোড়া-কুড়ীদের দেখা সাক্ষাৎ হইল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পার্শ্বের শালবনের ভিতর হইতে, রবি-ঠাকুর এবং রূপবতী চন্দ্রা দেবী বাহির হইয়া, বটগাছের অতি সন্নিকটস্থ এক সুবৃহৎ বহুশাখাবিশিষ্ট (ঝাঁকড়া) কেঁদ গাছের তলায় দাঁড়াইলেন। শ্রীমতী চন্দ্রা দেবী—আদেশ করিলেন, "তোরা সকলে বয়স অনুসারে, জোড়ে জোড়ে দাঁড়া।" প্রভুপত্নীর আদেশে তাহারা সকলে কেঁদ গাছের তলায় দেবতাদ্বয়ের সম্মুখে জোড়ে জোড়ে দাঁড়াইল।

বিবাহ-বিধির প্রথম প্রকাশ

পরমা সুন্দরী চন্দ্রাদেবী সর্ব্বপ্রথম বিবাহ-বিধির প্রবর্ত্তন করিলেন; এই বিধি বা আচার-বিচার ব্যতীত বিবাহ হইতে পারে না।

বিবাহ-বিধি

অতি সাধারণ। একটি করিয়া পাঁঠা (ছাগল=মেরম্) প্রত্যেককে দেওয়া হইয়াছে, একটি মুরগী সকলকে দেওয়া হইয়াছে, পাত্রীদিগকে একখানা কুলা, এবং পাত্রদিগকে একটা ছোট কুড়ালও দেওয়া হইয়াছে, যাহা কিছু দিবার দেওয়া হইয়াছে।

চন্দ্র ও সূর্য্যের পূজা

মারাং-বুরু (রবি-ঠাকুর) এবং বোংগা-বুরুর (সুন্দরী দেবী) পূজা, তথাকথিত কেঁদগাছের তলাতেই হইল। পূজার সময়ে দেবতাদ্বয়ের নিকটে, সকলের ছোট ভাই-ভগিনী দুটী থাকিয়া, যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিল। এই জন্য রবি-ঠাকুর পদবী-দানের সময়, অর্থাৎ সমাজ-প্রতিষ্ঠার গোড়াতেই, কনিষ্ঠ দম্পতি যুগলকে (কনিষ্ঠ পুত্রকে)—"মান-সরেণ" উপাধি দেন, এই মান-সরেণ গোত্রীয়গণই পূজাদির অধিকারী হইল, এবং জাতি-অজাতি করিবার একমাত্র কর্ত্তারূপে গণ্য হয়। বিবাহাদি সামাজিক কর্ম্মে ইহারা উপস্থিত থাকে। ইহাতে 'মান-সরেণ' গোত্রীয়কে পুরোহিত শ্রেণী করা হইয়াছে, — এই পদবী কর্ম্মগত বিভাগ মাত্র, জাতিতে সকলেই সমান।

একজনকে — "সরেণ সিপাহী" (রাজ-যোদ্ধা বা সেনাপতি) পদবী মারাং-বুরু দিলেন। উপাধি—"মুরমু ঠকুর"। 'মুরমু' — উপাধি চিন্তনীয় বিষয়, মুরমু গোত্রীয়েরাই—মুরম্‌ বা মুর নামে প্রখ্যাত হইয়াছে।

'কিস্‌কু-হড়'—পাইলেন রাজা খেতাব,—মুরমু ঠকুর, রাজার (দেহরক্ষী) একজন সৈনিক। কেবল 'খেতাব' নয়, গোত্রপতি হইলেন—কিস্‌কু (রাজ) বংশের।

কিষঁড়-হড় উপাধি পাইলেন — "মানড়ি-কিষঁড়," তিনি হইলেন শস্যাধিপতি (বৈশ্যবৎ কিছু), সকল হড়জাতির অন্নাদির ব্যবস্থাপক। ইহা ছাড়া আরও ৮টি গোত্র বা পদবী দিয়া, সর্ব্বসমেত ১২টি গোত্রপতি করিলেন। ভবিষ্যতে সগোত্রে বিবাহ-বিধি রহিত করিয়া দিলেন।

সিন্দুর দানের প্রথা

সূর্য্যের অস্তগমনের পূর্ব্বেই সিন্দুর দানের বিধি। সেই জন্য, গৃহে গিয়া সিন্দুরদানপর্ব্ব সমাধানের জন্য, গৃহাভিমুখে চলিল। নিকটে একটা পাহাড়িয়া শুষ্ক নদী-প্রবাহের গর্ত্ত ছিল, অর্দ্ধেক বর-কনে নদীপার হইয়াছে, অর্দ্ধেক পার হয় নাই, এমন সময়ে, নদীতে বান ডাকিয়া আসিল। সুতরাং অর্দ্ধেক পার হইতে পারিল না।

যাহারা নদীপার হইয়াছিল, তাহাদের নিকটে সিন্দুর ছিল ; তাহারা যথাকালে সিন্দুর পরিল, কিন্তু যাহাদের নিকট ছিল না, তাহারা সিন্দুর পরিতে পারিল না। ১২ গোত্রের অর্দ্ধেক সিন্দুর পরে, অর্দ্ধেক পরে না। সিন্দুর-ধারিণীদিগকে 'আংগারিয়া টুরু', এবং সিন্দুরহীনাদিগকে 'সাদা-টুরু' (বোঁগামা) বলে। সুতরাং দ্বাদশ গোত্রীয় সমাজ দুই প্রকার নাম পাইয়াছে। বর্ত্তমান কালে হড়জাতিদের মধ্যে দুই প্রকার সধবা নারী দৃষ্ট হয়। ইহা আদ্য বাংগালীর প্রাচীন সামাজিক প্রথা। যদিও বিধবা-বিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তত্রাচ নারীর দ্বিতীয় বার পতিগ্রহণে সীমন্তে সিন্দুর পরিবার প্রথা নাই। 'আংগারিয়া' শ্রেণীর হইলে, — কপালে— দুই ভ্রূ-মধ্যে সিন্দুরের 'টিপ' পরে, সাদা টুরুরা আদৌ সিন্দুরের ব্যবহার করে না। হিন্দু ও মোসলমান জাতির মধ্যে উভয়বিধ প্রথা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে।

আদ্য বাংগালী জাতির প্রধান

ব্যক্তিগণের মধ্যে, মারাং-বুরু (রবি-ঠাকুর)-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মগত সামাজিক প্রতিষ্ঠান মধ্যে কিস্‌কু-হড়—রাজা (মারাং-বাবু), মুরমু-ঠকুর—সেনাপতি (ক্ষত্রিয়), কিষঁড় হড় হইলেন মানড়ি (অন্ন) কিষঁড় (বৈশ্য), চতুর্থ 'মান-সরেণ' হইলেন (দিশম্‌ কার উরঠাণ্ড) পুরোহিত। এই পুরোহিত বংশ (মান-সরেণ গোত্রীয়) বাংলা দেশের আদ্য বাংগালীর জাতি-অজাতি করিবার একমাত্র অধিকারী। অবশিষ্ট আট গোত্রীয় (ঘর)-গণ সাধারণ বাংগালী। জাতিতত্ত্বে কোনই প্রভেদ নাই। জাতিতে সকলেই হড়। হড় জাতির বিস্তার অতি দূর দেশেও হইয়াছিল। ইজিপ্সান দেশের এক জাতির মধ্যে সিমসু হড় নামক জাতি ছিল; সিমসু হড় বা সেমসু হড় ইজিপ্সান মধ্যেও ছিল (হলের— এন্‌সিয়েণ্ট হিস্‌টরি, পত্র ৫৮)।

সমাজ প্রতিষ্ঠাই রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূল

'রাজ্য' বলিতে,—রাজকর্ম্ম, রাজত্ব, রাজাধিকৃত দেশ এবং সপ্তাঙ্গ বুঝায়। তথাকথিত সামাজিক বিভাগ

হইতে পরবর্ত্তী কালে রাজ্যশাসন ব্যাপারের উদ্ভব হইয়াছে, ক্ষুদ্র সমাজ বৃহদায়তন প্রাপ্ত হইলে, রাজ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। সমাজপতির বিশাল রূপায়ণই রাজমূর্ত্তি। রাজা যে বিধি-বিধানগুলির অবলম্বনে প্রজা প্রতিপালন করেন, সেই ব্যাপারটিকে সাধারণতঃ বলা হয়—'রাজ্যশাসন তন্ত্র'। 'তন্ত্র' বলিতে বুঝায়—সিদ্ধান্ত, প্রধান, হেতু, রাজ্য, স্বরাজ্য-চিন্তা, ইতিকর্ত্তব্যতা, অধীন ইত্যাদি। রাজ-তন্ত্র—রাজার অধীন, রাজার-সিদ্ধান্ত, রাজার ইতিকর্ত্তব্যতা—এই রকম কিছু।

আদ্য বাংলার রাজ্যাঙ্গ

দ্বাদশ কর্ম্মবিভাগ অতি প্রাচীন—গণতান্ত্রিকতার মূলে 'দ্বাদশ' বিদ্যমান। 'বারভূঞার' মত ব্যাপার সর্ব্ব সভ্য দেশেই বিদ্যমান ছিল। বাংলায় এই নীতি সর্ব্বাদি কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তথাকথিত কালের সামাজিক শাসন-ব্যবস্থার প্রসারণ কালে ব্যবস্থারও প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

প্রাচীন বিধি হইতেই—রাজ্যাঙ্গের পরিকল্পনা হইয়াছে। 'সপ্তাঙ্গ' প্রাথমিক, তৎপূর্ব্বে চতুরাঙ্গিক রাজ্যাঙ্গ ছিল, ক্রমে নব-অঙ্গে পরিণত হয়। কবি কালিদাস যখন 'রঘুবংশ' লেখেন, তখন নব-রাজ্যাঙ্গ ছিল, কবি তাঁহার কাব্যেই বলিয়াছেন।

রাজ্যাঙ্গের পরিচয়

দিতে হইলে বলিতে হয়,—স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, সৈন্য, 'এই সাতটিই রাজ্যের অঙ্গ। কিন্তু 'প্রকৃতি' সমেত আটটি অঙ্গ, তত্রাচ পুরোহিত লইয়া রাজ্যাঙ্গ নয়টি। আদ্য বাংগালী জাতির মধ্যে সমাজ শাসনের জন্য (সমাজ-প্রতিষ্ঠায়) যে দ্বাদশ গোত্রের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, এবং সমাজ রক্ষা এবং শাসনের জন্য যে প্রধান চারি পদবী (কর্ম্মগত) বিভাগ হইয়াছিল, তাহাই বিশাল-রাজ্যাঙ্গের বীজরূপে ব্যক্ত করা যায়। আদ্য বাংগালীরা সৌর, স্বয়ং রবি ঠাকুর এবং চন্দ্রা দেবী ইহাদের সমাজ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যদিও ইহা পৌরাণিক উপাখ্যান। বৈদিক সাহিত্যে, খ্রীষ্টীয় সাহিত্যাদিতে—সর্ব্বত্রই পৌরাণিক উপাখ্যান লইয়া—গোড়াপত্তন হইয়াছে।

কতিপয় সামাজিক শব্দার্থ

রাজা — মারাং-বাবু, প্রজা — পরজা, প্রভু — কিষাঁড়, ভৃত্য—গুতি, ঈশ্বর—চঁনত্ বোংআ বা সেরমা চঁন্দো। ঠাকুর-দেবতা—বোংআ। মানড়ি-কিষঁড়—অন্নের প্রভু। সেরমা — আকাশ, স্বর্গবৎ কিছু। ইত্যাদি শব্দগুলি হড়-শ্রুতির।

সংক্ষিপ্ত আলোচনা

পৃথিবীর সভ্যজনগণের পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনেই প্রাচীন বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে; আদি-বাংগালীদের শ্রুতিও তদ্রূপ পৌরাণিক উক্তি। বৈদিক সাহিত্যে সমাজ-প্রতিষ্ঠার উপাখ্যান মাত্রেই পৌরাণিক ব্যাপার। প্রথমে জাতিভেদ ছিল না, একথা বৈদিক সাহিত্য-শাস্ত্রাদিতে বিদ্যমান রহিয়াছে। গুণকর্ম্ম হিসাবে বিভাগ হইয়াছে — ইহাই প্রাথমিক বিবরণ। কর্ম্মানুপাতে উপাধি প্রবর্ত্তিত প্রথমে হইয়াছিল। বৈদিকগণ ক্রমেই নানা প্রকারে, ইহা বর্ণ বা জাতিগত ব্যাপার মধ্যে ধরিয়া লইয়াছেন। এই উপাধিলাভ ব্রহ্মা নামক দেবতার (অভিমানী দেবতার) প্রবর্ত্তিত। আদ্য বাংগালী শ্রুতিও এই কথা বলেন। পুরাণ-বিশেষের মতে ইহা সুপ্রাচীন প্রথা নয়—এ প্রকার উক্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে। বায়ু পুরাণের মতে—রাজা নহুষের পৌত্র সুতহোত্র-পুত্রত্রয়ের মধ্যে অন্যতম পুত্র গৃৎসমদ্ ঋষির (ক্ষত্রপেত ঋষি বা ব্রাহ্মণ) পুত্র শুনক, তাঁহার পৌত্র শৌনক ঋষি (৩-৪-৫।৯২); এই শৌনকবংশে বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণাদির উৎপত্তি হইয়াছে (৪।৯২); শৌনক এবং আষ্টিষেণগণ—ক্ষত্রপেত ব্রাহ্মণ। রাজা নহুষের বিবরণ বায়ু পুরাণের ৯২ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে—রাজার (ক্ষত্রিয়ের) বংশ হইতে ব্রাহ্মণ রূপে জন্মলাভ হইয়াছে এবং কর্ম্মবিভাগে সেই ক্ষত্রপেত ব্রাহ্মণ বংশে—

ক্ষত্রিয়, শূদ্র বর্ণ প্রকটিত হইয়াছে। অতএব চারি জাতি বলিয়া শৌনক ঋষির সময়ে কিছুই ছিল না। শৌনক স্বয়ং ক্ষত্রপেত ছিলেন (ব্রাহ্মণ), তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি (শৌনক বংশীয়) ভাই-ভাই এবং এক বংশজ হইয়াও, কেহ রাজা, কেহ বৈশ্য, এবং কেহ শূদ্রকর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। মৃগ (ঋত্বিক ব্রাহ্মণ), মাগধ (ক্ষত্রিয়), মানস (বৈশ্য) এবং মন্দগ (শূদ্র) বিষ্ণুতে আছে (৬৯।২)।

স্বয়ং বশিষ্ঠ ঋষিও বৈশ্যবৃত্তিপরায়ণ ছিলেন; তাঁহার কয়েকখানি সামুদ্রিক পোত ছিল, তিনি সমুদ্রপথে বাণিজ্য-ব্যবসা করিতেন, হয়ত তাঁহার পোত—চালদীয় ইরেচ্ বন্দরে, বাবিলনে বাণিজ্যার্থে যাতায়াত করিত। শৌনকের বংশে কেহ বাণিজ্য করিয়া বৈশ্য হইয়াছেন, কেহ বা তিন কর্ম্মীদের চাকরী করিয়া উদরান্নের সংস্থান করায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। অতএব জাতীয়তার গর্ব্ব আধুনিক ব্যাপার।

মুণ্ডকোপনিষৎ নামক শাস্ত্রে—১ম মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে তৃতীয় শ্লোকে আছে—

"শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ পপ্রচ্ছ" ইত্যাদি। মহাশালঃ—মহাগৃহস্থ শৌনক, আঙ্গিরসের (অঙ্গিরস্ বংশীয়) নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু বলিয়াছিলেন। অতএব শৌনক ঋষি,—উপনিষদ্ রচনাকালের লোক ছিলেন। এই উপনিষদ্খানি—অথর্ব্ববেদীয়া। ত্রয়ীর (ত্রয়ী—ঋক্, যজু এবং সাম বেদত্রয়, অথর্ব্ব ত্রয়ীর অন্তর্গত নয়, পরবর্ত্তী) পরের বেদ,—অতএব আদ্য বৈদিক কালের নয়। এই উপনিষদে অস্থায়ী কালের জন্য স্বর্গভোগের উল্লেখ আছে। তথাকথিত কালে—চারিবর্ণ চিরস্থির জাতীয়ত্বের পরিচায়ক ছিল না। দেখা যাইতেছে—বায়ু পুরাণের শৌনক যদি মুণ্ডকোপনিষদের শৌনক হন, তাহা হইলে তিনি ভগবান্ বুদ্ধদেবের অধিক প্রাচীনকালের লোক ছিলেন না। জাতিভেদ প্রথা বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী প্রথা নয়। শৌনকের সময়েও—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি কর্ম্মগত উপাধিমাত্রই ছিল। জাতি-তত্ত্বের সহিত, তথাকথিত উপাধি-তত্ত্বের কোন সম্বন্ধই ছিল না। তথাকথিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি উপাধি নিশ্চয় অস্থায়ী কালের জন্যই বিদ্যমান ছিল বা থাকিত।

শৌনক (ক্ষত্রপেত ব্রাহ্মণ)-বংশে শূদ্রেরও উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে,—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য যদি আর্য্য-শ্রেণীর অন্তর্গত থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে এক শ্রেণীর শূদ্রগণকেও আর্য্য শূদ্র বা আর্য্য-পূর্ব্ব শূদ্র বলা যাইতে পারে। শূদ্র—আর্য্যশ্রেণীর অন্তর্গত। দেখা যায় প্রজাপতি দক্ষরাজবংশে, কশ্যপবংশে চারি শ্রেণীর এমন কি পঞ্চম ম্লেচ্ছজাতিরও উদ্ভব হইয়াছে, মূলে তথাকথিত চারি উপাধিক জনগণ—মূলতঃ আর্য্য-শ্রেণীরই অন্তর্গত।

আর্য্যত্ব স্থায়ী ছিল না

পরিবর্ত্তনশীল—উপাধি বিশেষ মাত্র। আদৌ আর্য্য পদটী,—অর্য্য-ক্ত; অর্য্য অর্থে বৈশ্য, স্বামী, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি হয়। অর্য্যমন্ (য আগম)—সূর্য্য, পিতৃলোক-বিশেষ। 'আর্য্য' বলিতে বুঝায়—মানী, শ্রেষ্ঠ, গুরু, স্বামী, প্রভু, জ্যেষ্ঠ, সজ্জন। 'আর্য্যক' শব্দে—পিতামহ, মাতামহ, শ্রেষ্ঠ, মানী ইত্যাদি বুঝায়। মানী, প্রভু, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবিশেষকেই আর্য্য বলা যাইতে পারে।

রাজাঙ্গ বা রাষ্ট্রকায়স্থ মাত্রেই আর্য্য,—কারণ তাঁহারা মানী, শ্রেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, প্রভু সম্বন্ধীয় লোক। রাজা আর্য্য, সেনাপতি এবং সেনারাও আর্য্য। রাষ্ট্র-কায়স্থগণের আত্মীয়গণও আর্য্য। অথচ—ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কর্ম্মগত উপাধির ন্যায়, আর্য্যত্বও পরিবর্ত্তন-শীল। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজা পাইবার যোগ্য না হইয়া শূদ্রও হইতে পারে। কারণ ব্রাহ্মণ পদবীটি কর্ম্মজ, জাতিবাচক ছিল না।

বাংলাদেশে এবং সমগ্র প্রাচীন ভারতে

'এরিয়ন্'-আগমন নামক উপাখ্যান বিষয়ক ব্যাপারের পূর্ব্বে যে সকল রাজন্য ছিলেন, তাঁহারা এবং রাষ্ট্রকায়স্থিত ব্যক্তিগণ—আর্য্যই ছিলেন। এরিয়ন্ এবং আর্য্য—এক কথা বা সমতুল্য অর্থপ্রকাশক শব্দও নয়।

ভারতের আর্য্য শব্দে যাহা বুঝায়, অ-ভারতীয় 'এরিয়ন্' শব্দে তাহা বুঝায় না। ভারতীয় আর্য্য অর্থে—প্রধানতঃ রাজ্যাঙ্গ বুঝায়। নয় প্রকার রাজকীয় কর্ম্মিগণই আর্য্য। বাংলার রাজ্যাঙ্গ বেদপূর্ব্ব কাল হইতেই ছিল, সুতরাং আর্য্যত্বের অভাব, বাংলায় কোন সময়েই হয় নাই। ক্ষত্রিয়াদি কর্ম্মজ্ঞ পদবী-গুলির ন্যায় আর্য্যত্বও পরিবর্ত্তনশীল। অ-ভারতীয় জাতি-বিশেষ ভারতে আসিয়া যখন ক্ষাত্রবৃত্তি-চর্চ্চার দ্বারা রাজা হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা আর্য্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। এরিয়ন্ নামক কোন জাতি—শক, হূনেদের মত, ভারতে প্রবেশ করিয়া, ভারতীয় আর্য্য-সভ্যতায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের পৃথক পরিচয় দিবার কোন চিহ্নই হয়ত নাই। রাজা প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গগণের পুরোহিতগণও,—আর্য্য নামে পরিচিত হইতেন। ভারতের বহু রাজ্যের রাজাঙ্গ মাত্রেই আর্য্য বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন, সুতরাং সমগ্র ভারতে আর্য্যসংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য — আর্য্যশ্রেণীর অন্তর্গত। কিন্তু শূদ্রমধ্যে বহু আর্য্যশ্রেণীরও ছিল।

পরিবর্ত্তনশীল পদবী কালে স্থায়ী হইয়াছে।

ক্ষত্রিয়-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্রতী হইতেন, — তাঁহাদিগকে লোকে ঋষি বলিত। তাঁহারা ১৬ প্রকার ঋত্বিকের অন্তর্গত হইতেন। তাঁহারা ক্ষত্রপেত ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইতে যাঁহারা ক্ষত্রিয়বৃত্তি-অবলম্বী হইতেন, তাঁহাদের উপাধি হইত — ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়। এই প্রকার কর্ম্মজ উঠা-নামা সেকালে অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল। ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রবৃত্তিপরায়ণগণ — 'ব্রহ্ম-শূদ্র' নামে কথিত না হইলেও, ব্যাপারটা ঐ প্রকারই ছিল। ক্ষাত্র-শূদ্র, ক্ষাত্র-বৈশ্য ইত্যাদি ভাবের অভ্যুদয় যে না হইত, তাহা নহে। বৈদিক সাহিত্যে তথাকথিত উঠা-নামার উপাখ্যান আছে। অতএব চারি বর্ণ-বিভাগ বা চারি জাতিবিভাগ সুপ্রাচীন ব্যাপার নয়। প্রথমে ভারতে এক জাতিই ছিল। চতুর্ব্বর্ণ বলিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারি প্রকার জাতিকে বুঝায়। চতুর্ব্বর্ণ-সৃষ্টির কথা খুব প্রাচীন নয়। তত্রাচ—মানব (নর-নারী দুই জাতি) নামক দুই জাতির আবির্ভাব সর্ব্বাদি। সেই দুই জাতি হইতে, চারি প্রকার জাতির কল্পনা সম্ভব হইলেও, এই বিভাগ প্রাকৃত নয়, অপ্রাকৃত এবং কৃত্রিম। মানব জাতির মধ্যে যখন দুই জাতি, তখন কালে বহু বিভাগ অসম্ভব নয়, মানবই বহু বিভাগ করিতে পারিয়াছে। চতুর্দ্দোল, চতুর্ভুজ, চতুর্মুখ, চতুর্যুগ, চতুর্ব্বর্গ, চতুর্ব্বর্ণ, চতুর্ব্বেদ ইত্যাদির অভাব নাই, দুই হাত হইতে চতুর্ভুজের যেমন কল্পনা, একমুখ হইতে চতুর্মুখের কল্পনাও তদ্রূপ। এই প্রকার স্বাভাবিক ব্যাপার মানব চিন্তার উৎকর্ষ।

শমন শব্দ যখন পুংলিঙ্গ তখন যম বুঝায়, ক্লীবে—শান্তি, শান্তিস্থাপন; যজ্ঞার্থে পশুবধকে 'শমন' বলে। যাঁহারা (বৈদিক) পশুবধ করিতেন তাঁহাদিগকে বলা হইত—শময়িতৃ বা শমিতা, তাঁহারাই পশুচর্ম্ম উত্তোলন করিতেন, মাংস পাক করিতেন। পশুচর্ম্ম মোচন করিতেন শমিতারা; 'মুচ' ধাতুর অর্থ দম্ভ, শাঠ্য এবং মোচন ইত্যাদি, সুতরাং মুচি (মুচী), মুক্তি এবং মোচন প্রায় একই অর্থ প্রকাশ করে, পশুচর্ম্ম মোচনকারী শমিতা, পশু হত্যা করিতেন শমিতা। 'মুচি' শব্দটি সংস্কৃত নয়, মোচক সংস্কৃত শব্দ; মোক্ষ-কর্ত্তা বুঝায়। পশুগণের মোক্ষ-কর্ত্তা ইহাই বৈদিক অর্থ। শমিতারা বৈদিক শ্রেণীর লোক। মোচন বা মুক্তিকারী বলিয়া — 'মুচি', নাম হওয়া বিচিত্র নয়। ন-মুচি — এক অসুরের নাম (দিতিজ-বংশ); উপাখ্যান আছে — শিব তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। ন-মুচির মুচি শব্দ মুক্তি বা মোচনার্থক বলিয়া ধরা যায়। ন-মুচি, বৈদিক শমিতা মুচি নহেন, হয়ত তিনি যজ্ঞে পশুবধ এবং পশুচর্ম্ম মোচন করিতেন। শমন, শময়িতৃ, শমিতৃ, শমিতা—এ সকলই বিনাশক বা দমনকারক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে।

শমিতৃ (শময়িতৃ) যজ্ঞে পশুবধ বা পশু-বিনাশ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন। শূদ্র নামক চতুর্থ জাতিরা, যজ্ঞস্থলে প্রবেশ-অধিকার পাইত না, সুতরাং শূদ্র মধ্যে কেহ যজ্ঞে শমিতৃর কর্ম্ম করিত না, পশুচর্ম্ম উত্তোলনও করিত না, সুতরাং বৈদিক মুচিগণই তথাকথিত বৈদিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। সেই 'মুচি'রাই ঘাতক — হনন-কর্ত্তা, ঘাতুক অর্থে—হিংস্র, নাশক, নিষ্ঠুর ইত্যাদি। অতএব বৈদিক শমিতৃগণ— মুচি, ঘাতক, হিংস্র, নিষ্ঠুর ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। দেখা যায়, প্রথমে একটি শব্দের যে অর্থে ব্যবহার হইত, পরবর্ত্তী কালে তাহা অর্থান্তর প্রকাশ করিয়াছে। ইহার মূল — জাতীয় ভাবধারার পরিবর্ত্তন, সভ্যতার উন্নয়ন, ভাষার পরিবর্ত্তন। জাতীয় পদবী-গুলি প্রথমে যে অর্থ প্রকাশ করিত, পরবর্ত্তী কালে অর্থান্তর বিজ্ঞাপিত করিয়াছে। এই ব্যাপারের মধ্যে সাম্প্রদায়িক 'সুবিধা-বাদ' লুকাইয়া থাকা অসম্ভব নয়। জাতীয়ত্বের দিকটা কর্ম্মজ হইলেও নিন্দনীয় নয়। সমাজের হিতার্থে কর্ম্মীর শ্রেণী-বিভাগ সাধারণ ব্যাপার।

মতদ্বৈধ

বৈদিক সাহিত্য প্রভৃতির বচনগুলিকে আদর্শ রূপে গ্রহণ পূর্ব্বক, এবং হয়ত অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া, ভারতের ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে, এবং কতকটা তথাকথিত পন্থা অবলম্বনেও হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে বৈদিক সাম্প্রদায়িক উৎকর্ষগুলাই বিশেষরূপে গৃহীত হইয়া থাকিবে। পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ-জৈন সাহিত্যে যে সকল বিবরণ লিখিত রহিয়াছে, সেগুলি অ-হিন্দু মতবাদ বলিয়া, হিন্দুগণ গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নাই। বৈদিকেরা অ-হিন্দু মত, ধর্ম্ম ইত্যাদির বিলোপ চেষ্টাই সম্যক্‌রূপে করিয়াছেন। দেখা যায় ভগবান্ আচার্য্য শঙ্কর দেব, ভারতীয় বৈশেষিকাদি দার্শনিক মতবাদগুলিকেও 'বৈনাশিক' আখ্যা দিয়া, হিন্দুমতবাদ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু তিনিই 'মায়াবাদ' প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এ মতে স্রষ্টার বিশেষ স্থান নাই। প্রকারান্তরে তিনি 'বৈনাশিক' বিভিন্ন মতের প্রচার করিয়াছেন। মায়াবাদ ভারতে প্রচারিত হইলেও আদৃত হয় নাই। মায়াবাদের প্রচলন এক কালে ভারতীয় সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল। এ সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ মত, এক সম্প্রদায়ের যোগিগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মেও মায়াবাদের প্রবেশ চেষ্টা হইয়াছিল, শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলায় এই মতবাদের পরিচয় আছে। পৌরাণিক মত হিন্দুগণ গ্রহণ করিলেও, মোহমুদ্গরে এ মত সম্যক্ আদৃত হয় নাই বা বিরোধী মতকে চূর্ণ করিতে পারে নাই। সাংখ্য মতের সৃষ্টিতত্ব, প্রায় সকল পুরাণেই বিভিন্নরূপে গৃহীত হইয়াছে। দার্শনিক সৃষ্টিতত্ব ক্রমশই জটিলতর হইয়া উঠিয়াছিল।

নবীন মতবাদ

কালক্রমে য়ুরোপীয় মতই — সাহিত্য-ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। এইমত খ্রীষ্টীয় মতবাদে পূর্ণ ও স্ব-শাস্ত্রীয় সাম্প্রদাদিক সুবিধাবাদ-বিরহিত নয়। প্রবল জাতি, প্রভুর জাতি, পদানত জাতিদের বিষয় সত্য-বর্ণনায় চিরবিমুখ। আভিজাত্য-প্রভাবশীল জেতারা, কখন বিজিতদের প্রশংসা করেন না। স্তুতি বা ধন্যবাদও দেন না। প্রবল বৈদিকগণ—অবৈদিক ভারতীয়গণের প্রশংসা কখনই করেন নাই, তাঁহাদের সাহিত্য তাঁহাদের জন্যই রচিত হইয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের যশোবাদেই পূর্ণ থাকিবার কথা, আছেও তাহাই। দেখা যায়, অংগ, বংগ ইত্যাদি দেশ এবং তথাকথিত জাতি ও ভাষা সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশই করিয়া গিয়াছেন। ইহাদিগকে পাপ জাতি, দস্যু এবং ইহাদের ভাষা—'আসুরী-ভাষা' বলিয়া যথেষ্ট নিন্দাই করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের সাহিত্যে—বৈদিক সম্প্রদায় ব্যতীত অপরাপর ভারতীয় জাতিগুলিকে 'মানুষ' বলিয়াই গণ্য করা হয় নাই। যাহারা মানুষই নয়, তাহাদের আবার জাতি, ধর্ম্ম কি হইতে পারে? এই হেতু বৈদিক সাহিত্যের উক্তিগুলি— 'একতরফা' বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান প্রাচীচ্যের ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিকেরা ভারতের পক্ষে 'একতরফা' সিদ্ধান্তই করিয়া চলিয়াছেন। বৈদিকেরা

যে নীতি-অবলম্বী ছিলেন, (অবৈদিক পক্ষে) বর্ত্তমান য়ুরোপীয় অভিজাত পণ্ডিতেরাও তদ্রূপ ব্যবহারই অখ্রীষ্টান ভারতীয় ধর্ম্মীদের উপর করিতেছেন। বোধ হয় এইজন্ত ভারতের প্রকৃত ইতিহাস (প্রাচীন) রূপায়ণ লাভে সমর্থ হইতেছে না। 'একতরফা' বিচারমূলক সিদ্ধান্ত, বোধ হয় সিদ্ধান্তযোগ্য নয়। মানুষ হিসাবে,—অ-বৈদিক অ-মোসলমান, অ-খ্রীষ্টান জাতিগুলিকে গ্রহণ করিয়া, তাহাদের সাহিত্য হিসাবে—পুরাতন কিছু তথ্য আছে কিনা, দেখিবার সময় হইয়াছে। তাহারা বর্ত্তমান হিসাবে সভ্য বা বর্ব্বরই হউক, মানুষ বটে ত! মানুষ হিসাবে তাহাদের শ্রুতি-স্মৃতি বিষয়গুলি দেখিয়া বিচার করিলে, হয়ত প্রকৃত ব্যাপার কি, আবিষ্কৃত হইবে। বাংলার যাহারা আদি অধিবাসী, তাহারা আদ্য বাংগালী—ইহা সত্য। বর্ত্তমানে সভ্য বাংগালীরা, তথাকথিত বাংগালীদিগকে বাংগালী বলিতেই চাহেন না। বৈদিকেরাই যেন ভারতীয়, এবং অবৈদিক ভারতীয়গণ আদি ভারতবাসী হইয়াও ভারতের কেহই নয়, এই প্রকার উক্তি শোভন নয়। হড়, কোল, মুণ্ডা, দ্রবিড়, নাগ প্রভৃতি জাতিগণ যখন প্রাচীন ভারতবাসী, তখন তাহাদের শ্রুতি-স্মৃতি-সাহিত্য প্রভৃতির সহিত বৈদিক সাহিত্যাদির উক্তি, তথাকথিত বৌদ্ধ-জৈনাদির পৌরাণিক উক্তি এবং বর্ত্তমান কালের খ্রীষ্টীয় বিবরণ-গুলির তুলনা করিয়া,—'দোতরফা'রূপে সিদ্ধান্ত করিলে, সত্যের আবিষ্কার না হইবার কারণ নাই। আর্য্য-অনার্য্য মনোভাব পরিশূন্য ভাবে—দেখিবার কাল পড়িয়াছে। ভারতে মানুষ জন্মায় নাই—অ-ভারতীয় দেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া, ভারতীয় হইয়াছে, ইহার মূলে বিশেষ সত্য নাই, বলিয়া ধারণা হয়। সমাজ, ভাষা, শ্মশান-তত্ত্বাদির দিক দিয়াও ইহার মীমাংসা হয় না। ভারতে মানুষ জন্মিয়াছিল,—ইহার অনুসন্ধান সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক, অন্তথা কোন সিদ্ধান্তই করা চলে না।

সহোদরা-বিবাহ

আদ্য বাংগালীদের মধ্যে সর্ব্বাদি সমাজে প্রচলিত ছিল, শ্রুতিজাত উপাখ্যানে ইহাই বিবৃত হইয়াছে। পশু-পক্ষীদের মত ব্যবহার প্রথমে প্রবর্ত্তিত ছিল, ইহা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। পুরাণাদিতে প্রাথমিক বিবাহ ব্যাপার, তথাকথিত রূপেই বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে (৪।৩) ব্রহ্মার প্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে 'নারায়ণ' সংজ্ঞক ব্রহ্মার উদ্ভব হয় (৬।৪)। ব্রহ্মাই 'মনু' হইলেন (১৪।৭), তখন তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিবিশিষ্ট রূপায়ণ ছিলেন। আপনাকে বিভাগ করিয়া পৃথক্ হইলেন; পৃথগ্‌ভূতা নারী—'শতরূপা',—ইনিই ব্রহ্মার পত্নী। ব্রহ্মার বহুবার দেহত্যাগের উপাখ্যানও ভাগবতাদি পুরাণে বর্ণিত আছে। ব্রহ্মা—রাজা এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক ও ঋত্বিক ইত্যাদি বুঝায়; রূপক ভেদ করিলে—শতরূপা তাঁহার ভগিনী ছিলেন, বুঝায়। তাঁহারা দুটি যমজ,—একদেহ, একজাতি, আকৃতি সমানই জাতি বিজ্ঞাপিত। দুই জনই নরবপু—এক্ষেত্রে সহজাত, অথচ জাতীয়ত্বে পৃথক্—নর এবং নারী, ইহাই সম্ভবতঃ এক হইতে দুইয়ের কল্পনা। শতরূপাকে কন্যারূপে কল্পনা অপেক্ষা, সহজাতা ভগিনী কল্পনাই শ্রেয়ঃ। রুদ্রও অর্দ্ধনারীশ্বর নামে কথিত হইয়াছেন (১০।৭); তিনিও সহজাতা দেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। দক্ষরাজার কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন রাজা কশ্যপ। শতরূপার গর্ভে—প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ ভ্রাতৃদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন, উভয়েই রাজা হন। কর্দ্দম রাজার কন্যাকে প্রিয়ব্রত বিবাহ করেন। মেধাতিথি (১ম ?) প্রিয়ব্রতের পুত্র। ইনি ছিলেন প্লক্ষ দ্বীপের রাজা, সুতরাং ভারতের রাজা ছিলেন না। দেখা যায় জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী দ্বীপ (দ্বীপ বলিতে দুই জলভাগের মধ্যবর্ত্তী দেশ,—ভারতের প্রাচীন ভূগোল, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ (১৪০।৫২)—এই ভৌগোলিক বিষয় মহারাজ অশোকের সময়েও বিদ্যমান ছিল। জম্বু প্রভৃতি দ্বীপাদির কথা ঐতিহাসিক কালেও ভারতে প্রচলিত ছিল, ইহা কেবল পৌরাণিক ভূগোল নহে। এই কর্দ্দম রাজা ছিলেন প্রাচীন পারস্যের অন্তর্গত কর্দ্দম-নদী-মাতৃক প্রদেশের রাজা।

পারস্যের রাজারা সহোদরাকে বিবাহ করিতেন, আলেকজাণ্ডারের সময়েও তথাকথিত প্রথা তথায় প্রচলিত ছিল। রাজা বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা (আর্য্যেরা) যখন ভগিনী বিবাহ করিতেন, তখন সাধারণের মধ্যেও — তথাকথিত প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকা অসম্ভব নয়। রাজাই আদর্শ মানব। হিন্দুশাস্ত্রের উক্তিতে ভগিনী-বিবাহ সাধারণ ব্যাপার মধ্যে গণ্য ছিল। মাসী, পিসী, মামাত ভগিনী বিবাহ প্রথা প্রাচীন ভারতে ছিল। ব্রহ্মার দেহত্যাগের কথা বায়ুপুরাণে (৫।৯) আছে, নূতন ব্রহ্মার প্রকাশ ৯।৯-এ বায়ুতেই আছে। ব্রহ্মা — একাধিক, ইহা উপাধি-বিশেষ।

ব্রহ্মা, দক্ষ, প্রভৃতি দেবতাগণ সকলেই শরীরী ছিলেন (অভিমানী দেবতাও বটেন)। সোমের দৌহিত্র — প্রজাপতি দক্ষ, তিনি সোমের শ্বশুরও বটেন (৮১।১৫ বিষ্ণু)। বিষ্ণুপুরাণে আছে (৮৪।১৫) — পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ বলিয়া কিছুই ছিল না। অতএব চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে ছোট-বড় প্রধান-অপ্রধান বলিয়া কিছু নির্দ্দেশ ছিল না।

প্রজাপতি ব্রহ্মা আদি পুরুষ। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক রাজা ব্রহ্মা হইতেই 'মানবে'র জন্ম হইয়াছে (২৫।৯ বায়ু)। ত্রেতা-যুগে — যজ্ঞ প্রবৃত্তি হয় (১৭।২২)। প্রিয়ব্রত উপাখ্যান ত্রেতাযুগের। বৃংহণ কারণ বলিয়া — ব্রহ্মা (২৭।৪) বৃদ্ধিকরণ, পোষণার্থক, রাজা রূপে পালনার্থক। অজ এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া — স্বয়ম্ভু (৪৪।৪ ঐ)। সর্ব্বাদি ব্যক্তি — আদি পালনকর্ত্তা। প্রথম রাজা, তিনি রজঃ (রাজসিক) (১৫।৫)। বৈদিক সাহিত্যের উক্তির সহিত, আদ্য বাংগালী শ্রুতির বিশেষ অনৈক্য নাই। প্রথম হড়শ্রুতিতে পৃথিবীর জন্মকথা, বৈদিক বিরোধী নয় — বায়ুপুরাণের পঞ্চম অধ্যায়ে জলতল হইতে পৃথিবী উত্তোলনের উপাখ্যান আছে। অধিকাংশ পৌরাণিক মত এই প্রকার। বিষ্ণু-পুরাণে (৭।৪) ভগবান অনুমান (অনুমানাৎ) করিয়াছিলেন — 'জলতলে পৃথিবী আছেন' (অনুমান ভগবানও করেন?)। ব্রহ্মাণ্ডে (১৬।৬৪) উক্ত হইয়াছে যে, দ্বাপরযুগে শাস্ত্রের প্রতিকূলার্থবাদীর অভ্যুদয় হয়। (প্রতিকূলবাদী কাহারা?)

কান্দাহারের নামান্তর অরচোটস্ বা অর চো হড়স্

হড়গণের প্রাচীন প্রবাসস্থল বলিতে — 'পারস্য উপসাগর (ইরিথ্রিয়ান সি) মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহাকে প্রাচীন কালে হড়মোসীয় বলিত এবং তীরস্থ ভূভাগকে হড়মোসীয় দেশ বলা হইত। 'আরা হোড়স্'— কান্দাহার (কাণ-দাঃ-হড়)। ইজিয়ন দেশে — 'সেমস্থ-হড়' নামে এক জাতি বাস করিত। হলের এনসিয়েণ্ট হিস্‌টরিতে ইহার উল্লেখ আছে। নৈষদ জাতির নাম আছে, ভারতীয় নিশাদ জাতি কি? পারস্যের চালদীয় ভূমিতে হড়মো দেশ, তথায় প্রথম ভারতীয় কৃষ্ণকায় (কালক, কালকেয়) জাতিরা প্রথমে গিয়াছিল, প্রথমে যেস্থানে অবস্থান করিয়াছিল, সেই স্থানেরই নাম— হড়মেসীয়* (হড়মো) দেশ। তথাকথিত প্রাচীন স্থানবাচক নামগুলি, হড় নামসহ যুক্ত থাকায়, হড়গণের দিগ্বিজয়-বার্ত্তাই প্রকাশ করিতেছে।

* হড়মেসীয় হইতে 'এশিয়া' নাম হইয়াছে কিনা বলা যায় না।

বিপ্রবাবুর ঠাকুর

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

১

"মানুষ অভ্রান্ত নয়। বাপ-মাও যে ভুল করতে পারেন না, এমন মনে করবার কারণ নাই।"

তর্কের মধ্যে পত্নী প্রণতা যখন তাহার কথার উত্তরে এই কথা বলিল, তখন যুবক নীহার যে বিচলিত হইল না, এমন নহে। কিন্তু সে বিক্ষোভ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না; তাহার কারণ, পিতার শিক্ষায় সে সংযমসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সে কেবল বলিল, "যখন আমরাও অভ্রান্ত নই — তখন তাঁ'দের যা' ইচ্ছা তা' পালন করলে কোন দোষ হয় না।"

তাহার শ্যালিকা বিনতা বলিল, "তা' হ'লে আর বিচার-বুদ্ধির মর্য্যাদা কি থাকল? বাপ-মা যা' বলবেন, তা'ই মেনে নিতে হ'বে — এ কুসংস্কার।"

নীহার বলিল, "কিন্তু সংস্কার সবই কুসংস্কার নয়।"

তখন তাহার অবস্থা সপ্তরথীতে পরিবেষ্টিত অভিমন্যুর অবস্থার মত। তাহার কথায় তাহার শ্যালিকারা ও তাঁহাদিগের বান্ধবীরা বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সে বুঝিল, যুক্তির স্থান এ আলোচনায় নাই; তাঁহারা স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারাই অভ্রান্ত। সুতরাং বৃথা তর্কে পাছে সে ধৈর্য্যচ্যুত হয় সেই ভয়ে আর কোন কথা বলিল না! একজনের কথায় পূর্ণচ্ছেদ পড়িলেই সে উঠিয়া সকলকে নমস্কার করিয়া বিদায় লইতে চাহিল।

বিনতা বলিল, "কি, চললে যে?"

নীহার বলিল, "হাঁ।"

"সে হ'বে না। মা বলেছেন, তিনি খাবার নিয়ে আসছেন।"

"আমি দুপুর বেলা বেরিয়েছিলাম—সমস্ত দিন পরে এখন বাড়ী যাচ্ছি; এখন খেতে পারব না। আমি মা'কে প্রণাম করে যাচ্ছি।"

"মা'কে ত প্রণাম করে যা'বে; আর প্রণতাকে?"

বহু তরুণীর কণ্ঠের হাস্যোচ্ছ্বাসে কক্ষ মুখরিত হইল। নীহার কোন কথা না বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

বিনতা উঠিয়া তাহার সঙ্গে গেল। নীহার বলিল, "আপনি কেন কষ্ট করছেন; এঁদের সঙ্গে কথা বলুন।"

বিনতা সে কথা শুনিল না; সে প্রণতাকেও ডাকিল, প্রণতা কিন্তু লজ্জায় উঠিল না।

যে ঘরে বাড়ীর গৃহিণী জামাতার জন্য খাবার গুছাইতেছিলেন, সেই কক্ষের দ্বারে যাইয়া বিনতা বলিল "মা, নীহার চলে যাচ্ছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "সে কি, বাবা?"

নীহার বলিল, "আমি অনেকক্ষণ বেরিয়েছি— বাড়ী যা'ব।"

"সে কি কখন হয়? না, হাতমুখ ধোও।" তিনি বিনতাকে বলিলেন, "প্রণতাকে ডেকে দে।"

বিনতা বলিল, "আমি ডেকেছিলাম—এল না; সব রয়েছেন।"

মা দীনভাবে কন্যার দিকে চাহিলেন।

সেই অবসরে নীহার তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। তিনি বলিলেন, "একটু মিষ্টি খেয়ে যাও।"

"আজ আর পারব না, মা"—বলিয়া নীহার চলিয়া গেল।

মা বিনতাকে বলিলেন, "রাগ করলে না কি?"

"হ'তেও পারে। কেন না আমরা 'পিকেটিং' করতে গিয়েছিলাম শুনে বলেছিল, ওর বাবা ওসব পছন্দ করেন না; তা'তে প্রণতা রীতিমত উত্তর দিয়েছে।"

"বেহাই যদি ভাল না বাসেন, তবে প্রণতা না হয়, তোদের সঙ্গে না-ই গেল।"

"কি যে তুমি বল! তোমাদের সেকাল আর নাই। এই যে বার-তেরটি মেয়ে এসেছে—এরা কি মনে করবে?"

বিনতা চলিয়া গেল। সে উপস্থিত হইলেই কয়জন তরুণী বলিলেন, "তা' হ'লে আপনার ভগিনীপতি চলেই গেলেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি তাঁকে ফেরান। আমরা বিদায় নিচ্ছি। প্রণতা আমাদের উপর খুবই রাগ করেছে।"

প্রণতা বলিল, "রাগ কেন?"

"স্বামীর সঙ্গে দেখাই হ'ল না।"

"দেখা ত হয়েছে — চোখ দু'জনেরই আছে; বরং একজনের চশমা থাকায় চার চোখ।"

সকলে হাসিয়া উঠিল।

এই সময়ে চাকররা ট্রে-তে চা লইয়া আসিল। বিনতা বলিল, "এখন সব চা পান করুন — আজ 'পিকেটিং' করতে প্রায় তিন মাইল ঘুরতে হয়েছে।"

তখন মহাত্মাজীর প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন যাহাতে দ্রুত সাফল্য লাভ করে, সেই জন্য চেষ্টা চলিতেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে — লোকের উৎসাহ পুষ্ট করিবার চেষ্টায়—বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হইয়াছে। যে বোম্বাই কলের কাপড় বাঙ্গালায় বিক্রয়ের বড় বাজার পাইয়াছে সেই বোম্বায়ের নারীরা বড়বাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিতে অগ্রণী হইয়াছেন। বাঙ্গালী যুবতীরা ও কিশোরীরা তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতেছে।

বিনতার স্বামী ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী করিবার জন্য নাম লিখাইয়াছিল — কিন্তু মক্কেলের আর্জ্জি বা জবাবে নাম লিখিবার সুযোগ তখনও তাহার অধিক হয় নাই। এই সময় অসহযোগ আন্দোলন দেশে প্রবল বন্যার মত আসিয়া পড়িল; সুকুমার ওকালতি ছাড়িয়া রাজনীতি-চর্চ্চায় যোগ দিল। নিষিদ্ধ শোভাযাত্রার যোগদানের ফলে তাহার এক মাস কালের জন্য কারাদণ্ড হইলে বিনতা পিত্রালয়ে আসিয়া রাজনীতির আবর্ত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

তাহার কয় মাস মাত্র পূর্ব্বে প্রণতার বিবাহ হইয়াছে। দিদির সঙ্গে সঙ্গে দিদির বান্ধবীরা আসিতে লাগিলেন — তাঁহাদিগের উত্তেজনাপূর্ণ কথায় সে-ও আন্দোলনে আকৃষ্ট হইল।

তাহাদিগের পিতা স্বভাবতঃ দুর্ব্বলচিত্ত — তিনি, দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিরা যাহা করে, তাহাই করিলেন — কন্যার কাজে বাধা না দিয়া তাহাকে উৎসাহ দিলেন। বিনতার পিতৃগৃহ আন্দোলনকারিণীদিগের মিলনকেন্দ্র হইয়া উঠিল।

আজ পুলিসের নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া বিনতা প্রভৃতি শোভাযাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু পুলিস কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই। প্রণতা আজই প্রথম চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের মত দিদির সঙ্গে গিয়াছিল।

নীহার যখন আসিয়াছিল, তখন সকলে কেবল ফিরিয়া আসিয়াছেন; সকলেরই উৎসাহ তখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

নীহারকে বিনতাই বলিয়াছিল, "কাল সভায় তোমাকে যেতে হ'বে।"

নীহার বলিয়াছিল, "আমি যেতে পারব না।"

কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া সে বলিয়াছিল, "বাবার মত নাই।"

তাহার পরই প্রণতা বলিয়াছিল—পিতামাতারও ভুল হয়।

যুবতী ও কিশোরীরা যাইবার সময় ব্যঙ্গ করিয়া প্রণতাকে বলিল, "তা' হ'লে কাল আপনি আর যাচ্ছেন না?"

প্রণতা বলিল, "কেন?"

"পতিদেবতার অনভিপ্রায়ে—"

নূতন উৎসাহ তখন মদিরার মত ভাবপ্রবণ প্রণতাকে মত্ত করিয়া তুলিয়াছে; সে বলিল, "নিশ্চয়ই যা'ব।"

"যা'বেন?"

"দেখবেন—দেশের ডাক বাঙ্গালীর মেয়ে প্রত্যাখ্যান করে না।"

একজন বলিল, "এ যে একেবারে 'আনন্দমঠে'র 'সন্তান'—'আমরা অন্য মা মানি না—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'। 'আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা—মা।"

প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসের মধ্যে সভা ভঙ্গ হইল।

২

নীহার বিষণ্ণ হইয়া গৃহে ফিরিল। সে প্রণতাকে যে সংবাদ দিতে আসিয়াছিল, তাহা দেওয়া হয় নাই। যে আগ্রহ লইয়া যুবক তাহার পত্নীকে আপনার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুসংবাদ দিতে গিয়াছিল, তাহা বেদনায় পরিণত হইয়া তাহাকেই ব্যথিত করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, তাহাকে সমস্ত জীবন—বেদনাই বহন করিয়া অতিবাহিত করিতে হইবে। বিবাহের অল্পদিন পরেই সে বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার প্রকৃতি যে শিক্ষায় ও দীক্ষায় গঠিত হইয়াছে, প্রণতা সে শিক্ষার ও দীক্ষার পরিবেষ্টনে বর্দ্ধিত হয় নাই। কিন্তু যৌবনের ভালবাসা তাহাকে আশা দিয়াছিল, প্রণতার যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহা সহজেই দূর হইয়া যাইবে। আজ তাহার মনে হইল, সে আশা কি দুরাশা নহে?

যে সংযম ও শুচিতার পরিবেষ্টনে নীহার বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা তাহার পরিবারে কৌলিক হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে হইতে পঞ্চম পুরুষ পূর্ব্বে তাহার ইতিহাস পাওয়া যায়—তাহার পূর্ব্বের কথা অতীতের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার নিকটে একখানি সমৃদ্ধ গ্রামে তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের বাস ছিল। তাহার প্রপিতামহের পিতা ও পিতৃব্য সকলে তথায় বাস করিতেন। যখন শ্বশুরালয়ে সম্পত্তি পাইয়া—তাহার প্রপিতামহের পিতৃব্য পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে উদ্যোগী হয়েন, তখন তাহার প্রপিতামহের পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। গৃহে গৃহদেবতা রাধাবিনোদের নিত্যসেবায় কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল—গৃহের মহিলারাই তাঁহার পূজা করিতেন—যিনি যখন গৃহিণী, তিনি তখন সে ভার লইতেন। ক্রমে প্রথা দাঁড়াইয়াছিল, পরিবারের বিধবা নারীরাই রাধাবিনোদের সেবা করিতেন এবং লোক দেবতাদ্বয়কে "বিধবার ঠাকুর" বলিত। দেবর যখন গৃহবিগ্রহ লইতে চাহেন, তখন বিধবা ভ্রাতৃজায়া তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "আমি বিধবা—আমিই শ্বশুরের ভিটায় থাকিয়া 'বিধবার ঠাকুরে'র সেবা করিব।" তখন লোকের দেবসেবায় যেমন আগ্রহ ছিল, তেমনই লোকনিন্দারও ভয় ছিল। গ্রামের লোক যখন বলিল, বিধবা ভ্রাতৃজায়ার প্রস্তাবই সঙ্গত, তখন দেবরকে অনিচ্ছায় গৃহদেবতা তাঁহাকেই দিয়া যাইতে হইল।

বিধবা রাজলক্ষ্মীর সংসারে সম্বল ছিল — এক পুত্র আর এক কন্যা। তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন — কাজেই গৃহে ছিল পুত্র — আর ছিলেন গৃহবিগ্রহ। কন্যার অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে পর পর দুইটি মৃত সন্তান প্রসূত হয় এবং তাহার পরই তিনি বিধবা হয়েন। মা কন্যাকে নিকটে আনিয়া রাখিয়াছিলেন এবং দেবসেবায় আপনার সঙ্গিনী করিয়া তাঁহার শোকে সান্ত্বনা ও দুঃখে শান্তি লাভের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, দেবতার সেবায় তিনি যে শান্তি ও সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন, তাহা আর কিছুতেই লাভ করিতে পারেন নাই। মাতার মৃত্যুর পর দেবসেবার ও ভ্রাতার সংসারে কর্তৃত্ব করিবার ভার ও অধিকার সে সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে কন্যার হস্তগত হয়। তিনি সেই দুই ভার যেরূপ ভাবে বহন করিয়াছিলেন ও অধিকার যেরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা গ্রামের লোকের প্রশংসার ও শ্রদ্ধার বিষয় ছিল। মা মৃত্যুর পূর্ব্বে পুত্রের বিবাহ দিয়া গিয়াছিলেন। একটি মাত্র পুত্র রাখিয়া ভ্রাতা

যখন ভগিনীর পূর্ব্বেই পরলোকগত হয়েন, তখন পুত্রটি "মানুষ" হইয়াছে — কলিকাতায় যে চাকরী করে, তাহার আয় অল্প নহে। ননন্দা একবার ভ্রাতৃ-জায়াকে বলিয়াছিলেন, "দেখ বউ, রোজ যাতায়াতে ছেলের কষ্ট হয়; তুমি না হয়, নন্দকে নিয়ে কলকাতায় যাও।"

নন্দর মা বলিয়াছিলেন, "আর তুমি?"

তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "আমার কি যা'বার উপায় আছে? মা যে এই ভিটায় 'বিধবার ঠাকুরে'র সেবা করবার ভার আমায় দিয়ে গেছেন!"

"নন্দ যদি ইচ্ছা করে, কলকাতায় বাসা করুক — যতদিন তুমি আছ, ততদিন আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে পারব না — দু'জনে — দুই বিধবায় যেমন 'বিধবার ঠাকুরে'র সেবা করছি, তেমনই করব।"

বলা বাহুল্য, নন্দলাল কলিকাতায় বাসা করেন নাই। নন্দলালের স্ত্রীও কন্যা সৌদামিনী ও পুত্র সুরপতিকে লইয়া গ্রামের বাড়ীতেই থাকিতেন। কয় বৎসরের মধ্যে পিসীমার ও নন্দলালের মৃত্যু ঘটিল। তখন নন্দলালের মা তাঁহার পুত্রবধূর পিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাড়াগাঁ — ক্রমেই জনহীন হয়ে আসছে, আপনি মেয়ে, নাতনী, নাতী নিয়ে যা'ন।"

নন্দলালের বিধবা তাহাতে সম্মত হয়েন নাই — শাশুড়ীর কাছে থাকিয়া 'বিধবার ঠাকুরের' সেবা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে অধিক দিন তথায় থাকা সম্ভব হয় নাই; কেন না, পুত্রশোকাতুরা জননীর পক্ষে জীবন দুর্ব্বহ ভার হইয়াছিল — বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে তিনি যে লোকে গমন করিলেন, তথায় নাকি শোক নাই। কাযেই পিতা লইতে আসিলে কন্যা আর পিতাকে ফিরাইতে পারিলেন না; তবুও বলিলেন, "বাবা, আমার যে অনেক উৎপাত — ঠাকুর আছেন, তাঁরা ছেলেমেয়েরও বাড়া।"

পিতা বলিলেন, "সে ভাবনা আমার।"

কন্যার বিবাহ দিবার পর পিতা ব্যবসায়ে অনেক টাকা লাভ করিয়াছিলেন — তিনি আপনার গৃহের সংলগ্ন জমীতে কয়খানি বাড়ী ভাড়া দিবার জন্য প্রস্তুত করাইয়াছিলেন — গৃহসংলগ্ন গৃহে কন্যাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন — এক বাড়ীও বটে, স্বতন্ত্রও বটে। মা — রাধাবিনোদ বিগ্রহদ্বয়, কন্যা সৌদামিনী ও পুত্র সুরপতিকে লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সে গৃহে গৃহদেবতাই যেন সংসারের কেন্দ্র — ঠাকুরের "ভোগ" না হইলে পুত্রকন্যাও খাইতে পায় না, প্রাতে উঠিয়া ও সন্ধ্যায় আরতির সময় তাহাদিগকে ঠাকুরপ্রণাম করিতে হয়; গৃহ যেন দেবমন্দির — তাহাতে শুচিতাই সপ্রকাশ!

ক্রমে সৌদামিনীর বিবাহ হইল — পাত্র রূপে-গুণে সকলের প্রশংসাভাজন; সুরপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিতে লাগিলেন — তাঁহারও বিবাহ হইল। ভাঙ্গা সংসার যেন আবার গড়িয়া উঠিল। কিন্তু মা'র অদৃষ্টে সুখ ছিল না — জামাতা বৃত্তি লইয়া বিদেশে অধ্যয়ন করিতে গেল — পথেই রোগে সব শেষ হইল। শোক মা'রও যেমন লাগিল, পুত্রেরও তেমনই। সুরপতি সরকারের হিসাব বিভাগে পরীক্ষা দিয়া বড় চাকরী পাইলেন। কিন্তু তিনি বিধবা ভগিনীরই মত শুদ্ধাচারে থাকিতেন।

সুরপতির প্রথম সন্তান — নীহার। নীহারের জন্মের পরই তাহার জননীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং কয় বৎসর চিকিৎসায়, শুশ্রূষায় ও বায়ুপরিবর্ত্তনে আরোগ্যের সব চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া চারি বৎসরের পুত্রকে রাখিয়া মাতার প্রাণ রোগজীর্ণ দেহ ত্যাগ করে। সুরপতি আর বিবাহ করেন নাই — পিতামাতা উভয়ের কর্ত্তব্যভার লইয়া নীহারকে "মানুষ" করিয়াছেন। পিতামহীর ও পিসীমা'র সঙ্গে নীহার শৈশবে অনেক সময় ঠাকুরঘরেই থাকিত; তাঁহাদিগের কাছে শিখিয়া আধ আধস্বরে বলিত —

"ধূলো নয়, এ বালি নয়, এ গোপীর পদরেণু,
এই রেণু মাথায় ধরে নন্দের বেটা কানু।"

আবার—

"ফুল ফুটেছে, চাঁদ উঠেছে, কদমতলায় কে রে?
নন্দের বেটা কেষ্ট ঠাকুর, ঘোম্টা টেনে দে রে।"

পিতার নিকট প্রাপ্ত মনীষায় ও পিতার শিক্ষায় নীহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। পিসীমা'র দেবরের বন্ধুকন্যা প্রণতার সহিত ছয় মাস হইল তাহার বিবাহ হইয়াছে। সুরপতি লোকটি নির্ব্বিরোধ — শান্তিপ্রিয়; তিনি প্রণতাকে দেখিতে যাইয়াই পাকা কথা দিয়াছিলেন। মা তখন মৃতা— ভগিনীই সংসারের গৃহিণী।

কিন্তু বধূ আসিবার পর পিসীমা হতাশ হইয়াছিলেন। ঠাকুরপ্রণাম করা যে গৃহের পদ্ধতি, সে গৃহে প্রতি বার না বলিলে প্রণতা ঠাকুরপ্রণাম করিতে যাইত না—যেন অনিচ্ছায় প্রণাম করিত। পিসীমা'র প্রদত্ত স্নেহ গ্রহণ করিতেও যেন তাহার আগ্রহ ছিল না। পাছে নীহার দুঃখ পায় বলিয়া পিসীমা তাঁহার হতাশা ব্যক্ত না করিলেও নীহার তাহা বুঝিত। কিন্তু পিসীমা স্নেহহেতু এবং নীহার ভালবাসার প্রাবল্যে মনে করিতেন, প্রণতার এই ভাব শিক্ষার ত্রুটিসঞ্জাত, তাহা দূর হইয়া যাইবে।

আজ প্রণতার ব্যবহারে নীহারের সে আশা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। সে প্রণতাকে সংবাদ দিতে গিয়াছিল—সে সরকারের শুল্ক বিভাগে ভাল চাকরী পাইয়াছে; কিন্তু প্রণতার ভাব দেখিয়া সে কথা বলিতে পারে নাই। সে যে সরকারী চাকরী লইয়াছে, তাহা—সেই মহিলাসভায় বলিতে তাহার সাহস হয় নাই।

৩

সুরপতিই পুত্রের চাকরীর জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন; নীহার যেদিন সংবাদ পাইল—সে চাকরী পাইয়াছে, সেদিন তিনিই পুত্রকে সে সংবাদ প্রণতাকে ও তাহার পিতামাতাকে দিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সে রাত্রিতে সে হয়ত ফিরিবে না—শ্বশুরালয়েই থাকিবে। তাই আহারের সময় পুত্রকে যথারীতি পার্শ্বে দেখিয়া তিনি একটু বিস্ময়ানুভব করিলেন।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই চলে এলি?"

নীহার কোন উত্তর দিল না।

"বেহাই বেহান শুনে আনন্দ করলেন?"

পিতার শিক্ষায় পুত্র পিতার নিকট সত্য গোপন করা পাপ বলিয়া বিবেচনা করিত। সে বলিল, "আমি তাঁদের বলতে পারি নি।"

সুরপতি বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

তখন নীহার যথাসম্ভব সংক্ষেপে, যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বিবৃত করিল।

শুনিয়া পিসীমা স্তম্ভিত হইলেন।

সুরপতি অসাধারণ বিমলবুদ্ধি ছিলেন। তিনি একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে না হয়, তুই এ চাকরী নিস নে।"

নীহার জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বাবা?"

ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে সুরপতি বলিলেন, "চাকরী—ব্যবসা সবই ত জীবনে সুখ আর শান্তির জন্য। যদি চাকরী নিলে তা'ই যায়, তবে চাকরী না নেওয়াই ত ভাল।"

পিসীমা বলিলেন, "বল কি? এমন চাকরী!"

সুরপতি বলিলেন, "তোমার আমার বিবেচনায় চাকরী খুবই ভাল। কিন্তু বৌমা'র বিবেচনায় যখন তা' নয়—এ চাকরী যখন তাঁ'কে কষ্ট দেবে, তখন না হয় নীহার চাকরী না-ই নিলে।"

"তা' হ'লে কি করবে?"

"যদি ইচ্ছা হয়—তবে অন্য কোন কায করবে। না হয়—তবুও মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব হ'বার কথা নয়।"

তাহা পিসীমাও জানিতেন, নীহারও জানিত। কন্যাকে নিকটে আনিয়া সুরপতির মাতামহ তাঁহাকে একখানি বাড়ী লিখিয়া দিয়াছিলেন—কন্যার সংসারের সব ব্যয় তিনি বহন করিতেন এবং কন্যার যে টাকা ছিল ও যে আয় হইত তাহা বর্দ্ধিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার পর একটি কারখানার জন্য সুরপতির গৃহ ও গৃহসংলগ্ন জমী যখন কারখানার

অধিকারীরা ক্রয় করেন, তখনও কিছু টাকা আসিয়াছিল। আর এতদিন চাকরী করিয়া সুরপতিও অর্থ-সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

কথাটা কিন্তু পিসীমা'র ভাল লাগিল না। পুরুষের পক্ষে অলস থাকা—কোন কায না করা তাঁহার নিকট অপরাধ বিবেচিত হইত। তিনি বলিলেন, "সে কি কখন হয়?"

সুরপতি বলিলেন, "কেন, দিদি?"

"রাস্তায় রাস্তায় হৈ হৈ করে বেড়ান কি আমাদের হিন্দু গৃহস্থের ঘরের বৌ-ঝীর পক্ষে ভাল?"

"তোমার আমার বিবেচনায় ভাল নয়; কিন্তু আমাদের সময় এখন আর নাই। আর আমাদের গণা দিন ত ফুরিয়ে আসছে। যে ক'টা দিন আছে সে ক'দিন আমাদের সুখের জন্য কি এদের সুখের অন্তরায় হ'ব?"

"বৌমা'র দিদি এসেছে ব'লে তা'কে বাপের বাড়ী পাঠাতে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। না পাঠা'লে এমন হ'ত না।"

"সে দোষ আমার। আমার আরও দোষ হয়েছে—আগে যে লোক ছেলেমেয়ের বিয়েতে তন্ন তন্ন ক'রে সব সংবাদ নিতেন, তা'র বিশেষ কারণ ছিল। তাঁ'রা জানতেন, এক এক পরিবারের শিক্ষা-দীক্ষা এক এক রকমের—তাই যে পরিবারের শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে আপনাদের পরিবারের শিক্ষা-দীক্ষার মিল বেশী—সেই পরিবারেই বৈবাহিক সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। সেই জন্য তখন ঘটকেরা সব পরিবারের ইতিহাস সংগ্রহ ক'রে রাখতেন। এখন আমরা আর সে সব দেখি না—আমিও দেখি নাই। সেটা আমার অপরাধ।"

দিদি বলিলেন, "আমি বৌমা'কে আনতে পাঠাচ্ছি। এখানে এনে আমরা তা'কে বুঝাব—এ দেবতার মন্দিরে রাধাবিনোদের আশীর্ব্বাদে তা'র মন বদলে যাবে। ছেলেমানুষ বৈ ত নয়—হুজুগে মেতেছে, এখানে এলেই সব সেরে যা'বে।"

সুরপতি বলিলেন, "যদি তা'ই ভাল মনে কর, তবে কর। চাকরীতে যোগ দেবার চৌদ্দ দিন আছে—এর মধ্যেই কি হয় দেখা যা'ক।"

নীহার মনোযোগ সহকারে পিতার কথা শুনিতেছিল। যে পিতা পুত্রের ভবিষ্যৎ সুখশান্তির চিন্তায় এত ব্যাকুল — সেই পিতার ইচ্ছা যে প্রণতা আদেশ বলিয়া শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করিতে পারে নাই, এই দুঃখ তাহাকে বিষম বেদনা দিতেছিল। তাহার জন্য পিতার চিন্তার স্বরূপ সে জানিত। সে বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাকে যদি চাকরী গ্রহণের সুযোগ ত্যাগ করিতে হয়, তবে তাহা সুরপতির পক্ষে সুখের হইবে না।

তবে যুবকের ভালবাসা—সেই ভালবাসাই তাহার মনে আশার সঞ্চার করিতেছিল। পিসীমা'র কথাই সে ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে করিবার চেষ্টা করিতেছিল—প্রণতার যে বয়স তাহাতে সে তাহার ভুল বুঝিতে পারিবে এবং তাহার এই যে ভাব তাহা ত্যাগ করিয়া সে মনে করিবে — গৃহই নারীর কর্ম্মক্ষেত্র, সে গৃহের লক্ষ্মী।

মনে আশার ও নিরাশার দ্বন্দ্ব লইয়া সে যাইয়া শয্যায় শয়ন করিল—তাহার চক্ষুতে নিদ্রা নামিয়া আসিল না। দুশ্চিন্তার বেদনা যখন অত্যন্ত তীব্র হয়, তখন তাহা আপনার সৃষ্ট বিশৃঙ্খল ভাবের মধ্যে ডুবিয়া যায়। তাহারও শেষে তাহাই হইল। তখন—উষালোক যেমন হ্রদের বক্ষে যেন সুপ্ত হইয়া থাকে, তাহার মনে আশা তেমনই ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সে ঘুমাইয়া পড়িল। যে নিদ্রা মানসিক সংগ্রামজনিত শ্রান্তির পর আবির্ভূত হয় সে নিদ্রার যখন অবসান হয়, তখন পূর্ব্বে যে ভার দুর্ব্বহ বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে ভার আর দুর্ব্বহ বলিয়া অনুভূত হয় না।

স্ত্রীর মৃত্যুশোক সুরপতির দেবতার প্রতি ভক্তি গভীর করিয়াছিল; তিনি সেই ভক্তির ফলে নির্ভরশীলতার অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি আজ পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া দুঃখিত হইলেও বিচলিত হইলেন না। এদিকে ভ্রাতার ও ভ্রাতুষ্পুত্রের আহার শেষ হইলে

পিসীমা যাইয়া ঠাকুরঘরের দ্বারে বসিলেন। তখন ঠাকুরের "শয়ন" হইয়া গিয়াছে—ঘরের দ্বার রুদ্ধ। তিনি সেই দ্বারের সম্মুখে বসিয়া দেবতাকে স্মরণ করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন—দ্বারের সম্মুখে মাথা ঠুকিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, শিবরাত্রির সলিতা এই ছেলে—এর জীবন যেন দুঃখে মলিন না হয়। তুমি দয়াময়—দয়া কর।" তিনি জানিতেন, পুত্রের সম্বন্ধে সুরপতির প্রার্থনা ছিল—সে যেন জয়ী হয়; তিনি আজ ঠাকুরের কাছে সেই প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন—নীহার যেন জয়ী হয়।

প্রণতা যে দেবতার প্রতি ভক্তি দেখায় নাই, তাহাতে তিনি যেমন ব্যথিতা তেমনই বিরক্ত হইয়াছিলেন। সে কথা স্মরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "ঠাকুর, বালিকাকে সুবুদ্ধি দাও — সে যেন তোমার সেবা করিবার —" সহসা পিসীমা'র বুক কাঁপিয়া উঠিল, লোক যে রাধাবিনোদকে "বিধবার ঠাকুর" বলে! তাঁহার দুই চক্ষু সহসা অশ্রুতে ভরিয়া গেল। তিনি অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, তাহার পর শয়ন করিতে গমন করিলেন।

৪

পরদিন প্রাতে পিসীমা প্রণতার মাতাকে পত্র লিখিয়া একজন চাকরকে পাঠাইয়া দিলেন—নীহার অপরাহ্নে যাইয়া প্রণতাকে লইয়া আসিবে।

ভীমরুলের চাকে যদি লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হয়, তবে ভীমরুলগুলি যেরূপ চঞ্চল হয়, এই পত্র পাইয়া প্রণতার পিত্রালয়ে সকলে তেমনই চঞ্চল হইয়া উঠিল। আদর্শ সংক্রামক। বিনতার আদর্শে প্রণতারই মত তাহার দুই ভ্রাতাও অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। পত্রখানি লইয়া মা যখন আসিয়া বলিলেন, "বেহান লিখেছেন, প্রণতাকে আজ শ্বশুরবাড়ী যেতে হ'বে",—তখন সকলেই তাহাতে আপত্তি করিল। প্রণতা বলিল—"অসম্ভব!"

যেভাবে সে কথাটা বলিল তাহা না শুনিলে বুঝা যায় না।

মা বলিলেন, "কেন?"

বিনতা বলিল, "আজ আমাদের বাড়ী থেকেই সকলে শোভাযাত্রা ক'রে যা'বে, আর প্রণতা চ'লে যা'বে?"

"কিন্তু শ্বশুর হয়ত রাগ করবেন।"

"যদি করেনই! আজ দেশের লোক যে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে, তা' ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা'র সাফল্যের জন্য অনেককে ত্যাগ স্বীকার করতেই হ'বে।"

এক ভ্রাতা বলিল, "বড় জামাইবাবুর কথাই কেন ধর না।"

মা কি বলিতে যাইতেছিলেন; বিনতা বলিল, "শ্বশুর রাগ করবেন—আর শ্বশুরের ছেলে কাল রাগ ক'রেই গেছেন। শ্বশুর রাগ করেন, বুঝতে পারি; কারণ, সমস্ত জীবন তিনি যে চাকরী ক'রে আসছেন, তা'তে তাঁ'র মনে দাসমনোভাব রঞ্জকের হাতে বর্ণের মত স্থায়ী হ'য়ে গিয়েছে; কিন্তু নীহার—দেশব্যাপী এই নূতন হাওয়া কি তা'কে স্পর্শ করতে পারে নি?"

মা বলিলেন, "নীহার একটা ভাল চাকরী পেয়েছে।"

বিনতা বলিল, "কি চাকরী?"

"আমি কি ছাই অত জানি? বেহান লিখেছেন, সেই কথা বলতেই কাল এসেছিল; লাজুক ছেলে বলতে পারে নি।—"

"দেখি—দেখি!"—বলিয়া বিনতার এক ভ্রাতা মা'র হাত হইতে পত্রখানি লইয়া পড়িল; উত্তেজিত ভাবে বলিল, "শুল্ক বিভাগে চাকরী—প্রায় পুলিসের চাকরীই বলা যায়।"

বিনতা বলিল, "এই সময়—যখন দেশের লোক সরকারী চাকরী ছেড়ে দিচ্ছে, সেই সময়!"

প্রণতার মনে হইল, নীহারের ব্যবহারে তাহার মুখ লজ্জায় কালিমালিপ্ত হইল। তাহার পর সে ভাবিল, কেন? নীহারের কাযের জন্য সে দায়ী নহে—সে যে লজ্জানুভব করিতেছে সে স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ সম্বন্ধে বহুদিনের কুসংস্কারের ফল। তাহার মত বয়সে উত্তেজনা-প্রবণ নর-নারী যখন সব সংস্কার কুসংস্কার বলিয়া চক্ষুর সম্মুখ হইতে দূর করে, তখন একটা বিষয় দেখিতে বা বুঝিতে পারে না—

তাহাদিগের দৃষ্টিশক্তি চয়ত ক্ষীণ। সে মনে করিল, কায করিবার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সকলেরই আছে। সে বলিল, "এই মনোবৃত্তিই ত' দেশের মুক্তিপথে প্রধান বাধা।"

মা বলিলেন, "তোদের ও সব হেঁয়ালী আমি বুঝতে পারি না—বুঝতে চাইও না। এখন ব'লে দে, আমি চিঠির কি উত্তর দেব।"

বিনতা বলিল, "এ চিঠির জবাব না দেওয়াই এর উপযুক্ত জবাব। কিন্তু তুমি ত তা' শুনবে না; তোমার বিশ্বাস, মেয়ের মা'কে মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর সকলের পায়ের কাদা হ'য়ে থাকতেই হ'বে। আমি উত্তর লিখে দিচ্ছি।"

সে উত্তর লিখিয়া দিল, প্রণতা এখন যাইতে পারিবে না; কারণ, সে তাহার দিদির সঙ্গে বিলাতী বর্জন আন্দোলনে স্বেচ্ছাসেবিকার কায করিতেছে। পত্রের প্রতি ছত্রে ঔদ্ধত্য ও অবিনয় সপ্রকাশ।

পত্র লিখিয়া বিনতা যেন বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া তাহা সকলকে পড়িয়া শুনাইল; তাহার পর সে আপনি ভৃত্যকে ডাকিয়া পত্রখানি দিল।

ভৃত্য চলিয়া গেল।

মা ভয় পাইলেন। ভয় পাইয়া তিনি সব কথা স্বামীকে জানাইলেন; কিন্তু তাঁহার নিকট কোনরূপ সহানুভূতি পাইলেন না।

৫

পত্র পাঠ করিয়া পিসীমা স্তম্ভিত হইলেন। তিনি যখন পত্রখানি লইয়া ভ্রাতার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন নীহার পিতার কাছে ছিল। সুরপতি পত্রখানি পাঠ করিয়া নীহারকে দিলেন—নীহার তাহা পাঠ করিল। পত্রের কথাগুলি যেন তাহার বুকে বিঁধিতেছিল।

পিসীমা বলিলেন, "তুমি পত্র লিখে দাও।"

সুরপতি বলিলেন, "কি লিখব?"

"লিখে দাও—বৌমা'কে আসতে হ'বে এবং তুমি গিয়ে তাঁ'কে নিয়ে আসবে।"

নীহার ভাবিতেছিল; যাহার বুকের মধ্যে অগ্নিদাহ অনুভূত হয়, সে অধিক কথা কহিতে পারে না। এবার সে বলিল, "না, বাবা গেলেও যদি—"

পিসীমা বলিলেন, "আসবেন না? সে হ'তে পারে না!"

কিন্তু সুরপতি বুঝিলেন—দিদি, যাহা হইতে পারে না মনে করিতেছেন, তাহা হইতে পারে; কারণ যে পরিবেষ্টনে তাঁহারা বর্দ্ধিত, সে পরিবেষ্টন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে—পরিবর্ত্তন কালের নিয়ম, কিন্তু পরিবর্ত্তন যেন অকারণ ও অতি দ্রুত। তাঁহারা সেই পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কেবল তাহাই নহে—তিনি জানিতেন, নারী-প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, যুবতী যখন কোন বিষয়ের জন্য অত্যন্ত আগ্রহানুভব করে, তখন তাহাকে বাধা দিলে তাহাতে অনেক সময় কুফল ফলিয়া থাকে।

সুরপতি দিদিকে বলিলেন, "ভাল—একটু ভেবে দেখি কি করলে ভাল হয়।"

ভ্রাতার এই দ্বিধা ভগিনীর ভাল লাগিল না; তিনি ইহা অকারণ দৌর্ব্বল্যের অভিব্যক্তি বলিয়াই মনে করিলেন, ইহা সবল পুরুষের পক্ষে শোভন নহে।

ভগিনী চলিয়া যাইবার পর সুরপতি চিন্তিতভাবে নীহারকে বলিলেন, "আমি বলি, তোর ও চাকরী নিয়ে কায নাই—বোধ হয়, এতে অশান্তি বাড়বে।"

নীহার যেরূপ দৃঢ়ভাবে বলিল, "তা' হ'বে না, বাবা।" তাহাতে সুরপতি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন।

পুত্রের এই দৃঢ়সঙ্কল্প যে প্রণতার কাযের প্রতিক্রিয়া, তাহা সুরপতি বুঝিলেন। কিন্তু যে পুত্রকে তিনি পিতা ও মাতা উভয়ই হইয়া পালন করিয়াছেন, তাহার সুখ ও শান্তির জন্য তিনি সব ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি বলিলেন, "উত্তেজনার বশে কোন কায করতে নাই। ভাল ক'রে ভেবে দেখ। বৌমা যদি ভুল করেন, তবে

সেই জন্য তোমারও ভুল করবার অধিকার হয় না—তাঁকে ভুল থেকে মুক্ত করাই স্বামীর কর্ত্তব্য।"

সুরপতি যাহাকে স্বামীর কর্ত্তব্য বলিলেন, তাহা স্বামীর ভালবাসার অধিকার, সবলের অধিকার। কিন্তু—সে অধিকার যে স্বীকার করে না, তাহার সম্বন্ধে নীহার কি করিবে? পিতা তাহার নিকট কি, তাহা সে প্রণতাকে বলিয়াছিল। তথাপি পূর্ব্বদিন সে যেভাবে তাহার পিতার সম্বন্ধে কথা বলিয়াছিল, তাহার বেদনা নীহারের বক্ষ হইতে অপনীত হয় নাই; পরন্তু তাহা তাহার ভালবাসাকে — নিবিড় প্রেমকে অভিমানে রূপান্তরিত করিতেছিল; মধু যদি বিকৃত হয়, তবে তাহা বিষে পরিণত হয়।

সেই জন্য নীহার পিতার কথায় মনে করিল, পিতা তাহার জন্য আপনি অন্যায়রূপে লাঞ্ছনা সহ করিতে চাহিতেছেন—সে পুত্র হইয়া তাঁহাকে তাহা সহ্য করিতে দিবে না। যাহা সহ্য করিবার সে-ই করিবে — সে জীবন তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত করিবে সে-ও ভাল, তথাপি পিতাকে কোনরূপ বেদনা ভোগ করিতে দিবে না।

উত্তেজনায় ও পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসার আধিক্যে সে মনে করিতে পারিল না, সে যদি বেদনা ভোগ করে, তবে পরকলার মধ্য দিয়া পতিত সূর্য্যালোকের মত তাহা পিতার হৃদয় অধিক দগ্ধ করিবে। পিতা তখনই তাহার ভবিষ্যৎ বেদনার কথা মনে করিয়া স্বয়ং অশেষ বেদনানুভব করিতেছিলেন।

সুরপতি অফিসে চলিয়া যাইবার পর নীহার যেন মনের অস্থিরতায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

৬

অপরাহ্নে নীহার গৃহে ফিরিতেছিল। তাহার জামার পকেটে চাকরীর নিয়োগপত্র আর রিভলভার। বিদেশ হইতে যেসব জাহাজ কলিকাতার বন্দরে আসে, সে সকলের নাবিক — লস্কররা অর্থলোভে কোকেন হইতে পিস্তল পর্য্যন্ত অনেক নিষিদ্ধ দ্রব্য লুকাইয়া আনে এবং ধরা পড়িবার ভয়ে রাত্রির অন্ধকারে গোপনে সেসব কূলে আনিবার চেষ্টা করে। সন্ধান পাইলে তাহাদিগকে ধরা নীহারের চাকরীর অন্যতম কায। বলা বাহুল্য, ধরিবার চেষ্টা করিলে গোপনে জিনিস আমদানীকারীরা বাধা দিবার চেষ্টা করে। তাহাতে হাঙ্গামা ঘটে। সেই জন্য কর্ম্মচারীকে আত্মরক্ষার্থ রিভলভার কাছে রাখিতে হয়।

কিছু দূর আসিয়াই ট্রাম গাড়ী থামিয়া গেল। দেখা গেল, তাহার অগ্রে অনেকগুলি ট্রাম গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে এবং সম্মুখ হইতে বহু লোক দ্রুত পলায়ন করিতেছে। অনেকেই কি হইয়াছে, তাহা জানে না—সকলে পলাইতেছে বলিয়াই পলাইতেছে। কেহ বলিতেছে — পুলিস শোভাযাত্রাকারীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে—"বাপ রে কি লাঠি!—রক্তারক্তি ব্যাপার!" কেহ বলিতেছে, গুণ্ডারা শোভাযাত্রা-কারিণীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে—"সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়! গেরস্ত ঘরের মেয়ে, ঘরকন্না কর, তা' না 'দেশের কায করব'!—এখন কি হয়!"

কৌতূহলবশে নীহার ট্রাম গাড়ী হইতে নামিয়া অগ্রসর হইল। অল্প দূর যাইয়াই সে দেখিল, এক দল যুবতী ও কিশোরী পতাকা হস্তে অগ্রসর হইতেছে, আর এক দল উত্তেজিত লোক লাঠি প্রভৃতি লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। যুবতী ও কিশোরীরা ভয়ে কাঁপিতেছে। সেদিন বোম্বাইয়ে কোন আইন-ভঙ্গকারী নেতার গ্রেপ্তারে কলিকাতায় দোকান-পাট বন্ধ করিবার — "হরতাল" করিবার—আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। নিকটস্থ বাজারে হিন্দু দোকানদাররা দোকান-পাট বন্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু মুসলমানরা তাহাতে সম্মত হয় নাই। যাহারা শোভাযাত্রা করিয়া আসিয়া দোকান বন্ধ করিতে বলিয়াছিল, তাহাদিগের সহিত দোকানদারদিগের বচসা হয় এবং দোকানদাররা যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহাতে শোভাযাত্রাকারী যুবকরা উত্তেজিত হইয়া উঠে — সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকায় তাহারা বিশেষ উত্তেজিত

হয়। তখন দোকানদাররা দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে; সেই হিংস্র পশুর মত আক্রমণ-কারীদিগের আক্রমণে — লাঠির আঘাতে যুবকরা অনেকেই পলায়ন করিয়াছিল। আক্রমণকারীরা তখন রক্তের স্বাদ-প্রাপ্ত ব্যাঘ্রের মত হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে — তাহারা মহিলাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এই সময় নীহার তথায় উপস্থিত হইল—বিপদের স্বরূপ উপলব্ধি করিল। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বহেতু তাহার মনে হইল, রিভলভার দেখিলে জনতা ভয় পাইতে পারে। সে দাঁড়াইয়া রিভলভার বাহির করিল। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকা যায় না। সে যাহা মনে করিয়াছিল, তাহাই হইল—যাহারা পশুবলে বলী, তাহারা প্রায়ই কাপুরুষ হয়; রিভলভার দেখিয়া জনতা পিছাইয়া গেল।

সেই অবসরে পথিপার্শ্বস্থ গৃহের লোকরা বদ্ধ দ্বার মুক্ত করিলে শোভাযাত্রাকারিণীরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বার আবার রুদ্ধ হইল। গৃহস্বরা পূর্ব্বেই পুলিসকে আসিবার জন্য টেলিফোনে সংবাদ দিয়াছিলেন।

এই সময় জনতার মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল—"ও পুলিস নয়—বন্দুকে গুলী নেই।"

উত্তেজিত জনতা বাধা পাইয়া বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল—এই কথায় সাহস পাইয়া একক নীহারকে আক্রমণ করিল। ক্ষিপ্তপ্রায় জনতা লাঠি আস্ফালন করিতে করিতে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তৎক্ষণে যুবতী ও কিশোরীরা আশ্রয়গৃহের ফুটপাথের উপর বারান্দায় উঠিয়া রাস্তায় যাহা ঘটিতেছিল তাহা লক্ষ্য করিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে আক্রান্ত যুবক অদৃশ্য হইয়া গেল—বানের জলে যখন আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়, তখন পূজারে নির্ম্মাল্য যেমন আবর্ত্তে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়া—যেন কোন্ অজ্ঞাত অতলে চলিয়া যায়, সে-ও তেমনই ভাবে কোথায় গেল, আর দেখা গেল না।

বারান্দায় এক কিশোরী প্রস্তর-প্রতিমার ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল — কেবল তাহার প্রাণ যেন তাহার বিস্ফারিত নয়নের পথে বাহির হইয়া আক্রান্ত যুবককে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেছিল। যুবক যখন পড়িয়া গেল, তখন তাহার মনে হইল, অতর্কিত ঘূর্ণি-বায়ু-বাহিত প্রলয়ের মেঘ দীপ্ত দিবাকরকে অদৃশ্য করিয়া দিল। অনেকে যখন—"কি সর্ব্বনাশ!" "কি হ'ল" বলিয়া উঠিল তখন সে কেবল "উঃ" বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। বিনতা তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল; সে প্রণতাকে ধরিয়া ফেলিল।

ওদিকে দুইখানি মোটর লরীতে পুলিস আসিয়া পড়িল। দূরে পুলিসের লাল পাগড়ী দেখিতে পাইয়াই কাপুরুষ আক্রমণকারীরা যে যেদিকে পারিল পলাইয়া গেল। পুলিস আসিয়া দেখিল, পথ জনশূন্য, আর সেই পথের উপর সংজ্ঞাশূন্য নীহারের দেহ পড়িয়া আছে—তাহার পোষাক ছিন্নবিচ্ছিন্ন, ক্ষতবিক্ষত দেহ হইতে নিঃসৃত রক্তে সিক্ত। তাহারা সেই দেহ তাহাদিগের সঙ্গে আনীত আহত ও পীড়িতবাহী যানে তুলিয়া হাসপাতালে লইয়া গেল।

তখনও প্রণতার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় নাই। গৃহের মহিলারা তাহার মুখে ও চক্ষুতে জল দিয়া তাহাকে আনিয়া পাখার নিম্নে রাখিলেন; বলিতে লাগিলেন, "কি দৃশ্য! এ কি দেখা যায়?" একজন বৃদ্ধা বলিলেন, "কি জানি, বাছা, আজকাল মেয়েরা কেন যে এই সব বিপদে এগিয়ে যায়!"

পরিচয় দেওয়া বিনতার অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু একজন বলিয়া ফেলিল, "ওঁর স্বামী।"

বৃদ্ধা শিরে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! ছেলেটিই কি সঙ্গে ছিল?"

"না। উনি বোধ হয় পথে আসছিলেন।"

"ডাক্তার ডাকাব কি?"

বিনতা বলিল, "না। একখানা ট্যাক্সি ডাকিয়ে দিন; আমি একে বাড়ী নিয়ে যাই।"

"পথ পরিষ্কার হয়েছে ত?"

বাটীর অনেকে মনে করিলেন, পথ পরিষ্কার হইয়া থাকুক আর না-ই থাকুক "উড়ো আপদ" ঘাড়ে

না রাখাই সুবুদ্ধির কায। তাঁহারা ট্যাক্সি ডাকিতে পাঠাইলেন।

৭

প্রণতার যখন মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বিকারের পর রোগীর জ্ঞান হইলে সে যেমন বিকারের কথাই মনে করে, সে তেমনই প্রথমেই রাজপথে সংঘটিত ঘটনার কথা মনে করিল। সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, সে তাহার পরিচিত পিতৃগৃহে—পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী—তাহার শয্যাপার্শ্বে।

সংজ্ঞালাভ করিয়াই সে দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কি হয়েছে ?"

বিনতা বলিল, "তুই এখন উত্তেজিত হ'য়ে উঠিস্ না—চুপ ক'রে শুয়ে থাক্।"

প্রণতা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিল, বাহ্য-সংজ্ঞাশূন্যভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ? বল।"

তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তারের উপদিষ্ট ঔষধ মেজার গ্লাসে ঢালিয়া আনিয়া বলিলেন, "প্রণতা, ওষুধটুকু খেয়ে ফেল।"

সে গ্লাসটি লইয়া বেগে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল—প্রাচীরে লাগিয়া তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া বিদ্যুতের আলোকে জ্বলিতে লাগিল। সে বলিল, "কি হয়েছে ?"

বিনতা বলিল, "পুলিস নীহারকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। আমরা এখুনি খোঁজ নিচ্ছি—এতক্ষণ তো'কে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম।"

"আমাকে নিয়ে ? আমি হাসপাতালে যা'ব।"

তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, "আগে আমি যাই—এখনই যা'ব।"

"না। আমি যা'ব।"

বিনতা বলিল, "সে কি হয় ? তুই এতক্ষণ অজ্ঞান ছিলি। যেতে পারবি না।"

অত্যন্ত অধীরভাবে প্রণতা বলিল, "তুমি এই কথা বলছ ? তুমি আমার দিদি, না—শত্রু !"

মা কাঁদিতে লাগিলেন।

দাদা বলিলেন, "হাসপাতালে ত সব সময় দেখতে যেতে দেয় না। তাই—"

প্রণতা দাদার দিকে চাহিল — তাহার চক্ষু যেন জ্বলিতেছিল। সে বলিল, "আমি যা'ব। আমি বলব, 'আমি স্ত্রী, আমার স্বামীকে দেখব।' কে আমাকে যেতে না দেবে ?"

প্রণতা উঠিল, পার্শ্বের ঘরে যাইয়া একখানি রেশমী চাদর টানিয়া লইয়া গাত্রে দিয়া যেমন অবস্থায় ছিল, তেমনই অবস্থায় যাইতে উদ্যোগী হইল ; জিজ্ঞাসা করিল, "মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতাল ?"

বিনতা বুঝিতে পারে নাই নীহারের বিস্ময়কর কার্য্যের রবিকরে প্রণতার উপেক্ষার তুষারস্তূপ বিগলিত হইয়া গিয়াছিল—আবেগের ধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল।

তাহার পিতা বলিলেন, "চল, আমি যা'ব।"

বিনতাও সঙ্গে গেল।

(আগামী বারে সমাপ্য)

রূপের দেহ

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী

দেহের রূপটি সবাই খোঁজে
রূপের দেহ কেই বা জানে ?
দেহের রূপে সবাই মজে
রূপের দেহ কবির প্রাণে ।

দেহের রূপে   কালো সাদা   নানা রঙের রঞ্জনা
রূপের দেহ   রসে মাখা   মহাভাবের ব্যঞ্জনা ।
দেহের রূপে   যৌবনেরি   দুটি দিনের জয়-টিকা
রূপের দেহে   অনন্তেরি   চিরন্তন চিৎ-শিখা ।
মৃন্ময় এ   দেহের রূপে   চোখের নেশা অন্ধ করে
চিন্ময় ও   রূপের দেহে   ধ্যানের মকরন্দ ঝরে ।
দেহের রূপে   কামের তরী   মোহের দহে মগ্ন হয়
রূপের দেহে   রাই কিশোরী   মাধবেরি মর্ম্মে রয় ।
দেহের রূপে   দেহীর খেলা   রূপের দেহে বিদেহীর
দেহের রূপে   বিষের মেলা   রূপের দেহে বাঁশরীর ।

দেহ ভুলে' হৃৎ-কমলে
রূপের দেহ গড়্ না কবি !
বিশ্বরূপা পলে পলে
উঠ্‌বে ফুটে, অমর ছবি ।

"যন্তর-মন্তর"
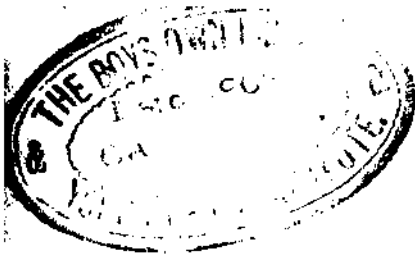
শ্রীবিমলেন্দু কয়াল, এম-এ

প্রাচ্যে গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব যথেষ্ট। বাগ্‌দান, বিবাহ প্রভৃতি সমস্তই তাদের শুভাশুভের উপর নির্ভর করে; যতক্ষণ না গ্রহনক্ষত্রের যোগাযোগ মেলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যাত্রা আরম্ভ হয় না। আর জন্মের মুহূর্ত্তে দূরান্তরালের অদৃশ্য গ্রহনক্ষত্রেরই ফলাফলের উপর, ভবিষ্য জীবন—হয় পুণ্যময়, না হয় শাপগ্রস্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যাঁরা গ্রহনক্ষত্রকে জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের অঙ্গ ব'লে পূজা ক'রে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহই সর্ব্বপ্রথম।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন সমর-উল্লাস চারিদিকের আকাশ-প্রান্তর মথিত ক'রে তুলেছিল, তখন জয়পুরের মহারাজ যোদ্ধা ব'লে পরিগণিত হন নি। তিনি পরিচিত ছিলেন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ব'লে; লোকে বল্‌তো তিনি ভারতের 'ম্যাকিয়াভেলী'। তিনি তাঁর রাজধানী নিজ নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তা' ছাড়া রাজ্যের স্থানে স্থানে পাদপচ্ছায়ার তলদেশে পথশ্রান্ত

"যন্তর মন্তর"—নয়া দিল্লী

পথিকের জন্য পান্থশালা, আর হিন্দুস্থানের বিভিন্ন নগরে পাঁচটী মান-মন্দির স্থাপন ক'রে গেছেন।

বিজ্ঞান-গবেষণার যে অভিনব পন্থা তিনি আবিষ্কার ও অনুসরণ করেছেন, অদ্যাবধি জ্যোতির্বীরা তার ফল ভোগ করছেন, আর তাঁর প্রভাব এখন পর্য্যন্ত সঞ্জীবিত রয়েছে। তাঁর জীবনকাহিনী-প্রণেতার

ভাষায় বলা যেতে পারে, "এ মন্দিরগুলি মহারাজের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ। তারা ভারতের অন্ধকার যুগকে অপূর্ব্ব আলোকময় ক'রে তুলেছে।"

শৈশবেই জয়সিংহ গ্রহনক্ষত্রকে কৌতূহলের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখেছিলেন। সেই সুতীক্ষ্ণ অনুধাবনের ফলে গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে তিনি প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে তৎকালীন প্রচলিত নিয়মাবলী ভ্রমসঙ্কুল ব'লে মনে করেছিলেন, আর সেজন্য তিনি নিজেই অনেক নূতন নিয়মের সূত্রপাত ক'রে গেছেন। এ কারণে তিনি হিন্দু, মুসলমান এবং ইউরোপীয় প্রথার সম্যক্ অনুশীলন আরম্ভ ক'রে নূতন তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য বহু কর্ম্মচারীকে দূরদেশে প্রেরণ করেন। তিনি অনুসন্ধিৎসু জ্যোতিষজ্ঞদিগকে রাজধানীতে সাদরে নিমন্ত্রণ ক'রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বহু মূল্যবান্ পুস্তক নিজের অনুশীলনের প্রসার-কল্পে ভাষান্তরিত করেছিলেন। তখনই তিনি দিল্লীতে মান-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে সাত বছর অক্লান্ত অনুশীলনের ফলে তিনি নক্ষত্রসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেন। অবশেষে জয়পুরে, উজ্জয়িনীতে, বারাণসীতে আর মথুরায় অনুরূপ মন্দির-সৌধ নির্ম্মাণ ক'রে কীর্ত্তি-স্তম্ভ অটুট রেখে গেছেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ মহারাজের সেই মূল্যবান্ গ্রন্থাগার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যেতে পারে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর যাবতীয় জ্যোতিষ-গ্রন্থ সেই অনুপম বাণীমন্দিরে সশ্রদ্ধায় পূজিত হ'য়ে এসেছিল। সম্ভবতঃ টলেমী (Ptolemy)র আরবী অনুবাদ "আলমাজেষ্ট" (Almagest) তাঁর উপর অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকবে। জয়সিংহ বলতেন, টলেমী অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্, সেজন্য তিনি তাঁর রাজত্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্ব্বিদ্ জগন্নাথদেবকে 'আলমাজেষ্ট' ভাষান্তরিত করতে আদেশ দিয়েছিলেন।

পুস্তকগুলি লুপ্ত হ'লেও সেই অপূর্ব্ব সৌধগুলি এখনও অটুট রয়েছে। জয়সিংহের স্বরচিত কয়েকখানি গ্রন্থ এখনও দেখা যায়। জ্যোতিষ-তালিকা-সংক্রান্ত "জিজ মহম্মদ শাহী" (Zij Muhammad Shahi) তাঁরই অক্লান্ত অনুপ্রেরণায় লিখিত। পুস্তকের গৌর-চন্দ্রিকা অপূর্ব্ব বললেও হয়। লেখা আছে, "জয়সিংহ আত্মার কটিদেশে তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কটি-বন্ধ ঝুলিয়ে দিয়েছেন"; আর দিল্লীতে পিত্তলনির্ম্মিত মান-মন্দিরের জন্য অনেক যন্ত্রপাতি আহরণ করেছিলেন। তাঁর অনুমোদিত মান-যন্ত্রগুলি খুব ছোট ছিল ব'লে তাঁকে সুখী করতে পারে নি। তার আরও কারণ ছিল—সময় 'মিনিটে' মাপবার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। তা' ছাড়া আরও কয়েকটী অসুবিধা ছিল, যেমন তাদের মেরুদণ্ডের ক্ষয়-প্রাপ্তি আর plane-এর স্থান-বিচ্যুতি। এই কারণেই তার পরিমাপ বিষয়েও অনেক ত্রুটী লক্ষিত হ'তো ব'লে, তিনি মনে করেছিলেন। সুতরাং দিল্লীতে তিনি পাথর আর চূণের স্থায়ী যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ করেন। তা'তে জ্যামিতিক নিয়মাবলীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় ও সেই স্থানের দ্রাঘিমা (meridian) ও অক্ষরেখা (latitude)র সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে যন্ত্রপাতি সন্নিবিষ্ট করা হয়। কাজে কাজেই বৃত্তগুলি ন'ড়ে গেলে অথবা মেরুদণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হ'লে যে ভুল হ'তে পারে, তা' সংশোধন করা সম্ভব হ'লো।

এই স্থাপত্য-যন্ত্রগুলি উচ্চতায় ৯০ ফুট পর্য্যন্তও আছে আর ইহারা মহারাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান ব'লে আজও পরিগণিত হচ্ছে। অথচ তিনি বলতেন যে তিনি "মুসলমান গ্রন্থানুযায়ী" ধাতুনির্ম্মিত বহু যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তিত করেছিলেন। জয়পুরে এখনও তার কতকগুলি সুন্দর নিদর্শন রক্ষিত আছে। প্রথমে এগুলি দিল্লীতেই ছিল, কিন্তু পরে হয়ত জয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিংবা নাদির শা' ১৭৩৯ খৃঃ অব্দে সেগুলি নিয়ে যান। মহারাজ মনে করেছিলেন হয়ত এই অ-নড় যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ ক'রে তিনি ভবিষ্যতের ভুলত্রুটীর হাত থেকে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু তিনি কল্পিত পরিমাপ ঠিক করতে গিয়ে সুবিধাগুলি বিসর্জ্জন দিয়ে ফেলেছিলেন। তার ফল হয়েছে এই যে, বর্ত্তমান কালের যে কোনও "কোণ-মাপক-

যন্ত্র" (theodolite) মহারাজের সমস্ত বৃহৎ সৌধকে পরাস্ত করেছে।

মহারাজের ইচ্ছা ছিল যাতে সহজে কার্যাসিদ্ধি হয়। মুসলমান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে তৈমুরের পৌত্র উলুগ বেগ ছিলেন শ্রেষ্ঠ। গুপ্তঘাতকের হাতে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় মুসলমান-জগতে বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় গ্রহ-নক্ষত্র অনুশীলনের পথ একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

"যন্তর-মন্তর" নামক দিল্লীর মান-মন্দিরটি নয়া দিল্লীর একটা শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ; এর পাশ দিয়ে এই নামেরই রাস্তা চ'লে গেছে;—ষ্টেশন থেকে এই রাস্তা ধ'রে গেলে 'সেক্রেটারিয়েট' আর নূতন 'ভাইসরিগ্যাল লজে' যাওয়া যায়। হিন্দু রাওয়ের বাটির সন্নিকটবর্ত্তী উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত 'পীর ঘায়েব', এইটাই হ'লো স্থানীয় 'সার্ভে পয়েন্ট'; এর প্রায় সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণে—"যন্তর-মন্তর"। জয়পুর-রাজের জ্যোতিষ-গণনার অভিলাষ

"যন্তর-মন্তর"—নয়া দিল্লী

জয়সিংহ তাঁরই অনুসরণ করেছিলেন। এই মুসলমান জ্যোতির্ব্বিদ যে সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রবর্ত্তন করেন মহারাজের যন্ত্রপাতিগুলি তার অনুকরণ মাত্র। কিন্তু বিশাল সূর্য্যঘড়ি ("সম্রাট্‌-যন্ত্র"), গোলার্দ্ধমণ্ডলগুলি ("জয়প্রকাশ") আর "রাম-যন্ত্র" প্রভৃতি, হিন্দু জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য প্রদান করছে। মহারাজ সর্ব্বপ্রথমেই এগুলি প্রবর্ত্তন করেন আর এগুলিই হ'লো তাঁর নিজস্ব নির্ম্মাণ-কৌশলের পরিচায়ক।

চরিতার্থ করবার জন্যই এই মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল। এখানেই রাজা তাঁর অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠফল লাভ ক'রে নূতন জ্যোতিষ-সংক্রান্ত তালিকার সূত্রপাত করেন। তাঁর স্বকল্পিত তিনটী যন্ত্রও এখানে বিদ্যমান আছে।

"সম্রাট-যন্ত্র" খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। নির্ম্মাণ-কৌশলে ইহা 'সমান-সময়-জ্ঞাপক' সূর্য্য-ঘড়িরই মতো। সম-দিবা-রাত্র জ্ঞাপক এই সূর্য্যঘড়ি,—সূর্য্যের মাধ্যন্দিন উচ্চতামাপক একটি ত্রিকোণাকৃতি স্তম্ভ (gnomon)

ও একটি কীলক দ্বারা গঠিত, যার ছায়াপাতে সময় নির্দ্দেশ করা যায়। ইহার কর্ণ (hypotenuse) পৃথিবীর অক্ষরেখার সমান্তরালরূপে অবস্থিত আছে। সূর্য্য দেখে সময় নিরূপণ করার পক্ষে এই সূর্য্যঘড়ি খুবই প্রশস্ত কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন ঘড়ির সঙ্গে এর বিশেষ মিল নেই। পৃথিবীর গ্রহপথ ঠিক বৃত্তাকার নয় ব'লে (eccentricity of earth's orbit), আর ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবমণ্ডলের ধরাতলদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী কোণের (obliquity of the ecliptic) জন্য এরূপ প্রভেদের সৃষ্টি হয়েছে।

এ যন্ত্রের সাহায্যে অন্যান্য নক্ষত্রগুলিরও অবস্থিতির কথা জানতে পারা যায়। এই যন্ত্র জয়পুর ও দিল্লীতে অদ্যাবধি শোভা পাচ্ছে। শেষোক্ত স্থানে ইহার ব্যাস প্রায় ২৭ ফুট ৫ ইঞ্চি হবে।

'রাম-যন্ত্র' Cylinder-এর মতো; তার উপরিভাগ সম্পূর্ণ খোলা আর ঠিক মধ্যভাগে একটা স্তম্ভ আছে। দিঙ্‌মণ্ডল বা আশাংশ (azimuth) আর উচ্চতার অনুশীলন করার জন্য ইহার ভিতরের দেওয়ালে ও মেঝের সমানভাবে খাঁজকাটা আছে। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সম্যক্ প্রণিধান যাতে সহজে হ'তে পারে তার জন্য
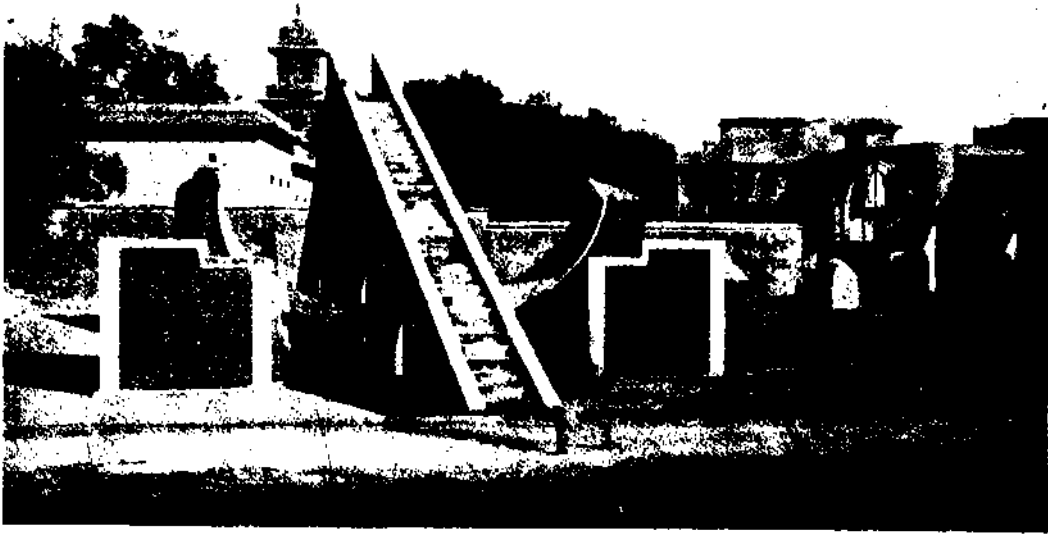
জয়পুরের মানমন্দির—দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ছোট "সম্রাট-যন্ত্রের" দৃশ্য।

জ্যোতিষী জগন্নাথ বলেন, "জয়প্রকাশ" সমুদয় যন্ত্রপাতির শিরোমণি বিশেষ। ইহা একটা গোলার্দ্ধের মত; ইহার বক্রোদর গর্ত্তে (concave side) কতকগুলি লম্বরেখা (co-ordinates) অঙ্কিত আছে। পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে আর উত্তর থেকে দক্ষিণে লম্বমান তারগুলি পরস্পরকে ছেদ করেছে, সেই তারগুলির সংযোগবিন্দু গোলার্দ্ধের উপর ছায়াপাত করে। এরই ফলে, তখন সূর্য্যদেব আকাশের কোন্ স্থানে অবস্থিত আছেন, আমরা তা' জানতে পারি।

দেওয়াল ও মেঝে কতকগুলি বৃত্তখণ্ডে (sectors) বিভক্ত। দিল্লীর রাম-যন্ত্রে এক একটা বৃত্তখণ্ডের জন্য এক একটি প্রাচীর আছে। এরূপ বৃত্তখণ্ডের সংখ্যা ত্রিশটী, প্রত্যেকটী ৬ ডিগ্রি পরিমিত।

"সম্রাট-যন্ত্রের" ১৪০ ফুট উত্তর-পশ্চিমে একটা গৃহ আছে। সেখানে চারটী বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র রক্ষিত আছে ব'লে তার নাম "মিশ্র-যন্ত্র" রাখা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের পরিব্রাজকবৃন্দ অনেকেই এই "যন্তর-মন্তরে"র কথা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন।

একজন ধর্ম্মযাজকের সঙ্গে Father Charles Bouier ১৭৩৪ খৃঃ অব্দে দিল্লীর মান-মন্দিরে শর (latitude) ও ধ্রুবক (longitude) পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে ভন্ অরলিক (Von Orlich) দিল্লী পরিদর্শন কালে এই বৃহৎ মন্দিরের চতুঃপার্শ্বের ধ্বংসাবশেষ দেখে লিখেছেন—এখন পর্য্যন্ত এই জীর্ণকীর্ত্তি ভগ্ন-সৌধটা অতীতের অপরূপ নির্ম্মাণ-কৌশলের সাক্ষ্য প্রদান করছে। তিনি লিখেছেন 'সেই হন। ১৯১০ সালে পুনরায় স্বর্গগত মহারাজ মন্দির সংস্কার করার আদেশ প্রদান করেন। কতকগুলি যন্ত্র নূতন নির্ম্মাণ করা আর মাপযন্ত্রগুলি (scales) পুনরায় খাঁজ কেটে নেওয়ার প্রয়োজন হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এগুলি 'প্লাসটারে' নির্ম্মিত হয়েছিল ব'লে খুব শীঘ্রই ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। খুব সম্ভবতঃ এই সময়েই ইউরোপীয় প্রথায় নির্ম্মিত সূর্য্যঘড়িটা বৃহৎ স্তম্ভের উপর স্থাপন করা হয়েছে।

জয়পুর মানমন্দির — "রাম-যন্ত্র"।

বিশাল সূর্য্যঘড়ি আর তুরীয় যন্ত্র (Quadrant) প্রকাণ্ড বৃত্তখণ্ডের (arc) উপর অবস্থিত আর লাল রঙের পাথর দিয়ে গঠিত হয়েছে—তার উপরিভাগে ওঠবার জন্ত সুন্দর, আঁকা-বাঁকা সিঁড়ি আছে।

এই মানমন্দির কঠোর কাল-প্রবাহের নির্ম্মমতা হ'তে পরিত্রাণ পায় নি। জয়পুর-ষ্টেট দু' দু' বার সৌধের সংস্কার করেছিলেন। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে রাজা স্বয়ং "সম্রাট-যন্ত্র" কিয়ৎ পরিমাণে সংস্কার করতে সক্ষম

নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে, আজ এই সুবিখ্যাত মান-মন্দির শুধু এক পুরুষসিংহের কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে পরিগণিত। যে যন্ত্রপাতিগুলির দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানের অশেষবিধ কল্যাণ সাধন হ'তো, আজ সেগুলি ব্যবহৃত হয় না। জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ্চা কি আজ দিল্লী, জয়পুর এবং বারাণসীতে হয় না? *

* "ইণ্ডিয়ান ষ্টেট রেলওয়ে ম্যাগাজিন" হইতে অনূদিত—লেখক।

গঙ্গৈব পরমা গতিঃ

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

আর্য্য-ঋষির, আর্য্য-সন্তানের, আর্য্য-শাস্ত্রকারের, আর্য্য-সাহিত্যিকের ইহা সনাতন, অমোঘ এবং অভ্রান্ত বাণী; যুগ-যুগান্তর একই কথা। ব্রহ্মার কমণ্ডলু, বিষ্ণুর পদাঙ্গুষ্ঠ ও শঙ্করের জটা, ভগীরথের কীর্ত্তি, ঐরাবতের ভ্রান্তি ও সগর-সন্তানের মুক্তিকাহিনী হিন্দু-মাত্রের মজ্জাগত। গঙ্গাও যা', জগৎও তাই,—যাইতেছে, যাইতেছে, যাইতেছে। গঙ্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী এখন যাত্রায়, গানে, কথায়, পথে, ঘাটে, বাটে, মাঠে, পীঠে মধুর মাহাত্ম্য বিস্তার করে না; কিন্তু এ জড়তান্ত্রিক ও জড়বাদী যুগেও বাল্মীকি, শঙ্কর ও দোরাব খাঁর গাথা কেউ কি ভুলিতে পারে? ভুলিতে কি পারে কেউ গ্রাম্য যাত্রাওয়ালা মতি রায়ের করুণ ক্রন্দন—

> "মরিরে মরি, রে প্রাণকুমার—
> এ দশা মোর কে করিল,
> বিশ্বমাঝে কে আজ আমার
> 'ভীষ্মজননী' নাম ঘোচাল?"

ঐরাবতকে ও জহ্নুমুনিকে যিনি শিখাইবার মত শিখাইয়াছিলেন, তিনিই শান্তনুপত্নীরূপে স্বহস্তে সপ্তশিশুর শিশুলীলা সম্বরণ করাইতে পারিয়াছেন, আর পারিয়াছেন ভীষ্ম-জননী হইতে।

গঙ্গা কোথায়? হুগলীর উভয়পার্শ্বে অসংখ্য কলের 'সেপ্‌টিক্‌ ট্যাঙ্কের' সমল ধারা বহিয়া যিনি বাবুঘাটের নীচে গঙ্গাস্নানের অভিনয় করান — না যিনি 'কাশী গঙ্গা-প্রসাদিনী সভা'র সাহায্যে জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক-পুঙ্গব হাফ্‌কিন ও হ্যানিকিনের সার্টিফিকেট লইয়া উত্তর-বাহিনী পতিতপাবনী — না যিনি গঙ্গোত্রী, গোমুখী, হরিদ্বার ও কনখল ধন্য করিয়াছেন এবং রুড়কীর ও নরোরার কাটিখাল উৎপাত সহ্য করিয়াও "মড়া এলেন না" — না যিনি নরোরার পাথরবাঁধা ড্যামে (Dam) 'ড্যাম্‌ড' (Damned) হইয়া নির্দ্ধারিত সংখ্যক 'কিউএক্স' পরিমাণ "ঝিরঝিরায়মাণ" পয়ঃ-প্রণালীরূপে পড়িয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউ-শনের potencyর মত Dutch কাটাখাল এড়াইয়া সাগর-সঙ্গমে "যোজনানাং শতৈরপি" পাতকী তরান।

সামোনি ডি মণ্ট ব্লাঙ্ক তুষারক্ষেত্রে
স্তর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

'কিউএক্স' কথার বাঙ্গালা অনুবাদ দিতে পারিলাম না। নরোরায় সরকার বাহাদুর পাথরের বাঁধে ঐরাবতের অধিক বাধা দিয়াছেন—দয়াপরবশ হইয়া নরোরার নীচে পতিত-তারণ-প্রয়াসে কয়েকটী ছিদ্র পাথরের প্রাচীরের উপর রাখিয়াছেন, সেই ছিদ্র দিয়া যে মৃদু প্রবাহ প্রবাহিত হয় 'কিউএক্স' পরিমাণে তাহার মাপ-মাত্রা ও সংখ্যা হয়। নীচের জলপ্রণালীর সহিত মিশিয়া তিনি আমাদের পতিতপাবনী নারায়ণী।

সেকথা ভাবেন নাই হেমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল ও দাশরথি; ভাবেন নাই বাল্মীকি, শঙ্কর ও দোরাব—

প্রাণ ভরিয়া গাহিয়াছেন গঙ্গার মহিমা, সে মহিমা স্মরণে পবিত্র ও শক্তিমান্ হইয়া বহু বৎসর ধরিয়া লড়িয়াছিলাম সিমলা, দিল্লী, 'লেজিসলেটিভ এসেম্বলী'তে ও 'কাউন্সেল অব্ ষ্টেটে'—চাহিয়াছিলাম, "হে প্রবল-প্রতাপ P. W. D.—হে White Elephant ঐরাবত—আর দুই চারি 'কিউএক্স' গণ্ডূষ—পিতৃপিতামহের তর্পণার্থে দয়া করিয়া দাও"। কিছুতেই কিছু হইল না — ভীষণ আপত্তি উঠিল, খৃষ্টীয়ানের পক্ষ হইতে নয়, মুসলমানের পক্ষ হইতে নয় — উঠিল আপত্তি সনাতন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ভূম্যধিকারীর পক্ষ হইতে। হরিদ্বার ও নরোরা হইতে খাল পুরিয়া গঙ্গাজল না পাইলে তাহাদের চাষের, আয়ের ও খাজনার ক্ষতি হইবে। বর্ণাশ্রমী সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীর জয়জয়কার হইল, আর হারিলাম আমরা। দুগ্ধপ্রয়াসী অশ্বত্থামার পিটুলি-গোলা জলে পিপাসা-নিবৃত্তির মত—নরোরার নীচে খাল, বিল, নর্দ্দামা, শাখানদী ও উপনদীর মিশ্রজল পাইয়া গঙ্গাজলের ক্ষোভ মিটাইতে হইল; কলির ভগীরথ জেনারেল উইলকক্সের তীব্র প্রতিবাদেও প্রতীকার হইল না। মহামহোপাধ্যায় হিন্দুপণ্ডিত "ভাঁস" দিলেন যে, শত কলে 'সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের' জলে গঙ্গা-মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না, পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে। হবেও বা তাই!

যাঁহাদের বিল্বদল ও গঙ্গাজল মাত্র দেবীপূজার একমাত্র ভরসা, তাঁহারা প্রবলপ্রতাপ ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কি করিতে পারেন? মাথা পাতিয়া White Elephant ঐরাবতের প্রভাব স্বীকার করিয়া লইতে হয়। বহুদিন তাহা করিয়াছেন, গত মাসেও তাহা করিলেন—বহু বৎসর ধরিয়া তাহা করিবেন। অলকনন্দাতীর-চারী দিব্য-দ্যুতিমান্ দল চেষ্টাও করেন না বুঝিতে — স্বর্গঙ্গা ভগীরথের তপস্যা-ফলে মর্ত্ত্যে কিরূপে আসিলেন। গঙ্গা, নদীমাতৃকা ভারতবর্ষে "পুণ্যপীযূষস্তন্যদায়িনী" জননী নহেন, ইনি আসিয়াছেন স্বর্গ হইতে অর্থাৎ প্রচলিত, প্রচারিত ও প্রকাশিত 'ভারতবর্ষের' বাহিরে কোনও অজ্ঞাত অত্যুন্নত প্রদেশ হইতে। একথা শাস্ত্রকারের কল্পনামাত্র নয়, কবিকাহিনী নয় — "স্বপন" নয় — "অলীক" নয়। ইহা সার, কঠোর ও প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক সত্য। মহামায়ার আগমনের সময়ে ভক্তিভরে বিল্বদল সহ গঙ্গাজল প্রদানের প্রাক্কালে এই কথা মনে হইয়াছিল; সুতরাং ইহার কিছু আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ঠাকুরমা ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভারত 'দ্বীপের' কথা উত্থাপন করিলে হাসিয়া গড়াগড়ি দিতাম, কারণ প্রাথমিক ভূগোলে ও কঙ্কাল-মানচিত্রে (skeleton map) প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল।

পঞ্জিকাকার যখন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের বয়সের কোষ্ঠীপাত করিতেন, আমরা করিতাম পঞ্জিকাকারের গোষ্ঠীর মুণ্ডপাত, কারণ ধর্ম্মগ্রন্থ-বিশেষে পড়িয়াছিলাম, ধ্রুব নিশ্চিত করিয়াছিলাম যে, ভগবান্ ছয় দিনে জগৎ সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। এ মাহাত্ম্য যাঁহারা প্রচার করিতেন তাঁহাদেরই কেহ কেহ আবার যখন Geological age ও Astronomical age সম্বন্ধে "চক্ষুরুন্মীলিত" করিলেন — লক্ষ লক্ষ নয় — কোটী কোটী বৎসরের উল্লেখ করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক জনকে — ক্যাথলিক পাদরীপুঙ্গব ও বৈজ্ঞানিকপ্রধান, ফাদার লাফোঁকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "যাঁহারা ছয়দিনে জগৎ সৃষ্টি ও সপ্তম দিনে বিশ্রাম কাহিনী ধর্ম্মগ্রন্থে ঘোষণা করেন, সেই নিঃশ্বাসে তাঁহারা জগৎ, আকাশ প্রভৃতি গঠন লক্ষ কেন কোটীবর্ষসাধ্য বিজ্ঞানের সত্যানুরোধে বিশ্বাস ও ঘোষণা করেন কিরূপে?" উত্তর হইল, "ভগবৎ ইচ্ছায় সবই সম্ভব।" ভাল—সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ব্রহ্মার "মুহূর্ত্তের" পরিমাণের কথা পাদ্রী সাহেবের জানা ছিল না। বরফের পাহাড়ের নিম্নে প্রাপ্ত ছয় লক্ষ বৎসর বয়স্ক ডাইনোসোরাস নামক অতিকায় জীবের মাংস, ইজিপ্ট দেশীয় মামীর (Mummy) গাত্রবস্ত্রের অভ্যন্তর হইতে প্রাপ্ত গমের চাষ করিয়া সেই চাষের গমের রুটি, এবং ভিসুবিয়াস্ অগ্ন্যুৎপাতের ভস্মরাশির নিম্ন হইতে প্রাপ্ত

সুরক্ষিত সুরা প্রভৃতির সংযোগে এক খেয়ালী ধনকুবের বান্ধবগোষ্ঠীকে এরোপ্লেনে চড়াইয়া পান-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া পরম ধন্য হইয়াছিলেন ; ভোজের সময় ছয় লক্ষ বৎসর — ছয় হাজার বৎসর ও দুই হাজার বৎসরের পার্থক্য তিরোহিত হইয়াছিল, কারণ "কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ"।

"ভারতদ্বীপ" কথার মূলে নিহিত গভীর তথ্যের তলে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক-সত্য বহুদিন তাপস-মনে সঞ্চারিত ; অভাব ছিল শুধু সাধারণ মানব-জ্ঞান-গোচর প্রামাণিকতার। হুকার (Hooker) প্রভৃতি হিমালয়ের উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ হিমাচল-শিখরে সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল পাইয়া প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করিয়া অমর হইয়াছেন, সে প্রমাণপ্রয়োগ জড়বাদমতে এখন সম্পূর্ণ।

১। স্যার আরনেষ্ট বার্কার
২। স্যার রে ল্যাঙ্কাষ্টার
৩। স্যার এস্ জনষ্টন
৪। প্রোফেসর গিলবার্ট মারে

প্রভৃতি আধুনিক বিশ্ববৈজ্ঞানিক ও মহাজ্ঞানিগণের সহায়তায় প্রসিদ্ধ লেখক এইচ্, জি, ওয়েলস্ মহোদয় তাঁহার "সভ্যতার ইতিহাস" নামক উপাদেয় গ্রন্থে ভারতবর্ষের উত্তরে মহাসমুদ্রের পরিকল্পনা করিয়া মানচিত্রে সংযোজন করিয়াছেন। কে জানে মৈনাক-সাহায্যে সমুদ্রমন্থন — এই মহাসমুদ্রেই হইয়াছিল কিনা ? ওয়েলস সাহেব কল্পনাপ্রসূত এবং সমাজদর্শন সম্বন্ধীয় পুস্তক লিখিয়াই খ্যাতি লাভ করেন নাই — এবিষয়েও তাঁহার কৃতিত্ব প্রভূত। উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক চতুষ্টয় তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন ও সার্টিফিকেটও দিয়াছেন। মহাসমুদ্র-গর্ভসম্ভূত নবীন হিমাচল ক্রমে সেই সমুদ্রের স্থান গ্রাস করিলেন—তুঙ্গতম অভ্রের গৌরীশৃঙ্গ আজ তাহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। শিবের দুই বিবাহই হিমাচলের জন্মের অবশ্য অনেক পরে। পর্ব্বত-গোষ্ঠীপতি বিন্ধ্যগিরি ছিলেন এককালে গৌরীশৃঙ্গ হইতেও উচ্চতর এবং জড়বাদী প্রাচীনতর বৈজ্ঞানিক অকাট্য প্রমাণ দিতেছেন যে, বিন্ধ্যাচল, একদিন হিমাচল অপেক্ষাও বহু উচ্চ ছিল। অগস্ত্যযাত্রার প্রামাণিকতার আর বাকি রহিল কি ?

সাহারা মরুভূমিতে সাগরসঙ্গম ও ভূমধ্যসাগরে মরুভূমি-সঞ্চার, আটলান্টিক মহাসাগরে প্রকাণ্ড মহাদেশ নিমজ্জন এখন বৈজ্ঞানিকের নিকট প্রমাণিত সত্য।

ওয়েলস্-প্রবর্ত্তিত মানচিত্রের বহু পরে কথা উঠিয়াছে যে, গঙ্গা ভারতের নদী নহেন, ইনি আসিয়াছেন সুদূর বিদেশ হইতে ; তাহা হিমাচল ও হিমাচল প্রদেশের বহু উত্তরে। এইখানেই পৌরাণিক কাহিনী—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-কাহিনীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যে সকল অদম্য পর্ব্বতবিহারী, পার্ব্বত্যতথ্যকুশল বৈজ্ঞানিকগণ হিমালয়ের বহু উত্তরে ও গঙ্গোত্রীর বহু উত্তরে কারাকোরা প্রভৃতি তুষারক্ষেত্রের বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রামাণিক সাক্ষী।

ইঁহাদের অন্যতম ভারতে ডাচ-রাজদূত মহামতি PH. C. Visser মধ্য-এসিয়ার কারাকোরা নামক প্রসিদ্ধ তুষার-পর্ব্বত সস্ত্রীক আরোহণ ও ভ্রমণান্তে এক অতি উপাদেয় সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সেই সকল তথ্য বিবৃত করিয়া ছায়াচিত্র সাহায্যে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ষ্ট্রীট Y. M. C. A. প্রভৃতি স্থানকয়েকটীতে মনোজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষোক্ত বক্তৃতার সময় সভাপতিত্বের গৌরব আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। এ গৌরব লাভের মূল কারণ অতি তুচ্ছ ; "লীগ অফ নেশনস্"-এ (রাষ্ট্রীয় মহাসভায়) ভারতবর্ষের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে ১৯৩০ সালে Geneva গমন করিয়াছিলাম, তদুপলক্ষে Swiss Alps পর্ব্বতের কোন কোন স্থানে ভ্রমণ করিয়া নয়ন-মন সার্থক হইয়াছিল। সামোনি ডি মণ্ট ব্লাঙ্ক নামক তুঙ্গ তুষারক্ষেত্রে গমন করিয়া উত্তর-হিমাচলের তুষারক্ষেত্র অদর্শনরূপ মহাপাতকের কথঞ্চিত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলাম। অতএব তুষারক্ষেত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার দাবী যৎসামান্য কিছু ছিল। সে ভ্রমণ-কাহিনী

'পঞ্চপুষ্প' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, পরে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই দাবীর অজুহাতে ভিসার সাহেবের অপূর্ব্ব বক্তৃতা-সভায় সভাপতিত্বের অধিকার পাইয়াছিলাম।

সভার কার্য্যশেষে আমার প্রশ্নের উত্তরে বৈজ্ঞানিক ভিসার মহাশয় বলেন যে, গঙ্গা, সিন্ধু (পঞ্চনদ) ও ব্রহ্মপুত্র কোনটীই খাস ভারতবর্ষের নদ-নদী নহেন। ভারতের বাহিরে বহু উঁচুতে উৎপন্ন হইতে তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

কথাটা পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য আমি ভিসার সাহেবকে এক পত্র লিখি। সেই পত্রের অনুবাদ নিম্নে দিলাম—

২০নং সুরি লেন, কলিকাতা
৭ই এপ্রিল, ১৯৩৬।

আশা করি, শ্রীমতী ভিসার ও আপনি নিরাপদে বোম্বাই পৌঁছিয়াছেন এবং তথাকার জলবায়ু কলিকাতার অপেক্ষা ভাল বোধ হইতেছে।

Y. M. C. Aতে ছায়াচিত্র অবলম্বনে আপনার শেষ বক্তৃতার সময় আমার প্রশ্নের উত্তরে সাধারণ ভাবে আপনি যে তথ্য বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে আমার ও আমার কয়েক জন শিক্ষিত বন্ধুর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে — ঐ বিষয়ে আমরা একটু বেশী করিয়া আলোচনা করিতে চাই এবং সেই জন্য ঐ সম্বন্ধে আপনার সঠিক মতামত লইয়া নিঃসন্দেহ হইতে চাই। আমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম ও যে উত্তর শুনিয়াছিলাম তাহার পুনরুক্তি করিতেছি—কৃপা করিয়া সমর্থন বা সংশোধন করিবেন।

কারাকোরা তুষারক্ষেত্রের (যাহার জীবন্ত বর্ণনা আপনার নিকট শুনিয়াছিলাম) সহিত আমাদের উত্তর-ভারতের মহানদীগুলির সম্বন্ধ কি — এই প্রশ্নের উত্তরে বুঝিয়াছিলাম যে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র (উপনদী সহ সিন্ধু ও যমুনার উল্লেখ করিয়াছিলেন কি না, তাহা ঠিক স্মরণ নাই) প্রভৃতি নদীরই কারাকোরা তুষারক্ষেত্রে উৎপত্তি এবং ঐ নদীগুলিই হিমালয় অপেক্ষা প্রাচীন। আপনি আরও বলিয়াছিলেন যে, হিমাচল পর্ব্বত-শ্রেণীর উচ্চতার বৃদ্ধির সহিত কারাকোরা তুষার-ক্ষেত্রের উচ্চতাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সভাপতিরূপে আমার অভিভাষণের শেষাংশে আমি রে ল্যাঙ্কাষ্টার এবং আরনেষ্ট বার্কারের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান-বিদ্‌দিগের অভিমত সহ এখন যেখানে হিমাচল অবস্থিত তথায় ৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহাসমুদ্র ছিল—এই কথা যাহা এচ্, জি, ওয়েল্‌স বলিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আপনার ও শ্রোতৃবৃন্দের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম। আমি আপনাদিগকে আরও বলিয়াছিলাম — আমাদের শৈশবাবস্থায় আমাদিগের শাস্ত্রকার ও পিতামহীগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষকে ভারত দ্বীপ বলিয়া বর্ণনা ও পৃথিবীর উৎপত্তি সামান্য ৬ হাজার বৎসর না হইয়া কয়েক লক্ষ বৎসর হওয়ার কথা, এবং গঙ্গার স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অবতরণ সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে যে উক্তি আছে অর্থাৎ পুরাকালে পূর্ব্বপুরুষগণের মুক্তি-কামনায় অবর্ণনীয় বহু বাধা অতিক্রম করিয়া — ভগীরথের উগ্র তপের ফলস্বরূপ স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে ভাগীরথীর অবতরণকথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে শিখিয়াছিলাম।

উক্ত বিষয় ও আপনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা একত্র বিচার করিলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রতিপন্ন হয় —

(১) হিমাচলের উদ্ভবের পূর্ব্বে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উদ্ভব।

(২) হিমাচলের উৎপত্তির পর, উদ্ভবস্থান হইতে অবতরণ জন্য হিমাচল, সেতু বা পয়ঃপ্রণালীরূপে সহায়ক হইলে ঐ মহানদীগুলি হিমাচলের উত্তরস্থিত তুষারক্ষেত্র হইতে ভারতদ্বীপে অবতরণ করিয়াছিলেন।

এই দুইটী তথ্য হইতে যে রোমাঞ্চকর ও বিস্ময়-জনক মহান্ সত্য স্পষ্ট হইবে তাহা অনুসরণ করা আপনার ন্যায় ব্যক্তিরই যোগ্য, সুতরাং বোম্বায়ে কিছু দিন অবস্থান ও বিশ্রামের পর আপনার অবসর মত কৃপা করিয়া জানাইবেন—আপনার উপরোক্ত

উক্তি — আমি ঠিক বুঝিয়াছিলাম কি না — এবিষয়ে আপনি আমার উল্লিখিত বর্ণনার সমর্থন বা সংশোধন করিবেন।

আপনার অভিযান সম্বন্ধে আপনার পুস্তকখানি বাহির হইলে আমি অতি সাধারণ ভাবে উহা দেখিয়াছি — আমি, এই বিশিষ্ট তথ্যের কথা উহাতে বিস্তৃতভাবে আছে কি না, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিব। তবে আমার মনে হয়, এ সম্বন্ধে আমার আগ্রহ চরিতার্থ হইবে না; কারণ আমার প্রশ্ন একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল এবং তাহার উত্তরে আপনার বিবৃতি অদ্ভুত ও যুগান্তকারী — তাহা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণিত হইয়া গৃহীত হইতে পারিবে।

আপনাকে এই অযাচিত কষ্ট দিবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

এই সময়ে ভিসার সাহেব বোম্বে সহরে বদলী হইয়াছেন, পত্রের উত্তর পাইতে বহু বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার উক্তি "ডাচ ধাঁসা" বলিয়া কিছু সন্দেহ না হইল তাহা নয়। আমি যে সকল সহকর্ম্মীর সহিত এ বিষয় লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিতাম, তাঁহারাও এই সন্দেহ পোষণ করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই সে সন্দেহ নিরাকৃত হইল। ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া সিমলা হইতে শ্রীযুক্ত ভিসার আমাকে পত্র লেখেন, তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল —

সিমলা

৩০-এ জুন, ১৯৩৩

প্রিয় স্যর দেবপ্রসাদ,

আমি বিশেষ ব্যস্ত থাকায় ও নানাস্থানে যাওয়ায় আপনার ৭ই এপ্রিল তারিখের পত্রের উত্তর যথা সময়ে দিতে পারি নাই। আপনার পত্র আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি।

উত্তর-ভারতের মহানদীগুলির সম্বন্ধ বিষয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি সরাসরিভাবে বলিয়াছিলাম যে, গঙ্গা অথবা সিন্ধুনদ কিংবা ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হিমালয়ে নয় — তাহার বহু উত্তরে পর্ব্বতশ্রেণীতে।

ওয়েলস্ ও অন্যান্য মনীষিগণ যাহা বলিয়াছেন অর্থাৎ আজ যেখানে হিমগিরি উচ্চশিরে অবস্থিত, তথায় মহাসমুদ্র বিরাজিত ছিল, তাহা ধ্রুবসত্য — তবে তফাৎ এই যে, উহা ৫০ হাজার বৎসরের কথা নয়, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

এইবার নদী-সমস্যা। উল্লিখিত নদনদীগুলিই আংশিক ভাবে বৃহৎ বৃহৎ গিরিপথ অবলম্বনে হিমাচল ভেদ করিয়া আসিয়াছে। সাধারণতঃ কোন নদীই পর্ব্বত ভেদ করিয়া আসে না — বেষ্টন করিয়াই যায় — যেহেতু তাহাই সহজ ও সুগম পথ। উল্লিখিত তিনটী মহানদীর গতির হেতুনির্দ্দেশের আমাদের একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে, হিমাচলের উত্তরে অবস্থিত পর্ব্বতরাজি হিমাচল অপেক্ষা প্রাচীন। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যখন উল্লিখিত নদীগুলি বহু উত্তরের পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উদ্ভূত হইয়া নিম্নে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া সাগরে পতিত হইয়াছিল, তখন সমগ্র হিমাচলপর্ব্বতরাজি সমুদ্রগর্ভে মগ্ন ছিল — পরে হিমগিরি ধীরে ধীরে সমুদ্র হইতে উত্থিত হয়।

কালের আদি হইতেই নদীগুলি নবোদ্ভূত দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। তবে আপনাকে ধরিয়া লইতে হইবে যে, ঐ ভূখণ্ডের উচ্চতা-বৃদ্ধি হিমালয়ের সৃষ্টির পরে ধীরে — অতি ধীরে এরূপ ভাবে হইতেছিল যে, ঐ নদীগুলি নবোদ্ভূত অধিত্যকা লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া, বিদীর্ণ করিয়া তাহাদের গর্ভদেশ এবং নদীবাহী গিরিপথগুলি ঐ সময় গভীর হইতে গভীরতর ও অধিত্যকা উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকিল।

হয়ত হিমগিরির উচ্চতা এখনও বাড়িতেছে — যদিও ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত নহে।

পুরাকালের অবস্থা পর্য্যালোচনায় মনে হয়, ভারতবর্ষ দ্বীপ ছিল না — আফ্রিকার সহিত একত্র এক প্রকাণ্ড মহাদেশ ছিল — ইহা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে

প্রমাণিত হইতে পারে, এবং ইহার ব্যাখ্যা ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সমস্ত পুস্তকেই পাওয়া যায়।

ভিদার

সন্দেহের বা অবিশ্বাসের লেশমাত্র স্থান রহিল না। বিশিষ্ট বিশ্ববৈজ্ঞানিক-প্রমাণিত H. G. Wells প্রকাশিত তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে কেহ কোন সন্দেহের কথা এখনও তোলেন নাই। যখন মধ্য এশিয়ার ও ভারতবর্ষের মধ্যবর্ত্তী মহাসমুদ্রগর্ভ ভরাট হইয়া নবীন হিমাচল গঠন আরম্ভ হইয়াছে অথচ সম্পূর্ণ হয় নাই, প্রাগৈতিহাসিক সেই কোন্ অজ্ঞাত যুগের ভারতের গঙ্গাবতরণ, কোন্ বিশিষ্ট শিল্পী মহাবতরণের চিত্র কল্পনার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু এ ক্ষেত্রে কল্পনা সম্পূর্ণ পরাভূত। মহাবতরণের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছে—আর প্রয়োজন হইয়াছে — ত্যাগী পিতৃপিতামহের বিশিষ্ট অনুরাগী অদ্ভুত শিল্পকুশল রাজপুত্র ভগীরথের নির্ম্মাণ-চেষ্টা ও অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়।

এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা বৈজ্ঞানিকগণের সাহায্যে এবং বৈজ্ঞানিক প্রথামত যতই অগ্রসর হইতেছে ততই বিস্ময়কর নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইতেছে। সম্প্রতি স্বেন হেডিন (Sven Hedin) ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ চায়না ও সুইডিস গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত ৬ বৎসরব্যাপী বৈজ্ঞানিক অভিযানের ফলে মধ্য-এসিয়া এবং তিব্বতের উত্তর-ভূভাগ সম্বন্ধে যে সকল ভৌগোলিক ও ভূতত্ত্ব-বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অতি বিস্ময়কর, এই অভিযানের বর্ণনা হইতে জানা যায় —

Dr. Norin made a special study of the glaciers which filled a large part of Tibet and the valleys of the Karakorum in the Ice Age. These glaciers slowly melted into the Tarim Basin forming a great inland sea which dwindled in the course of thousands of years. The sea left beach lines, some of them high up on the hill side traceable for hundreds of miles.

অর্থাৎ তুষারযুগে কারাকোরাম অধিত্যকা ও তিব্বতের বহু অংশ যে তুষারক্ষেত্রাবৃত ছিল সে সম্বন্ধে ডাঃ নরিন বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এই তুষারক্ষেত্রগুলি ধীরে ধীরে গলিয়া গিয়া তারিম নিম্নভূমিতে পড়িয়া এক বৃহৎ ভূমধ্যসাগরের সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং উহা সহস্র সহস্র বৎসরে লোপ পাইয়াছিল। শত শত মাইলব্যাপী সেই সমুদ্র-উপকূলের বহু চিহ্ন উচ্চে পর্ব্বতগাত্রে এখনও পরিদৃশ্যমান।

আরও জানা যায় যে—

Dr. Boblin found numerous fossils of dinosaurs, fish, insects and plants dating from the mesozoic period over 20,000,000 years ago অর্থাৎ ডাক্তার ববলিন ডিনসর, মৎস্য, কীট, পতঙ্গাদি ও উদ্ভিদের ভূগর্ভনিহিত প্রস্তরীভূত কঙ্কাল পাইয়াছেন, তাহা দুই কোটী বৎসরেরও অধিক বয়স্ক।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ স্যার জেমস্ জিনস্ ও জর্জ্জ ডরবস্ "Space-time", "Continuum", "World-line" প্রভৃতি বিষয়ক নব প্রচারিত জ্যোতিষতত্ত্বের সাহায্যে কোটীবর্ষাধিকব্যাপী সৃষ্টিতথ্যের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ইনস্‌ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়ের নব ভূতত্ত্ব-শাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপক সাণ্ডার সাহেব সুগভীর গবেষণার ফলে স্থির করিয়াছেন, যে কোন প্রস্তর-খণ্ড চূর্ণাদপি চূর্ণ হইয়া তাহার বয়সের সঠিক পরিচয় দিতে বাধ্য। জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে প্রকৃতি কোন গুহ্য রহস্য চিরদিন গোপন করিতে পারেন না। অধ্যাপক সাণ্ডারের "পাথুরে" প্রমাণ সাধারণ প্রত্নতাত্ত্বিকের "পাথুরে" প্রমাণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে প্রামাণিক।

এ সকল কথাই ঠাকুর মা ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের কথার সমর্থন করিতেছে।

পাথর

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিখিলের ব্যথা করেছে সৃষ্টি মোর।
হারানো শিশুরে খুঁজিয়া না পেয়ে মাতার আঁখির লোর
হঠাৎ জমিয়া কঠিন হয়েছে, করেছে সৃষ্টি মোর,
পাথর, আমি পাথর।

যুগযুগান্ত নিষ্পেষণের নিঠুর ব্যথার ভারে
নিঙাড়ি' পরাণ পথিকের দল চ'লে গেছে সারে সারে।
আঁকড়ি' রেখেছি সে নিঠুর ব্যথা—তপতার বুকে মোর,
পাথর, আমি পাথর।

নিবে গেছে যার খেয়ানের আলো হারায়ে পথের সাথী,
প্রভাত অরুণ আলোকে দলেছে ভীমা ঘন কালো রাতি।
(সেই) তরুণ প্রাণের হাহাকার লয়ে রচনা হয়েছে মোর,
পাথর, আমি পাথর।

ঘন বেদনার ভাষাহীন সব কথা,
শত অবিচার, অশ্রু-উছল ব্যথা,
উদ্বেল করি' ধরণীর হিয়া করেছে সৃষ্টি মোর,
পাথর, আমি পাথর।

আমি বিদ্রোহী, ব্যথা-বিদ্রোহী আমি।
মোর ব্যথা গলে ধরণীর বুকে নামি'
মিথ্যারে দহে তার ছাই লয়ে ভরিবে দিগম্বর।
পাথর, আমি পাথর॥

পত্র-পরিচিতা

শ্রীমতী আশালতা দেবী

মাথার উপর ফ্যান্ ঘুরচে। ঘরের মাঝখানে একটা এলোমেলো বড় টেবিল। টেবিলের উপর একটা খাতাভর্ত্তি বি-এ ম্যাথামেটিক্স অনার্সের লম্বা লম্বা অঙ্ক কষা রয়েচে। পাখার হাওয়ায় তার পাতাগুলো ফর্ ফর্ ক'রে উড়চে। একটা সেতার এবং একটা এস্রাজ পাশাপাশি শুইয়ে রাখা। গোটাকতক পানামা ব্লেড্; বুক্ কোম্পানীর একটা বইয়ের ক্যাটালগ্; ফটোগ্রাফের গুটি দুই নেগেটিভ প্লেট; একখানা উপন্যাস; কাঁচের প্লেটে একরাশ চাঁপা ফুল; ডিমের খোলে বড় বড় ক'রে কাটা সুপুরি ও এলাচ — মোটের উপরে সে টেবিলে নাই, হেন জিনিষ বোধ করি আবিষ্কার করা যায় না। এই ঘর এবং এই টেবিলের অধিকারিণী, উর্ম্মিলা দেবী মনোযোগ দিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে একটা অঙ্ক কষচে। মাঝখানে একবার মুখ তুলে ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বাইরের চাঁপা গাছটার দিকে চাইলে। খুব শক্ত অঙ্ক; চট্ ক'রে হচ্ছে না। এবং হচ্ছে না ব'লেই অঙ্কের মাদকতা এবং উর্ম্মিলার উত্তেজনা ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছে। টেবিলের উপর থেকে একটা পানামা ব্লেড তুলে নিয়ে ও পেন্সিলের মুখটা আরও সরু··· সরু থেকে নিবিড়তম সূক্ষ্ম ক'রে কাটলে। কেননা, পেন্সিলের মুখটা মনেরই প্রতীক। ওকে যদি সূক্ষ্মতম করা যায়, বুদ্ধির মুখও ধারাল হ'য়ে উঠবে। যাক্; আরও মিনিট পনেরো পরে অঙ্কটা শেষ হ'য়ে গেল।' কী আনন্দ! কবির রুদ্ধ কল্পনার স্রোতোবেগকে মুক্তি দিয়ে, তিনি যখন সম্পূর্ণ একটি কবিতা সৃষ্টি ক'রে তোলেন; শক্ত অঙ্ক অনেক ভেবে ভেবে, একটার পর আর একটা বাধাকে দূর ক'রে যেতে যেতে, অবশেষে হ'য়ে যাওয়ার পরে ··· উর্ম্মিলার আনন্দ এখন সেই আনন্দেরই সমান। এমন মুহূর্ত্তে সবচেয়ে ইচ্ছে করে এক পেয়ালা চা খেতে। রুপুকে ডেকে এক পেয়ালা চায়ের ফরমায়েস দিয়ে, ও সেতারটা তুলে নিয়ে টুং টাং করতে লাগল। হঠাৎ নজরে পড়ল টেবিলের উপরে সুমুখেই রাখা ফিকে ফিরোজা রঙের এক পুরু খাম। চিঠি···আজকের ডাকেই এসেছে··· অঙ্কটা নিয়ে ডুবে থাকায় খেয়াল হয়নি খুলে পড়তে। খামের উপরকার ঠিকানা লেখা দেখেই ও বুঝতে পারলে···এ নির্ম্মলের চিঠি। নির্ম্মল···নির্ম্মল···! নির্ম্মলের কথা মনে পড়তেই ওর হাসি পেল। বেচারা কী বোকা! মেয়েদের প্রকৃতিকে আজও বুঝতে পারলে না। কল্পনা করতে চেষ্টা করা যাক্, এই মুহূর্ত্তে সে, তার কলকাতার বাসায় কী করচে। উর্ম্মিলার কথা ভাবচে···সেটা উর্ম্মিলা ধ'রেই নিলে। বলতে পারেন—এটা তার বাড়াবাড়ি; নিজের ইনটুইশনের উপর অতিবিশ্বাসের ফল। কিন্তু বললেও ক্ষতি নেই। উর্ম্মিলা জানে এসব ক্ষেত্রে নিজের অন্তর্দৃষ্টি যা' বলে, তাই ঠিক হয়। লোকের বলাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু তা' মনে ক'রে ত ওর হাসি পায় নি। নির্ম্মল যা' খুসী ভাবতে পারে, তা'তে কী যায় আসে! কিন্তু ওর হাসি পাচ্ছিল, নির্ম্মল যখন ওর কথা ভাবে, তখন ওকে কেমন ক'রে, কী অবস্থায়, কী ব্যাক-গ্রাউণ্ডে রেখে ভাবে···তাই মনে ক'রে। নির্ম্মল ভাবচে: উর্ম্মিলা করতলের উপর একটি হাত রেখে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি গঙ্গার দৃশ্যের দিকে মেলে দিয়েচে। আনমনা···চিন্তাবিষ্টা। মাথার চুল খোলা; অসংবদ্ধ কেশপাশ, আদর ক'রে ওর বাহুতে, বাহু ছাড়িয়ে পিঠের উপরে এবং কপাল বেয়ে চোখের ভ্রূলতার পাশ দিয়ে, আরক্ত গণ্ডদুটির উপর লুটিয়ে পড়েচে। হাতে কী? ··· বোধহয় রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কিংবা বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সেই 'A Free Man's Worship' প্রবন্ধখানি। কারণ এই রকম ক'রে ভাববার অবসরই যে তাকে উর্ম্মিলা দিয়েচে। গত চিঠিতেই ত বোধ করি সে জানিয়েচে: রাসেলের উপরোক্ত প্রবন্ধখানি যেন

একটি ফুল-ফোটানো প্রবন্ধ। তা' যেন প্রবন্ধ নয়—কবিতা। রুপু চা নিয়ে এসেচে। ছু' এক চুমুক খেয়েই ও তীব্রস্বরে বললে: 'জানো না রুপু তুমি যে, আমি ট্রং চা খাই!' রুপু নতমুখে দাঁড়িয়ে, কী একটা বলবার উপক্রম করতেই, 'জানো না? কবে জানবে তা' হ'লে? একযুগ ধ'রে চা করচ। ওয়ার্থলেস্, ফুল কোথাকার'। রুপু ভয়ে ভয়ে পর্দার আড়ালে স'রে গেল। আরাম ক'রে ধীরে সুস্থে ফের চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে, নির্ম্মলের লেখা ফিকে ফিরোজা রঙের খামের চিঠিটা হাতে নিয়ে, নাড়াচাড়া করতে করতে ওর আবার হাসি পেল! হায় রে নির্ম্মল! তুমি যদি এই মুহূর্ত্তে দেখতে পেতে, ঊর্ম্মিলা কী রকম প্র্যাক্টিক্যাল মেয়ে, চায়ের পেয়ালায় স্বাদের একটু ইতর-বিশেষ হ'লেই ও কেমন ক'রে ধৈর্য্য হারায়। এইমাত্র চাকরটা ওর খাম-পোষ্টকার্ড কিনে নিয়ে এসে ফেরত পয়সা ছুটো দিতে যেন ইচ্ছে ক'রেই ভুলে গিয়েছিল, ঊর্ম্মিলা তাকে এমন তাড়া দিলে। নির্ম্মলের সঙ্গে ওর আলাপ হয়েছে মাস ছুয়েক আগে। তা-ও মোটে চিঠিতে। কিন্তু এই চিঠির আলাপই, মাস ছুয়েকের ভিতরে এত দ্রুত, এত ঘন হ'য়ে উঠেচে যে, মামুলী মুখোমুখি চলতি আলাপ হ'লে এইটুকু দাঁড়াতেই হয়ত বা দু'বছর লাগত। হয়ত তা-ও হোত না। কলেজের ছুটির লম্বা ফাঁকে, বিশেষ ক'রে এইবারে আই-এ দিয়ে থার্ড ইয়ারে উঠবার দীর্ঘ ছুটির অবসরে, ঊর্ম্মিলা অনেক কিছু করলে: দাবা খেললে, রেস্-কোর্সের মাঠে ওদের টু-সিটারটা নিয়ে যেয়ে, মোটর ড্রাইভ করতে শিখলে। 'বঙ্গলক্ষ্মী' প'ড়ে অতীতের আল্পনা-কলাকে পুনরুজ্জীবিত করতে, ঘরের মেঝেতে ভাত খাবার পিঁড়ীতে, ময়দা বেলবার চাকিতে যেখানে খুসী আল্পনা আঁকলে। কিন্তু কিছুতেই দীর্ঘ দিন কাটে না। অবশেষে লিখে ফেললে গুটি ছুইতিন গল্প এবং আধ-খাতা কবিতা। ওর এখানকার পরিচিত ভক্তমণ্ডলী প'ড়ে বললে: 'বাঃ খাসা হয়েচে, কিন্তু এসব শুধু আমাদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখলে চলবে না। এমন বস্তু থেকে বাঙলা দেশের বৃহৎ পাঠক-মণ্ডলীকে বঞ্চিত রাখলে, তাদের প্রতি যারপরনাই অবিচার করা হয়।' ঊর্ম্মিলা কী একটা মৃদু প্রতিবাদ করতেই তারা সশব্দে টেবিলে চড় মেরে বললে: 'রেখে দিন আপনার ওসব ব্যক্তিগত সঙ্কোচ। বুঝতে পারচেন না, এগুলো প্রকাশ করা আমাদের একটা ইম্পার্সোন্যাল কর্ত্তব্য।' কর্ত্তব্যের নিশানা সম্বন্ধে ঊর্ম্মিলা আরও তর্ক করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ওরা শুনলে না। সে সমস্ত প্রকাশ হোল। না—সত্যিই ঊর্ম্মিলা ভালো লেখে। তার একখানা লেখাও কোন সম্পাদক ফিরিয়ে দিলে না। তারপর ওরও নেশা লেগে গেল, এবং শক্ত শক্ত আজ কথার ফাঁকে ওর কাউন্টেনের মুখ থেকে গল্প এবং কবিতা বার হ'তে লাগল। বলতেই হবে, অসম্ভব কথার মত শোনাচে: নানা মাসিক পত্রের অফিসের মারফত, ওর কাছে দু'একজন ভক্তের চিঠি আনাগোনা করতে সুরু করলে। একজন রিপ্লাই কার্ডে আপন ঠিকানা দিয়ে প্রশ্ন ক'রে পাঠালে, 'আচ্ছা—আপনার অমুক গল্পে প্রবোধ যে নিঃসঙ্গতার ধ্যান করচে, সে ধ্যান কার? এর উত্তর গল্পে আপনি সযত্নে এড়িয়ে গেচেন।' যদি দয়া ক'রে চিঠিতে জানান, খুসী হব।' ঊর্ম্মিলা একটু হেসে ফেলে সেটাকে বাজে কাগজের ঝুড়িজাত করলে। কিন্তু অবশেষে তাকে জানাতেই হলো।' কেমন ক'রে ঊর্ম্মিলার ঠিকানা জোগাড় ক'রে (এবারে আর মাসিক পত্রের অফিসের মারফত নয়) তিনি লিখে পাঠালেন আর এক লম্বা চিঠি। এবং এবারে লেফাফায়—রিপ্লাই কার্ডে নয়। সে চিঠি নানা প্রসঙ্গ নিয়ে: সাহিত্যের আধুনিকতা, সাহিত্যের ভেজাল, সাহিত্যের ড্রামাটিজেশন্ এবং শেষে ঊর্ম্মিলা দেবীর অপর্য্যাপ্ত দান বাঙলা সাহিত্যে এবং অবশেষে সেই ধ্যানের প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি। কতবার আর বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলা যায়। কিন্তু বিপদ দেখ: গল্পে কে কাকে ধ্যান করেচে, কে কেঁদেছে, কে হেসেচে—এসবেরও আবার তন্ন তন্ন ক'রে কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি। যার যেমন সে

একটা ঝোঁকের উপরে, যেমন ঝোঁক আসে, তেমনি লিখে যায়। কিন্তু তার পরেও যদি আবার লোকে জের টানে: কেন এমন হোল, অমুকে কেন এমন করলে? সেটা দস্তুরমত অসহ্য! একবার ভাবলে, লিখে দিই: 'গল্প প'ড়ে প্রবোধকে যতটুকু জেনেচেন, সে তা-ই। তার চেয়ে বেশি ক'রে তাকে জানবার কোন উপায় নেই। যদি গল্প প'ড়েও বুঝবার পক্ষে অস্পষ্টতা থেকে যায়, সেটা কাঁচা হাতের লেখার দোষ। তাকে তা-ই ব'লে নিতে পারেন না কেন? চিঠি লিখে তার পিছনে পয়ত্তাড়া কষতে হবে না কি?' কিন্তু মনের ভাবনা তার কলমের ডগা দিয়ে বার হোল না। বরঞ্চ তার বদলে ইয়েটস্, রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস গোছের বাছা বাছা কবিদের বাছাই বাছাই কবিতার দু' এক প্যাসেজ্ উদ্ধৃত ক'রে, তিন পাতা প্রমাণ সাইজের ভরিয়ে প্রমাণ ক'রে দেখালে: প্রবোধ যাকে ধ্যান করত সে বিশ্বের একটা অশরীরী সৌন্দর্য্যের ছায়া। সে জগতের চিরবিরহের, চির-বেদনার একটা অস্পষ্ট ভাবমূর্ত্তি।.........আরও হেন তেন কত কী! কিন্তু সে ভাবতেও পারে না, যে উর্ম্মিলা দেবী, বি-এ অনার্স ক্লাসের দুরূহতম অঙ্কগুলোও, দু' তিন কাপ মাত্র চা খেয়ে হু হু ক'রে ক'ষে চলে, সে-ই অবশেষে লিখতে পারলে, ঘণ্টাখানেক নষ্ট ক'রে অমন বাজে কোর্থ রেট্ সেণ্টিমেণ্টাল্ এক চিঠি। কিন্তু ওই খানেই যে জগতের সব চেয়ে বড় রহস্যটা ওষ্ঠের উপর তর্জ্জনী তুলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েচে ···। মানুষের মনের এ-ই চিরন্তন আত্মবিরোধ। যে উর্ম্মিলাদেবী পাটনা-য়ুনিভার্সিটিতে অঙ্কের অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হবেই পণ করেচে, সে-ও পারলে লিখতে: কালিদাসের 'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্' গোছের শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে তিনপাতা ভর্ত্তি ভাবোচ্ছ্বাসময় এক চিঠি! খুব ফল হোল। তিনপাতার বদলে নির্ম্মল সেনের কাছ থেকে পাঁচপাতার উত্তর এল। সে চিঠিতে দোষাবহ কিছুই নেই। আপনারা যদি প্রশ্ন করেন, বলতেই হবে, তাতে দোষ খুঁজে পাওয়া যায়—এমন কিছুই নেই। সেটা একটা ইম্পার্সোন্যাল্ চিঠি। বেশির ভাগই সমাজ, সাহিত্য এবং রাষ্ট্রের নানা জটিল সমস্যা নিয়ে বকাবকি। কিন্তু কচে ফুলের শেষের দিকে ফুলের নলচের মত বোঁটাটির প্রান্তভাগে যেমন মৃদুগু একটু মধু থাকে, তেমনি লেখকও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বজনীন সুরে বাঁধা চিঠির মাঝেও এমন একটু রস, যাতে চিঠিটাকে প্রবন্ধ ব'লে ভ্রম না হয়। উর্ম্মিলার মন্দ লাগল না। যার সঙ্গে কোনদিন বোধ করি চাক্ষুষ আলাপ হবার সুবিধে আসবে না, তার সঙ্গে চিঠিতে চিঠিতে আলাপ করতে মন্দ লাগে না। উড়বার জন্যে অনেকখানি আকাশ পাওয়া যায়। মাঝখানে একটা পর্দ্দা ফেলাই রয়েচে, তাই তারই আড়ালে আপন মনের অনাবশ্যক গন্ধের অংশটাকে পরিহার ক'রে, সূক্ষ্ম পর্দ্দায় এই গন্ধবিহীন আলাপ তার বেশ লাগছে। ক্রমে তারা পরস্পরকে নিয়মিত চিঠি লেখে। ঘনিষ্ঠতার সুর আর এক পর্দ্দা চড়েছে।

তারপরে: উর্ম্মিলার চা খাওয়া শেষ হ'য়ে গেচে। পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে, ও খামখানা ছিঁড়ে চিঠিটা খুললে। কিছু দূরে পাওয়া গেল 'Why are you so horribly unequal? আপনার লেখা যখন পড়ি তখন মনে হয় একই গল্পতে দু'টো সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্তরের লোকের হাত আছে। আপনি যখন ভাবের জগতে, চিন্তার জগতে প্রবেশ করেন তখন আপনি কী স্বচ্ছন্দ! কী সুন্দর! আর যখনই কোন সাধারণ ঘটনার বিষয়ে লিপিবদ্ধ করেন তখন ভয়ানক হতাশ করেন। এর কারণ কী? আমার মনে হয় আপনি নিজেই বোধ করি অসাধারণ। বোধকরি আপনার সু-উচ্চ ভাব-জগৎ থেকে সাধারণ জগতে নেমে আসতে, আপনার রীতিমত কষ্ট হয়। কেমন, এই না? বলুন, ঠিক ধরেচি কি না?'

চিঠিটা রেখে উর্ম্মিলা মনে মনে বললে: 'তুমি ঠিকই ধরেচ, নির্ম্মল! আমি অসাধারণ। কিংবা যদিচ অসাধারণ ছিলুম না, তোমার দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে দেখে

এখন দস্তুরমত অসাধারণ লাগচে।' আর সত্যি হয়েছিলও তাই। উর্মিলা যত্ন ক'রে নির্মলকে যে সব চিঠি লেখে, তা'তে নিজেকে অন্তভাবে প্রকাশ করে। চিঠির সর্ব্বত্র যে উর্মিলা-চরিত্র ফুটে উঠে, সে মেয়ে সর্ব্বদাই গভীর—গভীরতম ভাবলোকে বাস করে। গভীর সৌন্দর্য্যাবেশে সে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন। সে কেবল ব'সে ব'সে গঙ্গার সৈকতভূমি দেখে। সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তলীলা তার জীবনের প্রধান পটভূমিকা। তার কেশে ধূপের গন্ধ। তার আঁচল মদিরস্নিগ্ধ। সে যেন এই মর্ত্তাণ যুগের মেয়ে নয়। বহু যোজন দূরের একটি দীপ্ত তারা।

প্লেট থেকে একটা চাঁপা ফুল তুলে নিয়ে আঘ্রাণ নিতে নিতে উর্মিলা চিঠির কাগজের প্যাডের উপর লিখলে :

'শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার চিঠি পেলুম ঠিক তখনই, যখন আপনার প্রশ্ন আমারই প্রশ্ন হ'য়ে উঠে আমাকে পীড়িত করচে। 'Why are you so horribly unequal ?' একথার কী জবাব দেব ! ঠিক এই প্রশ্নই যে একটু আগে আমি নিজেই নিজেকে করছিলুম। কী যোগাযোগ বলুন ত ? সংসারের ছোটখাট কথা কী ক'রে আমি নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করব বলুন......যতক্ষণ না আমি এই সব তুচ্ছতার মাঝে নিজেকে নামিয়ে এনেচি। তা' যে হাজার চেষ্টা ক'রেও পারলুম না। প্রসঙ্গতঃ আপনাকে আমার এই দারুণ অক্ষমতার একটু নমুনা দিই। শুনতে পাই, স্ত্রীলোকের কাছে আপন পছন্দ অনুসারে দোকানে যেয়ে জিনিষপত্র কেনাকাটা করা নিরতিশয় প্রিয় কাজ। তাই সেদিন গেলুম শপিং করতে— মানে গজ দুই রেন্‌বো সিল্ক আর পায়ের একজোড়া নাগরা জুতো কিনতে। যাবার সময়ে মনকে দৃঢ় করলুম ! ভয় কী ! সময় তোমার নষ্ট হবে না। বাজার-হাটের পারিপার্শ্বিক কাব্যজনোচিত না হ'লেও তুমি পাবে...... অনেক কিছু পাবে......। হয়ত তোমার গল্পের জন্যে কতো রকম টাইপ খুঁজে পাবে। বলতে পারো কী ? কিছুই বলা যায় না...... বেসাতির পথ বেয়ে কত চলতি পথের পথিক, তাদের টুকরো টুকরো কথাবার্ত্তা, ছোটখাট আচার-ব্যবহার দু'চোখ পেতে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করচে। কিন্তু পারলুম না, পারলুম না একাজ। গেলুম, কিন্তু কী ভাল্‌গার ! কী অসহ্য স্থূল আবহাওয়া। সমস্ত সময়টা বিতৃষ্ণায় মন অর্দ্ধনিমীলিত হ'য়ে ছিল। পাশের লোককেও চেয়ে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না।...'

চিঠিটা খামে মুড়ে, আঠা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে করতে উর্মিলা একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললে। লিখতে লিখতে তার মন কোথায় কতদূরে চ'লে গিয়েছিল। সে যেন বিধাতার মত নিজেকে নিজেই সৃষ্টি ক'রে তুলছিল...... কারো কাছে। একজনের কাছে নিজেকে এত সুন্দর ক'রে প্রকাশ করার, এত সুকুমার ব'লে প্রতিপন্ন করতে পারার মোহ অরক্ষণের জন্যে ওর মনে রঙ ধরালে। চেয়ারটা ঠেলে ও উঠে দাঁড়াল।

'দিদিমণি, আজ তোমার মাথা ঘষার দিন যে...' ঝি এসে দোরের কাছে ডাকচে। স্নান ক'রে এসে উর্মিলা সুমুখের বারান্দায় পায়চারি করচে। অতিরিক্ত গরমের জন্যে, আহমেদাবাদ মিলের একটি মিহি, সরু কালো পাড়ের শাড়ী শুধু পরেচে। হাত দু'খানি অনাবৃত। সদ্যঃস্নাত ভিজে এলো চুল থেকে মাথা ঘষার সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বারান্দার পাশের চাঁপা গাছটাও এই সময়ে ফুলের প্রাচুর্য্যে আগাগোড়া ভ'রে উঠেছিল। কী তীব্র গন্ধ ! সমস্ত বারান্দাটা, গ্রীষ্ম-মধ্যাহ্নের আতপ্ততায় এবং ফুলের তীব্র সুগন্ধে ঝাঁ ঝাঁ করচে। বারান্দায় এধার ওধার করতে করতে, নিজের অনাবৃত সুন্দর বাহু দু'খানি ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। বাঁ হাতে একটা নীল এনামেল করা আংটি রয়েচে। উপস্থিত মুহূর্ত্তে বি-এ অনার্সের শক্ত অঙ্ক ভেক্টর এনালিসিসের কথা কিছুতেই ওর মনে স্থান পাচ্চে না।

নির্ম্মল যখন ওর চিঠিটা পাবে, পড়া শেষ হ'য়ে গেলে কী ভাববে……নীল আকাশের দিকে চেয়ে একটি অনির্দ্দিষ্ট নিঃশ্বাস ফেলে মনে করবে: যিনি আমার পত্র-পরিচিতা তাঁর মন মডার্ণ যুগের মেয়ের মন নয়। এ যুগে বাস ক'রেও তিনি এ যুগের বাইরে ফুটন্ত পদ্মের মত, অবলীলাক্রমে আধুনিক যুগের জলে ভাসচেন; কিন্তু জলের তলাকার ঘোলা পাঁক তাঁর গায়ে লেশমাত্র ঠেকেনি। হয়ত তার' মনে প'ড়ে গেল এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই অপরূপ কবিতা …

'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশী ?'……

২

'উর্ম্মিলা! তোর কী হয়েচে? দাবা খেলা ছেড়ে দিলি না কি? আর মোটর ড্রাইভ? ও কী করচিস্? এমন সুন্দর সকাল বেলাটায়, খাতার উপর ঝুঁকে প'ড়ে ওসব কী লিখচিস্?…Lord! তুই আবার গল্প লিখতে আরম্ভ করেচিস্ না কি?'

উর্ম্মিলার দিদি আজ সকালের ট্রেনে কলকাতা থেকে এসেচেন। উপরোক্ত প্রশ্নগুলি তাঁরই।

'কেন দিদি, পড়ো নি? মাসিক পত্রে যে প্রায়ই…'

'আমি আবার বাঙলা মাসিক পত্র পড়ি কোন্ কালে! দেখেচিস্ কোন দিন? তবে গুজব শুনছিলুম বটে, কে এক উর্ম্মিলা দেবী আজকাল বেশ লিখচে। সে যে তুই, তা' খেয়াল করি নি। কিন্তু এ বুদ্ধি দিলে কে? ওসব বাজে হবি তুলে রাখ্।… এই সামনের ইষ্টারের ছুটিতে চল্ আমার সঙ্গে কলকাতা। You must enjoy yourself occasionally। চল্ বলচি, আমি তোর কোন ওজর আপত্তি শুনচিনে।'

'কিন্তু দিদি, ভেবেছিলুম: এই ইষ্টারের বন্ধে কলেজ নেই, সময় আছে, গোটা তিন-চার গল্প লিখে ফেলব।'

'যাঃ বখামো করিস্ নে।'

হতাশ হ'য়ে উর্ম্মিলা কলম নামিয়ে রাখলে।

* * *

বুধবার আন্দাজ ন'টার সময়ে নিউমার্কেটের এক কাপড়ের দোকানে, দু'টি মেয়ে বাজার করতে বেরিয়েচে। হিলউঁচু জুতো থেকে সুরু ক'রে, হ্যাণ্ড-ব্যাগ, মেয়েলি ছাতা, নকল পারসী শালের ক্লোক্, হাল আমলের নিখুঁত সজ্জার কোন অংশই তাদের পরিচ্ছদ থেকে বাদ যায় নাই। উর্ম্মিলার দিদি তাঁর কোন এক পূর্ব্বতন শাড়ীর সঙ্গে মিলিয়ে একটা ব্লাউসের টুকরো কিনচেন। উর্ম্মিলা স্বয়ং তার চেয়ে ভারী বাজার করচে … অনেকগুলো স্তূপাকার শাড়ী থেকে, গুটিকতক কাপড় বেছে নিয়ে, মহোৎসাহে দামদস্তর করচে। একজন তেইশ-চব্বিশ বছরের ভদ্রলোক বাইরে দোর-গোড়ায় ইতস্ততঃ করছিলেন: 'দেখুন, রুমালের জন্যে আমার খানিকটা সাদা সিল্ক চাই।'

এই দুই সম্ভ্রান্ত তরুণী খরিদ্দারকে নিয়ে এরা এতক্ষণ অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিল; তাড়াতাড়ি চেয়ার বার ক'রে এগিয়ে দিয়ে বললে: 'বসুন, বসুন, সিল্ক বার করি।'

ওপাশ থেকে তরুণী বললে: 'দেখুন, আলাদা ক'রে দু'টো ক্যাশ্‌মেমো করুন। এপাশের এই জিনিষ ক'টার ক্যাশমেমো উর্ম্মিলা দেবীর নামে। কিন্তু এই এ্যাম্বার রঙের শাড়ীটার আপনারা বড্ড দাম ধরেচেন… বলতেই হবে। আরও কিছু দাম কমালেই পারতেন।'

দোকানের এ্যাসিস্‌টেণ্ট হাতজোড় ক'রে বললে: 'ক্ষমা করুন, মাদাম! কিন্তু ওটা যে কী জিনিষ, তা আপনি প্রথম যেদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ওটা পরবেন, সেই দিনই বুঝতে পারবেন। তখন আর দাম বেশি নেওয়ার জন্যে আমাদের উপরে রাগ করতে পারবেন না।' উর্ম্মিলা মনে মনে খুশী হোল। কিন্তু সে বি-এ'র কম্‌বিনেশনে অঙ্ক অনার্সের সঙ্গে মিশিয়ে ইকনমিক্‌স্ নিয়েচে। দারুণ প্র্যাক্টিক্যাল মেয়ে। বললে: 'ও শাড়ীটার যদি দাম না কমান নেহাৎ, তা' হ'লে পুরো ক্যাশ্‌মেমো থেকে গোটা পাঁচেক টাকা বাদ দিন। এত টাকার জিনিষ নিলুম, সব দোকান থেকেই কমিশন পাওয়া যেত।' অবশেষে ওই সর্ত্তেই ক্যাশমেমো তৈরী হোল। বাদামি রঙের কাগজে প্যাকেট বাঁধা হ'তে লাগল।

সেই চব্বিশ বছরের তরুণ রুমালের কাপড় কিনতে কেন যে ক্রমাগত দেরী করচে……। 'হ্যাঁ দেখুন, আমাকে রুমালের কাপড়ের সঙ্গে অমনি গজ দুই রেবো সিল্কও দিন।…আমার নাম? ক্যাশ্ মেমোতে মিষ্টার সেনও লিখতে পারেন। নির্ম্মল সেন।'

ব্রাউন রঙের কাগজে মোড়া একটি ভারী প্যাকেট্ হাতে ক'রে, দরোজার কাছে যেতে যেতে, উর্ম্মিলা চকিত হ'য়ে চাইলে। মিষ্টার সেনের পার্শেলও তৈরী। দোকান থেকে বেরিয়েই নির্ম্মল উর্ম্মিলার দিদিকে লক্ষ্য ক'রে বললে: 'যদি আমার একটু কৌতূহল মাপ করেন, তা' হ'লে জানতে পারব কি, আপনার সঙ্গের ইনিই শ্রদ্ধেয়া লেখিকা উর্ম্মিলা দেবী?'

ওর দিদি ঠাট্টার সুরে বললেন: 'হ্যাঁ, উনিই শ্রদ্ধাস্পদা লেখিকা শ্রীমতী উর্ম্মিলা।'

উর্ম্মিলার মুখ থেকে অজ্ঞানতে বার হোল: 'নির্ম্মল বাবু যে! আপনি এখানে!'

'তোরা দু'জনে দু'জনকে চিনিস্ নাকি? কখন আলাপ হোল?' ওর দিদি স্মিতহাস্তে প্রশ্ন করলেন।

নির্ম্মল একটু এগিয়ে এসে উত্তর দিলে: ওঁর অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন ভক্ত। মানে ওঁর লেখার ভক্ত। বাস্তবিক এত অল্পবয়সে এমন ওয়াণ্ডারফুল…'

'বেশ ত, যাবেন একদিন আমাদের বাড়ী…খুব খুসী হব…ঠিকানা…একটা কার্ড দিই। হ্যাঁ, আমার বোন এর মধ্যেই নাম ক'রে ফেলেচে।'

উর্ম্মিলা ভারী প্যাকেটটা হাতে নিয়ে যেতে যেতে ভাবচে: 'Oh, shame! গত চিঠিতেই না সে লিখেচে যে, সে শপিং করতে ভালবাসে না। এসব জায়গায় আসতে হোলেই বিতৃষ্ণায় তার মন অর্দ্ধ-নিমীলিত হ'য়ে থাকে। ঈশ্বর! এমন ক'রেই কী আইডিয়ালিসমে চোট লাগাতে হয়? যদি ও আগেই আঁচ করতে পারত…উনিই নির্ম্মলবাবু, তা' হ'লেও না হয় সে এমন ভাব দেখাত যা'তে তার চরিত্রের একটা পূর্ব্বাপরতা বজায় থাকে। এমন ভাব দেখাত যেন সে দায়ে প'ড়ে, দিদির অনুরোধ ঠেলতে না পেরে অগত্যা এসেচে। কিন্তু আর তা' হয় না। উনি সব দেখেচেন; এ্যাম্বার রঙের শাড়ীর দাম নিয়ে টানাটানি, ক্যাশ্ মেমো থেকে পাঁচ টাকা বাদ দেওয়াতে ধস্তাধস্তি — সব দেখেচেন।

কিন্তু ভাবে এমন বোধ হোল না যে, নির্ম্মল অতি-রিক্ত শক্ পেয়েচে। বরঞ্চ ও দিদির সঙ্গে আর একটু আলাপ করলে। ঠিকানা-লেখা কার্ডখানা পকেটে ফেলে বললে: 'আচ্ছা, আজই যাব। বিকেলের দিকে, আশা করি যেয়ে আপনাদের খুব বেশী bored করব না।'

'তাই যাবেন। কারণ, কালই আমাদের কলকাতা থেকে চ'লে যাওয়ার কথা রয়েচে।'

ওদের দু'জনকে নমস্কার ক'রে নির্ম্মল বিদায় নিলে।

নিউমার্কেটের ভিতরে কোন কোন দোকানে, এই সকাল বেলাতেও বিদ্যুতের আলো জ্বলচে, এবং সব দোকানেই জোরে পাখা ঘুরচে। যেতে যেতে উর্ম্মিলার মনটা কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক, ইংরেজীতে যাকে বলে uncanny অনুভবে ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল।

নির্ম্মলের কিন্তু তা' হয় নি। উর্ম্মিলাকে হঠাৎ এমন অপ্রত্যাশিতরূপে চোখোচোখি দেখতে পেয়ে ও বিচলিত হ'য়ে উঠেছিল। এ যে দস্তুরমত রোমান্স! ইচ্ছা সত্ত্বেও উর্ম্মিলার সঙ্গে ও ভালো ক'রে একটা কথাও বলতে পারেনি। ওর দিদির সঙ্গেই সব কথাবার্ত্তাটা চালিয়েছিল। ওকে এমন ক'রে দেখতে পেয়ে নির্ম্মলের মনে এমন একটা উদ্বেলতা উঠল, যা'তে কাণ দু'টো লাল হ'য়ে উঠে, বুকটা দুরু দুরু করে, গলার স্বর কেঁপে যায়। ঠিক একটা বড় গানের সভায় গাইতে সুরু ক'রেই গায়কের নার্ভাস হ'য়ে যাবার মত। মনের এমন অবস্থায় ও ভুলেই গেছিল, উর্ম্মিলা তাকে গত চিঠিতে কী লিখেচে, কেমন ক'রে ওর মনের কোমল……কোমলতম উপাদানের পরিচয় দিয়েচে।

৩

বেলা পাঁচটা—

উর্ম্মিলার দিদির বালিগঞ্জের বাড়ীতে, ছাদের

উপরে একটা গোল টেবিল ও গোটাকতক উইকার চেয়ার রাখা। নির্ম্মল বললে: 'এ মাসের ধূপবাণীতে আপনার যে লেখাটা বার হয়েছে, উপভোগ ক'রে পড়লুম। কিন্তু……কিন্তু, আপনার রমলাকে ঠিক বুঝতে পারলুম না। স্বীকার করতেই হবে: she is a fine girl। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কল্পনাপ্রবণ। কিন্তু আপনি তাকে এমন দারুণ সিনিক্ করলেন কেন? একবারও তাকে ভালোবাসায় ফেললেন না। এটা ওর প্রতি অন্যায় হয়েছে। আর শুধু আপনার ও গল্পটাই বা বলি কী ক'রে, আপনার লেখায় সর্ব্বত্রই প্রেমের উপর একটা কেমন অবিশ্বাস……একটা বিতৃষ্ণার ভাব। কেন? কিসের জন্যে?'

'তার মানে একজনের লেখা সে যা' তাই। আর এ যুগের ছেলেমেয়েরা প্রেমে বিশ্বাস করে না। তা' ছাড়া, করবার দরকারই বা কী বলুন?' ঊর্ম্মিলা বললে। একটু থেমে আবার: 'কী দরকার বলুন? যখন পথের প্রতিপদে এত রহস্য যে বড় বড় বিশুদ্ধ গণিতবিদ্ বৈজ্ঞানিকেরাও অবশেষে রহস্যের তল না পেয়ে, মিষ্টিসিজ্‌মের দিকে ঝুঁকচে। নিউটন্‌ও, তাঁর তিরিশ বছর পূর্ণ হবার পরেই মিষ্টিক হ'য়ে গেছিলেন, জানেন? এ যুগটাই অজানার যুগ—রহস্যের যুগ। প্রেম নিয়ে মাতামাতি করায় তাই তত উৎসাহ নেই।'

'বিশ্বাস করতে পারলুম না। আপনার রমলা…… তাকে ভালো ক'রে জানলেই বুঝতে পারা যায়, তার ভালোবাসার ক্ষমতা কী অসীম! ওকে আপনি নিউটন্ আর মিষ্টিসিজ্‌ম্ দিয়ে ভোলাবেন কী ক'রে? মানলুম, ওর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেয়ে, সে যাকে ভালোবাসবে তারও অনেকখানি যোগ্যতা থাকা চাই। কিন্তু না হয় সে তার স্বপ্নময় মন নিয়ে ভালোবাসত কোন অযোগ্যকে। আর তাতেই যে তার ট্র্যাজিডি আরও ধারাল হোত। কিংবা কে বলতে পারে হয়ত…সে একদিন ঠিক লোকেরও দেখা পেতে পারত। কেন তাকে অপেক্ষা করালেন না? আপনি যেন অধৈর্য্য হ'য়ে তাড়াতাড়ি গল্পটা শেষ ক'রে ফেললেন।'

ঊর্ম্মিলার কী খেয়াল হোল, বললে: 'ওতে আমার নিজের জীবনেরও একটু আভাস আছে কি না… যে যা' … সে তাইত লিখবে। একটু ছায়া পড়া আশ্চর্য্য নয়।'

'তাই না কি?' আবেগে নির্ম্মলের বুকের শব্দ দ্রুততর হ'য়ে উঠল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে, নিজেকে কথঞ্চিৎ শান্ত ক'রে নিয়ে ও বললে: 'আমি জানতুম। হ্যাঁ, আমি জানতুম আপনার স্বপ্নের ঘোর লাগান মন নিয়ে, মডার্ণ যুগে আপনি আশ্রয় পাবেন না। আপনার হৃদয় আশ্রয় পাবে না। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছুতেই চলতে পারবেন না। ঠিকই ধরেচি। কিন্তু আপনার 'রমলা'কে আমার এই জন্যে অস্বাভাবিক লেগেছিল যে, সে কারুকে ভালো না বেসে, বয়সে এবং অভিজ্ঞতায় নিতান্ত অপরিপক্ক হ'য়েও অতিরিক্ত সিনিক্ গোছের হ'য়ে গিয়েচে। সে যদি আগে কারুকে ভালোবেসে ঘা খেয়ে থাকত, তা' হ'লে আপনি তাকে যেমন ক'রে দেখাতে চেয়েছেন, সে তেমনি ক'রেই ফুটে উঠত হয়ত …… '

'কিন্তু বললুম যে, ওর সঙ্গে আমারও জীবনের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। আমিও …… আগে এক জনকে ……' ঊর্ম্মিলা খাপছাড়া ভাবে চুপ ক'রে গেল।

ও যখন নির্ম্মলকে অন্তরাল থেকে চিঠি লিখে আলাপ জমিয়েছিল, তখন ও চেষ্টা ক'রে ওর কাছে নিজেকে এ যুগের মেয়ে নয় ব'লে প্রমাণ ক'রে ছেড়েছিল। যেন সে কত যুগ আগেকার কণ্ব-আশ্রমের উদাসিনী তাপসকন্যা। সে কেবল খস্‌খস্ আতর মেশানো আহমেদাবাদী মিহি শাড়ীর সুগন্ধি আঁচল বাতাসে উড়িয়ে আনমনে ব'সে থাকে। অন্যমনস্ক হ'য়ে গঙ্গার পারে দূর বনরেখার দৃশ্য দেখে। আর কিছুই করে না। তখনও সে যে খাম-পোষ্টকার্ড কেনার দু'টো ফেরত পয়সা যথাসময়ে ফেরত না পেয়ে ছোট চাকরটাকে তাড়া লাগায়, কিংবা শাড়ীর পাড় খারাপ হ'লে বাড়ীর সরকারের সঙ্গে দস্তুরমত বচসা করে, ওর এসব তুচ্ছ পরিচয় তখন বরাবর পর্দ্দার আড়ালে

উহ্য থেকে গেচে। কিন্তু যেদিন বেলা ন'টায়, সকাল বেলাকার কড়া রোদে, নিউমার্কেটের এক দোকানে নির্ম্মলের সামনে ব'সে এ্যাম্বার রঙের শাড়ীর প্রচুরতর দর কসাকষি করেচে, এবং শতকরা ক' টাকা কমিশন কাটা উচিত অঙ্ক ক'ষে প্রমাণ বাতলিয়ে দিয়েচে, তখন থেকেই ওর মনটা গেচে ভেঙ্গে। ওর কেবলই মনে হচ্চে: জীবন-বিধাতার উপরেও টেক্কা দিয়ে ও নিজের কলম দিয়ে নিজের যে রূপ এঁকে নির্ম্মলের সামনে ধরেছিল, তা' আগাগোড়া গিয়েচে ভেস্তে। কিন্তু ওকে বিধাতা যেমনটি গড়েচেন, যদি তার উপরেও তুলি না চালাতে পারলো, যদি নিজেকে ওরিজিন্যাল কিছু না ব'লে ওর মুগ্ধ ভক্ত চব্বিশ বছরের নির্ম্মলের কাছে প্রতিপন্ন করতে পারলো, তবে ওর আত্মপ্রকাশের মাঝে আবেশ থাকে কোথায়? ওর মধ্যে যে অভিনেত্রী নারী আছে, সে কেমন ক'রে ভ্যেক্টর এনালিসিস্ কথার ফাঁকে আপনাকে অপরূপ ক'রে প্রকাশ করবে? তাই এখন এই নিমিষে ওর ভারী ইচ্ছে হচ্চে, নিজেকে খুব ট্র্যাজিক্যাল্ কিছু ব'লে প্রমাণ করে। না হয়, নির্ম্মল যা' নিয়ে কথা পেড়েছে, গল্পের ওই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রেম-অবিশ্বাসী সিনিক্ মেয়ে 'রমলা'রই ভূমিকায় নিজেকে নামায়। কিন্তু যেখানে ও থেমে গিয়েছিল; উর্ম্মিলা একটু চুপ ক'রে থেকে বললে: '··· হ্যাঁ আমিও জীবনে প্রেমের ক্ষেত্রে একবার কঠিনতম বঞ্চনা পেয়েচি; তাই···' আবার ও চুপ করলে। একটা ঘন নিঃশ্বাস সন্ধ্যার উত্তরোল বাতাসের সঙ্গে মিশল। নির্ম্মলের বুকের মধ্যে কী রকম মধুর উত্তেজনায় তোলাপাড়া হচ্চে। সিঁড়িতে 'বয়ে'র পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। ট্রে-র উপর বসিয়ে চায়ের পেয়ালা নিয়ে আসচে। সন্ধ্যা প্রায় হ'য়ে এল। আর একটু পরেই শুক্লপক্ষের চাঁদ উঠবে। নির্ম্মল গভীর স্বরে বললে: 'থামলেন কেন? যদি আমাকে এতখানি বন্ধুর অধিকার দিয়ে, নিজের জীবনের গোপন কথা সুরু করেচেন, তবে শেষ অবধি বলুন। এমন ক'রে অসমাপ্ত ইঙ্গিতের মাঝে তার বেদনার রেশকে সুদীর্ঘতর ক'রে ফেলে যাবেন না। অবিশ্যি মনে করবেন না যে, আমি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে জানতে চাচ্ছি। আমার মনের প্রগাঢ় সমবেদনা···আপনার উপরে···'

উর্ম্মিলা মরিয়া হ'য়ে বললে: 'তা' কি আমি জানিনে। হ্যাঁ, আপনার কাছে মন খুলব। পরিচয়ের হিসাব ত একদিন দু'দিন দিয়ে মাপা যায় না; যায় সহানুভূতি দিয়ে। তা' আপনার আছে। হ্যাঁ, আমি প্রেমের ক্ষেত্রে দারুণ ঘা খেয়ে সিনিক্ হ'য়ে পড়লুম; এবং তাই যাকে হাতের কাছে পেয়েচি, তাকেই বিয়ে ক'রে ফেলেছিলুম।

কিন্তু উর্ম্মিলা দেবী হঠাৎ এ কী ক'রে বসলে! অভিনয়ের মাত্রা যে বড্ড চড়ালে। যাক্, তাতে ক্ষতি হবে না। ও যে এই সব নির্ভেজাল, বাজে, অসত্য information অনর্গল ব'লে যাচ্ছে, তা'তে কিছু যাবে আসবে না। কারণ, ও জানে ইষ্টারের ছুটি ফুরিয়েচে, কাল বেলা দু'টোর গাড়ীতেই ও কলকাতা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছে। দিদিও যাচ্ছেন ওই সাথে জামাই বাবুকে নিয়ে পশ্চিম-ভ্রমণে··· রাজগীর ··· রাজগীর থেকে কটক, পুরী। ওর সমস্ত জীবনের দিনরাত্রির মধ্যে, শুক্লপক্ষের পঞ্চমীর জ্যোৎস্নায়, খোলা ছাদে একটু একটু ক'রে চা খেতে খেতে নির্ম্মলের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ, বোধ হয় এই প্রথম এবং এই শেষ। ও কী ক'রে পারে নিজেকে অপূর্ব্ব কিছু একটা না প্রতিপন্ন ক'রে।

কিন্তু নির্ম্মল অবিসংবাদিতরূপে চমকে উঠল। পাংশুমুখে বললে (গলার স্বর থেকে তখনো সেই চমকে ওঠার রেশটা মুছে যায় নি): 'ওঃ তা' হ'লে··· তা' হ'লে আপনার বিয়ে হ'য়েই গেছে। আমি অবশ্য অন্য রকম মনে করেছিলুম।'

'হ্যাঁ, আমি বয়েসের চেয়েও ঢের ছোট দেখতে, তাই প্রথমে অমনি মনে হয়। কিন্তু আমার বয়েসও যে আসলে প্রায় চব্বিশ হ'তে চলল।' স্বরটা আরও মৃদুতর ক'রে: 'এই আমার জীবনের ট্র্যাজিডি।'

ও আজ সেই নতুন-কেনা, এ্যাম্বার রঙের শাড়ীটি পরেচে। সন্ধ্যার নিষ্প্রভ আলোয়, ওর সুন্দর

তন্বীদেহের দিকে চেয়ে, নির্ম্মলের মনে কেমন যেন একটা বিশ্রী বিতৃষ্ণা জেগে উঠল। কিন্তু ওর বিতৃষ্ণা আসে কেন? সে কিছু মরালিষ্ট হ'য়ে সারমন শোনাতে আসে নি। সে কিছু পাঁচ বছর বয়স থেকে নীতিপাঠ দ্বিতীয় ভাগ ক'ষে পড়ে নি। তবুও ওর শিক্ষিত, ভদ্র, সুকুমার রুচি যেন ওর মনকে কানমলা দিতে লাগল; বিশ্রব্ধ অবকাশে সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছে স্বামীর সম্বন্ধে এমন মেলোড্রামাটিক্ কথাবার্ত্তা—এ যেন সমস্ত পুরুষ জাতিকেই অপমান। অথচ ওর ত মনে মনে খুসী হওয়ারই কথা। উর্ম্মিলা দেবী তা'কে বন্ধুত্বের, প্রীতির, দরদের এত উচ্চাসনে বসিয়েচে যে, অনায়াসেই ওর কাছে আত্মবিমোচন ক'রে দেখাচ্চে। তবুও নির্ম্মল খুসী হ'তে পারলে না। ওর মনের সেই অনির্দ্দেশ্য বিতৃষ্ণার ভাব বেড়েই চলল। অস্ফুটে ওর মুখ থেকে বার হোল: 'আমি ভেবেছিলুম, অন্ততঃ আপনার চিঠি প'ড়ে আমার ধারণা হয়েছিল, আপনি এ যুগের মেয়ে নন। আপনার মনের আভাস যেন মালবিকা, পত্রলেখার সঙ্গেই মেলে। যে যুগের মেয়েরা কেতকী ফুলের রেণু দিয়ে পাউডার মাখত, কেয়া ফুলের পরাগে সুরভিত খদির দিয়ে তৈরী তাম্বুল-রাগে অধর রাঙিয়ে লিপষ্টিকের কাজ সারত...... আপনি যেন সেই যুগেরই মেয়ে।'

উর্ম্মিলা একটা নিঃশ্বাস চেপে বললে: 'আর এখন কী মনে হচ্চে?'

'এখন মনে হচ্চে, আপনি আল্‌ট্রা মডার্ণ—অতি আধুনিক।'

নিঃশ্বাসটা ছেড়ে উর্ম্মিলা বললে: 'কী জানেন, ওটা একই জিনিষের এপিঠ ওপিঠ।'

এ শোনা সত্ত্বেও, নির্ম্মলের মন থেকে বিতৃষ্ণার ভারী পর্দ্দাটা টুকরো টুকরো হ'য়ে উড়ে গেল না। চায়ের পেয়ালাটা শেষ ক'রে ও চুপ ক'রে রইল।

'আচ্ছা, আমার কথা ত অনেকই শুনলেন! এইবারে বলুন না, একটু আপনার কথা। বাঃ রে?... নেবেনই, আর তার বদলে দেবেন না কিছু।'

হঠাৎ নির্ম্মলের অত্যন্ত তীব্র একটা ইচ্ছা হোল, উর্ম্মিলার এই ন্যাকামি, এই পোজের বদলে সে-ও খুব একচোট কিছু বানিয়ে বলে। অবশ্য উর্ম্মিলা ওর কাছে সত্য কথাই বলচে। অন্ততঃ ও যে সত্য বলচে না......তার কোন প্রমাণ নির্ম্মলের হাতে নেই। তবুও কেন জানি না, খালি খালি ওর মনে হচ্চে: উর্ম্মিলা ওকে ডেকে নিয়ে এসে, শেষে বড্ড হতাশ ক'রে বিদায় দিচ্চে। একটা অনন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ, অসীম সম্ভাবনাময় সন্ধ্যাতে, ও তাকে একটা বাজে তৃতীয় শ্রেণীর ফিল্ম্-ষ্টার দেখিয়ে ছেড়ে দিলে। রুমাল দিয়ে মুখটা একটু মুছে বললে: 'শুনবেন আমার কথা? আমি এক কালে কী না ছিলুম! যা'কে বলে নির্ভেজাল সাহসী ছেলে। তারপরে একদিন রবীন্দ্র নাথের কবিতা প'ড়ে বদলে গেলুম। একেবারে হঠাৎ। মনে হোল: I shall be a saint yet!'

উর্ম্মিলার মনটাও চুপ্‌সে গেল। দু'জনেই চুপ্ চাপ। নির্ম্মল উঠে প'ড়ে বললে, 'আচ্ছা, আজ তা' হ'লে আসি।' উর্ম্মিলা ছাদের আলসে থেকে মুখ বাড়িয়ে ওর দিদিকে ডাকলে......বাধা দিয়ে নির্ম্মল বললে: 'থাক থাক ওঁকে ব্যস্ত করছেন কেন? আমি নিজেইত নীচে যেয়ে দেখা ক'রে নিতে পারি।'

* * *

উর্ম্মিলার দিদি ওকে নামিয়ে দিয়ে নিজে কোথায় কোথায় বেড়াতে গেলেন কটক, কনারক্, পুরী......। আর খামোখা ইষ্টারের ছুটিতে উর্ম্মিলাকে জোর ক'রে কলকাতায় ধ'রে নিয়ে যেয়ে, দিয়ে গেলেন নষ্ট ক'রে, একটি পত্র-পরিচিতা আর পত্র-পরিচিতের মাঝখানকার রোমান্সটুকু। সেই যে ইষ্টারের ছুটি কাটিয়ে উর্ম্মিলা ফিরে এসেচে, ওর কলেজ খুললো... সেই থেকে ও অঙ্ক কষার আগের চেয়েও মন দিয়েচে। পানামা ব্লেড দিয়ে পেন্সিলের মুখ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হচ্চে। খস্ খস্ ক'রে ফুলস্কেপ্ কাগজের ভাঁজ কাটা হচ্চে। আর ক্রতপঙক্তিতে সেগুলো ভ'রে উঠচে, কিন্তু গল্প দিয়ে নয়।

সেই দিন থেকে ফিকে ফিরোজা রঙের আর একখানা খামও ওর টেবিলে দেখা গেল না। রাইটিং প্যাড টেনে নিয়ে, মাথার চুল এলো ক'রে দিয়ে সে-ও আর কারুকে চিঠি লিখলে না। কলেজের ছুটি হ'লে ও এখন দাবা খেলে, গল্প লেখে না। মাসিকপত্রের সম্পাদকেরা তাগাদা দিয়ে দিয়ে হতাশ হয়েচে।

শিক্ষার ট্র্যাজিডি

—দুর্—ছাই, বোটানিখানায় "গাছে ওঠা" চ্যাপ্টারটা গেল কোথায়?
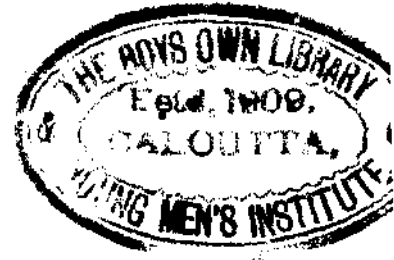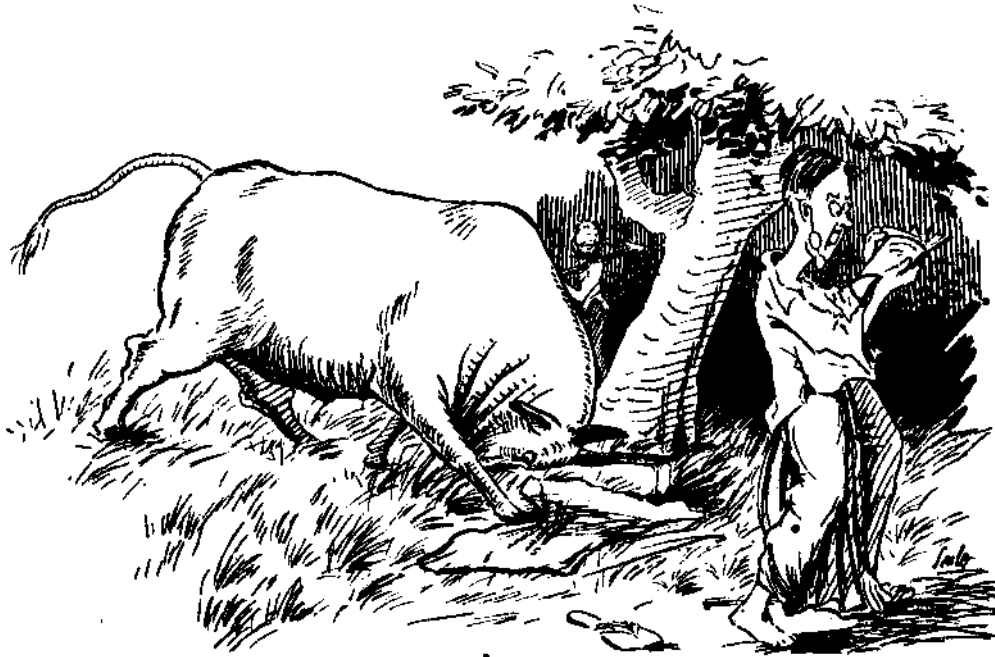
শরৎ চন্দ্রের 'চরিত্রহীন'

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি

'চরিত্রহীন' উপন্যাসের নামকরণে শরৎ চন্দ্র যেন আমাদের প্রচলিত সমাজনীতির আদর্শকে প্রকাশ্য ভাবেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন—সমাজ-বিচারের মানদণ্ডকে যেন স্পর্দ্ধিত বিদ্রোহের সহিতই অতিক্রম করিয়াছেন। সতীশ-সাবিত্রীর অপরূপ প্রেমলীলাই গ্রন্থের প্রধান বিষয় — ইহারই চতুঃপার্শ্বে উপেন্দ্র-দিবাকর-কিরণময়ী আপন আপন দুশ্ছেদ্য জাল বয়ন করিয়া প্রেমের রহস্যময় জটিলতা আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। সতীশ ও সাবিত্রীর মধ্যে সম্পর্কটী সমস্ত সামাজিক বৈষম্য ও অবস্থার বিসদৃশতা অতিক্রম করিয়া লঘু-তরল হাস্য-পরিহাস ও সস্নেহ তত্ত্বাবধানের মধ্য দিয়া যে কিরূপে একেবারে অনিবার্য্য, অসংবরণীয় প্রেমের পর্য্যায়ে গিয়া দাঁড়াইল প্রণয়-ইতিহাসের সেই চিরপুরাতন অথচ চিররহস্যমণ্ডিত কাহিনীটি এখানে অদ্ভুত সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। প্রথম হইতেই এই সম্পর্কটী মনিব-ভৃত্যের সাধারণ ব্যবহারের মাত্রা অনুসরণ করে নাই। সতীশের পরিহাস, উদ্দেশ্যে নির্দ্দোষ হইলেও সুরুচি-সঙ্গত ছিল না; সাবিত্রীও সতীশের কল্যাণ-কামনায় তীব্র শ্লেষ ও নির্ভীক স্পষ্টবাদিত্বের দ্বারা প্রণয়িনীরই মর্য্যাদা দাবী করিত, এবং সতীশের প্রণয়জ্ঞাপক পরিহাসগুলি সে উপভোগই করিত; তাহাকে গোড়া হইতে সংযত করিবার কোনই চেষ্টা সে করে নাই। মোটের উপর ব্যাপারটা একটা সাধারণ ইতর, কলঙ্কিত রূপ-মোহের মতই দাঁড়াইতেছিল; ঠিক এই সময় সাবিত্রীর অদ্ভুত আত্মসংযম ও প্রণয়াস্পদের আন্তরিক হিতৈষণা ইহাকে খুব উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়া দিল। যেমন অস্পষ্ট ও শ্বাসরোধকারী ধূম্র-যবনিকার অন্তরাল হইতে কাঞ্চনবর্ণ অগ্নি ধীরে ধীরে নিজ জ্যোতির্ম্ময় রূপ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই সমস্ত হাস্য-পরিহাস, মান-অভিমান ও নিষ্ঠুর ঘাত-প্রতিঘাতের আবরণ ভেদ করিয়া প্রেমের দীপ্ত সৌন্দর্য্য বাহির হইয়া পড়িল। এই প্রেমের সুস্পষ্ট আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই সাবিত্রীর ব্যবহারের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল। সে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সাম-লাইয়া লইল, ও সতীশের উদ্দাম, বাধাবন্ধহীন লালসাকে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়া প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল। আপনার সম্বন্ধে একটা হীন কলঙ্ক প্রচার করিয়া নিজেকে সর্ব্বপ্রযত্নে সতীশের সান্নিধ্য হইতে অপসারিত করিল, এবং রিক্ততা ও অপমানের সমস্ত বোঝা স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়া সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের মধ্যে আত্মগোপন করিল।

সাবিত্রীর লাঞ্ছিত মিথ্যা-কলঙ্ক-দুর্ব্বহ জীবনে চরম সার্থকতা আসিল, যখন তাহার কঠোরতম বিচারক উপেন্দ্র তাহার গুণমুগ্ধ ভক্ত হইয়া দাঁড়াইল, ও তাহাকে নিজ রোগ-জর্জ্জর, শোক-দীর্ণ শেষ জীবনের সঙ্গী করিয়া লইল। উপেন্দ্রের এই স্নেহাকর্ষণই তাহার প্রতি সমাজের নির্ম্মম অত্যাচারের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। সাবিত্রীর চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, তাহার এই অমানুষিক আত্মসংযম ও চরিত্র-গৌরবের মধ্যে সর্ব্বত্রই একটা বাস্তবতার সুর অসন্দিগ্ধভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে কোন দিনই একজন পৌরাণিক শাপ-ভ্রষ্টা দেবী বলিয়া আমাদের ভ্রম হয় না। সতীশ-সাবিত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কেবল এক স্থানেই একটু অবাস্তবতার স্পর্শ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কলিকাতার মেসে যখন তাহাদের প্রণয়-সম্পর্কটী ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল, তখন লেখক এই ক্রম-বর্দ্ধমান প্রেমের যৌবন-পরিণতির জন্য যে অনুকূল, বাধাবন্ধহীন অবসর রচনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তব জীবনে মেলে না। বেহারী ও বামুনঠাকুর উভয়েই এই নবীন আবি-র্ভাবটীকে সশ্রদ্ধ সম্ভ্রম ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়াছে, তাহার চারিদিকে ভক্তি-অর্ঘ্য রচনা করিয়া ও আরতি-দীপ জ্বালাইয়া ইহার দেবত্ব স্বীকার করিয়া

লইয়াছে। রাখাল বাবুর ঈর্ষ্যার কথা মাঝে মধ্যে শোনা যায় বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই ঈর্ষ্যা-কলুষিত বাষ্প প্রেমের নির্ম্মলতার উপর কোন কলঙ্কের দাগ বসাইতে পারে নাই। সতীশ-সাবিত্রীর অনুপম প্রেম-কাহিনীর কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের কেবলই মনে হয়, ইহার মাধুর্য্য ও বিশুদ্ধি কত সূক্ষ্ম সূত্রের উপরেই দাঁড়াইয়া আছে। একটী কুৎসিত ইঙ্গিত, একটী ইতর বিদ্রূপ ইহার সমস্ত মাধুর্য্যকে নিঃশেষে শুকাইয়া ইহার অন্তর্নিহিত কদর্য্যতাকে অনাবৃত করিয়া দিতে পারিত। সমস্ত মেস যেন তাহার সঙ্কীর্ণ সন্দেহ ও বিদ্বেষ-কলুষিত মনোবৃত্তি সংহরণ করিয়া নীরব সম্ভ্রমে এই প্রেম-মাধুরীকে নিরীক্ষণ করিয়াছে ও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ অনুকূল অবসর আমাদের কাছে অস্বাভাবিক বলিয়াই ঠেকে—মনে হয় যেন বাস্তবতার ঠিক মর্ম্মস্থলে অবাস্তবতার একটা সূক্ষ্মতর দানা বাঁধিয়াছে।

কিন্তু উপন্যাসমধ্যে যে চরিত্রটী সর্ব্বাপেক্ষা চমকপ্রদ, সে কিরণময়ী। কিরণময়ী শরৎ চন্দ্রের অত্যদ্ভুত সৃষ্টি। আমাদের বঙ্গদেশের সমাজ ও পরিবারে, বা উপন্যাসের পাতায় যত বিভিন্ন প্রকৃতির রমণীর দর্শন মিলে, কিরণময়ীর তাহাদের সহিত একেবারেই কোন মিল নাই। তাহার চরিত্রে অনন্যসাধারণ শক্তি, দৃপ্ত তেজস্বিতা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি ও বিচার-বুদ্ধির সহিত একেবারে কুণ্ঠাহীন, সংস্কারপ্রভাবমুক্ত, ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত সুবিধাবাদের এক আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ হইয়াছে।

কিরণময়ীর সহিত প্রথম পরিচয়ের দৃশ্যই আমাদের মনে গভীর দাগ কাটিয়া বসে। জীর্ণ, ধ্বংসোন্মুখ গৃহে মুমূর্ষু স্বামীর সান্নিধ্যে তাহার দীপ্ত, অশোভন, বিদ্যুৎরেখার ন্যায় রূপ, যত্ন-রচিত প্রসাধন ও সন্দেহের তীব্রজ্বালাময় বিষোদ্গার এক মুহূর্ত্তেই একটা শ্বাসরোধকারী অসহনীয় আব-হাওয়ার সৃষ্টি করে। তারপর অনঙ্গ ডাক্তারের সহিত তাহার প্রায় প্রকাশ্য প্রেমাভিনয়, তাহার শাশুড়ীর এই বীভৎস আচরণে প্রশ্রয়-দান, ও স্বামীর নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য—সকলে মিলিয়া আমাদের বিতৃষ্ণাকে বিজাতীয়রূপ তীব্র করিয়া তোলে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দৃশ্যপটের অভাবনীয় পরিবর্ত্তন। কিরণময়ী অত্যল্পকালের মধ্যেই উপেন্দ্রের মহত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, স্বীয় নীচ সন্দেহের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছে ও নব-জাগ্রত নিষ্ঠার সহিত স্বামিসেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশেষতঃ সতীশের সহিত তাহার সম্বন্ধটী নিতান্ত সহজ মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে, ও সতীশের মুখে উপেন্দ্রের অতুলনীয় পত্নীপ্রেমের কাহিনী শুনিয়াই তাহার নিজের পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে। এই নবীন প্রেমানুভূতির প্রথম ফল অনঙ্গ ডাক্তারের প্রত্যাখ্যান ও ঐকান্তিক, অক্লান্ত স্বামিসেবা। তারপর দিবাকরের সহিত শাস্ত্রালোচনার সময় তাহার চরিত্রের আর একটা অপ্রত্যাশিত দিক্ উদ্ঘাটিত হইয়াছে—তাহার বিচার-শক্তির আশ্চর্য্য স্বাধীনতা, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য ও শাস্ত্রানুশাসনের যুক্তিহীন জোর-জবরদস্তির বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ তাহার চরিত্র যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যে প্রভাবে অনুপ্রাণিত, তাহার উপর বিস্ময়কর আলোক-পাত করে। এই অসামান্য মানসিক শক্তির পরিচয় দিবার পরেই আবার একটা সাধারণ রমণীসুলভ ভাবোচ্ছ্বাস আসিয়া এই আশ্চর্য্য নারীর চরিত্র-জটিলতার সাক্ষ্য দান করে। সুরবালার নিঃসংশয় বিশ্বাস-প্রবণতার ইতিহাসে তাহার মনে ঈর্ষ্যার এক অদম্য উচ্ছ্বাস ঠেলিয়া উঠিয়াছে, ও এই অতি-প্রশংসিতা রমণীকে যাচাই করিয়া লইবার এক প্রবল ইচ্ছা তাহাকে সুরবালার সহিত পরিচিত হইবার দিকে অনিবার্য্য বেগে আকর্ষণ করিয়াছে। এখানেও সুরবালার যুক্তিহীন বিশ্বাসের নিকট কিরণময়ীর সমস্ত তর্কশক্তি পরাজিত হইয়া নীরব হইয়াছে। সুরবালার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের পর উপেন্দ্রের সহিত তাহার যে বোঝাপড়া হইয়াছে, তাহার অসঙ্কোচ, অনাবৃত প্রকাশ্যতার দুঃসাহস আমাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়। নারীর মুখে এরূপ স্বচ্ছ-সরল

স্বীকারোক্তি, এরূপ অনবগুণ্ঠিত আত্মপরিচয়, এরূপ নির্ভীক, অকুণ্ঠিত প্রেমনিবেদন বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাস-ক্ষেত্রে অশ্রুতপূর্ব্ব। নারীর প্রেম-রহস্য উদ্‌ঘাটনের একটি নিখুঁত, অনবদ্য চিত্রহিসাবে এই দৃশ্যটি চির-স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সুরবালার প্রতি অসংবরণীয় ঈর্ষ্যার বাষ্পই যেন তাহার সম্ভ্রম-সঙ্কোচের সমস্ত ব্যবধান উড়াইয়া দিয়া তাহার অন্তরের উষ্ণ গৈরিক-স্রাবকে বাহিরের দিকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। উপেন্দ্র তাহার স্ফটিক-স্বচ্ছ পবিত্রতা সত্ত্বেও এই মহিম-ময় প্রেমনিবেদনের অর্ঘ্য মাথায় উঠাইয়া লইয়াছে, ও তাহাদের অস্বীকৃত সম্বন্ধের প্রতিভূস্বরূপ দিবাকরকে কিরণময়ীর স্নেহ-হস্তে ন্যস্ত করিয়া আপাততঃ তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

তারপর দিবাকরের সস্নেহ অভিভাবকত্বের ভার লইয়া কিরণময়ীর জীবনের আর একটি ক্ষণস্থায়ী অধ্যায় খুলিয়াছে। দিবাকরকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া, হাস্য-পরিহাস করিয়া, তাহার অনভিজ্ঞ সাহিত্যিক-প্রচেষ্টাকে সরস বিদ্রূপবাণে বিদ্ধ করিয়া তাহার দিনগুলি কাটিতেছিল। দিবাকরের সহিত সাহিত্য-আলোচনার প্রসঙ্গে লেখক কিরণময়ীর মুখে রোমাণ্টিক উপন্যাসে বর্ণিত প্রণয়চিত্রের উপর নিজেরই মতামত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রণয়ের মূলে কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা নিবিড় উপলব্ধি নাই, কেবল অন্তঃসারশূন্য কথার কারুকার্য্য—বৃশ্চিক ও বজ্রমাত্র সম্বল করিয়া এই ব্যবসায়ে নামার কোন বাধা নাই। মন্তব্যগুলি অধিকাংশ স্থলেই সত্য এবং কঠোর সত্য — যদিও রোমাণ্টিক ঔপন্যাসিকদের সপক্ষে বলা যায় যে, প্রেম-কাহিনী তাঁহাদের মুখ্য বর্ণনীয় বস্তু নহে, বীরত্বপূর্ণ দুঃসাহসিক আখ্যায়িকাগুলিকে গ্রথিত করিবার ঐক্যসূত্র হিসাবেই ইহার ব্যবহার বেশী। দিবাকরের সহিত কিরণময়ীর কথোপকথনে লেখকের যে উচ্চ মনন-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সত্যই অতুলনীয়— প্রেমের প্রকৃতি ও দুর্ব্বার শক্তি, চিত্তজয়ের দুরূহতা ও পদস্খলনের বিচার বিষয়ে যে সূক্ষ্ম চিন্তাপূর্ণ গভীর আলোচনা কিরণময়ীর মুখে দেওয়া হইয়াছে, তাহা শুধু বঙ্গ-সাহিত্যে নয়, সর্ব্বসাহিত্যেরই শ্রেষ্ঠ চিন্তার সহিত সমকক্ষতার স্পর্দ্ধা করিতে পারে।

কিরণময়ীর চরিত্র-আলোচনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমরা দেখি যে, প্রেমতত্ত্বের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে দিবাকরের সহিত তাহার এমন একটা লঘু-তরল হাস্য-পরিহাসের পালা চলিতেছে, যাহার মধ্যে গোপন আসক্তির বীজ নিহিত থাকার খুবই সম্ভাবনা। এই রসালাপের মধ্যে কিরণময়ীর নিজের চিত্তবিকার থাকুক বা নাই থাকুক, দিবাকরের মনে যথেষ্ট দাহ্য পদার্থ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন উপেন হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া দিবাকর ও কিরণময়ীর সম্পর্কের অনুচিত ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করিয়া ফেলিল এবং কিরণময়ীকে কঠোর তিরস্কার করিয়া দিবাকরকে সেখান হইতে স্থানান্তরিত করিবার কড়া হুকুম জারি করিয়া গেল। এই অন্যায় ও অসহনীয় আঘাতে কিরণময়ীর ভিতরের পিশাচী তাহার সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষা, তাহার তীক্ষ্ণ ও মার্জ্জিত বুদ্ধিকে ঠেলিয়া দিয়া মাথা তুলিয়া উঠিল, এবং সেই ক্রোধোন্মত্তা রমণী উপেনের উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য তাহার পরম স্নেহের পাত্র দিবাকরকে কুক্ষিগত করিয়া আরাকান-যাত্রার জন্য পা বাড়াইল।

সমুদ্রযাত্রার মধ্যেই দিবাকর ও কিরণময়ীর সম্পর্কটা অনেক ক্ষণস্থায়ী, সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনের মধ্যে পাক খাইয়া আবার প্রায় পূর্ব্বস্থানটীতেই স্থির হইল। এই সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনের তরঙ্গগুলি শরৎ চন্দ্র আশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টির সহিত লক্ষ্য ও প্রকাশ করিয়াছেন। উপেন্দ্রের অনস্তিত্বের প্রবল প্রভাবই এই দুইটী হৃদয়ের বেগবান্ বীচিবিক্ষেপগুলি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। কিরণময়ী উপেন্দ্রের মাথা হেঁট করিবার উদ্দেশ্যেই দিবাকরের অধঃপতনের জন্য তাহার সমস্ত মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে; উপেন্দ্রের স্মৃতিতে মুহ্যমান দিবাকর তাহার বেদনাতুর চিত্তের বিহ্বলতার জন্যই অজ্ঞাতসারে এই মায়াবন্ধন উপেক্ষা করিয়াছে। তার পর উপেন্দ্রের

আলোচনায় উভয়েরই চিত্তমালিন্য কাটিয়া গিয়া মন আবার কতকটা প্রসন্ন-নির্ম্মল হইয়া উঠিয়াছে। কিরণময়ী দিবাকরের সহিত তাহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কটা স্থির করিয়া লইয়া তাহার মায়াজাল সংবরণ করিয়াছে ও পুনরায় স্নেহশীলা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর আসন অধিকার করিয়াছে। দিবাকর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ততটা নিঃসংশয় না হইয়াও কিরণময়ীর এই পরিবর্ত্তনে একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছে — কিন্তু রূপমোহ তাহার মনের একটা কোণে বাসা লইয়া ভবিষ্যতের জন্য উষ্ণ উগ্র কামনার নিঃশ্বাস সঞ্চয় করিতে সুরু করিয়াছে। জাহাজের মধ্যে সমাজ ও ব্যক্তির অধিকার লইয়া উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাও লেখকের গভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়।

সর্ব্বশেষে আরাকানে কামিনী বাড়ীওয়ালীর বাড়ীতে কুৎসিত আবেষ্টনের মধ্যে দিবাকর-কিরণময়ীর সম্পর্ক তাহার সমস্ত মাধুর্য্য হারাইয়া চরম অধঃপতনের মধ্যে ধূলিশায়ী হইয়াছে। কিরণময়ীর মধ্যে এখনও কতকটা সংযম ও শালীনতা অবশিষ্ট আছে; বিশেষতঃ দিবাকরের প্রতি তাহার প্রেম না থাকায় সে সেদিকে আপনাকে সম্পূর্ণ স্থির ও অবিচলিত রাখিয়াছিল। কিন্তু দিবাকর প্রচণ্ড লালসার সহিত যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ইতরতা ও নির্ল্লজ্জতার শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই অধঃপতনের কদর্য্য শ্রীহীন চিত্রটী নির্ম্মম বাস্তবতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে—ইহা শরৎ চন্দ্রের বাস্তবাঙ্কন-ক্ষমতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

এই চরম দুর্দ্দশার মাঝে পূর্ব্বজীবনের গৌরবময় স্মৃতি ও মুক্তির আশ্বাস লইয়া আসিয়া পড়িল সতীশ। সতীশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কিরণময়ীর মুখ হইতে জীর্ণ ও কদর্য্য মুখোস খসিয়া পড়িল, আত্মসম্ভ্রম ও গৌরবের আলোক আবার তাহাকে বেষ্টন করিল। উপেন্দ্রের মৃতপ্রায় অবস্থার কথা শুনিয়া তাহার মূর্চ্ছাই তাহার মনোভাবের প্রকৃত সংবাদ সকলের গোচর করিয়া দিল। সে ও দিবাকর, সতীশের ক্ষমাশীল অভিভাবকত্বে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য জাহাজে চড়িয়া বসিল।

এইখানেই কিরণময়ীর বিচিত্র ও বুদ্ধিপ্রদীপ্ত চরিত্রটী একটা মূঢ় বিহ্বলতা ও মনোবিকারের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষে তলাইয়া দিল। যে তীক্ষ্ণ মননশক্তি অসঙ্কোচে বেদ-উপনিষদের সমালোচনা করিয়াছিল, প্রেম ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে অদ্ভুত মৌলিকতাপূর্ণ বিশ্লেষণে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা প্রেমাস্পদের আসন্ন মৃত্যুর দুঃসহ আঘাতে একেবারে অসংলগ্ন পাগলামির দুই একটা সূত্রহীন, ভাঙ্গা-চোরা উক্তিতে পর্য্যবসিত হইল। ধর্ম্মবোধহীন হৃদয়সম্পর্করহিত বুদ্ধির কি অভাবনীয় পরিণতি!

কিরণময়ীর চরিত্রটী আগাগোড়া পর্য্যালোচনা করিলে উহার স্বাভাবিকতা ও সঙ্গতি সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়া উঠে। উহার ব্যবহারের সর্ব্বাপেক্ষা বিপরীতমুখী বিন্দুগুলির একই জীবনে সামঞ্জস্য করা যায় কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া দুরূহ। তাহার ক্রুদ্ধ ও ইতর সংশয় ও গভীর সহানুভূতিপূর্ণ স্বচ্ছ অন্তর্দৃষ্টি, তাহার অনঙ্গ ডাক্তারের সহিত প্রেমাভিনয় ও অক্লান্ত স্বামিসেবা, উপেন্দ্রের প্রতি গভীর একনিষ্ঠ প্রেম ও দিবাকরের সহিত পলায়ন, তাহার বেদ-বেদান্তের আলোচনা ও অসংলগ্ন প্রলাপ—এ সমস্তের মধ্যে বিচ্ছেদ ও অসঙ্গতি এতই গভীর যে, একই জীবনবৃন্তে এতগুলি বিচিত্র বিকাশের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস পীড়িত হইতে থাকে। এই অবিশ্বাস সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সমস্ত পরস্পরবিরোধী বিকাশগুলির মধ্যে গ্রন্থিবন্ধন যতটা দূর হওয়া সম্ভব, তাহা হইয়াছে—এই সমস্ত সূক্ষ্ম ও পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তনের যতটা সঙ্গত ও সন্তোষজনক কারণ দেওয়া যায়, তাহার অভাব হয় নাই। কিরণময়ীর জীবনের মুখবন্ধটা—তাহার প্রথম যৌবনের প্রেমহীন নীরস স্বামিসাহচর্য্য ও ধর্ম্মসংস্কারের একান্ত অভাব—ধরিয়া লইলে পরবর্ত্তী পরিণতিগুলি অচ্ছেদ্য কারণ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া নিতান্ত অনিবার্য্যভাবেই আসিয়া পড়ে। এক একবার মনে হয় যে, যাহার বিচার-বুদ্ধি এত গভীর ও অন্তর্দৃষ্টির আলোকে উজ্জ্বল তাহার ব্যবহারিক জীবনে এরূপ

কদর্য্য অভিব্যক্তি সম্ভব কি না,—স্বচ্ছ ও উদার বুদ্ধি উদগ্র কামনার ধূমে এমন সম্পূর্ণ ভাবে আচ্ছন্ন হইতে পারে কি না। কিন্তু বুদ্ধি ও প্রবৃত্তির মধ্যে যে গভীর অনৈক্য—তাহাই মানব-জীবনের একটা অমীমাংসিত রহস্য; এবং এই জ্ঞানের আলোকে আমরা কিরণময়ী-চরিত্রের অসঙ্গতিগুলিকে অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। কেবল সর্ব্বশেষে তাহার মস্তিষ্ক-বিকারের চিত্রটী অতি আকস্মিক হইয়াছে—উপেন্দ্রের আসন্ন মৃত্যুর সংবাদে যে মূর্চ্ছা তাহার প্রেমের গোপন কথাটী সুবিদিত করিয়া দিল, তাহার ঘোর যে তাহার বুদ্ধিকে চিরকালের জন্য আচ্ছন্ন অভিভূত করিবে তাহার ইঙ্গিত সেরূপ সুস্পষ্ট হয় নাই। মোটের উপর কিরণময়ী-চরিত্রের অসাধারণ জটিলতা ও দিগন্তব্যাপী প্রসার উপন্যাস-সাহিত্যে অতুলনীয় এবং ইহার আলোচনা আমাদের মনকে শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া ফেলে।

এই সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত জটিল, প্রতিরুদ্ধ কামনার গোপন ক্লেদ-পিচ্ছিল, উত্তাপক্লিষ্ট দৃশ্য হইতে সতীশ-সরোজিনীর প্রেম-কাহিনীর মুক্ত ও শীতল বাতাসে পলায়ন করিয়া আমরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। সাবিত্রীতে প্রেমের যে দীন, চীরপরিহিত ভিক্ষুকমূর্ত্তি ও কিরণময়ীতে তাহার যে ভ্রূকুটি-কুটিল নরকাগ্নিবেষ্টিত ঈর্ষ্যাবিকৃত ছদ্মবেশ আমাদিগকে ভিতরে ভিতরে পীড়িত করিতেছিল, সরোজিনী-চরিত্রে এই সমস্ত দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গিয়া সেই প্রেমের চিরপরিচিত প্রসন্ন-নির্ম্মল রাজবেশ আমাদের চক্ষুর উপর উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এখানে তাহার কোন বিকৃতি নাই, কোন বহ্নিজ্বালাময় অস্বাভাবিক উত্তাপ নাই, অবিরাম সংঘর্ষের ও কণ্ঠরোধের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস নাই। সতীশ-সরোজিনীর প্রেম অনেকটা স্বাভাবিক পথে, মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়াছে; তাহার প্রবাহমধ্যে দুই একটী যে বাধা দেখা দিয়াছে, তাহারা যাত্রাপথে একটু করুণ উচ্ছ্বাস তুলিয়াছে মাত্র, আর কোন ভয়াবহ পরিণতির সৃষ্টি করে নাই। এই সরল ও স্বাভাবিক ভালবাসার অবতারণা শরৎ চন্দ্রের প্রেম-কল্পনার বৈচিত্র্য ও প্রসারের নিদর্শন।

সুরবালা ও কিরণময়ী প্রেম-জগতের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু। আমাদের সনাতন পাতিব্রত্য, তাহার সমস্ত অখণ্ড বিশ্বাস ও অবিচলিত ধর্ম্মসংস্কার লইয়া যুগ-যুগব্যাপী সাধনা ও অনুশীলনের ফল লইয়া, সুরবালাতে মূর্ত্তিমান্ হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে তাহার আবির্ভাব স্বল্পসংখ্যক স্থলে; কিন্তু তাহার প্রভাব একদিকে উপেন্দ্রের ও অপরদিকে কিরণময়ীর উপর স্থায়ীভাবে বিস্তৃত হইয়াছে। সে উপেন্দ্রের হৃদয় এমন অবিসংবাদিত ভাবে অধিকার করিয়াছে যে, কিরণময়ীর জন্য সেখানে সূচ্যগ্রপরিমিত স্থানও নাই—কোন ছলে, দয়া-সমবেদনার ছদ্মবেশেও পরস্ত্রী-প্রেম সেখানে উঁকিঝুঁকি মারিতে সাহস করে নাই। আবার সে-ই কিরণময়ীকে ভালবাসা শিক্ষা দিয়াছে—কিরণময়ীর হৃদয়ে যে দ্বারটা চিররুদ্ধ ছিল, তাহা তাহারই ইন্দ্রজালস্পর্শে মুক্ত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির রমণী দুই উপগ্রহের মত এক উপেন্দ্রেরই কক্ষপথে আবর্ত্তিত হইয়াছে। সুরবালা-চরিত্রের অধিক বিশ্লেষণ নাই; কিন্তু সে ও তাহার মনোরাজ্য আমাদের এত পরিচিত যে, তাহাকে চিনাইতে পরিচয়-পত্র অনাবশ্যক। 'চরিত্রহীনে' সুরবালা ও 'গৃহদাহে' মৃণাল প্রভৃতি প্রমাণ করে যে, শরৎ চন্দ্রের দৃষ্টি বা সহানুভূতি কেবল নিষিদ্ধ প্রেমের প্রতিই সীমাবদ্ধ নহে—পুরাতনের রসও তিনি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

গ্রন্থমধ্যে পুরুষ-চরিত্রগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপেন্দ্র, সতীশ, দিবাকর সকলেই খুব সূক্ষ্ম ও জীবন্তভাবে চিত্রিত হইয়াছে। প্রত্যেকেরই কথাবার্ত্তা, চিত্ত-বিশ্লেষণ ও প্রকৃতির তারতম্য নিপুণভাবে স্বতন্ত্র করা হইয়াছে। বিশেষতঃ গ্রন্থের নায়ক সতীশের চরিত্র চমৎকার ফুটিয়াছে। তাহার সমস্ত ত্রুটি-দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তাহার মধ্যে যে উদারতা ও

মহত্ব, যে স্নেহশীল ক্ষমাপরায়ণ হৃদয় আছে তাহার মাধুর্য্য আমাদিগকে অনিবার্য্যভাবে আকর্ষণ করে। সাবিত্রীর প্রতি তাহার দুর্জ্জয় আকর্ষণ ও সরোজিনীর প্রতি ধীর, লজ্জা-কুণ্ঠিত ভালবাসা — এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে। 'চরিত্রহীন' বঙ্গ-উপন্যাস-সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—ইহার পাতায় পাতায় যে জীবন-সমস্যার আলোচনা, যে গভীর অভিজ্ঞতা, যে স্নিগ্ধ, উদার সহানুভূতি ছড়ান রহিয়াছে, তাহা আমাদের নৈতিক ও সামাজিক বিচার-বুদ্ধির একটা চিরন্তন পরিবর্ত্তন সাধন করে। *

* 'উদয়ন'-কার্য্যালয়ে শরৎ চন্দ্রের অষ্টপঞ্চাশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শ্রদ্ধাবাসরে পঠিত।

অকরুণ

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

সেদিন মঙ্গলবার, সাতাশে আষাঢ় —
বরষণ-শীতল দুপুরে
তোমারে শিলঙ্-মেলে তুলি, চুপিসাড়ে
বাড়ীতেই আসিলাম ঘুরে ;
মনে হ'ল যেন তার প্রতি ধূলিকণা
বিঁধিতেছে কাঁটার মতন
কোন্ ক্ষণে একপল ছিনু অন্যমনা
খোয়া গেছে অমনি রতন।

* * *

প্রাতে যার চারিদিকে ঝলকে ঝলকে
রবিকর প'ড়েছিল এসে
আগেকার রাতে যেথা পলকে পলকে
দেখেছিনু চাঁদ গেছে হেসে ;
সে ভবনে একেবারে জমাট আঁধার
দিবসেই চেপে ধরে বুক
বেদনার পিশাচিনী নিমেষে আমার
শুষিয়াছে যেন সব সুখ।

তোমার-কেশের-গন্ধে-সুরভি শয্যায়
বুক দিয়া কেঁদে কেঁদে মরি ;
শুভ্র তা'র অবয়বে, মজ্জায় মজ্জায়
স্পর্শ তব রেখেছে সে ধরি।
মনে হয় ডেকে ডেকে সে কেবল বলে,
'দয়িতারে কোথা দিয়ে এলে ?
বসনে বেঁধেছ গেরো, মূঢ়তার ফলে
হৃদয়ের খাঁটি সোনা ফেলে'।

* * *

আঁখি-তারা হারাইল নীলিমা তাহার
নাহি রঙ্ ধরার কোথাও
এস' ফিরে প্রিয়তমে এ গেহে আবার
মরমের গ্লানিমা ঘোচাও।
আজি আমি সাথীহীন, বহুজন মাঝে
একা আমি নিশিদিন'মান
তোমার কি এতটুকু প্রাণে নাহি বাজে
পাওনা কি শুনিতে আহ্বান ?

সর্ব্বাণী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৯)

বকুলের ঘনচ্ছায়ার মধ্যে গোপনে বসিয়া পঞ্চম তানে সুর বাঁধিয়া কোকিল অশ্রান্তকণ্ঠে গাহিয়া চলিয়াছে, কুহু, কুহু, কুহু, কুউ। বাঁধা ঘাটের আর একপাশে একটা আমগাছ নূতন বোলের গন্ধে মৌমাছিদের মাতাল করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে। তলায় কতকগুলি ক্ষুদ্র ফুল পড়িয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে বাতাস সেগুলি উড়াইয়া আনিয়া জলে ভাসাইয়া দিতেছে। জলের ধারে তৃণাস্তীর্ণ কূলের উপর একটা সারস পাখী তার লম্বা গলাটি পিঠের উপর বাঁকাইয়া দিয়া ধোঁয়াটে রঙের ডানার মধ্যে ঠোঁটটা ঢুকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। একটা বক চঞ্চল চক্ষে জলের ভিতরকার অবস্থা লক্ষ্য করিতে করিতে এক পায়ে দাঁড়াইয়া আছে। আর সেই সমস্ত মধ্যাহ্ন প্রকৃতিকে ব্যাপ্ত করিয়া একটা ঔদাস্তভরা সুর যেন কোন্ যন্ত্রহীন যন্ত্রীর অফুরন্ত রাগিণীর সঞ্চয়ের মধ্য হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।··· পুকুর ঘাটের দিকে মুখ করিয়া জানালার ধারে একটা আরাম কেদারায় আধশোয়া হইয়া সর্ব্বাণী একখানা নভেল পড়িতেছিল। পড়িতেছিল ঠিক বলা চলে না, বইখানার পাতা খুলিয়া তাহার মধ্যে মনটাকে কোনমতে নিবিষ্ট করিয়া রাখিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করার পর, এই কিছুক্ষণ হইল ব্যর্থকাম হইয়া বন্ধ নভেলের পাতাখানার মধ্যে চাঁপার কলির মত একটী আঙ্গুল রাখিয়া চুপ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট চক্ষে চাহিয়া ছিল। স্নানের পর দীর্ঘ কেশের শেষপ্রান্তে একটী গ্রন্থি দিয়াছিল, কোন্ সময় তাহা এলাইয়া গিয়াছে, বাতাসে কপালের শ্লথ চূর্ণ কুন্তলগুলি বীচি-বিক্ষেপকারী নদী-তরঙ্গের মতই তালে তালে নর্ত্তিত হইতেছে। সুমসৃণ কৃষ্ণ কেশ-দামের মধ্য হইতে সুবাসিত কেশতৈলের মৃদু সুরভি উত্থিত হইয়া ঘরের মধ্যে মৃদুভাবে সংস্পৃত হইতেছিল। যদি শিথিল বক্ষোবাসের উপর দিয়া হৃদ্‌স্পন্দন অনুভূত না হইত, তাহা হইলে মনে হইত, অলস মধ্যাহ্নের একখানি আলস্য-শিথিল তনুলতার প্রতিকৃতি বুঝি কোন নিপুণ চিত্রকর আঁকিয়া গিয়াছে।

পিছন দিক্‌কার নিমগাছের পুরাতন কোটরে বসিয়া একটা ঘুঘু ডাকিতেছিল, কোথা হইতে একটা পাপিয়া হঠাৎ চীৎকার করিয়া শুনাইয়া দিল,—'চোক্ গেল'···

সর্ব্বাণী যেন ঈষৎ শিহরিয়া তার চিন্তামগ্নতা হইতে জাগিয়া উঠিল। বইএর অঙ্গুলি দিয়া চিহ্নিত পাতাখানা খুলিয়া ফেলিল। মোটে ২৭-এর পাতা; পড়িবার মত ভাল বইও নয়, ভাল মনও নয়। বাবার শরীরে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, তাহাতে আর কোনই সংশয় নাই! দিন দিনই তার সুপ্রকট চিহ্নসকল নানা মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বাণীকে তারস্বরে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিতেছে। কেননা, সর্ব্বাণীর মন জানে, বাপের মনস্তাপের মস্ত বড় কারণ হইয়া রহিয়াছে সে নিজেই। তার এই অভূতপূর্ব্ব অবস্থা, না কৌমার্য্য না বৈধব্য—

এ এক হেঁয়ালীর মতই অহোরাত্র তাঁহার পিতৃ-হৃদয়কে নিপীড়িত করিতেছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; অথচ এমনি প্রবল বাৎসল্যরসে ভরা মন, জোর করিয়া একটা কথা বলিবেন, সে প্রবৃত্তিই হয় না। সর্ব্বাণী চকিতের মত সে কথাও ভাবিয়াছে। এর চাইতে যদি তিনি জোর-জবরদস্তি করিতেন, সে যেন ঢের ভাল ছিল। সেও তাহা হইলে তাহা লইয়া কান্নাকাটি, রাগ-অভিমান করিতে পারিত। হয়ত জিতিত, না হয়—বাপের হুকুমকেই মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়া যাহা তাহার অদৃষ্টের নির্দ্দেশ থাকিত, তাহাই করিয়া ফেলিত। কিন্তু এ এক অদ্ভুত অবস্থা! না মুখে একটী কথাও বলিবেন, না মন হইতে মনের আপদকে ঝাঁটাইয়া বিদায় দিবেন। নিঃশব্দে এই যে এতটা সুমহৎ দুঃখভারকে বহন এবং অন্তরের ভিতর দিয়া অশেষভাবেই লালন করিয়া চলিয়াছেন, ইহা লইয়া মানুষ কয়দিন বাঁচিতে পারে? সর্ব্বাণী রাগিয়া কাঁদিয়া আজ পিতাকে গিয়া বলিয়াছিল,—

"বাবা! আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, আমার একটা গতি না হ'লে আর তোমার রক্ষে নেই! বেশ, তাই না হয় করো, যা' করলে তুমি সন্তুষ্ট হও, তাই হোক; শুধু এমন ক'রে ভেবে ভেবে তুমি প্রাণটা দিও না।"

সুরঞ্জন এত বড় ত্যাগের কথায় কেবলমাত্র হাতটা বাড়াইয়া দিয়া তার মাথাটাকে বারেক স্পর্শ করিয়াই ক্ষমাময় মৃদুস্নিগ্ধ হাস্যের সহিত উত্তর দিয়াছিলেন, "পাগ্‌লি! কে বললে তোকে, আমি তাই ভাব্‌ছি?" তার পর ঈষৎ গম্ভীর মুখে কহিলেন, "না, তোমায় আমি বাধ্য করতে চাইনে। যদি কখন ইচ্ছে ক'রে করতে চাও, লজ্জা ক'রো না; ব'লো,—আমার জন্যে কিছু ভেবো না।"

ইহার পর সর্ব্বাণী নিঃশব্দে বাপের দুই হাঁটুর উপর উপুড় হইয়া পড়িল, আর সুরঞ্জন একটী কথাও কহিলেন না, কেবল স্নিগ্ধ নেত্রে চাহিয়া কল্যাণবর্ষী শীতল দক্ষিণ হস্ত কন্যার মাথার উপর রাখিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। মনে মনে কি বলিলেন, বা কিছুই তিনি বলিলেন না, সে কথা জানা গেল না।

অনেকক্ষণ পরে সর্ব্বাণী আস্তে আস্তে মাথা তুলিয়া বাপের দিকে একটী বার না চাহিয়াই নতমুখে পাশ কাটাইয়া পলাইয়া আসিল। তখনও চোখের জলে তাহার মুখ ভাসিতেছে।

বই পড়ার বিড়ম্বনা কি এর পর আর চলে?

পুকুরধারে ত্রিভঙ্গঠামে হেলিয়া পড়া নারিকেল গাছের উপর হইতে টপ করিয়া নামিয়া একটা মাছ-রাঙ্গা ভাসমান একটা মাছকে এক মুহূর্ত্তেই শিকার করিয়া লইয়া গেল। সুপারী গাছের মাথায় বসিয়া একটা শঙ্খচিল হঠাৎ চিঁ চিঁ শব্দে চেঁচাইয়া উঠিয়া জাগিয়া যেন কাহার উদ্দেশ্যে কঠিন তিরস্কার বর্ষণ করিল। বকটা নিজের অক্ষমতার ধিক্কারের লজ্জায় দুই পায়ের উপর খাড়া হইয়া উঠিল এবং এই সব সম্মিলিত গোলযোগের ধাক্কায় সুখসুপ্ত বেচারী সারস তার লম্বা গলাটীকে পিঠের দিক্ হইতে সাম্‌নের দিকে ফিরাইয়া লইয়া ঘুমভাঙ্গা সজাগ চোখে একবার চারিদিকে খরভাবে চাহিয়া লইয়া লম্বা পায়ে পরিক্রমণ পূর্ব্বক অতি শীঘ্রই দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলিয়া গেল।

সর্ব্বাণী অন্যমনস্ক হইয়া এই সব দেখিতেছিল, কিন্তু চোখে পড়িলেও কোন কিছুই তার মনের মধ্যে প্রবেশপথ পাইতেছিল না, এমনিই গভীর চিন্তায় তার চিত্ত নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। আসল কথা, সে এখন আর বালিকা নাই। নিজের এবং অন্যের ভালমন্দ বুঝিতে পারার মত মনের অবস্থা তার এখন হইয়াছে। সে এখন স্পষ্টই বুঝিয়াছে, নিজের কৃতকার্য্যের দ্বারা সে নিজেকে তার ভগ্ন-হৃদয় পিতার কাছে তাঁর বাকি জীবনের সহিত একবারে শৃঙ্খলিত করিয়া দিয়াছে! যে মনের তেজে সে সেদিন তার পিতৃ-অপমানকারীকে নির্ম্মম প্রতিশোধ দিতে পারিয়াছিল, তার নারী-মর্য্যাদার যে অবমাননাকে সে নিষ্ঠুর প্রত্যাঘাত করিতে এতটুকুমাত্র দ্বিধা করে নাই, সে তেজ তার সমানই আছে। কৃতকার্য্যের

জন্য অনুতাপের লেশও তাহার চিত্ত যে অনুভব করিতেছিল তা-ও নয়; তথাপি এইটুকু সত্যকে অস্বীকার করিবার মত স্পর্দ্ধা তার ছিল না, তার বাপের দিক্ হইতে দেখিলে তার কাজটাকে খুবই সমর্থন করা যায় না।. সর্ব্বাণী তার পিতার একমাত্র সন্তান। মাতৃহারা সর্ব্বাণীকে তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে লালন করিয়াছেন। কোনদিন কোন ত্রুটীই সে তার পিতৃস্নেহের মধ্য হইতে খুঁজিয়া পায় নাই। এ বিবাহ সম্বন্ধেও সুরঞ্জন সর্ব্বাণীর সম্মতি চাহিয়াছিলেন, এমন কি, এতটা তাড়াতাড়ি বিবাহ হয়, তাঁর তা' ইচ্ছাও ছিল না, শুধু সর্ব্বাণী তার ছেলেমানুষী তাচ্ছিল্যের খেয়ালে কোনমতে কাজটা চুকাইয়া ফেলিয়া বাপকে নিশ্চিন্ত করিবার লোভেই জিদ করিয়া ইহাতে সম্মতি দিয়াছিল। তারপর টাকাকড়ি লইয়া যা' কিছু অপ্রিয় ব্যাপার ঘটিল, সে-ও সর্ব্বাণীর নিজেরই কৃতিত্ব, বাপ তার এ বিষয়ে ঘোরতর বিরুদ্ধই ছিলেন। সর্ব্বাণীর কার্য্যপ্রণালী যেমনই হোক, তাহা লইয়া সে ইচ্ছা করিলে সারা জীবন ধরিয়াই লড়িতে পারে, কিন্তু তাদের সেই যুদ্ধের ফলে তার বাপকে আহত করার অধিকার তার আছে কি না, সে কথাটা ঠিক মীমাংসা করা যায় না। যখন তা' সে করিয়াছে তখন ঐ আশাহত ও আহতকে লইয়া তাকে চিরদিনই বিড়ম্বিত হইয়া থাকিতে হইবে। পড়া-শুনা, দেশের কাজ, আর্ত্তের সেবা, অজ্ঞের শিক্ষাবিধান, অনুন্নতদের উন্নতি-প্রচেষ্টা, এ অভাগা দেশে কত দিকে কত কাজ, কোটী কোটী কণ্ঠের কি করুণ মর্ম্মবিদারী প্রার্থনা দশদিক্ ভরিয়া উত্থিত হইতেছে, সর্ব্বাণীকে তা' লোভাতুর করিয়া তোলে, স্তব্ধ মধ্যাহ্নে ও নিস্তব্ধ মধ্যরাত্রে নিদ্রাহীন দৃষ্টি মেলিয়া নিঃশব্দে সে জ্বলিয়া মরিতে থাকে, অথচ প্রাণপণ বলে নিজেকে তার সমুদয় প্রিয় বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, জোর করিয়া নিজের কানকে শুনাইয়া বলে, "আমার উপায় নেই, আমি থাকতে বাধ্য, বাবাকে আমি ছেড়ে যেতে পারি না।"

সে জানে সে যা' করিয়াছে তার ফলে সে একটুও অসুখী হয় নাই, কিন্তু তার বাবা তো তা' ভাবেন না। তাঁর শুষ্ক মুখ, আর বড় বড় দীর্ঘনিঃশ্বাসগুলাই যে সে কথা প্রকাশ করিয়া দেয়। তবু যতদিন চাকরী ছিল, এক রকমে কাটিয়াছে, বছর দুই চাকরী ছাড়িয়া বাড়ী আসিয়াছেন, যেন অতিষ্ঠ করিয়াছে। আত্মীয়েরা যে যার সরিয়া গেল, সমাজে কানাকানি, পথে পথে বিস্ময়, ঘটক-ঘটকীদের আনাগোনা, সর্ব্বাণী বাহিরে যতই এসব গম্ভীর ঔদাসীন্যে উড়াইয়া দিক, মনে কি তার ভালই লাগে?

"খুব ভাল ছেলে, সব কথা জানে, এক পয়সা চায় না, শুধু শাঁকাপরা মেয়েটীকে চায়।" পাত্র নিজেই ঘটক পাঠাইল। সুরঞ্জন কল জানিতেন, এর আগেও দু'একবার এ ঘটনা ঘটিয়াছে, সর্ব্বাণী বলিয়া দিয়াছে বিবাহে তার রুচি নাই, সেটা পরীক্ষিত সত্য। নাই বা সে করিল? তা' ছাড়া এ দেশের লোকাচারে দো-পড়া মেয়ের তো বিয়ে হয়ও না। কিন্তু এবার-কার এই ছেলেটী বিশেষ করিয়াই একটু জিদ জানাইল। সে ওসব মানে না, 'বাগ্‌দত্তা' কন্যার অন্যত্র বিবাহের বিধি পরাশর ও মনু দুজনেই দিয়াছেন। যে পরাশরী শ্লোকটী অধুনা বিধবা-বিবাহ এবং সধবার পত্যন্তর গ্রহণের বিশেষ বিধিরূপে সমাজকে আলোড়িত করিতেছে সেই "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে" প্রভৃতি অন্যপতি-গ্রহণের কারণান্তর প্রদর্শিত শ্লোকটী যে বাগ্‌দত্তা কন্যার পক্ষেই বিহিত, তাহা বহুতর বিচার-বিতর্ক দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

'দো-পড়া' বলিয়া কোন বস্তু জগতে নাই, দো-পড়া অর্থেই বাগ্‌দত্তা বুঝায়। লোকাচারে যখন বিবাহরাত্রের মধ্যে পাত্রান্তরে বিবাহের বিধি আছে, তখন রাত্রি প্রভাতেই বা বাধা কোথায়? যদি সর্ব্বাণীর সম্মতি থাকে, নিজে আসিয়া তর্কদ্বারা নিজ মতকে সে সমর্থিত করিতে পারে।

সর্ব্বাণীর সম্মতি পাওয়া গেল না। সে এই বলিয়া জবাব দিল যে, তার বাগ্‌দত্ত নষ্ট, মৃত, প্রব্রজিত, ক্লীব

—এ সকলের যখন কিছুই নহে, এবং ঐ সকল কারণে যখন তার বিবাহ বন্ধও হয় নাই, তখন তার "কেসটি" তর্কদ্বারা প্রমাণ বা অপ্রমাণ হইতে পারে না, ইহা নিতান্তই মানসিক ব্যাপার! অতএব সে সবিনয়ে এবং করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, তাহাকে যেন আর বিপন্ন করা না হয়।'

সুরঞ্জন তাঁর কন্যা সম্বন্ধে একেবারেই যে নির্লিপ্ত, সে কথা আবেদনকারী মাত্রেই জানে এবং তাঁর মধ্যে যে পৌরুষের একান্তই অভাব, সে কথা বলিয়া তাঁকে ধিক্কার না দেয়, এমন কোন লোক নাই। এমন "মেয়েমুখো", "কুণো" লোকটা জজিয়তী করিয়া আসিল কেমন করিয়া, তাহাও লোকে ভাবিয়া অবাক্ হয়। আবার কেহ কেহ বলে, "মুন্‌সেফ, সবজজ, জজ সর্ব্বাবস্থাতেই উপরওলার কাছে হাতজোড় করা অভ্যাস হ'য়ে গেছে কিনা, — এখন মাথার উপর মনিব নেই, কিন্তু অভ্যাসটা তো আছে; মেয়ের কাছেও তাই জুজু হ'য়ে রয়েছে। এজাতের লোকগুলো যাকে বলে চিরশিশু! সাবালক এরা কোন দিন হ'তে জানে না।"

আবার কেহ বা ঈষৎ সহানুভূতি দেখাইয়া চোখ টিপিয়া বলে, "না থেকে কি করবে, যে ডানপিটে মেয়ে, জোর করতে গেলে কি না কি ক'রে বসবে, তার ঠিক কিছু আছে?"

এমনি করিয়া সর্ব্বাণীর বিবাহ সম্বন্ধ যা-ও বা আসে, তা-ও দু'দিনে পণ্ড হইয়া যায়। অবশ্য তাকে বউ করিতে চাহিবে, এমন কোন ছেলের বাপ এদেশের মাটিতে এখনও জন্মে নাই, স্বাধীন ছেলেরাই যা কৌতূহলবশে (অথবা বাস্তব শ্রদ্ধায়ও কেহ কেহ) দরবার করে এবং ঘা খাইয়া ফিরিয়া যায়, ক্রুদ্ধ হইয়া বলে, "মেয়ে মানুষের এত তেজ! এই জন্যেই বুলে কুকুরকে 'নাই' দিতে নেই।" গিন্নী বান্নীরা শুনিয়া শুনিয়া গালে হাত দেন, চোখ কপালে তুলিয়া বলেন, "তা না তো কি! মেয়ের জাত তো বাঁদীর জাত, এত তেজ যে কিসের করেন, তা' উনিই জানেন। ওসব তামাক্ গো তামাক্! রূপ আছে, পয়সা আছে, তার ওপর নেকা-পড়াও শিখেচে, তারই গরম।"

সর্ব্বাণী উপেক্ষায় মৌন হইয়া থাকে, ভালমন্দ কোন কথাই কানে তোলে না। ভাল কথা?—হ্যাঁ তা-ও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পায় বই কি!

দিন কতক তো পরিজনবর্গের যথোচিত চেষ্টা সত্বেও তার নাম খবরের কাগজে কাগজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনেক অজ্ঞাত, অখ্যাতনামা তরুণ-তরুণীদের প্রশংসা-পত্রও সে পাইয়াছে। আবার গালিও যথেষ্ট খাইয়াছে।

সর্ব্বাণী শুইয়া শুইয়া বই হাতে করিয়া সেই সব কথাই ভাবিতেছিল। জীবনটা তার যেন একটা প্রহেলিকার মত হইয়া উঠিয়াছে! কত কি করার আছে, অথচ কিছুই ভাল করিয়া করিবার নয়। বাপের সুখহীন জীবনকে আরও বেশী নিরানন্দ করিতে পারে, এমন নিষ্ঠুরতা তার মধ্যে নাই। সাংসারিক দৃষ্টিতে নিজেকে সুখী করিয়া, পিতৃ-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্তি দিবার সাধ্য যখন তার হইবে না, তখন গৃহধর্ম্ম ছাড়িয়া বাহিরের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া পিতাকে তার সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিতে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নহে, কিন্তু এমন করিয়া কত দিন এই বয়সে শুধু অতটুকু কাজের ভিতর থাকিয়া দিন কাটানো যায়? একটা কিছু অবলম্বন তাকে করিতেই হইবে; বড় কিছু না পারে মাঝারি কোন কিছু, আচ্ছা অনুন্নতদের উন্নতির উপায় করা, সে-ও তো একটা এ দিনের উপযোগী বড় কাজই।

"দিদিমণি! বাবু আপনাকে ডাকতেছেন।" বলিয়া এবাড়ীর ঝি হারাণী ঝাঁটা হাতে দরজার গোড়া হইতে উঁকি মারিয়া গেল।

সর্ব্বাণী হাতের বইখানা নামাইয়া রাখিয়া বাপের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল। পুকুরঘাটে অধ্যবসায়শীল বক তখন একটা ছোট্ট মৃগেল মাছের ছানা ধরিয়া লইয়া একপাশের শরবনের ধারে গিয়া আহার করিতেছে। জলের ধারের সেই সারসটা তৃণাস্তীর্ণ

সুশ্যামল তীরে উঠিয়া যথেচ্ছ পরিক্রমণে অভিনিবিষ্ট, বকুল গাছের মধ্য হইতে কি জানি কি দেখিয়া কি বুঝিয়া সেই চিরদিনের তাপিত পাখীটা ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিতেছিল, — 'চোক্ গেল', 'চোক্ গেল' !

কেন গেল তার' চোখ ? কি এমন অসহনীয় দৃশ্য, কি এমন দৃষ্টিদগ্ধকারী ঘটনা তার চোখে পড়িয়াছে, যার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আজও সে তার প্রাণের কান্না থামাইতে পারে নাই, থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া নালিশ করিয়া উঠিতেছে,—'চোক্ গেল', 'চোক্ গেল !'

"বাবা ! আমায় ডাকছিলে ?" — বলিয়া সর্ব্বাণী হাসিমুখে বাপের সাম্‌নে দাঁড়াইল। হাতে তার সেলাই-এর সুতাসুদ্ধ একটা রুমাল, যেন সে এতক্ষণ ওই কাজটাই করিতেছিল।

"হ্যাঁ মা ! ডাকছিলুম !—এই চিঠিখানা প'ড়ে দেখ তো, কি জবাব লিখে দেবে দেখ তো।"

একখানা মোটা খামের চিঠি, তার উপর অনেকগুলা ডাকের ছাপ মারা, তার একটায় সুরঞ্জন সর্ব্বাণীর বিবাহের সময়ে ইউ-পি'র যে সহরটায় থাকিতেন সেখানকার, আর একটায় কলিকাতার জেনারেল পোষ্টাফিসের—এই দু'টো বেশ বোঝা গেল। সর্ব্বাণী ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত ভিতরকার চিঠিলেখা কাগজটা টানিয়া বাহির করিল।

"এ আবার কে লিখেছে ! এ তো তোমায় লিখেছে দেখছি। আমায় দেখতে বললে যে ! ঘটকালীর চিঠি যদি হয়, 'ওয়েষ্ট পেপার বাস্‌কেটে' ছুঁড়ে ফেলে দাও, চুকে যাক্, ও দেখতে দেখতে আমার চোক ক্ষরে গেল—"

বলিতে বলিতে সর্ব্বাণী নীরব হইয়া মনে মনে চিঠিখানা পড়িল,—

মহাশয় !

আপনার হয়ত স্মরণ আছে, প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইতে যায়, আমায় আপনি আপনার কন্যা শ্রীমতী হরিমতী দেবীকে (চলতি নাম জানি না) সম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। আমাদের পক্ষ হইতে কোন অপ্রিয় আচরণের জন্য বিরক্ত হইয়া আপনার কন্যা বিবাহে অনিচ্ছুক হন এবং আত্মগোপন করেন। আমি সম্প্রতি বিদেশ হইতে ফিরিয়াছি, এ যাবৎ বিবাহ করি নাই, যদি আপনার কন্যার সম্মতি থাকে, তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে পারি ;— ('টোন'টা বেশ সুবিধের নয় ! যেন কতই অনুগ্রহ করতে চাইচেন !) তাঁর কিরূপ ইচ্ছা আমায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে যথাবিহিত ব্যবস্থাদি করিব।'—

চিঠি পড়া শেষ না করিয়াই সর্ব্বাণী মুখ তুলিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না বাবা ! যে ব্যবহার !— আর কাজ নেই। ওদের বাড়ীর সেই মুদ্রা-রাক্ষস বাবাটি তো আছেন ? আমায় হাতে পেলে আস্ত খেয়েই ফেলবেন। লিখে দাও—আমাদের মত নেই।"

চিঠিখানা কুচি কুচি করিয়া কাগজ-ফেলা ঝুড়িটায় সে সত্য সত্যই ফেলিয়া দিল। সুরঞ্জনের প্রফুল্লস্মিত মুখ, আকাশের চলন্ত মেঘ যেমন করিয়া সূর্য্যকে ঢাকে, তেমনি করিয়াই গাম্ভীর্য্যবিরস হইয়া আসিল। বোধ করি, এই অতি-অপ্রত্যাশিত পত্রখানা তাঁহার নিরুৎসুক মনকে একেবারে উন্মুখতার চরমে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। নূতন আশায় যেন আবার তার-ছেঁড়া মনোবীণাকে সমুৎসুকতার সহিত বাঁধিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। ফুৎকারে নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত নিষ্প্রভমুখে ঈষৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্ষণকাল মাত্র 'ওয়েষ্ট-পেপার বাস্‌কেটটা'র দিকে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিলেন, তারপর মৃদুকণ্ঠে যেন কেবল মাত্র আপনাকেই শুনাইয়া স্বগতোক্তির মতই বলিলেন, "ঠিকানাটা দেখে রাখাও হয়নি।"

"তাই নাকি।"

সর্ব্বাণী নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ঝুড়িটার কাছে গিয়া একবারটি চিঠির টুকরাগুলার একমুঠা তুলিয়া লইয়া তার উপর বারেক চোখ বুলাইয়াই নিতান্ত আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল, "যাক্ গে, বাবা ! ও আপদ গেছে ! — উত্তর না পেলেই উত্তর

বুঝে নেবে'খন। তা' ছাড়া চিঠিটা আসতে এত দেরি করেচে যে, ভদ্দর লোক এতদিনে ওর উত্তর পাবার আশাও বোধ হয় ছেড়ে দিয়েছে।"

তারপর বাপের কাছে সরিয়া আসিয়া ধপ করিয়া তাঁর পায়ের গোড়াটিতে বসিয়া পড়িল। তারপর তাঁর মুখের উপর চোখ মেলিয়া করুণা-তরল কোমলস্বরে কহিল, "আমরা এই বেশ আছি, বাবা! ও হ'লে ওরা আমায় তোমার কাছে তো থাকতে দিত না, তাই ভগবান্ নিজে হাতে সব বাধা ঠেলে দিয়েছিলেন। আমরা এ বেশ আছি, ওসবে আর কাজ নেই, কি বল? কেমন যেন মন চায় না। তুমি মনে কষ্ট ক'রো না। এ আমাদের বাল-বিধবার দেশ, এদেশে চিরকুমারী থাকা একটুও কঠিন নয়। এ তুমি মন থেকে বিশ্বাস ক'রো বাবা, এ খুব সত্যি!"

এই বলিয়া সে ছল ছল চোখে এবং হাসিভরা মুখে, দু'খানি নরম কচিপাতার মত কোমল হাতে তার বিস্ময়-বিমূঢ়তায় প্রায় হতবুদ্ধি বাপের পায়ের ধূলা তুলিয়া লইয়া নিজের নত মস্তকে ধারণ করিল, মানসিক চাঞ্চল্যের লেশহীন সহজ প্রশান্ত কণ্ঠে ধীরে ধীরে পুনশ্চ কহিতে লাগিল —

"তুমি আশীর্ব্বাদ করো বাবা! যাতে এমনি থেকেই জীবন সার্থক ক'রে নিয়ে যেতে পারি। সব মেয়েকেই যে যেমন-তেমন ক'রে বউ হ'তেই হবে, সে কখন ভগবানের বিধি হ'তে পারে না। পারে না,—তাই এদেশে বাল-বিধবার অত ঘটা! এখন যখন বাল্য-বিবাহ উঠে যাচ্ছে, তখন কাউকে কাউকে কুমারী থেকে ওদের স্থানীয় হ'য়ে সমাজের এবং উপরন্তু দেশের সেবা করতে হবে বৈকি। যেসব দেশে বাল-বিধবা নেই, সেসব দেশেই চিরকুমারী থাকার বিধি আছে। পুরাকালে সকল দেশেই চিরকৌমার্য্য ধর্ম্মের সামিল ছিল। ভেস্‌টাল ভারজিনের কথা মনে করো, আমাদের দেশে বাল্য-বিবাহ যখন প্রবর্ত্তিত হয়নি তখন মেয়েদের দু'টী ক্লাস ছিল; জানো ত? এক ব্রহ্মবাদিনী আর সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনীদের উপনয়ন, সংস্কার প্রভৃতি হ'তো, আর সদ্যোবধূরা বিবাহিতা হতেন। ব্রহ্মবাদিনীরা অগ্নি-সংস্কার, বেদাধ্যয়ন, জ্ঞানচর্চ্চা নিয়ে থাকতেন, আর অন্যেরা করতেন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন। দেখ, শুধু বৈদিক যুগেই নয়, বৌদ্ধ যুগেও অনেক কুমারী মেয়ে ধর্ম্মপ্রচার ও জ্ঞান-বিস্তার করতে কত না কৃচ্ছ্রসাধনা ক'রে গেছেন। আবার দেশে সেই আদর্শের বিস্তৃতি হোক। কোন জাতির মধ্যে সকল নর আর সকল নারী বিবাহিত জীবন যাপন করতে পারে না, কতককে মুক্ত থেকে ধন ও জ্ঞানচর্চ্চা, সমাজ ও দেশের কল্যাণ সাধনার্থে জীবনোৎসর্গ করতেই হয়; তা' সেটা যে ভাবে, যে আকারেই হোক। আমাদের দেশের সমাজ-বিধির বহুল পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং আরও হবে। এখন থেকে কতক মেয়েকে তাই শুধু ভোগের সাধনায় না ডুবে থেকে, ত্যাগের পথকে গ্রহণ করতে হবে। নিজেরা ক'রে পরকে পথ দেখানো, অন্ততঃ নীরবেই দেশের কিছু কাজ ক'রে যাওয়া — ভোগ-সুখকেই চরম না ক'রে; আত্মার সেই পথ—"

শেষ কথাগুলি ঈষৎ জড়াইয়া আসিল; কিন্তু বাপের মুখের উপর দিয়া একটা ব্যথার বিদ্যুৎ হানিয়া যাইতে দেখিয়া সহসা সে নীরব হইয়া গেল।

সুরঞ্জন এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়া একটুখানি নড়িয়া বলিলেন; সুগভীর স্নেহে এবং সুবিপুল গৌরবে তাঁর গাম্ভীর্য্য-মলিন মুখ অকস্মাৎ আনন্দ-দীপ্ত হইয়া উঠিল, পরম নির্ভরতার সহিত স্নিগ্ধ-নেত্রে উল্লসিতানন মেয়ের আবেদন-ব্যাকুল মুখটী নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া শান্তকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—

"তাই হোক মা! তোমার পথ ত্যাগের মহিমায় গৌরব-প্রদীপ্তই হোক, অকল্যাণের মধ্য দিয়ে কল্যাণের জন্ম হ'য়ে থাকে ব'লে ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে; তোমার জীবনে সেটা সার্থক

হ'য়ে উঠে, জগৎকে অমঙ্গলের ভয় থেকে মুক্ত করুক। আর তোমার পুণ্য যেন আমাদের পুন্নাম নরক থেকে ত্রাণ করে। সর্ব্বাণী! তোমায় আশীর্ব্বাদ করবার আমার ভাষা নেই, তুমি জানো—তুমি—আমার—কি-ই!"

সহসা সুরঞ্জন তাঁর স্বভাবের একান্ত বিরোধী ভাবেই অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, দেখিতে দেখিতে দু'ফোঁটা জল তাঁর এ বয়সেও অবিকৃত সুবিশাল দু'টী চোখের কোণ বহিয়া সুগৌর গালের উপর দিয়া গড়াইয়া আসিল। সর্ব্বাণী তাহা দেখিতে পায় নাই, সে তখন বাপের আশীর্ব্বাদ ও সমর্থন লাভে পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে নত হইয়া বাপকে প্রণাম করিতেছিল

শুধু তাঁর কথার মধ্য হইতে একটী শব্দ খচ করিয়া তার কানে ঠেকিল,—"আমাদের"। তার বাব কোন দিন এমন ভাবে কোন কথা বলেন না, যার সঙ্গে তার মায়ের কোন সম্পর্ক বুঝায়। কিন্তু কানে ঠেকিলেও আজিকার এই শুভ মুহূর্ত্তে সে অপর কোন বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত ছিল না। তার বাবা আজ তাকে তার আদর্শে স্থির থাকিতে সত্যকার সমর্থন করিয়াছেন, এই আনন্দই তার পক্ষে প্রচুর হইয়া উঠিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

"সদ্যবিধবা বিজয়াদশমী সাজিল সন্ধ্যা-গেরুয়ায়;
আসে একাদশী — অঙ্গনে বসি' শূন্য নয়নে ফিরে' চায়!
পূর্ণ ঘটের জলভরা বুকে
সহকারশাখা শুকায় সমুখে,
স্মৃতির মতন আলিপনাগুলি চারিধারে চাহে নিরুপায়।"

— শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

(ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিওর সৌজন্যে)

বাণী-মন্দিরের পূজারী

কুমার শ্রীমুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, এম্-এল্-সি

মন্দির মাত্রেরই পূজা করিবার জন্য পূজারীর আবশ্যক। পূজার উপকরণ সংগ্রহ যে কেহ করিতে পারে কিন্তু পূজা করিবার প্রকৃত অধিকারী হইতেছেন পূজারী। পূজার অধিকার পাইতে হইলে তদুপযোগী শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন। আমাদের দেশে বাণী-মন্দিরের উপযোগী পূজারী তৈয়ারীর জন্য কোনও রূপ ব্যবস্থা না থাকায় পূজার ব্যাঘাত হইতেছে—পদে পদে মন্দির — বাণীর বরপুত্রগণের সাধনার স্থান। আধুনিক জগতে লাইব্রেরী তাই আজ মন্দিরের ন্যায় সমাদৃত। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে উপদেষ্টার আবশ্যক। পূজা করিবার অধিকার যিনি পাইয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষা ভাল উপদেষ্টা কোথায় পাইবেন? পূজারী হইতে হইলে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা তো চাই-ই — তাহা ছাড়া তাঁহাকে বহু সদ্গুণের

নিখিল-ভারত-গ্রন্থাগার-সম্মিলনী (প্রথম অধিবেশন) —কলিকাতা—১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

বিশৃঙ্খলা ও ত্রুটীবিচ্যুতি ঘটিতেছে। পূজার উপকরণ যতই উচ্চাঙ্গের হউক না কেন, উপযুক্ত পূজারীর অভাবে—সকল চেষ্টা ও উদ্যম ব্যর্থ হইতেছে—অর্থের অপচয় হইতেছে—বাণী-মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পণ্ড হইতেছে।

গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী হইতেছে বাণীর উপযুক্ত

অধিকারী হইতে হইবে। সে সদ্গুণ কি, তাহা এক কথায় বলা চলে না। জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে চরিত্রবান্ হইতে হইবে। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইবে। বাক্পটু অথচ মিষ্ট-ভাষী হইতে হইবে, পুরাতত্বানুশীলনের জন্য প্রাচীনের সহিত যোগ তো রাখিতেই হইবে; তাহা ছাড়া আধুনিক

যুগের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির নিত্য নূতন গবেষণার সহিত সংযোগ রাখিতে হইবে—চলতি ভাবধারার সহিত যুক্ত থাকিতে হইবে—জ্ঞানের সকল বিভাগের উপর তাঁহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। তাঁহার সুকৌশল শাসন, সুশৃঙ্খলা স্থাপন ও যোগ্যতার সহিত কার্য্য পরিচালনক্ষমতা থাকা অত্যাবশ্যক; সুতরাং তাঁহার দায়িত্ব নিতান্ত অল্প নহে। একনিষ্ঠ সাধনা ভিন্ন উপযুক্ত পূজারী পদলাভ সম্ভবপর নহে—জগতে সেরূপ পূজারী দুর্লভ।

আধুনিক কালোপযোগী বাণী-মন্দিরের পূজারী তৈয়ারীর ব্যবস্থা জগতে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় আমেরিকায় প্রায় ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। এই গুরু কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন আন্তর্জাতিক দশমিক শ্রেণীবিভাগের আবিষ্কারক ডাক্তার মেলভিল্

মেলভিল্ ডিউই— ৭০ বৎসর বয়সে

ডিউই (Dr. Melvil Dewey)। ডাক্তার ডিউই তখন নিউ ইয়র্ক সহরে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাধ্যক্ষের কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। উপযুক্ত পূজারীর অভাব সে সময় সভ্য জগতে বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছিল, ডাক্তার ডিউই তাই এ অভাব পূরণে প্রথম পথপ্রদর্শক হন। তাহার পর নানাস্থানে পূজারী তৈয়ারীর জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমে সেগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় — প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষার জন্য ব্রুক্লীন বিশ্ববিদ্যালয় (Brooklyn), কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ইলিনয়স্ (Illinois) বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাকিউজ (Syracuse) বিশ্ববিদ্যালয়, বোষ্টন (Boston) সহরের সিমন্স (Simmons) কলেজ, সিয়েট্‌ল্ (Seattle)-এ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতিতে এই লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আরম্ভ হয়—তবে হাতে-কলমে ভাল করিয়া শিক্ষার জন্য তত্রত্য সাধারণ গ্রন্থাগারের সহিত এই সব বিদ্যালয়ের সংযোগ থাকে।

যাঁহারা স্কুলে শিক্ষকতা করেন তাঁহাদের মধ্য হইতে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্যে দক্ষ করিবার জন্য গ্রীষ্মাবকাশে শিক্ষা দিবার উদ্দেশে বিদ্যালয় (Summer School) স্থাপিত হয়—প্রথমোক্ত প্রথম শ্রেণীর লাইব্রেরীয়ানের মত শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলেও মোটামুটী কাজ চালানর মত করিয়া এই সব শিক্ষকদের লাইব্রেরীয়ানের কার্য্যে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। স্কুল-সংযুক্ত লাইব্রেরীর ভার ইঁহাদের উপর ন্যস্ত করা হইয়া থাকে।

আরও এক শ্রেণীর লোককে লাইব্রেরীর কার্য্যে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় — শিক্ষানবীশরূপে সাধারণ লাইব্রেরীতে এই সব লোককে ভর্ত্তি করা হয়—তাহারা হাতে-কলমে কাজ শিখিয়া পরবর্ত্তী কালে লাইব্রেরী সংক্রান্ত ছোটখাট কার্য্যে বা সহকারীরূপে কার্য্য পাইবার উপযুক্ত শিক্ষা পায়। আমেরিকাতেই প্রথমে ব্যাপকভাবে লাইব্রেরীয়ান তৈয়ারীর ব্যবস্থা হয়—ক্রমে সভ্য জগতের সর্ব্বত্র আমেরিকার আদর্শে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধিকাংশ লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষা দিবার
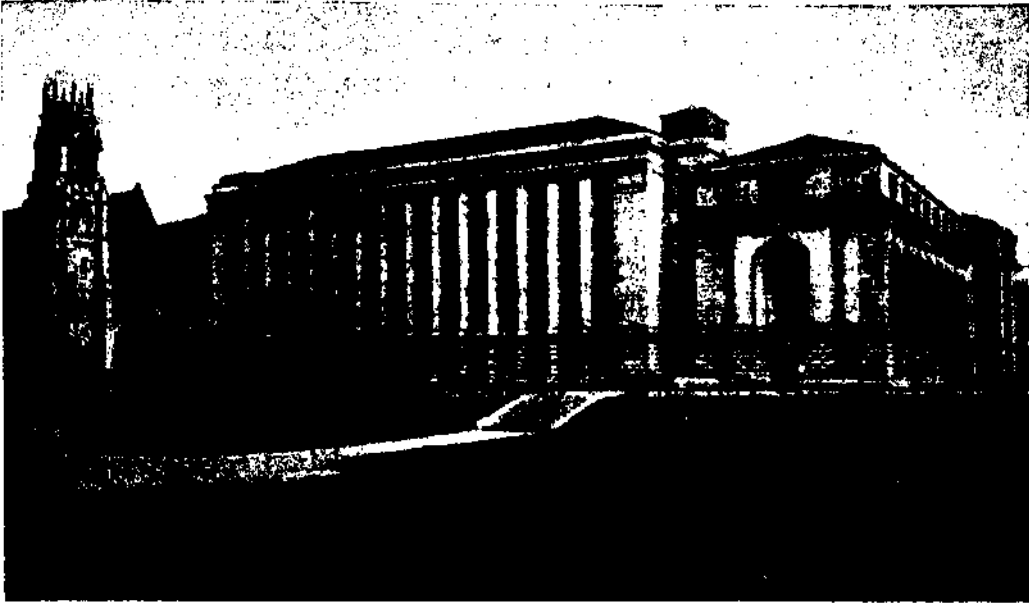
সাধারণ গ্রন্থাগার, ক্রাইষ্ট চার্চ্চ ক্যাথিড্রাল এবং লুকাস গার্ডেন—সেণ্ট লুই—মিসৌরী

বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইতে হইলে গ্রাজুয়েট বা উচ্চ শিক্ষা লাভের পরিচয় দিতে হয়। পূর্ব্ব হইতে লাইব্রেরী সংক্রান্ত কিছু অভিজ্ঞতা না থাকিলে অনেক স্থলে ভর্ত্তি করা হয় না। কোথাও কোথাও লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য-শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ডিগ্রী দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য-শিক্ষা এই কয়েক বিভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে—লাইব্রেরী পরিচালন (Library Administration), গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট জ্ঞান (Library Technique), গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography), গবেষণা এবং বিবিধ আলোচনা। পিট্‌সবার্গ (Pittsburgh), ক্লেভল্যাণ্ড (Cleveland) এবং সেণ্ট লুইতে (St. Louis) ছেলেদের লাইব্রেরীকার্য্যে বিশেষজ্ঞ হইবার পৃথক ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উইসকোনসিনের (Wisconsin) লাইব্রেরী কমিশন ব্যবস্থাপক সভার reference লাইব্রেরী এবং মিনেসোটা (Minnesota) বিশ্ববিদ্যালয়ে হাঁসপাতাল লাইব্রেরীর কার্য্যে বিশেষজ্ঞ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষা দিবার অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

সেণ্ট লুই সাধারণ গ্রন্থাগার, সেণ্ট্রাল বিল্ডিং

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—লাইব্রেরীয়ানের গুরুকার্য্য গ্রহণ করিতে হইলে চরিত্রবান্ হওয়া আবশ্যক। চরিত্র দ্বারা আচার, ব্যবহার ও রুচি নির্ণীত হয়। পুস্তক নির্ব্বাচনেও তাহা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সচ্চরিত্র না হইলে ঠিকভাবে জ্ঞানানুশীলন সম্ভবপর নহে। লাইব্রেরীয়ানের কার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে লাইব্রেরীর কার্য্যে প্রীতি থাকা আবশ্যক। প্রীতি না থাকিলে কোন কার্য্যেই সাফল্য লাভ করা যায় না। যিনি সে প্রীতি স্থাপনে অক্ষম, তাঁহার পক্ষে এ কার্য্যে না আসাই ভাল। প্রাণহীন কলের পুতুলের মত কাজ চালাইলে চলিবে না— সকল বিভাগে জীবন সঞ্চার যিনি করিতে পারিবেন তিনিই এই গুরুপদের উপযোগী। পাঠককে সাহায্য করিবার জন্য লাইব্রেরীয়ানকে সদাই উন্মুখ থাকিতে হইবে। পাঠকের পক্ষে পুস্তকতালিকা পর্য্যাপ্ত নহে, জ্ঞাতব্য বিষয় সহজগম্য এবং কঠিন বিষয় সরল, এক কথায় মুস্কিলের আসান করিয়া দেওয়াই লাইব্রেরীয়ানের কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত ভাবে পাঠকের জ্ঞানস্পৃহা বর্দ্ধনের সহায়তা করিতে হইলে কিছু সময়ের অপচয় হইতে পারে—বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া তাহা মার্জ্জনীয়। এখন সহযোগিতার যুগ আসিয়াছে — লাইব্রেরীর কার্য্যের প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়াইতে হইলে লাইব্রেরীয়ানকে স্থানীয় লোক এবং প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। বিদ্যালয়, ক্লাব, চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ধর্ম্মাচার্য্য, অভিভাবক, ছেলেমেয়ে —যাহারা লাইব্রেরীর সংস্পর্শে আসিবে তাহারা যেন জ্ঞাতব্য তথ্য সহজে পায়, পুরাতত্ত্বানুশীলন যাহাতে সুগম হয়—তত্ত্বানুসন্ধান স্পৃহা যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে পাঠকের মনে অনুপ্রেরণা আসে, অবসাদকালে আশার সঞ্চার হয়—উদ্দীপনা উদ্রিক্ত হয়—নির্জ্জীব গ্রন্থ প্রাণবন্ত হয়—এমন আবহাওয়া যিনি বাণী-মন্দিরে সৃষ্টি করিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত পূজারী হইবার

মিচেল গ্রন্থাগার — গ্লাস্‌গো

অধিকারী। পুস্তক সংরক্ষণ, পাঠকদের পুস্তক বিলি করা, পুস্তক বাহিরে যাইলে তাহার হিসাব রাখা এবং ফেরৎ আসিলে তাহা জমা করা কেরাণীর কার্য্য—আধুনিক লাইব্রেরীয়ানের শক্তি কেবল এ সব সামান্য কার্য্যে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। অবশ্য তাঁহার কার্য্য-পরিচালনার শক্তি থাকা চাই। লাইব্রেরীয়ানের সময় অনির্দ্দিষ্ট নহে—সকল দিকে তাঁহার সমান নজর রাখা সম্ভবপরও নহে। আবার ব্যক্তিগত জ্ঞান, শক্তি ও সামর্থ্যের তারতম্যের উপর কার্য্যের সাফল্য অনেকটা নির্ভর করে। হাতের কাছে যে কাজ আসিয়া পড়ে তাহাই যদি আগে করা হয়—যেটা গোলমেলে সেটার জন্য প্রথমে মাথা না ঘামাইয়া যেটা সহজে নিষ্পন্ন হয় তাহাই অগ্রে ধরা হয়, যদি বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অপেক্ষায় না থাকিয়া উপস্থিত মালমশলার সদ্ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে কাজ অনেকটা সহজসাধ্য হয়।
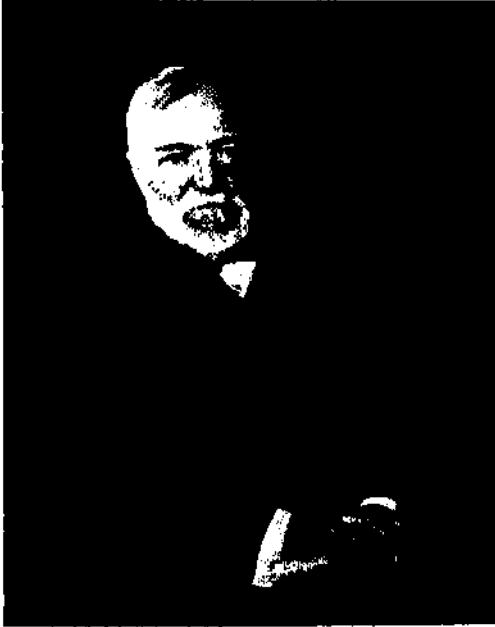
দানবীর এণ্ড্রু কার্ণেগী

তবে সাধারণের কাজ সব কাজের উপর—এ কথাটা স্মরণ রাখা উচিত। সুপরিচালনগুণে একমাত্র লাইব্রেরীর দ্বারা একটী সমগ্র সমাজের আবহাওয়া পাল্টাইয়া গিয়া নবজীবন সঞ্চারিত হইতে পারে। লাইব্রেরীর কৃতকার্য্যতা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাপকাঠির উপর, লাইব্রেরীর সাজসরঞ্জাম বা পুস্তক-সংখ্যার উপর বা পাঠকের হাজিরা বা পুস্তক বিলির
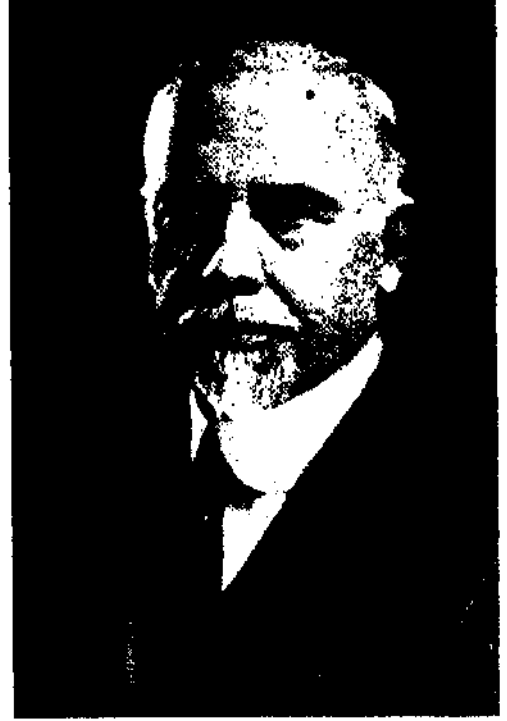
ডাঃ উইলিয়ম ওয়ার্নার বিশপ—মিচিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান ও ১৯৩৩ সালের আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার-সম্মিলনীর সভাপতি

তালিকার উপর নির্ভর করে না—চরিত্র এবং সমগ্র প্রতিষ্ঠানটীকে জীবন্ত করিবার শক্তির উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে বড় লাইব্রেরীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। য়ুরোপ বা আমেরিকার লাইব্রেরীর সহিত তাহার তুলনা করা যায় না। দানবীর কার্ণেগীর (Andrew Carnegie) অজস্র অর্থদানের ফলে ইংলণ্ড ও আমেরিকার বড় লাইব্রেরী মাত্রেই বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। আবার সেগুলি বহুবিভাগে বিভক্ত। গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে—তাহাদের কার্য্য অতিরিক্ত মাত্রায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বৈজ্ঞানিক এবং

গভীর জ্ঞানমূলক সভা-সমিতির গবেষণাপূর্ণ সহস্র সহস্র সাময়িক পত্র ও পুস্তক, রাজ্যশাসন সম্পর্কিত এবং আন্তর্জাতিক দলিল-দস্তাবেজ, সংবাদপত্র, মানচিত্র, মুদ্রিত চিত্র, সঙ্গীত-বিজ্ঞান এবং আমেরিকা ও জগতের যত মুদ্রাযন্ত্র হইতে রাশি রাশি পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে, সে সব সংগ্রহ ও তাহার যথাযথভাবে লাইব্রেরীতে সংস্থাপন যে-সে ব্যাপার নহে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা Library of Congress-এ দশ লক্ষ পুস্তক ছিল, এখন তাহা পঞ্চাশ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। হার্ভাডে (Harvard) ৩০ লক্ষ এবং ইয়েলে (Yale) ২০ লক্ষ পুস্তক ছিল, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে—হার্ভাডে ১০৫০০০ এবং ইয়েলে ৬১,০০০ পুস্তক যোগ করা হইয়াছে। আমেরিকায় কয়েকটা মিউনিসিপ্যাল ও বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর প্রত্যেকটার পুস্তক-সংখ্যা দশ লক্ষ। পাঁচ লক্ষের উপর বই বহু লাইব্রেরীতেই আছে। পুস্তক-সংখ্যা এত বেশী হওয়ায় লাইব্রেরী পরিচালন একটা বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভাল লাইব্রেরীয়ানের অভাব অনুভূত হয়—তাহার ফলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয়; সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেবল পণ্ডিত হইলে তিনি ভাল লাইব্রেরীয়ান হইবেন, তাহার কোন মানে নাই—লাইব্রেরীর কার্য্য তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হইবে, তবে তিনি সে কার্য্যের উপযুক্ত হইবেন—আবার লাইব্রেরীর কার্য্য শিক্ষা করিতে হইলে পাণ্ডিত্যও আবশ্যক। গঠনমূলক কার্য্য, লাইব্রেরী পরিচালন এবং তত্ত্বানুশীলন জন্য বেশী রকম শিক্ষার প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্জাম এবং বিদ্যাবত্তা শিক্ষাপদ্ধতি ও তত্ত্বানুশীলন এই সবের সংযোগ ভিন্ন লাইব্রেরীয়ানের কার্য্যে দক্ষতা লাভ সম্ভবে না।

আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য ৩৫টী প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে—তা' ছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের লাইব্রেরীয়ানের কার্য্যে অভিজ্ঞ করিবার জন্য কেবল গ্রীষ্মকালের, বসন্তের সময় Summer School খোলা হইয়া থাকে। তাহার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে, তাহার উল্লেখ আমি পূর্ব্বেই করিয়াছি।

হিজ্ হাইনেস বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও গাইকোয়াড়, সেনা খাস খেল, সামসের বাহাদুর, ফারজান্ত-ই-খাস-ই-দৌলৎ-ই-ইংলিসিয়া, জি সি-এস-আই, জি-সি-আই-ই, এল-এল-ডি।

সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষানৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি এবং তৎ-সংক্রান্ত প্রচলিত পদ্ধতির উন্নতিসাধন করিতে হইলে লাইব্রেরীয়ানদের তত্ত্বানুশীলনের মূল সূত্র অনুধাবন করিয়া চলিতে হইবে। বিশেষজ্ঞ হইতে হইলে এই ধরণের শিক্ষা অপরিহার্য্য—বনিয়াদ পাকা না হইলে উচ্চ স্তরে উঠিতে যাওয়া নিরাপদ নহে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার মত লাইব্রেরী-বিজ্ঞানের তত্ত্বানুশীলন কঠোর নহে, তবে সমাজবিজ্ঞান এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার সমতুল্য বটে। সহকর্ম্মীদের মতামত উপেক্ষণীয় নহে, তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে। লাইব্রেরীর কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি করিতে হইলে — শিক্ষা এবং সমাজবিষয়ে

লাইব্রেরীকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতে হইলে উদ্ভাবনী শক্তির অনুশীলন আবশ্যক, তবে নব নব আবিষ্কার দ্বারা জ্ঞান পরিপুষ্ট হইবে।

য়ুরোপে লাইব্রেরীর কার্য্যে বিশেষজ্ঞ করিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বে আমেরিকাতেই জগতের সর্ব্ব স্থান হইতে শিক্ষার্থীর আমদানী হইত। এখন প্রায় সব দেশেই আমেরিকার আদর্শে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বরোদা রাজ্যে, পাঞ্জাব ও মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও গাইকোয়াড় তাঁহার রাজ্যে বর্দ্ধিষ্ণু পল্লী মাত্রেই লাইব্রেরী স্থাপন করেন—তিনিই ভারতে লাইব্রেরী আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক। তাঁহার রাজ্যের

নিউটন এম্ দত্ত

লাইব্রেরীসমূহের Curator শ্রীযুক্ত নিউটন মোহন দত্তের পরিচালনার গুণে রাজ্যের লাইব্রেরীগুলির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। শ্রীযুক্ত দত্ত বহুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা করপোরেশনের রিপোর্টারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—তখন তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিবার সুযোগ ঘটে নাই। "রতনেই রতন চিনে"। গুণগ্রাহী গাইকোয়াড় শ্রীযুক্ত দত্তের গুণে মুগ্ধ হইয়া লাইব্রেরী পরিচালনকার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। তাঁহারই চেষ্টায় গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে লাইব্রেরী স্থাপিত হইয়া নিরক্ষরতা বিদূরণের জন্য বিরাট প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। কার্য্যসাফল্যের দ্বারা শ্রীযুক্ত দত্ত স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণিত করিয়াছেন। এতকাল লাইব্রেরী-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আগামী মার্চ্চ মাসে শ্রীযুত দত্ত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন।

আমেরিকার মিঃ ডিকিনসনকে (Dickinson) পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালনের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট আনয়ন করেন। তিনিই বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষা দিবার প্রথম ব্যবস্থা করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান লাইব্রেরীয়ান মিঃ লাবুরাম তাঁহারই উপযুক্ত ছাত্র। এখন মিঃ লাবুরামের তত্ত্বাবধানে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গণিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস্ আর রঙ্গনাথনকে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দেন। সেখানে বিশেষজ্ঞ হইয়া আসিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে নিয়োজিত হন। শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথনের পরিচালনগুণে মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। তাঁহার প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর দ্বার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। ৬০ জন সহকারী লইয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাই-ব্রেরীকে একটী কারখানায় পরিণত করিয়াছেন—উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেণীর লোক অবাধে লাইব্রেরীর সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীযুত রঙ্গনাথন্ লিখিত Five Laws of Library Science নামক গবেষণামূলক বহু

তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছে। সেখানি বাণী-মন্দিরের পূজারীর নিত্য ব্যবহার্য্য হইয়াছে। তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আজ তিনি লাইব্রেরী-জগতে অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারই মন্ত্রশিষ্য ডাঃ এম্ ও টমাস আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তিনি বিদেশে অধ্যয়ন করিয়া বিশেষজ্ঞরূপে সম্প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বাঙ্গলা দেশে বাণী-মন্দিরের পূজারীর কার্য্যে বিশেষজ্ঞ প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থা নাই, কাজেই দক্ষ লাইব্রেরীয়ানের অভাব সর্ব্বত্রই অনুভূত হইতেছে। কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য লাইব্রেরীয়ান মিঃ আসাদুল্লা

শ্রীযুক্ত এস্ আর রঙ্গনাথন্

সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্রতার অজুহাতে তাহার ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। কলিকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী, কলেজ বা উচ্চ বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী, সাধারণ লাইব্রেরী—বাঙ্গলার সকল স্থানেই আজ বিশেষজ্ঞ লাইব্রেরীয়ানের অভাব অনুভূত হইতেছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি

ডাঃ এম্ ও টমাস্—আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাধ্যক্ষ

পুস্তকের সংখ্যা লাইব্রেরীর কৃতকার্য্যতার পরিমাপক নহে—অস্থিসার কঙ্কালতুল্য পুস্তকে জীবনী শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে বিশেষজ্ঞের আবশ্যক। বাণী-মন্দিরকে প্রাণবন্ত করিতে হইলে উপযুক্ত পূজারী নিয়োগ করিতে হইবে—তবে তো বাণী-মন্দিরের উদ্দেশ্য সফল হইবে—বাণী-মন্দির স্থাপন সার্থক হইবে।

লর্ড আরউইন (Lord Irwin) কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারতের বড়লাট ছিলেন, এখন তিনি বিলাতে Board of Education-এর সভাপতি। গত ২৫-এ মে তারিখে বিলাতের লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের প্রধান কেন্দ্রের নবগৃহ 'চসার হাউসে'র (Chaucer House) দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে লাইব্রেরীয়ানদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

"আমরা অর্থনীতির সহিত সহজ-বুদ্ধিকে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারি কিন্তু, তাহা উদ্বাহের

শ্রীযুক্ত কে এম্ আসাডুল্লা—লাইব্রেরীয়ান, ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী

স্বাভাবিক অবস্থা নহে। বণ্টন-সমস্যা সমাধানের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করিতে হইলে ক্রমশঃ কার্য্য-কাল সংক্ষেপ করিতে হইবে—যন্ত্র সাহায্যে লোকের শ্রম লাঘব করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলে হয় তো সমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িতে পারে। শ্রম-মুক্ত অবসরের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে এই আন্দোলন দ্বারা এদেশের পুরুষ ও রমণীর ভাবী চিন্তার ধারা ওলট-পালট হওয়া সম্ভব—ঠিক সেই স্থানেই লাইব্রেরীয়ানের গুরু দায়িত্ব আসিয়া পড়িতেছে। আমি বিশ্বাস করি, লাইব্রেরীয়ানের এই দায়িত্বের শেষ-সীমা দুইটী বিপরীত পথে চলিয়াছে, প্রথমটী—লাইব্রেরী (সৎগ্রন্থ দ্বারা) সম্পূরণ এবং দ্বিতীয়টী—তাহা উজাড় করিবার সদুপায় উদ্ভাবন। কিন্তু তাহার মাঝে অবিচ্ছিন্ন সমস্যা হইতেছে কি পুস্তক পাঠ করিতে হইবে, সে বিষয়ে কি ভাবে লোকদের উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং যাহা পাঠ করা উচিত তাহা সহজপ্রাপ্য করিবার ব্যবস্থা করা; আমার ধারণা এই কাজ বড়ই কঠিন।"

আজ রুষিয়ার প্রাণশক্তি জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। সেখানে মানুষ তৈয়ারীর কি বিরাট প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে! সমস্ত দেশকে শিক্ষিত করিয়া শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে। নিরক্ষরতা বিদূরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চলিয়াছে আর এ কার্য্যের ভার পড়িয়াছে বিশেষভাবে লাইব্রেরীয়ানগণের উপর। তাই সেখানে হাজারে হাজারে লাইব্রেরীয়ান-গণকে শিক্ষিত করিবার জন্য জনৈক বিশেষজ্ঞ আমেরিকানকে ভার দেওয়া হইয়াছিল। সমস্ত লাইব্রেরীই আজ সেখানে আধুনিক প্রথায় পরিচালিত। তবে সেখানকার লাইব্রেরীয়ানগণ কিছু সময় শ্রমিকদের সঙ্গে হাতে কাজ করেন বলিয়া তাঁহারা তাহাদেরই আপনারই জন। শিক্ষার সার্থকতাই এইখানে।

লর্ড ডাক্তার

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

(১)

লেডী ডাক্তারকে লইয়া কেহ কেহ বিপদে পড়িয়াছে শুনিয়াছি। আমি বিপদে পড়িয়াছিলাম 'লর্ড ডাক্তার'কে লইয়া—অর্থাৎ লেডী ডাক্তারের স্বামীকে লইয়া। লেডী ডাক্তারের স্বামী বলিয়া এবং তাহার পৃথক কোন জীবিকা ছিল না বলিয়া আমরা পরিহাসচ্ছলে তাহাকে 'লর্ড ডাক্তার' বলিতাম। বিহারের সবডিভিসনের হাঁসপাতাল। সেখানকার ডাক্তার আমি। চিকিৎসার প্রসার যথেষ্ট। চিকিৎসা সম্বন্ধে অধিবাসিগণের বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। যাহার যে অসুবিধা হয় তাহা যথাসম্ভব দূর করিবার চেষ্টা করি। প্রসবের সময় মেয়েদের প্রায়ই অসুবিধা হয়। ধাত্রী-বিদ্যা বেশ যত্ন সহকারে পড়িয়াছিলাম। প্রসবের কেস্ যাহা পাই বেশ যত্ন, উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে সম্পন্ন করিয়া থাকি। কিন্তু জীবন-মরণের সমস্যা যখন সন্তানের জন্মাবকাশে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, তখনও মেয়েদের সঙ্কোচ দেখিয়া মনে ব্যথা জাগে। একে তো পুরুষ ডাক্তার বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকেরা ডাকে না, তাহার উপর আছে টাকার অভাব। যেখানে টাকা আছে, অভিভাবকও ডাকে, সেখানেও দেখিয়াছি মেয়েরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মৃত্যুভয় বা লজ্জা-ভয় কোনটা যে তাহাদের বেশী, সেটা সব সময়ে ধরিতে পারিতাম না। কত ক্ষেত্রে চক্ষে দেখিয়াছি, না যাইতে পারিয়া কাণে শুনিয়াছি—মা হইবার ক্ষণ-পূর্ব্বে বা ক্ষণপরেই কত মেয়েই মারা যাইতেছে, তবু পুরুষ ডাক্তারকে দেখাইতেছে না। এই সব দেখিয়া বহু চেষ্টায় কমিটিকে ধরিয়া একটি লেডী ডাক্তারের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলাম। তাহার ফলে কাণপুর হইতে মেরী গুপ্তা আসিয়াছিল।

ভাবিয়াছিলাম — এবার মেয়েরা বাঁচিবে, অভিভাবকেরা নিশ্চিন্ত হইবে, আমিও শান্তি পাইব। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা ঘটিল না। অধিকাংশ মেয়েই তেমনি কষ্ট পাইতে লাগিল; তাহাদের অভিভাবকেরা উৎপীড়িত হইল, আমি ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলাম। কেমন করিয়া হইল, তাহাই বলিতেছি।

লেডী ডাক্তার আসিবার কয়েক দিন পরে একদা প্রত্যূষে দুয়ারে কড়া নড়িতে লাগিল ও কবাটের উপর বলিষ্ঠ করাঘাত বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে গভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, 'মিষ্টার ডক্টর, মিষ্টার ডক্টর।' ইহার মধ্যে যেটুকু অবকাশ ঘটিতেছিল, তাহারি মধ্যে আমার পোষা কুকুরটি প্রাণপণে চোর তাড়াইবার ডাক ডাকিতেছিল।

এই ঐক্যতান সঙ্গীতের মধ্যে আমাকে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া আসিতে হইল। দুয়ার খুলিতেই দেখি একটি কালো সাহেব দুয়ার ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর আমার কুকুরটা যেন সাহেবের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার উপক্রম করিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে। কুকুরটাকে ধমক দিতেই — সে পরম বৈষ্ণব ভাব অবলম্বন করিয়া আমার পায়ের কাছে আসিয়া লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল। সাহেব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'It is an un-christian dog, Mr. Doctor. (মিষ্টার ডক্টর, এটি একটি অ-খৃষ্টান কুকুর)।

বারান্দায় বসিবার আসন ছিল। সেখানে সাহেবকে বসিতে অনুরোধ করিয়া আমি বলিলাম, দুঃখিত, সাহেব; কুকুরটা আপনাকে ইহার আগে কখন দেখে নাই; তাহার উপর আপনি একেবারে দুয়ারে কড়া নাড়িতে সুরু করিয়াছেন; সেজন্য কুকুরটা ঐরূপ করিতেছিল। আপনার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতে পারি?

সাহেব বলিল, নিশ্চয়ই। আমাকে বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন। আমি আপনাদের লেডী ডাক্তারের স্বামী — James গুপ্ত।

আমি বলিলাম, ওঃ বেশ। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বড়ই সুখী হইলাম।

বলিয়া জিজ্ঞাসুভাবে তাহার পানে চাহিলাম।

সাহেব সে চাহনির দিকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল, মিষ্টার ডক্টর, এ জায়গা আপনার কি রকম লাগে?

আমি। তার মানে? এখানকার জলহাওয়া কি রকম লাগে, না, এখানকার মাছ দুধ কি রকম লাগে?

সাহেব তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলিল, আচ্ছা মিঃ ডক্টর, এখানে আপনার private practice কি রকম চলে?

আমি। মন্দ নয়।

সাহেব। লোকেরা আপনার উপযুক্ত ফি দেয় তো?

আমি। ডাকিলেই দেয়। যাহারা ডাকে না, তাহারা অবশ্য দেয় না।

সাহেব। বেশ, বেশ! তবে আমার মনে হয়, এখানকার লোকেরা বড় কৃপণ স্বভাবের। আপনার কি মনে হয়?

আমি। আমার তাহা ঠিক মনে হয় না। দেশ গরীব। বেশী টাকা কোথা হইতে দিবে বলুন।

সাহেব। দেখুন না, আমরা যখন কাণপুরে থাকিতাম, এক একটা ডেলিভারি কেসে লোকে খুশী হইয়া ৭৫৲ টাকা দিত। এ তো সহরের কথা। সহরের বাহিরে ২০০৲ টাকা হইতে ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত। আর এখানে, সহরে ৫০৲ টাকা বলিলে লোকে চমকিত হয়; পাড়াগাঁয়ে ১০০৲ টাকা বলিলে লোকে গালি দেয়। এ কি কম দুঃখের কথা, মিঃ ডক্টর?

সাহেব কি বলিতে চাহে তখনও বুঝিলাম না। ঈষৎ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলাম। কিন্তু পুরা সাহেব না হইলেও লোকটা সাহেবী পোষাক পরা, সাহেবী নাম ধরে, এবং সাহেবদের বুলি বলে; কাজেই একটু খাতির করিতে হইল এবং ভিতরে বিরক্তি বা ক্রোধ হইলেও মুখে তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলাম।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভদ্রতা ও সাহেবী পোষাকের মর্য্যাদা রাখিবার জন্ত যতক্ষণ ও যাহা কথাবার্ত্তা হইল তাহা হইতে এই মর্ম্মটুকু প্রণিধান করিলাম যে, সাহেব চায় যে, কোন ডেলিভারি কেস্ আমি যেন হাতে না লই, (কারণ উক্ত কার্য্য অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ এবং অল্পেই লেডীদের সম্ভ্রমের হানি হইতে পারে) এবং সময় ও সুবিধা পাইলে যেন লেডী ডাক্তারের প্রশংসা করিয়া বলি যে সহরে একশত টাকাই এক একটি ডেলিভারির উপযুক্ত ফি এবং ৭৫৲ টাকাতে তাহা সম্পন্ন হইলে যেন গৃহস্থ মনে করে যে তাহাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে।

অতঃপর সাহেব আমাকে প্রচুর ধন্তবাদ দিয়া এবং কিঞ্চিৎ ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দিল।

(২)

দুই চারি স্থানে লেডী ডাক্তারের প্রশংসা করিতে হইল। তাহার কার্য্যাদি দেখিয়া ও তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহার জ্ঞান ও হাত মন্দ নহে। ফলে তাহার দুই চারিটি করিয়া কেস্ জুটিতে লাগিল। মধ্যে 'লর্ড ডাক্তার' একদিন আসিয়া ধন্তবাদ দিয়া গেল।

ধনঞ্জয় প্রসাদ এখানকার উকিল। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় তিনি আমার কাছে উপস্থিত।

'খবর কি?' জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন, আপনি শেষটা আমাদের এমন বিপদে ফেলিলেন কেন?

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, আমি বিপদে ফেলিলাম!

ধনঞ্জয় মৃদু হাসিয়া বলিলেন, নয় তো কি! আপনি না বলিয়াছিলেন লেডী ডাক্তার লোক ভাল, ডাক্তার ভাল? এই ভাল!

আমি এতক্ষণে ভাবটা কিছু বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন, কি হইয়াছে?

ধনঞ্জয় তখন ব্যাপারটি বলিয়া গেলেন। আপনার

কথাতেই লেডী ডাক্তারকে ডেলিভারি কেসে লইতে আসিয়াছিলাম। সে তখন অন্তঃপুরে। সাহেবী পোষাকে যে বাহিরে বসিয়া একখানি ছবিতে তুলি চালাইতেছিল সে প্রথমেই জেরা আরম্ভ করিয়া দিল এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিল, ডেলিভারি কেস্ বড় গুরুতর কেস্। এদেশের লোকে ইহার গুরুত্ব এখনও বুঝে নাই। প্রসূতি ও শিশুমৃত্যুর হার সেজন্য অতি দ্রুত বাড়িয়াই চলিয়াছে। অথচ প্রতিকারের কোন চেষ্টাই নাই। আমি ও আমার স্ত্রী সেই জন্য এই অজ্ঞতার বিরুদ্ধে যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতেছি। আপনি বসুন, আমি এখনি আমার স্ত্রীকে খবর দিতেছি। খবর দিবার আগেই লেডী ডাক্তারের আবির্ভাব হইল। লর্ড ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, ডার্লিং, ইনি এখানকার প্লীডার। ইঁহার স্ত্রীর প্রসবের সময় তোমার সাহায্য চান। তুমি প্রাতরাশ শীঘ্র সারিয়া লও। আমি তোমার যন্ত্রপাতি সব 'ষ্টেরিলাইজ্' করিয়া রাখিয়া দিতেছি। তুমি যাও, আমি এদিকের সব ব্যবস্থা ঠিক করিয়া আসিতেছি।

স্ত্রী লজ্জিত মুখে ফিরিয়া গেল। মনে হইল এ রকম obliging স্বামীর নমুনা আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা দেখিলে বা শুনিলে রন্ধনগৃহে বিপ্লব বাধিবে।

আরও দুই চারিটা ফাঁকা কথা কহিয়া লর্ড ডাক্তার উঠিয়া গেল। একটু পরেই ষ্টোভ জ্বালার শব্দ শুনিলাম। বুঝিলাম, সে কথামত কাজ করিতেছে। উহারি মধ্যে দাম্পত্যালাপের দুই একটা টুকরা শব্দও কাণে আসিতে লাগিল। একটা কথা বেশ স্পষ্ট ভাবেই কাণে আসিল— please don't. একটু পরেই ষ্টোভের গর্জ্জন থামিল। লোকটা বাহিরে আসিয়া বলিল, আর দেরী নাই, মিঃ প্লীডার; আমার স্ত্রী প্রস্তুত হইতেছেন। তারপরই হঠাৎ যেন এক লাফে বলিয়া ফেলিল, আপনি আমাদের fees-এর রেট্ নিশ্চয়ই জানেন!

জিজ্ঞাসুভাবে তাহার পানে চাহিতে সে বলিল, আপনাদের মত বুদ্ধিমান লোকদের সে কথা বলিতে হয় না। জানেনই তো এসব কেসে কত দায়িত্ব। জীবন-মরণ লইয়া খেলা বলিলেই হয়। অথচ ইহার জন্য আমরা মাত্র ৭৫৲ টাকা লইয়া থাকি।

আমি একটু বিস্ময়ের সহিত বলিলাম, সহরের মধ্যে ৭৫৲ টাকা!

সে তৎক্ষণাৎ বলিল, হাঁ, ইহাই ন্যায্য রেট্। তবে আপনাদের মত বন্ধুদের জন্য concession rate ৫০৲ টাকা মাত্র।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি সুধু একবার পরীক্ষার জন্য বা আমার স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ভরসা দিবার জন্য লইয়া যাই—ডেলিভারি যদি করাইতে না হয়, তাহা হইলে?

সে বলিল, কেবল পরীক্ষার জন্য হইলে ১০৲ টাকা। তারপর হঠাৎ সুর বদলাইয়া বলিল, ফিয়ের জন্য, মিঃ প্লীডার, কিছু আট্‌কাইবে না। আমরা তাহা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া লইব। সে জন্য চিন্তা নাই।

বলিয়াই লর্ড ডাক্তার, Darling, are you ready? বলিয়া এক লাফে ভিতরে গেল। একটু যেন ফিস্ ফিস্ শব্দ শোনা গেল।

"Very sorry", "Please don't mind" ইত্যাকার ২।১টা কথা কাণে আসিল। ক্ষণ পরে লেডী ডাক্তার প্রস্তুত হইয়া আসিল। গাড়ী তৈয়ারী ছিল। আমি তাহাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। তাহার স্বামী রাস্তা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিল। এই সময়টা মনে হইল লেডী ডাক্তারের স্বামী হওয়াটা সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

বর্ণনায় রসটা যেন জমিয়া আসিতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর কি হইল?

ধনঞ্জয় উকিল বলিয়া গেলেন, বাড়ী আসিয়া লেডী ডাক্তারের যাহা পরিচয় পাইলাম তাহাতে তাহার উপর শ্রদ্ধা জন্মিল। আমার স্ত্রীকে সে বেশ সাহস দিয়া বলিল, কোন ভয় নাই, স্বাভাবিক সুপ্রসব হইবে। সব ঠিক আছে। আবার একটু রসিকতাও করিল, মেয়ে মানুষের প্রসবে ভয় করিলে চলিবে কেন?

তাহার মত লইয়া ৫৲ টাকা ফি দিলাম। সে

প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রসবের এখনও কত দেরী আছে বলিয়া মনে করেন?

সে উত্তর দিল, এখনও অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টা দেরী।

পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রসবের সময় স্ত্রীর ভরসার জন্য আপনি যদি শুধু ঘণ্টাখানেক উপস্থিত থাকেন, কত ফি লইবেন?

সে প্রসন্ন মুখে বলিল, আমি যদি কোন প্রয়োজনে বাহিরে না যাই তো আসিব এবং আপনি যাহা দিবেন তাহাই লইব। তবে আমার বিশ্বাস, প্রসবে কোন ভয় নাই এবং বাহিরের কোন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না।

ইহার পর স্ত্রীকে আর একবার ভরসা দিয়া সে চলিয়া গেল।

ভাবিলাম, ইহার ব্যবহার তো মন্দ নহে।

কিন্তু ঘণ্টা দুই পরে মতের পরিবর্ত্তন করিতে হইল।

লেডী ডাক্তার ঔষধ লিখিয়া দিয়া গিয়াছিল। ঔষধ আনাইয়া সেবন করাইবার পর বেদনা যেন একটু বাড়িতেছিল। কোর্টে যাই নাই। বাহিরের ঘরে উদ্বিগ্নচিত্তে বসিয়া আছি, এমন সময়ে দুয়ারের শিকল সজোরে নড়িয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক আসিল, মিষ্টার প্লীডার, মিষ্টার প্লীডার!

গুণধরের কণ্ঠস্বর চিনিতে বিলম্ব হইল না। কি করি? সাহেব নহি যে, engagement না থাকায় ফিরাইয়া দিব। বাড়ীতে লোক আসিলে শত অসুবিধা সত্ত্বেও তাহার সহিত দেখা করিতে হইবে, এ সংস্কার বাল্যকাল হইতে অস্থিমজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে। যাইবে কি করিয়া? দুয়ার খুলিয়া দিয়া বোধ হয় একটু অপ্রসন্ন মুখেই তাহাকে বসিতে বলিলাম।

সে বসিয়াই বলিল, আপনি নিশ্চয়ই বড় ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন আছেন।

বলিতে হইল—হাঁ, তা' ছাড়া আর উপায় কি?

লর্ড ডাক্তার একটু ভাল করিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ধূমপান করিতে পারি কি?

আমি বলিলাম, আপত্তি নাই।

একটি সুদৃশ্য cigar-case হইতে cigar বাহির করিয়া আমাকে প্রথমে দিতে আসিল। আমি ধূমপান করিনা বলায় সেটি পুনরায় কেসে রাখিয়া দিয়া আর একটী cigar বাহির করিয়া লইয়া লর্ড ডাক্তার ধূমপানে মনোনিবেশ করিল এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ধূম্রলোক সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়া বলিল, মিষ্টার প্লীডার, আমি কি জন্য আসিয়াছি, আপনাকে বলা প্রয়োজন।

'বলুন' বলিয়া আমি তাহার মুখপানে চাহিলাম।

সে বলিয়া গেল, দেখুন, মিষ্টার প্লীডার, লেডী ডাক্তারের ক্ষেত্র এখনও আমাদের দেশে প্রস্তুত হয়নি। তাঁহার মর্য্যাদা এখনও লোকে বোঝেনি। আপনার এখান হইতে অনুরোধ হইয়াছে যে, দশটাকা ফি-তে Delivery case watch করিতে হইবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন কত দায়িত্ব ইহাতে। প্রসবকালের বিপত্তিসম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, এমন ধাত্রী কার্য্য করিবে এবং আমার স্ত্রী সেখানে উপস্থিত থাকিবেন, ইহা তাঁহার পক্ষে বড়ই অপমানজনক। আপনাকে বলিতে হইবে না যে, এ কার্য্য কত বিপজ্জনক। একটুতে সেপটিক্ (বিষাক্ত) হইতে পারে। কি ভয়ানক! তাহার মূল্য ১০৲ টাকা নহে।

আমি এবার বিরক্ত হইলাম। বলিলাম, আপনার একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনার স্ত্রীকে ডাকি তাঁহার পুরা ফি দিতে হইবে, এই তো?

সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, না, না, পুরা কাজ দিতে হইবে।

আমি ঈষৎ শ্লেষের সহিত বলিলাম, ঐ একই কথা। পুরা কাজ হইলেই পুরা ফি। আচ্ছা, ভগবান্ না করুন, যদি আপনার স্ত্রীকে ডাকিতেই হয়, পুরা ফি দিয়াই ডাকিব।

হঠাৎ যেন স্ত্রীর কাতর কণ্ঠস্বর কাণে আসিল। উঠিয়া বলিলাম, মিষ্টার James, ক্ষমা করিবেন, আমি আজ বড় ব্যস্ত।

হাঁ, নিশ্চয়ই। ক্ষমা করিবেন, আমি উঠিতেছি।

বলিয়া James উঠিল। আমি দুয়ার বন্ধ করিয়া বাঁচিলাম।

ধনঞ্জয় চুপ করিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তারপর 'ডেলিভারি' কতক্ষণে হইল?

ধনঞ্জয় বলিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে। ভগবানকে ধন্যবাদ যে সেপসিস্ আটকাইবার জন্য আর তাহাকে ডাকিতে হয় নাই। কিন্তু দেখুন, কি অন্যায়। লোকটা যেন medical tout; শুধু এক্ষেত্রে নয়। অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ ঘটিতেছে।

আমিও ইহাতে অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করিলাম। বাস্তবিকই বড় অন্যায়।

স্ত্রীর জন্য একটা prescription লিখাইয়া লইয়া ধনঞ্জয় বিদায় হইলেন। বলিয়া গেলেন, তিনি ইহা লইয়া লেখাপড়া করিতে ছাড়িবেন না।

দুই চারি দিন কাগজে one who knows, a sufferer নামক জীবাদির আবির্ভাব হইল। উপরোক্ত ধনঞ্জয় লিখিয়াছিলেন। উপর হইতে তদন্তের একটা আদেশও আসিয়াছিল।

ফলে আমার কাছে একখানি D. O. আসিল, লেডী ডাক্তারের কেস্ সম্বন্ধে তাঁহার স্বামী যেন মাথা না ঘামান বা রোগিণীদের বাড়ী যেন না যান, ইহার প্রতি আমি যেন লক্ষ্য রাখি।

লেডী ডাক্তারের কাছে চিঠিটা পাঠাইয়া দিয়া তাহার সহি লইয়া রাখিলাম।

(৩)

কিছুকাল প্রত্যুষের "Mr. Doctor" হইতে অব্যাহতি পাইলাম। James-এর স্বভাবই হইয়া গিয়াছিল কোন কিছু ঘটিলেই বা কোন কেস্ আসিলেই, হয় পরামর্শ লইবার জন্য, না হয় খবর দিবার জন্য আমার ডাক পড়িত। Civil Surgeon-এর D. O. আমাকে কিছুকাল সেই ডাক হইতে রক্ষা করিল।

হঠাৎ একদিন তেমনি সকালে দুয়ারের কড়া নড়িল ও ডাক পড়িল — মিষ্টার ডক্টর, মিষ্টার ডক্টর।

আজিকার ডাকে যেন আগ্রহ বেশী। শুধু আলাপ করিবার জন্য এ ডাক নহে।

দুয়ার খুলিতেই James-কে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। তাহার মুখের সেই সপ্রতিভ ও প্রফুল্ল ভাব যেন কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

'কি খবর' জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই সে বলিল, মিষ্টার ডক্টর, আমি বড় বিপন্ন। মেরী বড় অসুস্থ।

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি অসুখ? কালও যে আমি তাঁহাকে সুস্থ দেখিয়াছি।

James বলিল, কাল রাত্রি হইতে হঠাৎ খুব জ্বর আসিয়াছে। রাত্রে temperature ১০৫ হইয়াছিল। এখন সকালে ১০৩। মাথার যন্ত্রণা খুব বেশী। আপনি দয়া করিয়া আসুন।

শীঘ্রই সজ্জিত হইয়া লইলাম। প্রায় পাশেই বাড়ী। পৌছিতে দেরী হইল না।

সম্মুখের কক্ষটিতে কয়েক মিনিট বসিতে হইল। কক্ষটি পুরাতন হইলেও সজ্জা ও পরিচ্ছন্নতায় সুন্দর করিয়া তোলা হইয়াছে। কক্ষের বিশেষত্ব এই যে, কক্ষটি আলোকচিত্রে সুসজ্জিত এবং সব কয়টি আলোকচিত্রই একই জনের—মিসেস্ মেরী গুপ্তার। নানা ভাবের, নানা বর্ণের, নানা কারুকার্য্যে খচিত ছবি। দেখিলেই মনে হয় যেন বড়ই আন্তরিকতার সহিত অঙ্কিত। মনে হইল, একই জনের এতগুলি ছবির কি প্রয়োজন?

পরমুহূর্ত্তে James আসিয়া আমাকে ডাকিয়া অপর একটি কক্ষে লইয়া গেল। এটী শয্যাকক্ষ। ছবি ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য বর্জ্জিত। ছবিগুলিও সব মেরী গুপ্তার—কতকগুলি শুধু সযত্ন নিপুণতার সহিত গৃহীত আলোকচিত্র, কতকগুলি তাহা হইতে রঞ্জিত করিয়া অঙ্কিত। কক্ষের মধ্যস্থলে শুভ্র পরিষ্কৃত শয্যার উপর চক্ষু মুদিয়া মেরী শুইয়া আছে। একপার্শ্বে মাত্র একখানি চেয়ার। অপর পার্শ্বে একটি টিপয়; তাহাতে মুখঢাকা একটি কাঁচের গ্লাস, একটি

feeding bottle, আর দুইটি শ্বেত পাথরের ছোট পাত্র; তাহারও মুখ সযত্নে আবৃত।

কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই James অতি সন্তর্পণে স্ত্রীর কানের কাছে মুখ লইয়া মৃদুস্বরে বলিল, মেরী, ডাক্তার আসিয়াছেন। তোমার কষ্টের কথা সব ডাক্তারকে বল।

তারপর আমার পানে চাহিয়া James বলিল, মিষ্টার ডক্টর, পেসেন্টের ঘরে একাধিক লোক থাকা আমি বড় অন্যায় মনে করি। আমি এই পাশের ঘরেই রহিলাম। দরকার হইলেই আমাকে ডাকিবেন।

বলিয়া সে তাহার স্ত্রীর পানে মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। James কালো সাহেব। কিন্তু সে যখন মেরীর পানে চাহিল, মনে হইল এই কালো লোকটির হৃদয়সঞ্চিত গুপ্ত সৌন্দর্য্য যেন তাহার মুখ-মণ্ডল মুহূর্ত্তের জন্য অতি সুন্দর করিয়া দিল। নিজের স্ত্রী হইলেও রোগিণীর কাছে একজন লোক একসঙ্গে থাকিবে ইহার জন্য তাহার যে আগ্রহ তাহা আমার চিকিৎসকের চক্ষে বড় ভাল লাগিল এবং স্ত্রীর শুশ্রূষার জন্য তাহার এই প্রাণপণ চেষ্টা এবং স্ত্রীর সর্ব্ববিধ সুবিধার দিকে তাহার সদাজাগ্রত দৃষ্টি—আমার মনুষ্যের চক্ষু শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিল।

লোকটি তাহার স্ত্রীকে সত্যই ভালবাসে বটে।

(8)

রোগিণীর বুক, নাড়ী ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন বলুন আপনার কি কষ্ট।

মেরী কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহাতে তাহার ঠোঁট দু'টি বার কয়েক কাঁপিয়া উঠিল মাত্র। কোন কথা বাহির হইল না। ভাবিলাম বোধ হয় কোন যন্ত্রণার জন্য এরূপ করিতেছে। পরক্ষণে দেখিলাম মেরীর চক্ষু দুটি জলে ভরিয়া আসিল এবং চক্ষু ছাপাইয়া জল কপোল বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

আমি তখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। বলিলাম, ডাক্তার হইয়া আপনার এরূপ দুর্ব্বলতা শোভা পায় না। আপনার রোগ মোটেই কঠিন নহে। রাত্রে বেশী temperature হওয়ায় একটু বেশী কষ্ট হইয়াছে মাত্র। আর যাহা কষ্ট আছে এখনি সব দূর হইয়া যাইবে।

মেরী এবার কথা কহিল। বলিল, Doctor, pray treat him with a little more respect and kindness. He is so good and noble in his own way.

Him কে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। আমি একটু বিস্মিত ও অনুতপ্ত হইলাম। ইহা কি তবে Civil Surgeon-এর সেই চিঠির ফল? বোধ হয়। ইহার যে অপর একটা দিক্ আছে বা থাকিতে পারে, তাহা তখন মনে হয় নাই।

এ কথাও ঠিক যে, তাহার স্বামীর বিপক্ষেও যথেষ্ট বলিবার ছিল। কিন্তু এ সময়ে আমি ডাক্তার, সে রোগিণী। কাজেই চুল চিরিয়া বিচারের এ সময় নহে। তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মৃদুস্বরে বলিলাম, আপনার স্বামীকে তো কেহ অসম্মান করে না। তবে যিনি নিজে চিকিৎসক নহেন, চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার বেশী কিছু বলা অশোভন; — এই জন্যই উহা নিষিদ্ধ।

মেরী একটু লজ্জিত হইয়া অশ্রু মুছিয়া বলিল, আমার স্বামীর একটা ভুল বিশ্বাস যে, পর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিলে আমি সুখে থাকিতে পারিব না। পাছে আমি কি কমাইয়া বিপদ ডাকিয়া আনি, এ-ই তাঁহার সর্ব্বদার জন্য চিন্তা। রোগীর আত্মীয়ের সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা কহিবার কারণও তাই। অথচ নিজে স্বল্প আহার ও সুলভ পরিচ্ছদে সন্তুষ্ট থাকেন।

মেরীকে খুবই বিচলিত দেখিলাম। তাহাকে যথা সম্ভব সান্ত্বনা দিয়া ও সাবধানে থাকিতে বলিয়া ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিলাম এবং Jamesকে কাছে ডাকিয়া দিয়া বাহির হইলাম। আসিবার সময় স্ত্রী-ভাগ্যোপজীবী James-এর উপর কিছু শ্রদ্ধা লইয়া ফিরিলাম।

রোগ যত সহজ ভাবিয়াছিলাম তত সহজ রহিল না। Meningitis পর্য্যন্ত দাঁড়াইল। Pray don't mind, James. Arn't we quite happy with our small means ? Doctor, please treat James with a little more kindness and respect. He deserves them — ইত্যাদি প্রলাপের মধ্যে রোগ আমাদের প্রচুর বাধা সত্ত্বেও বাড়িয়াই চলিল।

ডাক্তার হইলেও এই রোগের মধ্যে শুশ্রূষা ও একাগ্রতার প্রকৃত মূর্ত্তি James-এর মধ্যে দেখিলাম। দিনের পর দিন, দিবারাত্রি সমান অনুরাগ, আগ্রহ ও নিষ্ঠা লইয়া এমন অক্লান্ত সেবা কোন পুরুষকে করিতে দেখি নাই। সকাল বেলা আমি আসিতেই আমাকে রাত্রের ইতিহাস শুনাইয়া 'Doctor, please excuse me for ten minutes only' বলিয়া সে স্ত্রীর শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া যাইত এবং দশ মিনিটের মধ্যে সমস্ত প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সমাপন করিয়া কক্ষে ফিরিয়া আবার কার্য্যভার গ্রহণ করিত। খাদ্য ছিল তাহার, শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দুইবেলা দুই কাপ চা ও সঙ্গে কয়েকখানি বিস্কুট।

কিন্তু এত করিয়াও মেরীকে বাঁচাইতে পারা গেল না। একত্রিংশৎ দিবসের এক ম্লান অপরাহ্ণে মেরীর জীবনের অবসান হইল। মৃত্যুর ক্ষণপূর্ব্বে তাহার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া James-এর হাত ধরিয়া বলিয়া গেল—James, dearest, don't weep for me, when I am gone. It will break my heart even after death. Wherever I may be I will patiently wait for you till Eternity. (জেম্‌স্, প্রিয়তম, আমি মরিলে আমার জন্য চোখের জল ফেলিও না। মৃত্যুর পরেও আমি তাহা হইলে বড় ব্যথা পাইব। আমি যেখানেই থাকি না কেন, ধীরভাবে তোমার জন্য অনন্তকাল বসিয়া রহিব।)

তারপর মেরীর কণ্ঠ চিরতরে নীরব হইল। James যেমন নিঃশব্দে মেরীর শুশ্রূষা করিয়া যাইত তেমনি নীরবে তাহার অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সমাধা করিল। সহরের প্রান্তে এক মুক্ত স্থানে মেরীকে সমাধি দেওয়া হইল। কয়েকদিনের মধ্যে সমাধির উপর একটি প্রস্তর-ফলক স্থাপিত হইল। তাহার উপর একটি সুন্দর পুষ্প ক্ষোদিত করিয়া নীচে লেখা রহিল—What withered here in tears and darkness will blossom there again in glory and sunshine. (যে ফুল এখানে অশ্রুজল ও অন্ধকারে শুকাইয়া গিয়াছে—সেখানে আবার সৌন্দর্য্য ও আলোকে বিকশিত হইয়া উঠিবে।)

অল্পদিনের মধ্যে সমাধির চারিদিকে একটি ক্ষুদ্র সুন্দর উদ্যান রচিত হইতে লাগিল।

যতদিন না নূতন লেডী ডাক্তার আসে ততদিন কমিটিকে বলিয়া James-কে পূর্ব্ববাসায় থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।

James একদিন আমার সঙ্গে দেখা করিয়া আমাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিল এবং কথায় কথায় বলিল, মিষ্টার ডক্টর, তোমার কি মনে হয় না মেরী ভগবানের কাছে পরিপূর্ণ শান্তি পাইয়াছে?

আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। তাঁহার মত উদার ও স্নেহময় হৃদয় কয়জনে পায়?

James উৎসাহিত হইয়া বলিল, মিষ্টার ডক্টর, অসাধারণ হৃদয় লইয়া মেরী জন্মিয়াছিলেন। আমাকে তো আপনি দেখিতেছেন। কিন্তু আমার মত স্বামীর প্রতি তাঁহার অনুরাগের অন্ত ছিল না। আমার অজ্ঞাতসারে, পাছে আমি ভবিষ্যতে কষ্ট পাই তাহা ভাবিয়া পূর্ব্ব হইতেই মেরী এমন ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যাহার ফলে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার অর্জ্জিত ও সঞ্চিত দশহাজার টাকা আমি পাইয়াছি।

তাহার পর একটু থামিয়া, বোধ হয় আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া, সে আবার বলিল, আপনি আমাকে মেরীর তিরোধানের পরেও যে এই বাসায় থাকিতে দিয়াছেন সেজন্য আমি আপনার নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ রহিব। আর মাসখানেকের মধ্যেই আমি এখানকার কাজ সারিয়া চলিয়া যাইব।

James চলিয়া গেল। তাহার জন্য দুঃখ হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, যাক্ বেচারার ভাগ্য মন্দের ভাল। মেরীর কৃপায় তাহার অন্নবস্ত্রের ভাবনা ভাবিতে হইবে না। ইহাতে হয়ত তাহার স্ত্রীবিয়োগ-দুঃখ কথঞ্চিৎ সহনযোগ্য হইয়া উঠিবে।

এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমার সে ধারণা দূর হইল। যাইবার একদিন আগে James কমিটির সম্মতি লইয়া কমিটির হাতে একটি ছোট Delivery Ward নির্ম্মাণের জন্য ৫০০০৲ টাকা দিল। তাহার সর্ত্ত রহিল Ward-টির নাম Mary Ward রহিবে এবং সেখানে মেরীর একখানি ছবি থাকিবে।

এখান হইতে মাইল দশেক দূরে খৃষ্টানদের একটি Medical Mission ছিল। সেই মিশনের হাতে James বাকি ৫০০০৲ টাকা দিয়া দিল। এইরূপে সে স্ত্রীর দানের ঋণ হইতে আপনাকে মুক্তি দিল।

কথাটা শুনিয়া মনে হইল, James-এর কি শেষটা মাথা খারাপ হইয়া গেল। নহিলে এমন করিয়া কি কেহ নিজেকে একেবারে নিঃস্ব করিয়া ফেলে!

পরদিন প্রভাতে James-এর পরিচিত ডাক শুনিলাম — 'মিষ্টার ডক্টর, মিষ্টার ডক্টর!' সে দিন তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলাম।

তাহার অঙ্গের কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ এবং তাহার ম্লান দৃষ্টি আমাকে আজ বিশিষ্টভাবে আকৃষ্ট করিল। আমাকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, মিষ্টার ডক্টর, আজ সকালেই আমি চলিয়া যাইব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় যাইবেন? James বলিল, কাছেই। 'পারিয়া' গ্রামে Christian Medical Mission আছে। সেখানে গিয়া থাকিব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, সেখানে কি করিবেন?

James উত্তর করিল, আমি মিশনারি হইব এবং অবশিষ্ট জীবন জনসেবায় কাটাইব। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, আমার নিকট প্রার্থনা! কিন্তু প্রার্থনা কেন? অনুরোধ বলুন।

James পকেটে হাত দিল। তারপর পকেট হইতে খানকয়েক নোট বাহির করিয়া আমার টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, আপনি এই নোট কয়খানি রাখুন। ইহার দ্বারা আমার স্ত্রীর সমাধি ও তৎসংলগ্ন উদ্যানটি আপনি দয়া করিয়া রক্ষার ব্যবস্থা করিবেন। বলুন, এ দয়া আপনি করিবেন?

বলিয়া James হাত যোড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি মুগ্ধ হইলাম। Jamesকে সসম্মানে হাত ধরিয়া বসাইলাম। বলিলাম, আমি আনন্দের সহিত এ ভার গ্রহণ করিলাম। আমি এস্থান ত্যাগ করিয়া গেলেও ইহা রক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া যাইব।

James কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল ও টেবিল হইতে নোট কয়খানি তুলিয়া আমার হাতে দিল। দেখিলাম, একশত টাকা করিয়া ২০খানি নোট। বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি তো মাত্র ১০০০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন। তাহা তো হাঁসপাতাল ও মিশনকে দিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এ দুই হাজার আবার কোথা হইতে আসিল?

James মৃদুস্বরে বলিল, ইহাই আমার সারা জীবনের সঞ্চয়। ভাবিয়াছিলাম, মেরীর আগামী জন্মদিনে ইহার দ্বারা কিছু কিনিয়া মেরীকে উপহার দিব। কিন্তু তাহা ঘটিল না। সেইজন্য আমার এই ক্ষুদ্র সঞ্চয় মেরীর সমাধি রক্ষার জন্য দিলাম।

তারপর James দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আর একটি অনুরোধ, মিষ্টার ডক্টর। আমি মরিলে আমার মৃতদেহ এখানে আসিবে। আপনি যেখানেই থাকুন আমাকে যেন মেরীর পাশে সমাধি দেওয়া হয়, এ ব্যবস্থাটি আপনি দয়া করিয়া করিবেন। ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।

শেষের দিকটায় তাহার গলাটা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। আপনাকে সংযত করিয়া James মৃদুস্বরে বলিল, But Mary desires me not to weep for her and I must not. Good bye, Mr. Doctor, good bye.

(কিন্তু মেরীর ইচ্ছা আমি যেন তাঁহার জন্য অশ্রু না ফেলি। কাজেই আমার অশ্রু বিসর্জ্জনের অধিকার নাই। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।)

বলিয়া, বোধ হয় উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া James ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সে এখানকার বাস উঠাইয়া 'পারিয়া' যাত্রা করিল।

ঠিক এক সপ্তাহ পরে পারিয়া-মিশন হইতে এক টেলিগ্রাম পাইলাম—James হার্টফেল করিয়া মারা গিয়াছে। তাহার দেহ লইয়া আসিতেছি।

এত শীঘ্র! James কি তবে ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইয়াছিল?

James-এর দেহ আসিল। তাহার দেহ তাহারই ইচ্ছামত মেরীর সমাধির পাশেই সমাধিস্থ করা হইল। James-এর সমাধি-প্রস্তরের উপর নিজের ইচ্ছায় একটি ছত্র ক্ষোদিত করিয়া দিলাম—Death which separated them has united them at last. (যে মৃত্যু তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, সে-ই আবার তাহাদিগকে মিলিত করিয়া দিয়াছে।)

কত দিন কাটিয়া গিয়াছে। অনেকেই মেরী ও জেম্‌সকে ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু আমার মনে এখনও তাহাদের স্মৃতি গভীর ভাবে অঙ্কিত আছে।

যখনি মনে পড়িত James-কে হীনচক্ষে দেখিয়াছিলাম এবং পরিহাসচ্ছলে তাহাকে 'লর্ড ডাক্তার' বলিয়া উল্লেখ করিতাম, নিজের কাছেই নিজে তখন অতীব লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইতাম।

তাই প্রতি রবিবার সন্ধ্যাকালে সেই উদ্যানেরই কয়েকটি ফুল তুলিয়া লইয়া দু'জনের সমাধির উপরে সাজাইয়া দিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া আসিতাম। বলিতাম, তোমার ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা, তোমার গভীর একনিষ্ঠ প্রেমের মাঝে কোথায় ডুবিয়া গিয়াছিল তাহা না বুঝিয়া একদিন তোমার প্রতি অবিচার করিয়াছিলাম, আমার সে দোষ ক্ষমা করিও, বন্ধু!

(ভারত ফটোটাইপ ষ্টুডিওর সৌজন্যে)

পৃথিবীর ব্যথা
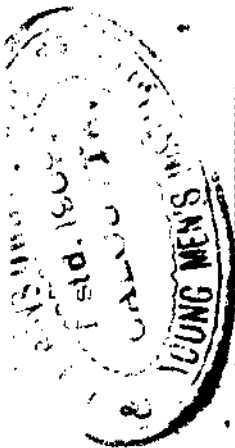
শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তোমরা কি পৃথিবীর শুনেছ ক্রন্দন?
আমি শুনিয়াছি; — নিত্য শুনি সে-গোপন
গুমরি' গুমরি' কাঁদা।

স্তব্ধ যবে সব
গহন নিশীথ রাতে নিথর নীরব
গভীর মৃত্যুর মতো; মর্ম্মরিয়া শাখা
বাতাস বহে না আর; বিহঙ্গম-পাখা
নিদ্রায় অবশ ক্লান্ত; লক্ষ কলরোল
অবসন্ন এ-মহীর — জীবন-হিল্লোল
নাহি ওঠে লয়ে তার সহস্র উল্লাস
বিস্তারিয়া কলাপীর বরণ-উচ্ছ্বাস
প্রাণের কল্লোলে আর বিভোল সঙ্গীতে:—
সেই ক্ষণে সেই স্তব্ধ গভীর নিশীথে
তোমরা কি ধরিত্রীর শুনেছ ক্রন্দন?
আমি শুনিয়াছি; — নিত্য শুনি সে-গোপন
গুমরি' গুমরি' কাঁদা নিভৃতে একাকী।

হা ধরণী জলোচ্ছ্বাসে ভরা দুটী আঁখি
বুঝি কোন্ অতীতের যুগান্তর হ'তে;
সেই অশ্রু-জ'মে-ওঠা-প্রবাহিনী-স্রোতে
আমরা জীবন-তরী ভাসাই কৌতুকে
কৃতঘ্ন ছেলের মতো, আপনার সুখে
প্রমত্ত দিবস রাতি; ব্যথিত বেদনা
কবে হ'তে জননীর চোখে অশ্রুকণা
বহায়েছে, কবে হ'তে করেছে দুখিনী
কোন্ দুঃখ মেলি' তার ব্যথার রাগিণী
ধরিত্রীর গতিরাগে, কবে কোন্ দিন
বাজিল জননী-বুকে হতাশার বীণ্ —

সন্দেহ জাগেনি কভু জাগেনি জিজ্ঞাসা,
বুঝি নাই অশ্রুসিক্ত জননীর ভাষা,
আপন প্রাণের মত্ত অভিসার মাঝে
বধির লাগেনি কানে অশ্রু-বীণ্ বাজে।

মর্ম্মন্তুদ সে-রোদন — গুমরি' গুমরি'
রজনীর নভতল দেয় অশ্রু ভরি'
আকুল হতাশে :— পশ্চিমে ঢলিয়া পড়ে
কালপুরুষের দেহ — তার সাথে সরে
উজ্জ্বল লুব্ধক — তারো নীচে ধীরে ধীরে
অগস্ত্য তারকা চলে অস্তাচল তীরে
নারিকেল-শাখা আড়ে ঝিলিমিলি খেলি'—
দূর মন্দিরের চূড়া রাখিয়াছে ঠেলি'
একটী উজ্জ্বল তারা যেন নভ-গায় —
উত্তর আকাশ-শীর্ষে সপ্তর্ষি-সভায়
বসিয়াছে দীপ্তাসনে;— সকল জুড়িয়া
ক্রন্দনের রোল বাজে ঝিরিয়া ঝিরিয়া:
ধরিত্রীর সে-ক্রন্দন গুমরি' গুমরি'
নিশীথের অবসর দেয় অশ্রু ভরি'।

ধরিত্রীর সে-ক্রন্দন, — অক্ষমা মাতার
রোদনের রোল সে যে, অশ্রুর পাথার
আপনার অসামর্থ্যে। ভাবে — মর-হিয়া
তার যুগ-যুগান্তরে কি গেল সঞ্চিয়া
আপন সন্তান তরে? মৃত্তিকার বুকে
জাগিল কি অমৃতের ধারা? সকৌতুকে
বাজিল কি নন্দনের অমর বীণায়
সুর-সুরধুনী এই ধরার ধুলায়?
শব্দ-গন্ধ-রূপ-রস-স্পর্শ-সুখ মাঝে
বাজিল কি তারার সঙ্গীত? শত কাজে,

লক্ষ লক্ষ জীবনের শত আকাঙ্ক্ষায়,
শত স্বার্থে অনুরাগে উষায় সন্ধ্যায়
অনিন্দ্য পাইল কেহ? সখার প্রণয়ে,
ভ্রাতৃ-আলিঙ্গনে কিম্বা পুত্রকন্যাচয়ে,
বসন্তে সবুজ-গানে, বরষা-স্বপনে,
শারদ আকাশ-তলে প্রেয়সী-নয়নে
প্রাণ ভরি' পেল কেহ স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতা
ওই দূর-গগনের? দিব্য চঞ্চলতা
কারো কি মনের পাখা করিল উদাস
মর্ত্ত্যের মদিরা-স্পর্শে? ফুটাল কি আশ
চ'লে যেতে আপনায় করি' অতিক্রম
সূক্ষ্ম অশরীরী সুখে সঙ্গীতের সম
এ-বিশ্বের ঐক্যতানে মিশায়ে চেতনা
বিচ্ছুরি' পড়িতে জ্যোতি-পুলকের কণা
সর্ব্ব দিকে দিগন্তরে? পরম সঙ্গীত
ধরার ধূলায় কভু হ'ল কি সঞ্চিত?
আপন সন্তান-স্নেহে দুখিনী মাতার
দুই চোখে বহে তাই দুখ-অশ্রু-ধার,—
অক্ষমা পৃথিবী তাই আকুল ক্রন্দন
দিয়া ভরি' তোলে স্তব্ধ নিশীথ গগন।

মণ্ডিত করিতে চায় ধরার ধূলায়;
বসন্তে শরতে কিম্বা বরষায় ছায়
আকাশে বাতাসে কিম্বা জলের কল্লোলে
যেথা যেথা প্রাণধারা স্পন্দিত হিল্লোলে
পূর্ণ করি' দিতে চায় অক্ষয় সম্পদে
অমৃতের স্পর্শ দিয়া; উর্দ্ধ হ'তে অধে
স্বরগ-বিহঙ্গ এক স্বর্ণ-পাখা মেলি'
কনক-কিরণ-রেখা দিকে দিকে খেলি'
রূপকথা ফুটাইতে চায় পৃথ্বী-বুকে
লীলাচ্ছলে হেলা-ভরে; পরম কৌতুকে
সঞ্চারিয়া দিতে চায় একটী চরম
পুলক-মূর্চ্ছনা; স্বচ্ছ নীল নভ সম
ধরিত্রীর দীন বুকে চায় রচি' দিতে
উজ্জ্বল কাহিনী এক;— অক্ষমের চিতে
শুধু ওঠে হতাশার বিলাপ ক্রন্দন —
— কোথা কোথা কোথা সেই অমূর্ত্ত স্বপন :—
কোথা শক্তি উড়িবার? পৃথিবীর ভাষা
অর্থ-হীন করি' তোলে সকল দুরাশা,
ধরণীর দেহ-ভরা কার্পণ্যের সুর
অবাস্তব করি' দেয় সকল সুদূর।

* * *

পৃথিবীর আকুল ক্রন্দন? নহে — নহে
আমারি এ-বক্ষতলে কে যে বুঝি বহে
একটী ক্রন্দনরোল;— কিসের দুরাশা
জীবনের সর্ব্বক্ষণ দিতে চায় ভাষা
স্বপ্নে-শোনা সঙ্গীতের সুরে; স্বপ্নে-দেখা
কোন্ সে আলোর জ্যোতি-উজ্জ্বলতা-রেখা

পৃথিবীর আকুল ক্রন্দন? নহে—নহে
আমারি এ-বক্ষতলে কে যে বুঝি বহে
একটী ক্রন্দনরোল — তারি হতাশ্বাস
ব্যথিত করিয়া যায় নিশীথ আকাশ,
তারি অবসন্ন সুর গুমরি' গুমরি',
রজনীর অবসর দেয় অশ্রু ভরি'।

কবিরাজ গোবিন্দদাস

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্র শ্রীখণ্ডের নাম বহুজনপরিচিত। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীল নরহরি, মুকুন্দ এবং তৎপুত্র রঘুনন্দনের নাম বৈষ্ণব সমাজ আজিও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া থাকেন। বহু সাধক, ভক্ত, পণ্ডিত ও কবির জন্মগ্রহণে এই গ্রাম ধন্য হইয়াছে। শ্রীখণ্ডের অবদান বাঙ্গালার সমাজ এবং সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

মহাপ্রভুর প্রকট-কালের মধ্যেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করিয়াই তিনটী প্রধান শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। প্রথম—শ্রীপাদ অদ্বৈতের মতানুবর্ত্তিগণ, ইহাঁরা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মধ্য দিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। আচার্য্য অদ্বৈত স্মৃতির বিধানে পিতৃশ্রাদ্ধও করিতেন, আবার যবন হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র খাওয়াইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। দ্বিতীয়—শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মতানুবর্ত্তিগণ, ইহাঁরা নিতাই-গৌরাঙ্গের উপাসক। বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধের গণ্ডী ইহাঁরা ততটা গ্রাহ্য করিতেন না। নিতাই জাতিভেদ মানিতেন না—একবার মাত্র হরিনাম উচ্চারণ করিলেই আচণ্ডাল তাঁহার আলিঙ্গন লাভে ধন্য হইত। পতিতোদ্ধারই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। সমাজসংস্কারে তাঁহার সম্প্রদায়ই অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তৃতীয়—শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের মতানুবর্ত্তিগণ, ইহাঁরা গৌর-গদাধরের উপাসনার প্রবর্ত্তন করেন। ব্রজভাবে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার সহিত সামঞ্জস্য সাধন পূর্ব্বক গৌর-উপাসনার নবীন পদ্ধতিতে বাঙ্গালার ভাবজগতে ইহাঁরা একটী স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পদাবলীই বৈষ্ণবগণের উপাসনার প্রধান মন্ত্র, নরহরিই গৌরলীলার পদরচনার প্রথম পথপ্রদর্শক। লোচনদাস, কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি, রায়শেখর প্রভৃতি স্মরণীয় বৈষ্ণব কবিগণ এই ভাবধারার ধারক এবং বাহক।

কবিরাজ গোবিন্দদাসও অনেকাংশে এই ভাবে প্রভাবিত। কবি প্রথম জীবনে শ্রীখণ্ডেরই অধিবাসী ছিলেন। ইহাঁরা জাতিতে বৈদ্য।

নরহরির জ্যেষ্ঠ সহোদর মুকুন্দ গৌড়ের বাদশাহের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। গৌড়ের দরবারের সঙ্গে শ্রীখণ্ডের আরও অনেকেরই সম্বন্ধ ছিল। কবি গোপালদাস স্বীয় বংশের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে 'রসকল্পবল্লী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'শ্রীকবিরঞ্জন দামোদর মহাকবি।
যশোরাজখান্ আদি সবে রাজসেবী॥'

এই কবিরঞ্জনই ছোট বিদ্যাপতি নামে পরিচিত। ইহাঁর একটী পদে বাদশাহ হুসেন শাহের এবং আর একটী পদে তৎপুত্র নসরৎ শাহের নাম পাওয়া গিয়াছে। যশোরাজখানের একটী পদে হুসেন শাহের নাম আছে। দামোদর সেনের সেরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তাঁহার 'সঙ্গীত-দামোদর' গ্রন্থখানির প্রতিলিপি অণ্ডাল ষ্টেশনের নিকট (বর্দ্ধমান জেলায়) দক্ষিণখণ্ডের ঠাকুরবাড়ীতে আছে। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে কবির কোন পরিচয় আছে কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। গোবিন্দদাস 'সঙ্গীত মাধব' নাটকে লিখিয়াছেন—

'পাতালে বাসুকির্ব্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥'

'গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা' পাঠও পাওয়া যায়। এই গোবর্দ্ধন 'হরিচরিত' কাব্যপ্রণেতা চতুর্ভুজের মত সে সময়কার কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, অথবা অর্থশালী ব্যক্তি, তাহা জানা যায় না। দামোদর শক্তি-উপাসক ছিলেন, এবং ইহাঁরই সংশ্রবে থাকিয়া যুবক গোবিন্দদাস শক্তি-উপাসনা এবং গীতপদ্যে ভগবতীর বর্ণনায় রত হন। 'ভক্তি রত্নাকর' বলিতেছেন (নবম তরঙ্গ)—

'ভগবতী প্রতি ঐছে হৈল যেন মতে।
তাহার কারণ এবে কহি সংক্ষেপেতে॥'

শক্তি উপাসক মাতামহ দামোদর।
ভগবতী যাঁর বশীভূত নিরন্তর॥
দামোদর কবিরাজ সর্ব্বত্র প্রচার।
তাঁর কন্যা সুনন্দা গোবিন্দ পুত্র যাঁর॥'

গোবিন্দ ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাঁহার মাতার কষ্ট দেখিয়া একজন দাসী গিয়া দামোদরকে সংবাদ দেয়। দামোদর পূজায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি দেবীর যন্ত্র দেখাইয়া ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই যন্ত্র দর্শন করাইলে সুখ-প্রসব হইবে। দাসী না বুঝিয়া যন্ত্র ধোয়াইয়া সেই জল পান করাইয়া দেয়। এই কারণে এবং মাতামহের সঙ্গগুণে গোবিন্দ দেবীর উপর অনুরক্ত হইয়াছিলেন। গোবিন্দের জীবনী আলোচনায় এ উপাখ্যানও স্মরণীয়।

দামোদর সেন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। 'ভক্তি-রত্নাকরে' (প্রথম তরঙ্গে) দেখিতে পাই—

'রামচন্দ্র গোবিন্দ এ দুই সহোদর।
পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর॥
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেহোঁ মহাকবি নাম বিদিত জগতে॥'

* * * *
* * * *

পিতা চিরঞ্জীবের সম্বন্ধে 'ভক্তি রত্নাকরে'র উক্তি—

'ভাগীরথী তীরে গ্রাম কুমারনগর।
অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর॥
সেই গ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি।
বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি॥
কি কহিব চিরঞ্জীব সেনের আখ্যান।
খণ্ডবাসী সবে জানে প্রাণের সমান॥
শ্রীচৈতন্য প্রভুর পার্ষদ বিজ্ঞবর।
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত অন্তর॥
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব বিদিত সর্ব্বত্র।
দীনহীনে কৈল যেঁহো ভক্তি রসপাত্র॥'

চিরঞ্জীব সেনও বোধ হয় গৌড়ের দরবারে কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গোবিন্দদাস 'সঙ্গীত-মাধব' নাটকে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রের পরিচয় ব্যপদেশে লিখিয়াছেন—

'স্বর্ধুন্যাস্তীর-ভূমৌ শরজনি-নগরে গৌড়-ভূপাধি-পাত্রাৎ ব্রহ্মণ্যাদ্বিষ্ণুভক্তাদপি সুপরিচিতাৎ শ্রীচিরঞ্জীব সেনাৎ যঃ শ্রীরামেন্দুনামা সমজনি পরমঃ শ্রীসুনন্দাভিধায়াং সোঽয়ং শ্রীমান্নরাখ্যো স হি কবিনৃপতিঃ সম্যগা-সীদভিন্নঃ॥'

'শরজনিনগর'—কুমারনগর। কবি গোবিন্দদাসের 'সঙ্গীতমাধব' নাটকখানি পাওয়া গেলে হয় তো কবির পরিচয় জানিবার পক্ষে আরও কিছু সুবিধা হইত। কবির নাটক হইতে 'ভক্তিরত্নাকরে' উদ্ধৃত শ্লোকগুলি মাত্রই এখন আমাদের সম্বল। কবি আপনাদিগকে কুমারনগরবাসী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি চিরঞ্জীব কুমারনগরেরই অধিবাসী ছিলেন, পরে শ্রীখণ্ডে গিয়া বাস করেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', আদিলীলা, দশম-পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্য শাখা গণনায় চিরঞ্জীব খণ্ডবাসী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন।—

'খণ্ডবাসী মুকুন্দ দাস শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরি দাস চিরঞ্জীব সুলোচন॥'

চিরঞ্জীব সুলোচন বোধ হয় দুই সহোদর ছিলেন। খণ্ডের কবি গোপাল দাস 'নরহরি শাখা নির্ণয়' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'চিরঞ্জীব সুলোচন খণ্ডবাসী ভাই।
যদিও গ্রন্থে আছেন তবু শাখাতে জানাই॥'

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের খণ্ডস্থিত পঞ্চ শাখার মধ্যে তিনি মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচনের নাম করিয়াছেন। রঘুনন্দন শাখা বর্ণনার উপসংহারে গোপাল দাস লিখিতেছেন—

'পূর্ব্বে কহিয়াছি শাখা চিরঞ্জীব সুলোচন।
খণ্ডবাসী সেন পদ্ধতি দুইজন॥
চিরঞ্জীব ভার্য্যা সতী বৈষ্ণবী সুশীলা।
শিশুতে পিতামহীকে মোর হরিনাম দিলা॥
তাহা সবার পুত্র পৌত্র অনেক হইলা।
সরকার ঠাকুরে সব সমর্পণ কৈলা॥

উপাধি প্রতিষ্ঠা ভয়ে মহান্ত না জানাইলা।
অদ্যাপি সেই গোষ্ঠীর সেবক রহিলা॥'

ইহা হইতে বুঝা যায় চিরঞ্জীব সেন, নরহরি সরকার ঠাকুরের বিশেষ অনুগত ছিলেন। 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে দেখিতে পাই, নরহরির সভায় চিরঞ্জীব দক্ষিণে এবং সুলোচন বামে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এই বর্ণনা পরস্পরের সৌহার্দ্যেরই পরিচায়ক।

'প্রেমবিলাসে' রামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনিবাসাচার্য্যকে পরিচয় দিতেছেন (চতুর্দ্দশ বিলাস)—

'রামচন্দ্র নাম মোর অম্বষ্ঠ কুলে জন্ম।
কেবল মানস প্রভুর চরণ দর্শন॥
তেলিয়া বুধুরি গ্রামে জন্মস্থান হয়।'

আমরা হস্ত-লিখিত পুঁথিতে 'বাসস্থান হয়' এই পাঠান্তর পাইয়াছি।

শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষাগ্রহণের পর গোবিন্দ বলিতেছেন—

'কুলের প্রদীপ মোর ভাই রামচন্দ্র।
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তাহার সম্বন্ধ॥'
(১৪শ বিলাস)

নরোত্তমের নিকট পরিচয়দান-প্রসঙ্গে—
(১৪শ বিলাস)

'গোবিন্দ কবিরাজ আসি পড়িল চরণে।
উঠাইঞা কৈল তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে॥
ইঁহো কোন জিজ্ঞাসিলা পাইয়া আনন্দ।
আচার্য্য কহেন রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ গোবিন্দ॥'

'প্রেমবিলাসে'র মতে তেলিয়া বুধুরি গ্রাম খেতরী হইতে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

'ভক্তিরত্নাকর' অষ্টম তরঙ্গে দেখিতে পাই একদিন রামচন্দ্র বিবাহের পর দোলায় চড়িয়া যাজী গ্রাম হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। আচার্য্য তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সঙ্গের কোন লোক বলিয়াছিলেন—

'কেহ প্রণমিয়া কহে এ মহা পণ্ডিত।
রামচন্দ্র নাম কবি নৃপতি বিদিত॥
দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক যশস্বী প্রবর।
বৈদ্য কুলোদ্ভব বাস কুমারনগর॥'

'ভক্তমাল'মতে গোবিন্দ জ্যেষ্ঠ এবং রামচন্দ্র কনিষ্ঠ। উভয় ভ্রাতার নিবাস বুধুরি গ্রামে। ভক্তমালের এই জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের গোলযোগ লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু বাসগ্রাম লইয়া প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর ও ভক্তমালে এই মতভেদ কবির পরিচয় সম্বন্ধে কাহারো কাহারো মনে সংশয় আনিয়া দেয়। আমরা এরূপ সংশয়ের কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না। ভক্তি-রত্নাকরেই ইহার মীমাংসা আছে। শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীধাম বৃন্দাবন গমন করিলে শ্রীরঘুনন্দনের আদেশে তাঁহাকে আনিবার জন্য রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। যাইবার কালে তিনি ভ্রাতাকে বলিয়া যান —

'নিজানুজ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ বিদ্যাবান্।
কার্য্যেতে চাতুর্য্য চারু সর্ব্বাংশে প্রধান॥
অতি স্নেহাবেশে তারে কহয়ে নিভৃতে।
যাইব শ্রীবৃন্দাবন রজনী প্রভাতে॥
এবে হেথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়।
সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয়॥
আছয়ে কিঞ্চিত ভৌম বহুদিন হৈতে।
তাহে যে উৎপাৎ এবে দেখহ সাক্ষাতে॥
শীঘ্র এই বাসাদিক পরিত্যাগ করি।
নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র বাস হয় সর্ব্বোপরি॥
তাহে এই গঙ্গা-পদ্মাবতী মধ্যস্থান।
পুণ্যক্ষেত্র তেলিয়া-বুধুরি নামে গ্রাম॥
অতি গণ্ডগ্রাম শিষ্ট লোকের বসতি।
যদি মনে হয় তবে উপযুক্ত স্থিতি॥
শ্রীমাতামহের পূর্ব্বে ছিল গতায়াত।
সকলে জানেন তেঁহো সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥
তথা বাস কৈলে অনেকের সুখ হয়।
গোবিন্দ কহয়ে এই কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥'
(ভক্তিরত্নাকর, ৯ম তরঙ্গ)

এই সময় ইঁহারা কুমারনগরেই বাস করিতেন। রামচন্দ্রের কুমারনগর ত্যাগের আরো একটা কারণ

ছিল। সে কারণ 'বুধুরি খেতরীর নিকটবর্ত্তী গ্রাম। সেখানে থাকিলে ঠাকুর নরোত্তমের সঙ্গলাভ ঘটিবে।' ভক্তিরত্নাকর বলিতেছেন—

'অল্পকালে পিতা সঙ্গোপন সঙ্গহীন। * * *
আজন্ম রহিলা মাতামহের আলয়॥'

সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, চিরঞ্জীব সেনের লোকান্তরের পরও ইঁহারা কিছুদিন শ্রীখণ্ডে মাতামহালয়ে বাস করিয়াছিলেন। পরে মাতামহ পরলোক গমন করিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে উভয় ভ্রাতায় কুমারনগরে গিয়া বাস করেন। চিরঞ্জীব এবং দামোদরের মধ্যে কে আগে লোকান্তরিত হইয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কবি যে বেশী দিন শ্রীখণ্ডে বাস করিয়াছিলেন, তাহাও মনে হয় না। সঙ্গীতমাধব নাটক লিখিবার সময় কবি নিশ্চয়ই বুধুরি গ্রামে বাস করিতেছিলেন। দেখিতেছি তখনও আপনাদের পরিচয়দান-প্রসঙ্গে কবি কুমারনগরের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন।

গোবিন্দের দীক্ষালাভের একটী উপাখ্যান আছে। সে উপাখ্যান প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর এবং ভক্তমালে প্রায় একরূপ। আরো অনেক গ্রন্থেই অল্পবিস্তর এই কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ এ সম্বন্ধে বিতর্ক তুলিয়াছেন। আমাদের মতে এ বিতর্কও নিরর্থক। প্রেমবিলাস-রচয়িতা গোবিন্দ কবিরাজের সম-সাময়িক ব্যক্তি। তিনি সেকালের অনেক ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া, অনেক কথা সম-সাময়িক লোকের মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াই লিখিয়াছিলেন। সুতরাং গোবিন্দ কবিরাজের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সমস্তটাই যে গালগল্প, একথা বলিতে পারি না। হয় তো অতিশয়োক্তি আছে। তাই বলিয়া একেবারে অবিশ্বাস্ত নহে। গোবিন্দদাসের দীক্ষা-কাহিনীটী প্রেমবিলাসের মতে মোটামুটী এইরূপ—গোবিন্দ বুধুরি গ্রামে বাসকালে অতি ভয়ানক গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হন। রামচন্দ্র তখন আচার্য্যের গৃহে, গোবিন্দ ভ্রাতার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। রামচন্দ্র অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকায় আসিতে পারিলেন না। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে গোবিন্দের অন্তিমদশা উপস্থিত হইল। তিনি পুনরায় পুত্র দিব্যসিংহকে যাজী গ্রামে লোক পাঠাইবার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। সংবাদ পাইয়া আচার্য্য সহ রামচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আচার্য্য শ্রীনিবাস গোবিন্দকে দীক্ষা দান করিলেন। রোগভোগকালে দেবীও দৈববাণীতে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে উপদেশ দিয়াছিলেন। দীক্ষা-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কবি রোগমুক্ত হন।

ভক্তিরত্নাকরে রোগের কথা নাই। কবি পিতার কথা স্মরণ করিয়া মাঝে মাঝে অনুতপ্ত হইতেন। রামচন্দ্রের দীক্ষা-গ্রহণের পর হইতে তাঁহার ব্যাকুলতা বৃদ্ধি হয়। এই সময় দৈববাণী হইল; দেবী বলিলেন, তুমি শ্রীকৃষ্ণ ভজনা কর। অতঃপর শ্রীনিবাসাচার্য্য বুধুরি আগমন করিলে, কবি তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থের বিবরণ প্রায় প্রেমবিলাসের অনুরূপ।

গোবিন্দের জীবনী আলোচনা করিতে হইলে শ্রীখণ্ডের কথা — তথা তৎসাময়িক বৃন্দাবনের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ ব্রজ-সম্বন্ধেরই সূচনা। পূর্ব্বে যে তিনটী শাখা বা সম্প্রদায় ভেদের উল্লেখ করিয়াছি, ব্রজপ্রবাসী শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভৃতির মধ্যে তাহার একটা শৃঙ্খলাপূর্ণ সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। গোস্বামীপাদগণের গ্রন্থরাজীর মধ্যে ইহার সন্ধান মিলিতে পারে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানিকে এই সমস্ত মতবাদ ও ভাবধারার সংক্ষিপ্ত সমন্বয় বলা চলে। গোবিন্দ কবিরাজ আচার্য্য শ্রীনিবাসের মধ্যস্থতায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে বৈষ্ণব ভাব-প্রবাহের এই মিলিত ত্রিবেণীতে অবগাহন করিয়াছিলেন। গোস্বামীপাদগণের পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের অমৃত ধারা গোবিন্দ-প্রতিভার উজ্জ্বল প্রবাহে বৈষ্ণব পদাবলীকে নবভাবে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল। অপর কবি হইলে ব্রজের এই উদ্দাম প্লাবনে তাঁহার

স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইত। হয়তো তিনি গতানুগতিক অনুসরণকারী বা অনুবাদকে পরিণত হইতেন। কিন্তু গোবিন্দ কবিরাজ—গোবিন্দ কবিরাজ! তিনি শ্রীধামস্থ গোস্বামীপাদগণের অতবড় ব্যক্তিত্বের সম্মুখেও আত্ম-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন! কবি তৎসাময়িক ব্রজ-প্রভাবের প্রবল প্রবাহে ডুবিয়াছেন, উঠিয়াছেন, লীলায়িত সন্তরণে স্বচ্ছন্দে উজানে ভাসিয়া চলিয়াছেন—গোবিন্দ পদাবলীর বিচিত্র ছন্দে তাহার প্রত্যেক ভঙ্গিটী চির-মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আছে।

গোবিন্দ পদাবলী রচনা আরম্ভ করেন পরিণত বয়সে, প্রায় বৎসর চল্লিশ পার হইবার পর। তৎপূর্ব্বেও যে তিনি কবিতা লিখিতেন, ভক্তিরত্নাকরে তাহার উল্লেখ আছে (নবম তরঙ্গ)—

'গীতপদ্যে করে ভগবতীর বর্ণন।
শুনি হর্ষ শক্তি উপাসক সঙ্গিগণ॥'

প্রেমবিলাসের মতে দীক্ষা-গ্রহণের পরই গোবিন্দদাস 'ভজ হুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন অভয় চরণারবিন্দ রে।' এই পদ রচনা করেন। প্রেমবিলাস-রচয়িতাও তৎপূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কবিতা রচনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেমবিলাসকার বলিতেছেন—

'আমার লিখন অন্যমত নহে ইহ।
এ কথা শুনিয়া দুঃখ না ভাবিহ কেহ॥
কবিরাজের পূর্ব্ব বাক্য করহ শ্রবণ।
পরে যে হইবে তাহা দেখিব সর্ব্বজন॥'
(১৪শ বিলাস)

এই কথা বলিয়া প্রেমবিলাস-রচয়িতা গোবিন্দদাসের পূর্ব্বরচিত একটী পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন।—

'ন দেব কামুক ন দেবী কামিনী
কেবল প্রেম পরকাশ।
গৌরী শঙ্কর চরণে কিঙ্কর
কহয়ে গোবিন্দদাস॥' (১৪শ বিলাস)

এইরূপ ভণিতা দিয়া গোবিন্দদাস যদি সত্যই কোন পদ রচনা করিয়া থাকেন, তবে তাহা কবির সৎসাহস ও সারল্যেরই পরিচায়ক। প্রথম যৌবনে সুপণ্ডিত মাতামহের আশ্রয়ে সুশিক্ষিত হইয়া কবি আত্মতৃপ্তি বা অপরের প্রীতি-সাধনের জন্য ঐরূপ ভণিতা দিয়া কিছু লিখিয়া থাকিলে, তাহাতে দুঃখ করিবার কাহার কি থাকিতে পারে?

আমরা একখানি দানখণ্ডের পুঁথির দুইখানি মাত্র পত্র পাইয়াছি। কবিতায় শেষে গোবিন্দদাসের ভণিতা; ভণিতায় নিজ নামের সঙ্গে গৌরীশঙ্করের উল্লেখ নাই, তবে শঙ্করের উল্লেখ আছে। রচনাও নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর নহে। পত্রাঙ্ক সাত এবং নয়। পুঁথির মালিক কতকগুলি পুরানো পুঁথির ছিন্নপত্রের সঙ্গে এই পত্র দুইখানি গৃহের বাহিরে আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাহারই মধ্য হইতে বাছিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম। জল পড়িয়া স্থানে স্থানে লেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পত্র দুইখানি বাঁকুড়া জেলার আসুরিয়া গ্রাম হইতে সংগৃহীত। যথা-সম্ভব পাঠোদ্ধার করিয়া ইহার অবিকল নকল তুলিয়া দিলাম।

৭ পত্রের পূর্ব্ব পৃষ্ঠা। '* * যত কহ অপ্রবিন নহ দানি চিরদিন কার বোলে সাধ মহাদান। ব্রজনারি পথে রাখি চঞ্চল করহ আঁখি এই বুদ্ধে পাবে অপমান॥ অকারণে কর শ্রম রাখহ আপন ভ্রম মোরা কেহ নহি ক্ষীণ জনী। সকল জুবতি ভাগে কহিব পতির আগে তখনি জানিবে চক্রপাণি॥ রাধার বচন সুনি কৃষি দেব চক্রপাণি পুনরপি কহেন কথন। কৃষ্ণকথা হিতাহিত শুন সবে দিয়া চিত গোবিন্দ দাশেতে বিরচন॥ ৯॥ সুই রাগ॥ একাবলি ছন্দ॥ মাধব আনন্দ ভাবে। কহেন গোপিকা সবে॥ শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাধিকা হের। পতির গরব কতেক কর॥ জত তেজি তোমা সবার স্বামি। গোকুলে বিক্ষাত জানি সে আমি॥ এমন রূপসি কাহার নারী। বাহির হইতে না দেই পুরী॥ সদা লীলা রঙ্গ বসিয়া থাটে। তোমা সবায় পতি পাঠায়ে হাটে॥ পুরুষ বলিয়া কে বলে তায়। নারির আর্জ্জন বসিয়া খায়॥ বলবান যদি হইত পতি।' আর

বা বলিতে কতেক ভাঁতি॥ কৃষ্ণের সুনিঞা এ সব কথা। কহে তাঁরে বৃকভানুর সুতা॥ সুন ২ অহে ব্রজের রাজ। নিজ বৃত্তি হৈলে কিসের লাজ॥ বিচারিয়া দেখ ভুবন মাঝে। জার জেই বৃত্তি তাহারে সাজে॥ নিবেদন করি তোমার ঠাঞি। পতি বিনে নারির ভরসা নাঞি॥ কহ ২ জায়া স্বামির আগে। কেমনে আসিয়া জগতে ভাঁগে॥ রাধিকা বলেন সুন্দর হরি। বিকে জাই [৭ পত্রের পর পৃষ্ঠা] আর না সয় দেরী॥ না কর জঞ্জাল সুনহ বোল। নষ্ট হয়ে দধি পায়স ঘোল॥ বিকি কিনি গেল সকল বৈয়া। না সহে বিলম্ব ব্রজের মায়া॥ মাধব কহেন জুবতি রাধে। বিলম্ব করহ আপন সাধে॥ আমার উচিত দিয়া গো দান। জাহ বিকে সবে কে করে আন॥ দুঁহে কক্ক কত কথার ছন্দ। প্রথম আরম্ভ পিরিতি বন্ধ॥ গোবিন্দদাশের আনন্দ মতি। সখা জার দেব সৈলজা-পতি॥ ১০॥ ভাট্যালি রাগ॥ পয়ার॥ কতেক চাতুরি তুমি কর মহাদানি। এমন চাতুরি মোরা কোথাহ না সুনি॥ রাধিকা বলেন সুন দেব জত্নরায়। অসম্ভব্য জত বল সহনে না জায়॥ ভাণ্ড প্রতি দান তুমি চাহ শোল পন। বেচিতে গব্যের মূল্য হব কত ধন॥ ঘৃত ভাণ্ড দুই পন ঘোলে তের বুড়ি। দধি দুগ্ধ ভাণ্ড মাত্র গণ্ডা দশ কড়ি॥ ক্ষীর পীঠা * * লাড়ু * * *। ননী ভাণ্ড পঞ্চবুড়ি ভাগ্য পুণ্যে হয়॥ ইহার এতেক দান চাহ চক্রপাণি। হেন বিপরীত কথা কোথাহ না সুনি॥ দ্রব্য দেখি কহ দান জে হয় উচিত। পরিহর কানু তুমি আপন চরিত॥ শ্রীহরি কহেন কথা ইশত হাসিয়া। কত কথা কহ রাধে আমারে ভাণ্ডিয়া॥ এই ঘৃত দুগ্ধ দধি আসা তিন লোকে। মহেশ সন্তোষ অতি জার অভিষেকে॥ হেন দ্রব্যে অল্প বুদ্ধি কর কি কারণে। ইহাতে অধিক ভোগ নাহিঁ ত্রিভুবনে॥ আছয়ে জতেক দ্রব্য কর অবধান। সবাকে অধিক এই গোরসের দান॥ প্রত্যয় না জাহ।'

৯ পত্রের পূর্ব্ব পৃষ্ঠা। '* * * জে জন জঞ্জাল করে নাহি দেয় কড়ি। দধি খায়্যা ভাঙ্গে তার মন্থনের হাঁড়ি॥ না জানে এসব কথা যশোদা জননী। গোপীকার পক্ষ হইয়া বলে রুষ্ট বাণী॥ জননীর বাক্য প্রতি কিবা অভিরোষ। সাধিতে আপন কড়ি ইথে কিবা দোষ॥ অত্যাপি তোমার ঠাঞি কড়ি শত পন। দানের সহিত দিবে করিয়া গনন॥ গোবিন্দদাশেত্তে বলে চন্দ্রচূড় গতি। সুনিঞা কৃষ্ণের কথা রাধা ক্রোধ মতি॥ ১৩॥ ভাট্যালি রাগ॥ অহে কানাঞি এতেক চাতুরি কেন। উচিত কহিতে দুঃখ পাবে চিতে আপনাকে নাহি জান॥ ধ্রু॥ করজের কথা সুনি গোবিন্দের মুখে। কৃষ্ণের বয়ান হেরি নয়ন নিমিখে॥ রাই কহেন সুন অহে কমল নয়ান। আপনাকে বাস তুমি কত ধনবান॥ না কর ২ কানাঞি ধনের বড়াঞি। কহিবে ও সব কথা অজানের ঠাঞি॥ তোমারে অধিক কেবা আছে ধনহিন। জুবতী হইয়া করে তোমার ঠাঞি ঋণ॥ জত ধনের ধনি তুমি নহে অগোচর। পড়সি হইয়া করি গোকুলেতে ঘর॥ কিঙকর রাখিতে কড়ি নাহিঁক ভবনে। ধেনু লইয়া ফির তেঞি কাননে ২॥ দিবসে তোমার ঘরে নাহিঁ পড়ে পাত। প্রাণ রক্ষা কর বনে মাগ্যা খাও ভাত॥ ধনের ধনিন জদি হত্যে নারায়ণ। ইহারে অধিক কত কহিতে কথন॥ এতেক শুনিঞা তবে দেব জত্নপতি। রাধারে কহেন কিছু প্রকাশ [৯ পত্রের পরের পৃষ্ঠা] ভারতী॥ তুমি কি জানিবে আমার ধনের কথন। স্বর্গ মহি রসাতলে জানে সর্ব্বজন॥ ব্রহ্মা আজ্ঞাকারি আমার শিবে অধিকার। জাঁহার পূজনে ধন অধিক সবার॥ সমুদ্র ভরিতে পারি এত আছে ধন। কুবের কিনিতে পারি বরুণ পবন॥ বাসুকি কিনিতে পারি ইন্দ্র সুর পুরি। চন্দ্র সূর্য্য কিনিবারে পারিয়ে সুন্দরী॥ রাই বলে সুন অহে নন্দের গোপাল। এত ধনি হইয়া কেন ঘাটের ঘাট্যাল॥ কানাঞি বলেন রাধে কর অবধান। বুদ্ধি জিবি নাহিঁ কেহ আমার সমান॥ সকলে জানয়ে আমি বিচারে পণ্ডিত। বুঝিয়ে কার্য্যের গতি জেবা হিতাহিত॥ চতুর দেখিয়া মোরে কংস

খিতিনাথ। সমর্পণ কৈল নিজ রাজ্যের জাগাত॥ কিঙকর পাঠায়ে আমি দিগ দিগান্তরে। আপনি সাধিয়ে দান জমুনার তীরে॥ গৌরবে না দেই জেবা জাগাতের কড়ি। জতন করিয়া তারে ঘাটে বান্ধ্যা এড়ি॥ গোবিন্দদাশেতে কয় করিয়া ভাবনা। সুনিঞা বন্ধন বাণী রাধিকা বিমনা॥ ১৪॥ শ্রীরাগ॥ ত্রিপদী॥ কৃষ্ণের চাতুরী বাণী সুনি রাধা চন্দ্রাননী হেন কালে কহেন কথন। ঢঙ্গ রঙ্গি নন্দসুত নাঞি বুঝ হিতাহিত জনজাল কর অকারণ। অন্ত জত গোওয়ালিনী জেবা করে বিকি কিনি এই পথে জাহার গমন। না পাবে জাগাত জার প্রতিফল দিবে তার তোমার অধিন জেই জন॥ সর্ব্বদিন স্বতন্তরা রাজার জোগানি মোরা লৈয়া জাই ঘৃত দধি ঘোল। কংসরাজ প্রদাদাত…' [পত্র শেষ]।

বানান অবিকল রাখিয়াছি। কৃষ্ণ কীর্ত্তন এবং পরবর্ত্তী কালে রচিত অনেক কবির দানখণ্ডের মত ইহার মধ্যেও গোপীগণ যশোদার কাছে গিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণের উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে উদ্ধৃত কবিতায় প্রথমশ্রেণীর বৈষ্ণব কবিগণের রচনার মত সে সরস সতেজ দর্পিত ভঙ্গী না থাকিলেও রচনা মন্দ নহে। ইহা কবিরাজ গোবিন্দদাসের রচিত কি না জানা যায় না। দানখণ্ডের কবিতা লিখিয়াছেন, অথচ কবি শৈলজাপতি, চন্দ্রচূড়ের দোহাই পাড়িয়াছেন; এই প্রকারের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক পদ একটু নূতন মনে হওয়ায় সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিলাম। কৌতূহল বশতঃ কোন অনুসন্ধিৎসু পাঠক যদি দয়া করিয়া পুরানো পুঁথির খোঁজ লইতে যত্নবান হন এবং ইহার সম্পূর্ণ পুঁথি যদি পাওয়া যায়, হয় তো কবির পূর্ণ অথবা আংশিক পরিচয়ও মিলিতে পারে। চন্দ্রচূড়সেবক এই গোবিন্দদাসের সঙ্গে কবিরাজ গোবিন্দদাসের প্রথম যৌবনে শক্তি-উপাসনার প্রবাদ মিলিয়া যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা চলে না। বসন্তের আবির্ভাবে কাননে, পল্লীতে, আকাশে, বাতাসে যেমন একটা উৎসব-সমারোহের সাড়া পড়িয়া যায়, গাছের ফুলে, পাখীর কণ্ঠে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, সৌন্দর্য্যে শোভায় প্রকৃতিকে নিতি নোতুন বলিয়া মনে হয় — বাঙ্গালায় একদিন তেমনি দিন আসিয়াছিল। বসন্তের সঙ্গীত, সৌন্দর্য্য, আনন্দ এবং নবীনতা যেন একটী আধারে পুঞ্জীভূত হইয়াছিল। সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বের সেই স্মরণীয় দিন, পল্লীতে পল্লীতে কবি গায়ক, কণ্ঠে কণ্ঠে আশার অমিয় বাণী, মানবে মানবে মহা-মিলন, হৃদয়ে ভরসা, বদনে ঔজ্জ্বল্য, নয়নে দীপ্তি, চরণে চাঞ্চল্য, বাহু আলিঙ্গনোদ্যত,—উত্তাল জনসমুদ্রের সে কি বিপুল তরঙ্গোচ্ছ্বাস! সে দিন বৈষ্ণব কবিতা রচনায় শাক্ত শৈব হিন্দু মুসলমান বলিয়া কোন ব্যবধান ছিল না। সুতরাং চন্দ্রচূড়পতি কবির দানখণ্ড দেখিয়া তাঁহাকে কোন বিশেষ পরিচয়ে চিহ্নিত করা চলে কিনা সন্দেহ। সন্দেহ হয়, তবে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। পুঁথির পাতা দুইখানির লেখা দেখিয়া আন্দাজ শতখানেক বৎসরের পুরানো বলিয়া মনে হয়।

কবিরাজ গোবিন্দদাসের অনেক পদ, গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির পদের সঙ্গে মিলিয়া গিয়াছে। তথাপি এমন বহু পদ পাওয়া গিয়াছে, যাহা কবিরাজ গোবিন্দদাসের রচনা বলিয়া নিশ্চিত রূপে চিহ্নিত করা চলে। গোবিন্দদাসের কবি-পরিচিতির প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। দুই একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কবিকার্য্যের সমগ্রতার ধারণা দিতে যাওয়াও বৃথা চেষ্টা। ব্রজবুলির পদে গোবিন্দদাসের তুলনা নাই। ব্রজবুলি একটা কৃত্রিম ভাষা, এইরূপ কৃত্রিম ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি বড় সহজ কার্য্য নহে, গোবিন্দদাস এই অ-সহজ সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন, যশোরাজ-খান্ প্রভৃতি দুই একজন বাঙ্গালী কবি ব্রজবুলিতে পদ রচনার সূচনা করেন, গোবিন্দদাসের হাতে তাহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। শব্দসৌন্দর্য্যে, ভাবমাধুর্য্যে, ছন্দ-ঝঙ্কারে এবং রস-ধ্বনি ও অলঙ্কারে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির সঙ্গে সমান আসন,—এমন কি স্থানে স্থানে শ্রেষ্ঠত্বেরও দাবী করিতে পারেন। তাঁহার বাঙ্গালা

পদও চমৎকার। বর্ণন-পারিপাট্যে এবং প্রগাঢ় সারল্যে সেগুলি প্রায় চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে তুলিত হইবার যোগ্য। গোবিন্দদাসকে একাধারে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলিত রূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। দুঃখের বিষয়, গোবিন্দদাসের পদের আজিও একটী ভাল সংস্করণ বাহির হইল না।

মধ্যে কিছুকাল ধরিয়া ভূতপূর্ব্ব বিদ্যাপতি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় গোবিন্দদাসকে মৈথিল বানাইবার জন্য বাহানা ধরিয়াছিলেন। স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র রায় মহাশয়, আমি এবং শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন—আমরা বিবিধ মাসিক এবং ত্রৈমাসিক পত্রে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। নগেন বাবু সে সমস্ত প্রতিবাদের আর উত্তর দেন নাই। গোবিন্দদাস যে মৈথিল ছিলেন কিংবা মিথিলায় বিদ্যাপতির পর গোবিন্দদাস নামে কোন শক্তিমান কবি জন্মিয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যাহা মিথ্যা, তাহার স্বপক্ষে আর প্রমাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? স্বজাতির প্রতি পক্ষপাত হয় তো ভাল কথা নহে, তাই বলিয়া স্বজাতির গৌরব লাঘবের চেষ্টাও তো' প্রশংসার কথা নয়।

'ভক্তিরত্নাকরে' কবি গোবিন্দদাসের 'কবিরাজ' উপাধি প্রাপ্তির দুইটী উপাখ্যান দেখিতে পাই। প্রথম উপাখ্যান—

'গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিজ্ঞ কবি সবে প্রশংসয়॥
শ্রীজীব লোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যার গীতামৃত পানে॥
'কবিরাজ' খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞী॥'

'শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র, চন্দনগিরেশ্চঞ্চৎসদ্বানিল
নানীতঃ কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীবসুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বত্রাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমদ্ভুৎ পরম্॥'

(ভক্তিরত্নাকর, ১ম তরঙ্গ)

দ্বিতীয় উপাখ্যান—শ্রীনিবাসাচার্য্য—

'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লীলা বর্ণিতে গোবিন্দে।
আজ্ঞা করিলেন মহা মনের আনন্দে॥
প্রভুর আজ্ঞায় বর্ণে গন্ধ পদ্য গীত।
সে সব শুনিতে কার না দ্রবয়ে চিত॥
গোবিন্দের কাব্যে শ্রীআচার্য্য হর্ষ হৈলা।
গোবিন্দে প্রশংসি 'কবিরাজ' খ্যাতি দিলা॥
শ্রীদাসাদি প্রিয়গণে গাওয়াইলা গীত।
গীতামৃত বৃষ্টি হৈল সর্ব্ব মনো হিত॥'

(ভক্তিরত্নাকর, ১০ম তরঙ্গ)

ইহা হইতে মনে হয়, কবি দুইবার—একবার গুরুর নিকট হইতে আর একবার শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীবাদির নিকট একই 'কবিরাজ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কবির জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্রও শ্রীবৃন্দাবনে 'কবিরাজ' উপাধি পাইয়াছিলেন।

খেতরীর মহোৎসবে গোবিন্দের রচিত পদাবলী শুনিয়া শ্রীপাদ বীরভদ্র গোস্বামী বলিয়াছিলেন—

'শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটী করে ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লইয়া মরি॥'

কবি জীবদ্দশাতেই যে তাঁহার কবি-কীর্ত্তির জন্য অজস্র প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, সম-সাময়িক কবিদের রচিত বন্দনা হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়।

শ্রীবৃন্দাবনস্থিত শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির মত ভারতবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতগণও গোবিন্দদাসের পদাবলীর জন্য কিরূপ ব্যাকুলভাবে আশাপথ চাহিয়া থাকিতেন নিম্নোদ্ধৃত পত্রিকাখানিই তাহার প্রমাণ—

'॥ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তি ॥

স্বস্তি পরম প্রেমাস্পদ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মহাভাগবতেষু। জীবস্য কৃষ্ণ স্মরণং শ্রীমতাং ভবতাং শুভানুধ্যানেন অত্রত্য কুশলং তত্রাত্যং তদীহেতমাং—

তত্র ভবন্ত এবাস্মাকং মিত্রতয়া বিরাজন্তে, তস্মাত্তবদীয় কুশলং শ্রোতুং সদা বাঞ্ছাম তত্রাবধানং কর্ত্তব্যং। সম্প্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাময় স্বীয়ানি গীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্ব্বমপি যানি তৈরমৃতৈরিব তৃপ্তা বর্ত্তামহে,

পুনরপি নূতন তত্তদাশয়া মুহুরপ্যত্নুপ্তিঞ্চ লভামহে, তস্মাত্তত্র চ দয়াবধানং কর্ত্তব্যং।

*　*　*　*

ইহ শ্রীমন্নরোত্তমকবিরাজৌ প্রতি শুভাশীর্ব্বাদাঃ।
নিবেদনবেদং ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্ত নমস্কারাঃ॥'
'পত্রীমধ্যে কবিরাজ রামচন্দ্র কয়।
নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে এক হয়॥
পত্রীমধ্যে শ্রীকৃষ্ণদাসের নমস্কার।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রচার॥'
(ভক্তিরত্নাকর, ১৪শ তরঙ্গ)

ভক্তিরত্নাকরে আছে (বোধহয় কবি শেষ বয়সে)—
'নির্জ্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে।
করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে॥' (১৪শ তরঙ্গ)

আমরা কিন্তু এরূপ কোন সংগ্রহ-গ্রন্থের সন্ধান পাই নাই। 'একান্ন পদাবলী' প্রভৃতি দুই একটী ক্ষুদ্র সংগ্রহের সংগ্রাহক কে জানা যায় না।

কবির পদের মধ্যে তাঁহার সম-সাময়িক (কবিরঞ্জন) বিদ্যাপতি, রায় চম্পতি, দ্বিজ রায় বসন্ত, শ্রীবল্লভ, পক্ক-পল্লীর রাজা নরসিংহ ও তাঁহার সভাসদ্ রূপনারায়ণ, রায় সন্তোষ, পক্ককোটের রাজা হরিনারায়ণ প্রভৃতি কবি এবং সজ্জনগণের নাম পাওয়া যায়। এই নামগুলি কবির সময় নির্দ্ধারণ এবং তাঁহার জীবনেতিহাস রচনার পক্ষে সাহায্য করিতে পারে। এই সমস্ত নামের মধ্যে মিথিলার কোন রাজা বা কবির নাম নাই। রায় চম্পতির সম্বন্ধে রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের টীকায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের সচিব (চমূপতি ?) ছিলেন। আমাদের মনে হয়, এইমত ঠিক নহে। চম্পতি গোবিন্দদাসের সম-সাময়িক কোন উড়িয়া কবি। চম্পতি বাঙ্গালী ছিলেন কিনা তাহারও অনুসন্ধান হয় নাই। অপরাপর সকলের পরিচয় কিছু কিছু জানা গিয়াছে।

গোবিন্দ কবিরাজ প্রায় ৭৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহাঁর জন্ম অনুমান ১৪৫৯ শকাব্দ, অন্তর্ধান ১৫৩৫ শকাব্দ চান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে।

কবির একমাত্র পুত্রের পরিচয় পাইয়াছি, নাম দিব্য-সিংহ। ইনি পিতার ন্যায় কবি ছিলেন অথবা কোন গ্রন্থ বা পদ রচনা করিয়াছিলেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যে এরূপ কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রেমবিলাসে দিব্যসিংহ নামে এক রাজার পরিচয় আছে (চতুর্ব্বিংশ বিলাস)—

'শ্রীহট্টে লাউড় দেশে নবগ্রাম হয়।
যথা দিব্যসিংহ রাজা বসতি করয়॥'

*　*　*

'শান্তিপুরে সেই রাজা উপস্থিত হয়॥
অদ্বৈত চরণে আসি আত্ম সমর্পিল।
শক্তি মন্ত্র ছাড়ি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নিল॥
কৃষ্ণদাস নাম তার অদ্বৈত রাখিলা।
অদ্বৈত চরিত কিছু তিঁহো প্রকাশিলা॥
অদ্বৈতের স্থানে শ্রীভাগবৎ পড়ি।
বৃন্দাবন চলিলেন হইয়া ভিখারী॥
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বৃন্দাবনে খ্যাতি।
রূপ সনাতন সহ যাঁহার পিরিতি॥'

ইনি গ্রন্থকার ছিলেন, সুতরাং পদরচনা করিয়াছিলেন, অনুমান করা চলে। রাজা দিব্যসিংহ গোবিন্দদাসের পুত্রের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি। ইনি দিব্য-সিংহ ভণিতায় পদরচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। ইহাঁর অদ্বৈত চরিত লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস রচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ। বোধহয় রাজা সন্ন্যাস-গ্রহণের পরই গ্রন্থ বা পদরচনায় প্রবৃত্ত হন। মনে হয় কৃষ্ণদাস ভণিতার কয়েকটী পদ ইহাঁর রচিত। দীনবন্ধু দাসের সংকীর্ত্তনামৃতে দিব্যসিংহ ভণিতার একটি পদ আছে। পদটী গোবিন্দদাসের পুত্রের রচিত হইতে পারে। আমরা একটি পদ পাইয়াছি, পদের ভণিতায় দিব্যসিংহের পর গোবিন্দ শব্দটী শ্লিষ্ট বলিয়া মনে হয়। মাথুর—বিরহের পদ; ভণিতায় দিব্যসিংহের নাম এবং ভাবমাধুর্য্যে পিতৃগৌরবের উত্তরাধিকারিত্বের নিদর্শন দেখিয়া আমরা এ পদ কবিরাজ গোবিন্দদাসের পুত্রের রচিত বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছি। পদটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

'কতদূরে মধুপুরী যাব কার পাশে।
আবাস বিপিন ভেল পিয়া পরবাসে॥
ব্রজের নয়ন নীরে কালিন্দী উথলে।
শুকাইল আঁখি মোর হিয়ার অনলে॥
তখন খুঁজিতু সই কান্দিবার ছলা।
কান্দিতে না পারি আর অনাথী অবলা॥
যে জনা করিত সাধ দেখিবার লাগি।
আজি তার দেখা নাই হায়রে অভাগি॥
যে দিকেতে চাই সই সব কানু মাথা।
রূপে ভরা আঁখি তবু নাহি থাকে ঢাকা॥
না যায় কঠিন প্রাণ থাকিতে না চায়।
দিব্যসিংহ গোবিন্দের পদপানে ধায়॥'

"মধুপুরী কত দূরে, (সেখানে কানুর জন্ত) কার পাশে যাব? (কিম্বা কার পাশে যাব, কে কানুকে আনিয়া দিবে?) প্রিয় প্রবাসে যাওয়ায় আমার আবাস অরণ্যসমান হইয়াছে। ব্রজের নয়নজলে কালিন্দীর জল বাড়িতেছে (বৃন্দাবনের স্থাবর জঙ্গম কাঁদিতেছে), কিন্তু আমার নয়নে জল নাই। বুকের আগুনে চোখের জল শুকাইয়া গিয়াছে। তখন (শাশুড়ী ননদীর গঞ্জনায় বঁধুর উপর অভিমান করিয়া) কাঁদিবার ছল খুঁজিতাম, কিন্তু এখন আর কাঁদিবার সামর্থ্য নাই। যে জন এক দিন দিনরাত্রি আমায় দেখিবার সাধ করিত, হায়রে মন্দভাগিনী আজি (আমি কাঁদিয়া সাধিয়াও) তার দেখা পাইতেছি না। বৃন্দাবনের যে দিকে চাই, সব কানুমাখা (সর্ব্বত্রই কানু স্মৃতি উদ্দীপিত হয়। সুতরাং চাহিতে পারি না)। তথাপি আঁখি মুদিবারও উপায় নাই, আমার চক্ষু কানুরূপে পূর্ণ হইয়া আছে। (চক্ষু মুদিলেই কানুকে দেখিতে পাই।) কঠিন প্রাণ কানুকে ছাড়িয়া যাইতেও পারিতেছে না, (আবার তাহাকে না পাইলে) থাকিতেও পারিতেছে না।" দিব্যসিংহ (মথুরায়) গোবিন্দের (অথবা স্বীয় পিতার) পদপ্রান্তে ছুটিতেছে।

দিব্যসিংহের পুত্রের নাম ঘনশ্যাম। ঘনশ্যাম সুকবি ছিলেন, তিনি পিতামহের যশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পদকর্ত্তা গৌরসুন্দর ঘনশ্যামকে 'গোবিন্দদাস-স্বরূপ' এবং কমলাকান্ত তাঁহাকে 'গোবিন্দ কবি সম ভাস' বলিয়াছেন। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলেন, ইহাতে অতিশয়োক্তি আছে (পদকল্পতরু, ভূমিকা—৮৭ পৃষ্ঠা)। অতিশয়োক্তি হইলেও ঐ উক্তি ঘনশ্যামের কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক। ঘনশ্যাম দাসের পদ ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি ওরফে ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদে মিশিয়া গিয়াছে। তবে চক্রবর্ত্তী ঘনশ্যামের পদে দাস উপাধি আছে কি না অনুসন্ধান করিতে হয়। নরহরি চক্রবর্ত্তীর গীতচন্দ্রোদয় নামে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ আছে। গ্রন্থখানি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থে ঘনশ্যাম ও নরহরি—দুই ভণিতার পদই পাওয়া যায়। গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যামের 'গোবিন্দরতিমঞ্জরী' নামে একখানি গ্রন্থের কথা শুনিয়া আসিতেছি। এই গ্রন্থে ঘনশ্যামের স্বরচিত বহু পদ আছে। গীতচন্দ্রোদয়ের সঙ্গে গোবিন্দরতিমঞ্জরী মিলাইলে দুইজনের পদ পৃথক করা সহজ হয়। আমরা গোবিন্দরতিমঞ্জরীর খণ্ডিত পুঁথি দেখিয়াছি। এই গ্রন্থ হইতে ঘনশ্যামের একটী পদ তুলিয়া দিলাম। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের পৌত্র মদন রায়ের সঙ্গে ঘনশ্যামের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ঘনশ্যামের পদে মদন রায়ের নাম পাওয়া যায়। গোবিন্দরতিমঞ্জরীর একটী পদ—

'শুন শুন আজুক রজনীক রঙ্গ।
তুয়া সখী অঙ্গভঙ্গী সঞে আয়ল সঙ্গহি পহিল অনঙ্গ॥
মধুর আলাপন শুনইতে সো পুন নটন ঘটন করু মোই।
শুনি নূপুরধ্বনি ঘনশর বরিখণ বিছুরল উনমত হোই॥
শরসনে কুসুম শরাসন ডারল কিঙ্কিণী রব অব ভেল।
নিজ বৈভব তব হরখি বরখি সব মদন মুগধ ভয়ি গেল॥
হাম পুন কোণ কি করি কাঁহা আছিএ অনুভব ওর
না পাই।
কহ ঘনশ্যামদাস জগমানস মোহন মোহিনী রাই॥'

গোবিন্দরতিমঞ্জরীর একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি আবিষ্কার এবং তাহার একটী ভাল সংস্করণ প্রকাশের জন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং বাঙ্গালার দুইটী বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ জানাইয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

গান
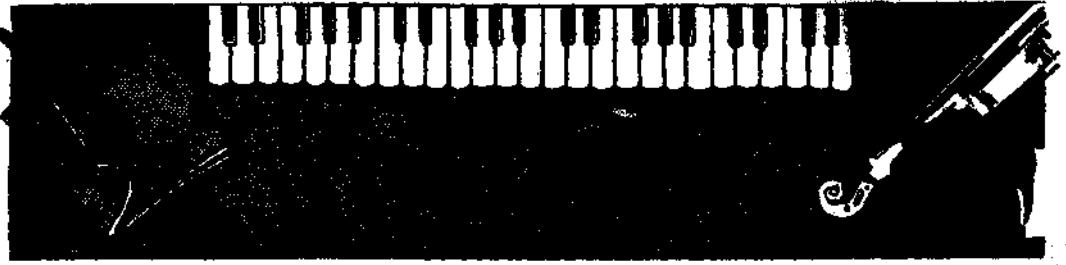
শীতের শেষে, ভীরুর মত, কে এলি তুই,
বল্?
শিশির ফোঁটায় ঐ যে লোটায় তোরি চোখের
জল!
তুই এলি মোর কুঞ্জবনে
ফাল্গুনে আজ সঙ্গোপনে,
অম্‌নি ফুটে উঠ্‌লো আমার
ফুল-কলিদের দল!

ঘুমিয়ে ছিল আমার নিখিল আঁধার কুয়াশায়—
স্বপন মাঝে তোমায় পাবার বিপুল দুরাশায়,
আজ ভোরে তার ঘুম ভাঙালে,
দখিন হাওয়া গন্ধ ঢালে,
তোমায় হেরি' কানন ঘেরি'
ফুলেরা চঞ্চল!

কথা — শ্রীরামেন্দু দত্ত

সুর ও স্বরলিপি — শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

II র্সা ণা ধা | পা মা -গা | সা রা -গা | গা মা -া | মা -পা মা | পা -া -া I
শী তে র | শে ষে ০ | ভী রু র | ম ত ০ | কে ০ এ | লি ০ ০

I পা -র্সা না | না র্সা -া | পা -র্সা -ণা | ধা -পা -া | র্সা ণা ধা | পা মা -গা I
কে ০ এ | লি তু ই | ব ০ ০ | ০ ল্ ০ | শী তে র | শে ষে ০

I সা রা -গা | গা মা -া | ধা ণা -া | ধা ণা -া | ধা -র্সা ণা | ধা পা -া I
ভী রু র্ | ম ত ০ | শি শি র্ | ফোঁ টা য়্ | ও ই যে | লো টা য়্

I পধা পা -া | মা গরা -গা | মা -া -া | -া -া -া | পা -র্সা না | না র্সা -া I

ভো রি ০ | চো খে র্ | জ ০ ০ | ০ ০ ল্ | কে ০ এ | লি তু ই

I পা -র্সা ণা | -ধা -পা -া II

ব ০ ০ | ০ ল্ ০

II মা -ধা ধা | ধা ধা -না | না -া র্সা | র্রা -া -র্সনা | র্সা -া -া | -া -া -া I

তু ই এ | লি মো র্ | কু ন্ জ | ব ০ ০ | নে ০ ০ | ০ ০ ০

I না -া র্রা | না র্সা -া | না -র্রা র্সা | ণা ধা -া | ণা -া র্রা | না র্সা -া I

কা ল্ শু | নে আ জ | স ঙ্ গো | প নে ০ | অ ম্ নি | ফু টে ০

I ণা -া ধা | পা -া -ধণধা | পা -া -া | -া -া -া | গা গা -গা | গা রগা -া I

উ ঠ্ লো | আ ০ ০০০ | মা ০ ০ | ০ ০ র্ | ফু ল ক | লি দে র্

I মা -া -া | -া -া -া | পা -র্সা না | না র্সা -া | পা -র্সা -ণা | -ধা -পা -া II

দ ০ ল্ | ০ ০ ০ | কে ০ এ | লি তু ই | ব ০ ০ | ০ ল্ ০

II সা সা সা | রা রা -া | রা রা -মা | গা মা -গা | রা রা -গা | রা -মা গা I

ঘু মি য়ে | ছি ল ০ | আ মা র্ | নি খি ল্ | আঁ ধা র্ | কু ০ য়া

I রা -া -া | -া -া -া | মা মা -পা | পা পা -মা | পণা ণা -া | ধা র্সণা -ধা I

শায়্ ০ ০ | ০ ০ ০ | স্ব প ন্ | মা ঝে ০ | তো মা য় | পা বা র্

I পা র্সা ণা | ধা -পা ণধা | পা -া -া | -া -া -া | না -া না | না না -র্সা I

বি পু ল | দু ০ রা | শা ০ ০ | ০ ০ য়্ | আ জ ভো | রে তা র্

I র্সা -া র্সা | না র্সা -া | র্সা র্সা -র্জ্ঞা | র্জ্ঞা -া র্রা | র্সনা -া -া | -া -া -া I

ঘু ০ ম্ ভা | ঙা লে ০ | দ খি ন্ | হা ০ ও | য়া ০ ০ | ০ ০ ০

I না -র্রা র্সা | ণধা ণা -া | র্সা ণা -া | ধা পা -া | পা ধা পা | মা গা -া I

গ ন্ ধ | ঢা লে ০ | তো মা য়্ | হে রি ০ | কা ন ন | ঘে রি ০

I সা সা রা | গা -া -রগা | মা -া -া | -া -া -া | পা -র্সা -না | না র্সা -া I

ফু লে রা | চ ০ ন্ | চল্ ০ ০ | ০ ০ ০ | কে ০ এ | লি তু ই

I পা -র্সা -ণা | -ধা -পা -া II II

ব ০ ০ | ০ ল্ ০

শ্রীদুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় মাস

পুরীর পথে —পয়লা জানুয়ারী। বেলা দশটায় বেরিয়ে পড়া গেল ; যেতে হবে ৩৪ মাইল পথ, সুতরাং গতিবেগ বাড়াতেই হ'ল। গ্রাম, বাজার, বিশুষ্ক জলা, নদী প্রভৃতি সামনে পড়্‌তে না পড়্‌তেই পশ্চাতে অদৃশ্য হ'তে লাগ্‌ল। প্রথম ২০ মাইল অতিক্রম করার পর বেশ একটু হাঁফ ধর্‌ল ; অবশেষে সাক্ষী-গোপালের পথে যখন পড়্‌লুম, তখন পিপাসার মাত্রা লজেঞ্চুসের তৃষ্ণাহরণ-শক্তিকে ছাড়িয়েই উঠেছে। পথের ধারেই ছিল এক মাদ্রাজী চিকিৎসকের বাড়ী ; সেখান থেকে অবসন্ন শরীরকে চা-পানে কতকটা সতেজ করার পর, পরস্পরের নাম বিনিময় করা গেল। ডাক্তার মহাশয় অতি ভদ্র প্রকৃতির ; পরে কাজে লাগ্‌তে পারে ভেবে, তাঁর জানা অনেক বাড়ীর ঠিকানা দিলেন। বল্‌লেন যে, গ্রামটীর নাম "সত্যবাদী" এবং পুরী সেখান থেকে ১২ মাইল দূর। সাক্ষী-গোপালের পথ, পুলিশ-ষ্টেশন ও Inspection Bunglow তাঁর বাড়ীর পাশাপাশি অবস্থিত।

বেলা সাড়ে চারটেয়, সাক্ষী-গোপালের পথ পশ্চাতে রেখে পুরী-অভিমুখে অগ্রসর হ'লুম। ভক্তজনের সশরীরে উপস্থিতির চেয়ে পুরীর দারুব্রহ্ম নাকি ঐ সাক্ষী-গোপালের সাক্ষ্যই অধিকতর প্রামাণ্য মনে করেন, তাই লোকে এঁকে সাক্ষী রেখে পুরী যায়।

এইবার পথ-চলার কষ্টটা বিশেষ ভাবে অনুভূত হ'তে লাগ্‌ল ; পায়ের বেদনা, গায়ের ব্যথা ও পেটের জ্বালা—এই তিনে মিলে বিলক্ষণ বেগ দিতে আরম্ভ কর্‌ল ; অন্যদিকে আবার মনেও জেদ চাপ্‌ল—"আজই পুরী পৌছানো চাই।" সন্ধ্যায় নদীর পুল পার হ'য়ে একটা ছোটখাটো বাজার পাওয়া সত্ত্বেও, সেখানে কালবিলম্ব না ক'রে এগুতে লাগ্‌লুম। সামনের আসন্ন অন্ধকার লক্ষ্য ক'রেই মাথা-ঘোরা ও শরীরের অবসন্নতা চেপে রাখ্‌তে হ'ল। জনমানবহীন অন্ধকার পথের অনুচর "ভয়" নামক উপদেবতাটী প্রাণে আশ্রয় গ্রহণ করায়, ছুটতে লাগ্‌লুম 'পুরী'র আলো দেখ্‌বার আশায়।

অবস্থা যখন এমনি দাঁড়িয়েছে যে, একটা হোঁচট লাগ্‌লেই মুখ থুবড়ে পড়্‌ব, বা আচমকা কোনো নৈশ শব্দ শুন্‌লে মূর্চ্ছা'ই যাব, ঠিক সেই সময়ই দূর-শ্রুত নগরের কোলাহল ও ক্ষীণ আলোকমালা যুগপৎ কর্ণে ও চক্ষে প্রতিভাত হ'ল। দু'একটী পর্ণকুটীর, দু'একজন পথচারী থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমেই গরীব কৃষিজীবী ও নিম্নশ্রেণীর পল্লী দেখা যেতে লাগ্‌ল ; পথও ক্রমশঃ প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হ'য়ে, জনবহুল রাজপথে আমাকে পৌছে দিলে। মন্দিরের কাছে আস্‌তেই একজন হেঁকে বল্‌লেন—"কে যায়?···দাঁড়িয়ে যাবেন একটু।

চল্‌তে চল্‌তেই জবাব দিলুম—"সময় কম, ক্লান্তও খুব; সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেই বাধিত হব।"

কোথায় যাচ্ছি তাই জেনে নিতে ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। জানকী বাবুর বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে, বাজারের দোকানে কিছু জলযোগ সেরে, রাত্রি প্রায় ৮-টায় সুভাষ বাবুদের বাড়ীর চাকরকে বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ দিয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর্‌লুম। চাকর ছাড়া গৃহস্বামীদের কেহই এখানে ছিলেন না ব'লে স্নানান্তে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন ও হোটেলেই সারাদিনের পর আহার সম্পন্ন কর্‌তে হ'ল।

২রা জানুয়ারী। উকিল হরেনবাবু এবং স্থানীয় জমীদার ও মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত শিরীষ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা কর্‌লুম। গত রাত্রের সেই ভদ্রলোকটী এবার পুলিসের পোষাক প'রে আমার বৃত্তান্ত জান্‌তে এলেন। পুরীতে তখন 'পিকেটিং' চলেছে; দেখা শুনা শেষ ক'রে ভদ্রলোক বল্‌লেন—"আমরা আর আপনাকে কি সাহায্য করব? আমি সি, আই, ডি, ডিপার্টমেন্টের; এই তল্লাটের ভার আমার উপর; রোজ দেখা হবে, সমুদ্রতীরে।" ছোরা দেখে বল্‌লেন — "এর 'লাইসেন্স' দরকার ছিল না; তবু নিয়ে ভালই করেছেন।" তারপর ঠিকানা লিখে সেই যে স'রে গেলেন তারপর আর কোনদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি।

পরদিন শনিবার সকালে কোনারক মন্দির দেখ্‌তে রওনা হ'লুম। পথের দূরত্ব, কোন্ পথ সোজা ও সুবিধাজনক, থাক্‌বার ব্যবস্থা কি, তা' পূর্ব্বেই জেনে নিয়েছিলুম। সহর পার হ'য়ে এমন এক বালুকাকীর্ণ রাস্তায় পড়্‌লুম যেখানে জুতা সমেত পা ব'সে যায়। ছোট ছোট ঝাউ গাছ দু'ধারে দণ্ডায়মান থেকে পথ নির্দ্দেশ না কর্‌লে, সেই দিগন্তব্যাপী বালুকা-সৈকতে পথ-নির্ণয় কঠিনই হ'ত।

ইতিমধ্যে কটকের এক সংবাদপত্রে আমার পদব্রজে ভারত-ভ্রমণের সংবাদ বেরিয়ে যাওয়ায়, পুরীর অনেকেই তা' দেখেছিলেন, — সুতরাং একদিনে ৪৮ মাইল যাতায়াত ক'রে তাঁদের আশ্চর্য্য ক'রে দেবার অভিপ্রায়ে খুব জোরেই হাঁট্‌তে আরম্ভ কর্‌লুম। কিন্তু বালির ওপর বেশী জোর চলে না; পাঁচ ছ' মাইল গিয়েই বেশ ক্লান্ত হ'য়ে ঘাম ছুটল। শীত এধারে ছিলই না, তার চারিদিকে বৃক্ষ-বিরল বালুকা-বিস্তার ধূ ধূ কর্‌ছে; কোথাও ফাঁকা মাঠ, কোথাও বা চাষীদের ঘর, বাগান, পুকুর বা ক্ষেত-আবাদ দূরে অবস্থিত দেখা যায় — পথ গেছে কিন্তু বালির ওপর দিয়েই। পথে লোক-চলাচল খুব কম; গ্রামের ফল, শস্য বা অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে গ্রামবাসীরা পুরীর বাজারে বিক্রয় করতে যায়; যাদের বাড়ী কাছে, তারা ফিরে আসে; আর যারা ১৮৷২০ মাইল দূর থেকে যায়, তারা পুরীতেই খাওয়া-দাওয়া ক'রে পরদিন বা মধ্যরাত্রে ফেরে। পথে একজন এই বালুকাময় পথ অপেক্ষা ভাল পথের সন্ধান দিল। এ পথ উঁচু-নীচু এবং এতে জল-কাদা থাক্‌লেও বালি ভাঙ্গার চেয়ে কতক ভালই মনে হ'ল — কেননা, এ পথে গ্রামও পেতে লাগ্‌লুম। প্রায় ১৪ মাইল এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম আর একজনকে; সে বল্‌লে—"এ পথ দিয়ে যাওয়ায় ঘুর হবে অনেক; মোটর এই পথে যায় বটে, কিন্তু হেঁটে যাওয়ায় সুবিধা হবে—এই মাঠ পার হ'য়ে, দূরে ঐ রেখার মত ঝাউ গাছগুলোর মধ্য দিয়ে।" জানা ছিল, মোটরের পথ ধর্‌লে যাতায়াত ৫৩ মাইল, ও হাঁটা-পথে গেলে ৪৮ মাইল পড়ে; আর যদি সমুদ্রের ধার দিয়ে যাওয়া যায়, তবে প্রায় ৪০৷৪২ মাইল হয়। সাগরতীরের পথে বিঘ্ন অনেক; নদী-নালা আছে, পারাপারের কষ্ট, জোয়ার এলে পার হওয়াও মুস্কিল; তা' ছাড়া নাকি হিংস্র জন্তুর ভয়ও আছে।

আবার সেই ঝাউ গাছের রেখা নজরে রেখে প্রায় ৫ মাইল মাঠ পার হ'লুম; প্রতি মুহূর্ত্তে দিক হারাবার ভয়ও ছিল; তার ওপর চারিদিক প্রায় শূন্য,

জন-প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই, কেবল হাওয়াতে এক-আধটা ঝাউ গাছের সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছিল। একদিকে "মাথার উপরে, খর রবি-করে বাড়িছে দিনের দাহ" অন্যদিকে—"চরণের তলে তপ্ত বালুকা নিভাইছে উৎসাহ"—এ হেন অবস্থায়, তৃষ্ণায়, রৌদ্রে, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, কি রকম যেন হ'য়ে যেতে লাগ্‌লুম; ভাব্‌লুম, হ'ল না, ফিরে যাই! কিন্তু ফিরে যাওয়াও শোচনীয়, যে পথ ধ'রে এসেছিলাম, সে পথ গেছে গুলিয়ে।

যদিও মাঠের শেষে গাছপালা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু সে যে কতদূর, তার যেন সীমা নেই! শেষ আবার সেই ঝাউতলার বালিপথ পাওয়া গেল। একটা গাছের তলায় ঝোপ দেখে, বিশ্রাম কর্‌লুম; চল্‌তে অসুবিধা হওয়ায়, সুরেশ বাবুর কথা স্মরণ ক'রে ঝাউ গাছের একটা সরল দেখে ডাল কেটে লাঠি তৈরী ক'রে, তা'তে ভর দিয়ে পথ চল্‌তে লাগ্‌লুম। ছোট একটা নদী সামনে পড়ায়, হেঁটে পার হ'লুম। ঝাউ-সারি শেষ হ'তেই গ্রাম পেলুম; সেখানে জল খেয়ে ও পথের নির্দ্দেশ জেনে আবার চল্‌তে লাগ্‌লুম। কয়েকটা রবিশস্যের ক্ষেত ও গ্রাম অতিক্রম করার পর আবার আরম্ভ হ'ল—সেই ধূ ধূ করা বালি-বিস্তার, আগুনের হল্কা ও সীমাহীন সমুদ্রের রৌদ্র-ঝলমল বালুকা-সৈকত, ঠিক ছায়া-চিত্রের স্বপ্ন দেখার মত আবছায়া ভাব।

খানিক চ'লে আসার পর পথ জিজ্ঞাসা করায়, একজন দেখিয়ে দিলে— দূরে একটা চূড়া ও কতকগুলো বড় গাছ; বললে—"সামনের গাছটা পার হ'য়ে ঐ স্থান লক্ষ্য ক'রে চল্‌লেই 'কোনারক' পাওয়া যাবে।" তথাস্তু—চলা যাক্। কখনও নরম, কখনও বা শক্ত, ঘাস-যুক্ত, কখনও আবার ঘাসের মত শুক্‌নো ছোট্ ছোট শরের বন ও বালির ওপর দিয়ে, পালে পালে বিচরণ-শীল হরিণ-শিশুদের সচকিত দৃষ্টি ও সন্ত্রস্ত পলায়ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্রমে মন্দির-সান্নিধ্য লাভ করা গেল।

অত্যুচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা মন্দির-প্রাঙ্গণ; তারি মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বট ও অশ্বত্থের ব্যূহ বেষ্টিত কোনারক মন্দির। মাঠ থেকে, প্রাচীরের একটা ভাঙা ফাটল টপ্‌কে মন্দিরের পূর্ব্ব-তোরণে দুই

কোনারকের সূর্য্যমন্দির

বিপুলকায় পাথরের হাতীর সামনে এসে পড়্‌লুম; খই, মুড়কী, কলা প্রভৃতি নিয়ে কয়েকখানা দোকান এবং দু'একটা মনোহারী দোকানও দেখা গেল; দশ-পনেরো জনের বেশী যাত্রী ছিল না।—তাও গ্রাম্য লোকই বেশী।

হিন্দু-স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষের দিক থেকে যাঁরা এই মন্দিরটী দেখেছেন, তাঁদের অনেকেরই মত এই যে, সমগ্র জগতে এ রকম কারু-শিল্প-খচিত মন্দিরের জুড়ি নেই। ফার্গুসন সাহেবের "Ancient Architecture in Hindusthan"এর ২৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"The temple itself is of the same form as all the Orissa temples, and nearly of the same dimensions as the great ones of Bhubaneshwar and Puri—but, it surpasses both these in lavish richness of details, so much so indeed, that perhaps I do not exaggerate when I say that it is for its size the most richly ornamental building—externally at least—in the whole world."

ঐতিহ্যের দিক থেকে এর পরিচয়, পুরীর মন্দিরে রক্ষিত প্রামাণ্য ইতিহাস-গ্রন্থ "মাদ্‌লা-পঞ্জী"তে পাওয়া যায়; আর তা'তে প্রকাশ যে, খৃঃ পূঃ ১২০০ শকাব্দে দ্বিতীয় নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল; "শাম্ব-পুরাণ" মতে, শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শাম্ব, চন্দ্রভাগা নদীর তীরে সূর্য্যের আরাধনার ফলে রোগমুক্ত হওয়ায় এই মন্দির সূর্য্য-দেবের উদ্দেশ্যে নির্ম্মাণ করেন।

"আইন-ই-আকবরি" প্রণেতা আবুল ফজল ঐ মন্দির-নির্ম্মাণ খরচেরও একটা হিসেব দিয়েছেন; তাঁর মতে—"In erecting this temple of the Sun was expended the whole revenue of Orissa for 12 years"—, আর উড়িষ্যার বার্ষিক আয়ের হিসেবও তিনি দিয়েছেন—২২,৮৫,৮১৮ মুদ্রা।

পুরীর মন্দির

এ সমস্ত বৃত্তান্তের চয়ন আমার অধিকারের বাইরে; কারণ আমি এ-মন্দির দেখ্‌তে এসেছি, শুধু পথিকেরই চোখ নিয়ে। তবু যে অনধিকার-চর্চ্চা কর্‌লুম, তা' কেবল এই ভেবে যে, পাঠকের অধিকার, পথিকের অধিকারের চেয়ে প্রশস্ততর।

নব-নির্ম্মিত মিউজিয়ম-ঘরে এই মন্দিরের বজ্র-দীর্ণ একাংশের স্খলিত প্রস্তর-মূর্ত্তি-পরম্পরাকে নম্বর দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে; এক দিকে, সে-সব মূর্ত্তির বৈচিত্র্য ও ভাস্কর্য্য যেমন সুনিপুণ,—অন্যদিকে আবার নর-নারীর এমন সমস্ত অবস্থার পরিকল্পনা তাতে মূর্ত্ত হয়েছে, যা' দুই ভায়ে একসঙ্গে দেখ্‌তে গেলেও লজ্জায় অধোবদন হ'তে হয়।

মন্দিরটী দেখ্‌তে যেন বিশালকায় একখানা রথ—কোন্ অতীতের মহারথীরা পথে যেতে যেতে ফেলে পালিয়ে গিয়েছেন। পাষাণ-স্তম্ভের গঠন-বৈচিত্র্যে ও আপাদ-শীর্ষের কারু-শিল্প-শোভায় নয়নাভিরাম এই মন্দিরের শিখরে ওঠ্‌বার জন্যে যে কৃষ্ণ-সোপান-শ্রেণী বিদ্যমান, তাও দেখ্‌তে চমৎকার। ঘরের নালাগুলি পর্য্যন্ত মকর প্রভৃতি জীব-জন্তুর আকারে প্রস্তর-ক্ষোদিত, তার পালিশ এত উৎকৃষ্ট যে, সদ্য-নির্ম্মিত ব'লেই মনে হয়। পুরীর মন্দির-সম্মুখে যে 'অরুণ স্তম্ভ' দেখা যায়, সেটী অষ্টাদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রদের অধিকারে আসার সময়, এই কোণারক থেকেই নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল, এবং অধ্যাপক Brown সাহেবের মতে সেটী "One of the most beautiful columns in the world"। কোণারক-মন্দিরের নবগ্রহ-মূর্ত্তি-ক্ষোদিত একখানা
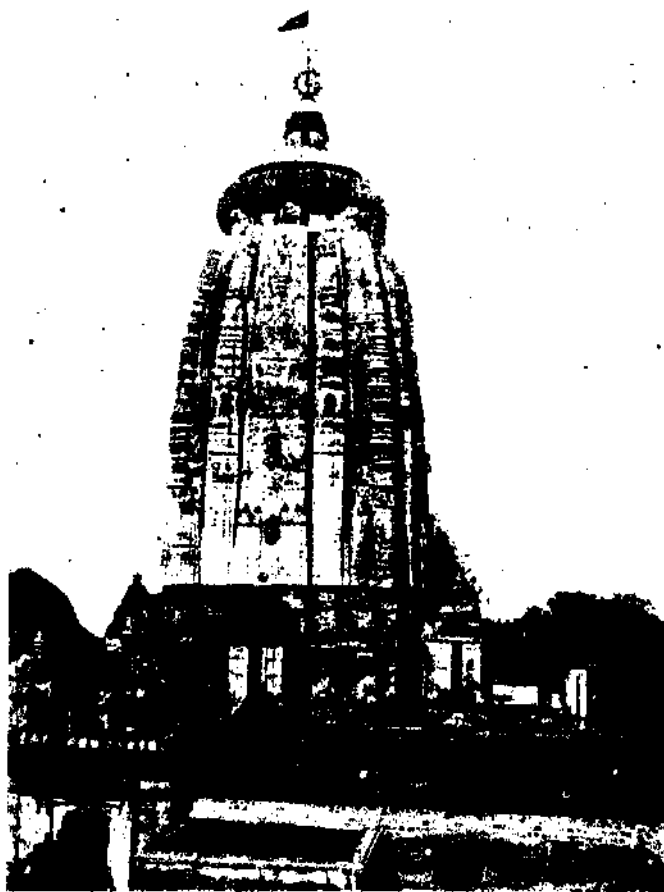
চৌকাট তিন হাজার টাকা খরচ ক'রে Bengal Governmentও নাকি একসময় ওপর থেকে নামিয়েছিলেন — ইচ্ছা, এটা কলকাতায় নিয়ে যাবেন, কিন্তু ১৯ ফুট × ৩ ফুট সেই প্রস্তরের গুরুভার সরকারকে সঙ্কল্প-ত্যাগে বাধ্য করে; কাজেই মন্দিরের বাইরে মাঠের মধ্যে আজও সেটা প'ড়ে আছে।

সমুদ্র এই মন্দির থেকে এক মাইল তফাতে, এবং মন্দির-শীর্ষ থেকে তার দৃশ্য খুব সুন্দর। প্রাচীরের বাইরে, সমুদ্রের দিকে "বাবাজীর মঠ"; চাল, ডাল, আলু প্রভৃতির দোকানও আছে; যাত্রীরাও বাইরের এক চালা-ঘরে থাকতে পায়। মন্দির থেকে চার

সমুদ্রতীর — পুরী

মাইল দূরে, সমুদ্রের কাছাকাছি চন্দ্রভাগার এক 'কুণ্ড' আছে, তাতে স্নান করা তীর্থ-পুণ্যের দিক থেকে প্রশস্ত।

সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব ঐগুলির দেখা-শুনা সেরে রওনা হলুম।

খানিক পথ আসার পর সঙ্গী জুটল, — এক প্রৌঢ় শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে সঙ্গে ক'রে পুরী চ'লেছিলেন। গল্প করতে করতে ও মৃগবহুল পথে মৃগনাভির সন্ধান করতে করতে অগ্রসর হ'তে লাগলুম। পথ এঁদের পরিচিত, সুতরাং বালির প্রাচুর্য্য পথ-ঘাট-মাঠকে একাকার করা সত্ত্বেও হারাবার ভয় আর রইল না।

নদী পার হ'য়ে তাঁরা সমুদ্রের ধারকেও পথ ক'রে তুললেন; সন্ধ্যা হ'য়ে এল; আলো জেলে জেলে পথ দেখাতে লাগলুম।··· ক্রমে অন্ধকার ··· কিছুই দেখা যায় না ··· এক ধারে সমুদ্রের অবিশ্রাম তরঙ্গোচ্ছ্বাস-শব্দ ও অন্য ধারে সমীরণ-চঞ্চল শস্যক্ষেত্রাদির নিঃশ্বাস ······ মাঝখান দিয়ে চলেছি সঙ্গী-নির্ভরশীল হ'য়ে নিরুদ্বেগে। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটীকে একবার বলতে শুনলুম—"পথ ভুল হয়েছে বোধ হয়"; ছেলেটী বললে — "না, ঠিক যাচ্ছি"। অনতিপরেই পুরীর আলো স্পষ্ট হ'য়ে উঠল —এবং রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটায় পুরীতে পৌছান গেল।

(ক্রমশঃ)

প্রতিবেশিনী দয়

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মানুষের মন বড় দুর্ব্বল। গঙ্গায় গিয়া নিজে স্নান করিয়া পিণ্টুলীকে স্নান করাইয়া বাড়ী ফিরিবার পথে দু'পাশে ছেলেদের খেলনার দোকানগুলা দেখিয়াই মাসির মনে পড়িল, দেবুকে যতদিন সে সঙ্গে আনিয়াছে এইসব দোকান হইতে কিছু না কিছু তাহাকে কিনিয়া দিতে হইয়াছে। আজও পিণ্টুলী সেই দোকানগুলার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়াই পথ চলিতেছিল। মাসি বলিল, 'নে না, খেল্‌না-টেল্‌না পুতুল-টুতুল এক আধটা নিবি ত' নে। নইলে মা আবার তোর হয়ত' বলবে, মেয়েকে আমার কিছু কিনে দেয়নি। যে বদ্‌-নামের কপাল আমার···ও বাছা, ও দোকানী, শুনছ, দাও ত' বাবা, এই মেয়েটিকে আমার ভাল দেখে একটি পুতুল দাও ত'!'

দোকানী একটি রং-করা মাটির পুতুল পিণ্টুলীর হাতে দিতেই মাসি বলিল, 'নে মা, একটা কেন দুটোই নে। আমি ত' আর ওকে নিজের হাতে দেবো না, তুই-ই দিয়ে দিস্‌। নইলে আবার তোর হাতে পুতুল দেখলে কেঁদে সারা হবে।'

পিণ্টুলী বলিল, 'কার জন্যে মা? দেবুর জন্যে?'

কথাটা পিণ্টুলীর কাছে বলিতেও মাসির কেমন যেন লজ্জা করিতেছিল। বলিল, 'আচ্ছা বোকা মেয়ে মা তুই! তা' ছাড়া আবার কার জন্যে নেব বাছা? তোর হাতে পুতুল দেখলে কাঁদবে, হয়ত'। তখন আবার কান্নাও আমার সহ্য হবে না। এমন পোড়া মন নিয়েও জন্মেছিলাম ছাই! কারও কান্না আমি দেখতে পারি না।'

এই বলিয়া দোকানীর পয়সা চুকাইয়া দিয়া মাসি বলিল, 'বাড়ী গিয়ে তুই-ই ওকে দিয়ে দিস্‌ মা, আমায় যেন কিছু না বলতে হয়। এই-ই শেষ দেওয়া। আজকেই আমি ওর বাপকে উঠে যেতে বলব। নাঃ, কাজ নেই আমার ওরকম ভাড়াটে। চোখের সুমুখ থেকে ওদের দূর ক'রে দেওয়াই ভালো।'

এতক্ষণে পিণ্টুলী কথা বলিল। বলিল, 'হ্যাঁ, নইলে ও আবার মারবে।'

মাসি বলিল, 'কী, মারলেই হলো কি না! পরের ছেলের মা'র আমি কেন সহ্য করব না! ও আমার কে? পরের ছেলে বই ত' নয়! নিজের ছেলে হলে আজ আমি ওকে মেরে খুন ক'রে ফেলতাম।'

পিণ্টুলী অবাক্‌ হইয়া মাসির মুখের পানে একবার তাকাইল। এখনও তাহার ধারণা যে, দেবু তাহার নিজের ছেলে। বলিল, 'তবে যে দেবু তোমাকে মা বলে?'

মাসি বলিল, 'মা বলে ওকে আমি মানুষ করেছি ব'লে। তা' ছাড়া ওর মা আমাকে মা বল্‌তো কি না! এই ধর্‌, তোর মা যদি আমাকে মা বলে, আর তাই দেখাদেখি তুইও যদি আমাকে মা বলিস্‌। তেম্‌নি।'

পিণ্টুলী বলিল, 'ও। আমি ভাবতাম বুঝি তুমিই ওর মা।'

মাসি বলিল, 'হ্যাঁ বাছা, ছেলেটা মায়ের মতনই করতো বটে, কিন্তু কেমন মা-বাপের ছেলে দেখতে

হবে ত'! মা'টা তত খারাপ নয়, ওর বাপটাই শয়তান! ওই বাপই ওকে শিখিয়েছে এই সব। নইলে দেবু আমার খুব ভাল ছেলে।'

রৌদ্রের তেজ বড় বেশী প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তার ধারে ঠুং ঠুং করিয়া ঘুঙুর বাজাইয়া কয়েকটা রিক্শা পার হইতেছিল। মাসি তাহাদের একজনকে কাছে ডাকিয়া পিন্টুলীকে বলিল, 'ওঠ্ মা, একে ছেলেমানুষ, তায় আবার পায়ের তলার মাটি একেবারে তেতে আগুন হয়ে উঠেছে।'

গাড়ীর উপর পিন্টুলী ও মাসি দু'জনেই পাশাপাশি উঠিয়া বসিল। তাহার পর গাড়ী ছাড়িয়া দিলে মাসি বলিল, 'দেবুকে নিয়ে এমনি রোজই আমাকে এই রিক্শা গাড়ী ক'রেই বাড়ী যেতে হতো। এখনও ছেলেটা আসতে চায় বাছা, শুধু ওই বাপ-টার ভয়েই আসে না। না আসুক্ গে!'

বলিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মাসি আবার বলিতে লাগিল,—'জানি বাছা, সবই জানি। পরের ছেলে, এমনি যে একদিন করবে তা' আমি আগে থেকেই জানি। কিন্তু জেনে শুনেও মন মানে না বলেই ছুটে যাই।'

সারা পথটা ধরিয়া মাসি সেদিন এমনি করিয়া এমন সব কথা বলিতে বলিতে আসিল যে, পিন্টুলী শুধু শুনিয়াই গেল। নিতান্ত ছোট এই মেয়েটার কাছে কথাগুলা বলার কোনও মানে হয় না, তবু সে যে কেন বলিল, কে জানে।

বড় রাস্তায় গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া গলিটুকু পার হইয়া বাড়ীর দরজায় আসিতেই দেখা গেল, দেবু তাহাদের দরজার কাছটিতে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। মাসির প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় কিনা তাই বা কে বলিতে পারে!

মাসির কিন্তু চোখে তখন জল আসিয়া গিয়াছে। ছেলেমানুষের মত অভিমান করিয়া দেবুর দিকে একবার ফিরিয়াও না তাকাইয়া মাসি সেদিকে একরকম পিছন ফিরিয়াই তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। দেবু কিন্তু সেখান হইতে নড়িল না। পিন্টুলী তাহার দু'হাতে মাটির পুতুল দুইটি লইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল, দেবু বলিল, 'এই পিন্টুলী, শোন্! ও দুটো কোথায় পেলি রে?'

একটি পুতুল তাহার দিকে আগাইয়া দিয়া পিন্টুলী বলিল, 'একটা তোমার, আর একটা আমার।'

দেবু বলিল, 'মা কিনলে বুঝি?'

ঘাড় নাড়িয়া পিন্টুলী বলিল, 'হ্যাঁ।'

'কই দেখি, কোন্‌টা ভালো।' বলিয়া দুইটা পুতুল দুই হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেবু দেখিল দুইটাই সমান। তখন সে একটা নিজের জন্য রাখিয়া আর একটা পিন্টুলীকে ফিরাইয়া দিল। বলিল, 'হেঁটে হেঁটে গেলি আর এলি ত'?'

পিন্টুলী বলিল, 'না না হেঁটে কেন, আসবার সময় আমরা রিক্শা ক'রে এলাম যে!'

'যাবার সময় হেঁটে গিয়েছিলি ত'?'

'হ্যাঁ।'

দেবু বলিল, 'আমি যদি যেতাম ত' দেখতিস্—যেতামও রিক্শায়, আসতামও রিক্শায়।'

পিন্টুলী বলিল, 'কিন্তু তোমার মা বলছিল, তোমাদের এ-বাড়ী থেকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে।'

দেবু বলিল, 'হ্যাঁ, দিলেই হলো। তোদেরই তাড়িয়ে দেবে দেখিস্।'

দেবুর মুখ চোখ দেখিয়া মনে হইল—সে রাগ করিয়াছে। আর বেশি কথা-কাটাকাটি করিলে হয়ত' তাহার সঙ্গে ঝগড়া হইয়া যাইবে, এই ভয়ে পিন্টুলী সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, দেবু জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যাচ্ছিস্?'

পিন্টুলী বলিল, 'ওপরে। মার্ কাছে।'

'ও তোর মা হয় বুঝি?'

'হ্যাঁ, হয়ই ত'।'

দেবু বলিল, 'খবরদার বলছি, আমার মাকে মা বলবি ত' মেরে তোকে আমি খুন ক'রে ফেলব।'

এই বলিয়া দেবু উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আমি যাচ্ছি মার কাছে। তুই তোর মার কাছে যা।'

দেবুর ভয়ে পিন্টুলী সত্যই উপরে যাইতে পারিল না। বীণার কাছে গিয়া সে তাহার পুতুল দেখাইতেছিল, আর সিঁড়ি ধরিয়া দেবু উপরে উঠিয়া যাইতেছিল। বীরেন তখনও আপিসে যায় নাই। আহারাদির পর কলতলায় আঁচাইবার জন্ম সে তখন ঘর হইতে বাহির হইতেছে। সুমুখেই দেবুকে উপরে উঠিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'কোথায় যাচ্ছিস্ রে?'

হাতে হাতে ধরা পড়িলে চোরের অবস্থা যেমন শোচনীয় হইয়া উঠে, দেবুর অবস্থাও ঠিক তেমনি হইয়া উঠিল। হেঁটমুখে তাহাকে সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বীরেন বলিল, 'নেমে আয়।'

দেবু ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। দেখিল সিঁড়ির নীচে পিন্টুলীও তাহার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিয়া তাহার আপাদমস্তক জলিয়া গেল। কিন্তু কি আর করিবে। বাবার আদেশ। কোনো রকমে ধীরে ধীরে সে তাহাদের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

বীরেন বলিল, 'নাঃ, কালই আমায় এ-বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে দেখছি। নইলে এই ছেলেটাই কোন্‌দিন অনর্থ বাধিয়ে বসবে।'

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হলো গো?'

বীরেন রাগিয়াই ছিল। বলিল, 'হলো আমার মাথা! তোমার দেবুটিও ত' কম নয়। দেখছি, কেমন চুপিচুপি পা টিপে টিপে আবার ওপরে উঠে যাচ্ছে। ভাগ্যিস্ দেখতে পেলাম, নইলে গিয়ে এতক্ষণ হাজির হ'তো।'

নারায়ণী বলিল, 'যাক্ না।'

'হুঁ।' বলিয়া বীরেন কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া থাকিয়া কাপড় জামা পরিয়া আপিসে যাইবার আগে বলিয়া গেল, 'কালই আমরা এ-বাড়ী ছেড়ে দেবো। বুঝলে?'

কথাটা শুনিয়া নারায়ণী বিশেষ সন্তুষ্ট হইল বলিয়া মনে হইল না। বলিল, 'তা' তোমার যা' খুসী তাই কোরো, আমায় আর কেন বলছ।'

বীরেন বলিল, 'তোমায় বলছি যে তুমি যাবার জন্তে প্রস্তুত হয়ে থেকো। আর আপিস থেকে এসে যদি শুনি যে ওই ছেলে আবার গিয়ে ওর সঙ্গে ভাব করেছে তাহ'লে তোমার অপমানের কিছু বাকি থাকবে না।'

নারায়ণী বলিল, 'ত্মাখো ত', তোমার ছেলেকে যদি আগ্‌লে রাখতে আমি না পারি।'

ঝগড়া করিতে বসিলে আপিসের দেরি হইয়া যাইবে, তাই বীরেন আর অপেক্ষা করিল না। দরজার কাছে গিয়া বলিল, 'তাহ'লে ছেলেকেও আমি মেরে খুন ক'রে ফেলব।'

বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দেবুর দিকে তাকাইয়া নারায়ণী বলিল, 'শুন্‌লি ত'?'

দেবু যখন দেখিল, তাহার বাবা সদর দরজা পার হইয়া গিয়াছে, তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। নারায়ণী আবার বলিল, 'সকালে কেন তুই মারামারি করতে গেলি বাপু? মা তোকে এত ভালবাসে, আর তুই কিনা তারই মাথায় কাপ্ ভেঙ্গে দিলি! নিমক্‌হারাম! ছি!'

দেবু বলিল, 'হ্যাঁ, আমি ওর মাথায় মেরেছিলাম কিনা? পিন্টুলীকে মারতে গেলাম, লেগে গেল ত' আমি কি করব?'

'পিন্টুলীকেই বা মারতে যাওয়া কেন তোর? কই এমন ত' তুই ছিলিনে? যত বড় হচ্ছিস্ তত এই সব শিখছিস্ বুঝি?'

দেবু বলিল, 'না, মারবে না! মার সঙ্গে ও কেন গঙ্গা নাইতে যাবে? আর আমাকে ভেংচী কাটবে কেন?'

দেবু যে পিন্টুলীকে মারিতে গিয়া মাকে মারিয়া বসিয়াছে নারায়ণী তাহা জানিত না। মাকে

সেকথা জানানো দরকার। তাই সে হাসিতে হাসিতে ঘরের বাহিরে আসিয়া সিঁড়ির কাছে গিয়া ডাকিল 'মা!'

ডাকিবামাত্র উপরের ঘর হইতে মাসি বলিয়া উঠিল, 'না মা, মা ব'লে তোমাদের আর অত ভালবাসায় আমার দরকার নেই। ভাবছিলাম— তোমাদের উঠে যেতে আমি নিজেই বলব, কিন্তু এক্ষুনি শুনলাম বীরেন নিজেই বললে, সে উঠে যাবে। তা' ভালোই হলো মা, আমায় আর বলতে হলো না।'

নারায়ণীর মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল। হেঁটমুখে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিজের কাপড়ের পাড়টা দু'হাত দিয়া টানিয়া টানিয়া সোজা করিতে লাগিল। যাহা সে বলিতে আসিয়াছিল, সেকথা আর বলা হইল না।

মাসি আবার বলিল, 'তোমাদের রেখে আমার কি লাভ মা? ভাড়া ত' এই এতদিনের মধ্যে পেয়েছি মাত্র দশটি টাকা। আর দেবেই বা কোত্থেকে? মদ খাবে, মাতলামি করবে, ফূর্ত্তি করবে, না বাড়ীর ভাড়া দেবে? তার আবার লম্বা লম্বা কথা! শুনলে গা জ্বালা করে। সাধ ত্থাখো দেখি! বলে কিনা, ছেলেকে ভালবেসে কই বাড়ীটা ওর লিখে দিক্ দেখি ছেলের নামে! ওমা আমার কে রে!'

অন্য সময় একা যখন ছিল, তখন যদি মাসি এ-সব কথা বলিত, নারায়ণী তাহাতে রাগ করিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু এখন এই নূতন ভাড়াটেদের সুমুখে তাহার স্বামীকে এমন ভাবে অপমান করায় নারায়ণীর চোখ দুইটা ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। প্রতিবাদ করিবার কিছুই নাই। লজ্জায় সে আর মুখ তুলিতে পারিল না। দেবু ছেলেমানুষ, অত সব সে বোঝে না, উপরে যাইবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়াই ছিল, নারায়ণী হাত বাড়াইয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া আবার তাহার ঘরে গিয়া ঢুকিল এবং ছেলেটাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া মেঝের উপরেই বসিয়া পড়িয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

দেবু অবাক্ হইয়া গিয়া নারায়ণীর কপালের চুলগুলি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

আলোর পাথেয়

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

সেদিন নেমেছে সন্ধ্যা—অন্ধকার গভীর নিবিড়।
অকস্মাৎ ভেসে গেল ধরণীর প্রান্ত দুই তীর
তারি মাঝে খর স্রোতে দুই খণ্ড শুষ্ক পত্র সম।
মুছে' গেল স্থল-জল, নর-নারী, স্থাবর-জঙ্গম,
মুছে' গেল হাস্য-দীপ্তি, মুছে' গেল অশ্রুর পাথার।
মৃত্যুর জঞ্জাল তলে জীবনের লক্ষ উপচার—
তাও ঢাকা প'ড়ে গেল। যে গতি নিজের রুদ্র বেগে
উদ্বেলিত—মিশে' গেল আঁধারের অন্তহীন মেঘে।

স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছি। অকস্মাৎ দেখি থরে থরে
মানুষ জ্বালায় দীপ পথে ঘাটে দেউলে প্রান্তরে।
লক্ষ উৎস মুখ হ'তে ক্ষয়-ক্ষীণ উদ্ধত স্পর্দ্ধায়
জ্বলে তারা—জ্বলে তারা আকাশের তারায় তারায়
আলোকের ভিক্ষা মাগি' জ্যোতির্বাষ্পে ঘন ঘূর্ণ্যমান
উল্কার পিণ্ডের মতো। দু'দণ্ডের স্পন্দমান প্রাণ—
তাই দিয়া স্পন্দিত করিয়া তোলে ঘনায়িত কালো
নিখিলের। জ্বলে আলো—দিকে দিকে জ্বলে' ওঠে আলো।

দেখিতেছি আরো ব'সে ভাবিতেছি,—আলোকের লাগি'
এ কি ক্ষুধা মানবের বুকে? চিত্তে তার আছে জাগি'
চির সুন্দরের লাগি' এ কি তৃষ্ণা অতৃপ্তি বিক্ষোভ
হৃদয়-বিদীর্ণ-করা? তার পরে এ কি তার লোভ
চির রাত্রি দিন? দু'দণ্ডের যে বিচ্ছেদ, তারো তরে
দুঃসহ আশঙ্কা জাগে, নয়নের কোলে ওঠে ভ'রে
আর্দ্র-অশ্রু-বাষ্প-ভারে। ত্রস্ত হস্তে দীপ্ত দীপ জ্বালি'
মুহূর্ত্তে সে গ'ড়ে তোলে আলোকের অপূর্ব্ব দীপালী।

ব'সে আছি। বাড়ে রাত। ধীরে ধীরে ঘন স্তব্ধতায়
নিখিল ঝিমায়ে পড়ে। তন্দ্রা নামে ধরণীর গায়
নিঃশব্দ চরণ পাতে। কালো তার অলকের আগে
মৃত্যুর নিঃশ্বাস যেন গাঢ় হ'য়ে—ঘন হ'য়ে জাগে
হিম কৃষ্ণ ভুজঙ্গের নিঃশ্বাসের মতো। তারো পর
আবার মিলায়ে যায় অন্ধকারে স্তব্ধ চরাচর।
অজস্র আলোর ভেলা ভেসে যায়, মুছে' যায় তার
দিগ্বিদিকে। জাগে ফের অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার।

অনন্ত আলোর ধাত্রী, অমৃতের পুত্র এরা সব।—
ব'সে ব'সে দেখিতেছি ইহাদেরি নিত্য পরাভব।
ম্লান হ'য়ে উঠিতেছে আত্মার অনিন্দ্য জ্যোতি রেখা
অহর্নিশি এই দ্বন্দ্বে, লভিতেছে শুধু অস্ত্র-লেখা
অন্তস্তলে। মুহুর্মুহু এলাইয়া পড়ে দেহ তার
শ্রান্তি আর যাতনায়। যুদ্ধের বিরাম তবু তার
নাই—নাই। যুদ্ধের প্রশস্তি দিয়া নিত্য অবিরাম
আলোকের দেবতারে নর-আত্মা করিছে প্রণাম।

হে দেবতা, জ্যোতির্ম্ময়, হে সুন্দর, নিত্য চিরন্তন,
অদৃশ্য আকাশে বসি' দেখিছ কি মানবের রণ
তোমারে লাভের লাগি? আত্মার আদিম শুভ্র শিখা
হারায়ে ফেলেছে তারা। আঁধারের গাঢ় যবনিকা
জড়ায়েছে চারিধারে। তবু তারা হারায়নি আশা,
হারায়নি অন্তরের অন্তহীন আলোর পিপাসা।
যুগ যুগান্তর ধরি' পথ চেয়ে উৎকণ্ঠিত বুকে
বসে' আছে, পাবে নাকি কোনো দিন তোমারে সুমুখে?

ক্লান্ত চোখে অশ্রু ঝরে, বক্ষে বাজে ব্যথার ঝঞ্জনা,
সহসা মূর্চ্ছার মাঝে সারা চিত্ত হারায় চেতনা
বেদনায়। তারপর অকস্মাৎ জাগে যবে মন,
দেখে সে, চাহিয়া আছে স্নেহাতুর সহস্র নয়ন
ধরার বুকের পরে। আলোকের অম্লান দেবতা
নক্ষত্রের আঁখি দিয়া পাঠায়েছে আশ্বাস বারতা।—
ওরে আলোকের পুত্র, ভয় নাই—নাই তোর ভয়,
আলোর পাথেয় তোর প্রতি পলে হ'তেছে সঞ্চয়।

ভারতে চিনির যুগ

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

ভারতের শিল্পপ্রগতির ইতিহাসে চিনি-শিল্পের গোড়া-পত্তনের কথা খুব পুরাতন নয়, কিন্তু আমাদের দেশে ইহার যে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে, ইহা অনেক দিন হইতেই অর্থনীতিজ্ঞেরা বলিয়া আসিতেছেন। আমাদের দেশে যে পরিমাণ আখের চাষ হয়, সেই পরিমাণ চর্চ্চা হইলে চিনি-শিল্প যে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রভূত আর্থিক উন্নতির সহায়ক হইত, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ইক্ষু উৎপাদন করিয়াছে। ইহা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আগেকার কথা। আরও অতীতের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই যে, ভারতবর্ষে যে পরিমাণ চিনি প্রস্তুত হইত, তাহা হইতে নিজেদের চাহিদা মিটাইয়াও বাহিরে রপ্তানি করিবার মত অবশিষ্ট থাকিত। কিন্তু সেই সময়কার চিনি-প্রস্তুত-প্রণালীর সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রপদ্ধতির কোন সামঞ্জস্য নাই। বাস্তবিক পক্ষে, আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারতবর্ষে চিনি প্রস্তুত করিবার কথা ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে কেহই আলোচনা করেন নাই। যুদ্ধের সময় চিনির মূল্য অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় দেশের ইক্ষু-উৎপাদনের ক্ষমতা এবং পরিমাণের দিকে আমাদের ব্যবসায়ী নেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এই সময় বোম্বাই প্রদেশের কতিপয় ধনীর আগ্রহে দুই-একটি চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন পরেই কারখানাগুলি বন্ধ হইয়া যায়। ইহার কারণ প্রধানতঃ ছিল বিদেশী প্রতিযোগিতা। বোম্বাইএর কারখানাগুলির মধ্যে টাটাদের কারখানাই ছিল বৃহত্তম এবং মিঃ বি, জে, পাদ্‌শা ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা।

ইহার কিছুকাল পরেই বিদেশী চিনির আমদানীর উপর শুল্ক ধার্য্য করা হইল। প্রথমতঃ এই শুল্কের উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব-আয়। রাজস্ব-আয় ছাড়া আখের চাষের প্রতি বা চিনির কারখানা স্থাপনের দিকে ভারত সরকার তখনও মনোনিবেশ করেন নাই। আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে চিনি-শিল্পের যে নানা-

প্রকার সুযোগ আছে সে বিষয় ভারত সরকার তখনও গভীরভাবে চিন্তা করেন নাই। প্রথমতঃ, যুদ্ধবিগ্রহের সময় চিনির আমদানী বন্ধ হইয়া গেলে নিত্য প্রয়োজনের জন্য দেশের লোকের চিনি কিংবা গুড়ের অভাবে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হয়; যে পরিমাণ চিনি কিংবা গুড় ভারতে ব্যবহৃত হয়, তাহা যদি দেশেই উৎপন্ন করা যায়, তবে এই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, শস্যের আবর্ত্তনের জন্য আখের চাষ খুব উপযোগী। আখের চাষে জমিতে অধিক পরিমাণে সার দেওয়া এবং জমি গভীর ভাবে চাষ করা দরকার হয়। এই জন্য যে জমিতে একবার আখের চাষ হয়, সেই জমিতে পরবর্ত্তী ফসল প্রচুর পরিমাণে হয়। তৃতীয়তঃ, ভারতের চাষীদের ধান, পাট, কিংবা গম ইত্যাদি শস্যের জন্য বিদেশী চাহিদার উপরে নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু তাহারা ইক্ষু উৎপাদন করিলে বিদেশী চাহিদার অপেক্ষা করিতে হয় না। সরকারের পক্ষ হইতেও ইক্ষুর চাষ অপেক্ষাকৃত লাভজনক, কারণ চাষীদের হাতে পয়সা আসিলে উপযুক্ত সময়ে তাহারা রাজস্ব দিতে পারে। শুধু এই কারণেও সরকারের ইক্ষুর চাষে উৎসাহ দান করা অনেক পূর্ব্বেই উচিত ছিল। ইক্ষু-ফসলের অন্যান্য সুবিধাও আছে। যথা, ইক্ষুদণ্ডের পরিত্যক্ত অংশগুলি গো, মহিষ ইত্যাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইক্ষু সাধারণতঃ মার্চ্চ হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত জমিতে থাকে। সুতরাং চাষীরা এই সময়টা আখের চাষ করিয়া অনেক পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারে। ভারতবর্ষে আখের চাষে সাধারণতঃ ১ কোটি ৩০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ চাষী ব্যাপৃত আছে। তাহাতে যে পরিমাণ ইক্ষু উৎপন্ন হয়, তাহা চিনিতে রূপান্তরিত করিতে হইলে অন্ততঃ ৫০ হাজার কারখানা-মজুর দরকার হইবে। এবং তাহাতে যে পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইবে তাহাতে অন্যূন ৬০ কোটি টাকা দেশের বার্ষিক আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। গত দুই বৎসরে বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ জমিতে আখের চাষ হইয়াছে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল —

	হাজার একরে	
প্রদেশ	১৯৩১-৩২	১৯৩০-৩১
যুক্ত প্রদেশ	১,৫১৪,০০০	১,৫০৪,০০০
পাঞ্জাব	৪৭৪,০০০	৪২৬,০০০
বিহার-উড়িষ্যা	২৮২,০০০	২৮৪,০০০
বাঙ্গালা	২৩৩,০০০	১৯৯,০০০
মাদ্রাজ	১১৭,০০০	১১২,০০০
বোম্বাই	৯৩,০০০	৯৩,০০০
সীমান্ত প্রদেশ	৪৪,০০০	৪৭,০০০
আসাম	৩১,০০০	৩৩,০০০
মধ্য প্রদেশ	২২,০০০	২১,০০০
দিল্লী	৩,০০০	৫,০০০
মহীশূর	৩৬,০০০	৩৮,০০০
হায়দ্রাবাদ	৩৫,০০০	৩৪,০০০
বরোদা	২,০০০	১,০০০
মোট	২,৮৮৬,০০০	২,৭৯৭,০০০

উপরোক্ত তালিকা হইতে বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষে আখের চাষের আয়তন নেহাৎ অল্পপরিসর নহে, এবং উপযুক্ত সার ইত্যাদি দ্বারা জমির উর্ব্বরতার উৎকর্ষ সাধন করিলে আমাদের দেশের সম্যক্ চাহিদা পূর্ণ করিবার জন্য যে পরিমাণ চিনি প্রস্তুত করা দরকার, সেই অনুপাতের আখ জন্মান যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ একাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চিনি ব্যবহার করে। ট্যারিফ্ বোর্ডের রিপোর্টে প্রকাশ, ভারতবর্ষ বৎসরে ১০ লক্ষ টন্ চিনি ব্যবহার করে এবং ১ লক্ষ টন্ দেশেই প্রস্তুত হয়। জাভা, কিউবা, ফিজি, মরিসাস্, হাওয়াইয়া ইত্যাদি স্থানে নিজেদের চাহিদার চেয়ে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ বেশী।

কিন্তু ভারতবর্ষ ইচ্ছা করিলে তাহার চাহিদা অনুরূপ চিনি প্রস্তুত করিতে পারে, এবং প্রয়োজনের পরিমাণে চিনি উৎপন্ন করিতে এখনও অনেক সময় লাগিবে। ভারতের মজুরও অপেক্ষাকৃত সস্তা। চিনির কারখানার কাজ যে সময়ে খুব বেগে চলে সেই সময়ে চারিপার্শ্বের কৃষকদের চাষের কাজ একেবারে থাকে না বলিলেই চলে। কাজেই তাহারা ঐ সময়ে খুব অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করিতে সম্মত হইবে।

১৯২১ সন হইতে ভারতে প্রস্তুত চিনির পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯২১-২২ সনে ভারতীয় কারখানায় প্রস্তুত চিনির পরিমাণ ছিল ২৮,২৫০ টন্। এই সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ১৯২৯-৩০ সনে দাঁড়াইয়াছে ৮৯,৮০০ টন্। ১৯৩০-৩১ সনে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৫,০০০ টন্। ১৯৩১-৩২ সনের প্রাথমিক আন্দাজ যদিও ছিল ১৭০,০০০ টন্, দ্বিতীয় আন্দাজে হইয়াছিল ২২৮,০০০ টন্, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইবে প্রায় ৩৫১,০০০ টনের কাছাকাছি। এই বর্দ্ধিষ্ণু শিল্প বাস্তবিকই দেশের গৌরবস্থল।

এখন দেখা যাইতেছে যে, চিনি-শিল্পই আধুনিক ভারতের শিল্পোন্নতির প্রধান আশ্রয়। বিদেশী চিনির উপরে যে রক্ষণ-শুল্ক স্থাপিত হইয়াছে, তাহা দেশী শিল্পের প্রসারের জন্য প্রভূত সুযোগ প্রদান করিয়াছে। ভারতবর্ষ অনুরূপ সুযোগ অন্য কোন শিল্পের উন্নতির জন্য পায় নাই। মিঃ শ্রীবাস্তব তাঁহার ১৯৩১—৩২ সনের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, দেশীয় চিনি-শিল্পের প্রতিষ্ঠাকল্পে সরকার যে পদ্ধতিতে শুল্কস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ অবশ্যম্ভাবীরূপে উজ্জ্বল। আমাদের ধারণাও এইরূপ।

সম্প্রতি সিমলাতে চিনি-শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য যে সম্মেলন আহূত হইয়াছিল তাহাতে প্রাদেশিক সরকারী এবং বে-সরকারী প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। আলোচনায় যদিও শিল্পোন্নতির জন্য বিশেষ কোন নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হয় নাই, তথাপি এই শিল্পসংশ্লিষ্ট নানা প্রকার তথ্য সংবলিত বিবরণী সভার কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহাতে এই সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রয়োজনীয় বার্ত্তা শিল্পীদের এবং কারখানার পরিচালকদের কাছে পৌঁছিয়াছে। ইহাতে তাহাদের প্রভূত উপকার হইবে।

মিঃ শ্রীবাস্তব আরও দেখাইয়াছেন যে, চিনির মূল্যের সঙ্গে মোট ব্যবহৃত চিনির পরিমাণের একটা যোগ আছে। কাজেই চিনি-শিল্পের উন্নতির পরিকল্পনায় তাহার মূল্যের বিষয় চিন্তা করা উচিত। নিম্নে যে তালিকা দেওয়া গেল, তাহাতে চিনির মূল্যের এবং ব্যবহৃত পরিমাণের যোগাযোগ কিয়দ্দূর নির্দ্ধারিত হইবে —

সম্বৎসর	কলিকাতায় জাভা চিনির দর (মণপ্রতি)	ভারতে ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ (টন্ হিসাবে)
১৯২৩—২৪	১৮৲	৬৭৮,০৮১
১৯২৪—২৫	১৪৷০	৮৫৯,০৫৭
১৯২৫—২৬	১০৸৶০	১,০১১,৪৮৮
১৯২৬—২৭	১১৸৵০	৯৯৯,৩০২
১৯২৭—২৮	১০৷৶০	১,১০১,৫২৪
১৯২৮—২৯	৯৸০	১,১৬৪,৮০৫
১৯২৯—৩০	৯৲	১,৩২৪,৯২৩
১৯৩০—৩১	৮৷৶০	১,২১৪,৫৮৫
১৯৩১—৩২	১০/০	৯৮২,৫৪০
১৯৩২—৩৩	১০৷৵০	৯২৮,০৯৫

উপরোক্ত হিসাব হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, ১৯৩০ এবং ১৯৩১ সনে চিনির মূল্য অপেক্ষাকৃত কম থাকায় মোট ব্যবহৃত চিনির পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বৎসর যতগুলি চিনির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা যখন আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই উৎপাদন সুরু করিবে, তখন চিনির দাম কমাই স্বাভাবিক। সুতরাং চিনির চাহিদাও সেই সঙ্গে বাড়িবে, এইরূপ আশা করা যায়।

উত্তর বিহারে এবং যুক্ত প্রদেশে চিনি উৎপাদন অনিয়মিত রূপে বেশী হইতেছে কিনা, এই সম্বন্ধে সিমলা-

বৈঠকে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ চাহিদা ও মোট প্রস্তুত চিনির পরিমাণ তুলনা করিলে অপরিমিত উৎপাদনের জন্য ভীত হইবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

এইখানে ভারতবর্ষের ও জাভার উৎপাদিত ইক্ষুর তারতম্যের আভাষ দেওয়া যাইতে পারে। ভারতবর্ষে প্রতি একরে ১৩ টন্ ইক্ষু উৎপাদিত হয়; এইরূপ ১০০ টন্ ইক্ষু হইতে ৮৷৷০ টন্ চিনি প্রস্তুত হয়। জাভাতে প্রতি একরে ৫০ টন্ ইক্ষু উৎপন্ন হয় এবং সেখানে ১০০ টন্ ইক্ষুতে ১২ টন্ চিনি প্রস্তুত হয়।

ইহাতেও নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই; যেহেতু জাভা অনেককাল হইতে এই আখের চাষের চর্চ্চা করিতেছে। ভারতবর্ষেও চেষ্টা করিলে উৎপাদনের হার বাড়ান যাইবে না, এইরূপ আশঙ্কা করা নিরর্থক।

বাঙ্গালা দেশও এই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করিতে তৎপর হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। বাঙ্গালা দেশে পাটের যুগের আজ প্রায় অবসান হইয়াছে। এই যুগের যখন গোড়াপত্তন হইয়াছিল, বাঙ্গালীরা তখন তাহাতে তাহাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই। বিদেশী মহাজন ও পুঁজিদার আসিয়া পাটের মুনাফা কাড়িয়া লইয়াছে। এবার আসিয়াছে চিনির যুগ। অচিরেই সমগ্র দেশময় মহাজনদের আর ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংগ্রাম সুরু হইবে। আশা করি এই সংগ্রামে বাঙ্গালী মহাজন, পুঁজিদার এবং ব্যবসায়ী পিছাইয়া পড়িবে না।

ঘরে-বাইরে
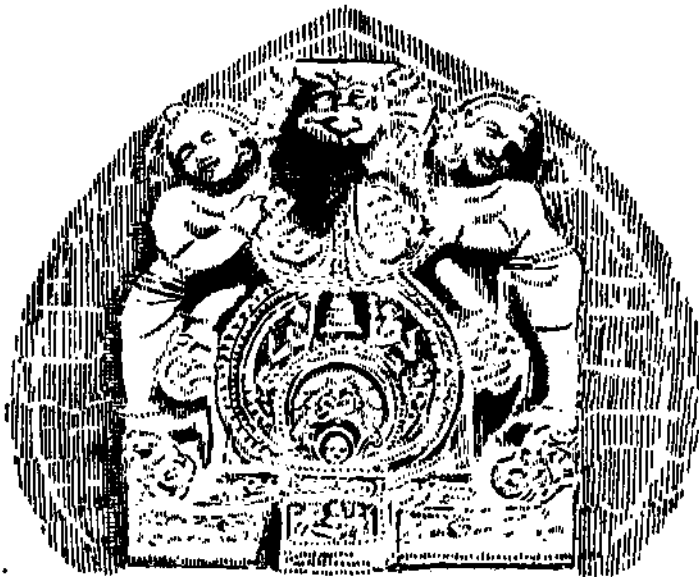
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

(১)

এবার পুজোর ক'টা দিন ঘরে বসেই কাটালুম। এ সময়ে ঘরে বসে থাকার ভিতর একটু নূতনত্ব আছে। কারণ আমি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সে সম্প্রদায়ের যাঁরা বারোমাস দেশে থাকেন, তাঁরা এ সময়ে বিদেশে যান; আর যাঁরা বারোমাস বিদেশে থাকেন, তাঁরা দেশে ফেরেন। এ ক'দিনের জন্য বিদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য শুধু দেশ-ভ্রমণ নয়, সেই সঙ্গে হাওয়া-বদলানো। বায়ু-পরিবর্ত্তন করলে নাকি লোকের অগ্নিমান্দ্য সারে। আর অগ্নিমান্দ্যটাই হচ্ছে কলিকাতাবাসীদের পোষা রোগ।

বাঙলার লোকের যাই হোক, বাঙলার প্রকৃতির কিন্তু শরৎকালেও অগ্নিমান্দ্য হয় না। বাঙলার প্রকৃতির গ্রীষ্মকালের জর বর্ষার ছ'মাস একটু চাপা থেকে, শরৎকালে আবার ফুটে বেরোয়। এই শরৎকালের temperature-বৃদ্ধির কারণ, গ্রীষ্মকালের relapse কি recrudescence, সে বিচার ডাক্তাররা করুন; আমরা রক্তমাংসের দেহের মারফৎ টের পাই যে, শরতের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীষ্মের পুনরাবির্ভাব হয়। এ কালটা বাঙলাদেশে সুখস্পর্শও নয়, সুখসেব্যও নয়। সুতরাং পূজোর সময়ে এখান থেকে পালানোই শ্রেয়। অন্ততঃ তার পক্ষে, যার ঘরে পুজো নেই কিন্তু পুঁজি আছে। পুজোর উত্তেজনার মধ্যে থাকলে, শীত-গ্রীষ্মের জ্ঞান মানুষের থাকে না। সে উত্তেজনার পিঠপিঠ অবসাদ আসে, বিজয়ার পর। আর এই অবসন্ন অবস্থায় ম্যালেরিয়া আমাদের চেপে ধরে। অন্ততঃ পাড়াগাঁয়ে ত তাই হয়; আর কলকাতায় হয় আমাদের সাহেবি ব্যারাম—typhoid। আমরা যেমন যেমন সভ্য হচ্ছি, সেই সঙ্গে সভ্য রোগেরও আমদানি করছি। একেই বলে সভ্যতার দাম।

(২)

আমি গোড়াতেই বলেছি যে, পুজোর ক'টা দিন আমি ঘরে বসেই কাটিয়েছি। ফলে পুজোর কোন সাড়াশব্দ পাইনি, ঢাকঢোলের হট্টগোলও আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। এর কারণ কলকাতার যে অঞ্চলে আমি বাস করি, তার উত্তরে ও পূর্ব্বে মুসলমানের বাস, এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে ইংরেজদের। ফলে মহরমের ক'দিন রণবাদ্যের চোটে কান ঝালাপালা হয়; আর বারোমাস-ত্রিশদিন সাহেব-বাড়ী থেকে gramophone-এর চীৎকারে পাড়ার শান্তিভঙ্গ হয়। ভাল কথা, চৈতন্যের সমসাময়িক নবদ্বীপের শাক্তরা নব বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নগরসঙ্কীর্ত্তন শুনে বিদ্রূপ করে বলতেন যে, ভগবান কি কালা? তাঁকে এত চীৎকার করে ডাকো কেন? কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, শক্তিপুজার ঢাকের বাদ্যি মোটেই শ্রোত্র-রসায়ন নয়। ধর্ম্মের নামে এদেশে যত গোল-মালের সৃষ্টি হয়েছে, আমার বিশ্বাস অন্য কোন দেশে এতটা হয়নি। জনৈক ফরাসী সাহিত্যিক

বলেছেন যে, সঙ্গীত অর্থে organised noise। সঙ্গীত মাত্রই যে উক্ত পর্য্যায়ভুক্ত, তা অবশ্য নয়; কিন্তু আমাদের দেশে পূজো-আর্চ্চার music যে organised noise, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এ দেশে রণবাদ্য ও ধর্ম্মসঙ্গীত, এই দুই একই জাতের। আমাদের দেশে ধর্ম্ম হয়ত বেরিয়েছে ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে, আর ঢাকঢোল প্রভৃতি হরিজনদের বাদ্যযন্ত্র। সুতরাং এ দুয়ের বেখাপ্পা মিশ্রণে এই গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। এই organised noise জিনিষটা আমার বিশ্বাস, হরিজন-সমস্যারই একটি সরব অঙ্গ। তবে এমনও হতে পারে যে, এই সাঙ্গোপাঙ্গ পূজা, কোন অনার্য্য পূজাপদ্ধতির আর্য্য সংস্করণ।

(৩)

দুর্গোৎসব থেকে আলগা থাকলেও, বিজয়ার মোহ আমি আজও কাটাতে পারিনি। বৎসরের মধ্যে ঐ বিজয়ার দিনটে আমার কাছে আজও একটা বিশেষ দিন। অভ্যাসবশতঃ আমার মনে এই সংস্কার জন্মে গেছে যে, বিজয়ার দিন ও ঠাকুর-ভাসানোর দিন একই দিন। কিন্তু এ বৎসর ঋতু যেমন ভেস্তে গিয়েছে, তেমনি ভাসানটাও উভয়সঙ্কটে পড়েছিল। দশমীতে ঠাকুর বিসর্জ্জন দেবার বাধা ছিল এই যে, সেদিন বিকেলটা ছিল বৃহস্পতিবারের বারবেলা, আর তার পরের দিন ছিল ত্র্যহস্পর্শ। ফলে এ-বৎসর বিজয়া ছিল একদিন, ভাসান হয়েছে দুদিন। আর সে দুদিনই আমি সন্ধ্যার প্রাক্কালে গঙ্গার ধারে রাজপথে যাই ঠাকুর-বিসর্জ্জন দেখতে। সেখানে গিয়ে দেখলুম যে, মা এবার এসেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে, আর তাঁর ভক্তরা তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করালেন লরিতে চড়িয়ে। এর থেকে বোঝা যায় যে, সভ্যতার যানবাহনের আশ্রয় কেউই ত্যাগ করতে পারে না, এমন কি আমাদের দেবদেবীরাও নয়। আমরা চরকায় সূতা কাটতে পারি, কিন্তু গরুর গাড়ীতে দিল্লী যাই নে, যাই রেলের গাড়ীতে; আর আমরা ঘোর স্বদেশী প্রবন্ধ লিখতে পারি, কিন্তু তা ছাপি বিলেতি মুদ্রাযন্ত্রে। এক কথায়, আমরা মুখে যাই বলিনে কেন, আমরা কি মনে, কি দেহে, যন্ত্রের অধীন। এই যন্ত্রযুগের উপর আমাদের রাগ এই কারণে যে, আমরা পৃথিবীসুদ্ধ লোক যন্ত্রের অধীন হয়ে পড়েছি; কিন্তু যন্ত্রকে আমাদের অধীন করতে পারিনি। তাই ইউরোপের আজ প্রধান সমস্যা হচ্ছে, কি করে' মানুষ যন্ত্রকে তার অধীন করতে পারবে। সে ভূভাগে বর্ত্তমান যুগে Capitalism-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হচ্ছে আসলে যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কারণ কল-কারখানাই Capitalism-এর জন্মদান করেছে। ইউরোপ অবশ্য এ যুগে যন্ত্রপূজার ধর্ম্মে বিশ্বাস হারিয়েছে। কারণ ইউরোপের এ জ্ঞান আজ হয়েছে যে, যন্ত্র সভ্যতার দেবতা নয়, বাহন মাত্র।

(৪)

সে যাই হোক্, এ ক'টা দিন চোখ বুজে কাটাইনি। কাটিয়েছি, পুজোর সংখ্যা মাসিক পত্র ও সাপ্তাহিক পত্র পড়ে'। ভাল কথা, মাসিক পত্র ও সাপ্তাহিক পত্রে বিশেষ কোনও প্রভেদ আছে কি? অন্ততঃ ও দুয়ের পুজোর সংখ্যায় ত নেই। দুয়েতেই ছোট গল্প আছে, ছোট বড় কবিতা আছে, এবং দুর্গাপূজার আধ্যাত্মিক ও scientific ব্যাখ্যা আছে। দুর্গাপূজার উৎপত্তি ও কালক্রমে পরিণতির ইতিহাস লেখা, এ যুগের পণ্ডিতদের একটা ফ্যাসান হয়ে উঠেছে। দেবদেবীর প্রতি ভক্তি যখন লোকের মনে কমে আসে, তখন তাঁরা জ্ঞানের বিষয় হয়ে উঠেন। আর এ যুগের জ্ঞানের অর্থই হচ্ছে scientific জ্ঞান, অর্থাৎ সেই জ্ঞান যা' historical method-এ লাভ করা যায়। দুর্গা এখন antiquarian-দের হাতে পড়েছেন। অবশ্য নব পণ্ডিতরা এ বিষয়ে নানা বিদ্যার পরিচয় দেন, কিন্তু তাঁদের গবেষণা আমাদের মন স্পর্শ করেনা। এর একটি কারণ, আমরা জানি যে একটি fact আছে, কিন্তু উক্ত fact-এর উৎপত্তির সম্বন্ধে আমরা প্রায় সকলেই অজ্ঞ, আর সে উৎপত্তির সন্ধান যে

পণ্ডিতরা জানেন, এ কথা আমরা সহজে বিশ্বাস করিনে। কারণ পণ্ডিতরা বিদ্যের আঁক যতই কষুন, তাঁরা অবশেষে ঠিকে ভুল করেন। আর তা ছাড়া এ বিষয়ে antiquarianism হচ্ছে আসলে sentimental antiquarianism; অর্থাৎ তা যুগপৎ মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের কথা। যাঁদের দুর্গার প্রতি ভক্তি আছে, তাঁরা এ antiquarianism-এর ধার ধারেন না; আর যাঁদের science-এর প্রতি ভক্তি আছে, তাঁরা এই sentimentalism সহ্য করতে পারেন না। সুতরাং এরকম লেখা পূজোর বাজারেই চলে, বিদ্যার মন্দিরে চলে না।

(৫)

বাঙলা দেশে নূতন পত্র নিত্যই প্রকাশিত হয়; কিন্তু এই সব নূতন পত্রের অঙ্গে চোখে পড়বার মত কোনও নূতনত্ব থাকে না। "উদয়ন" হচ্ছে একখানি নূতন পত্র, এবং প্রথমেই চোখে পড়ে—এ-পত্রের ছাপা অতি চমৎকার। এ যুগে মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাগদ্বেষের একমাত্র বাহন হচ্ছে মুদ্রাযন্ত্র। সুতরাং কোনও পত্রিকার ছাপা উপেক্ষা করবার বিষয় নয়।

যেকালে পৃথিবীতে হাতের-লেখা পুঁথির প্রচলন ছিল, সেকালের কোনও কোনও "আখরিয়া" অতি চমৎকার পুঁথি লিখতেন। কারণ সেকালের আখরিয়া-সমাজ, স্বসম্প্রদায়কে artist হিসাবে গণ্য করতেন। ফলে দেশে-বিদেশে আজও অনেক পুঁথি পাওয়া যায়, যে-সকল পুঁথিকে লোকে work of art বলে গণ্য করে।

মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পর থেকে আখরিয়াদের পেশা মারা গেছে। কেউ আর এখন হাতের লেখা লিখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে না। মুদ্রাযন্ত্র এখন এ-আর্ট্‌কে মেরেছে। কলের ধর্ম্মই হচ্ছে হাতকে বিকল করা।

অপরপক্ষে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সকলেই ছাপতে পারেন, কিন্তু সকলে ভাল ছাপতে পারেন না। সকল দেশেই ছাপানো একটি আর্ট্ হয়ে উঠছে, এবং এ আর্ট্ আয়ত্ত করতে হলে, তার জন্য শিক্ষা চাই, সাধনা চাই। ভাল ছাপা হেলায় হয় না। সুতরাং "উদয়নে"র ছাপা দেখে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। আশা করি এ বিষয়ে "উদয়নে"র দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হবে।

(৬)

"উদয়নে"র আর একটি মহাগুণ এই যে, তার ছাপা প্রায় নির্ভুল। এই গুণ আমার কাছে একটি অসামান্য গুণ। তার কারণ, প্রথমতঃ আমার হস্তাক্ষর ছাপার অক্ষর নয়; দ্বিতীয়তঃ আমার বানানও কাঁচা। বোধহয় যাঁর হাতের লেখা পাকা, তাঁর বানানও পাকা। তবে এ কথা সত্য যে, সব ইংরেজ লেখকদের হাতের লেখা সহজপাঠ্য নয়। আমি একটি ইংরেজ লেখককে জানি, যাঁর বই পড়ে আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করতুম, কিন্তু তাঁর চিঠি পড়া ছিল তেমনি দুঃখদায়ক। বিলেতি কম্পোজিটারদের বাহাদুরি আছে, কারণ তারা ঐ হস্তাক্ষর থেকেও পাঠ উদ্ধার করতে পারে। এর থেকে আমার মনে হয় যে, বিলেতি কম্পোজিটাররা দেশী epigraphist-দের সমতুল্য। আমার হস্তাক্ষর অত দুর্ব্বোধ্য নয়, কারণ আমি একজন বড় লেখক নই। অবশ্য কোনও কোনও বড় লেখকের হাতের লেখাও অতি সুন্দর, যেমন রবীন্দ্রনাথের। সম্ভবতঃ কালিদাসের হাতের লেখা ঐ জাতীয় ছিল, আর মাঘ ভারবির লেখা আমারই মত। যাক্ ও সব বাজে কথা। আমার আর এক দোষ আছে, প্রূফের সব ভুল আমার চোখে পড়েনা। চালের পোকা বাছার মত সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি সকলের নেই। সুতরাং যে কাগজের সম্পাদক আমাকে প্রায় নির্ভুল প্রূফ পাঠান, তিনি আমার নমস্য। "উদয়নে"র প্রূফগুলিও প্রায় নির্ভুল। এই নির্ভুল ছাপার আমি যে এত পক্ষপাতী, তার কারণ এই ছাপার গুণে, বাঙলা ভাষা যে আমি শুনে শিখেছি, পড়ে শিখিনি,—এ সত্য পাঠকদের কাছে ধরা পড়েনা; এক কথায় আমার বিদ্যে ধরা পড়েনা।

(৭)

হঠাৎ "উদয়নে"র গুণগান করবার কারণ কি বলছি।

"উত্তরা" পত্রের গত পূজার সংখ্যায় বীরবলের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। সে পত্রখানি ছাপার অক্ষরে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের একটি কথা আমার মনে পড়ল। ঐ একই কাগজের একই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রও প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি দুঃখ করে লিখেছেন যে, "আমার কত্তো পত্রই ডাকঘরের গর্ভপাতস্বরূপে মারা গেছে।" বীরবলের উক্ত পত্রখানি যদি ডাকঘরের গর্ভপাত স্বরূপে মারা যেত ত আমি দুঃখিত না হয়ে সুখী হতুম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ও-দুর্ঘটনা ঘটবার কোনও সম্ভাবনা ছিলনা। কারণ উক্ত পত্র আমি ডাকঘরের পেটে সঁপে দিই নি, দিয়েছিলুম "উত্তরা"র সম্পাদকের হাতে। ছাপার অক্ষরে উক্ত পত্র এমনি রূপান্তরিত হয়েছে যে, আমি নিজের লেখা নিজেই বুঝতে পারলুম না। "উত্তরা"র প্রুফ-সংশোধক লেখাটির উপর এমনি যথেচ্ছাচার করেছেন যে, আমার বিশ্বাস "উত্তরা"র পাঠকবর্গও এ পত্রের অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন না। অবশ্য তাতে তাদের কিছু আসে যায় না।

কিন্তু ছাপার অক্ষরে যদি এমন কথা থাকে যে, "এদানিক আমি নেশা ছেড়ে দিয়েছি", তাহলে সেটি লেখকের পক্ষে আক্ষেপের বিষয় হয়; কারণ কোন লেখক নেশা করেন কিম্বা ছাড়েন, তাতে পাঠকের কিছু আসে যায়না। তারপর "লেখা" যে কি কারণে "নেশায়" রূপান্তরিত হল, তার হদিস্ আমরা পাই নি। "লেখা" "নেখায়" রূপান্তরিত হতে পারে—শব্দের এ-হেন লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন ছাপাখানার পক্ষে সহজসাধ্য। কিন্তু "লেখা"কে শুদ্ধ করে' "নেশা" হয় না।

(৮)

বানান-সমস্যা বলে বাঙলায় যে একটা সমস্যা আছে, সে কথা আজকাল কোনও কোনও শুদ্ধি-বাতিক-গ্রস্ত লোক মাসিক পত্রের মারফৎ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু এ সমস্যা পাঠকের নয়, লেখকের। ধরুন যদি আমি লিখি "জমি" ত পাঠক অনায়াসে বুঝতে পারবেন যে, আমি কোন বস্তুর কথা বলছি। অপর পক্ষে আমি "জমী" লিখলেও ফল একই হবে। কিন্তু আমি "জমি" লিখব কি "জমী" লিখব, সে সমস্যা সুধু আমার।

দেখা যাক্, এ সমস্যার মীমাংসার কোনও নিয়ম আছে কি না।

বোধহয় সকলেই জানেন যে, আমাদের ভাষায় নানা জাতের শব্দ আছে। শাস্ত্রকারদের মতে তার ভিতর কতক শব্দ "তৎসম", কতক "তদ্ভব", আর কতক "দেশী"। বলা বাহুল্য, তদ্ব্যতীত আমাদের ভাষায় বহু বিদেশী শব্দও আছে।

বহুকাল পূর্ব্বে রামমোহন রায় উপদেশ দিয়েছিলেন যে, "তৎসম" শব্দের বানান সংস্কৃতের অনুরূপই হওয়া উচিত। অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ" শব্দের বানান অবিকল "ব্রাহ্মণ"ই হওয়া উচিত। কিন্তু তদ্ভব শব্দ আমরা যেমন উচ্চারণ করি, তেমনি বানান করা উচিত। অর্থাৎ "বিবাহের" উপর হস্তক্ষেপ করবার আমাদের কারও অধিকার নেই, কিন্তু তদ্ভব শব্দ "বিয়ে" কি "বে" লিখব, এই নিয়েই ত গোল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বানান উচ্চারণের অনুরূপ হতে পারেন।। কারণ যখন আমাদের উচ্চারণের কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই, তখন বানান উচ্চারণের অনুরূপ করলে, নানা-রকম বানান হবে।

(৯)

এ ত গেল বাঙলা ভাষার মূল সম্বলের কথা। কারণ তদ্ভব শব্দই আমাদের ভাষার প্রাণ,—তৎসম শব্দও নয়, দেশী শব্দও নয়, বিদেশী শব্দও নয়। অবশ্য এ জাতীয় শব্দও বাঙলা ভাষায় দেদার আছে। পৃথিবীর সকল ভাষাই এই ভাবে নানা ভাষা থেকে তিল কুড়িয়ে তাল করেছে।

এখন এই সব দেশী ও বিদেশী শব্দ কোন ব্যাকরণের উপদেশমত বানান করব? প্রথমতঃ আমরা জানিইনে যে, কোন শব্দটা দেশী। এমন দু-চারটি শব্দ আমি জানি, যেগুলিকে আমি দেশী বলেই ধরে নিয়েছিলুম; কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের মুখে শুনছি সেগুলি সব তদ্ভব, অর্থাৎ সংস্কৃতের বংশধর। যদি তাই হয় ত তদ্ভব শব্দের মত তাদের বানান নিয়েও মুস্কিলে পড়তে হয়।

তারপর বিদেশী শব্দও আমাদের ভাষায় কম নেই। আমাদের ভাষার শব্দের ঐশ্বর্য্যের জন্য আমরা আরবী, ফারসী, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার কাছে ঋণী। শ্রীযুক্ত সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বাঙলায় কত আরবী ফারসী শব্দ আছে, তার একটি লম্বা ফর্দ্দ করেছেন। পর্ত্তুগীজ শব্দও বাঙলায় কম নেই, ফরাসী শব্দও অনেক আছে, আর ইংরেজী শব্দ ত আমাদের ভাষায় নিত্য ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু এ-সকল শব্দ বিদেশী শব্দের তদ্ভব শব্দ, সে-সব বিদেশী অভিধানের সাহায্যে আমরা বানান করতে পারিনে। ধরুন "বোতল" "গেলাস" শব্দ কি আমরা Webster-এর অনুরূপ বাঙলায় বানান করতে পারি, কিম্বা উচ্চারণও করি?

সংক্ষেপে, এই বানান-সমস্যার কোন আশু মীমাংসা হতে পারেনা। কালক্রমে এই বানানের একটা ধরা-বাঁধা রূপ দাঁড়িয়ে যাবে; যেমন পৃথিবীর অন্য সব ভাষারও দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে এ সমস্যা মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত লেখকরা কলম গুটিয়ে বসে থাকবেন না; Shakespeare, Milton প্রমুখ পুরাকালের সাহিত্য-জগতের মহারথীরাও যেমন বসে থাকেননি। সাঁতার শিখে জলে নামা অবশ্য নিরাপদ, কিন্তু মানুষে তার উল্টো পদ্ধতিটাই অনুসরণ করছে এবং করবে।

(১০)

একটী সুপরিচিত নামের অপরিচিত পত্রের পূজোর সংখ্যায় একটী প্রবন্ধ পড়ে আমি বিস্মিত হলুম। এ পত্রটি দৈনিক, সাপ্তাহিক কিম্বা মাসিক জানিনে, কেননা এই পূজোর সংখ্যা ব্যতীত উক্ত পত্রের অপর কোনও সংখ্যা আমার চোখে কখনো পড়েনি। উপরন্তু এ বৎসর দেখছি যে, এই পূজোর সময় অনেক দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রও পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

এই বড় নামের ছোট পত্রিকাখানির একটি বিশেষ নূতনত্ব আছে। উক্ত পত্রে 'পূজোর ছবি' নামক লেখাটি পড়ে আমার মনে হল যেন সেটী আমার হাতেরই লেখা। প্রবন্ধটী আদ্যোপান্ত পড়ে' বুঝলুম যে, লেখাটি আমারই; আর সাত আট বৎসর আগে "সবুজপত্রে" সেটি ছাপা হয়েছিল। সম্পাদক মহাশয় অবশ্য লেখকের নাম দিয়েছেন—বীরবল; কিন্তু বীরবল কোন তারিখে কোন পত্রের জন্য উক্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সে বিষয়ে সম্পাদক মহাশয় একদম নীরব। সম্পাদক মহাশয় অবশ্য এ কার্য্যের জন্য আমার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করেন নি।

উক্ত প্রবন্ধের পুনরাবির্ভাব দেখে আমি অবশ্য বিস্মিত হয়েছি এবং সেই সঙ্গে খুসীও হয়েছি। আমার পুরোনো লেখার পাঠক-সমাজে না হোক, সম্পাদক-সমাজে আদর আছে, তারই পরিচয় পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করলুম। নূতন সম্পাদক মহাশয়রা যে আমার পুরোনো লেখাকে পাঠক-সমাজে নূতন লেখা বলে চালিয়ে দিতে পারেন, এতে আমার vanity চরিতার্থ হয়।

(১১)

তবে এ ঘটনায় একটু দুঃখিতও হয়েছি এই মনে করে যে, আমাদের লেখার পরমায়ু কত স্বল্প। পাঁচ ছ'বৎসরের মধ্যেই পাঠক-সমাজ একদম ভুলে গেছেন যে, বীরবল নামক একজন চটকদার লেখক কি লিখেছেন। যদি কারও মনে থাকত ত তরুণ সম্পাদক তাকে নতুন বলে চালিয়ে দিতে পারতেন না। আমার দুঃখের দ্বিতীয় কারণ এই যে, বীরবলের লেখার আদর আছে, আর আমার লেখার নেই। অথচ বীরবল যদিচ ইহলোকে বর্ত্তমান আছেন, তবু তাঁকে দিয়ে নূতন কিছু লিখিয়ে নেওয়া কঠিন। শুধু তাই নয়, সম্ভবতঃ আজ তাঁর

লেখবার সে শক্তিও নেই। বীরবল ত "উত্তরা" পত্রিকার মারফৎ পাঠক-সমাজকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি "নেশা ছেড়ে" দিয়েছেন; অতএব তাঁর কলমের মুখ দিয়ে এখন আর উল্টোপাল্টা কথা বেরোয় না। বাঙলায় একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, জনৈক গাঁজাখোর গাঁজার টান দিয়ে হাতী কিনতে গিয়েছিলেন, এবং বেজায় চড়া দামে একটি হাতী কিনতে রাজী হয়েছিলেন। হস্তী-বিক্রেতা পরের দিন যখন হাতী নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়, তখন তিনি তাকে বলেন যে — "যো হাতী মোলেগা ও চলা গিয়া"; অর্থাৎ নেশা তখন তাকে ছেড়ে গিয়েছে। সম্ভবতঃ বীরবলের অবস্থাও এখন তদ্রূপ। সে যাই হোক্‌, উক্ত প্রবন্ধ পড়ে' কেন যে আমার হরিষে-বিষাদ উপস্থিত হয়েছে, সে কথা খুলে বললুম। যদিচ এ-সব লেখকেরই ঘরের কথা, বাইরে বলবার যোগ্য নয়।

(১২)

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উক্ত পত্রে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা লম্বা প্রবন্ধ লিখেছেন; যদিচ তিনি নিজে কখনো সম্পাদকী করেননি, কিছুদিন থেকে শুধু নানা সম্পাদকের উপরোধ রক্ষা করছেন। সে প্রবন্ধটি অপরকে পড়তে অনুরোধ করা আমার মুখে শোভা পায় না। কারণ তাতে সবুজপত্রের সম্পাদকের তারিফ আছে।

এখন তাঁকে অনুরোধ করি যে, তিনি শুধু সম্পাদকীয় রীতি নয়, নীতি সম্বন্ধে আর একটা প্রবন্ধ লিখুন। নীতির অবশ্য যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সামাজিক লোকের পক্ষে প্রতি যুগেই ত কতকগুলি বিধি-নিষেধের প্রয়োজন হয়।

উপরোক্ত রূপ আহরণ অথবা হরণ করবার অধিকার এ যুগের সম্পাদকদের আছে কিনা, সে বিষয়ে ধূর্জ্জটি বাবু বিচার করুন। পূর্ব্বে দেশে-বিদেশে অনেকে এ বিষয়ে বিচার করেছেন। কবি রাজশেখর বলেন যে, হরণে কোনও দোষ নেই; আর ইতালীর দার্শনিক Croce বলেন যে, পরের মনোভাব যদি কেউ আত্মসাৎ করতে পারে, তাহলে সে মনোভাব তার স্বকীয় হয়। কিন্তু এ হচ্ছে মনোভাবের কথা, লেখার কথা ত নয়। আশা করি ধূর্জ্জটি বাবু একটি কথা মনে রেখে এ বিচারে প্রবৃত্ত হবেন;— সে কথাটী এই যে, এখন বাঙলায় বীরবলী লেখার দুর্ভিক্ষ হয়েছে।

মর্ম্মর

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

গ্রামের নাম বরাকর। গ্রামে হোয়েল সাহেবের মস্ত লোহার কারখানা আছে; বিশ-বাইশজন বাবুও সেখানে কলম পেশে। তাই গ্রামটা নাম-করা।

বৃহৎ কারখানার সামনে খানিকটা খোলা মাঠ। মাঠের পর বাবুদের একসারি পনের-ষোলটা 'কোয়ার্টার'। কোয়ার্টারের দক্ষিণ দিকে উঁচুনীচু মাঠ,—মাঠের পর গোলপাতার ছাউনি দেওয়া একসারি ঘর। ঘরের দেওয়াল বাঁকারির উপর মাটি লেপা। সব শেষের প্রাচীন ঘরখানায় থাকে গদাই।

গদায়ের সংসারটী ছোট, সে আর তার মা। মায়ের বয়সও ঘরখানার মতনই প্রাচীন; কত ঋতুর বিচিত্র বর্ণ-সমারোহ তার সামনে কেটে গেছে। মনে হয় পৃথিবীতে আর তার প্রয়োজন নেই; এবার চাই একটা অনন্ত বিশ্রাম! কিন্তু কাজের এখনও কামাই নেই। ঘরখানার সামনে চেটাই পেতে সে পুতুল তৈরী করে। পাশে ঝাঁকা নিয়ে দাঁড়ায় গদাই। সবল পুরুষ, রোদে পোড়া তাঁমাটে রঙ, পরণের কাপড়ের খোঁট কোমরে ফেন্তী দিয়ে বাঁধা।

ঘরের ভিতর তৈজসের মধ্যে আছে একটা দড়ির খাটিয়া, গোটা দুই মাটির হাঁড়ি, দুটো ছোট টিনের বাক্স আর তার ভিতরে খান কয়েক জীর্ণ বাঙলা বই, কোণে একটা মাটির উনুন, দেওয়ালে কারখানার সরকার বাবুর দেওয়া ৺কালীর ছবি। ঘরের সামনে খানিকটা খোলা জায়গা; সেখানে আছে দুটো কলা গাছের ঝাড়, তিনটে পেঁপের গাছ, একটা বহুদিনের অশ্বত্থ গাছ, তলায় মাটি দিয়ে উঁচু করা তুলসীমঞ্চ। তার সামনে একটু দূরে পায়ে চলা পথ। পথটা চলে গেছে বরাবর কারখানার দিকে।

পথের অনেকটা দূরে প্রকাণ্ড খাদ! গ্রামের লোকের কাছে খাদটী 'বুড়ো খাদ' নামে পরিচিত। স্বচ্ছ বারিরাশিতে প্রশান্ত খাদটী পরিপূর্ণ। গ্রামের লোক কেউ খাদে নামে না। কারণ এর অন্তরালে আছে একটা ভয়াবহ ইতিহাস, সেইটাই আতঙ্কের সৃষ্টি করে। সে ইতিহাস গদাই তার মার মুখে শুনেছে।

সে আজ চল্লিশ বছর পূর্ব্বের কথা—খাদের উপর ছিল একটা গ্রাম। বাসিন্দে ছিল ত্রিশ ঘর। গদায়ের মামার বাড়ী ছিল সেখানে। একদিন রাতে সহসা ভূমিকম্প হয়, পরদিন গ্রামের আর চিহ্নটুকু থাকে না। কেবল অতলস্পর্শী বারিরাশি সংহারের বিজয়ী দৃষ্টি নিয়ে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। গদায়ের মা বলে,—তারি একদিন পূর্ব্বে তারা এই গ্রামে চলে আসে; ও গ্রামের জনমানব আর বেঁচে নেই। গ্রামের আর আর লোকে বলে, খাদে নামলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ঘটনার চল্লিশ বছরের মধ্যে গ্রামের কয়েক জনকে ক্ষুধিত খাদ গ্রাস করেছে। এবং গ্রামের অনেকেই স্বপ্ন দেখেছে যে, খাদের ক্ষুধা এখনও মেটেনি।

পশ্চিমে অনন্তবিস্তৃত প্রান্তর, মাঝে মাঝে বনকাঁটার ঝোপ, নারিকেল গাছের সারি। কোথাও সঙ্কীর্ণ খাদ, এখানে সেখানে মাটির ঢিপি, পাথরের স্তূপ, দূর হ'তে মনে হয় যেন ছোট ছোট পাহাড়ের সারি! প্রান্তরের শেষ সীমানায় শালের বন, তার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় ক্ষুদে নদীর রক্তাভ বালুরেখা, যেন প্রান্তরের সীমা নির্দ্দেশ করছে।

দক্ষিণে অর্জ্জুন গাছের পিছনে চক্রবালের কোলে বিশাল জমাট-বাঁধা মেঘের মত পঞ্চকোট পাহাড়।

পূর্ব্বদিকে বুড়ো খাদের মাথায় সূর্য্য উঠেছে। ঝাঁকা হাতে নিয়ে গদাই বলল, "মাঁ, আজ হাটবার, কতগুলি পুতুল গড়া হ'ল দাও দেখি।"

বুড়ী বলল, "সবুর কর না, আমার কাঁধে ত' আর চারটে হাত নেই! একটু দাঁড়া।"

বুড়ীর কথা শেষ হওয়ার আগেই গদাই পুতুল-গুলি ঝপাঝপ্ ঝাঁকায় তুলে ফেলে বলল, "আরো গুটি কতক গড়ো মা!" তারপর হাঁকতে সুরু করে,—"চাই পুতুল — চাই পুতুল!"

বুড়ীর পুতুল গড়ার খ্যাতি গ্রামে খুব আছে। গদাই ঝাঁকা ঝাঁকা মাটি নিয়ে আসে, দোকান থেকে হরেক রকমের রঙ কিনে আনে। গদাই শুধু হাটে বেচতে যায় না, কারখানার কেরাণীদের কোয়ার্টারে পশার বেশী, বিক্রিও খুব।

সংসারের ভিতর মা ও ছেলের আর কোন ইতিহাস নেই! এতেই তারা সীমাবদ্ধ!

সব শেষের কোয়ার্টারটা বৃদ্ধ কেরাণী রতনের। তার দু'এক বছরের চাকুরী নয়, দীর্ঘ চল্লিশটা বছরের। সারা দেহে অবসাদের ছায়া, শিরাগুলি বার্দ্ধক্যের দরুণ খাড়া হ'য়ে উঠেছে, মাথার চুলগুলি সাদা। নিত্য সন্ধ্যায় গদাই কোয়ার্টারের সামনে সানবাঁধান রোয়াকটার উপর এসে বসে।

রতন তার শীর্ণ হাত দিয়ে গদায়ের সবল হাতখানা ধরে, সাদা ভুরুর নীচে স্তিমিত চোখদুটো তার উপর ফেলে স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলল, "খবর কি রে?"

রোয়াকটার উপর ভাল করে বসে গদাই বলল, "মাঠ থেকে ফিরে আপনার কাছেই আসছি!"

উভয়ের মধ্যে অনেক কথা চলে। সহসা গদাই কথার মাঝে বলে, "রতনবাবু, একলা থাকতে আপনার বড় কষ্ট হয়,—না?"

দূরে একসারি পিয়াল গাছ, তার উপরে সান্ধ্য আকাশ যেন ঝুঁকে পড়েছে। পশ্চিমে নারিকেল গাছের মাথায় বাতাসের একটানা সুর। অনেক দূর হ'তে দু' একটী শিয়ালের ডাক অস্পষ্ট কানে আসে। মাথার উপর কালো আকাশখানির দিকে চেয়ে গদায়ের প্রশ্নে রতন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল! তারপর তার জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ খুলে ধরল।

"বয়েস তখন আমার চব্বিশ বছর। রমাকে সঙ্গে করে আমি হোলার কোম্পানীর চাকুরী নিয়ে এখানে চলে আসি। কলকাতার বিপুল সমারোহ ত্যাগ করে রমার আসবার ইচ্ছে বড় ছিল না। তখন তার যৌবনের প্রথম উন্মেষ! সারা অঙ্গে তার কবিতার একটা চঞ্চল ছন্দ, জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র বর্ণচ্ছটা! স্বভাব ছিল তার স্বল্পতোয়া স্রোতস্বিনীর মত মৃদু, সারা মুখে কোমলতা!

"রমা দু'একদিন বেজায় আপত্তি করল। ছল ছল চোখে বলল, 'তুমি বনে চাকুরী করতে যেও না! শুনেছি পাড়াগাঁয়ে বাঘ, সাপের বড় ভয়, কোন দিন ......' আর সে বলতে পারল না, ঠোঁট দুটি মৃদু কেঁপে উঠল! সলাজ চোক দুটো থেকে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

"অনেক বুঝাবার পর তাকে রাজী করে এদেশে নিয়ে এলাম। কারখানা তখন এক বছর মাত্র চলছে। দুটো কোয়ার্টার তখন ছিল; ইঁটের গাঁথুনি ছিল না, মেটে ঘর, গোলপাতার ছাউনি! খালি প্রথমটা ছিল টালি দিয়ে তৈরী! সেখানে থাকত হোয়েল সাহেব।

"আমরা আসবার পনের দিন পর বুড়ো খাদের উপর গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায়। রমার কি ভয়! সে সংবাদ পাওয়া মাত্র জিনিষ পত্তর গুছিয়ে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'ওগো চল আর চাকুরীর দরকার নেই, নিশ্চয় আমাদের এ বাড়ীও কোন দিন পাতালের তলায় চলে যাবে।'

"রমার কোমল দেহটা বুকের মধ্যে নিয়ে বললাম, তোমার কোন ভয় নেই, আমাদের এ জায়গাটা কোন মতেই পাতালের ভিতর যেতে পারে না, সাহেব যখন কারখানা খুলেছে তখন বেশ করে মাটি দেখে নিয়েছে, যখন দেখেছে ধসে যাবার কোন ভয় নেই, তখন এই ঘর আর ঐ কারখানা তৈরী করেছে।

"আরো দুটো বছর কেটে গেল।

"চারিদিকে দূর-প্রসারী শ্যামল মাঠ। বনফুলের গন্ধে ভরা দখিণা বাতাস, আকাশ ভরা তারা, প্রচুর জ্যোৎস্না, ক্ষুদে নদীর মৃদু কলতান, গাছে-গাছে পাপিয়া-দোয়েলের গীতালি, ধীরে ধীরে তাকে নিবিড় ভাবে আকৃষ্ট করে ফেলল।

"পূর্ব্ব দিকে যখন প্রভাতের অস্পষ্ট লাল আভা ফুটে উঠত, রমার মন ভেসে যেত তখন বুড়ো খাদের ধারে। আমায় জোর করে নাড়া দিয়ে বলত, 'ওগো চল, বুড়ো খাদের ধারে বেড়াতে যাই।'

"বুড়ো খাদের ধারে গিয়ে সে আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে যেত। প্রভাতের রক্তিম আকাশ বুড়ো খাদের স্বচ্ছ জলের উপর প্রতিবিম্বিত হত; কত রঙের পুষ্প-সমারোহ! জলডুবরি, পানকৌড়ির শালুকবনে ডুব দেওয়ার ভঙ্গী দেখে রমা বলে উঠত, 'দেখ—দেখ ওরাও আমাদের মত লুকোচুরি খেলে।'

"রক্তপদ্মের পাশেই সরু ডাঁটার উপর ছোট ছোট লাল ফুল; রমা বলল, 'শিরমুলী ফুল কি সুন্দর দেখতে, ...আমায় ঐ রক্তপদ্মটা আর গোটা কতক শিরমুলী ফুল তুলে এনে দাও না!' তারপর হঠাৎ আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, 'না গো না, তোমায় জলে নামতে হবে না, ফুল আমার চাই না!' সহসা একদল রঙিন জল-হাঁস ঝুপ-ঝাপ করে জলে পড়ে প্যাঁক প্যাঁক করে সমস্বরে ডাকতে সুরু করে দিল।

"হাঁস দেখে রমার আনন্দ ধরে না। আমার হাতটা ধরে বলল, 'ঐ হাঁসগুলো রোজই ঠিক এই সময় আসে, সব পাখীর মধ্যে ঐ গুলোই সব চেয়ে সুন্দর।' নালবনে হঠাৎ একটা লাল পাখী ভেসে উঠল। রমা বিস্মিত হ'য়ে বলল, 'ও পাখীটাকে কোন দিন ত দেখিনি, নিশ্চয় ও পথ ভুলে এখানে এসেছে।' মাটি হ'তে একটা ছোট ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে সে লাল পাখীটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। জল-হাঁসের দল ডানার শব্দ করে আকাশে উড়ল, লাল পাখীটাও উড়ল তাদের সঙ্গে।

"রমার বিষণ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রইল লাল পাখীটার দিকে। বুড়ো খাদ তারা পার হ'য়ে গেল, তারপর পার হ'ল ঘন ঝাউবন, নাটাবন—একটা গ্রাম। এইরূপে ধীরে ধীরে তারা দৃষ্টির বাইরে বেরিয়ে গেল।

"সূর্য্য তখন খরতর হ'য়ে ঝাউ বনের মাথা পার হ'য়ে এসেছে। রমার তখন চমক ভাঙল, ব্যস্ত হ'য়ে বলল, 'শীগ্‌গির বাড়ী চল, এখনও উনুনে আগুন পড়েনি, টেঁপির মা এসে কাজে লেগেছে কি না, তাও জানি না। সে কাল যাবার সময় বলে গেছে, 'কাল মাসির বাড়ী যাব, বোধ হয় আসব না।' ভয়ানক কামাই করছে, খবরদার এ মাসের মাইনে ওকে দিও না, আমার হাতে টাকা দিও, একটু ভুগিয়ে দোব, তা' না হ'লে বড় আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে।'

"চোখে মুখে তখন তার পল্লীর তন্ময়তা থাকে না, কঠোর গৃহকর্ত্রীর শাসনের ভাব ফুটে ওঠে!

"সেদিন ছিল মেঘ-মেদুর সন্ধ্যা। কারখানা থেকে বাড়ী ফিরতেই রমা বলল, 'দেখ, পরশু হাটের বার একটা খাঁচা কিনে এনো ত?'

"আমি বললাম, 'কেন?'

"রমা হেসে বলল, 'রোজ দুপুর বেলা একটা ছোট হলদে পাখী ঐ জামরুল গাছে এসে বসে, আজ চার পাঁচ দিন রোজই গাছের তলায় ধান ছড়িয়ে দি, আর পাখীটা গাছ থেকে মাটিতে নেমে এসে ধান খায়। আজ আমার এত কাছে চলে এসেছিল যে, হাত বাড়ালেই ধরা যেত। খাঁচাটা কিনে আনলে পাখীটাকে ধরে খাঁচার ভিতর রাখব।'

"আরো দু'একটী কথার পর রমা জেদ ধরল, 'আজ বেশ ঠাণ্ডা আছে, ক্ষুদে নদীর ধারে যেতে হবে।'

"মাঠের উপর দিয়ে উভয়ে চললাম ক্ষুদে নদীর ধারে। চলতে চলতে মাঠের মাঝে মাঝে শেয়া ফুলগাছের ঝোপ দেখে তার কি আনন্দ! বলল, 'একটু দাঁড়াও।' যত পারল শেয়াফুল তুলে আঁচল ভর্ত্তি করল।" মাটির ঢিপি, পাথরের স্তূপগুলো, নাচতে নাচতে সে পার হ'য়ে গেল। ফণী-মনসার ঝোপের সামনে আসতেই সে সতর্কভাবে পাশ কাটিয়ে গেল।

ফণী-মনসার কাঁটাকে সে বড় ভয় করত। একদিন একটা প্রজাপতিকে ধরতে গিয়ে হাতটা তার ফণী-মনসার ঝোপের উপর পড়ে যায়, হাতে অনেক কাঁটা ফুটে যায়, সেরাতটা যন্ত্রণায় কেঁদেই অস্থির।

"রক্তাভ বালুরাশিতে কুদে নদী পরিপূর্ণ। কেবল নদীর মাঝে অতি ক্ষীণ জলের স্রোত রজত-রেখার মত নির্জীবভাবে বয়ে যায়।

"বালুচরে উভয়েই কিছুক্ষণ বসে রইলাম। হঠাৎ রমা বলল, 'আমি এখানে লুকোবো, তুমি আমায় খুঁজে বের কর।' কথা শেষ হ'তেই সে নৃত্যের ভঙ্গীতে ছুটে শিউলি গাছের ওপাশে পাথরের স্তূপের নিকট গিয়ে অদৃশ্য হ'ল।

"তারপর কোমল কণ্ঠে সাড়া দিল—'কু'—সঙ্গে সঙ্গেই একটা অস্ফুট আর্তনাদ 'উঃ'......

"ছুটে শিউলি গাছের পাশ দিয়ে পাথরের স্তূপের কাছে গেলাম। কতকগুলি আগাছার উপর তার কোমল দেহ নির্জীবভাবে পড়ে আছে। রক্তাভ মুখের উপর নীল আভা, উষ্ণ শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বক্ষ ধীরে ধীরে নামছে উঠছে, চোখ দুটো বুজে গেছে, ওষ্ঠদ্বয়ও নীলাভ হয়েছে, মাঝে মাঝে মৃদু মৃদু কেঁপে উঠছে। বুঝতে বিলম্ব হ'ল না—কালসর্পই তার জীবনের উপর যবনিকা টেনে দিয়েছে।"

রতন একবার তীক্ষ্ণভাবে আমলকী গাছের দিকে চাইল।' স্বরটা ঈষৎ কেঁপে উঠল। তারপর আবার ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করল, "ঘটনার ঘণ্টা দুই পরে তাকে হারালাম।" দক্ষিণ পশ্চিম কোণ দেখিয়ে আবার বলল, "ঐ যে ঘন করঞ্জ গাছ দেখা যাচ্ছে, ওর ও-পাশে চণ্ডীমায়ের শ্মশান ছিল, এ-পাশের দু'চারটে গ্রামের লোক মরলে ঐ শ্মশানে দাহ করা হ'ত। রমার দেহ ওই খানেই দাহ করা হয়।"

আমলকী গাছের দিকে আর একবার চেয়ে কাঁপা গলায় রতন আবার বলল, "রমা কিন্তু আমায় এখনও ভোলেনি! মৃত্যুর পনের দিন পর হ'তে আজ পর্যন্ত আমি প্রত্যহই তাকে দেখতে পাই। ঐ ঢিপিটার ওপাশে রমা দাঁড়িয়ে প্রায় প্রত্যহই আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে, যেন মিনতির সুরে বলে, 'চল! কুদে নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি!'

"আমি যাই নদীর দিকে, আমার পাশে পাশে সে চলতে থাকে। চলতে চলতে বলে, 'আমার মাথা খাও, তুমি অত ভেব না, আমি দিনরাত তোমার কাছে থাকি! আচ্ছা, শরীরের যত্ন নাও না কেন, বল ত?' এই বলে সে কাপড়ের আঁচল দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে দিতে থাকে! একটা শীতল শুভ্র নগ্ন হাত সারা দেহে কোমল পরশ বুলিয়ে দিয়ে যায়। রাতে বিছানার পাশেও তার চুড়ির মৃদু ঠুন ঠুন আওয়াজ পাই। গরম বোধ হ'লে তার আঁচলের এক অংশ দিয়ে আমায় বাতাস করতে থাকে, ভর্ৎসনার স্বরে বলে, 'একটা হাতপাখাও ত' রাখতে হয়! কাল হাট থেকে হাতপাখা কিনে এনো'।"

আমলকীর ঘন পল্লবের মধ্যে একটা পেচক কর্কশ ভাবে ডেকে উঠল। রতন সেই দিকে চেয়ে তৎক্ষণাৎ গদায়ের হাতখানা চেপে ধরে বলল, "দেখ, দেখ, আমলকী গাছের তলায় রমা! যৌবনের অপূর্ব্ব জৌলুস এখনও তার সারা অঙ্গে, কাঁঠালি চাঁপা রঙের শাড়ী সারা দেহ ঘিরে—চমৎকার তাকে আজ মানিয়েছে! ঐ শোন—আমায় বলছে, 'রাত অনেক হয়েছে, ঘরে শুতে যাও!'......আমি তবে যাই......!"

গদায়ের সারা অঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল! আকাশে, গাছের মাথায়, মাটির উপরে অন্ধকার তখন গভীর হয়েছে।

হাটের বার।

কারখানার তীব্র বাঁশীর আওয়াজে সারা গ্রামে চেতনার সাড়া পড়ে গেল। গদাই খাটিয়ার উপর অসমাপ্ত নিদ্রা হ'তে উঠে বসল! হাটেও সোরগোল পড়ে গেছে। ছোট এক খণ্ড জমীর উপর হাট বসে। এক পাশে ফোড়ের দল শাকসব্জী বোঝাই ঝাঁকা

নিয়ে বিক্রী করতে বসে। আর এক পাশে মাছ নিয়ে জেলেরা বসে। জমীটার শেষ প্রান্তে একসারি গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ঘর। সেগুলি কোনটা চা'লের দোকান, কোনটা মসলার দোকান, কাপড়ের দোকান, পাণের দোকান ইত্যাদি। হাটে দু'তিন থানা গ্রামের লোক বাজার করতে আসে। কারখানার কেরাণীর দল কিঞ্চিৎ বেশী মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করে থাকে।

গজু মুদির ঘর ঘেসে, পাণের দোকানের কপাট খুলে জগানী পাণের গোছ নিয়ে বসল।

প্রভাতের তরুণ আলো জগানীর যৌবনভরা নিটোল দেহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আরত দুটী চোখে তখনও ঘুমের রেশ; চূর্ণ কুন্তলগুলি কপালে মুখে এসে পড়েছে, খোঁপায় এক ছড়া শুকনো ফুলের মালা জড়ান, পরণে ডুরে কাপড়খানি—বেশ গুছিয়ে পরা। প্রথমেই ভীড় জমে তার দোকানে।

গদাই এক ঝাঁকা পুতুল নিয়ে জগানীর দোকানের সামনে এসে বসল। পাণের গোছ হাতে নিয়ে জগানী মুগ্ধভাবে কিছু দূরে নারিকেল গাছের মাথায় কি এক পাখীর ডাক শুনছিল।

গদাই কিছুক্ষণ জগানীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, "আজ তোর চোখ দুটো বড় ফুলো দেখাচ্ছে, রাতে ভাল ঘুম হয়নি বুঝি?"

গদায়ের প্রশ্নে জগানী মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, "রাতে গরম ছিল, ভাল ঘুম হয়নি। ভোরের বেলা ঘুমটা আসতেই কারখানার বাঁশীর বিট্‌কেল আওয়াজে ঘুম চটে গেল।"

নারিকেল গাছের মাথায় পাখীটা আবার ডেকে উঠল। জগানী বলল, "গদাইদা, পাখীটার ডাক কি মিষ্টি।"

গদাই হেসে চাপা গলায় বলল, "তোর গলা কিন্তু আরো মিষ্টি!"

সলাজ মুখখানা ক্রোধের ভাণ করে ঘুরিয়ে নিয়ে জগানী বলল, "তোমার যত ওই সব কথা।" তারপর জলের বালতী হাতে করে দোকানের ভিতর ঢুকে গেল।

গদাই স্থির দৃষ্টিতে জগানীর অনাড়ম্বর গতি-ভঙ্গিমার দিকে চেয়ে ভাবল—জগানী জমিদারের মেয়ের চাইতেও সুন্দরী!

জগানীর ইতিহাস গ্রামে এই মর্ম্মে পাওয়া গেছে—এক বৈশাখ মাসে ঘন বর্ষারাতে জগানীর বাবা হরিহর একখানা মাত্র কাপড় কোমরে জড়িয়ে গজুর দরজায় ধাক্কা মারে। গজুর স্ত্রী মোক্ষদা তখন বেঁচে ছিল। দরজা খুলে বীভৎস রাতটায় হরিহরকে ঘরে আশ্রয় দিল। সেই রাতেই গজুর সঙ্গে হরিহরের এখানে থাকবার পরামর্শ ঠিক হ'য়ে গেল। পরদিন হরিহরকে আর গ্রামে খুঁজে পাওয়া গেল না। কিছু দিন পর হঠাৎ একদিন মতিকে নিয়ে হরিহর গ্রামে এসে উপস্থিত হ'ল। ঐ ঘরটা তখন খালি পড়ে ছিল, মতিকে নিয়ে সে সেখানে থেকে যায়। জগানী জন্মেছে এই গ্রামেই।

দূরে পশ্চিম আকাশের কোলে সূর্য্য নেমে গেল। গদাই কোয়ার্টারের সামনে দিয়ে যেতেই রতন ডেকে বলল, "গদাই চল্, নদীর ধারে দিশের গড়ের কাছে যাই।"

দু'জনে নদীর ধারে এসে পৌছল। পশ্চিম দিগন্তের অতি ক্ষীণ রক্ত আভা বালুচরের উপর প্রতিফলিত হয়েছে। ক্ষুদে নদীর ওপারে ঘন শালবনের পিছনে তাল তমালের সারি আকাশটাকে সঙ্কীর্ণ করে তুলেছে। উত্তর দিকে কিছু দূরে মহুয়া বনের পিছনে উঁচু-নীচু মাটির ঢিপির সারি। সেদিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে রতন বলল, "ঐ যে মাটির ঢিপিগুলি দেখা যাচ্ছে, ঐ খানটা হ'ল দিশের গড়।

"প্রায় সাড়ে তিন শ বছর পূর্ব্বে হিন্দুস্থানের সম্রাট সেরশা ঐ গড় তৈরী করেন। তখন ওখানে ছিল বিশাল প্রাসাদ, অজস্র হাতী, ঘোড়া, কামান; কত সিপাই, কত সৈন্ত!

"এক ধূসর অপরাহ্নে রমার বড় ইচ্ছে হ'ল দিশের গড় দেখতে যাবার।

"গড়ের বিরাট ধ্বংসের চিহ্ন দেখে সে বিস্মিত হ'য়ে গেল। আমায় একটা ঢিপির উপর বসিয়ে রমা বলল, 'তুমি সম্রাট সের শা আর আমি হ'লুম তোমার রাণী!' এই বলে সে স্মিতমুখে লীলায়িত ভঙ্গিমায় ঢিপির উপর নাচতে লাগল।"

গদায়ের মনে হ'ল—মহুয়া বনের পিছনে সারি সারি গড়। ঠিক নদীর ধারে বিশাল মর্ম্মর হর্ম্য। হর্ম্যের এক কক্ষে সে বসে আছে। গায়ে মূল্যবান পরিচ্ছদ, মস্তকে স্বর্ণখচিত উষ্ণীষ, মস্তকোপরি স্বর্ণ-খচিত রক্তিম চন্দ্রাতপ। কক্ষের সামনে ক্ষুদে নদী মৃদু কলতানে বয়ে যাচ্ছে। প্রচুর জ্যোৎস্না তার উপর প্রতিফলিত হ'য়ে ঝলমল করছে। সহসা সামনে নদী-বক্ষে একখানি সুসজ্জিত নৌকা এসে দাঁড়াল। নৌকার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো জগানী! মুখের উপর চাঁদের প্রচুর আলো এসে পড়েছে,—তাকে দেখাচ্ছে অপরূপ সুন্দরী! বীণানিন্দিতকণ্ঠে জগানী বলল, "এস আমরা নৌকায় বেড়াতে যাই।"

স্নিগ্ধ চাঁদিমা রাত। দূর আকাশে নক্ষত্র-সমারোহ। অজস্র বনফুলের সৌরভ নিয়ে দক্ষিণা বাতাস বয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে নৃত্যের ছন্দে নৌকা চলেছে।...

জামরুল গাছের মাথায় হুতোম পেঁচা বিকট শব্দে ডেকে উঠল,—ভূত ভূতুম—ভূত—ভূতুম......দু'জনেই চমকে উঠল। দূরে ঘন গাছপালার পিছনে খণ্ড আকাশ খানা ক্ষয়গ্রস্ত চাঁদের আলোয় নিষ্প্রভ।

জগানী দোকানের কপাট খুলে পাণের গোছ নিয়ে ঘরের সামনে বসল।

রবিবারের হাট। দোকানে ভীড় বেশী রকম। সকলেরি এক হাতে খোলে আর এক হাতে পয়সা। জগানীর দোকানের সামনে সবাই ঝাঁকিয়ে বসল।

গয়লা পাড়ার কেষ্ট বলল, "ও জগানী, আমায় এক গোছ পাণ দে!"

কারখানার মেজো বাবু এসে তাড়া দিয়ে বলল, "আমার পাণটা আগে দে। গতবারের পাণ প্রায় সবই পচা ছিল, এবার যদি পাণ ভাল না হয়, আর তোর দোকান থেকে পাণ নেবো না।"

জগানী হেসে বলল, "এবার বাবু পাণ খুব ভাল হবে। না হয় খেয়ে পরে পয়সা দেবেন।"

মেজো বাবু হেসে বলল, "পয়সাটা আগেই দিচ্ছি, ভাল না হ'লে আর দোকানের সামনেই আসব না।" যাবার সময় জগানীর মুখের দিকে চেয়ে আবার হেসে গেল।

একে একে অনেক লোক এসে পাণ নিয়ে গেল। এবার এল বড়বাবু। ছিপছিপে চেহারা, অত্যধিক মদ্যপান হেতু চোখের কোলে গাঢ় মসীরেখা, উজ্জ্বল রং বিবর্ণ হয়ে গেছে। বয়েস ত্রিশের কিছু উপর। গ্রামে বড়বাবুর অফুরন্ত অত্যাচার চলে! নিরীহ গ্রামবাসীরা একটা প্রতিবাদও করতে পারে না। জগানীর দোকানের সামনে পাণ কেনবার অছিলায় এসে দাঁড়িয়ে বলল, "ছাঁচি পাণ দু'গোছ দে।" একটু থেমে আবার বলল, "আগে দু'খিলি পাণ খাওয়া ত?"

জগানী ব্রীড়ানত মুখে পাণ সাজতে লাগল।

বড়বাবু রসিকতার সুরে বলল, "হ্যাঁরে, হরিহর তোর বিয়ে দেবে না? একটু লেখা পড়াও ত তুই জানিস্? কবে বিয়ে করবি বল ত?"

জগানীর মুখখানা ক্রোধে রাঙা হ'য়ে উঠে। মনটা ঘৃণায় ভরে যায়। ইচ্ছে করে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিতে, কিন্তু কারখানার বড়বাবু বলে পারে না।

মোসাহেবদের দল বড়বাবুকে আবার ইসারা করে।

সাজা দু'খিলি পাণ হাতে নিয়ে বড়বাবু বলল, "একটু চুণ দে!"

কাঠির ডগায় চুণ নিয়ে কম্পিত হাতে জগানী সামনে ধরল। হঠাৎ বড়বাবু তার কোমল শুভ্র হাতখানা

সজোরে চেপে ধরে মৃদুস্বরে বলল, "আজ সন্ধ্যের পর আরো কিছু পাণ নিয়ে আমার বাড়ীতে যাস্।"

জগানীর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠল। প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে হাতখানা ছিনিয়ে নিয়ে কথার কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

ভিতরে খাটিয়ার উপর আফিং-এর নেশায় বৃদ্ধ হরিহর ঝিমোচ্ছিল।

জগানীকে অতর্কিতে আসতে দেখে সে বলল, "কি হ'ল তোর?"

কাঁপতে কাঁপতে ধরা-গলায় জগানী বলল, "বড় বাবু ভারী দুষ্টু লোক।"

বৃদ্ধের স্তিমিত চোখ দুটো রাঙা হ'য়ে উঠল। স্থবির অবসাদগ্রস্ত শরীরটা খাড়া করতে গিয়ে নুয়ে পড়ল।

চারিদিকে বিরাট স্তব্ধতা!

গদাই শুয়ে ভাবছিল জগানীর কথা। জগানী তাকে ভালবাসে। সেদিন নদীর ধারে সে স্পষ্ট দেখেছে, — সে দিশের গড়ের রাজা, আর জগানী তার রাণী! সে রাজা না হোক্ জগানীকে সে বিয়ে করবে; ভাবতে ভাবতে তার তন্দ্রা এল।

এমন সময় দরজায় জোরে করাঘাত হ'ল। গদাই তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দেখল, জগানীর হাত ধ'রে হরিহর দাঁড়িয়ে আছে।

গদাইকে দেখে হরিহর ব্যাকুল ভাবে বলল, "বড়বাবুর লোক আজ শাসিয়ে গেছে, জগানী যদি আজ তার বাড়ী না যায়, তবে জোর করে তারা এসে জগানীকে ধরে নিয়ে যাবে।"

গদাই জগানীর দিকে চেয়ে দেখল, তার সুগঠিত দেহখানি দীপশিখার মত কেঁপে কেঁপে উঠছে; চাঁদের আলো তার ভীত সুন্দর মুখখানির উপর পড়েছে। গদায়ের মনে হ'ল—নদীর ধারে দেখা রাণীই হ'ল জগানী!

জগানী বিদ্যুতের মত শুভ্র হাতখানি দিয়ে ব্যগ্র ভাবে গদায়ের হাত চেপে ধরে বলল, "গদাইদা, এখনি ওরা এসে পড়বে,— এ গ্রাম ছেড়ে আমাদের অনেক দূরে নিয়ে চল।"

গদাই গরুর গাড়ীর উপর সকলকে নিয়ে চড়ে বসল।

দিগন্ত-বিস্তৃত তালীবনের মাথায় শুক্লা চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠেছে। আকাশে সাদা সাদা মেঘ। বহুকালের মাটি আর পুরানো আকাশখানার দিকে সে একবার চেয়ে নিল। তারপর নদীর ধার দিয়ে উদাস বাউলের মত পথে গাড়ী হাঁকিয়ে চলল। প্রথমে তারা পার হ'ল দুপাশের গেঁয়ো ফুলের ঝোপ, উঁচু নীচু মাটির ঢিপি, পাথরের স্তূপ — তারপর পিয়াল গাছের সারি, ঘেঁটুবন, শালবন — তারপর উদার দিগন্ত-বিলীন প্রান্তর — তারপর একটা গ্রাম — আবার ঝোপ, জঙ্গল — আবার গ্রাম। ...... গাড়ীর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ — বনানীর পত্র-মর্ম্মর — মাঝে মাঝে ভুতুম প্যাঁচার ডাক—"ভুত—ভুতুম—ভুত—ভুতুম।"
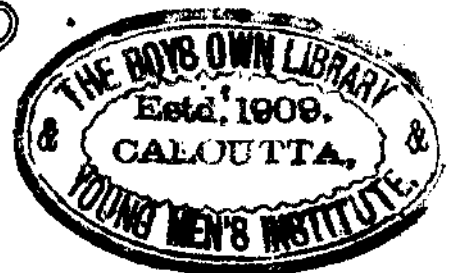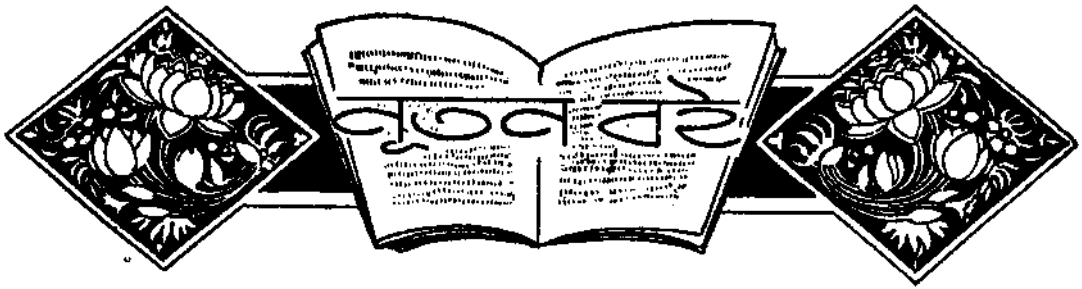
['উদয়নে' সমালোচনার জন্ত গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

মণি-দীপা — শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় বিরচিত। প্রকাশক— ইণ্ডিয়ান পাব্‌লিশিং হাউস। মূল্য চারি টাকা।

ভারতের দিকে দিকে ভারতীর যে রত্নভাণ্ডার ছড়ানো আছে, এতদিন যার কাহিনী শুনে এসেছি শুধু কানে, যা ছিল আমাদের কাছে সেই রূপকথার সাপের মাথার মাণিক, সুকবি হেমেন্দ্রলাল রায় ভারতের দিগ্‌দেশের সেই রত্ন-ভাণ্ডার হ'তে উজ্জ্বলতম মণিগুলি আহরণ ক'রে এনে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। সেই দুর্লভ মণিমালার সমুজ্জল তাঁর এই অপরূপ 'মণি-দীপা' আমাদের কাছে এসেছে যেন গরীবের ঘরে সাত রাজার ধন!

বেদ, উপনিষদ, বৌদ্ধ থেরীগাথা এবং অগণিত সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্য প্রভৃতির তিনি যে জড়োয়া সেট্‌টি বঙ্গ-ভারতীকে উপহার দিয়েছেন, আমি তার কথা বল্‌ছিনে, কেননা বাগ্‌দেবীর ও-ভূষণের সঙ্গে আমাদের পুরুষ-পরম্পরার পরিচয়। মীরাবাঈ, কবীর, দাদু, নানক, তুলসীদাস প্রভৃতি ভক্ত সাধকেরা যে অনুপম হিন্দীসুর বাণীর বীণায় ঝঙ্কৃত ক'রে গেছেন, হিন্দুর জীবনে প্রত্যেকের প্রাণে চিরদিনই তার প্রতিধ্বনি জাগ্‌ছে, অতএব আমি তাদের কথাও ধরছিনে; কবি হেমেন্দ্রলালের সুললিত ছন্দ ও সুমধুর ভাষার গুণে, বিশেষ ক'রে তাঁর আন্তরিক দরদের প্রলেপে এই চির-পরিচিত হিন্দী সাধক-সঙ্গীতগুলি হ'য়ে উঠেছে যেন একেবারে আমাদেরই ঘরের জিনিস।

তারপর, এতে আছে বৈষ্ণব কবিদের অমর অবদান — বৈকুণ্ঠের সেই অমৃতধারা! সেই জয়দেব, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস! আরও কত। জয়দেবের সেই 'ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে' থেকে আরম্ভ ক'রে বিদ্যাপতির সেই মৈথিলি "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়া মুখ চন্দা"— সমস্ত আজ এই বাঙ্গালী কবির অনুরাগের ছোঁয়া লেগে সুন্দর বাঙ্গালা রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু, আমি বলি—"এহ বাহ্য!" কেননা এ বৈষ্ণব সুধারসের মধুর আস্বাদ থেকে বাঙ্গালী একেবারে বঞ্চিত ছিল না।

'মণি-দীপা' আমার কাছে দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে এর তামিল, তেলেগু, মহারাষ্ট্রীয় ও গুর্জ্জর রত্নাবলীর অপূর্ব্ব প্রভায়, বাঙ্গালীর সঙ্গে এদের পরিচয় ছিল না। বাঙ্গালা দেশে এদের কেউ আনেনি এতদিন। বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে এরা ছিল অজ্ঞাত, অপরিচিত। কবি হেমেন্দ্রলাল এই দক্ষিণী মণিগুলি আজ বাঙ্গালা ভাষার সূত্রে গেঁথে বাঙ্গালা ভাষার রত্ন-ভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করে তুলেছেন। তাঁর 'কোচ' ও 'সাঁওতালী' গানের অনুবাদও এদিক দিয়ে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য দান বলা যেতে পারে।

মোটের উপর 'মণি-দীপা' যে বাঙ্গালা সাহিত্যের গর্ব্বের ও গৌরবের বস্তু হ'য়ে থাকবে চিরদিন, এ কথা বলাই বাহুল্য। এ গ্রন্থের বাহিরের সৌষ্ঠবও এর আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যেরই অনুরূপ হয়েছে। প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও রামগোপাল বিজয়

বর্গীয়ের সাহায্যে ইণ্ডিয়ান্ প্রেসের সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিকেশব ঘোষ মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণ ও অঙ্গরাগে যে কলাসম্মত সুরুচি ও সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা যথার্থই প্রশংসনীয়।

শ্রীজলধর সেন

কথাগুচ্ছ—বাঙলা ছোটগল্পের সঙ্কলন গ্রন্থ। শ্রীপ্রমথ চৌধুরী লিখিত ভূমিকা সম্বলিত ও কলিকাতা ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স, লিঃ, হইতে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার দ্বারা প্রকাশিত ও সম্পাদিত। মূল্য—সাধারণ বাঁধাই তিন টাকা ও সিল্কের বাঁধাই চারি টাকা মাত্র। পত্রাঙ্ক—ছয়+৫১৩ পৃষ্ঠা।

এই সঙ্কলন-গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-প্রভাতকুমার হইতে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত প্রবোধ সান্যাল পর্য্যন্ত তেত্রিশ জন মৃত ও জীবিত লেখকের ছত্রিশটি ছোটগল্প সঙ্কলিত হইয়াছে; এবং ইহাতে বাঙলার ছোটগল্প সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারা অনেকটা ধরা পড়ে। প্রকাশক মহাশয়ের উদ্দেশ্য যে অনেকটা ইহাতে সার্থক হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এই জাতীয় সঙ্কলনে সকল শ্রেণীর পাঠকের তৃপ্তি সম্পাদন সম্ভব নহে — এ সত্য সম্পাদক মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। পাঠক-সাধারণের মধ্যে বিভিন্ন রুচির লোকের অভাব নাই, সুতরাং একজনের মতে যে লেখাটি উৎকৃষ্ট, অপরের নিকট তাহাই হয় ত ব্যর্থ-রচনা বলিয়া অনেক সময় পরিগণিত হইতে দেখা যায়। আর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পের তালিকা এখানেই শেষ হয় নাই। তবে ইহা যে বাঙলা গল্পসাহিত্যের একটা নিদর্শন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সঙ্কলনটি প্রকাশ করিয়া প্রকাশক মহাশয় বাঙলার পাঠকসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইলেন। কেননা, অনেক দিন হইতেই এরূপ একটি সঙ্কলনের অভাব অনুভূত হইতেছিল। বিদেশী সাহিত্যে এরকম বহু সঙ্কলন-গ্রন্থ আছে। আমাদের বিশ্বাস, বাঙলার পাঠকসাধারণ এই বইখানা সাদরে বরণ করিয়া লইবেন। প্রকাশক মহাশয় ব্যয়বাহুল্য সত্বেও বইয়ের দাম অত্যন্ত সস্তা করিয়াছেন। আমরা বিশ্বাস করি, অদূর ভবিষ্যতেই ইহার পুন-মুদ্রণ দেখিতে পাইব। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সবই প্রশংসনীয়।

চৌধুরী মহাশয়ের ভূমিকায় আমরা অনেক কিছুই পাইয়াছি। ছোটগল্পের সম্বন্ধে এরূপ সুলিখিত নিবন্ধ অনেক কাল দেখি নাই।

তবে এই সঙ্কলনে যে দুই একটি সামান্য ত্রুটি আপাতদৃষ্টিতেই নজরে পড়িল তাহার উল্লেখ আবশ্যক মনে করি। জন কয়েক কথা-সাহিত্যিকের প্রতি একটু অবিচার করা হইয়াছে এবং এই সঙ্কলনে তাঁহাদেরও স্থান হওয়া সঙ্গত ছিল।

গল্পগুলির প্রথম প্রকাশের তারিখ অনুসারে পর পর সাজাইলে ক্রমঃবিকাশের ধারা বুঝিতে আরও সুবিধা হইত। লেখক-লেখিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকিলে ভাল হইত।

আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

মানস কমল—গল্পের বই। লেখক—শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১১২ পৃষ্ঠা। মূল্য এক টাকা।

পুস্তকখানিতে মোট ১১টি গল্প আছে। গল্পগুলি প্রকৃতই ছোটগল্প। ছোটগল্পের দুর্ভিক্ষের এই যুগে আমরা এই পুস্তকখানি পড়িয়া বাস্তবিকই আনন্দ পাইয়াছি। এগুলি ভাষার সারল্যে ও বর্ণনার মাধুর্য্যে সরস। 'রাত-দুপুরে' গল্পটী হাস্যরসের প্রস্রবণ; 'দেবতা', 'পতিতা', 'জয়-পরাজয়', 'জাতের গরব', 'পূজারী'—এই কয়টি গল্প আমাদের মনের পাতায় গাঢ় রেখাপাত করিয়াছে। 'প্রেমের মিলন' গল্প হিসাবে মন্দ না হইলেও আমাদের আন্তরিক সমর্থন লাভ করে না।

মোট কথা— লেখকের লিখিবার ক্ষমতা আছে; আমরা তাঁহার লেখনী হইতে আরও ভাল গল্প পাইবার আশা করি।

বইখানির বাঁধাই বেশ চমৎকার; ছাপা মন্দ নয়।

শ্রীনীহাররঞ্জন মিত্র

শিশু-বার্ষিকী—প্রকাশক, পপুলার এজেন্সী—কলিকাতা। সম্পাদক—লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী; দাম পাঁচ সিকে।

শিশুরা ভবিষ্যৎ জাতির মেরুদণ্ড — জাতিকে শক্তিমান করতে হ'লে তার ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হবে। তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা—শিশুর জ্ঞানোন্মেষ করার জন্য শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা। বিশিষ্ট শিশু-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেশ উপলব্ধি করতে পারলেও এখনও এদেশে বিশেষ শিক্ষা-প্রণালী বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয় নি। অথচ এরই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা আমাদের সর্ব্বাগ্রে উচিত। শিশুকে শিক্ষা দিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় শিশুর মনোরঞ্জন করা। একথা শিশু-মনোজগতের বিশ্লেষণ-কারী দার্শনিক মণ্টেসরী, ফ্রোবেল প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করেছেন। অনাবিল আনন্দের মধ্য দিয়ে শিশুর মনোবৃত্তির উদ্রেক করতে হবে শিক্ষার দিকে। আমাদের দেশে কয়েক বৎসর যাবৎ তারই আয়োজন চলেছে। কবি যতীন্দ্রমোহন, পূজার প্রাক্কালে, শিশু-মনোহরণ করবার জন্য আয়োজনের যে মোটেই ত্রুটী করেননি, সেজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদার্হ, বিশেষতঃ শিশুদের। আনন্দের আতিশয্যে তাদের শিশু-কণ্ঠের কোমল কল-ধ্বনি আমরা যেন শুনতে পাচ্ছি!

শিশু-বার্ষিকী চমৎকার মনোহারিত্বে বয়স্কেরও মনোহরণ করতে সক্ষম হয়েছে, শিশুদের ত কথাই নাই। তাদের আনন্দ উদ্রেক করবার যতগুলি পন্থা আছে, সমস্ত নিঃশেষ করে এখানে উজাড় করে দেওয়া হয়েছে, ভাব, ভাষা ও চিত্রাঙ্কনের দিক দিয়ে। প্রবীণ ও নবীন লেখকগণের রচনা-সম্ভারে এই অনুপম শিশু-বার্ষিকী শিশুপাঠ্য গ্রন্থ-রাজির মধ্যে যে উচ্চস্থান অধিকার করেছে সে কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। শিশু-সাহিত্যিকগণ ব্যতীত রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, চারু দত্ত, পরশুরাম প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকগণ এই শিশু-বার্ষিকীর সৌষ্ঠব সহস্রগুণে বর্দ্ধিত করেছেন। আর চিত্রগৌরবের পরিচয় না দিলেও চলে।

আমরা এই শিশু-বার্ষিকীর সর্ব্বাঙ্গীন ও বহুল প্রচার কামনা করি, আর যিনি এর সঙ্কলনভার গ্রহণ করেছেন তাঁকে আমাদের হৃদয়ের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল

আরতি—কবিতার বই। শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস প্রণীত। দাম এক টাকা। এই গ্রন্থখানির সমালোচনা পরবর্ত্তী সংখ্যায় করিবার ইচ্ছা রহিল।

বিনয় দত্ত

৺বিজয়ায়

অনবদ্য আনন্দের মঙ্গলধ্বনির মাঝে যাঁর আগমন হয়েছিল, বিসর্জ্জনের করুণ বিচ্ছেদ-ধ্বনির মাঝে তিনি বিদায় গ্রহণ করেছেন। আমাদের চারিদিকে যে বিপর্য্যয় হয়েছে, বিজয়ার মহামিলনে তা সঙ্ঘবদ্ধ হোক; দ্বেষ-হিংসায় যা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, বিসর্জ্জনের অন্তে তা সম্মিলিত হোক। রোগ, শোক, দুঃখ, তাপ, অক্ষমতা, দুর্ব্বলতাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখে মাতৃ-আবাহনের মহামন্ত্র বোধ হয় সশ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয় নি, তাই যেন আমাদের সর্ব্বশক্তিময়ী জননী এসেও এলেন না, তাই মাতৃপদরজঃ লাভ করে আমরা যেন ধন্য হয়ে উঠতে পারিনি। কমলাকান্তের সুরে বোধ হয় আমরা ডাকিনি, "উঠ মা, এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে, এবার আপনা ভুলিব, ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব, অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী।" মা উঠবেন না। কেন উঠবেন? আত্ম-প্রচেষ্টায় মোহান্ধ আমরা মাতৃচরণে আত্ম-বলিদান তো করি নি। আমরা দুর্ব্বলকে এখনও লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন করতে তো ভুলি নি। কেন তবে আমরা লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, উৎপীড়ন হতে রক্ষা পাবো? স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রকণ্ঠে বলেছেন, 'ঐ যারা চাষাভুষা, তাঁতিজোলা, ভারতের নগণ্য মনুষ্য, বিজাতি-বিজিত, স্বজাতি-নিন্দিত ছোট জাত, তারাই আবহমান কাল নীরবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের পরিশ্রমের ফলও পাচ্ছে না···যাদের রুধির-স্রাবে মনুষ্যজাতির যা কিছু উন্নতি, তাদের গুণগান কে করে?'

আমরা তা করি নি, তবে মাতৃকৃপা লাভ করব কেমন করে? তাই আসুন আজ দ্বেষহিংসা ভুলে, দুর্গম বাধা-বিঘ্নের গিরি-প্রান্তর পার হতে হতে আমরাও স্মরণ করি —

মাধব মাধব বাচি, মাধব মাধব হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ॥

আর বিজয়ায় বিজয়-অভিযানের পূর্ব্বে কোটীকণ্ঠে মিলিত প্রার্থনা করি—

শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

আসুন, ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ ভুলে গিয়ে, আজ দিকে দিকে ভ্রাতৃবাৎসল্যের মহা-মন্দির গড়ে তুলি।

* * *

যাঁদের অনুগ্রহ না পেলে আমরা সাহিত্যসেবার ঘাতপ্রতিঘাতের মাঝে একটুও স্থান সঙ্কুলান করতে সক্ষম হতুম না, 'উদয়নে'র সেই সহানুভূতিশীল বন্ধুবান্ধব, পৃষ্ঠপোষক লেখক-লেখিকা ও পাঠক-পাঠিকাগণের কাছে আমরা আমাদের বিজয়ার আন্তরিক সশ্রদ্ধ অভিবাদন নিবেদন করছি। গ্রহণ করলে চরিতার্থ হবো।

পরলোকে মহিলা কবি কামিনী রায়

গত ২৭-এ সেপ্টেম্বর সুকবি কামিনী রায় পরলোকে গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স প্রায় ৬৯ বৎসর হয়েছিল। তাঁর পিতা চণ্ডীচরণ সেন সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপরিচিত। তিনি মুন্সেফ ছিলেন; কিন্তু ইতিহাস অধ্যয়ন করে যেসব উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তার অধিকাংশেরই প্রচার, সরকারের নির্দেশে বন্ধ হয়েছে। এ দেশে ইংরাজ-শাসন প্রবর্ত্তনের প্রথম সময়ের ঘটনা নিয়ে তিনি কয়খানি উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসগুলির উপকরণ হিসেবে তিনি পরিশিষ্টে যেসব ঐতিহাসিক প্রমাণ উদ্ধৃত করেছিলেন, সে-সব ইংরাজের প্রতি এ দেশের লোকের অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করতে পারে মনে করেই, সরকার সেগুলির প্রচার বন্ধ করে দিয়েছেন।

তিনি ব্যক্তিগত মতের স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদাতা মেট্‌কাফের জীবনচরিত রচনা করেছিলেন এবং আমেরিকায় ক্রীতদাস-প্রথা নির্ম্মূল করবার কাজে সহায় 'টম্‌কাকার কুটীর' পুস্তকের অনুবাদ প্রচার করেছিলেন।

বাখরগঞ্জ জিলার বাসণ্ডা গ্রামে রক্ষণশীল আনুষ্ঠানিক হিন্দুপরিবারে কামিনীর জন্ম হয়। তখন স্ত্রীলোকদিগকে সাহিত্য-শিক্ষা প্রদানের প্রথা প্রচলিত হয় নি। কিন্তু তাঁব মা লেখাপড়া জানতেন এবং কন্যাকেও শিক্ষা দিয়েছিলেন। কন্যার জন্মের ৬ বৎসর পরে চণ্ডীচরণ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তারপর ১ বৎসর কয় মাস মধ্যে পিতার মৃত্যু হলে তিনি স্ত্রীকে আপনার কাছে নিয়ে যান। তদবধি তিনিই কন্যার শিক্ষাভার গ্রহণ্ করেন এবং দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত সেই ব্যবস্থার পর কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। তখনই কামিনী কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করেছেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কিছুদিন শিক্ষকের কাজ করেন। তাঁর কবিতায় যে অসাধারণ সংযম ও শুচিতা, যে উচ্চ-ভাবের বিকাশ আছে তা সচরাচর লক্ষিত হয় না। তিনি কবিতা লিখতেন বটে, কিন্তু স্বাভাবিক কুণ্ঠা হেতু রচনা প্রকাশ করতে চাইতেন না।

তাঁর পিতৃবন্ধু দুর্গামোহন দাশ মহাশয় তাঁর কতকগুলি কবিতা কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পড়তে দেন। হেমচন্দ্র সেগুলি পড়ে এতই প্রীত হন যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেই কবিতা সংগ্রহের জন্য ভূমিকা লিখে দেন। সেই ভূমিকাসহ কতকগুলি কবিতা 'আলো ও ছায়া' নামে প্রকাশিত হয়। কিন্তু লেখিকা আপনার নাম প্রকাশ করেন নি। এই একখানি পুস্তক প্রকাশ করেই তিনি বাঙ্গালার সাহিত্যিকদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি অধিক রচনা করতেন না এবং রচনার ভাব ও প্রসাধন মনোজ্ঞ না হলে তা প্রকাশ করতেন না। সে জন্য তিনি বাঙলা সাহিত্যকে অধিক সম্পদ দান করে যেতে পারেন নি। কিন্তু তিনি যা' দিয়ে গেছেন তা' বহুমূল্য।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ ৩০ বৎসর বয়সে তিনি বিপত্নীক কেদারনাথ রায়কে বিবাহ করেন। কেদার বাবু তাঁহার কবিতার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। এই সূত্রে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা পরিণয়ে পরিণতি লাভ করে।

শেষ জীবনে তিনি অনেকগুলি শোকে কাতর হয়েছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর একটী শিশু-সন্তানের মৃত্যু হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আকস্মিক দুর্ঘটনায় কেদার নাথেরও মৃত্যু হয়। তার অল্পদিন পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অশোক পরলোকগত হয় এবং কন্যা ৫ বৎসর যাবৎ ক্ষয়রোগে কষ্ট পেয়ে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে সব যাতনার হাত হতে মুক্তি পায়। পুত্র অশোকের মৃত্যুর পর তিনি যেসব কবিতা রচনা করেন, সেগুলি শোকগাথা হিসাবে বঙ্গসাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করেছে।

এর পর তাঁর সপত্নীপুত্রত্রয়ের মধ্যে দুই জনের অকাল মৃত্যুশোক তাঁকে সহ্য করতে হয়। জ্যেষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্র-

নাথ কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন এবং মধ্যম যতীন্দ্রনাথ বিভাগীয় কমিশনার ও 'বোর্ড অব রেভিনিউ'-এর মেম্বার হয়েছিলেন। এঁদের কনিষ্ঠ সত্যেন্দ্রনাথ এখন বাঙ্গালা সরকারের সেক্রেটারী।

তিনি পরিণত বয়সে এদেশে রাজনৈতিক ব্যাপারে নারীর অধিকার প্রসারের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বটে কিন্তু স্বভাবতঃ সংযমের অনুশীলন করতেন বলে তিনি কখন উগ্র আন্দোলনকারীদিগের মধ্যে পরিগণিত হতে পারেন নি। তাঁর গাম্ভীর্য্য, তাঁর জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা, তাঁর চরিত্রের মাধুর্য্য ও পবিত্রতা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত।

তিনি কবি হিসাবে যেমন, মানুষ হিসাবেও তেমনই বড় ছিলেন।

'আলো ও ছায়া'র পর তিনি 'নির্ম্মাল্য' নামক যে গীতি-কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তার কয়টি কবিতা বাঙ্গলা সাহিত্যে অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তিনি একদিকে যেমন হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের—অপরদিকে তেমনই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রভাবিত হন নি; তাঁর কবিতায় তাঁরই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়।

তিনি বহু অপ্রকাশিত রচনা রেখে গেছেন। আমরা আশা করি, তাঁর পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় ও ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন— সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন এবং বাঙ্গালার সাহিত্যানুরাগীদিগকে সে সকল থেকে বঞ্চিত করবেন না।

স্বর্গীয় ডক্টর আনি বেশান্ত

গত ২০-এ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ চারিটার সময় মাদ্রাজের আদিয়ার আশ্রমে ডক্টর আনি বেশান্ত ইহধাম পরিত্যাগ করে চলে গেছেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি আয়র্ল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স প্রায় ৮৬ বৎসর হয়েছিল। এই কর্ম্মময়, গৌরববহুল জীবনের অবসানে সমগ্র দেশ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

বর্ত্তমান যুগে যাঁরা অসামান্য প্রতিভাবলে অক্ষুণ্ণ কীর্ত্তি রেখে গেছেন, ডক্টর বেশান্ত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বহুমুখী প্রতিভাবলে এই মহীয়সী মহিলা বিশ্বমানবতার রাজ্যে অপূর্ব্ব স্থান অধিকার করেছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অধ্যাত্মরাজ্যে গভীর গবেষণা, অপূর্ব্ব বাগ্মিতা প্রভৃতিই তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণাবলী। সর্ব্বোপরি তাঁর অলৌকিক ভারত-প্রীতির কথা আমাদের কাছে অপূর্ব্ব উদারতার আভাষ এনে দেয়। প্রাচ্যের যুগান্তব্যাপী অধ্যাত্ম-বাণী ও অনুপম সভ্যতার কাহিনী তাঁকে সম্পূর্ণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই ভারত-প্রেম তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য হয়ে উঠেছিল। সমাজ-সেবা, শিক্ষা-দীক্ষা, রাষ্ট্রীয় সাধনা—সর্ব্বত্রই তিনি ভারতের কল্যাণ কামনা করে, নিজেকে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের জাতীয়তার কথা উল্লেখ করে তিনি পথভ্রান্ত জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সবিশেষ যত্ন করেন। তার ফলে এ দেশে 'হোমরুল'-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এজন্য নানাদিক দিয়ে তাঁকে গঞ্জনা, লাঞ্ছনা ও তিরস্কার ভোগ করতে হয়েছিল। প্রতিদানে ভারতবাসী তাঁকে জাতীয় মহাসভার সভানেত্রী পদে অভিষিক্ত করেন। তাঁর মতবাদ প্রচার করবার জন্য তিনি 'নিউ ইণ্ডিয়া', 'কমন উইল' প্রভৃতি পত্রিকা সসম্মানে পরিচালিত করে গেছেন। নির্য্যাতিতের সেবা তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত ছিল।

শ্রীযুক্তা আনি বেশান্ত বারাণসীধামে তাঁর অতুল কীর্ত্তি 'সেনট্রাল হিন্দু কলেজ' নামে যে বিরাট বিদ্যার্থী-ভবন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, উত্তরকালে তাই 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণত হয়েছে।

অসামান্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ফলস্বরূপ ১৯০৭ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভারতীয় থিওজফিক্যাল সোসাইটীর সভাপতি কর্ণেল অলকটের মৃত্যু হবার পর তিনিই সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্তপদ অলঙ্কৃত করে

ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে, এই ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করেন। তাই সর্ব্বদিকে তাঁর অপূর্ব্ব অবদানের কথা স্মরণ করে মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, 'যতদিন পর্য্যন্ত ভারতের অস্তিত্ব থাকবে, তত দিন পর্য্যন্ত তাঁর গৌরবমণ্ডিত কার্য্যকলাপের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ থাকবে।'

আদিয়ারের সমুদ্রতীরবর্ত্তী আশ্রমে রুগ্ন শয্যায় শায়িতা, এই মহীয়সী মহিলা নাকি ইচ্ছা করেছিলেন, যেন এই ভারতেই তিনি এবার ক্ষত্রিয় নারীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অন্তিম অভিলাষ যেন পরিপূর্ণ হয়।

ডক্টর বেশান্তের তিরোধানে ভারতের যে ক্ষতি হয়েছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। জাতির মুখর ভাষা নীরব অশ্রুজলে পরিণত হয়েছে। করুণাময়ের চরণে আমাদের মিলিত প্রার্থনা—যেন তাঁর আত্মার সদ্গতি হয়।

মেদিনীপুরে হত্যা

কিছুকাল আগে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার বার্জ আততায়ীর গুলীতে নিহত হয়েছেন। এই নিয়ে মেদিনীপুরে তিন জন ম্যাজিষ্ট্রেট নিহত হলেন। এই হত্যায় সমগ্র দেশে বিশেষ বিক্ষোভ লক্ষিত হয়েছে এবং লোকমত অকুণ্ঠভাবে প্রচার করছে যে এরূপ হত্যা ভারতবাসী হিন্দুর ধর্ম্ম ও প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ কার্য্যের দ্বারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। অহিংসার পথে—নিয়মানুগ আন্দোলনের ফলে গত অর্দ্ধশতাব্দী কালের মধ্যে এদেশে লোকের রাজনৈতিক অধিকার কিরূপ বর্দ্ধিত হয়েছে, তা লর্ড ল্যান্সডাউনের পূর্ব্ববর্ত্তী বড়লাটদিগের সময়ের ব্যবস্থাপক সভার গঠন ও বর্ত্তমানে বিলাতের পার্লামেন্টের প্রস্তাবিত ব্যবস্থার তুলনা করলেই বুঝতে পারা যাবে। ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসও অহিংসাকেই মূলনীতি বলে স্বীকার করে আসছেন।

রাজনীতিতে গুপ্তহত্যার স্থান থাকতে পারে না। কেননা, মানুষের ধন ও সম্পত্তি নষ্ট করবার অধিকার কারও নেই, এ-ই সমাজের ভিত্তি। বরং দেখা যাচ্ছে, এসব হত্যার জন্যই বিদেশে ও এদেশে এক দল লোক বলছে, নূতন শাসন-সংস্কারে অন্যান্য প্রদেশকে যেসব অধিকার প্রদান করা হবে, তার কতকাংশে বাঙ্গালাকে বঞ্চিত করা হবে।

আমরা সমাজের, অর্থনীতির ও গঠনমূলক কার্য্যের দিক থেকে বিচার করলে দেখতে পাই, এরূপ ব্যাপারে বাঙ্গালার বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে। প্রথমতঃ—এতে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হচ্ছে। রাজকর্ম্মচারীরা শাসন-পদ্ধতির জন্য দায়ী ন'ন। তাঁরা সেই পদ্ধতি পরিচালন করেন মাত্র। সুতরাং তাঁদের হত্যা করলেই যে শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হবে, এমন মনে করবার কোন কারণ থাকতে পারে না। শাসন-পদ্ধতির ত্রুটি প্রদর্শনের জন্য অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের বিচার-বিবেচনার ফল প্রকাশ করা উচিত। আবার দেখা যায় বিষ জীবদেহে প্রবেশ করলে যেমন দেহের সর্ব্বত্র তার ক্রিয়া লক্ষিত হয়, তেমনই এই সন্ত্রাসবাদ কেবল রাজকর্ম্মচারীদিগকে অযথা আক্রমণ করেই নিরস্ত বা নিঃশেষ হচ্ছে না; পরন্তু দেশের লোককেও বিপন্ন করছে।

অর্থনীতির দিক থেকে দেখলে বুঝা যায়, এতে সমাজে যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ব্যবসা-বাণিজ্যও বিপন্ন। লোক একস্থান থেকে স্থানান্তরে টাকাকড়ি নিয়ে যাবার সময় পথিমধ্যে আক্রান্ত ও নিহত হচ্ছে। এরূপ অশান্তির মধ্যে দেশে শিল্প, ব্যবসা—কিছুই সৃষ্ট বা পুষ্ট হতে পারে না। অল্পদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় অর্থসচিব মহাশয় বলেছিলেন, গতপূর্ব্ব বৎসরে বাঙ্গালায় সন্ত্রাসবাদ ও আইনভঙ্গ-আন্দোলনের জন্য পুলিশের ব্যয়বৃদ্ধির পরিমাণ ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ছিল; গত বৎসর তা ৪৭ লক্ষ

হয়েছিল; এবার আরও বেড়েছে। তিন বৎসরে এই অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ—১ কোটি ২২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা দেশের গঠনকার্য্যে ব্যয়িত হলে কত উপকার হতে পারত, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আজ দেশ গঠনকার্য্য চাইছে—গঠনকার্য্যের দ্বারা বাঙ্গালার লোকের অন্নসমস্যার সমাধান করতে হবে। সেজন্য অর্থের যেমন প্রয়োজন, দেশে শান্তিরও তেমনই প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন এরূপ কার্য্যের ফলে একাধিক স্থানে অধিবাসী-দিগকে অতিরিক্ত কর বা জরিমানা দিতে হয়েছে। এ-ও দেশের লোকেরই ক্ষতি।

জাপ-ভারত-ল্যাঙ্কাসায়ার বাণিজ্য-বৈঠক

সম্প্রতি ভারত-গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণের সঙ্গে জাপানী প্রতিনিধিদল আর বিলাতী প্রতিনিধিদল সিমলায় এক মিলন-বৈঠকে বসেছেন। ভারতে বস্ত্র-বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁদের আলোচনা চল্‌ছে। ভারত-গভর্ণমেণ্টের সদস্যগণের পরামর্শদাতারূপে লালা শ্রীরাম, শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার আর শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান এই সভায় নিমন্ত্রিত হয়েছেন। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বস্ত্র-শিল্প ব্যাপারে যাতে পূর্ব্ব-দিগন্তের জাপান, অন্যদিকে পশ্চিম-দিগন্তের ল্যাঙ্কাসায়ারের সহিত ভারতের একটা কোনও নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

বস্ত্র-শিল্প-প্রতিষ্ঠা যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তা সকলের দেখা উচিত। বিদেশী প্রতিযোগিতার সঙ্গে ভারতের ক্ষুদ্র কুটীর-শিল্পগুলিরও যাতে উচ্ছেদ না হয়, সেদিকেও আলোচনার গতিনির্দ্দেশ করা হোক বলে অনেকে মতামত দিয়েছেন। আমাদের শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় ফলাফল চিন্তা করে, বৈঠকে যে সুপরামর্শ দান করবেন, তা'তে বোধ হয় কারো সন্দেহ নেই।

মহাত্মা ও ভিক্ষু ফুজী

সম্প্রতি ওয়ার্দ্ধা আশ্রমে জাপানের প্রধান ধর্ম্মগুরু ভিক্ষু ফুজী ও তাঁর শিষ্য ভিক্ষু ওকিৎসু, মহাত্মাজীকে দেখতে এসেছিলেন। ভিক্ষু-পোষাক-পরিহিত, বাস্তরত বৌদ্ধ-শ্রমণদ্বয় ভগবান বুদ্ধের প্রিয় 'নাম মোহ রঞ্জি কহো' সঙ্গীতে দিগন্ত মুখরিত করে আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। ভিক্ষুর উপহার সসম্মানে গ্রহণ করে মহাত্মাজী বলেন, 'জাপান ভারতকে জয় করেছে'; উত্তর এলো—'কিরূপে'? মহাত্মাজী বলেছিলেন, 'ব্যবসার দ্বারা'। ভিক্ষু ওকিৎসু উত্তরে বলেন, 'বৌদ্ধদের সহিত ব্যবসার সম্পর্ক নাই'। আমাদের কৌপীনধারী হিন্দু-ভিক্ষু তাঁর স্বভাবতঃ সূক্ষ্মদৃষ্টির বলে অতি নিগূঢ় সত্যতত্ত্বের উদ্ঘাটন করেছেন; সানন্দে কি নিরানন্দে—তা কেউ বলতে পারে না।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে ভিক্ষু ওকিৎসু বলেছেন, "তেরশ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ আদর্শের দ্বারাই ভারত জাপানকে জয় করেছিল; এখন যদি জয় করতেই হয় তবে জাপান বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারাই ভারতকে জয় করবার চেষ্টা করবে।" আবার যদি কপিল-বাস্তুর সেই মহান্ পুরুষের অহিংসা মন্ত্রের উপদেশবাণী ফিরে আসে, তা হলে নিশ্চয়ই পৃথিবীতে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর মর্ম্মন্তুদ অত্যাচারের হাহাকার কম শোনা যাবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল

নূতন শাসন-তন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক বিলের প্রস্তাব শাসন-পরিষদে আলোচিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন সরকার, অধ্যাপক রাও প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ নানা মতামত সংবাদপত্রের মারফৎ প্রকাশ করেছেন। সম্প্রতি 'ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স এণ্ড ইন্‌ডাষ্ট্রিস্'ও এবিষয় আলোচনা করেছেন। এ সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হবার আগে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের মতামত

গ্রহণ করা হয়নি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচলন হলে তাতে দেশের আর্থিক অবস্থার অনেকটা স্বচ্ছলতা হবে, সেই উদ্দেশ্যেই এ বিলের প্রস্তাবনা। অনুমোদিত প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যাঙ্কের গঠনকার্য্য সম্পাদিত হলে, যদি মূল সদুদ্দেশ্য হতে বিচ্যুত হতে হয়, তবে এ নব-প্রবর্ত্তনে কোনও না কোন দোষ ত্রুটী থেকে যাবে বলে অনেকে মনে করেন। যে কোনও নূতন প্রতিষ্ঠানে একটু আধটু দোষ ত্রুটী থাকবেই থাকবে — সম্পূর্ণ-ভাবে দোষমুক্ত হওয়া এক রকম অসম্ভব। তবে যদি সকলে একত্র মিলে-মিশে কাজ করা যায় তবে দোষ ত্রুটীর ভাগ কম হতে পারে এবং এই দোষত্রুটি যতই কম থাকে ততই মঙ্গল। আর যদিই বা কিছু থেকে যায়, তবে যখন সকলে মিলে-মিশে সে বিষয়ের আয়োজন করেছেন তখন সকলেই সমভাবে তার ফলাফল ভোগ করবেন, কাজে কাজেই অনুযোগ অভিযোগ প্রভৃতি কাউকেই শুনতে হবে না।

'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক'কে 'অংশীদারী ব্যাঙ্ক' করতে হলে অংশীদারগণের মধ্যে অধিকাংশই এদেশীয় হওয়া কর্ত্তব্য, পরিচালন-সমিতিতেও উপযুক্ত পরিমাণে ভারতীয়ের স্থান থাকা দরকার।

রাজা রামমোহন রায়

গত ২৭-এ সেপ্টেম্বর দেশ-বিদেশের অনেক স্থানে রাজা রামমোহনের শত-বার্ষিকী মৃত্যু-দিবস অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে, এমনি দিনে, ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল সহরে, তিনি দেহত্যাগ করেন। সেই স্বর্গীয় মহাত্মার স্মৃতি-তর্পণার্থে আজ- দেশ-ব্যাপী বিরাট আয়োজনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাঁর মহান কর্ম্মের দ্বারা তিনি আমাদের যে পরিমাণ ঋণে আবদ্ধ রেখে গেছেন, তা পরিশোধ করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তাঁর স্মৃতি-তর্পণের দিনে আজ শুধু আমাদের সেই কথাই মনে পড়ে। ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজ-নীতি ও শিক্ষা-দীক্ষার মধ্য দিয়া বর্ত্তমানে আমাদের দেশে যে জাতীয় অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছে, রাজা রামমোহন ছিলেন তার প্রবর্ত্তক। মোগলের গৌরব-রবি যখন অস্তমিত হয়ে গেল, 'বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল', দেশের সেইক্ষণে রামমোহনের আবির্ভাব হয়েছিল। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংঘাতে জাতীয় জীবনের গতি তখন কোন পথে চালিত করা হবে, রাজা রামমোহন তা নির্দ্দেশ করে গেছেন। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কটকে এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় বলেছেন, তিনি ঐক্য ও সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে সাম্য ও মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ····· উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাচ্যে রাজা রামমোহন ও প্রতীচ্যে গ্যেটের ন্যায় মনীষী আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নি। গান্ধীজীও বলেছেন — হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সংস্কারকগণের মধ্যে রাজা রামমোহন অন্যতম। আজ তাঁর স্মৃতি-তর্পণের দিনে আমরাও সেই স্বর্গত মহাত্মার বিরাট অবদানের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞচিত্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

বস্ত্র-শিল্প-সংরক্ষণ আইন

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত বস্ত্র-শিল্প-সংরক্ষণ বিলটী রাষ্ট্রীয় পরিষদে পাশ হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কমার্স সেক্রেটারী বলেন, যে সময় জাপান ও ইংরাজ বস্ত্রব্যবসায়িগণের সহিত ভারতের বস্ত্রব্যবসায়িগণের আপোষ-মীমাংসার একটা সুযোগ এসেছে তখন তাঁরা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তা না দেখে পূর্ব্বাহ্ণেই এ বিষয়ে আলোচনা করা বোধহয় খুব সমীচীন হবে না। কারণ এই সম্মিলনীর আলোচনার ফলে শুল্ক সম্বন্ধে বোধহয় বিশিষ্ট পরিবর্ত্তন লক্ষিত হতে পারে। এ জন্ত আগামী মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বিলটী বলবৎ রাখার কথা বলা হয়। লালা মথুরাপ্রসাদ ও শ্রীযুক্ত জগদীশ ব্যানার্জ্জি তা সমর্থন করেন। অতঃপর বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের

প্রেসিডেন্ট মিঃ হেণ্ডারসন বলেন যে, আপ-ভারতের সমস্যা সমাধানেরই ফলাফল বিশ্ব-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থার পরিবর্ত্তন করবে। বিলটী গৃহীত হয়েছে।

ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘ

সম্প্রতি সমবায় ম্যানসনে সংবাদপত্রসেবিগণের যে একটী সঙ্ঘ গঠিত হয়েছে, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী মহাশয় তার উদ্বোধন করেছেন। উৎসব-বাসরটী নানা পুষ্প-পল্লবে সুচারুরূপে সজ্জিত করা হয়েছিল। বহু সংবাদ-পত্রসেবী ও সুধী সম্প্রদায়ের আগমনে সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবী সঙ্ঘের সভাপতি শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত মহাশয় তাঁর অভিভাষণে সভাস্থ সকলের নিকট কাশিমবাজারের উদারতা ও বদান্যতার পরিচয় প্রদান করেন ও ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের ব্যবহারের জন্য সমবায় ম্যান্সানের একটী কক্ষ ছেড়ে দেওয়ায়, সমিতির পক্ষ হতে মহারাজা বাহাদুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। মহারাজা তাঁর বক্তৃতায় 'জনমত গঠনে সংবাদ-পত্রসেবার স্থান' শীর্ষক সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, 'সংবাদপত্র-সেবার মর্য্যাদা প্রত্যেক জাতির একটী গৌরবের বিষয়; দেশবাসীদের দ্বারা দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনে সংবাদপত্রের বিশেষ স্থান রয়েছে।' জনমত গঠন করে সংবাদপত্রগুলি দেশের শাসন-কার্য্য পরিচালনে কি অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করে, অন্যান্য স্বাধীন দেশের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে আমরা তা বুঝতে পারি। বিলাত এবং অন্যান্য স্বাধীন দেশের প্রত্যেক বিশিষ্ট দলের মুখ-পত্র স্বরূপ এক একটী সংবাদপত্র আছে। ইহার প্রয়োজ-নীয়তা সম্বন্ধেও বোধহয় কারও সন্দেহ থাকতে পারে না। দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ করে যাতে বিভিন্ন মতাবলম্বী সংবাদপত্রসেবিগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও সখ্যস্থাপন হতে পারে, সে পথে এ সমিতির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আমরা বুঝতে পারি।

আমরা এই সঙ্ঘের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

স্বর্গীয় বিজ্ঞানাচার্য্য
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৩৩ সালের ২-রা নভেম্বর হাওড়ার অন্তর্গত পাইকপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আগামী ২-রা নভেম্বর এই ক্ষণ-জন্মা মহাপুরুষের শত-বার্ষিকী জন্মতিথির উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য চারিদিকে আয়োজন হচ্ছে। ভারতে
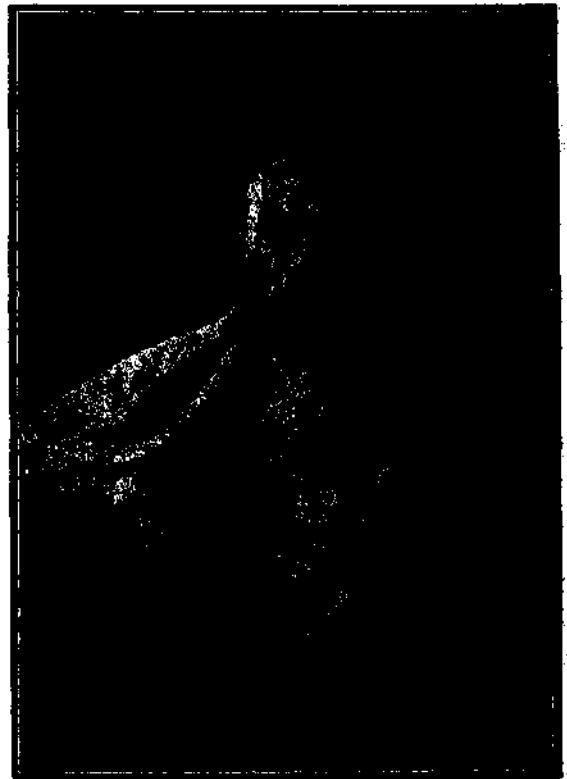
স্বর্গীয় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

বিজ্ঞানশিক্ষার পথ সুগম করবার জন্যই তিনি যেন জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এদেশে হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসার প্রচার কল্পে অশেষ চেষ্টা করেন। তাঁর

সে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, উন্নত চরিত্র, প্রখর বুদ্ধি, নির্ভীক সরলতা ও তেজস্বিতা আর গভীর জ্ঞানস্পৃহা আজ তাঁর দেশবাসীকে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করবে সন্দেহ নেই। তিনি এত কোমলহৃদয় ছিলেন যে, দুঃখ-বেদনা দেখলে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়তেন। দেওঘরের 'রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম' তারই উৎকৃষ্ট নিদর্শন। তৎকালীন 'হিন্দু পেট্রিয়টে' তাঁর সম্বন্ধে লেখা আছে—

"Whether as a professional man or as a scientist, whether as a legislator or as a public man, whether as a municipal commissioner or as a sheriff, whether as a journalist or as an accomplished public speaker, whether as a magistrate or as a senator, his services to the country were immense, varied and long." এই মহাপুরুষের শত-বার্ষিকী-স্মৃতি-পূজার উৎসবে সকলে যোগদান করে এ অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলবেন — এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

ওরিয়েণ্টাল গ্লাস ওয়ার্কস্

আমরা সম্প্রতি 'ওরিয়েণ্টাল গ্লাস ওয়ার্কসে'র কারখানা দেখে বিশেষ প্রীতিলাভ করেছি। এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের তৈরী কাঁচের জিনিষ দেখলে এগুলি যে বিদেশজাত দ্রব্যের চেয়ে হীন, তা মনে হয় না। স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করবার জন্য যখন দেশে বেশ আন্দোলন দ্রুতভাবে চলছে, তখন এই প্রতিষ্ঠান যাতে দেশবাসীর কাছ থেকে শুধু অবহেলা না পায়, তা সকলের দেখা দরকার। প্রতিষ্ঠানের নির্ম্মিত দ্রব্যের বহুল প্রচলন কামনা করি।

ছবিঘর

আমরা সম্প্রতি ছবিঘরে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এই প্রেক্ষা-গৃহের সভামণ্ডপ (auditorium) আমাদের বেশ তৃপ্ত করেছে। ইহার বাক্-যন্ত্র-প্রণালী সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের। এই যন্ত্রের শব্দোচ্চারণ বেশ স্পষ্টভাবেই হয়ে থাকে। চিত্রনির্ব্বাচন ও তত্ত্বাবধানে স্বত্বাধিকারী মহাশয় বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। আমরা এই চিত্রগৃহের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

বালী বঙ্গ-শিশু বিদ্যালয়

গত ৭ই আশ্বিন আমরা বালীর বঙ্গ-শিশু বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণের শিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। শিশুদের অঙ্কিত চিত্রাবলী প্রভৃতি আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। শিশু-মনের অন্তরালে যে ভাবধারা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, তাকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এই যে আয়োজন করেছিলেন, তজ্জন্য তাঁরা সকলের ধন্যবাদার্হ, সন্দেহ নেই। তাই কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয়ের জন্য আশীর্ব্বাদলিপি পাঠিয়েছিলেন —

"ভারি কাজের বোঝাই তরী
  কালের পারাবারে
পাড়ি দিতে গিয়ে কখন্
  ডোবে আপন ভারে।
তার চেয়ে মোর হাল্কা তুলির
  লেখন ভেসে ভেসে
হয় তো দুলে ঢেউয়ের দোলায়
  লাগবে কূলে এসে।"

'উদয়নে'র গল্প-প্রতিযোগিতা

বর্ত্তমান সংখ্যায় 'উদয়নে'র গল্প-প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ করবার কথা ছিল; কিন্তু গল্পের সংখ্যাধিক্য বশতঃ আমাদের সম্পাদক-সঙ্ঘের বিচারক মণ্ডলী এখনও তাঁদের বিচার শেষ করতে পারেন নি। সুতরাং এ সংখ্যায় প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশ করতে না পেরে আমরা দুঃখিত।

'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প'

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ 'উদয়নে' প্রকাশিত হ'য়েছে। প্রেসিডেন্সী কলেজের 'রবীন্দ্র পরিষদে' এটী পঠিত হয়েছিল।

অগ্রহায়ণ
১৩৪৫

প্রথম বর্ষ
অষ্টম সংখ্যা
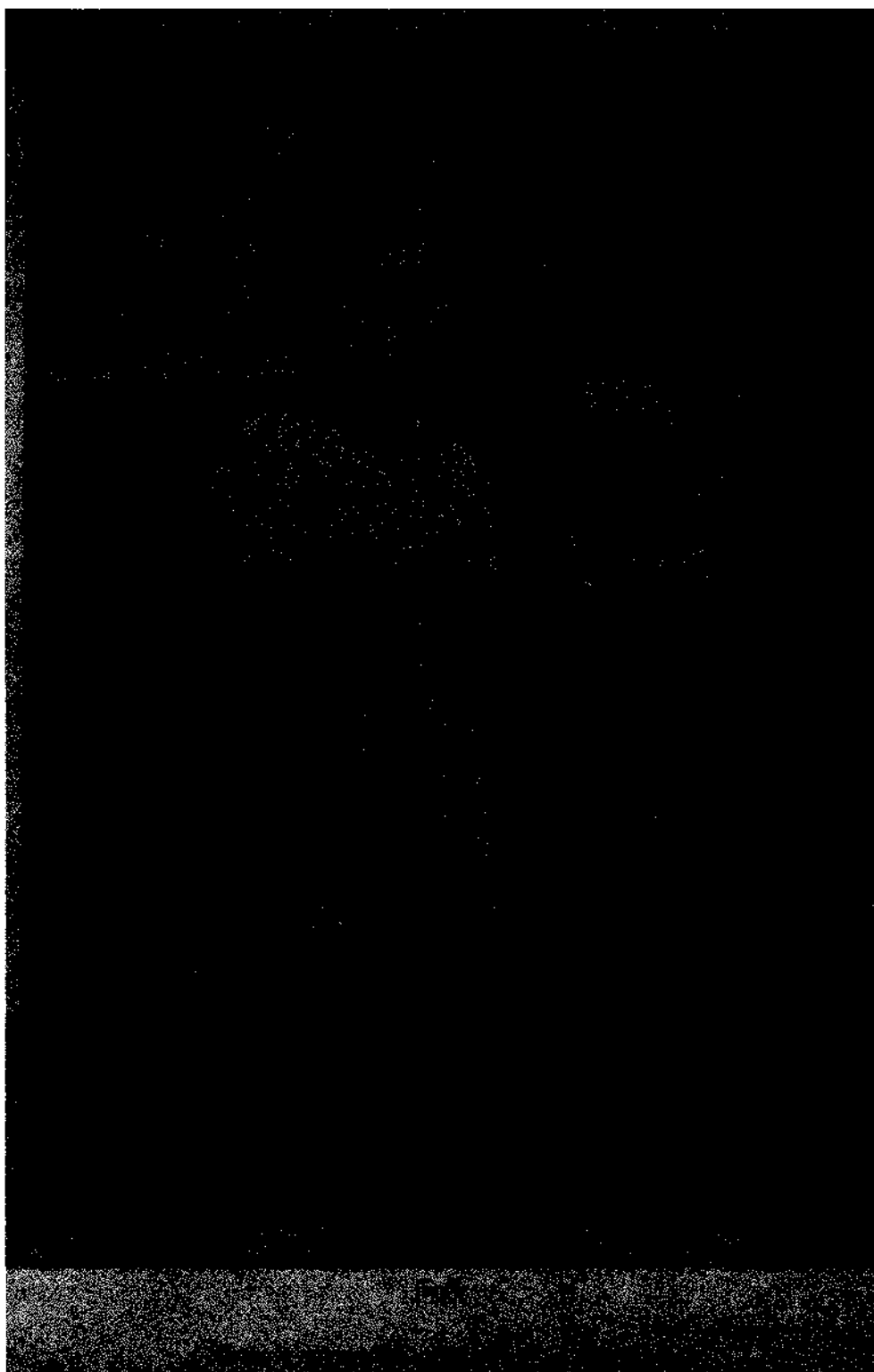
মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

রবীন্দ্রনাথ সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী কবি, "জগতে আনন্দ-যজ্ঞে" তিনি প্রধান পুরোহিত। তাই তাঁহার নিকট কোনও ব্যাপারই আনন্দহীন বলিয়া প্রতিভাত হয় না। যে মৃত্যুর ভয়ে জগৎবাসী সন্ত্রস্ত, সেই মৃত্যুকেও তিনি অভয়-মূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন, এবং মৃত্যুর বিভীষিকা মোচন করিয়া মৃত্যুকেও সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন।

কিশোর কবি রাধার বেনামী মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।

[ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী।

কারণ মৃত্যুতে সকল সন্তাপ দূর হইয়া যায়। আর বাস্তবিক মৃত্যু তো কোথাও নাই।—

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।"

* * *

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে,
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি।
চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।

* * *

জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ।

[প্রভাত-সঙ্গীত; অনন্ত জীবন।

মহাজীবন হইতে উৎপন্ন ব্যক্তি-জীবন যেন অগ্নি-জ্বালা হইতে বিনির্গত বিস্ফুলিঙ্গ, তাহা যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাতেই লয় পাইয়া নির্বাণ লাভ করে। আর পার্থিব জীবনই তো এক মাত্র জীবন নহে, আর এই জীবনও তো মরণের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু নহে, প্রতি পলে কত পরিবর্ত্তন ঘটে এই দেহের অন্তরালে, শৈশবের পরে যৌবন ও যৌবনের পরে বার্দ্ধক্য এবং বার্দ্ধক্যের পর দেহান্তর একই মৃত্যুর শৃঙ্খল-পরম্পরা।

যতটুকু বর্তমান তারেই কি বলো প্রাণ?
সে তো শুধু পলক নিমেষ।

অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে রয়েছে তার
কোথাও নাহিক তার শেষ !
যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ ম'রে গেছি,
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোরা মরণের ঘরে থাকি,
জানিনে মরণ কারে বলে !

* * *

মৃত্যুরে হেরিয়া কেন কাঁদি ।
জীবন তো মৃত্যুর সমাধি !

জীবন-মরণ তো কেবল ইহলোকের ব্যাপার নহে, তাহা লোক-লোকান্তরের একটি সংলগ্ন ঘটনা—

কবে রে আসিবে সেই দিন—
উঠিব সে আকাশের পথে,
আমার মরণ-ডোর দিয়ে
বেঁধে দেবো জগতে জগতে ।

[প্রভাত-সঙ্গীত ।

কারণ—

অস্তিত্বের চক্রতলে একবার বাঁধা প'লে
পায় কি নিস্তার ?

[চিত্রা, মৃত্যুর পরে ।

এই মরণ-যাত্রায় কাহারও সহিত কাহারও বিচ্ছেদ হয় না, কারণ সকলেই মরণ-যাত্রী, কেহ আগে আর কেহ পিছে চলিয়াছে মাত্র, মহাযাত্রা-পথে আবার লোক-লোকান্তরে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিয়া যাওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব নহে'।

তোরাও আসিবি সবে উঠিবি রে দশ দিকে,
এক সাথে হইবে মিলন,
ডোরে ডোরে লাগিবে বাঁধন ।

জীব অণুচৈতন্ত, মহাপ্রাণ বিভুচৈতন্ত । অণু ক্রমাগত বিভুত্ব লাভের সাধনা করিয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে ।

অণু মাত্র জীব আমি কণা মাত্র ঠাঁই ছেড়ে
যেতে চাই চরাচরময় ।

এ আশা হৃদয়ে জাগে তোমারই আশ্বাস-বলে,
মরণ, তোমার হোক জয় ।

[প্রভাত-সঙ্গীত, অনন্ত মরণ ।

বিশ্বজগৎ নাবিক, আমরা তাহার যাত্রী পথিক, আমরা প্রবাসী, অনন্তের মিলন-প্রয়াসী হইয়া অভিসারে যাত্রা করিয়া চলিয়াছি ।

গাও বিশ্ব গাও তুমি
সুদূর অদৃশ্য হতে,
গাও তব নাবিকের গান—
শত লক্ষ যাত্রী লয়ে
কোথায় যেতেছ তুমি
তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান ।

[ছবি ও গান, পূর্ণিমায় ।

আমাদের জীবনের খণ্ডতা কেবল আমাদের পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক বোধ মাত্র, কিন্তু আসলে—

আকাশ-মণ্ডপে শুধু ব'সে আছে এক "চির-দিন" ।

[কড়ি ও কোমল, চির-দিন ।

"আমাদের দৃষ্টির ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, তাই আমরা মরণকে ভয় করি । আমরা ভাবি মৃত্যু বুঝি জীবনের শেষ । কিন্তু দেহটাই আমাদের বর্তমানে সমাপ্ত, জীবনটা একটা চঞ্চল অসমাপ্তি, তাহার সঙ্গে লাগিয়া আছে, তাহাকে বৃহৎ ভবিষ্যতের দিকে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে ।" [পঞ্চভূত, মনুষ্য ।

আমাদের অধিষ্ঠান ভূমার মধ্যে । যাহা ভূমা তাহা সত্য, তাহা অমৃত । তাই আমার মরণ নাই । মৃত্যু বলিয়া প্রতীয়মান অবস্থা জীবনেরই প্রকারান্তর মাত্র ; অসম্পূর্ণ জীবনের সম্পূর্ণতা লাভের সহায় ও উপায় মরণ । এই সীমাবদ্ধ জীবনে যাহা অপূর্ণ অপ্রাপ্ত থাকে, তাহার সম্পূরণ হয় মরণে । মৃত্যুর পুত ধারায় ইহ জীবনের সকল দ্বন্দ্ব, বিরোধ, গ্লানি ধৌত হইয়া যায়, তাহার পরে অনন্ত জীবন, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ ।

জীবনে যত পূজা হলো না সারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা । [গীতাঞ্জলি ।

জীব তাহার জীবনের অস্তিত্ব অনুভব করে পরিবর্ত্তন-পরম্পরার ভিতর দিয়া, এবং সেই পরিবর্ত্তনেরই নামান্তর মৃত্যু। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণ মাতৃগর্ভে বাস করিবার সময় মাতাকে চিনে না, কিন্তু মাতৃক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিবা-মাত্রই মাতাকে আপনার সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় বলিয়া চিনিয়া লয়, তেমনি আমরা মৃত্যুকে অপরিচয়ের জন্য বৃথা ভয় করি, কিন্তু মৃত্যু জীবের পরমাত্মীয়, সে আত্মার প্রণয়ী। মৃত্যু প্রাণের প্রণয় লাভের জন্য দিবা-রাত্রি সাধনা করিতেছে, তাহার মন হরণ করিবার জন্য তাহার নিরন্তর অবিশ্রাম আরাধনা চলিতেছে, মৃত্যুর চঞ্চলা প্রেয়সী প্রথমে তাহার কাছে ধরা দিতে চাহে না, কিন্তু অবশেষে তাহাদের মনোমিলন ঘটিয়া যায়।—

চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায়,
স্থির নাহি থাকে,
মেলি নানাবর্ণ পাখা উড়ে উড়ে চ'লে যায়
নব নব শাখে।
তুই তবু একমনে মৌনব্রত একাসনে
বসি' নিরলস,
ক্রমে সে পড়িবে ধরা, গীত বন্ধ হয়ে যাবে,
মানিবে সে বশ।
* * *
ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জ্জন শয়নপ্রান্তে
এসো বরবেশে,
আমার পরাণ-বধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু; তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি' নিয়ো;
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে
পাণ্ডু করি' দিয়ো।

[সোনার তরী, প্রতীক্ষা।

মৃত্যুকে যাহারা ভালো করিয়া চিনিয়া উঠিতে পারে নাই তাহারা তাহাকে ভীষণ মনে করে, কিন্তু যাহার সহিত মৃত্যুর মনোমিলন ঘটে, যাহার প্রাণ সে হরণ করে, সে তাহার মনোহারিত্ব বুঝিয়া তাহার মিলনের জন্য সমুৎসুক হইয়াই থাকে—

শুনি' শ্মশানবাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
* * *
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি' কর,
ক্ষেপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

[উৎসর্গ, মরণ।

যে মৃত্যু লাভ করিয়াছে সে তো সমাপ্ত হইয়া যায় নাই,—

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখ তারে সর্ব্ব দৃশ্যে
বৃহৎ করিয়া।

[চিত্রা, মৃত্যুর পরে।

আমার জীবন তো আমার এই দেহটির মধ্যেই পরিসমাপ্ত নহে, তাহা নব নব কলেবরে আমার হইয়া আমাকে আমিত্বের আস্বাদ জানাইতেছে ও জানাইবে। আমার জন্ম হইতে জীবন মৃত্যুর অভিসারে চলিয়াছে, সে কি আজিকার ঘটনা? সে যে

শত জনমের চির-সফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী।

[চিত্রা, অন্তর্য্যামী।

কবির জীবনদেবতা যদি তাঁহার ইহ জীবনে সম্পূর্ণ সার্থকতার আনন্দ না পাইয়া থাকেন, তবে তাহাতেই বা দুঃখ বা নিরাশ্বাস হইবার কি আছে—

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আর বার
চির-পুরাতন মোরে।

নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবন-ডোরে।
[চিত্রা, জীবনদেবতা।

অনন্ত-পথ-যাত্রী মানব তাহার যাত্রা-পথের একটি আতিথ্যস্থান ছাড়িয়া যাইতে কাতর হয়, সঙ্গীদের ছাড়িয়া যাইতেছে মনে করিয়া ভয় পায়, কিন্তু সে তো চির একাকী,—

তখনো চলেছ একা অনন্ত ভুবনে,
কোথা হতে কোথা গেছ না রহিবে মনে।
[চৈতালী, যাত্রী।

এবং নব নব পরিচয়ের ভিতর দিয়া তাহার যাত্রা—

পুরাণো আবাস ছেড়ে যাই যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে কথা ভুলিয়া যাই।

জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখনি যেখানে লবে,
চির জনমের পরিচিত ওহে,
তুমিই চিনাবে সবে। [গান।

যিনি জীবন-মরণের বিধাতা তিনি প্রাণের সহিত মরণের "ঝুলন" ও "দোল" খেলা খেলিতেছেন,—তিনি প্রাণকে দোলা দিয়া মরণে জীবনে চালাচালি করেন,

পলকে আলোকে তুলিছ, পলকে
আঁধারে নিতেছ টানি'।
* * *
ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।

তাহাতে

আছে তো যেমন যা ছিল।
হারায় নি কিছু, ফুরায় নি কিছু,
যে মরিল, যে বা বাঁচিল।
[উৎসর্গ, মরণ-দোলা।

মৃত্যু পরম কারুণিক, সকলের ভেদ ঘুচাইয়া সমতা সম্পাদনের সহায়—

ইহ সংসারে ভিখারীর মতো
বঞ্চিত ছিল যেজন সতত,
করুণ হাতের মরণে তাহারে
বরণ করিয়া নিলে।
* * *
রাজা মহারাজ যেথা ছিল যারা,
নদী গিরি বন রবি শশী তারা,
সকলের সাথে সমান করিয়া
নিলে তারে এ নিখিলে।
[মোহিত সেন সংস্করণ, মরণ, বরণ।

রাজা প্রজা হবে জড়ো,
থাকবে না আর ছোট বড়,
একই স্রোতের মুখে ভাস্‌ব সুখে
বৈতরণীর নদী বেয়ে। [প্রায়শ্চিত্ত।

মৃত্যুভীতি নবোঢ়ার প্রণয়ভীতির তুল্য, কিন্তু একবার প্রণয়ীর সহিত পরিচয় হইয়া গেলে আর ভয় থাকে না—

প্রথম-মিলন-ভীতি ভেঙেছে বধূর,
তোমার বিরাট মূর্তি নিরখি মধুর।
সর্বত্র বিবাহ-বাঁশি উঠিতেছে বাজি',
সর্বত্র তোমার ক্রোড় হেরিতেছি আজি।

জন্মের পূর্বে এই দেহ ও সংসার জীবের অজ্ঞাত থাকে, তাহার সঙ্গে পরিচয় হওয়া মাত্র তাহাদের

নিমেষেই মনে হলো মাতৃবক্ষ সম
নিতান্তই পরিচিত একান্তই মম।

তেমনই "মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর!"—

জীবন আমার
এত ভালোবাসি ব'লে হয়েছে প্রত্যয়,
মৃত্যুরে এমনি ভালোবাসিব নিশ্চয়।
স্তন হতে তুলে নিলে শিশু কাঁদে ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে॥

ইহলোক ও পরলোক দুইই বিশ্বমাতার অমৃতপূর্ণ স্তন, আর মৃত্যু—

সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি'।

[সোনার তরী, বন্ধন।

নিজের মরণে যেমন ভয় বা দুঃখের কোনও কারণ নাই, প্রিয়জনের মৃত্যুতেও তেমনই কোনও ক্ষোভের কারণ নাই—

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা হলে
প্রাণ করে হায় হায়।

কিন্তু—

তোমাতে রয়েছে কত শশী ভানু,
কভু না হারায় অণু পরমাণু।

[নৈবেদ্য।

যখন মৃত্যু আমাকে পরলোকে লইয়া যাইবে, তখন—

একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া
তোমারে হেরিব একা ভুবন-ভুলিয়া।

[নৈবেদ্য।

মৃত্যু তো ইহলোক হইতেও চিরবিদায় বা চিরনির্ব্বাসন নহে। দেহ ও আত্মা দুইই তো এখানেই নানা আকারে রহিয়া যায়।—মৃত্যুতে হারাইয়া যাওয়া খোকা হাওয়ায়, জলে, অন্ধকার আর চাঁদের আলোয় মায়ের কাছে আসা-যাওয়া করে, সে স্বপ্নের ফাঁকে মায়ের মনের মধ্যে আবির্ভূত হয়। তাই খোকা মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছে—

মাসী যদি শুধায় তোরে—
খোকা তোমার কোথায় গেল চলে'।
বলিস—খোকা সে কি হারায়,
আছে আমার চোখের-তারায়,
মিলিয়ে আছে আমার বুকে কোলে।

[শিশু, বিদায়।

শাজাহানের প্রেয়সী কেবল তাজমহলের সমাধিতলে ছিলেন না, তিনি শাজাহানের নিকট সর্ব্বব্যাপিনী—

সেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিঃশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।

[বলাকা, সাজাহান।

প্রিয় যখন মৃত্যুতে নয়ন-সমুখ হইতে অপসারিত হইয়া যায়, তখনও সে অন্তর্হিত হয় না।—

নয়ন-সমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

[বলাকা, ছবি।

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহু-ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

[প্রবাহিণী।

বলাকার উড়িয়া চলা দেখিয়া কবির—

মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

মৃত্যুর প্রেম সর্ব্বনাশা, তাই সে ক্রমাগত প্রাণ হইতে

প্রাণে টানিয়া নব নব সুধাপাত্র আস্বাদন করাইয়া লইয়া চলে,—

সর্ব্বনাশা প্রেম তার, নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
[বলাকা, নদী।

কালের "মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে।" সেই মহাকাল প্রত্যেককে

ডাক দিল শোন মরণ-বাঁচন-নাচন-সভার ডঙ্কাতে।
[প্রবাহিণী।

তাই আমরা সকলেই এখানে প্রবাসী, তাই কবি সুদূরের পিয়াসী হইয়া বলিয়াছেন—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
[উৎসর্গ, প্রবাসী ও সুদূর।

বয়সের জীর্ণপথশেষে মরণের সিংহদ্বার পার হইয়া নবজীবন ও নবযৌবন লাভের আহ্বান আমাদের কাছে নিরন্তর আসিতেছে, কিন্তু আমাদের অজানাকে ভয় লাগে। কিন্তু কবি বলিতেছেন—

অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে।
অচেনাকেই চিনে চিনে
উঠ্‌বে জীবন ভ'রে।
জানি জানি আমার চেনা
কোনো কালেই ফুরাবে না,
চিহ্নহারা পথে আমায়
টান্‌বে অচিন ডোরে।

ছিল আমার মা অচেনা,
নিল আমায় কোলে।
সকল প্রেমই অচেনা গো,
তাই তো হৃদয় দোলে। [গীতালি।

মৃত্যুর প্রেমাভিসারেই জীবনের মহাযাত্রা—

আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
র'ব না ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি তো বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার
বার্দ্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন।
ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি। [বলাকা।

কবি বলেন—

আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ।
[বলাকা।

এবং সেই জন্য তিনি নির্ভয়ে বলিতে পারিয়াছেন—

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?
জয় অজানার জয়! [প্রবাহিণী।

সেই অজানা মৃত্যুর ভিতর দিয়া—

চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি'।
[বলাকা।

মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া—

বলো অকম্পিত বুকে,—
তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।
[বলাকা।

মৃত্যু তো মানবের—

বহু শত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

জীবের জীবন লইয়া

দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,
মন তাহাদের ঘূর্ণা-পাকের হাওয়া;
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চল্‌ছে নিরাকার। [বলাকা।

জগতে কিছুই শেষ হয় না, কারণ শেষ তো অশেষেরই অংশ—

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বল্‌বে।

* * *

ফুরায় যা, তা

ফুরায় শুধু চোখে,

অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার

যায় চ'লে আলোকে।

পুরাতনের হৃদয় টুটে

আপনি নূতন উঠ্‌বে ফুটে,

জীবনে ফুল ফোটা হলে

মরণে ফল ফল্‌বে। [গীতালি।

শেষের মধ্যে অশেষ আছে

এই কথাটি, মনে

আজকে আমার গানের শেষে

জাগ্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে।

[গীতাঞ্জলি।

হে অশেষ, তব হাতে শেষ

ধরে কী অপূর্ব্ব বেশ!

কী মহিমা!

জ্যোতির্হীন সীমা

মৃত্যুর অগ্নিতে জ্বলি'

যায় গলি',

গ'ড়ে তোলে অসীমের অলঙ্কার।

[পূরবী, শেষ।

কবি বলেন— "মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাকে।"

[পূরবী, মৃত্যুর আহ্বান।

এবং "অসীম ঐশ্বর্য্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্ব্বনাশ।"

[পূরবী, কঙ্কাল।

"সৃষ্টিকর্ত্তা" যিনি

তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে

ডাকিছেন সর্ব্বহারা মিলনের প্রলয়-তিমিরে।

[পূরবী, সৃষ্টিকর্ত্তা।

সৃষ্টিকর্ত্তার এই ডাক কেন, না—

জীবন সঁপিয়া, জীবনেশ্বর,

পেতে হবে তব পরিচয়।

[পূরবী, সুপ্রভাত।

ক্লান্ত হতাশ জনকে কবি বারংবার আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—

নামিয়ে দে রে প্রাণের বোঝা,

আরেক দেশে চল রে সোজা,

নতুন ক'রে বাঁধ্‌বি বাসা,

নতুন খেলা খেল্‌বি সে ঠাঁই।

[বৌঠাকুরাণীর হাট।

ভগবান অনন্ত, আর তাঁহার সৃষ্ট জীবনও অনন্ত ও অনাদিপ্রবাহ—

সকলেরে কাছে ডাকি' আনন্দ-আলয়ে থাকি'

অমৃত করিছ বিতরণ,

পাইয়া অনন্ত প্রাণ জগৎ গাইছে গান

গগনে করিয়া বিচরণ।

* * * *

জাগে নব নব প্রাণ, চির-জীবনের গান

পূরিতেছে অনন্ত গগন।

পূর্ণলোক-লোকান্তর প্রাণে মগ্ন চরাচর

প্রাণের সাগরে সন্তরণ।

জগতে যে দিকে চাই বিনাশ বিরাম নাই

অহরহ চলে যাত্রিগণ।

[গান।

প্রত্যেক খণ্ড জীবন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আদি কাল হইতে রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিয়া চলিয়াছে।—

জানি জানি কোন আদি কাল হতে

ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে।

সেই আদি কাল কি অল্পকাল?—

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—

সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়।

মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে এই জন্য যে, তাহার আহ্বানে সংসার ছাড়িয়া যাইবার সময় আমাদের সব প্রিয় সামগ্রী পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু মরণ তো রিক্ত নয়।

কে বলে সব ফেলে যাবি
মরণ হাতে ধরবে যবে।
জীবনে তুই যা নিয়েছিস,
মরণে সব নিতে হবে।

অতএব মৃত্যু যখন সমারোহ করিয়া প্রিয়সমাগমের জন্য আসে তখন—

রাজার বেশে চল রে হেসে
মৃত্যুপারের সে উৎসবে।

বর যেদিন বধূকে বরণ করিয়া লইতে আসিবে, সেদিন তো তাহাকে শূন্যহাতে বিদায় করিলে চলিবে না, তাহাতে প্রণয়ের অপমান হইবে যে।

মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে,
সেদিন তুমি কি ধন দিবে উঁহারে।
ভরা আমার পরাণখানি
সম্মুখে তার দিব আনি,
শূন্য বিদায় করব না তো উঁহারে,—
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

মৃত্যু-বরের জন্য জীবন-বধূ মিলনোৎসুক হইয়া সর্বক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকে—

সারা জনম তোমার লাগি'
প্রতিদিন যে আছি জাগি',

*   *   *

যা পেয়েছি, যা হয়েছি,
যা কিছু মোর আশা,
না জেনে ধায় তোমার পানে
সকল ভালোবাসা।
মিলন হবে তোমার সাথে,
একটি শুভ দৃষ্টিপাতে,
জীবন-বধূ হবে তোমার
নিত্য অনুগতা,

*   *   *

সেদিন আমার রবে না ঘর,
কেই বা আপন, কেই বা অপর,
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা। [গীতাঞ্জলি।

আমি অনাদি, আমার জন্য অনাদি কাল প্রতীক্ষা করিতেছে, মৃত্যু সেই অনাদি মহাকালেরই মিলনদূত,—সেই জন্য আমার অভিসারও অনাদি অনন্ত,—

তোমার অন্ত নাই গো অন্ত নাই।

তাই

তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর,
যবে আমার জনম হবে ভোর।
চ'লে যাব নবজীবনলোকে,
নূতন দেখা জাগ্‌বে আমার চোখে,
নবীন হয়ে নূতন সে আলোকে
পরব তব নবমিলন-ডোর।

মরণযাত্রায় তো মানব একাকী যাত্রী নয়, তাহার সঙ্গে তাহার বিধাতাও যে সহযাত্রী,—

যবে মরণ আসে নিশীথ গৃহদ্বারে,
যবে পরিচিতের কোল হতে সে কাড়ে,
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেছ।

[গীতিমাল্য।

আমাদের সংসার-বন্ধন ছাড়িয়া যাইতে ক্লেশ বোধ হয়, তাই মৃত্যু সেই বন্ধন মোচন করিয়া আমাদিগকে আমাদের প্রিয়তমের সকাশে লইয়া যায়, কাজেই মৃত্যু ভয়ানক নহে, সে আমাদের আনন্দস্বরূপ।—

মৃত্যু নহে রে জীবন ছিঁড়া,
তুমি আমার আনন্দ।

আমার জীবনদেবতার সহিত মিলন হইবে বলিয়াই আমার প্রাণবধূ স্বয়ম্বরা হইয়া মৃত্যুর পথে অভিসারিকা—

চল্‌ছে ভেসে মিলন-আশা-তরী
অনাদি স্রোত বেয়ে।
*　　　*
তোমায় আমায় মিলন হবে ব'লে
যুগে যুগে বিশ্বভুবন-তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির স্বয়ম্বরা।　　　[গীতিমাল্য।

আমি যে এই অঙ্গ ধারণ করিয়া আমার প্রাণকে আশ্রয় দিয়া প্রকাশ করিয়াছি,

সে যে　প্রাণ পেয়েছে পান ক'রে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য,
ভুবন　কত তীর্থ-জলের ধারায় করেছে তায় ধন্য।
[গীতিমাল্য।

মৃত্যু যদি না থাকিত তাহা হইলে জীবনই থাকিতে পারিত না, মৃত্যুর দ্বারাই আমরা জীবনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি—

মরণকে প্রাণ বরণ ক'রে বাঁচে।
[গীতালি।

এবং প্রত্যেক জীব—

বহিল　মরণ-রূপী জীবন-স্রোতে।
সে যে ঐ　ভাঙা-গড়ার তালে তালে
নেচে যায়　দেশে দেশে কালে কালে॥
[গীতিমাল্য।

"সবাই যারে সব দিতেছে", সেই আমাদের প্রিয়তম আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিবার জন্য

মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আস্‌ছে জীবন-মাঝে,
ও যে　আস্‌ছে বীরের সাজে।

সেই প্রিয়তমকেই বল্‌তে হবে—

মরণ-স্নানে ডুবিয়ে শেষে
সাজাও তবে মিলন-বেশে,
সকল বাধা ঘুচিয়ে ফেলে
বাঁধ বাহুর ডোরে।　　　[গীতালি।

মরণই আমাদের জীবন-তরণীর কাণ্ডারী,—

মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই।

গানের রাজা কবি জীবন-মরণের দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইয়াছেন—

তোমার কাছে এ বর মাগি—
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।
যেম্‌নি নয়ন মেলি, যেন
মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পূরে
গানের সুরে।

মানুষের জীবন তো অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল ধরিয়া পথিক, কিন্তু সে চিরপুরাতন হইয়াও মৃত্যুর বরে চিরনূতন—

বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হলো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

কে বলে, "যাও যাও"—আমার
যাওয়া তো নয় যাওয়া।
টুট্‌বে আগল বারে বারে
তোমার দ্বারে
লাগ্‌বে আমায় ফিরে ফিরে ফিরে-আসার হাওয়া।
*　　*　　*
পথিক আমি, পথেই বাসা,
আমার　যেমন যাওয়া তেম্‌নি আসা।
ভোরের আলোয় আমার তারা
হোক না হারা,
আবার জ্বল্‌বে সাঁঝে আঁধার মাঝে তা'রি নীরব চাওয়া॥
[প্রবাহিণী।

কবি একদিন রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে—

পরজন্ম সত্য হলে
কি ঘটে মোর সেটা জানি।
আবার আমায় টান্‌বে ধ'রে
বাংলা দেশের এ রাজধানী।

[কণিকা, কর্ম্মফল।

কিন্তু কবি পরজন্মে স্থির বিশ্বাস করেন, তাই তিনি বলিয়াছেন—

আবার যদি ইচ্ছা করো
আবার আসি ফিরে
দুঃখ-সুখের ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে।

[গীতালি।

কবি লিখিয়াছেন —

"জগৎ-রচনাকে যদি কাব্য-হিসাবে দেখা যায়, তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে। যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেখানকার যাহা তাহা চিরকাল সেইখানেই যদি অবিকৃতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎটা একটা চিরস্থায়ী সমাধি-মন্দিরের মতো অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত। এই অনন্ত নিশ্চলতার চিরস্থায়ী ভার বহন করা প্রাণীদের পক্ষে বড় দুরূহ হইত। মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভীষণ ভারকে সর্ব্বদা লঘু করিয়া রাখিয়াছে এবং জগৎকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে। যেদিকে মৃত্যু সেই দিকেই জগতের অসীমতা। সেই অনন্ত রহস্যভূমির দিকেই মানুষের সমস্ত কবিতা, সমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত ধর্ম্মতন্ত্র, সমস্ত তৃপ্তিহীন বাসনা সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মতো নীড় অন্বেষণে উড়িয়া চলিয়াছে। — একে, যাহা প্রত্যক্ষ যাহা বর্ত্তমান তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রবল, — আবার তাহাই যদি চিরস্থায়ী হইত তবে তাহার একেশ্বর দৌরাত্ম্যের আর শেষ থাকিত না — তবে তাহার উপরে আর আপীল চলিত কোথায়? তবে কে নির্দেশ করিয়া দিত যে ইহার বাহিরেও অসীমতা আছে। অনন্তের ভার এ জগৎ কেমন করিয়া বহন করিত মৃত্যু যদি সেই অনন্তকে আপনার চিরপ্রবাহে নিত্যকাল ভাসমান করিয়া না রাখিত।

"মরিতে না হইলে বাঁচিয়া থাকিবার কোন মর্য্যাদাই থাকিত না। এখন জগৎসুদ্ধ লোক যাহাকে অবজ্ঞা করে সেও মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবনের গৌরবে গৌরবান্বিত।

"জগতের মধ্যে মৃত্যুই কেবল চিরস্থায়ী — সেইজন্য আমাদের সমস্ত চিরস্থায়ী আশা ও বাসনাকে সেই মৃত্যুর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমাদের স্বর্গ, আমাদের পুণ্য, আমাদের অমরতা, সব সেইখানে। যে-সব জিনিস আমাদের এত প্রিয় যে কখনও তাহাদের বিনাশ কল্পনাও করিতে পারি না, সেগুলি মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া জীবনান্তকাল অপেক্ষা করিয়া থাকি। পৃথিবীতে বিচার নাই, সুবিচার মৃত্যুর পরে; পৃথিবীতে প্রাণপণ বাসনা নিষ্ফল হয়, সফলতা মৃত্যুর কল্পতরুতলে। জগতের আর সকল দিকেই কঠিন স্থূল বস্তুরাশি আমাদের মানস আদর্শকে প্রতিহত করে, আমাদের অমরতা অসীমতাকে অপ্রমাণ করে — জগতের যে সীমায় মৃত্যু, যেখানে সমস্ত বস্তুর অবসান, সেইখানেই আমাদের প্রিয়তম প্রবলতম বাসনার, আমাদের শুচিতম সুন্দরতম কল্পনার কোনো প্রতিবন্ধক নাই। আমাদের শিব শ্মশানবাসী, — আমাদের সর্ব্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যুনিকেতনে।

"জগতের নশ্বরতাই জগৎকে সুন্দর করিয়াছে। এই জন্য মানুষের দেবলোকেও মৃত্যুর কল্পনা, — সতীর দেহত্যাগ, মদন-ভস্ম ইত্যাদি।"

[পঞ্চভূত।

"জীবনকে সত্য ব'লে জান্‌তে গেলে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের 'পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই ব'লে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস ক'রেও মৃত্যুর বিভীষিকায়

প্রতিদিন মরে। যে লোক নিজে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বন্দী করতে ছুটেছে, সে দেখ্‌তে পায় — যাকে সে ধরেছে সে মৃত্যুই নয়, — সে জীবন!"

ফাল্গুনী নাটকের অন্তরের কথা ইহাই।

যুবকদল যখন "জগতের সেই যে বিরাট বুড়ো যে অগস্ত্যের মতো পৃথিবীর যৌবন-সমুদ্র শুষে খেতে চায়" তাহাকে ধরিবার জন্য অভিযান করিয়া বাহির হইয়াছিল, তখন তাহারা বলাবলি করিতেছিল—

"বিদায়ের বাঁশিতে যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনি সকলের দিকে চোখ মেলি। আর দেখি বড় মধুর। যদি সবাই চ'লে চ'লে না যেত তা হলে কি কোনো মাধুরী চোখে পড়্‌ত। চলার মধ্যে যদি কেবলি তেজ থাক্‌ত তা হলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তা'র মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি। জগৎটা কেবল 'পাবো' 'পাবো' বল্‌ছে না,—সঙ্গে সঙ্গেই বল্‌ছে 'ছাড়বো' 'ছাড়বো'। সৃষ্টির গোধূলি-লগ্নে 'পাবো'র সঙ্গে 'ছাড়বো'র বিয়ে হয়ে গেছে রে—তাদের মিল ভাঙ্‌লেই সব ভেঙে যাবে।"

[ফাল্গুনী।

প্লাবন ব'হে যায় ধরাতে
বরণ-গীতে গন্ধে রে—
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবারই আনন্দে রে।

[গান।

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা।
দেখিসনে কি শুক্‌নো পাতা ঝরাফুলের খেলা।
যে ঢেউ ওঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে?
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগ্‌ছে সারা বেলা।

[অরূপ রতন।

মৃত্যু যে অবসান ও শেষ নহে তাহা কবি বারংবার বলিয়াছেন।—

"আমাদের মধ্যে একটা মূঢ়তা আছে; আমরা চোখে দেখা কানে শোনাকেই সব চেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। যা আমাদের ইন্দ্রিয়-বোধের আড়ালে প'ড়ে যায়, মনে করি সে বুঝি একেবারেই গেল। ইন্দ্রিয়ের বাইরে শ্রদ্ধাকে আমরা জাগিয়ে রাখ্‌তে পারিনে। আমার চোখে দেখা কানে শোনা দিয়েই তো আমি জগৎকে সৃষ্টি করিনি যে আমার দেখা-শোনার বাইরে যা পড়্‌বে তাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যাকে চোখে দেখ্‌ছি, যাকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে জান্‌ছি, সে যাঁর মধ্যে আছে, যখন তাকে চোখে দেখিনে, ইন্দ্রিয় দিয়ে জানিনে, তখনও তাঁরই মধ্যে আছে। আমার জানা আর তাঁর জানা তো ঠিক এক সীমায় সীমাবদ্ধ নয়। আমার যেখানে জানার শেষ সেখানে তিনি ফুরিয়ে যাননি। আমি যাকে দেখ্‌ছিনে, তিনি তাকে দেখ্‌ছেন—আর তাঁর সেই দেখায় নিমেষ পড়্‌ছে না।"

[শান্তিনিকেতন, দ্বাদশ খণ্ড, মাতৃশ্রাদ্ধ।

"আমি ব'লে যে কাঙালটা সব জিনিসকেই গালের মধ্যে দিতে চায়, সব জিনিসকেই মুঠোর মধ্যে পেতে চায়, মৃত্যু কেবল তাকেই ফাঁকি দেয়—তখন সে মনের খেদে সমস্ত সংসারকেই ফাঁকি ব'লে গাল দিতে থাকে—কিন্তু সংসার যেমন তেমনই থেকে যায়, মৃত্যু তার গায়ে আঁচড়টি কাট্‌তে পারে না। অতএব মৃত্যুকে যখন কোথাও দেখি তখন সর্ব্বত্রই তাকে দেখ্‌তে থাকা মনের একটা বিকার। যেখানে অহং সেইখানেই কেবল মৃত্যুর হাত পড়ে, আর কোথাও না। জগৎ কিছুই হারায় না, যা হারাবার সে কেবল অহং হারায়।"

[শান্তিনিকেতন, সপ্তম খণ্ড, মৃত্যু ও অমৃত।

তাই কবি বলিয়াছেন—

যখন আমার আমি
ফুরায়ে যায় থামি',
তখন আমার তোমাতে প্রকাশ।

এবং মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি' বহিছে যেই প্রাণ,
সেই তো তোমার প্রাণ।
[গীতালি।

প্রাণ যে মুক্তধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিতে পারিতেছে তাহার কারণ—

নাচে রে নাচে মরণ নাচে
প্রাণের কাছে; প্রাণের কাছে। [মুক্তধারা

মরণকে যে প্রাণের পরিচয় বলিয়া না জানিতে পারে তাহার প্রাণ হয় ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ।—

মরণকে তুই পর করেছিস, ভাই,
জীবন যে তোর ক্ষুদ্র হলো তাই।
[প্রবাহিণী।

অতএব — জীবনেশ্বর তো কেবল জীবনেরই দেবতা নন, তিনি মৃত্যুবিধাতা—

তোমার মোহন রূপে
কে রয় ভুলে।
জানি না কি মরণ নাচে
নাচে গো ঐ চরণ-মূলে।
[গীতালি।

মৃত্যু হইতেছে জীবনের পরিণতি, —

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি কও আমারে কথা।
[

জীবনকে তোর ভ'রে নিতে
মরণ-আঘাত খেতেই হবে।
[গীতালি

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।
[গীতালি।

পূর্ণাৎপূর্ণ যিনি তাঁহারই মধ্যে তো সকল অংশ নিবিষ্ট ও নিহিত হইয়া রহিয়াছে, অতএব কোথাও কোনও ক্ষতি নাই, বিনাশ নাই, বিচ্ছেদ নাই। এই সত্যদৃষ্টি লাভ করিয়া কবি আপন প্রার্থনা ব্যক্ত করিয়াছেন —

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু,
বিরহ-দহন লাগে;
তবুও শান্তি তবু আনন্দ
তবু অনন্ত জাগে।
তবু প্রাণ নিত্যধারা, হাসে সূর্য্য চন্দ্র তারা,
বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে।
তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে;
নাহি ক্ষয় নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্যলেশ,
সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।
[গান।

অন্নসমস্যা ও বাঙ্গালীর পরাজয়

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি কি বিদ্যার্জ্জনের সহায়ক ?

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে মহামতি কারলাইল লিখিয়াছিলেন যে, the true university of our days is a collection of books অর্থাৎ সত্যকার বিশ্ববিদ্যালয় সদ্‌গ্রন্থের সমষ্টি মাত্র। যেদিন হইতে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হইল, সেই দিন হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তাও ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। বর্ত্তমান যুগের চিন্তাশীল লেখক H. G. Wellsও বলিয়াছেন, —"প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন পুস্তকের ভিতর দিয়াই সম্ভবপর হয়। এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া কোন এক অধ্যাপকের মুখনিঃসৃত উপদেশ-বাণী শ্রবণ করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। যে ছাত্র দিবালোকে Trinity College-এর বিলাস-সম্ভার-পরিপূর্ণ প্রকোষ্ঠে বসিয়া জ্ঞানার্জ্জনে নিরত থাকে এবং যে দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের সমাপন করিয়া নিশীথকালে গ্লাস্‌গো'র এক শয়নকক্ষে বসিয়া পাঠাভ্যাস করে, সে উপরোক্ত ছাত্র অপেক্ষা কিছু কম শেখে না।"

ইহা গেল পাশ্চাত্য দেশের কথা। এখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীর বিষয় কিছু বলিতে চাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি অর্থেই—mass production of graduates বুঝায়। কল-কারখানায় যে নিয়মে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় সেইরূপ আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজেও এখন সেই পদ্ধতিই অনুসৃত হইতেছে।

বাজারের নিয়ম এই, যখন যে জিনিষের চাহিদা বাড়ে তখন সেই জিনিষ সরবরাহ করিবার জন্য ব্যবসায়িগণ নূতন নূতন কারবার খুলিয়া নবোদ্যমে তাহার বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করেন। এখানেও সেই নিয়ম। নূতন 'সেসন্' আরম্ভ হইবার সময়ে খবরের কাগজে অনেক কলেজের এইরূপ বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়। কোন্ কলেজ হইতে কতগুলি ছাত্র প্রথম বিভাগে, কতগুলি দ্বিতীয় বিভাগে পাশ হইয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু, কতগুলি ছাত্র পরীক্ষার্থে প্রেরিত হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে শতকরা কত জন উত্তীর্ণ হইয়াছিল—তাহা বলা হয় না।

কলিকাতায় ২।৪টী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ১০০০ হইতে ১৫০০ পর্য্যন্ত ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে; উচ্চশ্রেণীগুলি প্রায় ২।৩।৪টী করিয়া section-এ বিভক্ত; এই সমস্ত বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব এই যে, এখানকার শিক্ষকগণ, কি উপায়ে ছাত্র 'পাশ' করান যায়, তাহাই সুন্দরভাবে শিখিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন। এই বিদ্যালয়সমূহকে আমি 'সর্ব্বনেশে' নামে অভিহিত করিয়া থাকি। এরূপ স্থানে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হয় না—ছাত্রদিগকে কেবলমাত্র 'মুখস্থ-বিদ্যা' শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের শিক্ষাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলে। কিন্তু সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, পাশ করিবার জন্য যেটুকু মাত্র প্রয়োজন, ছাত্রদিগকে কেবল তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ছাত্রদের অভি-ভাবকগণেরও এইপ্রকার বিদ্যালয়ের দিকেই লক্ষ্য বেশী। পুত্রের প্রকৃত শিক্ষা লাভ হউক বা না হউক ডিগ্রীধারী হইলেই চলিবে, কেননা তাঁহাদের ধারণা—ডিগ্রীই জীবিকা-অর্জ্জনের প্রকৃষ্ট উপায়।

কয়েক বৎসর যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয় এই নিয়ম করিয়াছেন যে, বিজ্ঞান-শিক্ষা দিতে হইলে কলেজের নিম্নতর শ্রেণীগুলিতেও Practical Class খুলিতে হইবে। ইহাতে ছাত্রদের 'হাতে-কলমে' কার্য্য করি-বার সুবিধা হয়। কিন্তু এমন অনেক কলেজ আছে যেখানে শুধু 'আই-এস্‌সি'-তেই সহস্রাধিক ছাত্র। এই

হাজার ছাত্রকে বহু ভাগে বিভক্ত করিয়া এক-একটী group করিয়া 'প্র্যাক্‌টিক্যাল' শিক্ষা দেওয়া হয়।

বড় বড় শ্রাদ্ধে দেখা যায় যে, কাঙ্গালী-বিদায়ের সময় তাহাদিগকে একটী 'আড়গড়ার' ভিতর প্রবেশ করাইয়া তাহার পর এক-এক করিয়া তাহাদিগকে পয়সা বা চাউল বিতরণ করা হয়।

এই সব কলেজে অর্থাৎ চল্‌তি কথায় 'হরি ঘোষের গোয়ালে' অধ্যাপকগণ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে যে কিরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহা পাঠকবর্গ বোধ হয় অনুমান করিতে পারিবেন। মাত্র অধিক সংখ্যক ছাত্র কলেজে ভর্ত্তি হইলেই চলিবে না; ছাত্রেরা যদি কেবল মাসের পর মাস মাহিনা দিয়াই খালাস হয় এবং বেঞ্চগুলি খালি থাকে, তাহা হইলে বড়ই বিসদৃশ দেখায়; ইহা নিবারণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ আর এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। কলেজে শতকরা ৭৫ দিন উপস্থিত থাকা আবশ্যক। তাহা হইলে Collegiate ছাত্র হইয়া পরীক্ষা দেওয়া যায়। ইহার ব্যতিক্রম হইলে অর্থাৎ শতকরা অন্যূন ৬০ দিন উপস্থিত থাকিলে আবার দশটাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে জরিমানাস্বরূপ দিতে হয়। এইরূপ অদ্ভুত নিয়ম কোথাও প্রায় দেখা যায় না। ছাত্রদের অভিভাবকদিগের নিকট হইতে দশটী টাকা আদায় হইলেই যেন তাহাদের সমস্ত ক্ষতি পূর্ণ হইয়া যাইবে। এই Percentage-রূপ কল উদ্ভাবন করায় ছেলেরা 'ফুটো ভাত মুখে গুজিয়াই' দৌড়াইতে দৌড়াইতে কলেজে আসিয়া হাজিরা দেয় এবং ক্লাসে বসিয়া কেবল ঝিমাইতে থাকে। যে কয়জন সজাগ থাকে তাহারাও আবার সমপাঠীদের সহিত গল্প-গুজব করিয়া সময় অতিবাহিত করে। প্রায়ই দেখা যায় যে, মাত্র ২।৪জন ছাত্র 'লেক্‌চারের' প্রতি মনোনিবেশ করে। যাহারা সময়মত হাজির হইতে পারে না, তাহাদের জন্য mutual proxy-র ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

এতাবৎ শুধু ছাত্রদেরই কথা বলিলাম। এখন শিক্ষকদের বিষয়েও কিছু আলোচনা করা উচিত। অন্যান্য সাময়িক পত্রে পূর্ব্বকালের টোল ও ছাত্রাবাসের কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি। সেকালের ছাত্রেরা গুরুদের নিকট হইতে প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন করিত। শাস্ত্রে কথিত আছে, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"। অধুনা ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সেরূপ কোন সম্পর্ক দেখা যায় না। কলেজের অধ্যাপকগণের মোটেই আকর্ষণী-শক্তি নাই। অবশ্য এখনও অনেক কলেজে দুই একজন এমন অধ্যাপক আছেন, যাঁহাদের ক্লাসে ছেলেরা অত্যন্ত যত্নসহকারে 'লেক্‌চারের' প্রতি মনোনিবেশ করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার বিপরীত দেখা যায়। আজকাল অনেক অধ্যাপকই একখানি Popular Note মুখস্থ করিয়া ক্লাসে তাহারই আবৃত্তি করিতে থাকেন। ছেলেরা কিছু শিক্ষা করুক বা না করুক, সে বিষয়ে তাঁহারা কোন দৃষ্টি রাখা আবশ্যক বোধ করেন না। এইরূপ শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষা বিশেষ অগ্রসর হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়কে এখন আমূল পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক — এবং প্রয়োজন হইলে বোধহয় তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়াও পুনর্গঠন করা বিধেয়।

যাঁহাদের পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তাঁহারা জানেন যে, বাঁশবনে অথবা উলুবনে সময়ে সময়ে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ইহার ফলে আবার বর্ষার নব জলধারায় বাঁশের নূতন অঙ্কুর ও নব তৃণদল উদ্গত হইয়া থাকে। আবর্জ্জনার ভস্মগুলি সুন্দর সারের কাজ করিয়া থাকে। আমি যতই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং তাহার অন্তর্ভুক্ত কলেজগুলির আকার, অবয়ব, সৌষ্ঠব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আলোচনা করি ততই দেখিতে পাই যে, ইহাতে এমন ঘুণ ধরিয়াছে যে, ইহার নবসংস্কার প্রায় অসম্ভব।

৭৫ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এখন ইহা এক বিরাট্ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে; এবং বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় চারিদিকে এমন ভাবে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে

যে, এখন ইহার সমূলে উৎপাটন বড়ই দুরূহ। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৩০,০০০ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে। ইহার পরিবর্ত্তে প্রাথমিক শ্রেণী হইতে মাইনর পর্য্যন্ত পড়াইয়া, তাহার পর 'বাছাই' করিয়া যদি ইহার দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ মাত্র তিন হাজার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়, তাহা হইলে কিছু সুব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু অভিভাবকগণও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছেন, তাঁহাদের এখনও চৈতন্য হইল না। সুতরাং কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাড়ে দোষারোপ করিলেই চলিবে না।

আমি এতদিন ধরিয়া প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির যে সমস্ত দোষ ও গলদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দেখাইতেছি; এখন পুনঃ সংস্কার আবশ্যক। ইহারই উপর বাঙ্গালী জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

কয়েক দিন হইল মফঃস্বল কলেজের একজন অধ্যক্ষ আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং একজন বিদ্যাবিশারদ ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। আমি কথা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আজকাল আপনারা কিরূপ ছাত্র তৈয়ারী করিতেছেন? আমি যে সমস্ত নমুনা দেখি তাহাতে প্রায় অবাক্ হইয়া যাই।" তিনি বিমর্ষভাবে উত্তর দিলেন, "বাস্তবিকই ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয় যে, ছাত্রদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা আদৌ জাগ্রত হইতেছে না, কেবল মাত্র যেটুকু পরীক্ষার জন্য প্রয়োজন তাহা ছাড়া আর কিছু শিখিতে তাহারা একেবারেই অনিচ্ছুক।"

সহস্র সহস্র যুবকের শক্তি ও সামর্থ্য এই প্রকারে অপচয় হয় এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে তাহারা কোন প্রকার জীবন-যাত্রা-প্রণালী নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয় না।

> "ছয় কোটি যাটি লক্ষের ক্রন্দনধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না, বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।"
>
> —বঙ্কিমচন্দ্র

নিরঞ্জন ঠাকুর

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৮

প্রণতা যখন হাসপাতালে উপনীত হইল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। যে পথে গাড়ী গেল—সেই পথের উপরই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা তাহার দুঃস্বপ্নের মত মনে হইতেছিল। পথে আবার জনস্রোত, যানের স্রোত—কেবল দুর্ঘটনার স্থানের নিকটে কয়জন কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া আছে। দোকানীরা আবার দোকান খুলিয়াছে।

হাসপাতালের অনুসন্ধান-কক্ষে যাইয়া প্রণতার পিতা কর্ম্মচারীকে বলিলেন, "অল্পক্ষণ পূর্ব্বে দাঙ্গায় আহত যুবকটিকে কোথায় রাখা হয়েছে?"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "তিন নম্বর ওয়ার্ডে। তাঁ'র পকেটে যে কাগজ ছিল, তা' থেকে ঠিকানা জেনে তাঁ'র বাড়ীতে খবর দেওয়া হয়েছিল। তাঁ'র বাপ আর একজন স্ত্রীলোক এসেছেন—তাঁ'রা তাঁ'র কাছে থাকবার অনুমতি পেয়েছেন। তাঁ'কে একটা আলাদা ঘরে রাখা হয়েছে।"

"আমরা যা'ব।"

"আমি আগে অনুমতি নিতে পাঠাই।"

প্রণতা অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি তাঁ'র স্ত্রী—আমি যা'ব।"

তাহার কথার দৃঢ়তায় কর্ম্মচারীর সব আপত্তি মূক হইয়া গেল; তিনি ভৃত্যকে বলিলেন, "তিন নম্বর ওয়ার্ডে যাঁ'কে—"

ভৃত্য বলিল, "আমি জানি।"

সে অগ্রসর হইল — সকলে তাহার অনুসরণ করিলেন। প্রণতা শুনিতে পাইল, কর্ম্মচারী বলিলেন, "আহা! ছেলেমানুষ। কি সর্ব্বনাশই হ'ল।"

সকলে যখন আহত ব্যক্তির ঘরে উপনীত হইলেন তখনও ডাক্তারদিগের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া ঔষধ ও পটি দেওয়া শেষ হয় নাই—মস্তকের কতকটা স্থান কামাইয়া দিয়া তাঁহারা উজ্জ্বল আলোক দিয়া দেখিতেছেন—খুলির চূর্ণ অংশ তথায় আছে কি না।

প্রধান চিকিৎসক বলিলেন, "এত লোক!"

সুরপতি যেন কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "আমার ছেলের স্ত্রী।"

ডাক্তার আর কিছু বলিলেন না। তিনিও মানুষ। তিনি আঘাতের স্থান ধৌত করিতে লাগিলেন। কায শেষ করিয়া যাইবার সময় তিনি সুরপতিকে সম্বোধন করিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, "আপনি অবস্থা বুঝিতে পারিতেছেন। মহিলাদিগকে এখানে থাকিতে না দিলেই ভাল হয়।" তিনি জানিতেন না, প্রণতা ইংরাজী বুঝিতে পারে।

ডাক্তাররা চলিয়া গেলেন; একজন শুশ্রূষাকারিণী আসিয়া ঘরের উজ্জ্বল আলো নিবাইয়া দিয়া একটি মৃদু আলো জ্বালিল। সে বলিল, "ঘরে সকলের থাকা হইবে না।"

সুরপতি বলিলেন, "তিন জন থাকিতে চাহিতেছি।"

"আচ্ছা"—বলিয়া শুশ্রূষাকারিণী চারিখানি চেয়ার আনিবার জন্ত ভৃত্যকে আদেশ করিল।

চেয়ার আনিলে সুরপতি প্রণতাকে বলিলেন, "মা, বস।"

প্রণতার পিতা, ভ্রাতা ও বিনতা ঘরের সম্মুখে বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। সুরপতি যাইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "ডাক্তারের কথা ত শুনেছেন—আপনারা বৌমা'কে নিয়ে যা'ন।"

বিনতা ঘরে আসিয়া প্রণতাকে যাইবার কথা বলিলে সে বাহির হইয়া যাইয়া সুরপতির পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।" এতক্ষণে তাহার চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল।

সুরপতি বহু কষ্টে আপনাকে সামলাইয়া লইলেন, ক্রন্দনোচ্ছ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া—প্রণতাকে তুলিয়া বলিলেন, "চল। তোমার অধিকার যে, মা, আমার অধিকারের চাইতেও বেশী।"

তাঁহার সঙ্গে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া প্রণতা সংজ্ঞা-শূন্য নীহারের শয্যাপার্শ্বে বসিল। পিসীমা নীহারের দেহের উপর দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া মুদিতনেত্রে দেবতার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছিলেন। সুরপতি স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন।

হাসপাতালের ঘড়ীতে সাতটা বাজিলে সুরপতি পিসীমাকে বলিলেন, "দিদি, আরতির সময় হ'ল; তুমি একবার বাড়ী যাও।"

তিনি প্রণতাকে বলিলেন, "মা, তুমিও যাও।"

প্রণতা কাতরভাবে বলিল, "আমাকে থাকৃতে দিন।"

"থাকৃবে। দিদি ঠাকুরের চরণামৃত আর চরণ-তুলসী আন্‌বেন; তুমি যাও—যদি পার ঠাকুরকে কৃপা করতে ব'লে এস। তাঁ'র কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়।"

পিসীমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "সাবিত্রীর মত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আন—" তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না। উঠিয়া প্রণতার হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন; ভৃত্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার সঙ্গে চলিলেন।

প্রণতার পিতা প্রভৃতি তখনও বারান্দায় ছিলেন। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ী যা'বে ?"

প্রণতা বলিল, "না। তোমরা যাও।"

কয় দিন পূর্ব্বে যে পিসীমা আসিবার জন্য লিখিলে সে ঘৃণা সহকারে বলিয়াছিল—"অসম্ভব", আজ সে সেই পিসীমার সঙ্গে যখন সেই গৃহে প্রবেশ করিল, তখন তাহার মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

পিসীমা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন—ঠাকুরের সিংহাসনতলে দণ্ডবৎ হইয়া যেন আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, রক্ষা কর।"

প্রণতার বুকের মধ্যে সেই আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি হইল। সে এ ভাব পূর্ব্বে কখন অনুভব করে নাই।

সে বসিয়া দেখিতে লাগিল, পিসীমা ঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন। সেই কাযে তিনি যেন সব বিপদ ভুলিয়া গিয়াছেন!

তাহার পর আরতি শেষ হইলে—ঠাকুরদের "শয়ন" দিয়া পিসীমা উঠিলেন — একটি পাতরের বাটিতে চরণামৃত ও চরণ-তুলসী লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তিনি যেন দেবতার চরণে সব অস্থিরতা সমর্পণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

পিসীমা পাচককে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌমা'র খাবার দাও।"

প্রণতা খাইতে অসম্মতি জানাইল।

পিসীমা'র আগ্রহে সে সামান্য দুগ্ধ পান করিয়া তাঁহার সঙ্গে হাসপাতালে ফিরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন তরণী হইতে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল — এতক্ষণে ধরিবার একট কিছু পাইল।

নীহারের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পিসীমা যখন তাহার উন্নত ললাটে ঠাকুরের চরণ-তুলসী রক্ষা করিয় তাহার ওষ্ঠাধরে, ললাটে ও মস্তকে ঠাকুরের চরণামৃত সিঞ্চিত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর কৃপা কর—ঠাকুর, কৃপা কর," তখন প্রণতাও মনে মনে তাঁহার কথার পুনরুক্তি করিতে লাগিল বুঝি হিন্দুনারীর চিরাগত ও প্রকৃতিগত সংস্কার বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার কুসংস্কার দূর করিয়া আত্মপ্রকা করিল।

পিসীমা ফিরিয়া আসিলে সুরপতি একবার গৃহে গমন করিলেন; কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই—আশৈশব-পালিত নিয়মে দেবতাকে প্রণাম করিয়া —ফিরিয়া আসিলেন।

সমস্ত রাত্রি সুরপতি, পিসীমা ও প্রণতা সংজ্ঞাশূ নীহারের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

যখন শঙ্কাদুঃসহ দীর্ঘ রাত্রি শেষ হইল, তখনও নীহারের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল না।

৯

যেরূপে রাত্রি কাটিয়াছিল, সেইরূপে দিন কাটিল, আবার রাত্রি আসিল। সকালে ও মধ্যাহ্নে যেমন, সন্ধ্যায়ও তেমনই একবার পিসীমা ঠাকুরের সেবা করিতে গমন করিলেন — প্রণতাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে তাঁহারা যখন যাইবেন, সেই সময় ডাক্তারেরা আসিলেন। তাঁহারা রোগীর অবস্থা লক্ষ্য করিলেন; বুঝিলেন, জীবনীশক্তি ছিদ্রকুম্ভের বারির মত দ্রুত বাহির হইয়া যাইতেছে। তাঁহারা সুরপতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "মহিলাদ্বয়কে আর এখন আসিতে দিবেন না।"

সুরপতি বুঝিলেন; যেন প্রবল আঘাত তাঁহাকে ফেলিয়া দিতেছিল। তবুও কর্তব্যনিষ্ঠার বল পাইয়া তিনি বলিলেন, "দিদি, তোমরা এখন বাড়ী যাও, আমি একটু পরে যাব — তা'র পর তোমাদের নিয়ে আসব।" শুনিয়া পিসীমা প্রণতাকে লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

বেলা যখন প্রায় দশটা তখন—শরতের দিবাশেষে সূর্য্য যেমন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যায়, নীহারের জীবন তেমনই ভাবে মৃত্যুর মধ্যে মিলাইয়া গেল। সুরপতি উপস্থিত ডাক্তারের দিকে চাহিলেন। ডাক্তারও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না; বলিলেন — "শেষ।"

সুরপতি বারবার মৃত পুত্রের মুখচুম্বন করিলেন। তাহার পর প্রবল চেষ্টায় কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বারান্দায় আসিলেন। তথায় নীহারের মাতুলালয় ও শ্বশুরালয় হইতে অনেকে এবং তাহার বহু বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আজ আমার কাছ থেকে নীহারের ছুটি। এবার তোমরা যাও।"

নীহারের বন্ধুরা কাঁদিয়া ফেলিল।

পুত্রহারা পিতা—পুত্রহীন, আনন্দহীন গৃহে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে প্রণতার পিতা।

তিনি যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন পিসীমা প্রণতাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ভ্রাতাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এত দেরী করতে হয়?"

সুরপতি বলিলেন, "দিদি, আর দেরী হ'বে না—" তাঁহার শেষ কথা কয়টি একবার আর্ত্তনাদের মত শুনাইয়া যেন বন্ধ হইয়া গেল।

পিসীমা হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রণতার পিতা কন্যাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

সুরপতি স্থির হইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "বেহাই মশাই, আপনি বৌমাকে ওঁর মা'র কাছে নিয়ে যান। এখানে ওঁকে কে দেখবে?"

প্রণতার তখন বাহ্যজ্ঞান ছিল না। পিতা তাহাকে ধরিয়া মোটরে তুলিলেন — সে সঙ্গে গেল।

কিছুক্ষণ পরে — আপনিও কাঁদিয়া শান্ত হইয়া সুরপতি দিদিকে বলিলেন, "দিদি, এইবার বড় পরীক্ষা — শান্ত না হ'লে এ পরীক্ষায় পার হ'তে পারা যা'বে না।"

পিসীমা কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

সুরপতি বলিলেন, "তোমাকে উঠতেই হ'বে — ঠাকুরসেবার ভার মা তোমাকে দিয়ে গেছেন; যত দিন পারবে সে সেবা করতে হ'বে। কিন্তু আমার আর—"

পিসীমার আর্ত্তনাদে তিনি কথা শেষ করিতে পারিলেন না।

মধ্যাহ্নে সুরপতির এক মাতুল-পুত্র আসিয়া সংবাদ দিল, শব শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। শুনিয়া সুরপতি বলিলেন, "চল, যাই।"

সে বলিল, "আপনি যা'বেন?"

"হাঁ যা'ব। আজ যে সম্বন্ধ-বিপর্য্যয় হয়েছে, ভাই। আজ নীহার বাবা, আমি তা'র ছেলে। তা'র শেষ কায যে আমাকেই করতে হ'বে; নইলে তা'র তৃপ্তি

হ'বে কিনা জানি না — কিন্তু আমি মনে করব, বুঝি সে তৃপ্ত হ'ল না।"

আচার ও বিধান ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া প্রবল শোকে মানুষকে যে দৃঢ়তা প্রদান করে, তাহা আর কিছুতেই মানুষ লাভ করিতে পারে না।

১০

নীহারের শ্রাদ্ধ গঙ্গাতীরে হইয়া গেল।

সুরপতি বিস্মিত হইলেন যে, প্রণতার পিতৃগৃহ হইতে তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলেন না। কিন্তু তিনি কি করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। পিসীমা সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিলেন না।

চারি দিকে মৃত পুত্রের স্মৃতি। গৃহে সকল দ্রব্যে —সকল স্থানে তাহার স্মৃতিলেখা। সুরপতির এক এক বার মনে হইত, এ পরিবেষ্টন হইতে দূরে যাইলে হয়ত বিস্মৃতির ভেষজে হৃদয়ক্ষতের যন্ত্রণা প্রশমিত হইবে। কিন্তু তিনি যখনই বিচার-বিবেচনা করিতেন, তখনই বুঝিতেন, এ যন্ত্রণা কখন প্রশমিত হইবে না—ইহা চির-জীবনের সঙ্গী; বরং পুত্রের স্মৃতিতেই দুঃখের মধ্যে স্বস্তির সম্ভাবনা আছে। তিনি অফিসের কাযে ছুটি লইলেন—তাঁহার দেহে জরার স্পর্শ সপ্রকাশ হইল। এ শোকে কি সান্ত্বনা আছে? এ শোকে কেহ সান্ত্বনা দিতে আসিলে সে চেষ্টা যেন অসহনীয় যন্ত্রণা মনে হয়। কথিত আছে, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির দেহ ভস্মীভূত হইলে — শ্রীকৃষ্ণ শতপুত্রশোকের শত ছিদ্র দেখিয়া গান্ধারীর অস্থি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

সুরপতি শাস্ত্রালোচনা করিতেন—একা থাকিতেই ভালবাসিতেন।

নীহারের মৃত্যুর পর এক মাস গত হইলেই তিনি মনে করিলেন, মানুষের জীবন কত ক্ষণভঙ্গুর, তাহা ত তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকাই কর্ত্তব্য—কেন না, জীবনে মৃত্যুই সত্য, আর সব মায়া ও মিথ্যা। শৈশবে মাতৃহীন যে পুত্রের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য লইয়া তিনি আর সব কর্ত্তব্য যেন ভুলিয়া ছিলেন, সে যখন তাঁহাকে কর্ত্তব্যের দায় হইতে মুক্তি দিয়া গেল, তখন অন্য কর্ত্তব্যের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার কর্ত্তব্য দেবসেবার ও প্রণতার আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করা। প্রণতার পিতা হয়ত তাঁহার ব্যবস্থার অপেক্ষা রাখিবেন না, কিন্তু তবুও নীহারের পত্নীর সম্বন্ধে তাঁহার কর্ত্তব্য তাঁহাকে করিতেই হইবে।

তিনি একদিন পিসীমা'কে বলিলেন, "দিদি, মানুষের জীবনে ত বিশ্বাস নাই। এখনই আমাদের পর ঠাকুরসেবার ব্যবস্থা করি।"

পিসীমা বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সেবা আর কে করবে?"

"সে কি তুমি আর আমি ভেবে স্থির করতে পারব, দিদি? যিনি সেবা নেবার কর্ত্তা, তাঁ'র মনে যা' আছে, তা'ই হ'বে। নইলে রাজপ্রাসাদে না হ'য়ে কারাগারে—দুর্য্যোগের মধ্যে তাঁ'র জন্ম হ'বে কেন? আর তিনি বৃন্দাবনে রাখালদের সঙ্গে গোচারণ ক'রে মাধুর্য্যলীলা প্রকট করবেন কেন?"

"আমার যা' কিছু আছে ঠাকুরের।"

"এ বাড়ী ঠাকুরের মন্দির—যে সেবা করবে সে-ই এতে বাস করতে পা'বে।"

সুরপতি স্থির করিলেন, দেবসেবার ও প্রণতার আবশ্যক ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া যে টাকা থাকিবে, তাহা তিনি নীহারের নামে হাসপাতালের—যে প্রতিষ্ঠানে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল তাহার—কাযে দিবেন।

সেই দিনই তিনি প্রণতাকে লিখিলেন—

মা,

আমার জীবনের কায শেষ হইয়াছে। এখন বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা। যিনি জীবন-মরণের কর্ত্তা তিনি কবে ডাকিবেন, জানি না। তাহার পূর্ব্বে আমার শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার নীহারের ধর্ম্মপত্নী—জানি না, যিনি দয়াময়, তিনি কেন তোমাকে এত দুঃখ দিলেন। আমি, তুমি

যতদিন বাঁচিবে ততদিন তোমার আবশ্যক ব্যয়ের জন্ত মাসিক একশত টাকা দিবার ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি, ইহাতে তোমার আপত্তি হইবে না। তোমার পত্র পাই ভাল, না পাইলেও অনুমান করিব, ইহাতে তোমার অসম্মতি নাই।

তোমার কল্যাণকামী—

নীহার-হারা নীহারের বাবা

সুরপতি পত্র লিখিয়া তাহা ডাকে পাঠাইয়া দিলেন।

১১

প্রণতার পিতা যখন বিধবা কন্তাকে লইয়া গৃহে আসিয়াছিলেন, তখন প্রণতা যেন বাহ্যসংজ্ঞাশূন্যা ছিল। সমাজ-প্রচলিত নিয়ম সম্বন্ধে তাহার সুস্পষ্ট কোন ধারণাও ছিল না—সে নিয়ম সম্বন্ধে তাহার পিতৃগৃহে কেহ অবহিতও ছিলেন না। তাহার মাতা দুই একবার সেই কথা উত্থাপিত করিবার ক্ষীণ চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পুত্রকন্তারা—বিশেষ কন্তা বিনতা তাঁহার সব চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল। সে বিষয়ে তাহারা পিতাকেও আপনাদিগের পক্ষে আনিয়াছিল। অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত আঘাতে প্রণতা যেন আর কিছু ভাবিবার অবসর পায় নাই।

প্রণতার পিতার এক মাসীমা কাশীবাসী হইয়াছিলেন। তিনি বালবিধবা এবং পিত্রালয়ে অবস্থানকালে শিশু ভগিনীপুত্রকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। প্রণতার পিতাও বহুবার সপরিবারে কাশীতে যাইয়া তাঁহার নিকট থাকিয়া আসিয়াছেন। সংবাদ পাইয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন।

তিনি প্রণতার জন্য যথেষ্ট দুঃখ করিলেন—কাঁদিলেন; কিন্তু প্রণতার সম্বন্ধে তাহার পিত্রালয়ের ব্যবস্থায় আপত্তি না করিয়া পারিলেন না। তিনি আসিয়া দুই তিন দিন পরেই প্রণতার মাতাকে বলিলেন, "বৌমা, যা' হ'বার হয়েছে; মেয়ের অদৃষ্টে যা' ছিল হয়েছে; কিন্তু হিন্দুর ঘরে এ যে খৃষ্টানের ব্যবস্থা করছ!"

মা উত্তর করিলেন, "মাসীমা, আমি কি করব?"

"কি করবে! এ জন্মে ত এই হ'ল—আবার এর পর—"

"আমার কথা কেউ শুনে না।"

"সে কি? মেয়ে বিধবা হয়েছে—এক গা গয়না, রঙ্গীন কাপড়, সধবার খাওয়া দাওয়া—এ সব কি ব্যবস্থা?"

"আপনি আপনাদের ছেলেকে বলুন। ছেলেমেয়েরা মূর্খ—সেকেলে ব'লে আমাকে গ্রাহ্যই করে না। কিন্তু উনিও যে ওদের মতেই কায করেন।"

"ছিঃ ছিঃ! শ্রাদ্ধের কি হ'বে?"

"আপনি যা' ভাল বুঝেন, তা'ই করুন।"

মাসীমা'র সঙ্গে মা'র কথোপকথন প্রণতার কর্ণগোচর হইয়াছিল। সে ভাবিল, সত্যই ত, সে কি করিতেছে? কিন্তু সে কি করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

এদিকে মাসীমা সেই দিনই প্রণতার পিতাকে বলিলেন, "বাবা, বিধবা মেয়েকে কি শুদ্ধ হ'বার ব্যবস্থাও করবে না?"

বিনতা ও বিনতার ভ্রাতারা তখন তথায় ছিল। বিনতা বলিল, "আপনি কি করতে বলেন?"

"যা' চিরকাল হিন্দুর ঘরের ব্যবস্থা, তা'ই করতে বলি।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিল, "অর্থাৎ ঐ কচি মেয়ে, ওর গা থেকে সব অলঙ্কার খুলে নিয়ে, ওকে থান কাপড় পরিয়ে, একাদশী করিয়ে, তবে ছাড়তে হ'বে।"

"দাদা, এ সব বড় দুঃখ—তা' আমার জানতে বাকি নেই। কিন্তু তা'র চেয়ে যা' বড় দুঃখ, যা'র চেয়ে বড় দুঃখ আর নেই—তা' কি নিবারণ করতে পেরেছ—মানুষ কি তা' পারে?"

"মৃত্যুকে কি কেউ নিবারণ করতে পারে?"

"সেটা সহ্য করতে পারব, আর গয়না, কাপড়, খাবার—বিলাস এ সব ত্যাগ করা সহ্য করতে পারব না? স্বামীর জন্ত প্রাণ না দিলেও এতটুকু ত্যাগ কি স্বীকার করতে পারা যায় না?"

"এই ত্যাগ কি 'এতটুকু' ?"

"এ ত্যাগ যে ত্যাগ ব'লে মনেই হয় না, দাদা।"

বিনতা বলিল, "স্বামীর কথা বল্‌ছেন, দিদিমা; স্বামীর সঙ্গে ওর ক' দিন দেখা হয়েছে, কতটুকু পরিচয় হয়েছে ?"

"এক দিনও ত দেখা হয়েছে ? এতটুকু পরিচয়ও ত হয়েছে ? যে বয়সে ওর বিয়ে হয়েছে, তা'তে স্বামী কি তা' বুঝবার মত বুদ্ধি-বিবেচনা ওর হয়েছিল। ও জানে, ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে ওর বিয়ে হয়েছিল।"

মাসীমা'র সংস্কারের দৃঢ় বর্ম্মে লাগিয়া তাহার যুক্তি ব্যর্থ হইতেছে দেখিয়া বিনতা অধীর হইয়া উঠিল; বলিয়া ফেলিল, "স্বামীর সঙ্গে ওর কি মনের মিল ছিল?"

মাসীমা বলিলেন, "তা'তে কি আসে যায় ?"

"আসে যায় না ?"

"না। আমাদের সময় অল্পবয়সে বিয়ে হ'ত; সত্য সত্যই স্বামী কি জানবার আগেও অনেকের কপাল পুড়ত। কিন্তু তা'রাও ত—"

মাসীমা'র কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিনতা বলিল, "আমরা মনে করি, জোর ক'রে কাউকে কঠোর আচার করান—সেকালের সেই সতীদাহেরই মত অন্যায়।"

"তোমরা তবে কি কর্ত্তব্য মনে কর, দিদি ?"

"আমরা মনে করি, এমন অবস্থায় মেয়ের আবার বিয়ে দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

"রাম! রাম!" — বলিয়া মাসীমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মনে হইল, যে স্থানে এমন কথা হয়—সে স্থানে থাকাও পাপ।

তিনি সে ঘর হইতে চলিয়া যাইবার সময় প্রণতার পিতাকে বলিয়া গেলেন, "বাবা, আমি আজই কাশীতে ফিরে যা'ব; আমাকে ট্রেনে তুলে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিও।"

বিনতা ভাবিল, এইরূপ বৃদ্ধারা একালের মধ্যে সেকালের ব্যবস্থা আনিয়া কেবল অশান্তির উৎপাদন করেন।

১২

পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া প্রণতা সব কথাই শুনিয়াছিল। সে আপনাকে ধিক্কার দিল এবং দিদির উপর তাহার কেবলই রাগ হইতে লাগিল। সত্যই সে স্বামীকে চিনিতে পারে নাই—চিনিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না; কে উজ্জ্বল সূর্য্যের দিকে চাহিতে পারে? এক দিন—এক বার সে তাঁহাকে চিনিবার সুযোগ পাইয়াছিল—সে কি কুযোগ! সে যখন উত্তেজিত ক্ষিপ্তপ্রায় জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আপনার প্রাণ দিয়াছিলেন। কিন্তু সে দোষ যে তাহারই। বিনতা অনায়াসে ঘোষণা করিল, স্বামীর সঙ্গে তাহার মনের মিল ছিল না! কি লজ্জা! কি অপমান! স্বামী জীবিত থাকিতে সে তাঁহার মহত্ব বুঝিতে পারে নাই—তাঁহার ভালবাসার মর্য্যাদা রাখিতে পারে নাই। আজ যখন তিনি দেবতার রূপে তাহার মনের মধ্যে অবস্থিত, তখন সে যে সঙ্কল্প করিয়াছে — প্রায়শ্চিত্ত-প্রক্ষালিত হইয়া সাধনার দ্বারা তাঁহার স্ত্রী বলিয়া আপনার পরিচয় দিবার উপযুক্ত হইবে; তবেই যদি ইহকালে যে মিলন হয় নাই, পরকালে তাহা হয়।

বিনতার যে কথায় মাসীমা ঘৃণায় স্থান ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার জন্য সে কখন বিনতাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না। তাহার পিতামাতার উপর তাহার শ্রদ্ধাও যেন শিথিল হইয়া আসিতেছিল—তাঁহারাও কি স্নেহাধিক্যে কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন করিলেন? ক্ষোভে, লজ্জায়, ঘৃণায় সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার পর সে মাসীমা'র সন্ধানে গেল। তিনি তখন তাঁহার ক্ষুদ্র বাক্সটি খুলিয়া আপনার তসরের কাপড় দুইখানি তাহাতে তুলিতেছিলেন—তিনি কাশীতে ফিরিয়া যাইবেন।

প্রণতা তাঁহার কাছে বসিল, বলিল, "দিদিমা, আপনি যেতে পা'বেন না।"

মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, দিদি ?"

"আমাকে কি করতে হয়, তা' আপনি আমাকে শিখিয়ে দেবেন।"

মাসীমা ভাবিলেন, এ কি বিদ্রূপ? কিন্তু প্রণতার মুখ দেখিয়া তাঁহার আর সে সন্দেহ রহিল না। তিনি বলিলেন, "আমি আর কি শিখাব, দিদি? আমাদের শিক্ষা যে একালে আর চলে না।"

"আমি কাশীতে আর এখানে আপনাকে যে আচার পালন করতে দেখেছি, এখন সে-ই কি আমার অবলম্বনীয় আচার?"

"আমি ত তা'ই জানি—আমরা সেই শিক্ষাই পেয়েছি।"

প্রণতা স্নান করিবার ঘরে গেল—একে একে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর আপনার শাড়ীর পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহা পরিয়া অলঙ্কার-গুলি লইয়া বাহির হইয়া আসিল। সে মা'র কাছে যাইয়া বলিল, "এগুলা রেখে দাও।"

মা কন্যার বেশ দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"আমার রাজরাণীর এ কি ভিখারিণীর বেশ!"

তাঁহার ক্রন্দন শুনিয়া সকলে আসিয়া দেখিলেন, প্রণতা হিন্দু-বিধবার বেশ ধারণ করিয়াছে। বিনতা ও তাহার ভ্রাতৃদ্বয় ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মাসীমা'র দিকে চাহিল—যেন তিনিই ইহার জন্য দায়ী।

প্রণতা মা'কে বলিল, "মা, চুপ কর। আমার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে, তা' সহ্য করতে পারবে, আর বাইরের এই তুচ্ছ সাজ সহ্য করতে পারবে না?"

বিনতা বলিল, "প্রণতা, মা'কে কি এমন ক'রে কষ্ট দিতে আছে?" সে যাইয়া আর একখানি শাড়ী আনিল।

প্রণতা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল, "দিদি, তুমি ত কেবলই বলেছ, মানুষ তা'র স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে কায করবে। তবে আজ আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন?"

বিনতা কি বলিতে যাইতেছিল। তাহাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া প্রণতা মা'কে বলিল, "মা, আমি আজ হ'তে দিদিমা'র কাছে থা'ব।"

মাসীমা বুঝিয়াছিলেন, বিনতা প্রভৃতির সব রাগ তাঁহার উপরই পড়িয়াছে। তিনি বলিলেন, "দিদি, আমি ত আজই কাশী চ'লে যা'ব।"

প্রণতা বলিল, "আপনি যেতে পা'বেন না—যা'বেন না, দিদিমা! আমাকে কি করতে হয়, তা' শিখিয়ে দিতে হ'বে।"

মাসীমা কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "দিদি, কি বলছ? আমি থাকতে পারব না।"

"যদি যা'ন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হ'বে—আমি যা'ব।" হাসপাতালে যাইবার সময় সে যেমন ভাবে বলিয়াছিল, "আমি যা'ব"—আজ তেমনই ভাবে বলিল, "আমি যা'ব।"

তাহার পিতামাতাও তাঁহাকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। অনিচ্ছাতেও—কেবল প্রণতার জন্য বৃদ্ধার যাওয়া বন্ধ করিতে হইল।

প্রণতা আর সকলকে ছাড়িয়া কেবল মাসীমা'র কাছে থাকিতে লাগিল। তিনিই নীহারের শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন তাহাকে তাহার কর্ত্তব্যের কথা বলিয়া দিলেন; সে যথারীতি তাহার কর্ত্তব্য পালন করিল। তাহার দৃঢ়তা তাহার দুর্ব্বলচিত্ত পিতার মত নিয়ন্ত্রিত করিল। মা তাহার মতেই মত দিতেছিলেন।

১৩

কিন্তু প্রণতার এই আচরণ তাহার ভ্রাতৃদ্বয়ের ও ভগিনীর কাছে অকারণ ও অযথা কৃচ্ছ্রসাধন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। বিনতার বান্ধবীরাও ইহাতে আপত্তি করিতে লাগিল।

মাসীমা "যাই, যাই" করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রণতা তাঁহাকে যাইতে দিল না। বিনতা তাহাকে তাহার বান্ধবীদিগের কাছে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিত—তাহাকে সভা-সমিতিতে যাইতে বলিত—বেড়াইতে যাইতে বলিত। প্রণতা সে সব কথায় কর্ণপাত করিত না। প্রণতার ভ্রাতারা ও বিনতা বলিতে লাগিল, "দিদিমাই ওর শনি হ'য়ে এসেছেন। ছিলেন কাশীতে—কত কাল ত আসেন নি; এখন অত ব্যস্ত হ'য়ে আসাই বা কেন?"

তাহারা এমন ভাবে এ সব কথা বলিত যে, তাহা মাসীমা'র কর্ণগোচর হইত। প্রণতাও যে সে সব শুনিতে পাইত না, তাহা নহে।

মাসীমা যখন যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তখন প্রণতা বলিল, "দিদিমা, যে অসহায়, শরণাগত— তা'কে রক্ষা করা কি ধর্ম্ম নয়?"

মাসীমা বলিলেন, "শাস্ত্র তা'কে বড় ধর্ম্ম ব'লে শিক্ষা দিয়েছে।"

"তবে আপনি কেমন ক'রে আমাকে ছেড়ে যা'বেন?"

"তোমার বাপ মা — এখন যাঁ'র তোমাকে রক্ষা করবার কথা—তাঁ'র অভাবে, তোমাকে রক্ষা করবেন, দিদি।"

"কিন্তু এ যে আমার অশান্তিতে ভরা শত্রুপুরী হয়েছে, দিদিমা।" সে কাঁদিয়া ফেলিল।

মাসীমা তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিলেন, "ও কথা কি বলতে আছে? তোমার বাপ, মা, ভাই, বোন সব তোমার উপর অধিক স্নেহের জন্যই অমন করছেন।"

"কিন্তু যা' আমার ধর্ম্ম নয়, আমাকে তা'ই করতে বলাই কি স্নেহের পরিচয়?"

মাসীমা নিরুত্তর হইলেন। তিনিও প্রণতার মনের কথা ও ব্যথার স্বরূপ অনুমান করিতে পারেন নাই। যে দিন সন্ধ্যায় নীহার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল — পথিমধ্যে সে আহত হইয়া পড়িবার পূর্ব্বে তাহার সহিত সেই সাক্ষাতের দিন সে স্বামীর সহিত যে ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার স্মৃতি সর্ব্বদাই জলদঙ্গারের মত তাহার বুকের মধ্যে অনুভূত হইতেছিল — তাহাকে বিষম যন্ত্রণা দিতেছিল। সে দিন যে ভুলের কুজ্ঝটিকা তাহাকে স্বামীর স্বরূপ দেখিতে দেয় নাই — সেই কুজ্ঝটিকার যবনিকা সহসা অন্তর্হিত হইয়াছিল — সেই দারুণ দুর্দ্দিনে; তখন সে বুঝিয়াছিল, সে কি ভুল করিয়াছিল — কি অপরাধ করিয়াছিল! সে অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিবার অবসর সে পায় নাই — তাহার দুর্ব্ব্যবহারের বেদনা বক্ষে লইয়াই তাহার জীবন-দেবতা মহত্ত্বের আদর্শ দেখাইয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন। আর সেই বেদনা শতগুণ হইয়া তাহাকে পীড়িত করিতেছে। স্বামীর সঙ্গে তাহার মনের মিল ছিল না? মিল হইবার যোগ্যতা সে কি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল? তবুও অল্পদিনের বিবাহিত জীবনে স্বামীর আদর, স্বামীর সম্ভাষণ, স্বামীর কথা — সেই সবই যে তাহার জপমালা হইয়াছে। অনন্ত দুঃখের মধ্যে সেই স্মৃতিই তাহার সুখ।

প্রণতা বলিল, "চলুন, আমি আপনার সঙ্গে কাশী যা'ব।"

মাসীমা বলিলেন, "সে কি কখন হয়? তোমার বাপ মা যেতে দেবেন কেন? তোমার শ্বশুর কি বলবেন? আর আমি — সেখানে তীর্থবাস করি, আমি কি তোমাকে একা নিয়ে যেতে পারি? সে সাহস আমার নাই, দিদিমণি।"

যেন কতকটা অন্যমনস্ক ভাবেই প্রণতা বলিল, "আর এক জায়গা ছিল—।"

"শ্বশুরবাড়ী?"

"হাঁ।"

"তোমার বিয়ের পর ত দেখে এসেছি, বাড়ী ত নয়, যেন দেবতার মন্দির! ঠাকুরের কি সেবা!"

প্রণতা কি ভাবিতেছিল।

মাসীমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে-ই ত তোমার বাড়ী। তুমি সেখানে রাজরাজেশ্বরী হ'য়ে থাকবে; তা' নয়—ভগবান এ'কি করলেন!" তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্বশুর আর কোন খোঁজ নেন নি?"

পিসীমা তাহাকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে তাহার উত্তরে বিনতা কি লিখিয়াছিল এবং সে কি বলিয়াছিল, তাহা প্রণতা মাসীমা'কে বলিল; আরও বলিল, তাহার পর নীহার আর শ্বশুরালয়ে আসে নাই। বলিতে বলিতে তাহার গলা ধরিয়া আসিল।

মাসীমা তাহাকে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন,

"বড় ভুল হ'য়ে গেছে। কিন্তু যখন হ'বার হয়, তখন অমনই হয়; সবই কর্ম্মফল।"

প্রণতা ভাবিতে লাগিল, বড় ভুলই হইয়াছে। কত ভুল। কিন্তু সে সব ভুল ত আর সংশোধন করা যায় না। সে বলিল, "কিন্তু হাসপাতালে যখন গিয়েছিলাম, তখন তাঁ'দের প্রগাঢ় স্নেহেরই পরিচয় পেয়েছি; সে কি স্নেহ!"

এই সময় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাহার একখানি পত্র লইয়া আসিল। তাহার পত্র! কে লিখিল? সে কম্পিত অঙ্গুলীতে পত্র খুলিল—পত্রখানি পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কা'র পত্র?"

সে পত্রখানি তাঁহার কাছে দিল; তিনি পড়িতে বলিলে তাহার ভ্রাতা সুরপতির লিখিত পত্র পাঠ করিল। শুনিয়া মাসীমা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন, "আহা এমন লোকেরও এমন সর্ব্বনাশ হয়! ছেলেই যে ছিল জীবন!"

পত্রখানি রাখিয়া প্রণতার ভ্রাতা সকলকে সংবাদ দিতে গেল। প্রণতা বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

বহুক্ষণ ভাবিয়া সে পত্রখানি লইয়া আপনার ঘরে গেল—শ্বশুরকে পত্র লিখিবে। মনে প্রথমে একটু সঙ্কোচের—একটু দ্বিধার অনুভূতি হইতেছিল; লিখিতে আরম্ভ করিলে সে সব দূর হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, সে অন্ধকারে পথ পাইতেছিল না—আজ পথের সন্ধান পাইয়াছে। সে কি আর ভুল করিতে—সে পথ ত্যাগ করিতে পারে? সে যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহার পর সুরপতি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া প্রণতার যেন তৃপ্তি হইতেছিল না—সে বার বার তাহা পাঠ করিতেছিল—তাহা যেন শান্তিজলের মত পবিত্র, তেমনই স্নিগ্ধ ও কল্যাণকর।

সে লিখিল, সে এখন যে জীবন যাপন করিবে, পিতৃগৃহের পরিবেষ্টন তাহার অনুকূল নহে, তাই—"আপনার বাড়ী, দেবতার মন্দির—আমাকে সেখানে থাকিয়া আপনার পদসেবা করিতে অনুমতি দিন।" সে গৃহ আজ তাহার কাছেও দেবতার মন্দির বলিয়া মনে হইতেছিল। সে লিখিল, "আমি যত অপরাধই করিয়া থাকি না কেন, আপনার স্নেহ আপনাকে তাহা ক্ষমা করাইবে।" সুরপতির ও পিসীমা'র চরণে প্রণাম জানাইয়া প্রণতা স্বাক্ষর করিল—"আপনার অভাগিনী কন্যা।"

পত্র লিখিয়া সে পাঠ করিল—এতক্ষণ যে অশ্রু ঝরে নাই, এখন তাহা আর বাধা মানিল না—পত্রের উপরও কয় ফোঁটা পড়িল।

পত্রখানি ডাকে পাঠাইয়া আসিয়া সে মাসীমা'কে বলিল, "দিদিমা, আমি পত্রের উত্তর দিলাম।"

মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি লিখলে, দিদিমণি?"

"লিখলাম—আমি যা'ব।"

মাসীমা প্রণতার মুখের দিকে চাহিলেন। সে বলিল, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন—যেন তা'ই হয়। তা' হ'লে আপনাকেও আর কাশী থেকে এনে এখানে আটকে রাখব না।"

"তা'ই হ'ক, দিদি। সুখে হ'ক আর দুঃখে হ'ক—ঐ ঘরই ঘর।"

১৪

প্রণতার পত্র লইয়া সুরপতি ভগিনীর কাছে যাইয়া বলিলেন, "দিদি, বৌমা পত্র লিখেছেন।"

ভগিনী ভ্রাতার দিকে চাহিলেন। তিনি তখন ঠাকুরঘরের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিতেছিলেন। তাঁহার দৃষ্টিতে বিস্ময়—কিন্তু প্রসন্নতার অভাব।

সুরপতি বলিলেন, "বৌমা আসতে চা'ন।"

পিসীমা বলিলেন, "আর আসা কেন?"

"কেন, দিদি?"

"যখন আসবার, তখন এলেন না। যদি আসতেন—যদি সে দিন দিদির সঙ্গে না যেতেন, তবে হয় ত এমন সর্ব্বনাশ হ'ত না।"

কম্পিত কণ্ঠে সুরপতি বলিলেন, "দিদি, তুমি ভুল বুঝেছ। বৌমা যে সে দলে ছিলেন, তা' নীহার হয়ত

দেখতেই পায় নি। ক'জন বাঙ্গালীর মেয়ে—স্ত্রীলোক বিপন্ন দেখে সে তা'দের রক্ষা করতে গিয়ে জীবন দিয়েছে। যখন আমি তা' ভাবি তখন তা'র কাযের গৌরব যেন আমার শোকের ভার লঘু ক'রে দেয়। বৌমার যাওয়া না যাওয়ায় ঘটনার কোন পরিবর্ত্তন হ'ত না, দিদি।"

পিসীমা বলিলেন, "যখন তা'র জন্য সিংহাসন সাজান ছিল, তখন তা'তে বসল না—আজ এ যে ধূলার শয্যা।"

"এই ত এখন তাঁ'র আসন, দিদি! তিনি যে নীহারের স্ত্রী; তিনি যদি এখানে আসতে চা'ন, আমি ত 'না' বলতে পারব না। আমাদের রাগ-অভিমান সে সবই ত শ্মশানে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে।"

পিসীমা অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সুরপতি একটু চঞ্চল হইয়া ঠাকুরের দিকে চাহিলেন—ঠাকুরের মুখে লোকাতীত মাধুর্য্য—চির-প্রসন্নতা। তিনি ভগিনীকে বলিলেন, "বৌমা কি নিয়ে থাকবেন? যখন পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়েছিল, তখন এক বিধবা এই 'বিধবার ঠাকুর'কে বুকে নিয়েছিলেন—তা'র পর তাঁ'র কন্যা হ'তে আরম্ভ ক'রে মা আর তুমি—তোমরাও এই ঠাকুরের সেবায় শোকে শান্তি পেয়েছ—শূন্যকে পূর্ণ ভাবতে পেরেছ। হয়ত উনিই বৌমার মনে শান্তি দেবেন।"

পিসীমা কাঁদিতে লাগিলেন।

সুরপতি আপনাকে সংযত করিয়া ভগিনীকে বলিলেন, "তুমি পত্রখানা প'ড়ে দেখ।"

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে পিসীমা'র শোক যেন উথলিয়া উঠিল। তিনি কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিলেন না; তাহার পর ভ্রাতাকে বলিলেন, "তাঁ'কে আনবার ব্যবস্থাই কর।"

"তুমি যে আমাকে গিয়ে তাঁ'কে আনতে বলে-ছিলে, সে দিন যাওয়া হয় নি। হয় ত সে-ই ভুল হয়েছিল। তা'র পরে বিষাদের মূর্ত্তি মা আমাদের ক' দিন হাসপাতাল থেকে তোমার সঙ্গে এসেছিলেন—কিন্তু তাঁ'কে তাঁ'র মর্য্যাদা দিয়ে আনা হয় নি। আজ যে অবস্থাতেই কেন তিনি আসুন না—আমি গিয়ে তাঁ'কে নিয়ে আসব। তিনি দুঃখিনী—দুঃখের বাড়ীই তাঁ'কে সাজে।"

পিসীমা কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন।

সুরপতি প্রণতাকে লিখিলেন—

মা,

তুমি আসিতে চাহিয়াছ।

এ বাড়ীতে তোমার অধিকার আমার অধিকার অপেক্ষা অল্প নহে। তুমি কবে আসিবে, তোমার বাবাকে ও মা'কে জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে জানাইলে আমি যাইয়া তোমাকে লইয়া আসিব।

শৈশবে মাতৃহীন নীহার আমার যে পিতামহীর ও পিসীমা'র কোলে মানুষ হইয়াছিল, তাঁহাদিগের শিক্ষায় প্রতিদিন—নিত্যকর্ম্মরূপে সে যে রাধাবিনোদকে প্রণাম করিত, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তাঁহারই নির্ম্মাল্য হও; তিনি তোমার দগ্ধ জীবন শান্তিস্নিগ্ধ করুন।

তোমার কল্যাণকামী

নীহার-হারা নীহারের বাবা।

তিনি ভৃত্যকে দিয়া পত্রখানি পাঠাইয়া দিলেন।

১৫

শ্বশুরের পত্র পাইয়া প্রণতা প্রথমেই মাসীমা'কে বলিল, "দিদিমা, আমি যাচ্ছি।"

মাসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়, দিদিমণি?"

বড় দুঃখের ম্লান হাসি হাসিবার চেষ্টা করিয়া সে বলিল, "শ্বশুরবাড়ী। আপনাকে অনেকদিন আটকে রেখেছি; কিছু মনে করবেন না।"

"মনে কি করব, দিদিমণি? তবে তোমার এ যাওয়া—এ ত আর সুখের নয়। তাই মন প্রবোধ মানে না।"

প্রণতা যাইয়া তাহার মাতাকে তাহার যাইবার কথা বলিল। তিনি বলিলেন, "বলিস্ কি? সে কি কখন হয়?"

প্রণতা দৃঢ়ভাবে বলিল, "তা'ই হ'বে, মা।"

তাহার পিতা যেন স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

বিনতা আপত্তি করিলে প্রণতা বলিল, "দিদি, আজ আর তুমি আমার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিও না—আমি তোমার কথা শুনব না।"

সে ভৃত্যকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিল; বলিল, "আমার সঙ্গে কে যা'বে?"

তাহার পর দাদাকে সঙ্গে লইয়া প্রণতা বিধবার বেশে—বিধবার শুদ্ধ হৃদয় লইয়া তাহার দেবমন্দিরে প্রবেশ করিল। পিসীমা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। শ্বশুরের ও পিসীমা'র অশ্রুতে তীর্থস্নান করিয়া বিধবা প্রণতা "বিধবার ঠাকুরে"র সেবা শিক্ষা করিতে আত্মনিয়োগ করিল।

পরশ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

(১)

বুক ভরে না বাঁকা আঁখির
ওই চাহনী লুকানো,
এবার প্রিয়, পরশ দিও,
মুখের কাছে মুখ আনো।
সকল বেদন হরণ ক'রে,
এসো সজল জলধর হে,
লও হে কোমল শ্যামল ক'রে
কানন-লতা শুকানো।

(২)

কুসুম যেমন নিবিড় ক'রে
পায় বুকে তার ভ্রমরকে,
সেই ত পাওয়া—নইলে পাওয়ার
বলো করে শুমর কে।
এসো আমার পুণ্য ঘন,
এসো সুহৃদ চিরন্তন,
এসো আমার সকল প্রীতি,
সকল ভীতি চুকানো।

(৩)

ফুটাও আমার মাটির দেহে
এবার তুমি চাঁপা হে,
এসো আমার পীযূষ-প্লাবন
বুকের দুকূল ছাপায়ে;
এসো যুগের যুগের বঁধু,
এসো যুগের যুগের মধু,
এসো আমার পরশমণি
জনম জনম জোগানো।
হে মোর প্রিয়, পরশ দিও,
মুখের কাছে মুখ আনো।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন

লেডী অবলা বসু

১৯২২ খৃষ্টাব্দে দুইটী বিধবা লইয়া সামান্য একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া এই বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাণীভবনের তত্ত্বাবধায়িকা শ্রীযুক্তা শ্যামমোহিনী দেবী

বঙ্গদেশে নারীসমাজে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে নারীশিক্ষা সমিতি গঠিত হয়। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বঙ্গদেশে প্রাথমিক এবং অন্যান্য শিক্ষা নারীগণের মধ্যে যেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, নারীশিক্ষা সমিতির প্রচেষ্টা যে তাহার অনেক সহায়তা করিয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মিশনারীরা অনেক দিন হইতে আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁহারা কৃতিত্বের সহিত নারীগণের মধ্যে জ্ঞানের প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার জন্য দেশবাসী কৃতজ্ঞ থাকিলেও দেশের প্রাণকে তাঁহারা স্পর্শ করিতে পারেন নাই। নারীশিক্ষা সমিতি কলিকাতাতে এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে অনেক অসুবিধার সহিত সংগ্রাম করিয়া আট দশটী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। আজ তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি মধ্য-ইংরাজী ও হাই স্কুলে পরিণত হইয়াছে; এবং অনেকগুলির নিজস্ব গৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে। ভদ্রমহোদয়গণের অনুগ্রহে অনেকগুলি স্কুল তাঁহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে ও পূজার দালানে আরম্ভ হয়, এখন সেই স্কুল স্থানীয় ভদ্রলোকদের যত্নে নিজস্ব গৃহে পরিচালিত হইতেছে—ইহা কি কম গৌরবের বিষয়? যাহা হউক, কলিকাতা কর্পোরেশন যখন হইতে কলিকাতার প্রাথমিক শিক্ষার ভার লইলেন, তখন হইতে নারীশিক্ষা সমিতি তাঁহাদের কার্য্য গ্রামে আরম্ভ
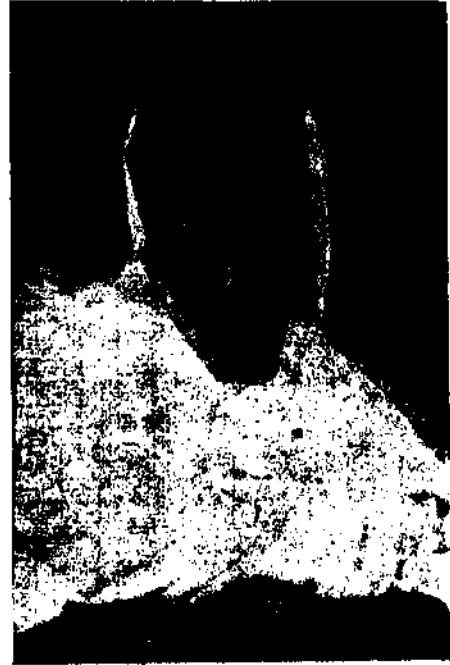
বাণীভবনের শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা হিরণবালা সেনগুপ্তা

করিতে সক্ষম হইলেন। যদিও কলিকাতার উপকণ্ঠে ম্যালেরিয়া প্রভৃতির জন্য শিক্ষয়িত্রীদের বহু ক্লেশ সহ

মাননীয়া লেডী অবলা বসু

সম্পাদিকা, নারীশিক্ষা সমিতি
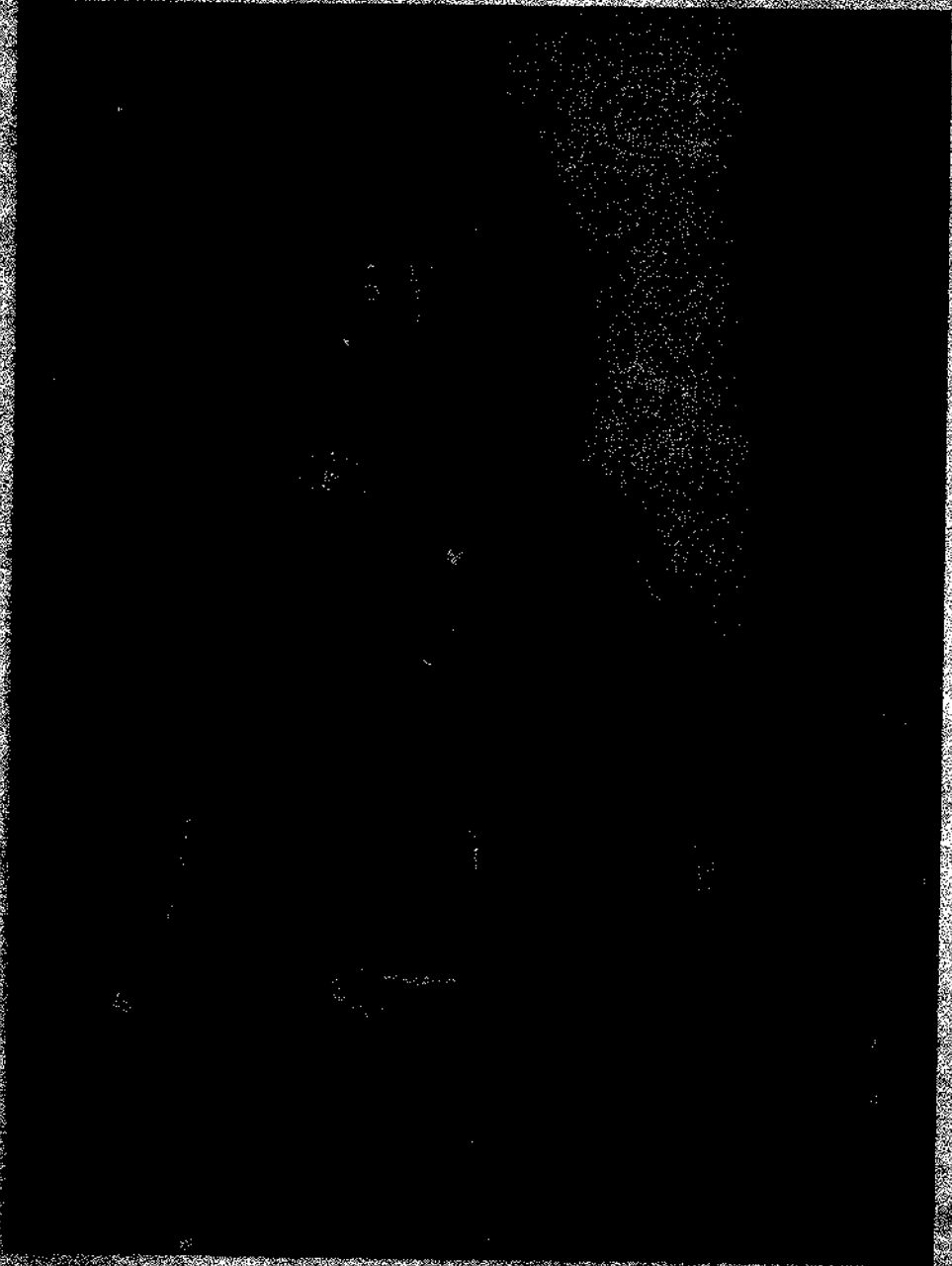
করিতে হইয়াছে, তথাপি সহরের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর অভাব হয় নাই। কিন্তু গ্রামে শিক্ষয়িত্রীর অভাব শিক্ষাবিস্তারের বিশেষ অন্তরায় হইল। তখন, যে সকল বিধবা অর্থসঙ্কটে পীড়িত হইয়া অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া শিক্ষালাভের জন্য উদগ্রীব ছিলেন, তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিয়া এই কার্য্যে ব্রতী করিবার জন্য নারীশিক্ষা সমিতি বিধবাশ্রম খুলিতে মনস্থ করিলেন। নারীশিক্ষা সমিতির প্রারম্ভ হইতেই অনেক অভাবগ্রস্তা বিধবা নারী তাঁহাদের অভাব-মোচনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। এই সকল নারীকে শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করিতে পারিলে গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের সহায়তা হয় এবং ইঁহারাও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া সম্মানের সহিত নিজেকে রক্ষা করিতে পারেন এবং অনেকে নিজ নিজ সন্তান ও পরিজন পালন করিতে পারেন। অনেকের ধারণা যে,

মহিলা-শিল্পভবনের তত্ত্বাবধায়িকা শ্রীযুক্তা সুপ্রভা রায়

বিধবারা গৃহে পরিশ্রম-পরাঙ্মুখ হইয়া আরাম করিবার জন্য আত্মীয়গৃহ হইতে চলিয়া আসেন। ইহা যে কতদূর অমূলক, তাহা বলা যায় না। অনেকেই উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বৃদ্ধ পিতা বা মাতা, সধবা হইলে কখন বা

মহিলা-শিল্পভবনের সহঃ-তত্ত্বাবধায়িকা শ্রীযুক্তা অমিয়া দেব

অপারগ স্বামীকে প্রতিপালন করেন। যাঁহারা সন্তানের মাতা তাঁহারা আত্মীয়ের গৃহে সন্তান রাখিয়া অতি-কষ্টে শিক্ষা সমাপন করিতেছেন, এবং শিক্ষা সমাপন করিয়া দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া সন্তান মানুষ করিতেছেন। দেশের বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের সময় আর পূর্ব্বের ন্যায় কেহ অভাবগ্রস্তা আত্মীয়াদের আশ্রয় দিতে পারিতেছেন না। সেইজন্য দলে দলে ভদ্রঘরের দুঃস্থ বিধবারা কোন উপায়ে উপার্জ্জন করিবার চেষ্টায় অন্তঃপুর হইতে বাহির হইতেছেন।

এই বাংলা দেশে ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা বিধবা সাড়ে চার লক্ষের উপর আছেন। তাঁহারা অপরের গলগ্রহ হইয়া নৈরাশ্যপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া কার্য্যক্ষম করিতে পারিলে আমরা জাতীয় জীবনে কত শক্তি লাভ করিতে পারি। সেই উদ্দেশ্যে নারীশিক্ষা সমিতি এই বিধবা-

শ্রম স্থাপন করিয়াছেন। বিধবাদের দুঃখ দূর করাই যাঁহার জীবনের একটী প্রধান কার্য্য ছিল, সেই প্রাতঃ-স্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র নামে এই বিধবাশ্রম "বিদ্যাসাগর বাণীভবন" উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর বাণীভবনে ৬০জন বিধবা স্ব স্ব ব্যক্তিগত আচার-নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সুনিয়মে শিক্ষালাভ করিতেছেন। ইঁহারা মধ্য-ইংরাজী পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা লাভ করেন। কারণ দেখা গিয়াছে যে, শিল্প, সেবা, তাঁত—যে কোন বিভাগেই হউক না কেন, সাধারণ শিক্ষা না থাকিলে কোন বিভাগেই কেহ পারদর্শী হইতে পারেন না।

পাঠান হয়। সেখানে এক বৎসর কাজ করিবার সময় তাঁহারা মাসিক ১০৲ বেতন পাইয়া থাকেন। গ্রামে শিক্ষকতা করিয়া পুনরায় এক বৎসর বাণীভবনে শিক্ষা-সমাপ্তির জন্য থাকিতে হয়। মধ্য-ইংরাজী শিক্ষা সমাপ্তির পর ইঁহারা যোগ্যতা অনুসারে কেহ ট্রেনিং, কেহ নার্সিং শিখিতে যান। কেহ কেহ শিল্প-শিক্ষকতার কার্য্যেও নিযুক্ত হন।

বাণীভবনে শিক্ষালাভ করিয়া এ পর্য্যন্ত শতাধিক বিধবা শিক্ষকতায় ও আর্ত্তসেবায়, এবং চারু ও কারু শিল্পের পারদর্শিতায় স্বাবলম্বী হইয়া স্বীয় পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

ভূগোল পাঠ

সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই তাঁতের কাজ ও জামার কাট ছাঁট ও সেলাই শিখিতে বাধ্য করা হয়। তদ্ব্যতীত যোগ্যতা অনুসারে অন্যান্য কুটীর-শিল্পও শিখান হয়। এখানে শিক্ষার্থিনীদিগকে সর্ব্বসুদ্ধ চারি বৎসর রাখা হয়। তিন বৎসর শিক্ষালাভ করিয়া যাঁহারা উপযুক্ত হন, তাঁহাদের গ্রামের বিদ্যালয়ে এক বৎসর শিক্ষকতার কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য

নারীশিক্ষা সমিতির অন্য কোন অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব না থাকিলেও কেবল এই একটি পুণ্য ও একান্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশবাসীর চৈতন্য উদ্বোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টাই ইহার সার্থকতা। সমিতি দেশের অবজ্ঞাত ও অপব্যয়িত এই প্রচুর প্রাণ-শক্তিকে নবজীবন দান করিতেছেন, তাহা যে কেহ বিদ্যাসাগর বাণীভবন দর্শন করিয়া, অল্পবয়স্কা এই

বিধবাদের কার্য্য দেখিয়া উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বিদ্যাসাগর বাণীভবনে বিধবাদের শিক্ষার আয়োজন ও অভিজ্ঞতার দ্বারা দেশের সাধারণ স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে সমিতির যে জ্ঞান হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, নারী-জাতির জীবনের স্বাভাবিক শক্তির সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা ও শিল্পশিক্ষার সংমিশ্রণ না হইলে, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সহজ হইবে না। যাহাতে গৃহকর্মের মধ্যেও নারী অর্থকরী কোন কাজ করিতে পারে, সেইজন্য প্রত্যেক নারীকেই কোনও রকম অর্থকরী কুটীরশিল্প শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

বাণীভবনে সাধারণ শিক্ষার সহিত যেমন কুটীরশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তেমন সেবা ও নার্সিং শিক্ষার মধ্য দিয়া যাহাতে তাহারা আর্ত্তসেবায় এবং অপরের সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে সহানুভূতিসম্পন্ন ও সমাজ-জীবনে কার্য্যকরী হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বাণীভবনে শিল্পশিক্ষা বিভাগে দৈনিক ছাত্রীও লওয়া হয়। সকলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন না, সেজন্য এ দেশের বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের দিনে অনেক গৃহস্থঘরের কন্যা ও বধূ সংসারের অবস্থা যৎকিঞ্চিৎ

সেলাই

স্বচ্ছল করিবার অভিপ্রায়ে বাণীভবনের শিল্পবিভাগে দৈনিক ছাত্রীরূপে বয়ন, সূচীশিক্ষা, তাঁত, বস্ত্ররঞ্জন প্রভৃতি গৃহশিল্প শিখিতে আসেন। দৈনিক বিভাগে প্রায় ৮০জন বিধবা, সধবা ও কুমারী ছাত্রী স্ব স্ব রুচি ও যোগ্যতা অনুসারে (১) জ্যাম, জেলি, আচার; (২) সেলাই, কাটছাঁট; (৩) সূক্ষ্ম কারুকার্য্য; (৪) বয়ন; (৫) বস্ত্ররঞ্জন; (৬) বুক-বাইণ্ডিং; (৭) চামড়ার কার্য্য প্রভৃতি বিনা বেতনে শিখিতেছেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ আয়ের অংশ প্রত্যেক শিক্ষার্থিনী পাইয়া থাকেন। বাণীভবনের বিধবাদের হাতখরচ ইহা হইতেই চলিয়া যায়।

এই শিল্পবিভাগে শিক্ষা সমাপন করিয়া ২২জন বিভিন্ন স্থানে শিক্ষকতার কাজ করিতেছেন ও ৩৪জন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন। দুঃস্থ পরিবারের মেয়েরা তাঁহাদের সংসারের সমুদয় কাজ

সূক্ষ্ম সূচী-কার্য্য

শেষ করিয়া দ্বিপ্রহরে ১২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত এখানে অবৈতনিক শিক্ষা লাভ করেন। অর্থকরী বিদ্যার সহিত তাঁহারাও সাধারণ শিক্ষার সুযোগ পাইয়া সাংসারিক ও মানসিক উভয় প্রকার উন্নতি লাভ করিতেছেন।

আজ পর্য্যন্ত বাংলার বৃহত্তর ও ব্যাপক কর্ম্মক্ষেত্রের অতি সামান্য অংশেই সমিতির শুভ প্রচেষ্টা ব্যাপ্ত হইয়াছে। বাণীভবনে মাত্র ৬০জন বিধবার স্থান আছে কিন্তু প্রতিবৎসরই বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জেলার শত শত বিধবার কাতর আবেদন আসিতেছে।

নারীশিক্ষা সমিতি কলিকাতাস্থ বাণীভবনকে কেন্দ্রস্থানীয় করিয়া প্রতি জেলাতে বিধবাশ্রম স্থাপন করিতে পারিলে বিধবাদের শিক্ষার অভাব প্রকৃতপক্ষে মোচন করা যায়। বাণীভবনে প্রত্যেক বিধবাকে ৪ বৎসর রাখিতে হয়। তাহার পরিবর্ত্তে প্রতি জেলাতে বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়া সেখানে তাহাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শেষ বৎসরে কলিকাতায় রাখিলে অল্প

বয়ন

গালিচা-বয়ন

ব্যয়ে অনেককেই কার্য্যক্ষম করান যায়। বাণীভবনের শিক্ষাপ্রণালী ও তাহার সফলতা দেখিয়া মনে হয়, দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে পড়িলে এই বিরাট কর্ম্মপ্রচেষ্টা সফল হইতে পারিবে।

এই কয় বৎসর ভাড়াটিয়া গৃহে অতিকষ্টে সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহ হইতেছিল। সম্প্রতি ২৯৪।৩ অপার সার্কুলার রোডে সমিতির নিজস্ব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। স্বর্গীয়া মহামতি হরিমতি দত্ত এই গৃহ নির্ম্মাণের প্রধান সহায়তা করিয়াছেন। তিনি সমিতির প্রারম্ভাবধি বিধবাদের দুঃখনিবারণে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত ২৫ হাজার টাকাতেই এই গৃহের সূচনা হয়। তিনি তাঁহার পরলোকগত স্বামী পরাণচন্দ্র দত্তের স্মৃতিতে এই অর্থ দান করেন এবং বিদ্যাসাগর বাণী-ভবনের প্রধান অংশ তাঁহারই নামে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনও এই গৃহনির্ম্মাণের জন্ত এক বিঘা ছয় কাঠা জমী দান করিয়া বঙ্গনারীদের

চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই জমী দানের প্রধান উদ্যোক্তা ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং দেশপ্রিয়

রং করা ও পাড় ছাপান

যতীন্দ্রমোহন। বলা বাহুল্য, এই জমী না পাইলে কলিকাতা সহরে বিধবাদের শিক্ষার জন্ত বিদ্যাসাগর বাণীভবনের স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ সম্ভবপর হইত না।

বিদ্যাসাগর বাণীভবন নির্ম্মাণের জন্ত প্রায় সত্তর হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে—সে জন্ত সমিতি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। দেশবাসী সদাশয়া মহিলা ও মহানুভব পুরুষদের নিকট ভিক্ষা ছাড়া এই ঋণ হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই। আমাদের দেশে দানশীলা মহিলার অভাব নাই—তাঁহারা পতিপুত্রের নামে একটী গৃহের ব্যয় দান করিয়া তাঁহাদের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিতে পারেন। এত দিন দেশবাসীর দয়াতেই এই বৃহৎ অনুষ্ঠানটীর কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বিধবাদের দুঃখ মোচন ও দেশে শিক্ষা প্রচার—এই দুই কার্য্যে সমগ্র দেশবাসীর সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের দয়াতে সমিতির সকল প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

"বিধবা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভোগসুখ পরিত্যাগ করে, গৃহকার্য্যে অতি নিপুণা হইয়া উঠে, অতিথি অভ্যাগত কুটুম্ব স্বজনদিগকে খাওয়াইতে ভালবাসে, স্বয়ং সবল এবং সুস্থশরীরী হয় এবং ঈর্ষ্যাদি দোষ পরিশূন্যা হইয়া সধবাদিগের প্রতি অনুগ্রহশালিনী এবং তাহাদিগের পুত্রগণের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহশীলা হয়। যে বাড়ীতে এরূপ বিধবার অবস্থান সে বাড়ীতে একটী জীবন্ত দেবীমূর্ত্তির অধিষ্ঠান।"

— ভূদেব

স্পর্শের মায়া

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

১

—দুলি, এলি? আজ যে এত দেরী?

মাথার শূন্য ঝাঁকাটা মাটিতে ফেলে, প্রতীক্ষমান রুগ্ন স্বামীর কাছে এসে দুলারী জিজ্ঞাসা করলে—

—কেমন আছিস্ রে? জরটা আর আসে নি তো?

—না।

—দেখি, তুই তো আবার বুঝতে পারিস্ না, সেদিন জর গায়েতে…

স্বামীর গায়-মাথায় হাত দিয়ে দেখে, দুলারী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—

—নাঃ, গা তো বেশ ভালই আছে। হকীমের সেই দাওয়াইটা দুপুরে এক পুরিয়া খেয়েছিলি?

ভিখুরাম ঘাড় নেড়ে, ঈষৎ অনুযোগের সুরে বল্লে—এত দেরী করলি কেন রে? আমি যে সেই কখন থেকে…

—তা কি করব বল্? মনে করলেই তো আসা যায় না! আমার হাতে তো ঘড়ী লাগানো নেই?—

একটু ঝাঁঝের সহিত কথাটা বলে দুলারী ধপ্ ক'রে মাটিতে ব'সে পড়ল। ভিখু চকিত হ'য়ে দেখলে দুলারীর চোখ মুখ যেন ছলছল করছে, রংটা শ্যামলা হ'লেও নিটোল গাল দু'টি তার লাল হ'য়ে উঠেছে—পাকা আপেলের মত, এটি শ্রান্তি, না উত্তেজনা?

কিন্তু ক্লান্ত হ'বার মত মেয়ে তো দুলারী নয়, তার মত অনলস, শ্রম-সহিষ্ণু……

ভিখু আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে—আজ তোর কি হয়েছে রে দুলি?

—কিছু না, কি আর হ'বে?

—তবে মুখ চোখ অমন ছলছল করছে, রোদ লাগ্ল নাকি?

—হ্যাঁঃ! কাল থেকে তুই ছাতা ধ'রে চলিস্, নইলে রোদ্ লেগে কোন্ দিন মূর্চ্ছা যাব আবার!

দুলারী হাস্‌বার চেষ্টা করলে কিন্তু হাসি এলো না, পাতলা ঠোট দু'খানি শুধু কেঁপে উঠল—চোখ দুটো আরো বেশী করে ছল্‌ছলিয়ে এলো যেন। সেটুকু গোপন করবার জন্যই সে মুখখানা নামিয়ে নিয়ে বল্লে—

—গোটা ভাদ্দরের রোদ মাথার উপর দে' গেল, তখন রোদ লাগ্ল না, লাগ্ল এখন! হুঁঃ, এমন বুদ্ধি নইলে কি……

—ভালোরে ভালো! আরসীতে মুখখানা একবার দেখ্‌না বাপু! তাহ'লেই তো বুঝতে পারবি…সত্যি দুলি, আজ তোর কি হল বল্ দেখি! বল্‌বি না?—আচ্ছা!

—আঃ! কি জ্বালা গো! বল্‌ছি কিছু হয় নি, তবু শুধু শুধু বিরক্ত করা!

গমনোদ্যতা দুলারীর হাত-খানা ধ'রে ফেলে তার উত্তেজনারক্ত মুখের পানে খানিক অপলকে তাকিয়ে থেকে ভিখু অধীর ভাবে বল্লে—কেউ কি কিছু বলেছে?—হাঁারে?—লুকোচ্ছিস্ কেন?—বল্‌না—সত্যি ক'রে বল্—তাহলে ঐ লাঠির ঘায়ে দিই তার মাথার খুলি উড়িয়ে—ব্যামো হ'লে কি হয়—এদেহে এখনো এতো শক্তি আছে, যাতে……

ভিখুর রগের শিরাগুলো স্ফীত হ'য়ে উঠল। পেশী-বহুল বলিষ্ঠ হাত দু'খানা মুষ্টিবদ্ধ করে সে খাটিয়া থেকে উঠে' প'ড়ে বল্লে—লোকটা কে? কি বলেছে তোকে শুনি?

—উঃ! ছাড়ো ছাড়ো হাতখানা ভেঙ্গে দেবে নাকি?

দুলারী শিউরে উঠে' স্বামীর মুঠোর মধ্যে থেকে হাতখানা টেনে নিয়ে এসে বল্লে—পাগল আর কি! এত বড় বুকের পাটা কা'র যে, দুলিয়া কাছিন্‌কে… হুঁ! তখুনি ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব না!

ভিখুরাম এবার সুস্থ হ'য়ে ব'সে প্রসন্নমুখে বল্লে—সে আমি জানি—নইলে তোকে কি এমন ক'রে পথে ঘাটে একলা ছেড়ে দিতে পারতুম ?

দুলারীর ডাগর চোখদু'টির কোণে কোণে জল ভ'রে এল। হায়! স্বামীকে এমন ভাবে মিছে কথায় ভুলিয়ে রাখতে সে আর কতদিন পারবে! হতভাগা ছোঁড়া-দের ঘরে কি ঝি, বউ, মা, বোন্ নেই? দুলারীকে পথে ঘাটে দেখলেই ওরা কেন অমন করে? শুধু গাঁয়েই নয়—বাজারেও!—গায়ে তো দুখান্ সোনা-রূপোও নেই ছাই! গরীবের বউ, ছেঁড়া কাপড় আর কাঁচের চুড়ী সম্বল—তবুও কেন যে···

সরলা 'দেহাতে'র মেয়ে দুলারী—জান্ত না বিধাতা তা'কে যে সম্পদ দিয়েছেন তা' রাজরাণীরও কাম্য। বাস্তবিক অমন রূপ ছোট লোকের ঘরে দেখা যায় না। রংয়ের 'জেল্লা' না-ই থাক্, সেই তন্বী তরুণীর যৌবন-স্ফুটিত পেলব তনু-শ্রীতে, চলনের ছন্দ-দোদুল ভঙ্গীতে, ঠোঁটের কোণে লেগে-থাকা মধুর চাপা হাসিটুকুতে, আর সেই তুলি দিয়ে আঁকা কালো কুচ্‌কুচে ভুরু দু'খানির তলে টানা টানা, বাঁকা চোখ দু'টির আবেশময় মদির চাহনীতে এমন একটা মিষ্টতা ও মাদকতা ছিল, যা' দেখে তরুণদের প্রাণে স্বতঃই চাঞ্চল্য জেগে ওঠে, এর জন্যে তাদের দোষ দেওয়া বৃথা।

যখন দরিদ্র শ্রমিক-বধূ দুলারী ঘুঁটে ও শাকসব্জীর ঝুড়ীটা মাথায় রেখে, পেঁয়াজী রংয়ে ছাপানো ময়লা সাড়ী খানা গুছিয়ে প'রে কমনীয় বাহুর ললিত দোলানীতে মোহের সৃষ্টি করে, পায়ের কাঁসার 'পয়জনা'র রুনু ঝুনু ধ্বনিতে সঙ্গীতের সুর বাজিয়ে হাটের পথে চলে যায়, তখন পথচারীদের মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়ে যায়! তাদের ভিতরে কেউ কেউ পথ চল্‌তে চল্‌তেই দুলারীর প্রতি লক্ষ্য ক'রে ঠুংরী গেয়ে ওঠে—

"জীয়া চাহে করু তোকা পেয়ার
শ্যাম্‌লী সলোনী—ও প্যারী নার!"

কেউ বা—

"ইয়ে তেরে চশ্‌মে গুলাবী হাঁয় মঁয়ে কে পেয়ালে,
যে পিয়েহি মুঝে—মস্তানা বনা দেতে হাঁয়—" *

ব'লে গলা ছেড়ে, গজল্ ভাঁজতে থাকে। আর কেউ বা সওদা কেনার অছিলায় সেই রূপসী পসারিণীর মাথার পসরা নামিয়ে, হাতে হাত ঠেকিয়ে, ছুটো ফষ্টি নষ্টি ক'রে গালাগালি খায়!

গাঁয়ের লোকেরা বলাবলি করে—ভিখুয়া ব্যাটার কি কপাল! ওই তো 'কালা দেও'য়ের মত চেহারা! এক পয়সার মুরোদ নেই, তার কি না অমন চমৎকার বউ!

সব চেয়ে বেশী জ্বালিয়েছে ওই চন্দনলাল, গ্রামের জমীদার ঠাকুরদের পাটোয়ারী সে, বেশ অবস্থাপন্ন লোকটা—গাঁ'য়ের মধ্যে সম্মান-প্রতিপত্তি আছে—দেখ্‌তেও বেশ সুপুরুষ। দুলারীর রূপ-যৌবন তাকে মুগ্ধ-লুব্ধ করেছিল আজ নয়, অনেকদিন। কিন্তু কাছে ঘেঁস্‌তে সাহস পায় নি ওর শাশুড়ী মাগীর ভয়ে, বুড়ী যেন ডাইনী! বউটাকে যক্ষীর মত সর্ব্বক্ষণ আগ্‌লে থাকৃত, এতটুকু বেচাল দেখলে গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিত। মাগী মরেছে না হাড় জুড়িয়েছে!

তারপর ভিখুয়া সেও কম নয় তো! গরীব হ'লে কি হয়—তার অসুরের মত দেহখানায় এতটা শক্তি ছিল যাতে চন্দনলালের মত পাঁচটা জোয়ান সায়েস্তা হ'য়ে যায়। কিছুদিন জমীদারের লেঠেলের কাজও করেছিল সে। এখন ক'মাস ধ'রে পিলে লিভার জ্বরে ভুগে ভুগে নির্জীব হ'য়ে পড়েছে তাই, নইলে গাঁয়ের লোকের সাধ্য কি তার বউয়ের দিকে উঁচু নজরে চায়!

শাশুড়ী নেই, স্বামী রোগে প'ড়ে,—এই তো সুবর্ণ-সুযোগ। যে পথে দুলারী বাজার থেকে ফেরে, সেই পথের মোড়ে যে সব-চেয়ে বড় বট গাছটা লম্বা-লম্বা ঝুরি নামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তারই আড়ালে চন্দন

* তোমার ওই গোলাপী আঁখি দু'টি যেন মদের পেয়ালা, যা' পান না করেই মত্ত ক'রে দেয়।

অপেক্ষা করে ; দুলারীর সাথে গাঁয়ের অন্য মেয়েছেলেরা থাকলে শুধু চোখের দেখা দেখেই চ'লে যায়। আর যেদিন ওকে একলা পায় সেদিন যে কি আনন্দ—কি যে বলবে ওকে—কি ক'রে যে খুসী করবে চন্দন তা' ভেবেই পায় না।

সে কখনো ভিখুর কুশল প্রশ্ন করে, আশ্বাস দেবার ছলে দুটো মিষ্টি-কথা ব'লে দুলারীর মন ভিজোবার চেষ্টা করে, কখনো বা কাছ ঘেঁসে এসে দরদ জানিয়ে বলে—

—আহা! তুমি যে হাঁপিয়ে পড়েছ বউ! এই গাছতলায় ব'সে একটু জিরিয়ে যাও না। পথখানি তো বড় কম নয়, ওই অত বড় ঝাঁকাটা মাথায় ক'রে......উঃ! অন্য মেয়ে হ'লে এদ্দিন কবেই না...... তোর এ কষ্ট দেখে আমার এত দুঃখ হয়— কি বলি? ইচ্ছে করে—

কিন্তু ইচ্ছেটা আর ব্যক্ত করা হয় না।

দুলারী কোনো দিন শুধু ভ্রূকুটী ক'রে নীরবে পাশ কাটিয়ে চ'লে যায়, আর কোনদিন চন্দনের কাতর মুখের পানে একটুকু তাকিয়ে থেকে ফিক্ ক'রে হেসে ফেলে। বলে—

—পরের বউয়ের 'পরে তোমার অত দরদ কেন, বাবুজী? আমার ঘরে কি দরদ করবার লোক নেই মনে করো? —

সেই যে হাসিটুকু......ওতেই চন্দনের সাহস বেড়ে যায়।

হয় তো জোর করলে এ বনের পাখী এদ্দিন কবেই ধরা পড়ত, কিন্তু চন্দন তা' চায় না। দুল্লির 'পরে জোর করতে গেলেই তার দেহ-মন দ্বিধায় সঙ্কোচে ভ'রে যায়—কি জানি কেন!

দুলারী বড় শক্ত মেয়ে, সহজে টলবার নয়। প্রথম প্রথম চন্দনলালকে সে যমের মত ভয় করত, তার কথা স্বামীকে কতবার বলতে গেছে, কিন্তু বলতে পারে নি। কারণ ভিখুর রাগ সে ভাল ক'রেই জানে। বেচারা রোগে ভুগে একে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে, তার ওপর পাটোয়ারীর মত একজন ক্ষমতাশালী লোক, রাগের মাথায় হঠাৎ যদি একটা খুন-খারাপি ক'রে বসে—তবেই তো... তার চেয়ে চুপ ক'রে যাওয়াই ভাল। ও আর কি করবে? সত্যি সত্যি বাঘ তো নয় যে গিলে খাবে? এই সব ভেবে দুলারী মুখ বুজিয়ে থাকে। চন্দনলালের আদর বা অত্যাচার ক্রমশঃ তার গা-সওয়া হ'য়ে আসছিল—কিন্তু আজকাল সে এমন বাড়াবাড়ি করছে যে, এ ভাবে চুপ ক'রে থাকা আর চলে না।

এই যে আজই—হাট থেকে ফেরবার পথে কি নাকালটাই না করলে! দুলারীও লজ্জা-সঙ্কোচ ছেড়ে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছে মিঠে-কড়া ক'রে। কিন্তু তাতেই কি লজ্জা আছে বেহায়াটার? কালই আবার জুটবে এসে। ওকে কি ক'রে জব্দ করা যায়? দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের এই উৎপীড়ন নিবারণ করা যায় কি ক'রে? স্বামীর কানে তুললে হিতে বিপরীত হ'বে। গরীবের বউ পর্দ্দানসীন্ হ'য়ে ঘরে ব'সে থাকাও পোষায় না—এদিকে ব্যাপারটা যেরকম দাঁড়িয়েছে তাতে কোন্‌দিন একটা কিছু......নাঃ, দুলারী কি যে করবে ভেবেই ঠিক করতে পারে না।

—আজ বাজারে যাবি না দুল্লি?

দুলারী ঘরের মেঝেয় পা ছড়িয়ে মুখ নীচু ক'রে ব'সে কি ভাবছিল, স্বামীর প্রশ্নে মুখ না তুলেই উত্তর দিলে—

—হ্যাঁ, তাই তো ভাবছি। ঘুঁটেগুলো একটু কাঁচা রয়েছে যেন, আজকের রোদটা পেলে......

—তা হলে সব ক্ষীগুলো না তুললেই হ'ত—

দুলারী একটা উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

তার মুখ-চোখের উদাস ক্লান্ত ভাব লক্ষ্য ক'রে ভিখু বল্লে—

—আচ্ছা, আজ থাক্ না—না-ই বা গেলি—

দুলারী ক্লিষ্ট-স্বরে বল্লে—

—না গেলে কি চলে ? খাবি কি ?

—কেন ? ঘরে আটা আছে তো ? তাতেই চ'লে যাবে এবেলা, দুখান্ রুটী আর শাকের একটু ভুজিয়া—সেই বেশ হ'বে। তোর ওই মুগের ডাল রোজ রোজ আর ভাল লাগে না বাপু!

—বেশ! সে এবেলা যেন হ'ল—তার পর কাল? সাত সকালেই কার কাছে হাত পাত্তে যাব, বল্ তো ?

দুলারী বিক্রেয় জিনিসগুলি গোছাতে আরম্ভ করল ক্ষিপ্রহস্তে।

ভিখু ব্যস্ততার সহিত বল্লে—

—আহা! থাক্ না—বল্‌ছি, আজ গিয়ে কাজ নেই—তোর চেহারাটা যেন কেমন কেমন লাগ্‌ছে—একটা অসুখ বিসুখ হ'য়ে পড়ে যদি—

—কিচ্ছু হ'বে না—গরীবের বউয়ের আবার সুখ-অসুখ কি ?

ঝাঁকাটা মাথায় তুলে, অনিচ্ছুক পা দু'খানা জোর ক'রে টেনে নিয়ে দুলারী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল—স্বামীকে আর বাধা দেবার অবকাশ না দিয়ে।

কিন্তু আধ ঘণ্টা না যেতেই সে ফিরে এল।

—নাঃ,—আজ আর যাওয়া হ'ল না,—শরীরটা কেমন করছে—

ভিখু চিন্তিত হ'য়ে বল্লে—তাইতো—হঠাৎ এমন হ'ল কেন রে ?

—কি জানি, ঐ যে ঠিক্ যাবার সময়টিতে তুই 'টুকে' দিলি, তখুনি আমার মনে……

—শোনো কথা! আরে, আমি তো জানি—আমি তো মুখ দেখেই বুঝেছি তোর শরীরটা ভাল নেই। সেই জন্যেই না মানা করছিলুম—থাক্, বেশ করেছিস্ ফিরে এসেছিস্।

বেচারা ভিখুরাম স্ত্রীকে বড্ড ভালবাসত। সে যখন ভাল ছিল—তখন দুলারীকে এমন শ্রমসাধ্য কাজ করতে দেয়নি, কিন্তু এখন ?—এখন সে নিরুপায়! এই অসুস্থ, অক্ষম দেহ নিয়ে মেহন্নৎ মজুরী কিছুই করা চলে না তো…… কাজেই……

গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিয়ে, ক্ষেতের শাক-পাত বেচে দুলারীই এদ্দিন সংসারটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে টেনে টুনে—তার ওপর আবার রোগ, একদণ্ড জিরেন পায় না বেচারী! এই কাঁচা বয়সে এত খাটুনি সহ্য হয় কি ?—কি করা যায়, যেমন কপাল ক'রে এসেছে……

—এ বেলা আর তোকে কিছুই করতে হ'বে না দুলি! তুই চুপ ক'রে শুয়ে থাক্, আমি ধীরে ধীরে সব ক'রে নেব।

ভিখু সব্জীগুলোয় জলছড়া দিয়ে রাখ্‌তে গেল। দুলারী তার হাত থেকে জলের ঘটীটা কেড়ে নিয়ে ত্বরিতে ব'লে উঠল—

—কেন গা? আমার গতরে কি পোকা ধরেছে না কি?

ভিখু বিস্মিত হ'য়ে বল্লে—

—এই যে বল্‌লি শরীরটা অসুখ ……

— কে বল্লে অসুখ ? কাঁকালটায় ব্যথা ধরেছিল—ফিক্ ব্যথা,— সেরে গেছে এখন।

ভিখু আর কিছু বল্লে না। কর্ম্ম-নিরতা পত্নীর পানে দরদ-ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেল্লে — ক্ষোভের, অক্ষমতার সে নিঃশ্বাস।

সন্ধ্যা হয় হয়। দুলারী তাদের বাটীর পিছনের মাঠটায় কাঠ কুড়োচ্ছিল, রান্নার জন্য। গরীবের সংসার, কাঠকুটোর সংস্থান এমনি ক'রেই করতে হয়। প্রকাণ্ড মাঠ, জনশূন্য। দিনশেষের চিক্‌মিকে আলো মাঠের সীমানায় সোণালী রেখা টেনে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরের গাছপালাগুলো ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসছে ক্রমশঃ।

দুলারীর মন আজ শঙ্কাশূন্য, প্রফুল্ল। যার জন্য পথে ঘাটে বেরোতে সে ভয় পায়, সে লোকটা গাঁয়ে নেই, কোথায় বেরিয়েছে কাজে। দুলারী একটা

ঝোপের পাশে একলাটি ব'সে কুড়িয়ে-আনা কাঠগুলো গোছাতে গোছাতে গুন্ গুন্ ক'রে গান করছিল আপন মনে। হঠাৎ কে যেন ডাকলে তার নাম ধ'রে। দুলারী চমকে উঠল—এ যে চন্দনলাল! কি মুস্কিল! আপদটা এরি মধ্যে আবার—

কিন্তু চন্দন কাছে এসে বেশ সহজভাবেই জিজ্ঞাসা করলে—ভিখুরাম কেমন আছে, দুল্লি?

দুলারী কাঠগুলো বাঁধতে বাঁধতে নতমুখে উত্তর দিলে—ভালো।

তার বুকের মধ্যে তখন গুড়্ গুড়্ করছিল। ভর সন্ধ্যে বেলা, কাছেপিঠে কেউ নেই, কি জানি ও কি মনে ক'রে এসেছে! দুলারী তখন পালাতে পারলে বাঁচে। তার মনের ভাব বুঝতে পেরেই যেন চন্দন একেবারে সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়াল।—বল্লে —ভালো আছে তবে কাজে যায় না যে?

—আমিই যেতে দিই না,—শরীরে 'তাকত' আসে নি এখনো—প'ড়ে ট'ড়ে যায় যদি……

উঃ! কি ভাগ্যবান এই ভিখুরাম!

চন্দনলালের বুকখানা দুলিয়ে দিয়ে হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল।

—কিন্তু তুই যে এমন ক'রে দিনরাত খেটে খেটে মরছিস্, তার কি একটু মায়াও করে না?

—গরীবের মায়া করলে চলে না বাবু! যার ঘরে এত অভাব। আজ দুলারীর কথার সুরে রূঢ়তার লেশ মাত্র ছিল না, চন্দনের আন্তরিকতাটুকু তার অন্তর স্পর্শ করেছিল বুঝি!

চন্দন এবার ভরসা পেয়ে ধ'রে-আসা গলাটা পরিষ্কার ক'রে বল্লে—তোর আবার অভাব কি দুল্লি? ভগবান তোকে যা' দিয়েছেন তাতে…কিন্তু তুই তো শুনবি না, সেদিন নোটখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে গেলি। আমার মনে এত কষ্ট হ'ল—আমি তো তোর ভালোর জন্তেই … ও কি চললি? না না, একটুক্ষণ থাক্ দুল্লি! তোর সঙ্গে দু'টো কথা বলব শুধু—

চন্দনের কোমল কণ্ঠস্বরে এমন একটা ব্যাকুলতা ছিল, যাতে মনে মনে রাগ থাকলেও দুলারীকে দাঁড়াতে হ'ল। চন্দনের দিকে ফিরে সে বল্লে—

—কি বলছ বলো, দেরী করতে আমি পারব না।

—কি আর বলব? আমাকে তুই দয়া কর দুল্লি! আমি যে—উচ্ছ্বসিত আবেগে অধীর হ'য়ে দুলারীর সবুজ কাঁচের চুড়ী-পরা গোলগাল হাত দু'খানি দু'হাতে ধ'রে, চন্দন বিহ্বল কাতর দৃষ্টিতে তার মুখপানে চেয়ে রইল। চোখ দু'টি তার ছল ছল। এক মুহূর্ত্তে দুলারী নিশ্চল স্তব্ধ হ'য়ে গেল। মুখে একটা কথা নেই, যেন পাথরের পুতুলটি!

—তোর পায়ে পড়ি দুল্লি!

নরম হাত দু'খানি মুঠোয় চেপে চন্দন কাছে টানতেই দুলারী যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে চকিত স্বরে ব'লে উঠল—কি চাও তুমি? তোমার মৎলবখানা কি? গরীবের উপর অনর্থক জুলুম ক'রো না বাবু। ছোটলোকের মেয়ে, গরীবের বউ—তাই লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে তাকে …

—দুলিয়া!

—থাক্! আমি আর কিছু শুনতে চাই না। গরীবের মান ইজ্জৎ নেই—না? সরো, ছেড়ে দাও আমাকে, ফের যদি কোনোদিন জ্বালাতন করতে এসো, তাহ'লে ……

চন্দনের শিথিল মুষ্টি হ'তে হাত দু'খানা টেনে নিয়ে তার মুখের পানে একটা তীব্র কটাক্ষ হেনে দুলারী আরক্ত মুখে হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল। তার কষ্ট-সংগৃহীত কাঠগুলো সেইখানেই প'ড়ে রইল। চন্দন হতবুদ্ধি, নির্ব্বাক!

ছিন্ন-বসনা, নিরাভরণা নারী—হয় তো দু'বেলা অন্নও জোটে না, তার এত দর্প!—এত তেজ!

এ যেন ছাই চাপা আগুনের ফিন্‌কি!

৩

সেদিনকার সেই ঘটনা—তুচ্ছ হ'লেও চন্দনলালের জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এনেছিল।

দুলারীর সেই প্রত্যাখান চপলচিত্ত যুবকের উগ্র লালসাময় মোহ, স্নিগ্ধ ভালবাসায় রূপান্তরিত ক'রে তার গর্ব্বিত উদ্ধত প্রকৃতিকে এমন নম্র শান্ত ক'রে দিয়েছে যে, দেখে মনে হয় না—এ সেই মানুষ!

চন্দন এখন ইচ্ছা ক'রেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়—কাজে, অকাজে।

গ্রামে থাকলেও দুলারীর ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না। দরকার কি?

থাক্—সে সুখে থাক্,—কাঙাল স্বামীর আদরে সোহাগে পরিতৃপ্ত হ'য়ে, নারীত্বের নির্ম্মল পবিত্রতায় মণ্ডিত হয়ে, রাজরাণীর গৌরবে—চন্দন তাকে আর জ্বালাতন করবে না কোনো দিন!

তার দেওয়া ব্যথাই চন্দনের জীবনের পরম সুখ।

প্রায় মাসখানেক বাদে ··· একদিন বিকালের দিকে চন্দন গ্রামে ফিরছিল সপ্তাহ-কাল অনুপস্থিতির পর।

বাজারের মাঝামাঝি এসে ঘোড়ার 'রাশ' আল্‌গা দিয়ে ধীরে ধীরে যেতে যেতে সে দেখ্‌তে পেলে অদূরে রাস্তার ধারে একটা পানের দোকানের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দুলারী—খালি ঝুড়ীটা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে রেখে, হাত মুখ নেড়ে হেসে হেসে কি সব বল্‌ছে। তার মাথায় আজ ঘোমটা নেই, পরণে সে ময়লা ছাপার কাপড় নেই, একখানা সবুজরংয়ে ছাপানো রঙীন্ সাড়ী পরেছে, গলায় সোনালী মোতির কণ্ঠী; এলোমেলো কোঁকড়া চুলগুলি পরিপাটী করে বাঁধা, কি সুন্দর! দুলারীর এ মোহিনী মূর্ত্তি চন্দন কখনো দেখেনি, সে দেখেছিল—সরম-ভয়ে সঙ্কুচিতা দরিদ্রা পল্লীবধূকে, পতিপ্রেমসর্ব্বস্বা সাধ্বী তেজস্বিনী নারীকে—এ তো সে নয়! এ যে লালসার সজীব ছবি! মূর্ত্তি-মতী প্রলোভন!

দোকানে অসম্ভব ভিড়—যে কোনদিন পান খায় না, সেও পান কেনবার বাহানায় এসে জুটেছে—সেই সুন্দরী তরুণীর মোহে প'ড়ে।

চন্দন স্পষ্ট দেখ্‌লে পাশের একজন জরীর টুপী পরা সৌখীন গোছ ছোক্‌রার কি একটা সরস ব্যঙ্গোক্তির উত্তরে দুলারী তা'র মদির আঁখির চটুল কটাক্ষ হেনে—প্রায় তার গায়ে প'ড়ে—খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠ্‌ল। আবার আর এক ব্যক্তি যে দুলারীর কাছ ঘেঁসে ব'সে, তার দিকে নির্লজ্জের মত লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে, হাতে পানের খিলি নিয়ে হাস্‌ছিল আর কি বল্‌ছিল, দুলারী তার হাত থেকে পানের খিলিটা ছিনিয়ে 'টপ্' ক'রে গালে ফেলে দিলে,—সঙ্গে সঙ্গে সেই হাসি!

আশ্চর্য্য! দুলারীর হাসিতে, ঠাট্‌ঠমকে কুণ্ঠার লেশ মাত্র নেই! ছি! ছি!

চন্দনের সর্ব্বশরীরে কে যেন আগুন ছড়িয়ে দিলে। এ কি সেই দুল্লি—যার পবিত্রতার পুণ্যদীপ্তিতে তার অন্তরের কলুষকামনারাশি অগ্নিশুদ্ধ কাঞ্চনের মত নির্ম্মল উজ্জ্বল হ'য়ে গেছে! এ কি ঘোর পরিবর্ত্তন! সে দৃশ্য আর সহ্য করতে না পেরে চন্দন চ'লে গেল ঘোড়া ছুটিয়ে।

দুলারী বাড়ী ফিরল, তখন বেলা আর নেই।

সে মনে করেছিল এই অহেতুক দেরী করার জন্য স্বামীর কাছে জবাবদিহি করতে হ'বে, কিম্বা—একচোট বকুনীই বা খেতে হ'বে, কিন্তু হ'ল তার বিপরীত।

ভিখু তার সাড়া পাবামাত্রই এগিয়ে এসে এক গাল হেসে ব'লে উঠ্‌ল—আর তোকে হাঁটাহাঁটি করতে হবে না রে দুল্লি! ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, এদ্দিনে আমাদের দুঃখ্‌খু ঘুচ্‌ল বোধ হয়—

—সত্যি না কি?—

বাজার হইতে আনিত ডাল, নুন, মসলা, তামাকের মোড়কগুলি সাবধানে রাখ্‌তে রাখ্‌তে দুলারী তামাসা ক'রে বল্লে—

—কেমন ক'রে? গায়ে জোর হয়েছে বুঝি?—পারবি আবার কুড়ুল ধরতে?

ভিখুরাম রোজ জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে সেই কাঠ বাজারে গিয়ে বেচ্‌ত—তাই তখনকার দিনে ওদের সংসারে অভাব অনটন তেমন ছিল না। রোগের ঠেলায় এখনো তার সে শক্তি ফিরে আসেনি—বেহারীদের ক্ষেত পর্য্যন্ত যেতেই হাপিয়ে পড়ে—এমন অবস্থা।

স্ত্রীর কথায় গর্ব্বের হাসি হেসে ভিখু বল্লে—দূর দূর! কাঠ কেটে কি দুঃখ্‌খু দারিদ্রি ঘোচানো যায়? সে সব নয়। এবার আমরা দোকান করব দুলি! মুদীর দোকান—

—দোকান! বিনিপয়সায় না কি?

—শোনো কথা! বিনি পয়সায় কি দোকান হয় রে পাগলী, পয়সা লাগবে। যে টাকা ক'টি আমি পেয়েছি তাতে······

—কোথায় পেলি টাকা? হ্যাঁ রে?—মাটি খুঁড়ে বুঝি?

—তামাসা না দুলি! এ টাকা ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই ছাখ্—

ভিখু তার কোঁচড় থেকে বার ক'রে দেখালে এক মুঠো টাকা! দুলারী বিস্ময়ে চোখ দু'টি বিস্ফারিত ক'রে ত্বরিতে ব'লে উঠ্‌ল—

—তাই তো! কে দিলে এ টাকা?

—পাটোয়ারীজীকে জানিস্ তো? ঐ যে সীতা-রামের বড় ছেলে—কি নাম তার·····

দুলারীর ঠোঁটের হাসি নিমেষে মিলিয়ে গেল। মুখখানা গম্ভীর ক'রে সে ভারি গলায় বল্লে—

—জানি, সেই বুঝি টাকা দিলে?

—হ্যাঁ, আপনা হ'তেই।—কি দয়ার শরীর বাবুর! আহা!···ভগবান তাঁর ভালো করুন। বল্লেন—ভিখুরাম এত রোগা হয়েছ কেন?—পেট ভ'রে খেতে পাওনা না কি?—ঐ যে বেহারীদের ক্ষেতে আজ গিয়েছিলাম কি না? সেইখানেই দেখা—

দুলারী বাধা দিয়ে অধৈর্য্য হ'য়ে বল্লে—

—বেশ! কিন্তু কি দরকার ছিল এ ভিক্ষে করবার! আমরা না খেয়ে মরছি না তো!

—দূর! ভিক্ষে করব কেন? বল্‌ছি যে—সে আপনা হ'তেই দিলে এ টাকা। বল্লে, তোমাদের কষ্টের কথা আমাকে জানালেই হ'ত এদ্দিন। আমি তো তোমাকে পর মনে করি না,—ছোটবেলায় কত খেলা করেছি, কুস্তি লড়েছি তোমার সঙ্গে—যাক্ তোমার আর কাঠ কেটে দিন গুজ্‌রান করতে হবে না। এই কুড়িটা টাকা নাও, এতেই অল্প-স্বল্প চাল, ডাল, আটা, গুড় সব কিনে এনে ব'সো—বেশ চ'লে যাবে, দোকানের ভাড়াও লাগবে না······ও কি? মুখখানা অমন করছিস্ যে? ভালোরে ভালো! এতে এত ভাববার কি আছে? ভয়ই বা কিসের?

দুলারী গালে হাত দিয়ে উদ্বিগ্নভাবে বল্লে—

—ভাববার কথা আছে বই কি?—এ টাকা যদি আমরা শোধ দিতে—

—ওঃ! সেজন্যে কিছু আট্‌কাবে না, বাবু তো বলেছে এ টাকাটা আর ফিরিয়ে নেবে না—কিন্তু তাই কি হয়? পরের টাকা—দয়া ক'রে দিয়েছে এই ঢের। দোকানটা একটু ভালোভাবে চল্‌লেই আমি এক এক কড়ি হিসেব ক'রে সমস্ত······হ্যাঁ, ভাল কথা, কাল থেকে তুই আর হাট বাজারে যাস্‌নি দুলি!

দুলি চমকে উঠল। তার মুখের ভাব তখন শ্রাবণের বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত। খানিক্ নির্ব্বাক্ থেকে শুষ্ক কণ্ঠে সে বল্লে—

—কেন? তোর বাবু মানা করেছে বুঝি?

—না, না, তা' কেন? ওর গরজ কিসের? আমিই বল্‌ছি—এই দিনকাল যে রকম পড়েছে—কাজ কি গিয়ে? আমি তো এখন সেরে উঠেছি। আর দোকানদারী করতে হ'লে ও সব কাজ ছেড়ে দেওয়াই ভাল,—বুঝ্‌লি কি না?

দুলারী বেশ বুঝতে পারলে ভিখু কথাটা চাপা দিতে চায়······। এ চন্দনলালের কাজ।

কিন্তু কেন? কেন? তার কিসের এত মাথা ব্যথা? যে ওকে শুধু বেদনাই দিয়েছে, তার জন্যে এত······

দুলারীর চোখ দুটো হঠাৎ কর্ কর্ ক'রে উঠল্।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার যত্নে-আঁকা কাজলের রেখা ধুয়ে গেল—ছাপিয়ে-পড়া অশ্রুর উচ্ছ্বাসে।

*   *   *

ভোরবেলা চন্দনলাল মেটো রাস্তা ধ'রে যাচ্ছিল কি একটা জরুরী কাজে। হেমন্তের প্রভাত। তখনো বেশ ঘোর-ঘোর ছিল। মাঠের গাছপালা, ঝোপ্‌-ঝাপ্‌ সব কুয়াসায় ঢাকা। পথ চলতে চলতে চন্দন সহসা থম্‌কে দাঁড়াল নারীকণ্ঠের একটি শব্দ শুনে।—শোনো!

একি দুলারী! —এ সময়……চন্দনকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর না দিয়ে দুলারী ইসারা ক'রে বল্লে—একটা কথা আছে, এখানে নয় ঐ ধারে —

—কিন্তু আমি যে কাজে যাচ্ছি —

—তা হোক্‌, পাঁচ মিনিটের জন্য শুধু —

খানিক দূর গিয়ে দুলারী দাঁড়াল। চন্দন দেখলে এ যেন সেই জায়গা যেখানে দুলারীর সঙ্গে শেষবার—হ্যাঁ, ঐ তো সেই করম্‌চার ঝোপ্‌ — এদ্দিন পরে আবার এখানে কেন? — চন্দন ব্যস্ততার সহিত বল্লে — কি বলতে চাও বলো, আমার সময় নেই —

—তা' আমি জানি, তুমি এখন কাজের মানুষ। কিন্তু একদিন — আবেগের মুখে এসে-পড়া কথাটা চকিতে ফিরিয়ে নিয়ে দুলারী চন্দনের মুখপানে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—আমার বাজারে যাওয়া তুমিই বারণ করেছ, না?

চন্দন মাথা নেড়ে জানালো—হ্যাঁ।

—কেন? কি ক্ষতি হচ্ছিল তোমার?

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে চন্দন ধীরে ধীরে উত্তর দিলে—ক্ষত্তির কথা নয়। আমি তোমার ভালোর

—আমার ভালো তুমি চাও? কেন বলতো? আমার ভালোর জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

এ 'কেন'র উত্তর কি দেওয়া যায়? চন্দনের বুকের রক্ত ছলাৎ ক'রে উঠল। পলকের জন্য দুলারীর উত্তেজিত, আরক্ত মুখের পানে তাকিয়েই সে চোখ দু'টো নামিয়ে নিলে।

—বলো — চুপ ক'রে থাক্‌লে চলবে না, আমাকে তুমি কেন এমন ক'রে … উচ্ছ্বসিত চিন্তাবেগে দুলারী কথাটা শেষ করতে পারলে না।

চন্দন অতি কষ্টে নিজেকে সাম্‌লে রেখে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বল্লে—কি বল্‌ব দুল্লি? তোমার এ পরিবর্ত্তন আমাকে কত ব্যথা দিয়েছে জানো?

—জানি, কিন্তু তুমিও জানো আমার এ পরিবর্ত্তন কা'র জন্যে? — দুলারী এবার চন্দনের কাছে, খুব কাছে স'রে এসে গাঢ় স্বরে বল্লে—তোমার সেইদিনকার কথা মনে আছে কি? যেদিন আমার হাত ধ'রে—এই খানেই না?

—হ্যাঁ এইখানে, সেজন্যে আমি মাপ চাইছি দুল্লি। সেদিনের সেই ঘটনা আমার জীবনটাকেই বদ্‌লে দিয়েছে—

—আমারও তাই—তোমার সে হাতের ছোঁওয়ায় কি যাদু ছিল জানি না — যার জন্যে আজ আমার এই দশা —

স্পর্শের প্রভাব! তাই হয় তো! সেই স্পর্শের মায়াই বুঝি দু'জনার জীবনে এই পরিবর্ত্তন এনেছে! কিন্তু কি বিচিত্র এই পরিবর্ত্তন!

একটা সুগভীর নিঃশ্বাস ফেলে চন্দন ব্যথিত চিত্তে আর্দ্র-স্বরে বল্লে—সে সব কথা তুমি ভুলে যাও দুল্লি!

—না, না, ও কথা বলো না, বলো না! সে আমি কি ক'রে ভুলব? সে যে আমার প্রাণে প্রাণে … আঃ! আজ যদি আবার তেমনি ক'রে — থাক্‌, কাজ নেই আর — তুমি যে ভালো হয়ে গেছ! ভালোই থাকো — তোমার দয়াই যেন আমার …

বেপথু কণ্ঠে, সজল করুণ সুরে কথাটা বলতে বলতে উদ্যত হাতখানি ত্রস্তে সরিয়ে নিয়ে দুলারী চ'লে গেল, চন্দনের উদ্বেলিত হৃদয়ে একটা তুফানের সৃষ্টি ক'রে।

মন্ত্রমুগ্ধ চন্দনের অবরুদ্ধ কণ্ঠ হ'তে অস্ফুট স্বরে নির্গত হ'ল—দুল্লি!

সে শব্দ দুলারীর কাণে গেল না। সে তখন অনেক দূরে।

প্রাচীন ভারতে ঐন্দ্রজালিক প্রদর্শনী

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বর্ত্তমান যুগে য়ুরোপ ও আমেরিকায় রঙ্গ-পীঠ ও নাট্যশালায় নানারূপ ঐন্দ্রজালিক-কৌশলের প্রদর্শনী সম্মানের স্থান অধিকার করিয়াছে। Thurston, Houdini প্রভৃতি জগৎবিখ্যাত ইন্দ্রজাল-কুশলীরা ঐ বিদ্যাকে নানাদিক্ দিয়া সূক্ষ্ম শিল্পকলায় পরিণত করিয়াছেন। প্রাচ্য দেশের অনেক ঐন্দ্রজালিকও বিদেশে সুপরিচিত ও সমাদৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে চীনদেশের লিং-লুঙ্ চাঙ্ ভারতে ও য়ুরোপে খেলা দেখাইয়া বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন-পন্থী বাজীকর মধ্যে মধ্যে য়ুরোপের নানা প্রদর্শনীতে "Indian Jugglery" ও "ভানুমতীর খেল" দেখাইয়া মধ্যে মধ্যে য়ুরোপের দর্শকদের চিত্ত-বিনোদন করিয়াছে। ভারতের জগৎবিখ্যাত "রজ্জু-কৌশল" (Rope-trick) কিরূপে সাধিত হয়, য়ুরোপের কোনও যাদুকর নানারূপ মস্তিষ্ক চালনা করিয়াও, অদ্যাপি ঐ কৌশলটীর রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। ভারতীয় যাদুকরীবিদ্যা আধুনিক যুগে আর তাদৃশ জনপ্রিয় নহে, এবং বর্ত্তমান যুগে এই ক্ষেত্রে ভারতীয় বিদ্যার কোনও উন্নতি দেখা যায় নাই। ভারতের নূতন ঐন্দ্রজালিকরা "বিলাতী" বিদ্যার অভ্যাসে নিমগ্ন। প্রাচীন-পন্থী-যাদুকর যাহারা আজও বিদ্যমান আছে, তাহারা তাহাদের প্রাচীন কলাকৌশল আধুনিক রঙ্গ-পীঠের উপযোগী করিয়া প্রদর্শনী দেখাই-বার কোনও চেষ্টাই করে নাই। তাহাদের "ভানুমতীর খেল" পথ-প্রান্তেই পড়িয়া রহিল, ভদ্রবেশ পরিধান করিয়া আধুনিক নাট্যমন্দিরে প্রবেশলাভ করিতে পারিল না। ভারতের কলাবিদ্যা ও নাট্যশিল্পের উন্নতির দিক্ দিয়া প্রাচীন কালের ভারতীয় ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার তিরোভাব অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কারণ প্রাচীন যুগের অবসর বিনোদন ও আমোদ উপভোগের সহায়করূপে এই পুরাতন-পদ্ধতির যাদুবিদ্যা, সর্ব্বদাই রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সমাদর ও প্রসাদলাভ করিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে কিছু কিছু পাওয়া যায়; "উদয়নে"র পাঠকদের কৌতূহল উদ্রেকের উদ্দেশ্যে তাহার একটী প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

স্বনামধন্য কবি ও আলঙ্কারিক দণ্ডী, সংস্কৃত সাহিত্যা-কাশের একটী অত্যুজ্জ্বল তারকা। দেশী ও বিদেশী পণ্ডিত-সমাজে আজও তাঁহার যশোদীপ্তি ম্লান হয় নাই। তাঁহার সুবিখ্যাত "কাব্যাদর্শ" অলঙ্কার-শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। তাঁহার রচিত "দশকুমার চরিত" প্রাচীন প্রথার আখ্যায়িকা ও উপন্যাস শ্রেণীর কথা-সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্ন। য়ুরোপীয় নানা ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। দণ্ডী ও তাঁহার রচিত গ্রন্থদুইটীর রচনাকাল লইয়া নানা আলোচনা হইয়াছে। অধিকাংশ য়ুরোপীয় পণ্ডিতের মতে তিনি খৃষ্টীয় সাত শতকের মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার "দশকুমার চরিতে" ভারতের সমসাময়িক সমাজ ও ব্যবহারিক জীবনের নানা খুঁটিনাটির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে "রাজবাহনের উপাখ্যানে" গ্রন্থকার, বিদ্যেশ্বর নামীয় একজন ঐন্দ্রজালিক ও তাহার কলা-কৌশলের একটী সুন্দর কৌতুকপ্রদ চিত্র দিয়াছেন। পণ্ডিত গণেশ জনার্দ্দন আগাশের সম্পাদিত ১৯১৯ সালের দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মূল-সংস্কৃত উদ্ধৃত হইল।

"তস্মিন্নবসরে ধরণীসুর একঃ সূক্ষ্ম-চিত্র-নিবসনঃ স্ফুরন্মণি-কুণ্ডল-মণ্ডিতো মুণ্ডিত-মস্তক-মানব-সমেতশ্চতুর-বেষমনোরমো যদৃচ্ছয়া সমাগতঃ সমন্ততোঽত্যুল্লসত্তেজো-মণ্ডলং রাজবাহনমাশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বকং দদর্শ। রাজা সাদরং কো ভবান্ কস্যাং বিদ্যায়াং নিপুণ ইতি তং পপ্রচ্ছ। স চ বিদ্যেশ্বর-নামধেয়োঽহমৈন্দ্রজালিক-বিদ্যাকোবিদো বিবিধ-

দেশেষু রাজমনোরঞ্জনায় ভ্রমন্নুজ্জয়িনীমদ্যাগতোঽস্মীতি শশংস।" (আগাশের সংস্করণ, ৫ উচ্ছ্বাস, পৃঃ ৩১)

অনুবাদ—'ইতিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, আপন মনে বিচরণ করিতে করিতে উপস্থিত হইল। তাহার পরিধানে সূক্ষ্ম-চিত্র-বসন, (সম্ভবতঃ, সুন্দর নক্সা-যুক্ত কোনরূপ ছিটের কাপড়) তাহার কর্ণে উজ্জ্বল মণিখচিত কুণ্ডল, (প্রাচীন ভারতে, পুরুষেরাও এই অলঙ্কার ধারণ করিতেন, প্রাচীন ভাস্কর্যে ও চিত্রে এই প্রথার বহু চাক্ষুষ প্রমাণ আছে)।

সে ব্যক্তি চতুর-বেশধারী (চটকদার সাজসজ্জাযুক্ত) মনোহারী পুরুষ। (বর্ত্তমান যুগেও অভিনব সাজ-সজ্জার পারিপাট্য ঐন্দ্রজালিকের প্রধান উপকরণ) তাহার সঙ্গে এক মুণ্ডিত-মস্তক অনুচর। এই ব্যক্তি দীপ্তিমান্ রাজা রাজবাহনকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। রাজা সাদরে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কে? কোন্ বিদ্যায় সুনিপুণ?" সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "আমার নাম বিদ্যেশ্বর। আমি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় সুনিপুণ। আমি দেশে দেশে রাজাদের মনোরঞ্জন করিয়া ভ্রমণ করি। অদ্য উজ্জয়িনী নগরে আসিয়াছি।"

মূল—"পরেদ্যুঃ প্রভাতে বিদ্যেশ্বরো রসভাব-রীতি-গতি-চতুরঃ তাদৃশেন মহতা নিজপরিজনেন সহ রাজ-ভবনদ্বারান্তিকমুপেত্য দৌবারিক-নিবেদিত-নিজবৃত্তান্তঃ সহসোপগম্য সপ্রণামমৈন্দ্রজালিকঃ সমাগত ইতি দ্বাঃস্থৈ-র্বিজ্ঞাপিতেন তদ্দর্শনকুতূহলাবিষ্টেন সমুৎসুকাবরোধ-সহিতেন মালবেন্দ্রেণ সমাহূয়মানঃ কক্ষান্তরং প্রবিশ্য সবিনয়মাশিষং দত্ত্বা তদনুজ্ঞাতঃ,—"

অনুবাদ—'পরদিন প্রভাতকালে, রস-ভাব-রীতি-গতি-চতুর (ইন্দ্রজালকুশলীর অনুরূপ রস ও ভাবোদ্দীপক রীতি ও গতি অবলম্বন করিয়া, অর্থাৎ চটক্‌দার 'নাটুকে' চালে) বিদ্যেশ্বর তাহার প্রকাণ্ড "দলবল" অনুচরাদি সঙ্গে লইয়া রাজভবনের দ্বারে উপস্থিত হইল। দ্বারপালকের মুখে তাহার নিজ বৃত্তান্ত ও আগমন সংবাদ রাজসমীপে প্রেরণ করিয়া রাজার সম্মুখে আনীত ও উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল। মালবরাজ ও তাহার অন্তঃপুরচারিকারা বিদ্যেশ্বরের ক্রীড়াকৌশল দেখিবার জন্য কুতূহলাবিষ্ট ও সমুৎসুক হইয়া তাহাকে একটী বিশিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করাইল, বিদ্যেশ্বর সবিনয় আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া ক্রীড়া আরম্ভ করিল।'

মূল—"পরিজনতাড্যমানেষু বাদ্যেষু নদৎসু গায়কীষু মদ-কল-কোকিলা-মঞ্জুল-ধ্বনিষু সমধিক-রাগ-রঞ্জিত-সামাজিক-মনোবৃত্তিষু পিচ্ছিকা-ভ্রমণেষু সপরিবারঃ পরিবৃতঃ ভ্রাময়ন্মুকুলিত-নয়নঃ ক্ষণমতিষ্ঠৎ।"

অনুবাদ—(ক্রীড়ার আরম্ভে, বাদক ও গায়িকাদ্বারা "ঐক্যতান-বাদনের" ন্যায় সঙ্গীতের প্রযোজনা হইল) 'পরিজনেরা বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিল, গায়িকারা মদ-কল-কোকিলা মধুর ধ্বনিতে গান আরম্ভ করিল; (উদ্দেশ্য) সঙ্গীতরাগদ্বারা রঞ্জিত করিয়া, দর্শকদের মন মুগ্ধ করিয়া, অন্যমনস্ক করা। (সেই উদ্দেশ্যে) একজন পরিজন (যাদুবিদ্যার উপকরণ) ময়ূরপুচ্ছ ঘুরাইতে লাগিল। পরিজন পরিবৃত হইয়া স্বয়ং বিদ্যেশ্বর চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিল' (এই সমস্ত প্রক্রিয়া ও সাধন কতকটা ভৌতিক কাণ্ডের অনুকারী উপচার, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ভৌতিক শক্তির অবতরণ করিয়া অভিনব-লীলা দেখান হইতেছে, কোনও রূপ যান্ত্রিক কৌশলে তাহা সম্পাদিত নহে—দর্শকদের মনে এইরূপ মোহ উপস্থিত করা)।

মূল—"তদনু বিষমং বিষ-মুল্বণং বমন্তঃ ফণালঙ্করণা রত্নরাজি-নীরাজিত রাজমন্দিরাভোগা ভোগিনো ভয়ং জনয়ন্তো নিশ্চেরুঃ। গৃধ্রাশ্চ বহবস্তৈরহিপতীনাদায় দিবি সমচরন্। ততোঽগ্রজন্মা নরসিংহস্য হিরণ্য-কশিপোর্দৈত্যেশ্বরস্য বিদারণমভিনীয় মহদাশ্চর্য্যান্বিতং রাজানমভাষত।"

অনুবাদ—'অতঃপর বিষম বিষ-উদ্গিরণকারী অলঙ্কৃত-ফণা-বিস্তারকারী ভীষণ সর্প রাজমন্দির রত্নরাজিদ্বারা আলোকিত করিয়া, দর্শকদের ভীত করিয়া, বিচরণ করিতে লাগিল। তাহার পর ব্রাহ্মণ নরসিংহ কর্ত্তৃক দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর

বিদারণ অভিনয় করিয়া রাজাকে চমৎকৃত করিয়া বলিল।

মূল—"রাজন্ অবসানসময়ে ভবতা শুভসূচকং দ্রষ্টুমুচিতম্। ততঃ কল্যাণ-পরম্পরা-বাপ্তয়ে ভবদাত্মজাকারায়াস্তরুণ্যা নিখিল-লক্ষণোপেতস্য রাজনন্দনস্য বিবাহঃ কার্য্যইতি। তদবলোকন-কুতূহলেন মহীপালেনানুজ্ঞাতো * * স সকলমোহজনকমঞ্জনং লোচনয়োর্নিক্ষিপ্য পরিতো ব্যলোকয়ৎ।"

অনুবাদ—'বিদ্বেশ্বর বলিলেন, "রাজন্ (ক্রীড়ার) শেষ অঙ্কে কোনও মঙ্গলসূচক বিষয়ের (অভিনয়) দর্শন করা কর্ত্তব্য। এইজন্য শেষ অভিনয়ে, আপনার কল্যাণ উৎপাদনার্থে, আপনার কন্যার সহিত কোনও অশেষ কল্যাণযুক্ত রাজকুমারের বিবাহ, তাহাদের রূপের অনুকারী তরুণ নট-নটী সাজাইয়া দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছি। তদ্দর্শনকুতূহলে রাজার আজ্ঞা পাইয়া (বিদ্বেশ্বর) সকলের মোহজনক নয়ন-অঞ্জন দর্শকবৃন্দের লোচনে নিক্ষেপ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করিল।'

মূল—"সর্ব্বেষু তদৈন্দ্রজালিকমেব কর্ম্মেতি সাদ্ভুতং পশ্যৎসু রাগ-পল্লবহৃদয়েন রাজবাহনেন অবন্তিসুন্দরীং বৈবাহিক-মন্ত্র-তন্ত্র-নৈপুণ্যেনাগ্নিং সাক্ষীকৃত্য সংযোজয়ামাস। ক্রিয়াবসানে সতীন্দ্রজালপুরুষাঃ সর্ব্বে গচ্ছন্তু ভবন্ত ইতি দ্বিজন্মনোচ্চৈরুচ্চামানাঃ সর্ব্বে মায়া-মানবা যথাযথমন্তর্ভাবং গতাঃ। মালবেন্দ্রোঽপিতদদ্ভুতং মন্যমানস্তস্মৈ বাড়বায় প্রচুরতরং ধনং দত্ত্বা বিদ্বেশ্বর ত্বমিদানীং সাধয় ইতি তং বিসৃজ্যান্তঃপুরমন্তর্মন্দিরং জগাম।"

অনুবাদ—'সকলে সেই অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক-কর্ম্ম সাশ্চর্য্যমনে দেখিতে লাগিল। প্রণয়োল্লসিত-হৃদয় রাজবাহনের সহিত অবন্তিসুন্দরীর বিবাহ যথোচিত মন্ত্র-তন্ত্র নৈপুণ্যে অগ্নি সাক্ষী করিয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহকার্য্য শেষ হইলে, ব্রাহ্মণ (বিদ্যাধর) উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ইন্দ্রজালপুরুষগণ, তোমরা সকলে চলিয়া যাও।" অতঃপর সমস্ত মায়া-মানবেরা যেরূপ অবস্থায় ছিল তাহাদের অন্তর্ধান হইল। মালবরাজ এই দৃশ্য অদ্ভুত মনে করিয়া সেই ঐন্দ্রজালিককে প্রচুর ধনদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া "বিদ্বেশ্বর! তুমি এখন আসিতে পার" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বিদায় করিয়া স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন'।

প্রতিষ্ঠায় বিসর্জ্জন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

একদিন শূন্য গৃহে দেবতা প্রতিষ্ঠা করি যবে,
জানি নাই হ'বে মিছে খেলা,
সে দিনের স্মৃতি শুধু মনোমাঝে চিরদিন র'বে,
আসে সন্ধ্যা—কেটে যায় বেলা।
দেবতা লুটায়ে পড়ে ধূলার মাঝারে একদিন,
চেয়ে দেখি মাটি মাত্র সার,
দেবতা দেবত্ব ল'য়ে কালের কোলেতে হ'ল লীন,
বৃথা ডাকি—সাড়া নাই তার।
তার লাগি তবু মোর অশ্রুরাশি পড়ে ঝ'রে ঝ'রে
অন্তরেতে উচ্ছ্বসে ক্রন্দন,
বিস্ময়েতে তবু আমি বারে বারে চাই শূন্য ঘরে,
ভাবি—কবে হ'ল বিসর্জ্জন?
ধ্বংস তার হ'য়ে গেছে, চিহ্ন তার কিছু আজ নাই,
তথাপি সে মনে জেগে আছে,
ঘরের পানেতে চেয়ে ছায়া যেন দেখিবারে পাই,
স্মৃতি তার জেগে থাকে পাছে।
মরণ?—সে মিছে কথা, তার স্পর্শ মিছে হ'য়ে যায়
মিছে তার ভ্রূকুটী করাল,
ছলিয়া ছলিয়া র'ল, সে সকলি মুছে নিতে চায়
দেখাইয়া মূরতি ভয়াল।
পূজার সে ফুলগুলি মিছেই চয়ন আজও করি
ফেলি জলে—ঢেউয়ে যায় ভেসে,
বৃথাই চন্দন ঘসি, পাত্রটী এখনও রাখি ভরি',
কাল ওঠে উচ্চস্বরে হেসে।
স্মৃতিই জাগিয়া র'ল,—দেবতা আজিকে নাই আর,
প্রতিষ্ঠায় হ'ল বিসর্জ্জন,
মন্দির ঘেরিয়া আজও জেগে আছে আর্ত্ত হাহাকার,
স্মৃতি শুধু করিছে ক্রন্দন।

কাব্যপুরুষ ও সাহিত্যবিদ্যাবধূ

(রূপক)

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী, বেদান্ততীর্থ, এম্‌-এ

স্বরচিত 'কাব্যমীমাংসা'য় কবিরাজ রাজশেখর সংস্কৃত কাব্যের উৎপত্তি বর্ণনা করিতে গিয়া রূপকচ্ছলে কাব্যপুরুষ ও সাহিত্যবিদ্যাবধূর যে অপরূপ বাঙ্ময়চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, সংস্কৃত কাব্যজগতেও তাহা অতি বিরল—অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পুরাকালে পুত্রলাভেচ্ছায় দেবী সরস্বতী হিমগিরি-শিখরে কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন। প্রীত হইয়া বিরিঞ্চি তাঁহাকে পুত্রবর প্রদান করেন। এইরূপে কাব্যপুরুষের জন্ম হইল। জন্মমাত্রেই সেই দিব্য শিশু উঠিয়া মাতার পাদস্পর্শ করিয়া ছন্দোবদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করিলেন—

"যে বাঙ্ময় অর্থাকারে (নিখিল বিশ্বরূপে) বিবর্ত্তিত, সেই মূর্ত্তিমান্ বাঙ্ময় আমি — কাব্যপুরুষ। মা! আপনার চরণযুগল বন্দনা করি।"

লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় এই প্রথম বেদসুলভ ছন্দের ছাপ পড়িল দেখিয়া সবিস্ময়ে সানন্দে দেবী সরস্বতী সেই অলৌকিক শিশুকে কোলে তুলিয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন—"বাছা! সমগ্র বাঙ্ময়ের জননী আমি—তোমারও মা। কিন্তু ছন্দোময়ী বাণী প্রণয়ন করিয়া তুমি আজ আমাকেও জয় করিয়াছ। 'পুত্র হইতে পরাজয় দ্বিতীয়বার পুত্রজন্মের আনন্দ প্রদান করে'—এ প্রবাদের সার্থকতা আজ আমি বর্ণে বর্ণে অনুভব করিতেছি। তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্বান্‌গণ সকলেই লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় গদ্যরচনার অভ্যাস করিয়া আসিয়াছেন। পদ্য কেহ কখন চোখেও দেখেন নাই। লৌকিক ভাষায় তুমিই প্রথম ছন্দের প্রবর্ত্তন করিলে। ধন্য ধন্য তুমি! শব্দ ও অর্থ তোমার শরীর, সংস্কৃত তোমার মুখ, প্রাকৃত তোমার বাহু, অপভ্রংশ তোমার জঘনদেশ, পৈশাচী ভাষা তোমার পাদদ্বয় ও মিশ্র-ভাষা তোমার বক্ষঃস্থল। তুমি সম, প্রসন্ন, মধুর, উদার ও ওজস্বী। সূক্তিমালা তোমার বাক্য, রস তোমার আত্মা, ছন্দঃসমূহ তোমার রোমাবলী, প্রশ্নোত্তর প্রবহ্লিকা (প্রহেলিকা) প্রভৃতি তোমার বাক্কেলি, অনুপ্রাস উপমাদি তোমার অলঙ্কার। ভবিষ্যৎ বিষয়ের অভিধাত্রী ভগবতী শ্রুতিও তোমারই স্তুতিচ্ছলে বলিয়াছেন—'তেজোময় মহান্ দেব মর্ত্ত্যগণের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। চারিটি তাঁহার শৃঙ্গ, তিনটি পাদ, দুইটি মস্তক, সাতটি হস্ত। ত্রিধা বদ্ধ হইয়া বৃষভরূপী এই মহান্ দেব শব্দ করিতেছেন'*। তথাপি আমার একটি কথা শুন। বয়স্থ-পুরুষোচিত প্রগল্‌ভতা সংবরণ কর। শিশুর মতই ব্যবহার করিতে থাক।" এই বলিয়া তিনি শিশুকে এক বৃক্ষশাখায় স্থাপিত গণ্ডশৈলোপরি † রচিত শয্যায় শোয়াইয়া স্নানার্থ স্বর্গঙ্গায় গমন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে কুশ-কুসুমসমিৎ প্রভৃতি আহরণের নিমিত্ত বাহির হইয়া মহামুনি উশনা দেখিলেন যে, সূর্য্যদেব ঈষৎ সরিয়া যাওয়ায় শিশুটি আর ছায়ায় নাই — রৌদ্রে কষ্ট পাইতেছে। "আহা! কা'র এ অনাথ বালক!"

---

* ঋগ্বেদ ৪।৫৮।৩—শব্দব্রহ্মপক্ষে সায়ণকর্ত্তৃক উদ্ধৃত মহাভাষ্যকারের ব্যাখ্যা — চারিটি শৃঙ্গ — নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত ; তিন পাদ — তিন কাল—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ; দুই মস্তক — সুপ্, তিঙ্ ; সাত হাত — সাত বিভক্তি ; ত্রিধাবদ্ধ — বক্ষে, কণ্ঠে, মস্তকে—এই সকল স্থানে বায়ুর আঘাতে শব্দ উচ্চারিত হয়। বৃষভ — কামবর্ধক। দুই মস্তক — দুই শব্দাত্মা—নিত্য ও কার্য্য—মূল মহাভাষ্যে এইরূপ আছে। যাস্ক যজ্ঞপক্ষে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সায়ণও যজ্ঞপক্ষে, সূর্য্যপক্ষে, শব্দব্রহ্মপক্ষে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিষ্প্রয়োজন বলিয়া সে সকলের উল্লেখ করা হইল না।

† গণ্ডশৈল — বজ্র বা ভূমিকম্পে স্খলিত বৃহৎ উপলখণ্ড।

ইহা ভাবিয়া মুনিবর কৃপাকুলচিত্তে তাহাকে নিজাশ্রমে লইয়া গেলেন। সারস্বতের কাব্যপুরুষও স্বস্তি পাইয়া মুনির অজ্ঞাতসারেই তাঁহাতে ছন্দোময় বাক্য সঞ্চারিত করিলেন। অকস্মাৎ অপরের ও নিজের প্রভূত বিস্ময় উৎপাদন করিয়া উশনা কবিতায় বলিয়া উঠিলেন—

"কবিরূপ দোগ্ধৃগণ অনুদিন যাঁহাকে দোহন করিলেও মনে হয় যাঁহার দোহন কার্য্য করাই হয় নাই (অর্থাৎ কবিদোগ্ধৃগণের অবিরত দোহনেও যিনি নিঃশেষিত হন নাই), সেই সূক্তি-ধেনুরূপিনী সরস্বতী-আমাদিগের হৃদয়ে সন্নিহিত থাকুন।"

সেই হইতে উশনার অপর নাম হইল কবি। কবি বলিতে মুখ্যতঃ উশনাকেই বুঝায়। অপরকে যে কবি বলা হয়, তাহা গৌণভাবে।

এদিকে স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া বাগ্দেবী পুত্রকে না দেখিতে পাইয়া আকুলহৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময় দৈবাৎ মহর্ষি বাল্মীকি সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে দেবীকে সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। উশনার আশ্রম কতদূরে জিজ্ঞাসা করায় বাল্মীকি সানন্দে ভগবতীকে তাহার আশ্রম দেখাইয়া দিলেন। দেবীও সত্বর তপোবনে প্রবেশ করিয়া শিশুকে সাগ্রহে কোলে তুলিয়া লইলেন। বাৎসল্যের আতিশয্যে তাঁহার স্তনযুগল হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতেছিল। সস্নেহে পুনঃ পুনঃ শিশুর মস্তক ও মুখমণ্ডল চুম্বনপূর্ব্বক উদ্বেগ নিবৃত্ত হইলে প্রীতমনে দেবী সরস্বতী প্রাচেতস বাল্মীকিকে নিভৃতে আহ্বান করিয়া ছন্দোজ্ঞান প্রদান করিলেন। দেবীর বরে অনুপ্রাণিত মহর্ষি যখন দেখিলেন যে, এক নিষাদ ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্য হইতে ক্রৌঞ্চীটিকে ‡ মারিয়া ফেলিয়াছে—আর তাহার সহচর ক্রৌঞ্চযুবাটি করুণ কেঙ্কারধ্বনি তুলিয়া রোদনে দিক্ মুখরিত করিতেছে, তখন তাঁহার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত শোক শ্লোকাকারে আত্মপ্রকাশ করিল—

"রে নিষাদ! দীর্ঘ বর্ষ ধরিয়া তুই কোন প্রতিষ্ঠা পাইবি না; যেহেতু ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্য হইতে তুই কামমোহিত একটিকে বধ করিয়াছিস্।"

তখন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না দেবী সরস্বতী ঐ শ্লোকটিকেও বর প্রদান করিলেন যে, অন্য কিছু অধ্যয়ন করিবার পূর্ব্বে যিনি প্রথম এই শ্লোকটি পাঠ করিবেন, তিনি সারস্বত কবি হইবেন। এইরূপে দেবীর প্রসাদে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়া মহামুনি বাল্মীকি রামায়ণরূপ ইতিহাস প্রণয়ন করেন। আর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসও প্রথমে এই শ্লোক পাঠ করার ফলে শত-সহস্রশ্লোকাত্মক মহাভারতসংহিতা রচনা করিতে সমর্থ হন।

কিছুদিন এইভাবে যাইবার পর একদিন শ্রুতির অর্থ লইয়া ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণের মধ্যে দারুণ বিবাদ উপস্থিত হইল। দাক্ষিণ্যবশতঃ ব্রহ্মা দেবী সরস্বতীকে এই বিচারের মধ্যস্থ স্থির করিয়া দিলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কাব্যপুরুষও মাতার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু দেবী বলিলেন—"বৎস! ব্রহ্মার অনুমতি না লইয়া তোমার ব্রহ্মলোকে গমন মঙ্গলকর হইবে না। অতএব, তুমি ফিরিয়া যাও।" গমনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় কাব্যপুরুষ রোষে ক্ষোভে অভিমানে গৃহত্যাগ করিলেন। প্রিয় মিত্রের এইরূপ বৈরাগ্য দর্শনে ভাবী বিরহাশঙ্কায় কুমার কার্ত্তিকেয় কাঁদিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ভগবতী গৌরী তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"বৎস! শান্ত হও। আমি উহাকে ফিরাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি ভাবিলেন—দেহধারিগণের মধ্যে একমাত্র প্রেমের বন্ধনই অচ্ছেদ্য। অতএব, ইহাকে বশে রাখিতে পারে, এমন কোন প্রেমময়ী রমণীর সৃষ্টি করা যাক। ইহা ভাবিয়া সাহিত্যবিদ্যাবধূর সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে আদেশ দিলেন

‡ এইখানে মূল রামায়ণের সহিত রাজশেখরের বিশেষ প্রভেদ; মূলে আছে, পুরুষ ক্রৌঞ্চটি হত হইয়াছিল—"তস্মাত্তু মিথুনাদেকং পুমাংসং পাপনিশ্চয়ঃ। জঘান বৈরনিলয়ো নিষাদস্তস্য পশ্যতঃ।" রামায়ণ—২।১০। রাজশেখরের এই সমস্ত কল্পনাটিই নূতন। তিনি বলিতেছেন — "নিষাদনিহতসহচরীকং ক্রৌঞ্চযুবানং ক্রন্দন্তমুদীক্ষ্য।"

—"এই দেখ, তোমার ধর্ম্মপত্নি ক্রোধবশতঃ গৃহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তুমি ইঁহার পিছু পিছু যাইয়া উঁহাকে ফিরাও।" তাহার পর কাব্যবিদ্যা-স্নাতক § মুনিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে মুনিগণ! তোমরা এই কাব্যপুরুষ ও সাহিত্যবিদ্যাবধূর অনুবর্ত্তন কর; ইঁহাদের স্তুতিবাদ করিতে থাক। উহাই তোমাদের কাব্যসর্ব্বস্ব হইবে।" ইহা বলিয়া তিনি চুপ করিলেন।

অতঃপর কাব্যপুরুষের অনুবর্ত্তন করিয়া সকলেই প্রথমে পূর্ব্বদেশে আসিয়া পৌছিলেন। সে দেশের জনপদগুলির নাম—অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, ব্রহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি। সে দেশে সারস্বতের কাব্যপুরুষের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ঔমেয়ী সাহিত্যবিদ্যাবধূ স্বেচ্ছায় যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সে দেশের স্ত্রীলোকগণ তাহার অনুকরণে বেশক্রিয়া করিয়া থাকেন—ইহারই নাম ঔড্রমাগধী প্রবৃত্তি *। মুনিগণ উহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন—

অপূর্ব্ব এই বেশ। ঈষদার্দ্র চন্দনলিপ্ত কুচমণ্ডলে সূত্রহার অর্পিত। সীমন্তচুম্বিত বস্ত্রপ্রান্ত। বাহুমূল উন্মুক্ত। অগুরু উপভোগহেতু নবদূর্ব্বাদলশ্যামা সুন্দরী গৌড়াঙ্গনাদিগের শরীরে এ বেশ বড়ই মনোহর দেখায়!

সে দেশে যদৃচ্ছাক্রমে যেরূপ বেশ সারস্বতেয় কাব্যপুরুষ ধারণ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তদ্দেশীয় পুরুষগণ তাহার অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইহাও পূর্ব্বোক্ত ঔড্রমাগধী প্রবৃত্তি। আর উমাপুত্রী যেরূপ নৃত্যগীতাদি করিয়াছিলেন—তাহাই ভারতী বৃত্তি *। মুনিগণ ইহারও প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাতেও কাব্যপুরুষের মন ভিজিল না দেখিয়া সাহিত্যবিদ্যাবধূ দীর্ঘ সমাসযুক্ত অনুপ্রাসবহুল যে সকল বাক্য বলিয়াছিলেন—তাহাই গৌড়ীয়া রীতির ** আদর্শ। মুনিগণ ইহারও প্রশংসা করিলেন।

পূর্ব্বদেশ ছাড়িয়া কাব্যপুরুষ পাঞ্চালের দিকে চলিলেন। পাঞ্চাল, শূরসেন, হস্তিনাপুর, কাশ্মীর, বাহীক, বাহ্লীক, বাহ্লবেয় প্রভৃতি জনপদ তাঁহার পদস্পর্শের সৌভাগ্যলাভ করিল। সেই সকল প্রদেশে ভ্রমণের সময় তাঁহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত ঔমেয়ী যেরূপ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সে দেশের নারীগণ তদনুকরণে তদ্রূপ বেশভূষা করিয়া থাকেন। উহাই পাঞ্চালমধ্যমা প্রবৃত্তি নামে বিখ্যাত। মুনিগণ উহার স্তুতিবাদ করিয়া কহিয়াছিলেন—মহোদয়-সুন্দরীগণের † বেশ অতি মনোরম। তাটঙ্কের ‡ ঈষৎ আন্দোলনে গণ্ডদেশের চন্দনলেখা তরঙ্গিতপ্রায়। আনাভিলম্বী তারহার § দলদল দুলিতেছে। শ্রোণী ও গুল্‌ফদেশ পর্য্যন্ত উত্তরীয়ে পরিমণ্ডলিত। এ বেশ দর্শনে কাহার না চিত্ত আকৃষ্ট হয়!

কাব্যপুরুষের মন তখন কিছু নরম হইয়াছে।

§ প্রাচীন যুগে উপনয়নের পর উপনীত ব্রাহ্মণবটু গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক বাস ও বেদাধ্যয়ন করিতেন। অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে ফিরিতেন। ইহার নাম ছিল সমাবর্ত্তন। সমাবর্ত্তন কালে তাঁহাকে স্নান করিতে হইত। এই স্নান করার ফলে তিনি স্নাতক সংজ্ঞা লাভ করিতেন।

* প্রবৃত্তি—বেশবিন্যাসের ধারা। ভরত-নাট্যশাস্ত্রে (চতুর্দ্দশাধ্যায়ে) প্রবৃত্তির লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে—পৃথিবীতে নানা দেশের বেশ ও আচারের বার্ত্তা খ্যাপন করে বলিয়া ইহার নাম "প্রবৃত্তি"। প্রবৃত্তি মূলতঃ চতুর্ব্বিধ—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী ও ঔড্রমাগধী। পৃথিবীতে দেশ বহু থাকিলেও—উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম—এই চারি ভাগে দেশগুলিকে ভাগ করিয়া এক একটি ভাগকে এক একটি প্রবৃত্তির অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে। এস্থলে রাজশেখর ভরত-নাট্যশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়াছেন।

* বৃত্তি—বিলাসবিন্যাসের ক্রম। অবস্থিতি, উপবেশন, গমন, হস্ত-ভ্রূ-নেত্রাদিকর্ম্মের বিশেষ ভাবের নাম বিলাস (নায়িকার অলঙ্কার—স্বভাবজ)। অথবা ধীরা দৃষ্টি, বিচিত্রা গতি ও সস্মিত বাক্যের নাম বিলাস (সাত্ত্বিক নায়কের গুণ)। বৃত্তি মোটামুটি dramatic style; বৃত্তি চতুর্ব্বিধ—ভারতী, সাত্বতী, আরভটী ও কৈশিকী। ভারতী—স্ত্রীবর্জ্জিত, পুরুষপ্রযোজ্যা, সংস্কৃত-বাক্যযুক্ত, বাক্যপ্রধান ব্যাপার—করুণ ও অদ্ভুতরসে ব্যবহার্য্য—নাট্যশাস্ত্র ২২অঃ।

** বচনবিন্যাস ক্রমের নাম রীতি। রাজশেখরের মতে রীতি মাত্র তিনটি।

† মহোদয়—কান্যকুব্জ, বর্ত্তমান কনৌজ।

‡ তাটঙ্ক বা তাড়ঙ্ক—কর্ণালঙ্কার বিশেষ—এক প্রকারের ear-ring।

§ তারহার—তারাহার (তারকার আকৃতিবিশিষ্ট হার) অথবা মুক্তাহার।

তিনি ঐ সকল প্রদেশে যে প্রকার বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তথাকার পুরুষেরা এখনও তাঁহার অনুকরণে সেই প্রকার বেশ ধারণ করিয়া থাকেন। সাহিত্যবিদ্যাবধূ তাঁহার সম্মুখে যেরূপ ঈষৎ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বিলাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাই সাত্বতী বৃত্তির আদর্শ। আবিদ্ধগতিযুক্ত হওয়ায় ইহা আরভটী বৃত্তিরও আদর্শ §। মুনিগণ এই বৃত্তি দুইটিরও প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন কাব্যপুরুষের চিত্ত ঈষৎ বশীভূত হইয়াছে দেখিয়া সাহিত্যবিদ্যাবধূ অল্প সমাস ও অল্প অনুপ্রাসযুক্ত যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাই পাঞ্চালী রীতির আদর্শ। মুনিগণ ইহারও প্রশংসা করিলেন।

তা'র পর কাব্যপুরুষ বিদিশা, সুরাষ্ট্র, মালব, অর্ব্বুদ, ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি ঘুরিয়া অবন্তীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সকল প্রদেশে ভ্রমণের সময় তাঁহার মনোরঞ্জনের নিমিত্ত উমাপুত্রী যেরূপ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সে দেশের নারীগণ তাঁহার অনুকরণে তদনুরূপ বেশভূষা করিয়া থাকেন। উহাই আবন্তী প্রবৃত্তি। উহা পাঞ্চালমধ্যমা ও দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তির মাঝামাঝি কিছু একটা। অতএব, সাত্বতী ও কৈশিকী* — এই দুইটি বৃত্তি তথায় প্রচলিত। মুনিগণ স্তুতিবাদ করিয়া বলিলেন—

পাঞ্চালদেশীয় নরগণের বেশবিধি ও দাক্ষিণাত্যের নারীগণের নেপথ্যরচনা বড়ই আনন্দপ্রদ। অবন্তী দেশের বেশ, বচন ও আচার এই উভয় দেশের বেশ, বচন, আচার প্রভৃতির মিশ্রণে সমুদ্ভূত।

কাব্যপুরুষের মন তখন বেশ ভিজিয়া উঠিয়াছে। তথাপি তিনি দক্ষিণদেশের অভিমুখে চলিলেন। মলয় মেকল, কুন্তল, কেরল, পাল, মঞ্জর, মহারাষ্ট্র, গঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদ এই দক্ষিণদেশের অন্তর্ভুক্ত। তথায় তাঁহার মনোহরণের নিমিত্ত সাহিত্যবিদ্যাবধূ যেরূপ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, আজিও সে দেশের রমণীগণ তাঁহার অনুকরণে সেইরূপ বেশরচনা করিয়া থাকেন। উহারই নাম দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তি। মুনিগণ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উহার স্তুতিবাদ করিলেন —

কেরল কামিনীগণের বেশ চিরদিন জয়লাভ করুক। মূলদেশ হইতে চঞ্চল কুটিল কুন্তলদামে তাঁহাদের চারুচূড়া রচিত। ভালদেশ — চূর্ণালক-লাঞ্ছিত। মেখলাদামের নিবেশনে নীবিবন্ধ অতি নিবিড়। — এ বেশ দর্শনে মুনিরও মন টলিয়া যায়।

কাব্যপুরুষ তখন সাহিত্যবিদ্যাবধূর প্রতি বেশ অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন। দক্ষিণাপথে তিনি যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তথাকার পুরুষগণ সেইরূপ বেশ পরিধান করিয়া থাকেন। বধূ তাঁহার সম্মুখে যে বিচিত্র নৃত্ত, গীত, বাদ্য, বিলাস প্রভৃতি দেখাইয়াছিলেন, তাহাই কৈশিকী বৃত্তির আদর্শ*। মুনিগণও প্রাণ ভরিয়া উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। কাব্যপুরুষের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বশে আনিবার জন্য সাহিত্যবিদ্যাবধূ যে সকল সমাসবিহীন মধুর, কোমল, কান্ত পদাবলীর প্রয়োগ করিয়াছিলেন,

---

§ সাত্বতী — সত্ত্ব, শৌর্য্য, ত্যাগ, দয়া, হর্ষ, ঋজুতা প্রভৃতি গুণ বর্ণনায় উপযোগী।

ইহা মনোব্যাপাররূপা সাত্ত্বিকী বৃত্তি। বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুতরস বর্ণনায় উপযোগী—শোক বা শৃঙ্গার বর্ণনায় অনুপযোগী। এই জন্য ঈষৎ নৃত্ত, গীত, বাদ্য, বিলাস বলা হইয়াছে। নৃত্ত — করণ ও অঙ্গহার সমাযুক্ত নটাশ্রিত রসপ্রধান অভিনয়—রসাত্মক হইতে গেলেই বাক্যার্থাভিনয় থাকা চাই। পক্ষান্তরে নৃত্য — নর্ত্তকাশ্রিত ভাবপ্রধান অভিনয়—ভাবাত্মক হওয়ায় ইহাতে পদার্থাভিনয় বর্ত্তমান। মোটের উপর নৃত্ত হইতেছে রস-স্ফূর্ত্তির অনুকূলভাবে অঙ্গোপাঙ্গগণের সবিলাস বিক্ষেপ ; রসাশ্রিত হওয়ায় বাক্যাভিনয় ইহার মধ্যে আছেই। আর নৃত্য হইতেছে কেবল ভাবাভিব্যক্তির অনুকূল অঙ্গবিক্ষেপ। আবিদ্ধ গতি — প্রয়োগ দ্বিবিধ—সুকুমার ও আবিদ্ধ। মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধ, মায়া, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি নাট্যে প্রয়োগ থাকিলে আবিদ্ধ নাট্য বলা চলে। উহাতে পুরুষের বাহুল্য—স্ত্রীলোকের অল্পতা দৃষ্ট হয়। আরভটী—মায়া, ইন্দ্রজাল, যুদ্ধ, বধ, বন্ধন দেখাইবার উপযোগী কায়বৃত্তি—ভয়ানক, বীভৎস ও রৌদ্ররসে ব্যবহার্য্য। সাত্বতী ও আরভটী যুক্ত নাট্য আবিদ্ধ সংজ্ঞা লাভ করে।

* কৈশিকী—স্ত্রীসংযুক্ত, নৃত্যগীতবহুল, শৃঙ্গাররসপ্রতিপাদিকা বৃত্তি। ঢিলা পোষাক পরিয়া ইহার প্রয়োগ করিতে হয়। মোটের উপর ইহা সৌন্দর্য্যোপযোগী ব্যাপার—শৃঙ্গার ও হাস্যরসে ব্যবহার্য্য। রাজশেখর এস্থলে পৃথক্ রীতির উল্লেখ করেন নাই।

তাহাই হইল বৈদর্ভী রীতির আদর্শ। মুনিগণ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কাব্যপুরুষ আর সাহিত্যবিদ্যাবধূকে উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারিলেন না। বধূরই জয় হইল।

বিদর্ভদেশে মদনের ক্রীড়াবাসস্বরূপ বৎসগুল্ম* নামে একটি নগর ছিল। তথায় সারস্বতেয় কাব্যপুরুষ উমা-পুত্রী সাহিত্যবিদ্যাবধূকে গন্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিলেন। অনন্তর এই দিব্যদম্পতী বহুদেশে বিহার করিয়া পুনরায় হিমগিরিতেই ফিরিয়া আসিলেন। তথায় গৌরী ও সরস্বতী পরস্পরকে সম্বন্ধিনীরূপে পাইয়া সুখে বাস করিতেছিলেন। কাব্যপুরুষ ও সাহিত্যবিদ্যাবধূ উভয়কে প্রণাম করিলে তাঁহারা একবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"আজ হইতে তোমরা উভয়ে কবির মানস-লোকে বাস করিতে থাক।" সেই হইতে কবির চিত্তলোক কাব্যপুরুষ ও সাহিত্যবিদ্যাবধূর অধিষ্ঠানে পুণ্যতীর্থের পবিত্রতালাভে ধন্য হইয়াছে। তাই কবির কল্পলোক এই দিব্যদম্পতীর পূতস্পর্শে চিরউদ্ভাসিত—চিরসুন্দর।

* বৃহৎকথামঞ্জরীতে পাওয়া যায়—দাক্ষিণাত্যে সোমশর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণের বৎস ও গুল্ম নামে দুইটি পুত্র ছিল। জয়মঙ্গলায় (কামসূত্রটীকায়) পাওয়া যায়—দক্ষিণাপথে দুইটি রাজকুমার ছিলেন—বৎস ও গুল্ম নামে। তাঁহাদের বাসভূমির নাম বৎসগুল্মক।

সন্ধানে

শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

ঘুম ভাঙ্গানিয়া গান গেয়ে ওই
কে চলে অসীম পানে।
ঝঙ্কারি' উঠে এ হৃদয়-বীণা
সে সুরের তানে তানে।
অনাদরে ছিল সুপ্ত যে বীণা,
জাগায়ে কে তোলে সুর-মূর্চ্ছনা,
আশার আলোক জ্বালালে কে আসি
নিরাশা-আঁধার-প্রাণে!
স্তব্ধ রজনী শুক-তারা জাগে
ঘুম ভাঙ্গানিয়া গানে।

তন্দ্রা টুটেছে, ব্যাকুল নয়ন
পথ পানে চেয়ে রয়।
শুনেছে কি দূরে কাহারো কণ্ঠ
আমার শ্রবণদ্বয়?
প্রহরের পর চলেছে প্রহর,
চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ হ'ল ক্ষীণতর,
ঘুম টুটে হ'ল প্রভাত সমীর
শেফালী-গন্ধময়।
ঘুম ভাঙ্গানিয়া গান কি শুনেছে
কী কথা সে তবে কয়?

মনের আগল খুলে বাহিরিনু
শুনিতে তোমার গান।
তোমারে খুঁজিয়া বাহির করিব
তাই তো এ অভিযান।
আঁধার রজনী পথে যদি নামে,
শ্রান্ত চরণ ক্লান্তিতে থামে,
হ'বে না তো শেষ অসীমের পথে
মোর এই অভিযান।
আগল খুলিয়া বাহিরিয়া এনু
পাবো ব'লে সন্ধান।

মরণেরে আমি করিয়াছি জয়,
জরারে রেখেছি দূরে।
প্রাণ মন মম রয়েছে ভরিয়া
তোমার গানের সুরে।
ধরা দেবে জানি অন্তরতম,
সার্থক হ'বে পথ চলা মম,
ভালোবেসে প্রিয় ঠাঁই দেবে মোরে
তোমার হৃদয়-পুরে।
সে দিনের আশে চলিয়াছি তাই
অসীমের পথে—ঘুরে।

বিহারীলাল

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ,এফ্-এস্-এস্,এফ্-আর-ই-এস্

উপক্রমণিকা

কবি বিহারীলালকে কেহ কেহ খুব বড় কবি, আবার কেহ কেহ নগণ্য কবির স্থান দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আলোচনার উৎস খুলিয়া দিলে কাব্যামোদী সুধী-বন্ধুগণের তর্ক-বিতর্কের ফলে তাঁহার সম্বন্ধে একটি

কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী
(৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত পেন্সিল-স্কেচ হইতে)

সুস্পষ্ট ধারণায় উপনীত হইতে পারা যাইবে। সেই আশায় এই প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বাস্তবিকই বিষয়টি তর্ক-বিতর্কের উপযোগী তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

কাব্যালোচনা করিতে গেলে কবির জীবনীরও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। বিহারীলালের প্রিয় শিষ্য ও আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ কবি-বন্ধু স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার বড়াল 'সাহিত্য' সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভে একবার লিখিয়াছিলেন —

"কোন গ্রন্থ পড়িতে হইলে তাহার রচয়িতার জীবনী (যদি পাওয়া যায়) সঙ্গে সঙ্গে পড়া উচিত। নহিলে মূলকথা পাওয়া যায় না, অনেক সময় বুঝা যায় না, ভাল লাগে না। মানুষটী ও বিষয়টী (man and matter) দুইটাই আয়ত্ত করা উচিত; এবং লেখকের সময়াবস্থাও (age) জানা উচিত।"

কিন্তু অনেক সময়েই কবির জীবন ও কাব্যের মধ্যে বিশেষ কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যিনি কাব্যের দ্বারা একটি জাতিকে মহান্ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন বা যিনি সুমধুর ধর্ম্মসঙ্গীত রচনা করিয়া ঋষির ন্যায় পূজা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিতের পর্য্যালোচনা করিলে হয়ত আমরা নিরাশ হই, যিনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাকে হয়ত স্বয়ং অত্যাচারী জমিদাররূপে দেখিতে পাই, যিনি কাব্যে ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রয়াসী, তাঁহার জীবনে হয়ত ধর্ম্মপ্রবণতার কোনও চিহ্ন নাই। তথাপি বড়াল মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মহামনীষিগণও ঐ ভাবের কথা অনেক স্থানে বলিয়াছেন, * এবং উহাতে কিছু সত্য নিহিত আছে। যাঁহার জীবন ও কাব্যের সহিত সামঞ্জস্য আছে, এরূপ কবিও বিরল নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিহারীলাল এই শেষোক্ত কবিগণের পর্য্যায়ভুক্ত। 'দুর্ভাগ্য' এই জন্য বলিতেছি যে, তাঁহার জীবনীর উপকরণ অতি সামান্যই পাওয়া যায়। অথচ তাঁহার জীবনী না জানিলে তাঁহার কাব্য বুঝা যায় না।

* "কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ।" —বঙ্কিমচন্দ্র।

তাঁহার সর্ব্বপ্রধান শিষ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ 'সারদা মঙ্গল' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম তখন তাহার ভাষায়, ভাবে এবং সঙ্গীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না।"

বিহারীলালের অপর এক ভক্ত অনাথবন্ধু রায়ও 'সারদামঙ্গলে'র উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া কবিবরকে পত্র লিখিলে, বিহারীলাল প্রত্যুত্তরে লেখেন —

"মৈত্রী বিরহ, প্রীতি বিরহ, সরস্বতী বিরহ, যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি 'সারদামঙ্গল' রচনা করি। * * *

মৈত্রী ও প্রীতি বিরহ যথার্থ সরল সহজভাবে বুঝাইতে হইলে আমার সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক করে। * * * জীবনবৃত্তান্ত এখন লিখিতে পারিব না।"

সংস্কৃত কলেজ

ইহাতে কবি স্বয়ংই বলিতেছেন, তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত না জানিলে আমরা তাঁহার কাব্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব না। পত্রখানি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। বিহারীলালের পুত্রগণ ধনী, কৃতবিদ্য ও যশস্বী। অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যেও তাঁহারা কবির জীবনচরিত প্রকাশের কোনও চেষ্টা বা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। মধ্যে মধ্যে বিহারীলালের কাব্যের অনুরাগিগণ তাঁহার কাব্যের স্তুতিমূলক সমালোচনা করিয়াছেন বা করিতেছেন, কিন্তু তাহাতে কবিকে বুঝিবার বিশেষ সুবিধা পাইতেছি না। কবির জীবনচরিত যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা তাঁহার কাব্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

জন্ম ও বংশপরিচয়

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে (৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৪২ বঙ্গাব্দ) কলিকাতার জোড়াবাগান পল্লীতে বিহারীলাল জন্মগ্রহণ করেন। যে গলিতে অবস্থিত পৈত্রিক ভবনে কবি জন্মগ্রহণ করেন, এক্ষণে কবির নামানুসারে তাহার নামকরণ হইয়াছে 'বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর লেন'।

বিহারীলালের পূর্ব্বপুরুষগণ ফরাসডাঙ্গায় বাস করিতেন। ইঁহাদের প্রকৃত উপাধি চট্টোপাধ্যায়। কবির প্রপিতামহ মনোহর হালি সহরের জনৈক সুবর্ণবণিকের দান গ্রহণ করিয়া পতিত হন এবং সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। সেই অবধি চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা পুরুষানুক্রমে কলিকাতার সুবর্ণবণিককুলের পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী। কবির পিতৃব্য দ্বারকানাথ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সতীর্থ ও আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষাগুরু ছিলেন। ইনি মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং এক সময়ে ইঁহার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। শুনা যায় পাতিত্যদোষবশতঃ তিনি এই কার্য্য পান নাই। বিহারীলালের পিতা দীননাথ সুবর্ণবণিকদিগের পৌরোহিত্য করিয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেন। বিহারীলালের জন্মের

পূর্ব্বে দীননাথের দুইটি পুত্রসন্তান শৈশবেই প্রাণত্যাগ করায় বিহারীলাল জনক-জননীর এবং বিশেষভাবে পিতামহীর অত্যন্ত আদরের পাত্র হন।

মাতৃবিয়োগ (১৮৩৯)

চারি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বিহারীলালের মাতৃবিয়োগ ঘটে এবং তাহার অত্যল্পকাল পরেই তাঁহার দুই বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাতে বিহারীলালের প্রতি তাঁহার পিতা ও পিতামহীর আদরের মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়া যায়। পিতা পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেও নিঃসন্তান বিমাতা শিশু সপত্নী-পুত্রের সকল উপদ্রব অম্লানবদনে সহ্য করিতেন এবং গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় স্নেহধারায় তাঁহাকে সিক্ত করিতেন। পিতার বাৎসল্যের স্মৃতি তাঁহার কাব্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। 'বঙ্গসুন্দরী'র 'প্রিয়তমা' সর্গে তিনি স্বীয় শিশুপুত্র অবিনাশকে সস্নেহে বক্ষে লইয়া বলিতেছেন—

"বুঝিলেম তবে এতদিন পরে,
কেন আমি ভালবাসি পিতায়,
সকলি ত্যেজিতে পারি তাঁর তরে,
তোমা ছাড়া যাহা আছে ধরায়।"

পিতামহী ও বিমাতার বাৎসল্যও কবিকে তাঁহার জননীর বাৎসল্যের স্মৃতি হৃদয়পটে অপরিম্লান রাখিতে সহায়তা করিয়াছিল, নতুবা চারি বৎসর বয়ঃক্রমের সময় যাঁহাকে হারাইয়াছিলেন, কেবল কল্পনার সাহায্যে অর্দ্ধশতাব্দী পরে 'সাধের আসন' নামক কাব্যের 'নিশীথে' শীর্ষক কবিতায় সে মাতৃস্মৃতি কবি কখনও এরূপ উজ্জ্বল ও মধুরভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন না—

"হৃদয়, আজি রে কেন আকুল হইলে হেন।
কতকাল দেখি নাই মায়ের স্নেহের মুখ,
অতি কষ্টে আধ-আধ, তাও যেন বাধ-বাধ,
প'ড়েও পড়েনা মনে; জীবনের কি অসুখ!
সে কাল-কালিমা টুটে আহা কি উঠিছে ফুটে!
ফিরিয়া আসিছে যেন হারানো পুরাণ সুখ।
চিনেছি মা আয় আয়! বিকাইব রাঙা পায়;
তুমিই দেবতা মম জাগ্রত রয়েছ প্রাণে,
বিপদে সম্পদে রাখ, অলক্ষ্যে আগুলে থাক;—
যখন যেখানে আছি, চেয়ে আছ মুখপানে।
নিদ্রায় আকুল হোলে ঘুমাই তোমারি কোলে,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় করি তোমারই স্তনপান,
তুমি আছ কাছে কাছে তাই প্রাণ বেঁচে আছে;
সর্ব্বদা সঙ্কট পাছে,—সদা কর পরিত্রাণ।
তোমারি কৃপায় মাগো, তোমারি কৃপায়
তরঙ্গে জীবন-তরী সুখে চলে যায়;
শুধু তোমারি কৃপায়।
তব স্নেহ মূলাধার, এদেহ বিকাশ তার;
নির্ম্মল মনের জল তব মহিমায়, মাত! তব মহিমায়।
চারি বছরের ছেলে কেন ফেলে স্বর্গে গেলে?
আমি অতি শিশুমতি, চিনিতে পারিনি গো!
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি, তোমারে পুজিনি গো।"

প্রাথমিক শিক্ষা (১৮৪৫-৫০)

পিতামহীর আদরে মাতৃহারা বালক বিহারীলাল ক্রমে ক্রমে "আলালের ঘরের দুলাল" হইয়া উঠিলেন। পাঠাভ্যাসে তাঁহার আসক্তি ছিল না। কেহ তাঁহাকে বিদ্যার্জ্জনের জন্য উৎপীড়িতও করিত না। তিনটি পুত্রসন্তান হারাইয়া অবশিষ্ট একটির প্রতি অত্যধিক স্নেহপরায়ণ পিতা মনে করিতেন, সে জীবিত থাকিয়া সামান্য সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া যজমান রক্ষা করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। বালক বিহারীলালও এই সুযোগে পাঠে অবহেলা করিয়া ব্যায়ামাদি দ্বারা শারীরিক উৎকর্ষ বিধানে মনঃসংযোগ করিলেন। তিনি স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ ছিলেন এবং সতীর্থগণের মধ্যে বাল্যকালোচিত বিবাদ-কলহের মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, বাল্যকালে বিহারীলাল "একটু দাঙ্গাবাজ গোছ" ছিলেন। তবে শুনা যায়, তিনি সর্ব্বদাই দুর্ব্বলের ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করিতেন। বিহারীলাল সন্তরণেও খুব দক্ষ ছিলেন

এবং নিমতলা ঘাট হইতে জাহ্নবীবক্ষ দুই তিন বার তিনি অনায়াসে পার হইতে পারিতেন।

তাঁহার অনিয়মিত বিদ্যাভ্যাসের জন্য পাঠ অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই। গৃহে সামান্য শিক্ষার পর দশম বৎসর বয়সে তিনি জেনারেল এসেমব্লিজ

জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসন্

ইন্‌ষ্টিটিউসনে কয়েক মাসের জন্য মাত্র বিদ্যাশিক্ষা করেন। অতঃপর বৎসরত্রয় সংস্কৃত কলেজের নিম্ন-শ্রেণীতে পাঠ করিয়া তিনি পাঠশালা ত্যাগ করেন।

পুরী যাত্রা

এই সময়ে তিনি এক দুঃসাহসিক কার্য্য করেন। তাঁহার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার এক খুল্লপিতামহ শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করেন। বিহারীলাল তাঁহার পিতার ও পিতামহীর অজ্ঞাতসারে পদব্রজে তাঁহার অনুগমন করেন এবং পথিমধ্যে তাঁহার সহিত মিলিত হন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন—

"বিহারীলাল আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বাল্যকালে তিনি কতকটা ছিপছিপে ও কাহিল ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার একবার শ্রীক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে তৎকালপ্রচলিত নিয়মানুসারে হাঁটাপথে যাওয়া হইয়াছিল। প্রত্যহ ১০।১২ ক্রোশ হাঁটিয়া এবং চিঁড়া, মুড়কি, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য ক্ষুধার উপর প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া তাঁহার শরীর গঠিত হইয়া গেল। সেই অবধি তিনি বরাবর হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন এবং বিলক্ষণ আহার করিতে পারিতেন। সাহস ও অকুতোভয়তা তাঁহার যে প্রকার ছিল, বাঙ্গালী জাতির সেরূপ খুব কমই আছে।"

পুরীতে সমুদ্রের অনন্ত বৈচিত্র্যময়ী শোভা ও বিশালতা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার এক পুত্রকে তিনি বলিয়াছিলেন, "সমুদ্র দেখেই আমার brain খুলে গেল।" সাগরের ওপার হইতে কি মহাসঙ্গীত ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তুলিল। এই স্থানেই বিহারীলালের কবি-জীবনের আরম্ভ হইল। তাহার 'নিসর্গসন্দর্শনে' 'সমুদ্রদর্শন' নামক কবিতাটীতে এবং 'সাধের আসনে'র কোনও কোনও পংক্তিতে এই সমুদ্র-দর্শন-স্মৃতি উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে —

"উদার অনন্ত নীল হে ধাবন্ত অম্বুরাশি!
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে কোথায় ধেয়েছ ভাই!

মহান্ তরঙ্গরঙ্গে কি মহান্ শুভ্র হাসি !
বল কারে দেখিয়াছ? কোথা গেলে দেখা পাই !”

সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাংলা কাব্যের অনুশীলন

শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর বিহারীলালের প্রকৃতিতে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন দেখা দিল। কৈশোরে বৃথা সময় নষ্ট করিবার জন্য তাঁহার মনে অনুতাপ জাগিল। তিনি এইবার আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে বিদ্যার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাশ্মীরের রাজমন্ত্রী স্বনামধন্য নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিহারীলালের বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা তখন ভাল ছিল না। দুই টাকা মাসিক বেতন দিয়া বিহারীলাল ও তাঁহার এক ভগিনী নীলাম্বরের পিতা দেবনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট মুগ্ধবোধ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। অতঃপর আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের প্রতিভাশালী অগ্রজ রামকমল ভট্টাচার্য্যের নিকট বিহারীলাল সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করেন। কালিদাস ও ভবভূতির কাব্য এবং বাল্মীকির রামায়ণ তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল।

রামকমলের নিকটেই বিহারীলাল ইংরাজী শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রিয়সুহৃৎ কৃষ্ণকমলের সহায়তায় ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। মেকলের সন্দর্ভাবলী, হিউম ও স্মলেটের ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী, সেক্সপীয়র, বায়রণ ও গোল্ডস্মিথের অমর কাব্যগুলি তিনি একে একে অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেন। তাঁহার রচনার কোনও কোনও স্থানে সেক্সপীয়র ও বায়রণের প্রভাব লক্ষিত হয়। কৃষ্ণকমলের সঙ্গে অনেক সংস্কৃত কাব্যও পাঠ করেন। কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন—

“বিহারীলাল ইং ১৮৭৪ অব্দে ফ্রি চার্চ্চের B.A. শ্রেণীর অনেক বিশিষ্ট ছাত্রের রঘুবংশ ও শকুন্তলার পাঠ সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। এবং এরূপ শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট সময়ে সময়ে জুটিত।
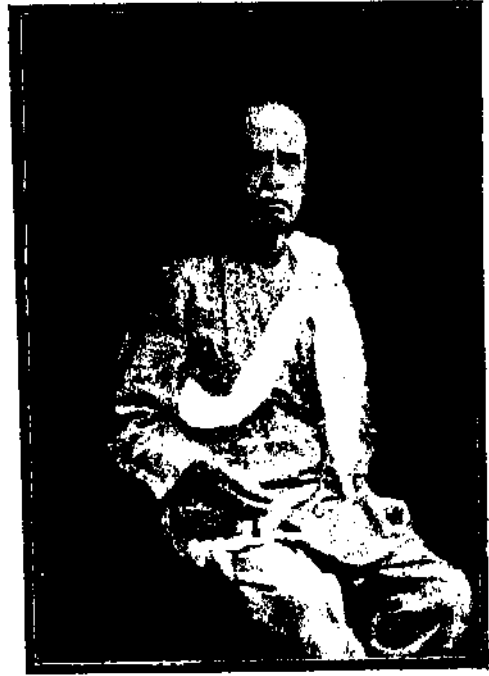
আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

“বিহারীর লেখাপড়ার সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া মুগ্ধবোধ পড়িতে গিয়াছিল কিন্তু ইস্কুল কলেজে বাঁধাবাঁধি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা তাহার স্বভাবের সহিত মিলিল না। তাহার individuality (ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য) এতই তীব্র ছিল। অল্পকালমধ্যেই সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া সে বাড়ীতে পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধ কিছুদিন পড়িয়াছিল ; তাহার বাড়ীর শিক্ষকও বড় ‘কেও কেটা’ ছিলেন না ; তিনি আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান নীলাম্বর বাবুর পিতা। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব আর বোধ হয় ভারবি, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত ও শকুন্তলা আমি তাঁহাকে পড়াইয়াছিলাম। তিনি আমার কাছে সকালে বিকালে পড়িতে আসিতেন।

“আমার মনে আছে, বায়রণের Childe Harold এবং সেক্সপীয়রের ওথেলো, ম্যাকবেথ, লীয়র প্রভৃতি দু’পাঁচখানি নাটক একত্রে পাঠ করা হইয়াছিল। বিহারীর ধীশক্তি এতই তীক্ষ্ণ ছিল, বিশেষতঃ কাব্য-শাস্ত্র পর্য্যালোচনাতে এরূপ একটি স্বাভাবিক প্রবণতা

ছিল যে, অতি সামান্ত সাহায্যেই তিনি ভালরূপ ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন। ইহার আরও এক কারণ ছিল: বাঙ্গালা সাহিত্যটা তিনি অতি উত্তমরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, ঈশ্বর গুপ্ত, দাশু রায় ইত্যাদি তৎকালপ্রচলিত অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ তাঁহার ভালরূপ পড়া ছিল।"

কিন্তু এই সময়ে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অনুরাগ পরিস্ফুট হইয়াছিল—বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রতি। বটতলা হইতে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত পুস্তকই তিনি কৈশোর হইতে অবহিতচিত্তে পাঠ করিতেন। এইরূপে তিনি কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র এবং চণ্ডীদাসপ্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণের সহিত বিশিষ্টভাবে পরিচিত হন। আধুনিক কবিগণের কাব্যও তিনি যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, রঙ্গলাল, নিধুবাবু, রাম বসু, দাশু রায় প্রভৃতির রচনার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল।

আর একটি শিক্ষার উপায়ের কথা বলা অত্যন্ত আবশ্যক। বিহারীলাল বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন এবং যেখানে যাত্রা, পাঁচালী বা কবির গান হইত, তিনি তথায় উপস্থিত হইতেন। গোবিন্দ অধিকারী, মদন অধিকারী, গোপাল উড়ে প্রভৃতির গান ও উপস্থিত রচনাশক্তি তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। এই সকল গান তিনি বাটীতে আসিয়া পুনঃ পুনঃ সুর-লয়ে আবৃত্তি করিতেন এবং বিস্মৃত পদগুলির স্থানে স্বয়ং নূতন পদ রচনা করিয়া লইতেন। এইরূপে তাঁহার প্রথম সঙ্গীতরচনাশক্তির অনুশীলন হয়। তাঁহার কোন কোন প্রসিদ্ধ গীতে এইরূপ কবির গানের প্রভাব লক্ষিত হয়। তবে সাধারণতঃ অনুকরণের প্রতি তাঁহার প্রকৃতিগত ঘৃণা ছিল—বিশেষতঃ ইংরাজী কাব্যের অনুকরণের প্রতি। তিনি বাংলার নবীন কবিগণকে পাশ্চাত্য কাব্যের অনুকরণ করিতে দেখিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন—

"এখন ভারতে ভাই কবিতার জন্ম নাই,
গোরে বসে অট্ট হাসে কে রে কার ছায়া?
হা ধিক্ ফেরঙ্গ বেশে এই বাল্মীকির দেশে,
কে তোরা বেড়াস্ সব উদ্ভিমুখী আয়া?
নেকৃড়ার গোলাপ ফুলে বেঁধে খোঁপা পরচুলে
ছিটের গাউন পোরে আহ্লাদে আকুল!
পরস্পরে গলা ধরি, নাচিছেন যেন পরী!
কি আশ্চর্য্য বিধাতার বুঝিবার ভুল!
কেন এ অলীক ভূষা, সরস্বতী অকলুষা,
ওই দেখ হাসিছেন বিমল গগনে!
হেলিয়া নলিনীরাণী, কোন্ প্রাণে খুঁজে আনি'
গাঁথিয়া দোপাটী মালা দিব শ্রীচরণে?

দুমিনিটে ঝ'রে যা'বে, ম'রে য'াবে ক্ষুদ্র প্রাণী;
দিওনা মায়ের পায়ে প্রসাদি কুসুম আনি!"

প্রথম বিবাহ (১৮৫৪)

বিহারীলালের আবাসভবন-সংলগ্ন একটি বাটীতে কালিদাস মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইঁহারই দশমবর্ষীয়া বালিকা কন্যার সহিত ঊনবিংশতি বর্ষ বয়স্ক বিহারীলালের পরিণয় সংঘটিত হয়। কবি-পত্নী অভয়া দেবী সুন্দরী ছিলেন কিন্তু নিরক্ষরা ছিলেন। লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়—এই দৃঢ় কুসংস্কার দূরীভূত করিয়া কবি তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে বিদ্যাশিক্ষা দিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশবর্ষ বয়সে সতী সন্তান-সম্ভবা হইলেন। কিন্তু যখন কবি সংসারসুখের আশায় উৎফুল্ল তখন অকস্মাৎ বজ্রাঘাত হইল। মৃত সন্তান প্রসব করিয়া অভয়া দেবী সতীলোকে প্রস্থান করিলেন। এই দারুণ দুর্ঘটনায় কবির হৃদয় শোকে ভগ্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার 'বন্ধুবিয়োগ' নামক কাব্যের 'সরলা' নামক তৃতীয় সর্গে কবির পত্নীস্মৃতি লিপিবদ্ধ আছে—

"যে গুণ থাকিলে স্বামী চিরসুখে রয়,
সে সকলে পূর্ণ ছিল তাহার হৃদয়।
না জানিত সৌখীনতা নবাবী চলন,
না বুঝিত রঙ্গভঙ্গ রসের ধরণ।

শঠতা, বঞ্চনা, ছল, বৃথা অভিমান,
একদিনো তার কাছে পায় নাই স্থান।
মন, মুখ সম ছিল সকল সময়,
বলিত সুস্পষ্ট, যাহা হইত উদয়।
আন্তরিক পতিভক্তি, আন্তরিক টান,
অন্তরে বাহিরে মম চাহিত কল্যাণ।
এমনি চিনিয়াছিল সতীত্ব-রতন,
এমনি বুঝিয়াছিল মান-ধনে ধন ;
এমনি সুদৃঢ় ছিল নারীর আচারে,
সকলেই স্নেহ-ভক্তি করিত তাহারে।
আলস্যে অশ্রদ্ধা ছিল শ্রমে অনুরাগ,
কোরে লয়েছিল নিজ সময় বিভাগ।
যে সময়ে যাহা তারে হইবে করিতে,
আগেতে করিয়ে আছে কেহ না বলিতে।
এমনি ধীরতা ছিল মনের ভিতর,
কখন দেখিনে তারে হইতে কাতর।
প্রথমেতে ছিল কিছু ভ্রান্ত সংস্কার,
ঘোচে নাই ভাল কোরে মনের বিকার।
পড়িতে বলিলে বহি মনে পেত ভয়,
ভাবিত পড়িলে হ'ব বিধবা নিশ্চয়।
খদ্যোত পড়িলে দীপে হ'ত চমকিত
শুনিলে পেচক-রব ভাবিত অহিত।
বুঝিত কিঞ্চিৎ অল্প প্রেম আস্বাদন,
অল্পই চিনিত আমি মানুষ কেমন।
শুষ্ক পত্রে ফুল্ল ফুল আচ্ছন্ন হইলে,
শীঘ্র স্বীয় শোভা ধরে পবন বহিলে।
সে দোষের ক্রমে হয়ে গেল পরিহার,
গর্ব্বের সঞ্চার সহ প্রেমের সঞ্চার।
কতই আনন্দ মনে, হাসি দুই জনে,
ধরেছে মুকুল আজি প্রণয়-কাননে।
ফুটিবে হাসিবে কত আমোদ ছুটিবে,
মনোহর ফল ফলি' চক্ষু জুড়াইবে।
হেরিয়ে সুচারু তরু ভুলে যাবে মন,
চিরদিন হ'য়ে র'ব আনন্দে মগন।
অকস্মাৎ ভূকম্পে সে সাধের কানন,
ভূমি শুদ্ধ উবে গেল নাই নিদর্শন !"

যে দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে কবিত্বের নিদর্শন থাক বা না থাক, উহা কবির জীবন-স্মৃতি হিসাবে মূল্যবান্ এবং আমরা পরে দেখিব উহা হয়ত তাঁহার ভবিষ্যতে রচিত কাব্যনিচয় বুঝিতে সহায়তা করিবে।

প্রথম রচনাবলী

বাল্যকাল হইতেই বিহারীলাল কবিতা লিখিবার অভ্যাস করিয়াছিলেন। আচার্য্য কৃষ্ণকমল বলেন—

"তিনি অল্পবয়সেই পদ্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই পদ্যগুলিতে প্রথমাবধিই আমি একটি নূতন 'ধর্ত্তা' লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাহা আমার খুবই ভাল লাগিত এবং সেই 'ধর্ত্তা' উত্তরকালে তাঁহার সমস্ত লিখাতেই লক্ষিত হয়। আমার জ্যেষ্ঠ তাঁহার পদ্যরচনার বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং উল্লিখিত নূতনত্বের জন্য বিহারীকে উৎসাহ দিতেন। সেই নূতনত্ব আমি কিরূপে বুঝাইয়া দিব তাহা ঠাওরাইতে পারিতেছি না। বোধ হয় ইংরাজীতে পোপ ও তাঁহার অনুগামী কবিদিগের পর ক্র্যাব, কাউপার, বায়রণ, ইঁহারা যে এক নবীনতা আনিয়াছিলেন, বিহারীর নবীনতা কতকটা সেই প্রকারের ছিল। ভাবব্যঞ্জক কোনও প্রচলিত শব্দই প্রয়োগ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না; এবং সেকেলে ভাব সকল লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেন।"

"স্বপ্নদর্শন" (১৮৫৮)

পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৫০ খৃঃ হইতে ১৮৬০ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি নানা বিষয়ে অনেক কবিতা লিখিয়াছিলেন। এইগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে। ইঁহার সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত পুস্তক পদ্যে রচিত নহে—গদ্যে। তাহার নাম "স্বপ্নদর্শন"। এই পুস্তিকাখানি ১২৬৫ সালে অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়। উহা

৺অক্ষয়কুমার দত্তের স্বপ্নদর্শন বিষয়ক প্রস্তাবগুলির আদর্শে রচিত। উহার ভাষা স্থানে স্থানে ওজস্বিনী

অক্ষয়কুমার দত্ত

হইলেও উহার এমন কোনও গুণ নাই যাহাতে উহা বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে।

"পূর্ণিমা" (১৮৫৮)

এই বৎসরেই অর্থাৎ ১২৬৫ সালের ফাল্গুনী পূর্ণিমায় 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য গ্রন্থের প্রণেতা কামাখ্যাচরণ ঘোষের পরিচালনায় ও বিহারী-লালের সম্পাদকত্বে 'পূর্ণিমা' নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। উহা কয়েকমাসমাত্র অর্থাৎ পরবৎসরের শারদীয়া পৌর্ণমাসী সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। বিহারীলাল উহাতে গদ্য পদ্য কয়েকটী রচনা প্রকাশ করেন। উহাতে প্রকাশিত কবির 'প্রেমবৈচিত্র্য' নামক কবিতাটী পরে তাঁহার 'প্রেমপ্রবাহিণী' নামক কাব্যগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। এই মাসিকপত্রে আচার্য্য কৃষ্ণকমলও 'জুঁইফুলের গাছ' ও 'তাঁতিয়া-টোপী' শীর্ষক দুইটি কবিতা লিখিয়াছিলেন।

এই সময়ে বিহারীলাল তাঁহার 'বন্ধুবিয়োগ' নামক কাব্য রচনা করেন (১২৬৬ সাল) কিন্তু কাব্যখানি ১২৭৭ সালের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং প্রকাশকালানুক্রমে আলোচনা করিতে গেলে উহার বিষয় এক্ষণে কিছু বলা সঙ্গত নহে।

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ (১৮৬০)

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পিতা দীননাথ বিহারীলালের দ্বিতীয় বার বিবাহ দেন। কবির দ্বিতীয়া পত্নী কাদম্বিনী দেবী বহুবাজার নিবাসী নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা ছিলেন এবং রূপে গুণে পতিকে আজীবন মুগ্ধ রাখিয়াছিলেন। বিহারীলাল স্বয়ং তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিখাইয়াছিলেন। কাদম্বিনী দেবী পতির

কবিপত্নী কাদম্বিনী দেবী

কবিত্বের পরমানুরাগিণী ছিলেন এবং বিহারীলালেরও পত্নীপ্রেম তাঁহার অনেক রচনায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের 'প্রিয়তমা' নামক নবম সর্গের কিয়দংশ এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য —

প্রিয়ে তুমি মম অমূল্য রতন !
যুগযুগান্তের তপের ফল ;
তব প্রেম স্নেহ অমিয়-সেবন
দিয়েছে জীবনে অমর বল।
সেই বলে আমি ক্রূর নিয়তির
কড়া কশাঘাত সহিতে পারি—
ভাঁড়ামি ভীরুতা বোঁচা পেত্নীর
এক কাণা কড়ি নাহিক ধারি।
জগত জালানী ঈরিষা আমারে,
তাপে জরজর করিতে নারে,
দ্যুলোকে ভূলোকে আলোকে আঁধারে
সমান বেড়াই চরণচারে।

*　　*　　*

আননে লোচনে স্বরূপ প্রকাশ,
হৃদয় প্রফুল্ল কুসুমভূমি,
জুড়াতে আমার জীবন উদাস,
ধরায় উদয় হয়েছ তুমি !
বিপদে বান্ধব পরম সহায়,
সখী আমোদিনী আমোদ সেবি,
শান্ত অন্তেবাসী ললিত-কলায়,
সমাধি-সাধনে সদয়া দেবী।
মায়ের মতন স্নেহের যতন
কর কাছে বসি ভোজনকালে,
বিকালে আমার জুড়াতে নয়ন
সাজ মনোহর কুসুমমালে।
সন্ধ্যা-সমীরণে শাস্ত্র আলোচনে,
সুমধুর বাণী-বাদিনী সারী ;
নিশীথ-নির্জ্জনে বেল-ফুলবনে
চাঁদের কিরণে ললিত নারী।
নিস্তব্ধ নিশায় লেখনীর মুখে
গাঁথিতে বসিলে রচনা-হার
তুমি সরস্বতী দাঁড়াও সন্মুখে,
খুলে দাও চোখে ত্রিদিব-দ্বার।

বিহারীলালের এই পত্নীর গর্ভেই তাঁহার সকল সন্তান — ৮টি পুত্র ও ৬টি কন্যা — জন্মগ্রহণ করেন।

"সঙ্গীত-শতক" (১৮৬২)

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিহারীলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সঙ্গীত-শতক" প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার অন্তর্গত গীতি-কবিতাগুলি ১৮৫০ খৃঃ হইতে ১৮৬০ খৃঃ কালের মধ্যে রচিত। এগুলি রচনার সময়ে প্রকাশিত হইলে কি হইত বলিতে পারি না। কিন্তু যে দশকে উহা রচিত সেই দশকে বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে এক যুগান্তর প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী', ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মাইকেলের 'তিলোত্তমা', ১৮৬১ খৃঃ মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ' ও 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', ১৮৬২ খৃঃ রঙ্গলালের 'কর্ম্মদেবী' ও হেমচন্দ্রের 'চিন্তাতরঙ্গিণী' প্রকাশিত হয় এবং এই তিন জন প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাবে, পুরাতন আদর্শে রচিত 'সঙ্গীত-শতক' পাঠকসমাজে কোনও আদর পাইল না। আচার্য্য কৃষ্ণকমল বলেন —

"একশতটি গানের প্রত্যেকটির মধ্যে এক একটি অপূর্ব্বতা আছে। বিহারী বিশেষ যত্ন করিয়া উত্তম অক্ষরে, উত্তম কাগজে কিছু অর্থব্যয় করিয়া গানগুলি ছাপাইয়াছিলেন। But the book fell still-born from the press। পঞ্চাশখানিও বিক্রীত হইয়াছিল কি না সন্দেহ।"

কৃষ্ণকমলের মতে "এই অপ্রতিষ্ঠা গ্রন্থের রচনার দোষে নহে, পাঠকদিগের সহৃদয়তার অসদ্ভাবে। 'সঙ্গীত-শতক' গ্রন্থ একশত বাঙ্গালা গানে গ্রথিত। গানগুলি 'কানু ছাড়া গীত নাই' সে ধরণের গান নহে। কোনটিতে তাঁহার নিজের মনোভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, কোনটিতে একটি সুন্দর বৃক্ষের বর্ণনা বা একটি চমৎকার সন্ধ্যার আকাশের বর্ণ বৈচিত্র্য বা একটি ফুলের বাগানের কথা ইত্যাদি। সর্ব্বত্রই রচনা এরূপ সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী যে, পড়িতে পড়িতে পরম আপ্যায়িত হইতে হয়।"

সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক রাজনারায়ণ বসুও লিখিয়াছেন —

রাজনারায়ণ বসু

"অনেকে এইরূপ আক্ষেপ করেন যে, ধর্ম্ম ও আদিরসঘটিত গীত (যাহাদের অনেকগুলিই অশ্লীলতা ও অবিশুদ্ধ প্রেমদ্বারা কলুষিত) ব্যতীত বন্ধুত্ব, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় অদ্যাপি গীত রচিত হয় নাই। কিন্তু এ আক্ষেপ অনেক পরিমাণে না হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে অমূলক। * * *

"কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী 'সঙ্গীত শতক' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে নানা বিষয়ের সঙ্গীত আছে।"

আমাদের বিশ্বাস, কাব্যসাহিত্যে রঙ্গলাল, মাইকেল ও হেমচন্দ্রের, এবং নাট্যসাহিত্যে রামনারায়ণ, কালীপ্রসন্ন, মাইকেল ও দীনবন্ধুর আবির্ভাবের পরে প্রকাশিত হওয়াতেই বিহারীলালের গ্রন্থখানির আদর হয় নাই। তবে যাঁহারা 'সঙ্গীতশতকে'র শেষ গীতে সন্নিবিষ্ট উপদেশটীর—

"ভাল কোরে দ্যাখ দ্যাখ, অন্তরেতে দৃষ্টি রাখ,
সদয় সরল মনে কর অন্বেষণ!
যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়ে দেখ তাই!
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন।"

অনুসরণ করিবেন, তাঁহারা এখনও অনেক লুকান রতনের সন্ধান পাইতে পারেন।

"মহাঝটিকা" (১৮৬৪)

১৮৬৪ খৃঃ মহাঝটিকার বৎসরে বিহারীলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশ ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহাকে পাইয়া কবির হৃদয় কিরূপ আনন্দে উদ্বেলিত হইয়াছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার রচনার অনেক স্থলেই পরিদৃষ্ট হয় —

"ওরে অবিনাশ, বাছারে আমার,
ননীর পুতুল, দুধের ছেলে,
স্নেহেতে মাখান কোমল আকার,
নয়ন জুড়ায় সমুখে এলে!
হেলে দুলে, হেসে পালিয়ে পালিয়ে,
ধেয়ে এসে তুমি পড়িলে গায়;
আপনি অন্তর ওঠে উথলিয়ে
পুলকে শরীর পূরিয়ে যায়!"

স্নেহপ্রবণ কবির এই বাৎসল্যভাব তাঁহার আর এক সন্তান 'দুধের মেয়ে বরদারাণী'র উদ্দেশে লিখিত পদগুলিতে প্রকটিত হইয়াছে।

"আয়রে আনন্দময়ী আয় মেয়ে বুকে আয়!
হাসি হাসি কচি মুখে নূতন ভুবন ভায়।
স্বর্গের কুসুম তুমি ফুটিয়াছ ভবনে,
ত্রিদিবের মন্দাকিনী হাসে তোর নয়নে।
তুমি সারদার বীণা খেলা কর কমলে,
আধ বিজড়িত বাণী শোনে প্রাণী সকলে।
ঈশ্বরের কৃপা তুমি জগতের জননী,
তাই মা হাসিলে তুই হেসে ওঠে ধরণী।"

এরূপ সরল ও আন্তরিক বাৎসল্যভাবপূর্ণ কবিতা বোধ হয় আমরা পরবর্ত্তী কবিদের মধ্যে কেবল দেবেন্দ্রনাথ সেনের কাব্যে পাইয়াছি।

"অবোধ বন্ধু" (১৮৬৬-১৮৭০)

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বিহারীলালের অন্যতম বন্ধু, চোর-বাগান নিবাসী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ "অবোধ বন্ধু" নামক একটি মাসিকপত্রের প্রবর্ত্তন করেন। বিহারীলাল উহার অন্যতম প্রধান লেখক ও পরে সম্পাদক ছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্রের 'ইন্দ্রের সুধাপান', আচার্য্য কৃষ্ণকমলের 'পল-বর্জ্জিনিয়া', 'নেপোলিয়নের জীবন বৃত্তান্ত' প্রভৃতি সুলিখিত প্রস্তাবাদি উহাতে প্রকাশিত হয়। যোগেন্দ্রনাথের সম্পাদকত্বকালে পত্রখানির আকার অতি ক্ষুদ্র ছিল। সেই সময়ে বিহারীলালের 'নিসর্গ সন্দর্শন' ও 'বঙ্গ-সুন্দরী'র কয়েকটী কবিতা উহাতে প্রকাশিত হয়।
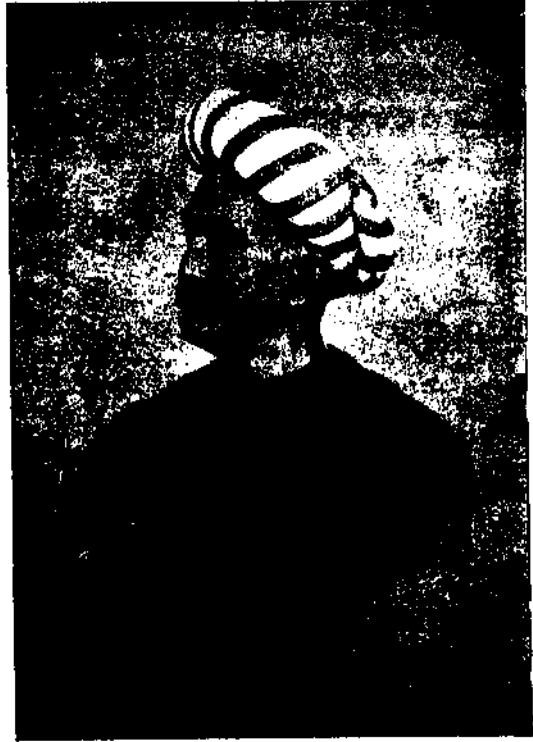
ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সি-আই-ই

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — (যৌবনে)

১২৭৬ সালের বৈশাখ (তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) হইতে পত্রের আকার বর্দ্ধিত হয় এবং বিহারীলাল উহার স্বত্বাধিকারী হন। উহাতে বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী', অসম্পূর্ণ কাব্য 'সুরবালা' ও 'প্রেম-প্রবাহিণীর' কিয়দংশ প্রকাশিত হয়। অর্থাভাবে এই পত্র ১২৭৭ সালে বিলুপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই পত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই ক্ষুদ্র পত্রে যে সকল গদ্য প্রবন্ধ বাহির হইত তাহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব ছিল। তখনকার বাঙ্গলা গদ্যে সাধু ভাষার অভাব ছিল না, কিন্তু ভাষার চেহারা ফোটে নাই। তখন যাঁহারা মাসিক-পত্রে লিখিতেন তাঁহারা গুরু সাজিয়া লিখিতেন—এই জন্য তাঁহারা পাঠকদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই এবং এই জন্যই তাঁহাদের লেখার যেন একটা স্বরূপ ছিল না। যখন 'অবোধ বন্ধু' পাঠ

করিতাম তখন তাহাকে ইস্কুলের পড়ার অনুবৃত্তি বলিয়া মনে হইত না। বাঙ্গলা ভাষায় বোধ করি সেই প্রথম মাসিকপত্র বাহির হইয়াছিল, যাহার রচনার মধ্যে একটা স্বাদ-বৈচিত্র্য পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যের প্রাণ-সঞ্চারের ইতিহাস যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিবেন তাঁহারা 'অবোধবন্ধুকে' উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। 'বঙ্গদর্শন'কে যদি আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভাত-সূর্য্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন 'অবোধ-বন্ধু'কে প্রভাতের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

"সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্য-কুঞ্জে বিচিত্র কল-গীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখী সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।

"ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না—কিন্তু আমি সেই প্রথম বাঙ্গলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।"

রবীন্দ্রনাথের উক্ত বাক্যগুলি অনেকে উদ্ধৃত করেন কিন্তু উহা কেবল আংশিক ভাবে সত্য। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র যখন 'বিবিধার্থসংগ্রহ' প্রকাশ করেন, তখনই বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনে উষার শুকতারা দেখা গিয়াছিল। তাহার দুই বৎসর পরে যখন টেকচাঁদ ঠাকুর 'মাসিক পত্রিকা'য় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন তখন তিনি গুরু সাজিয়া আসেন নাই, প্রিয় বয়স্যের ন্যায়ই রহস্যরসের রঙ্গে আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যগুরু বিহারীলালের যে অতিরঞ্জিত প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা কতদূর বিচারসহ তাহা আমরা পরে দেখিব। তবে ইতিহাস এই কথা বলে, ঠিক এই সময়ে হেমচন্দ্র গীতি-কবিতার যে আদর্শ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল, তাঁহার কবিতাবলীর প্রশংসা সর্ব্বত্র শ্রুত হইয়াছিল, তাঁহার কবিতার অনুকরণে কবিতা লিখিতে অনেক তরুণ কবি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তখন কেবল একটি ভোরের পাখী গান ধরে নাই, রঙ্গলালের ভেরী, মধুসূদনের পাঞ্চজন্য ও হেমচন্দ্রের শিঙ্গা বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের আবির্ভাব ঘোষণা করিবামাত্র নানাদিক্‌ হইতে বহু বিহঙ্গম

টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র)

ললিতস্বরে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, এবং সেই জন্তই যথেষ্ট প্রতিভা বিশ্বমান থাকা সত্বেও বিহারীলাল আশানুরূপ খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

(ক্রমশঃ)

চার্ব্বাক-পন্থী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সাড়ে ছটা বাজিবার বহু পূর্ব্বেই নরেনকে হাত গুটাইতে দেখিয়া শ্রীপতি বলিল,—কিহে, আজ হপ্তার হাওয়া গায়ে লাগলো বুঝি? উপরি খাটবে না?

নরেন হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল,—নাঃ, রোজ রোজ ভাল লাগে না।

শ্রীপতি বলিল,—ভাল না লাগলেই বা উপায় কি!—ঘণ্টা দুই টাইপের বাক্স নাড়লে যে পয়সা ট্যাঁকে আসে, সময় অসময়ের জন্তে তাই কি কম? অবিশ্যি বর্ষাকাল সামনে নেই—ডাক্তারের খরচটা কিছু কম ধরতে পার, কিন্তু সামনে অঘ্রাণ মাস, আত্মীয়ের বিয়ে দু'একটা ত হবেই। তার তত্ব—

নরেন হাত ধুইতে ধুইতে বলিল,—রাখ তোমার তত্ব! বিয়েতে না গেলেই হ'ল। সময় অসময়? আমাদের আবার সময়? ডুব্তোরি—; বলে, 'ডুবেচি না ডুবতে আছি—পাতাল কতদূর।'

শ্রীপতি বলিল,—জানালার ফাঁক দিয়ে দেখচ, হপ্তার গন্ধে কত গণ্ডা কাবুলী মাছি ভন্ ভন্ ক'রচে?

—হুঁ, মাছি না, ভীমরুল! তা' থাক, বুদ্ধি থাকলেই ওদের হাত ছাড়ানো কিছু শক্ত নয়। ওই ত হপ্তার হাল! ন'টাকা সাড়ে তের আনা—কি আর ওদের গর্ভে দেওয়া যায়? আজ মনের সাধে খরচ করা যাবে।

শ্রীপতি বলিল,—কালিয়া পোলাও নাকি?

নরেন ঘাড় ফিরাইয়া বলিল,—নয়ই বা কেন! মনে কর, যারা মোটর চড়ে, সিগার ফোঁকে, গন্ধ তেল মাখে—তাদেরই ওটা একচেটে? এই যে ন'টাকা সাড়ে তের আনা, এ তো আমার। সিগার, সোডা, নতুন ফুলকপি, কড়াইশুটি, ভাল সাবান, তেল, পোলাও, মাংস—

শ্রীপতি হাসিয়া বলিল,—চালাও—চালাও নবাবী! বাড়ি গিয়ে দেখবে হপ্তার ধারে চারিদিক থৈ থৈ। মুদি, গয়লা, ডাক্তার, কাপড়, জামা, মশলাপাতি, ঘরভাড়া—কত কি! তখন নবাবী এসে ঠেকবে আধ পয়সার বিড়িতে, দু'পয়সার কুচো চিংড়ীতে; ফুল কপির পাতা শুঁকেই ফিরতে হবে। দু'পয়সা চুণভরা সাবান চাই কি একখানা কিনতে পার, আর পোলাওয়ের বদলে বড় জোড় চালে-ডালে—ঘিয়ের ছিটে ফোঁটা কোথাও নেই!—বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

নরেন রাগ করিয়া বলিল,—সে তোরা! তোরা কিপ্‌টে কোথাকার—তোরা পিঁপড়ে টিপে মিষ্টি বার ক'রবি। আমাদের, বাবা, অত 'কালকের' জন্ত ভাবনা নেই। আজ ত বাঁচি! আচ্ছা, রইলো তোর নেমন্তন্ন, উপরি খেটে আমার ওখানে যাস্। দেখবি আজ ক্যায়সা হাল!—বলিয়া চটি পায়ে ফট্ ফট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। পাশের টুল হইতে অন্ত একজন কম্পোজিটার কহিল,—তোমার ত বরাত ভাল, একটা নেমন্তন্ন জুটে গেল।—তবু ভালটা মন্দটা খেতে পাবে।

শ্রীপতি সেদিকে চাহিয়া কহিল,—কাজ নেই আমার

ভাল মন্দ খাওয়ায়! কালই এসে হাত পাতবে—দাও কিছু ধার। হাঁড়ি চ'ড়চে না। বুঝলে না, ধার মানে জল! আজ অবধি খুচরো কত নিয়েচে জান? এই দেখ খাতা, এর প্রায় সবক'টা পাতাই ওর নামে খরচ লেখা।

—অ্যাঁ, বল কি! এত দেনা ক'রেও লোকটা স্বচ্ছন্দে—

শ্রীপতি কহিল,—সে ত দেখচই। ভাবনা ওর মোটেই নেই! শুনেচ ওর আর এক কীর্ত্তি? থাকে ভাড়া ঘরে, ছ'মাসের ভাড়া জমলেই—ব্যস্‌,—একেবারে সে পাড়া থেকে লম্বা। শ্যামবাজার থেকে বৌবাজার—শিয়ালদা থেকে বড়বাজার কোন চত্বরই নাকি বাকি নেই! এখন আছে ভবানীপুরের ওদিকে।

সে লোকটি হাসিয়া কহিল,—এতেই ত আমাদের জাতের বদনাম। পেটে না খেতে পাস্‌, মানটা ত আগে! ছিঃ!

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নরেনও বলিত,—ছি! বাপের মৃত্যুর পর 'মলঙ্গা লেনে' ছোট্ট যে খোলার ঘরটুকু ছিল, সেটুকু বন্ধকী দেনায় ডুবু ডুবু প্রায় দেখা গেল। প্রতিবেশী ঘোষাল মহাশয় সদ্‌যুক্তি দিলেন,—নরেন, ও সব মানতে গেলে ত সংসারে মাথা রাখা অসাধ্য হ'য়ে ওঠে। দেখনা, হাত চিঠির সব ক'টাই তিন বৎসরের মেয়াদ শেষ হ'য়েচে, উল্টো পিঠে একটা উশুল পর্য্যন্ত নেই। গহনা বাঁধা যা আছে,—বেশ ত, বেচে নিক। আর মুখের কথা? রামঃ বল—ও সব ধাপ্পাবাজি। এক ক্লাসের লোক—ওই রকম থাকে, কেউ ম'লেই নাবালকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে তারা মজবুত। তুমি স্রেফ্‌ চক্ষু বুজে দেখেই না মজাটা, দু'দিনে সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

নরেন মৃদুস্বরে আপত্তি করিল,—ছি! তা' কি হয়, কাকাবাবু। আমি সব দেনাই মাথা পেতে নেব, ওঁদের কাছে সময় ভিক্ষে ক'রবো—এতে নিশ্চয়ই ওঁদের দয়া পাব।

দয়া করিয়া সকলেই সময় দিলেন। নরেন কৃতার্থ হইয়া ঘোষালমহাশয়কে বলিল,—দেখলেন কাকাবাবু, লোকগুলো ভাল, ব'লতেই বুঝলেন।

ঘোষাল মনে মনে বলিলেন,—রও বাবা—দু'টি মাস। তারপর ওদেরই দেখবে আর এক মূর্ত্তি।

নরেন ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়া কোন ছাপাখানায় বেগার খাটিতেছিল। বয়স কম, মনে অপরিমিত উৎসাহ। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জ্যোতিঃ দু'টি ভাসন্ত চোখে টলটল করিতেছে। পিতার মৃত্যুর পর…… ম্যানেজারকে মাহিনার কথা জানাইতেই তিনি বার-কয়েক ইতঃস্তত করিয়া দৃঢ়-সঙ্কল্প যুবকের পানে চাহিয়া পনেরোটি টাকা দিতে রাজি হইলেন। নরেন বাড়ি আসিয়া মা ও বউকে এই আনন্দ-সংবাদ জানাইল।

কয়েকমাস পরে সে-ছাপাখানা ছাড়িয়া নরেন অন্যত্র চাকুরি লইল। মাহিনা এবং উপরি খাটিয়া সে প্রায় চল্লিশ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল। হিসাবী যুবক—সব কয়টি টাকা খরচ না করিয়া সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের বই খুলিল।

এইবার ঘোষালের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে-অক্ষরে ফলিয়া গেল। নরেনের কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করিয়া উত্তমর্ণ নালিশ ঠুকিল। নরেন হাতে পায়ে ধরিয়াও সে বেগ রোধ করিতে পারিল না। ভিটাটুকু দেনার দায়ে বিকাইয়া গেল,—আর গেল ব্যাঙ্কের যৎসামান্য পুঁজি। উত্তমর্ণ নরেনের অশ্রুজল দেখিয়া সান্ত্বনা দিল,—মাত্র টাকার দায়ে বাড়ি তাহাকে বাধ্য হইয়া লইতে হইতেছে,—নতুবা ও খোলার বাড়ির কি-ই বা দাম! যাহা হউক, সে নরেনের জন্য বছরপাঁচেক অপেক্ষা করিবে, যদি ইতি মধ্যে সে টাকা শোধ করিয়া দিতে পারে ত নরেনের জন্মভিটা নরেনেরই রহিবে।—প্রচণ্ড একটা আঘাত নরেনের বুকে আসিয়া বাজিল, তথাপি সে উত্তমর্ণের কথায় বিশ্বাস না করিয়া পারিল না।…যৌবনের জোয়ার তার সর্ব্বাঙ্গে, কর্ম্মশক্তিতে

সে অদম্য;...দু'টি সবল বাহুর বিক্ষেপে ভবিষ্যতের ভয় মনের ত্রিসীমানায় সে ঘেঁসিতে দিবে না। এখন কি ভাঙ্গিয়া পড়িলে চলে?

বাড়ি ছাড়িয়া নরেন ভাড়া-ঘরে উঠিয়া আসিল এবং সঞ্চয়ের নেশায় গভীর কর্ম্ম-সমুদ্রের তলায় সে ডুব দিল।

সে সঞ্চয়ের আতিশয্যে বাড়ির সকলেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন।

মা প্রায়ই বলিতেন, হাঁ রে নরেন, আমাদের শুকিয়ে রেখে এ কি তোর পুঁজি রে, বাপু। ছোট ছেলেটার এক পো দুধে হয়? বৌ এয়োস্ত্রী মানুষ, এক টুকরো মাছ না হ'লে—

নরেন হাসিয়া বলিত,—হয়, খুব হয়। একটু টানা-টানি কর না, ক'টা বছর। তারপর, বাড়িটা ছাড়িয়ে নিয়েই...দুধ, মাছ কারো কিছু অভাব রাখবো না।

মা বলিতেন,—তা হোক বাপু, পেটে না হয় একদিন না খেলে সয়, পরণের কাপড় খানায় কত সেলাই রিপু চ'লবে বল! আসচে মাসে বৌ'র এক জোড়া লাল পাড় শাড়ী চাই।

বেশী কিছু বলিবার ভয়ে নরেন তাড়াতাড়ি সেখান হইতে সরিয়া পড়িত।

মা কিন্তু সন্ধানে রহিলেন। মাসকাবারের মাহিনা যেদিন হাতে আসিয়াছে—সেই দিনই জিজ্ঞাসা করিলেন, —লাল পাড় শাড়ী কৈ রে?

—ঐ যাঃ, ভুলে গিয়েচি!

—ভুলেচ না আর কিছু! ও-সব কোন' কথাই আমি শুনবো না। দাও দেখি বাছা তিনটে টাকা—সুবলকে দিয়ে আনিয়ে নেব।

নরেন মাথা চুলকাইয়া বলিল,—কিন্তু এ-মাসে ত হয় না, মা। কামাইয়ের দরুণ দুটো দিন কাটা গেল।

মা-ও জিদ ধরিলেন,—দেখ নরেন, মিছে কথা বলিস না, যে দু'দিন কাটা গেল—সে দু'দিনও উপরি খেটে শোধ দিয়েছিস—আমি কি জানি না, না! নে, বার কর টাকা।

নরেন নিরুপায় হইয়া উত্তর দিল,—ও-ত ব'লছিল এ মাসটা ওতেই বেশ চলবে। না হয় আসচে মাসে—

মা বলিলেন,—না, বাছা, না। তুই যে আমার চোখের সামনে না খেয়ে, না পরে, শুকিয়ে টাকা জমাবি সে আমি সহ্য করবো না। বাড়িই না হয় গেচে, তা' ব'লে তোদের আমি হারাতে পারবো না।

নরেনের অশ্রু আর বাধা মানিল না।—জামার হাতায় চোখ ঢাকিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল,—তুমি কেবল আমার কষ্টটাই দেখচ, কিন্তু ভিটে ছেড়ে আসবার সময় তোমার কান্না ভুলবো না। না, না, আমায় কোন' অনুরোধ ক'রো না, আমি রাখতে পারবো না। যতদিন না সেই ভিটের তোমার নিয়ে যেতে পারি,—ততদিন খাওয়া-পরা বা বাবুআনি আমার দ্বারা হবে না—হবে না। এ পয়সা নয়, আমার বুকের রক্ত; বিনা দরকারে খরচ হ'লে আমি মরে যাব। দোহাই তোমার মা, আমায় ও-অনুরোধ আর ক'রো না।

কথা শেষে অবোধ বালকের মতই কোঁচার খুঁটটা মুখে চাপিয়া উচ্ছ্বসিত কান্না চাপিতে চাপিতে নরেন বাহির হইয়া গেল।

মা আর কি বলিবেন; নিঃশব্দে খানিক কাঁদিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিলেন,—ঠাকুর, নরুর আমার 'ধূলো মুঠো ধ'রতে সোনা মুঠো হোক', ওর মনের কষ্ট ঘুচুক।

রাত্রিতে বউকে ডাকিয়া নরেন চুপি চুপি বলিল,—তোমার খুব কষ্ট হ'চ্চে, নয়? কি ক'রবে বল—

বউ বেচারি অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—কি যে বল! তুমি যা' সইচ—আমরা কি সেটুকুও সইতে পারি না? মা'র যেমন কথা? কি হবে কাপড়—কোথাও কি বেরুই যে—

নরেন দুঃখিত স্বরে বলিল,—তোমার বয়সের মেয়েদের কত সাধ;—কত গয়না, কাপড়, পাউডার, গন্ধতেল। কিন্তু এমন বরাত তোমার—

সে বেচারি লজ্জায় জড়ো-সড়ো হইয়া হঠাৎ নরেনের মুখের উপর হাত চাপা দিয়া বলিল,—ছি! কি ব'লচো? আমি কি চেয়েছি ও-সব জিনিষ কোন' দিন?

—চাও না বটে, আমার ত সাধ হয়।

—যাও, তুমি ভারি দুষ্টু! আমার বলে মনেই হয় না ও-সব।

পরে ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল,—যদি কোন' দিন নিজের বাড়ি গিয়ে ব'লতে পারি—তখন চাইব। দেখব মশাই—কত দিয়ে উঠতে পার তুমি!

নরেন আদর করিয়া বউয়ের হাত দু'খানিতে চাপ দিয়া কহিল,—সেই ভাল। তোমার মত লক্ষ্মী বউয়েরা এই রকম আবদারই ক'রে থাকে। দেখ সু, মনে আমার অনেক সাধ—ওই দত্তদের মত তেতালা বাড়ি হবে না সত্য, কিন্তু ওই রকম ক্লক বাইরের ঘরে একটা টাঙাবোই।—ছোট্ট গোল টেবিল, খানকতক চেয়ার, চায়ের সেট একটা। আফিস থেকে ফিরতেই তুমি নিজের হাতে চা তৈরী ক'রে দেবে, একটু দুধ চিনি বেশী দিয়ে,—কেমন?

—কেন, এখনও ত দিতে পারি।

—এই দেখ—বুঝলে না! এখন যে ও-সব বাজে খরচ। বাড়ি না ছাড়িয়ে নিতে পারলে বাজে খরচ এক পয়সাও আমি ক'রবো না। বন্ধুরা কি বলে জান? —হাড় কিপ্‌টে। আমার নাম নিলে নাকি সকাল বেলায় হাঁড়ি চড়ে না! ও কি মুখ ফেরালে যে? শোনই না! খোকার ভাতে তাদের বলিনি ব'লে—বাবুদের কি যে রাগ! আমিও তেমনি জবাব দিয়েছি,—ছেলে বড় হোক, তার বিয়েয় তোদের খাওয়াব! হাঃ—হাঃ—বলিয়া হাসিতে লাগিল।

বউ ম্লানমুখে বলিল,—তা' কিছু মিষ্টি মুখ—

নরেন হাসিয়া বলিল,—নাঃ,—তুমি হ'লে দেখচি একপয়সাও জমাতে পারতে না। হবে, হবে, সাধ কি আমারই নেই, সু?—আছে। বরং ওদের চেয়ে ঢের ঢের বেশী আছে। কিন্তু আমার ওই একটা সাধের তলায় আর সব সাধকে চাপা দিয়ে রেখেছি। তুমি জান না, মা'র চোখের জল যে ক'রে পারি, আমি মুছোবোই মুছোবো। লোকে কেপ্পন বলে সইবে, লক্ষ্মীছাড়া ব'ললে সইবে না।

বাড়ির জন্য নরেন রীতিমত কৃচ্ছ্র-সাধন আরম্ভ করিল।

খাওয়া-পরার কথা বাদ দিলেও দেহের উপর যতটুকু সহ্য হয়—তার অনেক বেশী—সে হাসিমুখে বহন করিত। শ্যামবাজার হইতে শিয়ালদার মোড় প্রত্যহ দুবেলা সে হাঁটিয়া যাতায়াত করে। জলখাবার—খুব ক্ষুধা বোধ হইলে একপয়সার মুড়ি। কলের মিষ্ট জল আছে তাতেই পেট ভরিয়া যায়।

মাসের শেষে উপার্জ্জনের অধিকাংশ অর্থ যেদিন সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা হয়—সেইদিন তার অকালবার্দ্ধক্য-পীড়িত যৌবন যেন আনন্দ-আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহে। কুঞ্চিত ললাট হইতে ক্ষুদ্র রেখাগুলি হাসির প্লাবনে প্রায় মুছিয়া যায়, চক্ষু হইতে প্রাণের দীপ্তি বাহির হয়,—সমগ্র মুখখানিতে···জয়-কামনার শ্রী ফুটিয়া উঠে। শ্যামবর্ণকে মনে হয়—ঈষদ্ গৌর। সঙ্গীরা অবাক্ হইয়া ভাবে, উঁচু টুলে বসিয়া চিরকালের কুঁজা কম্পোজিটার কি করিয়া বত্রিশ ইঞ্চি বুকের ছাতিকে আটত্রিশে স্ফীত করিয়া আর সকলকে টেক্কা মারিয়া চলে! এবং সেদিনের আনন্দপ্রবাহে কি করিয়াই বা অভিজ্ঞ কম্পোজিটারের অত সহজ বানান গুলির···মারাত্মক রকমের ভুল ঘটে! এক পয়সার মুড়ির বদলে দু'পয়সার গজা কিনিয়া খায়। সেই একটি দিন বাজারেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। অসময়ের তরি-তরকারী, গোছালো মাছ, কিছু বা মিষ্ট, ফলমূল,—সেই একটি দিনেই নরেনের বাহুল্য বা বিলাস। এটি তার উৎসবের সূচনা-মুহূর্ত্ত, ব্রতের দিন।

এমনই করিয়া কয়েক বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে কয়েক শত টাকা ব্যাঙ্কে জমিল। নরেন হিসাব করিয়া দেখিল, আর একটি বৎসর। ছোটখাট

বারটি মাস মাত্র। ব্রতউদ্‌যাপনের বিলম্ব নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্বের কয়টি বৎসর যেমন নিঃশ্বাসের ভরে উড়িয়া গিয়াছে — শেষ বৎসরের পরমায়ু কি দীর্ঘতর! দণ্ড হইতে দিন — তারপর রাত্রি। তার উপর সংসারের এটা ওটা লাগিয়াই আছে। আজ মায়ের শরীর খারাপ, কাল ছেলেটার পেটের অসুখ। নিজের দেহও কেমন যেন বিকল; বৈকাল হইতেই চোঁয়া ঢেকুর উঠে, বদ্‌হজম। কেহ বলে অম্বল, কেহ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। বউও দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। কচি মেয়েটা আঁতুরেই মারা গেল, সেই হইতেই বউ শুকাইতেছে। কে জানে, সূতিকা, না গ্রহণী? নরেন মনে মনে হাসিয়া বলে, — পরীক্ষা! ভাল, যতই দল বাঁধিয়া তোমরা এস না, কয়টি বছর যদি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কাটিয়া গিয়া থাকে — একটি বৎসরও অনায়াসে কাটিবে। অম্বল বুকের মাঝে কতটুকুই বা জাঁকিয়া বসিবে? বউ কতটুকুই বা শুকাইবে? একবার বাড়ি দখল করিয়া বসিতে পারিলে — তোমরা ত ঝড়ের মুখে তুলার রাশি। ভাল টাট্‌কা পথ্য, — তাজা ঔষধ — বিকল দেহ দু'দিনে কর্ম্মক্ষম হইবে। যেমন বিনা কাজে ছাপাখানার অতিকায় যন্ত্রগুলা পড়িয়া পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে মরিচা ধরিবার উপক্রম! যেমন কাজের চাপ পড়ে — অমনই মিস্ত্রি আসিয়া ফাইল করিয়া হড় হড় করিয়া তেল ঢালে। মাজাঘসা পেটাপিটিতে বিকল যন্ত্র কয়েকদণ্ডে মজবুত হইয়া ভীমনাদে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। তেমনই দেহ! ও-সব কিছু নয়…। চাই উপার্জ্জন — চাই ধৈর্য্য।

পরীক্ষা বুঝি ভাল করিয়াই আরম্ভ হইল। ছেলেটার অসুখ সারিতে না সারিতে মা পড়িলেন।

বউ মুখ শুকাইয়া বলিল,—মা ত কখনও এমন ভুল বকেন না, তুমি ডাক্তার ডাক্।

নরেন হাসিয়া বলিল,—ও কিছু নয়, মাথায় ক'সে জলপটি লাগাও, আমি আসচি। দেখলে না, খোকা আপনিই সেরে গেল।

সেদিন সমস্ত রাত উপরি খাটিয়া নরেন পরের দিন ঘরে ফিরিল। দেখিল গৃহ নিস্তব্ধ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—তেল দাও না গো, স্নানটা সেরে ফেলি।

বউ শুষ্ক মুখে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল,—জ্বরটা ভাল বোধ হ'চ্চে না। জল পটিতে ত কিছু হ'লো না।

নরেন সেদিকে কান না দিয়া কহিল,—আচ্ছা, আজ সরকারী ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এনে দেবো'খন। তেল কই?

স্নান সারিয়া সত্যই সে ওষুধ আনিয়া দিল। মায়ের শিয়রে বসিয়া খানিক জলপটী লাগাইল — বাতাসও করিল। — তারপর…অফিসের সময় হইতেই পাখা ফেলিয়া নিঃশব্দে জামা গায়ে দিল।

বাহির হইবার সময় বউ বলিল,—একটা বেদানা এনোত। একটু রস না খেলে গায়ে বল হবে না। —আর সকাল সকাল ফিরো।

নরেন নিরুত্তরে চলিয়া গেল।

—সাড়ে ছ'টার সময় মনটা কেমন চঞ্চল হইয়া উঠিল। না—থাক, আজ আর উপরি খাটিয়া কাজ নাই। মায়ের অসুখটা সত্যই শক্ত বোধ হয়। একজন ডাক্তার ডাকিলে ভাল হয়। কিন্তু হাতে ত টাকা নাই, তিন দিন পরে মাহিনা মিলিবে। এখন টাকা পাইতে হইলে সেভিংস ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। এত বিপদ-আপদে যে প্রলোভন সে দমন করিয়াছে আজ অসুখের জন্য নিরুপায় হইয়া— ?—না, না, কে বলিল শক্ত অসুখ! জ্বর বেশী, বুড়ো মানুষ—সে-বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভুল বকিতেছেন। যাক্‌না আর দু'টা দিন। সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করাইয়াই বা লাভ কি? শরীরের রস মরিতেই ত দুই দিন কাটিয়া যায়; তারপর চিকিৎসা করাইলে ঔষধের গুণ ধরিবে। এখন এত তাড়াতাড়ি করিয়া লাভ কি? বেদানাও আজ থাক। বরং খোকার দুধ হইতে কিছু দুধ মাকে খাওয়ানো

যাক। বেদানার রসের চেয়ে দুধে শীঘ্র শীঘ্র গায়ে বল হয়। দুধে প্রোটিন আছে কিনা।—আর মিছামিছি এত সকাল বাড়ি গিয়াই বা কি হইবে? সে ত ডাক্তার নহে যে, হাত দিয়া রোগ সারাইয়া দিবে। বরঞ্চ এখানে কাজে ব্যস্ত থাকিলে ভাবনা-চিন্তার অবসর থাকিবে না। কথায় বলে, অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। মিছামিছি উপরি-টা নষ্ট করা উচিত নহে।

দুই একঘণ্টা করিয়া অবশেষে রাত্রিটাই কাটিয়া গেল। প্রত্যুষে বাড়ির গলিতে ঢুকিতে কেমন যেন পা দুইটা আড়ষ্ট হইয়া আসিল। বুকের গোড়ায় অনবরত টিপ্ টিপ্ শব্দ। সমস্ত রাত্রি জাগরণে কাটিয়াছে বলিয়া কি এই দৌর্বল্য? কে জানে! গলিটাও—অসম্ভব রকমের নিস্তব্ধ। না স্ক্যাভেঞ্জারের ঘড়-ঘড়ানি, না অসাবধান গৃহস্থের খোলা কলের ছড়-ছড় জলধারার শব্দ! কোন বাড়িরই দুষ্ট খোকা কি ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্গিয়া 'বায়না' ধরে নাই!—বাড়ির দুয়ারে আসিয়া অতি সন্তর্পণে কড়া নাড়িলেও সে শব্দে নরেন যেন নূতন করিয়া চমকিয়া উঠিল।

দ্বার খুলিয়া গেল। হুঁকা হাতে চৌধুরীবুড়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া। নরেনকে দেখিয়া নিরস্ত হুঁকায় একটা প্রবল টান দিয়া কহিলেন,—এস।

তাঁর কণ্ঠ অস্বাভাবিক গম্ভীর। নরেন সেদিকে চাহিতে পারিল না কিংবা কোনও প্রশ্ন তার মুখে জোগাইল না। ঘাড় হেঁট করিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিল।

দুয়ার বন্ধ করিয়া চৌধুরী ডাকিলেন,—শোন।

নরেন ফাঁসি-কাঠের আসামীর মতই নিঃশব্দে ফিরিল।

চৌধুরী বলিলেন,—হাঁ,—খুলে বলাই ভাল। ডাক্তারদের মত মিছে আশা দেওয়া আমি ভালবাসিনে। তোমার মা'র ব্যায়রামটা শক্ত। কাল তুমি বাড়ি নেই—বড্ড বাড়াবাড়ি—বউমা কেঁদে উঠতেই, কি করি নিজের পয়সা খরচ ক'রে ডাকালুম ব্রজবাবুকে। বল্লেন, অ্যানিমিক। গায়ে একফোঁটা রক্ত নেই। কেস শক্ত।—তবে চেষ্টা করা যাক।—আরে বাপু, ওইত তোদের প্যাঁচ! টাকা আদায়ের ফন্দী। গায়ে নেই রক্ত—ব্যস্—তার আর দেখবি কি? কেবল মোটা ফী যোগাও—

সে বক্তৃতার সবটুকু নরেনের কানে যায় নাই। উন্মত্তের মত সে ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

সামনের খালি ছাদটুকুতে বউ কাঁথা শুকাইতে দিতেছিল। নরেন আসিয়া পাগলের মত প্রশ্ন করিল,—কই, তুমি ত আমায় বল নি—মা এত দুর্ব্বল? গায়ে একফোঁটা রক্ত নেই?

বউ বলিল,—কালও ত বেদানা আনতে ব'লেচি। রক্ত থাকবে কোত্থেকে! এক বেলা এক মুঠো আলো-চাল। না ঘি, না দুধ;—রক্ত কি আপনি আসে?

নরেন সে কথা শুনিয়াও যেন শুনিল না। আপন মনে বলিতে লাগিল,—রক্ত নেই—রক্ত নেই! এতদূর হবে কে জানতো! দেখ, আজ যত ইচ্ছে দুধ নিও, আমি বাজার থেকে ভাল বেদানা আনচি, যেমন করে হোক মাকে বাঁচাতেই হবে। এ বাড়িতে নয়—এ বাড়িতে নয়। দাঁড়াও, আমি আসচি।—পাগলের মতই সে বাহির হইয়া গেল।

রোদ উঠিলে দেখা গেল, নরেন শুধু ঠোঙ্গা ভর্ত্তি ভাল বেদানাই আনে নাই, কয়েকটি কমলালেবু, কিছু আঙ্গুর ও গোটা দুই আপেলও আনিয়াছে।

অচৈতন্য মায়ের শিয়রে বসিয়া অতি যত্নের সহিত নরেন—বেদানার খোসা ছাড়াইয়া পাথর বাটীতে রস করিল, পরিষ্কার ন্যাকড়া না থাকায় বউকে খানিক ধমকাইল—পরে আপনার কোঁচায় খুঁটে রস ছাঁকিয়া মায়ের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল,—মা,—ও মা।

রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া মা চাহিলেন,—কিন্তু সে চক্ষে জ্ঞানের বর্ত্তিকা জ্বলিল না।

নরেন পাগলের মত ডাকিল,—মা, মা, ও মা।

সে আর্ত্তধ্বনি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইয়া নরেনের বুকে আসিয়া আঘাত করিল। হাত কাঁপিয়া বেদানার রস বালিশের উপর পড়িয়া গেল। মায়ের মুখের

একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও নহে। যেন ঝড়ের পূর্ব্বেকার পৃথিবী।

অবশেষে ঝড় বহিল। রোগ-শয্যায় পড়িয়া নরেনের প্রকৃতি একেবারে বদলাইয়া গেল।

বউয়ের হাতে সাগুর বাটি দেখিয়া নরেন চীৎকার করিয়া কহিল,—যত সব হতচ্ছাড়া মানুষ, জলসাগু খাইয়ে আমায় মেরে ফেলবে। কেন, দুধ নেই ?

বউ বলিল,—এই ত একটু আগে দুধ খেলে।

নরেন মুখ খিঁচাইয়া বলিল,—একটু আগে খেয়েচি, এখনও খাব। বেশ ক'রবো। আমি উপায় করি, খাব না ? খুব ক'রবো।

বউ কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল,—আজ ত পনেরো দিন বিছানায় শুয়ে, রোজগার পাতি নেই—

নরেন চীৎকার করিয়া কহিল,—চুপ। পোষ্টাফিসের টাকা নেই ? লেয়াও টাকা। ছ'মাস খাটবো না, কাজ ক'রবো না, দেখি সে টাকা খরচ হয় কি না। ভারি মজা ! ভেবেচেন মা'র মত না খাইয়ে এটাকেও মারবো, তাহ'লে মজাসে টাকাগুলো গাপ ক'রবার সুবিধে হয়।

বউ সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল,—কথা দেখ অলক্ষুণে। আগে মানুষ—তবে ত টাকা। কে চাইচে তোমার টাকা ?

নরেন তেমনই চড়া সুরে বলিল,—ফের নাকে কান্না ?. বেশ করবো, খরচ করবো। আমি জমিয়েচি—আমিই খরচ ক'রবো, 'কারো কি তোয়াক্কা রাখি। কালই মধুডাক্তারকে আনাব, বুঝলে ?

ঘটা করিয়াই চিকিৎসা সুরু হইল। জ্বর ছাড়িয়া গেলেও মাসখানেকের উপর নরেন অফিস কামাই করিল। রোগা মানুষের বায়না লাগিয়াই আছে। আজ মাছের কালিয়া, কাল চপ কাটলেট, ছানার পায়স, দই, রাবড়ী। কয়েকখানা ভাল কাপড় জামাও আসিল। আর আসিল একটা টেবিল, খানকতক চেয়ার ও চায়ের কাপ-প্লেট—ইত্যাদি। ছোট ঘরে আঁটে না বলিয়া দশ টাকা দিয়া একখানা বড় ঘর ভাড়া লওয়া হইল।

বাঁ হাতে ঝুলাইয়া হেলিতে দুলিতে এমন ভাবে চলিয়াছে যেন অদূরবর্ত্তী মোটরখানা উহারই অপেক্ষায় মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া আছে। সেদিন পোলাওয়ের হাঁড়ি চাপে, মাংসের চপ কাটলেট তৈয়ারী হয়, ক্ষীরের পায়স, আইসক্রীম সন্দেশ, দই—এমন কি বরফ দেওয়া লেমনেড পর্য্যন্ত বাদ পড়ে না। ভোজনের কি সে পারিপাট্য! লোকে লক্ষ্মীছাড়া বলে বলুক, কিন্তু আগামী কালের অত্যাচার—উৎপীড়ন সে সহিতে পারিবে না। উৎসাহী যৌবন বিন্দু-বিন্দু রক্ত দিয়া ভবিষ্যতের যে সুখ-সৌধ রচনা করে,—নিষ্ঠুর কালের একটিই ফুৎকারে সে-সৌধ তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া যায়। আবার নব উদ্যমে—অক্লান্ত আয়োজনে—কে ধৈর্য্যশীল সে-সৌধের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বশক্তির নিয়োগ করিবে!

একদিন বড় মাছের কয়েকখানা টুকরা পর দিনের জন্য বউ রাখিয়া দিয়াছিল, নরেন ত রাগিয়াই অস্থির!—এ গৃহিণীপনা কে তোমায় করিতে বলিয়াছে? নির্ম্মম ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়? এক টুকরা নহে, এক বিন্দু নহে। যে প্রতারক তাহাকে নিয়ত বঞ্চনাই করিবে, তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া ছবিতে রং ফলাইও না,—আলোককে উজ্জ্বল করিও না,—কোনরূপ লালন-দৌর্ব্বল্য সে নির্দ্দয়ের জন্য মনের কোথাও যেন না থাকে! রূঢ় অবহেলা ও দাক্ষিণ্যহীন অন্তর দিয়া সর্ব্বদা উহাকে বিদ্ধ করিয়ো। মনে রাখিও,—যে ভবিষ্যৎ ধন-জন-সমৃদ্ধ যশ-মান-সৌরভিত অট্টালিকার দুয়ারে নিয়ত অবনত শিরে বদ্ধ-করে ভৃত্যের মত সদা আজ্ঞানুবর্ত্তী, ভগ্নকুটীর সান্নিধ্যে তাহারই প্রতাপ অক্ষুণ্ণ! সে প্রবঞ্চক, নিষ্ঠুর, প্রভুত্ব-গৌরবে গর্ব্বান্ধ। দরিদ্রের বন্ধু বা শত্রু একমাত্র বর্ত্তমান। কোন দিন প্রসন্নতা,—কোন দিন বা ভ্রূকুটি। আদর বা শাসনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তার লেখায়। কিন্তু কপট ভবিষ্যতের ছলনায় যেন মানুষ না ভোলে!

পরদিনই হাতে পয়সা না থাকিলেও ধার করিয়া সে একটা বড় মাছ কিনিয়া আনিল। খাইবার সময় ছেলেমেয়েগুলাকে কাছে ডাকিল। বউকে বলিল,—থালা ভর্ত্তি ক'রে সকলকে দাও। একটুকরো যেন কালকের জন্য পড়ে না থাকে। আজ ত পেট ভরে খা'ক, কাল না হয় উপোস দেবে—সে-ও-ভাল। কিরে মন্টু, ভাল ক'রে খাচ্ছিস না যে? খিদে নেই? দূর পাগল! খা, খা, ভাল ক'রে খা। খেয়ে যদি মারা যাস সেও ভাল, কিন্তু খবরদার ডাক্তার এসে যেন না বলে—অ্যানিমিয়া। পেট পুরে খা, বুঝলি!—বলিয়া নরেন —হাঃ—হাঃ—করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বেশী হাসিলে বোধ হয় চোখের কোনে বড় বড় জলের বিন্দু আপনি আসিয়া জমে। হাসির গমকে সেই বিন্দুগুলি টপ্ টপ্ করিয়া ভাতের থালার উপর ঝরিয়া পড়িতে থাকে, তথাপি নরেনের হাসি থামে না।

গঙ্গা, গীতা ও গায়ত্রী

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু, গীতারত্ন

গায়ত্রী, সাবিত্রী, সরস্বতী, গঙ্গা ও গীতা একই পদার্থ। ব্রহ্মার এক তেজ সূর্য্য বা সবিতা, আর এক তেজ গঙ্গা ও সরস্বতী, এবং গীতা তাঁহার বাঙ্ময়ী মূর্ত্তি।

যিনি সূর্য্য তিনিই গঙ্গা, এবং গীতা তাঁহারই শব্দময়ী বা মন্ত্রময়ী মূর্ত্তি।

ব্রহ্মতেজেরই নাম সবিতা। সবিতার তেজ জগৎকে পোষণ করে। যে তেজ নিদ্রিতকে জাগ্রত করে, তাঁহার নাম সবিতা। ইনি প্রাতে বা বাল্যে গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে বা যৌবনে সাবিত্রী, এবং সায়াহ্নে বা বার্দ্ধক্যে সরস্বতী।

গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার অঙ্গ-সম্ভূতা, সুতরাং তিনি উভয়ের অংশ ও আত্মস্বরূপিণী। তিনি শান্ত, কান্ত, অনন্ত ও আদ্যন্ত-বিরহিতা।

পূর্ব্বে রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা শঙ্করের সঙ্গীত শ্রবণে আর্দ্র হইয়া গিয়াছিলেন, সেই আর্দ্রতাই দ্রবময়ী গঙ্গা। গঙ্গাধর শিব দয়া করিয়া বেদাক্ষর নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক তদীয় দ্রব্য দ্বারা গঙ্গা নির্ম্মাণ করেন।

শঙ্কর সর্ব্ব প্রাণিগণের প্রতি দয়া করিয়া, যোগোপনিষদের সার আকর্ষণপূর্ব্বক এই সরিদ্বরাকে নির্ম্মাণ করেন। বেদাক্ষর-নিষ্পীড়িত যে পদার্থ, তাহাই গঙ্গা, তাই গঙ্গা বেদময়ী।

> শ্রুত্যক্ষরাণিনিশ্চিত্য কারুণ্যাচ্ছম্ভুনা মুনে।
> নির্ম্মিতা তদ্দ্রবৈরেবা গঙ্গা গঙ্গাধরেণ বৈ ॥ ৮৭
> যোগোপনিষদামেতং সারমাকৃষ্য শঙ্করঃ।
> কৃপয়া সর্ব্বজন্তুনাং চকার সরিতাং বরাম্ ॥ ৮৮
>
> স্কন্দপুরাণ—কাশীখণ্ড।

গঙ্গা ব্রহ্মারই মঙ্গলস্বরূপিণী জলময়ী মূর্ত্তি। তিনি শুদ্ধ বিদ্যারূপা, করুণাত্মিকা, আনন্দামৃত-রূপিণী, ত্রিশক্তি। তিনি পরব্রহ্মস্বরূপিণী। তাঁহার জলরাশি অমৃতস্বরূপ। তিনি শম্ভুর জটাকলাপ হইতে নির্গত হইয়া পাপপূর্ণ সগরতনয়গণের অস্থিসমূহকে প্লাবিত করতঃ তাঁহাদিগকে স্বর্গে প্রেরণ করেন। তিনি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার নাম বিষ্ণুপদী। ইনি সিদ্ধ মুনি ও ঋষিগণদ্বারা সর্ব্বদা পূজিত হইতেছেন।

জীব তাহার জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ, যাহা তাহার জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত হইতে দেয় না। অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা বুঝিতে পারি না যে, গঙ্গা গীতারই দ্রবময়ী মূর্ত্তি। আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃই এইরূপ অজ্ঞানতার দ্বারা আমরা আক্রান্ত। সেই অজ্ঞানতারূপ দুরদৃষ্টকে নষ্ট করিবার জন্য আমাদের শ্রীকৃষ্ণের একান্ত শরণাপন্ন হওয়া উচিত। কৃষ্ণভক্ত সাধুগণ অবিনাশী, মহাপ্রলয়েও তাঁহাদের পতন হয় না।

> মহতি প্রলয়ে পাতঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বনিশ্চিতম্।
> ন পাতঃ কৃষ্ণভক্তানাং সাধূনামবিনাশিনাম্ ॥
>
> ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

প্রবল প্রারব্ধকেও কৃষ্ণভক্তির দ্বারা ক্ষয় করা যায়। সাধারণতঃ অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়, মনুষ্যলোকে কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে না, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই তাহা খণ্ডন করিতে পারেন, কারণ তিনিই "নিষেকং খণ্ডিতং শক্তং নিষেকজনকং বিভুম্" (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্ গণপতিখণ্ডম্ — ১২।১৫)। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলনিবন্ধন অবশ্যম্ভাবী বিষয়কেই নিষেক কহে। শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভোগ নিস্তারের আর উপায় নাই। অতএব সকলেরই তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

জীবের সুখ বা দুঃখ কোন ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন হয় না। সমস্তই স্বকর্ম্মের ফলভোগমাত্র।

প্রকৃতি জগতের আধার রূপে এবং শ্রীকৃষ্ণ জগতের আত্মা রূপে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ আত্মা, ব্রহ্মা মন, মহেশ্বর জ্ঞান, স্বয়ং বিষ্ণু পঞ্চপ্রাণ এবং প্রকৃতি দেবী বুদ্ধি-স্বরূপ বিরাজ

করিতেছেন। বেদে ইঁহাকে শৈলরাজদুহিতা বলে। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া অতি তুচ্ছ তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন।

প্রকৃতিই সমস্ত জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী ও সকলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জননী। শ্রীকৃষ্ণের মায়া-স্বরূপা প্রকৃতি দেবীও তাঁহার তুল্য। সেই জন্য প্রকৃতি দেবী নারায়ণী বা যোগমায়া নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। প্রকৃতি ভিন্ন কখনও সৃষ্টি হইতে পারে না।

সকল দর্শনশাস্ত্রই সৃষ্টিকে শক্তি অর্থাৎ প্রকৃতিমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ আত্মস্বরূপ ও নির্লিপ্তভাবে সাক্ষিরূপে সমস্ত জীবে অবস্থান করিতেছেন। এই অস্তবস্ত দেহ প্রকৃতিমূলক ও নশ্বর, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই নিত্য।

এই জগৎ ও জন্ম এবং কর্ম্ম সমস্তই দৈবাধীন, দৈবপ্রভাবেই সমস্ত বস্তুর সংযোগ ও বিয়োগ হয়, এই জন্য শাস্ত্র বলেন — "ন চ দৈবাৎ পরং বলম্"—দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্।

কিন্তু সেই দৈব সর্ব্বনিয়ন্তা পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণের অধীন। তিনিই কেবল দৈব অপেক্ষা বলবান্, সেই জন্য সাধুগণ নিরন্তর সেই পরমাত্মা সর্ব্বেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন।

দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং জন্মকর্ম্মশুভাবহম্।
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ ন চ দৈবাৎ পরং বলম্॥
কৃষ্ণায়ত্তঞ্চ তদ্দৈবং স চ দৈবাৎ পরস্ততঃ।
ভজন্তি সততং সন্তঃ পরমাত্মানমীশ্বরম্॥
দৈবং বর্দ্ধয়িতুং শক্তঃ ক্ষয়ং কর্ত্তুং স্বলীলয়া।
ন দৈববদ্ধস্তদ্ভক্তশ্চাবিনাশী চ নির্গুণঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

সেই পরমাত্মা পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ দৈবকে বর্দ্ধিত করিতে পারেন এবং ক্ষয়ও করিতে পারেন। তাঁহার ভক্তজনকে দৈব কখনও বদ্ধ করিতে পারেন না, সেই জন্য তাঁহার ভক্তেরা অবিনাশী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

তিনিই সুখদ ও মোক্ষদ, জন্মমৃত্যুভয়নাশক, পরমানন্দপ্রদ, মোহজালচ্ছেদনকর্ত্তা ও সর্ব্বদাতা বলিয়া কথিত হন।

জগতের সমুদয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাধীন এবং তাঁহারই ইচ্ছায় জীবেরা কখন পরস্পর সংবদ্ধ এবং কখন বা পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। এই সংসার-সমুদ্রে প্রকৃত কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধ নাই, কেবল প্রাক্তন কর্ম্মস্রোতে সমস্ত ফেনবৎ একত্র পুঞ্জীভূত হয়।

যে জীব ভক্তিযোগে পরমা প্রকৃতিরূপা জগদ্বিধাত্রী বুদ্ধিদায়িনী মহামায়ার আরাধনা করেন, তাঁহার প্রতি সেই মহামায়া প্রসন্ন হইয়া সেই ভক্ত সাধককে সুদুর্লভা কৃষ্ণভক্তি প্রদান করেন। মহাপ্রলয়েও কৃষ্ণভক্ত সাধুগণের বৈকুণ্ঠ হইতে পতন হয় না।

"তয়োঃ পাতো নাস্তি তস্মান্মহতি প্রলয়ে সতি।"

তিনি কখনও প্রকৃতিরূপ আবার কখনও মায়া-প্রভাবে পুরুষরূপ ধারণ করেন, আবার তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেও অতীত পদার্থ।

তিনি স্বীয় মায়াবলে কখন স্ত্রী, কখন পুরুষ এবং কখন নপুংসক মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন।

তিনি সমস্ত লোকের সর্ব্বপ্রকার দুঃখের তারণ-কর্ত্তা। তিনি তেজোপদার্থ মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল এবং তিনিই সাবিত্রী ও গায়ত্রী দেবী। তিনি পণ্ডিতগণের মধ্যে বাগ্বাণী সরস্বতী এবং বর্ণমালার মধ্যে অ-কার। তিনিই তীর্থ সমুদয়ের মধ্যে স্বয়ং ত্রিপথগামিনী পতিতপাবনী গঙ্গা এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন।

তিনি জলের শৈত্য, ভূমির গন্ধ ও আকাশের শব্দ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সকলেই প্রকৃতি হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। দেবী আদ্যাপ্রকৃতি সকলের প্রসূতি, কেবল একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির অতীত পদার্থ।

"শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।"

সৃষ্টিকালে ঈশ্বরেচ্ছায় মূল আদ্যাপ্রকৃতি রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী, এই পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হন।

তন্মধ্যে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী রাধা নামে উল্লিখিত হন; বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বেদমাতা ও যোগমাতা, সাবিত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী, যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তিনি দুর্গা নামে অভিহিত হন; আর যিনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি সর্ব্বদা সকল শাস্ত্রে জ্ঞান প্রদান করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠদেশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহার নাম দেবী সরস্বতী। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরীর হইতে উক্ত পঞ্চবিধ প্রকৃতির উৎপত্তি হইয়াছে।

দেবী সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নির্গত হইয়াছেন, তাঁহার একাংশ সাবিত্রীরূপে ব্রহ্মার প্রিয়তমা পত্নী, যিনি বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং অপরাংশে স্বয়ং নারায়ণের পত্নী। ইঁহারাও মূল প্রকৃতি।

শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণতম, শ্রীমান্, নির্গুণ ও প্রকৃতি হইতে অতীত পদার্থ।

"নাস্তি কৃষ্ণাৎ পরঃ প্রভুঃ"। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠতর প্রভু আর কেহ নাই।

"নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রং ন হি কৃষ্ণাৎ পরঃ সুরঃ।" যেমন বেদ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর শাস্ত্র আর কিছুই নাই, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা পরাৎপর দেবতা আর কেহই নাই।

যে মূর্ত্তি বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং যাহা হইতে সর্ব্বশাস্ত্র প্রসূত হইয়াছে, পণ্ডিতগণ সেই মূর্ত্তিকে শুদ্ধরূপা সাবিত্রী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তিনিই ব্রহ্মার সরস্বতী ও বেদপ্রসবিনী সাবিত্রী, তিনি সকলের বীজস্বরূপিণী। তিনি পণ্ডিতগণের স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি ও জ্ঞানশক্তি। তিনি গৃহীদিগের গৃহলক্ষ্মী, রাজগণের রাজলক্ষ্মী, তপস্বিগণের তপস্যা, সংসারের সারস্বরূপিণী। তিনি সকলের আধারভূতা বসুন্ধরা এবং সরিদ্বরা গঙ্গা।

তিনিই ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তি, বিষ্ণুর পালনশক্তি এবং মহেশ্বরের সংহারশক্তি।

সেই ত্রিবিধ শক্তিরূপিণী গায়ত্রীকে নমস্কার।

তিনি বিষ্ণুলোকে কমলা, ব্রহ্মলোকে গায়ত্রী ও রুদ্রলোকে গৌরী। তিনি গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী; তিনি ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। তিনি হৃৎপদ্মস্থিতা প্রাণশক্তি এবং মূলাধারে কুণ্ডলীশক্তি।

কিমন্যদ্ বহুনোক্তেন যৎকিঞ্চিজ্জগতীত্রয়ে।
তৎ সর্ব্বং ত্বং মহাদেবি শ্রিয়ে সন্ধ্যে নমোঽস্তু তে॥

দেবীভাগবত।

অধিক আর বলিবার প্রয়োজন নাই, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বমণ্ডলে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই তিনি। অতএব শ্রীরূপিণী সন্ধ্যাদেবীকে নমস্কার।

রক্ষ রক্ষ জগন্মাতরপরাধং ক্ষমস্ব মে।
শিশূনামপরাধেন তাংশ্চ মাতা ন কুপ্যতি॥

হে জগন্মাতঃ! আমায় রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার অপরাধ ক্ষমা কর। যেমন শিশুরা সহস্র অপরাধ করিলেও মাতা তাহাদের প্রতি কুপিতা হন না, সেইরূপ তুমি আমার জন্মজন্মান্তরের অপরাধ ক্ষমা কর।
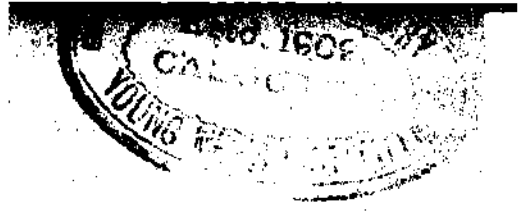
কঙ্কাল

শ্রীকালিদাস রায়

বৈশাখ মাস—তিথিটা বোধ হয় শুক্লা একাদশী কি দ্বাদশী হইবে। ভয়ানক গরম, ঘরে টেকা দায়, ঘুমও আসে না। বাহিরে বেশ হাওয়া, তাহা ছাড়া চারিদিকে জ্যোৎস্নার ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে। পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। বাড়ির নিকটেই 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র কুঠিয়ালদের গোরস্থান।

তখন প্রথম যৌবন, কলেজে পড়ি, ভয়-ডর কিছুই নাই—গোরস্তানেই ঢুকিয়া পড়িলাম। ভয় করিবার বিশেষ কোন কারণই নাই—এখানে উদ্যান-শ্রী সকল বীভৎসতা ও বিভীষিকাকে কি চমৎকার শোভা-সৌষ্ঠবেই ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এ ত হিন্দুর শ্মশান নয়—এটা পাশ্চাত্য জাতির সমাধি-ভূমি। পাশ্চাত্য জাতির বৃত্তি, প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক ধর্ম্ম বাঙ্গলা-দেশের এই দূর শহরতলীতেও সমান ক্রিয়াশীল। বিবেকানন্দের কথা মনে পড়িল—"ভারতবর্ষ ছেঁড়া ন্যাতা মুড়ে কোহ্-ই-নুর রাখে আর ইউরোপ মণিমুক্তার বাক্সর রাখে......" ইত্যাদি।

গোরস্তানের মাঝে মাঝে সুরকীদেওয়া রাঙা রাঙা পথ—পথের দুই ধারে রজনী-গন্ধার ঝাড়। রজনী-গন্ধার গন্ধে গোরস্তানের বাতাস মউ-মউ করিতেছে—চারি কোণে হেনা ফুটিয়াছে—তাহার গন্ধ পাড়া মাতাইয়াছে। ইহা ছাড়া চীনা-করবী, করবী, জবা, বেল, যুঁই ইত্যাদি নানাবিধ ফুলের গাছ—সব গাছই ফুলন্ত। কামিনী গাছগুলি বেশ কাটা-ছাঁটা, এক একটি বড় বড় ছাতার মত। নানা রঙের পাতায় ভরা পাতা-বাহারের গাছগুলি প্রাচীরের ধারে ধারে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। পাতাগুলি বাতাসে কাঁপিতেছে। সাদা-কালোর যেন কোলাকুলির মাতামাতি লাগিয়া গিয়াছে।

রাত্রি তখন বারোটা হইবে। একটি কবরের উপরকার মর্ম্মর-ফলকের উপর শুইয়া পড়িলাম। ভাবিতে লাগিলাম কোথায় শুইয়া আছি? নীচে একটি নরকঙ্কাল—উপরে আমি—মাঝখানে একখানি পাথর। অনায়াসে একটা নরকঙ্কালের পাশে একাকী গভীর রাত্রিতে শুইয়া আছি। চারিপাশেও ত নরকঙ্কাল—এযে প্রায় শবসাধকের মতই আমার চিত্তের অবস্থা এবং সাহসিকতা!

ভাবিতে ভাবিতে ঘুম আসিল। স্বপ্ন দেখিলাম—একটি নরকঙ্কাল আস্তে আস্তে আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া আমার কপালে অস্থিময় অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। আমি ভয়ে চমকিয়া উঠিলাম। 'কঙ্কাল কিন্তু কথা কহিয়া বলিল—

"মাভৈঃ—কিছু ভয় নাই, ভাই। বল দেখি আমি কোন্ জাতীয় মনুষ্যের কঙ্কাল?—বাঙ্গালী, কাফ্রী, চীনা, আরব, পাঠান, ইংরাজ—না ফরাসীর? তুমি বলিবে—আমি Anthropology-র Student নই, কি করিয়া বলিব? তোমার নিজের সাধারণ সহজ বুদ্ধিতেই কিছু বলিতে পার কি না দেখ না—তুমি ত সব জাতির মানুষই দেখিয়াছ? তুমি হয় ত বলিয়া বসিবে—ইংরেজের, কারণ তুমি 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র গোর-স্থানেই শুইয়া আছ। হাঁ। তাই বটে আমি খুব বড় একজন ধনী ইংরেজ সওদাগরেরই কঙ্কালই বটে। তবে দেখিয়া কি কিছু ঠাহর করিতে পারিতেছ? আমার কবরের উপরই তুমি শুইয়া আছ—আমি কবর হইতে বহু কষ্টে বাহির হইয়াছি।

"ভয় কি ভাই? যতদিন তোমার মত আমার দেহে মাংস, মেদ, মজ্জা, রক্ত ও চর্ম্মাদি ছিল ততদিনই আমাকে ভয়। এখন ত আমাকে ভয় নাই—তোমার মাংস-চর্ম্মের অন্তরালে যে কঙ্কালটি আছে—সেটিতে, আর আমার দেহটিতে কোন তফাৎ নাই। যত তফাৎ

ঐ মাংসপেশী ও চর্ম্মের জন্ত। সব হ'তে বেশি তফাৎ ঐ চামড়ার রঙটার জন্ত। একটা সাঁওতালের মেয়ের কঙ্কাল, তোমার কঙ্কাল আর আমি—সবারই এক রঙ, সব সাদা— যে রঙ হইতে সাত রঙের সৃষ্টি হইয়াছে —যে রঙ বিশ্লেষণ করিলে সাতটা রঙ পাওয়া যায়—সাতটা রঙ মিশাইলে যে রঙ হয়।

"তোমার কঙ্কাল আমার ভাল করিয়াই চেনে—সে আমার পরমাত্মীয়। আমরা এক ছাঁচেই জন্মিয়াছি। তোমার কঙ্কাল যে আমার কঙ্কালটির পাশে আসিয়া নিরুদ্বেগে নিদ্রাসুখ লাভ করিতে পারিয়াছে—তাহা চাঁদের আলোর জন্তও নয়, ফুলের গন্ধের জন্তও নয়। আত্মীয় আত্মীয়কে চিনিয়াছে—তোমার অজ্ঞাতসারে চিনিয়াছে, তাই দুই কঙ্কালের এই মৈত্রী-মিলন অনেকক্ষণ মাটির বাহিরে আছি, আর না — কে পাছে দেখিয়া ফেলে, আমি আবার কবরে ঢুকি। তুমি প্রত্যহ আসিও ভাই।"

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—দেখি শরীর হিম হইয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাড়ি চলিয়া গেলাম কঙ্কালবন্ধুর সস্নেহ আমন্ত্রণসত্বেও রাত্রিকালে আর গোরস্তানে কখনও প্রবেশ করি নাই। এত আশ্বাস, এত যুক্তি, এত মধুর আপ্যায়নেও আমি নিঃশঙ্ক হইতে পারিলাম না।

চিরতারুণ্য

শ্রীজগৎমোহন সেন, বি-এস্‌সি, বি-এড্

হৃদয় দেবতা, কহ মোরে কহ, —
এ হাসি ত মোর র'বে অহরহ
অধর-পুটে ?
দুঃখ ও সুখে সম গৌরবে
নিখিল চিত্ত ভরি সৌরভে
রহিবে ফুটে ?
বীণার এ' সুর, বুকের এ গান
রবে ত অটুট ? হবে নাত ম্লান
কালের ঘাতে ?
এমনি ত ফুল ফুটাবে হৃদয়
যবে বসন্ত মাগিবে বিদায়
ঝড়ের রাতে ?
মোর নিঝরের উছল এ ধারা
সাহারার বুকে হ'বে না ত' হারা
হবে না শেষ ?
মোর পেয়ালার ফেনিল সুরা এ
চিরদিন চোখে রাখিবে পুরায়ে
স্বপ্নাবেশ ?
আজি কৈশোরে রঙীন আশায়
জ্বালি' দীপক অরুণ ভাষায়,—
ইহার ভাতি

জরা মরণের নিশ্বাস বায়
নিভিবে না ? হ'বে আলোকিত তায়
তিমির রাতি ?
চাহি না সে হাসি, গাহি না সে গান
বেদনা যাহারে করে ম্রিয়মাণ ;
নিদাঘ-রবি
ঝরায় যে ফুল খর করপাতে
ঠাঁই নাই তার মোর আঙিনাতে
আমি যে কবি !
যৌবন জরা জীবন-মরণে
র'ব সমভাবে গন্ধে বরণে
কুজনে ভরি ;
লোল চর্ম্মের আবরণ-তলে
চিরতারুণ্যে রাখিব সবলে
বন্দী করি।
জীবন-দেবতা কহ কহ মোরে —
রহিবে ত বাঁধা চিরপ্রেমডোরে —
এমনি মোর ?
এমনি হৃদয় র'বে আলো করি —
আসিবে যেদিন কাল-শর্ব্বরী
তিমির ঘোর ?

সর্ব্বাণী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(১০)

বিকাল বেলা রোদের তাত কমিয়া গিয়াছে। ঝুর ঝুর করিয়া বেশ একটু খানি আরামপ্রদ হাওয়া উঠিয়া সারাদিনের কড়া গরমের পর ঘর্ম্মশ্রান্ত শরীরকে অনেকখানিই স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। সর্ব্বাণী তার বাপের শোবার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সাম্‌নেকার বারান্দাটায় তার একটা লোহার কাজকরা রেলিং দেওয়া খাটালের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া পড়িল। চোক দুইটা তার ঈষৎ যেন ঘুমে জড়ানো, মাথার এলোচুলের খোঁপাটা এলাইয়া পড়ে-পড়ে হইয়া কোন মতে আধখানা আটকাইয়া আছে, মুখখানায় তার অনেকখানি চিন্তার ছায়া মাখানো। আসল কথা, তার মুখ দেখিলেই অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তার জীবনের উপর দিয়া কি যেন একটা আকস্মিক ঝড়-ঝঞ্ঝা আসিয়া-পড়িয়া প্রবাহিত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সে যে আসিয়াছিল তার একটা সুস্পষ্ট প্রকট চিহ্নও রাখিয়া যাইতে ভুলে নাই। সর্ব্বাণীর চোকের কোলে কালির রেখা, তার মুখ শুষ্ক, তার গলার হাড় দেখা যাইতেছে, তার হাতের চুড়ি, বালা ঢল্ হইয়া গিয়াছে। তার নিদ্রালস ক্লান্ত চাহনীই নিজের হইয়া যেন কথা কহিয়া বলিয়া দিতেছিল, অনেক রাতই তাকে জাগিতে হইয়াছে, এখনও হয় ত তার সেই সজাগ সতর্কতার প্রয়োজন বোধের সমাপ্তি ঘটেও নাই, এখনও হয় ত নিত্যই তাহা চলিতেছে।

সে রেলিং-এর উপরকার কাঠটার উপর কনুই রাখিয়া হেঁট হইয়া নীচের দিকে চাইতেই দেখিতে পাইল, সেখানে বাগানের একধারে দু'ঝাড় রজনীগন্ধা ফুটিয়া উঠিয়া ঋতু পরিবর্ত্তনের সংবাদটা যেন তাকে জানাইয়া দিবার জন্যই মুখ তুলিয়া রহিয়াছে। দু'সারি লালদোপাটি ফুটিয়া থাকিয়া যেন জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতেছিল। একধারে ঝাঁকড়া বুড়ো গাছটায় একগাছ ছাতিমফুল অস্তগামী সূর্য্যের আলোয় যেন মৃদু বাতাসের তালে তালে রং ছড়াইতেছিল। সর্ব্বাণী যেন ঈষৎ বিস্ময়ভরেই এদের দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ চোক মেলিয়া চাহিয়া রহিল। সে যেন অনেক কাল ধরিয়াই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন বা তাদের বেশবাসের দিকে লক্ষ্য মাত্র করিতেও অবসর পায় নাই। বাস্তবিকই তার পক্ষে এই মাসাধিককাল অত্যন্তই দুঃসময় গিয়াছে। সুরঞ্জন এবারকার এই ধাক্কাটা যে কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন, সে আশা মাত্র তার মনের মধ্যে ছিল না। কি ভয়ানকই যে সে-সব দিন-রাত্রি—কি দুঃস্বপ্নাচ্ছন্ন ভয়াবহ তার স্মৃতি! উঃ, এখনও মনে আসিলে সমস্ত শরীর যেন ভয়ে শিহরিয়া কণ্টকিত হইয়া যায়!

কিন্তু সে জয়ী হইয়াছে। স্বয়ং মৃত্যুপতি শমনের সমন জারির বিরুদ্ধে যে অভিযান সে করিয়াছিল, তাহাতে হার মানিতে সে বাধ্য হয় নাই—জয় লাভ করিয়াছে। এতবড় আনন্দও যে তার অদৃষ্টে ঘটিবে এ কি সে সেদিনে ধারণাও করিতে পারিয়াছিল?

ফেরে যাওয়ার জন্ত ডাক্তাররা যখন ব্যবস্থা দিলেন, আর স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে দারুণ মতভেদ চলিতে লাগিল, ঠিক সেই সময়েই আহ্বান-পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল সর্ব্বাণীর পিসিমা গোলাপ সুন্দরী দেবীর নিকট হইতে। ইনি সুরঞ্জনের একমাত্র সহোদরা, বয়সে বছর কয়েকের ছোট, কচি বেলায় দেখিতে খুব সুন্দর ছিলেন বলিয়া মাতামহী নাম রাখিয়াছিলেন, গোলাপ। এখনও দেখিতে তিনি এবয়সেও কিছু কম সুন্দরী নন, সুরঞ্জনের সঙ্গে মুখের সাদৃশ্য আসে। গায়ের রংএতেও দুই ভাই-বোনের একই রকমের জৌলুস দেখা যায়।

সর্ব্বাণীকে ত সবাই সুন্দরী বলিয়া উল্লেখ করে, সে নিজেও তা' যে না জানে তাও নয়; কিন্তু পিসিমার এই প্রৌঢ় মূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্বাণী বিস্ময়ে নীরব হইয়া গেল। হ্যাঁ, তার বাপের উপযুক্ত বোন বটে!

অনেক কাল ব্যবধানের পর ভাই-বোনে দেখা হইল। সুরঞ্জনের ভগ্নিপতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া কাশ্মীর প্রবাসে দিন যাপন করিয়া এত কাল পরে সেখান হইতে পেন্সন পাইয়াছেন। হিমালয়ের মাথার উপর জীবন কাটাইয়া বাংলা দেশে ফিরিতে আর ভরসা নাই। তাই এদিকেই একটা স্থান খুঁজিতে ছিলেন, দৈবাৎ সুযোগ ঘটিয়া গেল দেরাদুনে আসিবার। গোলাপসুন্দরীর একমাত্র মাতৃহীন সপত্নী-পুত্র সুকুমার এখানকার 'ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে' একটা চাকরী পাইয়া গেল। জায়গাটা ভালই, স্বাস্থ্যকর, সৌন্দর্য্যপূর্ণ, খুব কাছেই হিমাচল শৃঙ্গে বিখ্যাত মুসৌরি সহর—গ্রীষ্মকালে গিয়া উঠিলেই হইল। উমাপদ সপরিবারে এইখানেই এক বাড়ী কিনিয়া রহিয়া গেলেন। এমনি সময়ে, এর বছর খানেকের মধ্যেই সুরঞ্জনের কঠিন রোগমুক্তির সংবাদ পাইয়া স্বামী-স্ত্রীতে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁকে সকন্যা এখানে চলিয়া আসিতে পত্র দিলেন, এবং পত্র দ্বারাই তাদের পক্ষের সমুদয় আপত্তি খণ্ডন করিতে লাগিলেন। চিরদিন বহু দূরে থাকিলেও ভাই-বোনে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান চিরদিনই রহিয়া গিয়াছিল। তাই কোঁটা এবং পূজার তত্ত্বে কোন দিনই কোন পক্ষের ভুল হইতে পারে নাই, তাই দেখা-শোনা না থাকিলেও স্নেহ-শ্রদ্ধার অভাবটা ছিল না।

সর্ব্বাণীর মনে তার এই প্রায়-অপরিচিতা পিসিমার সম্বন্ধে কৌতূহলের সীমা ছিল না। শৈশবের স্মৃতি সে ভুলিয়া আসিয়াছে, তার অভিনব বিবাহের সময়ে তাড়াতাড়ির জন্ত বিশেষতঃ বর্ষার বাধায় তার একমাত্র নিজের পিসিমাই আসিতে সমর্থ হন নাই। তখন দুঃখিত হইলেও এখন তার মনে হইল, ভাগ্যে তিনি আসেন নাই।

তাই এ সময়ে তাদের কথা স্মরণ করিয়াছেন; নতুবা হয় ত সে সময়ে উপস্থিত অন্যান্ত আত্মীয়দের মত এঁরাও তাদের পরিত্যাগ করিতেন!

দেরাদুন এক্সপ্রেস তাদের যথাস্থানে পৌঁছিয়া দিলে, ষ্টেশনে নামিয়াই তারা নিমন্ত্রকদলের সাক্ষাৎ লাভ করিল। শ্বেত-শ্মশ্রুধারী প্রসন্নমূর্ত্তি উমাপদ, পুরাদস্তুর সাহেবী সাজে সজ্জিত সুকুমার, এ ভিন্ন সর্ব্বাণী দেখিল আর একটী তারই সমবয়সী মেয়ে বেশ হাসি হাসি মুখ, চোখ দু'টী খুসীর প্রাবল্যে জল্ জল্ করিতেছে, তাদের আগ্ বাড়াইয়া লইতে আসিয়াছে। সে তার বাবার কাছে প্রশ্ন করিয়া করিয়া জানিয়া লইয়াছিল, তার পিসিমার ঐ একই ছেলে এবং এ ছাড়া একটী মাত্র মেয়ের কথাই তাঁর জানা আছে, আর কোন ছেলে-মেয়ে থাকিলেও তিনি সে কথা জানেন না। ছেলের নামটা তার নানা উপলক্ষ্যের উল্লেখে তাঁর মনে আছে, সে 'সুকুমার', কিন্তু মেয়ের নাম ত কই চিঠি-পত্রের মধ্যে উল্লিখিত হয় নাই, তাই তার আসল নামটাও তাঁর মনে পড়ে না। যখন ঐ মেয়েটীকে কচি অবস্থায় লইয়া উঁরা কাশ্মীর যান, তখন উহাকে সকলে খুকি বলিয়াই ডাকিত। সর্ব্বাণী ও খুকি দু'জনে প্রায় সমবয়সী, খুকি সর্ব্বাণীর চাইতে মাস দশেকের ছোট।

পরস্পর অভিবাদনাদি সমাপ্ত হইয়া গেলে খুকি আসিয়া সর্ব্বাণীর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। তার গায়ে একটা গরমের জাম্পার, গলায় মাফ্‌লার জড়ানো,

সর্ব্বাণীর গায়ে শুধু একটা হাল্কা রংয়ের ছোট্ট শাল, শেষ আশ্বিনের উত্তুরে হাওয়ার আমেজে তার একটু শীত-শীত করিতেছিল, খুকি তার হাত ধরিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—

"তোমার হাত যে হিম হয়ে গেছে, সবুদি! শীগ্‌গির তুমি আমার এই কোটটা প'রে এর পকেটে হাত ঢোকাও।"

সর্ব্বাণী বাধা দিবার আগেই চট্ করিয়া সে তার নিজের গায়ের কোটটা খুলিয়া ফেলিল এবং সর্ব্বাণীর বিস্তর অনুযোগ ও আপত্তির মধ্য দিয়াই সেটা তার গায়ে জড়াইয়া দিয়া তার হাত ধরিয়া তাকে এক প্রকার টানিয়া লইয়া চলিল। মুখে শুধু ধমক দিয়া বলিতে লাগিল,—

"হ্যাঁ, ওই মূর্ত্তি ক'রে বাড়ী গেলে মায়ের কাছে শুধু মার খেতেই বাকি থাকতো না। জানো ত. কাশ্মীরে বাস ক'রে ক'রে মা কাশ্মীরী হয়ে গ্যাছে। তাদের বুকে আগুনের মালসা ঝোলে, আর আমরা দুটো গরম কাপড়ও পরবো না?"

মুখে আপত্তি যা'ই না কেন জানাক্, এই চির-অপরিচিতা বোনটীর স্নেহের উপদ্রব সর্ব্বাণীর নিরাশ্রীর জীবনে অত্যন্তই মধুর হইয়া ঠেকিল। এমন করিয়া কে কবে তাকে যত্ন দেখাইয়াছে? তার দু'চোখে যেন হঠাৎ জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি সে তখন চোক নত করিয়া ও মাথা নীচু করিয়া পায়ের দিকের সাড়ীটা ঠিক করিয়া দিতে লাগিল, তারপর যখন মুখ তুলিল তখন তার চেষ্টা সফল হইয়াছে, চোখের জল চোখের মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছে, ফুটিয়া উঠিয়াছে অধর প্রান্তে ঈষৎ একটুখানি সকরুণ হাসি।

বাড়ী আসিয়া পিসিমাকে দেখিয়া সর্ব্বাণীর প্রবল ঔৎসুক্য প্রশমিত হইল। পিসিমাও সবুমা'কে কাছে টানিয়া লইয়া পরম স্নেহভরে তার গায়-মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সতৃষ্ণ-চোখে চাহিয়া-চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"ওমা, কত বড়টাই হয়েছিস্ রে! আমি তো সেই চার না পাঁচ বছরেরটী দেখে এসেছিলাম। ডালি আর তুই দু'জনেই ত সমান বয়সী, ও বুঝি ক'মাসের ছোট। আচ্ছা কার মতন মুখ হয়েচে? কই দাদার মতন ত নয়!" সহসা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল, ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে যেন কতকটা আত্মগতভাবেই কহিলেন,— "সেই পোড়া কপালীর মুখের সঙ্গে খুব বেশী সাদৃশ্য আসে!"

আরও একটী দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া তিনি অন্য দিকে মুখটা ফিরাইয়া লইলেন, তাঁর চোখ দু'টী ছল ছল করিতে লাগিল।

সর্ব্বাণী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া পিসিমার দিকে চাহিয়া থাকিল, কিন্তু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন সুরঞ্জন। তাঁকে সামনের হলের একটা কুসনওয়ালা কোচে বসানো হইয়াছিল, পথের কষ্ট লাঘবের জন্য আয়োজন ও চেষ্টা যথেষ্ট হওয়া সত্বেও দৌর্ব্বল্যজনিত যতটুকু হইয়াছিল তাহাতেই তিনি কিছু ক্লান্ত হইয়াছিলেন, হঠাৎ সহজভাবে উঠিয়া বসিয়া ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিলেন,—

"গোলাপ! শুনে যাও।"

বোন কাছে আসিলে নিজের পাশে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া কহিলেন, "বসো।"

তারপর ভাইবোনে কি সব আলোচনা হইল বলিতে পারি না, বোন যখন কার্য্যব্যপদেশে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন, সাড়ীর আঁচল তুলিয়া চোখ দু'টী মুছিতে মুছিতেই গেলেন দেখা গেল। ইতি মধ্যে ডালি আসিয়া সর্ব্বাণীকে দখল করিয়াছিল। সুরঞ্জনের পুরাতন ভৃত্যের হস্তে তাঁর তদানীন্তন প্রয়োজনীয় সেবার ভার দিয়া সর্ব্বাণী ডালির সঙ্গে তার মহলে চলিয়া গেল। সেখানে তাদের দুজনকার ব্যবস্থা একসঙ্গেই হইয়াছিল।

স্নান সারিয়া গাঢ় নীল রংয়ের মারহাট্টী সাড়ী এবং হল্‌দে রেশমের হাতকাটা ব্লাউজ পরিয়া ভিজা চুল পিঠে ছড়াইয়া সে যখন ফিরিয়া আসিল, চায়ের

টেবিলে সুকুমার ও ডালি তার জন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। সুকুমার তার দিকে চাহিয়া যেন বিস্ময়মুগ্ধ হইয়া গেল, এই সদ্যোস্নাতা নীলাম্বরী তরুণীকে তার যেন জগতের একটা নূতন বিস্ময়ের মতই অভিনব মনে হইল। ডালিও বার বার তার দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর মানসিক আনন্দ গোপন করিতে না পারিয়া সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াই বলিয়া ফেলিল,—"তোমাকে কি সুন্দর দেখতে সবুদি! যেন একখানি আঁকা ছবি!"

সর্ব্বাণী সলজ্জে তার গাল টিপিয়া দিয়া, বলিল—"ফাজলামী রেখে দাও ত! আমার পিসিমার কাছে আমি দাঁড়াতে পারি?"

ডালি কহিল,—"মায়ের কথা ছেড়ে দাও। মায়ের 'টাইপ' অন্ত, কিন্তু তোমার চেহারায় একটা কবিত্ব মাখানো আছে। কতকটা যেন গ্রীসিয়ান আর্টের মতন, ভেনাসের সঙ্গে খানিকটা যেন মেলে,—"

সর্ব্বাণী সুকুমারের সাক্ষাতে নিজের রূপের বর্ণনায় বিব্রত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়া সবেগে বাধা দিল,—

"আচ্ছা ডালি! রূপ বর্ণনা শুনেই কি আমার পেট ভরবে? কাল কখন সেই কি খেয়েছি তার ঠিক নেই, খিদেও কি আমার পায় না?"

ডালি অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি এক প্লেট খাবার তার দিকে সরাইয়া দিয়া চা-দানির মধ্যে চামচ চালাইয়া দিয়া কহিল,—

"এই যে ভাই, ততক্ষণ আরম্ভ করো, চা-টা ছেঁকেই দিচ্ছি। সত্যি, বেলা হয়ে গেছে, খিদে ত পাবেই; কিন্তু সবিদি! আমার আজ আর খিদে-তেষ্টা নেই।"

সুকুমার তার মুখে-ভরা রুটীর টুকরাটাকে আয়ত্ব করিয়া লইয়া বোনের দিকে ফিরিয়া মুখ ভেঙ্গাইল,—

"তাই তোরে ভল্‌কামারা! তুই যে দেখতে দেখতে একজন কবি হয়ে উঠ্‌লি। সর্ব্বাণি! তুমি হয় ত জানো না, আমাদের ভল্‌কামারা একবার কবিতা প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছিল, তারপর কবিতা লিখতে ব'সে কিছুতেই যখন মিল খুঁজে পায় না, তখন একেবারে মেঝে হাত পা ছুঁড়ে ভঁ্যা করে কেঁদে ফেল্লে—"

ডালি চা-এর পেয়ালাগুলা প্রত্যেককে ঠেলিয়া দিয়া তীব্র প্রতিবাদে চেঁচাইয়া উঠিল,—"দেখ দাদা! মিথ্যে কথা বলো না, ভাল হবে না বল্‌ছি। আমি ভঁ্যা করে কেঁদে ফেলেছিলুম? না, তুমিই মিথ্যে করে ঐ কথা রটিয়েছিলে? বাবাঃ, এমন উত্তন খুত্তন তুমি আমায় সেই থেকে ক'রে এসেছ; আজও তার শেষ হয় নি।"

সুকুমার পুনশ্চ তার দিকে চাহিয়া মুখ ভেঙ্গাইল,—"শেষ কি আছে, যে হবে? দার্শনিকরা বলেচেন, জগৎটা যেমন অনাদি তেমনি অনন্ত। মানুষের আত্মার বিনাশ নেই, দেহ মরলেও সূক্ষ্ম শরীর খুঁজে খোলে, শেষ অমনি হলেই হলো কি না! যদ্দিন না মরচি, তোমার সেই কবিতা লেখা আমি তা' বলে ভুলচি নে।" উঃ সে কি মজারই কবিতা! শুনবে সর্ব্বাণি! আমার মুখস্থ আছে। কলেজের পড়ায় কত শক্ত-শক্ত নোট মুখস্ত ক'রতে হয়েচে, আর অমন চমৎকার কবিতাটী ভুলে যাব? আচ্ছা বলি শোন—"

ডালি চা-এর পেয়ালা দুম্ করিয়া নামাইয়া লাফাইয়া উঠিল,—"দাদা! তোমার পায়ে পড়ি—"

সুকুমার গম্ভীর থাকিয়াই জবাব দিল,—"পড়বি? তা' বেশ ত পড়্ না। আমার পায়ে পড়লে ত আর তোর জাত যাবে না। শোন সর্ব্বাণি! কবিতা শোন, কবিতার নাম হচ্ছে—"আহা কি সুন্দর!"

কি সুন্দর আহা মরি চাঁদের আলো,
আমার বড় প্রাণে লেগেছে ভালো,
চকোর হলে চাঁদের কাছে যেতাম,
সারা রাত ধরে তার সুধা খেতাম,
কিন্তু মানুষ হয়েছি তাই রয়েছি বাড়ীতে,
যেহেতু মানুষ কভু পারে না উড়িতে।

সুকুমার আবৃত্তি থামাইয়া সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিল,—"কিরে ভল্‌কামারা! আর বলবো? নাঃ, আর বলবো না। ভল্‌কা এবার কেঁদে ফেল্‌বে, তার যোগাড় হ'চ্ছে। কিন্তু সর্ব্বাণি! কবিতাটি কেমন শুন্‌লে তা' বলো? মন্দ?"

সর্ব্বাণীর এ ছেলে-মানুষী কবিতা যেমনই লাগুক, এদের ভাই-বোনের এই মধুর সম্পর্কটী তার একান্তই সুমিষ্ট লাগিয়াছিল। সে হাসিমুখে সুকুমারের প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিল,—"খুব মন্দ কি? আমার তো নেহাৎ খারাপ লাগলো না।"

সুকুমার করুণভাবে ইহার দিকে চাহিল। মুখখানা গম্ভীর করিয়া প্রশ্ন করিল,—"তোমাদের কোর্সে কি কি সাব্‌জেক্ট ছিল? সংস্কৃত ছিল না?"

সর্ব্বাণী কহিল,—"মেঘদূত ছিল।"

সুকুমার মৃদু হাসিয়া কহিল,—"তাই বল, ডল্‌কা-মারাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলে! আমি বলি কাব্য-সম্বন্ধে মাথাটা বুঝি নিরেট করে রেখেছ!"

ডালি রাগ করিয়া গুম্ হইয়া রহিল, তার চা ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে দেখিয়া সুকুমার খপ্ করিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া এক চুমুকে পার করিয়া দিয়া তার দিকে দুই হাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

রাগ ভুলিয়া ডালি চিৎকার করিয়া উঠিল,—

"ও এঁটো, খেও না খেও না, —" কিন্তু ততক্ষণে সুকুমার চায়ের কাপ্ খালি করিয়া ফেলিয়াছে। মুখ খিঁচাইয়া জবাব দিল,—"ইকনমির জ্ঞান নেই? অপচয় হচ্ছিল দেখে সদ্‌গতি করে দিলাম। জঠরাগ্নিতে পড়ে সব শুদ্ধ হ'য়ে যাবে, ভয় কি!"

সর্ব্বাণী এদের দু'জনকার দিকে চাহিয়াই একটা মৃদু নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল,—হায়, সে তো কখনই এ সব সুখের আস্বাদ জানে না! কত দিক্ দিয়াই যে তার এই বিড়ম্বনাময় বিপাকগ্রস্ত জীবন বঞ্চিত হইয়াছে।

সামনের হলঘর হইতে কে একজন হাঁক পাড়িল,—"কিহে গেঙ্গু!—"

ডালি ত্রস্তে সহজ হইয়া বসিয়া পড়িল, সুকুমারও স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়া বোনকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আস্‌তে বলি?"

ডালির গাল লাল হইয়া উঠিল, চোখের পাতা নত হইয়া আসিল, কিন্তু সে ত্বরিতে সর্ব্বাণীর দিকে চাহিয়া লইয়া উত্তর দিল,—"সবুদি'র যদি না আপত্তি থাকে।"

পুনশ্চ আহ্বান আসিল,—"কিহে ফিরবো নাকি গঙ্গরাজ?"

সুকুমার তখন সর্ব্বাণীর দিকে চাহিয়া তার অনুমতি চাওয়ার ভাবেই কহিয়া গেল,—"আমার একটী বন্ধু মিষ্টার জি, পি, ব্যানার্জ্জী, আই-এক্-এস্, ভদ্রলোক, সর্ব্বদাই আসা-যাওয়া করেন,—"

সর্ব্বাণী নিজের আঁচলখানা টানিয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক সুকুমারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে আমারও নেই।"

চাকর আসিয়া উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলা পরিষ্কার করিতে-ছিল, তার কাজ শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই সুকুমারের আহ্বানে তার বন্ধু আসিয়া পর্দ্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিলেন।

হাফ্ প্যাণ্ট পরা, কামিজের আস্তিন গুটানো, চোকে "টর্‌টয়েজ সেল" চশমা, হাতে সোলা হ্যাট্ যেমন সব সাধারণ বিলাত-ফেরতা কমবয়সী ছেলেরা হয়। চেহারাটী বেশ লম্বা-চওড়া, চোকের চাহনী ও হাব-ভাব ভালই। ঘরে ঢুকিয়া সে সর্ব্বাণীকে দেখিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিত হইল, তারপর তার মুখের দিকে চাহিতেই যেন বিস্ময়মিশ্র প্রশংসায় তার চোখের দৃষ্টি স্তম্ভিত হইয়া গেল। সল্প মাত্র পরেই অভব্যতা হইতেছে বুঝিয়া সে তথা হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিলেও মনের মধ্যে তার একটা বিস্ময়াশ্চর্য্যের ঢেউ লাগিয়াই রহিল। এ বিস্ময়ের অর্থ—কে এ অপূর্ব্ব-দর্শনা তরুণী?

ইতিমধ্যে সুকুমার উঠিয়া তার জন্য একখানা চৌকি আগাইয়া দিয়াছে, বাড়ীর ছোকরা চাকর ধনিয়া এক কেটলী গরম জল লইয়া আসিয়াছে, ডালি নবাগতের জন্য চা তৈরী করিতে নতমুখে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং সর্ব্বাণী আগন্তুকের অভিবাদনের প্রত্যভিবাদন করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে।

সুকুমার বলিতে লাগিল,—"ব্যানার্জ্জী। এসো এর সঙ্গে তোমায় 'ইনট্রোডিউস' করিয়ে দিই; ইনি হ'চ্ছেন আমার মামাতো বোন শ্রীমতী সর্ব্বাণী দেবী। সর্ব্বাণি! ইনি আমার বন্ধু মিষ্টার জি, পি, ব্যানার্জ্জী।"

(ক্রমশঃ)
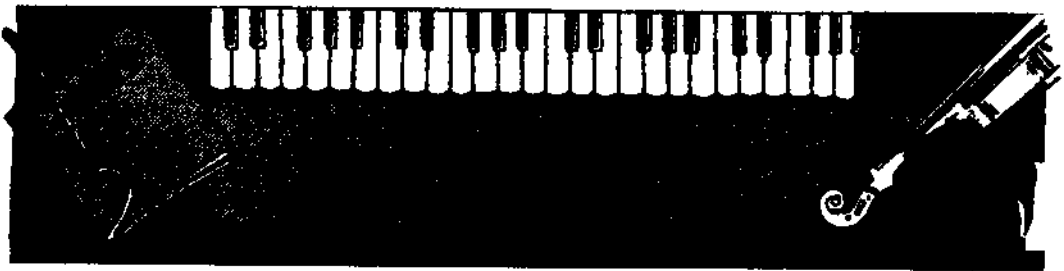
বেহাগ—তেতালা

জগবন্দন তুঁহি শ্যাম মোহন
নাম মধুর সব ধ্যান ধরো।
মুরলী কী ধুনমে মোহে লিয়ো সব
চন্দ্র মলিন হোত মুখ দেখ সব
সব মিল উনহী কো ধ্যান ধরো॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি — শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

২´ ৩ ০ ১
না ধা | র্সনাঃ ধঃ পা হ্মা | গা পমা গা -া | গা মা পা মা | রগাঃ রঃ সা ন্‌া |
জ গ | ব০ ০ ন্দ ন | তুঁ ০০ হি ০ | শ্যা ০ ০ ম | মো ০ হ ন |

২´ ৩ ০ ১
সন্‌া সা মগা মা | পা পা নধা না | র্সা নধা পা হ্মা | পা -া II
না ০ ম ম | ধু র স০ ব | ধ্যা ০০ ন ধ | রো ০ II

২´ ৩ ০ ১ ২´
পগা মা পা না | না -া না না | র্সা -া র্সা র্সা | র্রর্সা র্সা র্সা র্সা | পা র্সা র্সা র্সা |
মু র লী কী | ধু ০ ন মে | মো ০ হে লি | য়ো০ ০ স ব | চ ০ ন্দ্র ম |

৩ ০ ১ ২´
র্সা র্সা র্সর্রা র্সা | না নধা পহ্মা পা | না ধা র্রর্সা না | র্সা র্সা নধা পা |
লি ন হো০ ত | মু ০০ খ০ দে | ০ খ য০ ব | স ব মি০ ল |

৩ ০ ১
পা হ্মা গপমা গরা | সন্‌া সা মগা মা | পা -া II
উ ন হী০০ কো০ | ধ্যা০ ০ ন০ ধ | রো ০ II

তান—

০ । । । ১
১। ন্সা গমা পনা র্সনা | ধপা হ্মপা |
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ |

০ । । । ১
২। র্গর্রা র্সনা ধপা হ্মপা ¦ গহ্মা পনা ¦
আ০ ০০ ০০ ০০ ¦ ০০ ০০

২´ ৩ ০ ১
৩। ন্সা গমা পা হ্মা ¦ গা মা গা -া | সা মগা পহ্মা ধা ¦ মা গা রগা সা |
আ০ ০০ ০ ০ ¦ ০ ০ ০ ০ | ০ ০০ ০০ ০ ¦ ০ ০ ০০ ০ |

২´ ৩ ০ ১
গমা পা না -া ¦ র্সা র্গা র্রর্সা র্সা ¦ না -া ধা পা | গমা পা ||
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০০ ০ ||

২´ ৩ ০
৪। গমা পগা মপা মগা ¦ সগা মপা মগা রসা ¦ গমা পনা র্সর্গা র্রর্সা |
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ |

১
নধা পপা ||
০০ ০০

বিচিত্রা

শ্রীকনক রায়

কবরের পরেও

এন্টন নেব্‌স্‌ (Anton Knabes) ছিলেন অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্ঞী মেরিয়া থেরেসার অত্যন্ত পেয়ারের পুরোহিত। প্রায় দেড়শ' বছর আগে এই নেব্‌স্‌কে আম হোফ-এর গির্জ্জায় সমাহিত করা হ'য়েছিল। সমাহিত করার তিন মাস পরে মৃত দেহটি তুলে' দেখা গেল তা একেবারে অবিকৃত অবস্থায় আছে—দেহের কোন অংশ পচে নি বা নষ্ট হয় নি। তখনকার মতো দেহটিকে ফের সমাহিত করা হ'লো। তিন মাস পরে ডাক্তাররা আবার দেহটি তুলে' নিলেন। দেহের অবস্থা তখনো তেমনি অবিকৃত। এবার ডাক্তাররা কেটে দিলেন নেব্‌সের মৃতদেহের কয়েকটা শিরা। কাটার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এলো রক্তের ধারা।

অদ্ভুত ব্যাপার! ডাক্তাররা এবং বৈজ্ঞানিকরা ব্যাপার দেখে বিস্মিত হ'য়ে গেলেন। দেহকে কি ক'রে যে এই ভাবে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তাই নিয়ে চল্‌ল তাঁদের দীর্ঘ দিন ধ'রে গবেষণা। সে দিনও দুনিয়ার সব সেরা বৈজ্ঞানিকেরা এবং ডাক্তাররা আম হোফ-এর এই বিখ্যাত গির্জ্জাটিতে সম্মিলিত হ'য়েছিলেন। পাদ্রীর মৃতদেহটি নিয়ে আবার তাঁদের একদফা নাড়া-চাড়া হ'য়ে গেছে। তাঁরা এ রহস্যের মর্ম্ম ভেদ করতে সক্ষম হ'য়েছেন কি না বহির্জগত এখনও সে খবর জান্‌তে পারে নি।

কিন্তু এ সব অসাধারণ ঘটনার কথা ছেড়ে দিলেও — কবরের ভিতর থেকে মৃতদেহ টেনে তোলার রেওয়াজ ইউরোপে এবং আমেরিকায় দিনের পর দিনই বেড়ে চ'লেছে। এ সব ব্যবস্থা সাধারণতঃ গৃহীত হয় সেই সব ক্ষেত্রেই, মৃত্যু যে সব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয় না। কানা-ঘুষায় পুলিশ হয়তো জান্‌তে পার্‌লে — কোনো লোককে বিষ খাইয়ে হত্যা করা হ'য়েছে। তখন তারা অনুসন্ধান করতে সুরু করে। সন্দেহের পরিপোষক জোরালো কোনো প্রমাণ পেলেই কবর খুঁড়ে' মৃতদেহটা তুলে' নিয়ে তারা পাঠিয়ে দেয় সরকারী ডাক্তারদের কাছে পরীক্ষার জন্যে।

প্রথমে তাঁরা বাইরে থেকেই ধরতে চেষ্টা করেন, শরীরে বিষ প্রবেশ করলে যে সব চিহ্ন দেখা দেয় সেই সব চিহ্ন কোথাও প্রকাশ পেয়েছে কি না। মৃতদেহের নখ, চুল প্রভৃতি এ জন্য বেশ ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়। সেঁকো বিষ (arsenic) দিয়ে হত্যা করা হ'য়ে থাক্‌লে পাঁচদিন হ'তে সাত দিনের ভিতরে নখের চেহারা দেখে তা ধরা পড়্‌বার সম্ভাবনা থাকে। তারপর অঙ্গের বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে বিশ্লেষণ সুরু হয় এবং সত্যিকারের বিষ প্রয়োগ হ'য়ে থাক্‌লে তা ধরা পড়্‌তেও দেরী হয় না।

রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা একবার বিষ প্রয়োগ সম্বন্ধে যদি নিশ্চিত হওয়া যায়, তখন গবর্ণমেন্টের

গোয়েন্দা বিভাগ সচেতন হ'য়ে ওঠেন। নানা ভাবে হত্যাকারীর সন্ধান লাভের চেষ্টা চল্‌তে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, তাঁদের চেষ্টা নিষ্ফল হয় না। বিলেতে এমনি ভাবে অনেকগুলি হত্যার আস্কারা করা হ'য়েছে কবরের ভিতর থেকে মৃতদেহ তুলে' নিয়ে।

চ্যাপম্যান নামে পরিচিত একটি লোক লণ্ডনে মদের কারবার করত। ভারি ধূর্ত্ত — প্রকাণ্ড গোঁফ — হাতে অনেকগুলো হীরের আংটির চোখ-ঝল্‌সানো দীপ্তি। লোকটা তার তিন তিনটি স্ত্রীকে 'এন্টিমনি'র সাহায্যে হত্যা করে। ডাক্তাররা কবর দেওয়ার সময় প্রত্যেকবারেই সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন— Case of a heart-failure, অর্থাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে মৃত্যু। লোকটা গর্ব্ব ক'রে বল্‌ত — মরা মানুষ তার ইতিহাস বল্‌তে পারে না। এই চ্যাপ-ম্যানের উপরে পুলিশের সন্দেহ পড়্‌ল। তারা কবর থেকে তার তিনটি স্ত্রীর মৃতদেহই তুলে' নিয়ে পাঠিয়ে দিলে সরকারী পরীক্ষাগারে — পরীক্ষা কর্‌বার জন্যে। পরীক্ষায় পাওয়া গেল প্রত্যেকের দেহেই এন্টিমনির অস্তিত্ব। মৃত দেহও যে তার কাহিনী বলে, এর পর তার এমন প্রমাণই সে পেলে, যা' কিছুদিন আগে পেলে অত বড় পাপ এবং দুঃসাহসিকতার কাজ কর্‌তে সে হয়তো সাহসই পেতো না।

বস্তুতঃ ইউরোপে এই মৃতদেহ কবর হ'তে তুলে' নিয়ে পরীক্ষা কর্‌বার ব্যবস্থা বহু হত্যাকারীকে সন্ত্রস্ত ও সচকিত ক'রে তুলেছে। কিন্তু তাই ব'লে ইচ্ছে কর্‌লেই যে কেউ যখন তখন যে কবরখানার শান্তি ভঙ্গ কর্‌তে পারে তা নয়। পুলিশ যদি সন্দেহ না করে তবে সাধারণ লোকের পক্ষে, সন্দেহ কর্‌লেও আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ তুলিয়ে বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। ইংলণ্ডে এ নিয়ে বেশ একটু ভালো রকমেরই কড়াকড়ি আছে। কেউ যদি তা কর্‌তে চায়, তবে তাকে প্রথমে পার্লা-মেন্টের স্থানীয় সদস্যের কাছে আবেদন কর্‌তে হয়, তারপর সেই সদস্য যেয়ে যদি স্বরাষ্ট্র-সচিবের (Home Secretary) অনুমোদন যোগাড় ক'রে আন্‌তে পারেন,
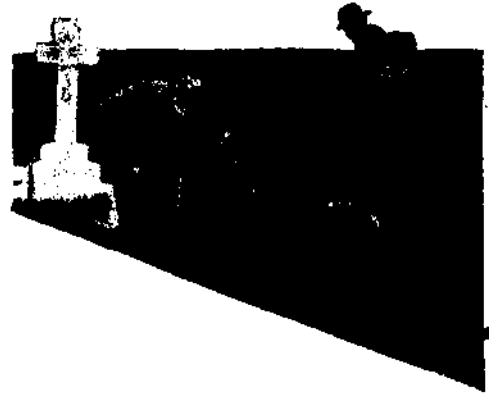
কবর খুঁড়ে' মৃতদেহ তোলা হ'চ্ছে

তবেই কবর খুঁড়ে' 'কফিন' তুলে' আন্‌বার অনুমতি পাওয়া যায়। তা ছাড়া এজন্য যে ব্যয় কর্‌তে হয় তার অঙ্কটাও সর্ব্বসাধারণকে এ ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়ার পথ হ'তে নিরস্ত ক'রে রেখেছে। সাধারণতঃ এজন্য তাকে খরচাই দিতে হয় অন্ততঃ পক্ষে ১৮ পাউণ্ড অর্থাৎ অন্যূন ২৬০৲ টাকা। তার উপরে যারা কবর খনন করে, পারিশ্রমিক ও মদের বাবদে তাদেরকেও বেশ মোটা হাতেই দক্ষিণা দিতে হয়।

কবর খুঁড়ে' মৃতদেহ বা'র ক'রে আনার সব চেয়ে বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছিল সম্ভবতঃ বিখ্যাত কবি ও চিত্রকর দান্তে গেব্রিয়েল রসেটির পত্নী এলিজাবেথের সম্পর্কে। রসেটি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এলিজাবেথের বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। তিনি তাঁকে দিয়েছেন শুধু দুঃসহ যন্ত্রণা ও নিষ্করুণ অবহেলা। অন্য রমণীর প্রতি তাঁর আসক্তির কথা নিয়েও তিনি পত্নীকে উপহাস কর্‌তে দ্বিধা বোধ করেন নি। এই পত্নী যখন মারা গেলেন তখন কবির মনে জাগ্‌ল তীব্র অনুশোচনা। ব্যথার আঘাতে বিহ্বল হ'য়ে তিনি স্থির কর্‌লেন — প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বেন। প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হ'লো এই যে, পত্নীর দেহের সঙ্গে তিনি সমাহিত কর্‌বেন তাঁর একখানা সদ্য-লেখা অপ্রকাশিত কাব্য-

দান্তে গেব্রিয়েল রসেটি
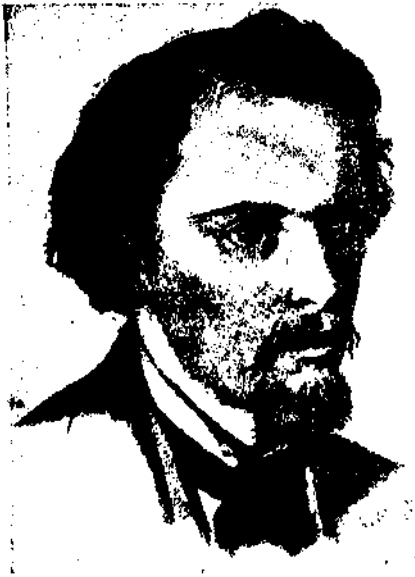
'মেরিয়ানা ইন দি সাউথ'

এখানি দান্তে গেব্রিয়েল রসেটির একখানা বিখ্যাত চিত্র। উপবিষ্টা রমণীর মুখে চিত্রকর রসেটি তাঁর পত্নী এলিজাবেথের মুখ হুবহু বসিয়ে দিয়েছেন। এলিজাবেথ কবির ভালোবাসা পান নি বটে, কিন্তু তাঁর অনেক বিখ্যাত চিত্রে এই এলিজাবেথই ছিলেন তাঁর সৌন্দর্য্যের আদর্শ।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি। কবির পক্ষে এ ত্যাগ অবশ্য খুব ছোট-খাট ত্যাগ ছিল না। কিন্তু জীবনে তাঁর এক ফোঁটা ভালোবাসা যিনি পান নি, মৃত্যুর পরে এত বড় দামী একটা জিনিস তিনিই অকারণে কেড়ে রেখে দেবেন, কবির কাছে তাও অসহনীয় হ'য়ে উঠ্‌ল। তাই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ এলিজাবেথের মৃত্যুর ঠিক ছয় বছর পরে রসেটি তাঁর স্ত্রীর কবর খুঁড়িয়ে 'কফিন'টা তোলালেন। তারপর তার ভিতর হ'তে বার ক'রে নেওয়া হ'লো সেই সমাহিত কাব্য-গ্রন্থখানা। বইখানা যখন রসেটির ঘরে এসে পৌছলো, তখন তিনি তরল নেশায় একেবারে মশ্‌গুল। পাছে আবার অনুতাপের ভূত কাঁধে চাপে, তাই আগে থাকতেই এবার তিনি এমন একটা জিনিসের আশ্রয় নিয়েছিলেন যার কাছে অনুতাপ অনুশোচনার কশাঘাত ঘেঁস্‌তে পারে না।

গ্যাসের যুগ

ইউরোপে এবং আমেরিকায় এখন চলেছে হরদম নানা রকমের গ্যাসের ব্যবহার। বিগত যুদ্ধের সময়েই সম্ভবতঃ মানুষ মারার হাতিয়ার রূপে গ্যাসের প্রথম আবিষ্কার হয়। তারপর ক্রমেই নতুন নতুন গ্যাস আবিষ্কৃত হচ্ছে, এই ধরণের সব উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে।

পাশ্চাত্য দেশগুলোতে আজ-কাল যারা চুরি-ডাকাতি করে তারা আর সেই আগের দিনের মতো অসভ্য বর্ব্বর অবস্থায় নেই। অনেক সময় দেখা যায় তারা এক একজন ধুরন্ধর পণ্ডিত—বিজ্ঞানে ও রসায়নে তাদের মাথা চমৎকার সাফ্‌। এরাই আবিষ্কার করছে নানা রকমের গ্যাস, নানা রকমের যন্ত্র—তাই দিয়ে তারা মানুষ মারছে, চুরি-ডাকাতির পথ সুগম ক'রে নিচ্ছে, পুলিশকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলছে। অবশ্য ইউরোপ আমেরিকায় পুলিশেরাও নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে ব'সে নেই। তারাও এদের সমান জুড়িদার। তাদের হাতেও এই গ্যাস সময় সময় এমন ইন্দ্রজালের

সৃষ্টি করে যে, তা অতি বড় বুদ্ধিমান ও বেপরোয়া অপরাধীকেও অতি সহজে টেনে এনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়।

মোটরে চ'ড়ে যারা ডাকাতি ক'রে বেড়ায় তারা এখন সাধারণতঃ সব সময়েই সঙ্গে রাখে বোমা—বিষাক্ত গ্যাসে পরিপূর্ণ। পালাবার সময় হয়তো জনতা তাদের অনুসরণ করতে সুরু করলে। এই বিপদের হাত এড়াবার জন্তে ছুঁড়ে মারলে তারা জনতার দিকে গুটি কতক বোমা। সঙ্গে সঙ্গেই জনতার এগিয়ে আসার পথ বন্ধ হ'য়ে গেল। এমনি ক'রে বিপন্মুক্ত হ'য়ে তারা স'রে পড়ে তাদের নিভৃত কোটরে, যেখানে পুলিশের চতুর গোয়েন্দাও সহজে তাদের সন্ধান পায় না।

যারা মানুষকে হত্যা করতে চায় তারা এখন বিষ-প্রয়োগ বা ছুরি-চালানো আর বিশেষ পছন্দ করে না। দরাজ হাতে তারা গ্যাসের ব্যবহার সুরু ক'রে দিয়েছে। এজন্যে কারবন মোনোক্সাইড (Carbon monoxide) হ'য়েছে এখন তাদের একটা বড় হাতিয়ার।

বিগত যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে, ক্লোরিণ গ্যাসের সাহায্যে অতি তুখোড় শত্রুকেও বাগে আনা যায়। যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতা এবার কাজে লাগাতে আরম্ভ করেছে ইউরোপ ও আমেরিকার অতি দুর্দ্ধর্ষ অথচ শিক্ষিত বদমাইস যারা তারাই।

সেদিন এমনিতর একটি অতি ধুরন্ধর ডাকাতের আস্তানাতে হানা দিয়েছিলেন বিলেতের 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের' ডিটেক্‌টিভেরা। এই আস্তানাটির মালিক হচ্ছেন একজন ভালো রসায়ন-বিদ্ বৈজ্ঞানিক। আস্তানাটির ভিতর হ'তে আবিষ্কৃত হ'লো—কয়েকখানা দামী চোরাই করা মোটরকার, কতকগুলো রিভলভার, কিছু অন্য রকমের অস্ত্র-শস্ত্র এবং একটা সিলেণ্ডার—৬০ পাউণ্ড (প্রায় ৩০ সের) পরিমাণ ক্লোরিণ গ্যাসে পরিপূর্ণ। এ সব ছাড়া তাতে পাওয়া গেল আরো কয়েকটি ছোট খালি সিলেণ্ডার এবং কতকগুলো মুখোস। মুখোসগুলো এমন ভাবে তৈরী যে, তার একটা মুখে এঁটে দিলে গ্যাস আর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশ্‌তে পারে না। বড় সিলেণ্ডার হ'তে ছোট

গ্যাস-ব্যবহারকারীর মুখোস

সিলেণ্ডারগুলোতে গ্যাস ঢেলে নিয়ে মোটরকারে ক'রে যে এরা যেতো ডাকাতি করতে, পুলিশ অজস্র প্রমাণ পেলে তার এই ঘরটিতে।

এর পরেই ইষ্ট এণ্ডের আর একটা বাড়ীর উপরে পুলিশের নজর পড়্‌ল। বাড়ীটা একজন রাসায়নিকের। পুলিশ খানা-তল্লাসী সুরু ক'রেই টের পেলে যে, সেখানে বিষাক্ত গ্যাস তৈরীর একটা ছোট খাট কারখানাই বসিয়ে ফেলেছে এই রহস্যময় বৈজ্ঞানিকটি। গ্যাসের সাহাযো রাহাজানি ক'রে যারা বিলেতের লোক-জনকে সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছে, তাদের যুদ্ধের রসদ যোগাবার মালিক ছিল যে এই লোকটাই, তার পরিচয় পেতেও পুলিশের দেরী হ'লো না। কিন্তু পরিচয় পেলে তারা একটু দেরীতে। সুতরাং তারা যখন হানা দিলে তার আড্ডাতে, তার আগেই সে জাল গুটিয়ে উধাও হ'য়ে গেছে।

এই ধরণের চোর-ডাকাতেরা সাধারণতঃ ক্লোরিণ গ্যাসই ব্যবহার করে। গ্যাসটার সাহায্যে মানুষকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলা খুবই সহজ। তা ছাড়া ওর প্রভাবে মানুষ অনেক সময় মারাও যায়। মুখের, গলার এবং ফুসফুসের জলীয় অংশের সংস্পর্শে এলেই গ্যাস উৎপন্ন করে বিষাক্ত হাইড্রোক্লোরিক

ব্যাসিডের। আর তার ফলেই ঘটে মানুষের চরমতম দুর্দশা। তার শক্তি লোপ পেয়ে যায়, কণ্ঠনালীর ভিতর সুরু হয় খিচুনীর। মাত্রা বেশী হ'লে অবশেষে মৃত্যুও নেমে আসে।

এ সুবিধাগুলি ছাড়া আরও একটা কারণে ক্লোরিণ গ্যাসের পসার দস্যুদের কাছে বেড়ে উঠেছে। ক্লোরিণ গ্যাস সহজে পাওয়া যায় এবং তার খরচাও ভারি কম। জল পরিষ্কার করবার জন্য ক্লোরিণ 'টনে-টনে' বিক্রয় হয়। আর সেই জন্যই তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করবার নিমিত্ত এ পর্যন্ত বাধা-নিষেধ বা আইনের সৃষ্টি হয় নি। ক্লোরিণ গ্যাসের দশ পাউণ্ডের খরচ বিলেতে বড় জোর ২৫ শিলিং। বেশী মাত্রায় তৈরী করবার যাদের সুবিধা আছে, পাউণ্ড-প্রতি ব্যয় তাদের দু'পেন্সের বেশী পড়ে না।

কিন্তু ক্লোরিণ গ্যাস ছাড়াও এই সব খুনে ও ডাকাতদের দল আরো কতকগুলো গ্যাস নিয়ে সম্প্রতি কারবার সুরু ক'রেছে। এই সব গ্যাসের একটির নাম হচ্ছে Carbonyl chloride। এ গ্যাসটির বৈশিষ্ট্য এই যে, যার উপরে প্রয়োগ করা হয় সে টেরও পায় না যে, তার উপরে গ্যাস প্রয়োগ করা হ'য়েছে। প্রয়োগের ৪৮ ঘণ্টা পরে হঠাৎ সে হয়তো মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আর একটা গ্যাস যা তারা প্রয়োগ করতে সুরু ক'রেছে তার নাম Diphenyl chloroarsine. ভারি সাংঘাতিক রকমের গ্যাস। ভীষণ মাথার যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। সে যন্ত্রণা এত বেশী যে, এ গ্যাস যার উপরে প্রয়োগ করা হয় তাকে দিয়ে আততায়ী যা খুসী তাই করিয়ে নিতে পারে।

কিন্তু কেবল খুনে' বা ডাকাত নয়, গ্যাস আজকাল ওদেশের পুলিশদের হাতেরও একটা বড় হাতিয়ার। বিষকেই বিষের প্রতিষেধক রূপে তাঁরাও ব্যবহার করতে চেষ্টা করছেন। নিউইয়র্কে কিছু দিন আগে বেশ একটা চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘ'টে গেছে। এই ব্যাপারটা থেকে পুলিশের হাতে গ্যাস যে কতটা জোর এনে দিয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

ক্রাউলে ভয়ানক দুর্দান্ত লোক। অনেকগুলো খুন ও রাহাজানি সে ক'রেছে। তার হাতে যেন বন্দুক ভেল্কি খেলে। সুতরাং পুলিশ তাকে কিছুতেই ধরতে পারে না। একদিন পুলিশ তাকে অনুসরণ করতেই সে যেয়ে আশ্রয় নিলে একটা ঘরের ভিতরে তার এক সঙ্গী এবং সঙ্গিনীর সঙ্গে। তিনজনে মিলে' তারা চালাতে সুরু করলে বন্দুক পুলিশের উপরে। পুলিশের বন্দুকও পাল্টা জবাব দিলে। কিন্তু সে জবাব অর্থহীন। ঘরের ভিতরে সুরক্ষিত তাদের দেহকে পুলিশের সে গুলি-গোলা স্পর্শও করতে পারলে না। বাইরে তখন হাজার হাজার লোকের ভিড় জ'মে গেছে। অবশেষে নিরুপায় হ'য়ে পুলিশ শরণ নিলে গ্যাসের। সরঞ্জাম এসে পৌঁছালো। জানালা দিয়ে গ্যাস তারা ছাড়্লে ঘরের ভিতরে, শাবল মেরে ছাদের খানিকটা ফাঁক ক'রে ঘরে গ্যাসের বোমা মারা হ'লো—সবগুলোই অশ্রু-বাষ্পের (tear gas) বোমা। ক্রাউলে আর সহ্য করতে পারলে না। চোখে কোত্থেকে তার সমুদ্রের জল এসে জমা হ'লো, নয়ন থেকে মিলে গেল দৃষ্টির আলো। অসহ্য যন্ত্রণায় বিহ্বল হ'য়ে বন্দুক ফেলে দিয়ে হাত মাথার উপরে তুলে' ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তারা পুলিশের হাতে আত্মসমর্পণ করলে।

'টিয়ার গ্যাস' পুলিশের হাতে আজকাল একটা বেশ বড় হাতিয়ার। বড় বড় দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিবারণ করবার জন্যে, ক্ষিপ্ত জনতাকে শান্ত করবার জন্যে, অ্যানার্কিষ্টদের (রাজদ্রোহী) আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্যে হরদম তারা এই 'টিয়ার গ্যাসে'র সঙ্গে মিতালি পাতাচ্ছে। তা ছাড়া অপরাধীর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় ক'রে নেবার জন্যেও তারা মাঝে মাঝে শরণ নিচ্ছে এই গ্যাসটারই। এর সব চেয়ে বড় গুণ হচ্ছে—এ অত্যন্ত নির্দোষ, দৈহিক কোনো হানি করে না, অথচ গুলি-গোলার চেয়েও এর শক্তি ঢের বেশী।

মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের জীবনের প্রদীপটা

নিবিয়ে দেওয়ার জন্তে আমেরিকা আবিষ্কার ক'রেছে আর একটা নতুন গ্যাসের। নেভাডা রাজ্যের কারা-কক্ষে এল্‌মার মিলার নামক একটি অপরাধীর উপর সম্প্রতি এই গ্যাসের শক্তি যাচাই ক'রে দেখেছেন সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ। স্ত্রীকে হত্যা করার অপরাধে এই মিলারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

মৃত্যু-গৃহের ভিতর একখানা চেয়ারে বন্দীকে বসিয়ে দেওয়া হ'লো। তার চেয়ারের নীচে রাখা হ'লো একটা পাত্রে খানিকটা সালফিউরিক য়্যাসিড। তার পর য়্যাসিডের ভিতর একজন ফেলে দিলে কয়েকটা সোডিয়াম সাইনাইডের বড়ি। পনের সেকেণ্ডের ভিতরেই ঘর খানা অপূর্ব্ব পুষ্প গন্ধে সুরভিত হ'য়ে উঠ্‌ল। চৌদ্দ মিনিট পরে ডাক্তার ঘরে ঢুকে' জানিয়ে দিলেন—বন্দীর মৃত্যু হ'য়েছে।

প্রস্তরের যুগ শেষ হ'য়েছে। লোহার যুগের চোখ-ঝল্‌সানো দীপ্তিও মিলিয়ে যাচ্ছে গ্যাসের ধোঁয়ার অন্তরালে। এইবার কি তবে গ্যাসের যুগ আরম্ভ হ'লো?

ক্রীতদাসদের কাহিনী

আমেরিকার নিগ্রোদের নিয়ে ক্রীতদাসের ব্যবসা চল্‌ত—তা' আমরা জানি। তার পর মানুষের এই অমানুষিক পাশবিকতার দিকে একদিন সভ্য-জগতের নজর পড়্‌ল। তাদের মন বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্‌ল। এর বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ সুরু ক'রে দিলে। দাস-প্রথা উঠে' গেল।

অন্ততঃ উঠে' গেছে—এই ছিল আমাদের ধারণা। কিন্তু দাস-প্রথা যে এখনও পৃথিবীর বুকের উপরে বেশ জাঁকিয়ে ব'সে আছে, সে খবর সম্প্রতি জন কয়েক ইউরোপীয় পর্য্যটকের মারফৎ আবার এসে পৌঁছেছে সভ্য-জগতের লোকদের কাছে। সে কাহিনী যেমন করুণ, তেমনি ভয়াবহ।

ম্যাক্স-গ্রুল (Max Gruhl) একজন জার্ম্মান পর্য্যটক। আবেসিনিয়াতে যে দাস-প্রথা এখনও চল্‌ছে তার এক মর্ম্মন্তুদ কাহিনী তিনি সভ্য-জগতকে জানিয়েছেন। সে কাহিনী এই—

"একটা শোভাযাত্রা আমরা দেখ্‌লুম। যত বড় শক্তিমানের লেখনীই হোক্—তার চিত্র কেউ আঁক্‌তে পারবে না। ...... নর-নারী চলেছে, তাদের নগ্ন বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না, এক জনের সঙ্গে আর এক জনের দেহ শিকল দিয়ে বাঁধা। উলঙ্গ শিশুগুলি নিয়ে চলছে তারা হয় কোলে-কাঁখে ক'রে, নয় কাঁধে চড়িয়ে। যাদের হাতে তারা বন্দী তাদের হৃদয় ব'লে কোনো জিনিস নেই। এত গুলো লোককে টেনে নিয়ে চ'লেছে তারা ভেড়া-গোরুর মতো নির্ম্মম ভাবে, মহাঔদাসীন্যের সঙ্গে।

"ক্রীতদাস! ক্রীতদাসদের শোভাযাত্রা এই বিংশ শতাব্দীতে! উত্তপ্ত মনের কোনো কল্পনা এর ভিতরে নেই। সত্য সত্যই তারা সব মানুষ, গৃহ হ'তেই তাদের সকলকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে, তারা চলেছে কোথায়—তা তারা জানে না এবং ভাগ্যে যে তাদের কি আছে তাও তাদের অজ্ঞাত।

"অসুস্থ প্রাণীর মতো চল্‌তে চল্‌তে ঝুপ্ ক'রে রাস্তায় তারা প'ড়ে যায়। যদি আমার শক্তি থাক্‌তো তবে পাগ্‌লা কুকুরের মতো এই সব দাস-ব্যবসায়ীকে আমি গুলি ক'রে হত্যা কর্‌তুম। দাসদের এই দল ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গেল।

"... বৃষ্টির ধারা ঝ'রে প'ড়ছে। কিন্তু তাদের আশ্রয় নেই, দেহ উত্তপ্ত কর্‌বার আগুন নেই। ক্ষুধার তাদের অন্ন নেই। তাদের দেহের শৃঙ্খল ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকারের বুক চিরে' জাগাচ্ছে শুধু একটা করুণ প্রতিধ্বনি।"

এক আবেসিনিয়াতেই যে সব ক্রীতদাস আছে তাদের সংখ্যা সম্ভবতঃ ২০ লক্ষকেও ছাড়িয়ে উঠ্‌বে। সেখানকার বড়লোকেরা এখনও মনে করেন যে, মানুষকে ক্রীতদাস ক'রে রাখ্‌বার অধিকার তাঁরা লাভ ক'রেছেন ভগবানের কাছ থেকেই। এক একটা

ছোট-খাটো রাজ-রাজড়ার হুকুম তামিল করবার জন্ত থাকে অন্ততঃ চোদ্দ-পনের হাজার ক্রীতদাস। সুতরাং বলা বাহুল্য ক্রীতদাসের প্রয়োজন সেখানে সর্ব্বদাই অনুভূত হয়। আর সেইজন্ত অনবরত জুলুম চল্‌তে

কৃতদাসেরা গাছ কাটছে

থাকে আশেপাশের অসহায় বুনো জাতগুলোর উপরে। বাড়ী থেকে তাদের জোর ক'রে ধ'রে আনা হয়, তারপর ঘোড়া-গোরুর গায়ে যেমন ক'রে মার্কা মেরে দেওয়া হয় তেমনি ক'রে মার্কা মেরে দেওয়া হয় তাদের দেহেও — যেন তারা পালাতে না পারে এবং পালিয়ে গেলেও ধ'রে আনা কঠিন না হয়।

সুদান ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত রাজ্য। এই সুদানেও চড়াও ক'রে অনেক সময় আবেসিনিয়ার দাস-ব্যবসায়ীরা লোক সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আসে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এমনি ধরণের একটা আক্রমণ হ'য়ে গেছে। এই আক্রমণে ২৭ জন লোক মারা যায় এবং ২৭টি রমণী ও ৫০টি বালক-বালিকা বন্দী হয়। এদের সকলকেই চিরন্তন দাসত্বের হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে দিতে হ'য়েছে।

দুঃখ-নির্য্যাতন সহ্য করতে না পেরে আবেসিনিয়া হ'তে পালিয়ে মাঝে মাঝে দু'চারটি ক্রীতদাস এসে সুদানে আশ্রয় নেয়। কিন্তু এই পালিয়ে আসাও সহজ ব্যাপার নয়। ধরা পড়্‌বার বিপদ তো আছেই, তা' ছাড়া পথও অতি দুর্গম। জিডারেফে এসে পৌছতে পার্‌লে তবে তারা নিরাপদ। কিন্তু এই জিডারেফে পৌছতে অন্ততঃ ৭৫ মাইল দুর্গম মরুভূমি তাদের পেরিয়ে আস্‌তে হয়।

আবেসিনিয়াতে ক্রীতদাসদের পরিবার বাড়াবার যে ব্যবস্থা তাও অত্যন্ত বীভৎস, অতিমাত্রায় অমানুষিক। ফরাসী বৈজ্ঞানিক মার্সেল গ্রিউল-এর (Marcel Griaule) অনুসন্ধানে যে তথ্য এ সম্বন্ধে ধরা প'ড়েছে নীচে তা উদ্ধৃত ক'রে দিলুম —

"গৃহপালিত পশু-পক্ষীকে যেমন ভাবে তাদের পরিবার বাড়াবার জন্ত জোড় মিলিয়ে দেওয়া হয়, তেমনি ভাবে কখনো কখনো ক্রীতদাসীর কাছে থাক্‌তে দেওয়া হয় যে কোনো একটা ক্রীতদাসকে। যে সব সন্তান জন্মগ্রহণ করে তারা তাদের মালিকের দাস-গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়ে।

"তবে সাধারণতঃ কাজের অসুবিধা না হ'লে এই ভাবে মিলিত স্ত্রী-পুরুষকে বিচ্ছিন্ন করা হয় না। কিন্তু মালিকের মর্জ্জি অনুসারে যে কোনো মুহূর্ত্তে তাদের পরস্পরকে তফাৎ ক'রে দেওয়ার পক্ষেও বাধা নেই। ক্রীতদাসীরা গর্ভাবস্থাতেও কাজের চাপ হ'তে নিষ্কৃতি পায় না।

"প্রসবের দিন পর্য্যন্ত তাদের কাজ করতে হয় এবং সন্তান-প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আবার উঠে' দাঁড়াতে হয় তাদের নিয়মিত কাজের বোঝা কাঁধের উপর তুলে' নেবার জন্যে।..."

আবেসিনিয়ার সম্রাট অবশ্য চেষ্টা করছেন তাঁর রাজ্যকে এই মহাকলঙ্কের গ্লানি হ'তে মুক্ত করতে। কিন্তু তাঁর এ চেষ্টায় তাঁকে বাধা দিচ্ছে রাজ্যের বহু প্রধান প্রধান ব্যক্তি। সুতরাং পথ তাঁর পক্ষে সহজ নয়—দুর্গম। কিন্তু তাঁর ভিতরে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আছে। এই মহালাঞ্ছিত হতভাগ্যদের প্রতি তাঁর মনে সত্যকারের একটা দরদ আছে, তাই মনে হয়, তাঁর চেষ্টা হয়তো নিষ্ফল হ'বে না। এবং তিনি নিজেও আশা করেন, বিশ বৎসরের ভিতরে তাঁর দেশকে তিনি এই দুর্ভাগ্যের হাত হ'তে মুক্তি দিতে পার্‌বেন।

কিন্তু কেবল আবেসিনিয়ায় নয়, দাস-প্রথার এই বীভৎস পাশবিকতা আরো দু'একটি দেশে আছে; আরব দেশ তাদের অন্যতম। আরব দেশে ক্রীতদাসের সংখ্যা হ'বে অন্ততঃ ১০ লক্ষ। তাদের কতককে আমদানী করা হয় সেখানে আফ্রিকা হ'তে, আর কতক আমদানী হয় পূর্ব্বদেশ থেকে। লোহিত

নৌকোতে ক'রে যে ভাবে ক্রীতদাসদের নিয়ে যাওয়া হয় তারি একটি দৃশ্য

সাগরের উপর দিয়ে প্রকাণ্ড ব্যবসা চলেছে যারা মানুষ নিয়ে কেনা-বেচা করে তাদের। মাঝে মাঝে নৌকো তাদের ধরা প'ড়ে যায় ইংরেজ নৌ-বাহিনীর কাছে। এ সৌভাগ্য যে সব নৌকোর হয় তার বন্দীরা অবিশ্যি মুক্তি লাভ করে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও লোহিত সাগরের উপর দিয়ে যে সব ক্রীতদাসকে আরবে আমদানী করা হয় তাদের সংখ্যা বৎসরে ৫ হাজারের কম হ'বে না।

তা' ছাড়া তীর্থের প্রলোভন দেখিয়েও বহু লোককে ভুলিয়ে এনে ক্রীতদাস করা হয়। বরং এইভাবে যে ব্যবসাটা চলছে সেইটেই এদের সবচেয়ে বড় ব্যবসা। সরল, নিরীহ লোকদের বলা হয়—পবিত্র মসজিদের ভিতরে প্রবেশ ক'রে উপাসনা করবার সুবিধা তাদের দেওয়া হ'বে। কিন্তু মক্কাতে পা দিতে-না-দিতেই ব্যবসায়ীদের মুখের খোলস খুলে' পড়ে। তারা এই অসহায় লোকগুলিকে নিয়ে হাজির করে বাজারে—যেখানে ক্রীতদাসদের ক্রয়-বিক্রয় চলে সেইখানে।

মসজিদে যাওয়ার পথে একটা রাস্তার ধারে বসে এই বাজার। পাথরের তৈরী বেঞ্চের উপর ব'সে সারা দিন ধ'রে এরা প্রতীক্ষা করতে থাকে। মসজিদে যাওয়ার পথে ক্রেতারা তাদের নিজেদের পছন্দ ও প্রয়োজন অনুসারে এক এক জনকে বেছে কিনে' নেয়। এখানে ক্রীতদাসের চাইতে ক্রীত-দাসীদের সংখ্যাও বেশী—দামও বেশী। রূপ, যৌবন ও বয়স অনুসারে দামের তারতম্য হয়। ৫০ পাউণ্ড হ'তে ৭০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত সাধারণতঃ ওঠে তাদের দাম।

চীনও একটা মস্ত বড় আড়ত এই ক্রীতদাসদের। সেখানে তাদের সংখ্যা প্রায় আবেসিনিয়ার মতোই—২০ লক্ষের কম হ'বে না। ক্রীতদাসীদের নাম সেখানে মুই ট্ছাই (Mui Tsai)। তারা পুরোপুরি একেবারে তাদের মনিবদেরই সম্পত্তি। টাকার বদলে বাপ-মার কাছ থেকে তাদের কিনে' নেওয়া হয় এবং একবার কেনা হ'য়ে গেলে, কখনো আর তারা তাদের মা-বাপের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারে না।

ক্রীতদাসেরা যে কেবল তাদের স্বাধীনতাই হারায় তা নয়, তাদের উপরে যে নির্য্যাতন চলে আমরা তা

বালক ক্রীতদাসকে দণ্ড দেওয়া হ'চ্ছে

কল্পনাও করতে পারি না। অতি সামান্য অপরাধেই হাতের পায়ের আঙুল, নাকের ডগা, কান তাদের

কেটে নেওয়া হয়। গরম তেল এবং গরম জল অতি অনায়াসেই তাদের মনিব তাদের গায়ে ঢেলে দেন। সে জন্ত কারো কাছে তাঁর কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। ক্রীতদাসীদের দেহ নিয়ে তিনি যেমন খুশী ব্যবহার করেন—তাতে প্রতিবাদ করবার অধিকারও তাদের নেই। ছেলেগুলোকে মায়ের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে খেয়াল মতো বাজারে বিক্রয় ক'রে দেওয়া হয়।

এমনি নির্যাতন সহ্য করছে এই বিংশ শতাব্দীতেও প্রায় ৫০ লক্ষ লোক যাদের দেহ ঠিক আমাদের দেহের মতোই রক্ত-মাংসে গড়া, যাদের মন ঠিক আমাদের মনের মতোই সুখ-দুঃখের আঘাতে সাড়া দেয়।

আশা

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

আশা আমাকে ভালবেসে ফেললে। আশা আমার পিতৃবন্ধুর কন্যা। মাত্র এইটুকু সম্বন্ধ সম্বল ক'রে কেরাণীর মুখ দু'চার দিন তাদের বাড়ীতে বদলাতে যেতুম। এ ছাড়া আশার সঙ্গে 'লভে' পড়বার সুযোগ তো নাই-ই, যোগ্যতাও কিছু নাই। আশা সুন্দরী, কলকাতার রং-চঙে কাপড়পরা সুন্দরী নয়, সত্যিকারের সুন্দরী, যাকে দেখলে অনেকদিন মনে থাকে,—হাঁ, একটি সুন্দরী মেয়ে দেখেছি বটে। আমি সুন্দর কি না জানিনে,—একদিন হয় তো কিছু সুন্দর ছিলুম, কিন্তু এখন আর তার চিহ্নও নেই বোধ হয়। আশার বিদ্যে আই-এ অবধি, আমি ম্যাট্রিক পাশ ক'রেই চাকরীতে ঢুকেছি। আশার গুণ প্রচুর, কিন্তু আমার কিছু আছে ব'লে তো শুনি নি আজো। আশার বাবা মস্ত বড় ব্যবসাদার, তিনটে মোটর রাখেন, নিজের বাড়ী কলকাতায়, আর আমি চল্লিশ-টাকার কেরাণী, বাসে না চ'ড়ে পয়সা বাঁচাই ও খাকি সস্তা মেসে। আশা অবিবাহিতা, আর আমার ছেলে পুলে না হ'লেও বিয়ে হ'য়েছে। তবু ও আশা আমায় ভালবাসলে। এর চেয়ে জগতে আশ্চর্য্য কিছু আছে জানো?

প্রথম যে দিন তাদের বাড়ীতে যাই, আশার বাবার কাছে একটা "রেকমেন্‌ডেশন লেটার" নেবো ব'লে—যদি চাকরীর কিছু সুবিধা হয় এই আশায়। সেদিনকার কথা আজও এত স্পষ্ট মনে পড়ে যেন কাল সে ঘটনা ঘটেছে। পায়ে জুতা ছিল না, আধময়লা কামিজটার পিট্‌টা ঝাঁজরা হ'য়ে গেছে, কাপড়টায় যে কত শেলাই তা' গোণা যায় না। এমনি অবস্থায় একদিন তাদের বাড়ী গিয়ে তার বাবা রায়বাহাদুর জি, সি, চ্যাটার্জ্জিকে প্রণাম করলুম। তিনি আমার দিকে একটু তাকিয়ে বললেন—কি চাই? পিতৃ-পরিচয় দিলুম প্রথমেই। অমনি উঠে এই এতো নোংরা লোকটাকে রায়বাহাদুর চ্যাটার্জ্জি একঘর লোকের সামনে বুকে টেনে নিলেন। তারপর সে কত কথা! মা কেমন আছেন, বোনের কোথায় বিয়ে দিয়েছ—বাবা কি রেখে গেছেন—অসংখ্য প্রশ্ন। প্রত্যাশীর দল সেদিন আর কোন আশা না দেখে ফিরে গেলো। ঘর খালি হ'তেই মিঃ চ্যাটার্জি ডাকলেন—আশা মা।

একটি কিশোরী এসে ঢুকলো। এই আশা—বয়স কতই বা আর,—পনের হবে। রায়বাহাদুর বললেন—দেখছিস্ আশা, এই আমার সেই পরম বন্ধু আশুবাবুর ছেলে, প্রণাম কর।

মেয়েটি তখুনি আমাকে প্রণাম ক'রে উঠে বললে—এতো ময়লা কাপড় কেন?

হেসে বললুম—পয়সা নেই কেনবার।

—ওঃ—ব'লে সে তার বাবার দিকে চাইলে। তার পর সেই বাড়ীতে কি আদর-যত্নেই না দিনকতক কাটালুম। সর্ব্বদা আশা থাকতো আমার কাছে। তার মা (আমার কাকীমা) মায়ের মতই আজও আমাকে আদর-যত্ন করেন।

দিন ছয় পরে রায়বাহাদুরের সুপারিশে এই চল্লিশ টাকার চাকরী। বিদ্যে বেশী থাকলে ভাল চাকরীই হোত, কিন্তু আমি তো মাত্র ম্যাট্রিক পাশ—তাতে এই বাজার। চাকরী হবার পর কিন্তু আশাদের বাড়ীতে আর থাকতে পারলুম না। আত্মসম্মানে যেন ঘা লাগে। পিতৃবন্ধুর বাড়ীতে কি অমনি ক'রে বেশী দিন থাকা যায়! গরীবের এই আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান যেন একটু বেশী; অন্ততঃ আমার আছে।

অফিস থেকে পনের টাকা 'এড্ভান্স' নিয়ে মেসে এসে বাসা বাঁধলুম। রায়বাহাদুর, কাকীমা এবং বাড়ীর সকলেই, আশার দাদারা ও বৌদি'রা—আমার চ'লে আসায় খুবই ক্ষুণ্ণ হলেন। কিন্তু উপায় কিছু ছিল না। আর আমি জানতুম, এই ক্ষুণ্ণতাতেই মানুষের মর্য্যাদা বাড়ে।

আশা কিন্তু একটুও ক্ষুণ্ণ না হ'য়ে বললে—মেসে থাকবেন তো? খুব ভালো—আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসবো।

মেসে যে মেয়েদের যেতে নেই সে জ্ঞান তাকে সেদিন আর দিলুম না। কথাটা শুনতে যেন খুব ভাল লাগলো, বললুম—যাবে বই কি।

—আপনিও শনিবার শনিবার আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসবেন কিন্তু।

—তাতো আসবোই।

আশা পরমোৎসাহে আমার যাত্রার যোগাড় ক'রে দিল। আমার কিছু ছিল না। আশা কোত্থেকে একটা তোষক, একটা বালিশ, একটা নতুন মশারী আর ছোট একটা টিনের স্যুটকেস এনে বললে—কিসে যাবেন, মোটরে?

—না, রিক্সতে।

তখনি সে দারোয়ানকে রিক্স ডাকতে বললে। আমাকে না বিদায় ক'রে যেন তার ঘুম হ'চ্ছে না।

•

মেসে অধিষ্ঠিত হ'য়ে গেলুম। প্রথম প্রথম প্রত্যেক শনিবারে ঠিক ছ'টার সময় অফিসের টেলিফোনে ডাক পড়তো। রিসিভার কানে দিতেই শুনতুম আশার গলা—আজ আসচেন তো?

বলতুম—আজ আর যেতে পারবো না—কাজ আছে।

—সে হ'চ্ছে না, আসতেই হবে। আজ রোবে যাবো মনে করেচি—আসুন। ফোন ছেড়ে দিয়ে আশা চ'লে যেতো।

সে যেন তখন থেকেই জানতো, তার ঐ "আসুন" হুকুম অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। যেতেই হ'ত।

দিন কয়েক পরেই আশাকে 'তুমি' বলতে লাগলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে সে-ও 'আপনি' কে 'তুমি'তে নাবিয়ে আনলে।

শনিবার সন্ধ্যাটা কিন্তু কাটতো বেশ। সিনেমায় আমরা বেশী যেতুম না। কারণ আশা সিনেমা দেখতে যেতে চাইলেই তার বৌদি'রাও যেতে চাইতেন। আশার কাছে সেটা বড় প্রীতিপ্রদ ছিল না। বলতো, কথা বোঝে না, কবিতা বোঝে না, ওদের নিয়ে আবার বেড়াতে যায়—মেয়ে জাতটা একদম অকর্ম্মণ্য।

কোন মেয়ের মুখে একথা শোনা পায় না—যদি বলতুম তো খুব খানিক হেসে কোঁকড়া চুল দুলিয়ে সে বলতো—আমি কি মেয়ে নাকি? আমি তো ছেলেই।

শরীর ওর নিটোল, নিভাঁজ, নিখুঁত—একটি সতেজে বর্দ্ধমান কলাগাছের মত। দেহটিকে দেখলেই মনে হয় বিশ্ব-শক্তি যেন তাতে কেন্দ্রীভূত।

বৌদি'দের জ্বালায় আশা সিনেমা দেখা ছেড়ে দিলে। বলতো, তোমরা দাদাদের সঙ্গে যাও না বাপু—আরাম পাবে—তোমাদের রান্নাবাড়া আর খোকা-খুকীর গল্প আমরা শুনতে পারবো না, দাদাদের বলগে।

বড় বৌদি' লোক খুব ভাল। আশা তাঁকে একটু সমীহ করে আর বলে—তুমি যদি ভাই মেজ বৌদি'কে আর ছোট বৌদি'কে লুকিয়ে আসতে পার তো এস— সিনেমা দেখিয়ে আনবো। বড় বৌদি'র কাজ খুব বেশী, সমস্ত সংসার তাঁর ঘাড়ে, কাজেই তিনি বড় সময় পান না।

মেজ বৌদি'কে আশা দু'চক্ষে দেখতে পারে না। তাঁর অপরাধ, তাঁর বাবা স্তর উপাধিধারী এবং সহরের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। আশা বলে—তোমার বাবা স্তর হয়েছে তাই ব'লে আমরা তোমার অত গুমর সইবো কেন—ধনীর দুলালী, ধনী বাপের কাছে গুমর করগে।

তা' আশা বড় মিথ্যে বলে না। মেজ বৌদি'র সত্যিই একটু গুমর আছে। তিনি দিনরাত নিজের সাজ-সজ্জা, কাপড়-গয়না নিয়েই ব্যস্ত এবং তাঁর কাছে গেলেই তাঁর বাপের বাড়ীর কথা শুনতে হ'বে।

ছোট বৌদি' আশার প্রায় সমান বয়সী। তাই আশা তাকে একটু কৃপার চক্ষে দেখে। বলে—লেখাপড়া তুই শিখলিনি বৌদি', ছোড়দা'কে কি ক'রে সামলাবি? ঐ দুরন্ত বালক—আমরা সবাই হেসে উঠি। আশা চোখ পাকিয়ে বলে—হাসছো কি, লজ্জা করে না?

বাড়ীর সবারই ছোট ব'লে আশা বাড়ীর সবারই স্নেহ বেশী পেয়েছে, এমন কি ভেঁছু দারওয়ানটাও তাকে বেশী খাতির করে। কাকীমার সঙ্গে আশার সম্পর্ক নেতান্তই অল্প। নেহাৎ দরকার না পড়লে তাঁর কাছে স যায় না; তার যতকিছু আবদার বাবার কাছে। রায়বাহাদুর এই আধ-পাগলা মেয়েটাকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে পুরো পাগল না ক'রে ছাড়বেন না দেখছি।

একদিন শনিবার গেছি আশাদের বাড়ী। রায়-বাহাদুরের বসবার ঘরে আশা তার বাবার চেয়ারের হাতলটায় ব'সে তাঁর পাকা চুল তুলছে আর বলছে—কি দুষ্টু বাবা তোমার ঐ বন্ধুর ছেলেটা। দুটোয় ছুটি হয়েছে, সাড়ে তিনটেতেও আসবার নামটি নেই।

আমারই কথা হ'চ্ছে শুনে বাইরে দাঁড়িয়ে গেলুম। রায়বাহাদুর হেসে বললেন — নাই বা এল রে — কি দরকার তোর তার সঙ্গে?

—দরকার অনেক বাবা। কি সুন্দর যে গল্প বলতে পারে ও, তুমি শুনলে তুমিও শুনতে চাইবে। ধানগাছে কেমন ঢেউ খেলে, অশথ গাছে কি ক'রে বাবুই পাখী বাসা বাঁধে, পুকুরের একঘাটে ডুব দিয়ে আর এক ঘাটে কি ক'রে পান কৌড়ির মতন ওঠা যায়—এই সব কথা এত চমৎকার বলে!

রায়বাহাদুর হেসে উঠলেন আমায় দেখতে পেয়ে, আশাও দেখতে পেলে। লজ্জায় সে কি রাঙা হ'য়ে উঠবার মেয়ে? বললে—কেন এত দেরী করলে? রায়-বাহাদুর মাথাটা টেনে নিয়ে বললেন—যা, এবার পানকৌড়ির গল্প শুনগে।

এমনি ক'রেই বেশ কিছুদিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু আশা বড় হয়ে উঠলো। একেই তো সে স্বাস্থ্যবতী ব'লে পনেরতেই আঠারোর মত দেখাতো, ষোলয় পড়তেই কাকীমা বায়না নিলেন—বিয়ে দাও। বিয়ে কিন্তু আশা কিছুতেই করবে না। আমাকে সে অনেকবার বলেছে এ-কথা। আমি হেসেই উড়িয়েছি। তখন কে জানতো যে ওইটুকু মেয়ের মনের জোর এতো বেশী!

আশার মেজদা'র বন্ধু, সুশীলবাবু বেশ ভাল ছেলে। মস্ত বড় লোকের ছেলে, এম্-এ পাশ, দেখতেও খুব সুন্দর।

বাড়ীর সকলেরই ইচ্ছে, আশাকে সুশীলের হাতে দেবে। সুশীলও তাকে খুব পছন্দ করে, না করবার কোন কারণ নেই। কিন্তু আশা তাকে মোটে আমল দেয় না। সন্ধ্যা বেলা দাদারা ও সুশীল এবং আমি ব্রীজ খেলতে ব'সে চা চাইলে আশা চা নিয়ে আসে, ব'সে খেলাও দেখে। সুশীলবাবু তাসগুলো গুটিয়ে বলেন—আর খেলতে হবে না, তার চেয়ে আশা দেবী একটা গান শোনান। আশা তীব্র মুখভঙ্গী ক'রে

বলে—ফরমাস করলেই কি আর গাইতে হ'বে না কি ? মেজদা' কট্‌মট্ ক'রে তাকান। আশা তাসগুলো তুলে নিয়ে ডাকে—ওরে মন্তু, মীরা,—আয় ম্যাজিক দেখাবো।

সুশীলবাবু একটু লাল হ'য়ে ওঠেন, একটু হেসে বলেন—আচ্ছা ম্যাজিকই তবে দেখান, আমরাও দেখি।

তাসগুলো ফেলে দিয়ে আশা বড়দা'কে বলে—আচ্ছা বড়দা', আমাদের দমদমার বাগানে একটা গোশালা করলে হয় না, আমি নয় সেখানে দেখবো-শুনবো ?

সুশীলকে ও চায় না ; কিন্তু বাড়ীর সবাই একদিন যুক্তি ক'রে কথাটা সরাসরি ওর সামনে পাড়লে। মেজ বৌদি' বললেন—সুশীলবাবু বেশ ভাল ছেলে, না রে আশা ?

—হ্যাঁ একদম নিছক ভাল ছেলেই বটে।

মেজদা' রেগে বললেন — মানুষকে অমন হতশ্রদ্ধা করিস কেন আশা ?

চোক কপালে তুলে আশা বললে—হতশ্রদ্ধা কই করলুম ?

বড়দা' এসে আশার পিঠে চাপড়ে বললেন—লক্ষী বোনটী, সুশীলকে তোর পছন্দ হয় কি না আমাদের ঠিক ক'রে বল দেখি ?

বড়দা'কে আশা খুব ভক্তি করে। তাঁর কথা কাটেও না বড় একটা। মুখে শান্ত ভাব এনে সে বললে—তুমি কি বুঝে আমাকে একটা অপদার্থ ধনীর ঘরের পুতুল সাজাতে চাইছো বড়দা' ? বাপের টাকায় সিল্কের পাঞ্জাবী উড়িয়ে ব্রীজ খেলতে এলেই মানুষ মহাপুরুষ হয় না, এম-এ পাশ ক'রেও চতুর্ভুজ হয় না। ঐ তুলতুলে ননীর শরীর দিয়ে কুটোটি কাটবার যার শক্তি নেই তাকে বিয়ে ক'রে খাঁচায় পুরে রাখবার মত খাঁচা আমার নেই।

সুশীলবাবুর সম্বন্ধে আমরা সবাই নিরাশ হ'য়ে গেলুম। সুশীলবাবুও আর বেশী ব্রীজ খেলতে আসতো না। শুনেছি সে এখন বিয়ে ক'রে সুখে আছে।

* * *

ম্যাট্রিক পাশ ক'রে আশা কলেজে ভর্তি হ'ল। বাড়ীতে পড়ার নাকি অসুবিধা এবং যাতায়াতে অনর্থক সময় অপব্যয় হবে ভেবে সে এখন কলেজ-সংলগ্ন বোর্ডিং-এ থাকে। শনিবার বাড়ী যায়, আমিও শনিবার যাই, তাই আমাদের দেখা-শোনার কিছু ক্ষতি হয় না। আশা আজকাল কাব্যচর্চ্চা করতে লেগেছে। রবিবাবুর যতো ভালো ভালো কবিতা তার মুখস্ত হ'য়ে গেল। কবিতা লিখচেও বেশ, কিন্তু আমাকেই শুধু দেখায়। বলি, দাও না একটা, এক সম্পাদককে দিয়ে আসি। আশা রেগে বলে—কি রকম, আমার কবিতা শুধু আমারই জন্তে, ও আমি কখনো ছাপাবো না।

—দেশের লোক প'ড়ে আনন্দ পাবে যে।

—না, কবিতা লেখার শেষ ক'রে দিয়েছে রবিঠাকুর। এখন আমরা যা' লিখছি, সেটা শুধু নিজেদের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্তে। সাহিত্যে নতুন কিছু দেবার দিন যদি আসে তো এক শতাব্দী পরে। তবে হাঁ, কয়েকজন অশ্লীল কিছু লিখে নাম বাহির করছে বটে, কিন্তু অমন ফাঁকা নাম তো আমি চাই না।

এর পর আর কথা যোগায় না। আশার লেখা কবিতা পড়ি আর ভাবি—সুন্দর! এ-গুলো বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ না হ'লে যেন সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হবে, কিন্তু উপায় কি! আশা তার কবিতা কোন দিনই ছাপতে দেবে না। দু'একবার মনে করেছি, চুরি ক'রে নিয়ে কাগজওয়ালাদের দিয়ে আসবো, কিন্তু ভয় করে। যা মেয়ে, যখন জানতে পারবে, অনর্থ ক'রে ছাড়বে।

আমার ছোটবেলা থেকেই লেখা অভ্যাস। এখন যা' কিছু লিখি সব তাতেই আশার ছায়া এসে পড়ে। ওর দৃপ্ত ভঙ্গী যেন আমার মনে কেটে কেটে বসেছে। ভাল মেয়ের কথা মনে হ'তেই আমার সুমুখে আশার মূর্ত্তি এসে দাঁড়ায়, যেন ও ছাড়া আর পৃথিবীতে নারী নেই। তবু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি, ওর প্রভাব

অতিক্রম করতে, কারণ সব গল্পেই ঐ একটি মেয়ের আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে তারিপ পাবো, বাংলা দেশে এমন ফাঁকি আর চলে না।

আশা আমার লেখা শুনতে চায়, কিন্তু শোনাতে আমার অত্যন্ত বাধে। কেন যে বাধে তার সম্বন্ধেও ভেবে দেখেছি। হয় তো যে লেখাটা আমি নিজে বেশ ভাল মনে করি এবং যে কোন সমালোচককে শোনাতে পারি আশার কাছে সেটাও পড়তে আমার গলার স্বর আটকে যায়। যদি আশা খারাপ বলে! কি লিখলে এবং কেমন লিখলে যে ওর ভাল লাগবে আমি জানি না, কখনো জানবো কি না তাও জানি না।

যেগুলো ছাপা হয় সেগুলো অবশ্য আশা পড়ে (আজকাল সে প্রায় সব মাসিকই পড়ে) কিন্তু কখনো কিছু বলে না। দেখে একটু ভরসা হয়। ভাবি হয় তো তত খারাপ লাগে না ওর। কিন্তু আমার কোন নতুন লেখা ও শুনতে চাইলে আমায় বড্ড মুস্কিলে পড়তে হয়। অথচ ওকে না শুনিয়েও আমি স্বস্তি পাই না। খানিকটা পড়তে গিয়েই কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে যাই। বলি আজ একটু গল্প কর আশা, বাকি গল্পটা তুমি কাল নিজে পড়ে নিও। আশা একটু হেসে বলে—আচ্ছা, ছাপা হ'লেই পড়বো।

একদিন খুব ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—আমার "বন্ধু" গল্পটা তোমার কেমন লাগলো আশা?

—ছাই, রাবিশ—

গল্পটা ছাপা না হ'য়ে সম্পাদকের কাছ থেকে ফেরত এলেও এত দুঃখ হোত না। ঐ গল্পের জন্ম রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমাকে কেউ গাল দিলেও সহ্য করতে পারতুম। কিন্তু আজ যেন কি হোল, মন আমার খারাপ হ'য়ে গেলো। একটু পরেই আশাদের বাড়ী থেকে চ'লে এলুম। রাস্তায় ভাবতে ভাবতে এলুম, গল্প আর লিখবো না, কিছুই লিখবো না। বাসায় এসেই দেখি একজন সম্পাদক বন্ধু ব'সে আছেন, তিনি লেখা চাইতেই ব'লে দিলুম—আমার কাছে আর লেখা পাবেন না, ও সব আমি ছেড়ে দিলুম।

—কেন—হঠাৎ কি কারণ ঘটলো?

কারণটা কিছুতেই বলা যায় না। আশার মত একটা মেয়ের মতামতের উপর নির্ভর ক'রে, তার ভাল লাগে না ব'লেই লেখা ছেড়ে দেবো—এ কি বলা যায়! বললুম—কেরাণীর ও পোষায় না।

—এতকাল তো বেশ পোষাচ্ছিল—নামও একটু করেছেন, এখন আবার কি হোল?

—হয় নি কিছু, এমনি মনের খেয়াল।

বন্ধু অন্যান্ত কথার পর বিদায় নিলেন। আশাদের বাড়ীতেই খেয়ে নিয়েছিলুম, কাজেই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। ঘুম আর আসে না। চিরজীবনের সাহিত্য-সাধনা আমার, এত দুঃখেও যাকে একটি দিনও ছাড়ি নি, ক্ষুধার সময় যার বন্দনা গেয়ে ক্ষুধা ভুলেছি, চাকরি খুঁজতে খুঁজতে নিরাশ হ'য়ে একান্ত ক্লান্ত আমি মাঠের ঘাসে ব'সে কবিতা লিখে হাসিমুখে ফিরে এসেছি, সেই আমি, একটা মেয়ের কথায় সাহিত্য-চর্চ্চা ছেড়ে দেবো? সাহিত্যই বা আমায় ছাড়তে চাইবে কেন? এত কালের পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের দল নিত্য এসে বলবে—দাও তোমার সাধনালব্ধ নির্ম্মাল্য—কি ব'লে আমি তাঁদের ফেরাবো! ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কিন্তু সকালে উঠে নিত্যকার মত আজ আর লিখতে বসতে পারলুম না; কি যেন একটা অভাব বোধ হ'তে লাগলো। কোথায় যেন কি নাই, কি যে হ'ল ঠিক ধরা যায় না। ব'সেই কাটালুম।

সে সপ্তাহটা কিছুই লেখা হ'ল না, আশ্চর্য্য মানুষের মন! আশার ভাল লাগে না তাই আমি আর কিছুই লিখতে পারি না! ভাল তার কখনো লাগতো কিনা জানি না, কিন্তু সে-দিন সে প্রকাশ করেছে, ভাল লাগে না। পরের শনিবারে আশাদের বাড়ী যাবো না ঠিক করেছি, কিন্তু করবো কি! ছুটির পর বাসায় এসে কাপড় বদলে ভাবলুম মাঠে খেলা দেখতে যাবো; ট্রাম ধরতে এসেই মনের মধ্যে একটা কি যে হোল, মাঠে না গিয়ে গেলুম আশাদের বাড়ী।

আমাকে দেখেই আশা বললে—একদম কবি হ'য়ে গেছ দেখছি যে, তেল মাখনি ক'দিন ?

সত্যিই চুলের অবস্থা ভাল ছিল না, খেলা দেখতে যা'ব, তাই চুল আঁচড়াবার কথা মনে ছিল না। অনিচ্ছায় কোন কাজ করতে চাইলে, এই রকমই হয় বোধ হয়। বললুম—কবি হই নি, সন্ন্যাস নেবো ভাব্‌ছি।

—বলো কি ? তবে বৌদিকে টেলিগ্রাম ক'রে দিই এসে সামলাবেন ; কিন্তু এতো বৈরাগ্যের হেতু কি ? বৌদি কি আজকাল চিঠি লিখছেন না ?

ওর কথায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠলো। গলায় ঝাঁজ এনে বললুম চুপ করো আশা, সব সময়েই ইয়াকি করতে নেই।

আশা হো হো ক'রে হেসে উঠলো।

একটু পরে আশা বললে—এ ক'দিনে কি লিখলে দেখি ?

—কিছু না, লেখা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন ? আমি খারাপ বলেছি ব'লে ?

—হ্যাঁ।

—কেন, ভাল তো ঢের লোকেই ব'লে থাকে—আমার ভাল না লাগায় কি তোমার ব'য়ে গেলো !

কি যে ব'য়ে গেলো, তা' নিজেই বুঝতে পারিনে, ওকে বোঝাব কি দিয়ে ! তবু জোর ক'রে বললুম—কে কোথায় ভাল বলে না বলে আমি তো দেখতে যাইনে, শুনতেও পাইনে, যারা পরিচিত তারা যদি প'ড়ে ভাল বলে তবেই না লেখা সার্থক ?

—ভাল না লাগলেও ভাল বলতে হ'বে না কি ? আচ্ছা, এবার থেকে না হয় ঐরকম খোসামুদির কথাই বলা যাবে। কিন্তু সে মিছে কথা—খোসামুদির কথা, তা তোমায় জানিয়ে রাখছি।

কি আর বলবো ! যিনি প্রশংসা করবেন তিনি পূর্ব্বেই জানিয়ে রাখছেন, যা' তিনি বলবেন তা' মিছে কথা।

আশা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললে, বললে—শোন, তোমার লেখার প্রশংসা বহু লোক করছে, নিজেও করে ঢের লোক ; কিন্তু তোমার কাছে তোমার পরিচিত সবাই বলে—'বেশ লিখছেন'। আমাকে কি তুমি সেই পরিচিতের দলে ফেলতে চাও ? তা' যদি চাও তো আমার কাছে তোমার কোন লেখা আর শুনিও না। আমি না প'ড়েই বলবো, 'সুন্দর লিখছো, চমৎকার, বাংলা-সাহিত্যে দ্বিতীয় নাস্তি'। আর যদি আমাকে তোমার সত্যি সাহিত্যিক বন্ধু মনে করো, তবে কোন্ খানটা আমার ভাল লেগেছে তোমায় নাই বা বললুম, কোন্ খানটা মন্দ লেগেছে এবং কেন মন্দ লেগেছে তাই শুধু আমি বলবো। সুমুখে তোমার প্রশংসা করবার লোকের তো অভাব নেই, তোমার ত্রুটি দেখিয়ে যদি দিতে পারি তবেই আমি তোমার যোগ্য বন্ধু হ'তে পারবো। অবশ্য আমার সমালোচনা তুমি না-ও গ্রহণ করতে পারো। কিন্তু আমার মতটাও তো খ'ণ্ডে দিতে হ'বে, নইলে তোমার গল্প তোমার মুখে শুনে তার আলোচনা করার লাভ কি ?

কথাটার সত্যতা এমন ক'রে আমাকে বিহ্বল করলে যে, মনে হোল, আশার চেয়ে নিকটতর সাহিত্যিক বন্ধু আমার আর কেউ নেই। সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে আমি তাকে বললুম,—তাই ক'রো, আমার দোষগুলোই তুমি দেখিয়ে দিয়ো, যা' বড় বেশী লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায় না জগতে। ওতে আমার সত্যি উপকার হ'বে। তবে ভাষাটা অত তীব্র না করাই ভাল।

খিল খিল ক'রে হেসে আশা বললে—তীব্র ভাষার খোঁচা না খেলে তোমাদের 'খেজুরে' সাহিত্যিক বুদ্ধির রস ঝরে না যে। জানতো, কবি আর খেজুর গাছ একই পদার্থ। খেজুর গাছে রস ঝরে শীতকালে, যখন সমস্ত প্রকৃতি জড় হ'য়ে থাকে, আর সেই রস ঝরাতে হয় গাছের বুকে ক্ষত ক'রে।

এর পর থেকে আশা আমার সাহিত্যের খোলাখুলি আলোচনাই করতো। তার ব্যঙ্গ, তার বিদ্রূপ

আমায় কষ্ট যে না দিত তা' নয়, তবু মনের ঝাঁজের মত ওর যেন একটা নেশা আছে। মদ খেতে হ'লেই ঐ ঝাঁজটুকু যেন সইতেই হ'বে।

*

* * *

পাড়া-গাঁ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আশার নেই। ওসম্বন্ধে তার যা' কিছু বিদ্যে বই-এ পড়া, আর আমার মুখ থেকে শোনা। তাই সে আমার স্কুল-জীবনের দুরন্তপনার কাহিনী, নদীর জলে সাঁতার কাটার গল্প, বাগানে আম চুরির ইতিহাস এমন নিবিষ্ট মনে শুনতো যে, বৈষ্ণব চূড়ামণিও রাধা-কৃষ্ণের কথা অমন ক'রে শোনে না। আমার বলতেও খুব ভাল লাগতো; ছেলে বেলার কথা বলতে কার না ভাল লাগে! আমার লেখার মধ্যে পল্লীর বর্ণনাটুকু শুনতে শুনতে তার মুখ-চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো। মাঝে মাঝে বলতো—চলো, তোমার পাড়া-গাঁ এবার আমি দেখবোই।

পুজোর ছুটি এসে পড়লো, আমার অফিস বার দিন বন্ধ। আশার বাবা সপরিবারে পশ্চিমে যাবেন। আমাকে ডেকে বললেন—চলো, আমাদের সঙ্গে।

যাবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু বাড়ীতে মা যে কতদিন থেকে ডাকছেন! সাত মাস মা'কে দেখি নি, তা ছাড়া স্ত্রীও তো আছে। বললুম,—আজ্ঞে, মা যেতে মত দেবেন না, আর মা'কে দেখতে আমারও বড্ড ইচ্ছে করছে। রায় বাহাদুর হেসে বললেন—বেশ বাবা, বেশ, মা'র কাছেই যাও। মা'র ছেলে কি অন্ত কোথাও যেতে চায়!

আশা এসে বললে—আমিও ওর সঙ্গে যাবো বাবা, বেড়াতে আমি যাবো না।

—তা' কি ক'রে হ'বে মা? ও বার দিন পরে ফিরে আসবে, তুই কি সেখানে একমাস থাকতে পারবি? আমরা তো এক মাসের আগে ফিরছি না।

—বার দিন পরে ও আমায় তোমাদের কাছে দিয়ে আসবে।

রায় বাহাদুরের আপত্তি করবার কিছুই ছিল না। তিনি বললেন—তা' যেতে পারো। কিন্তু আমার আপত্তির যথেষ্ট কারণ ছিল। প্রথমতঃ আমি গরীব, বড়লোকের মেয়ে নিয়ে গিয়ে সম্মানে রাখতে পারবো না। তারপর আমাদের পাড়াগাঁয়ে এত বড় অবিবাহিতা মেয়ে দেখে লোকে হয়তো ওর সামনেই ওকে কিছু খারাপ ব'লে বসবে। আশা সেটা সহ্য করতে পারবে না হয়তো। এই সব ভেবে আমি চট্ ক'রে কিছু বলতে পারলুম না। আশা আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়েই কি যেন বুঝে বললে—কিন্তু তোমার বোধ হয় নিয়ে যাবার ইচ্ছে নেই, না? সত্যি ইচ্ছে যে নেই তা' বলা চলে না। বললুম—অনিচ্ছার কিছু নেই, তবে তুমি সেখানে থাকতে পারবে কিনা তাই ভাবছিলুম।

—আচ্ছা, সে আমি বুঝবো।

বাসায় এসে মাকে চিঠি লিখে দিলুম, আমার সঙ্গে আশা যাবে। সব ঠিক, রায় বাহাদুর রাত্রি ৮টার ট্রেণে যাবেন, আর আমরা ঘণ্টা দুই পরে দশটা পনেরোর ট্রেনে যাবো।

এক সঙ্গেই হাওড়া ষ্টেশনে এসে আগে রায় বাহাদুরদের তুলে দিলুম। আশাও গাড়ীতে উঠলো, তার বাক্সটাও তুলে নিলে। বললুম—ওকি আশা, আমাদের বাড়ী যাবে না? আশা বললে—কই আর গেলুম, পশ্চিম দেখতেই ইচ্ছে করছে বেশী।

—কিন্তু আমি যে তোমাকে নিয়ে যাবো ব'লে চিঠি লিখে দিয়েছি। মা কি বলবেন?

—থাক না, গরমের ছুটিতে যাবো।

কি জন্তে যে আশা আজ যেতে চাইছে না বুঝলুম। আমার মনের কথা সে যেন জানতে পেরেছে। একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললুম। কিন্তু তবু যেন কোথায় কাঁটা বিঁধে রইল।

আশাদের নিয়ে ট্রেণ চ'লে গেলেও আমি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি বোকার মত। একটা 'কুলি' এসে বললে—কোথায় যাবেন? উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে এলুম।

বাড়ী এসে প্রায় প্রত্যেক দিনই আশাকে চিঠি

লিখতুম, পল্লী-জীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটির খবর দিয়ে; উত্তরে সেও তাদের ভ্রমণ-কাহিনী লিখতো, আর তার মধ্যে দু'একটা তার মনের সত্যরূপও বেরিয়ে আসতো। মেয়েদের মনের গোপন কথা জানবার সৌভাগ্য পুরুষ-লেখকদের কম, আশা সে অভাব আমার অনেকখানি ঘুচিয়েছে। মনে আর মুখে তার কিছু তফাৎ নেই। সে মনে যা' ভাবে মুখে তা' বলতে বেশী কুণ্ঠিত হয় না। এই গুণে তাকে যেন আমার আরো বেশী ভাল লাগে। আজ-কালকার ভদ্রতার যুগে মনের কথা যে যত ঢাকতে পারে তার ততই ত' বাহাদুরী। আশা কিন্তু মোটেই ঢাকতে চায় না। চিঠিতে সে লিখেছে—তুমি আমায় নেহাৎ দায়ে প'ড়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলে। নইলে এমন ধিঙ্গী মেয়েকে নিয়ে যেতে তোমার ইচ্ছে ছিল না। বৌদি' খারাপ কিছু ভাবতে পারেন তাই আমিও গেলুম না। কথাটার ভিতর একটা তীব্র সত্য ছিল, আমার মন নাড়া পেয়ে উঠলো। আমার পল্লীবাসিনী স্ত্রী সহরের হাবভাবে অভ্যস্তা আশাকে নিশ্চয়ই সহ্য করতে পারতো না। ব'সে আছি, আশা হয়তো পাশেই এসে গা ঘেঁসে ব'সে পড়লো, হয়তো আমার চুল টেনে দিতে লাগলো, —এমনি কত কি! প্রথম প্রথম আমারই যেন কেমন কেমন লাগতো, এখন অবশ্য সহ্য হ'য়ে গেছে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এত বড় একটা মেয়ে যদি নিতান্ত নিঃসম্পর্কীয় পুরুষের সঙ্গে অমন ব্যবহার করে, তবে তাকে তখুনি ঢাক পিটিয়ে বের ক'রে দেওয়া হয়। আশা যে কি ক'রে এত সব বুঝলে জানিনা, তবে সে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ী না গিয়ে ভালই করেছে।

আশার কথা বাড়ীতে প্রায়ই বলতুম। সে আমায় খুব যত্ন করে শুনে, মা তাকে দূর থেকেই স্নেহাশীর্ব্বাদ পাঠালেন। কথাগুলো এমনভাবে বললুম যে, বৌও তাকে ভাল না বেসে পারলে না। আশার খবর সবাই জানলে। তাকে না দেখেও সবাই চিনতে পারলে।

ছুটি ফুরুলে কলকাতা এসে শনিবারটা কোথায় কাটাব ভাবি। আশাদের আসবার এখনো অনেক দেরী আছে। ভেবে কিছু ঠিক না হওয়ায় গোল-দীঘির চারপাশে ঘুরে বেড়াই। এমনি ক'রে মাস-খানেক কাটতেই একদিন মেসের দরজায় মোটরের হর্ণ বাজলো। চাকর এসে বললে—গাড়ীতে এক দিদিমণি এসেছেন, আপনাকে ডাকছেন। গিয়ে দেখি আশা।

আমাকে দেখেই সে হেসে উঠলো, বললে — আজই দশটায় পৌছেছি। তখন অফিসে ছিলে তুমি — চলো।

—কোথায় যেতে হ'বে?

—বাড়ী।

—কেন? দেখা করতে?

—বাঃ রে বিজয়ার প্রণাম করবে না?

ভুলে গিয়েছিলুম। অত্যন্ত লজ্জা বোধ হোল। আমার যারা এতো হিতৈষী তাদের বিজয়ার পর প্রণাম করার জন্ত তাদের বাড়ীরই মেয়ে এসে নিমন্ত্রণ করে! তখুনি আশার সঙ্গে তাদের বাড়ীতে এলুম। এতদিনের অনেক কথা — দু'পক্ষেরই মনে জমা ছিল। কাজেই অনেক রাত হ'য়ে গেল; খেয়েই মেসে এলুম।

কয়েকদিন পরে অফিসে কাজ করছি বেয়ারা এসে বললে—ফোনে ডাকছে। গিয়ে দেখি রায় বাহাদুর কথা বলছেন। তিনি বললেন, আজ ৫টার সময় আশাকে দেখতে আসবে। আশা বোর্ডিং-এ আছে, তাকে কেউ দেখতে আসবে শুনলে সে নিশ্চয়ই বোর্ডিং থেকে আসবে না। আমি যেন আশাকে কোন কিছু একটা ব'লে ৪টার মধ্যে বাড়ী নিয়ে আসি। কে দেখতে আসবে জিজ্ঞাসা করায় রায়বাহাদুর বললেন—শালুখার জমিদার রমেশ মুখুজ্যে তাঁর একমাত্র পুত্রের জন্তে আশাকে চান। ছেলেটি এম-এ পাশ করেছে, বিলেত যাবার ইচ্ছে আছে। তবে তার পূর্ব্বে রমেশবাবু ছেলের বিয়ে দিতে চান। ছেলেটি খুব ভাল, পিতৃভক্ত। দেখ না, এযুগেও নিজে মেয়ে দেখতে না এসে বাবাকে পাঠাচ্ছে। বাবা যা' করেন

তাতেই ওর সম্মতি। এখন আশাকে রাজি করাতে পারলেই হয়। রায়বাহাদুরকে বাবার সম্মতি দিয়ে ব'সে ভাবতে লাগলুম—আশা জমিদার গৃহিণী হ'বে, ভালই হোল, এমনি একটি পাত্রই তো ওর জন্তে আমরা চাইছিলুম। বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন—সবই ভাল মিলেছে।

তিনটার সময় অফিস থেকে বেরিয়ে আশার বোর্ডিং-এ এলুম। তাকে বললুম — কাকীমা আজ কি-সব রান্না করেছেন আমাদের খেতে ডাকছেন। চলো বাড়ী যাই।

আশা তখুনি সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে ব'লে বাইরে এলো, বললে—গাড়ী ডাকো। বাসে আমি যাবো না।

ট্যাক্সি ডেকে তাকে নিয়ে ওদের বাড়ীর দরজায় এসে নামলুম।

দারোয়ানটার বেশ আজ বদলে গেছে। ধোলাই কোট, পাজামা প'রে মস্ত লাঠিটা বাগিয়ে সে ব'সে ছিল, আমাদের দেখেই এক মুখ হেসে সেলাম জানালে। তাকে এমন বেশে দেখেই আশা বললে—কি কৈজু, ব্যাপার কি? হঠাৎ বাবু হয়ে গেলে যে?

হাসতে হাসতে কৈজু বললে — দিদিমণিকো সাদি হোগা, আউর হাম বাবু নাই বনেগা?

মুহূর্তে আশা ব্যাপার বুঝে আমার দিকে এমন ক'রে চাইলে যে, আমার বুক কেঁপে উঠলো। পাগলা মেয়েটা এখনি হয়তো একটা কাণ্ড বাধাবে। কিন্তু আশা কিছু বললে না। আস্তে ভিতরে ঢুকে গেলো। পিছনে পিছনে আমিও ঢুকলুম। রায়বাহাদুর বাইরের ঘরেই ছিলেন। আমায় ডেকে কয়েকটা কাজের ভার দিলেন। যাঁরা আসবেন তাঁদের অভ্যর্থনার আয়োজনে আমরা ব্যস্ত হ'য়ে পড়লুম।

সাড়ে চারটার সময় তিনজন বৃদ্ধ ভদ্র লোক এলেন। রমেশবাবু ও তাঁর দু'জন বন্ধু। তাঁদের যথারীতি অভ্যর্থনা ক'রে বসাতেই রমেশবাবু বললেন—আমাদের একটু দেরী হয়ে গেছে, শুভ লগ্ন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। আগে মেয়ে দেখান, নইলে বারবেলা পড়বে।

আশার মেজদা' গেলেন আশাকে আনতে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট—মেজদা' আর আসেন না। রমেশবাবু খুব তাড়াতাড়ি করছেন, লগ্ন নাকি পার হ'য়ে যাচ্ছে। আশার বাবা বড়দা'কে যেতে বললেন। তিনিও গিয়ে আর ফেরেন না। ব্যাপার কি—আমাকে দেখতে বললেন। গিয়ে দেখি আশা তার ঘরে খিল দিয়ে কাঁদছে আর বাইরে গোষ্ঠী-সুদ্ধ লোক অনুনয়-বিনয়, তর্জ্জন-গর্জ্জন করছে। আশা কিছুতেই বেরুবে না। সে বলছে—আমি কি সং নাকি, আমাকে সবাই দেখতে আসবে? আমি যাবো না।

আমার অত্যন্ত রাগ হোল। সব এই আজ-কালকার শিক্ষার দোষ! চড়া গলায় বললুম—সং তুমি ছিলে না আশা, এইবার সং সেজেছো! ভদ্রলোকদের এই খানেই ডেকে নিয়ে আসি। দেখলুম কথাটায় কাজ হোল। আশা বললে—আমি যদি বিয়ে না করতে চাই।

—তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো আমরা বিয়ে দিচ্ছি না। ভদ্রলোক যখন বাড়ীতে এসেছেন একবার গিয়ে দাঁড়াতে কি দোষ? বিয়ের কথা পরে। দেখা দিলেই তো আর বিয়ে হ'য়ে যাচ্ছে না।

—আচ্ছা চলো।

আশা বেরিয়ে এলো। বড় বৌদি' বললেন—কাপড়টা বদলে নে।

—না।

কথাটা আশা এতো জোর দিয়ে বললে যে, আমরা কেউ আর তাকে কিছু বলতে সাহস করলুম না। চলুক তো কাপড় না বদলালেও চলবে। মেজ বৌদি' বললেন—গিয়ে প্রণাম করিস, বুঝলি।

আশা চুপ ক'রে রইল।

ঐ ধূমায়িত আগ্নেয়গিরিকে আমরা আর ঘাঁটালুম না। বাইরের ঘরে এসে আশা তিনজন বৃদ্ধকে তিনটি প্রণাম করলে। রূপ তার যথেষ্ট আছে, কাজেই সাজ না করার ত্রুটি কারও চোখে পড়লো না। বৃদ্ধ রমেশবাবু তার দিকে মিনিট খানেক তাকিয়ে থেকে বললেন—বেশ মেয়ে, তোমার নাম কি মা?

—আশা চ্যাটার্জ্জি।

বড় বৌদি' অন্তরালে গুঞ্জন করলেন—মুখপুড়ি আর কি! আশালতা দেবী বলবি, তা' না আশা চ্যাটার্জ্জি।

রমেশবাবু মুচকী মুচকী বেশ একটু হাসছিলেন। বললেন — বেশ নাম। আচ্ছা মা, তুমি রান্না-টান্না কিছু জানো?

—জানি।

—কি কি জানো?

—ডাল, ভাত, তরকারি, মাছ, মাংস, ডিম, চপ্, কাটলেট, চা, টোষ্ট, পান, তামাক সাজা।

সবাই উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলুম। রমেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন—বেশ মা বেশ। এমনি সপ্রতিভ মেয়েই আমি চেয়েছিলুম।

একটু থেকে আশার পিঠে হাত বুলুতে বুলুতে তিনি বললেন—যাবে তো মা আমার ঘরে? আমার মা হ'তে পারবে তো?

— না, কারুর মা বাপ হওয়া আমার পোষাবে না।

ঘরে যেন বজ্রপাত হোল। আমরা সবাই এক সঙ্গে চমকে উঠলুম!

আশা সটান উঠে কোনদিকে না চেয়ে চ'লে গেলো। রমেশবাবু রায়বাহাদুরের লজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে বললেন—ওরকম হ'য়েই থাকে আজকালকার মেয়েরা। বিয়ের নামে ক্ষেপে ওঠে আবার বিয়ে হ'লেই ঠিক হ'য়ে যায়। মেয়ে আমার পছন্দ হয়েছে। রায়বাহাদুর, আপনি কবে ছেলে দেখতে যাবেন বলুন।

রমেশবাবু তো আশাকে চেনেন না। যাই হোক, মেয়েদের দোষ দিয়েই এক্ষেত্রে মর্য্যাদা রক্ষা করা গেলো। রমেশবাবুরা বিদায় নিলেন।

আশার উপর আমরা সবাই এত রেগেছি যে, কেউ তার সঙ্গে কথাও কইলুম না, আশার মা পর্য্যন্ত না।

খানিকক্ষণ পরে দেখি আশা আস্তে আস্তে গিয়ে তার বাবার ঘরে ঢুকলো। রায়বাহাদুর ইজিচেয়ারে শুয়ে গড়গড়া টানছিলেন। আশা তাঁর মাথার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কি কথা হয় শুনবার জন্যে আমরা দু'তিনজন জানালার কাছে আড়ি পাতলুম। দেখি, চোখের জল মুছে আশা বলছে—তোমাকে বড় দুঃখ দিলুম বাবা। কিন্তু কি করবো, কেন তোমরা আমাকে এমন অবস্থায় ফেলো? রায় বাহাদুর আশাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাকে কাঁদতে দেখে নিজের অপমানের কথা ভুলে গিয়ে তখুনি তাকে কোলে টেনে নিলেন।

আশা খানিক কেঁদে মুখ মুছে বললে—বিয়ে আমায় কেন দিতে চাও বাবা, বিয়ে না হ'লে কি মানুষ বাঁচে না?

রায় বাহাদুর বললেন—আমরা বুড়ো হয়েছি মা, আর ক'দিন বাঁচবো? তোকে তাই একটি ভালছেলের হাতে দিয়ে যেতে চাই, যাতে তোর সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।

—আমার সম্বন্ধে চিন্তার কি আছে বাবা? আমাকে কেন এতো দুর্ব্বল মনে করো? আমি নিজের ভার বহন করতে যথেষ্ট সক্ষম, সে কথা কেন ভুলে যাও বাবা?

রায় বাহাদুর একটু নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—বেশ মা, তোর বিয়ে দেবার আর আমরা চেষ্টা করবো না।

আশার মুখখানি হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। সে বললে—তার চেয়ে বাবা, যে দশ-বার হাজার টাকা আমার বিয়েতে খরচ করবে ভাবচো, সেই টাকাটা আমায় দাও দেখি? আমি ঐ দিয়ে একটা গোশালা করি।

—গোশালা কি হ'বে রে?

— দুধ হ'বে, ঘি হ'বে, মাখন হ'বে — দেশের লোক খেতে পাবে, আর আমিও পয়সা পাবো—গরীব ছেলেদের বিলোবো।

রায় বাহাদুর একটু হেসে বললেন — আচ্ছা তাই করিস্।

অতঃপর আশার বিয়ের সমস্ত কথাই বন্ধ হ'য়ে

গেলো। কেউ সে-সম্বন্ধে কোন কথা পাড়লে রায় বাহাদুর থামিয়ে দিতেন।

আমার বহুদিনের স্বপ্ন, আশার খুব ভাল ঘরে বিয়ে হোক, আশা রাণী হোক, রাণী হবার সব যোগ্যতাই ওর আছে। আবার ভাবতুম, রাণী হয়ে কি হবে? তার চেয়ে আশা ভারতের নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করুক, জগৎবরেণ্য হোক, বিয়ে না হয় নাই করলো,—কত কি যে তার সম্বন্ধে কল্পনা করেছি ভেবে ঠিক করতে পারি না। আশার সম্বন্ধে কেন এত চিন্তা আমার হয়? আমি কি তাকে ভালবাসি? ভালবাসি—নিশ্চয়ই, তবে সে ভালবাসার মধ্যে এতটুকু কামনার স্ফুলিঙ্গ নেই, একবিন্দু অপবিত্রতা নেই।

সেদিন বড় বৌদি'র খোকার জন্মদিনের নিমন্ত্রণ। একটু সকাল সকাল গিয়ে দেখি আশা বড় বৌদি'র সঙ্গে রান্নাঘরে। ছোট বৌদি' বাপের বাড়ীতে আছেন। কাকীমা ব্যস্ত। দাদারা কেউ বাড়ী নেই। একা একা বসে একটা বই পড়ছি, মেজ বৌদি' এসে ঘরে ঢুকলেন। বললেন—একটা কথা তোমায় বলবো ঠাকুর পো।

—বলুন।

—এখন না, যাবার সময়, মনে ক'রে শুনে যেও।

মেয়েদের কি একটা বদ্ স্বভাব! যে কথা এখন বলবে না তাই 'বলবো' বলে মনকে অনর্থক খানিক আগে থেকেই ব্যতিব্যস্ত ক'রে দেয়।

আশা আসতেই বললুম—জানো, মেজ বৌদি' ব'লে গেলেন কি একটা কথা আমায় বলবেন।

—ওঁর মুণ্ডু করবেন। চলো, মা ডাকছেন। একলাটি বসে আছ কেন?

রাত্রের উৎসব শেষ হ'লে ফিরবার সময় মেজ বৌদি'কে ডেকে বললুম—কি কথা, এবার বলুন তবে!

তিনি আমায় বারাণ্ডায় ডেকে নিয়ে বলতে বললেন। তারপর খানিক আমতা আমতা ক'রে বললেন—আচ্ছা আশাকে তুমি কি চোখে দেখো?

অবাক হ'য়ে গেলুম। আমাকে এরকম প্রশ্ন করার মানে! আমি কি কোন রকমে এঁদের অবিশ্বাসের কাজ করেছি? বললুম—কেন বৌদি', হঠাৎ আজ এ-প্রশ্ন কেন?

—আশা কিন্তু তোমায় ভালবাসে।

—ভালবাসে?—আমায়?

—হাঁ, তোমায়।

—কখ্খনো না বৌদি', কিছুতেই না। আশা কি জন্যে আমায় ভালবাসবে? আমি তার কোনরকমে যোগ্য নই। তা' ছাড়া সে জানে আমার বিয়ে হয়েছে, স্ত্রী বর্ত্তমান। আমাকে কেন সে ভালবাসবে বৌদি'?

আমি জানি সে তোমায় ভালবাসে, আর আমার বিশ্বাস তুমিও তাকে ভালবাস।

—এর চেয়ে আশ্চর্য্য কথা আমি জীবনে শুনি নি। আমার মনের খবর আমি জানি না, জানে অন্য একজন! বৌদি', আপনি ভয়ানক ভুল করছেন।

—তা' নয় ঠাকুর পো, আমি জানি। আর তুমিও যে ভালবাস তাও আমি জানি।

বৌদি'র সঙ্গে আর কোন কথা কইতে পারলুম না। কিছু ভাল লাগলো না, মেসে চ'লে এলুম।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, সত্যি কি আশা আমাকে ভালবাসে? কখনো তার ব্যবহারে তো সেরূপ কিছু দেখি নি? কেন সে আমায় ভালবাসবে? কি আমার আছে যা' আমি তাকে দিতে পারি? না, বৌদি' নিশ্চয়ই ভুল করেছেন।

আমিও নাকি আশাকে ভালবাসি, বৌদি' বললেন। এমন সৃষ্টিছাড়া কথাও তো শুনি নি। আমি তাকে ভালবাসি? নিজেকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখতে লাগলুম, কোথাও যদি আশার উপরে কিছু—হ্যাঁ ভালই তো বাসি। আমার সমস্ত মন আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠছে কেন? কেন আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হ'য়ে যাচ্ছে? কোথায় ছিল এ ভালবাসা অন্তঃসলিলা নদীর মত? আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। নিজের অজ্ঞাতে কখন তাকে ভাল বেসেছি কখন তার ছবি মনের পরতে পরতে আঁকা হ'য়ে গেছে কিছুই জানি না। বৌদি' না বললে

আরও কতদিন যে নিজের কাছেই নিজের এ ভালবাসা গুপ্ত থাক্‌তো কে জানে? হাঁ, স্বীকার করতে বাধা নেই আর। আশাকে আমি ভালবাসি, সত্যিই ভালবাসি, নিজের চেয়েও ভালবাসি।

কিন্তু সে কেন আমায় ভালবাসবে? তার জীবনের যে বহু সম্ভাবনা রয়েছে!

সে তার অমন সুন্দর জীবনটা আমাকে ভালবেসে নষ্ট ক'রে দেবে — এতো হ'তে পারে না। না, তাকে ভুলবার সুযোগ দিতে হ'বে, দিতেই হ'বে। যদিও সে আমায় ভুলে গেলে আমি সব থেকে বেশী দুঃখ পাবো, তবু তার আমাকে ভোলা চাই-ই। তাকে জীবনে আমি সুখী দেখতে চাই। আমাকে ভোলা ছাড়া তার অন্য উপায় নেই তো।

উপায় আর কিছু নেই। আমার যা' হয় হ'বে, আশা আমাকে ভুলে যাক।

পর দিন অফিসে গিয়ে ম্যানেজারকে বললুম— আমার শরীরটা কিছু দিন থেকে খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। গরীব মানুষ, পয়সা খরচ ক'রে তো আর চেঞ্জে যেতে পারি না, যদি দয়া ক'রে আমাদের পুরী ব্র্যাঞ্চে আমাকে ট্রান্সফার করেন।

ম্যানেজার রাজি হ'য়ে বললেন—বেশ, কবে যেতে চান?

—আজই যাবো।

বাক্স-বিছানা বেঁধে পুরী চ'লে গেলুম। রায় বাহাদুরকে লিখে দিয়ে গেলুম — অফিসের কাজে পুরী যাচ্ছি গিয়ে চিঠি লিখবো। আশাতে আমাতে আজ দৈহিক ব্যবধান ৩১০ মাইল — কিন্তু মনে?

প্রাচীন কলিকাতা

কবিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, কাব্যরত্ন, উদ্ভটসাগর, বি-এ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

১৫। বাগবাজারে ৺ পঞ্চানন ঠাকুর

বাগবাজারের অন্তর্গত "সাবর্ণ্য-বেড়ে" নামক স্থানে একটী বিগ্রহ আছেন। ইঁহা এখন 'গোপাল মিত্রের লেনে'র পার্শ্বেই অবস্থিত। এই বিগ্রহটী অতি প্রাচীন। কে কবে ইঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইঁহার বর্ত্তমান পুরোহিত মহাশয় বলেন, "আমরা ৬।৭ পুরুষ ধরিয়া ইঁহার সেবা করিয়া আসিতেছি। কে কবে ইঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে আমাদের বংশে এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, বলরাম মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই মূর্ত্তি স্থাপন করিবার নিমিত্ত ভূমিদান করিয়াছিলেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আমি এই স্থান বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ দেখিয়াছি। লোকে তৎকালে এস্থানে যাইতে সাহস করিত না।"

বাগবাজার ও চিৎপুরে পূর্ব্বে নরবলি হইত। এই হেতু সাহস করিয়া কেহ অপরাহ্ণে এই দুইস্থানে যাইতে সাহস করিত না। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ অঞ্চলেই পূর্ব্বে কাপালিকেরা নরবলি দিত।

পূর্ব্বে একখানি ক্ষুদ্র খোলার ঘরে ৺পঞ্চানন ঠাকুর অবস্থিত ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, এই বিগ্রহের জন্য একটী ইষ্টক-মন্দির নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

১৬। বাগবাজারে ৺রাধাকান্ত ঠাকুর

৺ রাধাকান্ত-বিগ্রহ বহুকালের স্থাপিত। ইঁহার বর্ত্তমান সেবক মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, নিত্যানন্দ-বংশীয় রামসদয় গোস্বামী মহাশয় এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। অনুমান হয়, বাগবাজার-যুদ্ধের কিছু পরেই এই বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিলেন।

১৭। বাগবাজারে গুণ্ডার উপদ্রব

১০০ বৎসর পূর্ব্বে বাগবাজারে দুই জন মহাদুষ্ট প্রসিদ্ধ গুণ্ডা ছিল। ইহাদের নাম হরি বাগ্‌দী ও ছিরে নাপিত। ইহাদের মত অত্যাচারী লোক তৎকালে কলিকাতায় আর ছিল না। বাগবাজার-নিবাসী স্বর্গত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, "আমি বাল্যকালে ইহাদের নাম শুনিয়াছিলাম। ইহারা লাঠীর উপর ভর দিয়া তিন তলার ছাদে উঠিতে ও সেস্থান হইতে অবলীলাক্রমে মাটিতে লাফাইয়া পড়িত। লাঠীর সাহায্যে ইহারা অতি অল্পসময়ের মধ্যে দূরবর্ত্তী স্থানেও যাতায়াত করিতে পারিত। ১২৬০ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবারের "সংবাদ প্রভাকর" পত্রে ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন, "প্রসিদ্ধ বদমায়েস্ হোরে গাঁটকাটা ও ছিরে নাপতে বাগবাজারে বারুদখানা হইতে ধৃত হওয়াতে নগরের শান্তিরক্ষার পক্ষে অনেক সুযোগ হইয়াছে।"

১৮। বাগবাজারে প্রথম ইংরাজী স্কুল

১০১ বৎসর পূর্ব্বে বাগবাজারে একটী ইংরাজী স্কুলের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে, ২০ জানুয়ারী (১২২৩ বঙ্গাব্দ, ৯ই মাঘ, সোমবার) দিবসে "হিন্দু-কলেজ" স্থাপিত হয়। ইহার পর হইতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী নানা স্থানে ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল। এই সময়ে বাগবাজারেও একটী ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ২৪ অক্টোবর তারিখে বাগবাজার-নিবাসী কালীচরণ নন্দী ও মধুসূদন নন্দী, মার্সমেন-সম্পাদিত "সমাচার-দর্পণে" উক্ত ইংরাজী স্কুল সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন —

"শ্রীযুত জি,এ, টরণবুল সাহেব কর্ত্তৃক বাগবাজারে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত সাহেব কিছুকাল শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সমাদরণীয় উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন এবং তৎপরে অরিএন্টল সেমেনরিনামক পাঠশালায় শিক্ষকতাপদে মনোনীত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহার গুণ ও বিজ্ঞতা এবং এতদ্দেশীয় বালকগণের মঙ্গলার্থ উদ্যোগ অনেককাল পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত থাকিয়া ও উক্ত পাঠশালার মধ্যে ছাত্রেরদের বিদ্যাবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে তাঁহার পরিশ্রমের দ্বারা সম্পূর্ণরূপ প্রকাশমান হইয়াছে। স্বীয় আত্মীয় ব্যক্তিরদের পরামর্শক্রমে এইক্ষণে পাঠশালার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং তাঁহার বন্ধুগণ বাঞ্ছা করেন যে, উক্ত পাঠশালাতে স্বীয় সন্তানেরদের বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করাতে দয়াবান্ মহাশয়েরা অবশ্যই ঐ কার্য্যের বিলক্ষণ আনুকূল্য করিবেন নিবেদনমিতি। শ্রীযুত কালীচরণ নন্দী। শ্রীযুত মধুসূদন নন্দী। কলিকাতা ২৪ অক্টোবর ১৮৩২।"

১৯। বাগবাজারে কাষ্ঠের ব্যবসায়

১৭৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। মফঃস্বল হইতে বাঙ্গালী মহাজনগণ দলে দলে আসিয়া কলিকাতায় ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। প্রচুর কাঠের প্রয়োজন উপলব্ধি হওয়ায় বাগবাজারে ক্যাপ্টেন্ চার্লস্ পেরিন (Captain Charles Perrin) সাহেবের জমীর উপর বড় বড় মহাজন বড় বড় কাঠের গোলা স্থাপন করিতে লাগিলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাঠের ব্যবসায় প্রবলভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাগবাজারে এত অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল যে, মহাজনগণ স্থানাভাবে বাগবাজারের কাঠের গোলা তুলিয়া লইয়া বারাকপুর নামক স্থানে পুনরায় খুলিয়া বসিলেন। বহুপূর্ব্বের একটী কথা বলিতেছি। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দ্বিতীয় সহধর্ম্মিণী মেরিয়াম্ ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বেলুড়ে একটী সুবৃহৎ কাঠের গোলা খুলিয়া রামলোচন ঘোষ মহাশয়কে তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই রামলোচন ঘোষ মহাশয়, পাথুরিয়া ঘাটার সুপ্রসিদ্ধ ঘোষবংশীয়গণের প্রতিষ্ঠাতা।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত "বাষ্পীয় কল ও ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে" নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকে লিখিত আছে —

"বেলুড়ের পরে বারাকপুর। এস্থানে বাহাদুরী চৌকর ও দোকর এবং বাত্তি কাষ্ঠ প্রভৃতি বিক্রয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই সমস্ত কাষ্ঠ কলিকাতার অন্তঃপাতি বাগবাজারে ক্রয়-বিক্রয় হইত। ক্রমে, তথায় বসতি ও অপরাপর বাণিজ্য দ্রব্য নৌকাযোগে অধিক আসিবাতে নদীতীরে কাষ্ঠ রাখিবার স্থান সংকীর্ণ হইবায় কাষ্ঠের মহাজনেরা বারাকপুরে কাষ্ঠের বিপণি (আড়ত) করিল।"

(ক্রমশঃ)

শার্দ্দূল-শৃঙ্গে উদয়ন

শ্রীবরেন্দ্রসুন্দর চট্টোপাধ্যায়

বুধবার। গীর্জ্জার ঘড়িতে ঢং ক'রে একটা ঘণ্টা পড়ল। বুঝলাম রাত্রি একটা। কিন্তু চোখের পাতা এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে, ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেয়েও যেন আবার নূতন ক'রে ঘুমবার অভিপ্রায়ে পাশ ফিরে শুলাম। পাশেই ছিল প্রবোধদা, শার্দ্দূল-শৃঙ্গে যাবার জন্য তার চোখে ঘুমের লেশটী ছিল না, সে বললে— লেপের ভিতর থেকেই সূর্য্যোদয় দেখবার বাসনা করেছ না কি? ওদিকে যে একটা বাজল। ডাণ্ডি এসে দাঁড়িয়ে আছে। মনে করলাম একবার বলি,—থাক দাদা তোমার 'টাইগার হিল', দাৰ্জ্জিলিং তো লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমবারই জায়গা। যাই হোক মনের কথা মনে রেখেই মুখে বললাম—আর আধ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলে হয় না? কথাটা মুখ দিয়ে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবোধদা আমার গা থেকে লেপটা তুলে বললে —ঐ দেখ ওদিকে চেয়ে, ভুটিয়া-বন্ধু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এখন না যাত্রা করলে সূর্য্যোদয় দেখা আর বরাতে জুটবে না।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিছানায় উঠে বসলাম। ওদিকে তাকাতে দেখলাম, কাচের জানালা দিয়ে এক ভুটিয়া-বন্ধুর মুখ দেখা যাচ্ছে, ভুটিয়ার মুখ—নাক থ্যাবড়া গাল দুটো চোয়াড়ে, চোখ দু'টো এত ছোট দেখলে মনে হয় সদা-সর্ব্বদাই বোজা, ভুরুতে কয়েক গাছা কটা চুল আছে—সে না থাকারই মত, সিগ্রেট খাওয়া ঠোঁট দু'টো খুব পুরু নয়—কালো আর লালে মিশে এক অদ্ভুত বর্ণ সৃষ্টি করেছে—তাকে পান্‌সে লাল বা এক-কথায় ক্যাকাশে বলা যেতে পারে। বদনের রংটা দুধে আলতার গুলে তা'তে একটু চুরুটের ছাই ফেলে দিলে যে রং হয়, ঠিক সেই রং—সবটা নিয়ে একটা ওল বলা যেতে পারে, মাথায় একটা ক্যাম্বিস ক্যাপ—তাও তালি মারা।

আমাদের সব সেরে সুরে বেরুতে প্রায় দেড়টা হোল। দ্বার খুলতেই পেলাম একটা উৎকট মিঠা গন্ধ, বুঝলাম আমাদের সর্ব্বহারা ভুটিয়া-বন্ধু তার দেহ-যন্ত্রটীতে তাপ ও তেজ সঞ্চারের জন্য স্বদেশী মিক্‌শ্চার গ্রহণ করেছে। আমরা দু'জনে ডাণ্ডিতে চড়লাম। আমার একশ' চব্বিশ পাউণ্ডের দেহটা তখন প্রায় দু'শ পাউণ্ডের কাছাকাছি হয়েছিল। কারণ দাৰ্জ্জিলিংয়ের ফ্রিজিড জোনের সঙ্গে পাল্লা লড়তে গিয়ে আমাকে দিতে হয়েছিল প্রথম একটা ফতুয়া, তারপর ফ্লানেলের সার্ট, তারপর গলাবন্ধ, সোয়েটার, কোট এবং ওভার কোট, হাতে দস্তানা, মাথায় টার্কিশ ক্যাপ, সবটা নিয়ে যেন একটা ওরাং-ওটাং। ডাণ্ডিতে বসবার পর একখানি মোটা রাগ দিয়ে ভুটিয়া-বন্ধু আমাদের অধঃ-অঙ্গ 'ডবল' আক্রু দ্বারা সম্মানিত করলে। তারপর যেমন ক'রে প্রিয়জনের মৃতদেহ চারজনে সযত্নে সৎকারের জন্য

শ্মশানের দিকে বহন ক'রে নিয়ে যায়, আমাদেরও তেমনি ক'রে চারটি ভুটিয়া-বন্ধু সযত্নে গন্তব্য স্থানে নিয়ে চলল। বাঁধান রাস্তায় একফালি চাঁদকে সাথী ক'রে দু'টী প্রাণী চলেছি। প্রায় প্রত্যেক বাঁকের মুখে একটী ক'রে ঝর্ণা—কোনোটী ছোট, কোনোটী বড়। আমার বাঁ পাশে প্রকাণ্ড শ্যামল স্তূপ—চাঁদের আলোয় এক একটা নীলার চাঁইয়ের মত দেখাচ্ছে। আর ডান দিকে গভীর খাদ, খাদে ঘন বন, বনের দু'একটা গাছের শীর্ষদেশ চাঁদের আলোয় চিক্ মিক্ করছে। আমি একটা সামান্য নর-শিশু সবে এত বড় কুবেরালয়ের চন্দন-রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি, এখনো পুরীতে পৌঁছতে পারি নি, তাতেই যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতে বসেছি। স্তূপের পর স্তূপ, ঝর্ণার পর ঝর্ণা, গভীর খাদ, ঘন বন, তার মাঝে চাঁদের আলোর ফিকে আঁধারের আত্মগোপনের চেষ্টা, সবটা নিয়ে যেন একটা অদ্ভুত মায়াপুরী রচিত হয়েছে। মনে হোল—আমি যেন রূপকথার রাজপুত্তুর, দুস্তর বাধার সমুদ্র পার হ'য়ে কোন্ অবরুদ্ধা রাজকুমারীকে উদ্ধার করতে চলেছি পাতাল-পুরী হ'তে!

'ঘুম্'। নামটা কী ভয়ঙ্কর, অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ শুনলে প্রাণটা আপনা থেকেই চমকে ওঠে। এই 'ঘুম্' নামক স্থানটাতে ভুটিয়া-বন্ধুদের আমরা বহন-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিলাম। অর্থাৎ আমরা পদব্রজে শার্দ্দূল-শৃঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হলাম। যাবার মুখে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম পরিত্যক্ত দার্জ্জিলিং-এর পানে, মনে হোল যেন কয়েক পা দূরে ঘুমন্ত সহরটা ছোট বড় আলোক-মালায় নক্ষত্রপুঞ্জ হ'য়ে বিরাজ করছে, তার আশ-পাশ, পেছন, চারিদিক অন্ধকার।

যাই হোক, পিছনের মায়াকে কাটিয়ে আমরা রাঙা বালি-মাটি বেয়ে' উপরে উঠতে লাগলাম। পথ অপরিসর। চাঁদ পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে। বহু দূরে দূরে একটা ক'রে আলো কোনোরকমে তার যৎসামান্য জ্যোতিঃ নিয়ে বেঁচে আছে। আমরা প্রায় মাইল খানেক চড়াই উঠেছি, এমন সময় পিছনে বহুদূর হ'তে একটা ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল; শব্দটি ক্রমেই স্পষ্ট হ'তে স্পষ্টতর হ'য়ে আমাদের শ্রবণ-যন্ত্রটীকে উৎকণ্ঠিত ক'রে তুললে। আমি অবাক হ'য়ে পিছন ফিরে তাকালাম, ভিখারিণীর রুক্ষ কেশ-রাশির মত লাল্‌চে রাস্তাটা যেন আমাদের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েচে, — এইটুকুই শুধু চোখে পড়ল, শব্দের আর কোন কারণই খুঁজে পেলাম না।

দু'জনে পথ চলছি — নিস্তব্ধ অন্ধকারে বাক্‌হীন হ'য়ে রহস্য মন্দিরে প্রবেশ করছি। আরো পনের মিনিট পরে শব্দগুলো একেবারে প্রায় আমাদের কাছাকাছি এসে পড়ল। এগুলি যে কতকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ, এইবার তা আর বুঝতে বাকি রৈল না। পিছন তাকাতে বেশ নজরে পড়ল, পথের টুকরো পাথরে ঘোড়ার ক্ষুরের ঘসা লেগে আগুনের ফুলকি কাটছে। কিছু পরে দেখা গেল, একটা ঘোড়া প্রায় আমাদের পিছনে এসে পড়েছে, নাগাল পেতে আর মোটে হাত দশ বারো বাকি। মিট্‌মিটে আলোয় দেখতে পেলাম, ঘোড়াটী সাদা, রেসের ঘোড়া; তার আরোহী এক তরুণী। আর তার পিছনে ছুটে আসছে, আরো প্রায় সাত-আটটা ঘোড়া। পাহাড়ের স্তিমিত দীপালোকে অপরিসর পথখানিতে তরুণী অশ্বা-রোহিণীকে দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না! এতক্ষণ যেন একটা নিঃসাড় সাপের বুকের উপর দিয়ে প্রাণহীন অবস্থায় আসছিলাম; কিন্তু হঠাৎ এই বিস্ময় ও আনন্দের সংমিশ্রণে সমস্ত পথটা, সব অন্ধকার যেন এক মুহূর্ত্তে রমণীয় হ'য়ে উঠল।

ঘোড়াটী প্রায় কাছে এসে পড়াতে আমাদের পথ ছেড়ে দিতে হবে ভেবে মনটা একটু দমে গেল, কিন্তু তবুও অনিচ্ছাসত্ত্বেও পথ ছেড়ে দেবার জন্য আমাকে প্রস্তুত হ'তে হোল। শুধু মনে একটা আশা তখনও জেগে রইল যে, হয়ত শার্দ্দূল-শৃঙ্গে আবার দেখা হবে।

আমাদের বাঁ পাশে একটা বেতস বন এসে পড়েছে, তার পাতাগুলো মিট্‌মিটে আলোয় শির্ শির্ করছে।

মনে হোল, সারা বিশ্বের কম্পন যেন ঐখানেই কেন্দ্রীভূত হ'য়ে আছে। হঠাৎ পিছন হ'তে একটী মেয়েলি কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আমায় একটু পথ ছেড়ে দিন! সেই সাদা ঘোড়ার মেয়েটী! আমি অবাক্ হ'য়ে গেলাম, সে বাঙ্গালী! মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আপনি কি আমাদের চেয়ে আগে যেতে চান?

মেয়েটী হেসে বললে—আমি পিছনে থাকলে আপনাদেরই যেতে যে অসুবিধা হবে!

যাই হোক্ পথ ছেড়ে দিলাম। ঘোড়াটা আমাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। মেয়েটী যাবার সময় পিছন ফিরে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল। শার্দ্দূল-শৃঙ্গে পৌছবার পথে এইটুকু পাথেয়ই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

আমরা প্রায় সমতল হ'তে ন'হাজার ফুট উপরে উঠেছি। কাঞ্চনজঙ্ঘার খুব কাছে না হোক্ তবুও কাছেই বলতে হবে। কারণ এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে বেশ ভাল ভাবেই দেখা যায়। অতএব আমাদের খুবই শীত করা উচিত, কিন্তু পথশ্রমে কপাল ঘামে ভিজে উঠল, ছড়ির হাতলটা হাত থেকে খ'সে পড়ে যায়—এমনি পিছল হ'য়ে উঠল।

কিছুদূর হ'তে আবার একটা বিকট চীৎকার ভেসে এল, একটানা সুর, কোনোটা মোটা—কোনোটা সরু, আমি ত অবাক্। বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম—এটা কিসের শব্দ প্রবোধদা? প্রবোধদা উত্তর দিলে—আমাদের আগে যারা ডাণ্ডি চ'ড়ে গিয়েছে, সেই ডাণ্ডির ভুটিয়ারা গান ধরেছে! আমার ধারণা ছিল, আমরাই প্রথম দল, কিন্তু তা নয়।

দু'জনে আবার জোর কদমে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ভুটিয়া-বন্ধুদের একটানা গান আমার বেশ ভাল লাগছিল। সুরের গভীরত্ব আছে, যেন হিমালয়ের গভীর গহ্বর হ'তে ঐ স্বর বেরিয়ে আসছে বিপদ-সূচক সঙ্কেত ধ্বনির মত। প্রায় সাড়ে তিন মাইল পার হ'য়ে এসে একটী চওড়া রাস্তায় এসে পড়লাম। সেখানে আবার চাঁদের দেখা পেয়ে মন আনন্দে ভ'রে উঠল।

একটা বাঁকের মুখে এসে মনে হোল, আর পথ নেই। কিন্তু পথ আমাদের ভুলতে পারে নি। গাছের ফাঁক দিয়ে কোন রকমে জানিয়ে দিলে—আছি, আমি আছি! ঘন অন্ধকার, পথ এত সরু যে, দু'পাশের গাছগুলো প্রায় গায়ে ঠ্যাকে। বালি-মাটি এত পিছল যে, চড়াইয়ের মুখে উঠতে গিয়ে প্রায়ই পা হড়্কাবার সম্ভাবনা। মনে হোল এ-যেন আমাদের অমরাবতীতে পৌছবার অদ্ভুত কৃচ্ছ্রসাধন।

কিছুপরেই চোখে পড়ল একটা জল্ জলে আলো, আলোটা একটী মিনারে জ্বলছে। মিনারের খোলা ছাদটায় গুটিকয়েক লোক রয়েছে। আলোটা ছাদের নীচে থাকাতে লোকগুলোকে অন্ধকারে ছায়ার মত দেখাচ্ছে। আমরা ক্লান্তপদে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এসে মিনারের নীচেয় দাঁড়ালাম। আমার ব্যগ্র চোখ দু'টো কাকে যেন চারিধারে খুঁজতে লাগল। দেখলাম—কিছু দূরে সেই সাদা ঘোড়াটা ঘাড় নীচু ক'রে ঘাসগুলো শুঁকছে। মনে মনে একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। প্রবোধদা বললে—চল, ওপরে যাই, নীচে থেকে ভাল দেখা যাবে না।

আমি সাগ্রহে বললাম—হাঁ হাঁ, তাই চল। ভীড় জ'মে উঠলে দেখবার বড় অসুবিধা হবে।

যখন আমরা শার্দ্দূল-শৃঙ্গের মিনারে পৌছলাম তখন প্রায় সাড়ে চারটা। আমরা মিনারের খোলা ছাদে এসে দাঁড়ালাম। বেশ বোঝা গেল, অন্ধকার ফিকে হ'য়ে আসছে! দেখতে পেলাম আমার অদূরে সেই পথের মেয়েটী দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে উদাসভাবে চেয়ে রয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার সাদা চূড়োটা ক্রমে ক্রমে শিল্পীর তুলির রেখার ছবির মত ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। এমন সময় প্রবোধদা বললে—মাউণ্ট এভারেষ্ট দেখেছ, ঐ দেখ — তার রেখা দেখা যাচ্ছে।

আমি উৎসুকনেত্রে সেইদিকে চাইলাম। চেয়ে দেখলাম—আবছায়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা ধোঁয়াটে রংয়ের রেখা সামান্য ফুটে উঠেছে, বেশ ভাল ক'রে লক্ষ্য করলে তবে চোখে পড়ে। এদিকে চেয়ে

দেখলাম—মেয়েটীও মাউণ্ট এভারেষ্ট আবিষ্কারে সচেষ্ট। আমার পাশে একটী বাঙালী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আমরা যেদিকে তাকিয়ে রয়েছি সেইদিকে অনুসন্ধিৎসু নয়নে তাকিয়ে রয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি মাউণ্ট এভারেষ্ট দেখতে পেয়েছেন?

ভদ্রলোকটী হতাশার নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন—না, তবে চেষ্টা করছি।

কি জানি তাকে দেখাবার জন্ম আমার উৎসাহ অযাচিতভাবে বেড়ে উঠল। আমি এভারেষ্টের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললাম—ঠিক আমার আঙুলের দিকে সোজা চান। ঐ দেখুন—আব্‌ছায়া অন্ধকারে একটা মলিন রেখা দেখা যাচ্ছে, ঐটাই হোল মাউণ্ট এভারেষ্টের চুড়ো।

দেখলাম মেয়েটীও ঠিক ঐ দিকে লক্ষ্য করছে। পাশের লোকটী দেখতে পেয়েছে কিনা জানি না, মেয়েটী দেখতে পেয়েছে বুঝতে পারলাম।

ক্রমে ক্রমে অন্ধকার কেটে গেল। ধীরে ধীরে কাঞ্চনজঙ্ঘা সাদা হয়ে আসতে লাগল, মাঝে মাঝে ধূসরের ছায়া। বেশ বোঝা গেল তার সর্ব্বাঙ্গটা তুষারে ঢাকা, যেন একটা আইসক্রীমের স্তূপ, যেন একটা কয়লার পাহাড় একটুকরো অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ডে পরিণত হচ্ছে। আর দূরে মাউণ্ট এভারেষ্ট ঘন পাহাড়ের পাশ থেকে পিরামিড আকারে শুভ্রতা লাভ করছে।

যেখান হ'তে সূর্য্যোদয় হবে, সে স্থানটী বড় চমৎকার। দু'টী পাহাড়ের প্রান্ত ভাগ যেখানে সরল রেখায় উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত রয়েছে, ঠিক তা'রি ওপিট থেকে একটা ফিকে লাল আভা ফুটে বেরুচ্ছে, ক্রমে সেইটেই গাঢ়ত্ব লাভ ক'রে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব-সূচনা দিচ্ছে। তারই আর একপাশে সমতলের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে,—সাদা, কটা ও সবুজের পাশাপাশি প্রকাশ—মনে হয় যেন কোন চিত্রকর একখানি ছবি বিছিয়ে রেখেছেন কিংবা যেন সমুদ্র সামনে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ দৃশ্য না দেখলে এর সত্যকারের অনুভূতি লাভ করা যায় না।

কাঞ্চনজঙ্ঘাকে এবার সত্যই কাঞ্চনজঙ্ঘার আকারে দেখলাম। সূর্য্যোদয়ের লাল আভা তুষারের ওপর পড়ে সোনার বর্ণ ধারণ করেছে; খানিকটা সাদা, কিছু কিছু স্বর্ণাভ, বাকিটা ধূসর, মনে হোল যেন একটা গ্রহ নূতন জীবন লাভ করছে, আর আমরা যেন মান-মন্দিরে ব'সে তাই লক্ষ্য করছি। দু'খানা সাদা মেঘ কিছু দূরেই আমাদের পায়ের তলায় দু'টো পাহাড়ের বাঁকে বিচরণ করছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন একটা হিমানীর নদী পথ-শ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রাম করতে বসেছে।

উদয়-পর্ব্বতের ঠিক উপরে তিনটী রেখা দেখা গেল। এত উজ্জ্বল লাল, এত দীপ্র, এত জলজলে সে আলো যে তত উজ্জ্বল বর্ণ এর-পূর্ব্বে আমি আর কখনো দেখি নি। ক্রমে ক্রমে ভানুদেব দেখা দিলেন অনন্ত প্রভায়, বর্ণনাতীত বর্ণচ্ছটায়, আমি অবাক হ'য়ে তার দিকে চেয়ে মহাকবির কবিতা আবৃত্তি ক'রে ফেললাম—

ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক জয়!
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়
তোমারি হউক জয়!

সেখানে যত নর-নারী ছিল, সকলেই দেখি আমার মুখের পানে তাকাচ্ছে, সেই অপরিচিতা মেয়েটীও আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছে। আমি একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লাম। মেয়েটী খুব সহজ ও ধীর কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি বুঝি কবি?

আমি বললাম—না, কবি নই, তবে কবিতা ভালবাসি।

সে আবার ঘাড় ফিরিয়ে সূর্য্যোদয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। একদিকে রূপ, অপর দিকে রূপা; এই রূপ ও রূপার সঙ্গমে মুক্তি স্নান ক'রে আমার জীবন সার্থক হোল।

ফেরবার পথে কেবলই মনে পড়ছে—
ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক জয়।

অরুণোদয়

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

সে দিন ছিল শনিবার। বীরেনের আপিস সকাল সকাল বন্ধ হইবার পরেই সে বাড়ীর সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক ঘুরাঘুরির পর সেই পাড়াতেই বাড়ী একখানি পাওয়া গেল। দোতলায় দু'খানি ঘর। ভাড়া মাত্র দশ টাকা। এত সস্তায় বাড়ী পাইবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। তাই বাড়ী পাইয়া খুশী মনেই সে বাড়ী ফিরিল। ঘরে ঢুকিয়াই সস্তা এই বাড়ীখানার কথা বোধকরি সে নারায়ণীকে বলিতে যাইতেছিল। এমন সময় নারায়ণী নিজেই বলিয়া উঠিল, 'বাড়ী দেখ্‌লে?'

নারায়ণী সহজে এ বাড়ী ছাড়িতে চাহিবে না বীরেন তাহাই জানিত, কাজেই তাহার মুখে বাড়ীর কথা শুনিয়া বীরেনের একটুখানি বিস্মিত হইবারই কথা। বলিল, 'কেন বল দেখি?'

নারায়ণী বলিল, 'কালই চল। মা আমায় আজ ওদের সামনে বড় অপমান করেছেন।'

নারায়ণীর গলার আওয়াজ ভারি। চোখ দুইটা ছল্ ছল্ করিতেছে।

বীরেন খুশী হইয়া বলিল, 'ভাখো, বলেছিলাম কি না!'

নারায়ণী চুপ করিয়া রহিল।

বীরেন বলিল, 'বাড়ী ঠিক ক'রে এসেছি। এর চেয়ে ভাল বাড়ী। কাল সকালেই উঠে যাব।'

নারায়ণী বলিল, 'কিন্তু এ হাঙ্গামা তুমিই ত' করলে। কী দরকার ছিল তোমার বাড়ীর কথা বলবার। ছেলেকে ভালোবাসলেই যে বাড়ীখানা লিখে দিতে হবে তার কি মানে!'

বীরেনও চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। অন্যায় হয় ত' সত্যই হইয়াছে।

যাই হোক্, পরদিন সকালেই বীরেনের জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা সুরু হইয়া গেল।

বীণা বলিল, 'এরকম ঝগড়া ক'রে উঠে যাওয়াটা কি ভাল হচ্ছে দিদি?'

নারায়ণী বলিল, 'বেশ ছিলাম ভাই, কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়ে কি যে হয়ে গেল......আর আমাদের এখানে থাকা চলে না।'

বীণা বলিল, 'তবে কি আমরা আসার জন্যেই এইটি হ'লো দিদি!'

নারায়ণী বলিল, 'না ভাই, হ'লো আমার ওই বরটির জন্যেই। উনি বলতে আরম্ভ করলেন—মাগী ভালোই যখন বাসে তখন দিক্‌না বাড়ীখানা আমার ছেলের নামে লিখে। এই হ'লো যত নষ্টের মূল।'

বীণা বলিল, 'কিন্তু দিদি, মনে থাকে যেন পিন্টুলীর সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ের কথা তুমিই আগে বলেছ।'

নারায়ণী হাসিয়া বলিল, 'মেয়েটার জন্যে আমার মন কেমন করবে ভাই। কাছেই ত' যাচ্ছি, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এক-আধদিন বেড়াতে যাবে ত'?'

বীণা সে কথার জবাব না দিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'আচ্ছা ভাই, পরের ছেলেকে ভালো বাসা বোধহয় চলে না। ও যতই কেন না কর, পরের ছেলে পরই থেকে যায়। না?'

নারায়ণী বলিল, 'কি জানি ভাই, ওসব কথা কোনো দিন ভেবেও দেখি নি, কিছু জানিও না।'

বীণা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'আচ্ছা যাও ভাই। দু'দিনের জন্যে দেখা হয়েছিল, চিরকাল মনে থাকবে।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া বীণা আবার বলিল, 'আচ্ছা দিদি, এর পর যদি কোনও দুষ্টু লোক তোমায় কোনো দিন বলে, বীণা ব'লে যে মেয়েটার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল সে মেয়েটা ভারি দুষ্টু মেয়ে, ভাল মেয়ে মোটেই নয়, সেকথা কি তুমি বিশ্বাস করবে দিদি?'

একথা বলিবার কারণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নারায়ণী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

বীণা বলিল, 'হাসি নয় ভাই, দুনিয়ায় এমন লোকও ত' আছে, বল না তুমি বিশ্বাস করবে কি না?'

নারায়ণী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'কখ্খনো না। তাই আবার করে নাকি?'

বীণা বলিল, 'তাহ'লে যে ক'দিন আমাকে তুমি দেখেছ দিদি, তাতে তোমার এই ধারণাই হয়েছে যে, আমি খুব ভালো মেয়ে। কেমন?'

নারায়ণী বলিল, 'এ সব কথা কেন বলছ ভাই? তুমি খারাপ—কই একথা ত' আমি কোনো দিন ভাবিও নি।'

বীণা আর কোনও কথা না বলিয়া নারায়ণীর একখানি হাত ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে তাহার সেই সুন্দর মুখখানি উদ্ভাসিত করিয়া বড় সুন্দর হাসি হাসিতে লাগিল।

বীণাপাণির এই কথাগুলার অর্থ সেদিন কেহ বুঝিতে পারিল না সত্য, কিন্তু দিন কয়েক যাইতে না যাইতেই তাহার ভিতরের রহস্য জানিতে আর কাহারও বাকি রহিল না।

নারায়ণী ও দেবুকে লইয়া বীরেন বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যেদিন হইতে গিয়াছে সেইদিন হইতে মাসির যেন আর কোনও কিছুতেই স্বস্তি নাই। দিবারাত্রি শুধু দেবু আর দেবু! পিন্টুলীর সঙ্গে দেবুর গল্প তাহার যেন আর শেষ হইতেই চায় না। অথচ পিন্টুলী তাহার কিই-বা বুঝে!

তবু যাহোক্ পিন্টুলী আছে বলিয়া রক্ষা। সেও যদি না থাকিত মাসি তাহা হইলে কি যে করিত কে জানে।

বীণা সেদিন ছাদে গিয়াছিল কাপড় তুলিতে। মাসি তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিল, 'শোনো মা, বোসো এইখানে। দুটো কথা বলি।'

বীণার সঙ্গে কথা বলিবার সুযোগ পাওয়া বড় দায়। স্বামীর কাজকর্ম নাই। বাড়ী হইতে বাহির হওয়া আজকাল সে একরকম বন্ধই করিয়া দিয়াছে। সকাল বেলা বাজারে একবার না গেলে নয় বলিয়াই যায়। তাহার পর দুই স্বামী-স্ত্রীতে সারাদিন বসিয়া বসিয়া কেমন করিয়া যে সময় কাটায় কে জানে। পিন্টুলীকেও আজকাল তাহাদের কাছে ঘেঁসিতে দেয় না। যদি সে একবার নীচে নামে ত' আবার তৎক্ষণাৎ উপরে উঠিয়া আসিয়া বলে, 'আমায় তাড়িয়ে দিলে।'

মাসি বলিল, 'তোমার দেখা ত' আর পাবার জো নেই মা, দু'টিতে যেন মাণিকজোড়। দেখলে চোখ জুড়োয়। আর ওদের যদি দেখতে মা, ঝগড়া-ঝাঁটি দিনরাত লেগেই থাকতো। ছোঁড়াটা আসতো মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে আর বৌটার হ'তো কষ্ট। সুখে থাকতে ভূতে কিলোলো। কেন বাপু, বেশ ত' ছিলি, ভাড়া পর্য্যন্ত চাইতাম না, তা' না, ছেলেকে নিয়ে পন্ পন্ ক'রে রেগে বেরিয়ে গেল। এইবার মজাটি বুঝবে।'

কোন কথা না বলিয়া বীণা হাসিতে লাগিল।

মাসি বলিল, 'ছেলেটাকে ভালোবাসতাম, ছেলেটাও আমার কাছে থাকতে চাইতো, তা' ওদের আর সইলো না। বলে, বাড়ীটা লিখে দাও ছেলের নামে। থাম্— এরই মধ্যে আমি মরে যাই নি। মরবার আগে দিতাম কিনা দেখতিস্। তা' না, এখন থেকেই দাও—দাও— দাও—দাও! নে এইবার, কি নিবি নে, একূলও গেল ওকূলও গেল। গেল না? তুমি কি বল?'

বীণা এবারেও কোন কথা বলিল না। নীরবে শুধু তাহার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

মাসি তাহার কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে একবার নাড়িয়া দিয়া হাসিয়া বলিল, 'শুধু হাসি, শুধু হাসি! কথার জবাব দে না!'

বীণা বলিল, 'হাঁ মা, ওদের অন্যায় হয়েছে তা' ত' বুঝতেই পারছি!'

মাসি বলিল, 'না বাছা, তোমার মন পড়ে রয়েছে বরের কাছে, তুমি কি আর ভাল ক'রে কথা কইতে পারো! তোমায় মিছেই ডাকা!'

বীণা হাসিতে লাগিল।

মাসি কিন্তু থামিল না। বলিল, 'ছেলেটা যাবার সময় কেঁদে কেঁদে গেল আমি স্বচক্ষে দেখলাম। তার কি আর যাবার ইচ্ছে ছিল! জোর ক'রে নিয়ে গেল বই ত' নয়।......না বাছা, তুমি মনে করছ তোমার মেয়েকে আমি ভালোবাসব, না? আর নয় মা, ন্যাড়া বেলতলায় দশবার যায় না,—ওই একবারেই আমার শিক্ষে হ'য়ে গেল।'

বীণা এইবার কথা কহিল। বলিল, 'আমরা কিন্তু মেয়েকে আর নেবো না। আপনাকে জন্মের মত দিয়ে দিলাম।'

মাসি হাসিল। বলিল, 'ও কথা সবাই বলে মা, ওরাও বলেছিল।'

বীণা বলিল, 'আচ্ছা দেখবেন পরে। তখন বুঝতে পারবেন।'

মাসি ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল, 'না মা, খুব হয়েছে। আমিই যে আর কাউকে নেবো না। তাতে আমার যত কষ্টই হোক্। এই বাড়ীখানা আছে, সামান্য দু'চারটে পয়সা-কড়ি, দুটো সোনা-রূপোর গয়না-গাঁটি, যা' কিছু আছে, তারই লোভে মরবার সময় অনেকেই আসবে আমার সেবা করতে। যে করবে সে-ই নেবে মা। আমি আর এমন ক'রে ছেলে মানুষ ক'রে ঠকব না, তুমি দেখো।'

মাসির কথা বোধকরি ফুরাইতেই চাহিত না, যদি না নীচে হইতে মাধবের ডাক আসিত।

মাধব ডাকিল, 'কই গো, কাপড় তুলতে গিয়ে যে—

হাসিতে হাসিতে লজ্জায় একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়া বীণাপাণি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'দেখছ মা, আমার কি আর দু'দণ্ড বসবার জো আছে!'

এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া গেল।

পিণ্টুলী বসিয়া বসিয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল। বীণা চলিয়া যাইতেই মাসি তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'বরকে অমনি ভালোবাসতে হবে। শুধু বক্ বক্ ক'রে বকলে চলবে না, বুঝেছিস্ পিণ্টু?'

পিণ্টুলী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ। কিন্তু আমার বর যে চলে গেল, তার কি হবে?'

মাসি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তুই বড় হ', তারপর তুই নিজে গিয়ে ধ'রে আনবি। পারবি ত'?'

পিণ্টুলী বলিল, 'হাঁ, খুব পারব। এক্ষুনি পারি।'

'তা' তুমি পার মা।' বলিয়া মাসি হাসিতে লাগিল।

বেশি দিন নয়। দিন চার-পাঁচ পরের ঘটনা।

সকালে সেদিন ঘুম ভাঙিতেই মাসি নীচে নামিয়া আসিল। কাপড় কাচিবার জন্য ঠিক যে সময় সে রোজ নামে, সেদিনও ঠিক সেই সময়েই নামিয়াছিল। এত সকালে বীণার ঘরের দরজা কোনো দিনই খোলা থাকে না, সেদিন দেখিল, দরজা খোলা। তা' হইবে হয় ত', আজ তাহাদের সকালে-ঘুম ভাঙিয়াছে।

মাসি বলিল, 'কি গো, মেয়ের যে আজ খুব সকালে ঘুম ভেঙেছে!'

কিন্তু কথাটার কোন জবাব পাওয়া গেল না।

মাসি আবার বলিল, 'কি গো, সাড়া দিচ্ছ না যে?'

তবু নিরুত্তর।

মাসি ভাবিল, হয় ত' তাহারা আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কাপড় কাচিয়া ভিজা কাপড়েই মাসি উপরে উঠিয়া যাইতেছিল, কি ভাবিয়া খোলা দরজাটার ভিতর একবার তাকাইয়া দেখিল। কিন্তু এ কি! ঘরে জিনিসপত্র কিছুই নাই। ঘর ফাঁকা। তবে কি যে-ঘরটায় নারায়ণী ছিল সেই ঘরে উঠিয়া গেল নাকি? মাসি তাড়াতাড়ি সেই দিকে গিয়া দেখিল, না, সে-ঘরে সেদিন হইতে শিকলটা যেমন করিয়া তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এখনও তেমনি শিকল দেওয়া। তবু একবার শিকল খুলিয়া দরজা ঠেলিয়া ফাঁকা ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিল। কেহ কোথাও নাই। এ-ঘর দেখিল, ও-ঘর দেখিল, মানুষ ত' নাই-ই, এমন কি তাহাদের সংসারের সামান্য জিনিষ-পত্র যাহা কিছু ছিল তাহারও কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। আর-একটুখানি আগাইয়া সে সদর দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দরজা খোলা, হাঁ হাঁ করিতেছে। সর্ব্বনাশ! কাহাকেও কিছু না বলিয়া ইহারা দুই স্বামী-স্ত্রী গত রাত্রে চুরি করিয়া চুপি চুপি পলায়ন করিয়াছে। অথচ পিন্টুলী রহিয়াছে তাহার কাছে। রাত্রে রোজ যেমন সে তাহার কাছে শোয়, গত রাত্রেও তেমনি শুইয়াছিল। নীচে নামিয়া আসিবার আগেও সে তাহাকে তাহার বিছানার এক পাশে নির্ব্বিকার চিত্তে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া থাকিতে দেখিয়া আসিয়াছে।

মাসির মাথার ভিতরটা কেমন যেন ঘুরিতে লাগিল। এমন করিয়া তাহাদের পলাইবার হেতুটা সে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ভিজা কাপড়েই সদর দরজার কাছে সে কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া ভাবিতে ভাবিতে সে এক-পা এক-পা করিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

একরাশ ফুলের মত অমন সুন্দরী মেয়েটা তাহাদের এখনও ঠিক তেমনি করিয়াই ঘুমাইতেছে। ইহাকে ফেলিয়া তাহারা গেল কোথায়? এমন মেয়ে ছাড়িয়া কোন্ প্রাণে কেমন করিয়াই বা গেল, আর কেনই বা গেল তাহারা?

শুকনো একটা কাপড় পরিয়া ভিজা কাপড়টা রেলিং-এ মেলিয়া দিয়া মাসি একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

পিন্টুলী এখনও কিছুই জানে না। জাগিয়া উঠিয়া যখন দেখিবে তাহার মা, তাহার বাবা তাহাকে একা এই সদ্য-পরিচিতার কাছে ফেলিয়া দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তখন সে কি করিবে কে জানে। কি বলিয়াই বা তাহাকে বুঝাইবে, কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে মাসি ভাবিয়া কিছুই কূল-কিনারা পাইল না। তাহারা কে, কোথায় তাহাদের বাড়ী, কিছুই সে জানে না। পিন্টুলীও তাহা বলিতে পারিবে কি না সন্দেহ। হে ভগবান! এ কি কঠিন সমস্যায় তাহাকে ফেলিয়া দিলে!......

(ক্রমশঃ)
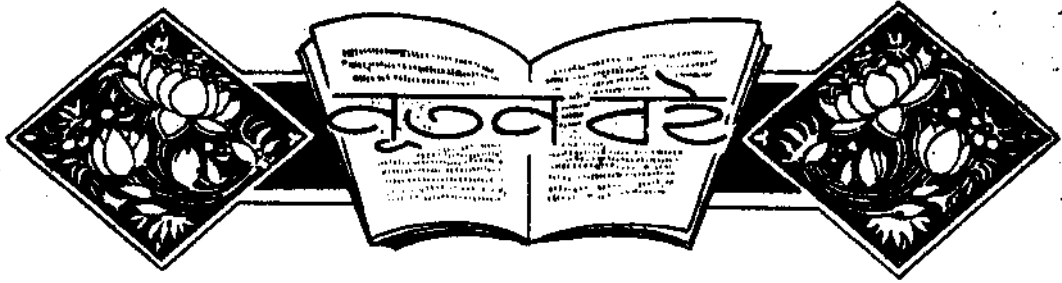
['উদ্বোধনে' সমালোচনার জন্ম গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

মার্কিন সমাজ ও সমস্যা—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম-এ (নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ-এস্-এ) প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রকুমার নাগ, পি-এইচ-বি (শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ-এস্-এ), কলিকাতা। মাস-পয়লা প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকার শিক্ষার জন্ম বহুকাল মার্কিন-মুলুকে বাস করিয়াছেন, পাশ্চাত্য বহু প্রদেশে পর্যটন করিয়াছেন — সে দেশের যে সকল অনাচার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহারই বিভীষিকাময় ছবি এ-গ্রন্থে আঁকিয়া আমাদের সাম্‌নে ধরিয়াছেন। এ ছবি মনগড়া নয়, কাল্পনিক নয়—সত্যের ফটোগ্রাফ। পরচর্চ্চার উদ্দেশ্যে বা বিদ্বেষের ভাবে এ-গ্রন্থ লেখা নয়। তাঁর রচনায় কোথাও ভাবাবেগ নাই, উচ্ছ্বাস নাই, অপরের প্রতি আক্রোশ নাই। রচনায় সর্ব্বত্র ধীরতা ও সংযম, বিচার ও যুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থকারের বক্তব্যের একটু পরিচয় দিই। তিনি দেখাইয়াছেন, "ধন-দেবতা আজ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি প্রসন্ন," কিন্তু সেজন্ম তাহার সমাজ-মঙ্গলকে অনেকখানি বলি দিতে হইয়াছে। লেখক দেখাইয়াছেন—নাচের নামে ইন্দ্রিয়-সাধনায় মার্কিন যুবক-যুবতী আজ প্রমত্ত; নাচের ঘরে অশ্লীলতার নগ্ন রঙ্গ; বেশ্যাবৃত্তি নাই— তথাপি নির্লজ্জ লাম্পট্যের কি প্রাচুর্য্য! Natural state বা চরম স্বাভাবিকতার নামে সেখানে চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা; পারিবারিক ও দাম্পত্য ব্যাপারে মার্কিনে প্রতি সাতটি বিবাহে একটি বিবাহ-বিচ্ছেদ সুনিশ্চিত; পরীক্ষা-বিবাহ এবং আসঙ্গ-বিবাহ অর্থাৎ যাহাকে লইয়া যতক্ষণ আনন্দ-উপভোগ চলে—পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই নব ব্যবস্থা — কিছুদিন প্রেম করিয়া আর কোন সন্ধান না রাখা; অনাথ অসহায় শিশু-পালনের জন্ম আশ্রমাদির সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে; অবৈধ প্রেমের প্রাবল্য; সে কারণে ভদ্র-সম্ভ্রান্ত গৃহে খুনোখুনি। নারীত্ব ও মাতৃত্ব আজ মুলুক ছাড়া হইয়াছে; ঘরে-বাহিরে স্বৈরিণীর প্রাদুর্ভাব। স্বামীর কোনো দাবী নাই স্ত্রীর উপর—স্ত্রীরও সেই অবস্থা, অথচ আরামে উভয়ের দিন চলিয়া যায়—কোনো অনুযোগ ওঠে না! সমাজের এই অবস্থা।

তারপর 'গণতন্ত্র'। চোর, নর-ঘাতকদের সংখ্যা মার্কিনে যত, এমন আর কোন দেশে নাই; মদের প্রচলন বন্ধ—সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে সারা মার্কিন জুড়িয়া যে-সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে, তাদের দৈনিক ঘুষের পরিমাণ প্রায় 'দশকোটি টাকা'! বিচারে আসামীরা প্রায় পায় মুক্তি— তাহাতে 'sporting public' বিপুল আনন্দ লাভ করে! চোর-ডাকাত সেদেশে বাহাদুর পুরুষ! যার সম্পত্তি চুরি যায়, সে 'fool'! জনসাধারণকে কিরূপে প্রতারিত ও বশীভূত করা যায়, সে সম্বন্ধে ধনিক-নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিক নেতাদের মধ্যে আলোচনা চলে। গণতন্ত্রের ভিত্তি—জনসাধারণের স্বার্থ। তাহা সর্ব্বদা উপেক্ষিত হইতেছে।

মার্কিন রাজনীতি। স্বার্থপর-সম্প্রদায়-বিশেষের দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত; মার্কিন ব্যবসায়ীরা এই স্বার্থপর-

সম্প্রদায়। নির্ব্বাচন-ব্যাপারে দুর্নীতি ও দুষ্ক্রিয়া একবারে চরমে ওঠে। উৎকোচে সরকারী কর্ম্মচারী ও জনসাধারণ একদম বশীভূত—বিরোধী দলের সঙ্গে দাঙ্গা-হাঙ্গামা খুন সেখানে নিত্যকার ঘটনা।

আইন। মদ্যপান আইনে নিষিদ্ধ। কাজেই অধিকাংশ পরিবারে রীতিমত মদ চোলাই হয়। পান ও বিক্রয়ের সুবিধা খুব। ঘরে তৈয়ারী এ মদ বিশ গুণ চড়া দামে বিকায়। এ ব্যাপারে লুকোচুরি নাই—সকলেই তাহা জানে।

তারপর মার্কিন জাতির উদার brotherhood বা ভ্রাতৃত্বের প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন,—আমেরিকার বাণী—It is an inexorable law of progress that inferior races (non-white peoples) are made for the purpose of serving the superior and if they refuse to serve, they are fatally condemned to disappear. মার্কিন ভ্রাতৃত্বের এমনি মহিমা যে, Lynching-এর ন্যায় নির্লজ্জ বর্ব্বর প্রথা এই দেশেই শুধু প্রচলিত! Lynching-এর অর্থ, "জাতি-বিদ্বেষের কাঠগড়ায় নিগ্রো বলি।" তার উপর অভিনব ঔপনিবেশিক আইনের প্রভাবে এশিয়াবাসী ছাত্রদল সেখানে কোনো রকমের অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে না। মার্কিন-বাসী হিন্দুদিগণের প্রতি মার্কিন জাতির বিদ্বেষ দানবীয়। মার্কিনের এই পরিচয়—বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার এই "খোলস-ছেঁড়া" বীভৎস-মূর্ত্তি, গ্রন্থকার সত্যের বর্ণে আঁকিয়া আমাদের সামনে ধরিয়াছেন। যে সব লোক গর্ব্বে অভিমানে নিজেদের প্রগতির দূত ভাবিয়া মার্কিনের আদর্শ দেশের সামনে ধরিতে ব্যাকুল, এ গ্রন্থপাঠে তাঁদের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘুচিবে এবং দেশের আপামর-সাধারণ এ সভ্যতার সঠিক পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হইবেন। গ্রন্থকারকে তাঁর এ সাধু প্রচেষ্টার জন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দক্ষিণ আফ্রিকা দৌত্য-কাহিনী—

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত এবং শ্রীনিখিলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক ২০নং সুরি লেন হইতে প্রকাশিত—মূল্য ৫০ আনা।

স্যর দেবপ্রসাদ এ গ্রন্থে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানকার ঔপনিবেশিক ভারতবাসী-বৃন্দের দুর্দ্দশার করুণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক কাহিনীর অবতারণা করা।

ঔপনিবেশিক ভারতবাসীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা স্মরণ ক'রে ভারত সরকারের কাছে এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। তার ফলে ১৯২৫ সালে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এক ডেপুটেশন পাঠান হয়। তদুপলক্ষে মিঃ প্যাডিসন, সৈয়দ রেজা আলি ও সেক্রেটারী মিঃ বাজপাই দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রা করেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতবাসিগণ এ কমিশনে সন্তুষ্ট না হ'য়ে একজন হিন্দু-সভ্য পাঠাবার অনুরোধ জানায় এবং ডেপুটেশনের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে না দেখে লর্ড রিডিং স্যর দেবপ্রসাদকে এই ডেপুটেশনের অন্যতম হিন্দু-সভ্য নিযুক্ত করেন। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর গবেষণার অনেক তথ্যই লিপিবদ্ধ হয়েছে।

লাঞ্ছিত ভারতবাসীর পরিশ্রমের ফল বুয়র ও অন্যান্য শ্বেত জাতি দক্ষিণ আফ্রিকায় আজ নিরাপদে উপভোগ করছে, অথচ সেই ভারতবাসীই প্রতিদিন দারুণ অত্যাচারে নির্য্যাতিত হ'চ্ছে। পুস্তকের সর্ব্বত্র দক্ষিণ আফ্রিকার এই লাঞ্ছিত ভারতবাসিগণের দুর্দ্দশার করুণ-কাহিনীই অতি নিপুণ-ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। অবস্থা এখনও পূর্ব্বের মতো রয়েছে—কেন না ডেপুটেশনের সমস্ত সিদ্ধান্ত এখন পর্য্যন্তও বিচারাধীন। কত দিনে যে এর নিষ্পত্তি হ'বে তা বলা যায় না।

তা ছাড়া গ্রন্থখানি ভ্রমণ কাহিনী হিসেবেও যে সাধারণের সম্পূর্ণ উপভোগ্য হ'বে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। পাঠকেরা দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যই এ গ্রন্থ হ'তে জানতে পারবেন।

শ্রীবিমলেন্দু কয়াল

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

বোধহয় সকলেই জানেন যে, ইংরেজী ভাষায় অসংখ্য শিকারের বই আছে। এ সাহিত্য যেমন বিপুল, তেমনি বিচিত্র। কারণ যাঁরা শিকার করেন, তাঁরা যখন বন্দুক ছেড়ে কলম ধরেন, তখন তাঁরা বাঘ-ভালুকের সুধু বর্ণনা করেই নিরস্ত হন না। মানুষের যেমন আমরা psychology লিখি, ethics লিখি, তাঁরাও তেমনি বন্য জন্তুদের মনস্তত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা করেন। জানোয়ারদের মধ্যেও যে 'হরিজন' আছে, সে জ্ঞান আমাদের ছিল না। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, বন্যজন্তুদের ভিতর fraternity না থাক, equality আছে। কিন্তু শুনছি এদের ভিতর Hyena নাকি অস্পৃশ্য। তার চেহারা যেমন বীভৎস, তার চরিত্রও নাকি তেমনি কুৎসিত। তবে liberty এদের মধ্যে সর্ব্বসাধারণ। জানোয়ারদের ভিতর মেয়ে-পুরুষ দুই সমান স্বাধীন। Female emancipation-এর সমস্যা এদের নেই। সুতরাং এ সাহিত্য আমাদের একটা নতুন প্রাণী-জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

কিন্তু এ আরণ্যক শাস্ত্র আমার প্রিয় নয়, অতএব পরিচিতও নয়। এরকম শাস্ত্রে বানপ্রস্থ, মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণিত বানপ্রস্থ নয়। আমরা বলি "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ", কিন্তু শিকারীদের বানপ্রস্থ যৌবনেই করতে হয়। কারণ নখী-দন্তীদের সংহার করতে হলে, সেই বয়েসেই বনে যাওয়া কর্ত্তব্য, যে বয়েসে মানুষে নিজে গলিতনখদন্ত হয়নি। কেননা শিকার একরকম সৌখীন যুদ্ধ। শিকার 'ওরফে' মৃগয়া যে ক্ষাত্রধর্ম্ম, এ কথা আমাদের শাস্ত্রেও বলে।

শিকার করতে আমরা সকলে ভাল না বাসলেও, নানা জীবজন্তুর রূপ দেখ্‌তে ও গুনাগুণ শুনতে আমরা সকলেই ভালবাসি। তাদের রূপ দেখ্‌তে যে আমরা ভালবাসি, তার প্রমাণ Zoo-তে গেলেই পাবেন। সেখানে যখনি যান, দেখ্‌তে পাবেন যে, উক্ত উদ্যানে জানোয়ারের চাইতে মানুষ নামক জীবের সংখ্যা ঢের বেশি। আর তারা সব ছোট ছেলে নয়। তাদের মধ্যে অনেক বয়স্ক লোকও দেখা যায়। বছর পঁচিশেক আগে আমি একদিন Zoo-তে গিয়ে দেখি যে, সেকালের বঙ্গের জনৈক কংগ্রেস leader একটি বৃদ্ধ মুখপোড়া হনুমানের সঙ্গে নর্ম্মালাপ করছেন। আমি একটু দূরে থেকে শুনলুম যে, তিনি বানর-প্রবরকে ইংরেজী ভাষায় জিজ্ঞাসা করছেন — "How is your brother Mr.··· ?" যে ভদ্রলোকের শারীরিক কুশলের প্রশ্ন করলেন, তিনি ছিলেন একজন ধ্যাড়্‌ধামা বাঙালী কংগ্রেস নেতা। এ ঘটনার উল্লেখ করলুম এই দেখাবার জন্য যে, ছেলেমানুষী সুধু ছোট ছেলেদের ধর্ম্ম নয়, বড় লোকের ভিতরও তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আর জন্তু-জানোয়ারের চরিত্রসম্বন্ধে যে আমাদের

কৌতুহল সনাতন, তার প্রমাণ পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি গল্পসাহিত্য। আমি এ-সব গল্প পড়্‌তে আজও ভালবাসি। এর কারণ, পঞ্চতন্ত্রের জন্তু-জানোয়াররা কথা কয়—আর শিকার-কাহিনীর বাঘ-ভালুক সব নীরব। Pictures-এর চাইতে talkie কার না অধিক প্রিয়?

৩

প্রবাদ এই যে, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি বই সেকালের রাজপুত্রদের political philosophy শেখাবার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সেকালে রাজধর্মের সঙ্গে পশুধর্মের কি নাড়ীর যোগ ছিল, তা আমাদের কাছে একটা রহস্য। আর আমরা যখন রাজপুত্র নই, তখন জন্তু-জানোয়ারের কাছ থেকে কোনরূপ political philosophy শেখবার আমাদের লোভও নেই, প্রয়োজনও নেই।

একালের শিকার-সাহিত্য থেকে কোনরূপ ফিলজফি উদ্ধার করা যায় না, কারণ শিকারীরা আর যাই হ'ন—ফিলজফার নন। কিন্তু যে-সব জন্তু জানোয়ার "red in tooth and claw", তাদের কাছ থেকে একটা বড় সত্য Darwin উদ্ধার করেছেন। তিনি বলেন, জীবনের ধর্মই হচ্ছে struggle for existence—অর্থাৎ দিবারাত্র পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করা। এবং এই কথাই হয়েছে এ যুগের পলিটিক্‌স্ ও ইকনমিক্‌সের মূলকথা; আর এ ফিলজফির টীকাভাষ্য করছেন এ যুগের মিরীহ পণ্ডিতের দল। বনের পশুরা কি খেয়ে বাঁচে, তা জানবার শিকারীদের দরকার নেই; কিন্তু তারা যে গুলি খেয়ে মরে, এটা তাঁরা সকলেই জানেন। তবে পশুরা যদি conference করতে জানত, তাহলে তারা নিশ্চয়ই শিকারীদের disarmament-এর প্রস্তাব করত; এবং সে প্রস্তাব আমাদের মত সাহিত্যিকের দল নিশ্চয়ই অনুমোদন করতেন। যদিচ শিকারীদের মধ্যেও সাহিত্যিক আছেন—অর্থাৎ তাঁরা, যাঁরা শিকার-কাহিনী লেখেন এবং লোকে তা পড়েও। আর এই শিকারী সাহিত্যিকরা নিশ্চয়ই বলতেন যে, হে শ্বাপদকুল! আগে তোমরা তোমাদের নখ উপ্‌ড়ে ও দাঁত তুলে ফেল, তারপর আমরা বন্দুক ছাড়্‌ব। এ কথা শুনে পশুরা নিরুত্তর হয়ে যেত। কেননা, তাদের সমাজে Dentist-ও নেই, নাপিতও নেই।

৪

হঠাৎ এ-সব কথা তোলবার কারণ আমার কিছু আছে। সেদিন একখানি চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে শিকারের বইয়ের সাক্ষাৎ পেয়ে, তার পাতা ওল্টাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। বইখানির কাগজ দামী ও ছাপা চমৎকার, আর সেখানি খুলে দেখি যে তার ছবি আরও চমৎকার।

ছবিগুলি সব আলোকচিত্র, ইংরেজীতে যাকে বলে ফোটোগ্রাফ। আর তার প্রতি ছবিটিই নয়নমুগ্ধকর। এ পুস্তককে শিকারের বই না বলে, ছবির বই-ই বলা উচিত। ফোটোগ্রাফও যে আর্ট হয়ে উঠেছে, এই ছবিগুলি তার প্রমাণ। অথচ এগুলি কাদের ছবি? না বাঘ, ভালুক, সাপের। এই সব ছবি দেখবার লোভেই আমি এই বইয়ের পাতা ওল্টাই এবং সেই সূত্রে দু-চার পাতা পড়িও। বেশি যে পড়িনি তার কারণ, এর লেখক যথার্থ লেখক নন্। তাঁর লেখার ভিতর সাহিত্যের মালমসলা সবই আছে; তা-হলেও সে-সবকে মিলিয়ে তিনি মুখরোচক সাহিত্য বানাতে পারেন নি। সে যাই হোক, এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে—

"It is an attempt to take the mind of the ordinary reader for a short time at least away from the constant worries of modern life, away from international politics and economic crises, away from the slogans of communism, socialism, swaraj and self-determination."

এ বই পড়ে যদি দুদণ্ডের জন্যও এ-সব ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহলে শিকারী সাহেবের এ বই লেখা সার্থক হয়েছে।

৫

যে-সব বিষয় নিয়ে ইউরোপের মন আজ বিক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্ত হয়েছে, সে-সব বিষয়ে বৃথা চিন্তার হাত থেকে আমরাও রেহাই পাইনে। কালাপানীর ও-পারের কথা আজ এ-পারের কথাও হয়ে উঠেছে।

ধরুন এই economic crisis-এর কথা। পৃথিবী জুড়ে যে আজ টাকার দুর্ভিক্ষ হয়েছে, দুনিয়ার এ দুরবস্থার কথা আমাদের বই পড়ে শিখ্‌তে হয় না, ট্যাঁকে হাত দিলেই টের পাওয়া যায়। এ ফাঁড়া যে কি করে কাটিয়ে ওঠা যায়, সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত শুনতে আমরাও বাধ্য। বিশেষতঃ যখন সে-সব মতানুসারে আমরা চলতে বাধ্য নই। কারণ, আমাদের এ বিপদের স্রোত উজিয়ে যাবার সাধ্য নেই, আমরা শুধু স্রোতে ভেসে যেতেই পারি।

গত যুগের ইকনমিক্‌সের একটা মস্ত কথা হচ্ছে Laissez faire, অর্থাৎ বাঙলায় যাকে বলে, "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও"। অর্থাৎ কোন দেশেরই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইকনমিক্‌সের হালচালের উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বিংশ শতাব্দীর ইকনমিক্ শাস্ত্রে এ-কথা একদম বাতিল হয়ে গিয়েছে। আজকের দিনের প্রধান কথা হচ্ছে regulation। এক কথায়, প্রতিদেশের গভর্ণমেণ্টকে ইকনমিক্ জগতের বিধাতা হতে হবে; এখন প্রতি দেশই নিজের দেশের টাকার ও মালের নৈসর্গিক গতিবিধির মোড় ফেরাতে চাচ্ছেন। আপ্‌শোষের কথা এই যে, এক দেশের গভর্ণমেণ্ট যে পথে যেতে চান, আর এক দেশের গভর্ণমেণ্ট বলেন সেটা বিপথ। পরস্পরের মতামতে কাটাকাটি গিয়ে যোগফল শেষটা দাঁড়াচ্ছে শূন্য,—অর্থাৎ নানা গভর্ণমেণ্টের Laissez faire। বর্ত্তমান ইকনমিক্ সমস্যা হচ্ছে international সমস্যা, অথচ প্রতি দেশই তার national মীমাংসা করতে চাচ্ছেন। সুতরাং সব মীমাংসা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

৬

এই সব প্রয়াসের ব্যর্থতা থেকেই, international politics-এর কথা অনেকের মনে হয়েছে। এবং ইউরোপের বহু মনীষী লোক একটি World State-এর কল্পনা করছেন। অনেকে আশা করেছিলেন যে, League of Nations সর্ব্বপ্রকার আন্তর্জাতিক বিরোধের একটা আপোষ মীমাংসা করে দেবে। কিন্তু ফলে তা হয়নি; হবার কথাও নয়। পৃথিবীতে বহু খণ্ড খণ্ড Nation-কে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করে international গভর্ণমেণ্টের সৃষ্টি করা যায় না। কেননা পৃথিবীতে যত Nation আছে ও জন্মাচ্ছে, সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান; অন্ততঃ স্বাধীন হলেই প্রতি জাতের প্রাধান্যের লোভ বাড়ে। আর প্রতি জাতই যদি ধরে নেন্ যে, পৃথিবীর ইকনমিক্‌স্ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই প্রাধান্য লাভ হচ্ছে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র ফল, তাহলে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিরোধ যে বেড়েই চলবে, সে ত ধরা কথা। যে Wilson সাহেব League of Nations-এর প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাঁরই আর একটি কথা self-determination, International Politics-এর প্রধান অন্তরায়। এ শুধু ইউরোপের কথা নয়। এসিয়ার অন্তর্ভূত নকল ইউরোপ, জাপানেরও কথা। এই সেদিনই জাপান "যুদ্ধং দেহি" বলে League of Nations-এর এক যুগ-ব্যাপী আলোচনার ব্যর্থতা প্রমাণ করে দিয়েছে। পৃথিবীতে বহু রাজা থাকার ফলে যে বর্ত্তমান অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা এখন অস্বীকার করা কঠিন। এই কারণেই ইউরোপে অনেকে আজ পৃথিবীকে একক্ষেত্র করবার কল্পনা করছেন; আর সে এক ক্ষেত্র তাঁদের মতে হবে শ্রীক্ষেত্র, অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলেই গ্রাহ্য হবে। এ ধর্ম্ম যে শিকারী সাহেবের মনের সোয়াস্তি নষ্ট করবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

৭

এখন এই World State বস্তুটি কি? এ বস্তু যে পৃথিবীতে নেই, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য; আর সম্ভবতঃ সত্য যুগেও ছিল না,—কিন্তু ভবিষ্যতে হবে। পৃথিবীর নানা State কে জোড়াতাড়া দিয়ে এক ষ্টেট হবে, না মানুষের মন থেকেই এ ষ্টেট বেরিয়ে আসবে—যাঁরা মনে মনে এ ষ্টেট গড়ছেন, তাঁদের কথা শুনে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। বিলাতের একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক—H. G. Wells, সম্প্রতি এই World State আমাদের চোখের সুমুখে খাড়া করেছেন। এঁর The Shape of Things to Come-নামক সদ্য প্রকাশিত পুস্তকখানি, এই World State-এর আবাহন মাত্র।

লেখক একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, সমাজ-সংস্কারক এবং ঔপন্যাসিক। খৃষ্টানরা যাকে বলে, একে তিন, আর তিনে এক — সাহিত্যিক হিসেবে Wells তাই। সুতরাং এ পুস্তকখানি একাধারে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কাব্য। এর কারণ তিনি লিখেছেন ভবিষ্যতের ইতিহাস, সন-তারিখ সম্বলিত; এবং ভবিষ্যতে যে-সব বই লেখা হবে, তার থেকে অনেক মতামত উদ্ধৃত করেছেন। ভবিষ্যতের ইতিহাস যে লেখা যায় না, এমন কথা আমি বলি নে; কারণ তাহলে অতীতের ইতিহাসও লেখা যায় না। অতীতের ইতিহাস সব একরকম উপন্যাস; আর ভবিষ্যতের ইতিহাসও যদি সেই শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে দুই সমান বিশ্বাসযোগ্য। তবে এই বিলেতি ভবিষ্যপুরাণ, আমাদের "ভবিষ্য-পুরাণের" সগোত্র।

তবে এ ইতিহাস পড়ে মনে কোনরূপ আশার সঞ্চার হয় না; কারণ Wells বলেন যে, পৃথিবী একক্ষেত্র হবার পূর্ব্বে আর একবার তা কুরুক্ষেত্র হবে। অর্থাৎ মানব সমাজের একবার মহাপ্রলয় হবে, তারপর নতুন সমাজের সৃষ্টি হবে। আমরা এই প্রলয়কে যাদৃশ ভয় করি, অজানা নতুন সৃষ্টির উপর তাদৃশ ভরসা রাখ্‌তে পারিনে। সংক্ষেপে এ বইয়ের সার কথা এই যে, মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা অচল—সুতরাং এ-সমাজের একটা মহাপরিবর্ত্তন ঘটা প্রয়োজন, অতএব অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্ত্তনের যে প্রয়োজন আছে, সে কথা আমরাও জানি; তবে সে প্রয়োজন যে অবশ্যম্ভাবী, সে কথা আমরা মানিনে।

৮

অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, আমরা যখন আদার ব্যাপারী, তখন আমাদের জাহাজের খবরে দরকার কি?—দরকার এই যে, আমরা আদার ব্যাপারী হলেও, জাহাজের খোঁজ করতে বাধ্য। কারণ মানব-সমাজ-তরী এখন মহা ঝড়ে পড়েছে, সুতরাং তা মাঝ-দরিয়ায় ভরাডুবি হবে, কিম্বা শেষটা কূল পাবে, এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অদম্য এবং স্বার্থও জড়িত। ভারতবর্ষ এখন ইউরোপের সমাজ-তরীর ল্যাং-বোট। World State প্রভৃতির কল্পনা একটা New World-এর কল্পনা—আর সেই New World-এ আমরা সকলেই আশ্রয় পাব আশা করি। এ আশার কোনও মূল আছে কিনা, সে প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। কারণ কোন্ আশাই বা সমূলক?—অথচ আশাই হচ্ছে আমাদের জীবনের একমাত্র সম্বল। আজকের দিন যে পৃথিবীর অতি দুর্দ্দিন, সে বিষয়ে ইউরোপের মাথাওয়ালা লোকেরা প্রায় সকলেই একমত।

যাঁরা আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত, তাঁরা জানেন যে, Wells এবং Bernard Shaw-র মতেরও মিল নেই, মনেরও মিল নেই; যদিচ দু'জনেই বড় লেখক ও দু'জনেই Socialist। ফলে Shaw ফাঁক পেলেই Wells-কে বিদ্রূপ করেন, এবং Wells ফাঁক পেলেই Shaw-র উপর ঝাল ঝাড়েন। কিন্তু আমরা দূর থেকে দেখ্‌তে পাই যে, উভয়ের মতের মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক নেই। Shaw-র নতুন বইয়ের নাম—"The Political Madhouse in America and Nearer Home." Wells যাকে বলেন মহারণ্য, Shaw তাকে বলেন পাগলা গারদ। আর

আমাদের সমাজ একাধারে অরণ্য ও পাগলা গারদ। এ বিষয়ে আর বেশি বাক্যব্যয় করব না, কেননা তাহলে হয় অরণ্যে রোদন করব, নয় প্রলাপ বকব—অথবা একসঙ্গে দুই।

৯

এখন বাইরের কথা ছেড়ে ঘরের কথায় ফিরে আসা যাক্। উক্ত শিকারী সাহেব বলেছেন যে, বাঘ-ভালুকের রূপগুণের কথায় মনোনিবেশ করলে মন থেকে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও স্বরাজের ভাবনা দূর হয়। স্বরাজের কথা অবশ্য আমাদের ঘরের কথা; কেননা এ হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষের কথা, আর বাঙলাও ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী। সুতরাং এ ভাবনা আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর ভাবতে বাধ্য। বাধ্য বলছি এই জন্য যে, আমরা চাই আর না চাই, বাঙলা ইংরেজী দৈনিক পত্র প্রতি সকালে তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। আর সংবাদপত্রের সত্য-মিথ্যে সংবাদের ধার না ধারা আমাদের পক্ষে অসাধ্য; যদিচ আমরা কেউ কেউ মনে করি যে, সংবাদপত্র এ-যুগের কুশিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়। তবুও আমরা সকলেই এ বিদ্যালয়ের ছাত্র। ঘুম থেকে উঠে এক পেয়ালা চা গলাধঃকরণ না করলে আমাদের ঘুম ভাঙ্গে না; আর দৈনিক সংবাদপত্র হচ্ছে চায়ের সাহিত্য।

এখন এই স্বরাজ কথাটার নাম সকলেই জানেন, কিন্তু রূপ কারো কাছেই স্পষ্ট নয়। মানুষে একটা নাম পেলে, আর তার রূপ কল্পনা করতে চায় না। এ হচ্ছে মানসিক economy-র একটি বিশেষ ধর্ম।

এই স্বরাজ কথাটা এ দেশের একটা পুরোনো কথা। সংস্কৃত শাস্ত্রেও এ কথাটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু সে অন্যসূত্রে। কথাটি সেকালে ছিল ধর্মের কথা,—একালে হয়েছে পলিটিক্সের। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত 'স্ব' বলতে ব্যক্তিবিশেষ বোঝাত। তাই "বেদান্তেষু যম আহু একপুরুষম্", তাঁকেই শ্রীমদ্ভাগবৎ বলেছেন "স্বরাট্"। এ স্বরাজ্য যে আমরা কেউ লাভ করতে চাই নে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

১০

পলিটিক্সে স্বরাজ কথার প্রথম আমদানি করেন দাদাভাই নওরোজি, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে। তখন তাঁর কথার অর্থ আমরা স্পষ্টই বুঝেছিলুম; কেননা কথাটি তখন ছিল Dominion Status-এর দেশী তরজমা মাত্র।

তারপর ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর ধরে এ কথাটার যে মুখে মুখে কতরকম অর্থ করা হয়েছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। আর পলিটিসিয়ানরা নিত্য তার নতুন নতুন মূর্তি গড়ছেন। পলিটিসিয়ানদের হাতে স্বরাজ এখন যুগপৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের বস্তু হয়েছে,—হয়নি শুধু স্থিতির। অতঃপর বিলেতের পলিটিসিয়ানরা আমাদের স্বরাজের একটা একমেটেগোছের মূর্তি করেছেন। সে মূর্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে White Paper-এ। সে মূর্তি দেখে Churchill প্রমুখ রাজপুরুষরা মনে মনে প্রমাদ গণছেন। তাঁরা বলেন, এ White Paper-এ বানান ভুল দেদার; তাই বিলেতের পলিটিকাল পণ্ডিতেরা সভা করে তার প্রুফ সংশোধন করছেন। Churchill বলেন, তোমরা যা' দিতে চাও তা স্বরাজ নয় "ষরাজ"।

এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই, কারণ আমিও যা লিখি, অপরে তার বানান শুধ্রে দেয়।

এ স্থলে আমি শুধু একটি কথা বলব। আমরা যা' চাচ্ছি, তা হচ্ছে Parliamentary Democracy। এ বস্তুর জন্ম বিলেতে; ইউরোপের অন্যান্য দেশ আজ শ'খানেক বৎসর ধরে, এ বস্তুকে স্বদেশে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আজকের দিনে Parliamentary Democracy-কে কেউ কি আর মহাবস্তু বলে মনে করে? Russia, Italy ও নব জার্মাণী যে করে না, তা ত প্রত্যক্ষ। আর ইংলণ্ড, ফ্রান্সের লোক যে এতে বিশ্বাস হারিয়েছে, তার প্রমাণ তিনিই পাবেন, যিনি আধুনিক ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের চর্চা করবেন। তবে অবশ্য

আমাদের আদর্শ হচ্ছে ইউরোপের ছাড়া কাপড় পরা।

১১

Parliamentary Democracy এখন ইউরোপে গ্রাহ্য নয় বলে যে আমাদের আকাঙ্ক্ষার ধন হতে পারে না, এমন কথা তিনিই বল্‌তে পারেন, যাঁর বিশ্বাস ভারতবর্ষের ইতিহাস বিলেতের ইতিহাসের মাছিমারা নকল হতে বাধ্য। ইউরোপ যখন লাফাবে বা ডিগবাজী খাবে, তখন ভারতবর্ষকেও লাফাতে কিম্বা ডিগবাজী খেতে হবে। অর্থাৎ আমাদেরও ঘড়ি-ঘড়ি মত ও পথ বদলাতে হবে। আমি অবশ্য বিলেত ও ভারতবর্ষকে একদেশ মনে করিনে। সুতরাং আমার মনে হয় যে, Parliamentary Democracy-ই এ-যুগে আমাদের একমাত্র আদর্শ হতে পারে। Communism, Fascicism প্রভৃতি ইউরোপে যে-সব নব-ism বেরিয়েছে, যাঁরা নিজের দেশকে বিলেতি চশমা দিয়ে দেখেন, তাঁরাই শুধু সে-সব ism-এর একটা না একটাকে নেক-নজরে দেখেন। তাঁরা ভুলে যান যে, ইউরোপে যে যে দেশে যে যে নতুন ism-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সে-সব, দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা থেকে স্বভাবতঃ জন্মলাভ করেছে।

Parliamentary Democracy-র অনেক দোষ থাক্‌তে পারে, কিন্তু এর পিছনে যে ফিলজফি আছে, সে ফিলজফি সাধারণ মানবের মনে ধরে। আজকাল যে Parliamentary Democracy-র উপর লোকে বিশ্বাস হারাচ্ছে তার কারণ, এর ফলে অনেক economic সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যার মীমাংসা Parliament করতে পারছে না। এই কারণেই Wells World-State-এর কল্পনা করছেন, আর Shaw আমেরিকা ও ইংলণ্ডকে Mad-house বলছেন। এঁদের উভয়েরই জল্পনা কল্পনা বর্ত্তমান ইকনমিক অবনতির ফল। এঁরা উভয়েই ইউরোপের উন্নতিকামী, আর এ-যুগে উন্নতির অর্থ হচ্ছে দেশের ধনবৃদ্ধি। বলা বাহুল্য যে ভারতবর্ষ ইউরোপ নয়। আর এসিয়া বাদ দিয়ে আমাদের কাছে World-State-এর মানে কি ?

মহেন্দ্রলাল সরকার

গত ২রা নভেম্বর স্বর্গীয় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের স্থাপিত বিজ্ঞান-সভাগৃহে তাঁর শত-বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পন্ন হ'য়ে গেছে। আচার্য্য স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় সে উৎসবে সভাপতি ছিলেন। মহেন্দ্রলালের জীবন কর্ম্ম-বহুল—কাজও ছিল তাঁর নানা রকমের। তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতার সেরিফ, বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য প্রভৃতি ছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী কাব্য' বন্ধু মহেন্দ্রলালকে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন —

ভিষক-কুল-পঙ্কজ-সবিতা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার, এম-ডি,

হৃদয়সন্নিহিতেষু।

সহোদর-প্রতিম মহেন্দ্র,

কতিপয় দিবস অতীত হইল আমি এক দিন উষায় সমীরণ সেবন করিতে করিতে তোমার ভবনে উপনীত হইয়াছিলাম। দেখিলাম, তুমি চেয়ারে উপবিষ্ট, তোমাকে বেষ্টন করিয়া অনেকগুলি লোক—বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী, উৎকল, সাহেব, বিবি—দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তুমি তাহাদিগের পীড়া নির্ণয় করিয়া ঔষধ বিতরণ করিতেছ। আমি ততক্ষণ একপার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। জনতানিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে না। এই দৃশ্যটি অতীব মনোহর। ইচ্ছা হইল আলেখ্যে লিখিয়া জন-সমাজে প্রদর্শন করাই। অধ্যয়ন কালাবধি তুমি আমার পরম বন্ধু; সেই সময় হইতে তোমার নানারূপ মহত্ত্বের চিহ্ন দর্শন করিয়াছি; সত্যের অনুরোধে বিপুল-বিভব-প্রদ এলোপাথি এক প্রকার বিসর্জ্জন দিয়া হোমিওপাথি অবলম্বন অসাধারণ মহত্ত্বের কর্ম্ম; কিন্তু প্রিয়দর্শন, উল্লিখিত প্রিয়-দর্শনটি মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। তোমার মহত্ত্বের এবং অকৃত্রিম প্রণয়ের অনুরাগ-স্বরূপ আমার "সুরধুনী কাব্য" তোমাকে অর্পণ করিয়া যারপর নাই পরিতৃপ্ত হইলাম।

অভিন্ন-হৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

দীনবন্ধুর কাব্যের সহিত মহেন্দ্রলালের নাম জড়িত থাকায় যেন মণিকাঞ্চন যোগ হয়েছে।

মহেন্দ্রলাল বড় ডাক্তার, অশেষ বিদ্যাসম্পন্ন, বিজ্ঞানানুশীলনানুরাগী, রাজনীতি-চর্চ্চা-রত—এ সবই ছিলেন। কিন্তু তাঁর সে সব ক্ষেত্রের কীর্ত্তি লোকে ভুলে যেতে পারে, কিন্তু তাঁর বিজ্ঞান-সভা-সংস্থাপন-কীর্ত্তি কালজয়ী। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে যখন ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে কেহ বিজ্ঞান-গবেষণার প্রয়োজন মনে করেন নি তখন তিনি বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দির প্রতিষ্ঠা-কল্পে যে অনুষ্ঠান-পত্র প্রচার করেছিলেন, তা থেকে নিয়ে একাংশ উদ্ধৃত হ'লো:—

"এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে; তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে, এবং আবশ্যক মতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখা সভা স্থাপিত হইবে।

"ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান-

অনুশীলন বিষয়ে প্রোৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ; আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা (মনোরম ও জ্ঞান-দায়ক প্রাচীন গ্রন্থসকল মুদ্রিত ও প্রচারিত করা) সভার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।"

দীর্ঘ আট বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় মহেন্দ্রলালের কল্পনা মূর্ত্তিগ্রহণ করেছিল।

আজ ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিজ্ঞানানুশীলন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তাতে এই প্রথম পরিকল্পনার গৌরব মলিন না হ'য়ে উজ্জ্বলই হয়েছে। কারণ প্রথম পরিকল্পনার গৌরব মহেন্দ্রলালের। আজ তাঁর জন্মের পর শতবর্ষ যখন অতীত হ'লো, তখন আমরা তাঁর কথা স্মরণ ক'রে তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা সমর্পণ ক'রে আপনাদের ধন্য মনে করছি। আমরা আশা করি, বাঙালী তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বাংলার উন্নতি সাধন করবে।

বিঠলভাই প্যাটেল

২২শে অক্টোবর অপরাহ্ণ ২টা ৭ মিনিটের সময় জেনেভায় ভারতের জন-নায়ক বিঠলভাই প্যাটেল মহানিদ্রায় অভিভূত হয়েছেন। শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁর জ্ঞান অটুট ছিল—মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর অন্তিম সময়ের আর দেরী নেই। চিরনিদ্রার কথা স্মরণ ক'রে তাই তিনি বলেছিলেন—

"আমার সমস্ত স্বদেশবাসী আর পৃথিবীর নানা দেশের বন্ধুবর্গকে আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করবেন—মৃত্যুর পূর্ব্বেও আমি অগোপে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রার্থনা করছি।"

প্রবীণ রাষ্ট্র-নায়কের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে তরুণ নেতা সুভাষ চন্দ্র উপস্থিত ছিলেন।

বিঠলভাইয়ের কর্ম্ম-বহুল জীবনের অবসানে সারা দেশ বেদনায় পরিম্লান হ'য়ে উঠেছে। জাতীয় জীবন-যাত্রার পথে তাঁরই অতুলনীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে চলাই তাঁর স্মৃতিকে চির-সঞ্জীবিত ক'রে রাখবার প্রকৃষ্ট উপায়। প্রবাস-জীবনের অবসানে স্বদেশে ফিরে এসে নূতন উদ্যমে কর্ম্মব্রত গ্রহণ করার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি মহাপ্রস্থানের পথে চ'লে গেছেন। জীবনে যা অসম্পূর্ণ র'য়ে যায় তার জন্য একটা তীব্র বেদনা অন্তরের অন্তস্তলে যে আত্ম-গোপন ক'রে থাকে, তাতে অস্বাভাবিকতার কিছুই নেই। আমাদের মনে হয় তা একেবারে ব্যর্থ হয় না, একেবারে বিফল হ'য়ে যায় না। কবি বলেছেন—

জীবনে যত পূজা হ'লো না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে, ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা,
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥

আজ তাঁরই তিরোধানে তাঁর অসম্পূর্ণ কর্ম্ম-পন্থাকে সসম্মানে শিরোধার্য্য করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য। তাঁর দেশপ্রেম, অবিচলিত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, নির্ভীক স্পষ্ট উক্তি, শাসন ব্যাপারে গভীর জ্ঞান—এগুলি আদর্শস্থানীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এরই বলে তিনি নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতির কার্য্য অকুতোভয়ে পালন ক'রে গেছেন। নির্ভীক মতামতের তিনি একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন এবং দেশের উন্নতিকল্পে যা প্রয়োজন তার জন্য প্রাণপাত করতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। ন্যায়পরতা তাঁর আদর্শ ছিল। ভারতীয় রাষ্ট্র-পরিষদের সভাপতির পক্ষে কোনও বিশিষ্ট দলের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয় মনে ক'রে, তিনি চিত্তরঞ্জন-মতিলাল প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্যদলের সভ্য পদে ইস্তফা দেন। দেশ-প্রীতি তাঁর হৃদয়ে নিঃশব্দে ফল্গু-ধারার মত প্রবাহিত হ'তো। তিনি মহাত্মা গান্ধীর মতামত উপেক্ষা ক'রে পরিষদে যোগদান করলেও মহাত্মাজীর প্রবর্ত্তিত আন্দোলন সমর্থন ক'রে তাঁকে অর্থ-সাহায্যও করেছিলেন। চীনে ভারতীয়

সৈন্য প্রেরণ ও বোলশেভিক-বিতাড়ন বিল প্রসঙ্গে তিনি প্রচুর নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর রুলিং নিয়ে পরিষদে বিবিধ বিতর্ক ও মতবাদের সৃষ্টি হ'তো বটে, কিন্তু তাঁর এই সাহসিকতার জন্য তাঁকে সকলে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতেন।

স্বর্গীয় বিঠলভাই প্যাটেল

তিনি পরিষদের অত্যন্ত ক্ষমতাশালী সভাপতি ছিলেন। কোনও স্বাধীন দেশের 'স্পীকার' অপেক্ষা তিনি কোনও অংশে হীন ছিলেন না। শুনা যায় যে, মিঃ লয়েড জর্জ্জ পণ্ডিত মতিলালের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন, 'এই গোঁফওয়ালা রুক্ষ-ভাষী ব্যক্তিই কি ভারতের 'স্পীকার'?' উত্তরে পণ্ডিতজী বলেছিলেন, 'তাঁর মুখ বন্ধ করার একমাত্র উপায়ই ছিল তাঁকে ঐ পদে বসিয়ে দেওয়া'। স্যর ম্যালকম হেলী পরিষদ ত্যাগ করার সময় বলেছিলেন যে, তিনি হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন। কারণ তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে 'প্যাটেল' ও 'পণ্ডিত' আর কোনও গোলযোগ করতে পারবেন না।

এই মহাজীবনের অবসানে আজ সারা ভারতময় এক নীরব আর্ত্তনাদ ব'য়ে যাচ্ছে। সেই আর্ত্তনাদের

মাঝে অমর প্যাটেলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ভারতে আবার নবীনতম প্যাটেলের জন্ম হোক।

ভারতে নারী-জাগরণ

সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথা যে নারীকে তার আসল শক্তিসঞ্চয়ের পথে বাধা দিচ্ছে মাড়োয়ারী-মহিলা-সম্মিলনীর সভানেত্রী, শ্রীযুক্ত যমুনালাল বাজাজের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা জানকীদেবী বাজাজ সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। মাড়োয়ারী মহিলারা ছাড়া, কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণও সেদিন সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সভানেত্রী তাঁর বক্তৃতায় পর্দা-প্রথা, বাল্যবিবাহ, মহিলাগণের অলঙ্কার ও বেশভূষা এবং নারীগণের দ্বারা খাদি প্রচার ও হরিজন সেবা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা জানকী দেবী মুসদ্দী মাড়োয়ারী মহিলাদের শিক্ষা বিষয়ে উদাসীনতা, আত্মরক্ষায় অক্ষমতা ও অন্যান্য কুসংস্কারের উল্লেখ করেন।

মুসদ্দী ও বাজাজ দুই সভানেত্রীই পর্দা-প্রথাকে মাড়োয়ারী মহিলা সমাজের সব চেয়ে বড় বন্ধন ও কুপ্রথা ব'লে একবাক্যে স্বীকার করেছেন। তনু, মন ও আত্মা এই তিনেরই অবনতির মূল এই পর্দা-প্রথা। মুক্ত বায়ু-সেবনের পথে, প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি উপভোগের পথে, ও বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়া ও চালচলনের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পথে পর্দা-প্রথা যে মহিলাদের বিশেষ অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়ায়, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা ক'রে মহাত্মা গান্ধী যে বাণী পাঠিয়েছেন তার মধ্যেও এই কুপ্রথা বর্জ্জনের সমর্থন আছে। মহাত্মা বলেছেন—"পর্দা-প্রথা ব্যতীতও আপনারা পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন। পুরুষের সহিত নারীদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা কর্ত্তব্য।…… সীতাদেবী অবগুণ্ঠিতা অসূর্য্যম্পশ্যা হ'লে রামচন্দ্রের সঙ্গে অনুগমন করতে পারতেন না।" পর্দা-প্রথা-রোধের এই সমর্থন-বাণীর সঙ্গে মহাত্মাজীর সতর্কবাণীও বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হ'বে। হায়দ্রাবাদের এক সামাজিক সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রের একজন প্রতিনিধি মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি সিন্ধুদেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে পর্দা-প্রথা সম্বন্ধে এই সতর্কবাণী জানিয়েছেন,—

"…… পর্দা ত্যাগ করার অর্থ এ নয় যে, বালিকাগণ যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইবে। পুরুষের সম্মুখে নিজের মুখ লুক্কায়িত রাখাকে আমি উন্নতি বা আত্মবিকাশের পক্ষে হানিকর বলিয়া মনে করি। লজ্জাই আত্মরক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়—পর্দা নহে।"

মহাত্মাজীর এই বাণী থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি পর্দা-প্রথাকে কুপ্রথা ব'লে উচ্ছেদ করার পক্ষপাতী হ'লেও এর অপব্যবহারের দিকেও মহিলা-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মহিলারা যেন মহাত্মাজীর আশ্বাসবাণীর সঙ্গে তাঁর সতর্কবাণীটুকুও বিশেষভাবে মনে রাখেন। হিন্দু নারীর নারীত্বের পক্ষে ক্ষতিকর কোনও প্রথা হিন্দু নারী যেন প্রশ্রয় না দেন—"মুক্ত বায়ু-সেবন" যেন স্বেচ্ছাচারিতায় পর্য্যবসিত হ'য়ে না পড়ে। মহাত্মাজী আরও বলেছেন — "দেশের যুবক-যুবতী যদি পবিত্র থাকতে চায় তবে তাদের সর্ব্বপ্রকার গোপনতা ত্যাগ করতে হ'বে।" তিনি সহপাঠ সম্বন্ধেও বলেছেন—"সুনিয়ন্ত্রিত ও সুচিন্তিত সহপাঠ আমি অনুমোদন করি।" আর বিবাহের সম্পর্কে তিনি বলেছেন— "বিবাহের উদ্দেশ্য যখন আধ্যাত্মিক ও জাতীয় উন্নতি, তখন অসবর্ণ ও আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহও দোষের নয়।"

জগত্তারিণী-স্বর্ণপদক

সুপ্রসিদ্ধ রস-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী-স্বর্ণপদক পেয়েছেন। বর্ত্তমান যুগে যাঁরা হাস্যরসাত্মক রচনার দ্বারা বিশেষ খ্যাতি ও যশ অর্জ্জন করেছেন কেদারবাবু তাঁদের অন্যতম। তিনি

অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন—তন্মধ্যে—'চীনযাত্রী', 'কাশীর কিঙ্কিৎ', 'আমরা কি ও কে', 'ভাদুড়ী মহাশয়', 'কোষ্ঠীর ফলাফল', 'কবুলতি', 'পাথেয়', 'দুঃখের দেওয়ালি' প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ। কেদারবাবু দীর্ঘ জীবন লাভ ক'রে, সাহিত্যে আরও অনেক কিছু দান করুন—এই আমাদের আন্তরিক কামনা।

কলিকাতার স্বাস্থ্য

কলিকাতাবাসীদের স্বাস্থ্য যেভাবে দিন দিন অবনতির পথে চলেছে তাতে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, গ্রাম ছেড়ে নগরের সুরম্য অট্টালিকাবাসী হ'য়েও রক্ষা নেই। অথচ ব্যাপারটা এ পর্য্যন্ত কর্ত্তারা যেন কানে তুলেও তুলছিলেন না। সম্প্রতি স্বাস্থ্য-সম্মিলনীর বিবরণীতে স্পষ্টই প্রকাশ পেয়েছে যে, টাইফয়েড প্রভৃতির মত আন্ত্রিক জ্বরের (Enteric fever) তাড়নায় কলিকাতাবাসী সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছে। অনেক লোকই যে ইতিমধ্যে এর কবলে প'ড়ে প্রাণ হারিয়েছে ও হারাতে চলেছে সে কথা মিথ্যা নয়।

এখন দরকার হয়েছে এর প্রতিকারের। কিন্তু প্রতিকারের উপায় যাঁদের হাতে রয়েছে তাঁরা যদি মনোযোগ না করেন তা হ'লে কাগজে কলমে যতই প্রতিবাদ বা অভিযোগ আনা হোক না কেন, তার কোন মূল্য আছে কি? স্বাস্থ্য-সম্মিলনী বেশ জোর গলায় বলেছেন যে, কলিকাতাবাসীর এই স্বাস্থ্যহানির প্রধান কারণ সহরের জলনিকাশের সুব্যবস্থার অভাবের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট সাহেবের সভাপতিত্বে যখন এমন একটা অপ্রিয় সত্য কর্ত্তাদের সামনে ধরা হয়েছে তখন এ বিষয়ে অমনোযোগী হ'লে আর চলবে না। তা ছাড়া এ সহরের জল-নিকাশের ব্যবস্থা যে ক্রমশঃই খারাপের দিকে চলেছে তা ত পূর্ব্বেই অনেকের জানা ছিল। এ পর্য্যন্ত ত Drainage Expert-দের বাগ্‌বিতণ্ডা আর পরস্পরের দোষগুণ বিচার করতে করতেই সময় ও পরিশ্রম নষ্ট হয়েছে। এবার প্রকৃত কিছু করার আয়োজন করা উচিত। রোগী যখন মৃত্যুশয্যায় তখন চিকিৎসকদের মধ্যে মতামতের অনৈক্য নিয়ে বিবাদ বাধলে রোগীরই প্রাণ বাঁচান দুরূহ হ'য়ে পড়ে। অতএব এখন স্বাস্থ্য-সম্মিলনীর উপদেশগুলিকে কার্য্যে পরিণত ক'রে, যাতে অদূর ভবিষ্যতে কলিকাতাবাসীর স্বাস্থ্যকে বিপন্মুক্ত করা যায়—সেদিকেই যেন নজর দেওয়া হয়। বাক্‌যুদ্ধের মিথ্যাসমারোহে কর্পোরেশন বা সরকারের নিন্দার চেষ্টা করলেই ত আর সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা হ'বে না।

কলিকাতার পানীয় জল দূষিত হয়েছে ব'লে যে কথাটা উঠেছে, সেটাকে ত আর মিথ্যা বলা চলে না। কলিকাতার পানীয় জল যে দূষিত হয়েছে, সম্মিলনী এ কথা জেনেই, পানীয় জলকে ফুটিয়ে নেবার উপদেশ দিয়েছেন। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস এবং কর্পোরেশনের রাসায়নিক পরীক্ষকের (Chemical Analyst) বাদানুবাদের ফলে এ ব্যাপারটা যে সত্য তা প্রমাণিত হয়েছে। কলিকাতার মধ্যে ইটালি অঞ্চলেই এই দূষিত পানীয় জলের জন্য অনেকগুলি পরিবার আন্ত্রিক-জ্বরে ভুগে বিশেষ ভাবে কষ্ট পেয়েছে ও পাচ্ছে। তাদের মধ্যে কতকগুলি যে প্রাণও হারায়নি এমন নয়। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, দেশী-বিদেশী খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই বাস আছে। সুতরাং তাদের কেহই এখন নিরাপদ ন'ন। তা ছাড়া যখন কলিকাতার মধ্যে এক অঞ্চলের অধিবাসীরা এইভাবে স্বাস্থ্য হারাতে বসেছে, তখন অপর অঞ্চলগুলির কোনও ভয় নাই—এরূপ মনে করাও ভুল হ'বে। কলিকাতাবাসীরা এ পর্য্যন্ত পাইপের পানীয় জলকে নিরাপদ মনে ক'রেই নিঃসংকোচে ব্যবহার ক'রে এসেছে। কিন্তু আজ তাদের সেই অতি-বিশ্বাসের ফল ফলছে। এখন থেকে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে কলিকাতা-

বাসীর সমবেত চেষ্টায় এর প্রতিকার করা বিশেষ দরকার হ'য়ে পড়েছে।

স্বাস্থ্য-সম্মিলনী আরও বলেছেন যে গৃহে ও বাজার প্রভৃতিতে অপরিস্কৃত (unfiltered) জল একেবারেই ব্যবহার না করা সঙ্গত এবং যত শীঘ্র সম্ভব, সর্ব্বত্র ড্রেন-পাইখানা বসাইবার ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা সম্মিলনীর এ-দু'টী মন্তব্যের দিকেও কর্পোরেশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বাংলায় প্রথম চিনির কল

গত ৪ঠা আশ্বিন তারিখে ঢাকায় 'দেশবন্ধু সুগার মিলে'র উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন হ'য়ে গেছে। সেখানে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এক সারগর্ভ অভিভাষণ পাঠ করেছেন। বাংলার মস্তিষ্ক শুধু কলম-পেশায় নিবদ্ধ না ক'রে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে চালনা করলে, বর্ত্তমানে বাংলা দেশ হ'তে যে বেকার-সমস্যা অনেকটা দূরীভূত হ'বে, সে কথাটা আচার্য্যদেব বাংলার মাসিক পত্রিকার মধ্য দিয়ে নানা প্রবন্ধের অবতারণা ক'রে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের ভিতরে যে যথেষ্ট সত্য নিহিত রয়েছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ১৯৩২ সালের মার্চ্চমাসে যখন দেশীয় চিনি-শিল্পের রক্ষাকল্পে বিদেশী চিনির উপর অতিরিক্ত হারে সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য্য হয়েছিল, তখন অনেকেই মনে করেছিলেন যে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বাঙালীর মূলধনে, বাঙালীর পরিচালনায় অনেকগুলি চিনির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হ'বে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তা হয়নি। যখন যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার প্রভৃতি প্রদেশের ধন-কুবেরগণ চিনি-উৎপাদন কার্য্যে প্রভূত অর্থ নিয়োগ করছেন তখন বাংলাদেশ সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে আছে। বাংলাদেশ ছাড়া ভারতের অন্যান্য জায়গায় এই ব্যবসা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাই আচার্য্যদেব আক্ষেপ ক'রে বলেছেন—'বাঙ্গলার নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, সংরক্ষণ নীতি প্রবর্ত্তিত হইবার পর দেড় বৎসর অতীত হইতে চলিল, অথচ এ পর্য্যন্ত এই প্রদেশের লোকদ্বারা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিচালিত একটী চিনির কলও স্থাপিত হইল না।' আমরা এ বিষয়ে বাংলার শিক্ষিত বেকার যুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্বল্প ব্যয়েও কিরূপে চিনি উৎপাদন কার্য্য সুসম্পন্ন করা যেতে পারে, সে বিষয়েও আচার্য্যদেবের উপদেশ সকলের প্রণিধানযোগ্য। আখ চাষের পদ্ধতি এবং চিনি উৎপাদন করবার প্রণালী — এগুলি আধুনিক যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

ভারতের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিনির আমদানী হ'য়ে থাকে। এখানে প্রতি বৎসরে গড়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টন চিনি ব্যয়িত হয়। সম্পূর্ণ না হোক্, কিছু পরিমাণেও স্বদেশে চিনি উৎপন্ন হ'লে স্বদেশের অর্থ স্বদেশেই থেকে যাবে এবং তাতে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হ'বে, সন্দেহ নেই।

পাটের বাজার মন্দা হ'য়ে যাওয়ায় দেশের আর্থিক অবস্থা শিথিল হ'য়ে পড়েছে। যে-সব জমিতে এতদিন ধ'রে পাট চাষ করা হয়েছে কিন্তু ভবিষ্যতে আর হ'বে না, সেই পতিত জমিগুলির সদ্ব্যবহার না করলে চাষীদের বিশেষ ক্ষতি হ'বে। বর্ত্তমানে এইসব জমিতে আখের চাষ হওয়া প্রয়োজন। বাংলার ব্যবসায়ীদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য।

মন্দির প্রবেশ

সাম্প্রদায়িকতার বিষে আজ সমগ্র ভারতবর্ষ জর্জ্জরিত হ'য়ে পড়েছে। এ সাম্প্রদায়িকতা শুধু হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টানে নয়, হিন্দুদের নিজেদের সমাজের মধ্যেও এ সমস্যা ভীষণ প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে। এই সমস্যার সমাধান করবার জন্যই মহাত্মা গান্ধী ভারত-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। রাজনৈতিক আলোচনা বর্ত্তমানে স্থগিত রেখে তিনি অস্পৃশ্যদের উদ্ধারের জন্য মনোনিবেশ করেছেন। হিন্দুসমাজ থেকে

অস্পৃশ্যতা দূর করা, অস্পৃশ্যদের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার করা, তাদের স্বাধীন নাগরিকের অধিকার দান করা এবং তাদের স্কুল-কলেজ ও মন্দির-প্রবেশের পথ সুগম ক'রে দেওয়া — এই ধরণের জন-হিতকর ও দেশ-হিতকর সমাজ সংস্কার কার্য্যেই আজ তিনি ব্রতী হয়েছেন। তিনি বুঝেছেন—সমাজ থেকে যতদিন না কুসংস্কারের শৃঙ্খল মোচন করা হয় ততদিন পর্য্যন্ত, যত শক্তিশালী রাজনৈতিক পন্থাই অবলম্বন করা যাক্ না কেন, তা অকৃতকার্য্যতায় পর্য্যবসিত হ'বে। এই মহদুদ্দেশ্য যাতে নির্ব্বিঘ্নে সাধিত হ'তে পারে তার জন্য একদিকে যেমন উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি আবার ধর্ম্মাধিকার প্রভৃতি বিষয়েও সকলের সমানাধিকারের ব্যবস্থা করা উচিত। হিন্দুদের উচ্চ সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিম্নবর্ণের সম্প্রদায়গুলির সমতা আন্‌তে হ'লে আজ আমাদের সমাজে যারা নির্য্যাতিত হচ্ছে এবং যাদের আজ আমরা অস্পৃশ্য ব'লে দূরে সরিয়ে রেখেছি তাদের সম্বন্ধে আমাদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন করতে হ'বে, তাদের বিশেষ ক'রে শিক্ষা এবং ধর্ম্মচর্চ্চা বিষয়ে বর্ণাশ্রম হিন্দুদের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে হ'বে, অর্থাৎ একদিকে স্কুল-কলেজ অন্যদিকে মন্দির ও ভজনালয় প্রভৃতি খুলে দিতে হবে। নতুবা বিশাল হিন্দুজাতির একটা অঙ্গহানির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

এ মহাকার্য্য সাধনের পথে যে নানা বাধা-বিঘ্ন দেখা দেবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে বাধা-বিঘ্ন ধীরে ধীরে আমাদের উত্তীর্ণ হ'তে হ'বে। বর্ণাশ্রম-স্বরাজ্য-সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রাচীন পন্থাবলম্বী সনাতনী হিন্দুরা আজ এ বিষয়ে বিশেষ বিঘ্ন উৎপাদন করতে চেষ্টা করছেন। কোনও কোনও বিষয়ে যে, আমাদের সনাতন পন্থা অবলম্বন ক'রে চলার প্রয়োজন আছে, আমরা সেকথা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত বাইরের জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলতে গেলে সেই অতি পুরাতন প্রাচীনতম কুসংস্কারাপন্ন প্রথাকেই যে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে হ'বে—তাও আমরা বিশ্বাস করি না। গঙ্গা-সাগরে প্রথম সন্তান বিসর্জ্জন দেওয়া, সতী-দাহ, বাল-বিধবার বিবাহ না দেওয়া প্রভৃতিতে যে কি নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত ছিল তা আমাদের জানা নেই। সংবাদ পেলাম, কিছুদিন আগে এক সুশিক্ষিতা বিধবা হিন্দু যুবতী তার কয়েকটী সঙ্গিনীকে নিয়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করেছে। স্থানীয় হিন্দুরা অনেক চেষ্টা ক'রেও তাদের বিচলিত করতে পারেন নি। আমরা যখন বহু বিবাহ করতে দ্বিধা করি না, তখন দুঃখিনী বালবিধবার বিবাহ দিতে আমরা নারাজই বা হ'ব কেন? আজ যদি আমাদের নিষ্পেষিত নিম্ন-বর্ণের ভ্রাতারা মন্দির ও বিদ্যার্থীভবনে প্রবেশাধিকার না পেয়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, তবে বিশাল হিন্দু জাতির যে কত বড় ক্ষতি হ'বে তা কল্পনা করতেও বুক কেঁপে ওঠে।

আজ আমাদের দেশে প্রাচীন ও আধুনিকতম আলোকে সমুজ্জ্বল সমাজ-সংস্কার প্রথা আরম্ভ করা উচিত। তারই বার্ত্তা বহন ক'রে যে মহাপুরুষ অল্পদিন পরে আমাদের দেশে পদার্পণ করবেন, তাঁর মহতী ইচ্ছা সার্থক হোক।

সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত ও ভাই পরমানন্দ

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ভাই পরমানন্দ আজমীরে সম্প্রতি হিন্দু মহাসভার পঞ্চদশ অধিবেশনের সভাপতিরূপে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তা'তে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের তিনি সমালোচনা করেছেন। আলোচনার মধ্যে সম্পূর্ণ নূতন কিছু না থাকলেও স্পষ্ট ও ইঙ্গিত-পূর্ণ অনেক তথ্য আছে। ভারতের জাতীয় ভাবাপন্ন হিন্দুরা এ পর্য্যন্ত কোন সম্প্রদায়ের উন্নতিতে বাধা দেন নি এবং নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সিদ্ধিরও চেষ্টা করেন নি। হিন্দুসভার গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন ব'লে প্রমাণ করবার চেষ্টা চলছে বটে, কিন্তু ভারতের জাতীয় ভাবাপন্ন হিন্দুরা

কোন স্বার্থকে স্থান দেওয়া ত দূরের কথা, জাতীয় উন্নতিরই জন্ম সাম্প্রদায়িক স্বার্থকে ত্যাগ করবার উদাহরণই অনেকবার দেখিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক-অধিকার-বিভাগ সম্বন্ধে ভাই পরমানন্দ এলবার্ট হলে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের মধ্যে সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ভাব লক্ষ্য করেছেন। পক্ষপাতিত্বের দ্বারা ভারতীয় জাতীয়তার অঙ্গহানি হ'লে তা যে ভারতবর্ষের পক্ষে ভীষণ ক্ষতির কারণ হ'বে তাতে সন্দেহ নেই। অতএব এই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে হিন্দুদের আহত হওয়ার কথা বাদ দিলেও ভারতীয় জাতীয়তার অনাহত ভাব অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজন আছে। যাতে এই জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত না করা হয় তার জন্ম হিন্দু মহাসভা হিন্দুর ন্যায্য দাবি জানিয়ে প্রধান মন্ত্রীকে তার করেছেন।

ভাই পরমানন্দ সভাপতিরূপে আজমীরে যে বক্তৃতা করেছেন তাতে তিনি হিন্দু-মহাসভার পক্ষ থেকে কংগ্রেস ও সরকার উভয়েরই তীব্র সমালোচনা করেছেন বটে, কিন্তু হিন্দু-মহাসভারও যে প্রশংসা করেন নি সে কথাটাও ভুললে চলবে না। প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের ফলে হিন্দুদের ক্ষতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হ'য়েই তিনি সরকারকে জানিয়েছেন যে, এর ফলে হিন্দুরা হতাশ হৃদয়ে যদি তুমুল আন্দোলন চালায় তাতে ভবিষ্যতে শান্তি স্থাপন আর সম্ভব না-ও হ'তে পারে, তখন কিন্তু হিন্দুকে দোষী করলে চলবে না।

প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত চিরস্থায়ী আইনে পরিণত হবার পূর্ব্বেই এ বিষয়ে যা কিছু আপত্তি জানাবার সরকারকে তা জানিয়ে এটাকে দোষশূন্য ক'রে তোলবার জন্ম ভাই পরমানন্দ যে উপদেশ দিয়েছেন তা কেবল হিন্দুর কেন, সকল সম্প্রদায়ের নেতাদেরই ভাল ক'রে ভেবে দেখা দরকার।

হিন্দু-মহাসভার এই বর্ত্তমান কার্য্যসমূহের সম্পর্কে পণ্ডিত জহরলাল কাশীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক বিরাট সভায় যা বলেছেন, তারও এক্ষেত্রে উল্লেখ না করলে বিষয়টী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ১২ই নভেম্বর তারিখে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে এই সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। পণ্ডিত জহরলাল সেই সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা থেকে কিছু উদ্ধৃত করা গেল। তিনি বলেছেন—"হিন্দু-মহাসভা যে একটা ছোটখাট রকমের প্রতিক্রিয়া-মূলক দল এ-ধারণা তাঁর আগেই ছিল। ভারতের হিন্দুদের অভিমত তাঁরা প্রচার করেন — এরূপ তাঁরা ব'লে থাকেন বটে, কিন্তু তাঁরা হিন্দুদের ঠিক প্রতিনিধি ন'ন।··· মহাসভা আজমীর অধিবেশনে ঘোষণা করেছেন যে—মহাসভার উদ্দেশ্য ভারত হ'তে মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের মুছে ফেলে 'হিন্দুরাজ' প্রতিষ্ঠা করা। এই ঘোষণাতে আমি যারপর নাই ব্যথিত হ'য়েছি।···এতে মহাসভা যে শুধু নীচ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, এ মনোভাব জাতীয়তারও পরিপন্থী। সুতরাং মহাসভার এই বর্ত্তমান নীতি অবনতিমূলক, জাতীয়তা-বিরোধী, প্রগতি-বিরোধী এবং অনিষ্টকর।"

পণ্ডিত জহরলালের এই সমালোচনাকে মালব্যজী অত্যন্ত তীব্র ব'লে মনে করলেও, হিন্দুসভার এই শ্রেণীর প্রস্তাবগুলির সহিত তিনি নিজেও সম্পর্ক রাখতে চান না এবং এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ ক'রে হিন্দুসভা যে ভুল করেছে সে কথাও তিনি স্বীকার করেন।

পৌষ
১৩৪০

প্রথম বর্ষ
নবম সংখ্যা

ত্যাগের জন্ম

রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর

আধুনিক পণ্ডিতেরা যে দুইখানি উপনিষৎকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মনে করেন সেই দুইখানি (ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক) উপনিষদেই একটি আখ্যান আছে। এই আখ্যানে পঞ্চালদেশের রাজা জৈবলি প্রবাহণ উদ্দালক আরুণিকে বলিতেছেন, "যে অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সত্যের উপাসনা করে সে ব্রহ্মলোকে গমন করে, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আর পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে না। কিন্তু যে গ্রামে যজ্ঞানুষ্ঠান করে, দান করে, তপশ্চরণ (উপবাস) করে, সে পিতৃলোকে গমন করে, পিতৃলোক হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করে।"* বৃহদারণ্যকোপনিষদে অন্যত্র বলা হইয়াছে, "এই লোক (ব্রহ্মলোক) ইচ্ছা করিয়া প্রব্রাজক-(পরিব্রাজক) গণ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়" (৪।৪।২২)। এই দুইটি বচনে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং পরিব্রাজক বা ভিক্ষু এই তিন আশ্রমের কথা আছে। গৃহস্থের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সে গৃহে থাকিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা যতই কেন না অনুষ্ঠান করুক, তাহার মোক্ষ বা মুক্তি হইবে না, পুনর্জ্জন্ম হইবে। বানপ্রস্থ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সে বনে গিয়া সত্যের উপাসনা করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে, আর তাহার পুনর্জ্জন্ম হইবে না ; সে মোক্ষলাভ করিবে। পরিব্রাজক সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে সূচিত হইয়াছে, সে-ও মোক্ষলাভ করিবে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের আর একটি সংবাদে (২।৪।১ ; ৪।৫।১) উদ্দালকের শিষ্য, জনকের গুরু, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন, "অরে, আমি এই স্থান (গৃহস্থাশ্রম) হইতে প্রব্রজিত হইব।"

বৃহদারণ্যকোপনিষদে যে ভাবে বানপ্রস্থের এবং পরিব্রাজকের কথা উত্থাপিত হইয়াছে তাহাতে অনুমান হয়, এই উপনিষৎ রচিত হইবার পূর্ব্বাবধি এই দুইটি আশ্রমই বিদ্যমান ছিল। এই তথ্য এই উপনিষদের আর একটি বাক্যে (৪।৪।২২) পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে —

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন। এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি। এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোক ইতি। তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।"

* ছান্দোগ্য ৫।১০।১—৭ ; বৃহদারণ্যক ৬।২।১৫—১৬।

"ব্রাহ্মণগণ বেদ অধ্যয়নের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা, এবং উপবাস করিয়া এই (আত্মাকে) জানিতে ইচ্ছা করে। ইহাকে জানিয়া মুনি হয়। এই লোক (ব্রহ্মলোক) লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া প্রব্রাজকগণ প্রব্রজিত হয়। ইহা জানিতেন বলিয়া পূর্ব্বকালের বিদ্বানগণ সন্তান কামনা করিতেন না; বলিতেন, 'আমরা সন্তান দিয়া কি করিব, আমাদের এই আত্মা (ব্রহ্ম) রহিয়াছে, এই লোক (ব্রহ্মলোক) রহিয়াছে'। তাঁহারা পুত্রকামনা, বিত্ত-কামনা, (স্বর্গাদি) লোককামনা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা আচরণ করিতেন।"

ভারতবর্ষের ইতিহাস এই বিষয়ত্যাগের এবং বৈরাগ্যের জয় ঘোষণা করে। বৌদ্ধ এবং জৈনগণ ত্যাগীর উপাসক। উপনিষদে (ছান্দোগ্য ৭।২৫।২) বলা হইয়াছে, যে আত্মজ্ঞানী, আত্মানন্দ, যাহার খেলা আত্মার সহিত সে স্বরাট্ হয় (তাহার স্বরাজ্ হয়)। বিষয় ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা আত্মজ্ঞানের সোপান। সুতরাং ত্যাগ আধ্যাত্মিক স্বারাজ্য লাভের উপায়। প্রাচীন কালের হিন্দুমাত্রই জন্মান্তরে বিশ্বাস করিত, এবং মোক্ষকে জীবনের চরম লক্ষ্য মনে করিত। সুতরাং তাহাদের উপর ত্যাগের অখণ্ড প্রভাব ছিল। কিন্তু এই প্রভাব সত্ত্বেও হিন্দুর সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প উন্নতির চরম সীমায় পৌছিয়াছিল। রসসাহিত্য, বিজ্ঞান এবং শিল্পের মূল আদর্শ ত্যাগ নহে, ভোগ। কাব্য, নাটক, চিত্র, ভাস্কর্য্য এবং নানাপ্রকার কারুশিল্প আর্টো ভোগের জন্য কল্পিত। প্রাচীন ভারতে ত্যাগীর উদ্ভাবিত সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনের ন্যায় ভোগীর উদ্ভাবিত সাহিত্য ও শিল্পের উৎকর্ষ দেখিয়া মনে হয়, কোন কালে ভারতে ত্যাগের আদর্শের একাধিপত্য ছিল না। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বিষয় ত্যাগ এবং বিষয় ভোগ এই উভয় আদর্শের মধ্যে প্রতি-যোগিতা, এমন কি বিরোধও দেখা যায়।

শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে (৩।৪।২০) আশ্রম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে জাবালশ্রুতি (উপনিষৎ) হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন —

"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা।"

"ব্রহ্মচর্য্য (বেদাধ্যয়ন) সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবে। গৃহস্থ হইয়া তারপর বানপ্রস্থ হইবে। বানপ্রস্থের পর প্রব্রজিত (সন্ন্যাসী বা পরিব্রাজক) হইবে। যদি পূর্ব্বেই বৈরাগ্য জন্মে তবে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে, গৃহ হইতে, বা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজিত হইবে।"

চারিটি আশ্রম; ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ (বৈখানস) এবং ভিক্ষু (পরিব্রাজক, সন্ন্যাসী, যতি বা শ্রমণ)। জাবাল উপনিষদে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে পরিব্রাজক হইবার ব্যবস্থা পাওয়া যায়। আপস্তম্বের (২।৯।২১।১) এবং বশিষ্ঠের ধর্ম্মসূত্রে (৭।১।৩)ও বিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য (বেদাধ্যয়ন) শেষ করিয়া গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, পরিব্রাজক এই তিনের যে কোন আশ্রমে প্রবেশ করিতে পারা যায়। ভিক্ষুর এবং বানপ্রস্থের ধর্ম্ম (কর্ত্তব্যকর্ম্ম) ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মসূত্রকার গৌতম উপসংহার করিয়াছেন (৩।৩৬)—

"ঐকাশ্রম্যং ত্বাচার্য্যাঃ প্রত্যক্ষবিধানাৎ গার্হস্থ্যস্য গার্হস্থ্যস্য।"

"(বেদে) কেবল গার্হস্থ্য আশ্রমের সাক্ষাৎ বিধি থাকায় আচার্য্যের মতে আশ্রমধর্ম্ম একাশ্রমে (গৃহস্থের আশ্রমে) নিবদ্ধ।"

এখানে গৌতম স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, বেদে বান-প্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমের অর্থাৎ বিষয় ত্যাগ করিয়া প্রব্রজিত হওয়ার সাক্ষাৎ বিধান নাই, সাক্ষাৎ বিধান আছে কেবল গার্হস্থ্য আশ্রমের। সুতরাং এক গৃহস্থের আশ্রমই অবলম্বনীয়। বেদে যে সকল যাগযজ্ঞের বিধি আছে তাহা সস্ত্রীক অনুষ্ঠান করিতে হয়। সুতরাং যাগযজ্ঞের বিধির সঙ্গেই বেদে গার্হস্থ্য আশ্রমের সাক্ষাৎ বিধি রহিয়াছে। যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ইহলোকে পুত্র, বিত্ত, প্রভুত্ব প্রভৃতি ঐহিক কল্যাণ লাভ এবং মৃত্যুর পর দেবলোকে বা ব্রহ্মলোকে অমরত্ব লাভ।

সুতরাং গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করিলে বিষয় ভোগ এবং মোক্ষ উভয় ফলই পাওয়া যায়।

গৌতমের মত বৌধায়নও তাঁহার ধর্মসূত্রে বলিয়াছেন (২৷৬৷২৯)—

"ঐকাশ্রম্যং ত্বাচার্য্যা অপ্রজননত্বাদিতরেষাং।"

"অন্যান্য (বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু) আশ্রমে সন্তান উৎপাদনের সম্ভাবনা না থাকায়, গার্হস্থ্যাশ্রমই একমাত্র আশ্রম।"

যদি বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু আশ্রম বেদবিহিত না হয় তবে এই দুই আশ্রম কাহার বিহিত? এই প্রশ্নের উত্তরে বৌধায়ন বলিয়াছেন (২৷৬৷৩০)—

"তত্রোদাহরন্তি—প্রাহ্লাদি র্হ বৈ কপিলো নামাসুর আস। স এতান্ ভেদাংশ্চকার দেবৈঃসহ স্পর্দ্ধমান স্তান্মনীষী নাদ্রিয়েত।"

"এই বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া হয়,—প্রহ্লাদের পুত্র কপিল নামক এক অসুর ছিল। দেবতাগণের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া সে এই সকল আশ্রমবিভাগ (বানপ্রস্থ, ভিক্ষু) করিয়াছিল। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহার আদর করে না।"

গার্হস্থ্যের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বৌধায়ন (২৷৬৷৩৬) এবং আপস্তম্ব (২৷৯৷২৪৷৭—৮) প্রজাপতির এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

> ত্রয়ীং বিদ্যাং ব্রহ্মচর্য্যং প্রজাতিং
> শ্রদ্ধাং তপোযজ্ঞমনুপ্রদানম্।
> য এতানি কুর্ব্বতে তৈরিৎসহ স্মো
> রজো ভূত্বা ধ্বংসতেঽন্যৎ প্রশংসন্॥

"বেদ অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, সন্তানোৎপাদন, শ্রদ্ধা, তপশ্চরণ (উপবাসাদি), যজ্ঞ, দান—যাহারা এই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে তাহারা আমাদিগের সহায়। যে অন্য (ঊর্দ্ধরেতাগণের) আশ্রমের প্রশংসা করে সে ধূলিতে পরিণত হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।"

আপস্তম্ব স্বীয় ধর্ম্মসূত্রে বিভিন্ন আশ্রমের কর্ত্তব্য বিধান করিয়া চতুরাশ্রমের মধ্যে কোন্ আশ্রম উৎকৃষ্ট এবং কোন্ আশ্রম অপকৃষ্ট তাহার বিচার করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বপক্ষের মত বিবৃত করিতে গিয়া তিনি প্রথমতঃ পুরাণের এই দুইটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (২৷৯৷২৩৷৩—৫)—

অথ পুরাণে শ্লোকাবুদাহরন্তি—

> অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজামীষিরেঽষয়ঃ।
> দক্ষিণেনার্য্যম্ণঃ পন্থানং তে শ্মশানানি ভেজিরে॥
> অষ্টাশীতিসহস্রানি যে প্রজাং নেষির ঋষয়ঃ।
> উত্তরেণার্য্যম্ণঃ পন্থানং তেঽমৃতত্বং হি কল্পতে॥

"পুরাণ হইতে এই দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়—

"যে ৮৮০০০ হাজার (গৃহস্থ) ঋষি সন্তান কামনা করিয়াছিলেন, তাহারা অর্য্যমনের দক্ষিণায়ন মার্গে শ্মশানে (মৃত্যুর কবলে) পতিত হইয়াছিলেন।

"যে ৮৮০০০ ঋষি সন্তান কামনা করেন নাই (অর্থাৎ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন) তাঁহারা অর্য্যমনের উত্তরায়ণ মার্গে গমন করিয়া অমৃতত্ব (অমরত্ব) লাভ করিয়াছিলেন।"

এই দুইটি পুরাণের শ্লোক অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বপক্ষের যাহা মূল কথা আপস্তম্ব তাহা এই ভাবে বলিয়াছেন—

ইত্যূর্দ্ধরেতসাং প্রশংসা। অথাপি সঙ্কল্পসিদ্ধয়ো ভবন্তি। যথা বর্ষং প্রজাদানং দূরে দর্শনং মনোজবতাং যচ্চান্যদেবং যুক্তম্। তস্মাচ্ছ্রুতিতঃ প্রত্যক্ষফলত্বাচ্চ বিশিষ্টানাশ্রমানেতানেকে ব্রুবতে। ৬—১।

"(এই শ্লোকে) ঊর্দ্ধরেতাগণের প্রশংসা করা হইয়াছে। ঊর্দ্ধরেতাগণ যাহা মনে করেন তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়। যেমন অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি, অপুত্রের পুত্রলাভ, বহুদূরস্থিত বস্তুর দর্শন, মনোরথ গতি, এবং এইরূপ আর যাহা ইচ্ছা করেন তাহার সকল যাহা ঘটন। অতএব কেহ কেহ বলেন, শ্রুতির বচনমতে এবং প্রত্যক্ষ ফলানুসারে এই সকল ঊর্দ্ধরেতার আশ্রমই উৎকৃষ্ট।"

পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে গার্হস্থ্যের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার জন্য আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

"ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধানাং তু বেদাঃ প্রমাণমিতি নিষ্ঠা। তত্র যানি শ্রূয়ন্তে ব্রীহিযবপশ্বাজ্যপয়ঃকপালপত্নীসম্বন্ধান্যুচ্চৈর্নীচৈঃ কার্যমিতি তৈর্বিরুদ্ধ আচারোঽপ্রমাণমিতি মন্যন্তে। যত্তু শ্মশানমুচ্যতে নানাকর্ম্মণামেবোক্তে পুনঃ সংস্কারো বিধীয়তে। ততঃ পরমনন্তং ফলং স্বর্গশব্দং শ্রূয়তে।" (১০—১২)।

"বেদে পারদর্শী পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই (অতীন্দ্রিয় বিষয়ে) বেদই প্রামাণ্য। বেদে যে ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে তাহা ধান্য, যব, পশু, ঘৃত, জল, পাত্র এবং পত্নী সহযোগে এবং উচ্চ ও নীচ স্বরে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই সকলের বিরোধী আচার প্রমাণহীন বলিয়া বিবেচিত হয়। যাহা গৃহস্থগণের শ্মশান বলা হয় তাহা অগ্নিহোত্রাদি নানা কর্ম্মের অন্তে পিতৃমেধ নামক অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া (মৃত্যুর পর পিশাচরূপে শ্মশানে বাস নহে)। বেদে কথিত হয়, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার পরে অনন্তকাল স্বর্গে বাস।"

বৌধায়নের এবং আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্র এই দুইজন আচার্য্যের প্রণীত কল্পসূত্রের অন্তর্গত। কল্পসূত্র তিন ভাগে বিভক্ত,—শ্রৌত, গৃহ্য এবং ধর্ম্ম। বৌধায়নের শ্রৌতসূত্র অতি প্রাচীন, এবং তাঁহার নামে প্রচলিত ধর্ম্ম-সূত্রে কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত বচন আছে আধুনিক পণ্ডিতেরা এরূপ মনে করেন। ধর্ম্মসূত্রসহ আপস্তম্বের কল্পসূত্র এক হাতের রচনা বলিয়া অনুমিত হয়। বিভিন্ন কল্প-সূত্র বেদের বিভিন্ন শাখার বা চরণের অর্থাৎ বিভিন্ন বেদবিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্যের রচিত। বৌধায়ন এবং আপস্তম্ব কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের দুইটি স্বতন্ত্র শাখার বা বিদ্বান্ গোষ্ঠীর প্রবর্ত্তক ছিলেন। বেদের প্রত্যেক শাখায় মন্ত্র, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষৎসহ সমস্ত বেদ এবং কল্পসূত্রাদি বেদাঙ্গ অধীত হইত। ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং কৌষিতকী উপনিষদে উদ্দালক আরুণির পুত্র শ্বেত-কেতু আরুণেয় একজন বিশিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যান্বেষী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্বেতকেতু দ্বাদশ হইতে চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ বয়সের মধ্যে সকল বেদ অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন এবং ইঁহাকে সম্বোধন করিয়াই উদ্দালক আরুণি বলিয়াছিলেন, "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" (ছান্দোগ্য ৬।১ ; ৬।৮—১৬)। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রে (১।২।৫।৪—৬) কথিত হইয়াছে, "নিয়ম প্রতিপালিত হয় না বলিয়া অবর বা অর্ব্বাচীনগণের মধ্যে ঋষি (মন্ত্র দ্রষ্টা) দেখা যায় না। কিন্তু কেহ কেহ কর্ম্মফলে পুনর্জ্জন্মে শ্রুতর্ষি হয় (অর্থাৎ শুনিবামাত্রই বেদের বচন স্মরণ করিতে পারে)। যেমন শ্বেতকেতু।" আপস্তম্বের টীকাকার হরদত্ত বলেন, এই শ্বেতকেতু ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত শ্বেতকেতু। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্র ছান্দোগ্যাদি উপনিষদের পরে রচিত হইয়াছিল। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে ঊর্দ্ধরেতাগণের বিভিন্ন আশ্রম সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে দেখা যায়,—বিভিন্ন বেদ-বিদ্যালয়গুলিতে তখন মুক্তি লাভের জন্য বিষয় ত্যাগ করা কর্ত্তব্য কি না, তৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। যাঁহারা বর্ত্তমানে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস অনুশীলন করেন তাঁহারা বলেন, গৌতম, বৌধায়নাদির ধর্ম্মসূত্র ও বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদের পরে রচিত। ছান্দোগ্যাদি উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল বৈদিক যুগের শেষ ভাগে। তারপর যদিও উপনিষৎ রচনা চলিতেছিল, তথাপি বৈদিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান কার্য্য ছিল সূত্রসঙ্কলন। এই জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের এই যুগকে কেহ কেহ সূত্রযুগ বলেন। গৌতমের এবং বৌধায়নের উপরে উদ্ধৃত বচন-প্রমাণেও দেখা যায়, বিষয় ত্যাগ মুক্তিলাভের পক্ষে আবশ্যক কি না, এই সম্বন্ধে বেদাধ্যায়ীগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ ছিল। এইরূপ মতভেদের দুইটি কারণ—

(১) বিষয় ত্যাগ না করিয়া গৃহস্থরূপে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ, দান এবং তপশ্চরণ করিলে মুক্তিলাভ করা যায়। সুতরাং বিষয় ত্যাগ অনাবশ্যক। অপর পক্ষের মত, বিষয় ত্যাগ না করিলে, পুত্রকামনা করিয়া গৃহস্থভাবে জীবন যাপন করিলে, মুক্তিলাভ হইতে পারে না, শ্মশানযাত্রী হইতে হয় অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয়। এই দুই প্রকার বিশ্বাস মতভেদমূলক নহে, ধর্ম্মভেদমূলক।

(২) শ্রুতিতে বা বেদে অর্থাৎ উপনিষদে মুক্তির

জন্য বিষয় ত্যাগের ব্যবস্থা আছে কি না? গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব বলিয়াছেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের লেখা সপ্রমাণ করে যে, কোন কোন আচার্য্য প্রচার করিতেন, উপনিষদে বিষয় ত্যাগের ব্যবস্থা আছে।

বেদের সিদ্ধান্ত নিরূপণের জন্য মীমাংসা দর্শন উদ্ভাবিত হইয়াছিল। বেদের প্রধান দুই ভাগ, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। যেমন যজুর্বেদের বাজসনেয় শাখার মন্ত্রভাগ শুক্লযজুর্বেদসংহিতা, ব্রাহ্মণ ভাগ শতপথব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ ভাগে নানাবিধ বিধি-নিষেধ থাকায় বেদের বা শ্রুতির প্রমাণ বলিলে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ ভাগের বচনই বুঝায়। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে একটি উপবিভাগ আছে, তাহার নাম আরণ্যক। উপনিষৎ এই আরণ্যকের অন্তর্ভূত। শতপথব্রাহ্মণের উপনিষৎ ভাগের নাম "বৃহদারণ্যোপনিষৎ"। ব্রাহ্মণ ভাগের প্রথম অংশে যাগযজ্ঞের বিধি আছে। এই অংশকে বলে কর্ম্ম-কাণ্ড। শেষাংশে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচার আছে। এই অংশকে বলে জ্ঞানকাণ্ড। কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের বিভাগ অনুসারে মীমাংসাদর্শনেরও দুইভাগ। যে ভাগে যাগযজ্ঞের বিধি মীমাংসিত হইয়াছে তাহাকে বলে কর্ম্ম-মীমাংসা বা পূর্ব্ব-মীমাংসা; যে ভাগে উপনিষদের তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে তাহাকে বলে উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব-মীমাংসাকে মীমাংসা বলা হয়, এবং উত্তর-মীমাংসা বেদান্ত নামে পরিচিত। বর্ত্তমানে একখানি মাত্র পূর্ব্ব-মীমাংসা সূত্র প্রচলিত আছে। ইহার রচয়িতার নাম জৈমিনি। এবং একখানি উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত সূত্র প্রচলিত আছে। এই সূত্রের রচয়িতার নাম বাদরায়ণ। বাদরায়ণ এবং পারাশর্য্য (পরাশর পুত্র) ব্যাস অভিন্ন বলিয়া গণ্য হয়েন। বেদান্ত সূত্র পাঠ করিলে জানা যায় জৈমিনিও একখানি উত্তর-মীমাংসা সূত্র রচনা করিয়াছিলেন। বেদান্ত সূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের আরম্ভে (৩।৪।১) বলা হইয়াছে—

"বাদরায়ণের মতে শব্দ প্রমাণ (শ্রুতি) অনুসারে কর্ম্মের (গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় যাগ-যজ্ঞের) সহায়তা ব্যতীত কেবল আত্মজ্ঞানের দ্বারা পুরুষার্থ (মোক্ষ) লাভ হয়।"*

এই সূত্রের অনুকূল উপনিষদের বচনসকল শঙ্করের এবং রামানুজের ভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। রামানুজ শঙ্করের চারি শতাব্দী পরে, দ্বাদশ শতাব্দে, প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকিলেও, তিনি যে মূল বৃত্তি অবলম্বনে তাঁহার শ্রীভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহা বোধ হয় শাঙ্করভাষ্য অপেক্ষাও প্রাচীনতর। কারণ তিনি লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বাচার্য্যগণ ভগবান বৌধায়নকৃত বিস্তীর্ণ ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি সংক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে সূত্রাক্ষর ব্যাখ্যাত হইল।" সুতরাং যে সকল উপনিষদের বচন শঙ্কর এবং রামানুজ এই উভয়ের ভাষ্যে উদ্ধৃত দেখা যায় তাহা যে গুরুপরম্পরানুসারে বাদরায়ণের অভি-প্রেত বচন, স্বচ্ছন্দে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

উপরে উদ্ধৃত সূত্রের পরের সূত্রে জৈমিনির প্রতিবাদ বিবৃত হইয়াছে। জৈমিনি বলিতেছেন, কর্ম্মের কর্ত্তা আত্মা। সুতরাং আত্মা কর্ম্মের অঙ্গ এবং আত্মজ্ঞানও কর্ম্মের অঙ্গ। যে সকল উপনিষদের বচনে আত্ম-জ্ঞানের স্বতন্ত্র ফল কথিত হইয়াছে তাহা অর্থবাদ বা স্তুতিবাক্য মাত্র, তাহা সত্য নহে। ৩।৪।৩—৭ সূত্রে বাদরায়ণের মতের বিরুদ্ধে অন্যান্য যুক্তিও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল যুক্তিও জৈমিনির মতানুযায়ী মনে করা যাইতে পারে। তার পরের কয়েকটি সূত্রে (৮-১৫) এই সকল যুক্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। উভয় পক্ষই উপনিষদের উপর আপন আপন মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। জৈমিনি এবং বাদরায়ণ উভয়ের বিবৃতি পাঠ করিলে মনে হয়, উপনিষদে দুই প্রকার প্রমাণই আছে। তারপর আবার বাদরায়ণ বলিয়াছেন (৪।১৭)—"বেদে ঊর্দ্ধরেতাগণের আত্মজ্ঞান লাভের কথা পাওয়া যায়।" এই সূত্রের পরের সূত্রে জৈমিনির মত উদ্ধৃত হইয়াছে। জৈমিনি বলিতেছেন, ঊর্দ্ধরেতাগণের আশ্রম-

* ৺কালীবর বেদান্তবাগীশের বঙ্গানুবাদের অনুসরণ করিয়া বেদান্তদর্শনের উদ্ধৃত সূত্রের এবং শাঙ্কর ভাষ্যের উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ দেওয়া হইল। মূল উদ্ধৃত হইল না।

সূত্রের অনুকূলে যে সকল শ্রুতির (উপনিষদের) বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে ঐ সকল আশ্রমের পরামর্শ বা উল্লেখমাত্র আছে, কিন্তু চোদনা বা বিধিবাক্য নাই, অর্থাৎ লিঙ্ আদি বিভক্তিযুক্ত বিধায়ক শব্দ নাই। আবার শ্রুতির বচনে ঊর্দ্ধরেতার আশ্রমের অপবাদ বা নিন্দাও আছে। এইরূপ শ্রুতির দৃষ্টান্তস্বরূপ শঙ্কর এবং রামানুজ এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন —

"বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ১৷৫৷২)।

"যে অগ্নি (অর্থাৎ যজ্ঞ) পরিত্যাগ করে সে-ই দেবতাদিগের বীর্য্যহন্তা হয়।"

শঙ্কর আরও দুইটি শ্রুতির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসী র্নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীতি।"

"তৎ সর্ব্বে পশবো বিদুঃ।"

"আচার্য্যকে তাঁহার বাঞ্ছিতধন (গুরুদক্ষিণা) দান করিয়া বংশপরম্পরার বিচ্ছেদ ঘটাইও না। অপুত্রের স্বর্গাদিলোকলাভ হয় না।"

"তাহাদের সকলকে পশু বলিয়া জানিবে।"

জৈমিনির এই প্রতিবাদের উত্তরে বাদরায়ণ উপনিষদের কোন বিধিবাক্যের উল্লেখ করিতে পারেন নাই, পরন্তু যে বচন সম্বন্ধে জৈমিনি বলিয়াছেন, তাহাতে ঊর্দ্ধরেতাগণের আশ্রমসকলের উল্লেখ (পরামর্শ) মাত্র আছে, সেই বচনকেই কোন্ প্রকারে বিধায়ক করিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারগণ বাদরায়ণকে সমর্থন করিবার জন্য উপরে উদ্ধৃত জাবাল উপনিষদের বচন প্রদান করিয়াছেন। তাহারা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন যে, বাদরায়ণ এই জাবাল উপনিষদের বচনের উল্লেখ মাত্রও করেন নাই। বেদান্তদর্শনের ৩৷৪৷২০ সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"অনপেক্ষ্যৈব জাবালশ্রুতিমাশ্রমান্তরবিধায়িনীমযমাচার্য্যোঽত্রাপ্রবর্ত্তিতঃ। বিদ্যতে এব আশ্রমান্তরবিধিশ্রুতিঃ প্রত্যক্ষা গার্হস্থ্যাৎ" ইত্যাদি।

"আচার্য্য বাদরায়ণ আশ্রমান্তর (বানপ্রস্থ, ভিক্ষু) বিধায়িনী জাবাল শ্রুতির অপেক্ষা না করিয়াই এই বিচার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। গার্হস্থ্য ছাড়া বানপ্রস্থাদি আশ্রমবিধায়ক প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ শ্রুতির বচনও আছে। ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া" ইত্যাদি।

রামানুজ পূর্ব্বোদ্ধৃত জাবালোপনিষদের বচন উদ্ধৃত করিয়া তার পরের অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন—

"যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ইতি জাবালানামাশ্রমবিধিসদ্ভাবাৎ ক্বৈতেষ্বপরেষপি বাক্যেষাশ্রমপ্রাপ্তিরর্থতা অবগম্যতে উপপাদিতম্।"

"'যেদিন বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে সেই দিনই প্রব্রজিত হইবে।' জাবালগণের এই আশ্রমান্তর গ্রহণবিধি থাকায় নাই, এই প্রকারে বিচার হওয়ায় যে সকল বাক্য আলোচিত হইয়াছে তাহাদের অন্যপ্রকার অভিপ্রায় থাকিলেও ঊর্দ্ধরেতার আশ্রম অবশ্য প্রবেশ করিতে হইবে, ইহা উপপন্ন হয়।"

গার্হস্থ্য আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্য আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে, এই বিষয়ে জাবালোপনিষৎ ভিন্ন শঙ্করের এবং রামানুজের নিকট পরিচিত অন্য কোনও উপনিষদে বিধিবাক্য পাওয়া যায় না। অথচ জৈমিনি এবং বাদরায়ণ—এই দুইজনের একজনেও এই উপনিষদের বচনের কোন উল্লেখ করেন নাই। এইরূপ ঘটনা হইতে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হইতেছে, জৈমিনির এবং বাদরায়ণের সময়ে জাবালোপনিষদের অস্তিত্বই ছিল না; এই উপনিষৎ ঐ সময়ের পরে এবং শঙ্করের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

একদিকে, আদিম উপনিষদ্গুলিতে, বানপ্রস্থের বা ভিক্ষুর আশ্রমপ্রবেশ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ বিধির অভাব দেখা যায়; আর একদিকে, পরিব্রাজকগণের উল্লেখ, যাজ্ঞবল্ক্যের বিষয় ত্যাগের বিবরণ, এবং স্থানে স্থানে সন্ন্যাসের প্রশংসা পাওয়া যায়। ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য কি? ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য, সন্ন্যাস বেদপন্থী ব্রাহ্মণ সমাজে বা বৈদিক আর্য্যসমাজে উৎপন্ন হয় নাই; ইহা

আগে অবৈদিক, হয়ত অনার্য্য সমাজে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ বৈদিক ব্রাহ্মণগণকর্তৃক অবলম্বিত হইয়াছিল। বৈদিকগণের মধ্যে যাঁহারা প্রথম এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা কোন বিধিবাক্যের অপেক্ষা রাখেন নাই। তারপর যখন স্মার্ত্তগণ এবং জৈমিনিপ্রমুখ মীমাংসকগণ প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ বেদবিধির অভাব লক্ষ্য করিয়া বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেন, তখন বাদরায়ণপ্রমুখ আর একদল মীমাংসক কর্ম্মসন্ন্যাসের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কালক্রমে বাদরায়ণেরই জয় হইল। স্মার্ত্তগণ তখন আপোষ করিতে বাধ্য হইলেন। মনু (৬।২) এবং পরবর্ত্তী স্মার্ত্তগণ আশ্রমসমুচ্চয়ের ব্যবস্থা করিলেন। অর্থাৎ মানবজীবনকে সমান চারি ভাগে ভাগ করিয়া প্রথম ভাগে ব্রহ্মচর্য্য (বেদাধ্যয়ন), দ্বিতীয়ভাগে গার্হস্থ্য, তৃতীয়ভাগে বানপ্রস্থ এবং চতুর্থভাগে ভিক্ষুআশ্রমবাসের ব্যবস্থা করিলেন। ভগবদ্গীতা পাঠ করিলে সহজে মনে হয়, মোক্ষদায়ক বা সিদ্ধিদায়ক আত্মজ্ঞানকে গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অঙ্গীভূত করা হইয়াছে। এইরূপ মতকে বলে জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়বাদ। গীতাভাষ্যের অবতরণিকায় শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"তত্রকেচিদাহুঃ,—সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস পূর্ব্বকাৎ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠামাত্রাদেব কেবলাৎ কৈবল্যং ন প্রাপ্যত এব, কিং তর্হি? অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মসহিতাৎ জ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি সর্ব্বাসু গীতাসু নিশ্চিতোঽর্থ ইতি।"

"কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস (গার্হস্থ্যধর্ম্ম ত্যাগ) করিয়া কেবল আত্মজ্ঞানের অনুসরণ করিলে কৈবল্য (মোক্ষ) লাভ হয় না। কি উপায়ে তবে কৈবল্য লাভ হয়? বেদে এবং স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত কর্ম্ম (গার্হস্থ্যধর্ম্ম) অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে যে আত্মজ্ঞান লাভ হয় তাহাই কৈবল্যপ্রাপ্তির কারণ; ইহাই সমস্ত গীতার নিশ্চিতার্থ।"

"কেচিৎ" অর্থ শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী গীতাব্যাখ্যাকারগণ। তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কর্ম্মের বা গার্হস্থ্যধর্ম্মের সহিত মিলিত জ্ঞান মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ, ইহাই গীতার সার কথা। অবতরণিকায় শঙ্কর সংক্ষেপে এই মতের খণ্ডন করিয়া উপসংহার করিয়াছেন—

"তস্মাদ্গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ, ন কর্ম্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ, যথা চায়মর্থস্তথা প্রকরণশো বিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ।"

"অতএব কেবল তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, কর্ম্মের সহিত (গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সহিত) মিলিত তত্ত্বজ্ঞানে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না, ইহাই গীতার নিশ্চিত অর্থ। গীতার এই সার কথা আমরা বিষয়ানুসারে বিভাগ করিয়া যথাস্থানে দেখাইব।"

বাদরায়ণের হাতে ত্যাগ বা সন্ন্যাসধর্ম্ম মীমাংসক সমাজে জয়লাভ করিয়াছিল; শঙ্করের হাতে ত্যাগ দিগ্বিজয়ী হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য করিয়া বেদাধ্যায়নের এবং বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠানের বিলোপ সেই দিগ্বিজয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু স্মার্ত্তগণ কখনও বিষয়ত্যাগ অনুমোদন করিতে সম্মত হয়েন নাই। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ যখন পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সে বিষয় ত্যাগ অনুমোদন করিলেন, তখন অবশ্য গৌতমের ও বৌধায়নের মত গার্হস্থ্য ভিন্ন অন্য আশ্রম অস্বীকার করিবার উপায় রহিল না। তখন স্মার্ত্তগণ বলিতে আরম্ভ করিলেন, বিষয়ত্যাগ এবং ঊর্দ্ধরেতার ব্রত গ্রহণ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে বিহিত হইলেও কলিকালে নিষিদ্ধ। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে সঙ্কলিত অপরার্ক নামক যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির টীকায় (১।১৫৬) নিম্নলিখিত স্মৃতির বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

গোপশুং দেবরাৎ পুত্রং সত্রযাগং কমণ্ডলুম্।
সুরাপ্রয়োগং ভিক্ষুং চ ন কুর্বীত কলৌযুগে।

"কলিযুগে যজ্ঞে গোবধ, দেবরের দ্বারা বিধবা ভ্রাতৃবধূতে পুত্রোৎপাদন, সত্র (দ্বাদশ দিবসের অধিক স্থায়ী যজ্ঞ) অনুষ্ঠান, কমণ্ডলু বহন, সুরাপান এবং চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবে না।"

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে সঙ্কলিত হেমাদ্রির "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণিতে" (কালনির্ণয়ে) আদিত্যপুরাণ হইতে

কলিকালে বর্জ্জনীয় ক্রিয়াকলাপের তালিকাপূর্ণ এক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মাধব, রঘুনন্দনাদি পরবর্তী নিবন্ধকারগণও এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বচনে—

"বানপ্রস্থাশ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধিচোদিতঃ"

"শাস্ত্রবিধি অনুসারে বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ" কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে। রঘুনন্দনের "উদ্বাহতত্ত্বে" কলিকালে বর্জ্জনীয় আচার সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয় পুরাণের একটি বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে "দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য" বা ঊর্দ্ধরেতার অবস্থা নিষিদ্ধ হইয়াছে। নিবন্ধকারগণের ধৃত এই সকল বচনে অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, ব্রাহ্মণাদির শূদ্রপাচকের অন্ন গ্রহণও কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে। উচ্চজাতির হিন্দুরা যথাবিধি এই নিষেধ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বিষয়ত্যাগের নিষেধ কখনও প্রতিপালিত হয় নাই। বিষয়ত্যাগ সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। একান্ত সংযমী সত্ত্বগুণপ্রধান লোকের পক্ষেই কেবল প্রকৃত ত্যাগ সম্ভবপর। যুগযুগান্তর হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ প্রকৃতির অসংখ্য লোক বিষয় ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধরেতার ব্রত পালন করিয়া আসিতেছেন। বেদের নিষেধ না মানিয়া তাঁহারা প্রজাতন্তুর বা বংশধারায় বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন। ইহার ফলে হিন্দুজাতির মধ্যে কত কোটি সদ্বংশ যে নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে কে তাহার গণনা করিতে পারে? বহু সদ্বংশের বিলোপ হিন্দুজাতির অধঃপতনের একতম কারণ।

প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুরা বিষয় ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন আধ্যাত্মিক স্বারাজ্য লাভ করিবার জন্ত। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দে পার্থিব স্বারাজ্য লাভের জন্তও বিষয়ত্যাগের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে। এই ত্যাগ ঠিক হিন্দুর কর্ম্ম সন্ন্যাস নহে, পাশ্চাত্য পরার্থে আত্মোৎসর্গ। মুক্তির জন্ত বিষয়ত্যাগের ঢেউও খুব সম্ভব ভারতবর্ষ হইতেই য়ুরোপীয় খৃষ্টান-সমাজে পৌঁছিয়াছিল। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিগণের ঊর্দ্ধরেতা হওয়া আবশ্যক। এই সম্প্রদায়ে এখনও সন্ন্যাস গ্রহণের রীতি আছে। কিন্তু য়ুরোপ হইতে যে বৈরাগ্যের ঢেউ ভারতবর্ষে আসিয়াছে তাহার লক্ষ্য পার্থিব হিত। কার্ল মার্কস, জন রাস্কিন এবং টলষ্টয় এইরূপ ত্যাগী ছিলেন। য়ুরোপে এইরূপ ত্যাগীকে লোকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু বিচার না করিয়া তাহাদের উপদেশ কেহ গ্রহণ করে না। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈরাগ্য এদেশে আসিয়া এই দেশীয় বেশ ধারণ করিয়াছে, এবং শিক্ষিত হিন্দুগণের অন্ধবিশ্বাস আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অন্ধবিশ্বাসের অবসর থাকিতে পারে; কিন্তু পার্থিব প্রত্যক্ষ বিষয়ে অন্ধ-বিশ্বাস বুদ্ধিবৃত্তির দুর্ব্বলতার পরিচায়ক।

স্বপ্নপ্রাণ

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী

আকাশ যেখানে বাঁধা প'ড়ে আছে ধরার আলিঙ্গনে,
আমার রাণীর মণি-মন্দির ওইখানে নির্জনে ;
দুলদুলাভ তড়িতের মতো ছুটে চলে মোর রথ,
ব্যবধান তবু আজো ততটুকু — এ কি বিচিত্র পথ !

ওখানে যে-বীণা গুঞ্জরে তা'র এখানে শুনি যে সুর ;
কমকণ্ঠের মঙ্গলগান ভেসে আসে সুমধুর ;
দেখা যায় যেন নীলাম্বরীর লীলায়িত অঞ্চল,
ঘন-অঞ্জন-গঞ্জিত কালো আলুলিত কুন্তল ; —

অবিরাম চলি, তবু এইটুকু পথের হয় না শেষ !
তাই ভাবি আমি দিগন্তপানে চাহিয়া নির্নিমেষ :—
কেহ কি আমার নিষ্ফলতার সায়ক হানিয়া বুকে
আড়ালে দাঁড়ায়ে জয়-গৌরবে হাসিতেছে কৌতুকে ?

জানি, আমি জানি, নহে মোর রাণী মায়াময়ী মরীচিকা,
শূন্যের বুকে সোনার মূরতি স্বপন-তুলিতে লিখা ;
জানি ক্ষণিকের আলেয়ার লীলা নহে নহে মোর রাণী,
কল্পলোকের আকাশচারিণী কবির কবিতাখানি ।…

মর্ত্যের মাটি, শত ত্রুটি তা'র — এই মাটি মোর মূল ;
মানুষ আমার এ জীবনে কত পরমাদ কত ভুল ;
মর্ত্য-সীমার বাহিরে যা আছে নিষ্পাপ নিরমল,
নিষ্কলঙ্ক চিরমধুরের সুষমা-সমুজ্জ্বল,—
আমি তো সে-ধনে চাহিনি জীবনে ; এই ধরণীর বুকে
আমারি মতন শত-ভুলে-ভরা ক্ষণ-লীলা কৌতুকে
আনন্দময়ী চঞ্চলা যেই মাটির প্রতিমা আছে,
আমার বুকের ব্যাকুল বাসনা তাহারেই চাহিয়াছে—
হে দেবতা, এ কি পাপ ?
অনুকম্পায় ফিরাও তোমার বর্ষীয় অভিশাপ ।

রাজা রামমোহন রায়

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

"রামমোহন বঙ্গদেশকে গ্যানিট্‌-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র আজ তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি-মৃত্তিকা লেপন করিয়া গিয়াছেন"—

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শতবর্ষ পূর্ব্বে বিলাতে বাঙ্গালী রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। রামমোহনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশের অমার অন্ধকার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল, তখন দেশ অন্ধকারের মধ্যে আলোক-লাভের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করিবার শক্তিও বুঝি হারাইয়াছিল। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য-বর্ণনায় বিজ্ঞবর ওলডেন বার্গ বলিয়াছেন—উত্তুঙ্গশৃঙ্গশালী পর্ব্বত ও দুস্তর সমুদ্র ভারতবর্ষকে অন্যান্য দেশ হইতে এমনভাবে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীরা স্বতন্ত্রভাবে সভ্যতার ও শিল্পের, শিক্ষার ও দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতবর্ষের সমাজ-বিন্যাসের স্বাতন্ত্র্য অসাধারণ। কিন্তু চিরদিন কোন দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। বাণিজ্যের আগ্রহে যে সংযোগ স্থাপিত হয়, সেই সংযোগ-সেতু-পথে বিজয়-বাসনা অগ্রসর হয়। ভারতবর্ষেও তাহাই হইয়াছিল। বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া মুসলমান এদেশে অগ্রসর হইয়াছিল এবং তাহার পর বিজয়ের বাত্যা ভারতবর্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। ভারতবর্ষ মোগল-পাঠান, শক-হূন প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কোন রূপে আপনার বৈশিষ্ট্য-রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার অবস্থা ম্যাথু আর্ণল্ড্ বর্ণনা করিয়াছেন—

> The East bowed low before the blast,
> In patient, deep disdain ;
> She let the legions thunder past,
> And plunged in thought again.

তাহার পর "খুলিল দ্বিতীয় অঙ্কে দৃশ্য অভিনব।" রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে নূতন অভিনেতার আবির্ভাব হইল; বণিক ইংরাজ এদেশে বাণিজ্য-ব্যপদেশে আসিয়া ঘটনার আবর্ত্তনে রাজদণ্ড হস্তগত করিল। দেশ তখন অরাজক। দিল্লীর শাসকের দুর্ব্বল হস্ত বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশে প্রসারিত হয় না—বাদশাহ অন্তঃপুরেই সম্রাট্; আবার মুর্শিদাবাদের অত্যাচারী শাসকের দণ্ড বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে পৌঁছে না; কেবল গ্রাম্য সমিতির কল্যাণে লোক আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে। চারিদিকে অত্যাচার—অনাচার—ক্ষমতার ব্যভিচার।

সেই সময় যখন ইংরাজ অশান্তির মধ্য হইতে, শান্তির ও বিশৃঙ্খলার মধ্য হইতে শৃঙ্খলার উদ্ভবসাধনে সচেষ্ট, তখন রামমোহনের আবির্ভাব। এদেশে ইংরাজ-শাসনের প্রবর্ত্তন কেবল রাজনীতিক বিপ্লব নহে; তাহার ফলে দেশে সমাজনীতি, ধর্ম্মমত প্রভৃতিতেও বিপ্লব সমুপস্থিত হইয়াছিল। হিন্দুর তীক্ষ্ণ প্রতিভা মুসলমান শাসনে—বিশেষ মুসলমান শাসনের শেষ দশায়—স্ফূর্ত্ত হইবার অবসর পায় নাই। এবার প্রতীচীর সংস্পর্শে আসিয়া নূতন অবস্থায় তাহা স্ফূর্ত্ত হইল। পতিত জমীতে যে বীজ বপন করা হয়, তাহা যেমন সহজেই অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, হিন্দুর প্রতিভারও তাহাই হইল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ হিন্দু ও মুসলমান ব্যবস্থা-বিধি সংগৃহীত করাইয়া য়ুরোপীয় বিচারকদিগের সহিত হিন্দু ও মুসলমান পণ্ডিত ও মৌলবী নিযুক্ত করিয়া বিচার-বিভাগের নূতন ব্যবস্থা করেন। ইহাতে তীক্ষ্ণধী বাঙ্গালীদিগের সহিত ইংরাজের সংযোগ হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কেরী, ওয়ার্ড ও মার্শম্যান শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তাহাতে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি, পুঁথি হইতে মুদ্রিত হয়। তাঁহারা বাঙ্গালা

সংবাদপত্রও প্রচার আরম্ভ করেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী সিভিলিয়ানদিগের শিক্ষার্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করিয়া দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেন। জোন্স, কোলব্রুক ও উইলসন সংস্কৃত সাহিত্যে গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন। ডেভিড হেয়ার ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন; ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড মেকলে এদেশে ইংরাজীতে শিক্ষা-প্রদানের প্রস্তাব করেন।

এদেশে রামমোহন রায়ই ইংরাজী শিক্ষার ও প্রভাবের প্রথম উল্লেখযোগ্য ফল। যে বৎসর ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ গভর্ণর হয়েন ও এদেশে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসর (১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে) হুগলী জিলার রাধানগর গ্রামে রামমোহনের জন্ম হয়। তাঁহার জীবন-কথা বৈচিত্র্যবহুল। তাঁহার পিতা রামকান্ত ক্ষুদ্র জমীদার ছিলেন। তিনি মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে চাকরী করিতেন। স্বগ্রামে বাঙ্গালা ও ফার্সী শিক্ষালাভ করিয়া নবম বর্ষ বয়সে আরবী শিক্ষার জন্য পাটনায় গমন করেন। তিন বৎসরে আরবী ভাষা আয়ত্ব করিয়া তিনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বারাণসীতে গমন করেন। বারাণসীতে তিনি উপনিষদ ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে স্বগ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি 'হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম-প্রণালী' গ্রন্থ গদ্যে রচনা করেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালা পদ্য সমৃদ্ধ হইলেও গদ্য-রচনা অধিক চলিত ছিল না। সেই হিসাবে তিনি বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্যের প্রবর্ত্তক এ কথা বলা যায়। তখনও বাঙ্গালা ভাষা বর্ত্তমান রূপ ধারণ করে নাই। আমরা তাঁহার সতী-দাহ-বিষয়ক প্রস্তাব হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি —

"এরূপ সহমরণে ও অনুমরণে পাপই হউক কিম্বা যাহা হউক, আমরা এ ব্যবহারকে নিবর্ত্ত করিতে দিব না, ইহার নিবৃত্তি হইলে হঠাৎ লৌকিক এক আশঙ্কা আছে যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী সহগমন না করিয়া বিধবা অবস্থায় রহিলে তাহার ব্যভিচার হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু সহমরণ করিলে এ আশঙ্কা থাকে না, জ্ঞাতিকুটুম্ব সকলেই নিঃশঙ্ক হইয়া থাকেন এবং পতিও যদি জীবৎকালে জানিতে পারে তবে তাহারো মনে স্ত্রীঘটিত কলঙ্কের কোনো চিন্তা থাকে না।"

পুত্র, প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে রচনা প্রকাশ করায় রামমোহনের পিতা বিরক্ত হয়েন এবং রাম-মোহনকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে হয়। তিনি তখন পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময় তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মমতের আলোচনা করেন। তিন বৎসর পরে পিতা পুত্রকে ফিরিয়া আসিতে বলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া ২২ বৎসর বয়সে রামমোহন ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফরাসী, লাটিন ও হিব্রু ভাষাতেও কিছু অধিকার লাভ করেন। এই সময়ে তিনি প্রতিমাপূজা, সতীদাহ প্রভৃতি বিষয়ে ব্রাহ্মণ-দিগের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হয়েন।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি সরকারী চাকরী পাইয়া, সেরেস্তাদার হইয়া ত্রয়োদশবর্ষ পরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে অবসর লইয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

এইবার তিনি একদিকে ক্রিয়া-কাণ্ড-বহুল হিন্দু ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের ও অপর দিকে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক-দিগের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি উপনিষদাদি হিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ সাধারণের অধিগম্য করিবার জন্য বাঙ্গালায় অনূদিত করেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বেদান্তের বঙ্গানুবাদ ও পরবৎসর 'বেদান্তসার' ও বেদান্তের ইংরাজী অর্থানুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮১৬ ও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি উপনিষদের বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি সতীদাহ নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন।

রাজা রাধাকান্ত দেব প্রচলিত হিন্দুমতের সমর্থক হইয়া ব্রাহ্মণ রামমোহনের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিতে থাকেন।

খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত তাঁহার আলোচনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আলোচনায় তাঁহার প্রতিভা বিলাতে ও আমেরিকাতেও স্বীকৃত হয়।

আমরা যে সব কার্য্যের উল্লেখ করিলাম, সে সবই পর-মত-খণ্ডনের কারণ ও সেই জন্য উল্লিখিত। কিন্তু তাহাতেই রামমোহনের কৃতিত্ব নহে; পরন্তু অন্য কার্য্যেই তাঁহার প্রতিভা স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—

"কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা—আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে, রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নব শিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিলুপ্তপ্রায় বেদ, পুরাণ, তন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।"

শেষোক্ত কার্য্যের গৌরব আমরা অসাধারণ বলিয়া বিবেচনা করি। রামমোহনের অনেক ভক্ত বলেন, তিনি হিন্দু ধর্ম্ম প্রকারান্তরে ত্যাগ করিয়াছিলেন। আমরা ইহা স্বীকার করি না। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ একবার কোন আনুষ্ঠানিক হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

"আমার সমস্ত জীবন প্রচলিত হিন্দু আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন। তাঁহারা হয় ত মনে করিবেন, আমার অন্তর্নিহিত হিন্দুত্বই আমাকে আজ আপনাকে হিন্দু বলিয়া পরিচিত করাইতে প্রবৃত্ত করিতেছে। তাহা যে অসম্ভব তাহা নহে। কিন্তু আমার মনে হয়—হিন্দু সমাজে তাঁহাদিগের যথেষ্ট স্থান না থাকিলেও যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মত্যাগে অসমর্থ, আমি তাঁহাদিগের অন্যতম। অল্প বয়সেই আমার ধারণা জন্মিয়াছিল—যাঁহারা ভগবানে বিশ্বাস করেন এবং যাঁহাদিগের সে বিশ্বাস নাই, যাঁহারা একেশ্বরবাদী এবং যাঁহারা তেত্রিশ-কোটি দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন—বিশাল হিন্দুধর্ম্মে সকলেরই স্থান আছে। প্লেটো বলিয়াছেন—যিনি যেরূপ ইচ্ছা চিন্তা করিতে পারেন, কিন্তু সে চিন্তা তিনি প্রকাশ করিবেন না—যিনি তাঁহার দেশের ধর্ম্মমতকে লোকের নিকট হেয় করেন, তিনি মহা অপরাধ করেন—মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত তাঁহার আর কোন উপযুক্ত দণ্ড নাই।" "A man, who brings into contempt the creed of his country, is the deepest of criminals, he deserves death and nothing else."

রামমোহনের মত দূরদর্শী লোক ইহা বুঝিতে পারেন। তাই তিনি সমাজের শৃঙ্খলানাশের বিরোধী ছিলেন—এমন কি বর্ণ-বিভাগও নষ্ট করেন নাই। বিলাতে যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার গল-দেশে ব্রাহ্মণের উপবীত লক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার মতাবলম্বী দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অসবর্ণ বিবাহের বিরোধী ও হিন্দু সংস্কারানুবর্ত্তী ছিলেন।

রামমোহন পৌত্তলিক আচারের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি তাহার বিরুদ্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নহে—হিন্দু-শাস্ত্রকারদিগের। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন বিধবা-বিবাহ হিন্দু-শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিয়া তাহা প্রবর্ত্তিত বা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, রামমোহন তেমনই নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত বলিয়াই তাহা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-সমাজ ত্যাগ করেন নাই—হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় বর্জ্জন করেন নাই। হিন্দুর অধিকারী-ভেদ-ব্যবস্থা কাহারও অবিদিত নাই। কি জন্য হিন্দুধর্ম্মে প্রতিমাপূজা—ঈশ্বরকে আকারদানের ব্যবস্থা আছে, তাহা সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বুঝাইয়াছেন—"ঈশ্বর অনন্ত জানি, কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়-পিঞ্জরে পুরিতে পারি না, সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎ-পিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।"

হিন্দুর ধ্যান-ধারণা তাহাকে জগদীশ্বরের আরাধনায় উদ্বীত করে। হিন্দুধর্মে দার্শনিকতারও স্থান আছে। রামমোহন যে সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে সময় হিন্দুধর্মের প্রথম স্তরের নিন্দা করিয়া খৃষ্ট-ধর্ম-যাজকরা হিন্দুকে খৃষ্টান করিবার প্রবল চেষ্টা করিতেছিলেন। রামমোহন তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দেন, হিন্দুধর্মের বহিরাবরণ দেখিলেই হইবে না— তাহার অন্তরে প্রবেশ করিলে আর দ্বিধার অবকাশ থাকিবে না। তিনি যে উপনিষদের উপদেশ দেশবাসীকে শুনাইয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া জার্মান কোবিদ সোপেনহর বলিয়াছিলেন —

"ইহা জীবনে আমার সান্ত্বনার কারণ হইয়াছে, মৃত্যুতেও তাহাই হইবে" — "It has been the solace of my life ; it will be the solace of my death."

রামমোহন সেই উপনিষদ-বর্ণিত ধর্ম্মমতের অবতারণা করিয়া খৃষ্ট-ধর্ম্ম-মতকে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ প্লাবিত — মজ্জিত করিতে দেন নাই। ইহা যে তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি তাহা কে অস্বীকার করিবে ? রামমোহন মানুষ ছিলেন এবং তিনি যে-কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে-কালে অবতার সৃষ্টির বাসনা সমাজে বলবতী ছিল না,—তাই তাঁহার চরিত্রে যে মানবোচিত বহুশক্তি ছিল সে সকলের যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। এমন কি কেহ কেহ তাহাতেই তাঁহার নবধর্ম্ম-মত প্রচারের কারণ সন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি না। তিনি যে কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি হিন্দু-সমাজকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের বিশালত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যে ধর্ম্মে চার্ব্বাকেরও মতও ঘৃণিত হয় নাই এবং যে ধর্ম্মাবলম্বীরা গৌতম বুদ্ধকেও অবতারগণ-মধ্যে স্থান দান করিয়াছেন—

"নিন্দাকর শ্রুতিজাত যজ্ঞবিধিনিচয়,
পশুঘাত দেখিয়া করুণ হৃদয়;
আসিল কেশব নিজে বুদ্ধরূপ ধরি—
জয়! জয়! জগদীশ—জয়! জয়! হরি!"

সেই ধর্ম্মের যে রূপ ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবে, তিনি তাহার সেই রূপই দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত—খৃষ্ট-বর্জ্জিত খৃষ্টধর্ম্ম নহে। তিনি সংস্কারকামী ছিলেন—সংহার চাহেন নাই। যে সমাজবিন্যাস শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত তিনি তাহা নষ্ট করিতে চেষ্টা করেন নাই।

কেহ কেহ মনে করেন, 'ব্রাহ্ম সমাজ' স্থাপন রামমোহনের প্রধান উল্লেখযোগ্য কার্য্য। সেই জন্য আমরা তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম-মতের আলোচনায় এত অধিক স্থান ব্যয় করিয়াছি। কিন্তু ইহাই তাঁহার একমাত্র উল্লেখযোগ্য কার্য্য নহে।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বাঙ্গালা গদ্য সৃষ্টিতে বা সংস্কারে তাঁহার কৃতকার্য্যের কথা বলিয়াছি। যিনি অপ্রচলিত গদ্য রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তিনি যে প্রচলিত পদ্য রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতে পারিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমরা নিম্নে তাঁহার রচিত একটি সুপরিচিত সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম—

"মনে স্থির করিয়াছ চিরদিন কি সুখে যাবে।
জীবন যৌবন ধন মান রবে সমভাবে॥
এই আশাতরু-তলে
বসিয়াছ কুতূহলে।
বিষম করিয়া কোলে আম না জানিতে হবে॥
ওরে মন ভম নাম
দিবা ভবে অন্ধকার।
সুখাভে দুঃখেরই ভার বহিতে হবে॥
অতএব অজ্ঞান
যে অবধি থাকে প্রাণ।
স্মরণ কর সমাধান নির্ম্মল আনন্দ পাবে॥"

তাঁহার সময়ের সকল উন্নতিদ্যোতক কার্য্যেই তিনি সাগ্রহে যোগ দিতেন। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা-প্রদান জন্য সর্ব্বপ্রথম যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় সেই হিন্দু-কলেজ-সংস্থাপনে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ডেভিড হেয়ার ও স্যর এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টের সহযোগিতা করিয়াছিলেন। ইংরাজ তখনও এদেশে রাজ্য-স্থাপন করিবার কল্পনা দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করেন নাই; কাজেই এদেশে কিরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে, সে সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। কেহ কেহ মনে করিতেছিলেন এদেশে সংস্কৃত শিক্ষাই প্রয়োজন, ইংরাজী শিক্ষায় সুফল না ফলিয়া কুফল ফলিবে। কিন্তু রামমোহন বুঝিয়াছিলেন, ইংরাজী শিক্ষালাভ না করিলে এ দেশের লোক পৃথিবীতে আপনার উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে না।

প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে অধিকার লাভ না করিলে এদেশের লোক "যে তিমিরে সে তিমিরে" থাকিবে। সেই জন্য ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টকে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন-জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া এক পত্র লিখেন। মেকলের যে প্রস্তাবের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ইহার পরিবর্ত্তী এবং এই পত্র লিখিত হইবার দশ বৎসর পরে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক এদেশে ইংরাজীতে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন। ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ফল কি হইবে, তাহা তখন রামমোহনের বহু স্বদেশবাসী উপলব্ধি করিতে না পারিলেও, কোন কোন দূরদর্শী ইংরাজ যে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহা রিচার্ডস্ লিখিত ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পুস্তক পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন —

"The school master is abroad with his primer, pursuing a course which no power of man can hereafter arrest."

শিক্ষার ফলে যে শক্তির উদ্ভব হইবে, তাহা মানুষ প্রহত করিতে পারিবে না।

আবার —

"The knowledge now diffused and diffusing throughont India, will shortly constitute a power which three hundred thousand British bayonets will be unable to control."

অর্থাৎ সমগ্র ভারতে যে জ্ঞান বিস্তারলাভ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা অল্পকাল মধ্যেই যে শক্তির উদ্ভব করিবে তাহা তিন লক্ষ বৃটিশ-সঙ্গীন (ইংরাজের সেনাবল) নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে না।

যে ফরাসী লেখক বলিয়াছেন—লেখনীর শক্তি তরবারের শক্তি অপেক্ষা অধিক, তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাহুবল অপেক্ষা জ্ঞানবল অধিক ফলোপধায়ী। রামমোহনও তাহাই বুঝিয়াছিলেন।

তাঁহার কার্য্যফলে আজ খণ্ড-ভারতের স্থানে মহা-ভারত সৃষ্ট হইয়াছে। বিসমার্কের প্রতিভা বাহুবলের সাহায্যে বহুখণ্ডে বিভক্ত জার্ম্মাণীকে এক সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছিল, রামমোহন-প্রমুখ বাঙ্গালীদিগের প্রতিভা বাহুবল বর্জ্জন করিয়া বহুধা-বিভক্ত ভারতবর্ষকে এক করিয়াছে। আজ যে জাতীয়তার জয়ধ্বনি দিকে দিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, আজ যে দেশাত্মবোধ জাতিকে তাহার জন্মগত অধিকারলাভে উৎসাহী করিতেছে, ঐ শিক্ষাই তাহার কারণ। সুতরাং একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, রামমোহনপ্রমুখ ব্যক্তিরা যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহাতে ঈপ্সিত ফল ফলিয়াছে।

এদেশে সংবাদপত্রের ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়, পরাধীন দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অধিকাংশ ইংরাজ-শাসকের প্রীতিপ্রদ হয় নাই এবং অনেকে অনেক প্রকারে সে স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত ইতিহাস প্রদানের স্থান-আমাদিগের নাই। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সরকার 'কলিকাতা জারণাল'-পত্রের সম্পাদক জেমস্ সিল্ক বাকিংহামকে ১৫ই এপ্রিলের পর এদেশে থাকিবার অনুমতি প্রত্যাহার করিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগের

আদেশ দেন। তাঁর ভারত-ত্যাগের পক্ষকাল পরেই 'গভর্ণমেন্ট গেজেটে' বাঙ্গালায় সংবাদপত্রের ও পুস্তিকাদির প্রচার জন্ত ছাড় লইবার ব্যবস্থা করিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। তৎকাল-প্রচলিত ব্যবস্থানুসারে উহা সুপ্রিম কোর্টে দাখিল করা হয়। ১৫ই মার্চ তারিখে উহা পেশ হইলে দুই দিন পরেই ছয় জন বাঙ্গালী কোর্টে উহার প্রতিবাদ করিয়া আবেদন করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচক ব্যবস্থার প্রতিবাদকারীদিগের মধ্যে রামমোহন রায় অন্ততম। তাঁহার সহকর্মীদিগের নাম—

চন্দ্রকুমার ঠাকুর
দ্বারকানাথ ঠাকুর
হরচন্দ্র ঘোষ
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রসন্নকুমার ঠাকুর

তাঁহাদিগের আবেদন অগ্রাহ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের কার্য্যের গৌরব ম্লান হইতে পারে না। সুতরাং বলা যাইতে পারে, এ দেশে যাঁহারা নিয়মানুগ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, রামমোহন তাঁহাদিগের অন্ততম।

সতীদাহ নিবারণকল্পেও রামমোহন চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বহুদিন হইতে রামমোহন একবার প্রতীচী পর্য্যটনের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাহার সুযোগ উপস্থিত হইল। দিল্লীর বাদশাহ তাঁহার কতকগুলি অভিযোগ বিলাতে পাঠাইতে অভিলাষী হয়েন। রামমোহনের খ্যাতির বিষয় অবগত হইয়া তিনি তাঁহাকেই যোগ্যপাত্র মনে করিয়া সেই কার্য্যের ভার প্রদান করেন এবং তাঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন।

তখন যে বিলাতে গমন সামাজিক হিসাবে অসাধারণ সাহসের পরিচায়ক ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু রামমোহনের সাহস অসাধারণই ছিল। তাঁহার খ্যাতি বিলাতে তাঁহার পূর্ব্বগামী হইয়াছিল। সেই জন্ত তিনি তথায় ভারতে বিচার ও রাজস্ব-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদান করিতে আহূত হয়েন। এই সাক্ষ্যদান ব্যপদেশে তিনি যে প্রায় শত-পৃষ্ঠা-ব্যাপী পুস্তক রচনা করেন, তাহা তাঁহার দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অসাধারণ অভিজ্ঞতার ও দূরদর্শনের প্রমাণ। তিনি ভারতবাসীদিগের অবস্থা সম্বন্ধেও পরীক্ষিত হইয়াছিলেন।

বিলাতে তিনি বিশেষ সম্মান লাভ করেন। কবি ক্যাম্পবেল তাঁহার সম্বন্ধে লিখেন; প্রত্নতাত্ত্বিক রোশেন বেদের অনুবাদ সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ দার্শনিক তাঁহাকে "মানবজাতির সেবায় অতি প্রশংসিত, প্রিয় সহযোগী" বলিয়া অভিহিত করেন।

য়ুরোপে তিন বৎসর যাপনের পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭-এ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। বৃষ্টলে তাঁহার শব সমাহিত হয় এবং পরে তাঁহার পরম বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর সমাধিস্থানে একটি স্মৃতি-সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

রামমোহনের নানা কার্য্যের এই অসমগ্র পরিচয় হইতেই পাঠকগণ তাঁহার অসামান্ত প্রতিভার পরিচয় পাইবেন। বাস্তবিক "মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া"— আমরা যে সকল বিভাগ দেখিতে পাই সে সকলের প্রায় সকল বিভাগেই রামমোহনের অলোকসামান্ত প্রতিভা প্রযুক্ত হইয়াছিল এবং ঐন্দ্র-জালিকের দণ্ডস্পর্শ যেমন যাহা স্পর্শ করে, তাহাকেই স্বর্ণে পরিণত করে — মৃতকে জীবিত করে, তাঁহার প্রতিভা তেমনই যে কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছিল সেই কার্য্যই সুসম্পন্ন করিয়াছিল।

বাঙ্গালীর প্রতিভার প্রতীক রামমোহনের কার্য্যের বৈশিষ্ট্য — জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা — সর্ব্বত্র কালোপযোগী পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া দেশকে উন্নতির পথারূঢ় করা। কোন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন—"ইংরেজের মূল ধারণা

এই যে, নূতন প্রথাপেক্ষা পুরাতন প্রথার উৎকর্ষ অধিক এবং পুরাতন প্রথার উচ্ছেদসাধন না করিয়া সম্ভব হইলে সে সকলের উন্নতিসাধন করাই সঙ্গত।” রামমোহন এই মতাবলম্বী ছিলেন, তিনি রক্ষণশীল ছিলেন, জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষায় অবহিত ছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক পরিবর্তন প্রবর্ত্তানুরাগী ও উন্নতি-সাধন-প্রয়াসী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে এই সকল গুণের সম্মিলন তাঁহার কর্ম্মশক্তির উৎস উৎসারিত করিয়াছিল এবং তাঁহার আরব্ধ কার্য্য বাধা-বিঘ্ন-বহুল সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া সাফল্যের বন্দরে উপনীত করা সম্ভব করিয়াছিল। তিনি নবভারতের নবযুগ প্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যে দুর্গ-স্তম্ভ-শীর্ষ হইতে তূর্য্যধ্বনি করিয়া সুপ্ত জাতিকে জাগরিত করিয়া দিয়াছিলেন — তাহাদিগকে সোৎসাহে বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভের জন্য আগ্রহশীল করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের জয়যাত্রায় উন্নতির রথে সারথ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজ তাঁহার মৃত্যুর পর শতবর্ষের ব্যবধান হইতে আমরা তাঁহার কার্য্যের গৌরব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে উদয়াস্ত-ভাস্করারুণ-রাগ-রঞ্জিত অভ্রভেদী গিরি-শৃঙ্গের মত দেখিতে পাইতেছি। তিনি দূরস্থ হইলেও আজ তাঁহার গৌরব তাঁহার দেশকে ও দেশবাসীকে গৌরবমণ্ডিত করিতেছে। তাঁহার আদর্শ আজ তাঁহার স্বদেশবাসীকে তাঁহার অনুকরণে ও অনুসরণে আকৃষ্ট করিতেছে—যে পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছে—তাহা উন্নতির পথ—জয়ের পথ।

পাষাণের ফুল *

শ্রীনীলিমা দাস

আজি এ চন্দ্রিকারাত্রে পাষাণ ক'রেছে মোরে নিস্পন্দ-নীরব
পাষাণের স্তূপসম ; স্তব্ধ, মূক, অপলক। নয়ন-সম্মুখে
উন্মোচিত হ'লো বুঝি বিস্ময়ের রূপ-রাজ্য অসীম কৌতুকে
নিশীথ-গগন-তলে। পাষাণের এত রূপ,—সৌন্দর্য্য-বিভব!
বিরাট গাম্ভীর্য্য হেরি' ভয়ত্রস্ত মন মোর মানে পরাভব
হে বিশাল! তব নভ-চুম্বী ওই কিরীটের কাছে। গর্ব্ব-সুখে
ভরে' ওঠে চিত্ততল ; যেন কোন্ মূল্যহীন বিত্ত লভি' বুকে
প্রাণ রচে শতরূপে অমর্ত্ত্য অমূর্ত্ত এক বাণীহীন স্তব!

বিন্দু-সরসীর তীরে একান্ত নির্জ্জন শান্ত একাগ্রকাননে
সুন্দরেরে গাঁথিলো যে ইষ্টক-সমষ্টি-সাথে, তারে নমস্কার ;
ডুবে যায় ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র কাজ, সবি তুচ্ছ হেয় হয় মনে,
সঙ্কীর্ণতা ভুলি' প্রাণ তোমা' চাহি' ক্ষণকাল লভে সত্যসার!
সমস্যা জেগেছে কি এ? কিম্বা হবে কেশ-গুচ্ছ পাষাণের ফুল।
—গিরিসুতা পার্ব্বতীর [illegible]

* [illegible] দর্শনে রচিত।

ছবি

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

মগধের রাজা রুদ্রসেন মালব জয় করলেন এবং সেই জয়ের পর কেড়ে নিয়ে এলেন সেখানকার এমন একটি রত্ন, সারা ছনিয়ার রত্ন-ভাণ্ডার খুঁজে' বেড়ালেও যার সন্ধান মেলে না। সে রত্ন মালবের রাজকন্যা মালবিকা। মগধের কবি শেখর এই মালবিকাকে দেখে যে শ্লোক রচনা ক'রেছিলেন, তর্জ্জমা করলে তার ভাষা দাঁড়ায় এই রকমের—

"ডালিমের দানা—রঙ্ তার প্রায় পদ্মরাগ মণির মতোই লাল। রাজকন্যা মালবিকার ঠোঁটে সেই ডালিমের দানার আমেজ। ডালিমের রস মিষ্টি, কিন্তু তার চেয়েও ঢের বেশী মিষ্টি তাঁর সেই হাসি যা তাঁর ঠোঁটের উপরে ছলকে উঠে' টলকে পড়ে।

"বৈশাখের আকাশের কোলে হঠাৎ জাগে কাল-বৈশাখীর মেঘ—রঙ তার নীলে কালোয় মিশানো অপরূপ। রাজকন্যা মালবিকার চোখে দোলে কাল-বৈশাখীর সেই মেঘের মতোই নীলার আলো ও কালোর অন্ধকার। মেঘের বুকে তড়িৎ চমকায়, মালবিকার চোখ্ ছাপিয়ে ঝলক হানে দৃষ্টির বিদ্যুৎ।

"বসন্তের ছোঁয়া বনের দেহকে ফুলে ফুলে ফুলময় ক'রে তোলে। রাজকন্যা মালবিকার গতির ছন্দেও চোখ্ মেলে তাকায় কখনো বা রাজার বাগানের আধ্ফোটা গোলাপের কুঁড়ি, আবার কখনো বা নীল সরোবরের শ্বেত শতদলের পাপ্ড়ি। রাজকন্যার পিঠের উপরে এলিয়ে-পড়া একরাশ কালো চুল। সে চুল যে গন্ধ ছড়ায় তাতে মাতাল হ'য়ে ওঠে মানুষের মন।"

কবির এই বর্ণনার ভিতরে হয়তো একটু আধটু অত্যুক্তি আছে। কিন্তু তা হ'লেও মালবিকাকে দেখে সত্য সত্যই মন মাতাল হ'য়ে ওঠে। এই মালবিকাকে পেয়ে রাজার মনও মাতাল হ'য়ে উঠ্ল। তাই তিনি তাঁকে ডেকে একদিন বললেন—রাণী, তোমাকে চোখের আড়াল করতে ভরসা পাইনে। মনে হয়—ফিরে' এসে দেখ্বো, তুমি হয়তো মিলিয়ে গেছ। তোমাকে বুকে রেখেও সোয়াস্তি পাইনে, কারণ তোমার স্পর্শ আমাকে এমন ক'রেই আচ্ছন্ন ক'রে রাখে যে, চোখ্ হারিয়ে ফেলে তার দেখ্বার শক্তি। এ তুমি আমাকে কি যাদু করলে?

মালবিকা হেসে বললেন—মহারাজ, বন্দিনী যে তার উপরে অতখানি মন ঢেলে দিতে নেই। কারণ বন্দীর স্বাভাবিক ঝোঁকই থাকে মুক্তির দিকে। সুযোগ ও সুবিধা পেলে পালাবার লোভ সে হয়তো সম্বরণ ক'রে নিতে না-ও পারে।

—তা জানি রাণী, তা জানি। তাই তো আমি এমন একটা কিছু চাই যা তুমি হারিয়ে গেলেও তোমার মূর্ত্তিকে ফুটিয়ে রাখ্তে পারবে আমার চোখের সামনে।

মালবিকা আবার হাসেন। হেসে বলেন—মহারাজ, কায়ার চেয়ে ছায়ার মায়া যদি আপনার কাছে বড় হয়, তবে তার পথ তো ভারি সহজ। আমার নিজের একখানা ছবি আছে আমার কাছে। সেখানা আমি দিচ্ছি এনে আপনাকে। যদি আমি কখনো হারিয়ে যাই, আমার সেই ছায়াই হয়তো আপনাকে এই কায়ার মোহটাও ভুলিয়ে দিতে পারবে।

অন্ধকারের ভিতর হঠাৎ যেন একটি আলোর দীপ্তি চমকে যায়। রাজা বলেন—ছবি আছে তোমার? তোমার ছবি! দেখি।

রাণী মালবিকা তাঁর সজ্জার মঞ্জুষা খুলে' বা'র ক'রে নিয়ে এলেন একখানা আলেখ্য চার ধার যার সোনার পাতে মোড়া, রূপোর কাঠি দিয়ে ঘেরা। ছবিখানা হাতে নিয়েই রাজার ভুরু দু'টো কুঞ্চিত হ'য়ে উঠ্ল। তিনি অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন—হয়নি রাণী—কিছুই হয়নি। তোমার কোনো আদল ধরা পড়েনি, এ ছবির মুখে। মুখের দীপ্তি ধরা পড়েনি, চোখের দৃষ্টি ধরা পড়েনি, হাসির আলো ধরা পড়েনি। এ ছবি দেখে তো তোমাকে চেনা যায় না। আমি তোমার

এমন আলেখ্য আঁকাবো যা শিল্প-জগতে চিরদিনের জন্ম গর্ব্ব ও গৌরবের বস্তু হ'য়ে থাকবে।

পরের দিন দরবারে ব'সেই রাজা বললেন—মন্ত্রী, ঘোষণা ক'রে দাও, মগধের রাজা তাঁর নতুন রাণীর ছবি আঁকাতে চান। ভালো ছবি আঁকতে পারলে সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা তার পুরস্কার।

তোমার এমন আলেখ্য অঁাকাবো যা শিল্প-জগতে চিরদিনের জন্ম গর্ব্ব ও গৌরবের বস্তু হ'য়ে থাকবে।

রাজার ঘোষণা লোকের মুখে চ'ড়ে, হাওয়ার বুকে উড়ে দিখিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। গান্ধারের শিল্পীরা তা শুনলে, কাশী-কোশল-কৌশম্বীর শিল্পীরা তা শুনলে। পাহাড় ডিঙিয়ে সে সংবাদ পৌঁছালো চীনে, সাগর পেরিয়ে পৌঁছালো লঙ্কায়। সুতরাং চীন ও লঙ্কার শিল্পীরা তা শুনলে। এমনি ক'রে সারা দুনিয়ার শিল্পীদের কানে গিয়ে পৌঁছালো মগধের রাজার ঘোষণার কথা।

চা'র দিক থেকে মগধের রাজধানীতে শিল্পীর দল এসে ভীড় জমাতে সুরু করলে।

উজ্জয়িনীর শিল্পী—নাম তার মঞ্জুশ্রী। সারা ভারত জুড়ে তার খ্যাতি। রাণী মালবিকার ছবি ফুটিয়ে তুলতে সুরু করলে সে তার তুলির লেখায়। চেহারা নিখুঁৎ হ'লো। রঙ-এর ভিতরে ফুটে' উঠল দুধে আলতায় মিশালে যে রঙ হয় সেই রঙ-এর আমেজ। দাঁড়াবার ভঙ্গি হ'লো অপরূপ। কিন্তু হাজারো রূপসীর ভিতর থেকে রাণী মালবিকাকে যা আলাদা ক'রে রেখেছে তা ধরা পড়ল না তার তুলির লেখায়। রাজা খুশী-অখুশীর দোলায় দুলে' তাকে যথোচিত পুরস্কার দিয়ে বিদায় দিলেন।

তারপর এলো কাশীর শিল্পী যশোবর্দ্ধন। যশের আভায় সারা ভারতে তার জোড়া নেই। মালবিকার মুখের অবয়ব ঠিক রেখে তাঁর চোখে পরালো সে হরিণের দৃষ্টি, পায়ে পরালো নটরাজের নৃত্যের ছন্দ। ছবির ভিতর দিয়ে ঝ'রে পড়ল কল্পনাকে হার মানায় যে লাবণ্য তারি আভাস। কিন্তু বাইরের রূপই তো ছবির সব নয়। অন্তরের রূপের যে আভাটুকে বাদ ক'রে দিয়ে বাইরের

রূপ মোহ জাগায়, মালবিকার সেই সত্যিকারের রূপ ধরা পড়্‌ল না কাশ্মীর শিল্পীর তুলিতেও। সুতরাং তাকেও রাজা বিষণ্ণ মনে বিদায় দিলেন।

তারপর এলো মহারাষ্ট্রের শিল্পী প্রভা-শঙ্কর। কিন্তু এবার রাণী মালবিকা বেঁকে বস্‌লেন। বল্‌লেন—মহারাজ, শিল্পীদের কাছে বার বার এমন ক'রে নিজের রূপের পরীক্ষা দিতে আমার আত্মমর্য্যাদায় ঘা লাগে। সুতরাং আমার আলেখ্য আঁকাবার সঙ্কল্প আপনি পরিত্যাগ করুন।

রাজা বল্‌লেন—কিন্তু রাণী, আমি যে পণ করেছি, তোমার এমন আলেখ্য আঁকাবো যা চিরদিনের জন্য শিল্প-জগতের সব চেয়ে সেরা সম্পদ হ'য়ে থাক্‌বে।

রাণী বল্‌লেন—তবে ঘোষণা ক'রে দিন্ মহারাজ, ছবি এঁকে যে আপনাকে খুশী করতে পার্‌বে পুরস্কার পাবে সে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। কিন্তু যে ক্ষীণ শক্তি নিয়ে রাজা-রাণীকে অনর্থক উত্যক্ত কর্‌বে তাকে গ্রহণ করতে হ'বে মৃত্যুদণ্ড।

রাজা বল্‌লেন—এ সর্ত্তে কোনো শিল্পীই আস্‌বে না রাণী, তোমার ছবি আঁক্‌বার জন্য। সুতরাং প্রকারান্তরে তুমি আমাকে তোমার ছবি আঁকাবার সঙ্কল্পই তো পরিত্যাগ কর্‌বার কথা বল্‌ছ।

রাণীর ঠোঁটের কোণে একটা রহস্যময় হাসির আভাস ফুটে' উঠ্‌ল। তিনি বল্‌লেন — মহারাজ, সত্যিকারের শিল্পী ছাড়া—যার ভিতরে সৃষ্টি কর্‌বার শক্তি আছে সে ছাড়া, আর কেউ ছবির মুখে মনের ছাপ টেনে দিতে পারে না। আর সত্যিকারের শিল্পী সেই, যার নিজের শক্তির উপরে বিশ্বাস আছে—মৃত্যুর ভয় যার নেই। এমনি কোনো শিল্পী যদি আপনার এই ঘোষণার কথা শোনে, তবে তার কৌতূহলই টেনে আন্‌বে তাকে এই দুঃসাহসিকতার পথে। সুতরাং আপনি যে শিল্পীকে চান, তার সন্ধান পেতে হ'লে' এই একটি মাত্র পথই খোলা আছে আপনার সাম্‌নে।

রাণীর কথার ভিতরকার যুক্তি রাজার মন স্পর্শ কর্‌লে। তিনি বল্‌লেন—তাই হ'বে রাণী তাই হ'বে। তোমার পরামর্শই আমি গ্রহণ কর্‌লুম।

পরের দিন সভায় ব'সেই রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বল্‌লেন—এবার ঘোষণা ক'রে দাও মন্ত্রী, তুলির টানে রাণীর রূপ যে ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌বে, মগধের রাজা তাকে পুরস্কার দেবেন লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও রটনা ক'রে দিও যে, সত্যিকারের শিল্পী-প্রতিভা যার নেই, সে এসে যদি রাজা-রাণীকে বিরক্ত ক'রে, সে লাভ কর্‌বে পুরস্কার নয়—মৃত্যু-দণ্ড।

রাজার ঘোষণা লোকের মুখে চ'ড়ে, হাওয়ার বুকে উড়ে' এবারও দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে যারা মগধের রাজধানীতে জড় হ'য়েছিল রাণী মালবিকার ছবি আঁক্‌বার জন্য তারাও রাজধানী ছাড়্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। যাদের তুলির টানে নির্জীব কাগজের ভিতরেও জীবনের সাড়া জেগে ওঠে, জীবন হারাবার ভয়ে তারাও তুলি ধর্‌বার সাহস হারিয়ে ফেল্‌লে।

দিনের পর দিন মিলিয়ে যায়। রূপকথার গল্পের পরীকেও যে হা'র মানায় সেই নতুন রাণীর ছবি আঁকার যোগ্য শিল্পীর সন্ধান তবু মেলে না। রাজার মুখের উপরে আষাঢ়ের মেঘের মতো অন্ধকারের ছায়া ঘনিয়ে আসে। মাসের পর মাস মিলিয়ে অবশেষে বৎসরও প্রায় শেষ হয়, এমনি সময়ে রাজার দরবারে এসে দাঁড়ালো এক তরুণ যুবক—চোখে তার স্বপ্নের বিহ্বলতা, মুখে তার আনন্দের দীপ্তি।

রাজা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তুমি কে? কি চাই তোমার?

যুবক উত্তর দিলে—আমি বিমান—কাশ্মীরের শিল্পী আমি। মহারাজের নতুন মহিষীর ছবি আঁক্‌বার সৌভাগ্য যাচ্‌ঞা করি।

আনন্দের আতিশয্যে রাজার চোখ দু'টো জল্ জল্

ক'রে উঠ্‌ল! তবু নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে তিনি বললেন—কিন্তু যুবক, আলেখ্য যদি ঠিক না হয়······

—জানি মহারাজ, জানি, আমার মাথা আপনার ঘাতকের তলোয়ারের কাছে উপহার দিয়ে যেতে হ'বে।

—তুমি বয়সে তরুণ। তাই তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, স্বর্ণ মুদ্রার চেয়ে তোমার ঐ জীবনের দাম কম নয়।

—আপনার অর্থ মহারাজ, শিল্পী বিমান হয়তো স্পর্শও করবে না। শিল্পীর মন সৌন্দর্য্যের উপাসক। আমি এসেছি এই আশায় যে, হঠাৎ যদি এমন একটা রূপ চোখে প'ড়ে যায়, যা হাজার হাজার বৎসরের পর হঠাৎ পৃথিবীর বুকে কচিৎ কখনো সৃজিত হয়, যা প্রভাতের প্রথম পদ্মটির মতো ফুটে' ওঠে এবং একবার ঝ'রে গেলে হাজার বৎসরের ভিতরও আর যার সন্ধান পাওয়া যায় না। তেমন রূপ যদি পাই, আমার মর্ত্ত্য মা'র সেই অপরূপ সম্পদ যাতে একেবারে হারিয়ে না যায়, আমি তারি চেষ্টা করব। পৃথিবীর কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নাই। এমনি ক'রে সে ঋণের এক কণা পরিশোধ করবার সঙ্কল্প নিয়েই আমি বেরিয়েছি। আমাকে মার্জ্জনা করবেন মহারাজ, মহারাণী যদি আমার এই কল্পনাকে খুশী করতে না পারেন, তবে শিল্পী বিমান গর্দ্দান দেবে, তবু তুলি স্পর্শ করবে না।

মগধের রাজা হাঁকলেন — মন্ত্রী, শিল্পী বিমানকে মহারাণীর রূপ দেখাবার ব্যবস্থা করো।

শ্বেত পাথরের তৈরী কক্ষের দেয়াল, গায়ে তার হীরে-মণি-পান্নার কারুকার্য্য। ইন্দ্রধনুর মতো তার বর্ণের বিলাস চোখে ঝলক হানে, মনে বিস্ময় জাগায়। উপরে রাজহাঁসের পালকের মতো সাদা চন্দ্রাতপ, তার গায়ে মতির ঝালর, দিনের আলোকে ঝল্‌-মল্‌ করে। পায়ের নীচে কচি ঘাসের পাতার মতো নরম গালিচা — ঘাসের মতোই সবুজ তার রঙ্‌।

এই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালো শিল্পী বিমান। সঙ্গে সঙ্গেই সামনের বাতায়নের উপর থেকে খ'সে পড়্‌ল মেঘের মতো কালো মখমলের তৈরী একখানা পুরু পর্দ্দা। এ কি রূপ! বিমানের দেহের স্পন্দন যেন থেমে গেল — চোখ্‌ তার পলক হারিয়ে ফেললে। কত সৌন্দর্য্যের রেখা শিল্পী বিমানের চোখে কতদিন কত রূপের শতদল ফুটিয়ে গেছে। সে মুগ্ধ হ'য়েছে, কিন্তু এমন ভাবে সম্বিত কখনো হারিয়ে ফেলেনি।

রাণীর গলায় দুল্‌ছে মোতির হার, মাথায় জল্‌ছে মুকুট — সমস্ত অঙ্গ ঘিরে' ঝল্‌মল্‌ করছে হীরে-মণি-মাণিক্যের অলঙ্কার। কিন্তু এই সব অলঙ্কারের দীপ্তিও ম্লান হ'য়ে গেছে তাঁর দেহের দীপ্তির কাছে। সে দীপ্তি যেন বিদ্যুতের রেখার মতো — স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই চেতনার সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে মুছে' দিয়ে যায়। ধীরে ধীরে শিল্পী বিমানের নীলোৎপলের মতো চোখের উপরে সূক্ষ্ম রেশমের পর্দ্দা পরানো পল্লবের যবনিকা দু'টো নেমে এলো।

কিন্তু চোখ্‌ বন্ধ ক'রেও সে বেশীক্ষণ থাকতে পারলে না। ভিতরের একটা দুঃসহ জ্বালা জোর ক'রে টেনে তার এলিয়ে-পড়া চোখের পাতা দু'টোকে খুলে' দিলে। কিন্তু এবার বাতায়নের পানে চাইতেই তার বিস্ময় আগের বারের মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেল। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এক মুহূর্ত্তের ভিতরে মানুষের মুখের চেহারা যে অতখানি বদলে যেতে পারে তা তো কল্পনাও করা যায় না। শিল্পী দেখ্‌লে — আনন্দের আলোর এতটুকু চিহ্নও সে মুখের ভিতরে কোথাও নেই। অপরূপ সুন্দরী, তবু কি নিঃস্ব, কি রিক্ত! বেদনা-ভারে সে দেহ যেন মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছার মাঝে এলিয়ে পড়ে। প্রেমাস্পদের সন্ধান যে পেয়েছে, অথচ প্রেমাস্পদকে পায়নি — এ মুখ যেন তারি মুখ। বহু আভরণেও এ নিরাভরণা। চোখের দৃষ্টি মিনতিতে ভরা। মানুষ যেমন ক'রে কথা বলে, সে দৃষ্টি যেন তেমনি ক'রেই ডেকে বলে—হে বন্ধু, হে দয়িত, হে আমার প্রিয়তম, আমাকে ভুল বুঝো না, যা আমার একান্ত মিথ্যা তাকেই তুমি সত্য ক'রে তুলো না তোমার তুলির লেখায়। তুমি আমার অন্তরের অন্তস্তলে অবগাহন করো। সেখানে তপস্যা চলেছে তোমাকে লাভ করবার জন্য কত যুগ-যুগান্ত হ'তে, কত

জন্ম-জন্মান্তর হ'তে। তারি ইতিহাস তুমি প'ড়ে নাও তোমার অন্তরের অনুভূতি দিয়ে। আমার চেয়ে

শিল্পীর চোখের পাতা আবার তার দৃষ্টির উপরে নেমে এলো। ধ্যানের ভিতরে ডুবে' গিয়ে মনের

এ কি রূপ! বিমানের দেহের স্পন্দন যেন থেমে গেল — চোখ্ তার পলক হারিয়ে ফেল্‌লে…

কঠোর তপস্যা তপস্বিনী অপর্ণাও করেন নি তাঁর মহেশ্বরকে লাভ করবার জন্ম।

পর্দার উপরে তুলির পর তুলির আঁচড় সে টেনে চল্‌তে লাগ্‌ল সেই মুখের প্রত্যেকটি রেখাকে তার

স্মৃতির ভিতরে ধ'রে রাখ্‌বার জন্ত। কতক্ষণ যে সে এ ভাবে ছিল তা সে নিজেও জানে না। ধ্যান-শেষে সে যখন আবার চোখ্ মেল্‌লে বাতায়নের পথ হ'তে তখন মগধের নতুন রাণী মালবিকার মূর্তি মিলিয়ে গেছে।

•

শিল্পী বল্‌লে—মহারাজ, সত্যিকারের শিল্প যা তা সাধনার বস্তু। নিভৃতে তার সাধনা করতে হয়। মহারাণীর ছবি আমি নির্জ্জনে ব'সে আঁক্‌তে চাই। আপনি আমাকে এমন স্থান দান করুন যেখানে কেউ আমার শান্তির ব্যাঘাত না করে।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—শিল্পি, তোমার সাধনায় সিদ্ধি লাভ কর্‌তে কত দিনের প্রয়োজন হ'বে?

—একমাস, মহারাজ, একমাস। হৃদয়ের সমুদ্র মন্থন ক'রে যে কলা-লক্ষ্মীকে আমি লাভ করব, ঠিক একমাস পরে আপনার সাম্‌নে আমি তাঁকে স্থাপন কর্‌তে পারব ব'লে আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু এই এক মাসের ভিতর কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে—কেউ যেন আমার ধ্যান ভঙ্গ না করে।

রাজা মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—শিল্পীর ইচ্ছা অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্‌বার ভার মন্ত্রী, আমি তোমার উপরেই অর্পণ কর্‌লুম। এ আদেশ পালনে এতটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘট্‌লে, মনে রেখো তার দণ্ড তোমাকেই গ্রহণ কর্‌তে হ'বে।

•

দিন আসে—দিন মিলিয়ে যায়। মনের ভিতরে নতুন রাণীর যে মূর্ত্তি শিল্পী এঁকে নিয়েছে, রেখার পর রেখা টেনে তাই সে ফুটাতে চেষ্টা করে। গ'ড়ে উঠ্‌ল দীর্ঘ তনু, পুষ্পের স্তবকের ভারে নম্র লতার মতো সুন্দর। গ'ড়ে উঠ্‌ল মৃণালের মতো সুডৌল বাহু, আঙুলগুলো যার পদ্মের কোরকের মতো অপরূপ। গ'ড়ে উঠ্‌ল নিটোল মুখ যা জমাট জ্যোৎস্নার মতো অভিনব লাবণ্যের রেখায় লীলায়িত। রেখার টানে টানে আর সব অঙ্গই ধরা পড়্‌ল—ধরা পড়্‌ল না শুধু তাঁর অধরের হাসির করুণ দীপ্তি, আর দু'টি নয়নের দৃষ্টির উচ্চকিত বিদ্যুৎ। রঙে রৌদ্রের রেখা জমিয়ে শিল্পী টেনে দিলে তার ছবির অধরে হাসির আভা, তার চোখে পরালে দৃষ্টির আলো। কিন্তু সে হাসির ভিতর দিয়ে, সে দৃষ্টির ভিতর দিয়ে রাণীর মুখের সে বিষণ্ণ বেদনার ছাপ ধরা পড়্‌ল না, যা মুহুর্মুহুঃ নীরব ভাষায় আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে। রৌদ্রের রেখা মুছে' ফেলে দিয়ে শিল্পী জ্যোৎস্নার হাসি জড়িয়ে দিলে তার অধরে ও দৃষ্টিতে। হাসি কোমল হ'লো, দৃষ্টি স্নিগ্ধ হ'লো। কিন্তু কান্নার যে বন্যা শিল্পী দেখেছিল নতুন রাণীর হাসিতে ও দৃষ্টিতে সে কান্নার রেখা তাতেও ধরা পড়্‌ল না।

নিজের অক্ষমতায় শিল্পীর মন তিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। এত দিন কি সে শুধু তবে মিথ্যারই উপাসনা ক'রে এসেছে? তার সাধনা কি তবে তার তুলিকে সে শক্তিটুকুও দেয় নি যার বলে, জানা রূপকেও সে নিজের খুশী মতো রেখার অক্ষরে ব্যক্ত কর্‌তে পারে।

শিল্পীর মন ধ্যানের ভিতরে মগ্ন হ'য়ে গেল। ভোরের হাসিতে জাগ্‌ল মধ্যাহ্নের দীপ্তি, দুপুর মিলিয়ে গেল অপরাহ্নের ঘনায়মান ছায়ার অন্তরালে। পশ্চিমের দিকে দিনের চিতা রক্ত-রেখায় রাঙা হ'য়ে উঠ্‌ল। আর তারি সঙ্গে সঙ্গে পূবের দিকে ঘনিয়ে এলো অকাল জলদোদয়ের বাষ্পোচ্ছ্বাস। মেঘের গর্জ্জনে ধ্যান ভাঙ্‌তেই শিল্পীর চোখ্ পড়্‌ল পশ্চিমের আকাশের দিকে ও পূর্ব্বাকাশের বাষ্পের জোয়ারে ভরা ঘন কালো মেঘের উপরে। তুলিটাকে তাড়াতাড়ি সে হাতের ভিতরে তুলে' নিলে। তার পর তার আঙুলগুলো বিদ্যুতের গতিতে ছুটে' চল্‌ল ছবির পর্দার উপরে রেখার পর রেখা টেনে। সন্ধ্যার আভা মিলিয়ে যাবার আগেই এবার ছবির ঠোঁটে ফুটে' উঠ্‌ল করুণ বেদনার ম্লান ছায়া যা কেবলমাত্র সন্ধ্যার বিদায়-আরতির ভিতরেই ধরা পড়ে, চোখের কোলে জাগ্‌ল তার কান্না-ভেজা দীর্ণ দৃষ্টি যা কেবল সজল মেঘের কাজলের ভিতরেই ছড়িয়ে থাকে।

শ্রান্ত দেহখানি শিলাতলে এলিয়ে দিয়ে শিল্পী ছবির পায়ের কাছে স্তব্ধ হ'য়ে শুয়ে' ছিল। ধীরে ধীরে তার ঘরে এসে ঢুক্‌লেন মগধের মহারাজা আর তাঁর মন্ত্রী।

রাজা বল্‌লেন—শিল্পী, তোমার মাস শেষ হয়েছে, রাজার দরবারে আজ তোমার ছবি পেশ কর্‌বার শেষ দিন।

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো উঠে' দাঁড়িয়ে রাজাকে নমস্কার ক'রে শিল্পী বল্‌লে—মহারাজ, শিল্পী বিমানের কথার নড়্‌চড়্‌ তার জীবনে কখনো হয় নি,—আজও হ'বে না। মহারাণীর আলেখ্য আঁকা আমারও শেষ হ'য়ে গেছে।

শিল্পী বিমান তার ডা'ন হাত দিয়ে ছবির উপর থেকে কালো রঙের পাতলা পর্দাটা আস্তে আস্তে টেনে তুলে' নিলে। সঙ্গে সঙ্গেই রাজার বিস্মিত কণ্ঠ উচ্চকিত হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল—চমৎকার!

কিন্তু তার পরমুহূর্তেই তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, ক্রোধ ছাপিয়ে উঠ্‌ল বিস্ময়ের বিহ্বলতাকে।

রাজা তিক্তকণ্ঠে বল্‌লেন— কিন্তু এ কার মূর্তি শিল্পী? ...
এ ছবি তো মগধের মহারাণী মালবিকার ছবি নয়।

তিক্ত কণ্ঠে তিনি বল্‌লেন—কিন্তু এ কার মূর্তি, শিল্পী—মূর্তি? রক্ত-মাংসের দেহের মতো সজীব ক'রে এ কাকে তুমি এঁকেছ তোমার তুলির লেখায় —মহারাণীর মুখের সঙ্গে আদল মিলিয়ে? এ ছবি তো মগধের মহারাণী মালবিকার ছবি নয়।

ধীরে ধীরে শিল্পী বল্‌লে—ঐ ছবিই মগধের মহারাণীর ছবি মহারাজ!

—তাই যদি হ'বে তবে তাঁর দেহে রত্ন-ভূষা নেই কেন? তাঁর কণ্ঠ মণি-হার-রিক্ত কেন? তাঁকে দীন ভিখারিণীর বেশ পরিয়েছ কেন?

—মহারাজ, আমার চোখে মহারাণীর এই ভিখারিণী মূর্তিই যে ধরা পড়েছে।

—তাঁর অধরের হাসিতে আমি দেখেছি বহ্নির জ্বালা। সে হাসি মানুষকে দগ্ধ ক'রে, মরীচিকার মায়ার মতো মুগ্ধ করে। কিন্তু তোমার ছবির মুখে যে হাসি ফুটে রয়েছে সে হাসি কান্নার নামান্তর মাত্র। ও হাসি তো আমার নতুন রাণীর মুখের হাসি নয়।

—ঐ হাসিই আপনার নতুন রাণীর হাসি মহারাজ! দিনের বিরহে সন্ধ্যার মুখে যে হাসি ফোটে সে হাসি তো কান্নাই ঝরায়। মহারাণীর মুখে বিরহী আত্মার এই কান্নাই দেখেছে আমার শিল্পীর চোখ্‌। তাই তো তাঁর হাসির ঐ রূপই ফুটে উঠেছে আমার এই তুলির লেখাতেও।

—আর ঐ দৃষ্টি! রাণীর দৃষ্টি তুমি ধর্‌তে পারো নি শিল্পী। সে দৃষ্টি যে বিদ্যুতের রেখার মতো। সে দৃষ্টি পলকে পলকে উল্কা ঝরিয়ে যায়, যার দিকে সে চায় তারি বুকের উপরে। এ কার দৃষ্টি এনে তুমি কার চোখে পরিয়ে দিয়েছ শিল্পী?

—মহারাজ, দৃষ্টির রেখা টান্‌তেও আমার ভুল হয় নি। প্রিয়ের চিরবিরহে যার চোখে সমুদ্রের জোয়ার জাগে, সে তার দৃষ্টি কি ক'রে লুকোবে শিল্পীর কাছ থেকে? মহারাজ, আপনি দেখেছেন নতুন মহারাণীর দেহ, আমার কাছে ধরা পড়েছে তাঁর আত্মার রূপ। সত্যিকারের যে শিল্পী সে নকল করে না, সে করে সৃষ্টি।

রাজা গর্জন ক'রে উঠে' বল্‌লেন—শিল্পী, তুমি আমার রাণীর অপমান করেছ। আমার ভিতর

দিয়ে তাঁর আত্মা তার প্রিয়তমকে পায় নি, তোমার ছবির রেখায় রেখায় এই অভিযোগের আভাসই ফুটে' উঠেছে। সুতরাং আমি তোমাকে কঠোর শাস্তি দেবো। কিন্তু তার আগে প্রায়শ্চিত্ত করবার একটা সুযোগও আমি তোমাকে দিতে চাই। আমি আবার তোমাকে সাত দিনের সময় দিচ্ছি। এই সাত দিনের ভিতরে ঐ হাসি—ঐ দৃষ্টি মুছে' ফেলো তুমি তোমার ছবির ঠোঁট ও চোখ হ'তে। অলঙ্কারে ভূষিত ক'রে দাও তার দেহ। যদি পারো মুক্তি পাবে, যদি না পারো রাজাকে অপমান করার যে দণ্ড, মাথা দিয়ে তাই তোমাকে বরণ ক'রে নিতে হ'বে।

একটা ম্লান হাসির দীপ্তি শিল্পীর ঠোঁটের উপরে ভোরের স্নিগ্ধ আলোর মতোই উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে' উঠ্‌ল। সে বল্‌লে—মহারাজ, সাতদিন কেন সাত যুগ সময় দিলেও ও ছবির মুখের একটি রেখাও আমি বদ্‌লাতে পারবো না। আমার কাছে প্রাণ বড়, কিন্তু প্রাণের চেয়েও বড় আমার শিল্প-সাধনা। শিল্পীর দৃষ্টি যাকে সত্য ব'লে জানে, সে জানা তার ভগবানের জানার মতোই নির্ভুল। প্রাণের বিনিময়েও সে তার একটি রেখা বদলায় না। আপনার নতুন রাণীর দেহটাকে যে আপনি পেয়েছেন তাতে ভুল নেই মহারাজ, কিন্তু তাঁর আত্মা আপনার কাছে দুষ্প্রাপ্য রত্নের মতোই দুর্লভ হ'য়ে আছে।

দুঃসহ রোষে রাজার সমস্ত শরীর থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ল। অসহিষ্ণু কণ্ঠে তিনি মন্ত্রীকে ডেকে বল্‌লেন—এই উদ্ধত যুবককে এই মুহূর্তেই হত্যাগারে নিয়ে যাও। প্রথমে তলোয়ারের আঘাতে খসিয়ে নেবে ওর ঐ আঙুলগুলো যা দিয়ে ও ছবি আঁকে, তারপর খসিয়ে নেবে ওর হাত। তারপর কাঁধের উপর থেকে খসিয়ে নেবে ওর ঐ মাথা, স্পর্দ্ধার গুমরে যা ও আমার কাছেও নোয়াতে রাজি নয়।

শিল্পী বিমানের হত্যার আদেশের কথা তখন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রাজার সাতমহলা পুরীর সাতটি দ্বার গলিয়ে সে সংবাদ পৌঁছালো রাজার অন্তঃপুরেও। তারপর রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। রাজা তাঁর কীর্ত্তির কাহিনী সরস ক'রে বর্ণনা করবার ভাষা আয়ত্ত ক'রে নিয়ে নতুন রাণীর মহলে ঢুকে' পড়্‌লেন।

নতুন রাণীর কক্ষ সব সময়েই থাকে অপূর্ব্ব সাজ-সজ্জায় সজ্জিত। ঘরে ঢুকে'ই রাজা দেখ্‌লেন—সে ব্যবস্থার আগাগোড়া ব্যতিক্রম হয়েছে। রাণীর নিত্য-ব্যবহার্য্য বেশ-ভূষা, রত্নালঙ্কার সমস্তই ছড়িয়ে প'ড়ে আছে মর্ম্মরে-গড়া মেঝের উপরে একান্ত বিশৃঙ্খলভাবে। প'ড়ে আছে তাঁর মুক্তোর মালা, প'ড়ে আছে তাঁর হীরের মুকুট, প'ড়ে আছে তাঁর মণি-মাণিক্যের কঙ্কণ-কেয়ুর-কিঙ্কিনী, প'ড়ে আছে তাঁর জরীর জালে ঘেরা শাড়ী ও ওড়্‌না, অঙ্গের আঙিয়া ও অন্যান্য আভরণ।

বিস্মিত হ'য়ে রাজা ডাক্‌লেন—রাণী! নতুন রাণী! মালবিকা!

সে স্বর কক্ষ হ'তে কক্ষান্তরে ধ্বনিত হ'লো, কিন্তু রাণীর সাড়া পাওয়া গেল না।

হঠাৎ তাঁর মনের ভিতরে একটা সন্দেহের ছায়া চমক দিয়ে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি ছুটে' তিনি প্রবেশ করলেন শিল্পী বিমানের ঘরে। সেখানে আলেখ্যের দিকে তাকাতেই দেখ্‌লেন নতুন রাণীর ছবি সেখানে নেই। কে যেন তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে কেটে ছবির পর্দাখানা খসিয়ে নিয়ে গেছে। কেবল তার রত্ন-খচিত পরিবেষ্টনী-খানা প'ড়ে আছে, রাণীর শূন্য-গর্ভ ঘরের মতোই একটা মূক ব্যথার পুঞ্জীভূত চিহ্নকে মূর্ত্ত ক'রে তুলে'। উন্মাদের মতো ছুটে' রাজা সে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বসুন্ধরা

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেবার তোমারে চিনিনি জীবনে, মরণের দ্বারে এসে
হে দেবি, যেদিন প্রথম চিনিনু, কহিলাম ভালোবেসে—
"পূজা করিবার দেহ অধিকার, ওগো রাণি, ওগো মা !"
তুমি মৃদু হেসে ফিরাইলে মুখ, শুধু বলে' গেলে "না" ।
ঘনাল আঁধার, সময় হ'ল না হায় !
চিরযৌবনা,—তুমি গেলে তব নব জয়-যাত্রায় ।

অয়ি অকরুণে, ভেবেছিলে মনে ছাড়িয়া এসেছ মোরে ?
পিছে পড়ি নাই, — আমি আসিয়াছি আবার তোমারি ক্রোড়ে ।
বারেকের ভুল তুমি ক্ষমিলে না—দেবতা করেছে ক্ষমা ;
ক্ষণিকের পূজা প্রেমের খাতায় সে যে রেখেছিল জমা ।
ছল ছাড়ো মাতা, এইবার ফিরে চাও ।
স্নেহ-চুম্বন দেহ শিরে মোর, অঙ্গ জুড়ায়ে দাও ।

এবারেও যদি নিষ্ফল করো, ছাড়িব না কোনমতে ।
চিরদিন ধরে' ছায়ার মতন ফিরিব তোমারি পথে ।
উদয়গিরির শিখর হইতে অস্ত-সাগর-তলে
যুগে যুগান্তে ঘুরিয়া ফিরিব নানারূপে নানাছলে ।
শিশিরে শরতে আলোকে অন্ধকারে,
তোমার পূজার হ'ব উপচার কালে কালে, বারে বারে ।

একদিন শেষে দয়া হ'বে তব, দয়া যে হ'তেই হ'বে ;
সহসা সেদিন এ মোর কণ্ঠে সুধার উৎস ব'বে ।
সঙ্গীতে সুরে দশদিক পূরে জাগিব হে মৃন্ময়ি !
তোমারি বরেতে সন্তান তব — হ'ব হ'ব আমি জয়ী ।
ক'ব "ভালোবাসি,"— কহিব "তোমারে চিনি ।"
হে মোর জননি ! মম গৌরবে তুমি হ'বে গরবিনী ।

প্রতিদিন কহ যেই কথা, গাহ প্রতি পলে যেই গান
অন্তর ভরি' ল'ব তাহা ধরি' — অনাবিল অম্লান ।
অপরূপ তব দিব্য মূরতি, অপরূপ লীলা তব !
মানব ভাষায় প্রকাশিব তায়, অয়ি চির অভিনব !
ডুবে র'ব, আমি ডুবাইব নিশিদিন ;
যতটুকু পারি স্নেহ দিয়ে শুধু শুধিব স্নেহের ঋণ ।

তারপরে যবে সন্ধ্যা নামিবে তোমারো দিনের পারে,—
নিভে যাবে আলো জনমের মত অতল অন্ধকারে —
শীতল আঁধারে বর্ষ-ঋতুর আনাগোনা হ'বে শেষ,—
কবে কোথা ছিলে,— আছো কি না আছো —
রহিবে না উদ্দেশ,—
সেদিন একাকী আমি র'ব তব আশে,
অমৃত মন্ত্রে ধ্বনিত করিয়া অসীম শূন্যতা সে ।

তিল তিল ক'রে জীয়ায়ে তুলিব তোমার অতীত কথা,
সার্থক হ'বে বহুজীবনের আমার সার্থকতা ।
ধেয়ানে তোমার রূপ দিব রাখি, কণ্ঠে তোমার ভাষা,
অমর আত্মা জেগে র'বে মোর, মরণ-বিজয়ী আশা ।
তপোশেষ হ'বে,— একদিন হ'ব জয়ী ।
নবীন জীবনে কোলে ল'বে মোরে জননি জ্যোতির্ময়ি !

বাঙলা সাহিত্যের মূল সূত্র

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

১

অথাতো সাহিত্য জিজ্ঞাসা :

কেন আমরা সাহিত্য রচনা করি? কথাটা মোটের উপর প্রথমেই একটু যেন কানে কেমন শোনায় নাকি? এ জিজ্ঞাসা করা, আর সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, আজ এতদিন পরে, একটু যেন কেমন আশ্চর্য্য মনে হয়।

এতকাল ধরে আমরা ত' সাহিত্য সাধনা করে আসছি। যুগের পর যুগ আসছে, কালের তালে পা ফেলে চলেছি! অনেক যুদ্ধ আমরা করেছি, অনেক সদাসৎ বিচার করেছি। কিন্তু সেই মূল সূত্রটা কি আমরা ধরতে পেরেছি বলে মনে হয়? সাহিত্যের উৎকর্ষের জন্য দলাদলি, ভালমন্দ, সাদা-কালো, অনেক রঙের খেলাই ত' খেলে এলাম, তাতে একটা ধারার সুস্পষ্ট শৃঙ্খলা আছে, না এই যখন-যেমন তখন-তেমন চলেছে? কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই একধারা রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে, কি, হঠাৎ-সাজা বহুরূপীর মত ছেলেদের ভয় দেখায়, বুড়োদের হাসি জাগায়, যুবকরা গর্জ্জে ওঠে, মেয়েরা গুমরে মরে? সব জিনিষটা একটা ন্যায়ের শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে সঠিক জায়গায়, তার কাম্যকবনে কি আমাদের এ সাহিত্য পৌঁছেচে?

কল্পনা নয়, চোখে দেখা যাচ্ছে, কথার ভাবে বোঝা যাচ্ছে, কার্য্যের ফলাফল দেখে, বিচার করে, এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, সাহিত্য রচনার পদ্ধতি সম্বন্ধে লোকের নানা মতদ্বৈধ ও ভাব-বিভিন্নতা আছে। আদর্শ ও আদর্শকে রূপদান করার ভঙ্গী সকলের এক নয়, মতও এক নয়।

সাহিত্য কিন্তু রচনা হয়ে যাচ্ছে। চলেছে, কালের স্রোত যেমন চলে।

এই প্রশ্নই আমরা এখানে আলোচনা করব। দেখতে সাধ যে, এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা হয় কি না; এবং সে প্রশ্নের মীমাংসা হলে, যাদের জন্য এ সাহিত্য তাদের, অর্থাৎ আমাদের এই বাঙলা দেশের, বাঙালা-সাহিত্যের—কোন মূল সূত্র পাওয়া যায় কি না। আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে, রস: কথাটা প্রাচীন সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রের কথা। যুগ যুগ ধরে, তার—এই রস শব্দের টীকা-টীপ্পনী, ব্যাখ্যা, ভাব-বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা, অনেক কিছু হয়ে গেছে। উপনিষদের কালে, "রসো বৈ সঃ" বলেছে। সেই ব্যাখ্যা, চৈতন্যের যুগে এসে মানুষের প্রেমের রসাভাসকে বৈকুণ্ঠের অপ্রাকৃত থাকে তুলে দিয়েছে। ঘুরে-ফিরে সেই থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড়ই রয়ে গেছে। থোড়ের জলের রাসায়নিক ক্রিয়া বিশেষভাবে কার কার হয়েছে, কার কার একেবারেই হয়নি। ইংরাজ আসবার পর থেকে, সেই রসশব্দ "passion" হয়ে গেছে।

এইটে দেশে শুনতে পাই যে, রসসৃষ্টি হলেই সাহিত্য-সৃষ্টি হ'ল। অথচ এইটেই যে শেষ কথা, তা ত' বলা যায় না। আর শেষ কথা কোন্ বিষয়েরই বা বলা যায়? আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও শুনতে পাই যে, গতি যেমনই হোক, ভঙ্গী যেমনই হোক, গন্তব্যে পৌঁছুতে পারলেই হ'ল। আরো একটু সহজ করে বলতে হ'লে বলতে হয়, পদ্ধতি (Technic) যাই হোক—প্রকাশভঙ্গী যেমনই হোক, কাম্য মিললেই হ'ল, রস হ'লেই হ'ল।

এই পদ্ধতির ভিত্তি থেকে দল সৃষ্টি হয়ে দোলো-সাহিত্য অনেক রচনা হয়েছে। এক দল অন্য এক দলকে ভদ্রতার সীমার বাইরে গিয়ে অনেক সুরুচির পরিচয় দিয়েছে। আর কথার ওপর কথা গেঁথে, কথার উয়ের ঢিপি তৈরী করে, তার ওপরে চড়ে বলেছে, আমার সাহিত্য বড়, অর্থাৎ আমিই সবচেয়ে বড় রসস্রষ্টা। কখন কখন দল বেঁধে ডঙ্কা বাজিয়ে বলেছে

ওপাড়ার ওরা কিছু নয় কে, সাহিত্য কাকে বলে, সেটা ভাল করেই দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগেও হয়েছে, পরেও হয়েছে। এখনও তা চলেছে। ভবিষ্যতে যে চলবে না, একথা নির্ভয়ে কে বলতে পারে?

সেই জন্যে কথাটা পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের মতন হওয়াই বিধেয়; দলাদলি মানেই হার-জিৎ—যুদ্ধ। আদর্শ ও প্রকাশভঙ্গীর ঝগড়া। কথা সাজিয়ে কথার মার-প্যাঁচ—আর কিছুই নয়। যুদ্ধটা খোলা হাতে না হ'য়ে যদি আঁধারে মেরে জয়লাভ হয়, তবে মানুষে বলবে, জিৎ হ'ল বটে, কিন্তু কাজটা খুব সম্মানের হ'ল না। সাহিত্যের এই হার-জিতের পালার খেলা আজকের দিনেও নীরব নয়।

পুরান ভিত্তি

সাহিত্য শব্দটা সংস্কৃত। যাঁরা সংস্কৃত জানেন, তাঁরা তার ব্যুৎপত্তিও জানেন। এমন দিন গিয়েছে যে, সংস্কৃত ভাষার শিকল থেকে, এই বাঙলা ভাষার মুক্তির জন্য টুলো-পণ্ডিতের সঙ্গে অনেক বিতণ্ডা হয়ে গেছে। কোম্পানীর হাত থেকে বাঙলা যাবার পর, টুলো-পণ্ডিতদের হাত থেকে নাগরিক কলকাতার ভাষা বাঙলা সাহিত্যে এসে দেখা দিয়েছে। ভাষা নিয়ে সে সময় যেমন ঝগড়া হয়েছিল, ভাব নিয়েও তেমনি হয়ে গেছে। সে অবধি আজও কিন্তু সে ভাব-ভাষার ঝগড়ার বিরাম নেই। তখন ছিল সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজী-নবীশদের ঝগড়া, এখন আবার ইউরোপীয় ও তথাকথিত ইংরেজী তর্জ্জমার ভাবের আবাহন বাঙলা সাহিত্যের ভিতর, তার ঝগড়া। দলাদলির বিরাম নেই। তবে শুনেছি, আধুনিক বিজ্ঞান বলে, ঝগড়াই নাকি জীবনের পরিচয়। তা যদি হয়, তবে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের নিশ্চয়ই খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আর এটাও ঠিক যে সংস্কৃত আমলের সঙ্গে তার ভাব ও ভাষার সঙ্গে এ বাঙলা-সাহিত্যের সম্বন্ধ স্পষ্ট।

তাহলে, আমাদের এই সাহিত্য-সৃষ্টির মূল সূত্র, ভিত্তিটা কোথায়? দুটো দিক চোখের উপর ভেসে উঠছে। একটা হ'ল, যখন আমরা নাবালক ছিলাম, সকল জিনিষই আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করতাম। সে গ্রহণ করার রীতি ছিল আর এক রকম। নেওয়ার প্রবৃত্তি বেড়ে যেত বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক লোক, প্রত্যেক জিনিষের উপর একেবারে ঠিক শ্রদ্ধাহীন না হলেও, সব বিষয়ে, সকল পুরান জিনিষের প্রতি একটা বিদ্রূপ করার স্পৃহা ও স্পর্দ্ধা অহরহই জেগে থাকত। আড়ম্বর করে কথা বলা, প্রত্যেক ভাবের বিরুদ্ধে একটা দর্প করে হাস্যের উচ্ছল ধ্বনিতে কথা রঙিল করে বলতে খুব ভাল লাগত। আর একটা দিক আছে, তখন আর আমরা নাবালক নই—বয়সের অভিজ্ঞতা কিছু সঞ্চয় হয়েছে, সে সময় ভাব-ভাষা সংযত হয়ে এসেছে, সকল লোক, বস্তু বা কোন ঘটনা, অন্য চোখে দেখার সময় হয়। নাবালক অবস্থায় শব্দ-ধ্বনির ওপর মমতা, সব বিষয়ে একটা স্বাধীন ভাব প্রকাশ করতে আনন্দ পেতাম। কিন্তু দিন যখন গেল, তখন জীবনটাকে ঘোরাল ভাবে দেখবার প্রবৃত্তি জেগে উঠল, জীবনের পথে চলার বেগ বাইরের দিকে কমে এল বটে, অন্তরের শক্তি, তার প্রাচুর্য্য, তার গতি আরো দ্রুত হতে লাগল।

একদিন যারা নাবালক ছিল, আজ তারা সাবালক হয়ে উঠেছে। আমরা এখন আর সাহিত্যের নাবালক অবস্থায় নেই। এত বছরের এত যুগের অভিজ্ঞতা আমাদের আজকে যেখানে এনে দাঁড় করিয়েছে, সেখান থেকে, আমাদের এই বাঙলা দেশ, তার জীবন, তার সাহিত্য-স্রষ্টা ও দ্রষ্টা—দুথাকের অবস্থা থেকে বিচার করার প্রয়োজন হয়েছে। আগে ছিল রাম-রাবণের যুদ্ধের মধ্যে, রূপকথার রাজপুত্তুর ও রাজকন্যের মধ্যে, সৈন্যের কোলাহল, বীরের গর্জ্জন, নিশান তুলে নেচে বেড়ান, এই সব নিয়ে রস পাওয়ার একটা তুমুল আনন্দ ছিল। নাবালকের স্বপ্নঘোর ঠিক আর এখন নেই। এখনকার স্বপ্ন মানুষের মত, এসব জাব্বা-জোব্বা-পরা—যাত্রার অভিনয় দেখার মত, ওই বীরের গর্জ্জনে মন ঠিক আর নিবিষ্ট হয় না। পক্ষিরাজ

ঘোড়ায় রাজপুত্তুরের ছোটা ঠিক চাইনে। চাই তার হৃদয়ের গোপন কথা, চাই দেখতে তার ত্যাগ, তার ভিতরের সংযম, তার মনের দরদ কতখানি গভীর, কাল দীঘির জলের মত, কি সাগরের গাম্ভীর্য্যের মত। তা যদি না হয়, তবে আজকের দিনে তাকে সাহিত্য বলতে সঙ্কোচ আসা অস্বাভাবিক নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যের প্রয়োজন তার জাতির আত্মোন্নতির জন্য, অর্থগত যে প্রয়োজন সেটা দ্বিতীয় স্তরের কথা। সমাজগত যে উন্নতি তাও ওই দ্বিতীয় স্তরের কথা। জীবনের চলার পথে মানুষ তার দেহ ও মন, বা আত্মার সম্পদে সম্পত্তিশালী। জীবনীশক্তি থাকা মানুষের পক্ষে যেমন সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় তেমনই জাতির জীবনীশক্তিও ততোধিক প্রয়োজনীয়। মানুষকে তার জীবন ভোগ ও উপভোগ করতে দেওয়া তার আত্মার জন্য তেমনই প্রয়োজনীয়। তাকে সকল রকম সুবিধা সুযোগ তার শক্তির বৃদ্ধির জন্য ও পূর্ণ-বিকাশের জন্য, জগতে, যে ভূমিতে, যে দেশে, যে জাতিতে, যে সমাজে সে জন্ম নিয়েছে, তার মধ্যে তার নিজস্ব স্থান ও নিজস্ব বজায় রাখার জন্য, সেই সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যেখানে তার স্বাধীন মন, স্বাধীন শক্তির বিকাশ পায়, সেই রকম আবহাওয়া তার প্রয়োজন। সেই আবহাওয়ায় তবে সে বেঁচে থাকতে পারে। বড় গাছের তলায় আওতা পেয়ে, যেমন ছোট গাছ বাঁচে না, যেমন খোলা-চাপা ঘাস, সূর্য্যের আলোর অভাবে—ঠিক ঠিক স্বাভাবিক রঙ—সে সবুজ ফোটাতে পারে না, রক্ত না থাকলে মানুষে যেমন পাণ্ডুর হয়ে যায়, মড়ার মুখের মত ফ্যাকাসে হয়ে যায়, তেমনি একটা জাতি, একটা দেশ যদি খোলা আকাশ বাতাস না পায়, তবে তার ওই সবুজ রঙ ধরে না—স্বাভাবিক হয় না। জাতির সাহিত্যও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে না।

দর্শন-শাস্ত্রে আছে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ * * নিদিধ্যাসিতব্যঃ"। পুরাণ-সভ্যতার এই চরম কথা। আধুনিক যান্ত্রিক যুগে, বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে সেই মূল কথা জানবার জন্যই যা কিছু সাধনা চলেছে। তখনকার সভ্যতার গন্তব্য স্থান, আর একালের সভ্যতার গন্তব্য স্থানের সন্ধান, মাত্র শুধু সাধন-মার্গের ভিন্নতা বললেই চুপ করা যায় না, আরো কিছু বলতে হয়। যাই ধরা যাক না কেন, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতির আত্মার উন্নতি যে বাঞ্ছনীয়, সে বিষয়ে সম্ভবতঃ মতের অমিল হবার বিশেষ কোন কারণ নেই।

কথাটা এই যে, আত্মার উন্নতি হয় কি করে? তখনকার দিনে আত্মার উন্নতি হত এক পথের পথিকদের, এখনকার দিনে পথিকরা সেই পুরান চলার পায়ের দাগে দাগে ঠিক চলতে যে প্রস্তুত, তা মনে হয় না। কাজেই পথ খুঁজে নিতে বের হ'তে হয়েছে। যে পথ পূর্ব্ব-পূর্ব্ব আচার্য্যরা দেখিয়ে গেছেন, হয়ত কালধর্ম্মে সে পথ ভুলে গেছি, নয়ত, কাল-ধর্ম্মে সে পথ জঙ্গল হয়ে গেছে, সে পথে চলার পথিক আজ আর নেই।

সে পথ কি? পথের কথা পথিকের অজানা হলেও, চলতে চলতে যে অভিজ্ঞতা জন্মায়, তার ভিতর থেকে সে পথকে জানে, পথের সুখ দুঃখ ভোগ করে। কেউ হয়ত গন্তব্যে পৌঁছয়, কেউ হয়ত গহন অরণ্যে পথের জন্য ঘুরে মরে, সূর্য্যের আলো পায় না, ক্ষীণ তারার আলোর বনের ভিতর থেকে পথ কেটে বেরুন কঠিন হয়। অন্ধকার বেশ করে তাকে ঘিরে ফেলে। তারপর 'কোথা' 'কোথা' করে, 'কতদূরে আর কত দূরে' বলে যাত্রা শেষ হয়ে যায়। সাপের খোলস-খানা ফেলে চলে যাওয়ার মত, খোলস ফেলে চলে যায়। সবটাই অন্ধকারে। অন্ধকারে যে কি হয়, তা সে অন্ধকারই বলতে পারে। একজন লোকের পক্ষে এই পথ চলা যেমন, জাতির পক্ষে গন্তব্য পথে চলাও ঠিক অমনি। যে রকমেই হোক মানুষের নিজের উন্নতির দিকে যদি পথ কেটে যেতে হয়, তবে খোলা হাওয়ায় খোলা আকাশের তলায় যাওয়াই, যাত্রার পক্ষে সুগম। না হলে, যেখানে দাসত্বের চাপে মানুষ দাসভাবাপন্ন, সেখানে তা সুগম

হতে পারে না। পররাষ্ট্রের পরাধীনতাও যেমন, নিজরাষ্ট্রের পরাধীনতাও তেমন। যখন একটা জাতি আর একটা জাতির বুকের ওপর জাঁতার মত চেপে বসে, সে জাঁতাকে সরাতে না পারলে পিষ্ট হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন গতি তার থাকে না। তেমনি দলগত দলের চাপে পিষ্ট হলে, যে দোলো-সাহিত্য হয়, তাতে আত্মার উন্নতি হতে পারে না। দল থাকলেই দলের চাই থাকবে, চাই থাকলেই, চেলা-চামুণ্ডারা জয়গানও যেমন করে, সঙ্গে সঙ্গে পিষ্টও হয়। এ কথা ইতিহাসের সাক্ষ্য নিলে বোধ হয় বোঝবার পক্ষে অনেকখানি সহজ হয়ে আসে।

এটা অতি সহজ কথা, যেখানেই একটা জাতি আর একটা জাতিকে তার পায়ের দাপে পিষে রাখে, সেখানে তার স্বাধীন স্ফূর্তি থাকে না। স্বাধীন স্ফূর্তি না থাকার জন্যে মনের মধ্যে যে গ্লানি সঞ্চিত হয়ে ওঠে, সে গ্লানি জীবনের সাথী হয়ে থাকে। সাহিত্যে সেই গ্লানির দুঃখ ফুটে ওঠে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বেশীর ভাগ চোখ-ঢাকা বলদের মত ঘানিতে ঘুরতেই আরাম পায়, সেই ঘোরাটা তার অভ্যাস হয়ে যায়। দলপতিরূপ চাই সেই চোখ-ঢাকা বলদ দিয়ে, নিজের জন্য তেলটুকু বার করে নিয়ে —খোলটা খেতে দেয়—বলদ তখন খোল খেয়েই সন্তুষ্ট। দলপতির ঠেলায় পড়ে সে তখন বলে "আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—এই ঘানিতে ঘোরার মত আনন্দ আর নেই। এই ঘানিতে ঘোরাবার জন্যই ভগবান মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তখন 'ইমানি ভূতানি নৃত্যন্তে'—আনন্দেতে। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যরচনা আরম্ভ হয়ে গেল যে, সে সাহিত্য অধ্যয়ন করলে, অমনি ব্রহ্মবিদ্ হয়ে গেল, দলপতি যাদের তা পড়বার হুকুম দিলেন না—তারা তৃতীয় পন্থার লোক তাদের আর ব্রহ্মজ্ঞান হল না। তারা কেবল দলপতির বংশাবলীর ঘানিই টানতে লাগল। দলপতির বংশ তাদের বলে দিলে—তোরা জন্মেছিস পদধূলি পাবার জন্যে। তাই আজও এমন ঘানির বলদ আছে, যারা গৌরব করে, অমুকের বাড়ী লক্ষ ব্রহ্মবিদের পদধূলি আছে, একটুখানি জিহ্বায় আস্বাদ নিলে, বুকে মাথায় দিলে, ঊনকোটী চৌষট্টি কুল উদ্ধার হয়ে যায়। এই দলপতির দল থেকে কীর্তিবাস ওঝা বাল্মীকির ভূত ছাড়িয়ে তার উয়ের ঢিবি ভেঙে সাহিত্য রচনা করলে। গ্রামে গ্রামে তা ছড়িয়ে পড়ল। কথকতা আরম্ভ হল। এই কথা বলদদের বোঝান হ'ল যে স্বয়ং নারায়ণ ব্রহ্মবিদ ভৃগুর পদচিহ্নে শ্রীবৎসলাঞ্ছন বক্ষকে শোভিত করেছেন। দোলো-সাহিত্য জয়লাভ করলে। মানুষের আত্মার উন্নতি হ'তে লাগল। মাঝে মাঝে আবার দুচার-জন এলো—তারা আবার কালী-তারা-ষোড়শীর দশমহাবিদ্যার তাণ্ডব ঢুকিয়ে দিলে। মানুষ পথে চলতে লাগল, 'তারা শিবসুন্দরী' বলে। তারক-ব্রহ্ম-রাম নাম যেমন চলছিল, তাও চললই, তারা পরমেশ্বরী জেগে উঠলেন। ঈশ্বর ছিলেন একলা, মানুষ তাঁর ঈশ্বরী এনে দিয়ে চরমকে পরম করে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে আবার সাহিত্য রচনা চলতে লাগল।

আজকার দিনে সেদিনকার সেই আত্মার উন্নতি যে হয়েছিল, একথা যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে জীবনে অগ্রসর হওয়া বলে কথাটার কোন মানেই থাকে না। কেননা আজ আমরা সব জিনিষের দর কষে দেখতে চাই। আগের সেইটেকেই যদি উন্নতি বলে স্বীকার করে নিই, তবে আজকে যে সাহিত্য রচনার জন্যে মাতামাতি করছি, তাহলে তার কোনই মূল্য নেই বলতে হয়। মূল্য নেই বললে আজকের লোক শুনবে না, তারা বরং আগের গুলোকে উড়িয়ে নস্যাৎ করে দিয়ে, একাল ও একালের জিনিষের প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, এটা সুনিশ্চয়।

আগের দিনে যারা দোলো সাহিত্য করে এসেছে, তারা তাদের ক্ষমতার জন্য যত না সুনাম বা পার্থিব বস্তু লাভ করেছে, দলকে অনুসরণ করার জন্য অনেক তকমা পেয়েছে। আজও তাই হয়ে আসছে। দলের লোক কারুকে মহাকবি করে দিলে, কারুকে বললে

কবিই নয়। দলের বাইরে থেকে সাহিত্য রচনার শক্তির প্রকাশকে সহজে স্বীকার কেউ আজও করতে চায় না। চাঁই হবার প্রবৃত্তি, রাজ্যলাভের আশা, দুরাশা হলেও সহজে ত' কেউ ত্যাগ করে না। আমরা ত' আর সকলেই নিত্যসিদ্ধ থাকের লোক নই, সপার্ষদ হয়েও সবাই জন্মাই না—কাজেই দলে থেকে যে লাভ হয় সে লাভটা সহজে ছাড়তে চাই নে। এটা মানুষের অভ্যাসই বল, আর সহজ প্রকৃতিই বল—প্রকৃতি নিত্য প্রকাশ হয়ে অভ্যাস এনে দেয়, আবার অভ্যাস যখন মাথা থেকে পা অবধি ছাঁচ গড়ে ঘাম-তেল মাখিয়ে দেয়, তখন ওই প্রকৃতিই অভ্যাসরূপ দেবতার নবতাল ষড়ঙ্গের সঙ্গে মিলিয়ে ঠিক করে দেয়।

পরাধীনতা নিজ জাতির কাছেই হোক, আর পর-জাতির কাছেই হোক্—আওতার মানুষের রঙে সবুজ তাজা রঙ থাকে না। দলের যে ভূত সে বালক কাল থেকেই পেঁচোয় পাওয়ার মত ঘাড়ে চেপে রয়ে যায়। তাকে নাড়তে গেলে হাড় পর্য্যন্ত ঠকাঠক করে ওঠে। সাহিত্যে তখন সেই হাড়ের ঠক ঠকাঠক্ শব্দ বেজে উঠে। চাঁইদের কিন্তু সেটা ভাল লাগতে পারে না। চাঁই হওয়ার একটা ধর্ম্ম আছে।

এদিকে ঈশ্বর আর পরমেশ্বরী যখন মানুষে সৃষ্টি করলে, তখন এলেন ধর্ম্ম। আগের দিনে যখন ইমানি ভূতানি আনন্দের রসে ভোর ছিলেন, তখন শতদ্রু বিপাশা থেকে গঙ্গাতট-ভূমি প্রচুর খাদ্য দিত। ক্রমে যত খাদ্যের কাড়াকাড়ি সুরু হতে লাগল, তখন দেবতার দল বাড়তে গেল। এক এক দেবতার এক এক অনুচর স্তব গান আরম্ভ করে দিলে। বেদ গান আরম্ভ হয়ে গেল। সেই সব দেবতারা আজও আমাদের সাহিত্যে নানা রকম উঁকি ঝুঁকি দেন বটে, নতুন করে ছবি-ছাপায় অনেক অভঙ্গ আমরা দেখতে পাই বটে, কিন্তু কালের হাওয়া যে ভাবে বইছে তাতে ধর্ম্মকেই উড়িয়ে দেবার যখন মাঝে মাঝে পরামর্শ চলে, তখন সেই দেবতারা ত' কা কথা। পোড়া পেটের দায়ে দেশের যে নবরস ছাড়া আরও একটা নতুন রস এসেছে, সে রসে আনন্দের উল্টো পিঠটাই দেখা যায়। "আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"র দিনে যে ভগবান ভরা-পেটের মুখ দিয়ে আনন্দ বার করেছিলেন, সে ভগবান যদি এখনও থাকেন, তাহলে তিনি হয়ত, নতুন উপনিষদ তৈরী করবার প্রেরণা দিয়ে বলতেন, "তোরা ত' খুব আনন্দ করছিস, কিন্তু আমার দুঃখ ত' তোরা বুঝলি নি, আমি এখন বলতে চাই "দুঃখাদ্ধ্যেব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—"রসো বৈ সঃ" নয় বাপু, এখন "দুখো বৈ সঃ"।

এই দলের অন্তরে, তার ভিতরে থাকেন দুজন, একজন হলেন ধর্ম্ম, আর একজন আগেকার দেবতাদের বদলে যাকে নিয়ে এই দল গড়া হ'ত, সেই চাঁইটী ক্রমে ঈশ্বরের গদি কেড়ে নিলেন। গদি থাকলেই, আলবোলা চাই, গড়গড়া চাই, গড়াগড়ি চাই, জয়ধ্বনি চাই,—জয় প্রভুর রোল চাই। বেদের কালে লাঙল ঘাড়ে করে চাষ-বাস করে পেট ভরাতে হ'ত, যজ্ঞটা যাজনটা থেকে সোনার তাল পাওয়া যেত, ক্রমে সে সব দেবতাদের চাপা দিয়ে, দলপতিকে ঈশ্বরের থাকে তুলে পার্শ্বদেরা যুক্তি তর্ক কাব্য দর্শন, রাগ অনুরাগ, ভাব বিভাব, নানা রকম গড়ে তুলল। আগেকার বন্দরা আবার তেমনি চোচাপটে 'প্রভু হে' বলে সাষ্টাঙ্গে মাথা লুটিয়ে দিলে। সংস্কৃতের দর্শন-কাব্যকে খাড়া করে—দেশজ ভাষা নিয়ে মিলিয়ে গড়ে তুললে একটা সাহিত্য! সে সাহিত্য শুধুই রস, যা কিছু প্রাকৃত জনোচিত ভাব বিভাব, সব ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে। ব্রহ্ম তখন স্রোতের শেওলার মত ভাসতে লাগলেন! দলপতিদের মঠ হল, মন্দির হল, ভোগ রাগ হতে লাগল—একটা করে জয়ধ্বনির সঙ্গে নাম গান হয়; আর মুক্তি, অর্থাৎ সেই অপ্রাকৃত লীলা ছোট আমলকীর ফলের মত হাতের মুঠার ভেতর আসে।

দেশের আবহাওয়া তখন আগের দিনের মত ছিল না। দেশের বাইরে থেকে অনেক খাপ-খোলা তলোয়ার হাতে মুক্ত পুরুষ দেশ ছেয়ে ফেলেছিল,

তারা বললে এ ত' ভাল কথা নয়। তারা তখন দলের একজনকে ধরে ছত্রিশটা বাজারে ছত্রিশহাজার বেতের ঘায়ে গায়ের ছাল তুলে দিলে। দলের লোক নাম গান করতে লাগল। মুক্তি আরো সুলভ হয়ে গেল। কেউ কেউ বললে, ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি, আমরা লীলাময়ের মাধুর্য্যরসে বিভোর হয়ে আছি, মাটির দেহ মাটিতেই থাকবে, আমি রমণও নই রমণীও নই, আমি যে দেশ-কালের বাইরে। সেই "আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ" সাহিত্য চলতে লাগল। সে দিনের ঈশ্বর সেই ছত্রিশহাজার বেতের দাগ আজও ভুলতে পেরেছেন কি না—তিনিই বলতে পারেন। আমরা প্রাকৃত জন তা বলতে ভরসা পাই না।

দিন চলতে লাগল। সুখে দুঃখে—মানুষ অনেক কল্পনা দিয়ে নিজেকে টেনে নিয়ে চলল। একথা ইতিহাসের।

প্রকৃতির নিয়মই এই এক ঋতুর পর আর এক ঋতু আসে। তেমনি দলের পর দল আসতে লাগল। একদল উঠল। বেত খাওয়ার রস থেকে, এক দল বেত মারাওয়ালাদের সঙ্গে বেশ মিশে গেল। পেট ভরতে লাগল, মালপোর বদলে, পাঠার মুড়ি খাবার সখ বেড়ে উঠল। খাবার যোগাড়ের প্রাচুর্য্য থাকলে মুখ বদলাই করা শোভা পায়। তারা তখন অছিলা খুঁজে বার করে নিলে। আগম-নিগম অনেক এল। ধর্ম্ম চাই! ফিরে গেল মাটির গড়া দেবতার দরজায়। পুঁতলে হাড়িকাট। কাটলে ছাগল, বললে মায়ের প্রসাদ। ভূরি ভোজন চলতে লাগল। ময়ূরে চড়া কার্ত্তিক বাবরী চুল, ভোমরার ডানার মত গোঁফে চাড়া দিয়ে বসলেন। ব্রহ্ম তখন বারোয়ারীর সঙ হয়ে গেলেন। তখন যে সোনার কার্ত্তিকের আমলে সাহিত্য আরম্ভ হোল, তাতে প্রাকৃত রস প্রাকৃতের পরাকাষ্ঠায় উঠল, এদিকে আগেকার অপ্রাকৃতরা লাঞ্ছিত হল। ভাষায় ঢুকল ফারসী, অন্যদিকে সোনার কার্ত্তিক ঈশ্বর হল না বটে, কিন্তু একেবারে হরপার্ব্বতীর সেবাইত, শাপে এ দেশে এসে জন্মালেন। বামুন রাজার টাকা আর বামুনের বুদ্ধি যে খেলা খেলে আসছিল, আবার সেই খেলাই খেলতে সুরু করে দিলে। ছত্রিশহাজার বেতমারাওয়ালাদের দেশের বার করে দেবার জন্যে—বড় আয়োজন করলে। বাঙলার আকাশে আগে তারা একটুখানি সাদা মেঘের মতন দেখা দিলে—তারপর মেঘের চাঁদোয়ায় সব ঢেকে গেল। রাজা করতে গেলেন নিজেকে কায়েমী—বিধাতা পুরুষ বললেন—কোথা যাই আমি?

প্রকৃতির নিয়মেই ঝড় আসে, আগের দিনের দেবতাদের জাত বাঁচাবার জন্যে যত কিছু সাধনা করা হয়েছিল, এক বন্যায়, মন্বন্তরে, দুর্ভিক্ষে ছত্রিশ জাত এক করে ছেড়ে দিলে। দেবতা বামুন এক গাড় হয়ে গেল। বেনো জলে সেদিন, বাদার বিল থেকে পলাশীর আমবাগান পর্য্যন্ত জল ঘোলা হয়ে গেল। রাত্রি হল অন্ধকার। দেশ হল জঙ্গল। মানুষ-জন-গরু-বাছুর গেল মরে। ঘরে যে সন্ধ্যে পিদীম কে জ্বালে তার ঠিকানা রইল না। সাহিত্য তখন ডুব দিলেন ইছামতীর জলে। ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে, বুনো মৌচাক ভেঙে মধু খেয়ে—মানুষ বাঁচতে চেষ্টা করতে লাগল। তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়ে কোন অনুপপত্তি নাই, বলবার যে শক্তি ছিল—তা ফুরিয়ে গেল।

এ পালার গাওনা হয়ে গেল। উত্তর কুরু থেকে সুরু করলে যাত্রা। এল পেটের দায়ে শতদ্রু বিপাশার তীরে, গঙ্গা গোদাবরী ঘুরতে ঘুরতে পদ্মার জলে এসে সব মিলিয়ে গেল। যা রইল তা স্মৃতির তর্পণ, আর ন্যায়ের কচকচি।

ধারাটা আরো একটু পরিষ্কার করে বলতে হলে, বলতে হয় যে, উত্তর থেকে যা এল তা হস্তিনা, কান্যকুব্জ, মগধ, নবদ্বীপ ঘুরে বিক্রমপুরে এসে তলিয়ে গেল। যা রইল তা ওই 'আত্মা বা অরে'র আমিত্বটুকু। সেই আমিকে বাঁচাবার জন্যে যত পারলে গণ্ডী দেবার ব্যবস্থা করলে। সাতগাঁর দাঁড় বহা থেমে গেল, ধর্ম্ম ডুব

মারলেন কালাপানির ভিতরে। পূবদিক থেকে যে সূর্য্য উঠত, আলো দিত, সে লজ্জায় মুখ ফেরালে। দেশ অন্ধকার। জাহাজ ভরে দিয়াকাটি এসে, পূর্ব্বের অরণি কাষ্ঠের স্থান অধিকার করলে। দেখলাম, জাহাজ ভরে আলো আসছে। তারা এসে বললে, আমি তোমাকে জ্ঞান দেব ও গন্তব্য পথ দেখিয়ে দেব। অবশ্য উচ্চারণটা ছিল বাঁকা।

আর এক পালা সুরু হল। এ পালা বড় ঘোরাল। ওপরে আকাশ ঘন ঘোর, ভিতরে নেই মনের জোর। পরের দেশলাইয়ে জ্বালি আলো। ধুনো গঙ্গাজল ছড়িয়ে নিজেকে লক্ষ্মী কৌটোর ঝাঁপিতে বেঁধে রাখবার সাধনা চলল। লক্ষ্মী বললেন, ওরে হতচ্ছাড়ারা আমি চললেম, জাহাজে চড়ে, তোরা অন্ধকারে প্যাঁচার মত মুখ গোমড়া করে থাকগে বসে, ও বাহনে আর আমার দরকার নেই! কথাটাও সত্যি। হাতী-ঘোড়া পাল্কী-দোলা চড়তে পেলে, কে আর পাঁাচায় চড়ে বেড়াতে চায় বল? সপ্তশতী বেয়ে যত সম্ভার নিয়ে এসে যে লক্ষ্মীকে এতদিন পুজো দিয়ে আসছিলাম, সে লক্ষ্মী যখন গেলেন চলে, তখন ধর্ম্ম ঢুকলেন হেঁসেল ঘরে, আর ছোট বোন সরস্বতী উঠলেন চালের বাতায়। খুঙ্গী-পুঁথি যা ছিল, পেটের দায়ে দিলেম বেচে। তখন সরস্বতীও বড় বোনের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন চলে। সেই অবধি সেই লক্ষ্মী সরস্বতীকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে জাহাজে চড়ে গতাগতি করছি। মা ত' আজও মুখ তুলে চায় না, মায়ের বোন মাসি দরদ করে বেশী, একটু আধটু কথা কয়, কিন্তু ফিরে আসতে আর চায় না! পাছে বোন করে মুখভার।

এই যখন হাল, তখন সাহিত্যও হালে পানি পান না অবস্থা। না-খেতে পেয়ে মানুষ গেল ইতর হয়ে— সাহিত্যে দেখা দিলে পচাল। আগেকার উনকোটী চৌষট্টি দেবতারা তখন রইলেন দেশের ওপর ভর হয়ে। যা কিছু কলাটা মূলোটা পাওয়া যায় তাই লাভ। মেয়েদের বললে, খবরদার, বাড়ীর আঙন থেকে যদি বের হও, 'নাল' না বলে যদি 'লাল' বল, তবেই তুমি গেলে। গোয়াল দেখ, রান্না কর, কন্না কর, ঘরের কোণে ঘোমটা টেনে বসে থাক। তারা আর কি করে? পুকুরঘাটে গিয়ে যা কিছু তাদের সুখ দুঃখ মিসি-দাঁতে চোখের জলে, শাঁখা খাড়ু নেড়ে কইতে লাগল, না হলে যে দম ফেটে মরে যায়। তখন সেই গুমরোণ কান্না একদিকে, আর অন্যদিকে পচাল—এই হোল সাহিত্যের ধারা। অনেক আগে একটা মানুষ এসে দেশকে বললে, মানুষকে বললে—

শোন্‌রে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই···

তার একশ বছর পরের মানুষ বললে, বেশ বলেছ ভাই। মানুষকে ঠাকুর করে দিই··· সেই মানুষ ঠাকুর হওয়ার ঝোঁক, আর দণ্ডবতের ঝোঁক চলতে সুরু করলে। ঠাকুর দেবতার দেশে, আবার আউল বাউল পীর ফকির সব দেখা দিলে। গন্তব্য পথ যাঁরা দেখিয়ে দিতে এলেন··· তাঁরা অনেক কিছু করলেন। তাঁদের দয়ায় যেমন আমরা অনেক কিছু পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে জাত অনেককে দিতে হল।

প্রীত্ না মানে জাত কুজাত।
ভুখ্ না মানে বাসি ভাত॥

তখন

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী।
হাঁড়িতে ভাত নাহি নিতি আবেশী॥

ঘর পড়ছে টলে, হাঁড়িতে নেই ভাত, জাত থাকে কি করে। এই ভাবে কাটতে লাগল দিন।

• কিছুকাল গেল—তারপর সাহিত্যের সুদিন এল। সুদিন কি সেদিন কুদিন, সে তার ফলে পরিচয় দিয়েছে। এ হালের কথা, এর পথ ঘাট চলা ফেরার ভঙ্গী নতুন ধরণের। সেই নতুনের ধারা আজ পর্য্যন্ত চলেছে। দেশ যেমন তার জীবনের গন্তব্য পথে চলেছে, সাহিত্যও সেই ভাবে চলেছে।

নতুন ভিত্তি

সাহিত্যের ভিত্তি খুঁড়ে দেখতে গিয়ে আমরা এই পর্য্যন্ত পেয়েছি — তার পরের যে গাঁথনি, সেই গাঁথনিই আজকের সাহিত্য। এ সাহিত্য বিচিত্র, নতুন ধারা ধরণ ভঙ্গী সবই নতুন। এই নতুনকে যখন আমরা বরণ করে নিলাম, আমাদের জীবনের ধারা বদল হয়ে গেল। সেই "আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ" আমরা ভুলি নি। কেবল মোড় ফিরে গেছে। একদিকে দণ্ডবতের ঝোঁক আর একদিকে মাথা তোলবার ঝোঁক—এই ঝোঁকা-ঝুঁকির দো-টানার মাঝে চলতে সুরু হল।

এ সাহিত্য নিয়েও দল হয়েছে, দলাদলি হয়েছে, দোলো-সাহিত্য এখন চলেছে। এর পিছনেও ধর্ম্ম আছে, মানুষের ঈশ্বরত্ব আছে। কিন্তু অতলান্ত মহা-সাগরের ঢেউ ভেঙ্গে জাহাজ বোঝাই হয়ে এমন সব জিনিষ এল যাতে আমরা একেবারে বদলে গেলাম।

আধুনিক বিজ্ঞান বলে, তিনটা জিনিষ দেখবার কথা। একত্ব, ক্রমিক ধারা, আর অভিব্যক্তি বা প্রকাশ। এই যে যুগ এল—এ যুগে বাঙলা সাহিত্য প্রথম জন্ম লাভ করলে। তার আগে গৌড়ীয় রীতিই ছিল। এই যুগে বাঙলায় বাঙালী হল। আধুনিক বিজ্ঞানের এই ধারা দিয়ে বিশ্লেষণ করে আমরা খুঁজে দেখব, আগের সঙ্গে তার একত্ব কতটা, ক্রমিক ধারায় তার স্ফূর্ত্তি কি রকম, আর তার অভিব্যক্তি ও প্রকাশের ভঙ্গী কেমন।

এই নতুন ভিত্তির কথা বলবার আগে, পুরান ভিত্তির কথা এখানে আরো একটু বলার দরকার আছে। না বললে এটা যে নতুন, সেটা বোঝবার অবসর পাওয়া একটু কঠিন হবে। সে কথাটা এই—

কেউ কেউ হয়ত এই বলে এখানে তর্ক তুলতে পারেন যে, আগে কি বাঙলা ছিল না। বাঙালী ছিল না যে, এইখানে এসে বাঙালী ও বাঙালী সাহিত্যের জন্ম হল? একথার নিরসন করার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। আমরা যে পদ্ধতি ও রীতি দিয়ে, যে চোখ দিয়ে দেখছি, তাতে বোঝা যায় যে, এই আমাদের কথাটাকেই হয় ত প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা অসঙ্গত হবে না।

পুরান দুটো পঙক্তি আমাকে এখানে তুলতে হ'ল। যাকে আজকালকার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বা ঐতিহাসিকরা হাজার বছরের পূর্ব্বের বাঙলা বলে স্বীকার করে, সেখান থেকে আজ পর্য্যন্ত একটা ধারার হিসাব দিতে চেষ্টা করেছেন। ঐতিহাসিক গবেষণার তর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য এ লেখা যদিও নয়, তবে এইটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে, পুরান ভিৎ থেকে নতুন ভিতের সন্ধান নিতে হলে, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে। আমরা নিছক ইতিহাসের দিক দিয়ে যাবার এখন প্রয়োজন মনে করি না, সাহিত্যের ভাবের ও জীবনের দিক দিয়েই যেতে চাই, তা থেকে যে ইতিহাস, তাই পেতে চাই।

সে পঙক্তি দুটা এই। পুরান কবিতার দুটা চরণ।

"বাজ ণাব পাড়ী পঁউয়া খালেঁ বহিউ।
অদয় বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥ ধ্রু ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥ ধ্রু ॥"

এর অর্থ হল—বাজের নৌকায় পাড়ি দিয়ে পদ্মাখালে বাইলাম।

আর অদ্বয় বাঙলা দেশ তাতে এসে ক্লেশ লুটিয়ে দিলাম।

আজ ভুসু বাঙালী হলি, কেন না নিজ ঘরণীকে চণ্ডালী করে নিলি। অর্থাৎ বাঙলা দেশের মেয়ে নিয়ে ঘরণী করে, সহজিয়া সাধন করে ভুসু অদ্বৈত থাকের চণ্ডাল হয়ে গেল।

সংস্কৃত মহাভারতের আমলে বাঙলা দেশ ছিল, বঙ্গ ম্লেচ্ছ। অশোকের আমলে সংবঙ্গীয়েরা কি যে ছিল তা সঠিক জানা যায় না, বৌদ্ধ যুগের সহজিয়ায় যা পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, এই সব তথা-কথিত বৌদ্ধ গান ও দোঁহার ভাষ্য টীকা হ'ত সংস্কৃত ভাষায়। বল্লাল-লক্ষ্মণের সময়ও সংস্কৃত ভাষা। যে

ধারা চলে আসছিল তাতে, ইংরাজ আগমনের পর যে জিনিষটা গড়ে উঠল, তার সঙ্গে পূর্ব্বেকার সম্পর্ক যে বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায়, তা বিশেষ মনে হয় না। এ যুগের গোড়ার দিকে বিরাট দশাসই প্রতিভা দেখা দিয়েছিল, তিনিও সেই গৌড়ীয় ভাষার কথাই বলে গেছেন। তবে আজ যে সেই পুরানদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের দাবী করি—সেটা আর কিছু নয়, আমাদের জাতীয়তার' একটা ধুয়ো চলেছে বলে। বঙ্কিম এসে বাঙ্গালার ইতিহাস নিয়ে রগড়া-রগড়ির পর থেকে এই নতুন ধুয়ো চলছে। আগে আমাদের এই বাঙলা সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তা বোধহয় বুঝতে অভাব হবে না। আজও একখানা বাঙলার ইতিহাস, সত্য যাকে ইতিহাস বলতে পারা যায়, তা গড়ে তোলা বোধহয় এখন সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয় না। তা সে মাল-মশলার অভাবেই হোক্, আর বিদ্যার অভাবেই হোক্ আর শক্তি বা পরিশ্রমের অভাবেই হোক্। হয় নি একথা বললে খুব অন্যায় হবে না।

এই কথাগুলো মাঝে থেকে বলে যাওয়ার একটা কারণ আছে। সে কারণ আমরা পরে এই ধারার সঙ্গে সঙ্গে বোঝাতে চেষ্টা করব।

ইংরাজ যখন এল তখন দেশ অরাজক। রাজা না থাকলেই অরাজক হয়, এ কথা নয়, রাজা থাকলেও অরাজক হয়। অর্থাৎ সমাজে থাকে না শৃঙ্খলা, শাসনে অনেক অবহেলা ঘটে যায়। মুসলমান আমলে জাত বাঁচাবার জন্যে সে সমাজের বাঁধন সুরু হ'ল, তাতে ফল হল আমরা একেবারে ঘরমুখো হয়ে রইলাম। সেকালে রোগীর ঘরে, জানালা দরজার ফাঁক, নর্দ্দমার পথ, ছেঁড়া ন্যাকড়া দিয়ে সব ফাঁক বন্ধ করবার পদ্ধতি ছিল, পাছে ঠাণ্ডা লাগে, শ্লেষ্মার প্রকোপ বাড়ে, আমরাও সে সময় ঠিক অমনি নাকে-কানে তুলো গুঁজে বাইরেকে ঢুকতে দিতে রাজী হই নি, পাছে জাত যায়।

এই জাত বাঁচাবার স্পৃহাটা এতই বেড়ে উঠল যে, তাতে নিজের জাত বাঁচাতে গিয়ে, জাত প্রায় মারা যেতে লাগল। কতক গেল মুসলমান হয়ে আগেই, পরে আবার ঈশাই হয়ে গেল কতক। দেশের যারা সমাজের নেতা, হয় তারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নয় টাকাওয়ালা জমিদার, তারাই তখন সব রকমে নিজেদের স্বার্থের থলির মুখে একেবারে নিরানব্বুইয়ের গাঁট কসতে লাগল। চতুরে-চতুরে খেলা চলতে লাগল। চাতুর্য্য জিনিষটা যখন আরম্ভ হয় তখন বেশ, তারপরেই নিজের চাতুরীর কাছে নিজেই পড়ে বাঁধা। ফল, ক্রমে তাঁতির গেল কাপড়, চাষার গেল জমি, মাঝির গেল নৌকো। স্থলে জলে যা কিছু ছিল, সব ফুরিয়ে গেল। একদিকে পড়ল সেই নিরানব্বুইয়ের গাঁট, অন্য দিকে সব যখন হাতে থেকে ফসকে গেল, তখন ঘরমুখো বাঙালী বলে উঠল:

"কত রূপ স্নেহ করি', দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।"

জাতের বুকের ভেতর একটা নতুন সুরের খোঁচা এসে বিঁধল। যেটা একদিকে ধোঁয়াচ্ছিল, সেটার আগুনের ফুলকি ফিনিক দিয়ে উঠল। যে বিরাট চার হাত লম্বা দশাসই পুরুষ বাঙলায় সেদিন এল, আরবী, ফারসী, তামিল, তৈলেঙ্গী, দ্রাবিড়, স্মৃতি-শ্রুতি প্রভৃতি সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্র, ইংরেজী, হিব্রু, গ্রীক, সব ভাষাই শিখে নিলে। শুধু শিখলে না—নিঙড়ে রস বার করে নিলে। তার আরসীখানা ছিল খোলা আকাশের মত, তাতে সব প্রতিফলিত হল। সে তখন একটা নতুন ভাঙা-গড়া করে, অনেক মিলিয়ে ইংরেজী ভাষাটাকে দেশের ভিতর ঢুকিয়ে দিলে। বিদ্যুতের ব্যাটারী দিলে যেমন সব ঝনঝন করে বেজে ওঠে, পঙ্গুকে নাচিয়ে ছেড়ে দেয়, তেমনি ওই ভাষা এসে যেদিন বাঙলায় ঢুকল, মরা জাত একেবারে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। চোখ মেলে চেয়ে দেখলে, পৃথিবীটা শুধু এইটুকু নয়। অনেকখানি জায়গা—পাত্‌কোটাই সমুদ্দুর নয়। গলায় কণ্ঠি পরে বৃন্দাবনে গিয়ে বাঁদরকে খাওয়ানই চতুর্ব্বর্গ নয়—আর পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে শবসাধন করলেই,

সবারি আঙিনার বেড়া ষোড়শী ভুবনেশ্বরী বেঁধে দিয়ে যায় না।

জাত জাগতে সুরু করলে। কিন্তু অভ্যাস যায় না মলে। কেউ বল্লে, "বঁধু কাঁচা ঘুমটা ভেঙে দিলে, আরো একটু ঘুমুতে পারলে ভাল হত।" কেউ বল্লে, "এ আবার কি ঢঙ্।" চল্লিশটা আম আর একটা পাঁটা যে খায়, সে অত সহজে, মালপোর ঢেঁকুর শুনে ভয় পায় না। সব্যসাচীর মত কারুকে সে রেহাই দিলে না। সব দাবিয়ে দিলে। উপনিষদ ভাঙলে, বেদান্ত ভাঙলে, মহানির্ব্বাণ ভাঙলে, বাইবেল, কোরান, সব বাঙলা করে নিয়ে এল। এতদিন ধরে যা কিছু সংস্কৃতেই চলেছিল, এই প্রথম ভাষা টীকা হ'ল বাঙলায়। এই খানেই বাঙলার সাহিত্যে বাঙালীর নিজত্ব জন্ম লাভ করলে।

তারপর এল এক টিকী ও তালতলার চটী। বিশ্বের জোরে সাগরকে তোলপাড় করে দিলে। জ্ঞান দাও, জ্ঞান দাও বলে, চীৎকার করে উঠল। কর্ত্তাদের লিখে জানালো যে, শাস্ত্রে হবে না—মিলের utility পড়াও—পশ্চিমী ন্যায় ঢোকাও—ভাঙ আচারের কাসুন্দির হাঁড়ি, মেয়েদের অক্ষর শেখাও। পারলে না—বলে ম'ল—"ধন্য রে দেশাচার"।

কিন্তু দেশ সে সাগরের ডাক শুনতে পেলে না। দণ্ডবৎ করবার যে অভ্যাস, সেত সহজে প্রকৃতিকে ভোলে না। আবার ধর্ম্মের ডাক উঠল। দল বাঁধল, দোলো-সাহিত্য আবার মাথাচাড়া দিতে সুরু করলে। দল-ভাঙা সাহিত্যের দলও তেমনি দেখা দি[…] দল-বাঁধা সাহিত্য-রাও চুপ করে রইল না। পদ্যে, নাটকে, প্রহসনে নানা রঙে ও ঢঙে তার দেখা দিলে। তার ধারা-ধরণ কতক স[…] ইংরাজী সাহিত্যের কাছে ধার ক[…] সংসারে, কারবারে, যেমন ইংরেজ এ[…] কেউ কেউ তাতে নতুন বড় মা[…] গেল দেউলে হয়ে। সাহিত্যে[…] ইংরেজের ভাব নিয়ে, কেউ হু[…] ভাব নিয়ে, ধার-করা ভাবের সুদ আসল দিতে গিয়ে দেউলে হয়ে গেল।

ইংরেজকে দেখে, ইংরেজের সাহিত্যকে জেনে, সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপের সাহিত্য ও জীবনের ধারা যখন এরা কিছু কিছু জানলে, তখন জাতির ভেতর একটা বিরাট আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠ্ল। সংসারে, সমাজে, এমন হোল যে, পথের ধারে ষাঁড়ের ডালনা রেঁধে খেতে সুরু করে দিলে। পুরানোদের আর মানতেই চাইল না। পুরানোরা তা দেখে একবারে চমকে গেল। ঘরমুখো ধাত, তারা বললে, সর্ব্বনাশ করলে রে, জাতধর্ম্ম আর রাখলে না।

মুসলমান আমলে স্মৃতি দিয়ে, পুরাণ দিয়ে, ন্যায় দিয়ে, টিকী দিয়ে, আটকাতে গেল, বৈরিগীর দল শুনলে না, তারা টিকী রাখলে, কিন্তু খোল করতাল বাজিয়ে অষ্টপ্রহর করে নেচে, স্মৃতির পাঁতি উড়িয়ে দিতে গেল। এবার কেষ্টকালী একসঙ্গে দেখা দিলে। বললে সমন্বয়। একদিক দিয়ে এই সমন্বয় দলের সাহিত্য দেখা দিলে, অন্যদিকে বারমুখো দলের সাহিত্য দেখা দিলে। ঘরমুখোরা করতে লাগল হরিবোল, হরিবোল — বারমুখোরা করতে লাগল গণ্ডগো[…]

মাঝখানে জেগে উঠল 'আনন্দ […]
এই যে, পরের অধী[…]
জোগাড়, স[…]
যে […]

পড়, তখন চাকরীর মোহ বড় মোহ। নীতির মোহ বড় মোহ। অপ্রিয় সত্যের ওপর রঙ চাপিয়ে নানা ঢঙে বলতে চেষ্টা করা হল, কিছু কিছু মিথ্যাও তাতে রঙিন করে দিলে। সামঞ্জস্য করতে গিয়ে আসলে বড় সাহিত্য গড়ে উঠল না। কি করে উঠবে? মিথ্যের কোন জিনিষই কোন দিন গড়ে উঠে না। যা কিছু পুরানো ছিল সবই এ সাহিত্য কিন্তু নাড়া দিয়ে দিলে।

অনেক নতুন জিনিষ এ সাহিত্য বললে, গড়লে, দেখালে, যার আলোচনা করলে মনে হয়, আজও আমরা যে একেবারে সে আমলকে ডিঙিয়ে সামনে খুব বেশী এগোতে পেরেছি, তা মনে হয় না।

দেশের অবস্থা, আচার ব্যবহার যেমন দেশের সাহিত্যকে রূপ দেয়, তেমনি, সাহিত্যও আবার দেশকে রূপ দেবার চেষ্টা করে। কখন পারে আবার কখন পারেও না। তাই এই আনন্দমঠের কিছু পরে আবার উঠল ধর্মের ডাক, শুধু ডাক নয়, বানের জলের ঢেউয়ের মত এল তোড়ে। ইহলোকের কার-কারবারে অক্ষমতা অভাব যত বাড়ে, ধর্ম ততই এসে ঘাড়ে ভূতের মত চেপে বসে। এদিকে ...র কাছে যতই নিজেদের অক্ষম বোধ ... ও পুরান দর্শন দিয়ে, ... করবার জন্যে ...স জন্যে

অবতারণা করে খোল বাজিয়ে দিলে, এবারের ঈশ্বরে পওার খণ্ডা নেই। এ দেশী ও বিদেশী সব পাণ্ডিত্য ছেঁটে ফেলে তৈরী হ'ল। মুসলমান আমলে একবার একজনকে ঈশ্বর খাড়া করে তুলেছিল—তখন সেই ইহলোকের দরজায় ছিল সোলেমানী আগড়, একালের ইহলোকের দরজায় বিদ্যুতের ফটক। দেশের সে দল বললে, ওসব বিজ্ঞান-টিজ্ঞান চলবে না, বাজে কথা, এই দেখ জাগ্রত ঈশ্বর। তিনিও বল্লেন ঈশ্বরকে জানা যায় না কি গো, খুব যায়, এই তোমার গা ছুঁয়ে যেমন তোমায় জানা যায়, তেমনি যায়।

হবে! যিনি ঈশ্বর তিনি ঈশ্বরকে জানাতে পারেন বটে, এ কথা সত্য। কিন্তু ঈশ্বরকে আমরা দেখি নি, সৃষ্টির আদি যে কবে তাও জানবার সুযোগ হয় নি। আর ঈশ্বরকে জানবার জন্যে অনেকে, অনেক কিছু যুগ যুগ ধরে মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি করে এল, কেউ তা পেরেছে বলে, কিম্বা ঠিক সঠিক-খবর দিতে পেরেছে বলে জানা নেই। এ ঈশ্বর বল্লে, 'আমিত্ব ঘোচানই, মনুষ্যত্বের চরম, দাস-'আমি'টুকু না হয়, কোন রকমে রাখা যেতে পারে। দাসত্বের দেশে আমিত্বের পরাকাষ্ঠা জেগে উঠ্‌ল। ঘুরে ফিরে কিন্তু সেই "আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ"। সঙ্গে সঙ্গে দোলো-সাহিত্য গড়ে উঠতে লাগল। আগেকার নজীর আছে, বারজন করে সপার্ষদ থাকবেই। ভাব ছড়িয়ে দিলে—আবাদ চলতে লাগল। আবাদ করলে ফসল কিছু না কিছু হয়, তা উলু বনই হোক্, আর ধান ক্ষেতই হোক্, আবাদ ...ল। কিন্তু বিবাদও বাধল, যেমন বেধে যায়। কিন্তু 'যদা যদা হি গ্লানির' দিনে যেমন ছিল, ঠিক ...ই রয়ে গেল। সেদিনকার ঈশ্বরের দোলো-...সাহিত্য যারা শুনলে না, তারা হয়েছিল ...দিনকার দোলো-লোকের সাহিত্য যারা ... তারাও পাষণ্ডী। এ দোলোরা প্রায় ... বাকী রইল ওই পাষণ্ডীরা। ...স মলেও যায় না। তারা আবার ...লো। তখন ঈশ্বরের দল বল্লে,

মুসলমানী আমলে যদি ও ঈশ্বর না আসত, তা হলে সব মুসলমান হয়ে যেত। ইংরাজ আমলের ঈশ্বরের দল বলতে লাগল, এ ঈশ্বর না এলে সব ঈশাহি হয়ে যেত। দেশকে ধর্ম্মের গ্লানি থেকে রক্ষা করলেন।

ধর্ম্মের গ্লানি থেকে রক্ষা হওয়াই সংসারে সব চেয়ে বড় কথা। অথচ এ ধর্ম্মের কাছে এ সংসারটা অনিত্য—মায়া। সাহিত্যে, দোলো-সাহিত্যে রঙ-ঢঙ সবই রইল, বোঝান হল—সংসার অনিত্য। কিন্তু নাটশালে পয়সা দিয়ে সে অনিত্যটা দেখে যাও। পয়সাটা চিরকালই অখণ্ড নিত্যবস্তু কিনা। বিবেক বৈরাগ্যের বক্তৃতায় দেশের নাটশালা ভরে উঠল যেমন, সঙ্গে সঙ্গে চাল-ধোয়ানী পচাই চলতে লাগল তেমন। সমাজ হল এই, সাহিত্য হল এই। চলল খেল। এ ঈশ্বর সব ধর্ম্মের থাকের সাধন করে সমন্বয় করেছেন, কাঁচা আমিকে, পাকা আমি করেছেন, কাযেই সাহিত্যে হারুণ-অল-রসিদের বোগ্‌দাদী গল্পের খেল দেখাবার সময় রাম রহিম আর জুদো রইল না, সাহিত্যে সাঁচ্চা কথা বলা সুরু হয়ে গেল। সেকালে সাহিত্যের দিল যে কি পরিমাণ সাঁচ্চা তার যাথার্থ্য প্রমাণ করে রেখে গেল শুধু হাঁজি হাঁজি বলে। সোলেমান কেরাণীর দরবারে কাঁচা-পাকা কেয়া-ভার বিচার বিচক্ষণা হ'ল। কিন্তু কালের কালাপাহাড় সব দেবতার নাক কেটেই রেখে গেল, তাদের দরজা আজ পর্য্যন্ত কেউ খুলতে পারলে না।

দেশ বড় চমৎকার, সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা। ঈশ্বর এ দেশটাকে অন্য দেশের চেয়ে একটু বেশী করে ভালবাসেন। তাই যখন তখন ঘন ঘন নরবপুকে সহায় করে লীলা করতে আসেন। দেশে ধর্ম্মের গ্লানি লেগেই আছে, তিনিও কি করেন, থাকের লোক ডাকাডাকি করলে চুপ করে থাকতে পারেন না। তাই এলতলা, বেলতলা, ষষ্ঠীতলা থেকে নিতুই নতুন নবরে-নব কচি ঈশ্বর, বুড়ো ঈশ্বর অবাঙ্-মনসোগোচরের ঘর থেকে আসতে লাগলেন। চলেছে, তাদের সাহিত্যও চলেছে।

এই আবহাওয়া যখন দেশে চলল, তখন দেশে এমন একজন জন্মাল যে, যার ভেতরে পুব-পশ্চিম দুয়ে মিলে নতুন কিছু হ'ল। এই সব দোলো-সাহিত্য যখন চলতি খাতা, তখন তার খাতা খুব সচল বলে সকলে নিলে না। কিন্তু পশ্চিম থেকে বিষাণ বাজিয়ে যখন মহাকবি বলে ডেকে-হেঁকে গেল, তখন লোকে হকচকিয়ে বললে তাই নাকি! আগের দিনের দশাসই মানুষ যে বীজটা পুঁতেছিল বাঙলার মাটিতে, সেই বীজ থেকে ফলে-ফুলে ভরা একটা বিশাল গাছ হয়ে উঠ্‌ল, সেই গাছের সব চেয়ে পাকা ফল এও এক দশাসই মানুষ। একে কে যেন যাদুর নড়ি হাতে তুলে দিয়েছে। এর হাতে বাঙালা-সাহিত্য শুধু ঘরমুখো রইল না, একেবারে দরবারী হয়ে উঠল।

দোলো-সাহিত্যের দল কিন্তু একেবারে চুপ করে রইল না, নেইও চুপ করে। রামচন্দ্রী টাকা এখন হা-ঘরে বেদেনীতে ঠকিয়ে বেচে, কিন্তু রাজামুখো টাকাকে অচল বলার ক্ষমতা কারও নেই, কাজেই রাজার দেশ থেকে যখন ডাক এল, ডঙ্কা পড়ল, তখন এর সাহিত্যকে দোলো-লোকেরা অনেক অজুহাত ফিরিয়ে বলে, ও সব একেবারে বিদেশী কিনা, তাই মাটির সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। মাটির সঙ্গে কার যে কতখানি সম্পর্ক সেটা বোঝা শক্ত—কেননা মাটিটাই দেশের লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছে বলে মনে হয় না। দেশের লোক পেট ও পাটার ভাবনা যতখানি ভাববার তা যতখানি ভাবে, মাটির জন্যে ততখানি ভেবে দেহ মাটি করা তাদের পক্ষে ততখানি সুলভ নয়।

এই মাটির বুকের উপর দিয়ে, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, অনেক ভাণ্ড-চোর হয়ে গেছে,—যতরকম অপচার অনাচার, মানুষের ঐশ্বর্য্য ও শক্তি দিয়ে করতে পারে তা হয়ে গেছে, সর্ব্বসহা সবই সয়েছে। কাকেও কিছু বলে নি। সে যা বলবার, তা তার বিধাতার দিকে তাকিয়ে বলেছে, তুমি যে বার বার গ্লানি দূর

করবার জন্য আস, সে গ্লানি দূর ত কই হয় না। লোকে যে তোমার নাম করে ধর্ম্মের ডাক ডাকে, কই কোথায়, সবই মিথ্যে ফাঁকি। মাটিকে যারা ফাঁকি দেয়, আপনাকে তারা ফাঁকি দেয়। তাই জাতের গণ্ডী টেনে আজও এই হাল।

"সাতকোটী সন্তানেরে হে বঙ্গ জননি।
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি॥"

বড় দুঃখেই কবি মাকে এ কথা বলে। সেটা দেশের কানে সত্যি পৌচেছে কি না—দেশ হয়ত তার প্রমাণ দেবে।

পুরান সাহিত্যের ভাঁজ খুলে দেখা গেল যে, মানুষকে এরা ঈশ্বর করে দেশ হয়ে গেল নাস্তিক। ঈশ্বর হ'ল আচাভুয়োবোম্বাচাক, — মানুষ গেল দশ হাত মাটির তলে গেড়ে। জীবের অনাচারে গঙ্গায় গেল চড়া পড়ে, অথচ ধর্ম্ম-বাবাজী ঠিকই আছেন। ব্রহ্মও আছে, বৈরিগীও আছে, মঠ, মন্দির, বালাখানা, তোষাখানা ঠিকই আছে। হাড়কাঠের কাছে তেমনি ছাগল ব্যা-ব্যা করে। শাঁখ ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়ে দেবতার তেমনি আরতি হয়, পুরুত টিকীতে তেমনি ফুল বাঁধে। দেবতার ফুল আর পড়ে না। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্তর শুনতে শুনতে দেবতা অতিষ্ঠ আর আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

নতুন সাহিত্যে যা এল, তাতে 'আমিত্ব'কে লোপ করার কথা কইলে না, আমিত্বকে বজায় করার সাধনাই চলতে সুরু করলে। রোদ, আলো, বাতাস পেয়ে যেমন গাছ বাইরে থেকে প্রাণের রসকে সঞ্চয় করে মাটির রস থেকেও তেমনি সঞ্চয় করে, পুষ্ট হয়। বাইরেকে বাদ দিয়ে যে সাহিত্য দোলো-সাহিত্য করে মনে করছিল, একটা কিছু করলাম, এ নতুন সাহিত্য—তা না করে বাইরে ভেতর দুয়ে মিলিয়ে উঠ্ছে। এর আমলে আরো নয়া-নয়া-ঢঙ-রঙের সাহিত্য দেখা দিয়েছে, তারা সবই এই দশাসই পুরুষের আওতায়। কেউ তা স্বীকার করে, কেউ করে তার অস্বীকার।

এরি মধ্যে আর একজন এল—সে ঘরভাঙা-সাহিত্য গড়ে নিতে আরম্ভ করলে। গড়তে গেলে যে ভাঙতে হয়, এ মানুষটা তা জানে। যে আগুনে এ মানুষের পাঁজরা পুড়ে খাক্ হয়, সে আগুন নিয়ে সে ঘর করে। হয় আগুন নিভাতে হবে, নয় আগুন জ্বালাতে হবে।

এই হ'ল 'অথ'র মানে। অতঃ সাহিত্য জিজ্ঞাসা আমরা যে তুলেছি, এই ধারায় যে আভাসের শিকল গাঁথা হোল, তাতে এটা বোধ হয় বোঝা যাবে যে, সাহিত্য জিজ্ঞাসা কি?

প্রথম হোল ধর্ম্ম, তারপর সমাজ, তারপর মানুষ নিজে, এই তিনে মিলে এ রচনা ও রটনা হয়। এর পিছনে আছে দেশের জলবায়ু, দেশের আবহাওয়া, দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা। আগের সাহিত্য হ'ল ভূয়ো সুখের, এখনকার সাহিত্য হোল সত্যি দুঃখের। এর দুঃখের ওর নেই। এই দুঃখের যে তাপ, তার তপ থেকে যে সৃষ্টি, সে সৃষ্টি আশা হয় নতুন হবে।

আজকের দিনে মেয়েদের সেই ঘোমটা নেই। ছেলেরা পেট ভরে খেতে পায় না, দেশের আকাশে কানা-মেঘের জল। বুড়োরা ভয়ে কুঁড়োজালি ঘোরাচ্ছে। আমরা পরে, এই ইতিহাসের ধারার বিশ্লেষণ করে সে সাহিত্য-জিজ্ঞাসাকে বোঝাবার চেষ্টা করব; সাহিত্য বিচার করে, এপার ও ওপার মিলিয়ে তার দার্শনিক ভিত্তির উপরে আমাদের সাহিত্য জিজ্ঞাসার যথাযথ প্রতিষ্ঠা করব।

উত্তরাধিকারী

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

আমাদের ও-অঞ্চলে হিজলডাঙ্গার দত্তদের চেনে না এমন লোক নাই। অবস্থা যে তাহাদের ভালোই ছিল সে সম্বন্ধে অবশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু নাম তাহাদের বড় লোক বলিয়া নয়। বড়লোক তো কতই থাকে। তাহাদের বাড়ীর কয়েক রশি দূরেই তো একটা রাজ-বাড়ী ছিল। সে রাজবাড়ীর অর্দ্ধেক আজ গঙ্গাগর্ভে, আর অর্দ্ধেক ইষ্টক-স্তূপে পরিণত হইয়াছে। প্রথম দেউড়িটা এখনও বোঝা যায় বটে, কিন্তু তারপরেই এমন ঘন জঙ্গল আরম্ভ হইয়াছে যে, সেদিকে যায় কাহার সাধ্য! সে বাড়ীর কোথায় কি ছিল জানিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। ফলে, লোকের মুখে-মুখে বিগত রাজৈশ্বর্য্য লক্ষগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এখন শুনিলে মনে হয়, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য দিল্লীর বাদশাহের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। সে বংশের কে যে কোথায় আছে এবং কি ভাবেই বা কালাতিপাত করিতেছে কেহ তাহার সংবাদ পর্য্যন্ত রাখিবার প্রয়োজন বোধ করে না। অথচ দত্তরা তো তাঁহাদেরই মুন্সি ছিল। কিন্তু ওই-অঞ্চলের কে তাহাদের না জানে, আর কে-ই বা খাতির না করে। অবস্থায় আজ তাহাদেরও ভাটা পড়িয়াছে। মস্ত বড় চকমিলান বাড়ীটাই যা। বালাখানার দরদালানে বসিয়া বাড়ীর মালিকেরা এখনও মুখস্থ চপটাং রাজা-উজির মারেন বটে, কিন্তু পাড়ার ছেলেরা মিলিয়া বালাখানায় যদি লাইব্রেরী না বসাইত তাহা হইলে চামচিকার উৎপাতে ও-ঘরে আর বসা চলিত না। মালিকেরা তো সকলে সুদূর অন্দরের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, আর নিজের-নিজের সুবিধামত এদিক-ওদিক দরজা ফুটাইয়া বাহিরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সরিকও তো কম নয়। কাহারও ভাগে দুইটি ঘর আর একটা বারান্দা, কাহারও বা একটিমাত্র ঘর আর আধখানা বারান্দা। এমনি করিয়া অতগুলি লোক ঠাসিয়া-ঠুসিয়া অন্দর বাড়ীতে বাস করিত।

তবে হ্যাঁ, মনোময়ের গুণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বালাখানার ছাদ মেরামত হইতে আরম্ভ করিয়া বাহির মহলের যত কিছু জোড়া-তালি সে নিজের পয়সা খরচ করিয়া করিয়াছে। কিন্তু সে-ও তো সব শ্বশুরের কল্যাণে। এম-এ পাশ তো আজকাল সকলেই করিতেছে! কিন্তু সরকারী দপ্তর-খানায় অমন ভালো চাকরীটি শ্বশুর না থাকিলে আজ-কালকার দিনে কে বাগাইতে পারে! তবে সেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, চাকরী যেই জোটাইয়া দিক গাঁটের পয়সা পাঁচজনের কাজে খরচ করিতে যে পারে তাহার মন ছোট নয়।

এই তো দত্তদের বর্ত্তমান অবস্থা। কিন্তু নাম-ডাক তাহার চেয়ে অনেক বেশী। এবং কলিকাতা সহরে যদিচ মনোময়কে রায়বাহাদুরের জামাই বলিয়াই লোকে জানে, তাহাদের ও-অঞ্চলে সেই রায়বাহাদুরের নামও কেহ শোনে নাই। সেখানে তাহার বড় পরিচয় হিজলডাঙ্গার দত্তদের ছেলে বলিয়াই। এমন কি তাহার নামের পিছনের এম-এ উপাধিটাও বাহুল্য মাত্র।

এত বড় নাম-ডাকের হেতু যিনি তিনি বহুকাল হইল গত হইয়াছেন। তখন দত্তদের জমজমাট অবস্থা। বঙ্কুবাবু দুইহাতে সেই ধন বিতরণ করিতেন। বাড়ীতে দানসত্র, সদাব্রত তো ছিলই, উপরন্তু ত্রিশ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যে এমন গ্রাম ছিল না যেখানে তিনি অন্ততঃ একটি পুষ্করিণীও খনন করেন নাই এবং শীতকালে অন্ততঃ দুইশত কম্বলও বিতরণ করেন নাই। শেষ জীবনে তিনি অকস্মাৎ সমস্ত ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। সেখানে বহু টাকা ব্যয়ে একটি প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া এবং সেই মন্দিরের শ্রীশ্রীরাধামাধব

জিউর সেবার জন্য যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করিয়া নিজে মাধুকরী দ্বারা জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। দান করিবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই থাকে। কিন্তু কোনো বড় দাতার অথবা ত্যাগীর দানের অথবা ত্যাগের মর্য্যাদা আর কেহ না বুঝুক এই বাংলা দেশের লোকে বোঝে। তাই বঙ্কুবাবু যদিও আজ নাই, এবং তাঁহার পরিত্যক্ত সে বিপুল সম্পত্তিরও অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে তথাপি দত্তবংশের মর্য্যাদা আজও চারিপাশের লোক অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

মনোময় মোটা টাকা মাহিনা পায়, এবং গ্রামের উপর তাহার যথেষ্ট মমতাও আছে। গ্রামের অথবা পার্শ্ববর্ত্তী কোনো গ্রামের কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তাহার যথাসাধ্য সাহায্য হইতে বঞ্চিতও হয় নাই। তবু তাহার পূর্ব্বপুরুষের দান লোকের মনের এতই উঁচুতে দাগ কাটিয়া গিয়াছে যে, তাহার কোনো দানই লোকে প্রাপ্যের অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিতে পারে না।

দত্তবংশের দানশীলতা মনোময় উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে। কেবল একটি বিষয়ে বংশের আর সকলের হইতে সে পৃথক। ইঁহাদের সকলেই ভক্তিমার্গের পথিক, জ্ঞানমার্গের নয়। এণ্ট্রান্স ফেল করিয়া সকলেই গুরুর নিকট মন্ত্র লইয়াছে। প্রত্যেকের কণ্ঠে তুলসীর মালা, মাথার চুল ছোট-ছোট করিয়া ছাঁটা, তাহার উপর গোক্ষুর পরিমাণ একটি শিখা। বাড়ীতে বিগ্রহ দেবতা আছেন, তাঁহার ভোগ না হইলে কুড়ি বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক কেহ জলগ্রহণ করে না। দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি অপরিসীম। এবং শুধু সুশোভন বিনয় ও সুমার্জ্জিত ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া গ্রামের সহস্র ছেলের মধ্যে দত্তবাড়ীর ছেলেদের অতি সহজেই বাছিয়া লওয়া যায়।

কেবল মনোময়ই এ বংশের একটি ব্যতিক্রম। তাহার মাথার চুল হাল-ফ্যাশানে ছাঁটা, শিখা নাই। গলার তুলসীর মালাও নাই। পাতলা ছিপছিপে দেহ, সর্ব্বদা চঞ্চলভাবে ছটফট্ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। বৈষ্ণবোচিত নেয়াপাতি ভুঁড়ি নাই, — ধীর নম্র কণ্ঠ নাই, — মৃদু ক্ষীণ হাসিও নাই। কোনো কাজ করিবার সময় আর সকলে যখন কিংকর্ত্তব্য বিবেচনা করে সে তখন সে কাজ শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার কথাও কোমলতাবিহীন। দ্বারে ব্রাহ্মণ প্রার্থী আসিলে সকলে কিছু দিক আর না দিক সমাদর করিতে ত্রুটি করে না, — বড় ভাই চিন্ময় উপস্থিত থাকিলে তো পাদোদকও আদায় করিয়া লয়। কিন্তু তাহার কাছে সে সব নাই! ব্রাহ্মণ দেখিয়া সে উঠিয়াও দাঁড়ায় না। হয় তো আবেদন আধখানা শুনিয়াই পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া মেঝেয় ছুঁড়িয়া দেয়, বই হইতে মুখ তুলিয়া দেখেও না কে প্রার্থী। আর যদি মুখ তোলে তো ভিক্ষাবৃত্তি সমাজের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর সে সম্বন্ধে রুক্ষভাষায় একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া দেয়। এই সকল কারণে গ্রামে তাহার কিছু অখ্যাতিও আছে।

অনেকে এই জন্য তাহার স্ত্রী বিভারাণীকে দায়ী করেন। কথাটা হয় তো একেবারে মিথ্যা নয়। বি-এ পড়িবার সময় রায়বাহাদুরের গৃহে তাহার বিবাহ হয়। তখন পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের সকল চিহ্নই তাহার ছিল। বিবাহের কিছুদিন পরেই গেল টিকী, তারপরে মালা। তারপরে বাড়ীর লোকে সবিস্ময়ে দেখিল মনোময় আহ্নিকও করে না, বিগ্রহের ভোগ হওয়া পর্য্যন্ত আহারের জন্য অপেক্ষাও করে না। বিভারাণী সকালে উঠিয়াই তাহার জন্য ষ্টোভে দু'খানা লুচি ভাজিয়া দেয়, আর একটু চা। আটটা বাজিতে না বাজিতে পান চিবাইতে চিবাইতে মনোময় বাহিরে আসিয়া একটা চেয়ার টানিয়া নিবিষ্টমনে পড়িতে বসে। ব্যাপার দেখিয়া বাড়ীর লোকেরা মুখ টিপিয়া হাসে। কিন্তু যে-ছেলে দু'দিন পরেই অবধারিত গ্র্যাজুয়েট হইবে তাহাকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও সাহস করে না।

—হবে না? অত বড় ধিঙ্গি বৌ! তখনি বলেছিলাম দাদাকে ...

কিন্তু দাদা, অর্থাৎ মনোময়ের পিতা কি করিবেন? অত বড় ধিঙ্গি বৌ, বিশেষ সহরে মেয়ে আনিতে তাঁহারই কি ইচ্ছা ছিল? কিন্তু অতগুলো টাকা! তাহার সিকিও তো কেহ দিতে রাজী হয় নাই। হইলে কি আর তিনিই এ বিপত্তি ঘাড়ে লইতেন?

পালকী হইতে নামিতে না নামিতেই বিভা একজোড়া স্যাণ্ডাল পায়ে দিয়া একটা তোয়ালে কাঁধে ফেলিয়া বাপের বাড়ীর ঝিকে বলিল,—জিগ্যেস কর্ তো হরির মা, এ বাড়ীর বাথ্রুমটা কোথায়?

হরির মাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, মনোময়ের মা হন্ হন্ করিয়া সেই ঘরে আসিতেছিলেন, নববধূর কথা শুনিয়া আর পায়ে জুতা দেখিয়া তিনি একহাত ঘোমটা টানিয়া সরিয়া পড়িলেন।

মনোময়ের মা অতি নিরীহ মানুষ। হাঙ্গামায় থাকিতে ভালোবাসেন না। বধূকে একবার দেখিয়াই বুঝিলেন, এখানে শাশুড়ীপণার সুবিধা হইবে না। সুতরাং আগে থাকিতে সরিয়া পড়াই ভালো।

কিন্তু বিভারও দোষ ছিল না। কলিকাতায় এত বড় বাড়ী যাহাদের তাহারা বহু লক্ষ টাকার মালিক। এত বড় বাড়ীতে যে বাথ্রুম নাই, এ কথা সে ভাবিতেও পারে নাই।

মনোময়ের মা পালাইয়া বাঁচিলেন, আসিল ছোট বোন জয়া। এ বাড়ীতে সে-ই একমাত্র মেয়ে যাহার স্বামী বাড়ীতে বসিয়া জোতজমা দেখে না, আপিসে চাকরী করে। এজন্ত বাড়ীর অন্তান্ত মেয়েরা তাহাকে সমীহও করে, হিংসাও করে। সহুরে মেয়ের সঙ্গে কথা কহিতে যদি কেউ পারে তো সে জয়া।

জয়া বলিল,—বাথ্রুম কি হবে বৌদি? অমন চমৎকার খিড়কীর পুকুর রয়েছে, এরা বাথ্রুম করতে যাবে কোন্ দুঃখে?

বিভারাণী তাড়াতাড়ি বলিল,—সেই খিড়কীর পুকুরটাই দেখিয়ে দাও ভাই, গরমে প্রাণ যায়।

বিভার কথা ভারি মিষ্টি, আরও মিষ্টি তাহার হাসি। এক মুহূর্তেই জয়া তাহার ভক্ত হইয়া উঠিল। এমন কি বৌদির জুতা পরার লজ্জা লঘু করিবার জন্ত নিজেও জুতা বাহির করিয়া পায়ে দিয়া বসিল। দিল্লীতে স্বামীর কাছে থাকিতে সে নিজেও জুতা পরে। বাপের বাড়ীতে বাক্সের ভিতর তুলিয়া রাখে।

কিন্তু তাহাতেও লোকের মুখ বন্ধ হইল না। তাহারা বিভাকে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে বেশ রস জমাইয়া তুলিল। জয়া আর কত লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিবে?

রাত্রে মনোময় এই লইয়া একটু অনুযোগ করিয়াছিল।

—ক'টা দিনই বা এখানে আছ বিভা, এ ক'টা দিন জুতো নাই পরলে!

বিভা হাসিয়া বলিল,—পরবোনা-ই ভেবেছিলাম। কিন্তু যা তোমাদের মেঝে! লজ্জা ক'রে নিজের পা'কে কষ্ট দিয়ে লাভ কি, বল?

মনোময় আর কিছু বলে নাই, শুধু একটু হাসিয়াছিল।

—হাসলে যে?

—এমনিই।

কিন্তু বিভা ছাড়িল না। কেন হাসিল সে কথা বলিতেই হইবে।

মনোময় হাসিয়া বলিয়াছিল,—ভাবছি, এ জুতো ছিঁড়লে তারপরে কি পায়ে দেবে?

বিভা স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদার করিয়া বলিয়াছিল,—কেন? তুমি কিনে দিতে পারবে না?

—তাহ'লে এখন থেকেই জলখাবারের পয়সা থেকে জমাতে হয়।

স্বামীর মুখ চাপা দিয়া বিভা বলিয়াছিল,—থাক্ থাক্। এ জোড়া ছিঁড়লে খালি পায়েই বেড়াব। কিন্তু থাকতে কষ্ট করব কেন? জুতো পরা কি খারাপ?

মনোময়ের মনে যাই থাক, মুখে বলিয়াছিল,—না।

ক্ষুধার কষ্ট বিভারাণীর কখনও হয় নাই। এম-এ পাশ করার পর মনোময়কে দুইটা মাসও বসিয়া থাকিতে হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারিয়েটে একটা ভালো চাকরী জুটিয়া যায়।

আরও কিছুদিন পরে একটি ছেলে হইল। সেও এক ব্যাপার।

ছেলের নামকরণ লইয়া বিভাতে ও মনোময়ে তুমুল বিতর্ক বাধিয়া গেল। সেটা ১৯২২ সাল। চাকরী ছাড়িয়া দিবার জন্য মনোময় ভীষণ জেদ ধরিয়া বসিল। অপর পক্ষে বিভা ও রায়বাহাদুর কিছুতে তাহাকে চাকরী ছাড়িতে দিবে না। মনোময় পুরুষ মানুষ, গাছতলায় রাত কাটাইতে পারে। কিন্তু বিভা তো সত্যিই কচি ছেলে লইয়া গাছতলায় আশ্রয় লইতে পারে না। চাকরী ছাড়িলে তাহারা খাইবে কি?

মনোময় বলিল,—যদি আমি এম-এ পাশ না করতাম তাহ'লে খেতাম কি?

বিভা রাগিয়া বলিল,—কচু সেদ্ধ আর ভাত। কিন্তু তাহ'লে তোমার সঙ্গে আমার বিয়েও হ'ত না।

মনোময় আর কথা কহিল না। দিন-রাত্রির অধিকাংশ সময় বাহিরে-বাহিরে কাটাইতে লাগিল। কিন্তু খামখা বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতে তাহার ভালোও লাগে না, পারেও না। অবশেষে একদিন শ্রান্ত হইয়া পড়িল এবং বাড়ী ফিরিয়া জেদ ধরিল ছেলের নাম রাখিবে চিত্তরঞ্জন।

দেশে চিত্তরঞ্জনের তখন অসামান্য প্রভাব। তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার শৌর্য্য, তাঁহার অকৃত্রিম দেশপ্রীতির কাছে আসমুদ্র হিমাচল মাথা নত করিয়াছে। তাঁহার কথা যখনই মনোময় ভাবে, মনে হয় যেন তাহারই আদর্শ, তাহারই সমস্ত জীবনের স্বপ্ন রক্তমাংসের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। শুধু তাহার আদর্শ নয়, সমস্ত বংগের আদর্শ, যে আদর্শের প্রেরণায় বন্ধুবাবু সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মাধুকরী গ্রহণ করিয়াছিলেন বৈষ্ণবের সেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শের তাহার চেয়ে বড় উত্তরাধিকারী আর কে হইতে পারে? বন্ধুবাবুর বংশধরকে দেশবন্ধুর ত্যাগ যেন কেবলই লজ্জা দিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার যে হাত-পা বাঁধা। বিভা কিছুতেই তাহার সঙ্গে রাজপথে নামিবে না। বন্ধুবাবুর উদ্দেশে হাতজোড় করিয়া সে বারম্বার মার্জ্জনা চাহিল। অধম সে, অকৃতি সে, দত্তবংশের মুখ উজ্জ্বল করিবার শক্তি থাকিতেও পঙ্গু। মানুষের জীবনে ইহার চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কি হইতে পারে? বন্ধুবাবুকে সহস্র প্রণাম জানাইয়া মনে মনে বলিল, তাহার নিজের জীবন ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে যাক্, কিন্তু পুত্রের জীবন সে ব্যর্থ হইতে দিবে না, কোনোক্রমেই না। জীবনের কর্ম্ম-পথের সন্ধান মিলিবার পূর্ব্বেই এমন করিয়া বিবাহের বন্ধনে তাহার হাত-পা বাঁধিয়া দিবে না। তাহাকে সে সর্ব্বপ্রযত্নে মানুষ করিবে, সত্যকার মানুষের মতো মানুষ।

সে জেদ ধরিয়া বসিল, ছেলের নাম রাখিবে চিত্তরঞ্জন।

বিভারাণী কথা কহে না বটে, কিন্তু স্বামীর চিন্তাধারার খবর রাখে। নামকরণের পিছনে স্বামীর যে মনোভাব তাহা ভাবিয়া একটু দ্বিধাভরে কহিল,—চিত্তরঞ্জন? বাবা নাম রেখেছেন···

মনোময় ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল,—অথবা বিবেকানন্দ।

বিভা অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেয়ে। ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—বরং চিত্তরঞ্জনই ভালো।

মনোময় সাগ্রহে বলিল,—ভালো নয়? খুব ভালো নাম। আমার তো খুব পছন্দ হয়।

বিভারও পছন্দ হইয়াছে। ছেলের নাম চিত্তরঞ্জনই রাখা হইল। এবং মনোময় আগের মতোই উৎসাহে আফিস করিতে লাগিল।

চিত্তরঞ্জন তাহার চোখের সুমুখে হাত-পা ছুঁড়িয়া খেলা করে, মনোময় গভীর মনোযোগের সঙ্গে চাহিয়া-চাহিয়া দেখে।

কাজের ফাঁকে মাঝে-মাঝে ঘরে আসিয়া বিভারাণী স্বামীর কাণ্ড দেখিয়া হাসে।

—অমন উপুড় হ'য়ে ছেলের মুখে কি খুঁজছ বল তো?

মনোময় অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া বসে। বলে,—খোকার মুখটা কার মতো হয়েছে বল তো? হাঁ-মুখটা ঠিক বাবার মতো, না?

—তবে তো সবই বুঝেছ।

বিভা খোকার বিছানার কাছে সরিয়া আসে। গভীর স্নেহের মৃদু প্রকাশ তাহার ঠোঁটের ফাঁকের হাসিতে ফুটিয়া ওঠে।

বলে,—হাঁ-মুখটা হয়েছে বরং আমার বাবার মতো। আর চিবুকের কাছটা, চোখ আর ভুরু তোমার মতো। চিবুকের কাছটা তো অবিকল তোমার মতো!

—অবিকল আমার মতো? দেখি, দেখি, আয়নাটা?

মনোময় তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া আয়না পাড়িয়া আনিল। আয়নায় একবার নিজের চিবুকটা দেখে আর খোকার চিবুকের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করে। কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারে না। পরিণত বয়সের চিবুকের সঙ্গে কচি শিশুর চিবুকের মিল খুঁজিতে যে-দৃষ্টির প্রয়োজন তাহা মনোময়ের নাই। সে সন্দিগ্ধভাবে নিজের চিবুকের একস্থানে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করে,—এইখানটার কথা বলছ, না?

বিভা তাহার চিবুকটা নাড়িয়া দিয়া বলিতে-বলিতে চলিয়া যায়,—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। ঠিক ওইখানটা! তোমার বুদ্ধি কত?

মনোময় অপ্রস্তুতভাবে হাসে। শত চেষ্টা করিয়াও সে ছেলের মুখের কোনো স্থানের সঙ্গে কাহারও মুখের মিল খুঁজিয়া পায় না। বরং দেখে, শিশুর মুখ দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। দু'মাসের ছেলের মুখের সঙ্গে ছ'মাসের ছেলের মুখের এবং ছ'মাসের ছেলের মুখের সঙ্গে এক বৎসরের ছেলের মুখের আকাশ-পাতাল তফাৎ। সে আর কিছুতে দিশা পায় না।

ছোট ছেলে। বিছানায় শুইয়া-শুইয়া মাথার উপর ঝোলানো কাগজের রঙীণ ফুলটির দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে। সেটিকে ধরিবার জন্ত হাত-পা ছোঁড়ে। মনোময়ের বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না।

বিভাকে ডাকিয়া বলে,—দেখ, দেখ,—মোটে চার মাস তো বয়েস। কেমন ক'রে চাইছে দেখ! যেন এখুনি ও সব জিনিষ জানতে চায়।

বিভার নিজের যদিও এইটি প্রথম ছেলে, কিন্তু অনেক ছেলেই তো ঘাঁটিয়াছে। সে মৃদু মৃদু হাসে। পরিহাস করিয়া বলে,—তোমারই মতন ওর বুদ্ধি হবে।

কিন্তু মনোময়ের তখন পরিহাস বুঝিবার মতো মনের অবস্থা নয়। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে খোকার পানে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলে,—উঁহুঁ, আমার চেয়ে বেশী।

এমনি করিয়া আদরে-আব্দারে চিত্তরঞ্জন বড় হইতে লাগিল।

তাহার নূতন-নূতন দামী-দামী জামা, তাহার প্যারাম্বুলেটার, তাহার ভালো-ভালো খাবার, মনোময় কোথাও আর ত্রুটি রাখিল না। চারি বৎসর এমনি চলিল। এবং এই চারি বৎসরে তাহার উপদ্রবে বাড়ীর লোক বিব্রত হইয়া উঠিল। কিন্তু মনোময়ের ভয়ে তাহাকে একটা কড়া কথা বলিবার সাধ্য কাহারও ছিল না।

কিন্তু চিত্তরঞ্জন পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিতেই একটা বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল,—এবং একদিনে।

নূতন নূতন দামী জামা বাক্সে উঠিল, পরিধানের জন্ত ব্যবস্থা হইল মোটা খদ্দরের হাফ্ প্যাণ্ট ও হাত কাটা সার্ট। প্যারাম্বুলেটারটা এককোণে সরাইয়া রাখা হইল, তাহাতে চড়া নিষেধ। খাবার জন্ত দেশ হইতে আসিল লাল-লাল চিঁড়া এবং আখের গুড়। এবং মনোময় একদিন নাপিত ডাকিয়া তাহার ভ্রমর-কৃষ্ণ, কুঞ্চিত কেশদামের লাঞ্ছনার একশেষ করিল।

জামা-কাপড় প্যারাম্বুলেটার এমন কি লাল চিঁড়া ও আখের গুড়ের জন্তও বিভা ততটা আপত্তি জানাইল না। কিন্তু অমন চমৎকার চুলগুলি ছাঁটিয়া দেওয়ায় তাহার মন ভারী হইয়া উঠিল। তথাপি মুখে কিছুই বলিল না। চাকুরী ছাড়ার খেয়াল এইদিকে মোড় ফিরিয়াছে, এখন বাধা দিতে যাওয়া সঙ্গত হইবে না।

কিন্তু তাহার মন কি কারণে ভারী হইয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার মনোময়ের তখন নিতান্তই সময়াভাব। স্বদেশী আন্দোলন তখন জোর চলিয়াছে। আফিসে যখন-তখন দুই-তিনজন মিলিয়া তাহারই ঘরে জটলা পাকায়। রুগ্ন উত্থানশক্তিহীন দেশবন্ধু ষ্ট্রেচারে করিয়া কাউন্সিলে আসিয়াছিলেন। বাংলার চারিজন নেতা তাঁহার ষ্ট্রেচারের পায়া ধরিয়া তাঁহাকে বহিয়া আনিয়াছিলেন। আফিসের কেরাণীর জীবনে স্বচক্ষে কোনো ঘটনা দেখিবার সুযোগ কমই মেলে। কিন্তু কাণে-শোনা ঘটনা যখন তাহারা আফিস ঘরের অথবা চায়ের দোকানের টেবিল চাপড়াইয়া বিবৃত করে তখন কে বলিবে, এ ঘটনা তাহাদের চোখের সম্মুখে সংঘটিত হয় নাই!

নিজের টেবিলে বসিয়াই মনোময় শোনে,—শোনে নয়, যেন চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতে পায়,—দেশবন্ধুর শীর্ণ মুখের উপর শান্ত, ম্লান ছায়া পড়িয়াছে, দু'টি শিথিল বাহু কোলের কাছে বদ্ধাঞ্জলি, চোখ দু'টি থাকিয়া-থাকিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু তখনই আবার গভীর শ্রান্তিতে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে···

মনোময় স্পষ্ট দেখিতে পায়। আফিসের বন্ধুরা কখন্ গল্প শেষ করিয়া চলিয়া যায় সে জানিতেও পারে না। কিন্তু তাহার কলম আর চলে না। মাথা সম্মুখের স্তূপীকৃত কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়ে, যেন ঘাড়ের বাঁধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। শূন্য দৃষ্টির ফাঁক দিয়া মন তাহার বাঁধনহারা মেঘের মতো কোথায় উড়িয়া চলিয়াছে কে জানে!

বাড়ী ফিরিয়া এক কাপ চা ও কিছু খাবার খাইয়াই সে চিত্তরঞ্জনকে মুখে-মুখে শিখাইতে বসে, এই পৃথিবীর আকার কিরূপ, কেমন করিয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে, দিন ও রাত্রির সৃষ্টিরহস্য কি। সে কতক-গুলি মাটির মডেল কিনিয়াছে। পাহাড়ের মাথায় জল ঢালিয়া বুঝাইয়া দেয় নদীর গতি-পথের কথা। মাটির গোলকের উপর পিপীলিকা বসাইয়া গোলকটিকে প্রাণপণে ঘুরায়। বুঝাইয়া দেয়, কেন এই ভূমণ্ডল সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতে থাকিলেও আমরা পড়িয়া যাই না। এমনি আরও কত কথাই সে খেলাচ্ছলে বালককে বুঝাইয়া দেয়।

সকাল এবং সন্ধ্যা চিত্তরঞ্জনের বই পড়ার সময়,—সকালে এক ঘণ্টা এবং সন্ধ্যায় এক ঘণ্টা। ছোট ছেলের বেশী পড়া ঠিক নয়।

বিভারাণী সমস্ত ব্যাপারটিকে মনে-মনে পরিহাস করিয়া উড়াইয়া দিত। স্বামীকে দিনরাত্রি ছেলে লইয়া এমনি মাতিয়া থাকিতে দেখিয়া মাঝে-মাঝে তাহার মস্তিষ্কের স্থিরতা সম্বন্ধেও আশঙ্কা করিত। কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতে ছেলের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং তাহার পড়ার উন্নতি দেখিয়া সে পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন যে সাধারণ বালক নয়, তাহার মেধা যে সাধারণ বালকের চেয়ে অনেক প্রখর, এ বিষয়ে তাহারও আর সংশয় রহিল না। এবং শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর সঙ্গে সেও একমত হইল যে, ভবিষ্যতে এই চিত্তরঞ্জনও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতো দেশের, দশের এবং বিশেষ করিয়া দত্ত বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।

আট-নয় বৎসর বয়সের সময় চিত্তরঞ্জন যখন বাপের কাছে শোনা অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প বলিতে লাগিল তখন বিভা শুধু বিস্ময়ে নয় শ্রদ্ধায়ও অভিভূত হইয়া উঠিল। লেখাপড়া সে-ও কিছু করিয়াছে। কিন্তু এ সকল সে কোনোদিন শোনে নাই।

এক-এক দিন এক-এক রকমের কথা।—

—জানো মা, এই পৃথিবী একদিনে তৈরী হয় নি। একদিন ছিল যেদিন কিছু ছিল না,—সূয্যি না, চাঁদ না, পৃথিবী না, কিচ্ছু না,—এমন কি হাওয়া পর্য্যন্ত ছিল না। শুধু ছিল ছোট্ট ছোট্ট নেব্যুলা···

আশ্চর্য্য! আট-নয় বৎসরের ছেলে পিতার গল্প বলিবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত অবিকল আয়ত্ত করিয়াছে!

বিভা বিস্মিতদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে,—সত্যি?

গর্ব্বিত পুলকে মনোময় ঘাড় নাড়িয়া বলে,—হুঁ।

বাপের সমর্থনে চিত্তরঞ্জন আরও উৎসাহিত হইয়া মাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল,—আচ্ছা, তুমি প্রমাণ কর তো দেখি, পৃথিবীটা গোলাকার।

বিভা হাসিয়া বলিল,—গোল-ফোল জানি না বাপু, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি চ্যাপ্‌টা।

চিত্তরঞ্জন মায়ের অজ্ঞতায় হাসিয়া আকুল হইল। কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত সমস্তটা দুলাইয়া বলিল,—চ্যাপ্‌টা মোটেই নয় মা, রীতিমত গোল। চ্যাপ্‌টা! হিঃ হিঃ!

একটু থামিয়া নিজের ভুল সংশোধন করিয়া বলিল,—কেবল উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। না বাবা?

চিত্তরঞ্জন বাহিরে গেলে বিভা বলিল,—ও দেখবে তোমার চেয়েও অল্প বয়সে এম-এ পাশ করবে।

মনোময় হাসিয়া বলিল,—এম-এ নয় গো,—এম-এ তো আজ-কাল সবাই পাশ করছে। ওকে তারও চেয়ে বড় হতে হবে,—ওরই নামের আর একজনের মতো কিম্বা তারও চেয়ে বড়।

ইহারই মাসখানেক পরে মনোময় একদিন এক-খানা চিঠি লইয়া হাসিতে হাসিতে উপরে আসিল।

—ওগো, রুণুর বিয়ের যে সব ঠিক হ'য়ে গেল। এতদিনে একটা দুর্ভাবনা ঘুচ্‌ল।

রুণুর বিবাহ লইয়া মনোময় যে এতদিন দুর্ভাবনায় দিন কাটাইতে ছিল এ সংবাদ বিভা পায় নাই।

সে হাসিতে-হাসিতে বলিল,—কই, চিঠি দেখি?

তাহার হাতে চিঠিখানি দিয়া মনোময় চিত্তরঞ্জনকে লইয়া পড়িল,—ওরে তোর দিদির যে বিয়ে!

চিত্তরঞ্জন খেলা করিতেছিল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কবে? কবে?

—আষাঢ় মাসে। তোরা সবাই যাবি যে।

চিঠি পড়িতে পড়িতে বিভার মুখ কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। চিঠিখানা স্বামীর গায়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বিয়ে তো হবে। কিন্তু টাকার কি ক'রে যোগাড় হবে শুনি?

চিত্তরঞ্জনের গালে কি করিয়া কালি লাগিয়া গিয়াছিল। রুমাল দিয়া গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে তাহা মুছিতে-মুছিতে মনোময় উদাসীনভাবে বলিল,—সে হ'য়ে যাবে অখন।

বিভা ঝঙ্কার দিয়া বলিল,—হ'য়ে তো যাবে। কিন্তু কি ক'রে? তোমার কি ব্যাঙ্কে হাজার টাকা জমা আছে?

মনোময় মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল,—ব্যাঙ্কে আর কি ক'রে থাকবে? প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে তুলতে হবে আর কি।

বিভা আর দাঁড়াইল না। গট্ গট্ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সমস্ত দিন সে ভালো-মন্দ কোনো কথা কহিল না। তাহার থমথমে ভাব দেখিয়া মনোময়ও সাহস করিয়া কাছে ঘেঁসিতে পারিল না। সে-ও আড়ালে-আড়ালে ফিরিতে লাগিল।

সমস্ত দিন এমনি থমথমে ভাব চলিল। বর্ষণ আরম্ভ হইল রাত্রে,—বর্ষণ এবং ঝড়। বিভারাণী একেবারে বেঁকিয়া দাঁড়াইল।

বলিল,—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে আমি কিছুতে হাত দিতে দোব না।

মনোময় বিস্মিতভাবে বলিল,—তাহ'লে আমি টাকা পাব কোত্থেকে? বা রে!

বিভা কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিল। বলিল,—সে আমি জানি না। কিন্তু কাল যদি তোমার ভালো-মন্দ কিছু হয়, তাহ'লে আমি দাঁড়াব কোথায় বল তো?

মনোময় যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল,— তার মানে? তবে দাদারা রয়েছেন কি করতে?

বিভা এক ধমক দিল। কহিল,— দেখ, ন্যাকামি কোরো না। সবারই দাদা সব করলে, এখন তোমার দাদাই বাকী র'য়েছেন। আজ টাকার দরকার পড়েছে তাই ভাঁয়ের খোঁজ নেওয়া হয়েছে, নইলে কোন্ খোঁজটা তোমার নেন, শুনি? এই যে এবারে এত আম হ'য়েছে, কাক-পক্ষীতে নষ্ট ক'রে ফেলে দিচ্ছে, তোমাদের জন্ম ক'টা আম এসেছে হিসেব দাও তো?

— ক'লকাতায় কি আম কম আছে না কি?

— তাই ব'লে বাগানের আম পাঠাবে না? আমাদের জন্যে না হয় নাই পাঠালেন। কিন্তু ছেলেটার জন্যেই বা ক'টা পাঠালেন?

এইবার মনোময় বিরক্ত হইয়া উঠিল। বলিল,— সেখানেও কি ছেলেপুলে নেই নাকি?

অকস্মাৎ ও-পাশের বিছানা হইতে শিশুকণ্ঠের ঝঙ্কার উঠিল,— আর আমি বুঝি আম খেতে জানি নে?

আজ চিত্তরঞ্জন যে এখনও জাগিয়া আছে তাহা কেহই জানিত না। সাধারণতঃ বেশী রাত্রি সে জাগে না, সকাল সকাল ঘুমাইয়া পড়ে। আজও যথাসময়েই নিদ্রা গিয়াছিল। কিন্তু ইহাদের দু'জনের চীৎকারে সে ঘুম ভাঙিয়া যায়।

বিভা বলিল,— ওই শোনো।

এই ব্যাপারে ছেলেমানুষকে কথা কহিতে দেখিয়া মনোময় প্রথমটা ক্রোধে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়াছিল। কিন্তু বিভার কথায় হাসিয়া ফেলিল।

কহিল,— কেন? তোর দুঃখুটা কি? তুই কি আম খেতে পাচ্ছিস না?

চিত্তরঞ্জন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,— তাই বলে নিজের বাগানের আম,— বা রে!

নিজের বাগানের আমের জন্ম যে চিত্তরঞ্জনের মনে এত ক্ষোভ জমা হইয়াছিল, এ সংবাদ কোনো দিন সে ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই। আমের তাহার অভাব নাই, সুতরাং লোভও থাকিবার কথা নয়: মনোময় স্বচক্ষে দেখিয়াছে হাতের আম চিত্তরঞ্জন অকাতরে ভিখারীকে দিয়া দেয়। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে শুধু বিভার পানে চাহিয়া রহিল।

সে চাহনির মধ্যে একটা দাহ ছিল। বিভা কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

জোর করিয়া হাসিয়া বলিল,— তা কি করবে? ও আমার মতন হয়েছে। উচিত কথা পষ্টাপষ্টি ব'লে দেয়।

মনোময় মনে-মনে ভাবিল,— তাই হবে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মনোময়কে হার মানিতে হইল।

দাদার নিকট বহু প্রকার বিনয় করিয়া এবং বহুবার দুঃখপ্রকাশ করিয়া মনোময়কে লিখিয়া দিতে হইল যে, হাজার টাকা দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত। সেই সঙ্গে উপসংহারে পুনশ্চ করিয়া ইহাও লিখিয়া দিল যে, অমন পাত্র পাওয়াও দুষ্কর। সুতরাং যে-কোনো উপায়েই হউক ওইখানেই বিবাহ দিতে হইবে।

উত্তর আসিতে দেরী হইল না। সকালে মনোময় চিত্তরঞ্জনকে মহারাজ অশোকের জীবনী শোনাইতেছিল। সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট কি ভাবে জীবন যাপন করিতেন, ধর্ম্মের জন্ম এবং প্রজাসাধারণের জন্ম কত বড় আত্মত্যাগ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাই শুনিতে শুনিতে চিত্তরঞ্জন তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় বিভারাণী আসিয়া একখানি খামের চিঠি স্বামীর কোলের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

খাম খানি খোলা। বিভা নিশ্চয়ই পড়িয়াছে। মহারাজ অশোকের জীবন-কথা শেষ হইতে পাইল না। মনোময় জিজ্ঞাসা করিল,— কার চিঠি?

— তোমার দাদার।

— কি লিখেছেন?

বিভা ফিরিয়া আসিল। বলিল,—পড়েই দেখ না।

মস্ত বড় চিঠি। পড়িতে অনেক সময় লাগিল। পড়া শেষ করিয়া উদ্বিগ্নমুখে মনোময় বলিল,—তাহ'লে ?

বিভা বিরক্তভাবে বলিল,—তা আমি কি জানি ? তোমাদের সম্পত্তি তোমরা বাঁধা দিলে আমি ঠেকাতে পারি ?

মনোময় চিন্তিতভাবে বলিল,—সেই জন্যেই তো আমি হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলাম।

সম্পত্তি বাঁধা দেওয়াতেও বিভার আপত্তি ছিল। কিন্তু মনোময়কে লইয়া ততখানি টানাটানি করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। মনোময় শান্ত লোক, সহজে উত্তপ্ত হয় না। কিন্তু একবার উত্তপ্ত হইলেও আর রক্ষা রাখে না। সে সে ক্রমেই ভিতরে-ভিতরে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে তাহা বিভার বুঝিতে বাকী ছিল না।

এবারে সে শান্ত ভাবেই বলিল,—তাতে কি সুবিধে হ'ত ?

—আম-বাগানটা যেত না। একবার বাঁধা পড়লে আর কি দাদা ছাড়াতে পারবেন ?

মনোময় আবার অশোকের গল্প করিতে লাগিল — তার পরে আপনার রাজভাণ্ডারের যা-কিছু ছিল,—ধন, রত্ন, বস্ত্র, অলঙ্কার—সব প্রজাদের বিলিয়ে দিয়ে শুধু একখানি কাষায় বস্ত্র প'রে মহারাজ অশোক নেমে এলেন ;—হাতে নিলেন শুধু একটি মাত্র আমলকী। রাজ-রাজেশ্বরের ভিখারী-মূর্তি দেখে প্রজারা সবাই এক সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠল,—জয় মহারাজ প্রিয়দর্শীর জয় !

বিভা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল,—সবারই যদি সে ক্ষতি সয়, তোমার সইবে না ? বাগান তো তোমার একার নয় ? আর ও বাগান থেকেও তো আমাদের ভারি লাভ হচ্ছে ?

চিত্তরঞ্জন অকস্মাৎ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দুই হাতে তালি দিয়া বলিল,—ঠিক হবে তাহ'লে ! যেমন আমাদের না দিয়ে নিজেরা-নিজেরা খায়, তেমনি উপযুক্ত শাস্তি হবে !

প্রথমটা মনোময় ব্যথিত বিস্ময়ে পুত্রের পানে চাহিয়া রহিল। তারপরে সমস্ত ব্যাপারটিকে বালসুলভ চপলতা মনে করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

কহিল,—তারপরে তোরা যখন যাবি, তখন কি খাবি ?

হাতের তালু উল্টাইয়া বালক বলিল,—আমি আর যাবই না। আমি এইখানেই বাড়ী ক'রব, গাড়ী ক'রব, চাকরী ক'রব, ব্যস ! কি দুঃখে দেশে যাব ?

প্রথম আঘাতের ধাক্কাটা সামলাইয়া লইয়া মনোময় ভাবিল, তাই তো ! চিত্তরঞ্জন কি দুঃখে দেশে যাইবে ! সমস্ত দেশ ও জাতিকে যে সত্য পথের সন্ধান দিবে, সে কি ছোট একটু পরিধির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পারে ? ভাবিল বটে, কিন্তু মহারাজ প্রিয়দর্শীর গল্প সেদিন আর জমিল না।

পসারী

শ্রীমমতা মিত্র

সব বেচা কেনা শেষ ক'রে দিয়ে এখন চলেছি ঘরে,
হেনকালে মোরে কে তুমি জননি ডাকিলে মধুর স্বরে ?
হাতে যা রয়েছে মিঠাই এগুলি সামান্য গুটি কয়,
তোর ঘরে মাগো দিয়ে যেতে পারি এমন কিছুই নয়।
দূর গাঁয়ে মোর ঘরেতে রয়েছে পাঁচটি নাতিনী নাতি,
আমি গেলে সবে 'কি এনেছ' বলি ছুটে আসে হাত পাতি।
তাহাদের লাগি যাহা হোক্ কিছু হাটবারে হয় নিতে,
চাহে নাক' মন হাসি মুখগুলি মলিন করিয়া দিতে।

জাগি আমি যবে আকাশেতে মাগো পড়ে না আলোর রেখা,
সুপ্ত জগৎ, গগনের কোলে শশী তারা যায় দেখা।
বনের বুকের আঁচলখানিতে তখনো আঁধার ছায়া,
আম কাঁঠালের গাছের নয়নে জড়ানো ঘুমের মায়া।
গরীব আমি যে, নিদ্রার ঘোর নাহি ঘেরে মোর আঁখি,
প্রভাতে আমারে জাগাবার তরে গাহে নাক' গান পাখী।
চেয়ে একবার পরাণ সমান স্বপন মাখানো গাঁয়ে
বোঝাটি মাথায় হাটপথ পানে চলে আসি পায়ে পায়ে।

আঁকা বাঁকা পথ জঙ্গল কত পার হ'য়ে যবে আসি
ধরণী তখন উজ্জল হয় লভিয়া রবির হাসি।
দশ বারো কোশ পথ বাহি তবে পহুঁছাই এসে হাটে,
সেখানে আমার বেচা কেনা ক'রে সারাটি দিবস কাটে।
কপাল মন্দ থাকে গো যেদিন হ'য়ে যায় লোকসান,
দেবতা যখন হ'ন প্রসন্ন ফিরি ঘরে লাভবান।
খর রোদ সহি, সহি জলধারা বরষায় মাঠে বাটে,
দুখ ক্লেশ নাহি, এমনি করিয়া সহজে দিবস কাটে।

ক্ষেতে কাজ করি বাকি দিনগুলি, হাটবারে হাটে আসি,
এইভাবে মোর কেটে যায় দিন, এই আমি ভালবাসি।
কাহারো দয়ার নহি প্রত্যাশী, তোষামোদ নাহি করি,
সহজ সরল পথ বাহি মোর চলেছে জীবন-তরী।
ক্ষেতের কাজেতে সহায় আমার রূপসী প্রেয়সী মম,
সকল কর্ম্মে রহে সে পার্শ্বে পরম বন্ধু সম।
হাড় ভাঙ্গা শ্রম করিয়া গোঙানু দীর্ঘ জীবন আমি,
শেষ হ'য়ে এল এপারের পালা, সন্ধ্যা এসেছে নামি।

শীতে বরষায় রৌদ্রের দিনে কাজ লয়ে আমি থাকি,
তাহারি মাঝেতে মোর কুটীরের সোনার ছবিটি আঁকি।
এই যে এখন চলিয়াছি পথে, কল্পনা চলে সাথে,
নাতিদের তরে গৃহিণী হয়ত কাঁথার শয্যা পাতে।
আঁধার গাঁয়েতে কুটীরে আমার এক কোণে দীপ জ্বলে,
বধূ গান গায় ছোট ছেলেটিরে ঘুম পাড়াবার ছলে।
বড় বড় তরু দুধারে দাঁড়ায়ে রয়েছে তুলিয়া মাথা,
আমি গেলে তারা চিনিয়া আমারে সাদরে নাড়িবে পাতা।

অনেক কথাই হ'য়ে গেল বলা, জননি, বিদায় তবে,
আঁধার এখন ছেয়েছে অবনী, বহু পথ যেতে হ'বে।
আগের মতন নাহি বল দেহে, যৌবন গেছে চলে,
অতি দ্রুত আর পারি না চলিতে বেশী পথ যেতে হ'লে।
চির পরিচিত চির আদরের গাছে ঘেরা গ্রামখানি
চোখে পড়িলেই কি সে মন্তরে পরাণ লয় যে টানি।
দিনের ক্লান্তি ঘুচিবে সকলি যাইলে আপন ঘরে,
জুড়াইবে তনু স্নিগ্ধ নিদ্রা নামিয়া নয়ন পরে।

মন্তেসরি প্রণালী অনুযায়ী শিক্ষাদান

শ্রীযুক্তা মায়া সোম

অধুনা ইউরোপ ও আমেরিকা শিশু-শিক্ষায় অগ্রণী। শিক্ষাকে শিশুর স্বাভাবিক রুচি ও প্রকৃতির অনুযায়ী করিয়া তুলিতে আজ তাঁহারা ব্যস্ত। নিজেদের ইচ্ছা, নিজেদের কর্তৃত্ব, নিজেদের শাসন শিশুর উপর চালাইয়া, আজ তাঁহারা উহার স্বাধীন প্রকৃতির অবাধ উন্নতির পথে অস্বাভাবিক বাধা উপস্থিত করিতে প্রস্তুত নহেন। দেড় শতাধিক বৎসর ধরিয়া শিশুর মন লইয়া এই সংগ্রাম চলিতেছে। খ্যাতনামা শিক্ষা-সংস্কারকদিগের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে অবশেষে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশু তাহার ন্যায্য দাবীর পূর্ণ অংশ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীতে শিশু-শিক্ষার জন্য যে সকল প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে মন্তেসরি প্রণালী অন্যতম। এই প্রণালী বর্ণনার পূর্ব্বে শিশুর স্বভাব ও মনস্তত্ত্ব কিছু জানা আবশ্যক।

শৈশব অভ্যাস গঠনের উপযুক্ত সময়। কেন না এই বয়সে শিশুরা যাহা শিক্ষা করে তাহার ফল কিয়ৎ পরিমাণে স্থায়ী হয়, এইজন্য শৈশবে উত্তম শিক্ষার ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার। শিশুদের সাত আট বৎসর পর্য্যন্ত বিচার বুদ্ধির পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায় না, কোন বিষয়ের কার্য্য-কারণ নির্ণয়ে তাহারা অক্ষম। এইজন্য এই বয়স পর্য্যন্ত তাহারা যাহাতে নিজেদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের চালনা করিয়া বহির্জগতের সকল প্রকার জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিশুরা যাহাতে নিজেরা দেখিয়া শুনিয়া ও স্পর্শ করিয়া বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহার আয়োজন করা আবশ্যক।

শিশুদিগের ক্রীড়ার প্রতি অনুরাগ মাতৃক্রোড় হইতেই দেখা যায়। এই খেলাধুলার মধ্য দিয়াই উহারা গৃহে শিক্ষালাভ করিতে থাকে। অনেক পিতামাতা শিশুদিগের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করেন না, সুতরাং গৃহে তাহাদিগের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন না। এই অভাব দূর করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকাতে শিশুদিগের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। মন্তেসরি প্রণালী মতে শিশুদিগের খেলা-ধূলার মধ্য দিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। আজ আপনাদের মন্তেসরি প্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

কুমারী মারিয়া মন্তেসরি তাঁহার প্রণালী মতে প্রথমে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন রোমের এক সামান্য পল্লীর আদর্শ গৃহে। তিনি রোম নগরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ও পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। কুমারী মারিয়া মন্তেসরি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইতালী দেশ শিক্ষা-সম্বন্ধে কুসংস্কারে পূর্ণ ছিল। মেয়েদের শিক্ষার খুবই অভাব ছিল, অধিকন্তু শিক্ষিতা রমণীদের কেহ ভাল চক্ষে দেখিত না, সুতরাং লেখাপড়া শিখিতে তাহাদের যথেষ্ট বেগ পাইতে হইত। তখনকার দিনে লেখা পড়ার তেমন চর্চ্চা না থাকিলেও কুমারী মন্তেসরি লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেশের প্রচলিত লোকমত, সমাজের কুসংস্কার ইত্যাদি সব উপেক্ষা করিয়া ডাক্তারী পরীক্ষা দিবার ইচ্ছায় তিনি রোম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। ইতিপূর্ব্বে স্থানীয় কোন মহিলা ডাক্তারী পরীক্ষা দেন নাই। এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি Psychiatric Clinic অর্থাৎ কালা, বোবা, পাগল ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠানের সহকারী ডাক্তারের কাজ লইলেন। যে-শিশুদের মনোবৃত্তি সাধারণ সুস্থ শিশু অপেক্ষা কম, গৃহে এবং হাঁসপাতালে তাহাদের চিকিৎসায় তিনি বিশেষ ভাবে মন দিলেন। সময় অসময়ে তাঁহাকে রোগীর পার্শ্বে থাকিতে দেখা যাইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তিনি রোগীকে ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন ততক্ষণ তিনি শান্তি পাইতেন না। কখনও কখনও রোগীর পার্শ্বে

বসিয়া তাঁহাকে সারারাত কাটাইতে হইয়াছে, তাহাতেও কখন বিরক্তি বা ক্লান্তি বোধ করেন নাই।

ডাঃ মন্তেসরি শিশুরোগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করায় হাঁসপাতালের শিশুদের দেখিবার শুনিবার ভার তাঁহার হাতে দেওয়া হইল। হাঁসপাতালের অধিকাংশ শিশু অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল। তাহারা কিরূপে মানুষ হইবে, কি উপায়ে তাহাদের জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ হইবে, এই বিষয়ই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তিনি চিকিৎসা কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া State Orthophernic School অর্থাৎ শিশু অনাথালয়ের ডিরেক্টার পদে নিযুক্ত হইলেন। এই স্থানে তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক বালক-বালিকাদের উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ ঘটিল। কায়মনে তিনি সমস্তদিন তাহাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি দিবাভাগে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির শিশুকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, ও রাত্রিকালে সমস্তদিনের অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল পৃথক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করিতেন।

ডাঃ মন্তেসরির বহুদিনের সাধনার ফলে এই বিষয়ের কৃতনিশ্চয়তা সম্বন্ধে তিনি হঠাৎ একদিন আশান্বিত হইলেন। একটি দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ছেলে তাহার নিকট শিক্ষা করিয়া সাধারণ ছেলেদের সহিত পরীক্ষা দিয়া ভাল নম্বর পাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তখন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা মনোযোগ ও উৎসাহ-পূর্ব্বক ঐরূপ বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ফলে দেখা গেল, যে সমস্ত ছেলেরা তাঁহার পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহারাই পরীক্ষায় অধিকতর নম্বর পায়। তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন মনে করিয়া তাঁহার পদ্ধতিকে সাধারণের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে স্থির করিলেন। তখন তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনের ছাত্রী হিসাবে ভর্ত্তি হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশু-মনস্তত্ত্বের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিলেন। শিশুর মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে যতগুলি পুস্তক ছিল সবগুলি পাঠ ও গবেষণা করিতে ও নানাপ্রকারের প্রাইমারী স্কুল পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এই নূতন শিক্ষা-প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন।

তিন চারি বৎসরের সাধারণ শিশুদের এই প্রণালী অবলম্বনে সহজেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইন্দ্রিয় পরিচালনার সাহায্যে প্রাথমিক শিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাতে এই বয়সের শিশুরা লেখাপড়া শিখিতে যথেষ্ট আমোদ পাইয়া থাকে। কারণ কয় বৎসর গবেষণার পর তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মানব জীবনের তিন হইতে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত মন অতিশয় নমনশীল, অর্থাৎ যাহা দেখে শুনে সব কিছুরই ছায়া তাহার মনে পড়িয়া যায়। এই তিন বৎসরের মধ্যে মানবের ভবিষ্যৎ স্বভাবের আভাস পাওয়া যায়। কাজেই জাতির, সমাজের, রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য এই বয়সের শিশুদের মানুষ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

ডাঃ মন্তেসরির মতে শিক্ষার সময়ে শিশুকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, এই স্বাধীনতার ভিতর দিয়াই সে তাহার দৈনন্দিন জীবন সুশৃঙ্খলিত করিয়া তুলিবে। শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা শিশুর মধ্যেই আছে, এই সুপ্ত বীজশক্তিকে পরিস্ফুট করাই শিক্ষার কাজ। এইজন্য তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা, স্ফূর্ত্তিজনক পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগের অবাধ গতি দিতে হইবে।

সকলেই জানেন যে, যখন ৫।৬টি শিশু একসঙ্গে মিলিত হয়, তথায় প্রত্যেক শিশুর মাতা বর্ত্তমান থাকিলেও শিশুরা ঝগড়া-ঝাঁটি বা মারামারি না করিয়া কোন কাজই করিতে পারে না। মন্তেসরি বিদ্যালয়ের এক একটি শ্রেণীতে ৩ হইতে ৭ বৎসর বয়সের ৫০।৬০ জন শিশু থাকে, তাহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তথাপি তাহারা কলহ বা মারামারি না করিয়া প্রত্যেকে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। কেহ বা অঙ্ক কষে, কেহ বা লিখে, কেহ বা ঘর পরিষ্কার করে, কেহ বা চুপ

করিয়া বসিয়া থাকে, আবার কেহ বা অপরের কার্য্য লক্ষ্য করে। শিক্ষয়িত্রী তাহাদের কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করেন না, এবং কোন শিশুকে অপরের কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে সুযোগ দেন না। শিক্ষয়িত্রী প্রত্যেক শিশুর ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করেন, যদি কোন শিশু তাঁহার সাহায্য চায়, তাহাকে সাহায্য করা হয়, তাহার ভুল সংশোধনপূর্ব্বক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলা হয়। শ্রেণীতে শিক্ষয়িত্রীর যে প্রাধান্য আছে, তাহা শিশুদের বোধ করিতে দেওয়া হয় না। শিক্ষয়িত্রী সামান্যই শিক্ষা দিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি বেশী পর্য্যবেক্ষণ করেন। শিশুরা বিদ্যালয়ে নিজের নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করিয়া শিক্ষা সুরু করে; শিক্ষয়িত্রী তাহাদিগকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করেন। তাহাদের স্বইচ্ছা, কার্য্যকুশলতা ও স্বাধীনতার মধ্য দিয়া শাসনাধীনে আনা হয়। ডাঃ মন্তেসরির উদ্ভাবিত যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক খেলনার (apparatus) সাহায্যে এই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

শিশুরা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত নানা বিষয়ে শিক্ষা-লাভ করিতে সমর্থ হয়। খেলনার ব্যবহার পুনঃ পুনঃ দেখিবার আবশ্যক হয় না। ঐ খেলনাগুলিতে শিশুদের স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যায় এবং ইহাতে শিশুর উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে কাজের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কারণ শিশুর অনুরাগ উৎপাদন করিতে পারে এইরূপ কাজের ব্যবস্থা থাকিলে তবেই শাসন সহজ হয়। সে নিজের ইচ্ছামত খেলনাগুলি পছন্দ করিয়া লয়। ইহাতে কেহ বা দ্রুত আবার কেহ বা ধীরে শিক্ষা করিতে সমর্থ হয়। শিক্ষা তাহাদের নিকট ভারস্বরূপ বা ভয়াবহ হয় না। শিশু ইহার ব্যবহার ভুল করিলেও পরে সে নিজেই তাহার ভুল বুঝিতে সমর্থ হয়। শিশু ক্লান্ত হইলে বিশ্রাম করিতে পারে, আবশ্যক বোধ করিলে ঘুমাইতেও পারে, শিক্ষয়িত্রী তাহাকে কিছুই বলেন না। কিন্তু খেলনাগুলির এমনই মোহিনীশক্তি যে, পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলেও শিশুরা অধৈর্য্য হইয়া পড়ে না বরং আমোদই অনুভব করে। শিশু তাহার দৈনিক জীবনের অনেক কার্য্য এইভাবে সম্পন্ন করিয়া আত্মনির্ভরশীল হয়।

প্রত্যেক মাতাই জানেন শিশুরা রান্নাঘরে বসিয়া তাঁহার কার্য্য নিরীক্ষণ এবং সুযোগ পাইলে তাঁহাকে সাহায্য করিতে ভালবাসে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত কক্ষে নীরবে স্থির হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা তাহারা মাতার সহিত রান্নাঘরে থাকা বেশী পছন্দ করে। শিশুদের যদি নিজে স্নান-আহার করিতে দেওয়া হয় বা অন্য কোন রকম ফরমাস করিয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় তবে তাহারা যথার্থই কৃতার্থ হয়।

সেইজন্য ডাঃ মন্তেসরি দৈনন্দিন সাংসারিক কার্য্য, যথা বিভিন্ন বস্তু স্পর্শ ও উত্তোলন, বস্ত্র পরিধান, জামার বোতাম ও জুতার লেস লাগান, পরিবেশন ও তৎপরে বাসন-পত্র ধুইয়া মুছিয়া যথাস্থানে স্থাপন, বৃক্ষ, জীব-জন্তুর যত্ন ও লালন-পালন ইত্যাদি পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কিরূপে এগুলি করিতে হয় শিক্ষয়িত্রী নিজে দেখাইলে শিশুরা উহা অনুকরণ করে। এইরূপে তাহারা দৈনন্দিন কাজে অভ্যস্ত হয় ও সামাজিক রীতি, নীতি, শিষ্টাচার ইত্যাদি শিখে। গৃহ-কার্য্যের ভিতর দিয়া এইগুলি শিক্ষা করিতে শিশুরা আমোদ পায়, অনুরাগ দেখায় এবং সম্পন্ন করিতে সতর্কতা অবলম্বন করে। শিশু বিরক্তিভাব প্রকাশ না করিয়া আশ্চর্য্যভাবে আত্মসংযমের পরিচয় দেয়। একসময়ে একটি শিশু পরিবেশনের জন্য গরম সুপ (ঝোল) লইয়া যাইতেছিল, সেই সময় একটি মাছি তাহার নাকের উপর বসে, যতক্ষণ না পরিবেশন শেষ হইল, ততক্ষণ সে মাছির উপদ্রব সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই প্রকারে তাহাদের সাধ্যাতীত দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়।

এইগুলি যাহাতে সুশৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হয়, সেইজন্য তিনি বলেন যে, শিশুদের ব্যবহারোপযোগী আসবাব এমন হওয়া দরকার যাহা তিন বছরের শিশু অনায়াসে ও অক্লেশে নাড়াচাড়া করিতে পারে। আসবাব ও খেলনাগুলি নূতন চকচকে ও সুন্দর

হওয়া উচিত। তাহা হইলে শৈশব হইতে সৌন্দর্য্যজ্ঞান শিক্ষা হয়। খেলনাগুলি পরিপাটিরূপে গুছাইয়া, সাজাইয়া রাখিবার ভার শিশুদের হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে। এইরূপে শিশুরা তাহাদের খেলার ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে সদা প্রস্তুত থাকে। যে শিশু যে স্থান হইতে যে খেলনা লইবে, সেই স্থানেই উহা রাখিবে। যে খেলনা যে উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইবে। তাহাকে যথেচ্ছভাবে এগুলি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না, কিন্তু সযত্নে ব্যবহার করিতে শিখান হইবে। যদি কোন মেয়ে একটি খেলনা লইয়া খেলিতে চায়, যে পর্য্যন্ত না প্রথম মেয়েটির খেলা শেষ হয় সেই পর্য্যন্ত সে নীরবে অপেক্ষা করিবে। কখনও কখনও শিশুরা তাহার নিকট হইতে খেলনা ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে শিখে কখনও বা সে তাহাকে ঠিক ব্যবহার করিতে শিখায়। এইরূপে শিশুরা ক্রমে ক্রমে দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে শিখে।

মন্তেসরি বিদ্যালয়ে এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়মূলক খেলনা (apparatus), যথা—সিলিণ্ডার, কিউব বিভিন্ন বর্ণের রেশমের চাকতি, ওজনশিক্ষা, জ্যামিতিক-আকৃতি-বিশিষ্ট কাষ্ঠ ইত্যাদির দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সময়ে শিশুদের ইন্দ্রিয়গুলি তীক্ষ্ণ ও অনুভবপ্রবণ থাকে, উক্ত খেলনার সাহায্যে শিক্ষা করিলে জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির সম্যক পরিচালনা হয় ও শিশুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এই খেলনাগুলির উদ্দেশ্য নয় যে, শুধু আকৃতি, গঠন, গুণ ও নামের সহিত পরিচিত করান, খেলনাগুলি পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে শিশুদের মনোযোগ, যুক্তি এবং বিচারশক্তির উৎকর্ষ সাধন হয়। মন্তেসরি শিক্ষায় শিশুরা কাজটি কিরূপে সম্পন্ন করিবে তাহা খেলনার সাহায্যে শিশুদিগের দ্বারাই সাধিত হয়, সুতরাং শিশুদিগের আগ্রহ অনায়াসেই উহা দ্বারা উদ্দীপিত হয়। শিশুদিগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা শিক্ষার উপযোগী হইলে তাহাদিগের যে বিষয়ে বিতৃষ্ণা দেখা যায়, ক্রমশঃ সে বিষয়ে অনুরাগ আসে। শৈশব হইতে এইরূপ অভ্যাস করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে সে তাহার অনুরাগ বা বিরাগের বিষয়গুলির প্রতি নিজ হইতেই মনোনিবেশ করিতে পারিবে।

আর একটি কথা—মন্তেসরি বিদ্যালয়ে শিশুদের মৌনাবলম্বন শিখান হয়। নীরবে এবং নিস্তব্ধভাবে তাহাদের দৈনিক কার্য্য আরম্ভ হয়; ক্রমে ক্রমে তাহারা সকল কাজ ধীরে করিতে ও আস্তে কথা বলিতে অভ্যস্ত হয়। তখন তাহারা আর গোলমাল ভালবাসে না। সময়ে সময়ে শিশুরা মৌন থাকিতে আনন্দ অনুভব করে। মৌনাবলম্বন করিতে একবার অভ্যস্ত হইলে শিশুরা যতই আমোদ-প্রমোদের মধ্যে থাকুক না কেন, শিক্ষয়িত্রীকে একবার নিশ্চল স্থির-ভাবে বসিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা সংযত হইয়া শিক্ষয়িত্রীকে ঐভাবে অনুকরণ করিবে। কোন রকম আদেশের আর প্রয়োজন হয় না।

আমার মনে হয়, যেমন আমাদের দেশে সাধারণ শিশু-বিদ্যালয় নাই, এবং যখন গৃহেই শিশুর হাতে খড়ি হয়, তখন প্রত্যেক পিতামাতার শিশুশিক্ষায় মন দেওয়া দরকার। মন্তেসরি প্রণালীকে কিছু পরিবর্তিত ও আমাদের দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী করিয়া লইয়া আমরা নিজ নিজ গৃহে অতি অনায়াসেই ইহা শিশু-শিক্ষায় প্রয়োগ করিতে পারি। কারণ শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে নূতনভাবে পরিচালিত করাই মন্তেসরি প্রণালীর উদ্দেশ্য।

হরিজন-আতঙ্ক

শ্রীনরেন্দ্র দেব

অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে গতবৎসর যে পুণাচুক্তি হ'য়েছিল, তার ফলে অস্পৃশ্যতা যতটা দূর হোক বা না হোক, প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপরিষদে তারা যে অতঃপর অধিক সংখ্যক আসন পাবেই, এটা একরকম স্থির হ'য়ে গেছে। এই চুক্তির মীমাংসার দিন মহাত্মা অস্পৃশ্যদের নূতন নামকরণ করেছেন—'হরিজন'। 'হরিজন' শব্দটি নূতন নয়। মহাত্মা গান্ধীর পূর্ব্বে মহাত্মা তুলসীদাস প্রথম হরিভক্তদের নাম দিয়েছিলেন 'হরিজন'। হরিজন আখ্যায় অভিহিত হ'য়ে অস্পৃশ্যদের যে কতটা পদোন্নতি হবে সেটা সম্যক বোধগম্য হ'ল না ব'লে, যারবেদা জেলে মহাত্মাকে একখানি পত্র লিখেছিলেম। পত্রখানির সার মর্ম্ম এই—

"আপনি অস্পৃশ্যদের একটি বিশেষ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ক'রে দিয়ে বোধ হয় ভুল করলেন; কারণ হিন্দুসমাজের আর সকলের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক হ'য়ে যাবার পক্ষে তাদের ওই বিশেষ সংজ্ঞাটিই হয়ত এর পর একটা প্রধান বাধা হ'য়ে দাঁড়াবে। এখন থেকে 'হরিজন' ব'ললেই অস্পৃশ্যদের বোঝাবে। কাজেই, কেবলমাত্র নামের পরিবর্ত্তনে তাদের যথার্থ কোনো পরিবর্ত্তন বা সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে না। হরিজন নামাঙ্কিত হ'য়েও অস্পৃশ্য যারা, তারা অস্পৃশ্যই থেকে যাবে। ধরুন, আমরা যদি আজ থেকে আমাদের মুসলমান ভাইদের নাম দিই 'পীরজন'—শিখ ভাইদের বলি 'বীরজন'—বা খৃষ্টান ভাইদের ডাকি 'যীশুজন' ব'লে,—তাতে, শিখ, মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মূলগত ভেদ উঠে গিয়ে একটা একতা বা সাম্যভাব তাদের পরস্পরের মধ্যে স্থাপিত হ'তে পারে কি? কেবলমাত্র ভিন্ন নামে শিখ শিখই থেকে যাবে, মুসলমান ও খৃষ্টানের সঙ্গে হিন্দুর যে ভেদাভেদ বা পার্থক্য তার কিছুই ব্যতিক্রম হবে না। তাই, আমার মনে হয়, আপনার প্রদত্ত এই 'হরিজন' নামের দ্বারা অস্পৃশ্যগণ চিরদিন অস্পৃশ্য ব'লেই চিহ্নিত হ'য়ে থাকবে মাত্র! নয় কি?—"

মহাত্মা এর উত্তরে পত্র লিখেছিলেন—"অস্পৃশ্য ভাইদের যদি 'অস্পৃশ্য' ব'লেই বোঝাবার জন্য 'হরিজন' নামটা ব্যবহার করা হয়, তা হ'লে অবশ্যই সেটা আপত্তিজনক ব'লে বিবেচিত হ'তে পারে। কিন্তু, তাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করবার সময় প্রচলিত হীন পরিচয়গুলোর পরিবর্ত্তে 'হরিজন' নামটা ব্যবহার করাই আমি ভাল বলে মনে করি।"

এরপর আর তর্ক চলে না বটে, কিন্তু আলোচনাটা যে এইখানেই শেষ হ'তে পারে, এমনও মনে হয় না।

হরিজনদের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, এর গোড়া-পত্তন করেছিলেন সেকালের আর্য্যগণ। আজ যেমন সাগর-পারের গৌরবর্ণ বিদেশীরা ভারতবাসীদের 'ব্ল্যাক্-নিগার' ব'লে উল্লেখ করেন এবং এঁদের আগে যেমন মোগল, পাঠান, তুর্কী প্রভৃতিরা এসে আমাদের 'কাফের' ব'লে সম্ভাষণ করেছিলেন, ঠিক তেমনিই স্মরণাতীতকালে একদা দৃষদ্বতী ও সরস্বতী-তীরে সমাগত আর্য্যগণ এ দেশে তাঁদের উপনিবেশ স্থাপন ক'রে আমাদের দস্যু ও দানব আখ্যায় অভিহিত করেছিলেন।

আমাদের বললেম এইজন্য যে, বাঙালীরা এ দেশের আদিম অধিবাসী। আমরা যে আর্য্য নই এটা আমাদের আকৃতি ও বর্ণ থেকেই সপ্রমাণ হয়, এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে বাইরে থেকে এসে এ দেশে বসবাস সুরু করেন নি, ঐতিহাসিকেরা এ সত্যেরও সন্ধান দিয়েছেন। কিন্তু, সে কথা যাক্। আর্য্যগণ যেদিন আমাদের দস্যু বা দানব আখ্যা দিয়েছিলেন, সেদিন এই বিশাল ভারতবর্ষে মাত্র দু'টি জাত ছিল—আর্য্য এবং যাঁরা আর্য্য নয়। অধুনা

মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচকদের জাতি বিভাগে যেমন কর্পোরেশনের কাগজপত্রে দেখতে পাওয়া যায় খৃষ্টান ছাড়া আছে কেবল দু'টি জাত—মুসলমান এবং যাঁরা মুসলমান নয়। তেমনি আর্য্য আমলেও ছিল কেবল দু'টি জাত—আর্য্য এবং যারা আর্য্য নয়, অর্থাৎ—দস্যু। 'অনার্য্য' এই ভদ্র সংজ্ঞাটি আমরা পেয়েছিলাম অনেক পরে। যেমন আজ সুদীর্ঘকাল অবমাননার পরে আমরা ঘৃণিত অস্পৃশ্যদের 'হরিজন' এই ভদ্র নামে অভিহিত করা কর্তব্য ব'লে মনে করেছি। আমরা আর্য্য প্রভুদের বশ্যতা স্বীকার করবার পর তাঁরা অনুগ্রহ ক'রে আমাদের আর দস্যু ও দানব না ব'লে, 'অনার্য্য' ও 'শূদ্র' নাম দিয়েছিলেন। এবং, কৃপাপূর্ব্বক তাঁদের সেবা করবার অর্থাৎ দাসত্ব করবার অধিকার দিয়ে আমাদের ধন্য করেছিলেন।

ঋগ্বেদে ৩য় মণ্ডল ৩৪ সূক্ত ৯ম ঋকে আছে—"ইন্দ্র দস্যুগণকে বধ করিয়া আর্য্য বর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।" স্যর রমেশচন্দ্র দত্ত এই 'বর্ণ' সম্বন্ধে তাঁর ঋগ্বেদের অনুবাদে লিখেছেন—" 'বর্ণ' অর্থে জাতি। ঋগ্বেদের রচনার সময় কেবল দুই জাতি ছিল—আর্য্য ও দস্যু। তাহা এই ঋকেই প্রতীয়মান হইতেছে। এখানে 'বর্ণ' শব্দ একবচনে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব যে সকল ব্যক্তি 'আর্য্য' নামে আসিতে পারে তাহাদিগকে এক শ্রেণী বা বর্ণে ভুক্ত করা হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণী নহে। সায়ন এই ঋকের অর্থ তাঁহার সময়ানুযায়ী করিয়াছেন। তিনি 'আর্য্যং বর্ণং' অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি করিয়াছেন।"

আর্য্যগণ যে আমাদের মনুষ্যের মধ্যেই গণ্য করতেন না তার প্রমাণ ঋগ্বেদে ১০ম মণ্ডল ২২ সূক্ত ৮ম ঋকে স্পষ্টভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে— "আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যুজাতি আছে। তাহারা যজ্ঞকর্ম্ম করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়!"

আজ 'দস্যু' বলতে ডাকাতদেরই বোঝায়। যারা জোর ক'রে পরস্বাপহরণ করে তাদেরই আমরা 'দস্যু' বলি। আর্য্যদের আমলে কিন্তু আমরা আমাদের নিজস্ব যা কিছু রক্ষা করতে গিয়েই সবাই 'দস্যু' আখ্যা পেয়েছিলেম। মনুর আমলেও আমরা 'দস্যু' ব'লেই পরিচিত ছিলেম। মনুর মতে দস্যুরা অতি ঘৃণিত হীন জাত। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে আছে—"যাহারা মুখ, বাহু, উরুদেশ ও পাদদেশ হইতে জন্মিয়াছে, জগতে তজ্জাত হইতে যে সকল জাতি বহিষ্কৃত (অর্থাৎ যারা ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য নয়—এমন কি শূদ্রও নয়) তাহারা ম্লেচ্ছভাষীই হউক আর আর্য্যভাষীই হউক—উহারা 'দস্যু' বলিয়া আখ্যাত।" মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ৭০ শ্লোকে আছে "ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় যদি আপদ্ বিনা অপরকালে স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম না করে তাহা হইলে বক্ষ্যমান পাপযোনী প্রাপ্ত হইয়া পরে জন্মান্তরে দস্যুর দাসত্ব প্রাপ্ত হয়!"

বর্ত্তমান যুগে মনুর এই জুজুর ভয় যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয় কেউ মেনে চলেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য। 'দস্যু' শব্দের অর্থ ও প্রয়োগ আজ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে, তবু এ কথাটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আজকের অস্পৃশ্যদের মতই, সেদিনের 'দস্যু' নামে অভিহিত জাতিরা ছিল আর্য্যগণের একান্ত ঘৃণার পাত্র!

বেদের সময় হ'তেই দেখা যাচ্ছে যে, বিদেশীরা এদেশে এসে দেশের আদিম অধিবাসীদের অস্পৃশ্য করে রেখেছিল। আর্য্যদের আমল থেকে যা চলে আসছে আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' (৭ পঃ ৩ খঃ ৫৯৭ পৃঃ) দেখতে পাই বিশ্বামিত্র তাঁর অবাধ্য জ্যেষ্ঠ পুত্রদের অভিসম্পাত দিচ্ছেন—"তোদের অন্ত্যজাতিভাক্ হউক!" তারপর "তাহারাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ ও মুতিব এই অতিশয় অন্ত্যজন হইল। বিশ্বামিত্রের বংশে উৎপন্ন ইহারা দস্যুগণমধ্যে প্রধান!"—ইত্যাদি। সুতরাং

দস্যুরাই যে সে যুগে 'অন্ত্যজ' অর্থাৎ নীচ অস্পৃশ্য জাত ছিল এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে—এর কারণ কি? আর্য্যগণ এদেশের আদিম অধিবাসীদের এতটা ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখতেন কেন? এর উত্তর স্বার্থের সংঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক যে কারণে আজ ভাই ভাইকে শত্রু মনে করে, জ্ঞাতির মধ্যে বিরোধ বাধে, সেই একই কারণে আর্য্যগণ আমাদের প্রতি এত বেশী বিরূপ হ'য়েছিলেন। আমাদের যে তাঁরা দস্যু বা দানব ব'লে ঘৃণার চক্ষে দেখতেন তার প্রধান কারণ—আমরা তাঁদের এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসাটাকে মোটেই পছন্দ করি নি। তাই, প্রাণপণে তাঁদের সকল প্রকার বিপক্ষতাচরণ ক'রে এদেশে তাঁদের তিষ্ঠানো দায় ক'রে তুলেছিলেম। তাই আর্য্যদের কাছে আমরা হ'য়ে উঠেছিলেম ঘৃণিত দস্যু।

স্বার্থ ও আত্মরক্ষার জন্য এই অসুরদের সঙ্গে আর্য্যদের অনেকদিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কখনো হেরে গিয়ে—কখনো হারিয়ে দিয়ে—শেষটা নানা ছলে বলে কৌশলে তাঁরা আমাদের বশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে 'History repeats itself' ভারতের গত দেড়শতাব্দীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে এই বাক্যের সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি হয়। দেখা যায় প্রাচীন আর্য্য অভিযানের সঙ্গে তার কি অদ্ভুত সৌসাদৃশ্যই না রয়েছে। আর্য্য-বিজয়ের ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখতে পাওয়া যায় তাঁদেরও সেকালের Policy ছিল—To Divide and Rule! এই উপায়েই সেই মুষ্টিমেয় আর্য্য আগন্তুকেরা এ দেশের বিশাল আদিম অধিবাসীদের জয় করে শাসনাধীনে আনতে পেরেছিলেন। নচেৎ কেবলমাত্র ঘোড়-সোয়ারের সুযোগ নিয়ে—তাদের পক্ষে এ অসাধ্য সাধন করা কোনোদিনই সম্ভবপর হতো না। কারণ, ভারতের আদিম অধিবাসীদের কাছে সেদিন ঘোড়ার ব্যবহার অজানা থাকলেও—তাদের মধ্যে একটা একতার বন্ধন ছিল, তারা সংসক্ত ও সমধর্ম্ম সম্পন্ন ছিল। তাদের নিজেদের মধ্যে কোনো প্রকার জাতিভেদ বা অস্পৃশ্যতার বালাই ছিল না। তারা সুখী ও সুসমৃদ্ধ ছিল। সামাজিক ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোনো অনুদার সঙ্কীর্ণ নীতিই প্রচলিত ছিল না। পরিণত বয়সে বিবাহ, দাম্পত্য বিচ্ছেদ, পরিত্যক্তা স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ, বিধবার বিবাহ এমন কি ধর্ষিতার বিবাহও প্রচলিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আর্য্যদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করবার পর থেকেই সকল দিক্ দিয়ে তাদের মধ্যে ভাঙন সুরু হ'ল। দাসেরা প্রভুদের আচার-ব্যবহার, আহার-বিহার এমন কি তাদের ধর্ম্মেরও অনুকরণ করতে আরম্ভ করলে। যেমন মুসলমান ও ইংরাজ আমলেও আমরা অনেকেই করেছি এবং এখনও করছি।

সেদিন যারা এদেশে নব আগন্তুকদের অধীনতা স্বীকার ক'রে তাদের সেবায় নিযুক্ত হ'ল, আর্য্যগণ তাদের কৃপাপূর্ব্বক দাসের কার্য্যে সাদরে গ্রহণ করলেন। কিন্তু, যারা তাঁদের আনুগত্য স্বীকারে অসম্মত হ'য়ে তখনও পর্য্যন্ত বিরুদ্ধাচরণে নিরস্ত হ'ল না, তাদের দৈত্য, দানব, অসুর, দস্যু, ইত্যাদি ঘৃণাব্যঞ্জক কু-আখ্যায় অভিহিত করে আর্য্য প্রভুরা তাদের বিনাশ সাধনের জন্য বৈধাবৈধ নানা উপায়ে প্রবল যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। এই যুদ্ধে চিরাচরিত প্রথা অনুসারে প্রভুদের মনস্তুষ্টির জন্য দাসত্বে নিযুক্ত আদিম অধিবাসীরা আর্য্যদের প্রভূত সাহায্য করেছিল। ফলে আর্য্যবিজয় এদেশে আরও ত্বরান্বিত ও সহজসাধ্য হ'য়ে উঠেছিল।

তথাপি যখন 'চতুর্ব্বর্ণ' কল্পিত হয়েছিল—তখন আর্য্য বিধানদাতারা অনার্য্যদের অনেকের সেই বিপক্ষতাচরণের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করতে না পেরে তাদের সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে ঠেলে দিয়েছিলেন। আর্য্যগণের দাসত্ব স্বীকার করার পুরস্কার স্বরূপই এ দেশের আদিম অধিবাসীরা 'শূদ্রবর্ণ' বা 'দাস জাতি' বলে অভিহিত হয়েছিল।

'শূদ্র' শব্দের সরল ব্যাখ্যা 'বায়ু পুরাণে'র অষ্টম অধ্যায়ে ৪৯ পৃষ্ঠার ১৬৫ শ্লোকে এই রকম আছে—

"শোচন্তশ্চদ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাস্থ যে রতাঃ।
নিস্তেজ সোহল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাংস্তান্ ব্রবীত্ত সঃ॥"

অর্থাৎ,—যারা শোক করে—সুতরাং মূঢ়, যারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে অর্থাৎ একস্থানে দীর্ঘকাল স্থির হ'য়ে বসবাস করে না অতএব, যাযাবর, যারা নিস্তেজ ও স্বল্পবীর্য্য সেই সকল প্রজাকে 'শূদ্র' নামে অভিহিত করে ব্রাহ্মণাদি অপর বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করা হ'ল।

Muir Original Sanskrit Text, Vol. I. ৯৭ পৃষ্ঠায় 'শূদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে 'শুচ্' শব্দের আত্মাক্ষর ও 'দ্র' শব্দ একত্র সংযুক্ত ক'রে 'শূদ্র' শব্দ নিষ্পন্ন করা হয়েছে। 'শূদ্র' অর্থে যারা মূঢ়, যাযাবর ও বলিষ্ঠের নিকট পরাজিত দুর্ব্বল জাতি!

এবম্বিধ 'বর্ণ বিভাগ' ক'রেও কিন্তু আর্য্যেরা নিশ্চিন্ত হন নি। যথেষ্ট Safe-Guard রেখেও কি উপায়ে এই শূদ্রের দাসত্বটা কায়েমীভাবে চিরস্থায়ী ক'রে রাখতে পারা যায়, যাতে তারা ভবিষ্যতে আর কখনো না মাথা চাড়া দিয়ে উঠে বিদ্রোহ করতে সক্ষম হয়, তারও ব্যবস্থা তাঁরা নানা উপায়ে করেছিলেন। সে দিন Civil disobedience বা non co-operation শূদ্রদের কল্পনার অতীত ছিল, কাজেই নির্ব্বিবাদে ও নিরাপত্তিতে আর্য্যপ্রভুরা এদেশের আদিম অধিবাসীদের উপর যথেচ্ছাচার করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আজ যেমন রাষ্ট্রীয় পরিষদে জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিকূল বিবিধ বিধি-বিধান প্রবল আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিদেশী শাসনকর্ত্তাদের অনুগত অভাজনগণের ভোটের জোরে অবলীলাক্রমে পাশ হ'য়ে যাচ্ছে, তেমনি সেদিন আর্য্য-প্রধানেরা বিনা বাধাতেই স্মৃতি ও পুরাণের সাহায্যে, ভেদনীতির প্রবর্ত্তনের দ্বারা শূদ্রগণকে সকল রকমে হীন ক'রে রাখবার সুচতুর ব্যবস্থা করেছিলেন। বেদাধ্যয়ন ও শাস্ত্রপাঠ প্রভৃতি উচ্চশিক্ষা, যাগ-যজ্ঞ ও মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সংক্রান্ত সদনুষ্ঠান এবং উচ্চবর্ণের সংস্পর্শ থেকে আর্য্যগণ তাদের চিরবঞ্চিত করে রেখেছিলেন। তারই বিষময় ফলে সেই ধ্বংসের বীজ ক্রমে সমাজের সকল-স্তরে আমূল প্রবেশ ক'রে সমগ্র জাতিকে আজ বিচ্ছিন্ন, দুর্ব্বল ও দাসমনোভাবাপন্ন অমানুষ ক'রে ফেলেছে। তাদের দাসত্বের জটিল বন্ধন আজ এমনিই সুকঠোর হ'য়ে উঠেছে যে, কোনোদিক দিয়েই তারা আর মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না!

যে শিবমন্দিরে প্রবেশ নিয়ে আজ তথাকথিত আর্য্য ব্রাহ্মণেরা হরিজনদের বিরুদ্ধে লগুড় হস্তে দণ্ডায়মান হয়েছেন, পুরাকালে একদিন সেই শিব-মন্দিরগুলিই ছিল ব্রাহ্মণদের পক্ষে একবারে নিষিদ্ধ স্থান! ঋগ্বেদে ৭ম মণ্ডল ২১ সূক্ত ৫ম ঋকে আছে— "যাহাদের দেবতা শিশ্ন (অর্থাৎ যারা লিঙ্গপূজা করে) আমাদের যজ্ঞাদি ক্রিয়ার নিকট তাহাদের আসিতে দিবে না।" ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে ৯৯ সূক্তে ৩য় ঋকে আছে— "যাহাদের দেবতা শিশ্ন তাহাদিগকে হত্যা করিয়া —" ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঋগ্বেদের যুগে যে শিবপূজা ছিল আর্য্যগণের পক্ষে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিষিদ্ধ কাজ আজ সেই শিবলিঙ্গের মন্দির-দ্বারে দাঁড়িয়ে সেই তথাকথিত আর্য্য ব্রাহ্মণগণই হরিজনদের মন্দির প্রবেশে বাধা দিচ্ছেন — যে মন্দির হরিজনদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত, হরিজনদেরই চিরার্চ্চিত জাতীয় প্রাচীন দেবতার পূজাগৃহ! হরিজনদের অদৃষ্টের এই এত বড় পরিহাস আর কোনো দেশের ও আর কোনো জাতির ইতিহাসে আছে কিনা জানি না!

আর্য্য ব্রাহ্মণেরা গোড়া থেকেই সমস্ত আট-ঘাট বেঁধে চলা সত্ত্বেও তাঁদের একচ্ছত্র অধিকার একদিন এদেশে এক অপ্রত্যাশিত দিক্ থেকে প্রবল বাধা পেয়েছিল। ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ক্ষত্রিয়েরাই একদিন ব্রাহ্মণ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। এর কারণ সম্ভবতঃ রাজ্যে ব্রাহ্মণের অধিকৃত শীর্ষস্থান সেদিন ক্ষত্রিয়েরা নিজেরাই অধিকার করবার জন্য প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। অথবা রাজ্যের সর্ব্ববিষয়ে ব্রাহ্মণের too much interference অসহ্য বোধ হওয়াতে ক্ষত্রিয়েরা তাঁদের স্কন্ধ হ'তে ওই বর্ণশ্রেষ্ঠ পরভৃতিকদের

অপসারিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কৃতকার্য্য হ'তে পারেন নি। কূট-চক্রী সুচতুর ব্রাহ্মণদের বুদ্ধি ও ষড়যন্ত্রের কাছে সেদিন ক্ষত্রিয়ের বাহুবল শুধু পরাভবই স্বীকার করে নি, নিজেদের মধ্যে একতার অভাবে এই দ্বন্দ্বের আবর্ত্তে পরস্পরকে আঘাত ক'রে তারা একান্ত হতবলও হ'য়ে পড়েছিল। ব্রহ্মণ্য প্রতাপ এদেশে আর একবার রাহুগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিল বৌদ্ধধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাবে। পরে আবার শঙ্করাচার্য্য এসে বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করে ব্রহ্মণ্য প্রাধান্যের কতকাংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন বটে; কিন্তু তিনি বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন বলে ব্রাহ্মণেরা এই সময় নানা আজগুবি পুরাণ রচনা ক'রে জনসাধারণের মত পরিবর্ত্তনে প্রাণপণে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং তাঁদের বিনষ্ট প্রভাব পুনরুদ্ধারে বহু পরিমাণে কৃতকার্য্যও হয়েছিলেন।

এই নব ব্রহ্মণ্য যুগের পুনরভ্যুদয়ের সময় যারা বৌদ্ধ শাসন পরিত্যাগ ক'রে তাঁদের নিকট আত্মসমর্পণ ক'রতে অস্বীকৃত হয়েছিল ব্রাহ্মণেরা তাদের জাতিচ্যুত ক'রে শুধু সমাজ থেকে নয়, গ্রাম থেকে, নগর থেকেও বহিষ্কারের ফতোয়া জারি করেছিলেন। এই ব্যাপারে ভয় পেয়ে যারা পরে বৌদ্ধ শাসন ছেড়ে ব্রাহ্মণ শাসনের অধীনে ফিরে এসেছিল তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হ'য়ে পড়েছিল। সেদিনও ব্রাহ্মণেরা সেই একই কৌশল অবলম্বন ক'রেছিলেন যা' বৈদিক যুগে তাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষেরা অবলম্বন ক'রে আর্য্য বিজয় সুসম্পন্ন করেছিলেন সেই divide and rule policy—সেই বিপক্ষপক্ষকে অস্পৃশ্য অন্ত্যজ বলে ঘৃণায় দূরে রাখা, তাদের জাতি ও ধর্ম্মের মিথ্যা গ্লানি প্রচার করা!

নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে বাধ্য হ'য়ে বুদ্ধদেবকে অবতার ব'লে স্বীকার করলেও ব্রাহ্মণেরা তাঁকে 'পাষণ্ড' বলেও উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় প্রভু গৌতমের প্রতি তাঁদের কি বিজাতীয় আক্রোশই না ছিল! সম্ভব হ'লে তাঁকেও হয় ত' অস্পৃশ্য করে রাখতেন তাঁরা। শ্রীমদ্ভাগবতে ২য় স্কন্দ ৭ম অধ্যায় ৬৭ পৃষ্ঠায় আছে—"দেবদ্বেষী অসুরগণ উত্তমরূপে বেদমার্গ অবলম্বন করিয়া ময়দানব কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত দুর্লক্ষ্যবেগ পুরীদ্বারা লোকদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ সেই অসুরদিগের বুদ্ধির ভ্রমসাধন ও লোভ উৎপাদনার্থ বুদ্ধাবতার হইয়া পাষণ্ডবেশে তাহাদিগকে নানা উপধর্ম্মের উপদেশ দেন।"

এই ত' গেল স্বয়ং বুদ্ধদেব ও তাঁর ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুণ্য-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের মন্তব্য। এর উপর আবার পদ্ম-পুরাণ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের স্বধর্ম্মত্যাগী দৈত্য ও মায়া-মোহের দাস বলে উল্লেখ করেছেন। পদ্মপুরাণ সৃষ্টি খণ্ড ১৩শ অধ্যায় ১৩০ পৃষ্ঠায় আছে—"মায়ামোহ বলিল, তোমরা মদীয় ধর্ম্মই ভজনা কর। এই কথা কহিলে দৈত্যগণ সেই ধর্ম্মই আশ্রয় করিল এবং তদবধি তাহারা 'আর্হত' এই নামে পরিচিত হইল। অসুরেরা মায়ামোহের প্ররোচনায় 'ত্রয়ীমার্গ' (অর্থাৎ ঋক যজুঃ সাম এই তিন বেদোক্ত ধর্ম্ম-কর্ম্ম) পরিত্যাগ করিলে অন্যান্য অনেকেই সেইরূপ জ্ঞানোপদেশ লাভ করিল। তাহারা আবার অন্য অনেককে সেই উপদেশ শিখাইল। এইরূপে সকলেই তাহারা পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ কালে 'নমো অর্হতে' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই প্রায় সকল দৈত্যই 'ত্রয়ী-ধর্ম্ম' পরিত্যাগ করিল—" ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য যে, প্রভু বুদ্ধেরই অপর নাম 'অর্হৎ'। ব্রাহ্মণের সুদীর্ঘ দাসত্বের উৎপীড়নে বিব্রত শূদ্র বুদ্ধ-দেবের আবির্ভাবে যেন তাদের ত্রাণকর্ত্তাকে খুঁজে পেয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও মুক্তির সন্ধান পেয়ে দলে দলে তারা এসে সেই মহাশ্রমণ বিশ্ব-বরেণ্য ভিক্ষুর রক্তিম চীবরের অভয় অন্তরালে আশ্রয় নিয়ে আত্মসম্মান রক্ষা করেছিল। ঠিক যেমন নব ব্রহ্মণ্য শক্তির পুনরভ্যুদয়ের পরবর্ত্তী মুসলমান যুগে ও ইংরেজদের আমলে বৌদ্ধধর্ম্ম-ভ্রষ্ট ও ব্রাহ্মণ শাসনে দণ্ডিত অস্পৃশ্য অন্ত্যজ হরিজনেরা দলে দলে মুসলমান ও খৃষ্টান হ'য়ে গিয়ে ব্রাহ্মণদের অত্যাচার থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করেছিল ও এখনও

ক'রছে। কারণ, দৈত্য, দস্যু, অসুর, শূদ্র ইত্যাদি ঘৃণিত নামে আখ্যাত হ'য়েও ত' হরিজনদের নিস্তার ছিল না। ব্রাহ্মণদের দাসত্ব, সেবা ও পরিচর্য্যা ক'রেও এবং ব্রাহ্মণ বিধি-ব্যবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ loyal হ'য়েও তবু তারা চিরদিনের জন্য অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ থাকতেই বাধ্য হয়েছিল। কেবলমাত্র, যাদের সাহায্য ব্যতীত ঘরসংসার অচল হ'য়ে পড়বে, এমনিতর জনকতককে তাঁরা দয়া ক'রে নয়,—প্রয়োজনের খাতিরে বাধ্য হ'য়েই জলাচরণীয় ক'রে নিয়েছিলেন। যাদের সে সৌভাগ্য হয় নি তাদের মানবাত্মা উচ্চবর্ণের ঘৃণা ও অবজ্ঞায় নিয়ত পীড়িত ও অপমানিত হচ্ছিল। কাজেই, সুযোগ পাওয়া মাত্র তারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রে পক্ষপাতদুষ্ট ব্রাহ্মণ শাসনের বাইরে চলে যেতে কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করে নি।

ফলে, হিন্দুর সংখ্যা অন্য জাতের অনুপাতে শতকরা এদেশে ক্রমেই কমে আসছে। ইংরাজ যখন প্রথম ভারতে আসে তখন এখানে হিন্দুর সংখ্যা ছিল শতকরা ৮০ জন। ১৮৭৫ সালের সরকারী বিবরণীতে দেখা গেল, হিন্দুর সংখ্যা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৭৩'৭-এ! ১৯২১ সালের আদম সুমারীতে হিন্দুর সংখ্যা নেমে এসেছে ৬৮'২-এ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এক ইংরাজ আমলেই হিন্দুর সংখ্যা শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ কমে গেছে। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ভারতে মোট হিন্দু ছিল ১৭'৮ কোটী। ১৯২১ সালে তারা মাত্র ২১'৭ কোটীতে উঠেছে। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যা এই চল্লিশ বৎসরের মধ্যে ৫'১ কোটী থেকে ৬'৯-কোটীতে এসে পৌছেচে আর খৃষ্টানেরা •'২ কোটী থেকে একেবারে ৪'৮ কোটীতে দাঁড়িয়েছে।

জন্মের হার আগাছার মত বাড়ে না। খৃষ্টান ও মুসলমানদের এই যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি, এটা তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ, পুনর্ব্বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ আন্তর্জাতিক বিবাহ, পতিতার বিবাহ প্রভৃতি প্রচলিত আছে ব'লে যতটা না হোক হিন্দুসমাজের ঘৃণিত, অবহেলিত, নির্য্যাতিত নিম্নজাতির লোকেরা দলে দলে হিন্দু সমাজ পরিত্যাগ ক'রে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করার ফলেই অপর দুই সমাজ এত বেশী পুষ্টিলাভ করতে পেরেছে। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যের নজির দেখিয়েও তাদের ধরে রাখতে পারা যায় নি। মুসলমান মোল্লারা আজও গ্রামে গ্রামে ঘুরে ইস্‌লাম ধর্ম্মের উদার মর্য্যাদা প্রচার ক'রে অত্যাচারিত অস্পৃশ্যদের সহজেই কোর্-আনের কলমা পড়িয়ে নিতে পারছেন। খৃষ্টান্ মিশনারীদের তো কথাই নেই। ভারতে তাদের অসংখ্য বিরাট প্রতিষ্ঠান খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হ'য়ে নানা কাজের ভার নিয়ে রয়েছে। সেদিন ভারতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রসার বৃদ্ধি সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রতে গিয়ে মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব বিশপ রেভারেণ্ড্ ডাঃ হোয়াইট বলেছেন যে, ভারতবর্ষে অস্পৃশ্যদের ভিতর থেকে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ ২০০০ খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হচ্ছে।

এইভাবে যদি হিন্দুজাতির ক্ষয় হ'তে থাকে তাহ'লে আর পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই যে নিম্নশ্রেণীর সমস্ত অস্পৃশ্য হিন্দুরা হয় খৃষ্টান, নয় মুসলমান হ'য়ে যাবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র করবার অবকাশ নেই। হিন্দুর ধর্ম্ম-মন্দির ও সমাজ-মণ্ডপ হ'তে নিম্ন জাতির এই মহানিষ্ক্রমণ নিবারণ ক'রতে হ'লে কেবলমাত্র তাদের 'হরিজন' বলে উল্লেখ করলেই এবং মাঝে মাঝে খুব ধূম ক'রে বারোয়ারী ভোজে তাদের সঙ্গে বসে জনকতকে মিলে খিচুড়ি খেলেই কি তা নিষ্পন্ন হবে?

ডাঃ আম্বেদ্‌কার যথার্থই বলেছেন যে—"The more dignified procedure would be to invite us to ordinary social functions without any fuss!" সামাজিক কাজে কর্ম্মে যদি তাদের নিয়ে আমরা অন্যান্য জাতের সঙ্গে সমানভাবে চলতে পারি, তবেই তাদের যথার্থ মর্য্যাদা দেওয়া হবে। ছেলে-মেয়েদের বিবাহে এবং শারদীয়া পূজা প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে আমরা দেখতে পাই অনেক হিন্দু জমীদার-বাটীতে সাহেব-মেমেরা নিমন্ত্রিত হ'য়ে আসেন। বাড়ীশুদ্ধ সকলেই তাঁদের খাতির যত্ন করতে

এবং ভালমন্দ কিছু খাওয়াতে যেন শশব্যস্ত হ'য়ে পড়েন! অথচ হিন্দুশাস্ত্র অক্ষরে অক্ষরে মান্‌তে হ'লে য়ুরোপীয় খৃষ্টানদের তো কোনও যুক্তি দিয়েই জলাচরণীয় ক'রে নেওয়া চলে না! কিন্তু তা সত্বেও হিন্দুর বাড়ীতে শুভ ক্রিয়াকর্ম্মে তাদের প্রবেশে কোনো বাধা নেই; অথচ সেই হিন্দুর বাড়ীতেই সেই পূজা-পার্ব্বণ বা বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে যদি কোনো নীচ-জাতীয় অস্পৃশ্য হিন্দু গিয়ে দাঁড়ায় তা হ'লে বাড়ীশুদ্ধ সকলে মিলে তাকে দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়! বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ ও হরিজনদের এই ত' আপেক্ষিক অবস্থা!

মহাত্মার ইচ্ছায় তাঁর কতিপয় লক্ষপতি ভক্ত হরিজনদের দুঃখ দূর করবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একটি "অস্পৃশ্যতা-নিবারণ-সমিতি" স্থাপন করেছেন, কিন্তু তাঁদের প্রধান কথা হচ্ছে — "Social reforms like the abolition of the Caste-System or inter-dining are outside the scope of the League" অর্থাৎ জাতিভেদ সম্পূর্ণ বজায় রেখে এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপেও অস্পৃশ্যদের কোনো আমোল না দিয়ে তাঁরা অস্পৃশ্যতা নিবারণ করবার সাধু-সঙ্কল্পে ব্রতী হয়েছেন। পাঁচ বৎসর ধ'রে তাঁরা বছরে পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ ক'রে অস্পৃশ্য হিন্দুদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধন করবেন স্থির করেছেন। তাঁদের কার্য্যপদ্ধতি হচ্ছে — পতিত জাতির ছেলেমেয়েদের মধ্যে তাঁরা শিক্ষা বিস্তার ক'রবেন। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিবিধ শিল্প-বাণিজ্যে উৎসাহ দিয়ে তাদের দ্বারা সমবায়-সঙ্ঘ গঠন করাবেন! তাদের স্বাস্থ্য-শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলবেন। পথে-ঘাটে চলতে কূপ ও পুষ্করিণীতে জল নিতে, পাঠশালে পড়তে ও দেবালয়ে পূজা-অর্চ্চনায় অধিকার যাতে আর তাদের বাজেয়াপ্ত না হয়, সেদিকেও তাঁরা লক্ষ্য রাখবেন! কিন্তু তাদের নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির কোনো ব্যবস্থা তাঁরা করবেন কিনা সেকথা স্পষ্ট ক'রে কোথাও উল্লেখ করেন নি! তবে একথা বলেছেন বটে যে, পতিত জাতির প্রগতির পথে যত কিছু অন্তরায় তা সাধ্যমত তাঁরা দূর করবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা ক'রবেন। উত্তম প্রস্তাব সন্দেহ নেই। কিন্তু মূলে যদি সেই আদিম ভেদনীতিকেই অপরিহার্য্য বা অপরিবর্ত্তনীয় বলে ধার্য্য করে রাখা হয় তা হ'লে এই সমিতির সকল প্রচেষ্টাই ভস্মে ঘৃতাহুতির মতই ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

সমগ্র ভারতে হিন্দুর সংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ২৪ কোটী। তার মধ্যে প্রায় ৬ কোটীর উপর হিন্দুকে আমরা অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছি। অর্থাৎ মোট হিন্দু জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশই হরিজন! ব্রাহ্মণের সংখ্যা মাত্র এক কোটী! এই এক কোটীর সুখ-সুবিধা ও স্বার্থের সুযোগ অব্যাহত রাখতে ৬ কোটী নর-নারী দীর্ঘকাল ধ'রে সমাজে ঘৃণ্য ও উপেক্ষিত হ'য়ে এসেছে। আজও তাদের সে দুঃখের অবসান হয় নি। তবু যে তারা এখনো নিজেদের "হিন্দু" ব'লে পরিচয় দেয় — এটা হিন্দু-সম্প্রদায়ের মহা মহিমার জন্য নয় — হিন্দু সমাজের মহামারের মহৎ ভয়ে! বহুকাল ধ'রে নানা উপায়ে তাদের অমানুষ ক'রে রাখার সুকৌশলের গুণে। ওরি মধ্যে যাদের এখনও সাহস আছে — আত্মসম্মান বোধ আছে — তারা সুযোগ পাওয়া মাত্র হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ ক'রে অন্য সম্প্রদায়ে যোগ দিচ্ছে। উৎসাহী মিশনারীরা ও সহীদত্ব-কামী মোল্লার দল সহজেই তাদের মধ্যে প্রচার কার্য্যে অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জ্জন ক'রে ধন্য হচ্ছেন।

হরিজনদের শিক্ষা-দীক্ষা, নৈতিক চরিত্র ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে আমরা যে চিরদিন শুধু উদাসীনই ছিলেম তাই নয়। নানা কঠিন বিধি-নিষেধের দ্বারা বরাবর তার বিরুদ্ধাচারণও ক'রে এসেছি। এ পাপ আমাদের অনেকদিন থেকেই জমে উঠ্‌চে। সেই কোন্ ত্রেতাযুগে রামায়ণের আমলে শূদ্ররাজ শম্বুক শাস্ত্র চর্চ্চা করতেন এবং বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হ'তে সাহসী হয়েছিলেন, এই অপরাধে আমাদের ব্রাহ্মণ অভিভাবকেরা অযোধ্যাপতি

শ্রীরামচন্দ্রকে প্ররোচিত ক'রে শূদ্র-রাজকে হত্যা ক'রে মারতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। আমাদের সেই পাপের আজ প্রায়শ্চিত্ত করবার সময় এসেছে! পূর্ব্ব-পুরুষের অনুষ্ঠিত অন্যায়ের বিষময় ফলে আজ তাঁদের সন্তানরূপে আমরা ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছি! ··· The sins of fathers are visited in their sons!

কিন্তু, সাত-সমুদ্র-তেরনদী পার হ'য়ে এসে একাধিক খৃষ্টান-প্রতিষ্ঠান আজ ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ১৩, ৪৮১ টি ইস্কুল স্থাপন ক'রে স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য সকলকেই নির্ব্বিচারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন। ভারতের দরিদ্রনারায়ণদের সেবার জন্য এই ম্লেচ্ছ (?) বিদেশীর দলই এখানে ৬৯১টি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ক'রে রুগ্ন আতুরগণের পরিচর্য্যা করছেন। অনাথ শিশু ও বালক বালিকাদের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা, দুঃস্থ নিরাশ্রয়দের জন্য আশ্রয় নির্ম্মাণ, অভাবগ্রস্তদের জন্য অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপন, অসহায় নারীদের নিরাপদ বাসস্থান, এমন কি কুষ্ঠরোগীদের জন্য সেবাসদনও এই খৃষ্টান মিশনারীরাই এদেশে একাধিক গড়ে তুলেছেন। আমরা আমাদের লজ্জাকর ছুঁৎমার্গ নিয়ে দূরে থেকে আমাদের সঙ্গ ও সাহচর্য্য হ'তে যাদের বঞ্চিত ক'রে রাখি, খৃষ্টান মিশ-নারীরা গিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে তাদেরই নিষিদ্ধ পল্লীর ঘরে ঘরে যান, তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সংবাদ রাখেন, তাদের সকলের সঙ্গে মেলা-মেশা করেন, তাদের উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেন, আপদে-বিপদে সাহায্য করেন, সুখে-দুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনা জানান। আর আমরা?—আমরা তাদের সংস্রবে থাকতে ঘৃণা বোধ করি। তাদের কাউকে আমাদের কাছেও ঘেঁসতে দিই নি! বাড়ীতে ঢুকলে গোবর জল ছড়াই, ছুঁয়ে ফেললে স্নান ক'রে কাপড় ছেড়ে শুদ্ধ হই; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এতকালের শুচিতাতেও আমাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটলো না আজও! অবশ্য একথা সত্য যে, কোনো কোনো গীর্জ্জায় দেশীয় খৃষ্টানরা য়ুরোপীয়দের সঙ্গে ঠিক সমান আসন পান না, তথাপি, এ কথাও মিথ্যা নয় যে, খৃষ্টান্ সমাজে তাঁরা হিন্দুসমাজের মত ঘৃণ্য বা অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হন না। তাঁদের ছোঁয়া-ছুঁয়িতে সেখানে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। তাঁদের হাতের জল সেখানে অচল নয়!

কেবলমাত্র শিক্ষা দিলে, কেবলমাত্র মন্দির-প্রবেশ ও কূপ-স্পর্শের অধিকার দিলেই হরিজনদের প্রতি আমাদের সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হবে, এরূপ মনে করা অত্যন্ত ভুল। মনকে উদার করে প্রাণের মধ্যে তাদের প্রেমের সঙ্গে গ্রহণ করা চাই—আপনার সমকক্ষ ভাবে, নিজের আপনজন বলে স্বীয় আত্মীয় রূপে। তবেই মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতি আমাদের যথার্থ কর্ত্তব্য পালন করা হবে। ডাঃ আম্বেদকার এই দাবীই জানিয়েছেন মহাত্মার কাছে—জাতিভেদ তুলে দিন।

কিন্তু মহাত্মা জাতিভেদ তুলে দেবার পক্ষপাতী নন। হিন্দুর বর্ণাশ্রমের প্রতি তাঁর একটা প্রবল শ্রদ্ধা বা অনুরাগ আছে। তিনি এই বর্ণাশ্রম অক্ষুণ্ণ রেখেই অস্পৃশ্যদের উন্নতি সাধনে দৃঢ় সঙ্কল্প করেছেন। কিন্তু তা' যদি সম্ভব হ'ত তা' হলে এই 'অস্পৃশ্য সমস্যা' হিন্দু সমাজে কখনও দেখাই দিত না। আজ যে এই হিন্দু সমাজের এক-চতুর্থাংশ অস্পৃশ্য হ'য়ে পড়েছে, এর কারণ অনুসন্ধান ক'রে দেখা যাচ্ছে যে, এর মূলে রয়েছে বর্ণাশ্রমেরই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ! বর্ণাশ্রমের ফল যে আজ এমন বিষময় হ'য়ে উঠবে, এ হয়ত' বর্ণাশ্রম প্রবর্ত্তকদের কল্পনায়ও আসে নি। কারণ "চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ"—গীতায় শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তি অনুসারে যদি হিন্দু সমাজে চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ বরাবর চলতো তা হ'লে এই অন্ত্যজ অস্পৃশ্য নিম্নজাতির সমস্যা আজকের মত এমন কঠিনরূপ ধ'রে দেখা দেবার অবকাশ পেতো না। যে যার গুণকর্ম্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণভুক্ত হ'লে কারুর আর কোনো অভিযোগ করবার কিছু থাকতো না। কিন্তু, সে সুন্দর বিধির অপব্যবহার ঘটিয়ে বর্ণ-বিভাগ যখন গুণকর্ম্মের বিচার ছেড়ে বংশগত অধিকারে এসে দাঁড়ালো তখনই তা এদেশের পাপ ও এ জাতির অভিশাপ হ'য়ে উঠলো।

অর্থাৎ, গুণে কর্ম্মে সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়েও কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ-কুল-জাত ব'লে যাঁরা ব্রাহ্মণত্বের দাবী করতে সুরু করলেন তাঁরা ব্রাহ্মণের আসনকে কলঙ্কিত করতে লাগলেন। আবার তাঁদের অপেক্ষা সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হ'য়েও যাঁরা তাঁদের জন্মের বাধার জন্য নিম্নতর শ্রেণী-তেই থেকে যেতে বাধ্য হলেন, তাদের মধ্যে একটা বিক্ষোভ স্বাভাবিক হ'য়ে উঠলো।

বর্ণভেদ কমবেশী জগতের সকল দেশেই আছে। আভিজাত্য ও পদমর্য্যাদার ভেদ, দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্যের ভেদ, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভেদ কোন্ দেশে না দেখতে পাওয়া যায়? কিন্তু কোথাও এমন জন্মগত হীনতার একটা লজ্জাকর ছাপ ললাটে দেগে দেওয়া হয় না তাদের। তারা সুযোগ ও সুবিধা পেলে আপন যোগ্যতার গুণে যে কোনো দিন সমাজের যে কোনো নিম্নস্তর থেকে জাতির শীর্ষ স্থানে এসে উঠতে পারে। কিন্তু, এদেশের একজন অস্পৃশ্য শ্রেণীর লোক যতই শিক্ষিত, ভদ্র ও জ্ঞানী হোক না কেন, একমাত্র বিবাগী, বৈরাগী, সন্ন্যাসী বা অবধূত হতে না পারলে—পুরুষানুক্রমে সে নীচ, অস্পৃশ্যই থেকে যাবে। হিন্দু সমাজের উচ্চস্তরের কোনো আসনেই তার স্থান হবে না। অথচ, চরিত্রে ও ব্যবহারে চণ্ডালের চেয়েও অধম যে মূর্খ ব্রাহ্মণ সে তার কেবলমাত্র বংশগত উপবীতের দোহাই দিয়েই হিন্দু সমাজের গৌরবকর শ্রেষ্ঠ আসনও দাবী করবার অধিকার রাখে। হিন্দুর অধঃপতনের প্রধান বা মূল কারণ এইখানেই। এইখানেই আজকের হরিজন সমস্যার ও ভিত্তি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

আজকের এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-অধ্যুষিত যুগে The Law of Heredity-র Theory এখন সম্পূর্ণরূপে exploded হ'য়ে গেছে! তথাপি যখন মহাত্মা ব'লছেন যে "The Law of Heredity is an eternal Law, and that any attempt to alter it must lead to utter confusion......Varnasrama or the Caste System is inherent in human nature. Hinduism has simply reduced it to a Science." তখন মনে হয়, হরিজন সমস্যার একটা কিছু সমাধান আশা করা আমাদের পক্ষে হয়ত' আকাশ-কুসুমের মতই দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠবে! তিনি যদি বলতেন যে, Hinduism had honestly attempted to reduce the Caste System to a Sceince, but miserably failed and made a mess of it, owing to the self-interested motive and utter corruption of the degenerated higher caste তা' হলে কিছু আশা ছিল যে, হয়ত' এই বর্ণাশ্রমের অপব্যবহার একদিন দূর হবে এবং এর বিভাগ এই বংশগত অধিকারের মিথ্যা সংস্কারমুক্ত হ'য়ে আবার গুণকর্ম্মের সত্য আদর্শে ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় উন্নীত হবে।

কিন্তু, বর্ণাশ্রমের বর্ত্তমান রূপ বজায় রাখলে, অর্থাৎ, একে ওই Law of Heredity বলে মেনে নিলে এবং to alter it must lead to utter confusion—এই আশঙ্কায় ওকে নিয়ে নাড়া-চাড়া করাটা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করলে, এই যে আমাদের মধ্যে আজ একটা শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টের ভাব মজ্জাগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে তা কোনোদিনই দূর হবে না। আবার, এই উচ্চ-নীচ-ভেদাত্মক মনোভাব দূর না হ'লে অস্পৃশ্যতার সমস্যাও সমাধান করা সম্ভব হ'বে বলে মনে হয় না। এই শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্য যে বর্ণাশ্রমের অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহারই মূলতঃ দায়ী সে বিষয়ে একাধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।২।৬।৭) আছে—"ব্রাহ্মণ জাতি দেবতা হইতে উৎপন্ন,—শূদ্র অসুর হইতে।" মনুসংহিতায় (১০।৩) আছে "বেদাধ্যয়নাধ্যাপন ও তদ্ব্যাখ্যান বিষয়ে সবিশেষ উপযুক্ততা হেতু, উপনয়ন সংস্কারের বিশিষ্টতা প্রযুক্ত সর্ব্ব বর্ণাগ্রজ এবং ঈশ্বরের উত্তমাঙ্গজ বলিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

শূদ্র যে দাসত্ব করবার জন্যই জন্মেছে এবং ব্রাহ্মণ সর্ব্ব প্রকারে অযোগ্য হ'লেও সে যে চিরদিনই দেবতা—এই নির্লজ্জ উক্তিও আমাদের শাস্ত্রে আছে। মনুসংহিতায় (৯।৩১৭) বলা হয়েছে— "সংস্কৃতই হউক আর অসংস্কৃতই হউক অগ্নি যেমন মহতী দেবতা, তদ্রূপ অবিদ্বান হউন আর বিদ্বানই হউন,

ব্রাহ্মণ মহাদেবতা স্বরূপ।" মনুসংহিতা (৮।৪১৩) আদেশ করেছেন— "পরন্তু ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক শূদ্র দ্বারা তিনি (ব্রাহ্মণ?) দাস্তকর্ম্ম করাইয়া লইবেন; যেহেতু বিধাতা দাস্তকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন"।।

এই যেখানে আজ শাস্ত্র-বাক্য ও বর্ণাশ্রমের মূল তত্ত্ব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে এই বর্ণাশ্রম বজায় রেখে "হরিজন" উদ্ধার প্রচেষ্টা স্বভাবতঃই ব্যর্থ ও নিষ্ফল হ'তে বাধ্য। জাতিগত বর্ণবিভাগ তুলে দিয়ে যদি এখানে আবার ভারতের আদর্শ বর্ণাশ্রম বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে পারা যায়, তবেই হরিজন-সমস্যার কতকটা সমাধান হয়ত' সম্ভবপর হ'তে পারে ব'লে মনে হয়। প্রাচীন ভারতে বর্ণাশ্রম বিভাগ যে জন্মগত ছিল না তার প্রমাণ ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডল ১২৫ সূক্ত ৫ম ঋকে পাওয়া যায়। বাগ্দেবী বলছেন—"আমি যাহাকে ভালবাসি তাহাকে ভয়াবহ করি; তাহাকে ব্রাহ্মণ, তাহাকে ঋষি, তাহাকে সুবিজ্ঞ ব্যক্তি করি—" এই ঋক থেকে বুঝা যায়—সে যুগে জন্মগত অধিকার না থাকিলেও কারুর ব্রাহ্মণ হওয়া সম্বন্ধে বাধা ছিল না। বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী কালেই ব্রাহ্মণদের গোষ্ঠীগত স্বার্থের খাতিরে এটাকে জন্মগত অধিকারে দাঁড় করানো হয়েছে। বেদের মধ্যে মাত্র এক স্থানে একবার ছাড়া আর কোথাও বর্ণাশ্রমের উল্লেখ নেই, কাজেই, ওটি যে পরে ব্রাহ্মণ স্বার্থে ওর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে চিন্তাশীল মনীষীদের এ সন্দেহ মিথ্যা ব'লে মনে হয় না। জগতের অন্যান্য দেশে যে বর্ণ-ভেদ আছে তার মধ্যে এই শোচনীয় উচ্চ নীচ বা শ্রেষ্ঠ অপকৃষ্টের ছুঁৎমার্গও তদানুসঙ্গিক ঘৃণার ভাব বিদ্যমান নেই। আজ সেখানে যে শুঁড়ী হীন মদ্য-ব্যবসায়ী কাল সে নিজগুণে সেখানে চার্চ্চের পূজারী হ'তে পারে। তাই, তাদের মধ্যে বর্ণভেদ থাকলেও এই লজ্জাকর অস্পৃশ্য-সমস্যা কোনো দিনই জেগে উঠবার অবকাশ পায় নি, ফলে তাদের জাতিগত সংহতি ও সংসক্তিও বিনষ্ট হয় নি।

এই যে ছোট বড় মনোভাব নিয়ে এদেশের মজ্জাগত ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ বা তথাকথিত 'বর্ণাশ্রম'-এর বিষাক্ত কবল থেকে মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিতে না পারলে হিন্দু সমাজের ও হিন্দু জাতির কল্যাণ সুদূর পরাহত।

একথা বুঝেছিলেন মানুষের বেদনায় ব্যথিত শ্রীগৌতমবুদ্ধ, তাই বৌদ্ধ-শাসনে জাতিভেদ ছিল না। ভারত সেদিন উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন হ'তে পেরেছিল। এই কথা বুঝেছিলেন যুগসাধক শ্রীরাম-কৃষ্ণ পরমহংসদেব, তাই তিনি বলেছিলেন—"এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে—সে উপায় ভক্তি। ভক্তের জাত নেই!…ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়! অস্পৃশ্য জাতিও ভক্তি থাকলে শুদ্ধ, পবিত্র হয়—!"

পরমহংসদেবের মানসপুত্র বীর বিবেকানন্দ মনে-প্রাণে এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তাই ছুঁৎমার্গের তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি জানতেন, বর্ণাশ্রমের বর্ত্তমান রূপ বজায় রাখলে ছুঁৎমার্গের ছোঁয়াচে বিষ থেকে হিন্দুজাতির পরিত্রাণের আর উপায় নেই। তাই তিনি বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করেছিলেন, "পরাধীন ভারতবর্ষে আজ শুধু একজাতি—সে জাতি দাস! আমরা সবাই আজ শূদ্র! শূদ্র আমার ভাই!—"

'হরিজন' উদ্ধার করতে হ'লে, চাই এই মনো-ভাব! বর্ণাশ্রমের মিথ্যা অহঙ্কার রাখলে চলবে না! চাই এই মন—এই প্রাণ—আচণ্ডালকে কোল দেবার মত প্রেমের সাধনা!—উদার উন্মুক্ত চিত্তে সবাইকে ডেকে বলতে হবে—

"শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই!"

কৈলাসী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

গোরুটী-ভদ্রেশ্বর। কলিকাতা হইতে বেশী দূরে নয়। গঙ্গার ধারে বড় বড় পাট-কল—বড় রাস্তার ধারে-ধারে কুলিদের ঘর—পল্লীর সে সহজ সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ছায়া-তরুতলে সে-পাঠশালা আর বসে না; দীঘীর ধারে সমাজপতিদের বৈঠক বন্ধ হইয়াছে।

পল্লীর বুকে দু'চারিটা খড়ের ঘর, খানা-ডোবা, ঝোপ-জঙ্গল দেখা যায়—কিন্তু তাহাতে যেন প্রাণ নাই!

বৈকালের দিকে কৈলাসী ও-পারে গিয়াছিল গরু কিনিতে। তার বয়স ত্রিশের কোঠা পার হইয়াছে। তার কেহ নাই। তবু আজো রঙ-করা শাড়ী পরা, চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা বাঁধা—এ সখটুকু ষোল-আনা বজায় আছে। হাতে সে সোনার তাগা পরে; গস্ত করিতে গিয়া রঙীন কাচের চুড়ি দেখিলে না কিনিয়া থাকিতে পারে না!

নানা লোকে নানা কথা বলে। কেহ বলে,—বুড়া হরকালী শিকদারের সঙ্গে তার বিবাহ হয় নাই—অথচ কৈলাসীর কথাতেই বুড়া নাকি উঠিত-বসিত! কেহ বলে, তা নয়! হরকালীর সে ছিল তরুণী ভার্য্যা। বুড়া-বয়সে তাকে বিবাহ করিয়াছিল—বুড়াকে সে ভালোবাসিতে পারে নাই। কিন্তু··

পাড়ার যাদব চাটুয্যে পয়সা করিয়া নামে রায়-বাহাদুরী খেতাব আঁটিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। হরকালী মারা গেলে তিনি নাকি কৈলাসীর কাছে লোক পাঠাইয়াছিলেন—গঙ্গার ধারে রায়-বাহাদুর যে-বাগান তৈয়ার করিয়াছেন, সে বাগান খালি পড়িয়া আছে! কৈলাসী আসিয়া সে বাগানে বাস করিলে তিনি খুশী হইবেন এবং কৈলাসীর দেখাশুনার সকল ভার গ্রহণ করিয়া তিনিও ইত্যাদি ইত্যাদি! এ-প্রস্তাবে কৈলাসী যে জবাব দিয়াছিল, তাহাতে রায়-বাহাদুর ভয়ে কৈলাসীর বাড়ীর কাছ দিয়া চলা বন্ধ করিয়াছেন!

সে-কথায় রাগ করিলেও সে রাগ রায়-বাহাদুর ফলাইতে পারেন নাই। রায়-বাহাদুর বলিয়া একটা নাম আছে! তা ছাড়া বয়স হইয়াছে—ঘরে ছেলে-মেয়ে-স্ত্রী, নাতি-নাতনি! কোনো কলরব তুলিলে—কৈলাসীর যে ঝাঁজ, কি জানি, কি করিয়া বসিবে! তার উপর আইনের রাজ্য — উপন্যাস-নাটকের নয় যে, মিথ্যা ফিকির চালাইয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিবেন!

কৈলাসী গরু কিনিয়াছে—গরুর দুধ যোগাইয়া যাহা উপার্জ্জন হয়, তাহাতেই একা মানুষ—তার দিন চলিয়া যায়। শিকদারের দেওয়া বাড়ী পাটের কলওয়ালা কিনিয়া লইয়াছে—গোরুটীতে জমি কিনিয়া সেখানে কুঁড়ে বাঁধিয়াছে। দু'চারিটা উৎপাত যে না ঘটিয়াছে, এমন নয়। সে উৎপাতে দমিবে, এমন মেয়ে কৈলাসী নয়!

যে কথা বলিতেছিলাম। পল্লীর পথে কৈলাসী ঘরে ফিরিতেছিল। সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্বক্ষণ।

বাগনাপাড়ার পর ছোট একটা জঙ্গল। এই জঙ্গল পার হইয়া কৈলাসী দেখে,. হাজা পদ্মদীঘীর পাড়ে মানুষের মত কে একজন পড়িয়া আছে। কৈলাসী কাছে আসিল—দেখে, মানুষই! গায়ে ছেঁড়া জামা, পরণে ময়লা ছেঁড়া কাপড় — মানুষটির বয়স বেশী নয়। ডাকাডাকি করিতে সে চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখ দুটা জবাফুলের মত লাল। চেহারা ভদ্র-ঘরের ছেলের মত!

কৈলাসী কহিল—কোথায় থাকো? এখানে পড়ে কেন?

জড়িত ভাষায় মানুষ যে-উত্তর দিল, তাহা শুনিয়া কৈলাসী বুঝিল, তার নেশার ঘোর এখনো কাটে নাই!

মুখ অচেনা। এ-গাঁয়ের নয়। অদূরে ক্ষেতে পাঁচ-সাত জন লোক কাজ করিতেছিল; ডাকিয়া তাদের সাহায্যে লোকটাকে তুলিয়া কৈলাসী গৃহে আনিল।

পরিচর্য্যায় বিশেষ ফল হইল না। দাওয়ায় মাদুর বিছাইয়া কৈলাসী তাকে বলিল—এইখানে পড়ে থাকো। সকালে ভালো হলে উঠে ঘরে যেয়ো।

লোকটা মৃদু হাসিল—কোনো জবাব দিল না।

*

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙ্গিতে দাওয়ায় আসিয়া কৈলাসী দেখে, লোকটা উঠিয়া বসিয়াছে। কৈলাসী কহিল—ঘর কোথায়?

সে কহিল—নেই।

কৈলাসী বিস্মিত হইল। সে কহিল—ঘর নেই! তবে……?

মৃদু হাসিয়া সে কহিল—কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায় বেরিয়েছিলুম। কাজও একটা মিলেছিল……

এই অবধি বলিয়া সে চুপ করিল।

কৈলাসী কহিল—কাজ যদি মিলেছিল, তাহলে ঐ পুকুর-পাড়ে পড়েছিলে কেন?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল—বরাত!…মানে, মাহিনা পেয়েছিলুম। মাহিনা পেতে এক দোকানে ঢুকি। যা হয় তার পর—খুব নেশা করি। পাঁচজন সঙ্গী জুটেছিল। দোকান থেকে যখন বেরুলুম—পকেটে কিছু রইলো না। চলতে চলতে পা কেমন ভেরে এলো—শুয়ে পড়লুম। হুঁশ হতে দেখি, এইখানে রয়েচি।…একটু একটু মনে পড়চে, তুমি যেন কি বলেছিলে আমায় ডেকে…

ঘৃণায়-বিরক্তিতে কৈলাসীর মন ভরিয়া উঠিল। কৈলাসী কহিল—এখন ভালো হয়েচো তো?

—হয়েচি।

কৈলাসী কহিল—কোথায় যাবে?

লোকটা কহিল—বুঝতে পারচি না।

কৈলাসী কহিল—চাকরি করো বলছিলে—চাকরিতে যাবে না?

লোকটা কহিল — চাকরি নেই। একজনের বদলিতে কাজ করছিলুম। সে এসেচে।

কৈলাসী কহিল—তাহলে কি করবে?

লোকটা কহিল—তাই ভাবচি।

—ঘর-দোর নেই? আপনার জন?

লোকটা কহিল—না থাকার সামিল।

কৈলাসীর মনের মধ্য হইতে অস্ফুট-ধ্বনি বাহির হইল—আহা!

কৈলাসী কহিল—দেখচি, ভদ্দর লোকের ছেলে! এমন অবস্থা করে তুলেচো!

লোকটা কৈলাসীর পানে চাহিল। কৈলাসী দেখিল, তার দুই চোখের দৃষ্টি করুণ বেদনায় ভরা! কৈলাসী কহিল—তোমার নাম কি?

সে কহিল—বিশু।

—ব্রাহ্মণ?

মাথা নাড়িয়া বিশু জানাইল, তাই!

কৈলাসী কহিল—ভাবো, কোথায় যাবে। আমি গাই দুইতে চললুম। গাঁয়ে দুধ জোগান দিতে যাবো।

কৈলাসী চলিয়া গেল। বিশু গট্ট হইয়া বসিয়া রহিল।…

দু'ঘণ্টা পরে কৈলাসী ফিরিল—একেবারে স্নান সারিয়া। ফিরিয়া দেখে, বিশু তেমনি বসিয়া আছে।

কৈলাসী কহিল—ভেবে কিছু ঠিক হলো?

বিশু কহিল—ঠিক করবার কিছু নেই।

—তাহলে?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিশু কহিল,—এবারে উঠি…

বিশু উঠিবার উদ্যোগ করিল।

—পয়সা-কড়ি কিছু আছে?

—না।

—তবে?

পদ্মিনী
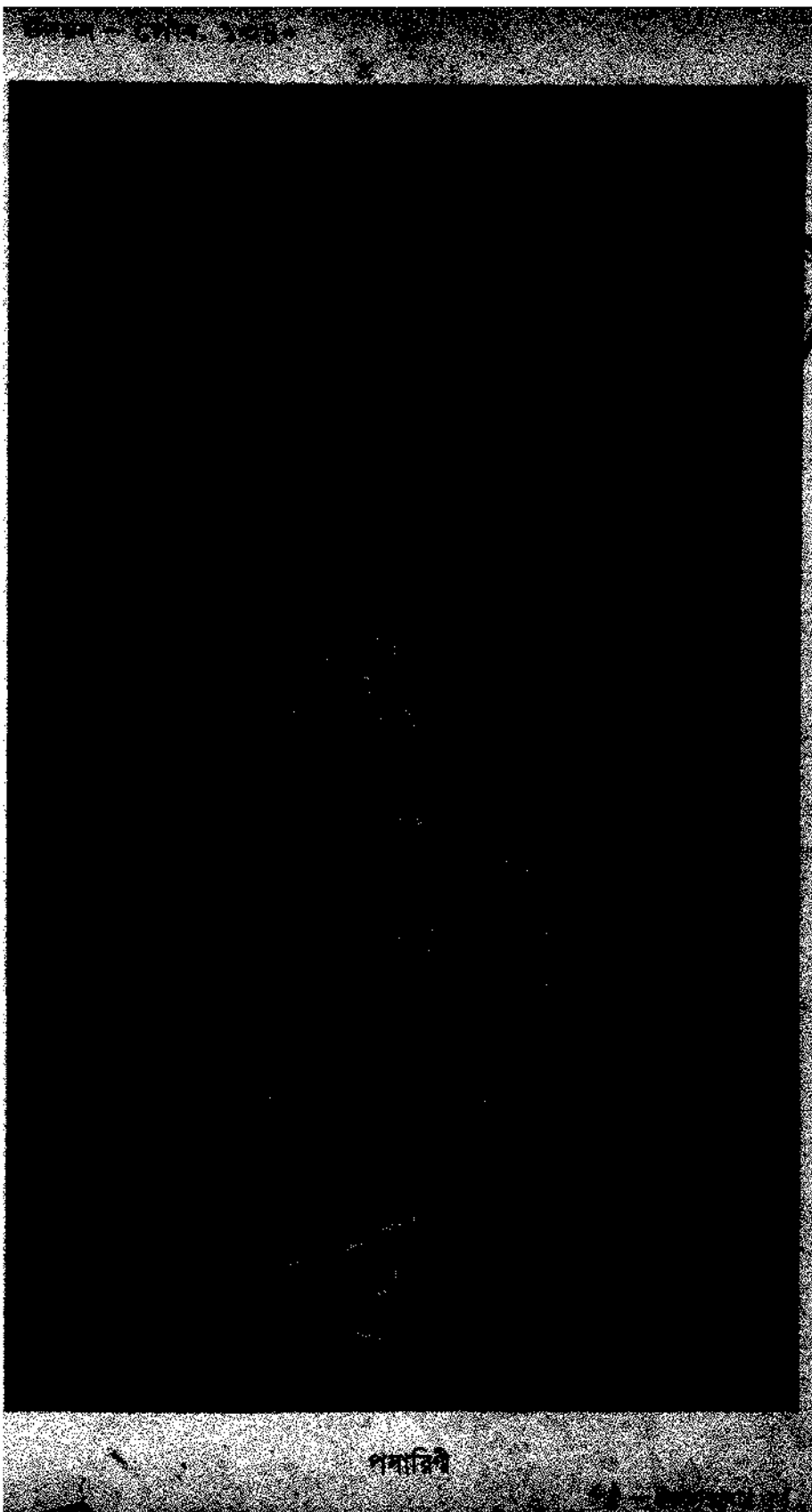
এ মমতা? সঙ্গে সঙ্গে কাছুর কথা, লক্ষ্মীর মার কথা এবং ভোঁদার সেই ইঙ্গিতও তার মনে পড়িল।

লজ্জায় মন রাঙা হইয়া উঠিল। ছি-ছি!

•

সকালে ঘুম ভাঙিতে কৈলাসী উঠিয়া দেখে, উঠানের কোণে গোবরের ভাঁড়—সেই ভাঁড়ে মুখ গুঁজড়িয়া বিশু পড়িয়া আছে!···সে চমকিয়া উঠিল!

সেই পুরানো রোগ!···না, এ লোককে লইয়া এ যে বিষম বিপদে পড়া গেল! থাক্ পড়িয়া! কৈলাসী নিত্য-কাজে বাহির হইয়া গেল।

ফিরিতে বিলম্ব হইল—ফিরিল রাগে জলিয়া। আসিয়া দেখে, বিশু স্নান সারিয়া ফিট্-ফাট্ সাজিয়া বসিয়া আছে।

কৈলাসী কহিল—কাল যুগীদের আড্ডায় জুটে-ছিলে?···বলো···

শুষ্ক মুখে বিশু কহিল—ওরা যাত্রা শুনতে দিলে না, ধরে নিয়ে গেল!

—হুঁ!

তীব্র দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া কৈলাসী কহিল—নেশার মুখে সেখানে কি সব বলেচো?

কি বলিয়াছে, বিশুর মনে পড়িতেছিল না। কুতূহলী দৃষ্টিতে সে কৈলাসীর পানে চাহিল। ভয় হইতেছিল—হয়তো যা বলিয়াছে, তা খুব মন্দ কথা! নহিলে কৈলাসীর মুখে-চোখে এতখানি ঝাঁজ ফুটিবে কেন?

কৈলাসী কহিল—বেইমান, হতভাগা! পথের কুকুর পথে পড়েছিলে—দয়া করে ঘরে এনে ঠাঁই দিয়েছি, আস্পর্দ্ধা তাতে বেড়ে গেছে! না?···

বিশু কহিল,—কি বলেচি?

—শুনতে চাও?

প্রশ্নের ভঙ্গী দেখিয়া শুনিবার বাসনা বিলুপ্ত হইয়া গেল। তবু ভরসা হয় না বল্‌তে—না, শুনিব না!

কিছু বলিতে হইল না। কৈলাসীই বলিয়া দিল; কহিল,—আড্ডা ভারী জমেছিল—না? তুমি দেখতে সুন্দর,—তোমার রূপে ভুলে আমি তোমায় ধরে রেখেচি! তুমি আমার বন্দী প্রাণেশ্বর! হতভাগা, বওয়াটে কোথাকার···এ-সব নোঙ্‌রা কথা বলতে জিভ খসে পড়লো না?

ঠিক কথা! তাকে সকলে তারিফ করিতেছিল বাহাদুর বলিয়া। রায়বাহাদুর বাগান-বাড়ী ধরিয়া দিয়া যে কৈলাসীর প্রেম লাভ করিতে পারে নাই, সে কৈলাসী তাকে মাথার মণি করিয়া রাখিয়াছে! এমনি বহু কথা! সে-কথায় নেশার মুখে সগর্ব্বে সে বলিয়াছিল,—চেহারা ভাই! আমার এই চেহারা···

নেশার ঘোরে তখন এ-সব বলিলেও এখন কৈলাসীর মুখে এ-কথা শুনিয়া সে যে কোথায় লুকাইবে, কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না!

কৈলাসী কহিল—মেয়ে মানুষের যত্নের আর কোনো মানে নেই—না?···পুরুষ মানুষ কি না, তাই ঐ এক মানেই বোঝো! ইতর, ছোটলোক কোথাকারের! বেরোও, বেরোও এখনি আমার এখান থেকে! মানুষ পাখী পোষে, গরু পোষে, কুকুর পোষে, বাঁদর পোষে, তাদের প্রাণেশ্বর করবে বলে—না? লক্ষ্মীছাড়া বওয়াটে! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা!··· বেরোও তুমি··· এখনি বেরোও আমার বাড়ী থেকে! ও-মুখ আমি দেখতে চাই নে আর! ভিখিরী হাঘরে কোথাকারের···

কৈলাসীর সারা অঙ্গ কাঁপিতেছিল, পা টলিতেছিল—দাওয়ার সিঁড়ি ধরিয়া কোনমতে বসিয়া পড়িল!··· তার চোখের সামনে দিনের আলো নিবিয়া আসিতেছিল!······

৪

সেই তালি-দেওয়া চটী জোড়ায় পা ঢুকাইয়া, নিজের সেই জীর্ণ জামা-কাপড় পরিয়া বিশু বাহির হইতেছিল। কৈলাসী কহিল,—কোথায় যাওয়া হচ্ছে আজ্ঞা দিতে?

বিশু কহিল—চলে যাচ্ছি।

—তা তো দেখচি। কিন্তু যাওয়া হচ্ছে কোন্ মোমরার ঘরে?

কুণ্ঠিত স্বরে বিশু কহিল—তুমি যে যেতে বলেচো।

—ও!...

একটা নিশ্বাস! সে নিশ্বাস সবলে চাপিয়া কৈলাসী কহিল—যেতে হয়, খেয়ে-দেয়ে যেয়ো। না খেয়ে গেলে গেরস্তর অকল্যাণ হয়। সে বেইমানী-টুকু নাই করে গেলে!...

বিশু কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কৈলাসী খুঁটের ঝোড়া নামাইয়া রাখিয়া বিশুর হাত ধরিল; ধরিয়া কহিল — রাগে রান্না-বান্না করিনি। বসো। এখনি রেঁধে দিচ্ছি। যেতে হয়, খেয়ে যেয়ো। যাওয়াই তোমার উচিত। তুমি লোক ভালো নও — মমতার যুগ্যি নও। মন তোমার আর-পাঁচ জনের মতই নোঙ্‌রা। যত্ন নিতে তুমি জানো না।...

যন্ত্র-চালিতের মত বিশুকে ফিরিতে হইল।

আহারাদির পর আর একবার বাহির হইবার চেষ্টা! কৈলাসী কহিল — উঃ, নবাব খাঞ্জা-খাঁ! কথায় গায়ে ফোস্কা পড়ে, না? — কেউ তোমায় ধরে রাখবে না। কোথাকার কে, রাখাই বা কেন? তা রোদ পড়লে যেয়ো ... রোদে বেরিয়ে আবার জ্বর করো, করে পথে পড়ে থাকো — দেশশুদ্ধ লোক আমায় ছি-ছি করুক! আবার আমি ঘরে এনে টাকার শ্রাদ্ধ করি! টাকাটা আমার এত সস্তা নয়!

বিশু বসিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল না, যা ঘটিতেছে, এ-সব সত্য? না, নেশা করিয়া খেয়াল দেখিতেছে? ... কৈলাসী আর দাঁড়াইল না, কোথায় বাহির হইয়া গেল; বলিয়া গেল,— আমি না ফিরলে চলে যেয়ো না বেইমানী করে!... এ্যাদ্দিন যার খেলে, তার এ কথাটুকু ...

অগত্যা! নিরুপায় বিশু দাওয়ায় পড়িয়া রহিল — যেন প্রাণহীন মাটির পুতুল!

কৈলাসী ফিরিল—রাত তখন অনেক। ঘর-দ্বার অন্ধকার। কি কাজে গিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিলে তখন সে তার সদুত্তর দিতে পারিত না! কিন্তু ভাগ্যে সে-প্রশ্ন করিবার লোক কেহ ছিল না!

ঘরে আসিয়া দীপ জ্বালিয়া কৈলাসী দেখে, দাওয়ায় বসিয়া আছে বিশু — যেন পাথরের মূর্ত্তি! সে কহিল — আলো জ্বালোনি?

বিশু কহিল—তুমি যে বলে গেছলে...

কৈলাসী কহিল—তা বেশ, সন্ধ্যাটা যদি সেই রইলেই, আলোটুকু জ্বাললে হাতে কি মহাব্যাধি হতো! ছি-ছি—এমনি ভাবে গেরস্তর অকল্যাণ করা! ভর-সন্ধ্যে গেল, ঘরে আলো জ্বল্‌লো না!...

নিজের মনে গজ-গজ করিতে করিতে কৈলাসী গিয়া প্রদীপ জ্বালিল, উনুন ধরাইল। উনুন ধরিলে হাঁড়ি চাপাইয়া তাহাতে চাল-ডাল ছাড়িয়া দিল।... দাওয়ার পানে চাহিয়া দেখে, বিশু তেমনি বসিয়া আছে। কৈলাসী তার ত্রিসীমা মাড়াইল না।

অন্ন তৈয়ার হইলে পাত্রে তাহা ধরিয়া দিয়া বিশুকে সে কহিল—নাও, খেয়ে নাও। ভালো গেরো হয়েচে আমার! নিজে না খেয়ে বিছানায় পড়ে থাকবো—সে উপায়ও রাখো নি! গুরুঠাকুরটি হয়ে বাড়ী কামড়ে পড়ে আছো! এমন বেহায়া দেখিনি! তাড়িয়ে দিলেও ঘরের খুঁটি ধরে বসে থাকে! মরণ! মরণ!...

এ-কথায় কাহারও মুখে অন্ন ওঠে না! বিশুরও উঠিতেছিল না। কৈলাসী ধমক দিল—খাও না বাপু... পাথরের ঠাকুরটি হয়ে বসে আছো কেন? পয়সার জিনিষ চাল-ডাল! সে পয়সা নষ্ট করো না...

এ কি হেঁয়ালি! বিশু কোনো কথা না বলিয়া নিঃশব্দে খাইতে বসিল।

বিশুর বুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছিল! তবু রাত্রে দাওয়ায় বসিয়া আকাশের পানে সে চাহিয়া রহিল। আকাশে রাশি রাশি নক্ষত্র—নীরবে তার পানে চাহিয়া আছে। চোখে ঘুমের চিহ্ন নাই। ঐ

নক্ষত্রগুলার পানে চাহিয়া বিশু ভাবিতেছিল, তার নিজের কথা।। এখানে এই যে পরম আরামে পড়িয়া আছে···

এক পথিক গান গাহিয়া পথে চলিয়াছে। সে গাহিতেছিল —

আমার ময়া গাঙ্গে বাণ ডেকেছে,
হাসির কমল জলে ভাসে!

সেই যাত্রার দলের গান!·· সহসা বিশুর মনে হইল, তার জীবনের কথাই যেন ও-গানে লেখা!···তার নির্জীব চিত্ত এখানে জাগিয়া উঠিয়াছে, সত্য! মনে সহস্র সাধ-আশা দেখা দিয়াছে! শুধু তাই নয়! ভালো কাপড়-চোপড় পরিবার বাসনাও মনে জাগিয়াছে! —এ চিত্ত-বিলাস ঐ কৈলাসীর আদরে-যত্নে!···

তাকে এত নিষেধ করে—নেশা ভাঙ্গ করিস্ নে—তবু কি তার মন!···কিন্তু এ-যত্ন কেন করে কৈলাসী? তাড়াইয়া দেয়, আবার চলিয়া গেলেও থাকিতে বলে! তবে কি···? কিন্তু ছি-ছি! নেশার খেয়ালে কি এ সব নোঙ্‌রা কথা সে কহিতে গেল? কৈলাসীর হাবে-ভাবে-আচরণে এমন বিশ্রী ইঙ্গিত কোথাও নাই! লজ্জায় ধিক্কারে সে এতটুকু হইয়া গেল।

শেষে মনে হইল—না, এবার কৈলাসীর কথা সে রাখিবে—এখান হইতে চলিয়াই যাইবে। সত্যই তো, যা-তা কথা বলিয়া কৈলাসীর সে অপমান করিয়াছে! এ অপমান অত্যন্ত গর্হিত! কৈলাসী নারী! নারীর পক্ষে সব-চেয়ে যা লজ্জার কথা, অপমানের কথা···

চিন্তার বিরাম নাই! সে যেন পাগল হইবে!

চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাইবার বাসনায় সে ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। শুইবামাত্র নিদ্রা···

নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিল, বসন্তের মাধুরীতে ভুনিয়া ভরিয়া উঠিয়াছে! প্রথম যৌবনের রঙীন আভায় সে মাধুরী আরো উজ্জ্বল, আরো অপূর্ব্ব!···ঘর-সংসার—সারাদিন পরিশ্রম করিয়া সে যেন ঘরে ফিরিয়াছে! আর কৈলাসী? স্নেহে, যত্নে, সোহাগে বিশুর সকল শ্রান্তি হরণ করিতেছে! শ্রান্ত শিরে কৈলাসীর হাতের স্পর্শ···

সারা দেহ কাঁপিয়া উঠিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কৈলাসী সত্যই তার কাছে দাঁড়াইয়া। তার মাথায় কৈলাসীর হাত! সে চক্ষু মুদিল!—বড় ভালো লাগিতেছিল। সে জাগিয়াছে বুঝিলে যদি কৈলাসী চলিয়া যায়? যদি ভর্ৎসনা করে?···

কৈলাসী একটা নিশ্বাস ফেলিল। বিশুর মন সে নিশ্বাসের স্পর্শে বিচলিত হইল। সজোরে সে কৈলাসীর হাতখানা চাপিয়া ধরিল, কহিল—কে?

কথার সঙ্গে সঙ্গে বিশু উঠিয়া বসিল। কহিল—তুমি! এ ঘরে?

কৈলাসী কহিল—কেমন আছো, দেখতে এসেচি।

—ভালো আছি।

—তাই দেখচি।

কৈলাসী চলিয়া গেল। বিশু ভূতের মত বসিয়া রহিল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিল। বেলা হইয়া গিয়াছে। কৈলাসী বাড়ী নাই।

মুখ-হাত ধুইয়া বিশু তেমনি বসিয়া রহিল।

কৈলাসী ফিরিয়া তাকে দেখিয়া কহিল—চলে যাও নি এখনো?

বিশুর বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। সে কহিল,—এবার যাবো···

—হাঁা, যাও। পাড়ায় আমার মুখ দেখানো ভার হয়েচে! ছি ছি ছি!—বুড়ো বয়সে এ কি মিথ্যা কলঙ্ক!

বিশু ভাবিল, জিজ্ঞাসা করে, যদি তাড়াইয়া দিবে তো কাল রাত্রে মাথায় হাতের পরশ দিতে গিয়াছিলে কেন? কিন্তু এ প্রশ্ন করা হইল না। কৈলাসী দাঁড়াইল না—নিজের হাতে খড়-বিচুলির ঝুড়ি লইয়া গোয়ালে গিয়া ঢুকিল।···

বিশু ভাবিল, না, তার নিজের মনও চঞ্চল হইয়াছে। যে-বাসনা তাকে আজ নূতন নেশায় মাতাইয়া তুলিয়াছে···

না! এ-মন লইয়া এখানে আর পড়িয়া থাকা চলে না।

সে উঠিল; উঠিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

কৈলাসী তখনি ফিরিল। দাওয়ায় বিশু নাই। চারিদিকে চাহিয়া কৈলাসী ডাকিল—বিশু···

কোন উত্তর নাই। দ্বারে আসিয়া কৈলাসী দাঁড়াইল। ঐ যে······দূরে টলিতে টলিতে পথে চলিয়াছে—···বিশু না?

বিশুই! পায়ে সেই তালি-মারা চটি···ধূলা উড়িতেছে! গায়ে সেই জীর্ণ জামা, পরণে সেই কাপড়—যে-কাপড়-জামা পরিয়া এখানে আসিয়াছিল। কৈলাসী তাকে নূতন জামা-কাপড় কিনিয়া দিয়াছে—সে-সব ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীর চেহারা নিমেষে যেন বদলাইয়া গেল··· বসন্তের শ্যামল-শ্রী চকিতে শীতের কুহেলিকার স্পর্শে ঝরিয়া দুনিয়াকে মুহূর্তে বিবর্ণ করিয়া দিয়াছে! তার চোখের পিছনে জল ঠেলিয়া আসিল।

কৈলাসী আসিয়া দাওয়ায় মুখ গুঁজিয়া পড়িল। যে দুঃখ-বেদনা বহু দিন ভুলিয়াছিল, সে-বেদনা আবার আজ তাকে পিষিয়া মারিবে বলিয়া যেন পাহাড়ের বোঝা বহিয়া আনিয়াছে!···

লক্ষ্মীর মা আসিল; ডাকিল—কৈলেস···

গাঢ় স্বরে কৈলাসী কহিল—কেন?

—দু'সের দুধ দিতে পারিস ভাই?

—না···

লক্ষ্মীর মা অবাক! সে কহিল—মর্! কাঁদচিস্ না কি?

—না। বলিয়া কৈলাসী উঠিয়া বসিল।

—তবে?

—মাথাটা ভারী ধরে আছে!

কৈলাসীর পরণে সেই রঙ-করা শাড়ী। লক্ষ্মীর মা কহিল — সে-ছোঁড়াকে পথে দেখলুম। কোথায় গেল?

কৈলাসী রাগ করিল না; কহিল—বাড়ী গেছে।

—হঠাৎ?

কৈলাসী কহিল—যাবে না বাড়ী? আমার জন্ত তো সব ত্যাগ করতে পারে না! কে আমি?

—তা বটে! ··· তবে তোর খুব বাধ্য — না?

কৈলাসী কহিল,—হাঁ।

লক্ষ্মীর মা হাসিল—বাঁকা হাসি! যে-হাসিতে সারা দেহ-মন অশুচি হইয়া ওঠে!

কৈলাসী তাহা দেখিল, দেখিয়া রাগ করিল না।

যে যা বোঝে, বুঝুক! ইহার সঙ্গে তাহা লইয়া কি তর্ক করিবে?

তার শুধু মনে হইতেছিল, বেচারা, অসহায় বিশু!

চোখের কোলে জল তাই ছাপাইয়া আসিতেছিল।

লক্ষ্মীর মা এ মৌনতার যে-অর্থ বুঝিল, তাহাতে সে আবার হাসিল। কহিল—তাহলে সত্যি? লোকে যা বলে ···?

কৈলাসী এ কথার অর্থ বুঝিল—তার সারা অঙ্গ লজ্জায় রী-রী করিয়া উঠিল। কিন্তু এ কথার কোনো প্রতিবাদ করিল না — লক্ষ্মীর মাকে তিরস্কারও করিল না! যে-অপবাদে বিশুকে তাড়াইয়াছে, চুপ করিয়া থাকিয়া নিজে হইতে সে-অপবাদ মাথায় তুলিয়া লইল।

বুদ্ধের মুখ-শ্রী

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

রূপসৃষ্টির রাজ্যে জগতের ইতিহাসে বারবার নানা সমস্যা উপস্থিত হয়েছে। শুধু কয়েকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংযোগে — কিম্বা চক্ষুকর্ণাদি কয়েকটা ইন্দ্রিয়ের প্রতিরূপ রচনায় একটা মূর্ত্তি সুষ্ঠুভাবে রচিত হয় না। জড়জগতের অন্তস্তলে আছে বিরাট মনোজগৎ—সে জগতের অসংখ্য তরঙ্গ ও বুদ্‌বুদ্ উদ্ভাসিত হয় মানুষের মাংসজ বা ইন্দ্রিয়জ দেহে—যা'তে করে মানুষ নিজের আন্তরবার্ত্তা প্রতি মুহূর্ত্তে বিশ্বের নিকট নিবেদন করছে। এজন্য দেহের ভিতর দিয়ে দেহাতীতের প্রকাশ সম্ভব হয়—মানস-হিল্লোল সুপ্রকাশ সম্ভব হয় শরীরের নানা অবয়বের ভিতর দিয়ে। যে সমস্ত সভ্যতা অন্তরজগৎ সম্বন্ধে বিশেষ বোঝাপড়া করে নি —তারা শুধু শরীরের কমনীয়তা বা সুগঠন লক্ষ্য করে' তৃপ্ত হয়েছে—প্রত্যক্ষের ভিতর দিয়ে অপ্রত্যক্ষের বার্ত্তাকে বিকশিত করার চেষ্টা তা'দের পক্ষে সম্ভব হয় নি। গ্রীক-শিল্পে মূর্ত্তির মুখ-শ্রীর ভিতর দিয়ে বৈচিত্র্য উদ্‌ঘাটনের সফল চেষ্টা হয় নি—কোন লেখকের মতে গ্রীকেরা মনে করত "face is only a part of the body"—মুখের কোন বিশিষ্ট দাবী ভাস্করের নিকট প্রতিভাত হয় নি। এজন্যই রাস্‌কিন (Ruskin) বলেছিলেন — "A Greek never expresses a personal character and never expresses a momentary passion." অর্থাৎ মনোজগতের সূক্ষ্ম হিল্লোল বিশ্লেষণের কোন চেষ্টা গ্রীক-শিল্পে নেই। এজন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যের চেষ্টা থাকলেও মুখ-শ্রীর বৈচিত্র্য এ ক্ষেত্রে দুর্লভ ছিল—"a hero was any hero, a god any god, the distinction was effected by the symbol."

কাজেই যারা গ্রীক-সভ্যতার উত্তরাধিকারী তারা ভারতীয় মূর্ত্তি-কলার মৌলিক তত্ত্ব মোটেই উপলব্ধি করতে পারে নি। জগতের ইতিহাসে ভারতবর্ষেই মনস্তত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা প্রথম আরম্ভ হয়। বৌদ্ধ-ভাবুকগণই জগতের প্রথম ও প্রধান মনস্তাত্ত্বিক (Psychologists)। হিন্দু-দর্শন স্থূলজগতের পশ্চাতে একটা বিরাট সূক্ষ্মজগৎ কল্পনা ও বিশ্লেষণ করেছে—সে জগতের বার্ত্তাকে দেহ-সীমার মাঝে উদ্‌ঘাটন করাই ভাবুকদের পরমার্থ হয়েছিল। এ শ্রেণীর চেষ্টা নানা মূর্ত্তি-সৃষ্টিতে প্রকাশ পায়—কিন্তু বুদ্ধমূর্ত্তি যে বিরাট জগতের প্রতিভূ—সে জগৎ সম্বন্ধে বোঝাপড়া না থাকাতে এ মূর্ত্তিটির সামনে উপস্থিত হ'য়ে ইউরোপ একেবারে বিমূঢ় হয়ে যায়।

সারনাথের বুদ্ধমূর্ত্তি

খ্রীষ্টমূর্ত্তি যে তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করে — বুদ্ধমূর্ত্তির নিকট সে তত্ত্ব অতি সামান্য। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাস্থ্য বা দৃঢ়তা — মাংসপেশীর পুষ্ট প্রাচুর্য্য — এসব অতি যৎসামান্য ব্যাপার হয় — যাঁ'রা অন্তরতর লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছে তাদের কাছে। ইউরোপের খ্রীষ্টমূর্ত্তিগুলি প্রায়ই বাইরের বা আকাশের দিকে চেয়ে আছে এরূপ

ভঙ্গীতে রচিত। র‍্যাফেলের Transfiguration-এর খ্রীষ্টমূর্ত্তি বা মাইকেল এঞ্জেলোর মাংসপেশীবহুল খ্রীষ্টমূর্ত্তির দৃষ্টি বাইরের দিকে; ভারতের বুদ্ধমূর্ত্তির দৃষ্টি ভিতরের দিকে—অন্তরজগতের দিকে—আকাশের দিকে নয়। কোন সাধনায় পরমতত্ত্ব হচ্ছে বাইরের জিনিষ—অন্য সাধনায় তা' ভিতরের ব্যাপার। যেখানে তা' আত্মস্থ জ্যোতির সন্ধানে পরিণত হয় সেখানে মূর্ত্তিকে চিদানন্দের আলোকেই রচনা করতে হয়।

বস্তুতঃ বুদ্ধমূর্ত্তি জগতের ইতিহাসে একটা সমস্যা উপস্থিত করে। এ-মূর্ত্তি ইউরোপের নিকট একটা দুর্ব্বোধ্য ব্যাপাররূপে পরিণত হয় এবং তা'তে করে' যতটা জটিল তর্ক-বিতর্কের সূচনা হয়েছিল জগতের কোন মূর্ত্তি সম্বন্ধে সেরকম কোনকালে হয় নি। সেকালে প্রাচ্য আর্টের সঙ্গে পশ্চিমের পরিচয় হয় নি, কাজেই সমালোচকগণ ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে' দুর্বাক্য ব্যবহার করতে ছাড়েন নি। Sir George Birdwood ভারতীয় রূপকলার একজন সমজদার বলে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মতে বুদ্ধের মুখে কোনরকম "শ্রী" থাকা ত' দূরের কথা—বুদ্ধের মুখে কোনরকম ধর্ম্মই নেই — কোন একটা পিষ্টক যেমন একটা জড়স্তূপ — বুদ্ধের মুখ তা'র চেয়ে বেশী কোন রকম ব্যাপার নয়। তাঁর ভাষা উদ্ধৃত করি—"The senseless similitude by its immemorial fixed pose, is nothing more than an uninspired brazen image vacuously squinting down its nose to its thumbs, knees and toes. A boiled suet pudding would seem equally well as a symbol of passionate purity and serenity of soul."*

অনেক কাল হ'তে ইউরোপীয় আলোচকেরা যে মনের কথাটি গোপন রেখেছিলেন — বার্ডউড সাহেব সে কথাটি স্পষ্ট করেই এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন। বলা বাহুল্য এ মন্তব্যটি এত বীভৎসভাবে ভ্রান্ত যে, ইউরোপের অনেক শিল্পী ও শিল্পরসজ্ঞেরা ভেবে দেখ্‌লেন, পশ্চিমের পক্ষে এরকমের একটা মন্তব্য সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করা অসম্ভব। বুদ্ধমূর্ত্তির সূক্ষ্ম নির্দ্দেশ তাঁদের কাছে স্পষ্ট না হ'তে পারে কিন্তু মূর্ত্তিটির প্রসন্ন প্রকাশধর্ম্ম যে একেবারে অস্বীকার করা যায় না একথা নিঃসন্দেহ; অন্ততঃ মূর্ত্তিটি যে suet pudding-এর চেয়ে একটু উচ্চতর সৃষ্টি একথা না বললে প্রতীচ্যদেশের পক্ষে একান্ত অমার্জ্জনীয় অপরাধ হবে। তাই তের জন রসবিদ্‌ Times পত্রে একটা প্রতিবাদ প্রকাশ কর্‌লেন†। তাতে এই উক্তিটি ছিল—"We, the undersigned artists, critics and students of art, find in the best art of India, a lofty and adequate expression of the religious emotion of the people and of these deepest thoughts on the subject of divine. We recognise in the Buddha type of sacred figure, one of the great artistic inspirations of the world."

যে সমস্ত শিল্পীরা এ প্রতিবাদ করেন তাঁরা নব্য-মতের পোষক ছিলেন এবং প্রাচ্য কলা বিশেষতঃ জাপানী ও চৈনিক কলা তাঁদের কাছে প্রাচ্য শিল্পের দ্বারও কতকটা উদ্ঘাটিত করেছিল। ধীরে ধীরে এ শ্রেণীর মতের পরিবর্ত্তন ঘটে। বিখ্যাত রসতাত্ত্বিক Roger Fry বলেন—"The European mind gradually prepared to accept the methods of oriental design and with that preparation has come an immense increase in its accessibility."

বলা প্রয়োজন এই প্রতিবাদেও বুদ্ধের মুখ-শ্রীর রসবস্তু হৃদয়ঙ্গমের পথ যে বিশেষ উন্মুক্ত হয়েছিল তা' নয়। উপরোক্ত রসিকগণ বুদ্ধমূর্ত্তি সম্পর্কে শিল্পগত উৎকর্ষতার (artistic inspiration) কথাই বলেছেন। শুধু হস্তনৈপুণ্য, পারিপাট্য বা তক্ষণধর্ম্ম সম্বন্ধে উচ্চমত পোষণ করা এ ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত নয়। সকল দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা এই উৎকর্ষতা উদ্ঘাটনে পশ্চাদ্‌পদ নয়—তা' বলে মিশরীয় মূর্ত্তি খেফ্রা'র বা মধ্যযুগের খ্রীষ্টের

* J. R. A. S. of Arts—Feb 4, 1910.

† The Times, Feb 28, 1910.

যা' প্রতিপাদ্য, ভারতীয় বুদ্ধের মূর্ত্তি তা' নয়। এ তিনটি মূর্ত্তি তিনটি স্তরের তিনটি জগৎকে প্রতিফলিত করছে যদিও সব ক্ষেত্রেই শিল্পীরা প্রচুর নৈপুণ্য দেখিয়েছে। কাজেই শিল্পনৈপুণ্য সম্বন্ধে বাহবা দিলেই মূর্ত্তিটির সম্যক্‌ভাবে বিচার করা হয় না।

বস্তুতঃ ইউরোপ যখনই বুদ্ধমূর্ত্তি বা বুদ্ধের মুখ-শ্রী আলোচনা করতে গেছে, তখনই একদেশদর্শী হয়ে পড়েছে। এরূপ প্রশান্ত, আত্মসমাহিত আনন-শ্রী

বুদ্ধমূর্ত্তি—অজান্তা

জগতের তক্ষণকলার ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। এ জন্য কখনও বা দুর্বুদ্ধিবশতঃ মূর্ত্তিটিকে মাংসপিণ্ড বলে' তিরস্কার করেছে এবং পরবর্ত্তী যুগে যখন এ মূর্ত্তির একটা সুষ্ঠু বিস্ময় স্বীকৃতি সম্ভব হয়েছিল তখন ও মূর্ত্তিটা ভারতের দান নয় বলে একবার ঘোষণা করতে ইউরোপ ইতস্ততঃ করে নি। এ কাজের অগ্রণী হলেন ইংরাজ নয়, ফরাসী। ফরাসী মনীষী ফুসে (M. Fouche) গবেষণার একটা কর্দমাক্ত আবর্ত্ত সৃষ্টি করে' বললেন, বুদ্ধমূর্ত্তি গ্রীক শিল্পীর দান, ভারতের নয়*। জগতে বুদ্ধদেব একটা সর্ব্বজনবন্দনীয় স্থান অধিকার করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কাজেই বুদ্ধ মূর্ত্তি রচনায় একটা গৌরব আছে—বুদ্ধের মুখ-শ্রী তক্ষণে একটা বাহাদুরী আছে—যা' হ'তে ইউরোপ বঞ্চিত হ'তে চায় না। পশ্চিম এ যশটি আহরণ করতে এলো পশ্চাৎ-দ্বার (back-door) দিয়ে; কিন্তু যে সমস্ত রচনাকে এ চতুরতার প্রতিভূ বলে' দাঁড় করালে সেগুলি অতি দুর্ব্বল, যৎসামান্য এমন কি আত্মবিরোধী সৃষ্টি। বস্তুতঃ সে কৃতিত্বও সত্যিকারভাবে পশ্চিমের নয়। ফুসে (Fouche) ফরাসী দেশের পণ্ডিতগণের এক সভায় বললেন, গ্রীস জগৎকে দু'টি মূর্ত্তি দান করেছে যে জন্য ইউরোপ গর্ব্বিত হ'তে পারে; একটি হচ্ছে খ্রীষ্টমূর্ত্তি—দ্বিতীয়টি হচ্ছে বুদ্ধমূর্ত্তি। বলা বাহুল্য এ দু'টি মূর্ত্তিই দু'টি পরিহাস—গ্রীক শীলতার (culture) পক্ষে খ্রীষ্টের মর্ম্মগ্রহণ যেমন অসম্ভব তেমনি বুদ্ধের জটিল-তত্ত্ব বোঝাও অকল্পনীয়—কাজেই দু'টি ক্ষেত্রেই দানটি জগতের ইতিহাসে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

ভারতীয় মূর্ত্তি সম্বন্ধে 'ফুসে'র মন্তব্য গান্ধার-শিল্পকেই লক্ষ্য করেছে। এ শিল্পটি সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদের পরে এটুকু স্বীকৃত হয়েছে যে, এটা একটা নি[illegible] শ্রেণীর চেষ্টা—আদিম গ্রীক বা রোম্যান আর্টের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, এমন কোন সম্পদ গান্ধার সৃষ্টিতে নেই। ভারতের রূপকলার ইতিহাসে এসব মূর্ত্তি সাময়িকভাবেও স্থান পেতে পারে কিনা সন্দেহ, কারণ গান্ধার-মূর্ত্তিগুলির ইতিহাস মধ্যএসিয়ার সহিত যুক্ত এবং এ মূর্ত্তিগুলির প্রভাবও ভারতবর্ষে মোটেই স্থায়ী হ'তে পারে নি। Indo-Scythian রাজাগুলি বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করে বুদ্ধের মূর্ত্তি তৈরীর ফরমায়েস করে—[illegible] ফরমায়েস পূর্ণ করে গ্রীকো-রোম্যান ভাড়াটে কারিগর এ উভয় সম্পর্কে জন্ম হয় এই সঙ্করকলার। বলা[illegible] বাহুল্য বহু চেষ্টায়ও মহাপুরুষলক্ষণাদি সংহত করে [illegible] শিল্পীরা এ সমস্ত মূর্ত্তিতে ভারতীয় রস-শ্রী দান করতে

* Beginnings of Buddhist Art.

পারে নি। প্রত্যেকটি মূর্ত্তিই কোন না কোন গ্রীক দেবতার ভঙ্গী পেয়ে বসেছে। বস্তুতঃ এ সমস্ত হেলেনিষ্টিক শিল্পীদের অভিজ্ঞতাই নিবদ্ধ ছিল কতকগুলি গ্রীক বা রোমক মূর্ত্তির সম্বন্ধে—সে মূর্ত্তিগুলোকে একবার বুদ্ধের চেহারায় পরিণত করা হ'ল ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম সম্পর্কে এবং খ্রীষ্টের মূর্ত্তিতে পরিণত করা হল ইউরোপের ধর্ম্মব্যবস্থায়। এ সমস্ত রচনা, সকল শীলতার (culture) পক্ষেই লজ্জার ব্যাপার। পশ্চিমে খ্রীষ্টমূর্ত্তি রচনার উপাদান ছিল Apollo মূর্ত্তি—মেমবাংক খ্রীষ্টমূর্ত্তিতে তা' সুপ্রকাশ হয়; এদেশেও Apollo মূর্ত্তিকে আদর্শ (model)

বুদ্ধমূর্ত্তি—গান্ধার

ক'রে রচনা করা হয় বুদ্ধমূর্ত্তি। কোন ভাবুক বলেন—"It is a thoroughly hybrid art in which provincial Roman forms are adapted to the purposes of Indian imagery."*

বুদ্ধের মুখ-শ্রী আলোচনা প্রসঙ্গে এ ব্যাপার আলোচনা আংশিকভাবে অবশ্যম্ভাবী—কারণ, ধর্ম্মগ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুসারে একটা পুষ্ট অবয়বপূর্ণ মানব-শরীর রচনা করলেই তা' বুদ্ধমূর্ত্তির দ্যোতক ব্যাপার হয়ে পড়ে না। যে রোমক শিল্পের উপাদানে এ সমস্ত জটিল মনস্তত্বের সূক্ষ্ম প্রতিভাস-পূর্ণ মূর্ত্তি রচনার চেষ্টা হয়েছে, সে শিল্প যে একেবারে ধর্ম্মবিধি হ'তে মুক্ত একথা অনেকেরই জানা নেই। রোমক শীলতায় (culture) ধর্ম্মের স্থান অতি যৎসামান্যই ছিল—রোমক দেবতার মূর্ত্তিগুলি রচিত হ'য়েছিল নগরের শোভাবর্দ্ধনের জন্য—ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য নয়। রোম বাইরের সৌন্দর্য্যের জন্যই এ সমস্ত মূর্ত্তিকে নিজের ইতিহাসে স্থান দেয়—ভিতরের কোন নিগূঢ় ভাবতত্ত্বের জন্য নয়। ইটালীয় বিখ্যাত অধ্যাপক Dela Setta বলেন—"It was impossible in Roman art to create the figure of a god there was no tradition for religious representation....The Roman people had no feeling for religious art, they only saw its decorative use. The Romans no longer felt what these figures stood for but appreciated the outside form only."†

এরূপ অবস্থায় এ রকমের আদর্শে ভগবান বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিরচনা ধৃষ্টতা মাত্র। গ্রীকশিল্পসম্বন্ধেও এ রকমের কথা খাটে না বটে, কারণ গ্রীকজাতি ধর্ম্মবিরোধী ছিল না। কিন্তু বলা হয়েছে গ্রীকমূর্ত্তিতে মুখশ্রীর কোন বিশেষত্ব উদ্ঘাটন মুখ্য ব্যাপার ছিল না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চলন্ত নানা অবস্থাকে উপস্থাপিত করেছে এ শিল্প সন্দেহ নেই—কিন্তু মনোজগতের গতিভঙ্গকে মুখ-শ্রীতে দ্যোতিত করতে একান্তভাবে অক্ষম হয়েছে। আধুনিক মূর্ত্তি-কলা বিষয়ে প্রামাণ্য মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁদের ভিতর অন্যতম বলেন—"The power of showing in the countenance a certain state of mind was absent from Greek art for nearly the whole of the fifth century...Greek art for the period considered the human countenance merely a part of the body which had no more right than the rest to special attention. The artist tried to perfect the form of the head just in the same degree as he tried

* Coomarswamy.

† Religion and Art.

to give ideal rendering of the form of the foot, the arm or the thorax."*

বল্‌তে কি পরবর্ত্তী শতাব্দীতেও দু'টিমাত্র রীতি সৃষ্টি করা গ্রীসীয় আর্টের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল; একটা হচ্ছে অতি মৃদু ও তরল ভাবনার দ্যোতক এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে যন্ত্রণামূলক হিংস্রতার। হেলেনিষ্টিক আর্ট বহু সাধনাদ্বারাও মানসিক অবস্থার সঙ্গে শরীরের বা মুখের সঙ্গতি সম্পাদন করতে পারে নি।
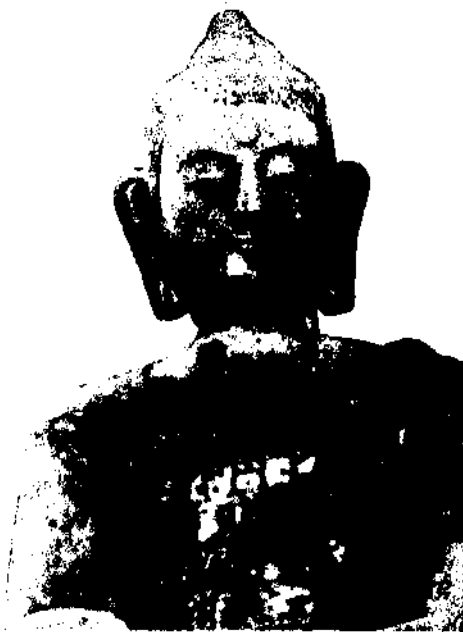
বুদ্ধমূর্ত্তি—নেপাল

ভারতের শিল্পীরা প্রাথমিক অবস্থায় বুদ্ধের মূর্ত্তি রচনায় কুণ্ঠা প্রকাশ করেছে। যে মূর্ত্তি বৌদ্ধ-সাধনার মুকুটমণি—যে মূর্ত্তি সমগ্র বৌদ্ধতত্ত্বের দ্যোতক এবং সে বিষয়ে চরম বাণী তা'কে সফল ভাবে উপস্থিত করার সামর্থ্য কোন শিল্পীর পক্ষে কল্পনা করা সুলভ নয়,—শ্রদ্ধাবান্ সাধক সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিকে মর্ম্মরীভূত করতে তাই সাহসী হয় নি। বস্তুতঃ বুদ্ধমূর্ত্তি রচনা সে জন্য নিষিদ্ধও ছিল। এজন্য প্রাচীন ভারতের তক্ষণ-কলায় বুদ্ধের জীবন-বৃত্তান্তের সমস্ত ঘটনা খোদিত আছে কিন্তু বুদ্ধের স্থানটি শূন্য রাখা হয়েছে। এর মানে সেকালের শিল্পীরা বুদ্ধমূর্ত্তি রচনা করতে সক্ষম হয় নি এরূপ বোঝায় না—কারণ সকল রকমের চেহারাই শিল্পীরা খোদিত করেছে; এ ব্যাপারের শুধু এ রকম মানে হওয়াই সম্ভব যে, ভগবান তথাগতকে স্থূলভাবে রচনা করার স্পর্দ্ধা ভক্ত-শিল্পীরা করে নি। বস্তুতঃ ভারতীয় রস-সৃষ্টি-তত্ত্বে প্রত্যক্ষ বা স্থূলভাবে রসবস্তুকে উপস্থাপিত করাও এদেশের অনুমোদিত ছিল না। ভারতীয় ধ্বনিবাদ পরোক্ষভাবে অর্থাৎ suggestion-এর ভিতর দিয়া কোন প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রতিফলন করার পক্ষপাতী ছিল—প্রত্যক্ষভাবে নয়; রসগ্রন্থাদিতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

যে সঙ্কোচ ভারতীয় শিল্পীদের ছিল—পশ্চিমের ভাড়াটে শিল্পীদের তা' ছিল না। তাদের যে কয়েকটা মূর্ত্তি রচনায় হাতে-খড়ি হয়েছিল তা' দিয়েই তা'রা দুনিয়ার সব মূর্ত্তি রচনায় অগ্রসর হ'তে প্রস্তুত ছিল—রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে; ফলে মধ্য-এসিয়ার ইতিহাসে এল কয়েকটা নকল বুদ্ধের মূর্ত্তি। বলা প্রয়োজন দু'এক শতাব্দীর ভিতরই এসব মূর্ত্তির আদর্শ ভারতে একেবারে লুপ্ত হ'ল। ভারতীয় শিল্পীরা যখন প্রাথমিক সঙ্কোচ ত্যাগ করে বুদ্ধমূর্ত্তি রচনায় অগ্রসর হ'ল তখন ভারতে একটা নবযুগ এসে পড়ল। সৌন্দর্য্যের একটা প্রবল ঝড় বয়ে' গেল দিক্ হতে দিগন্তরে। ওদিকে হীনযান বৌদ্ধধর্ম্মের সীমা অতিক্রম করে' এল মহাযানের বিজয় যাত্রা—অসংখ্য মূর্ত্তি ও বিগ্রহ বুদ্ধকে মধ্যমণি করে' রচিত হ'তে লাগল।

খ্রীষ্ট-পরবর্ত্তী প্রথম শতাব্দীতে কনিষ্কের পরিষদে দু'টি বিভাগের সূচনা হ'ল। উত্তর বিভাগে তিব্বত, সিকিম, ভোট প্রদেশ, নেপাল, চীন ও জাপান প্রভৃতি; দক্ষিণ বিভাগে লঙ্কাদ্বীপ, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ। এদু'টি বিভাগে যথাক্রমে মহাযান ও হীনযান-পন্থীদের বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সাধনের সূচনা হ'ল। অশ্বঘোষের রচনা এবং বিশেষভাবে নাগার্জ্জুনের ব্যাখ্যা বুদ্ধজগতে একটা প্রবল

* Dela Setta.

উপস্থিত করলে। নাগার্জ্জুন মহাযানবাদকেই শাস্ত্র-সম্মত বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে প্রজ্ঞাপারমিতাগ্রন্থ এ সম্বন্ধে প্রামাণ্য পুস্তক—যাকে বহুকাল গুপ্ত অবস্থায় রাখা হয়। এমনি করে' একটা নূতন বুদ্ধ-জগৎ সমগ্র এসিয়ায় পরিব্যাপ্ত হ'ল—তাতে করে' সৃষ্টি হ'ল অসংখ্য বুদ্ধ; এক অখণ্ড বুদ্ধ হ'তে উৎসারিত হ'ল পঞ্চবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি। মূলতঃ একই তত্ত্বের প্রতিরূপক হয়ে দাঁড়াল এই বিচিত্র বহুত্ববাদ। ফলে

বুদ্ধমূর্ত্তি—ব্রহ্মদেশ

রূপজগতে এল এক আনন্দের তোলপাড়—শিল্পীরা বৈচিত্র্যের নিভৃত অঙ্কে নব নব সাধনায় অগ্রসর হ'ল।

মহাবজ্রভৈরবতন্ত্রে আছে শিল্পীরা কাজ করবে রজত মুদ্রার লোভে নয়—তাঁকে সাধু হ'তে হবে, অচঞ্চল হওয়াও তার একটি বিশেষ গুণ; বিশেষতঃ তা'কে হ'তে হবে আসক্তিহীন—এবং সে রচনা করবে ভক্তের সান্নিধ্যে। তাই ভারতীয় শিল্পীরা যখন বুদ্ধমূর্ত্তি রচনা আরম্ভ করল তখন এল অপূর্ব্ব রসসমাবেশ, ভাবোচ্ছ্বাসের অলৌকিক ব্যঞ্জনা; যা'তে করে বুদ্ধমূর্ত্তি শিল্পজগতের একটা অপরাজেয় কীর্ত্তি হয়ে পড়্‌ল, সে সৃষ্টি হ'ল গুপ্ত-যুগে এবং তার পরবর্ত্তী সময়ে। হীনযান-পন্থীদের দেশেও বুদ্ধ এক অপূর্ব্ব শোভা লাভ করল—মহাযান-পন্থীরাও বুদ্ধের অপরূপ রূপসম্ভার সৃষ্টি করে' সমগ্র প্রাচ্য ভূমিতে একটা আন্দোলন উপস্থিত করল।

বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যেমন একটা অস্পষ্ট ভাবাবর্ত্ত সাধারণের ভিতর বর্ত্তমান—সেরকম একটা অজ্ঞতা বুদ্ধমূর্ত্তি সম্বন্ধেও চলে এসেছে। প্রাথমিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মুখর তিরস্কার এবং পরবর্ত্তীদের সামান্য পরিমাণে এ সম্বন্ধে মতের পরিবর্ত্তন এ মূর্ত্তির বাণী অধ্যয়নে পর্য্যাপ্ত হয় নি। বলা প্রয়োজন ইউরোপের ভাবজগতে বার বার পটপরিবর্ত্তন হয়—কখনও বা ইউরোপ মিশর-শিল্প নিয়ে মশ্‌গুল—কখনও বা পারস্য-আর্ট নিয়ে বিভোর—কখনও বা নিগ্রো-আর্ট নিয়ে আত্মহারা হয়ে যায়। প্রশংসা করতেও ইদানীং ইউরোপের আটকায় না এবং কিছুকাল পরে—Andrew Lang-এর ভাষায়—কাপড়-চোপড়ের ফ্যাসনের মত সে মতকে ত্যাগ করতেও ইউরোপ ইতস্ততঃ করে না। মাঝে একশ্রেণীর রসিক দেখা দিল যারা ভারতীয় আর্টকে বাহবা দিয়ে এদেশের ভক্তি অর্জ্জন করতে প্রয়াস পেল। ভারতের ধর্ম্মের উপর মুরুব্বিয়ানা ক'রে অনেকে এদেশে করতালি পেয়েছে; এবার ভারতের রূপকলার সম্পর্কে স্বস্তিবাচন করে' এ ক্ষেত্রে এদেশের পুরোহিত পদে বৃত হ'তে প্রলুব্ধ হ'ল। ফলে তারা এমন এক ব্যাখ্যা দিতে সুরু করল—বস্তুতঃ যা'র কোন ভিত্তি নেই এবং শাস্ত্রতঃ যার কোন সমর্থন নেই। যারা এদেশের প্রাচীন সাহিত্য ও সাধনাতত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, তারাই হ'ল এদেশের দেবরূপ-রচনার ডমরুবাদক। তারা বুদ্ধমূর্ত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে বলল, এটা এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক মূর্ত্তি—আত্মার একটা অপূর্ব্ব অবস্থার দ্যোতক—যে অবস্থা জড় অবস্থার অতীত; এক কথায় এটা একটা transcendental বা অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তি। কথাটা শোনায় ভাল—ভারতবর্ষীয়েরা নিজকে

কেউ আধ্যাত্মিক বল্‌তে তৃপ্তি বোধ করে—এটা এদেশের একটা চিরন্তন দুর্বলতা। বলা প্রয়োজন, ভারতে শুধু যে অধ্যাত্মতত্ত্বের বিশিষ্টতা ঘটেছে একথা মিছে—এ দেশে রূপ-রস-গন্ধ-জগতের চর্চাও সামান্য হয় নি। কূট্‌ রাষ্ট্রনীতি, ব্যবহারনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, চৌষট্টিকলা ইত্যাদি নানা ভোগমূলক শাস্ত্রের এত সুনিপুণ ও সূক্ষ্ম আলোচনা হয়েছে যে, অন্য কোন দেশে তা' সম্ভব হয় নি। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষ লোকায়ত-তত্ত্বের কোন কোন দিক্‌ যে উদ্ভাসিত করতে অক্ষম, এরকম একটা বিশ্বাস সেকালে থাক্‌লেও একালে কৌটিল্যের অর্থনীতি ইত্যাদি গ্রন্থাদি আবিষ্কারের পর থাকা আর উচিত নয়। এজন্য এদেশ শুধু অধ্যাত্ম-বিদ্যায় পটু, অন্য বিদ্যায় মূঢ়—এরকম একটা ধারণা দূর হওয়া ভাল। বস্তুতঃ এখানকার অধ্যাত্ম অরূপতত্ত্বও ভৌতিক রূপতত্ত্বের উপর নির্ভর—দু'টিই অঙ্গাঙ্গী।

দেবমূর্তি সম্বন্ধে অধ্যাত্ম-মহিমা আরোপ করা বাহুল্য ও প্রমাদপূর্ণ। শিবের মূর্তি বা বিষ্ণুর মূর্তির নানা বৈচিত্র্য সম্বন্ধেও এরূপ উক্তি অমার্জনীয়, কারণ দেবতারা মানবের খণ্ডতার অতীত—সে সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত উঠাও অপরাধ। অধ্যাত্ম মানবেরই পূজা ও আরাধনার লক্ষ্য হচ্ছেন দেবতা; দেবতাদের লক্ষণ ভেদে নানা মূর্তির ভিতর মানস বৈচিত্র্যই লক্ষ্য কর্‌বার জিনিষ—যেমন সদাশিব মূর্তি, নটরাজ মূর্তি ইত্যাদিতে নানা মানসিক অবস্থা সূচিত হয়। নচেৎ শিব আধ্যাত্মিক কিম্বা গণেশ আধ্যাত্মিক নয়—দেবতা-সম্বন্ধে এরূপ নির্দেশ ভ্রমপূর্ণ—দেবলোক-সম্বন্ধে সে প্রশ্ন উঠে না।

বুদ্ধমূর্তি সম্পর্কে আলোচনা শুধু মানুষ বুদ্ধের চর্চায় পর্যবসিত হওয়া ভুল—মহাপুরুষ লক্ষণযুক্ত তথাগত ভগবান্‌ বুদ্ধ স্বর্গ ও মর্ত্যের সেতু—ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের মিলন-ভূমি। সেদিক্‌ হ'তে দেবস্থানীয় অনেক মূর্তি সৃষ্টি হয়েছে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে। কিন্তু যে মূর্তিটি মানবদেহের ভিতর দিয়ে স্বপ্রকাশ হয়েছে সে মূর্তিটি কি রকমের এ প্রশ্ন সহজেই উঠে। সে মূর্তিটিতে কোনরকম অস্বাভাবিকতা নেই। খ্রীষ্টমূর্তি রচনায় শিল্পীরা আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার কর্‌বার চেষ্টা করে পশ্চিমে। তারা ভাবে মানুষ মডেল বা আদর্শ রেখে মূর্তি ত' তৈরী হবেই, কারণ, পশ্চিমে তাহাই প্রথা; তার সঙ্গে এমন কিছু যোগ বা বিয়োগ করে দেওয়া হোক্‌ যাতে আধ্যাত্মিকতা ফুটে উঠে। Bible-এ আছে —Flesh is Death, Spirit is Life ইত্যাদি; কাজেই তারা খ্রীষ্টের জীর্ণ, শীর্ণ, চিন্তাপূর্ণ ও মলিন চেহারা সৃষ্টি কর্‌লে, যাতে করে মাংসজ লালিত্য মোটেই থাকে না। এরকমের খ্রীষ্টমূর্তিতে আধ্যাত্মিকতা আরোপ করা ওদেশের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল। ভারতীয় বুদ্ধমূর্তিতে এ রকম কোন শীর্ণ সঙ্কোচ বা জর্জরিত দেহের জয়জয়কার নেই। বুদ্ধমূর্তি পুষ্ট, মাংসল, সুগঠিত, সুশ্রী ও চিত্তহারী। ইন্দ্রিয়জ লালিত্যের দিক্‌ হতেও এ মূর্তির তুলনা পাওয়া কঠিন। আননের সুস্থ প্রসন্নতা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সরল গতিভঙ্গ কোনরকম ঐহিক পঙ্গুত্ব সূচনা করে না যাতে ক'রে একটা পারলৌকিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হ'তে পারে। বস্তুতঃ এদেশ পরলোককে একটা পর্দা-ঢাকা কবরস্থানের বাইরের ভূমি বলে' কখনও মনে করে নি।

বুদ্ধমূর্তির অধ্যাত্মতা সম্বন্ধে সাহেবরা দেশের ধর্মতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব না জেনে যে সার্টিফিকেট দিয়েছেন সে সম্বন্ধে অন্য বক্তব্য হচ্ছে — আত্মার একটা তুরীয় অবস্থার দ্যোতক বলে বুদ্ধমূর্তি যে কৃত্রিম অভিনন্দন পাচ্ছে সে আত্মাকেই বৌদ্ধ-তত্ত্ব স্বীকার করে না। যে 'আত্মা' বা 'আত্ম-তত্ত্ব' বৌদ্ধধর্মে বারবার অস্বীকৃত হয়েছে — তা' কি কখনও বৌদ্ধসৃষ্টিতে সম্ভব হয়? সকল সৃষ্টিই বিশিষ্ট ধর্ম বা ভাবতত্ত্বের প্রকাশক (expression)—যে তত্ত্ব বারবার বৌদ্ধধর্মে প্রত্যাখ্যাত হ'ল সেটাকেই কি জোর করে উপস্থিত আছে বল্‌তে হবে? সংস্কৃত ও পালি সাহিত্য বা ভারতীয় বৌদ্ধ-বাদ সম্বন্ধে যাদের ক-খ-গ জানা নেই পশ্চিমের তেমন লোকেই এসব দুরূহ তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা বলে' এদেশে বাহবা পেতে চায়। বৌদ্ধধর্মের

নিঃসত্ত্ব-নিজ্জিবত্তা বা 'non-soulness' একটা মেরুদণ্ড বিশেষ। মজ্ঝিমা-নিকায়ে আছে—'Since neither self nor aught belonging to self, brethren, can really and truly exist, the view which holds that this I, who am world, who am self, shall hereafter live permanent, persisting, eternal, unchanging yea, abide eternally, is not this entirely a foolish doctrine?*" বুদ্ধঘোষ সুমঙ্গল-বিলাসিনীতে বলেছেন — "anything whatever within called soul, who sees, who moves the limbs etc. there is none", বৌদ্ধ-তত্ত্বের সুস্পষ্ট অনাত্মবাদের ভিতর যে মূর্ত্তি জন্মলাভ করেছে তা'তে এরকম একটা অবাস্তব কল্পনা আরোপ কি পরিহাস নয়?

বস্তুতঃ বুদ্ধমূর্ত্তিকে উপলব্ধি করার অক্ষমতা হ'তে এসব বিচিত্র কল্পনা সৃষ্ট হয়েছে। এজন্য বুদ্ধের অতুলনীয় মুখ-শ্রীর উপর পড়ে গেছে এক অবগুণ্ঠন — বিস্ময় তাই বুদ্ধমূর্ত্তি শুধু নয় — ভারতীয় মূর্ত্তি-তত্ত্বই মিসরীয় দেবী আইসিসের মত ঘোমটার আড়ালে পড়ে গেছে।

বুদ্ধের মুখ-শ্রীর বিশেষত্বগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে, যদিও বার বার এমূর্ত্তির রহস্য উদ্ঘাটনে অনেকেই সক্ষম হয় নি — তবুও মূর্ত্তিটি হেঁয়ালি নয়। এমূর্ত্তির সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে অধোদৃষ্টি বা ভূমিষ্ঠভাবে স্তিমিতলোচন। মানুষের চোখ বন্ধ অবস্থায় দেখলে মনে হয় দুটি কথা — হয়ত সে মৃত না হয় সে চিন্তান্বিত। আমরা যখন নিবিষ্টমনে ভাবি তখন স্বতঃই চোখ নিমীলিত করা হয়। গভীর চিন্তার সময় মানুষ বাইর থেকে দৃষ্টি সংহরণ করে নিয়ে আত্মস্থ হয়। প্রচলিত সংস্কারগুলি ত্যাগ করে' বুদ্ধমূর্ত্তির দিকে দেখলে মনে হবে যে, মূর্ত্তিটি কি ভাবছে — অর্থাৎ এটা একটা ভাববার অবস্থার রূপ। চলবার অবস্থার বা বহিরঙ্গগুলি সঞ্চালনের অবস্থার রূপ জগতে প্রচুর আছে — কিন্তু ভাববার অবস্থার অর্থাৎ 'psychological state'-এর রূপক প্রাচীন রূপ-জগতে নেই বললেই চলে। বুদ্ধমূর্ত্তি চিন্তার একটা ঘনীভূত বা মর্ম্মরীভূত অবস্থা যাকে ইংরাজীতে বলা যেতে পারে 'thought crystallised.' দেহের অন্তরালে যে মানসজগৎ লুপ্ত আছে তাকে দেহসীমার ভিতর উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা করেছে ভারতীয় রূপকার জগতের ইতিহাসে সর্ব্বাগ্রে। ইদানীং ইউরোপে 'pan-psychic' নাট্যকলার কথা শোনা যায়। রুষীয় নাট্যকার Andreyeef প্রভৃতি শুধু মনোজগতের তরঙ্গভঙ্গ-গুলিকে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছে। বলা বাহুল্য ভারতীয় রূপকলা একান্তভাবে pan-psychic; তার কারণ হচ্ছে জগতের ইতিহাসে ভারতবর্ষই প্রথম মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছে — এবং মনোজগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও বৈচিত্র্যও ভারতের নিকট যেমন স্বপ্রকাশ হয়েছে এমন আর কোথাও নয়। কাজেই মনোজগতকে সফলভাবে উদ্ঘাটনের চেষ্টা ভারতবর্ষেই সূত্রপাত হয়েছে। বৌদ্ধবাদেই জগতের মনস্তত্ত্বমূলক প্রগতি আরম্ভ হয়।

বুদ্ধের মুখ-শ্রীতে তাই ফুটে উঠেছে অন্তরজগতের বা ভাবজগতের অসীম রূপোল্লাস; হঠাৎ যেন জগতের নিভৃত গুহা হ'তে এসেছে নূতন তরঙ্গভঙ্গ — অসীম চিন্তারণ্যের প্রফুল্ল প্রকাশ। বুদ্ধ-মূর্ত্তির প্রধান ব্যাপারই হ'ল চিন্তাকে শরীরী করার একটা অবস্থা; যা' সুগুপ্ত অভ্যন্তরে লুকান ছিল তা' দীপ্যমান হল আনন-শ্রীতে। সমগ্র অবয়বের স্থিরতা ও ঋজুতা এই অবারিত চিন্তা-স্রোতের হিল্লোলকে চক্ষু-গ্রাহ্য করছে। অতি সংক্ষেপে এমূর্ত্তি spiritual বা শরীর ও মনের উপরকার কোন অবস্থার দ্যোতক ব্যাপার নয়—এটা একটা মানসী মূর্ত্তি বা psychological figure। ইতিহাসে পশ্চিমের গ্রীক শিল্পীরা এই মানস হিল্লোলকে উদ্ঘাটন করতেই ব্যর্থ হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ভারতের এই অপরিসীম সফলতা জগতের ইতিহাসে একটা নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেছে। সে আলোচনার স্থান এখানে নেই।

কাজেই দেখা যাচ্ছে ভারতীয় মনস্তত্ত্বচর্চ্চা প্রতিফলিত

---

* সূত্রপিটক, ১।১০৮

হয়েছে অপূর্ব্ব রূপাধারে ভারতের রসপ্রকাশক্ষেত্রে। Guizot এক সময় ইউরোপের পক্ষে বলেছিল—জটিল মানসিক রসবস্তু (complicated human emotion) মর্ম্মরে উপস্থাপিত করা যেতে পারে না; ভারতীয় রূপকলা-ক্ষেত্রে দেখতে হয় ইউরোপ যেখানে ব্যর্থ, ভারতবর্ষ সেখানে কিরূপ জয়ী হয়েছে।

গান্ধারকলার বুদ্ধমূর্ত্তি পশ্চিমের ভঙ্গীতে রচিত—সে আদর্শে দৈহিক পারিপাট্যই লক্ষ্য করবার জিনিষ। এজন্য গান্ধার-বুদ্ধের মুখ-শ্রী একান্তই মাংসস্তূপের মত—যদিও তা' সুগঠিত। তা' দেখে মনে হয় না যে, কোন বিশিষ্ট ভাববাঞ্জা প্রকাশ শিল্পীর পক্ষে সম্ভব হয়েছে। বস্তুতঃ পশ্চিমের শিল্পী—আসন, আধার, মুদ্রা এবং লক্ষণগুলির ভিতর কোন সঙ্গতিই (synthesis) সৃষ্টি করতে পারে নি — এজন্য এসব মূর্ত্তিতে মুখ-শ্রী নিষ্প্রভ ও ভাবহীন মনে হয়।

ভারতীয় বুদ্ধমূর্ত্তি-সংগ্রহের ভিতর যাভার মূর্ত্তি বিশেষভাবে প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। বস্তুতঃ একটা স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, আত্মসমাহিত প্রফুল্ল ও সংযত সৌন্দর্য্য এমূর্ত্তিতে যেমন দেখতে পাওয়া যায় অন্যত্র তা' দুর্লভ। একটা উচ্চতর ভাব-জীবনের স্তর সহজেই এ মূর্ত্তিতে চোখে পড়ে। বিস্ময়ের বিষয় এই বরভূধরে প্রচুর সংগ্রহের ভিতর প্রধান বুদ্ধমূর্ত্তিটিকে অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখা হয়েছে। শিল্পীরা হাজার হাজার মূর্ত্তি গড়েও এই প্রধানতম মূর্ত্তিটি রচনা করবার সময় পেল না—এরকম অনুমান ভ্রান্ত সন্দেহ নেই। এসম্বন্ধে যে সমস্ত গবেষণা হয়েছে তা'তেও পশ্চিমের লঘু অনুমান স্পষ্ট হয়ে উঠে। বুদ্ধমূর্ত্তি সম্যক্ ও সর্ব্বতোভাবে রচনা করা সম্ভব নয় — এ স্বীকৃতি শ্রেষ্ঠতম শিল্পীরা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রেখেই গেছে — এমন কি বরভূধরেও।

অনুরাধাপুরের বুদ্ধের মুখ-শ্রী সংযত ও গম্ভীর — চিন্তার একটা গভীর ছায়াপাত এমূর্ত্তিকে মহার্ঘ করে' তুলেছে। এমূর্ত্তি অনাসক্ত ও সংসারের দুঃখভার-পীড়িত সাধারণের জন্য ঈষৎ ক্লিষ্ট — দুর্দ্দম্য সংকল্প ও সাধনার বেগ মুখ-শ্রীতে দীপ্যমান। অতি পেলব ভাবে বুদ্ধের মুখ-শ্রীতে এরূপ নানা ভাবাবেগ প্রতিফলিত করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে অজান্তার বুদ্ধের মুখ-শ্রীর কথা স্মরণ হয়। এরকমের মানস-ভাবাবেগের প্রতিফলন জগতের কোন রচনায় আছে কিনা সন্দেহ। বুদ্ধ, জগতের দুঃখ-যন্ত্রণা, পীড়া, মৃত্যু প্রভৃতি জটিল সমস্যায় দোদুল্যমান জনতার ব্যথায়

যাভার অসম্পূর্ণ বুদ্ধমূর্ত্তি

আর্ত্ত—অসীম করুণা উৎসারিত হচ্ছে তাঁর চোখ হ'তে। এই মহামানব সমগ্র পৃথিবীর বেদনাভার স্বীকার করে উপায় খুঁজে পেয়েছেন মুক্তির — তাই এই চেহারাতে আছে আশার বাণী — আশ্বাসের মাভৈঃ ধ্বনি। জগতের বিরাট পিতৃত্বের সুষ্ঠু প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় আর একটি মূর্ত্তিতে সেটা হচ্ছে মিশরীয় সম্রাট খেফ্রে'র। কিন্তু তা'তে কারুণ্যের এই অসীম প্রকাশের ছায়ামাত্র নেই। অজান্তার এই

মুখ-শ্রীতে বুদ্ধ অন্তরকে যেন নগ্ন করেছেন জনসাধারণের কাছে, এ রকম এক একটা যুগ-মূর্ত্তি জাতীয় শীলতার (culture) চরম দান। ভারত এ দান করে' জগতে বন্দনীয় হয়েছে।

লুঙমেন গুহার বুদ্ধমূর্ত্তি—চীন

লুঙমেন গুহার চৈনিক বুদ্ধমূর্ত্তিতে আছে চৈনিক চিত্তের শিশুসুলভ সারল্য, অর্গলহীন রসসমাবেশে তা' বিরাট চৈনিক জগতের যেন অন্তরঙ্গ সুহৃৎ। এ মুখ-শ্রীতে দূরত্ব নেই, অনাসক্তি নেই—এ মুখ-শ্রী প্রেমে ভরপুর—চৈনিক জগতের চিরপ্রবাহিত আনন্দ-কল্লোলের যেমন ভাবগ্রাহী তেমনি এই প্রাচীন সভ্যতার দুঃখযাত্রারও আশ্রয় স্থল। হানয়ের বুদ্ধমূর্ত্তি জাগ্রত ও সচেষ্ট কারুণ্যে ভরপুর। নেপালের বুদ্ধের মুখ-শ্রীতে আছে একটা অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য এবং বিচিত্র ঐশ্বর্য্য যা' ইতিহাসে পঞ্চবুদ্ধমূর্ত্তি কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়েছিল। এ মূর্ত্তির মুখ-শ্রীতে তিব্বতের রহস্য ও ভারতের সংযম প্রকাশ পায়। ব্রহ্মদেশের যে প্রামাণ্য ও প্রাচীন মূর্ত্তিটি দেওয়া গেল তাতে এক আশ্চর্য্য রসবত্তা লক্ষিত হবে যা Shwe Dagon Pagoda-র অভ্যন্তরস্থ বুদ্ধমূর্ত্তিতে নেই। এ মূর্ত্তির মুখ-শ্রীতে আছে ব্রহ্মদেশের গভীর মর্ম্মে প্রকটিত সাধনার বার্ত্তা! ব্রহ্মের অন্তর্জীবনের উৎসমূলে আছে সামাজিক সংযম ও ব্যবহারিক ঋজুতা, ব্রহ্মদেশীয় এই মূর্ত্তিটিতেও এ সমস্ত ভাবাবেশ লক্ষিত হবে।

জাপানের বুদ্ধমূর্ত্তিতে আছে একটা প্রবল আত্ম-নির্ভরের ভাব—একটা সহজ আত্মপ্রত্যয় যা জাপানী শীলতার একান্ত মর্ম্মবস্তু। জাপানের বৌদ্ধধর্ম্ম কোরিয়া ও চীনের ধর্ম্মতত্ত্বের সহিত যুক্ত—কিন্তু জাপানের দ্বৈপায়ন সাধনা সমস্ত বিধিব্যবস্থার ভিতর জাগ্রত করেছে এক নেতিমূলক চর্চ্চা—যাতে ক'রে জাপান সহজে অন্যান্য দেশের সহিত ঐক্য স্থাপন করতে পারে নি। এই নিঃসঙ্গ দৃঢ়তা জাপানের বুদ্ধমূর্ত্তিতে আশ্চর্য্যভাবে স্থান পেয়েছে। এ মূর্ত্তিটির নাম হচ্ছে Dia Butsu—ইহা কামাকুরাতে অবস্থিত। এ মূর্ত্তিটি সম্বন্ধেই L. Hearn বলেছেন, "Its beauty,

বুদ্ধমূর্ত্তি—জাপান

its dignity, its perfect repose reflect the higher life of the race." মিঃ চেম্বারলেন বলেন—"No other gives such an impression of majesty or so briefly symbolises the central idea of

Buddhism, the intellectual calm which comes of perfected knowledge."

এ সমস্ত বুদ্ধমূর্ত্তির মূল প্রেরণা এসেছে ভারতবর্ষ হ'তে। ধর্ম্মপ্রচারে-ব্রতী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যখন এসিয়াময় পর্য্যটনে অগ্রসর হয় তখন হাতে দু'টি অস্ত্র ছিল—একটা হচ্ছে বৌদ্ধগ্রন্থ, দ্বিতীয় হচ্ছে বুদ্ধমূর্ত্তি। বুদ্ধমূর্ত্তিই একটা বাণীস্থানীয় হয়ে' পড়েছিল প্রাচ্যদেশে। সারনাথের বুদ্ধমূর্ত্তির মত আত্মসমাহিত ও স্থিরতার আদর্শমূলক সৃষ্টি যে কোন লঘু ও অগভীর জাতির নিকট একটা প্রেরণা আনতে পারে। ইন্দ্রিয়জ-লালিত্য অক্ষত রেখে মনোজগতের একটা সংযত বার্ত্তা এমনি ভাবে কোন মূর্ত্তিতেই রক্ষিত হয় নি। বুদ্ধের আন্তর তপস্যা, সিদ্ধি ও প্রচার—এই তিনটি অবস্থাই একটি মূর্ত্তিতে শিল্পী পর্য্যবসিত করে এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি রচনা করেছে। ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন মুখ্য ব্যাপার করে' এ মূর্ত্তিতে দ্যোতিত হয়েছে, বুদ্ধের এক অপরূপ রসসম্পর্ক বা সৌন্দর্য্যের দিক্ হতে হয়েছে তুলনাহীন এবং প্রকাশ-সাফল্যের দিক্ হতে বিস্ময়জনক।

শুধু ভারতবর্ষই এই শ্রেণীর মূর্ত্তি-রচনার উৎস। ভারতীয়-শীলতা ও তত্ত্ব বুদ্ধের আলোকোজ্জ্বল জীবনের আধার রচনায় কল্পনা করেছে এবং ক্রমশঃ তা বিশ্বভারতে ব্যাপ্ত হয়েছে। ভারতকে বেষ্টন করে' প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে সমস্ত প্রদেশ বুদ্ধমূর্ত্তি রচনা করেছে তা'দের আদর্শ ভারত হ'তেই গৃহীত। গুপ্ত-যুগেই বুদ্ধরচনায় অপূর্ব্ব সাফল্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এ যুগের পূর্ব্বে দুটি রচনার ধারা ছিল, পশ্চিমে মথুরা প্রদেশের রচনাচক্র ও পূর্ব্বাঞ্চলে পূর্ব্বভারতীয় চক্র। পূর্ব্বাঞ্চলের ধারাই ক্রমশঃ সাঁচি ও অমরাবতীতে প্রভাব বিস্তার করে। গান্ধার-শিল্প-রীতির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি।

ভারহুত, সাঁচি এবং প্রাথমিক অমরাবতী ভাস্কর্য্যে বুদ্ধের মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না বলা হয়েছে। অমরাবতীর পরবর্ত্তী রচনায় বুদ্ধমূর্ত্তি দেখতে পাওয়া যায়। এ সমস্ত ধারায় গান্ধার-রীতির দুর্ব্বল স্পর্শ লুপ্ত হয়ে ক্রমশঃ ভারতীয়-রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। অনেকেরই বিশ্বাস, শুধু বই দেখে বা গ্রন্থ আলোচনা করে' মূর্ত্তি রচনা করা যেতে পারে—তা সত্য হ'লে গান্ধার-শিল্পীর বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি কতকগুলি পাথরের স্তূপে পরিণত হ'ত না। বস্তুতঃ ভারতীয় সাধনায় তক্ষণ-শিল্পের কারুধর্ম্ম একটা স্বাধীন প্রকাশ-শ্রী লাভ করেছিল। সে শ্রী দ্যোতিত হয়েছে ভারহুত ও সাঁচি প্রভৃতির রূপোদ্ঘাটনে। যে সমস্ত দেবতা, যক্ষ ও নাগাদি রচিত হয়েছে তা'তে একটা রীতির সৃষ্টি হয়—সেটার সহিত গান্ধার-রীতির মর্ম্মগত সম্পর্ক ত' নেই-ই বরং বিরোধ আছে। কাজেই যখন ফুসে (Fouche) বলেন গান্ধারের বাইরের ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করে গুপ্ত-রীতি সৃষ্টি হয়, তখন তিনি ভুলে যান রস-সন্নিবেশের উৎস ও প্রেরণা একটা আন্তর-বিধি হ'তে জন্মে, বাইরকে যোগবিয়োগ করে' রূপকলার সৃষ্টি হয় না; কোন শিল্পের অন্তরঙ্গ ধর্ম্মে এরকমের বিধান নেই পূর্ব্বেই বলেছি; একটা আন্তর-ধর্ম্মের বিরোধ ঘটে যখন মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞতা থাকে, দ্বিতীয়তঃ ধার করা জিনিষ নিয়ে রূপগত সঙ্গতি (ensemble) সৃষ্টি করা যায় না। এজন্য ম্যাকডোনাল্ডের উক্তি অবান্তর ব্যাপার সন্দেহ নাই *।

বস্তুতঃ সকল দেশেই ঘটে-পটে, অশনে-বসনে সর্ব্বত্র কলাসৃষ্টির একটা বিশিষ্ট ছন্দ মুকুলিত হয়—সে ছন্দই উদ্ভাসিত হয় বৃহৎ ও ব্যাপক সৃষ্টিতে। কবিবর মরিস (Morris) বলত—"A nation is known more by its cups and saucers than by its great pictures." যে সৌন্দর্য্যের কারুধর্ম্ম এ সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্পরচনায় দীপ্যমান হ'ত, আদিকাল হ'তে সে ধর্ম্মই উচ্ছ্বসিত হয়েছে মথুরা ও পূর্ব্ব ভারতের মর্ম্মরমূর্ত্তিতে এবং গুপ্ত-যুগের সৌন্দর্য্যের সহস্র ধারায়। বুদ্ধমূর্ত্তি রচনার চরম সফলতা দেখতে পাওয়া যায় এ যুগে। যে মনস্তাত্ত্বিক রসজগৎ ভারতীয় প্রকাশে দীপ্যমান, তা' পর্য্যাপ্ত আধার পেয়ে গেল বহুকালের সাধনায়। কোন

* Festschrift Ernst Windisch, Leipzig 1914.

ইউরোপীয় লেখক বলেন —"Its chisel work and finish are excellent and in fineness and accuracy it is unsurpassed in India or anywhere".†

তিব্বতের যে মূর্ত্তিটি দেওয়া গেল তা' ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী মূর্ত্তি। এ আননে বিষণ্ণতা নেই, কঠোর মননের ধূসর ম্লানতা নেই। প্রফুল্ল হাস্যবিকশিত মুখখানি একটা গভীর আন্তরলোককে আলোকিত করে' তুলেছে। এরূপ সুকুমার স্নিগ্ধ, আনন্দ-উদ্বেলিত মুখ-শ্রী যে আন্তর-প্রসন্নতাকে উদ্ঘাটিত করে—তা'তে শুধু একটা লঘু ভাবাবেশ মাত্র নেই—এটা একটা ইতর হাস্যের প্রতিফলক মাত্র নয়। বুদ্ধের অন্তরের গভীরতম তত্ত্ব প্রকাশ পাচ্ছে এই সফলতা-ধর্ম্মী উল্লাসে। অজান্তার বুদ্ধ কারুণ্যে মুদিত, জগতের জর্জ্জরিত জড়তায় আর্ত্ত—তিব্বতের সুদূরস্থ এ মূর্ত্তি আর্ত্তত্রাণে ব্রতী—এ যেন মনোজগতের আর একটা মেরু অনবগুণ্ঠিত। এ মূর্ত্তিতে আছে উল্লাস—কিন্তু তার পিছনে আছে বিরাট তপস্যার এক গভীর পশ্চাদ্‌ভূমি (background)। এ মূর্ত্তিতে সূক্ষ্মতম-ভাবে দ্যোতিত হয়েছে বিপরীতের মিলন—আলো ও ছায়া, হাস্য ও বিষাদ, দিন ও রাত্রি। প্রাচীন গ্রীক, রোমক বা মিশরীয় ভাস্কর-বিদ্যা এরূপ একটা অপূর্ব্ব অবস্থাকে সফলভাবে মর্ম্মরীভূত করার স্বপ্নও দেখে নি।

বস্তুতঃ শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রচনায় মগ্ন বহু সভ্যতাই এই আন্তরলোকের বার্ত্তা উদ্ঘাটন করতে একান্ত অক্ষম হয়েছে। ভারতের সম্পর্কে যে সমস্ত সভ্যতা এসেছে তাদের দৃষ্টি ও মর্ম্ম অনেকটা রূপান্তরিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তবুও বাইরের চর্ম্মাবরণ রচনার উৎসাহ ও লোভ হ'তে তারা নির্ম্মুক্ত হ'তে পারে নি। খ্রীষ্টীয় শিল্পে যেমন রুগ্ন, জর্জ্জরিত, বিষণ্ণ ও শীর্ণ খ্রীষ্টের রচনা হয়েছে, তেমনি বুদ্ধমূর্ত্তির কঙ্কাল নিয়েও নাড়াচাড়া হয়েছে। গান্ধার-শিল্পের উপবাস-ক্লিষ্ট কঙ্কালসার বুদ্ধের দেহাবরণের এক মূর্ত্তি আছে—জাপানী-শিল্পেও বুদ্ধকে এ রকম একটা অবয়ব দেওয়া হয়েছে। এ সমস্ত রচনা 'pan-psychic' নয়, এগুলো হ'ল 'pan-physical'—ভারতীয় রসরচনার মূল প্রেরণা হতেই এ সব মূর্ত্তি বঞ্চিত। ভাবের দিক থেকে স্পষ্টই এগুলিকে বাইরের সৃষ্টি বলা যেতে পারে—রচনার দিক থেকে এগুলির ছন্দই অন্যরকম।

বুদ্ধের মুখ-শ্রী জগতের তক্ষণ ও চিত্রকলার ইতিহাসে এক অপরাজেয় সৃষ্টি। মানুষের অন্তরলোকের বার্ত্তা এমনিভাবে স্থূলদেহের গণ্ডীর উপর উদ্ভাসিত করা

বুদ্ধমূর্ত্তি—তিব্বত

সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির চরম দান। মানুষের প্রভুত্ব মানুষের শরীরের সাহায্যে সম্ভব হয় নি—মানুষের অসীম মনোরাজ্যের আনুকূল্যে। সে বিরাট জগতেই মানুষ বেঁচে ও মরে থাকে। কত সামান্য ক্রন্দন ও হাস্য জগতের ইতিহাসে প্রলয় উপস্থিত করেছে! কত জটিল সমস্যায় মানুষ অসীম কালে আন্দোলিত হচ্ছে; মনের এ বার্ত্তা প্রকাশের জন্যই মানুষের সামাজিক ইতিহাস—মানুষের সাহিত্য ও কলা সংগ্রহ। এ মানসরাজ্যের সমস্ত উত্তুঙ্গকীরিট, দূরদিগন্তের সীমান্ত ও অজস্র প্রবাহিত তরঙ্গকল্লোল স্বপ্রকাশ হয় মনস্তাত্ত্বিক রূপকলায়। বুদ্ধের মুখ-শ্রী রচনায় ব্যাপদেশে ভারতীয় শিল্পী এমনিভাবে ভূলোক ও দ্যুলোক ব্যাপ্ত মনোবিহারকে মর্ম্মরিত ও চিত্রিত করে' ধন্য হয়েছে।

† Codrington.

অভিনোদয়

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

মাসি ঠিক যাহা ভাবিয়াছিল তাই।

ব্যাপারটা শুনিয়া অবধি পিণ্টুলী কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কাঁদিবার কথাই। ওই অতটুকু মেয়ে — মা-বাবা ছাড়িয়া যে একটি দিনের জন্যও কোথাও থাকে নাই, আজ সে একেবারে অকস্মাৎ চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। বাবার জন্যই তাহার বেশি কান্না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'মা আমার নেই। মা মরে গেছে।'

মাসি ত' অবাক্!

'সে কি লা! ও তবে কে? ও তোর মা নয়?'

ঘাড় নাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিণ্টুলী বলিল, 'না। কাউকে বললে বাবা আমাকে মেরে খুন ক'রে দিত।'

'তাই ত' বলি, মা কি কখনও নিজের মেয়ে ছেড়ে চলে যেতে পারে গা?'— মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'ও বুঝি তোর সৎ-মা?'

ঘাড় নাড়িয়া পিণ্টুলী বলিল, 'হুঁ।'

মাসি বলিল, 'ও মা! তা এতদিন কিছু বুঝতে পারিনি গা! তাইতে খাঙ্কুসী এমন কাজ করতে পারলে। ও হো হো হো, এতক্ষণে সব বুঝতে পারলাম মা, এবার আমি সবই বুঝতে পেরেছি। তা আচ্ছা পাষাণ বাপ্ যা হোক্। — তা হোক্‌গে মা, আয় তুই আমার কাছে আয়।'

এই বলিয়া মাসি তাহাকে সস্নেহে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, 'যাক্‌গে মা যাক্‌গে। অমন বাপের মুখে ঝাঁটা। তাইতে যদি সুখে থাকিস্ ত' তাই থাক্‌গে যা। আমরা বেশ থাকব।'

এমনি সব নানান্ কথা বলিয়া, ভালোবাসিয়া, আদর করিয়া মাসি তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত চুপ করাইল।

বাড়ীর মধ্যে মাসি আর পিণ্টুলী। তাড়াটে আনিবার নামও সে আর মুখে আনে না।

পিণ্টুলীকে মাসি দিবারাত্রি চোখে চোখে রাখে। যেখানে যায় সঙ্গে লইয়া যায়, একসঙ্গে বসিয়া বসিয়া খায়, একসঙ্গে ঘুমায়, পাড়ায় কাহারও বাড়ী বেড়াইতে গেলে পিণ্টুলী তাহার সঙ্গেই থাকে।

প্রথম প্রথম সকলেই জিজ্ঞাসা করিত, 'এটিকে আবার কোথায় পেলে মাসি?'

মাসি বলিত, 'ভগবান জুটিয়ে দিয়েছেন বাছা।'

'আর সেটি কোথায়? সেই দেবু?'

'তারা চলে গেছে।'— মাসি বলে, 'এ ত' মা পাখী পোষা। আজ পুষছি, কাল উড়ে যাবে।'

এই বলিয়া মনের দুঃখে আরও কি যেন সে বলিতে যায়, কিন্তু পিণ্টুলীর মুখের পানে তাকাইয়া তাহাকে চুপ করিতে হয়। বয়স কম হইলেও পিণ্টুলী আজকাল সব কথাই বুঝিতে পারে।

পিণ্টুলী ছোট মেয়ে। মাসির ধারণা — সব সময় তাহার সঙ্গ হয় ত' উহার ভাল লাগে না। তাই সে নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়া পিণ্টুলীর সমবয়সী মেয়েদের

ডাকিয়া আনিয়া বলে, 'আয় মা, আমার পিন্টুলীর সঙ্গে খেলা করবি আয়।'

মেয়েরা পিন্টুলীর সঙ্গে খেলা করিতে আসে। হাসিয়া খেলিয়া মাসির চোখের সুমুখে পিন্টুলী ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ায়। মাসি এক দৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে।

কখনও-বা চোখে কাপড় বাঁধিয়া মাসি নিজে কানাবুড়ি সাজিয়া বসিয়া থাকে। মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া কানামাছি খেলে, চোর চোর খেলে, আবার কখনও-বা নিজেও তাহাদের সঙ্গে ছুটিয়া ছুটিয়া খেলিয়া বেড়ায়। কিন্তু এত বয়সে খেলাটা তাহাদের সঙ্গে ঠিক জমে না, হয় ত' ছুটিতে ছুটিতে একটুকুতেই সে হাঁপাইয়া ওঠে! পিন্টুলী তাহার হাতে ধরিয়া বসাইয়া দিয়া বলে, 'তুমি পারবে কেন? চুপটি ক'রে তুমি এইখানে বসে থাকো।'

আবার কোনো কোনো দিন বুড়ী-মেয়ের মত পিন্টুলী তাহাকে শাসন করে। বলে, 'বলছি তুমি পারবে না, তবু তুমি কেন শুনছ না বল দেখি! পড়বে এখুনি মুখ থুবুড়ে আছাড় খেয়ে, হাত-পা ভাঙাবে, ভাঙিয়ে তখন — আন্ মা পিন্টুলী একটু আগুন নিয়ে আয়, দে মা একটু সেক্ দিয়ে! আমি পারব না বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ।'

সেদিন অমনি মেয়েদের সঙ্গে সদর দরজার বাহিরে গলি রাস্তাটার উপর পিন্টুলী খেলা করিতেছিল, এমন সময় একজন ভদ্রলোক পিন্টুলীকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁরে, তোর নাম পিন্টুলী, না?'

পিন্টুলী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

'কোন্ বাড়ীতে থাকিস তোরা?'

আঙুল বাড়াইয়া বাড়ীটা দেখাইয়া দিয়া পিন্টুলী বলিল, 'এই যে এই বাড়ী।'

'হুঁ!' বলিয়া ভদ্রলোক চলিয়া গেল এবং খানিক পরেই কোথা হইতে জনকতক লোক ডাকিয়া আনিয়া খুব খানিকটা হৈ চৈ করিতে করিতে আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিয়া পিন্টুলীকে বলিল, 'ডাক্ দেখি তোর বাবাকে!'

বাবার নাম শুনিবামাত্র পিন্টুলীর চোখ্ দুইটা ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। বলিল, 'বাবা ত' নেই এখানে।'

'কোথায় আছে?'

পিন্টুলী বলিল, 'তা ত' জানি না।'

ভদ্রলোক বলিল, 'দেখছেন মশাই, মেয়েটাকে পর্যন্ত শিখিয়ে রেখেছে।— কে আছে বাড়ীতে?'

পিন্টুলী ভয়ে-ভয়ে বলিল, 'মা।'

'তবে আর-কি, আসুন।' বলিয়া সেই তিন চার জন লোক সঙ্গে লইয়া ভদ্রলোক সরাসর ঘরের ভিতর গিয়া ঢুকিতেছিল। হঠাৎ কি ভাবিয়া লোকগুলিকে বলিল, 'আচ্ছা আপনারা দাঁড়ান এইখানে মশাই, আপনারা সাক্ষী থাকবেন, আমি দেখি।' দরজার বাহিরে তাহাদের অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে নিজেই ঘরে গিয়া ঢুকিল। সিঁড়ির কাছে গিয়া ডাকিল, 'বীণা! বীণা!'

পিন্টুলী তাহার আগেই ছুটিয়া উপরে গিয়া মাসিকে খবর দিয়াছিল।— 'দ্যাখো কারা এসেছে।'

মাসি নীচে নামিয়া আসিল। বলিল, 'কাকে খুঁজছ বাবা?'

ভদ্রলোক রুক্ষকণ্ঠে জবাব দিল। — 'বীণাকে ডেকে দিন। আর সেই হারামজাদা মেধোকে।' বলিয়া পিন্টুলীকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'এর সেই বাপটাকে।'

মাসি বলিল, 'তারা ত' বাবা এখান থেকে চলে গেছে। আমার এই নীচের ঘরে ভাড়া ছিল, হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে কয়ে এমন সুন্দর এই মেয়েটাকে ফেলে রেখে চোরের মত লুকিয়ে পালিয়ে গেছে।'

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, 'উঁহু, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, আমি দেখব।'

মাসি বলিল, 'ত্থাখো বাবা, খুঁজে ত্থাখো। আমার কথায় বিশ্বাস হলো না?'

ভদ্রলোক প্রত্যেকটি ঘর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল। কিন্তু কোথাও তাহাদের না পাইয়া বলিল, 'আজ আড়াইটি বছর এমনি করে লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে আর আমি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি। একবার তাদের পেলে হয়, আমি আচ্ছা করে বুঝিয়ে দিই তাহ'লে।'

মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে বাবা, আমায় একটু আড়ালে গিয়ে বলবে?'

পিণ্টুলীর কাছ হইতে একটুখানি দূরে সরিয়া গিয়া ভদ্রলোক যাহা বলিল তাহার মর্মার্থ এই—

বীণাপাণি তাহার বোন, আর মাধব তাহার বন্ধু। পিণ্টুলী যখন নিতান্ত ছোট তখন তাহার মা মারা যায়। ওই পিণ্টুলীকে সঙ্গে লইয়া মাধব তাহাদের বাড়ী আসা-যাওয়া করিত। তাহার বোন বীণাপাণির তখন বয়স হইয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পর আর তাহাকে পড়ানো হয় নাই। বিবাহের বয়স হইয়াছিল, কিন্তু উপযুক্ত পাত্র না পাইলে বিবাহ দিবে না—এই ছিল তাহার প্রতিজ্ঞা। এমন দিনে মাধব একদিন নিজেই প্রস্তাব করিল—বীণাপাণিকে সে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু মাধব বিপত্নীক, তাহা ছাড়া আগের পক্ষের ওই একটা মেয়ে। সতীনের ছেলেপুলে থাকিলে সংসার প্রায়ই সুখের হয় না। তাহা ছাড়াও মস্ত একটা বাধা, মাধব ব্রাহ্মণ আর তাহারা কায়স্থ। এই সব ভাবিয়া মাধবের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া সঙ্গত নয় বুঝিয়াই সে ইহা বন্ধ করিয়া দেয়। মাধবের স্ত্রী মারা যাবার পর বাড়ীতে সে একা। বাড়ীখানি নিজের। কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে তাহাদের বাড়ী এই মাধবের যাওয়া-আসা লইয়াই বীণার সঙ্গে তাহার ঝগড়া হয় এবং তাহার পরদিন বীণাকে আর তাহাদের বাড়ীতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ওদিকে দেখা যায়—মাধবও তাহার মেয়েটাকে লইয়া বাড়ী-ঘরদোর সব বিক্রি করিয়া দিয়া নিরুদ্দেশ। সেই অবধি তাহাদের সে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। চোখের সুমুখে একবার পাইলে হয়…

মাসি জিজ্ঞাসা করিল, 'পেলে কি করবে বাবা?'

বীণার দাদা বলিল, 'কি করব? আমাদের বংশে একটা কলঙ্ক দিয়ে দিলে, সে হারামজাদার হাড়গুলো গুঁড়ো ক'রে দেবো না?'

মাসি বলিল, 'অন্যায় করবে বাবা, খুবই ভুল করবে। তা যেন কখনও কোরো না। ওরা দু'টিতে বেশ আনন্দে আছে, সত্যি বলছি বাবা, খুব সুখে আছে।'

'হ্যাঁ সুখে আছে! সুখে যে ওরা থাকতেই পারে না। মেধোকে আমি চিনি না! মস্ত বদরোগী মানুষ, বীণাকে হয় ত' মেরেই খুন করে ফেলবে।'

মাসি বলিল, 'না বাবা, তুমি ভুল বুঝেছ। বোন তোমার খুব সুখেই আছে। আমি দেখেছি।'

মুখ দেখিয়া মনে হইল সে তাহা বিশ্বাস করে নাই। যাই হোক্, সে তাহার পকেট হইতে কাগজ-পেন্সিল বাহির করিয়া তাহার নিজের নাম-ঠিকানা লিখিয়া, কাগজখানা মাসির হাতে দিয়া বলিল, 'মেয়েটা যখন আপনার কাছে রয়েছে, হয় ত' তাদের খবর আপনি একদিন পেতে পারেন। খবর যদি কোনোদিন পান ত' এই কাগজখানা সেই হতভাগী বীণির হাতে দিয়ে বলবেন যে, দাদা তোর—'

বলিতে গিয়া ঠোঁট দুইটা তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

কাপড় দিয়া চোখ মুছিয়া নিজেকে একটুখানি সামলাইয়া লইয়া সে আবার বলিল, 'তা বীণি যদি নিজে বলে, সে সুখে আছে তাহ'লে ত' বেঁচে যাই। তাই ব'লে তাকে একবার দেখতেও পাব না? হতভাগী এমনি করে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে? তারপর হঠাৎ একদিন যদি মরে যাই, তখন দেখবেন ও-ও ঠিক আমারই মতন—'

বলিতে বলিতে মুখে কাপড় চাপা দিয়া ঠিক ছোট ছেলের মত সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

এতক্ষণে মাসি বুঝিল তাহার অভিমান কোথায়। তাহার কান্না দেখিয়া মাসিও কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। বলিল, 'আমি খবর যদি কোনোদিন পাই ত' তুমিও পাবে বাবা, এই কাগজ আমার কাছে রইলো।' তোমার নামটি কি বাবা?'

'আমার নাম হেম। আমি ভবানীপুরে থাকি।' বলিয়াই আর সে অপেক্ষা করিল না। চোখ মুছিতে মুছিতে তাড়াতাড়ি সে নীচে নামিয়া গেল।

পিন্টুলীকে মেয়েদের ইস্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মেয়েদের জুতা-জামা পরিয়া ইস্কুলে যাওয়া মাসি আগে পছন্দ করিত না, কিন্তু সেদিন একটি মেয়েকে অমনি জুতামোজা পরিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া ইস্কুলে যাইতে দেখিয়া পিন্টুলী বলিল, 'আমিও অমনি ইস্কুলে যাব মা।'

মাসি বলিল, 'না মা, ছি, ওখানে সব খিরিস্তানী কাণ্ড-কারখানা, ওখানে যেতে নেই।'

কিন্তু পিন্টুলীই শেষে তাহাকে হার মানাইয়াছে।— 'বা-রে, তাই বলে লেখাপড়া শিখব না?'

মাসি বলিল, 'মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখে কি হবে মা?'

পিন্টুলী বলিল, 'চিঠিপত্তর পড়তে পারব, লিখতে পারব। সেই সেদিন তুমি সেই ঠিকানাটা পড়তে পারলে?'

সে কথা সত্য। লেখাপড়া একটুখানি শেখা দরকার। মাসি বলিল, 'তা বেশ ত', ঘরে মাষ্টার রেখে দেবো।'

'কিন্তু ঘরে মাষ্টার রাখলে মাইনে যে বেশি লাগবে মা।'

তাহাও মিথ্যা নয়।

সুতরাং ইস্কুলে তাহাকে পাঠাইতেই হয়।

কিন্তু প্রথমেই এক গোলমাল বাধিয়া বসে। খাতায় নাম লিখিতে গিয়া শিক্ষয়িত্রী জিজ্ঞাসা করেন, 'মেয়ের নাম?'

মাসি নিজে গিয়াছিল ভর্তি করিতে। বলিল, 'পিন্টুলী'।

'না না, ভাল নাম।'

সর্বনাশ! ভাল নাম আবার কি! ওই ত' বেশ নাম। বলে, 'পিন্টুলীবালা দেবী লিখে নাও না বাছা!'

পিন্টুলীও একটুখানি গোলমালে পড়িল। ভাল নাম তাহার সে নিজেও জানে না।

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, 'আচ্ছা নামটা না হয় কালকে ঠিক করে এনো। বাবার নাম?'

পিন্টুলীকে ঠেলিয়া দিয়া মাসি বলিল, 'বল্ না মা!'

পিন্টুলী বলিল, 'শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র ভট্‌চাজ্।'

তাহার পর ঠিকানা। ঠিকানাটা মাসি জানিত। সেটা সে নিজেই বলিল।

কিন্তু তাহাতেই নিস্তার নাই। এইবার মাসির পালা।

'আপনার নাম?'

মাসি বলিল, 'তোমরা জ্বালালে দেখছি বাছা! গুষ্টিশুদ্ধ নাম নিয়ে তোমাদের কি হবে?'

'তাহ'লেও দরকার।'

মাসি বিরক্ত হইয়া বলিল, 'লেখো—কাদম্বিনী।'

'মেয়ে আপনার কে হয়?'

মাসি বলিল, 'এই জন্যেই ত' ইস্কুলে দিতে চাইনি মা। বলেছিলাম না—এ-সব খিরিস্তানী কাণ্ড।'

মেয়েটি একটু হাসিয়া বলিল, 'বলুন না।'

মাসি বলিল, 'আমার মেয়ে হয়।'

যে মেয়েটি লিখিতেছিল, সে একবার মাসির মুখের পানে তাকাইল। ইহার মেয়ে এত সুন্দরী! সম্ভবত সে বিশ্বাস করিল না। জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহ'লে ওই মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মারা গেছেন বলুন।'

মাসি একেবারে আগুনের মত দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। পিন্টুলীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, 'আয়

লো আয়, এখান থেকে চলে আয়! তোকে আমি ঘরেই পড়াব। পয়সা না জোটে, বাড়ীখানা বিক্রি ক'রে দেবো—চল্!'

হাসিতে হাসিতে শিক্ষয়িত্রী তাহাকে ধরিয়া বসাইলেন।—'আহা চটছেন কেন, বসুন, বসুন।'

মাসি বলিল, 'ত্যাখো দেখি কথা! মাধব ভট্‌চাজ্ ওর বাপ। বলে কিনা, সে মরে গেছে। সতুর্-বতুর্, আলাই-বালাই! মরবে কি রকম?'

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, 'লিখে নাও—বেঁচে আছেন। আর আপনি তাহ'লে ওর মা ন'ন্?'

মাসি বলিল, 'তা না হয় না হলাম। মা মাসি দুই-ই সমান। যে মানুষ করে সেও মা।'

শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, 'লিখে নাও—উনি ওর মাসি হ'ন।'

মাসি বলিল, 'হ্যাঁ, তাই লেখো মা, তাই লেখো। আমাকে এইবার যেতে দাও।'

কিন্তু যাইবার ত' উপায় নাই। গার্জেনকে সহি করিতে হয়।

মাসির হাতের দিকে কলমটা বাড়াইয়া দিতেই মাসি বলিল, 'তামাসা করছ নাকি বাছা? লিখতেই যদি জানব ত' মেয়েকে এত ক'রে লেখাপড়া শেখাতে চাইছি কেন? লিখতে আমি জানি না।'

যাই হোক্ পিন্টুলীকে ভর্ত্তি করিবার পর্ব্বটা ত' কোনোরকমে চুকিয়া গেল। কথা হইল, মেয়েকে আনিবার জন্য দশটার আগে ইস্কুলের গাড়ী যাইবে, আবার ছুটির পর গাড়ীতে করিয়াই পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে।

(ক্রমশঃ)

চিত্র-শিল্পী

শ্রীচন্দ্রশেখর আঢ্য, এম্-এ

রঙে, রসে সিক্ত করি' আমার এ স্বর্ণতুলিখানি,
তোমার কুটীর-কুঞ্জে, অনিমিখ, রাত্রি জাগি রাণি —
মধুকর মাতোয়ারা, অঙ্গভরি' ফুটিছে কুসুম,
মুগ্ধ, লুব্ধ আছি চাহি, চোখে মোর নাহি তিল ঘুম।
গোলাপ-অধর দু'টি, মেঘ-মায়া অতুল নয়ন,
বুক ভরা পদ্ম দু'টী, বিকশিত বনানী শোভন —
আমার এ চিত্রপটে, আঁকি' লব রাগরক্ত ছবি,
ভুবনের স্বর্গখণ্ড; রূপদক্ষ অনুরাগী কবি।

সারা মন আঁখি ভরি', শত চিত্র করিনু রচন,
বরণের ইন্দ্রধনু রঙ্গজাল হইল সৃজন,
তবু ত' দিলে না ধরা, ওগো প্রিয়, দিগন্তের মায়া,
গোধূলির স্বপ্ন তুমি, যাদুকরী আলো-ভরা ছায়া।

চিত্রপট রাখি' দিনু; করি' তোমা অসীম অক্ষর,
নয়নের নীলপত্রে, আঁকা র'লে চিরশ্যামময়!

আধুনিক যুগের লুপ্ত পক্ষী

শ্রীঅশেষচন্দ্র বসু, বি-এ

বর্ত্তমান যুগে যে-সকল জীবজন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের বিষয় আলোচনা করিতে যাইলে প্রথমেই মরিসিয়স্ দ্বীপের লুপ্ত পক্ষী 'ডো ডো'-র কথাই মনে পড়ে। পক্ষহীন অসহায় 'ডো ডো'-রা এক সময় নির্জ্জন মরিসিয়স্ দ্বীপে বহু সংখ্যায় বাস করিয়া দ্বীপকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বেও লোকে এই 'ডো ডো' পক্ষীর সহিত পরিচিত ছিল। কিন্তু আজ মানবের অবিমৃষ্য-কারিতায়—এই বিহঙ্গ যাযাবর পারাবত (Passenger pigeon), 'বৃহৎ অক্' পক্ষী, 'নিরালা পাখী' (Solitaire), 'শিখাধারী শুক', Pied duck প্রভৃতির মত চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

যে দ্বীপে 'ডো ডো'-রা বাস করিত সেই মরিসিয়স্ দ্বীপ আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ-স্থিত ম্যাডাগাসকার দ্বীপের পূর্ব্বদিকে ভারত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। দ্বীপটীর আয়তন মাত্র ৭২০ বর্গ মাইল। সম্ভবতঃ ১৫০৭ খৃঃ অব্দে পোর্ত্তুগীজরা সর্ব্বপ্রথমে এই দ্বীপ আবিষ্কার করিয়া 'ডো ডো'-র সহিত পরিচিত হন এবং ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া এই 'ডো ডো' নামেই ইহাদিগকে অভিহিত করেন। এই নামটীর অর্থ 'নির্ব্বোধ পক্ষী'। ইহার প্রায় ৯১ বৎসর পরে ওলন্দাজরা এই দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। ওলন্দাজ-দিগের আগমনের পর হইতেই 'ডো ডো'-র কথা ইউরোপের জন-সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইয়া পড়ে।

'ডো ডো'-রা দেখিতে আদৌ সুন্দর ছিল না। আকারে ইহারা বর্ত্তমান কালের গৃহপালিত "টার্কি" অপেক্ষা বৃহৎ হইত। ইহাদের আকৃতি বুঝাইবার নিমিত্ত এখানে একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

ইহাদের পালখের বর্ণ কৃষ্ণাভ ধূসর, চঞ্চুর বর্ণ কৃষ্ণ, ক্ষুদ্র চরণদ্বয় পীত এবং বক্ষঃস্থল ও পুচ্ছের পালখ শ্বেতাভ হইত। পক্ষহীন হওয়ায় এবং চরণ ক্ষুদ্র থাকায় ইহারা আদৌ উড্ডয়ন করিতে বা দ্রুত পলায়ন করিতে পারিত না। দ্বীপের জঙ্গলের মধ্যে বীজ ও ফলাদি আহার করিয়া ইহারা নির্ভয়ে বাস করিত, এবং তৃণাদি স্তূপীকৃত করিয়া তদুপরি বৎসরে একটী মাত্র অণ্ড প্রসব করিত।

ওলন্দাজরা দ্বীপে পদার্পণ করিয়াই মাংসের লোভে ইহাদের শিকারে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু ইহাদের পক্ক মাংসকে কোনও উপায়ে সুস্বাদু করিতে না পারিয়া শেষে ইহাদের নাম রাখেন 'ঘৃণ্য-পক্ষী'। মাংসের আস্বাদ

লুপ্ত পক্ষী 'ডো ডো'-র চিত্র

কদর্য্য হইলেও 'ডো ডো'-রা নিষ্কৃতি পাইল না। ওলন্দাজরা তাহাদের সহিত যে সকল শূকর দ্বীপে আনিয়াছিল তাহারাই ইহাদের ধ্বংস-সাধনে প্রবৃত্ত হইল। 'ডো ডো'-রা উড্ডয়নে অক্ষম ও দ্রুত পলায়নে অপারগ হওয়ায় শূকর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া সহজেই নিহত হইতে লাগিল। ধ্বংসের অনুপাতে প্রজনন ব্যাপার মন্দ হওয়ায় ইহারা সংহারের ক্ষতিপূরণ করিতে অক্ষম হইল, এবং ওলন্দাজদিগের আগমনের ৮০ বৎসরের মধ্যেই মরিসিয়স্ দ্বীপ হইতে চিরকালের মত বিলুপ্ত হইয়া গেল। সন্তরণ দিতে সমর্থ হইলে

ইহারা বোধ হয় আরও কিছুকাল জীবিত থাকিতে পারিত।

ওলন্দাজ চিত্রকরদিগের অঙ্কিত চিত্র না থাকিলে এবং 'ব্রিটিশ মিউজিয়ম্' ও অক্সফোর্ডের 'অ্যাস্‌মোলিয়ান্ মিউজিয়মে' ইহার দেহাংশ রক্ষিত না হইলে আজ 'ডো ডো'-র কথা আরব্যোপন্যাসের 'রক' পাখী বা আরব দেশের উপকথার 'ফিনিক্সের' মতই অলীক হইয়া দাঁড়াইত। ওলন্দাজ চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত প্রথম মূল চিত্রখানি আজিও উট্রেট্ সহরের একটী পাঠাগারে রক্ষিত আছে। ভিয়েনা, বার্লিন প্রভৃতি সহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানাদিতে ইহার চিত্র বিদ্যমান আছে। প্যারী ও কোপেন্‌হেগেন সহরে এই পক্ষীর অস্থি সংরক্ষিত হইয়াছে। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ইহার একখানি চরণ এবং অক্সফোর্ডের 'অ্যাস্‌মোলিয়ান্ মিউজিয়ামে' ইহার অপর একটী চরণ ও মুণ্ড রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৬৫ এবং ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে মরিসিয়স্ দ্বীপের একটী বিস্তৃত জলাভূমি সংস্কার করিবার সময় পঙ্কের মধ্য হইতে এই পক্ষীর বহু অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই সকল অস্থি লণ্ডনের যাদুঘরে সংযোজিত করিয়া বিলুপ্ত 'ডো ডো'-র সম্পূর্ণ কঙ্কাল পরিকল্পিত করা হইয়াছিল। মরিসিয়স্ দ্বীপের যাদুঘরে এক্ষণে বোধ হয় তাহা সংরক্ষিত হইয়াছে।

এই সকল অস্থি পরীক্ষা করিয়া পক্ষী-তত্ত্বজ্ঞেরা অনুমান করেন যে, সেকালের 'ডো ডো'-রা পারাবত গোষ্ঠিরই অন্তর্গত ছিল।

বিলুপ্ত পক্ষীর তালিকায় 'ডো ডা'-র পরেই 'রোড্রিগেজ্' দ্বীপের 'সলিটেয়ার' বা 'নিরালাপাখী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্ষুদ্র 'রোড্রিগেজ্' দ্বীপ মরিসিয়স্ দ্বীপের ৩৭০ মাইল পূর্ব্বে ভারত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। এই দ্বীপটীর আয়তন মাত্র ৪২ বর্গ মাইল। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে ১৭২।১৭৩ বৎসর পূর্ব্বে 'নিরালা-পাখীরা' বাস করিত। এখন তাহাদের অস্থি ব্যতীত আর কোনও চিহ্ন পৃথিবীতে বিদ্যমান নাই। ফরাসী পর্য্যটক লিগেট্ সাহেব ইহাদের বিবরণ লিখিয়া না রাখিলে এবং এড্‌ওয়ার্ড নিউটন্ উক্ত দ্বীপে ইহাদের অস্থিপুঞ্জ আবিষ্কার করিয়া তথ্য নিরূপণ না করিলে আজ 'নিরালাপাখী'র কোন কথাই লোকে জানিতে পারিত না। লিগেট্ সাহেব ১৬৯১ খৃঃ অব্দে উক্ত দ্বীপে আসিয়া বাস করেন এবং ১৭৬১ খৃঃ অব্দে এই পক্ষীরা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

'ডো ডো' হইতে ইহাদের আকৃতি একেবারে বিভিন্ন হইলেও 'নিরালা পাখী', 'ডো ডো'-র মতই পক্ষহীন ছিল এবং তাহাদের মতই বীজাদি আহার করিত। ইহাদের আকৃতি অনেকটা বৃহদাকার মোরগের মত হইত।

'ডো ডো'-র মত ইহারা বৎসরে একটী মাত্র অণ্ড প্রসব করিত এবং পক্ষী ও পক্ষিণী উভয়ে মিলিয়া অণ্ডের উপর অঙ্গতাপ প্রয়োগ করিত। প্রজনন-কাল ব্যতীত দ্বীপের মধ্যে ইহারা একাকীই পৃথকভাবে অবস্থান করিত বলিয়া ইহাদের 'সলিটেয়ার' নাম দেওয়া হইয়াছিল। ইহাদের মাংস খুব সুস্বাদু ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। এই মাংসের লোভেই নাবিকেরা ইহাদের ধ্বংস-সাধনে তৎপর হইয়াছিল। দ্রুত ধাবনের ক্ষমতা না থাকায় ইহারা পলায়ন করিয়া শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে এড্‌ওয়ার্ড নিউটন্ 'রোড্রিগেজ' দ্বীপে ইহাদের বহু অস্থি আবিষ্কার করেন, এবং সেই সকল অস্থি সংযোজিত হইয়া সাউথ কেন্‌সিংটন-এর যাদুঘরে, বিলাতের Royal College of Surgeons এবং কেম্ব্রিজের যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে।

'ডো ডো' ও 'নিরালাপাখী'র অনেক পরে বৃহৎ 'অক্-পক্ষী' বিলুপ্ত হইয়া যায়। 'নিউফাউণ্ড্‌ল্যাণ্ড' ও 'সেণ্ট্ কিলডা' নামক দ্বীপ এক সময় ইহাদের প্রধান বাসস্থান ছিল। দক্ষিণ মহাসমুদ্রে এখন যেমন অসংখ্য 'পেঙ্গুইন্' পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়—উত্তর অ্যাটলাণ্টিক্ মহাসাগরেও সেইরূপ এক সময় বহু বৃহৎ 'অক্-পক্ষী' দৃষ্টিগোচর হইত। এখনকার পেঙ্গুইন্-দিগের মত ইহারাও

পক্ষহীন ছিল, এবং উচ্চে প্রায় তিন ফুট্ অবধি হইত। মানুষের প্রতি সরল বিশ্বাসই ইহাদের ধ্বংসের কারণ

বিলুপ্ত 'বৃহৎ অক্'

হইয়াছিল। ইহাদের বাসদ্বীপে নাবিকেরা পদার্পণ করিলে ইহারা তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত হয় নাই, এবং ধরিবার নিমিত্ত নিকটে গমন করিলেও ভয়ে পলায়ন করে নাই। ইহাদের এইরূপ নির্ব্বোধ প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া

সাধারণ 'পেঙ্গুইন্' পক্ষীর চিত্র।
বিশেষভাবে সংরক্ষিত না হইলে কালক্রমে ইহারাও বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে।

এবং ইহাদের মাংস সুস্বাদু বুঝিয়া নাবিকেরা ইহাদের ধ্বংস-সাধনে তৎপর হইয়াছিল। 'বৃহৎ অক'-এর নিকটে গমন করিলে তাহারা পলায়ন করে না দেখিয়া নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড্ ও সেন্ট্‌কিল্ডা দ্বীপের নাবিকেরা নিঃসঙ্কোচে ইহাদের নিকট গমন করিত ও মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া অসংখ্য 'অক্' বধ করিত। 'বৃহৎ অক-রা' এমনই নির্ব্বোধ ছিল যে, চতুর্দ্দিক হইতে ঘিরিয়া তাড়া দিলে উহারা পালে পালে নাবিকদের জাহাজের মধ্যেই প্রবেশ করিয়া আশ্রয় লইত। এইরূপে নির্ম্মম সংহারের ফলে ইহারা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

'ডো ডো' ও 'নিরালা পক্ষীর' মত 'বৃহৎ অক'-রা বৎসরে একটি মাত্র ডিম্ব প্রসব করিত, এবং তাহা অন্যান্য পক্ষীর মত নীড়ে সংস্থাপিত না করিয়া পর্ব্বত

ধ্বংসোন্মুখ 'ক্ষুদ্র অক্'

বা তটভূমির উন্মুক্ত স্থলেই রাখিয়া দিত। ইহাতে যে শুধুই অণ্ডনাশের সম্ভাবনা ছিল তাহা নহে, এই প্রকার স্বল্প অণ্ড প্রসবের ফলে সংহারের অনুপাতে ইহাদের রক্ষা-সাধন সম্ভবপর হইল না। ১৮৪৪ খৃঃ অব্দে 'বৃহৎ অক'-এর শেষ পক্ষীটীও পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

এক্ষণে 'বৃহৎ অক'-এর অল্প কয়েকটী ডিম্ব ও পালথ ব্যতীত আর কোনও চিহ্ন বিদ্যমান নাই। ইহাদের অণ্ড দুষ্প্রাপ্য বলিয়া অত্যধিক মূল্যবান্। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে একটী অণ্ড ৪৭২৫৲ টাকায় এবং বৎসর কয়েক পূর্ব্বে লণ্ডনে একটী অণ্ড ৪৫০০৲ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল। ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে মাত্র ৬৮টী অণ্ড এবং ৮০টী

পালখ সমেত চর্ম্ম ছিল বলিয়া জানা গিয়াছিল। ডিমের মত ইহাদের পালখ-সমেত চর্ম্মেরও মূল্য অত্যধিক। একটী পালখ-সমেত চর্ম্ম একবার ৫২৫০৲ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান কালে উত্তর অ্যাটলাণ্টিক মহাসমুদ্রে যে সকল 'ক্ষুদ্র অক' দেখিতে পাওয়া যায় তাহারাও যে কালক্রমে 'বৃহৎ অক'-দের মত বিলুপ্ত না হইবে তাহা কে বলিতে পারে! নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ও উত্তর হিমকোটী মণ্ডলের লোকেরা তাহাদের প্রধান আহার্য্য বোধে যে পরিমাণে ইহাদের অণ্ড ভক্ষণ করে তাহাতে বোধ হয় অণ্ড-ভক্ষণ কালবিশেষে নিরুদ্ধ না হইলে ইহারাও কয়েক শতাব্দীর মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

দাবী

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

১

সত্যব্রত সৌখীন যুবা। কোন কিছুর খুঁৎ সে সহ্য কর্‌তে পারে না। অবস্থা খুব স্বচ্ছল বলা যায় না; কলিকাতায় সিমলা অঞ্চলে দু'খানা বাড়ী। একখানায় সে নিজে বাস করে, অপরখানা ভাড়ায় খাটে।

সওদাগরী অফিসে সত্যর ষাট টাকা বেতনের চাক্‌রী। [illegible]। ভাড়ার টাকা ক'টি বড় চোখে দেখা যায় না—দু'খানা বাড়ীর ট্যাক্সের বাবদ সিধে কর্পোরেশন অফিসে চলে যায়।

গুটি চারেক ভগিনী ছাড়া সত্যর আর কেহ ছিলেন না। সকলগুলিই বিবাহিতা। তাহাও আবার দূরে, কলিকাতার বাহিরে। আর ছিলেন এক মাতুল, সম্পূর্ণ সেকেলে ধরণের সদানন্দ মানুষ। ভবানীপুরে বাড়ী। ছোট-বড় সকলের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব। প্রত্যেকের ঘরের খবর ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা এবং সুখ-দুঃখের অংশ লওয়া তাঁর স্বভাব।

এই মাতুলের আশ্রয়ে থেকে সত্য মানুষ। এবং মাতুলেরই চেষ্টায় সওদাগরী অফিসে তার চাক্‌রী। এই চাক্‌রী পাবার কিছুকাল পরে সে বাড়ীতে এসে বাস কর্‌তে বাধ্য হল। দূরে ভবানীপুরে থাকায় বাড়ী দু'খানা ভাড়া দেওয়ার ভাল সুবন্দোবস্ত হত না। অনেক সময় অনেক ভাড়াটিয়া দু'তিন মাসের অথবা তারও অধিক কালের ভাড়ার টাকা বাকী রেখে উধাও হ'ত।

যে-খানায় তারা নিজেরা চিরদিন বাস করে এসেছে সে-খানার উপর সত্যর বড় মমতা ছিল। তার একটু চুণবালি খসা সে সহ্য কর্‌তে পার্‌ত না। কিন্তু প্রত্যেক ভাড়াটিয়া বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার পর সত্য তদারক কর্‌তে গিয়ে প্রতিবারই দেখ্‌ত, চুণ বালি খসিয়ে কেরোসিনের কালিতে ঘরগুলি নোংরা করে রেখে গেছে। দেওয়ালে শুধু নয়, চৌকাঠ-জানালার গায়ে পর্য্যন্ত বড় বড় পেরেক চিরস্থায়ী সূত্রে আঁটা। হাতুড়ীর চোট সহ্য কর্‌তে না পেরে অনেক জায়গার কাঠও খসে গেছে। প্রতিবারই মেরামত করা হয় আর প্রতিবারই এই অবস্থা। এই সকল দেখে শুনে সে নিজের বাড়ীতে চলে এল। মাতুলও আর এ বিষয়ে আপত্তি তুল্‌লেন না। মাতুল যেমন তাকে ঐকান্তিক স্নেহ-যত্ন কর্‌তেন, সেও সেইরূপ তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা কর্‌ত।

মাতুল পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে এক ধানের আড়তে কাজ কর্‌তেন। সেই সূত্রে সেখানকার এক ভদ্র পরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। মাতুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় তিনি একজন বেশ সমৃদ্ধ ব্যক্তি। তিনি মনে কর্‌তেন, মানুষ কিছু মৃৎপিণ্ড নয়, সে কেন অপরের জীবন-ধারা জানিবে

না—বুঝিবে না—আপনার করিয়া লইবে না। আজকালকার সভ্যতা-গর্ব্বী বহু অসমবয়সীয় ছেলেদের নিকটে এজন্ত তাঁকে ব্যথাও পেতে হয়েছে বিস্তর। নাম জিজ্ঞাসা করলে তারা নাসিকা ফুলিয়ে তুলত। এ-সত্ত্বেও বন্ধু-বান্ধবের তাঁর অভাব হয় নাই। কিন্তু এই বন্ধু-প্রীতির কারণে তিনি হঠাৎ এমন এক অবস্থার ভিতরে এসে পড়লেন, যাতে সত্যব্রতর জীবন মরুভূমিতুল্য করে ফেললে।

আড়তের কার্য্য ত্যাগ করার পর একরূপ নিকম্মা অবস্থায় তিনি বাড়ীতে বসে বসে দিন কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। সত্য এই সময় সিমলার বাড়ীতে চলে এল। একটি ছোক্‌রা বামুন তার রান্না-বান্না করত, ঠিকা ঝি বাহিরের কাজকর্ম্ম করে দিয়ে যেত।

সত্যর আয় অল্প হলেও সে সৌখীন মানুষ। নিজের ঘরটি বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত। তার বসবার ঘরের মেঝের উপর কার্পেট পাতা। একদিকে চেয়ার, আলমারী, মার্ব্বেল পাথরের গোল টেবিল। টেবিলের উপর ফুলদানী—তাতে তাজা ফুলের তোড়া, অপর দিকে একটি মজলিসি বিছানা—টেবিল হারমনিয়ম, সেতার, সারেঙ্, বাঁয়া তবলা এই সমস্ত। কিন্তু তার গৃহে কোনদিন মজলিস্ বসতে দেখা যায় নাই।

প্রতিমাসের বেতন থেকে সে গৃহসজ্জার বাবদ কিছু কিছু ব্যয় করত। দাম যার অধিক এক মাসের উদ্বৃত্ত টাকায় সেটা খরিদ করা সম্ভব হত না। দু'তিন মাস অথবা তারও ঊর্দ্ধকাল হাতে অর্থ জমিয়ে সেটি সে খরিদ করত। কুশ্রী কদর্য্য কিছু অথবা গৃহের বিশৃঙ্খলা আদৌ সে সহ্য করতে পারত না। এ বিষয়ে কতকটা সে নিশ্চিন্তই ছিল। যদিও সে নিজে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলতে পারত না সত্য, কিন্তু তাঁর ঘরে উপদ্রব করার মত ছোট ছেলেমেয়ে ত' দূরের কথা, গৃহে একমাত্র সে ভিন্ন আর কেহ ছিল না। ছোক্‌রা বামুনটি রান্নাঘর নিয়ে থাকত। তার বৈঠকখানা ও শয়নের ঘরের মেঝে ঝি এসে একবার সাফ্ করে যেত। আর যা' কিছু করার সে নিজের হাতে করত। অফিসে যাবার বেলা সে দরজায় তালা লাগিয়ে যেত। কাজেই যেখানকার জিনিস সেইখানে থাকত—ওলট-পালট হ'ত না।

এই রকম ফিট্‌ফাট্ থাকত সে। কিন্তু চারিদিক্‌কার এই নিশ্চল নীরবতায় সময় সময় তার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠত। এমন নিঃসঙ্গ জীবন মানুষের থাকে!

যখন সে খোলা জানালা দিয়ে বিস্ময়-মুগ্ধ-দৃষ্টি মেলে বাইরের জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে চেয়ে মগ্ন হয়ে যেত, তখন প্রায় সে ভাবত ওই জ্যোৎস্নার রঙের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে তার জীবন সঙ্গিনীকে সে খুঁজে ঘরে আনবে।

রাত্রির বেলা শয্যার উপর শুয়ে থেকে সম্ভব-অসম্ভব কত কথাই তার মনে এসে জড় হত। মাঝে মাঝে সে এমনই আত্মহারা হয়ে পড়ত যে, সে যেন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করত, যে রূপের সন্ধানে সে উন্মত্ত, তার সেই চিরাকাঙ্ক্ষিতা মানস-লক্ষ্মী তার শয়নের খাটের পাশে যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি সুন্দর তার কেশবিন্যাস! সলাজ ঘোমটাটি [illegible] খোপায় জড়িয়ে ধরে রাখবার কি মনোরম [illegible]! কি টানা-টানা চক্ষু দু'টি—আর কি চমৎকার মুখ-শ্রী! গায়ের রঙ সোনাকেও হার মানায়। হাঁ, ঠিক এই রকমটিই ত' সে চেয়েছিল। এই ছিল তার সাধনা—এই ছিল তার জীবনের ব্রত।

সেই দিন রবিবার। অফিসের তাড়া নেই। ঠাকুর-চাকর এ সকল বিষয়ে বেশ হুঁসিয়ার। উড়িয়্যার বামুন হ'লে তারা এ দিন গঙ্গাস্নান করে—কপালে তিলক কাটে—চুণ-দোক্তায় সরস করে পান সেজে গালে পোরে। দেশবাসীর সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করে। তার পর গজেন্দ্র-গমনে এসে হাজির হয়। বাঙালী ঘরের-বামুন এদিনে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। আর শেষ মুহূর্ত্তে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে মনিবের ঘরের দিকে ছুটে।

সত্যব্রতর ছোক্‌রা-ঠাকুরটি উড়িয়্যার অধিবাসী। মনিবের অভিপ্রায়ে তাকেও ফিট্‌ফাট্ থাকতে হয়

প্রথম যখন সে কার্য্যে বাহাল হয় তখন বেতন আর খোরাকের ব্যবস্থা ছিল। এখন পোষাকের অতিরিক্ত ব্যয়ও সত্য ইচ্ছাপূর্ব্বক বহন করে। নতুবা তার নোঙ্‌রামী ঘুচে না—তাকে সুশাসনে রাখা যায় না। সে এসে কাছে দাঁড়াতে হঠাৎ সত্যর এক বন্ধু এসে হাজির হ'ল। নাম সুরদাস। উভয়ে এক অফিসে চাকুরী করে। বাড়ী টিটাগড়। সত্যর বাসার ঠিকানা তার নোট-বুকে টোকা ছিল। আজ নূতন এই সে সত্যর বাসায় এল।

সুরদাসকে পেয়ে সত্যর আর আনন্দ ধরে না। তাকে টেনে নিয়ে বল্‌লে, "একটা পাড়ার ভিতরে বাস করি বটে—বন্ধু-বান্ধব আমার একটিও নেই। তাদের চলনের সঙ্গে আমার চলাটা আদৌ খাপ্‌ খায় না। এতদিনে মনে পড়্‌ল বুঝি? সেই কবে ঠিকানা নিয়েছিলি—এক বছর হল না?"

সুরদাস হেসে বল্‌লে, "রোজই অফিসে পাই কিনা—তা' না হ'লে অনেক আগেই এসে পড়্‌তুম।"

সত্য বল্‌লে, "অফিসে কেরাণীকুলের কি জীবন থাকে নাকি রে? এক একখানা পাথর—যার যার সিটে অচল অটল। সেখানকার পাওয়া পাওয়াই নয়। জানিস্‌ সুরদাস! সন্ধ্যে হয়-হয় এমনই সময় আমি জন্মেছিলুম। শুন্‌তে পাই লোকের বাহুল্যে বাড়ীটা সর্ব্বদা সরগরম থাকৃত। আমি কিন্তু সে সব চোখে দেখি নি। আমি এসে দেখ্‌লাম মাকে আর চারিটি বোন্‌কে। বোনেরা একে একে পরের ঘরে যায় আর গুণ্‌তি করে দেখি ক'টি কম্‌ল। শেষ ছোট বোন্‌টি যেদিন প্রস্থান কর্‌লে সেদিন খুব বড় জোরেই একটা নিশ্বাস ছেড়েছিলুম। যাক্‌, তবু মা ছিলেন অন্তর জুড়ে। তাঁকে হারিয়ে সর্ব্বহারা হয়েছি। এমন নিঃসঙ্গ মানুষ দেখেছিস্‌ কোথাও?"

সুরদাসও একটা নিশ্বাস ছাড়্‌লে।

সত্য বল্‌লে, "ভাগ্যে মামা ছিলেন, তাই এ পর্য্যন্ত টি'কে আছি।"

সুরদাস জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "মামা কোথায়?"

"ভবানীপুরে তাঁর নিজের বাড়ীতে। তাঁদের খেয়ে আমি মানুষ। তাঁদের অন্ন ধ্বংস করেই এত বড়টি হয়েছি। কেবল বাড়ীটায় ভাড়া জোটে না। জুটলেও ভাড়াটেরা সময় সময় দু'পাঁচমাসের ভাড়া বাকী রেখে পালিয়ে যায়, তাই বাড়ীতে এসে থাক্‌তে হয়েছে।"

"রান্না-বান্না করে কে?"

"এই যে তোর চোখেরই উপর—এই ছোক্‌রা ঠাকুরটি। একে রেখেছি দু'টি ভাত সিদ্ধ কর্‌তে। আমি খাই একটু ঘি—একটু দুধ—আর ভাতে পোড়া একটা কিছু। এ সকলে আর গোলমাল নেই। ভাতগুলো সিদ্ধ হলেই ছোক্‌রাটির উপর চোখ রাঙানোর আর কোন কারণ থাকে না।" একটু হেসে বল্‌লে, "তাই বলে নিরামিষাশী নই—হাঁসের ডিম ভাতেও খাই।"

সুরদাস বল্‌লে, "তা' হলে ত' অতি সারবান জিনিসই খাস্‌?"

সত্য বল্‌লে, "সারবান জিনিস খাবার মত অবস্থা আমার নয়। তবে কম-বেশী এই রকমই খাই। ঘরের লোক কিছু নয়—বাইরের লোক মাস-গুণ্‌তি যারা মাত্র আটটি টাকা বেতন পায়—রান্না নিয়ে প্রতিদিন তাদের সঙ্গে খিটিমিটি কর্‌তে আমার ইচ্ছা হয় না।"

বাথায় সুরদাসের অন্তর কেমন করে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "অফিসঘরের দৈনিক হিসাব মিলালে ত' শুধু চল্‌বে না, ঘরের হিসাবও মিলাতে হবে। যাই হোক্‌ অন্তঃপুরের একটি হিসাবী লোক অবিলম্বে চাই।"

সত্য এ কথার উত্তর না দিয়ে হাত যোড় করে বল্‌লে, "ভাই! মিনিট পাঁচেক সময় দে আমাকে। ততক্ষণ আলমারী খুলে বই, মাসিক বা' হয় একটা কিছু পড়্‌। ওরাই আমার সময়-অসময়ের সঙ্গী।"

সে বাইরে চলে গেল।

সুরদাস আলমারী খুলে একখানা বই টেনে নিলে। কিন্তু বইখানা টেবিলের উপর ধরা রইল। সত্যর

এই নির্জ্জন গৃহের সত্যকার কাহিনী তখন তাকে অভিভূত করে রেখেছিল। বইয়ের পাতার কল্পনায় কাহিনী তাকে মুগ্ধ করতে পারছিল না। এমন একলাটি দিনের পর দিন বন্ধুটি যে কি করে কাটিয়ে দিচ্ছে সুরদাস ভেবে পাচ্ছিল না। তাকে একদিন এমন নির্জ্জনে কাটাতে হ'লে, মনে হ'ত একটা বিকট দৈত্য সর্ব্বগ্রাসী রূপ নিয়ে ঘর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি যেন একটা হারিয়ে যাওয়ার বেদনা গৃহের চারিধার ঘিরে বাতাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে।

একটু পরে সত্য বড় একখানা থালায় খাবার সামগ্রী হাতে করে এসে উপস্থিত হ'ল। ময়রার দোকানের কোন জিনিষ আর বাকী নাই। পশ্চাতে বাচ্চা ঠাকুরটির হাতে গরম চায়ের পেয়ালা।

সুরদাসের চঞ্চল দৃষ্টির কাছে এড়িয়ে গেল না যে, এ সকল সঙ্গী-বিরহের নিবিড়তর ব্যথার পরিতৃপ্তি! তবুও সে বললে, "আমার জন্য এতটা—"

"কার জন্য করব? কেউ ত' আমার এখানে আসে না।"

পাছে সত্য দুঃখিত হয় এজন্য সুরদাস বেশ আনন্দের সহিত থালাখানা শেষ করলে। কিন্তু সত্যকেও সে অংশী করে নিলে, রেহাই দিলে না। সে বললে, "একটা বিষয়ে আমার বড় আশ্চর্য্য ঠেকছে সত্য! তোর উন্নত মনের সঙ্গে বাড়ীটার সকল দিক্‌কার ঐক্য বেশ সুস্পষ্ট। কেমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিস্। কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই। এ খোকা-ঠাকুরটি আবার কোথায় পেলি? সহরের অনেক গৃহেই তল্লাস করতে হয়েছে বোধ করি। সংস্কারকের মন তোর—একেও দেখি নিজের রীতি-প্রকৃতির সঙ্গে কেমন সমন্বয় করে ফেলেছিস্।"

সত্য হাসলে।

সুরদাস বললে, "আমাকে এমন একলা জীবন কাটাতে হ'লে চিল-শকুনি মরা-গরু নিয়ে ভাগাড়ের যে অবস্থা করে, ঘরের জিনিসপত্রের ঠিক সেই অবস্থা হ'ত। কেহ বাড়ী-ঘরে এলে শ্রী দেখে বলত,—হতভাগা! লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার!"

সত্য বললে, "সেই রকমই হবার কথা। এই সকলে মন ভুলিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে এই রকমেই অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছি। এখন ছুরিটা-কাঁচিটা এমন কি কলমটা পর্য্যন্ত জায়গা-নাড়া হ'লে সহ্য করতে পারি না।"

সুরদাস বললে, "সে যতই হোক্, যত মূল্যবান আর যত সুন্দর জিনিষ দিয়েই ঘর ভরিস্ না কেন, গৃহের শূন্যতা যেন কাটছে না। এইবার বিয়ে-থা কর্।"

সত্য হাসলে। বললে, "সময় সময় ভাবি ও-পথে আর যাব না। আবার সময় সময় ভারি কষ্ট বোধ হয়।"

সুরদাস যে উদ্দেশ্যে এসেছিল, এবার যেন সে-সম্বন্ধে সুরাহা দেখতে পেলে। সে মনে মনে খুসী হ'ল। বললে, "ঐ রকমই হয়। প্রথমটা ভাবা যায় বেশ আছি। শেষে জীবন রসহীন তিক্ত বলে মনে হয়।"

ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করে সে দেখ্‌লে আটটা বেজে গেছে। বললে, "জামা-কাপড় পরে নে। মা পাঠিয়েছেন তোকে নিমন্ত্রণ করতে।"

সত্য হেসে বললে, "এ হতভাগ্যকে তিনি জানলেন কি করে?"

"এই হতভাগারই কাছ থেকে।"

সত্য বললে, "ছিঃ! তোর পিতামাতা বর্ত্তমান, অমন কথা বলা উচিত নয়। আমি যে ঠাকুরকে বলে দিলাম তোর চাল নিতে। খিচুড়ী খাবি কি মাংসের ব্যবস্থা করব তাই জেনে বাজারে যাব ভেবে রেখেছি।"

"ঠাকুর ত' রান্না চাপায় নি এখনও?"

"তা' চাপায় নি। রবিবার, বিশেষ তাড়া নেই। তারপর কি রান্না হবে এখনও তাকে বলা হয় নি।"

সুরদাস বললে, "তবে আজ থাক্। আর একদিন এসে স্ফুর্ত্তি করে খাওয়া যাবে। মা আবার তাঁকে

রেঁধে বেড়ে উপোসী হ'য়ে আমাদের জন্য পথ চেয়ে বসে থাকবেন।"

যাওয়ার জন্য প্রায় প্রস্তুত, এমন সময় সত্যর মামা রেবতীবাবু এসে উপস্থিত হলেন। এদের সাজসজ্জা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথাও যাবি নাকি সত্য?"

"হাঁ, টিটাগড় যাব, এঁদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে।"

রেবতীবাবু সস্মিতমুখে বললেন, "বাবাজীর নিবাস টিটাগড় বুঝি? সত্যর সঙ্গে কি সূত্রে —"

সত্যই জবাব দিলে। বললে, "আমরা এক অফিসে চাকরী করি, মামা!"

রেবতীবাবু হেসে বললেন, "চাকরী এক অফিসে কত লোকই করে, ঘনিষ্ঠতা হয় ক'জনার সঙ্গে? তা' বেশ! আমি আবার খুব ব্যস্ত। বর্দ্ধমান থেকে এক 'তার' এসেছে। সেও এক বন্ধুর কাছ থেকে। আমিও সেজে গুজে যাত্রা করে বেরিয়েছি। হাস্‌চ যে? আমাদের বুড়োয়-বুড়োয় বন্ধুত্ব হয় না বুঝি? এ ভাঙ্গেও না—মচ্‌কায়ও না। অনেক ঝড়-ঝাপ্‌টা সহ্য করার পর পাকা-পোক্ত মন নিয়ে হয় কিনা, তাই। বাবাজীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার তেমন সুবিধে হ'ল না। ওরে সত্য! শুধু খেয়েই আসিস্‌ নে। বাবাজীকে একদিন গরীবের কুটীরে নিয়ে যাস্‌। আর কিছু না পারি, গল্প দিয়ে পেট ভরাতে পারব। তোর মামীমা আবার কি খাবার করেছেন, তাই দিয়ে পাঠালেন। যাত্রাকালে আর নাম করব না। সে থাক্‌, বাবাজী এতদূর থেকে এসেছেন, ওঁর সঙ্গেই যাও।"

২

বাড়ীতে ডেকে এনে সত্যকে ছুটি খাওয়ানর উদ্দেশ্য শুধু সুরদাসের ছিল না, অপর মতলব ছিল। কিন্তু সে কপট নয়। পাছে সত্য লজ্জা-কুণ্ঠায় আসতে আপত্তি করে সেই ভয়ে সে প্রকাশ করে বলে নি।

সুরদাসের এক মাসতুতো অবিবাহিতা ভগিনী ছিল। মাসিমার বাড়ী তাদের একই গ্রামে। মেসোমহাশয় বর্ত্তমান নাই। অবস্থা ভালই। বাড়ীতে লোহার সিন্দুক—বন্ধকী গহনা—কোম্পানীর কাগজপত্র ছিল। কেবল পুরুষ-মানুষেরই অভাব। মেয়ে পার করবার ভাবনা এঁদের বিশেষ কিছু ছিল না। মেয়ের দিক্‌ থেকেও নয়—গৃহস্থের দিক্‌ থেকেও নয়। সুরদাসের ইচ্ছা, ছেলেটি স্বাস্থ্যবান ও সুপাত্র হয়। বড় মানুষের পক্ষপাতী সে নয়। মোটা ভাত মোটা কাপড়ে দিন গুজরাণ করতে পারে, এই হ'লেই যথেষ্ট।

এ সম্বন্ধে সত্যর উপর তার অনেক দিন থেকে ঝোঁক ছিল। মা ও মাসি তাগিদ দিতেন,—ছেলেটিকে এনে একবার দেখা। এবার মাসী নিজের হাতে জামা-কাপড় গুছিয়ে দিয়ে বললেন, "আজ রবিবার আছে, নিয়ে আয় ছেলেটিকে। এই বেলায় ফিরবি কিন্তু। আমরা তোদের খাবার তৈরী করে রাখব।"

সত্য এসে উপস্থিত হ'লে সুরদাসের মা ও মাসী বললেন, "বেশ ছেলে!"

উপস্থিত জলযোগ সমাধা হ'লে সত্যকে নিয়ে সুরদাস বাইরের ঘরে এসে বসল। সুরদাস বললে, "দ্যাখ্‌, তোকে একটু সতর্ক করে রাখি, ভোম্বল-দাসের মত বোকা বনে' বসে থাকিস্‌ নে যেন। রূপ যা আছে তার উপরে আর খোদকারি চলবে না। শৌর্য্য-বীর্য্য দেখিয়ে ছোট্ট একটি মেয়েকে মুগ্ধ করবার জন্য তোকে কিন্তু ডেকে আনা হয়েছে এ বাড়ীতে।"

সত্য এতক্ষণে এঁদের চক্রান্ত বুঝতে পারলে। হেসে বললে, "আচ্ছা মতলব-বাজ ছেলে ত' তুই? 'বুদ্ধির্যস্য স জীবতি', বেঁচে থাক্‌। কিন্তু শৌর্য্য দেখাব কি হাত-পা ছুঁড়ে? ঘরের কাছে কিছু লক্ষ্যভেদের ব্যবস্থা ত' করে রাখিস্‌ নি যে, অর্জ্জুনের মত আস্ফালন করে যেয়ে ধনুর্ব্বাণ হাতে ধরব।"

সুরদাস হেসে বললে, "তেমন কোন আয়োজন নেই। তার প্রয়োজনও নেই; কেননা তেমন কোন প্রতিজ্ঞা মেয়েটিরও নেই—আমাদেরও নেই। বোকার মত বসে থাকিস্‌ নি—ভিতরে বেশ কিছু আছে— এই রকমের একটু আভাস দিবি আর কি!"

মেয়েটি দেখে সত্যর বেশ পছন্দ হ'ল। যে রকমটি সে চায়—ঠিক তাই। গায়ের রঙটি অতি চমৎকার, যেন উদয়োন্মুখ সূর্য্যের কমনীয় বর্ণচ্ছটা। মেয়েটিকে তার বেশ মনে ধ'রল। সে ইঙ্গিতে জানিয়ে রাখ্‌লে, তার মামার মতামতের উপর সমস্তই নির্ভর করবে। তাঁর মতের বিরুদ্ধে তার এক পা'ও এগুবার শক্তি নেই—ইচ্ছাও নেই।

এদিকে সত্যর মামা রেবতীবাবু সেইদিনই উদ্বিগ্ন-চিত্তে বর্দ্ধমানে তাঁর বন্ধু চন্দ্রনাথবাবুর বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বর্দ্ধমানে বহুদিন ধানের আড়তের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময় চন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়।

আড়তের পিছনের চালাঘরে রেবতী নিজের জন্য হাত পুড়িয়ে রান্না করতেন। চন্দ্রনাথ খবর পেয়ে একদিন এসে তাঁর ভাতের হাঁড়ি ফাটিয়ে দিলেন। সেইদিন থেকে শেষ পর্য্যন্ত চন্দ্রনাথের গৃহে তাঁর খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা ছিল। কোনদিন বাজার থেকে একটা মাছ হাতে করে গেলেও চন্দ্রনাথ ভয়ঙ্কর চটে যেতেন। ক্রমে আত্মীয়বৎ ব্যবহারে তিনি সেই বাড়ীরই একজন হ'য়ে গিয়েছিলেন। বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত মনোবৃত্তির মধুরতম স্পর্শে তাঁকে কোনদিন কৃতজ্ঞতাভারে নুয়ে পড়তে দেন্ নি। দীর্ঘকালের সংশ্রবে রেবতী শুধু এঁদের হাঁড়ির খবর জানতেন না — স্ত্রী-পুরুষ-বালক-বৃদ্ধ সকলকার মনের খবরও জানতেন।

চন্দ্রনাথ পূর্ব্বে বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। দো-মহলা বাড়ী, বাঁধা পুষ্করিণী, বাগান-বাগীচা—সে সকল এখনও অক্ষত দেহে বর্ত্তমান আছে। নাই কেবল অর্থ। বাড়ীটা এখন মহাজনের হস্তে ঋণে আবদ্ধ। কলিকাতায় তাঁর লোহের কারবার ছিল। সেই কারবারে লক্ষ্মীকে তিনি পেয়েও ছিলেন, আবার হারিয়েও ছিলেন।

টেলিগ্রাম পেয়ে রেবতীর চিন্তার সীমা ছিল না, না-জানি কি আপদ বিপদ ঘটে থাক্‌বে। এক হাঁটু ধূলি নিয়ে ভয়ে ভয়ে তিনি ওঁদের বৈঠকখানা ঘরে এসে ঢুক্‌লেন। দেখ্‌লেন ঘরে আর কেহ নাই। চন্দ্রনাথ ইজি-চেয়ারের উপর বিষন্ন মুখ করে শুয়েছিলেন। চক্ষু দু'টি ক্লান্ত ও ব্যথিত। রেবতী অমঙ্গলের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লেন। ভয়ে ভয়ে ডাক দিলেন, "চন্দ্র বাবু!"

চন্দ্রনাথ চকিত হ'য়ে চেয়ে দেখেই আসন ছেড়ে উঠে দুই হাতে তাঁকে বুকে চেপে ধরে কেঁদে ফেল্‌লেন।

পরে উভয়ে আসন পরিগ্রহ করে একটু স্থির হয়ে বস্‌লে চন্দ্রনাথ বল্‌লেন, "এবার মুখে কালি পড়ল রেবতী-দা'! তোমার ঐ কালো মেয়ে, যে তোমার অত্যন্ত আদরের ছিল সেই মীনার বিয়ের সমস্ত ঠিক-ঠাক। ভাবী বেহাই এসে পত্রাপত্র করে গেলেন; আসছে পরশু তারিখে এই বিয়ের কথা। মাঝে পাত্রটি নাকি অন্য পরিচয়ে আত্মগোপন করে এসে নিজেই মেয়েটি দেখে গেছেন। কাল সকালে তাঁর বাবা পত্রের দ্বারা এ সংবাদ আমাদের জানিয়েছেন। আরও জানিয়েছেন,—কালো মেয়ে বলে ছেলেটি এ বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি অত্যন্ত দুঃখের সহিত এ সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হলেন।"

রেবতীর ধড়ে প্রাণ এল। তিনি বল্‌লেন, "ওঃ! প্রাণগতিক ত' সব মঙ্গল? কুছ্-পরোয়া নেই। আজকালকার ফচ্‌কে ছোঁড়া যত—মীনাকে বলে কালো! ছেলেটি কেমন? হাউয়ের কাঠি—না গুণ্ডার সেনাপতি? একবার মনটা যাচাই করে দেখলে পারত—কালো কি ধলো? পেটের জ্বালায় কল-কারখানার আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের আবার ভিরকুটি! মেয়েটার বরাতের জোর যে, অমন ছেলের হাতে পড়ে নি। রূপ কি শুধু রঙে? সৌন্দর্য্যের জ্ঞান ছোঁড়াদের টনটনে। মায়ের যেমন স্বাস্থ্য—তেমনি গোলগাল গড়ন। ওই রকম চুলের গোছা—আর কালো দু'টি ভাসন্ত চোখ যে সাধনা করে পেতে হয়! সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেছে ত' বয়ে গেছে। কালি পড়বে সেই চামার বেটাদের মুখে—তোমার কি?"

রেবতী এ বাড়ীতে থাকতে মীনা যে আদর-সোহাগ তাঁর কাছে পেত, তেমন তার মা-বাপের কাছেও পায় নি। মীনাও ইঁহার একান্ত অনুগত হ'য়ে পড়েছিল। তার প্রতি এই অবহেলায় তিনি অত্যন্ত চটে গেলেন। এ ধরণের কটূক্তি বোধ করি তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কোনও দিন কাকেও করেন নি।

খাওয়া-দাওয়ার পর দুই বন্ধু বাহিরের ঘরে বিশ্রাম করছিলেন। রেবতী শুনলেন মিঠাই, মণ্ডা, দধি, ক্ষীর, মৎস্য ইত্যাদি সকল দ্রব্যেরই বায়না করা হয়ে গেছে। এ সংবাদে তাঁকে কিছু বিচলিত হ'তে দেখা গেল কিছু সময় চিন্তা করে তিনি বললেন, "যদি এই তারিখেই কাজ করতে হয়, ভাবনার দুটি কারণ আছে। এক, এত শীঘ্র সুপাত্র হয় ত' জুটবে না—যার তার হাতে মেয়েটিকে সমর্পণ করতে হবে। অপর, দাঁও পেয়ে পণের দাবী অত্যধিক বেড়ে যেতে পারে।"

চন্দ্রনাথ বললেন, "সুপাত্র যে জুটবে না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। এতদিন যখন জোটে নি তখন এমন একটা ঘটনার পর সে আশা করাই বৃথা। পণের দাবী সম্বন্ধে যদি বেশী হাত গুটাতে যাই, মাকে হয়ত আরও অধিক অপাত্রে বিসর্জন দিতে হবে। সাধ্যের অতীত হ'লে দাবী মিটাব কি দিয়ে? এখন কে বা এ সকল খোঁজ করে—আর গড়া-পেটাই বা করে কে?"

রেবতী মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করছিলেন যে, এতবড় দুর্দ্দিনে এক মাত্র তাঁকেই আহ্বান করে আনা হয়েছে। তিনি চন্দ্রনাথের কথায় আর কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে—খাটের উপরকার বিস্তৃত শয্যায় অঙ্গে অঙ্গে গা ঢেলে দিলেন।

কিছু সময় পরে চন্দ্রনাথ দেখলেন তিনি নিশ্চিন্ত-মনে নাসিকা-ধ্বনি করছেন।

চন্দ্রনাথের মনে সোয়াস্তি ছিল না। রেবতী যতক্ষণ নিদ্রা গেলেন তিনি খাটের এক পাশে বসে থেকে আকাশ-পাতাল ভাবনায় কাটিয়ে দিলেন। মনের এই বিষম ভার তিনি বইতে পারছিলেন না।

রেবতী গাত্রোত্থান করলে তিনি মীনাকে ডেকে পান-জল দিতে বললেন।

একান্ত লজ্জায় আড়ষ্টভাবে মন্থরগতিতে মীনা এসে কাছে দাঁড়াল। তার মুখে যে বিষাদের চিহ্ন তিনি দেখলেন চন্দ্রনাথের মুখের ভাষায় তার কতটুকুই বা ধরা পড়েছে? তিনি সশঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। বললেন "মীনা, কতদিন পরে তোমার ছেলেটি ঘরে এল তাকে বুঝি কুটুমের মত শুধু পান-জল দিয়েই ভোলাবে?"

সে ঘাড় হেঁট করলে।

রেবতী বললেন, "শুধু পান-জলে কিন্তু দুষ্ট ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্টতা হবে না মা-লক্ষ্মী! সেই হুতুম পেঁচার গল্পটি মনে আছে ত'? এ বয়সে আবার কি সব নূতন গল্প শিখলে তার পরিচয় রাতের বেলা রকের উপর মাদুর পেতে বসে দিতে হবে কিন্তু।"

বিবাহ-ভঙ্গের নিদারুণ সংবাদ শুনার পর বাড়ীতে যতগুলি লোক ছিলেন মীনাকে দেখে মনে হয়েছিল, সে-ই বুঝি সব চেয়ে শান্তির রূপ ধরে আছে। অপমানে তার দেহ যে ভেঙ্গে পড়ছিল, কেহ বড় অনুভব করতে পারেন নি। এদিকে রেবতীরই লক্ষ্য পড়ল সকলের আগে। তিনি চেয়ে দেখলেন, পানের ডিবা ও জলের গ্লাসটি রেখে সে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে।

চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন উপায় কি? বায়না-পত্তর সমস্ত ফিরিয়ে আনব? ময়রাদের বোধ হয় দু'চারখানা ভিয়ানের কড়াও নেমে গেছে। আত্মীয়-কুটুম সবাইকে বলে ফেলেছি। তোমার চিঠিটাও বোধ করি এতক্ষণ পৌঁছে গেছে।"

রেবতী বললেন, "যেরূপ লোভ দেখাচ্ছ তুমি—আর আমার নামে চিঠিও যখন একখানা ছেড়েছ তখন মিঠাই-মণ্ডার লালসা ছেড়ে দেবার মত কোন সদ্‌যুক্তি কি আমি তোমাকে দিতে পারি? 'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।' দেখাই যাক্ না। শুনলাম, বাড়ীখানাও বন্ধক রেখেছ, আমাকে একবার জানাতে পার নি? মন্দ সময়ে এরূপ বাধ্য-

টাকা দিয়ে ঋণ করো না কোনদিন, সে আর খালাস হ না।"

চন্দ্রনাথ বললেন, "বাড়ীটা এই সম্প্রতি বন্ধক রেখেছি। মীনার বিবাহের দাবী-দাওয়া নিয়ে পাত্রপক্ষ য ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসলেন, সে দাবী মেটান আমার এ বর্তমান অবস্থায় সম্ভব ছিল না। দেখ্‌লাম ক্ষায়ক্লেশে যা সংগ্রহ করেছি খাওয়া-দাওয়া আর বাইরের খরচ-পত্রটা কোন রকমে চল্‌তে পারে। গহনা, বরসজ্জা বাড়ীর বন্ধকের টাকা দিয়েই প্রস্তুত করা গেছে।"

রেবতী পান-জল খেয়ে একলাই সহরের দিকে বেড়াতে বের হ'য়ে গেলেন।

এদিকে বেলা পড়ে এল, সে-দিনটিও যায়। চন্দ্রনাথ একলাটি সেই আসনেই তদবস্থ হ'য়ে বসে রইলেন। যাঁকে ভরসা করে কাছে ডেকে আন্‌লেন, তাঁর নিকটে এ পর্য্যন্ত কোন সদ্যুক্তি তিনি শুন্‌তে পেলেন না। এখনকার একটি পল, একটি দণ্ড কি এইরূপ অবহেলায় কাটিয়ে দিতে পারা যায়? তাঁর মন ক্রমেই ভেঙে যাচ্ছিল।

ভেবেছিলেন পাড়া-প্রতিবাসী পাঁচজনকে ডেকে রেবতীর সম্মুখে একটা যুক্তি স্থির করবেন। রেবতী ত' নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে গেলেন। তিনি আর স্থির থাক্‌তে না পেরে পাড়ার সকলকে ডেকে এক প্রতি-বাসীর গৃহে এসে বস্‌লেন। সকলেই এ সংবাদ অবগত ছিলেন। কেহ বল্লেন,—"তাই ত', সময় যে খুবই অল্প—এত শীঘ্র পাত্র পাওয়া—যে বাজার!" কেহ বল্লেন,—"আমার এক পিসতুতো ভাই আছে, একটা দিনের অবসরে তারা কি গুছিয়ে উঠ্‌তে পারবে? দেখি, কাল একবার যাব।" এই পর্য্যন্ত।

চন্দ্রনাথ ফিরে এসে ইজি-চেয়ারের উপর শুয়ে পড়্‌লেন। পাড়ার লোকের আশা-ভরসায় নিরাশ হ'য়ে তখন রেবতীর কথাই পুনঃ পুনঃ মনে উঠ্‌ছিল। তাঁর প্রথম কন্যার জন্য এই রেবতীই এ-গ্রাম সে-গ্রাম পায়ের তলায় করে পাত্র জুটিয়ে এনেছিল। সেও কি এই দুঃসময়ে এমন পরিবর্তন নিয়ে উপস্থিত হ'ল যে তার কাছে সাহস পাবার কিছুই নেই? হা ভগবান! তাঁর বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পেয়ে আসছিল।

এদিকে রেবতী ফিরে এসে নিজেই হাঁক ছেড়ে মীনাকে কাছে ডেকে তার সঙ্গে গল্প-গুজবে মেতে উঠ্‌লেন। মীনা অবশ্য ব্যথায় আড়ষ্ট হ'য়েই ছিল। বিশেষতঃ অতি সন্নিকটে উপবিষ্ট পিতার অভিব্যক্তি এক এক বার দেখে সে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। রেবতী হাস্য-পরিহাসে তাকে সে-দিক থেকেও ভুলিয়ে আন্‌বার চেষ্টা করছিলেন।

৩

পরদিন সকালে সত্য এসে উপস্থিত হ'ল। জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে 'তার' করেছেন?"

রেবতী তাকে দেখে পুলকিত হয়ে উঠ্‌লেন। বল্লেন, "ভাব্‌বার কিছু নেই। তোমার মামাটি সশরীরে বিদ্যমান আছেন। আর রোগ-পীড়া অথবা অপর কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় যে আক্রান্ত হই নি, তা' এই সুস্থ শরীর দেখে অবশ্য বুঝ্‌তে পারছ। কাল সন্ধ্যার সময় 'তার' করেছি, রাত্রেই ত' পাবার কথা?"

"তাই পেয়েছি।"

"সকালে জলটল খেয়ে বের হও নি বোধ করি।"

সত্য বল্লে, "থাক্—"

"থাক্‌বে কেন? 'তার' পেয়ে এসেছ বলে তোমাকে ত' চিনি, মামার চিন্তায় খাবার কথা তোমার মনেই ওঠে নি।"

জলযোগ শেষ হ'লে সত্য জিজ্ঞাসা করলে, "'তার' করেছেন কেন?"

"সে এর পরে শুনো। পরিশ্রান্ত হ'য়ে এলে, বাইরের ঐ ফুলবাগানে বেঞ্চি আছে, বিশ্রাম করগে। কলকাতার পার্কে রাস্তার ধুলো আর কলের ধোঁয়ার হাওয়া খাও, আর এঁর ফুলবাগানের শিউলি ফুল-তলাটায় গিয়ে বস দিকি নি, শরীর জুড়িয়ে যাবে। শিউলিফুলের গাছ অত বড় আর অত নিখুঁত গাছে পাবে কোথাও দেখি নি।"

সত্য চলে গেলে রেবতী জিজ্ঞাসা করলেন, "পাত্রটি কেমন দেখলে ?"

সত্য বাস্তবিকই সুপুরুষ। রঙে, স্বাস্থ্যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনদিকে বড় খুঁৎ দেখা যায় না। চন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "ছেলেটি কে ?"

"আমার ভাগে। কল্‌কাতায় দু'খানা বাড়ী আছে। চাকরীও আছে একটা। বেতন পায় ষাটটি মুদ্রা। সংসারে কিন্তু আর দ্বিতীয় মনুষ্য নেই। বেশ সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী আর কর্ত্তব্যপরায়ণ।"

চন্দ্রনাথ এতটা আশা করেন নি। তিনি জান্‌তেন না যে, সত্য নামধারী এঁর উপযুক্ত একটি ভাগিনেয় আছে। তাঁর মনের ভিতর ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। চোখের কোণেও জল জমে এল। বল্‌লেন, "তোমাকে পেয়ে আমার কোনদিন তৃপ্তি হ'ল না রেবতী! যতদিন এ বাড়ীতে ছিলে বেশ ছিলাম। দায়-উদ্ধার করে দিয়ে আবার ত' খসে পড়্‌ছ ?"

রেবতীরও চক্ষুদু'টি সজল হ'য়ে উঠ্‌ল।

চোখের জলটুকু রোধ করে তিনি বল্‌লেন, "দায়-উদ্ধার ভগবান্‌ই তোমার করে দেবেন। আমি কোথাকার কে ? ছেলেটির যা বিবরণ দিলাম বাড়ীর মধ্যে একবার আলোচনার দরকার। শাশুড়ী-ননদ ঘরে না থাক্‌লে মেয়েটি সুখী হ'তে পার্‌বেন কিনা, সে বিষয় তাঁরাই অধিক বুঝবেন। তা'ছাড়া জমীদারী-টারী কিছু নেই। একখানা বাড়ীতে নিজেই বাস করে। আর একখানায় টাকা সত্তর ভাড়া ওঠে। নিজের বেতন ষাটটি টাকা মাত্র। ব্যস্‌।"

উত্তরের প্রণয়টুকু রেবতী এক জায়গায় অটুট করে ধরে রেখেছেন, ভাব্‌তে গিয়ে চন্দ্রনাথের দুই চোখ ছাপিয়ে জল এল। তিনি মুখ ফুটে কিছুই বল্‌তে পার্‌লেন না।

রেবতী চিন্তা করে দেখলেন, এ ভিন্ন আর গতি নাই। এই অল্প সময়ে লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়ালে তিন টাকার গৃহস্থ তিনশো টাকার ডাক্‌ ছাড়্‌বে, সে সমস্ত বরদাস্ত করা যাবে না।

চন্দ্রনাথ বল্‌লেন, "মীনাকে একবার ছেলেটির দেখা দরকার।"

রেবতী বল্‌লেন, "তা অবশ্য।"

তারপর সত্যকে কাছে ডেকে মাতুল ঘটনাটি বিস্তারিত জানালেন এবং বল্‌লেন, ভদ্রলোকের মান, সম্ভ্রম, জাতি সকলি যায়। জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি, কি একবার মেয়েটি দেখ্‌বে ?"

সত্য লজ্জায় উত্তর কর্‌লে, "কি দরকার! আপনি ত' দেখেছেন একবার।"

রেবতী বল্‌লেন, "একবার নয়, বহুবার। তার জন্মাবধি তাকে দেখে আস্‌ছি। আর একটি কথা,—যে-পাত্রটির সঙ্গে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল তাঁদের দাবীমত গহনা-বরসজ্জা সংগ্রহ কর্‌তে এঁর বাড়ীখানা বন্ধক পড়েছে। তার কি হবে ?"

সত্য বল্‌লে, "গহনা-বরসজ্জার দরকার নেই। আপনি বলুন, বাড়ীখানা যেন বিবাহের পূর্ব্বেই সেই টাকায় খালাস করা হয়।"

রেবতী বল্‌লেন, "তাহ'লে তোমার আর কল্‌কাতায় ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। কাল ত' বিয়ে, অফিসে একখানা চিঠি লিখে দাও।"

সত্যর চোখে তখন টিটাগড়ের মেয়েটি ভাস্‌ছিল। বিশেষতঃ কপালে ছোট একটি টিপ পরে পরীর মত রূপ নিয়ে যে মেয়েটি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, তার সম্বন্ধে কোন আপত্তি সে জানায় নি। রাত্রি পার হয় নি — যদি এমনই একটা ঘটনা সংঘটন হয়, সুরদাসের নিকটে তার মনোবৃত্তি অভিনবই ঠেক্‌বে। তাই এই মিলন-প্রচেষ্টা কোন দিক্‌ দিয়ে তার প্রাণে যেন আঘাত কর্‌ছিল। একবার মনে কর্‌লে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে এসে হাজির হবে, মামাকে কথা দিয়ে সে কলিকাতায় চলে যাবে। সেখানে বসে ভেবে চিন্তে দুশ্চিন্তা স্থির কর্‌বে। কিন্তু কি বা স্থির কর্‌বে ? কাল ত' বিবাহের দিন। যদি পাত্র না এসে আপত্তি আসে,

তখন আর বারোটি ঘণ্টাও অবশিষ্ট থাকবে না। সে-নিষ্ঠুরতার সীমা নির্দেশ করতে স্বয়ং ভগবানও পেরে উঠ্‌বেন না। আর মাতুলের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলে, তাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করতে হবে সুনিশ্চিত। তাঁর অবাধ্য সে কোনদিন হয় নি। কাজেই কল্‌কাতায় যাওয়ার ইচ্ছা সে ত্যাগ করলে। কিন্তু পরদিন রাত্রির বেলা শুভ-দৃষ্টির সময় কালো রূপ দেখে তার মন একেবারে বিগড়ে গেল।

৪

বর-কনে সঙ্গে নিয়ে রেবতী তাঁর ভবানীপুরের বাড়ীতে এসে উঠ্‌লেন এবং সেখান থেকে মেয়েটিকে আবার বর্দ্ধমান রওনা করে দিলেন। পরের যাত্রারও প্রথমতঃ কিছুদিন নিজের বাড়ীতে এনে রেখে, পরে একদিন মেয়েটিকে সঙ্গে করে সত্যর কাছে রেখে এলেন।

সত্যর কিন্তু মনের গুমোট্‌ভাব তখনও কাটে নি। বাইরে যদিও কিছুই প্রকাশ করে নি, ভিতরে ভিতরে সে গুমরাচ্ছিল।

যাই হোক্, সত্য অমানুষ ছিল না। আবার মীনার মুখে কোন প্রয়োজনের বালাইও ছিল না। সত্য অনুমানের বলে তার জন্য অনেক কিছু আনতে ত্রুটি করত না, কিন্তু সে সকল হাতে ধরে দেবার বেলায় অন্তরের রাগ-রশ্মি তেমন ফুটে উঠ্‌ত না; মীনার চোখে সেটা ধরা পড়ে যেত। ঐখানে ছিল তার ব্যথা।

একদিন সত্য একখানা বেশ দামী মাদ্রাজী সাড়ী এনে তার হাতে দিলে।

মীনা বল্‌লে, "এত দামী কাপড় কেন এনেছ? কি হবে এ দিয়ে?"

সত্য বল্‌লে, "কি হবে তা' জানি নে। লোকে পরার জন্য এ সকল তৈরী করে, আর লোকে পয়সা খরচ করেই এ সকল কেনে। তাই এনেছি।"

মীনা বল্‌লে, "আমার উপর তোমার যে আশীর্ব্বাদ সেই-ই সকলের উপরে। এ রকম অবস্থায় অতিরিক্ত ব্যয় যদি কর, দুর্ভাবনায় নিজেই আবার একদিন ক্লান্ত হ'য়ে পড়্‌বে।"

সত্য বল্‌লে, "অবস্থার খবর তোমার জানার দরকারই বা কি?"

মুখে সেই মৃদু গাম্ভীর্য্য।

মীনা ভয় পেয়ে আর কিছু বল্‌লে না।

সত্য কিন্তু থাম্‌লে না। বল্‌লে, "আমি গরীব-গৃহস্থ, এই ব্যথায় বুঝি ভরে রেখেছ সমস্ত মন? কিন্তু এখনও ত' মরি নি — চেষ্টা করলে বড় হতেও পারা যায়।"

মীনার কপাল ঘেমে উঠ্‌ল। সে কাপড়খানা নিতে হাত বাড়াল। বল্‌লে, "দাও।"

আর একদিন সত্য জিজ্ঞাসা করলে, "বায়স্কোপে যাবে? 'কপালকুণ্ডলা' নাকি ভাল দেখাচ্ছে।"

মীনা বল্‌লে, "তুমি যাবে ত'?"

"আমার সময় হবে না, কাজ আছে। তোমাকে রেখে কাজে বেরিয়ে যেতে পারি, আবার ফির্‌বার সময় সঙ্গে করে আনতে পারি।"

মীনা বল্‌লে, "থাক্।"

সন্ধ্যা ছ'টার পর স্বামীর বিশেষ কি প্রয়োজনীয় কাজ? আর সে এমনই কাজ যে, একদিনেরও ফুরসৎ মিলে না? এইরূপে প্রতিনিয়ত মীনার অন্তরে নূতন নূতন ব্যথার সৃষ্টি হচ্ছিল।

কিন্তু মীনার কোন কাজেই সত্য কোন খুঁৎ ধরত না। আবার প্রশংসাও দিত না। নির্ব্বিকার মানুষটি দ্বিধাহীন চিত্তে দরদের সঙ্গে এ সকল গ্রহণ করত কি উপেক্ষা করে চলত বুঝা যেত না। মনের ভিতর যা' গাঁথা থাকে তার অর্থ বুঝা শক্ত।

অদ্ভুত এই মানুষটি। তার আচরণে স্ত্রীর প্রতি অযত্নের ভাব কিছু প্রকাশ পেত না। ভাল সামগ্রীটি দেখ্‌লে সে মীনার জন্য সংগ্রহ করে আন্‌ত। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত স্ত্রীর সঙ্গে সে বড় অধিক কথা বল্‌ত না। মীনার অন্তরে কিন্তু কথা জমে জমে

চেঁচা মেরে উঠ্‌ত। এমন যোগীপুরুষকে নিয়ে কি সংসার করা যায়?

এদের অন্তরের এই গোলযোগ নিয়ন্ত্রিত করতে সংসারে কেহ ছিলেন না। কাজেই দিন সমানভাবে বয়ে চলছিল। কিন্তু একটি বিষয়ে সত্যর সর্বদা লক্ষ্য পড়ছিল যে, তার গৃহের জিনিষপত্র যেমনটি সে চায় সেই রকমই সাজান-গুছান থাকে। কখনও এতটুকু বিশৃঙ্খলা ঘটে না। বরঞ্চ এমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় যে, সময় সময় সত্যর নজর সে দিকে গিয়ে পড়ে।

মীনা এসে ঠাকুরকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। দু'টি প্রাণীর সংসার, বাইরের লোক এসে তার আবার কি সহায়তা করবে? সত্য কোনদিন জানাত না যে,—"এ রাঁধ — এ কর।" কিন্তু স্বামীর তৃপ্তি-অতৃপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখে মীনা তার অন্তরের সমস্ত অস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করতে পারত। স্বামী যা' চায় ঠিক তেমনটি করে রেখে সত্যর অন্তরে যেন সে উগ্র জ্বালা ধরিয়ে দিত। কিন্তু সত্য তার অভ্যস্ত পথে সমভাবেই চলে যাচ্ছিল।

বছর চারেক এইভাবে কাটার পর মীনা ক্রোড়ে একটি পুত্র-সন্তান পেলে। সে ভাব্‌লে এইবার যদি সন্তানের কৃপায় তার উপর স্বামীর বিমুখতার ভাবটি কাটে! আবশ্যক অনাবশ্যক সকল সামগ্রী হাতের কাছে জুগিয়ে দিয়ে এই যে হতাদর — এ তীব্র জ্বালা ক্রমে তার অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ছিল। স্বামী অফিসে গেলে সে শুয়ে পড়ে চোখের জলে বিছানা ভিজিয়ে দিত। এক একবার ভাব্‌ত, এ দগ্ধ-জীবন শেষ করে দি। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে অফিসের ভাত দিয়ে কাছে বসে সে জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে বোধ হয় তোমার পছন্দ হয় নি। কি করেই বা হবে? এর আগে বহু লোকের হয় নি। ডাগর মেয়ে শুনে বিয়ের দু'বছর আগে থেকে প্রায়ই সম্বন্ধ আস্‌ত। কিন্তু আমাকে দেখার পর তাদের আর উৎসাহ থাক্‌ত না। বোধ করি ষাট-সত্তরটি সম্বন্ধ আমার ভেঙে গেছে।"

এর কারণ বোঝা শক্ত ছিল না। তথাপি সত্য মুখ নিচু করে তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করলে, "কেন?"

"কেন? এই কালো রূপ — গায়ের যা রঙ — দেখ্‌লে কারও পছন্দ হয়?"

সত্য মনে মনে বললে, "তবু যা'হোক নিজে সেটা বুঝেছ।"

প্রকাশ্যে কিছু বললে না।

মীনা বললে, "দেখ্‌তে এসে লোকে যখন ফিরে ফিরে যেত, বাবার শুক্‌নো মুখ দেখে আমার বুক ভেঙে পড়ত। আত্মহত্যা করতে প্রবৃত্তি হ'ত। পাঁচ পাঁচটি মেয়ে গলায় — শেষটা আমারই জন্যে বাড়ীখানা পর্য্যন্ত বন্ধক পড়্‌ল। ভাব্‌তাম গরীবের ঘরে ভগবান্ মেয়ে যদি দিলেন, রূপ কেন দিলেন না?"

সত্যর প্রাণটা একটু থচ্ করে উঠ্‌ল।

মীনা বললে, "কিন্তু রাখে কৃষ্ণ, মারে কে? মামাবাবু এসে নিঃস্বার্থভাবে কি দয়াটাই না করলেন! তুমি ত' একটিবার আমাকে দেখ্‌তেও চাইলে না।"

সত্য মুখ বুজে খেয়ে উঠে অফিসে চলে গেল।

অফিসে এসে সেদিন তার কাজ-কর্মে মন বসছিল না। এক একবার হাতের কলম ছুঁড়ে ফেলে দৃষ্টি উদাস করে বসে বসে কি ভাব্‌ছিল। তার প্রাণের যে দিক্‌টায় শূন্যতায় 'খা' 'খা' করে, মীনারও সেই দিক্‌টায় বোধ করি সেইরূপই করে। মীনা চঞ্চল নয়—শান্ত। প্রাণখোলা সম্ভাষণ কোনদিন পায় না — তাই এমন সংযত-বাক্। তাই তার প্রাণের জ্বালা ধরা যায় না। আজ যেন সমস্ত ঝরে ঝরে পড়েছে।

মনের বিরূপতার গোড়া থেকে স্থুল-দৃষ্টিতে সে তার দিকে চেয়ে এসেছে বলে মীনার কালো রঙের ভিতরেও যে সৌন্দর্য্য নিহিত ছিল, তার নাগাল সে কোন দিন পায় নি। আজ সে কৃষ্ণ-যবনিকা কোথায় যেন উড়ে গিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। সে একবার টেবিলের নথি-পত্রের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কলমটি হাতে তুলে নিলে। সকালগুলি তার সময়মত শেষ করতে হবে।

কিন্তু নথি-পত্রের লেখার সঙ্গে তার চোখের পরিচয় ঘটল না। সেখানে ভেসে উঠ্‌ল দু'টি করুণা-প্লাবিত চোখ্! যে চোখ্-দু'টি আজ তার অন্তরের মধুরতম সুপ্ত অংশ জাগিয়ে দিয়েছে! অফিস আর গৃহ সে ব্যবধান আজ আর ছিল না। রাস্তা-ঘাট, বাড়ী-ঘর, গাড়ী-ঘোড়া, মানুষ-পশু কত কি বিঘ্ন — সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মীনা কি আজ চোখের কোল জুড়ে থাক্‌তে এমনি করে ধরা দিলে?

হাঁ, মীনাই দাঁড়িয়ে! ঘন-কৃষ্ণ দীর্ঘ-কেশ পিঠের উপর ছড়িয়ে দিতে বুঝি ভয় পেয়ে গেছে — পাছে কেহ অহঙ্কৃত মনে করে, তাই কুণ্ডলী করে মাথার উপর পাক দিয়ে বাঁধা। প্রতীক্ষার চোখ্-দু'টি নিজের অন্তরের দিকেই ধরে রেখে দিয়েছে। চাপরাশী এসে একটা ফাইল দিতে সত্য চম্‌কে উঠ্‌ল। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে কাজে প্রবৃত্ত হ'ল।

অফিসের পর সে টল্‌তে টল্‌তে বাড়ীতে এল। নিত্যকার মত হাত পা ধুয়ে চেয়ারে এসে বস্‌লে, মীনা তার জন্য চা এবং খাবার এনে টেবিলের উপর রাখ্‌লে। সত্য বল্‌লে, "বস।"

সে সম্মুখের চেয়ার একখানা দেখিয়ে দিলে।

সত্য জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "তুমি চা খাও না?"

এ প্রশ্ন এই নূতন।

মীনা বল্‌লে, "না।"

"কেন?"

"কি দরকার? মেয়ে মানুষে আবার চা খাবে কেন?"

সত্য বল্‌লে, "ক্লান্তির জন্যে লোকে খায়। তোমার খাটুনিও ত' বড় কম নয়।"

স্বামীর মুখে এ-ধরণের কথা সে কোন দিন শুনে নি। সে বল্‌লে, "তা' হোক্, তোমার চা খেয়ে আমি ক্লান্তি দূর কর্‌তে চাই নে। বিশ্রামের সময় আমি ঢের পাই, বিশ্রামও করি।"

সত্য জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "বিকেলে একটু খাবার-টাবার খাও?"

মীনার মুখে সলজ্জ কুণ্ঠার হাসি।

সত্য বল্‌লে, "হাসি নয়, সত্যি কিছু খাও না?"

মীনা বল্‌লে, "এতদিন একলাটি ছিলে—এখন দু'জন। তোমরা দু'জনে খেলেই আমার শরীর রক্ষা হবে। আসল শরীর-তত্ত্ব তোমার জানা নেই।"

সত্য এমন নেড়ে-চেড়ে কোনদিন দেখে নি তাকে। এ-অপেক্ষা নারী-দেহ-মনের মাজ্জিত রূপ-গুণ আর কি? সে হেসে বল্‌লে, "তা হ'বে। শরীর-তত্ত্বে অধিক জ্ঞান না থাক্‌লে আমার দেহের রোগের লক্ষণই বা তুমি পাবে কি করে?"

"তার অর্থ?"

"এই ত' মুস্কিল। ব্যাখ্যা-ট্যাখ্যা আমার মুখে ভাল আসে না। আশ্চর্য্য এই যে, এত দূরে দূরে থেকেও আমার রোগ-নির্ণয়ে তোমার ভ্রম হয় নি। মীনা, আমরা যেন স্রোতের দুই কূলে দু'জনে এতদিন বাস করে আস্‌ছিলাম। আজ আমাদের পরিচয় হ'ল। খুব সমারোহের সঙ্গে নয়—অত্যন্ত সহজে। ওপার থেকে তোমার নজর পড়ল এই ব্যাধি-গ্রস্তের উপরে। তাই পারাপার ভেঙ্গে দিয়ে ছুটে এলে ওষুধ বিলোতে।"

মীনা কিছু সময় চোখ্ বুজে চুপ্ করে রইল। পরে বল্‌লে, "আজ তুমি বড্ড যা' তা' বলছ যেন। অফিসে কি খুব খেটেছ? কি রোগ তোমার?"

সত্য হেসে বল্‌লে, "রোগী আরোগ্য করে এখন জিজ্ঞাসা করছ, কি রোগ? সে তুমি ভাল জান। জান বলে তার চিকিৎসাও কর্‌তে পেরেছ। সত্যি মীনা! আমার যে রোগ—এত তাড়াতাড়ি আর কেহ হয় ত' আরোগ্য কর্‌তে পারত না।"

মীনার আড়ষ্টভাব ক্রমে কেটে উঠ্‌ছিল। সে অল্প হেসে বল্‌লে, "ওঃ! তা' ভাল। তা' আমার ভিজিটের টাকাটা?"

সত্য জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ভিজিট কত?"

"বত্রিশ টাকা। গাড়ীভাড়াটা না হয় মাপ কর্‌তে পারি।"

সত্য চেয়ার ছেড়ে উঠে জামার পকেট থেকে

মনিব্যাগ টেনে বের করে খুলে ফেললে। দেখ্‌লে সাতটি মাত্র টাকা আছে। অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লে, "কি করা যায়? ডাক্তার সাহেবের জানা নেই কি যে, তাঁর রোগীটি সামান্য একজন গরীব কেরাণী?"

কি এক অজানিত পুলকে মীনার মন সিক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল। এ রকম ত' সম্ভবপর ছিল না! স্বামীর এ ধরণের প্রণয়-সম্ভাষণে সে চিরদিনই বঞ্চিতা—রিক্তা। কিন্তু স্বামী যে আর্থিক অনটনের কথা শুনালেন, যা' একদিকে পরিহাস মাত্র—অপর দিকে সত্যের উপর স্থাপিত—তার বেদনা যদি তেমনি দুর্জ্জয় হয়, সে ব্যথার বিষ, তাকে নিবিড় মমতা দিয়েই ত' মুছে নিতে হবে।

স্বামীকে নিয়ে যে ভয়ের ছায়া তার বুকে মুদ্রিত ছিল, সে ঘোর তখনও কাটে নি। তার আশা-তরু সত্য সত্যই এতদিনে যে পুষ্প-পল্লবে মঞ্জুরিত হ'য়ে উঠেছে, কি জানি সে নিশ্চয়তা তখন পর্য্যন্তও যেন বেদনার্ত্ত হৃদয়ের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে ফিরছিল।

সত্য এগিয়ে গেল। মীনার কাণের পিঠের চুলগুলি সংস্কৃত করে দিলে। মীনার দেহ পুলকে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌ল। সত্য জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার ভিজিটের টাকাটার তা' হলে কি ব্যবস্থা করা যায়, মীনা?"

মীনা গলবস্ত্রে ভূমিতলে নত হ'ল। অঞ্চলাগ্রে স্বামীর দুই পায়ের ধূলি কুড়িয়ে মস্তকে ও বক্ষে গ্রহণ করে মৃদু-স্বরে বল্‌লে, "আমার সমস্ত দাবী ওই চাঁদমণিটির সাক্ষাতে এই আমি কুড়িয়ে পেলাম।"

যখন সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল, সত্যর মুখের পরিপূর্ণ সন্তোষের ছায়া তার মুখের উপর পড়ে ঝিক্‌-মিকিয়ে উঠ্‌ল।

মার্কিণের আর্থিক দুর্গতি ও তাহার সমাধানের প্রচেষ্টা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টক্ মার্কেটে যে দুর্যোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পর হইতেই মার্কিণ দেশে আর্থিক সঙ্কট ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই এজন্য নিউইয়র্ক সহরের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলাকে দায়ী করিয়া থাকেন। তাঁহারা অভিযোগ করেন যে, নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কার্স টাকা সহজেই কর্জ্জ দিয়া লোকের ফট্‌কা-জুয়া খেলিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে এ দুর্গতি। এ অভিযোগ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ফেডারল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খাতায় দালালী ঋণের (ব্রোকার্স লোন) পরিমাণ ছিল মোট ২,৯০৮,০০০,০০০ ডলার—ইহার মধ্যে নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কগুলির হিস্যা ছিল মোট ১,১৫১,০০০,০০০ ডলার। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে দালালদিগের ঋণ বৃদ্ধি পাইয়া মোট ৫,০৯১,০০০,০০০ ডলার হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু তাহা বলিয়া নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কগুলির হিস্যা কিছুমাত্র বাড়ে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই বৃদ্ধির অংশটা যোগাইয়াছিল সহরের ও বাহিরের অন্যান্য ব্যাঙ্ক। ২৩-এ অক্টোবর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে, যেদিন ষ্টক্-বাজারের পক্ষে অতি দুর্দিন ছিল, সেদিন দালালদিগের ঋণের মোট পরিমাণ বাড়িয়া ৬,৬৩৪,০০০,০০০ ডলার হইলেও, নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কগুলি দায়ী ছিল মাত্র ১,০৭৭,০০০,০০০ ডলারের জন্য অর্থাৎ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের তুলনায় অনেক অল্প। তাছাড়া এই সব বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির ফেডারল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট কোন দেনা ছিল না। সুতরাং মার্কিণদের ফট্‌কা-জুয়ায় মত্ত হওয়াতে নিউইয়র্ক সহরের বড় বড় ব্যাঙ্কগুলিকে দায়ী করা ঠিক্ যুক্তিসঙ্গত হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ছাড়া আর এক প্রকারের ব্যাঙ্ক আছে, তাহাকে "ইন্‌ভেষ্ট্‌মেন্ট" বা লগ্নী ব্যাঙ্ক বলে। "বণ্ড" ও "ষ্টক" বেচা ও "আণ্ডার রাইট্" করাই ইহাদের ধান্ধা। এই সব ব্যাঙ্ক অনেক টাকা বিদেশে ধার দিয়াছে, সেই সব টাকা এখন আর আদায় হইতেছে না ও সেই সকল ঋণের নিদর্শন-পত্রগুলি অতি অল্পমূল্যে বিক্রয় করিতে হইতেছে। সে সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর পরিমাণে টাকা জমা হইয়া উঠিয়াছিল; ধনপতিগণ টাকা খাটানোর নতুন নতুন উপায় সন্ধান করিয়া ফিরিতেছিলেন, অথচ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধের দ্বারা যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা পরিপূরণের জন্য ও আবশ্যকীয়াদি খরিদ করিবার জন্য টাকার অত্যন্ত অভাব ছিল। তাই এই সব দেশে টাকা খাটানো অত্যন্ত লাভজনক বিবেচনা করিয়া মার্কিণ লগ্নী-ব্যাঙ্কগুলি এই বিদেশী ঋণে টাকা নিয়োগ করিয়াছিলেন।

গত ইউরোপীয় মহাসমরের প্রথম দুই বৎসর মিলিত-শক্তিবর্গের ব্যাঙ্কারের কাজ যুক্তরাজ্যই চালাইয়া আসিতেছিলেন। সে দুই বৎসর মিলিত-শক্তিবর্গ যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র যুক্তরাষ্ট্র হইতেই ইংলিশ ক্রেডিটের সাহায্যে ক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ নাগাদ্ ইংরাজদের পক্ষে টাকা ধার দেওয়া কষ্টকর হইয়া পড়ে। তখন সকলে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারস্থ হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র এই সর্ত্তে টাকা ধার দেয় যে, যুদ্ধের সকল সামগ্রী যুক্তরাষ্ট্র হইতেই মিলিত-শক্তিবর্গ খরিদ করিবেন। যুদ্ধের দরুণ ঋণ করা টাকার মোটা অংশ যুক্তরাষ্ট্রেই ব্যবহার করার জন্য শ্রমিকশ্রেণীর ও উৎপাদিকা শক্তির প্রভূত আর্থিক উপকার হইয়াছিল। সরকার "লিবার্টি বণ্ড" দেশের লোকের কাছে বিক্রয় করিয়া এই ঋণের টাকাটা উঠাইয়াছিলেন, অর্থাৎ টাকাটা দেশের লোকে মিত্রশক্তিবর্গকে কর্জ্জ দিলেও সরকার মাঝে পড়িয়া জামিনের কাজ করিলেন। সুতরাং যদি কোন শক্তি এই ঋণ পরিশোধ করিতে বিমুখ হয়, তাহা হইলে লিবার্টি বণ্ড হোল্ডারের

কোন ক্ষতি হইবে না, যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাহা দিয়া দিবেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকার দিবেন কোথা হইতে? অবশ্য প্রজাবর্গের উপর করের বোঝা চাপাইয়া! অর্থাৎ লিবার্টি বণ্ড পরিশোধ করিবার জন্য দায়ী রহিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ প্রজাবর্গ। মিত্রশক্তিবর্গ এই লিবার্টি বণ্ডের টাকা যুক্তরাষ্ট্রেই ব্যবহার করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহারা তাহার বদলে সেই টাকার মূল্যের একটি করিয়া শপথ-পত্র দিলেন, যে, দাবী করিবামাত্র ঐ শপথ-পত্রের টাকা পরিশোধ করিয়া দিবেন। যতদিন যুদ্ধ চলিতেছিল ততদিন টাকা বা সুদের জন্য কোন তাগিদ্ দেওয়া হয় নাই। সময় উপস্থিত হইলে টাকা পাওয়া যাইবে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু ভার্সাই সন্ধির সময় মিত্রশক্তিবর্গ দাবী করিয়া বসিলেন যে, ঋণের টাকাটা যুদ্ধের অব্যবহিত ক্ষতি বলিয়া নাকচ করিয়া দেওয়া হউক; অবশ্য সে দাবী টিকে নাই। এইরূপে যুক্তরাষ্ট্র খাতক হইতে মহাজনে পরিণতি লাভ করিল। একটি খাতক দেশের পক্ষে শুল্ক-প্রাচীর তোলা অন্যায় নয়; কিন্তু একটি মহাজন দেশ যদি ঐ নীতি অবলম্বন করে তবে তাহা দেশের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠে, কেননা ঋণগ্রহীতাকে মাল বেচিয়া ঋণ শোধ দেওয়ায় বাধা দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্র মহাজন হইয়াও শুল্কপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পরিবর্ত্তে অধিকতর উচ্চ করিয়াই তুলিয়াছে। ফলে ঋণগ্রহীতা দেশগুলির পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের টাকা পরিশোধ করা কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে দুনিয়াব্যাপী আর্থিক দুর্যোগ উপস্থিত হওয়ায় পণ্যের দর পড়িয়া যায় এবং সেইহেতু বহু কলকারখানা বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে বহু সহস্র লোক বেকার হইয়া পড়ে। তাই যে টাকাটা দিয়া হয়ত ঋণ শোধ করা চলিত, সেই টাকাটা এই বেকারের দলকে সাহায্য করিতে ব্যয়িত হইতে লাগিল। এইভাবে, দুনিয়ার বাণিজ্য-সঙ্কোচ ও দর-পতনের ফল সকল দেশেই বিষময় হইয়াছে। জর্ম্মণীর দুর্দ্দশা এরূপ তীব্র হইয়াছিল যে, অনেক জর্ম্মণ যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ের মার্কের কথা স্মরণ করিয়া ভয়ে দেশ হইতে টাকা উঠাইয়া বিদেশে জমা রাখিল। ফলে জর্ম্মণী যে বিদেশের টাকা শোধ করিতে অপারগ তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। এই সময়ে আবার অষ্ট্রীয়ার অন্যতম প্রধান ব্যাঙ্ক "ক্রেডিট্ অ্যানষ্ট্যাল্ট্" ফেল হওয়ায় কয়েকদিনের মধ্যে জর্ম্মণী স্বর্ণহীন হইয়া পড়িল। ব্যাপার দেখিয়া হুভার, মোরেটরিয়মের ব্যবস্থা করিলেন — জর্ম্মণী কিছুদিনের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এই মোরেটরিয়মের উদ্দেশ্য ছিল মাত্র কিছুকালের জন্য যুদ্ধ-ঋণ ও ক্ষতিপূরণের টাকা-পরিশোধ স্থগিত রাখা; কিন্তু মোরেটরিয়মের আয়ুকাল ফুরাইলেও প্রধানতঃ আর্থিক দুর্গতির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পাওনা টাকাটা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে… জর্ম্মণী ত' আর দিবে না বলিয়াই বসিয়াছে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র-সরকারকে ক্রমশঃ প্রজাবর্গের উপর করের বোঝা বাড়াইয়াই ঘাট্তি বাজেট্, ব্যালেন্স করিতে হইয়াছে — ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ষ্টক মার্কেটের অধঃপতনের পর দেশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা দেশবাসীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, এ সঙ্কট-টা এমন কিছু নহে… লোকেও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেটা আশায় আশায় বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছিল; কিন্তু যখন তাহার পরও দেশের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি না হইয়া বরং অধিকতর অবনতিই হইতে লাগিল, বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়াই যাইতে লাগিল, তখন সরকার আর হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তখন হুভার গভর্ণমেণ্ট একে একে তিনটি ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন — (১) ন্যাশানাল ক্রেডিট্ কর্পোরেশন্, (২) দি রিকন্ষ্ট্রাক্‌শান্ ফাইনান্স কর্পোরেশন্, ও (৩) গ্লাস্-ষ্টিগ্যাল্ অ্যাক্ট। প্রথমটির উদ্দেশ্য দেশের ব্যাঙ্কগুলিকে সমষ্টিবদ্ধ করিয়া দুঃস্থ প্রতিষ্ঠানগুলিকে

ঋণদান করিতে সাহায্য করা। দ্বিতীয়টীর উদ্দেশ্য ব্যাঙ্ক ও রেলপথগুলিকে ঋণ দিয়া সাহায্য করা। তৃতীয়টীর উদ্দেশ্য ক্রেডিট্ প্রসার দ্বারা কৃত্রিমভাবে স্ফীতি বা ইন্‌ফ্লেশন সৃষ্টি করিতে ফেডারল্ রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সাহায্য করা। পরে আইন করিয়া রিকন্‌ষ্ট্রাক্‌শন ফাইনান্স কর্পোরেশনের ক্ষমতা বাড়াইয়া দেওয়া হয়। যে কোন সঙ্ঘ বেকার নিয়োগ করিতে সহায়তা করিবে, তাহাকেই সাহায্য করিবার ক্ষমতা এই কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়। টাকার বাজার ১১,০০০,০০০,০০০ ডলার বৃদ্ধি করিয়া পণ্যের দর পুনরায় পূর্ব্বের মত চড়া করিবার মানসে ফেডারল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১,১০০,০০০,০০০ ডলার মূল্যের সরকারী বণ্ড খরিদ করে, কিন্তু আশা ফলবতী হইল না। এইরূপে সরকারের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও দেশের দুর্দ্দশার কিছুমাত্র লাঘব না হইয়া বরং বাড়িয়াই গেল। বেকারের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে ১০ লক্ষে গিয়া ঠেকিল।

এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার হইলেন রুসভেল্ট্। দেশের আর্থিক উন্নতি-অবনতি প্রধানতঃ নির্ভর করে দেশের ব্যাঙ্কগুলির উপর। যেরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের অনেকগুলি ব্যাঙ্ক একে একে দেউলিয়া হইয়া পড়ে তাহাতে দেশবাসী স্বভাবতঃই একটু শঙ্কিত ও সন্দেহাকুল হইয়া পড়ে। "স্পেকুলেশন্" বাজারে নামিয়া অনেক ব্যাঙ্কই ষ্টক ও বণ্ড কেনা-বেচায় নামিয়া পড়িয়াছিল। কোন ব্যাঙ্ক-কে যদি হঠাৎ সিকিউরিটী কেনা-বেচায় পাইয়া বসে তাহা হইলে সেই ব্যাঙ্কের পক্ষে ব্যাঙ্কিং-এর মূলসূত্রগুলি মানিয়া চলা দুরূহ হইয়া পড়ে। গ্লাস বিল্ কায়েম করিয়া ব্যাঙ্কগুলির সংশ্লিষ্ট এই সিকিউরিটী বিভাগ তুলিয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছিল।

রুসভেল্ট্ যখন দেশের কর্ণধার হইলেন তখন বিপুল পরিমাণে সোনা নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কগুলির তহবিল হইতে বাহির হইয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রান্ত প্রদেশে ও বিদেশে রপ্তানি হইয়া যাইতেছিল। রুসভেল্ট্ ব্যাঙ্ক তহবিলের এই সোনা ঘাট্‌তি পরিপূরণের জন্য ও রপ্তানি কিয়দংশ রোধ করিবার নিমিত্ত চারি দিন—৬ই মার্চ্চ হইতে ৯ই মার্চ্চ—ব্যাঙ্কগুলির দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন অর্থাৎ ঐ ক'দিন "ব্যাঙ্ক হলিডে" বলিয়া জাহির করিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সোনা রপ্তানির উপর একটা শুল্ক চাপাইয়া (এম্‌বার্গো) দিলেন। এই ছুটী দেওয়ার ফলে পণ্যের দর কিছু চড়িয়া গেল এবং সোনা আবার ফেডারল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিলে আসিয়া জমিতে লাগিল।

এই সময় যে-সকল দেশে স্বর্ণমান সিক্কারূপে প্রচলিত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্বর্ণমান ত্যাগ করে—ফলে সেই দেশের সিক্কা, ডলারের তুলনায় চড়াদরবিশিষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্র আমদানী প্রতিরোধকল্পে দীর্ঘ শুল্ক-প্রাচীর তুলিয়া দিলেও এই সব হতাদর-সিক্কা-বিশিষ্ট দেশ-জাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ছাইয়া ফেলিতেছিল। মার্কিণ-জাত পণ্য এই সকল "ডাম্প্‌ড্" পণ্যের সহিত প্রতিযোগীতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ১০০টী ৬০-ওয়াট্ বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক "বাল্‌ব্" তৈয়ারী করিতে জেনারেল ইলেকট্রিক্ কোম্পানীর খরচা পড়িতেছিল ৩·৭২ ডলার; অথচ জাপান ঠিক সেই ধরণের বাল্‌ব্ খরচ-খরচা দিয়াও যুক্তরাষ্ট্রে ৩·১২ ডলারে লাভ রাখিয়া বেচিতেছিল। এক বৎসরে (১৯৩২-৩৩ খৃঃ) প্রায় ৭৯০ লক্ষ ঐ ধরণের বাল্‌ব্ যুক্তরাষ্ট্র আমদানী করে। তাই এই হতাদর-সিক্কা-বিশিষ্ট দেশগুলির সহিত সমানভাবে প্রতিযোগীতা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রও স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় স্বর্ণমানগুলির তুলনায় ডলারের দর ১৩% পড়িয়া যায়; সরকারী বণ্ডের দর নামিয়া যায়; গম ও তুলার দর বাড়িয়া যায় এবং রূপার দর চড়িতে থাকে। দেশের মধ্যে পণ্যের দর চড়াইয়া দেওয়াই স্বর্ণমান ত্যাগের উদ্দেশ্য। বিদেশীরা যখন যুক্তরাষ্ট্রের পাওনা টাকা শোধ দেয়, তখন তাহা সোনা দিয়াই শোধ করে। প্রেসিডেন্ট রুসভেল্ট্ ১০০,০০০,০০০ ডলার পর্য্যন্ত

পাওনা বিদেশীর নিকট হইতে রূপায় শোধ লইবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন — ইহাতে খাতক দেশগুলির পাওনা শোধ দিবার যে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইল, তাহাই নহে, রূপাকেও আন্তর্জাতিক সিকিউরিটীর ইজ্জৎ দেওয়া হইল। দুনিয়াব্যাপী একটা পাকা সিক্কা নিয়ন্ত্রণের জন্য ডলারের সোনার পরিমাণ কমাইয়া দিবারও কথা হইল। ডলারের দর এইরূপভাবে কম করিয়া দেওয়ার ফলে খাতকেরা সহজেই মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে, কারণ পূর্ব্বের তুলনায় এখন অল্প টাকা দিয়াই পূর্ব্বের ঋণ শোধ করা চলিবে। পণ্যের দর চড়িয়া গেলে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উন্নতি দেখা যাইবে। কেননা, কারখানা-ওয়ালারা কাঁচামালের দর চড়িতেছে দেখিলেই তাহারা দর অধিক চড়িবার পূর্ব্বেই খরিদ করিয়া জমা করিবে এবং ফলে আবার নতুন ভাবে উৎপাদনের চেষ্টা চলিবে। এইরূপে চারিদিকেই উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের বাজেট ঘাট্‌তি দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট রুসভেল্ট্ বাজেট ঘাট্‌তি কমাইবার জন্য "ইকনমিক বিল" পাশ করিয়া বৃদ্ধ সৈন্যদিগের ভাতা এবং সিভিল ও মিলিটারী চাকুরীয়াদের মাহিনা কমাইয়া ৫০০,০০০,০০০ ডলার বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিলেন।

হুভারের শাসনকালে কৃষিজাত পণ্য, বিশেষতঃ তুলা ও গমকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ফেডারল ফার্ম বোর্ড ও ষ্টেবিলাইসেশন কর্পোরেশন কায়েম করা হয় এবং তাহার ফলে সরকার-তহবিলের প্রায় ৩৫০,০০০,০০০ ডলার ক্ষতি হয়। রুসভেল্ট্ কৃষিজাত পণ্যাদির সাহায্যকল্পে ফেডারল্-সরকার-প্রতিষ্ঠিত ফেডারল্ ফার্ম বোর্ড, ফেডারল্ ফার্ম লোন বোর্ড, রিকনষ্ট্রাক্‌শন্ ফাইনান্স কর্পোরেশন প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া (মার্জার) একটী ফার্ম ক্রেডিট অ্যাডমিনিষ্টারেশন কায়েম করিলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে একটী মূল প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করায় ২,০০০,০০০ ডলার বাঁচান যাইবে বলিয়া প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস করেন এবং কৃষিকে সাহায্য করারও সুবিধা হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন।

কৃষকদিগের ক্রয়শক্তি বাড়িলে তাহারা কারখানাজাত পণ্য অধিকতর পরিমাণে খরিদ করিতে সক্ষম হইবে এবং তাহা হইলেই বেকারের দল পুনঃ কাজে নিযুক্ত হইবার সুবিধা পাইবে। তাই কৃষককুলকে সাহায্য করিবার মানসে রুসভেল্ট্ শাসনতন্ত্র ৮০০,০০০,০০০ ডলার খরচের ব্যবস্থা করিলেন। এই সাহায্য ত্রিবিধ উপায়ে করিবার ব্যবস্থা হয়। (১) পণ্যের দর চড়া করিয়া দিবার নিমিত্ত হুভার-সরকার বহু পরিমাণে তুলা, গম প্রভৃতি খরিদ করে; তাহা সরকারের গোলায় জমা আছে। কৃষক যদি এখন তাহার কর্ষিত জমির কিঞ্চিৎ অংশ অনাবাদী অবস্থায় ফেলিয়া রাখে, তাহা হইলে ঐ অনাবাদী জমি হইতে যে পরিমাণ শস্য তাহার উৎপন্ন হইত সেই পরিমাণ শস্য সরকার তাহাকে সরকারী গোলা হইতে উৎপাদন-খরচার মূল্যে বিক্রয় করিবে, অর্থাৎ কৃষকের অনাবাদী জমিতে শস্য উৎপাদন করিতে, ধরা যাক্ যদি ৭ সেণ্ট খরচা হয়, তাহা হইলে সরকার ঐ ৭ সেণ্ট মূল্যেই তাহাকে শস্য পণ্য বিক্রয় করিবে। ইহার ফলে কৃষক শ্রম না করিয়াই, যে টাকা মুনাফা করিবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, তাহা করিতে সক্ষম হইবে, অথচ মোট উৎপাদনের পরিমাণ জমি অনাবাদী রাখার জন্য কিঞ্চিৎ অল্প হইয়া দর চড়াইয়া দিতেও সাহায্য করিবে। (২) দ্বিতীয় সঙ্কল্প অনুসারে সরকার নিজেই কৃষকের নিকট হইতে জমি খাজনা লইবার বন্দোবস্ত করিলেন। ধরা যাক্, একজনের ১০০ একর চাষের জমি আছে। সরকার ঐ ব্যক্তিকে ৯০ একর চাষ করিতে বলিয়া বাকী ১০ একর জমি নিজেই খাজনা লইয়া পতিত করিয়া রাখিলেন। ঐ দশ একর জমি চাষ করিয়া কৃষক যে মুনাফা আশা করে, সরকার সেই মুনাফার অংশটাই খাজনা হিসাবে কৃষককে দিবেন। ইহার

ফলেও উৎপাদনের পরিমাণ কম হইয়া পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া দিবে। (৩) তৃতীয় প্ল্যানটীর এইভাবে ব্যাখ্যা করা চলে। ধরা যাক্, গম-উৎপাদককে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে যে, ১৯১৪ খৃঃ তুলনায় এ বৎসর গম বিক্রয় করিয়া যে কম দর পাইতেছ, সেই কম অংশটা বোনাস দিয়া আমরা পূরাইয়া দিব, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কয়েক একর জমি পতিত করিয়া ফেলিয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর আটা-ময়দার কল-ওয়ালাদের উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে যে, তোমরা যে কোন দরে গম কিনিতে পার তাহাতে সরকারের আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের তুলনায় যে পরিমাণ কম দর দিয়া এ বৎসর গম খরিদ করিতেছ সেই পরিমাণ টাকা সরকারকে ট্যাক্স হিসাবে দিতে হইবে। এই ত্রিবিধ উপায়ের মূল কথা হইতেছে কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি করা।

সরকারী হিসাব অনুসারে ৪০% কৃষকের জমি বন্ধকীভুক্ত এবং প্রায় ৮,৫০০,০০০,০০০ ডলার ঐ বন্ধকীর টাকা বাকী। জমির দাম অসম্ভব রকমের পড়িয়া যাইলেও জমির জন্য যে টাকা কৃষককুল কর্জ্জ লইয়াছিল, তাহার জন্য অত্যন্ত চড়া হারে সুদ দিতে হইতেছে, এবং তাহার উপর পণ্যের দর পড়িয়া গিয়াছে। কৃষককুলের জমি ও উৎপাদিকাশক্তি বাঁচাইবার জন্য রুস্‌ভেল্ট্‌ প্রায় ২,০০০,০০০,০০০ ডলার খরচা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্ল্যান অনুসারে কৃষকগণকে $4\frac{1}{2}$%-এর অধিক সুদ দিতে হইবে না। সরকার বন্ধকী জমির সাহায্যকল্পে ৪% সুদে ফেডারল্ ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক বণ্ড বাহির করেন। ল্যাণ্ড ব্যাঙ্কগুলি জমির ফার্ষ্ট-মর্টগেজ্ খরিদ করিয়া বা বন্ধকী দলিলের সহিত এই নতুন বণ্ডের বিনিময় করিয়া সরকারের সাহায্য করিল।

যুক্তরাষ্ট্রে বিয়ার-মদ চোলাই-এর ব্যবস্থা ছিল না; ফলে বুট্‌লেগারস্ বে-আইনীভাবে মদ বিক্রয় করিয়া মোটা টাকা লাভ করিতেছিল। রুস্‌ভেল্ট্‌ অনুমান করিলেন যে, এক এই বিয়ার চোলাই হইতেই ট্যাক্স হিসাবে সরকারের ১৫০,০০০,০০০ ডলার আয় হইতে পারে। তাই তিনি বিয়ার বিল পাশ করিলেন। এই বিল পাশ হইবার কয়েক দিনের মধ্যেই ৪০০,০০০ বিয়ার-বাক্স ও ৪০০,০০০ গ্রোস্ বোতল, অর্ডার দেওয়া হয়; ১০,০০০ নতুন লোক কাজ পায়, অর্থাৎ বিয়ার বিল পাশের ফলে এক শ্রেণীর লোকই শুধু লাভবান হয় নাই। ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিল্পেও উন্নতি দেখা গিয়াছে ও বেকারের সংখ্যা হ্রাস হইতে চলিয়াছে।

গত এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই হইল যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সংগ্রামের মোটামুটী হিসাব। রুস্‌ভেল্টের সকল সঙ্কল্পেরই পিছনে রহিয়াছে একই প্রধান উদ্দেশ্য—যেমন করিয়াই হউক দেশের ক্রয়-শক্তি বাড়াইতেই হইবে। অল্পে অল্পে দেশবাসীর মনেও ক্ষীণ আশার রেখা দেখা যাইতেছে। প্রায় ৫৬,০০০ হাজার কারখানার মালিক ৩,০০০,০০০ লোককে কাজে নিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বিয়ার আইন বিধিবদ্ধ হইবার একমাসের মধ্যেই হোটেল ও রেস্তরাঁর ব্যবসায়ে ২০,০০০,০০০ ডলার আয় বাড়িয়াছে। পণ্যের বাজারেও অন্ততঃ কাগজে-কলমে কৃষকগণের দৌলৎ ৫০০,০০০,০০০ ডলার বাড়িয়াছে। ষ্টীল উৎপাদন ৩৫% ও ময়দা উৎপাদন ৩০% বাড়িয়াছে। মার্চ্চ মাসের তুলনায় এপ্রিল মাসে বেকার নিয়োজিত হইয়াছে ২·৭% অধিক আর তাহাদের আয় বাড়িয়াছে ৬·৪%।
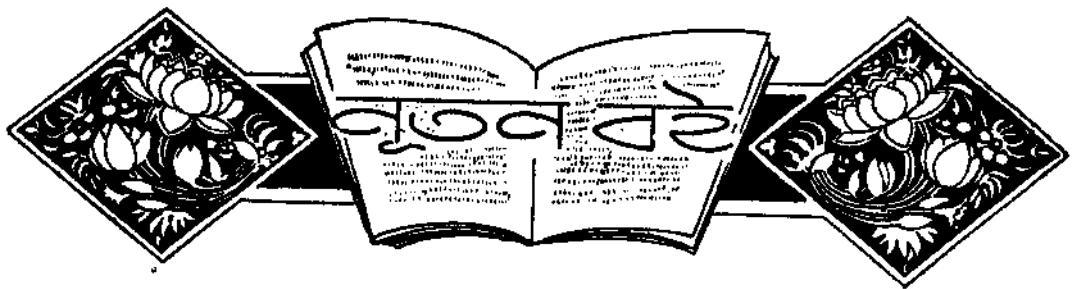
['উদয়নে' সমালোচনার জন্ত গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি সমালোচনার্থ পাইয়াছি। যথাসময়ে উহার সমালোচনা "উদয়নে" প্রকাশিত হইবে।

আরবা উপন্তাস—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—পাঁচ টাকা।

অনামী—শ্রীদিলীপকুমার রায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য—তিন টাকা।

মঞ্জুলা—শ্রীরামেন্দু দত্ত। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ৭১বি-২ নং চক্রবেড়ে রোড নর্থ, কলিকাতা, মূল্য—দেড় টাকা।

বিশ্বকোষ—১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ২য় সংস্করণ,—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু। প্রকাশক—শ্রীবিশ্বনাথ বসু, ৯নং বিশ্বকোষ লেন, কলিকাতা, মূল্য—প্রতি সংখ্যা আট আনা।

পাঁচ সাগরের ঢেউ—শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, মূল্য—বারো আনা।

শিশু-জগৎ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন। প্রকাশক—ইউ, রায় এণ্ড সন্স, ১১৭-১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—এক টাকা।

ময়ূরপঙ্খী রাজকন্তা—শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীবসুদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, ১৯৯ নং বৌ-বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—আট আনা।

হিন্দুদের পুনরুত্থান—শ্রীমতিলাল রায়। প্রকাশক—প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস, মূল্য—পাঁচ সিকা।

উচনচ—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল। প্রকাশক—বাতায়ন পাব্লিশিং হাউস্, ১৪৪নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—দেড় টাকা।

মাটির মেয়ে—শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল। প্রকাশক—শ্রীগৌরগোপাল মণ্ডল, ৪৪নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—দুই টাকা।

আগামীবারে সমাপ্য—মোহাম্মদ কাসেম। প্রকাশক—এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, মূল্য—দেড় টাকা।

আদিশূর ও ভট্টনারায়ণ—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, মূল্য—দুই টাকা।

Rabindra Nath Tagore—his religious, social and political ideals. By Dr. Tarak Nath Das. Publishers—Saraswaty Library, 9, Ramanath Majumdar Street, Calcutta, Price—One Rupee.

বস্তির গল্প—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত। প্রকাশক—খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫নং কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা মূল্য—এক টাকা।

স্মৃতি-রেখা—শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। প্রকাশক—শ্রীনিখিলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, ২০নং সুরী লেন, কলিকাতা, মূল্য—পাঁচ সিকা।

একখানি মুখ—শ্রীসুধীরেন্দু রায়। প্রকাশক—শ্রীগৌরগোপাল রায়, ৪৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা, মূল্য—এক টাকা।

ছায়াগীতা—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীমনীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, ৯৫-৩সি নং হাজরা রোড, কলিকাতা মূল্য—এক টাকা আট আনা।

সরল পোলট্রি পালন—শ্রীঅমরনাথ রায়। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ২৫নং রামধন মিত্রের লেন, কলিকাতা, মূল্য—এক টাকা।

সাঁঝের-প্রদীপ—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রকাশক শ্রীকিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত, উখরা, বর্দ্ধমান,—দেড় টাকা।

মন্দিরের চাবি—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীকিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত, ১২৪-৪নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—চারি আনা।

সনাতন—শ্রীবিজয়মাধব মণ্ডল। প্রকাশক—শ্রীসুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮-২-১নং হাজরা রোড, কলিকাতা, মূল্য—আট আনা।

জাতিস্মর—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—পি, সি, সরকার এণ্ড কোং, ২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—দেড় টাকা।

জেনেভা-ভ্রমণ — শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। প্রকাশক—শ্রীনিখিলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, ২০নং সুরী লেন, কলিকাতা, মূল্য—বারো আনা।

লক্ষ্যহারা—শ্রীক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গোলাপ পাব্লিশিং হাউস্, ১২নং হরীতকী বাগান লেন, কলিকাতা, মূল্য—দেড় টাকা।

রাজশ্রী—শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৬নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ধ্রুবের মহাসাধন—শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, মূল্য—ছয় আনা।

ফুলকলি—শ্রীনিবারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। প্রকাশক—ডাক্তার শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কামাল কাচনা, নবাবগঞ্জ, রংপুর, মূল্য—চারি আনা।

আমার ব্যবসা' জীবন—রায় সাহেব বিনোদবিহারী সাধু। প্রকাশক—শ্রীবিজয়চন্দ্র দাস, ২০ নং উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা, মূল্য—দেড় টাকা।

জাতীয় ভিত্তি—শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীপ্রফুল্ল রায়, পি ৪৯ নং লেক্ রোড, কলিকাতা।

ফরাসি বিপ্লব—রেজাউল্ করীম, বি-এ। প্রকাশক—বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস, ২০৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

দুলালী—শ্রীরামেন্দু দত্ত। প্রকাশক—কিশোর লাইব্রেরী, ২৭নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

রসায়ন—শ্রীরামেন্দু দত্ত। প্রকাশক—সিংহ প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং ওয়ার্কস, মূল্য—এক টাকা।

মাধবাচার্য্য—শ্রীপ্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন। প্রকাশক—পি, গাঙ্গুলী, কব্‌রেন্ রোড, শ্রীরামপুর, মূল্য—এক টাকা।

Notes on Indian Constitutional Reform—By Prof. N. Gangulee, C. I. E., B. Sc., Ph. D (Lond.). Published by the author from 89, Lansdowne Road, Calcutta, Price—Re 1/

মাধুকরী—শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—বেঙ্গল বুক সোসাইটি, ১৮৭ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—চারি আনা।

মুক্তির রূপ—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ। প্রকাশক—বেঙ্গল বুক সোসাইটি, মূল্য—চারি আনা।

অষ্টাদশী—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১০২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—পাঁচ আনা।

শ্রীমদ্ ব্রহ্মবিজ্ঞান—শ্রীশিবেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। "শ্রীসচ্চিদানন্দ পুরী", পোঃ মসূয়া, জিলা ময়মনসিংহ, হইতে প্রকাশিত। মূল্য—এক টাকা।

আত্ম-জীবনস্মৃতি—শ্রীআশুতোষ ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, ১নং ব্ল্যাকোয়ার স্কোয়ার, কলিকাতা।

সাকী ও সুরা—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—পুরবী সাহিত্য পরিষদ, খরদহ, ২৪ পরগণা, মূল্য—ছয় আনা।

গল্পমালা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ। প্রকাশক—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণা, মূল্য—দেড় টাকা।

স্নেহের দাবী—শ্রীনিখিরাজ হালদার। প্রকাশক—বিপুল সাহিত্য ভবন, মূল্য—এক টাকা চারি আনা।

সঙ্গীত লহরী—শ্রীযদুনাথ সর্ব্বাধিকারী। প্রকাশক—শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ২০ নং সুরী লেন, কলিকাতা, মূল্য—আট আনা।

ডাউন দিল্লী এক্‌স্‌প্রেস্‌—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশক—বেঙ্গল বুক সোসাইটি, ১৮৩নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—চারি আনা।

জয়ন্তী—শ্রীপ্রতাপ সেন, বি-এসসি। প্রকাশক—শ্রীবিমলাচরণ রায় চৌধুরী, কাজি-বাজার, কটক, মূল্য—আট আনা।

মাতৃ-স্মৃতি—শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

ভুলের ফুল—শ্রীরামেন্দু দত্ত। প্রকাশক—সান্যাল বুক ষ্টোর, ১৫নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—এক টাকা।

সপ্তক—শ্রীইলা দেবী ও শ্রীসুধাংশুকুমার হালদার। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩-১-১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা

গল্পপ্রিয়া এবং শ্রীমঙ্গল — শ্রীপদ্মেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—আর, এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্স, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—ছয় আনা।

The Alphabet Of Bengali Literary Celebrities.—By Manmatha Nath Ghosh. Published by Arun Kumar Ghosh, 90, Shambazar Street, Calcutta. Price - 8 - as. only.

ঝঞ্ঝা (The Tempest)— শ্রীনগেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। প্রকাশক—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস, ৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য—এক টাকা।

অস্তাচল—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য—দেড় টাকা।

ছিন্ন পাপড়ী—শ্রীনবগোপাল দাস। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য—দেড় টাকা।

পথের পথিক — শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য—দেড় টাকা।

নীলকণ্ঠ—শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, মূল্য—এক টাকা চারি আনা।

দেশ—সুবিখ্যাত জাতীয় পত্রিকা 'আনন্দ বাজার'-এর পরিচালক-বর্গ কর্ত্তৃক এই সাপ্তাহিক 'দেশ' প্রকাশিত হইল। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছয় পয়সা। বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা।

৮০ পৃষ্ঠার 'দেশ', মাত্র ছয় পয়সা মূল্য, সুলভ বলিতে হইবে। আমরা ইহার কয়েক সংখ্যা পাইয়াছি। প্রফুল্লচন্দ্র, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন, কানাইলাল গাঙ্গুলী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, ৺রবীন্দ্র মৈত্র, রণদাকান্ত রায় চৌধুরী, যামিনীকান্ত সেন, সরলাবালা সরকার প্রভৃতি যশস্বী লেখক-লেখিকার লেখায় সুসমৃদ্ধ। এ ছাড়া খেলাধূলা, নাট্য-প্রসঙ্গ প্রভৃতি কিছুই বাদ নাই।

'দেশ'-এর মত এত বড় সাপ্তাহিক বাংলায় নাই। আমরা এই নূতন সাপ্তাহিকের আবির্ভাবে আনন্দিত হইয়াছি। সুসম্পাদিত ও চিত্রশোভিত 'দেশ' দেশবাসীর প্রিয় হইবে, ইহাই আমরা আশা করি।

আমরা 'দেশ'-পত্রিকার পরিচালকবর্গ ও সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

'স'

Rammohun Roy—the Man and his Work: Centenary Publicity Booklet No. 1 : compiled and edited by Amal Home and published under the auspices of The Rammohun Roy

Centenary Committee, June, 1933. Price— -/8/- as. To be had of Satis Chandra Chakravarti, M. A., Jt. Secy., Centenary Committee, 210-6, Cornwallis Street, Calcutta.

রামমোহন রায় আধুনিক ভারতের যুগপ্রবর্ত্তকদের মধ্যে অন্যতম। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পরলোকগমনের পরে এক শতাব্দী পূর্ণ হইল, এই উপলক্ষ্যে তাঁহার স্মৃতি ভারতীয় জনগণের চিত্তে পুনরায় জাগরূক করিবার জন্য "রামমোহন শত-বার্ষিকী জয়ন্তী"-র আয়োজন। এই শুভ অবসরকে অবলম্বন করিয়া রামমোহনের চিরস্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ তাঁহার সমগ্র গ্রন্থাবলীর একটি সুন্দর ও সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য কতকগুলি সম্মেলন ও উৎসবাদিও হইবে। রামমোহনের তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির আলোকে আমাদের হিন্দু সংস্কৃতির কতকগুলি প্রধান বিষয় বিশ্বের সমক্ষে যুগোপযোগী নূতন ভাবে আনীত হইয়াছে—বেদান্তের ও উপনিষদের আশ্রয় লইয়া হিন্দু আবার নূতন ভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। রামমোহনের রচনা ও ব্যক্তিত্ব যতই আলোচনা করা যায় ততই মঙ্গল।

উপস্থিত নাতি-ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। ইহাতে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম শ্রদ্ধাপ্রণোদিতভাবে রামমোহন-প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন, রামমোহনের জীবনীর সারকথাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্বের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়গণের কতকগুলি নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন পুস্তকের পরিশিষ্টে রামমোহন-সম্বন্ধে পূর্ব্ব-প্রকাশিত নানা প্রবন্ধ পুনঃপ্রকাশিত করিয়াছেন ও রামমোহনের শতবার্ষিকী সম্পর্কে নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। রামমোহন-বিষয়ক সাতখানি চিত্র দ্বারা পুস্তকখানির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। রামমোহনের রচিত তাবত পুস্তকের কালানুক্রমিক তালিকা এবং রামমোহন সম্বন্ধে প্রধান প্রধান সমস্ত অভিমত বা অন্য লেখার প্রমাণ-পঞ্জী পুস্তকের শেষে সন্নিবেশিত হওয়ায় অনুশীলনের পক্ষে বিশেষ সহায়তা হইবে। ইহার ছাপা ও কাগজের পারিপাট্য সকলেরই মনোহরণ করিবে। মোটের উপর নানা দিক দিয়া বইখানি খুব কাজের হইয়াছে, এবং রামমোহন-শতবার্ষিকীর আয়োজনের প্রথম ফলস্বরূপ এই বইখানির জন্য আমরা শতবার্ষিকীর কর্ত্তৃপক্ষকে ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোমকে অভিনন্দিত করিতেছি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বহুরূপী—গল্পের বই। শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীরাধেশ রায়, রসচক্র-সাহিত্য-সংসদ, পি-২৩০।৫নং রাজা বসন্ত রায় রোড, দক্ষিণ কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

পাঁচটি পাঁচরঙা রূপ লইয়া **বহুরূপী** রস-চক্র-সাহিত্য-সংসদ্ হইতে দেখা দিয়াছে। এই গ্রন্থের বিদ্রূপবাক্যগুলিতে কোনও ব্যক্তিগত শ্লেষ বা ব্যঙ্গ না থাকায় সর্ব্বত্র উচ্চরুচিসম্পন্ন না হইলেও কাহারও আপত্তিকর নাই। এইজন্য তাহা উপভোগ্যই হইয়াছে। 'চরিত্রহীন' নামক দ্বিতীয় নক্সায় শরৎবাবুর 'চরিত্রহীন' পুস্তকের 'রিয়ালিষ্টিক' যাচাইকারী যে জানোয়ারটির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহার কদর্য্য নগ্নতায় বীভৎস রসের সহিত করুণরসের সমাবেশ ঘটিয়াছে। সদ্য-বাপ-মরা ধনী-পুত্রটির Scientific research-এর নির্লজ্জ ইতিবৃত্ত বক্তার মুখে যতই বেপরোয়া হইয়া উঠে, সহযাত্রী শ্রোতৃদ্বয়ের মনে কৌতুক ততই করুণায় ভিজিয়া যায়। কিন্তু এই আখ্যায়িকার অন্তরালে যে সকল Side-thrust (এধার-ওধার খোঁচা) আছে, তাহা ভাবিবার কথা। তৃতীয় রচনা 'গার্ডেন পার্টি'র ব্যাপারটি গার্ডেন-পার্টির মতই উল্লাস ও হিল্লোলে ভরা—ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাল্কা কথাবার্ত্তার তুবড়ি-বাজী। বহুরূপীর বহুরূপ একত্র মিলিয়া বাগান-বাড়ীর অরন্ধন উৎসবে হল্লা জমাইয়াছে। বাগান বাড়ীর বাক্সোর ফুলবাবুদের রাসের পুতুল দেখিয়া ভূতভয়গ্রস্ত আত্মহারা ব্যাপারটুকু পরম

উপভোগ্য—ভারী ভাল লাগিল। সহজ কল্পনায় ইহার রসটুকু পাঠককে অভিষিক্ত করিয়া তুলিবে। বারিধি বেচারীর নাসাভঙ্গিটি অতিমাত্র। নিছক হাস্ত পরিহাসের মধ্যে রক্তারক্তি কেন?

রায়বাহাদুর চিত্রটি অল্প পরিসরের মধ্যে অতি চমৎকার ফুটিয়াছে। আজ-কালকার কালে যে মনোভাব ও কার্য্যকলাপ সাহায্যে ঐ উপাধি অর্জ্জিত হয়, তাহা কাহারো অজ্ঞাত নাই। সেই বিকৃত কাপুরুষতা, সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন বিচারবুদ্ধি, সেই নির্লজ্জ পদলেহন-প্রবৃত্তি লেখকের ঝকঝকে লেখনীর কশাঘাতে একেবারে উলঙ্গ হইয়া দেখা দিয়াছে।

কিন্তু সবচেয়ে আমাদের ভালো লাগিয়াছে—গ্রন্থের সর্ব্বশেষ চিত্র 'পকেট মন্থন'। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন অধ্যাপক বিপিনবাবুটিকে একেবারে চোখের সামনে জাজ্জ্বল্যমান দেখিতেছি। তাহার কারণ, জীবনে অল্পবিস্তর যে ব্যক্তির সাক্ষাৎ আমরা সকলেই একাধিক বার পাইয়াছি, সেই ব্যক্তিই এ গল্পে তাহার পরিপুর্ণ মূর্ত্তি ও পরিপুর্ণ অন্যমনস্কতার রূপ লইয়া দেখা দিয়াছেন। তাঁহার পকেটের মধ্যে হারাণো নোট, হারাণো চাবি বা হারাণো চুরিকাঠিটাই শুধু মিলে না, তাঁহার অভ্রভেদী ঔদাসীন্য, উত্তুঙ্গ নিরীহতা ও সুগভীর জড়ত্বেরও সন্ধান মিলে। শেষের দিকে গৃহিণীর কাছে গালি খাইয়া বেচারীর ভাবখানা এমনি নির্ব্বোধ ও নিরুপায় হইয়া উঠিয়াছে যে, করুণায় পাঠকের মন ভরিয়া উঠে।

বাঙ্গালীর বর্ত্তমান দুঃখ-দুর্দ্দিনে এমনতর সরল রগরগে হাস্যময় চিত্রের প্রয়োজন আছে। যে অনাবিল হাসি স্বাস্থ্যের সাথী ও চিত্তের সঙ্গী, এই বহুরূপী তাহার রূপে ও রসে তাহারই রসদ যোগাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কতকগুলি নিতান্ত Provincial শব্দ, যথা, হন্তদন্ত, তুলক্রাম, প্রভৃতির পৌনঃপৌনিক ব্যবহার বর্জ্জনীয় বলিয়া মনে করি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

পরিণাম—উপন্যাস। ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এল্ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, প্রবর্ত্তক পাব্লিশিং হাউস। ৬১ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

নরেশবাবু উপন্যাসখানির মুখবন্ধে "তথাকথিত 'ভদ্র' উপজীবিকার মোহ" সম্বন্ধে যে সমস্যার অবতারণা করেছেন তা' আখ্যানের রসবস্তু মোটেই ক্ষুণ্ণ করেনি। উপন্যাসটি বেশ সচ্ছন্দ সরলভাবে সহজ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, কোথাও হোঁচট খাওয়ার চিহ্নমাত্র নেই। গল্পের ভিতরকার "সিচুয়েশন"-গুলোও কষ্ট-কল্পিত নয়। একটি গোয়ালার ছেলের নিকট উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কারের স্বপ্ন দেখা যেমন স্বাভাবিক বলে মনে হয়, নরেশবাবু তা' আশানুরূপ সাফল্যের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ললিতার সঙ্গে কৃষ্ণধনের দীর্ঘকাল সংযমপূর্ণ সাহচর্য্য মনস্তত্ত্ব-অনুমোদিত এবং মানসিক দ্বন্দ্বের (psychological conflict) নিদর্শন। গল্পের শেষ অংশে ললিতাকে বিধবা করে বিবাহ দিয়ে যে 'মুস্কিল আসান' করা হয়েছে, তাতে একটু রসহানি হয়েছে বলে মনে হয়।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

শ্রীকর্ম্মযোগী রায়

বিস্মৃতি—কবিতার বই। শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত। প্রকাশক — শ্রীঅমূল্যগোপাল মজুমদার, ডি,এম্, লাইব্রেরী, ৬১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আট আনা।

ছোট্ট একখানি সৌষ্ঠবসম্পন্ন কবিতার বই। মলাটের কাগজ, লাল কালি, চিত্র-পরিকল্পনা, আকার—সবই সুরুচির পরিচায়ক। ছাপা সুন্দর, প্রুফ্ দেখার ভুলও চোখে পড়িল না।

স্নেহাস্পদ কবি, মহাকবি কালিদাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য শকুন্তলার পঞ্চম অঙ্কটি বাংলা কবিতায় রূপান্তরিত

করিয়া তাহার নাম দিয়াছেন 'বিস্মৃতি'। তাঁহার এই প্রয়াস প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। "পরিচারিকা"র কবিশেখর শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় পুস্তকটির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তদতিরিক্ত আর কিছু বলিবার নাই। আমরা কবিকে সাহিত্য-চর্চ্চায় উৎসাহিত করি।

শ্রীরামেন্দু দত্ত

নারীহরণের প্রতিকার — শ্রীজিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে ও পোঃ দুয়ারাবাজার, গ্রাম দুহালিয়া, জেলা শ্রীহট্ট—এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য—আট আনা।

এই বইখানি নিতান্ত সময়োচিত হইয়াছে। নারী-হরণ জাতি ও সমাজের পক্ষে দুরপনেয় কলঙ্কস্বরূপ। এই কলঙ্ক মুছিতে হইলে নারী ও পুরুষের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার ইহার উপায় নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখকের যুক্তিগুলি সমর্থন করি এবং প্রত্যেক বাঙ্গালী নর-নারীকে পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ রায়

পর্দ্দানশীন্—গল্পের বই। শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু, বি-এ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৭নং রাজাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; মূল্য—বারো আনা।

প্রভাতবাবু তরুণ কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন। তাঁহার ছোট-গল্প মাঝে মাঝে মাসিক পত্রিকায় দেখা যায়। ছোট-গল্প লেখায় যে আর্টের প্রয়োজন প্রভাতবাবু অনেকটা তা আয়ত্ত করিয়াছেন।

নয়টি ছোট-গল্প লইয়া এই "পর্দ্দানশীন" বাহির করা হইয়াছে, এবং প্রথম গল্পটির নামানুসারেই এই পুস্তকখানির নামকরণ হইয়াছে। এই পুস্তকের মধ্যে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার—এই গল্পগুলির মধ্যে অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসের ঢেউ বহে নাই। লেখার ভঙ্গিমা সহজ ও সুন্দর বলিতে হইবে।

এই নয়টি গল্পের মধ্যে "পর্দ্দানশীন" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া "জগাপিসী", "বৌদির কীর্ত্তি" "রবিবাবু" নামক গল্পগুলিও আমরা উপভোগ করিয়াছি।

পুস্তকখানির মধ্যে মুদ্রাকর-প্রমাদ মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয়।

ছাপা মন্দ নয় বাঁধাই ও কাগজ ভাল।

শ্রীবিনয় দত্ত

ঘরে-বাইরে

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১

আমি মাসের পর মাস 'উদয়নে' যে ঘরে-বাইরের কথা লিখ্‌ছি, তার অন্তরে ঘরের চাইতে বাইরের কথাই বেশী থাকে। এর কারণ, ঘরের এখন এমন কোন বড় কথা নেই, যা ভারতবর্ষের বাইরে বাকি পৃথিবীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে ভাবা যায়।

দৈনিক সংবাদপত্র থেকে অবশ্য রয়টারের তারের মারফৎ কোথায় কি ঘট্‌ছে তা জানা যায়—কিন্তু বোঝা যায় না। বিলেতের মনীষী-সম্প্রদায় এ-সব বিষয়ের একটু বিস্তৃত আলোচনা করেন। সুতরাং ইউরোপের সভ্যতার বর্ত্তমান গতিবিধির কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করতে হলে তাঁদের বক্তব্য কথা শোনা নিতান্ত প্রয়োজন।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের অতি আধুনিক ইকনমিক্স ও পলিটিক্সের মোটা কথা যে, এই দুই দেশের চিন্তাশীল লোকদের বই পড়্‌লে পুরো বোঝা যায়, তা' অবশ্য নয়। কারণ এঁদের ভিতরেও নানা লোকের নানা মত আছে।

এর কারণ, পদার্থ বিজ্ঞানের মত অর্থ-বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি আজও আবিষ্কৃত হয়নি। প্রথমোক্ত সূত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাঁধা; আর সেগুলি Newton-এর সময় হ'তে অদ্যাবধি সর্ব্ব বৈজ্ঞানিক এমন কি সর্ব্বলোক-গ্রাহ্য হয়েছে।

আজকের দিনে অবশ্য Einstein-এর গণিতের প্রসাদে Newton-এর মতামতকে চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য করতে বৈজ্ঞানিকরা ঈষৎ ইতস্ততঃ কর্‌ছেন। কিন্তু Einstein-এর নব আবিষ্কার Newton-এর আবিষ্কারের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। নব ফিজিক্স পুরোনো ফিজিক্সের evolution মাত্র।

ইকনমিক্স ও পলিটিক্সের মধ্যে আছে মানুষের মন, আর মানুষের মন শুধু বিভিন্ন নয়, বিচিত্র। জড়জগৎ খামখেয়ালী নয়, কিন্তু মানুষমাত্রেই অব্যবস্থিত-চিত্ত।

২

ইকনমিক্স ও পলিটিক্স শাস্ত্রে যে মানুষের জীবন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি আর কোন-কালেই হবেনা, তা' জানি; তবুও এ-সব শাস্ত্রের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় থাক্‌লে, এ-সব বিষয়ের কিঞ্চিৎ জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি। অন্ততঃ সমস্যাটি যে কি, তা' বুঝতে পারি। অনেকদিন আগে জনৈক ইংরাজ দার্শনিক বলে গিয়েছেন যে, কোন বিষয়ে মীমাংসা লাভ করবার চাইতে সমস্যার জ্ঞান লাভ করবার মূল্য বেশী। কথাটা মিছে নয়। মীমাংসা পেয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু সমস্যা আমাদের চিন্তার উদ্রেক করে। আর চিন্তা করাই হচ্ছে মানব-ধর্ম্ম।

আজকের দিনে, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হয়েছে দেশের বর্ত্তমান ইকনমিক দুর্দ্দশা হতে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়। এ ভাবনা থেকে আজ কেউই মুক্ত নয়,—বৈশ্যও নয়, শূদ্রও নয়; অতএব ক্ষত্রিয়ও নয়, ব্রাহ্মণও নয়। ভারতচন্দ্র বহুকাল পূর্ব্বে প্রশ্ন করেছিলেন যে, "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?" এ কথাটা মনে রাখলে, সকলেই বুঝতে পারবেন যে, বর্ত্তমান অর্থসমস্যা শুধু ব্যক্তিগত নয়,

সমগ্র সমাজের। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থিক দুর্গতি যে ইউরোপের আর্থিক দুর্গতির অধীন, সে কথাও তাঁর কাছে স্পষ্ট, যিনি মনোজগতে কূপমণ্ডুক নন্। ফলে আজকের দিনে ঘরের কথা, প্রধানতঃ বাইরের কথা। এর কারণ, আমরা শক্তিহীন আর ইউরোপের শক্তি প্রলয়ঙ্করী।

রাধা একবার দুঃখ করে বলেছিলেন যে, "ঘর হ'তে আঙিনা বিদেশ।" আজ বোধহয় কোন লোক এ দুঃখ করবেন না। আজকের দুঃখের বিষয় এই যে, "ঘর হতে আঙিনা বিদেশ নয়।" সমগ্র পৃথিবীটা একই গৃহ, সুতরাং পৃথিবীর লোক আজ একই গৃহ-দুর্বিপাকে পড়েছে। তাইতেই আজ অনেকে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের কথা ভাবছেন। ইকনমিক সমস্যা যে সমাজের মূল সমস্যা তার কারণ, ইকনমিক্সই হচ্ছে সভ্যতার সিঁড়ির প্রথম ধাপ। ও-ধাপটি ভেঙ্গে পড়লে, তার উপরের সব ধাপ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে, আকাশে ঝোলে না।

৩

আমি দিন চারেক আগে একখানি নূতন ইংরেজী বই পড়ে শেষ করেছি। বইখানির নাম "The Intelligent Man's Way to Prevent War." আর বইখানি ছ'জন খ্যাতনামা ইংরেজের লেখা।

আমরা বাঙালীরা নিজেদের intelligent men বলে বিশ্বাস করি, আর যেহেতু আমিও একজন বাঙালী, সেহেতু আমারও এ গ্রন্থ পড়বার অধিকার আছে; উপরন্তু লেখকের অন্যতম H. J. Laski-র লেখার সঙ্গে আমি সুপরিচিত। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে কি বলেন, তা' শোন্‌বার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল। সমগ্র বইখানি পড়ে দেখলুম যে, Laski-র প্রবন্ধই এ পুস্তকের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। Laski হচ্ছেন এ যুগের নব পলিটিক্সের একটি প্রধান শাস্ত্রী। উপরন্তু তিনি ইকনমিক-শাস্ত্রেও পণ্ডিত। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন যে—

"That world has become an inescapably interdependent unit. An alteration of the price of wheat on the Chicago exchange may alter the whole way of life of an Hungarian peasant; and the abandonment of free-trade by Great Britain may affect the social economy of all the Scandinavian countries. Anyone who considers the impact of the American departure from the gold standard, in April 1933, upon the commercial habits of Western Europe and Asia, will realise that the sovereign right of a congeries of competing states to take fundamental economic decisions without regard to their impact upon the rest of the world, has become an international danger too great to be endured."

৪

"That world has become an inescapably interdependent unit"—অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী যে এক ইকনমিক জালে জড়িয়ে পড়েছে, আর কোন দেশেরই সে জাল ছিঁড়ে যে পালাবার পথ নেই—সে দেশ বড়ই হোক্ আর ছোটই হোক্, ধনীই হোক্ আর দরিদ্রই হোক,—এই সত্যের প্রতি বাঙালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই আমি বেশী করে বাইরের কথা লিখি।

আর একটি কথা, পৃথিবীর সব দেশেই আজ ইকনমিক ক্ষেত্র interdependent হয়ে পড়েছে, কিন্তু নানা দেশ আজ পলিটিকাল ক্ষেত্রে independent; ফলে, নানা দেশ নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের উন্নতি করতে না পারলেও, পরদেশকে আরও বিপন্ন করে ফেলেছেন। এ ভাবে আর বেশী দিন চললে ইউরোপীয় সভ্যতা রসাতলে যাবে—এই ভয়ে ইউরোপের অনেক জ্ঞানী লোকে পৃথিবীকে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে এক করবার কল্পনা করছেন।

Wells-এর World-State এই কল্পনাপ্রসূত। আমি গত মাসে তাঁর যে বই-এর উল্লেখ করি, Laski সে সম্বন্ধে লিখেছেন যে—

"Mr. H. G. Wells has been unquestionably

right in insisting that there are no effective middle terms between the anarchy of the pre-League world and a World-State in the full sense of the term."

এ-জাতীয় একটি World-State হলে হয়ত মানুষের সবরকম আপদ-শান্তি হয়, কিন্তু তা যে হওয়া সম্ভব, তা ত' মনে হয় না। কেননা তার পূর্ব্বে প্রতি জাতির সভ্যতার ইতিহাস, হিসেবের খাতা থেকে মুছে ফেলতে হবে। আর মানুষ ইতিহাসের জের টেনেই চলে।

৫

এ-সব কথা যথেষ্ট স্পষ্ট হলেও, সকলের চোখে পড়ে না। এর কারণ, সকল সত্য কথা মানুষের প্রিয় নয়। যে-সত্য আমাদের প্রিয় নয়, সেই সত্যেরই আমরা পাশ কাটিয়ে যেতে চাই; আর যিনি তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁকে আমরা pessimist বলি। কেউ কেউ বলেন যে, আমি ঘরে-বাইরের বিষয় যা লিখি, তার ভিতর থেকে pessimism-এর সুর প্রকাশ পায়।

আমার মন বাইরের ঘটনার একান্ত অধীন, সুতরাং অবস্থার বিপর্য্যয়ে যে আমার মনেরও সুর বদলাবে, এ ত' ধরা কথা।

এ যুগে ইউরোপে কেউ আর মানুষকে আশার বাণী শোনাতে পারছেন না। যাঁরা optimist, তাঁরা অবশ্য সমাজকে দিলাশা দিচ্ছেন। অর্থাৎ যে আশা তাঁদের মনে নেই, সেই আশায় ভর করে থাকতে অপরকে পরামর্শ দিচ্ছেন।

ইংলণ্ডের জনকতক বড় বড় ইকনমিষ্টের নাম করতে পারি, যাঁরা দেশের লোককে ভরসা দিচ্ছেন যে, "কেটে যাবে মেঘ"; কিন্তু কি সূত্রে যে কাটবে, তা ঠিক বলতে পারছেন না। অপরপক্ষে কালমেঘ যে দিন দিন ঘনিয়ে আসছে, তাও তাঁরা অস্বীকার করতে পারছেন না। বরং Way to Prevent War প্রভৃতি বইয়ের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, সমাজকে এই আসন্ন ঘোর বিপদের বিষয় সতর্ক করে দেওয়া। ভবিষ্যতে মানুষের সঙ্গে যদি মানুষের লড়াই বাধে, তাহলে সে লড়াইও জন্মলাভ করবে বর্ত্তমান economic অরাজকতার ফলে। এরকম নিজে ভয় পাওয়া আর অপরকে ভয় দেখানোর নাম কি optimism? যদি তাই হয় ত', optimismও pessimism পর্য্যায় শব্দ হয়ে পড়ে।

৬

আমার pessimism-এর কৈফিয়ৎ স্বরূপে আমি বিলেতের একজন শীর্ষস্থানীয় ইকনমিষ্ট G. D. H. Cole-এর ক'টি কথা এখানে উদ্ধৃত করে দেব। আমি বাঙলা রচনাকে ইংরাজী কোটেশন-বিড়ম্বিত করতে ভালবাসিনে। আজকাল যে করছি তার কারণ, ইকনমিক্স সম্বন্ধে আমাদের সকল শিক্ষাদীক্ষা আমরা বিলেতী গুরুদের কাছেই লাভ করেছি। সুতরাং এ-সব বিষয়ে আমরা বাঙলায় যা বলি-কই, তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ইংরাজীরই অনুবাদ। দ্বিতীয়তঃ, আমার বিশ্বাস পাঠকসমাজ আমাদের শিক্ষা-গুরুদের কথার বেশী মূল্য দেবেন, কারণ পাঠকসমাজও আমাদেরই মত ইংরাজীশিক্ষিত সমাজ।

G. D. H. Cole তাঁর সদ্যপ্রকাশিত The Intelligent Man's Review of Europe To-day-নামক প্রকাণ্ড পুস্তকের এই বলে উপসংহার করেছেন যে—

"Only fools venture, in the present situation, upon confident prophecy about the economic outlook. So far, only those who ventured upon prophecy since the world depression began, the pessimists have always been right, and it is tempting to assume that they will go on being right, and to say that there is no prospect of an early recovery from the slump, or even of any sustained upward turn."

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট থেকে নিষ্ক্রমণের কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। এ কথা বলায় যদি pessimism-এর পরিচয় দেওয়া হয়, তাহলে আমি বলি তথাস্তু।

৭

বিলেতী সভ্যতার শৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খলামুক্ত ঘরের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে অতীত ভারতবর্ষের কথা পাড়তে হয়; অর্থাৎ সেই দূর অতীতের, যখন অর্ব্বাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা জন্মলাভ করেনি। আমি সম্প্রতি বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর সমাজ ও রাজা-সৃষ্টি সম্বন্ধে মতের পরিচয় পেয়ে একটু চমকে উঠেছি। কেন, সে কথা পরে বলব।

বসুবন্ধু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক এবং তাঁর রচিত "অভিধর্ম্মকোষ" বৌদ্ধদর্শনের একখানি অগ্রগণ্য পুস্তক। এ পুস্তকের যে সপ্তম শতাব্দীতেও যথেষ্ট পঠন-পাঠন প্রচলিত ছিল, তা বাণভট্টের কথা থেকেই জানা যায়। বাণভট্ট বলেছেন যে, দিবাকর মিত্র নামক বৌদ্ধাচার্য্যের আশ্রমের পেঁচারাও "অভিধর্ম্মকোষ" আওড়াত। এ অবশ্য ঠাট্টার কথা। বাণভট্ট ছিলেন কবি, তাই তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ সকল জাতীয় দার্শনিককে নির্ব্বিচারে বিদ্রূপ করেছেন।

শঙ্করাচার্য্যও খুব সম্ভবতঃ এ গ্রন্থের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গের "মহাযান সূত্রালঙ্কার"ও তিনি তাঁর বেদান্ত ভাষ্যে আত্মসাৎ করেছেন। শঙ্করের মায়াবাদ অসঙ্গের বিজ্ঞানবাদের হিন্দু-সংস্করণ মাত্র। এই কারণেই বোধহয় সেকালের ভক্তি-শাস্ত্রে শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বসুবন্ধুর "অভিধর্ম্মকোষ" আজও মুদ্রিত হয়নি, সুতরাং মূল গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। জনৈক ফরাসী পণ্ডিত কিন্তু উক্ত গ্রন্থ আদ্যোপান্ত ফরাসীভাষায় অনুবাদ করেছেন; আমি সেই অনুবাদের বাঙলায় অনুবাদ করে উল্লিখিত কথা ক'টি বাঙালী পাঠকের কাছে ধরে দেব। আশা করি আমার অনুবাদটি নির্ভুল হবে; অন্ততঃ, তাঁর বক্তব্য সকলেই বুঝতে পারবেন।

৮

বসুবন্ধুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আদি-যুগে কি পৃথিবীতে রাজারাজড়া ছিল?

এ প্রশ্নের উত্তরে বসুবন্ধু বলেন—না। পুরাকালে মানুষে সকালে ধান কাটত দিনে খাবার জন্য, আর বিকেলে ধান কাটত রাত্তিরে খাবার জন্য। তাদের মধ্যে কোন অলসপ্রকৃতির লোক প্রথমে খাদ্য-দ্রব্য সঞ্চয় করে, পরে সকলে তার অনুকরণ করে। সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে—এ বস্তু আমার ও আমার সম্পত্তি—এই কথা মানুষের মনে জন্মলাভ করল। ফলে কাটা-ধান সঞ্চয় করবার প্রবৃত্তি দিন-দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

এর পর মানুষে শস্য-ক্ষেত্র বিভাগ করে নিতে আরম্ভ করল। তারা সব খণ্ড খণ্ড জমির মালিক হয়ে উঠল, এবং পরস্পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিতে সুরু করল। এই হচ্ছে চৌর্য্যবৃত্তির মূল।

আর এই চুরিডাকাতি বন্ধ করবার জন্য তারা সকলে একত্র মিলিত হয়ে কোন "মনুষ্যবিশেষকে" নিজ-নিজ সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য উৎপন্ন-শস্যের ষষ্ঠাংশ দিতে স্বীকৃত হল। মানুষে উক্ত ব্যক্তির নাম দিলে "ক্ষেত্রপ", অর্থাৎ ক্ষেত্র-রক্ষক। যেহেতু তিনি "ক্ষেত্রপ", তাঁর নাম হল ক্ষত্রিয়। যেহেতু তিনি "মহাজনসম্মত" এবং প্রজারঞ্জক, তিনি "মহাসম্মত" রাজা বলে পরিচিত হলেন। এই হচ্ছে রাজবংশের উৎপত্তির কথা।

বসুবন্ধুর এ সব কথা যে বেদবাক্য, তা অবশ্য নয়। এ যুগের philologist এবং sociologist তাঁর ভাষা-তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক বলে অগ্রাহ্য করবেন। তবে তাঁর একটি কথা বর্ত্তমান-বিজ্ঞান-সম্মত। আগে ধান না বুনে, পরে মানুষে ধান কাটে কি করে। এর উত্তরে H. G. Wells বলেন যে, আদিম মানব "reaped before he sowed"; অর্থাৎ আগে Consumption পরে Production।

৯

বসুবন্ধুর মুখে এ সব কথা শুনে আমি যে একটু চমকে উঠেছিলুম, এখন তার কারণ বলছি। এ যুগের পলিটিক্সের প্রবর্ত্তক Rousseau-র মতের সঙ্গে বসুবন্ধুর

মতের আশ্চর্য্য মিল আছে। Social Contract-এর কথাটা ইউরোপে একটি নতুন কথা হলেও—ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন কথা। আর সকলেই জানেন রুসোর মত ইউরোপে কি প্রলয় ঘটিয়েছে।

তারপরে বন্ধুবন্ধুর মুখে Property-র জন্মকথা শুনে, Karl Marx নিশ্চয়ই বলতেন, "ভাই হাত মিলানা"।

এর থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কতকগুলি বিশেষ মতের আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করা হচ্ছে সাধারণ মানবধর্ম্ম। কিন্তু, সেই সব মতামত নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করা সম্ভবতঃ ইউরোপীয়দের ধর্ম্ম। আর আমরা ঘরের লোকের সঙ্গে বাইরের লোকের মনের যতটা পার্থক্য কল্পনা করি, আসলে ততটা নেই; এবং humanity কথাটা একেবারে মিছে নয়। যিনি একটু চোখ চেয়ে দেখবেন, তিনিই human being-এর সাক্ষাৎ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে পাবেন।

তাই আজকাল ইউরোপে যাঁদের বড় মন, তাঁরা পলিটিক্স ও ইকনমিক্সের কথা একটু বড় করে ভাবেন। অপরপক্ষে বর্ত্তমান-সভ্য-সমাজে primitive man-এরও অভাব নেই। Bergson বলেন যে, যাঁর একটু অন্তর্দৃষ্টি আছে তিনিই নিজের অন্তরে primitive man-এর সাক্ষাৎ পাবেন।

পৃথিবীর বর্ত্তমান দুরবস্থা একমাত্র জাতিতে জাতিতে কলহের ফল নয়—আমাদের নিজের অন্তরে যে civilized man আছে, তার সঙ্গে আমাদের অন্তরের primitive man-এর বিরোধেরও ফল।

সাময়িকী

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

গত ১৪-ই অগ্রহায়ণ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ৭৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন। যে দু'একজন জীবিত বাঙালী মনীষীর নাম অতীত ও বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের ভিতরে স্থান পাওয়ার যোগ্য এবং ভবিষ্যতেও যাঁদের নাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের ভিতরেই থাক্‌বে, জগদীশচন্দ্র তাঁদেরই অন্যতম। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার, বিজ্ঞান-জগতে একটা নূতন যুগের সূত্রপাত করেছে। জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর গৌরব, কিন্তু তিনি বাংলার গর্ব্ব। তাই তাঁর ৭৫ বৎসর বয়সের এই প্রারম্ভকে আমরা সাদরে অভিনন্দিত করছি। আরও বহুবার বর্ষ-চক্রের পূর্ণাবর্ত্তন তাঁর জীবনে ফিরে আসুক্‌—এবং তাঁর প্রতিভার অপূর্ব্ব আলোকে তাঁর প্রত্যেকটি দিন সার্থক ও সমুজ্জল হ'য়ে উঠুক।

পরবর্ত্তী সংখ্যায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

রাজা রামমোহনের স্মৃতি-বার্ষিকী

১৮৩৩ সালের ২৭-এ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায় ব্রিষ্টল সহরে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর একশ' বছর অতিবাহিত হয়েছে।

দেশের বড় বড় লোকদের শত-বার্ষিক-স্মৃতি-পূজার আয়োজন এখন প্রায় সব দেশেই করা হচ্ছে, তার প্রয়োজনও আছে। কারণ এই ধরণের স্মৃতি-পূজার দ্বারা মৃত মনীষীদের সেই সব শক্তিকেই আমরা স্মরণ করি, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ঞা করি নিজেদের ভিতর সেই সব শক্তি-অর্জ্জনের যোগ্যতা যা তাঁদের অমর ক'রে রেখেছে। মানুষের ভুলে যাওয়ার ক্ষমতা অপরিসীম। সময়ের ব্যবধান তার মনের উপরে এমন বিস্মৃতির যবনিকা টেনে দেয় যে, যাঁদের দান জাতির ও দেশের মেরুদণ্ড গ'ড়ে তোলে, তাঁদের কথাও মানুষ ভুলে যায়। এ যে তার কত বড় অকৃতজ্ঞতা তা বলা যায় না। এই অকৃতজ্ঞতার পাপ হ'তে জাতিকে মুক্ত রাখার জন্যও এই ধরণের উৎসব-গুলির প্রয়োজন আছে।

রামমোহন এমন একজন লোক যাঁকে অসঙ্কোচে যুগ-প্রবর্ত্তকের আসন ছেড়ে দেওয়া যায়। বস্তুতঃ তরুণ বাংলা, শুধু বাংলাই বা বলি কেন, তরুণ ভারত তাঁর গড়া বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ভারতবর্ষকে দিয়েছেন তার জাতীয়তার অনুপ্রেরণা, ও নবযুগের সাধনার আদর্শ এবং বাংলাকে দিয়েছেন তার ভাষার কাঠামো, ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতি-নীতির গোড়ামির বন্ধন হ'তে মুক্ত হওয়ার উপযোগী মন এবং বিশ্বের সঙ্গে যোগ-যুক্ত হওয়ার উপযুক্ত শিক্ষা ও সংস্কার। সুতরাং দেশের কাছ থেকে পূজা পাওয়ার দাবী তাঁর যতখানি আছে, নব্য-ভারতে দু'একজন ছাড়া আর কারও ততখানি নেই। বাংলা তাঁর স্মৃতি-পূজার আয়োজন ক'রে তার কৃতজ্ঞ মনেরই পরিচয় প্রদান করেছে—বেশী কিছুই করে নি।

স্মৃতি-পূজার কাজ চল্‌বে আগামী ২৯-এ ডিসেম্বর হ'তে ৩১-এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সার্ব্বজনীন সম্মেলন, সাধারণ সভা, মহিলা সম্মেলন, রামমোহনের পোষাক-পরিচ্ছদ ও তাঁর হাতে-লেখা পুঁথি, প্রবন্ধ, পত্র ইত্যাদির প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই উপলক্ষে। বাংলার এবং ভারতের বহু বিখ্যাত জন-নায়ক এবং সাহিত্যিক, রামমোহনের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করবেন। এই শত-বার্ষিকী স্মৃতি-অনুষ্ঠানের সভাপতি হয়েছেন কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ।

এ অনুষ্ঠানকে সাফল্য-মণ্ডিত করতে হ'লে অর্থের আবশ্যক। অনুষ্ঠাতারা জন-সাধারণের কাছে এজন্য অর্থ যাচ্ঞাও করেছেন। বাঙালী এ অনুষ্ঠানকে সার্থক ক'রে তোলার জন্য যা দান করবে তা যে যোগ্য কাজেই দান করা হ'বে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। রামমোহনের যথাযোগ্য স্মৃতি প্রতিষ্ঠার দ্বারাই আমরা তাঁর সম্বন্ধে আমাদের এত দিনকার ঔদাসীন্যের সত্যিকারের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের বাণী

সম্প্রতি বোম্বাই সহরে রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলির একটি প্রদর্শনী হ'য়ে গিয়েছে। এই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বোম্বাই গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকদের নিয়ে। তিনি সেখানকার বিশিষ্ট লোকদের দ্বারা মহাসমারোহে অভ্যর্থিত হয়েছেন। কবি-গুরুকে সেখানে অনেকগুলি সভাতে বক্তৃতাও করতে হয়েছে। বক্তৃতাগুলি মহাকবির গভীর চিন্তাশীলতা ও দূরদৃষ্টির ছাপে সমুজ্জ্বল। আমরা দেশের জনসাধারণকে এই বক্তৃতাগুলি বিশেষ অভিনিবেশের সঙ্গে পাঠ করতে অনুরোধ করি। এখানে আমরা তাঁর বক্তৃতা হ'তে দু'একটি কথা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। বর্ত্তমান শিক্ষা, সভ্যতা ও যুগের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"বর্ত্তমানের শিক্ষা আমাদের মনকে ঠিকভাবে গ'ড়ে তুলতে পারছে না। বরং এ শিক্ষা অন্তরের সত্তাকে বাইরে ব্যক্ত করার পক্ষে বিষম অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এই চরম সত্যকেও তাই আজ আমরা প্রতিপদে অস্বীকার ক'রে চলেছি। * * বর্ত্তমানের বৈজ্ঞানিক যুগে ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করবার যে বিপুল অভিযান চলেছে, তার ফলে দেখা দিচ্ছে পৃথিবীব্যাপী বিপর্য্যয় ও বিশৃঙ্খলা। * * * শক্তিশালীর আক্রমণ হ'তে নিজেকে বাঁচাতে হ'বে, কেবল তাই নয়, দুর্ব্বলের হাত হ'তেও নিজেকে বাঁচতে হ'বে। কারণ তা না হ'লে শক্তির সমতা রক্ষা করা সম্ভবপর হ'বে না। চোরাবালি যেমন শক্তিমান হাতীর পক্ষে বিপজ্জনক, বলবানের পক্ষে দুর্ব্বলও তেমনি বিপদের বস্তু। দুর্ব্বল প্রতিরোধ করতে অসমর্থ, কিন্তু চোরাবালির মতই তা বলবানকে নীচে টেনে নামায়।"

পশ্চিম আজ যে মনোভাব নিয়ে সারা দুনিয়ায় প্রভুত্ব করে বেড়ায় তার পরিচয় দিতে গিয়ে, কবি-গুরু বলেছেন—

"পশ্চিম আজ মনে করে যে, তারা যেন একটা বিরাট দাস-সম্প্রদায়ের মালিক। এই সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ জীর্ণ শীর্ণ লোককে তারা রাষ্ট্র ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কলের চাকার সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। এই মনোবৃত্তির মূলে রয়েছে ইউরোপের একটা আতঙ্কগ্রস্ত ভাব। তাই সে আজ আদিম বর্ব্বর যুগের প্রথার অনুসরণ ক'রে অচিন্ত্যপূর্ব্ব নিষ্ঠুরতা এবং অমানুষিকতা দিয়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ত্রাসের সঞ্চার ক'রে ফিরছে। কাপুরুষের নিষ্ঠুরতার তুলনায় কোন নিষ্ঠুরতাই বেশী তীব্র নয়। লোভের এবং লাভের নিকট যারা আত্মবিক্রয় করে, নিজেদের গৌরব অযথা বাড়াবার নেশায় যারা উন্মত্ত, তাদের চিত্ত সর্ব্বদাই ভরা থাকে সন্দেহে এবং ভয়ে। তাই আশঙ্কার সামান্য কারণ যেখানে বিদ্যমান সেখানেও তারা নিষ্ঠুর হ'তে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না। অপরকে স্বাধীনতা দেবার ক্ষমতা তাই পশ্চিম আজ একেবারেই হারিয়ে বসেছে। যে কোনও উপায়ে

তারা তাদের লব্ধ-বস্তু রক্ষা করবার জন্যই সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন। আর তারি ফলে তারা নিজেদের এবং পরের স্বাধীনতা সম্বন্ধে একেবারে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়েছে।"

স্বাধীনতার জন্য দেশের ভিতর আজ একটা গভীর ব্যাকুলতার সৃষ্টি হ'য়েছে। এই স্বাধীনতার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বোম্বাই-এর এক বক্তৃতায় বলেছেন —

"স্বাধীনতা বাইরের বস্তু নয়। মনের ও আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে জীবনের আদর্শ হিসেবে যে গ্রহণ করতে শিখেছে এবং অপরের দিকে ও জিনিষটাকে সম্প্রসারিত ক'রে দিতে যে কুণ্ঠিত নয়, সে-ই স্বাধীনতার প্রকৃত উপাসক। যার অধীনে শত শত ক্রীতদাস থাকে সে ব্যক্তিও প্রকারান্তরে ক্রীতদাসের সঙ্গে একই শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সকলকে বাদ দিয়ে এবং দূরে রেখে সে তার নিজের তৈরী প্রাচীরের ভিতরেই একাকী বাস করে। তার সেই প্রাচীরের আড়ালে তার নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও সঙ্কুচিত হ'য়ে থাকে। স্বাধীনতা সম্বন্ধে যার অপরের প্রতি একান্ত অবিশ্বাস এবং সন্দেহ, স্বাধীনতার উপর তার কিছুমাত্র নৈতিক দাবী থাকে না — সে পরাধীনই থেকে যায়।"

কবি-গুরু তাঁর এই শেষের কথাটা বলেছেন দেশের লক্ষ লক্ষ লোক, যাদের আমরা অস্পৃশ্য ক'রে রেখেছি — আচার-ব্যবহার, চলা-ফেরার স্বাধীনতা হ'তে বঞ্চিত ক'রে রেখেছি, তাদের দিকেই ইঙ্গিত ক'রে। যে স্বাধীনতা আমরা চাই, সেই স্বাধীনতা হ'তেই প্রকাণ্ড একটা জন-সমাজকে বঞ্চিত ক'রে রাখলে, আমাদের দাবীই হালকা হ'য়ে পড়ে, দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। পশ্চিমের উদ্ধত মনের উপরে কবি-গুরুর বাণী রেখাপাত করবে, এ আশা করা অবশ্য আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। তিনি নিজেই বলেছেন — "আমি জানি, শক্তিশালীকে সাবধান করবার জন্য আজ আমি যে সব কথা বলছি, তা অরণ্যে রোদনের মতই নিষ্ফল।" কিন্তু সে যাই হোক্, আমরা কায়মনোবাক্যেই কামনা করি, দেশের লোক যেন ধীরভাবে তাঁর কথাগুলি নিয়ে চিন্তা করে—আলোচনা করে। তা'তে যে দেশের অশেষ কল্যাণ হ'বে তা'তে আমাদের কিছু-মাত্র সন্দেহ নেই।

অদ্ভুত দাবী

কর্পোরেশনের একটি বিশেষ সভায় ১৯-জন মুসলমান কাউন্সিলার একযোগে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করেছেন —

"শ্রমিক ও নিম্নতন ভৃত্যদের কাজ ছাড়া কলিকাতা কর্পোরেশনের আর সমস্ত কাজেই মুসলমানদের জন্য শতকরা ৩৩⅓টি পদ ছেড়ে দিতে হ'বে এবং মুসলমান কর্ম্মচারীদের সংখ্যা যত দিন না শতকরা ৩৩⅓এ পৌঁছায় ততদিন শতকরা ৫০-জন হিসাবে মুসলমান কর্ম্মচারীর দ্বারাই কর্পোরেশনের নতুন ও শূন্য পদগুলি ভর্ত্তি করতে হ'বে।"

মুসলমান কাউন্সিলারদের এ প্রস্তাবের ভিতরে কোথাও এতটুকু যুক্তি নেই বা ন্যায়ের অনুমোদন নেই — এ নিছক আবদার মাত্র। কারণ এ দাবী পেশ করবার কোন অধিকারই নেই কলিকাতার মুসলমানদের। এ ধরণের দাবীর নিষ্পত্তি সাধারণতঃ তিন রকমে হ'য়ে থাকে — লোক-সংখ্যার অনুপাতে, যোগ্যতার অনুপাতে, কর-দানের অনুপাতে। লোক-সংখ্যার দিক্ দিয়ে বিচার ক'রে দেখ্‌লে— মুসলমানেরা শতকরা বড় জোর ২০-টি মাত্র পদের দাবী করতে পারেন। কারণ মুসলমানদের জন-সংখ্যা গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটী বাদে কলিকাতায় শত করা ২০·৭। ১৯৩১ সালের 'সেন্সাস রিপোর্টে' এই সংখ্যার অনুপাত শতকরা ২০·৭ জনই ধরা হয়েছে।

ট্যাক্স দানের দিক দিয়ে বিচার করলে মুসলমানদের দাবী হ'য়ে পড়ে আরও অদ্ভুত—আরও অকিঞ্চিৎকর। কারণ তারা যে ট্যাক্স দেয়, তা কর্পোরেশনের সমগ্র ট্যাক্সের (গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যালিটীর দেয় ট্যাক্স নিয়ে) শতকরা ৫·৩ ভাগ মাত্র। সুতরাং অর্থের দিক

দিয়ে বিচার করে দেখ্‌লে, অর্থাৎ যাদের টাকার জোরে কর্পোরেশন চলছে তাদের দিক দিয়ে বিচার করলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের চাকরীতে মুসলমানদের দাবী পাঁচ-ছ'টির বেশী পদকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে পারে না।

তার পর যোগ্যতার কথা। যোগ্যতার পরিমাপ মোটামুটি ভাবে করা যায় সম্প্রদায়ের ভিতরকার শিক্ষিতদের সংখ্যার দ্বারা। কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলিতে প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের ভিতরে যাঁরা ইংরেজী জানেন তাঁদের অনুপাতে ইংরেজীজানা মুসলমানদের সংখ্যা ১৩'৬ জন মাত্র। ইংরেজীজানা লোকদের অনুপাত ধরার কারণ এই যে, কর্পোরেশনের যে পদগুলি লাভের জন্ত এঁরা দাবী করেছেন তার প্রায় সবগুলিতেই ইংরেজীজানা দরকার। সুতরাং মুসলমান কাউন্সিলারদের এ-দাবী যে কত অদ্ভুত ও অন্যায় তা বোঝা মোটেই কঠিন নয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের কাজ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ, ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বড় সহরের লক্ষ লক্ষ নর-নারীর স্বার্থের সঙ্গে তা জড়িত হ'য়ে আছে। এ কারও ঘরোয়া ব্যাপার নয় যে, খুশীমত বা খেয়ালমত এর বিধি-ব্যবস্থা, কাজ-কর্ম নিয়ন্ত্রিত করা চলবে। এর শৃঙ্খলার ভিতর, কাজের ভিতর, কোথাও এতটুকু গলদ থাকলে তার ফল হাজার হাজার নর-নারীর পক্ষে মারাত্মক হ'য়ে ওঠা কিছুমাত্র কঠিন নয়। সুতরাং অন্যায় দাবীর স্থান এখানে একেবারেই নেই।

কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভার অ-ব্রাহ্মণ সদস্যেরা সেখানকার লাট সাহেবকে সম্বর্দ্ধনা করবার সময় সরকারী চাকুরীতে তাঁদের সম্প্রদায় থেকে বেশী লোক নেবার প্রার্থনা জানান। লাট সাহেব তার উত্তরে যা বলেছিলেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেছিলেন — "আমার গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে যতটা করা সম্ভব তা' করেছে এবং সরকারী চাকরীতে সব সম্প্রদায়ের লোকই যাতে যথাযোগ্যস্থান পায় তার চেষ্টা এখনও করছে। কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের সংখ্যানুপাতে সরকারী কাজ দেওয়া হ'বে — এ দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়। তা করলে সরকারী কাজে যোগ্যতার আদর্শ খাটো হ'য়ে পড়্‌বে। কোন গবর্ণমেণ্টই এ রকমের অবস্থার কল্পনাও করতে পারেন না।"

বোম্বাইয়ের লাট সাহেব কথাটা বলেছিলেন অনুন্নত সম্প্রদায়ের সম্পর্কে। কিন্তু তা হ'লেও কথাটা কলিকাতা কর্পোরেশনের চাকরীর এই সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাটোয়ারার চেষ্টার সম্পর্কেও চমৎকার খাপ খায়। যেখানে যোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে সেখানে সংখ্যার অনুপাতে চাকরী দিতেও স্যর ফ্রেডারিক রাজি নন্। কলিকাতা কর্পোরেশনের চাকরীর যে দাবী মুসলমান কাউন্সিলরেরা জানিয়েছেন তা কেবল যোগ্যতার দাবীকেই লঙ্ঘন করে নি, লোকসংখ্যার অনুপাতের দাবীকেও লঙ্ঘন করেছে।

কিছুদিন হ'ল হিন্দুরা মুসলমানদের সঙ্গে হিসাব-নিকাশে ধামা-চাপা দেওয়ার নীতিকেই গ্রহণ করেছেন। এ নীতিগ্রহণ করার উদ্দেশ্য একটা মনোমালিন্যকে এড়িয়ে চলা। কিন্তু এই মনোমালিন্য এড়িয়ে চলতে যেয়ে ক্রমেই তা বেড়ে উঠ্‌ছে। এ অনিবার্য্য। কারণ যেখানে মনের ভিতর থেকে ত্যাগের প্রেরণা নেই, অথচ অন্য কারণে ত্যাগ করতে হয় — সেখানে মন থাকে অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট মনের ভিতরেই বিদ্বেষের বীজ ডাল-পালা ছড়িয়ে বেড়ে ওঠে। এ কথাটা হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই আজ বোঝার প্রয়োজন এসে পড়েছে। কারণ এমনি ভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস। অবিশ্বাসই এই বাংলার জাতীয় জীবনকে পাকা বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হ'তে দিচ্ছে না। হিন্দুদের দুর্ব্বলতা কেবল যে হিন্দুকেই পঙ্গু ক'রে তুলছে তা নয়, মুসলমানকেও গ্লানিতে ভরে দিচ্ছে, সমগ্র জাতির প্রাণ-শক্তিকেই তা ক্ষীণ ক'রে তুলছে।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সম্মান

লণ্ডনের কেমিক্যাল সোসাইটি বিজ্ঞান-জগতের শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। সুতরাং এর 'অনারারী ফেলো' নির্ব্বাচিত হওয়া পৃথিবীর যে কোনও বৈজ্ঞানিকের পক্ষে গৌরবের কথা। আর সেইজন্যই এ সম্মান সাধারণতঃ খুব কম লোকের পক্ষেই লাভ করার সৌভাগ্য হ'য়ে থাকে, যদিও এ সমিতির সাধারণ সভ্য অনেকেই হ'তে পারেন।

এবার পৃথিবীর সাতজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের ললাটে এই গৌরবের জয়মাল্য পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সাতজনের ভিতরে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রও একজন। বাকি ছয়জনের ভিতরে দু'জন এমন বৈজ্ঞানিকও আছেন যাঁরা বিজ্ঞানের জন্যই 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের এই সম্মান বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছে, বিশ্বের দরবারে বাঙালীর গৌরব বাড়িয়েছে।

গ্রন্থাগারিকের কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা

বাংলা গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছে ভাল লাইব্রেরীয়ান তৈরী করবার জন্য ক্লাশ খোলবার একটা পরিকল্পনা পাঠিয়ে দিয়েছেন। পরিকল্পনাটি কি ক'রে কাজে পরিণত করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা করবার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়েছে। তার সদস্য মনোনীত হয়েছেন ডাঃ ডব্লিউ, এস, আরকোহার্ট, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কুমার মুনীন্দ্রনাথ দেব রায় মহাশয়, এম্-এল্-সি এবং ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান—মিঃ কে, এম, আসাদুল্লা।

ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশের বিশ্ব-বিদ্যালয় এর আগেই ভাল লাইব্রেরীয়ান তৈরী করবার দায়িত্ব নিজেদের উপরে তুলে নিয়েছেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হ'তে গ্রন্থাগারিকের কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে এবং তারপর তাঁদের পথ মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ও গ্রহণ করেছেন। বাংলার বিশ্ব-বিদ্যালয়েরও যে এদিক দিয়ে দেশের প্রতি একটা দায়িত্ব আছে তাতে সন্দেহ নেই।

সম্প্রতি কলিকাতায় 'নিখিল-ভারত-গ্রন্থাগার-সম্মেলনে'র একটি অধিবেশন হ'য়ে গিয়েছে। সেই অধিবেশনই এ সম্পর্কে দেশের শিক্ষিত সমাজকে খানিকটা সচেতন ক'রে তুলেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় যদি এ ভার গ্রহণ করেন, তবে তার মত ভাল ব্যবস্থা আর কিছুই হ'তে পারে না। বস্তুতঃ শিক্ষাদানের সুবিধা তাঁদের যতটা আছে, আর কোন প্রতিষ্ঠানের তা নেই। কারণ তাঁদের নিজেদের বড় লাইব্রেরী আছে এবং কি ক'রে যে শিক্ষাদান করতে হয় তার পদ্ধতির সঙ্গেও তাঁদের বিশেষ পরিচয় আছে।

গ্রন্থাগার যে শিক্ষা-বিস্তারের একটা বড় উপায় তা অস্বীকার করবার জো নেই। গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়ে ইউরোপ এবং আমেরিকায় শিক্ষা-বিস্তারের পথ ঢের সুগম হ'য়ে উঠেছে। তা ছাড়া গ্রন্থাগার সংশিক্ষা বিস্তারেরও একটা বড় পথ। রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে দেখা যায় যে, জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরণের ভাল ভাল গ্রন্থ বেছে নিয়ে অজস্র গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছে। দেশের লোক সেই সব গ্রন্থ পড়ে এবং তাদের যা জানা দরকার এইভাবে অতি সহজে তারা সেগুলি আয়ত্ত ক'রে নেয়।

বাংলার অজ্ঞতা অপরিসীম। তার পাঁচ কোটি নর-নারীর ভিতর যাঁরা শুধু লিখ্‌তে পড়্‌তে জানেন, তাঁদের সংখ্যা শতকরা বড় জোর এগার জন। যাঁরা লিখ্‌তে পড়্‌তে জানেন তাঁরাও আবার ভাল গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন না, তাঁদের অনেকে কেবল বাজে গ্রন্থ প'ড়েই সময় কাটান। ফলে বাংলায় চলেছে — যেখানে শিক্ষা আছে সেখানেও শিক্ষার অপব্যবহার। বাংলার সহরে ও পল্লীতে লাইব্রেরী যে কতকগুলি গ'ড়ে ওঠেনি, তা নয়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখ্‌লে দেখা যাবে, তার ভিতরে অপাঠ্য

গ্রন্থের সংখ্যাই বেশী। এই অপাঠ্য গ্রন্থগুলি ছেঁটে ফেলে, ভাল গ্রন্থ দিয়ে গ্রন্থাগারগুলি ভরিয়ে তুলবার দায়িত্ব লাইব্রেরীয়ানের। সুতরাং দেশের ভিতর ভাল লাইব্রেরীয়ানের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কিন্তু ভাল লাইব্রেরীয়ান হওয়াও শিক্ষা-সাপেক্ষ। আর সেইজন্যই বিশ্ব-বিদ্যালয় যদি এই শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে তার দ্বারা তাঁরা দেশেরই কল্যাণ সাধন করবেন।

টেক্সট্-বুক কমিটি

বাংলার স্কুলগুলিতে কোন্ কোন্ বই পড়ান হ'বে তার নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি আছে। এই কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা যাচ্ছিল কিছুদিন থেকে এবং সে অভিযোগের প্রধান কথা ছিল—গ্রন্থের নির্বাচন ভাল হচ্ছে না। কিন্তু সম্প্রতি যে অভিযোগ এসেছে তা ঠিক এ ধরণের নয় — সে অভিযোগ আরও গুরুতর। সে অভিযোগ সত্য হ'লে তার প্রতিকারের ব্যবস্থার জন্য বাংলার গবর্ণমেন্টের তৎপর হওয়া সঙ্গত। অভিযোগটি এই —কমিটির সদস্যেরা তাঁদের খেয়ালমত ইতিহাস তৈরী করা সুরু ক'রে দিয়েছেন, অর্থাৎ গ্রন্থকারদের দিয়ে তাঁদের মর্জ্জি-মত ইতিহাসের ঘটনার পরিবর্ত্তন করিয়ে বই লেখাতে সুরু ক'রে দিয়েছেন। তাঁরা স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের গ্রন্থকারদের উপর যে সব ফতোয়া জারি করেছেন ব'লে শোনা যাচ্ছে, তার দু'একটির নমুনা নিয়ে উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া গেল —

আলাউদ্দিন খিলিজি তার পিতৃব্য জালালুদ্দিন খিলিজিকে হত্যা ক'রে সিংহাসন আরোহণ করেছিলেন —স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের ভিতরে এ-কথার উল্লেখ থাকতে পারবে না। সুলতান মহম্মদ তোগলক যে অত্যাচারী ও খাম-খেয়ালী নৃপতি ছিলেন, প্রজাকে যে তিনি অজস্র অত্যাচারে নিপীড়িত করেছেন, ইতিহাসের ভিতর হ'তে এ কথাগুলি বাদ দিতে হবে।

শিখদের উপর মোগল বাদশাহদের অমানুষিক উৎপীড়নের উল্লেখ ইতিহাসে থাকতে পারবে না — জাহাঙ্গীরের আদেশে গুরু অর্জ্জুন সিংকে হত্যা করা হয়েছিল, আওরঙ্গজেবের আদেশে তেগ বাহাদুর নিহত হয়েছিলেন, বান্দা এবং তাঁর শিষ্যেরা নিহত হ'ন বাহাদুর সার নির্দ্দেশ-ক্রমে — এই সব অবিসংবাদিত সত্য ইতিহাসের ভিতর থেকে বাদ দিতে হ'বে।

আওরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষের কথা, তাঁর হিন্দু-মন্দির ধ্বংসের কথা, হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর বসানর কথা, তাঁর শাসননীতিই যে মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ — এ-সব কথা ইতিহাসের ভিতর থেকে ছেঁটে ফেলতে হ'বে।

আফ্জল খাঁ-ই যে প্রথমে শিবাজীকে আক্রমণ করেন এবং শিবাজী যে শুধু আত্মরক্ষার্থেই তাঁকে হত্যা করেছিলেন—এ সত্যের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত করান চলবে না, ইত্যাদি।

ইতিহাস মানে—অতীতের যা সত্য তারি সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তাতে কল্পনারও স্থান নেই, পক্ষপাতিত্বেরও স্থান নেই। সেই ইতিহাসকে যাঁরা বিকৃত করতে চাচ্ছেন তাঁরা যে 'টেক্সট্ বুক কমিটি'র সদস্য হওয়ার উপযুক্ত নন, তা বলাই বাহুল্য। স্কুলে যেসব বই পড়ান হয় তার বাছাই খুব ভাল হয় না। এদিক দিয়ে কমিটির একটা বড় রকমের ত্রুটি আছে। এই ত্রুটির সঙ্গে যদি আবার এত বড় একটা অন্যায় ও অনাচার এসে মেশে, তবে সে রকমের কমিটির দ্বারা দেশের প্রভূত অকল্যাণের আশঙ্কা আছে। দেশের বালক-বালিকাদের শিক্ষার উপাদান যাঁরা ঠিক ক'রে দেবেন, তাঁরা নিজেরাই যদি ক্ষুদ্রতার হাত হ'তে মুক্তিলাভ করতে না পারেন তবে ছেলেদের বড় হবার আদর্শের প্রতিষ্ঠা তাঁদের দ্বারা কখনও হ'তে পারে না। সুতরাং 'টেক্সট্-বুক কমিটি'র বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এসেছে তার মূলে যে সত্য কতখানি আছে তা যাচাই ক'রে দেখা সকলেরই উচিত। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি 'টেক্সট্-বুক কমিটি'র দিকে আকর্ষণ করছি।
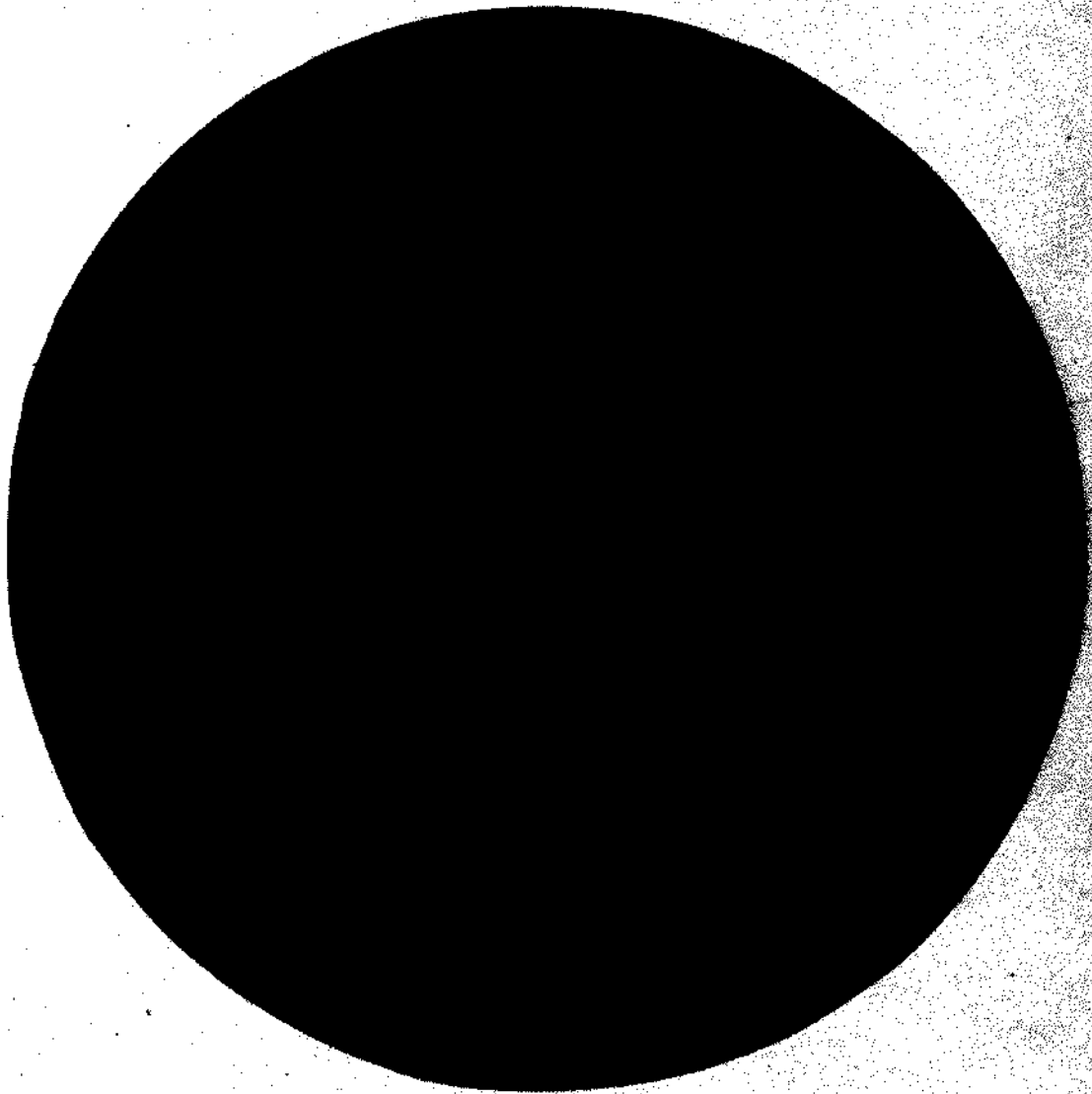
'কোথায় আলো ? কোথায় আলো ?'

শিল্পী — কুমার রবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ)

সরোজনলিনী দত্ত

মাঘ

১৩৪০

প্রথম বর্ষ

দশম সংখ্যা

কৃত্তিবাসের "হরধনুভঙ্গ"

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্‌-এ

রামকর্তৃক হরধনুভঙ্গের বৃত্তান্ত রামায়ণের আদিকাণ্ডের একটি বিশিষ্ট প্রসঙ্গ। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড সম্পাদন কালে * এই প্রসঙ্গটি লইয়া বিস্তর ভুগিতে হইয়াছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাঠকগণকে তাহারই কিছু বিবরণ প্রদান করিব।

মূল রামায়ণে হরধনুভঙ্গবৃত্তান্ত অত্যন্ত সরল। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে যজ্ঞরক্ষান্তে বিশ্বামিত্র রামের নিকট মিথিলায় জনকযজ্ঞে যাইবার প্রস্তাব করিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে জনকগৃহস্থ হরধনুর বৃত্তান্তও রামকে কহিলেন। রাম মিথিলা যাইতে সম্মত হইলে বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে লইয়া তথায় রওনা হইলেন। বিশ্বামিত্রের আশ্রম গঙ্গার দক্ষিণ ভাগে ছিল †। দিনমান হাটিয়া রামলক্ষ্মণসহ বিশ্বামিত্র শোণ নদের তীরে উপস্থিত হইলেন। রাত্রিতে বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে কুশনাভের শতকন্যার বায়ুকোপে কুব্জত্বপ্রাপ্তি, কুশনাভের পুত্র গাধির জন্ম, ইত্যাদি কাহিনী শুনাইলেন। প্রভাতে শোণ নদ পার হইয়া আবার দিনমান হাটিয়া পথিকগণ গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। জাহ্নবীতীরে বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণের নিকট গঙ্গার জন্ম-কাহিনী এবং রামের পূর্ব্বপুরুষ সূর্য্যবংশীয় রাজা ভগীরথকর্ত্তৃক মর্ত্ত্যে গঙ্গা-আনয়ন বর্ণনা করিলেন। গঙ্গা পার হইয়া রামলক্ষ্মণ ও বিশ্বামিত্র রাজা বিশালের পুরী অর্থাৎ বৈশালী নগরীতে উপনীত হইলেন। এই স্থানে বিশ্বামিত্র রাজা বিশালের ইতিহাস বর্ণনা-প্রসঙ্গে সমুদ্রমন্থন ইত্যাদি কাহিনী রামলক্ষ্মণকে শুনাইলেন। ইহার পরে অহল্যার কাহিনী কীর্ত্তন ও অহল্যা-উদ্ধার বৃত্তান্ত। অহল্যা-উদ্ধারের পরেই মিথিলা গমন। মিথিলায় জনক বিশ্বামিত্রকে রাম-

* আষাঢ়, ১৩৪০, সংখ্যা 'উদয়নে' 'কৃত্তিবাসের গঙ্গাবতরণ' নামক প্রবন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তারার্পণসূত্রে কিরূপে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণ উদ্ধারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা পূর্ব্বেই পাঠকপাঠিকাগণকে জানাইয়াছি।

† বিশ্বামিত্রের আশ্রমের নাম সিদ্ধাশ্রম,—বর্ত্তমান বক্সারে উহা অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত হয়। বক্সার শোণ নদের তীর হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূরে,—রামলক্ষ্মণ একদিনে অতটা রাস্তা হাটিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বক্সার গঙ্গার তীরে, রামায়ণে সিদ্ধাশ্রম গঙ্গাতীরে অবস্থিতরূপে বর্ণিত নহে। শোণ নদের পশ্চিমে ১৫।২০ মাইলের মধ্যে কোথাও বিশ্বামিত্রাশ্রমের অবস্থান সম্ভবপর। শ্রীযুক্ত নন্দলাল দে মহাশয়ের Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India-গ্রন্থে গয়ার ২৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে দেবকুণ্ড নামক স্থানে বিশ্বামিত্রাশ্রমের অপর সন্ধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

লক্ষ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বিশ্বামিত্র জনককে রামের রাক্ষস-বধ, যজ্ঞরক্ষা, ইত্যাদি কীর্তি শুনাইলেন। এমন সময় অহল্যার পুত্র শতানন্দ সেইখানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র সানন্দে শতানন্দকে রামদর্শনে অহল্যার শাপান্ত বৃত্তান্ত শুনাইলেন। শতানন্দ তখন বিশ্বামিত্রের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্রের সহিত বসিষ্ঠের বিবাদ, বিশ্বামিত্রের পরাজয়, তপস্যাদ্বারা বিশ্বামিত্রের রাজর্ষিত্ব লাভ, ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভের জন্য বিশ্বামিত্রের কঠোরতর তপস্যা, বিশ্বামিত্রের প্রভাবে ত্রিশঙ্কুর সশরীরে স্বর্গে গমন, বিশ্বামিত্রের প্রদত্ত মন্ত্রপ্রভাবে শুনঃশেফের প্রাণরক্ষা, এই কাহিনীগুলি শতানন্দ সবিস্তারে কীর্তন করিলেন।

প্রসঙ্গতঃ এই স্থানে উল্লেখ করা যায় যে, বাজার-সংস্করণের রামায়ণে,—তথা উহার মূল ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীরামপুরী রামায়ণে এই মনোরম কাহিনীগুলি সমস্তই বাদ পড়িয়াছে। অথচ কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের অধিকাংশ পুঁথিতেই এই উপাখ্যানগুলি আছে। শ্রীরামপুরী রামায়ণের অবলম্বিত পুঁথিখানি যে নিতান্তই খণ্ডিত ও বিশৃঙ্খলপত্র ছিল, এই মনোহর কাহিনীগুলির বর্জন তাহার অন্যতর প্রমাণ।

এই কাহিনীগুলি বলা হইলে পর, রামলক্ষ্মণকে হরধনু দেখাইবার জন্য বিশ্বামিত্র জনককে অনুরোধ করিলেন। জনক রামলক্ষ্মণকে হরধনুবৃত্তান্ত শুনাইলেন। কিরূপে বহু রাজা হরধনু ভাঙ্গিতে আসিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়াছেন, কিরূপে তাঁহারা অবশেষে জোর করিয়া সীতাকে ছিনাইয়া লইবার জন্য মিথিলা অবরোধ করিয়াছিলেন, এবং জনকের নিকট পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিয়াছেন, জনক এই সমস্ত গল্প বলিয়া ধনু আনিতে আদেশ করিলেন। অষ্টশত পুরুষ সেই ধনু বহিয়া আনিল ধনু এক মহাকায় সিন্দুকে রক্ষিত ছিল। রাম সিন্দুক খুলিয়া ধনুটি দেখিলেন। বিশ্বামিত্রের আদেশে তিনি হাসিতে হাসিতে ধনুকে জ্যা আরোপণ করিলেন। জ্যা ধরিয়া টানিতেই ধনু মধ্যে ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হইয়া গেল। ধনু ভাঙ্গিবার সময় ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। বিশ্বামিত্র, জনক এবং শ্রীরামলক্ষ্মণ ব্যতীত আর সকলেই সেই ভীষণ শব্দ শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, এই বর্ণনায় সীতার প্রসঙ্গমাত্র নাই—রামকে সীতার দূর হইতে দেখিবার কথা—অথবা রাম-সীতার চোখে চোখে দেখা হইবার কথা,—রামকে পতিরূপে পাইবার জন্য সীতার দেবগণের নিকট প্রার্থনার কথা,—ইহার কিছুই উপরের বিবরণে নাই।

এখন, বাজার প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে হরধনু-ভঙ্গবৃত্তান্ত কি প্রকারে বর্ণিত আছে, দেখা যাক্।

মিথিলার রাজা জনক চাষকৃমে কন্যা সীতাকে প্রাপ্ত হইলেন। সীতা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। সীতার বিবাহ-ব্যবস্থার জন্য স্বর্গে দেবতাগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মার পরামর্শে শিব পরশুরামকে ডাকাইয়া আনিলেন। নিজের ধনুক দিয়া শিব পরশুরামকে মিথিলায় পাঠাইয়া দিলেন। জনকের নিকট পরশুরাম মুখে শিব এই উপদেশ প্রেরণ করিলেন যে, এই হরধনু যে ভাঙ্গিতে পারিবে, তাহাকেই যেন সীতা-সম্প্রদান করা হয়। পরশুরাম জনককে সেই উপদেশ দিয়া জনকের ঘরে হরধনু রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। সীতা-সম্প্রদান সম্বন্ধে জনকের এই পণের কথা দেশ-বিদেশে বিঘোষিত হইলে বহু রাজা ও রাজপুত্র ধনুক ভাঙ্গিতে মিথিলায় আসিলেন, কিন্তু কেহই ধনুক ভাঙ্গিতে পারিলেন না,—লজ্জা পাইয়া পলায়ন করিলেন। লঙ্কার রাবণও ধনুক ভাঙ্গিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাকাল হওয়ার কথা বাজার-সংস্করণের রামায়ণে বেশ বিস্তৃতভাবে সরস করিয়া বর্ণিত।

বিশ্বামিত্রের তপোবনে যজ্ঞরক্ষান্তে বিশ্বামিত্র রামকে জনকতনয়া সীতার কথা এবং হরধনুভঙ্গপণে জনককর্তৃক তাহার বিবাহ-ঘোষণার কথা বলিলেন। শুনিয়া রাম মিথিলাতে যাইতে সম্মত হইলেন। বিশ্বামিত্রের সহিত রামলক্ষ্মণ মিথিলায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র জনকের নিকট দুই রাজকুমারের

পরিচয় দিলেন, এবং রামের কান্তিকাহিনী বলিলেন,—জনক মহাসমাদরে রামলক্ষ্মণকে অভ্যর্থনা করিলেন। ইহার পরে বাজার-সংস্করণের রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত করিতে হইতেছে:—

হেনকালে জনক বলেন কুতূহলে।
সভায় বসিয়া কথা শুনেন সকলে॥
যেজন শিবের ধনু ভাঙ্গিবারে পারে।
সীতা নামে কন্যা আমি সমর্পিব তারে॥
একথা শুনিয়া রাম কমললোচন।
ধনুকের সন্নিকটে করেন গমন॥
হেনকালে সীতা দেবী সহ সখীগণ।
অট্টালিকা উঠিয়া করেন নিরীক্ষণ॥
জানকী বলেন সখী করি নিবেদন।
কোন্ জন রাম বা লক্ষ্মণ কোন্ জন॥
সীতারে দেখায় সখীগণ তুলি হাত।
দুর্ব্বাদলশ্যাম ঐ রাম রঘুনাথ॥
রামেরে দেখিয়া সীতা ভাবিলেন মনে।
পাছে হে বিরিঞ্চি কর বঞ্চিত এ ধনে॥
দেবগণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে।
স্বামী করি দেহ রাম কমললোচনে॥
বাসনা পুরাও মম দেব গণপতি।
হর-হরি-সূর্য্যদেব দেবী ভগবতী॥
দেব-দেবী স্থানে সীতা করেন প্রার্থনা।
রামে পতি ক'রে দিয়া পুরাও বাসনা॥
পিতার কঠিন প্রাণ রাম শিশু তনু।
কি প্রকারে ভাঙ্গিবেন মহেশের ধনু॥
সীতার মানস জানি হৈল দৈব বাণী।
পাবে রাম গৃহে যাও জনকনন্দিনী॥

ইহার পরে বাজারসংস্করণে একটি ত্রিপদী আছে—তাহাতে উপরে উদ্ধৃত ছত্রগুলির শেষ কয়ছত্রের বিষয়ই ফিরিয়া ত্রিপদীতে বলা হইয়াছে; অর্থাৎ দেবদেবীগণের নিকট রামকে পাইবার জন্য সীতা প্রার্থনা জানাইয়াছেন। এই ত্রিপদীর সমস্তটা উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক—তবে নিম্নলিখিত ছত্র কয়টি পাঠকের জানা দরকার —

কমঠ কঠোর ধনু শ্রীরাম কোমল তনু
কেমনে তুলিবে শরাসন।
কত শত বীরগণ না করিল উত্তোলন
পিতার দারুণ এই পণ॥
সীতার এমন মন বুঝিলেন দেবগণ
আকাশে হইল দৈব বাণী।
শুন গো জনকসুতা না হইও দুঃখ-যুতা
স্বামী তব রাম গুণমণি॥

হরধনুভঙ্গ এবং বিবাহের পূর্ব্বে সীতার সহিত রামের পূর্ব্বরাগপর্য্যায় সাক্ষাৎকার, রামকে পাইবার জন্য সীতার দেবদেবীগণের নিকট প্রার্থনা, ইত্যাদি কিছুই বাল্মীকিতে নাই। আদিকাণ্ডের পাঁচটি কৃত্তিবাসী পুঁথি-গুলির একখানিতেও এই উপন্যাস নাই। বাজার-সংস্করণে ইহা কোথা হইতে আসিল খোঁজ করিতেই দেখিলাম,—অদ্ভুতের রামায়ণে অনুরূপ বর্ণনাই আছে! রামলক্ষ্মণকে অভ্যর্থনা করিয়া জনক পুরীর ভিতর লইয়া গেলেন; তখন গবাক্ষ দিয়া সীতা রামকে দেখিলেন এবং মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়া রামকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

"কমঠ কঠোর ধনু রামের কোমল তনু
না পারিব গুণ চড়াইতে॥
পাইবে উত্তম পতি ত্রিভুবনে তুমি সতী
তোমার ধর্ম্মে ব্রহ্মাদেব সুখী।
শুনিয়া আকাশবাণী আনন্দিত কমলিনী
হরষিতা হইলা চন্দ্রমুখী॥
দেবের শুনিয়া কথা আনন্দিতা হইলা সীতা
দেবচক্র বুঝিতে না পারি।
বর দিলা ভগবতী শ্রীরাম হউক পতি
অদ্ভুতের মধুর ভারতী॥
কমঠ কঠিন অতি মহাদেবের ধনু।
নবীন বয়স রাম কোমল অতি তনু॥" ইত্যাদি।

অতঃপর অদ্ভুত সীতাকে দিয়া রামকে পতি পাইবার জন্য চণ্ডীপূজা করাইয়াছেন। চণ্ডী মূর্ত্তিমতী হইয়া সীতাকে বর দিয়াছেন,—রামই তাহার পতি হইবে।

অদ্ভুতে ও বাজার-সংস্করণে দুই একটি ছত্রে মাত্র ভাষার মিল আছে—কিন্তু বিষয়গত মিল দেখিয়া এই সিদ্ধান্তই মনে উদিত হয় যে, বাজার-সংস্করণের হরধনু-ভঙ্গপ্রসঙ্গ অদ্ভুতাচার্য্য দ্বারা প্রভাবিত। অদ্ভুত এই স্থানটি মহানাটক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। সতীশের মুখে বার বার পদ্মপলাশলোচনার উল্লেখ শুনিয়া উপেন্দ্র যেমন বিষবৃক্ষের পঙ্কোদ্ধার চিনিতে পারিয়াছিলেন,— ধনুর বর্ণনায় 'কমঠ কঠোর'-এর বার বার আবির্ভাবে মহানাটক ধরা পড়িয়া যায়। যথা —

অথ সীতামনসি পরিভাবনম্,—
কমঠপৃষ্ঠকঠোরমিদং ধনু-
র্মধুরমূর্ত্তিরসৌ রঘুনন্দনঃ।
কথমধিজ্যমনেন বিধীয়তা-
মহহ তাত পণস্তব দারুণঃ॥

কৃত্তিবাস ও অদ্ভুত তুলনায় পাঠ করিয়া আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, অদ্ভুতের রামায়ণে কৃত্তিবাস অপেক্ষা কাব্যরস অধিকাংশ স্থানেই বেশী। বাঙ্গালী সমাজের খাঁটি চিত্র, বাঙ্গালীর স্নেহপ্রবণতা, ভাবপ্রবণতা, দুর্ব্বলতার চিত্র অদ্ভুতে যত পাওয়া যায় কৃত্তিবাসে ততটা নহে। কৃত্তিবাস মোটামুটি বাল্মীকিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রচনা তাই গম্ভীর ও ঘন—পরিচ্ছন্ন ও বাহুল্য-বর্জ্জিত। অদ্ভুতের রামায়ণেই খাঁটি বাঙ্গালীর পরিচয় পাই,—যত রাজ্যের গালগল্প, সরস কাহিনী—অশ্রুজল ও উচ্ছ্বাসের বন্যা আসিয়া অদ্ভুতের রামায়ণেই ভীড় করিয়া আশ্রয় লইয়াছে।

বাজার-সংস্করণের হরধনুভঙ্গ এইরূপে অদ্ভুতদ্বারা প্রভাবিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া এই প্রসঙ্গের খাঁটি কৃত্তিবাসের রচনা উদ্ধারে সাবহিত হইতে হইল। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল উদ্ধারকার্য্যে যে পুঁথিখানি আমার প্রধান অবলম্বন, তাহাকে আমি 'ক' পুঁথি বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। পুঁথিখানি ১৫৭১ শকাব্দ বা ১০৫৫ সনের নকল। এই পুঁথির সহিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের অন্যান্য পুঁথি মিলাইয়া দেখিলাম, অন্য পুঁথিগুলিদ্বারা যে পাঠধারা সমর্থিত হয়, তাহার সহিত 'ক' পুঁথির পাঠ মিলে না। 'ক-' পুঁথিতে বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানগুলি নাই, অথচ আমার অবলম্বিত কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের অন্য সমস্তগুলি পুঁথিতেই এই উপাখ্যানগুলি আছে। বাল্মীকি-রামায়ণে এই উপাখ্যানগুলি আছে—অদ্ভুতের রামায়ণেও এই উপাখ্যানগুলি গৃহীত হইয়াছে। শ্রীরামপুরী রামায়ণে, তথা বাজার-সংস্করণে, এই উপাখ্যানগুলি বাদ পড়িয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এমত অবস্থায় আমার প্রাচীনতম পুঁথি 'ক' পুঁথি যে অন্ততঃ এই অংশে খাঁটি কৃত্তিবাসী পাঠধারা রক্ষা করে নাই,—সেই সিদ্ধান্তই করিতে হয়।

কিন্তু 'ক' পুঁথির এই অংশে বড় চমৎকার রচনা পাইলাম। জানকীর স্বয়ংবর সভা বসিয়াছে,—পৃথিবীর সমস্ত রাজা জনকগৃহে সমবেত হইয়াছেন। উপরে চন্দ্রাতপ শোভিতেছে,—বিচিত্র আসনে নৃপতিগণ উপবেশন করিয়াছেন।—

হেনকালে জনকে জে বুলিলা বচন।
সীতার বিবাহ পণ সুন দিয়া মন॥
মহেশের ধনুতে জেই গুণ দিতে পারে।
সেই বর সীতাএ বরিব স্বয়ংবরে॥

ইহা শুনিয়া নৃপতিগণ একে একে হরধনু তুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেহ আস্ফালন করিয়া গেলেন এবং অধোমুখে ফিরিয়া আসিলেন;—কেহ বা গলদঘর্ম্ম হইলেন, কিন্তু ধনু তুলিতে পারিলেন না;—কেহ বা আবার ধনুতে টান দিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াই পড়িলেন। ইত্যবসরে নারদ যাইয়া লঙ্কা হইতে

রাবণকে ডাকিয়া আনিলেন। মহাবীর রাবণ পর্য্যন্ত ধনু উত্তোলন করিতে পারিলেন না।—

ক্ষেত্রিয়ের বীর শক্তি জদি হৈল নাশ।
তাহা দেখি হৈল রাজা জনক হতাশ॥
বাগ্যভাগু নাহি কথা সভার মুখেত।
সঙ্কুচিত সীতাদেবী দাঁড়াইছে আগেত॥
দুঃখিত হইয়া কহে নৃপতি জনক।
পৃথিবীর রাজা জান সর্ব্ব বিদূষক॥
কি কারণে বসিয়াছ সুবর্ণ সিংহাসনে।
অকারণে শিরে ছত্র কি ছার জীবনে॥
ধনুকেত গুণ দিতে কেহ না পারিলা।
দেশে হনে আসি কেন মিছা দুঃখ পাইলা॥
জনে জনে চাহিলেক নৃপতি সকল।
বিশ্বামিত্র মুনি কহে বচন নিশ্মল॥
বুঝিলানি ক্ষেত্রি হৈল রাজারা কুবল।
গুণ দিতে না পারিল সর্ব্ব মহাবল॥
অধোমুখে বসিল সকল নরপতি।
কাহাতে বিবাহ দিবা সীতা গুণবতী॥

তখন বিশ্বামিত্র মুনি একধারে উপবিষ্ট দূর্ব্বাদলশ্যাম রামের প্রতি জনকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। বলিলেন, এই বালকই ধনুক ভাঙ্গিতে পারিবে। সভাস্থলে সীতা উপস্থিত ছিলেন—

সীতাএ সুনিলা জদি মুনির বচন।
বঙ্কিম নয়ানে চাহে শ্রীরাম বদন॥
রঘুনাথ চক্ষুসনে হইল মিলন।
হাসিতে লাগিল রাজা রঘুর নন্দন॥
নিজপতি হেন সীতা ভাবিল মনেত।
মনে মনে বরমাল্য দিলেক কণ্ঠেত॥
তুমি হেন পতি হৌক জন্মজন্মান্তরে।
চিত্রপট্ট তুল্য দেবী সভার ভিতরে॥

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে সভাস্থলে বা অন্যত্র বিবাহের পূর্ব্বে রাম সীতার দেখা হওয়া বাল্মীকি-সম্মত নহে।

যাহা হউক, রামের বালক-আকৃতি দেখিয়া তাঁহার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াও বিশ্বামিত্রের কথায় জনক রামকে বরণ করিলেন।—

হস্ত জোড়ে জনকে করেন বিনয়।
প্রধান পুরুষ তুমি প্রধান তনয়॥
না চিনিয়া প্রথমে তোমাকে না বরিলুম।
মনে ক্রোধ না করিয় অপরাধ কৈলুম॥
ব্যক্ত কর মহিমা দেখুক সর্ব্বজনে।
পৃথিবীর রাজা সব আছে বিদ্যমানে॥

রামও একটু কৌতুক করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলেন না।—

তাহা সুনি কহে রাম করিয়া কৌতুক।
গুণ দিতে পারি নাখি হরের ধনুক॥
বিশ্বামিত্রে আনিয়াছে নিমন্ত্রণ খাইতে।
তান বাক্যে আসিয়াছি কৌতুক দেখিতে॥
দেও নিয়া বস্তু সব যেই রাজা ভাল।
বরণের জুগ্য নহে বুলিছ ছাওয়াল॥
বিশ্বামিত্র রামকে একটু ধমক দিয়াই কহিলেন—
তাহান সহিতে তোমার না জুয়ায় উত্তর॥
আপনার বস্তু কর আপনে গ্রহন।
কুকুরে নি খাইতে পারে সিংহের ভোজন॥

ইহার পরেই যে রামের বর্ণনা আছে, তাহা বাস্তবিকই সুন্দর রচনা।—

এই বাক্য শুনি উঠে রাম মোহামতি।
মদনমোহন বেশ মত্ত সিংহ গতি॥
রাজমণ্ডলে দেখে বালক লক্ষণ।
হাসিবারে লাগিলেক জত রাজাগণ॥
মুনি সবে দেখিলেক বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
ক্ষেত্রি বৈশ্যে দেখিলেক পুরুষ সুন্দর॥
দেখিল রাক্ষসগণে জমের আকার।
গন্ধর্ব্বলোকে দেখিলেক ত্রিভুবন সার॥

স্ত্রীলোকে দেখিলেক অভিনব অনঙ্গ।
সর্ব্বলোকে দেখিলেক বিজুলি তরঙ্গ॥
বিদ্যুত গমনে রাম ধনু নৈল হাতে।
অলক্ষিতে গুণ দিল সভার বিদিতে॥

রামকে বিভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক বিভিন্নরূপে দর্শন বর্ণনায় সুন্দর রচনাটুকু কৃত্তিবাসের রচনা নহে বলিয়া ধার্য্য করিতে কিছুতেই প্রাণ সরিল না। কিন্তু আদিকাণ্ডের অন্য পুঁথিগুলিদ্বারা নির্দ্দিষ্ট পাঠধারার সহিত ইহার কিছুমাত্র মিল নাই দেখিয়া এই রচনা যে কৃত্তিবাসের সেই বিষয়েও কৃতনিশ্চয় হওয়া কঠিন হইল। খুব অস্পষ্টভাবে এমনও মনে হইতে লাগিল যে ভগবানকে বিভিন্ন ব্যক্তিকর্ত্তৃক এই প্রকার বিভিন্নরূপে দর্শন বর্ণনা কোথায় যেন পাইয়াছি,—যেন কোন সংস্কৃত কাব্যে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিরক্ষক শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, এই রামায়ণ-সম্পাদনে আমার অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন,—এ ক্ষেত্রেও সুবোধের সাহায্যেই সমস্ত পরিষ্কার হইল। উপরে উদ্ধৃত সুন্দর রচনাংশটুকু বন্ধুবান্ধবগণকে পড়িয়া শুনাইতাম। একদিন সুবোধ বলিল,—গুণরাজ খাঁ-বিরচিত 'ইতিহাস পুস্তক' নামক কাব্যে অনুরূপ রচনা সে পাইয়াছে। কৌতূহলী হইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ হইতে গুণরাজ খাঁর 'ইতিহাস পুস্তক'-এর পুঁথিগুলি আনাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। এই পরীক্ষার ফল অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি—কিন্তু এইখানে ফিরিয়া পাঠকবর্গকে জানান আবশ্যক। "দেখিলাম,—ইহা কৃত্তিবাস-অদ্ভুতাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী রচনা,—রামায়ণের আদিকাণ্ডের বিস্তৃত পুঁথি। ইহার পরিচয় দিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। সংক্ষেপে এইস্থানে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে ইহার পটভূমি মহাভারতের বনপর্ব্ব। যুধিষ্ঠির পাশায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া বনে গিয়াছেন। তাঁহার জিজ্ঞাসায় কৃষ্ণ তাঁহাকে রামচরিত শুনাইতেছেন। আদিকাণ্ড বেশ বিস্তৃত রচনা, ১০।৮০ পাতায় সমাপ্ত। পরে আর ১০।১৫ পাতায় রামায়ণের বাকী অংশ বিবৃত হইয়াছে।" (বঙ্গশ্রী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০, ৫৬৭ পৃষ্ঠা)

শ্রীহট্টজেলার আথানগিরিনামক গ্রামে প্রাপ্ত গুণরাজ খাঁর 'ইতিহাস পুস্তক' হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

ক্ষেত্রি সবের দর্প জদি হইলেক নাশ।
দেখিয়া জনকরাজা হইল হুতাশ॥
বাক্যভাও নাহি বাক্য নাহিক মুখেতে।
সঙ্কুচিত সিতাদেবি দাণ্ডাইছে রৌদ্রেতে॥
ইত্যাদি।

ইহার সহিত 'ক' পুঁথির পাঠের অতি সামান্যই প্রভেদ বর্ত্তমান। সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে 'ক' পুঁথির 'হরধনুভঙ্গ'-প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ গুণরাজ খাঁর 'ইতিহাস পুস্তক' হইতে বেমালুম ভণিতা বদলাইয়া গ্রহণ করা।

এই গুণরাজ খাঁ কে? ইনি কি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের গুণরাজ খাঁ,—কুলীনগ্রামবাসী? শ্রীমান সুবোধচন্দ্রই দেখাইয়া দিল,—'ইতিহাস পুস্তক'-এর রামবর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আছে এবং তাহা ভাগবতের অনুবাদ। যথা—৺ কেদারনাথ দত্ত প্রকাশিত গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণবিজয়—৬৭ পৃষ্ঠা—

হস্তির মদরক্ত অঙ্গে লাগিল সরিরে।
একেত সুন্দর কৃষ্ণ বহুরূপ ধরে॥
হাসিতে হাসিতে তবে করিলা গমন।
সেই ক্ষণে নানা মূর্ত্তি ধরে নারায়ণ॥
মল্ল সবে দেখে কৃষ্ণ বজ্রের সমান।
নানা রূপে সভাকে মুহিলা ভগবান॥
নারি সকলে দেখে অভিনব মদন।
নন্দ আদি গোপে দেখে শিশু দুইজন॥
দুষ্ট রাজা সভে দেখে জেন জমকাল।
বাসুদেব দেবকি দেখে দুধের ছাওয়াল॥
প্রাণ নিতে জম আইসে দেখে কংস রায়।
জগীগনে সিদ্ধাগনে দেখে জোগ রায়॥

(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীহট্টে প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুঁথি,—নং ৮৭১,—হইতে উদ্ধৃত করিলাম)

ভাগবতের দশম স্কন্দের ৪৩ অধ্যায়ে ইহার মূল শ্লোকটি আছে—

"মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥"

রচনাসাদৃশ্য দেখিয়া বিচার করিতে গেলে 'ইতিহাস পুস্তক'-এর রচয়িতা কুলীন গ্রামের মালাধর বসু গুণরাজ খাঁ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু 'ইতিহাস পুস্তক' গ্রন্থের পুঁথি অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গে পাওয়া যাইতেছে দেখিয়া আবার নানা সন্দেহ মনে জাগিয়া উঠে।

লক্ষ্য করা আবশ্যক যে 'ইতিহাস পুস্তক'-এর রচনা স্থানে স্থানে অদ্ভুতাচার্য্যের সহিত মিলিয়া যায়। যথা —

ইতিহাস পুস্তক —

রামে বোলে ধনুখান দেখি অতি ভারি।
এই সে কারণে আমি মনে শঙ্কা করি॥
এতেক বোলিলা জদি কমল লোচন।
মহা ক্রোধ করি তবে উঠিলা লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ বোলয়ে প্রভু হেন বোল কেনে।
আকাশে উড়াম ধনু হেন লয় মনে॥
নহে বোল ধনু ভাঙ্গি করু খান খান।
সাগরে পালাম ধনু করি দুইখান॥

* * *

অষ্টাঙ্গে প্রণাম কৈল মুনির চরণে।
হস্ত যুড়ে কহে রাম রাজাগণ স্থানে॥
বিশ্বামিত্র গুরু বাক্যে হৈল আগুসারি।
তুমি সবে আজ্ঞা কর তবে ধনু ধরি॥

* * *

পুষ্পের ধনুক যেন অতি সুকমল।
তেন মতে লাড়ে ধনু রাম মহাবল॥
রামে বোলে ধনুখান নহে কিছু ভারি।
এমন নির্ব্বল ধনু কভু নাহি ধরি॥

এইবার অদ্ভুতের রচনা দ্রষ্টব্য। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ, আদিকাণ্ড ২৩৪।২৩৫ পৃঃ।

ধনুখান দেখি গুরু অতিবড় ভার।
না পারিলে লজ্জা পাই সভার ভিতর॥
রামের বচনে ক্রোধ হইল লক্ষ্মণ।
আপনাকে আপনি না জান কি কারণ॥

* * *

যদি আজ্ঞা কর মোক কমললোচন।
গুণের কি কব কথা করোঁ খান খান॥

* * *

যোড় হাতে বলে রাম সভা বিদ্যমান।
বড় বড় আসিয়াছে নৃপতি প্রধান॥
গুরুদেব আজ্ঞা আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তোরা যদি আজ্ঞা দেহ তবে ধনু ধরি॥

* * *

রামে বোলে এহি ধনু বল বড় ভারি।
এমন নির্ব্বল ধনু কর৩ না ধরি॥
পুষ্পের ধনু যেন সাজিছে কামান (?)।
হেন মতে নাড়ে ধনু রাম বলবান॥

এই ছত্রগুলির সাদৃশ্য স্পষ্ট। কিন্তু অন্যত্র মিল নাই। কে কাহাকে অনুকরণ করিয়াছেন এবং দুই একটি ছত্র বেমালুম না বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বলা কঠিন। গায়েনগণের গুণগ্রাহিতার ফলেও একজনের দুই চারিটি ছত্র অন্য কবির রচনায় যাইয়া উড়িয়া বসিতে পারে।

'ক'-পুঁথির পাঠ এইরূপে গুণরাজ খাঁর রচনাগ্রহণ-দ্বারা বিকৃত প্রমাণিত হইলে দেখা গেল যে, আমার অবলম্বিত গ-চ-ছ-ঝ পুঁথির হরধনুভঙ্গপ্রসঙ্গের পাঠে

চমৎকার মিল আছে। এই চারি পুঁথির মিলিত পাঠই খাঁটি কৃত্তিবাসী রচনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই রচনা বাল্মীকির অনুযায়ী। শতানন্দ কর্তৃক বিশ্বামিত্রের উপাখ্যানকথন শেষ হইল। বিশ্বামিত্র জনককে বলিলেন, শীঘ্র রামকে ধনু আনিয়া দেখাও। জনক রামের বালক-আকৃতি দেখিয়া কিঞ্চিৎ সন্দেহাকুল হইয়াও ধনু আনিতে আদেশ করিলেন। রাম ধনুতে গুণ দিতে উঠিলেন। এই স্থানে কৃত্তিবাস, গুণরাজ খাঁ, অদ্ভুত, সকলেই মহানাটক হইতে ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসেরও নিম্নোক্ত স্থানটুকু মহানাটকের শ্লোক অবলম্বনেই লিখিত —

লক্ষ্মণ বোলেন বসুমতী হৈর স্থির।
ধনুকেত গুণ দিতে উঠে রঘুবীর॥
বাসুকী তক্ষক সভে হৈয় সাবধানে।
পৃথিবী হইব টান ধরিবা যতনে॥
('পৃথিবী খাইবে টাল'—পাঠান্তর।)
দশ দিকে তোমরা যে বৈস লোকপাল।
সাবধানে থাকিয় পৃথিবী খাইবে টাল॥

মহানাটকে ইহার মূল শ্লোকটি এই —

পৃথ্বি স্থিরা ভব ভুজঙ্গম ধারয়ৈনাং
ত্বং কূর্ম্মরাজ তদিদং দ্বিতীয়ং দধীথাঃ।
দিক্‌কুঞ্জরা কুরুত তত্‌ত্রয়ে দিধীর্ষা-
মার্য্যঃ করোতি হরকার্ম্মুকমাততজ্যম্॥

হরধনুভঙ্গকালে পৃথিবীর অবস্থা বর্ণনা, কৃত্তিবাস —

ধনুক ধরিয়া রাম তোলে বাম হাতে।
নোঙাইয়া গুণ তাথ দিলা রঘুনাথে॥
ধনুকের কুটি বৈসে পৃথিবী ভিতরে।
পৃথিবী সহিতে নারে টলমল করে॥
পাতালেত থাকিয়া বাসুকী কাঁপে ডরে।
ভূমিকম্প হৈল যেন পৃথিবী ভিতরে॥
দিকদিগন্তরে লোক গণিল প্রমাদ।
আচম্বিতে পৃথিবীতে হৈল বিসম্বাদ॥

ইহাও মহানাটকের বর্ণনারই প্রতিধ্বনি। হরধনুভঙ্গ হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ হইল — বিষম ঝঞ্ঝন শব্দে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিতে লাগিল। কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেব নিজ ধনুভঙ্গের শব্দ পাইয়া বুঝিতে পারিলেন, —এত দিনে জানকীর বর মিলিয়াছে। পরশুরাম সেই শব্দ শুনিয়া শঙ্কিত হইলেন;—লঙ্কায় রাবণ সেই শব্দ শুনিয়া বুঝিলেন—এই হরধনুভঙ্গকারী বীরের হাতেই তাঁহার মরণ। এবং,—

দেবগণে বলে প্রভু পাইলাম রক্ষা।
কৃত্তিবাসে ভণে রামের বিক্রম পরীক্ষা॥

শিষ্টাচার

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত রচনা

কথাবার্তার সময় — attitude of attention :— মুখের দিকে ঈষৎ বা স্পষ্ট চাওয়া, অন্য কার্য্য না করা, সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্য ত্যাগ।

শারীরিক অভ্যর্থনা — যথা, অভ্যুত্থান, প্রত্যুদ্‌গমন, আগন্তুককে বসাইয়া পরে নিজে উপবিষ্ট হওয়া, অনন্তর অনাময় জিজ্ঞাসা—[তাহা বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ঠতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে] অভ্যর্থনাও সকল লোকের প্রতি অবিকল একরূপ হইবে না।—যথা কুমার সম্ভবে—

কম্পেন মূর্দ্ধ্নঃ শতপত্রযোনিং,
বাচা হরিং বৃত্রহণং স্মিতেন।
আলোকমাত্রেণ সুরানশেষান্,
সম্ভাবয়ামাস যথাপ্রধানম্॥
তস্মৈ জয়াশীঃ সসৃজে পুরস্তাৎ,
সপ্তর্ষিভিস্তান্ স্মিতপূর্ব্বমাহ।
বিবাহযজ্ঞে বিততেঽত্র যূয়-
মধ্বর্য্যবঃ পূর্ব্ববৃতা ময়েতি॥ *

আপনি শিষ্টাচারপ্রবণ থাকিলেই সকল সময় শিষ্টাচার রক্ষা করা হয় না। পরিবারবর্গকে এবং ভৃত্যদিগকেও শিষ্ট ব্যবহার বিষয়ে সুশিক্ষিত করা আবশ্যক। লোকে তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াই একেবারে তোমাকে পায় না, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বাটীর অপর লোকদিগের হাতে পড়িতে হয়।

ঐ সকল সময়ে ভৃত্যাদি সুশিক্ষিত না থাকিলে আগন্তুকদিগকে কষ্ট পাইতে হয়।

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

এই শ্লোকটী হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৃহের পরিজন এবং দাসদাসীবর্গকেও সদাচার প্রণালী শিখাইতে হয়।

---

(১) সশব্দ ভোজন একটু পাশব ভাবের প্রকাশক।

(২) উচ্চৈঃস্বরে বাক্যালাপ একটু নিরঙ্কুশতা এবং গর্ব্বের জ্ঞাপক।

(৩) চলাফেরায়—ধুপ্‌ধাপ্ শব্দ করা অসাবধানতা, নিরঙ্কুশতা এবং গর্ব্বের বোধক বলিয়া দুষ্য।

(৪) অভিবাদনাদি — প্রণাম, নমস্কার, সেকহ্যাণ্ড, সেলাম স্থলভেদে প্রযোজ্য। হিন্দু স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সেকহ্যাণ্ড ও সেলাম উভয়ই পরিত্যাজ্য।

(৫) পরোপকার সাধনের উপর * একটী স্বার্থ-সাধনের আবরণ দেওয়া উচিত। ঐ প্রকার আবরণ না দিলে উপকৃত ব্যক্তির অনেকটা আত্মসম্মান খর্ব্ব করা হয়। আবরণ দিলে যদিও উপকৃত সুবোধ ব্যক্তির চক্ষে উপকারীর মাহাত্ম্য অধিকতর চিক্কণ হইয়া সোনায় সোহাগা হইয়া উঠে এবং তাঁহার কৃতজ্ঞতা বৃদ্ধিই করে, তথাপি তাঁহার গ্লানিবৃদ্ধি করে না। 'এই কাজটী করায় যদিও তোমার কিছু সুবিধা হইতেছে বটে ; কিন্তু কাজটী আমি নিজের কিছু প্রয়োজন সাধনের জন্যই নির্ব্বাহ করিতেছি'—এই ভাবটী রক্ষা করিয়া উপকার সাধনের চেষ্টাই প্রকৃত শিষ্টাচার সঙ্গত।

---

* মহেশ্বর মস্তকসঞ্চালন দ্বারা বিধিকে, বাক্‌প্রয়োগ দ্বারা বিষ্ণুকে, হাস্য দ্বারা দেবরাজকে এবং কেবলমাত্র দৃষ্টিনিক্ষেপ দ্বারা অপরাপর সুরগণকে যথাযোগ্য সম্মান ও সংবর্দ্ধনা করিলেন। ৪৬।

সপ্তর্ষিবৃন্দ হর-সমক্ষে আগমন পূর্ব্বক 'ভগবানের জয় হউক' বলিয়া আশীঃপ্রয়োগ করিলে মহেশ্বর ঈষদ্ধাস্যে বলিলেন, আমি ত অগ্রেই এই উপস্থিত বিবাহযজ্ঞে আপনাদিগকে পুরোহিতপদে বরণ করিয়াছি। ৪৭। — সপ্তম সর্গ।

(৬) শিষ্টাচারের সহিত সত্যবাদিতার কোন বিরোধ আছে কি? বাহ্যতঃ একটু আছে বলিয়া বোধ হয়, আভ্যন্তরিক কিছুই বিরোধ নাই। — "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।" এই মনুবাক্যের প্রকৃত অর্থ জানা রহিলে সত্যবাদিতায় এবং শিষ্টাচারে কোন বিরোধ থাকিবে না (টীকাকারদিগের অর্থ দেখা আবশ্যক)।

(৭) উপকারগ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ নিতান্ত গর্ব্বিত স্বভাবের লক্ষণ। আমি জানিতাম কোন ব্যক্তি আপনার পরম সুহৃদের স্থানে কিছু টাকা ধার করিয়াছিলেন বলিয়া যতদিন সেই টাকা না শুধিয়াছিলেন, ততদিন বন্ধুর সহিত একবারও দেখা করেন নাই। টাকা শোধ দিতে গেলে উদার হৃদয় বন্ধু বলিলেন, "এত দিন অদর্শন থাকিয়া আমাকে যে আনন্দে বঞ্চিত করিয়াছ তাহার শোধ কিরূপে দিবে? অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরিমাণে দেখা দিবে, না? ঐ ক্ষতি পূরণের ইহাই উপায়।"

(৮) কথাবার্ত্তায় স্পষ্টবাক্ হইতে হয় এবং উত্তরদানে সত্বর হইতে হয়। অনেকের কথা বড় মিড়্ মিড়ে, আবার অনেকে উত্তর দানে এত বিলম্ব করেন যেন শুনিয়াও শুনিলেন না, বোধহয়।

—কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম, চিঠিপত্র লেখালেখি সম্বন্ধেও সেই সকল নিয়ম খাটিবে। যেমন কথা স্পষ্ট বলা আবশ্যক, তেমনি অক্ষরও স্পষ্ট হইবে। যেমন কেহ কিছু বলিলে তাহার উত্তর সত্বরই দিতে হয়, কেহ চিঠি লিখিলেও তাহার উত্তর দিবার হইলে শীঘ্রই দেওয়া সঙ্গত।

(৯) পরিচয় জিজ্ঞাসায় পিতৃনামাদি জিজ্ঞাসা আজিকালি অন্যায্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, কিন্তু উহা অন্যায্য নহে। উহা ইংরাজের অনুকরণ হইতেই জাত।

(১০) অধিক সৌজন্য হইতে যে সমাদরের অত্যুক্তি জন্মে তাহা দূষণীয় নহে। মহাভারত বিরাট পর্ব্ব দ্রষ্টব্য।

(১১) স্বগৃহে উচ্চ এবং প্রধান আসন গ্রহণ করা ইউরোপীয় রীতি, ভারতীয় রীতি নহে; এক্ষণে এই দুইটা রীতিতে গোল বাধিয়া গিয়াছে।

(১২) গুণ এবং শক্তি দ্বারা যাহারা প্রকৃত কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তাঁদেরও কর্ত্তৃত্ব সংগোপিত হয়।

(১৩) স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সমাদর বা সম্মান বা সম্ভ্রম প্রদর্শন সর্ব্বদাই করিতে হয়—বিশেষতঃ রেলওয়ে প্রভৃতি স্থানে—।

(১৪) চিঠি পাইলেই উত্তর দিতে হয়।

(১৫) কেহ কাহার নিকট আসিতে চাহিলে তাহার আসায় নিজের কোন প্রয়োজন নাই, এভাব জানাইতে নাই। তাহার আসায় নিজেরও উপকার হইবে বলিতে ও ভাবিতেও হয়।

(১৬) পরিচিত দু'জন লোক একত্রে বসিয়া থাকিলে এবং কোন বিশেষ কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিলে পরস্পর কথা না কওয়া শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। কথা না কহিয়া থাকাকে বলে "গোঁজ" হইয়া থাকা।

(১৭) যখন কোন প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা চলে তখন অন্য প্রসঙ্গের অবতারণাকে বলে অসহিষ্ণুতা।

(১৮) কেহ আহ্বান করিলে যাইতে বিলম্ব করায় যে অভিমান প্রকাশ পায় তাহা অতি তুচ্ছ; কিন্তু বিলম্ব না করাতেই সৌজন্য—

রাতের ফুল

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

পবিত্রর কথা

বাস্তবিক—এ যেন এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে! রজনীর প্রতি আমার এই যে ভালবাসা—এ প্রেম, আসক্তি না মোহ?

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু জ্যোতিশদা' বলে শেষেরটাই নাকি ঠিক্ অর্থাৎ মোহ!

কিন্তু তাই কি?

মোহ কি মানুষের মনে এমন স্থায়ীভাবে······

নিতান্ত অল্পদিন তো নয়, দিনের পর দিন করে ছ'সাত মাস হয়ে গেল, রজনীর প্রতি আমার আকর্ষণ এখনো এতটুকু শিথিল হয় নি কেন?

তার রূপে, শিক্ষায়, হাব-ভাব-ভঙ্গীতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না, যা আমার মত একজন উচ্চ-শিক্ষাভিমানী, গর্ব্বিত, চপলচিত্ত যুবককে এই দীর্ঘকাল সমানভাবে মুগ্ধ, মোহাবিষ্ট করে রাখ্‌তে পারে।

এ যদি মোহ হয়, ভালবাসা তবে কি?

সেদিন জ্যোতিশদা'র বাসায় এই নিয়ে খুব খানিকটা বচসা হয়ে গেল।

ছ'জনেই সমান তার্কিক, হার মানতে কেউ চায় না। অবশ্য আমার দিকটাই কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল তা স্বীকার করি, তবু সেই দুর্ব্বলতাটুকু ঝেড়ে ফেলবার জন্যই আমি গলার জোরে, মুখের তোড়ে তর্কটা পুরোদমে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলুম। আরো কতদূর চল্‌ত কি জানি, যদি বউদি'—জ্যোতিশদা'র অর্দ্ধাঙ্গিনী—না এসে পড়তেন!

—তোমাদের আজ হচ্ছে কি বলো দেখি? সেই থেকে শুনছি রান্নাঘর থেকে—

বউদি' আমাদের উত্তেজিত মুখের পানে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন—মুখ-চোখ একেবারে লাল হয়ে গেছে! বাবা রে বাবা! এ কি অনাসৃষ্টি তর্ক?

জ্যোতিশদা' বল্‌লেন—অনাসৃষ্টিই বটে! তুমি এতক্ষণ নেপথ্যে না থেকে সাম্‌নে আস্‌তে যদি, তা'হলে হয়তো আমাদের এ ভোগান্তিক······

তার মুখের কথাটা লুফে নিয়ে আমি বল্লুম—ঠিক্ কথা! আচ্ছা, আপনিই এর মীমাংসা করুন বউদি', জ্যোতিশদা' তো আমাকে একেবারে উড়িয়েই দিতে চান।

—আমি এ সবের কি বুঝি ভাই? মূর্খ মেয়েমানুষ—

—ও কথা বলো না শুভা! এ সব অনাসৃষ্টি বিষয় মেয়েরাই ভাল বুঝবে।

—হ্যাঁ বউদি'! আপনি নেপথ্যে সব শুনেছেন তো? আচ্ছা বলুন তো······

—বসো ভাই, আমি এখন কিছু বলব না, আগে এক কাপ্ চা খেয়ে গলা ভিজিয়ে নাও, সেই কখন্ থেকে বকাবকি করছ, আর এই মাংসের সিঙাড়া ক'খানা গরম গরম······দেখ তো কেমন হয়েছে—

বাস্তবিক—গলা না শুকোলেও তর্কের ঝোঁকে ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল বিলক্ষণ, তাই বিনা প্রতিবাদে বউদি'র আদেশ পালন করে ধন্যবাদ জানিয়ে বল্লুম—হ্যাঁ, এইবার—আপনি ভাল হয়ে বসুন না বউদি'! আপনিই হলেন আজ আমাদের বিচারক—

জ্যোতিশদা' ছ'টো পানের খিলি মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বল্লেন—বিচারটা কিন্তু নিরপেক্ষভাবে করতে হবে, বুঝলে শুভা? 'বেচারা ঠাকুরপো' বলে তুমি যে শুধু ওর দিকেই টেনে······

—শুন্‌লেন বউদি'? কি রকম গাত্রদাহ! আপনি আমাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখেন বলে—

—মিছে কথা! আমি অমন হিংসুটে নই যে······

আচ্ছা, এইবার জজসাহেব বিচার আরম্ভ করুন, কিন্তু মামলাটা আগাগোড়া না জেনে……

—সব জানি গো।……তুমি একটু চুপ করো দেখি!

বউদি' আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ক'দিনের কথা ঠাকুরপো? রজনীকে তুমি পেয়েছিলে…

—গত ফাল্গুনে,—এই সাত মাস হ'ল আর কি!

—এতদিন! এতদিন ধরে তোমাদের কোর্টশিপ্ চলছে? ধন্য!

—কোর্টশিপ্! বলো কি শুভা? এ যদি কোর্টশিপ্ হয় তা'হলে ব্যভিচার আর কা'কে বলে?

—আঃ! তুমি থামোনা বাপু!

বউদি'র শান্ত, সৌম্যমুখে ভ্রূকুটি জেগে উঠ্ল। উত্তেজিত সতেজ মনে অতর্কিতে এসে-পড়া দ্বিধা বা দুর্ব্বলতাটুকু সবলে ঝেড়ে ফেলে আমি বেপরওয়াভাবে বল্লুম—বল্তে দিন না বউদি'! ব্যভিচার, পাপাচার, যে যা বুঝে থাকে বলুক—ডোন্ট্ কেয়ার! আমি নিজের মনে তো বেশ জানি, আমার এ ভালবাসা নিষ্কলুষ পবিত্র…

—বেশ, তাই যদি হয় তা'হলে রজনীকে তুমি বিয়ে করো না কেন? ওকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তিটা যে কি…

—কিছু না, রজনীকে আমি পূজার ফুলটুকুর মত পবিত্র মনে করি বউদি'! আপনার কাছে সত্যি বল্চি, কিন্তু……বিয়ে তো আমাদের হয়ে গেছে অনেক দিন।

—সে কি গো? কবে? এত বড় একজন জমীদারের বিয়ে হ'ল, কেউ জান্লে না, কেউ শুন্লে না—এ কি রকম—

জ্যোতিশদা' আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠ্লেন—কি করে জান্বে? এ তো আর আমাদের ঢাক্-পেটা বিয়ে নয়? উপোস দিয়ে শুকিয়ে, টোপর মাথায় হনুমানটী সেজে, সাত রাজ্যের লোক এক করে, বাপ্ রে বাপ্! হয়রাণের একশেষ আর কি!…

—তা'হলে? এ সিভিল ম্যারেজ্ বুঝি?

—উহুঁ, সে তো তবু পদে ছিল, এ বিয়ে…কি বলব? গান্ধর্ব্বমতে, নিভৃতে, লোকচক্ষুর অগোচরে—

বউদি'র বিস্মিত দৃষ্টি এবার জ্যোতিশদা'র মুখ থেকে সরে আমার ওপর পড়্ল, আমি থত-মত ভাব গোপন করে তাড়াতাড়ি বল্লুম—তাতেই বা ক্ষতি কি বউদি'? ঘটা করে, পুরুত ডেকে দু'টো মুখস্থ-করা মন্ত্র না আওড়ালে বিয়ে বুঝি সিদ্ধ হয় না? এই যে মিলন—শুধু প্রাণে প্রাণে, প্রেমই যার মূল-মন্ত্র, অন্তরের প্রেরণাই যার পুরোহিত…

—থামো ঠাকুরপো! অত বড় বড় কথা, আমার নিরেট মাথায় সহজে ঢুকবে না। তার চেয়ে সোজা-সুজি … আচ্ছা, একটা কথা ঠিক করে বলো দেখি—এ মিলনে তোমরা যথার্থই সুখী হয়েছ কি?

আমি এক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক থেকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বল্লুম—নিশ্চয়! একথা একবার নয়, একশোবার বল্ছি, আমি সুখী, পরম সুখী! আপনি হয় তো বিশ্বাস করবেন না,—কিন্তু …

—কেন বিশ্বাস করব না ভাই? রজনীর মত মেয়েকে পেয়ে সুখী হওয়াই তো স্বাভাবিক। আমি তাকে যতটুকু দেখেছি……

—আপনি রজনীকে দেখেছেন? কবে? কোথায় বউদি'?

—বাঃ রে! এরি মধ্যে ভুলে গেলে? সেই যে সে-দিন সিনেমায়…মনে নেই? আমার কিন্তু সকল সময় মনে পড়ে, যদিও সে ক্ষণিকের দেখা, একটা বই দু'টো কথা বল্তে সময় পাই নি, তবু—বেশ মেয়েটী! মুখখানি দেখ্লেই কেমন মায়া হয়, আর কথাবার্ত্তাও কি মিষ্টি!

—একেবারে মধু! মধু! ওঃ! আপনার অন্তর্দৃষ্টি কি তীক্ষ্ণ বউদি'! ক্ষণিকের দেখাতেই এত! ভাল করে দেখলে না জানি……

আমি হাস্তে লাগলুম। বউদি' বল্লেন—ভাল করে দেখার সুযোগ আর দিলে কই? এত করে বলি,

যখন আসবে তখন রজনীকেও নিয়ে এসো, তা' আনবে না তো!

—সেজন্যে আমাকে দোষ দিও না বউদি', আমি তো সাধাসাধি করি, তবু ও যে মোটে বেরোতেই চায় না। এমন 'কুণো' দেখি নি। বল্‌লে বলে, লজ্জা করে, কিন্তু লজ্জা যে কিসের তা তো বুঝি না!

—আহা! তাই যদি বুঝ্‌তে তা'হলে আর···

বউদি' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

—যাক্, তোমার নিজের কথাই তো শুনলুম, কিন্তু রজনী—সে মেয়েটী নিজের অবস্থায় বেশ সুখে আছে কি না, তার দিক থেকে অনুযোগ করবার কিছু আছে কি না, সেটা তলিয়ে দেখেছ কি?

—এর উত্তর আমার মুখে শোনার চেয়ে আপনি যদি একবারটী দয়া করে দীনের কুটীরে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসেন বউদি', তা'হলেই ভাল হয়। নিজের মুখে বল্‌লে গর্ব্ব করা হবে, কিন্তু তাকে আমি যে-অবস্থায় রেখেছি, তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যে-সকল ব্যবস্থা করেছি, তা'তেও যদি অভাব-অভিযোগ করবার কারণ কিছু ঘটে, তা'হলে বল্‌তে হয়, মেয়েদের ধর্ম্মই এই—দুঃখকে জোর করে টেনে বার করাই যেন ওদের স্বভাব।

—তা আমি মান্‌ছি, চোখে না দেখেও, তোমার দয়ায় রজনীর কোনো দিকে কোনো অভাব নেই। সোণাদানা, হীরেমোতি ছাড়া মেয়েমানুষের জীবনে যা প্রধান কাম্য··· ভালবাসা, তা'ও তুমি দিয়েছ পর্য্যাপ্তভাবে, কিন্তু সব দিয়েও জীবনে ওর যে একটা মস্ত বড় ফাঁকি রয়ে গেছে ভাই!

—ফাঁকি! এ ফাঁকি কিসের বউদি'? ঐ মন্ত্র পড়ে বিয়ে না করা? হে ভগবান্! এই খানেই তো গলদ থেকে যায়, সংসারের নর-নারীর পবিত্র মিলনকে, মধুর প্রেমকে ওই লৌকিকতার গণ্ডীতে আবদ্ধ করে কতকগুলো জটিল দুর্ব্বোধ্য মন্ত্রের চাপে নিষ্পেষিত করে সমাজ আমাদের যে কি ক্ষতি করছে, সেটা যদি···

জ্যোতিশদা' এতক্ষণ সুবোধ বালকটীর মত চুপ করে বসে একবার আমায়, একবার বউদি'র মুখের পানে পিট্ পিট্ করে দেখছিল, এখন আর থাকতে না পেরে বলে উঠ্‌ল—ইস্! ক্ষতি বলে ক্ষতি! বলো কি ভায়া? এ যে একেবারে ভালবাসার গলা টিপে মারা হচ্ছে!

আমি গম্ভীরভাবে বল্‌লুম—ঠাট্টা নয় জ্যোতিশদা'! সত্যি সত্যি, আমি নিজের মনে বেশ বুঝছি, বিয়ে করলে রজনীকে আমি এত মধুর, এমন গভীর-ভাবে ভালবাস্‌তে কখনই পারতুম না। এর মধ্যে একটা বাধা-বাধকতা এসে পড়ে আমাদের দাম্পত্য জীবনের আনন্দ, বৈচিত্র্য, তরুণত্ব, মাধুর্য্য সব বিস্বাদ করে দিত—

—কিন্তু ঠাকুরপো, এ যে অবৈধ!

—আঃ! কেন মিথ্যে মাথা ঘামাও গুক্তা? ও স্ত্রী-লাভের মন্ত্র বোঝা কি তোমার আমার কর্ম্ম? বাপ-মা, সেই কোন্ কালে পায়ে বেড়ী দিয়ে রেখে গেছেন, পা দুটো একদম বদ্ধ করে। আমাদের জীবনটা একেবারে··· কি বলব? যাকে বলে এঁদো পড়া—

বউদি' হাস্‌তে হাস্‌তে জ্যোতিশদা'র দিকে চোখের ইসারা করে বল্‌লেন—আহা গো! মনে আপশোষ থাকে কেন? এখনো সময় যায় নি, চুলে পাক ধরে নি, একবার চালচিড়ে বেঁধে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়ো না কপাল ঠুকে—কাশী তো তেমন দূর নয়! ঠাকুরপোর মত তোমারও যদি তীর্থের ফল মিলে যায় —অমনি একটি—

—মহাভারত! তা' কি আর মিলবে? এ যে পাথরচাপা কপাল গিন্নি! নেহাত জোটেই যদি, একটা ভৈরবী টৈরবী! কাজ কি বাপু?

দু'জনেই হেসে উঠ্‌লেন। আমি সে হাসিতে যোগ না দিয়ে বল্‌লুম—বাজে কথা থাক্ এখন,—হ্যাঁ, আপনি কি বলছিলেন বউদি'? অবৈধ? কিন্তু সত্য কি অবৈধ হতে পারে? আমি যদি রজনীকে সত্যি-কার ভালবাসাই বেসে থাকি তা'হলে? আপনি বেশ করে ভেবে······

—এতে ভাব্‌বার কিছু নেই ভাই। — আচ্ছা, মোটামুটি একটা কথা বলি, যে রজনীকে তুমি রাণীর আসনে বসিয়ে পূজো করছ, সংসারে তার প্রতিষ্ঠা কি? সমাজ তাকে কোথায় স্থান দেবে? তোমার পরম ভালবাসার পাত্রী রজনী যদি দশের কাছে তার পরিচয় দিতে যায় সে কি বলবে? জমীদারবাবুর রক্ষিতা—

—আরে ছ্যাঃ! তা কেন? তুমি নেহাৎ সেকেলে গিন্নি! বলবে, জমীদার পবিত্র মুখুজ্যের দয়িতা, বান্ধবী, অথবা—

—থামো! তোমার টিপ্পনীর জালায় যে অস্থির! বলো ঠাকুরপো! তোমার রজনীর এখনকার পরিচয় কি?

এ প্রশ্নের উত্তর সহসা যোগাল না। বউদি' বেছে বেছে আমার মনের ঠিক্ দুর্বল স্থানটাতেই আঘাত করলেন।

আমাকে নির্বাক দেখে বউদি' আবার বল্‌লেন—তুমি ভুল করছ ঠাকুরপো! মস্ত ভুল! তোমার পয়সা আছে, প্রতিপত্তি আছে তাই, আমাদের ঘরে হ'লে এদ্দিন ··· যাক্, এ ভুল সংশোধনের এখনো সময় আছে, আর দেরী না করে তুমি রজনীকে বিয়ে করে ফেলো ভাই, লক্ষ্মীটী!··· সংসারে যা' চিরদিন হয়ে আস্‌ছে —

এতক্ষণে ধাতস্থ হয়ে বল্‌লুম—তাই করতে হবে! সেই কোন্ মান্ধাতার কালে সনাতন প্রথা তার আর এতটুকু এদিক্ ওদিক্ হবার যো নেই! না বউদি', এখন পরিবর্ত্তনশীল নূতন যুগ, ও-সব বিদ্‌ঘুটে বিধি-নিয়মগুলো তুলে দেওয়াই উচিত। মনের প্রসারতা, জীবনের সার্থকতা লাভ করতে হলে—লোকলজ্জার সমাজের ভ্রুকুটিতে ভয় পেলে তো চলবে না।

বউদি' অপ্রসন্নমুখে বল্‌লেন—সে সাহস তোমার থাকতে পারে, কারণ তুমি পুরুষ, কিন্তু রজনী···তার নারীত্বকে এভাবে লাঞ্ছিত করা তোমার উচিত হচ্ছে কি? শুধু শুধু একটা খেয়ালের বশে একটী মেয়ের জীবন হেলা-ফেলা করে···

—না না, তাই কি?

মর্ম্মে আহত হয়ে বল্‌লুম—আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন বউদি'! আমি এত-বড় পাষণ্ড নই যে, যাকে এত ভালবাসি, দেবীর মত শ্রদ্ধা করি, তার জীবনটা হেলা-ফেলায় ব্যর্থ করে দেব। রজনী নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, নিজের ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তি সম্পূর্ণ না হোক্, অনেকটাই তা'র হয়েছে, সে যদি আপত্তি করত —

—আপত্তি করে নি? আহা! কি বোকা মেয়ে গো! বউদি' খানিক গুম্ হয়ে থেকে, একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—সে বেচারী আপত্তি করবেই বা কি? তার নিজের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, স্বাধীন সত্তা থাকলে তো? তোমাকে সে ভালবেসেছে আত্মহারা, সর্ব্বহারা হয়ে, প্রাণ লুটিয়ে, তুমি হাত ধরে তাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানেই যাবে, একবারটী জিজ্ঞাসাও করবে না—এটা স্বর্গ, না নরক? বাস্তবিক ভারি দুঃখ হয় ঠাকুরপো, ওই সরলা মেয়েটার জন্যে। তবে তার এই ভালবাসাই যথার্থ ভালবাসা।

—আর আমার?

—তোমার? বল্‌ব?

বউদি' বিমর্ষমুখে একটু হেসে আমার পানে তাকিয়ে বল্‌লেন—রাগ করো না ঠাকুরপো! তোমার এ ভালবাসা নয়, ভাল-লাগা!

জ্যোতিশদা' সোৎসাহে টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন—সাবাস্! সাবাস্ শুভা! যা বলেছ লাখটাকার কথা! ঠিক্ এই কথাটাই এদ্দিন আমার মনে এসেও মুখে আসছিল না, আশ্চর্য্য! কিন্তু ভায়া কি তা স্বীকার করবেন? কখনো না!

স্বীকার করি আর না করি, কথাটার প্রতিবাদ করবার মত কোনো যুক্তি-তর্কই খুঁজে পেলুম না। কাজেই রণে ভঙ্গ দিতে হ'ল তখনকার মত।

মনের সে স্ফূর্ত্তি আর ছিল না।

কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলুম যেন। একটা অবসাদের ভাব এসে পড়ছিল অন্তরে আমার, নির্মল শরতাকাশে খণ্ড মেঘের মত। বাড়ী ফিরলুম, তখনো সেই ভাব, ফেরবার আগ্রহও বুঝি আজ রোজকার মত··· নাঃ, আছে, আছে বই কি! এই যে রজনীকে কতক্ষণ দেখি নি!

গেটের কাছে মোটর ছেড়ে দিয়ে সরাসর ওপরে উঠে গেলুম শোবার ঘরে, ওই দখিনের বড় জানালাটায় সে রোজ এমন সময় বসে থাকে শত কাজ ফেলে, আমারি প্রতীক্ষায়, সে স্থান আজ শূন্য কেন? যা কোনো দিন হয় না, আগ্রহের মুখে বাধা পেয়ে মনটা আরো দমে গেল, এই তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ কারণেই! মানুষের মন কি হাল্‌কা!

শুনলুম রজনী তেতলায় গেছে, অল্পক্ষণ হ'ল। হয়তো আমার দেরী দেখেই, কিন্তু এ রকম দেরী আগেও কতবার হয়েছে — তবে আজ ··· কি মুস্কিল! কেবল ওই চিন্তা! বউদি' আমার মাথায় আজ কি যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন!

কাপড় ছেড়ে, ঝিমিয়ে-পড়া মনটাকে একটু চান্‌কে নিয়ে তেতলায় গেলুম, দেখ্‌লুম দখিন-দুয়ারী ঘরখানার সামনে যে খোলাছাদটুকু, সেইখানে মাদুর পেতে শুয়ে রয়েছে রজনী, একলাটী, চুপ করে সে কি যেন ভাব্‌ছিল তন্ময় হয়ে। সে তন্ময়তা এত গভীর যে, আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেলে না, এত কাছে এসেও, এমন কি ভাবনা তা'র?

যাই হোক্‌···বড় ভাল লাগ্‌ল দেখ্‌তে।

শুক্লা সপ্তমী, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রজনীর সারা অঙ্গে লুটিয়ে পড়েছে।

শুভ্র অনাবৃত বাহুর 'পরে তার ছোট্ট মুখখানি চামেলী ফুলটার মত ফুটে রয়েছে যেন।

শুভ্র কণ্ঠে শুভ্র মুক্তার কণ্ঠী; কাণে মুক্তার দুল, পরিচ্ছদও আগাগোড়া সাদা, সাদা সেমিজের ওপর ধপ্‌-ধপে শান্তিপুরী সাড়ী—জরীর পাড়টুকু তার ম্লান চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় না। পালিশের চিক্‌চিকে সরু চুড়ী ক'গাছি যেন হাতের রংয়ে, জ্যোৎস্নার রংয়ে মিশে গিয়েছে। সমস্তই শুভ্র।

রজনী সাদাই ভালবাসে বুঝি? যে দিন তাকে প্রথম দেখি, সেদিনও তো এমনি ······ সাদাই ওকে বেশী মানায় হয়তো, কিন্তু আমার তেমন ভাল লাগে না, কি জানি কেন? অত বেশী শুভ্রতা মনকে কেমন উদাস করে দেয় যেন, সংসারে বাঁচ্‌তে হলে জীবনে একটু রংয়ের আমেজ চাই না কি!

কিন্তু, রজনীকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল আজ — যেন গ্রীক-শিল্পীর যত্নে গড়া—শুভ্র মর্ম্মর-প্রতিমা একখানি!

এ শুভ্র নিথর সৌন্দর্য্য, স্নিগ্ধ মাধুর্য্য নীরবে উপভোগ করবার জিনিস। আমার অবস্থা তখন সে রকম নয়, তাই মিনিট কতক দাঁড়িয়ে থেকেই আমি অধৈর্য্য হয়ে ডাক্‌লুম — রোজি!

রজনী চমকে গিয়ে উঠ্‌ছিল, বাধা দিয়ে আমি তার পাশে বসে বল্‌লুম — থাক্‌ উঠ্‌ছ কেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি?

রজনী সলজ্জভাবে বললে —নাঃ, এ কি ঘুমের সময়? এমনি একটু শুয়েছিলুম, বেশ জ্যোৎস্না তাই —

—ভালই তো, কিন্তু একলাটী কেন? বিশুর মা রান্না ঘরে বুঝি? কি যে দশা ওদের, রান্না ঘরে কুটনো না পাকালে —

— না, বিশুর মা তো আমার কাছেই ছিল, আমিই বল্‌লুম যেতে —

—কেন?

—কি দরকার সকল সময় আগ্‌লে থাকার? ভাল লাগে না —

—কি ভাল লাগে না? বিশুর মা'কে? তার অপরাধ? বেচারী বুড়ো হয়েছে বলেই কি ···

—যোৎ! তা কেন?

একখানি হাত আমার কোলের ওপর রেখে রজনী সলাজ মধুর হাসি হেসে বললে —আচ্ছা, সময় সময় একটু একলা থাকতে ভাল লাগে না কি?

—তা লাগতে পারে, কিন্তু তোমার আজকাল বেশ একটু সাহস হয়েছে দেখ্‌ছি। আগে তো সন্ধ্যে হলে একদণ্ড একলা থাক্‌তে পারতে না, আমার একটু-খানি দেরী হলেই···ওঃ! সেকি অভিমানের ঘটা! এখন তো আর সে রকম দেখি না।

—তখন নেহাৎ অবুঝ ছিলুম তাই, এখন যে বুঝতে পারছি···

—কি? কি বুঝতে পারছ?

রজনী নিরুত্তর।

কোলের ওপর রাখা এলিয়ে-পড়া হাতখানা তার তুলে নিয়ে, গলায় জড়িয়ে ব্যগ্রতার সহিত বল্লুম—বলো না রোজি? কি বুঝেছ এখন, বলো? রজনী আনত চোখ দু'টী তুলে—বেশ ডাগর না হলেও ঘন পক্ষ্ম-ঘেরা অলস ঢুলু ঢুলু বড় মধুর সে আঁখি দু'টীতে আমার পানে তাকিয়ে কুণ্ঠিতস্বরে ধীরে বল্লে—এই, —কি আর বলব? ভগবান্ আমাকে একলা করেছেন—তখন আর বৃথা বকাবকি করে···

—মিছে কথা,—দুষ্টু! ভগবানের সেই ইচ্ছাই যদি ছিল, তা'হলে এমন একটা ছন্নছাড়া সঙ্গী জুটিয়ে দিলেন কেন? আর বুঝি ভাল লাগে না এ সঙ্গীটীকে? এঁ্যা? কি বলো?

আমি আদর করে রজনীর ফুলের মত পেলব হাল্‌কা দেহখানি বাহুবেষ্টনে টেনে নিলুম।

রজনী আমার বুকের 'পরে মুখ রেখে চুপ করে রইল।

শ্লথ বাহুখানি তার আমার গলায় লুটিয়ে পড়েছে, একছড়া জুঁইয়ের গড়ে মালার মত, তেমনি স্নিগ্ধ কোমল পরশ তার, আবেগের এতটুকু উত্তাপ নেই তাতে—

আশ্চর্য্য! রজনীকে যখনই আদর করি, তখনি সে এমনি করে নীরবে এলিয়ে পড়ে।

জানি, তার প্রেম গভীর, একান্ত নির্ভরশীল, কিন্তু সে প্রেমে এমন একটু উচ্ছ্বাস কি উদ্দামতা নেই বুঝি, যা' প্রেমাস্পদের বিহ্বল প্রাণে উন্মাদনা জাগিয়ে···নাঃ! একটা না একটা খুঁৎখুঁতুনী লেগেই আছে, মানুষের কি যে স্বভাব।

রজনীর মনেও এমনি কোন খুঁৎখুঁতুনি থাকে যদি, বউদি' যে বলছিলেন—

আগ্রহভরে বল্লুম—রোজি! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে সত্যি সত্যি বলবে?

রজনী মুখ না তুলেই বল্লে—কি?

—বলছিলুম, তুমি কি নিজেকে যথার্থই সুখী মনে করো? আমার কাছে তোমার অনুযোগ-অভিযোগ কর্‌বার কিছু নেই কি?

রজনী নীরব। শুধু একটা চাপা গাঢ় নিঃশ্বাস আমার বুকের 'পরে অনুভব করলুম।

—থাকে যদি বলো, আমার কাছে সঙ্কোচ করো না। আমি তোমাকে অসুখী করছি না তো?

অসহিষ্ণু ভাবে ব্যাকুল আগ্রহে আমি রজনীর অবনমিত মুখখানি তুলে ধরলুম, এতটুকু শুভ্র মুখখানি চাঁদের আলোয় টুল্ টুল্ করছে, অশ্রুজলের একটী ফোঁটা যেন!

—বলো রোজি, চুপ করে থেকো না।

—কি বলব? পথের কাঙালকে কুড়িয়ে এনে যে সিংহাসনে বসাতে পারে, তাকে বলবার আর কি আছে?

ধরা গলায় গাঢ় স্বরে কথাটা বলে রজনী আমার মুখ পানে চেয়ে রইল, অনিমেষ হয়ে।

করুণতা-মাখা কি কোমল মধুর দৃষ্টি তার! কিন্তু ওতে সে বিহ্বলতা কই? উদ্বেলিত উচ্ছল হিয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা যাতে পরিতৃপ্ত······দূর করো ছাই!

খালি নেই নেই! এসব ত্রুটী-বিচ্যুতি এতদিন চোখে পড়েনি তো?

কি জানি, কি যে হয়েছে এখন, থেকে থেকে এম্‌নি একটা অতৃপ্তির ভাব মনের কোণে এসে পড়ে বিষণ্ণ ছায়া ফেলে। কিন্তু এ ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত!

না, আর যেন এমন না হয়, আমি যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট—আমি সব পেয়েছি!

অধীর আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে রজনীকে আমি বুকে চেপে ধরলুম।

—ভুল বলছ রোজি! পথের কাঙাল নয়,—রত্ন! আমার কত ভাগ্য যে, এ রত্ন পথের ধুলোয় কুড়িয়ে পেয়েছি—

রাত্রে রজনীকে বললুম — বউদি' তোমাকে ডেকেছেন রোজি!

—কে বউদি'?

—ওই যে জ্যোতিশদা'র স্ত্রী গো! যিনি তোমাকে সেদিন সিনেমায়—

—ও! তিনি?

—হাঁ, বেশ মানুষটা, না?

—চমৎকার! তাঁকে একবার দেখেই যেন কত দিনের চেনা মনে হ'ল।

—তোমাকেও তাঁর বড্ড ভাল লেগেছে না কি! যখনি যাই তখুনি বলেন, রজনীকে নিয়ে এলে না কেন? যাবে একদিন? চলো না কালই তোমাকে নিয়ে যাই তাঁর কাছে, কত খুসী হবেন।

—খুসী হবেন?

—না তো কি রাগ করবেন? ওঁরা সে প্রকৃতির লোক নন রোজি! তুমি জানো না তাই,—আমাকে কি রকম স্নেহ-যত্ন করেন—

—তা করতে পারেন, কিন্তু······

—এতে আর কিন্তু নেই,—বলো, কাল যাবে তো?

—না!

আর একদিন রজনীকে এমনি দৃঢ়তার সহিত অকুণ্ঠিতভাবে 'না' বলতে শুনেছিলুম, যেদিন তাকে বোর্ডিংয়ে রাখার প্রস্তাব······যাক্, সে সব কথা পরে হবে।

রজনী সহজে রাজি হবে না জানতুম, তাই বলে এমন স্পষ্ট অস্বীকার···ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম—কেন বলো দেখি? আমার সঙ্গে যেতে তোমার বাধা কি?

রজনী শয়নের উদ্যোগ করছিল, আমার পানে চকিতে চেয়ে চোখ দু'টী নামিয়ে নিয়ে সে আস্তে আস্তে বললে—বাধা আছে কি না জানি না,—কিন্তু আমি যেতে পারব না, ক্ষমা করো আমাকে, তুমি দয়া করে যেখানে স্থান দিয়েছ সেইখানেই থাকতে দাও।

—দয়া করে!

অন্তরে আমার অতর্কিতে একটা আঘাত লাগল।

—এ ধারণা তোমার মনে আজও রয়েছে?—আশ্চর্য্য! তুমি এতদিনেও আমাকে ঠিক্ বুঝলে না রজনী?

—বুঝেছি! ওগো, খুব বুঝেছি আমি! এর বেশী বুঝতে আর চাই না!—মাফ করো আমাকে!

বলতে বলতে—রজনী ঝুপ্ করে শুয়ে পড়ল বালিশে মুখ গুঁজড়ে।

তার কম্পিত কণ্ঠস্বরে, কথা বলবার ভঙ্গীতে বিদ্রোহীর ভাব সুস্পষ্ট,—কিন্তু কেন? আমার অপরাধ?

আমার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হ'ল না। কতক্ষণ বাদে চমক-ভাঙ্গা হয়ে দেখি, রজনী তেমনি ভাবে শুয়ে,—শ্বাস-প্রশ্বাসে বোধ হ'ল ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘুমোক্—

আমার যে চোখের পাতা বোজে না, এ কি অস্বস্তি ধরল আজ! একে মনের গতিক তেমন সুবিধের নেই, কয়েকটী ছোট-খাট ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, তারপর রজনীর এই অপ্রত্যাশিত ভাবান্তর আমাকে শুধু ক্ষুব্ধ নয়, একটু উদ্বিগ্নও করে তুলেছিল।

ঘুরে ফিরে কেবলি মনে পড়ে বউদি'র কথা। আমি কি বাস্তবিকই রজনীর প্রতি অবিচার করছি? তাই যদি হয়, তবে সমাজের চক্ষে, ভগবানের চক্ষে নয়! তিনি তো জানেন রজনীকে আমি কি ভীষণ আবর্ত্ত থেকে তুলে কোথায় এনে রেখেছি, তা'র মত ভাগ্য-বিড়ম্বিতার জীবনে এর চেয়ে ভাল আর কি হতে পারত?

গাঁটছড়া বেঁধে বিয়ে না করলে বুঝি নারীর নারীত্ব চরিতার্থ হয় না?

এই যে ধন দিয়ে, মান দিয়ে, প্রাণ দিয়ে আরাধনা—এ কি কিছু নয়?

কি জানি মেয়েদের মন···কবি যথার্থ ই লিখেছেন—

"........................রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরি সখা ! সাধনার ধন !"

রজনীকে আমি বিবাহ না করায় কারণ সবাই যা বুঝেছে রজনীরও তাই বিশ্বাস এখন পর্যন্ত, নইলে এত করেও তার মনে···আচ্ছা, আমি কি যথার্থ ই ভুল পথে চলেছি ? এ প্রশ্নের উত্তরে আমার অন্তর থেকে আপনিই সাড়া আসে 'না'।

কিন্তু আজ তো এলো না !

একটা গভীর নিঃশ্বাসের শব্দে সচকিত হয়ে দেখলুম রজনী পাশ ফিরে শুয়েছে। নিদ্রালস শিথিল তনুলতা তার শুভ্র কোমল শয্যায় ডুবে গিয়েছে যেন !

এলোমেলো চুলের মাঝখানে সুপ্তি-মাখা মুখখানি তার বড় সুন্দর, বড় করুণ দেখাচ্ছিল—ওই করুণতাই বুঝি ওর সৌন্দর্যের বিশেষত্ব ! দেখ্‌লেই মায়া হয়, বউদি' মিছে বলেন নি তো !

সে মুখের পানে চেয়ে চেয়ে আমার বিগলিত দরদী-চিত্তে জেগে উঠ্‌ল আর একদিনের চিত্র, যেদিন রজনীকে প্রথম দেখি—শরতের এক উজ্জ্বল সন্ধ্যায় কাশীতে, দশাশ্বমেধঘাটের বিচিত্র জন-সমারোহের মধ্যে।

মূর্চ্ছিতা জননীর পাশে বসে সে আকুল হয়ে কাঁদছিল। চারিদিক ঘিরে কুতূহলী জনতা—

মেয়ে-পুরুষ—ছেলে-বুড়ো সবাই আছেন।

—ও মাগো !—কি করে পড়ে গেল ? পা পিছ্‌লে বুঝি ?

—হ্যাঁ গা ! একবার নাকে হাত দিয়ে দেখ দেখি, নিঃশ্বেস পড়ছে কি না ?

—মাগীর মিরগী আছে নিশ্চয়, তা অমন রোগ নিয়ে ঘাটে আসবার কি দরকার ছিল ?

—আরে বাপু ! বসে বসে কাঁদ্‌লে কি হবে আর ? মুখে চোখে একটু গঙ্গাজল দাও। দাঁত কপাটি লেগেছে না কি ? ওমা ! তবেই তো মুস্কিল !

—আচ্ছা, রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে খবর দিলে হয় না ? মরেই যদি যায়—

এমনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে অনর্থক ভিড় জমিয়ে তুলেছে তারা, কিন্তু এগোচ্ছে না কেউ-ই।

—আপনারা দয়া করে একটু সরে দাঁড়ান দেখি নইলে উনি যে দম্ আট্‌কে মারা যাবেন !—

বলে আমি দু'হাতে ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই রজনী তার অশ্রুভারাকুল আর্ত্ত নয়ন দু'টী আমার পানে তুলে ব্যাকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি ডাক্তার ?

সেই আমাদের শুভদৃষ্টি !

তার সেই শঙ্কা-ব্যথাতুর বিবর্ণ মুখে, সজল চোখে, আলু-থালু শুভ্রবেশে এক অপরূপ সৌন্দর্য্যের ঢেউ লেগেছিল, সে মধুর ছবি যে আজও চোখের সামনে রয়েছে আমার।

থাক্, কি বলছিলুম ? হাঁ, রজনীর মা'কে বাঁচানো গেল না। বেরি বেরি রোগে দীর্ঘকাল ভুগে জীবনীশক্তি তা'র ক্ষয় হয়েছিল ; হার্টও ছিল খারাপ, তার ওপর হঠাৎ পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত লেগেছে, কাজেই······

ডাক্তার, নার্স, ঔষধ, পথ্য, কিছুতেই কিছু হ'ল না। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

জ্ঞান একবার হয়েছিল সকালের দিকে, মুহূর্ত্তের জন্য, তার মধ্যে পরিচয় নেবার বা দেবার সুযোগ আর হয়ে ওঠে নি।

আমার শুধু নামটুকু জেনেই তিনি পরম আশ্বাস-ভরে—ব্রাহ্মণ ? আঃ !···আমার রজনীকে আপনি··· ব্রাহ্মণ-কন্যা···নিষ্পাপ···

বল্‌তে বল্‌তেই সেই যে চক্ষু বুজলেন—ব্যস্ · সেই প্রথম ও শেষ বাক্য তাঁর।

তারপর রজনীর কাছে কথায় কথায় যতদূর জেনেছি তাতে সব পরিষ্কার হয় না।

রজনীর অতি শৈশবে জ্ঞানোন্মেষের পূর্ব্বেই পিতৃ-বিয়োগ হয়, তাঁর নাম অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, পিতার সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র তার অভিজ্ঞতা।

মাতা বিধবা হয়ে পর্য্যন্তই, রজনীকে নিয়ে কাশীতে বাস করেছেন, তাঁদের সাহায্য করবার কেউ ছিল না।

অসহায়া অনাথিনী—বিশেষ পরিশ্রমে কাপড় সেলাই করে, জরীর পাড় বুনে, ছোট ছোট মেয়েদের পড়িয়ে, পাল-পার্ব্বণে, সময়ে অসময়ে গৃহস্থদের ঘরে কাজকর্ম্ম করে দিয়ে সংসার চালাতেন। বিধবার সঞ্চয়ও সামান্য কিছু ছিল, কিন্তু সব গেছে রোগের ঠেলায়।

এই একমাত্র মা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ আপন আছে কি না, রজনী তা জানে না, এই তার পরিচয়, সুতরাং…

সমাজ তাকে স্থান দেবে কোথায়? আমিও সেই সমাজেরই একজন, কিন্তু সাধারণের সঙ্গে আমার একটু নয়, অনেক স্বাতন্ত্র্য আছে—প্রথমতঃ আমি অবিবাহিত এবং অভিভাবকশূন্য, আমার স্বাধীন মতে হস্তক্ষেপ করে এমন কেউ ছিল না। তারপর অর্থবল।

তথাপি রজনীকে নিয়ে প্রথমটা বিব্রত হতে হয়েছিল কম নয়। রজনীর মা যখন ওকে আমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন, তখন তাঁর মনোগত ইচ্ছা কি ছিল ভগবান জানেন, তবে রজনীর মুখেই শুনেছি সে লেখাপড়া কাজকর্ম্ম শিখে স্বাবলম্বী হতে পারে, এই রকম উদ্দেশ্য তাঁর মনে প্রথম থেকেই ছিল। শেষের দিকে অসুখে পড়ায় তাঁর মত পরিবর্ত্তিত হয়, অসহায়া কন্যার ভার কা'র হাতে দিয়ে যাবেন, এই চিন্তায় বিধবার আহার নিদ্রা ত্যাগ হয়েছিল। উপযুক্ত একটী ভারবাহীর সন্ধানও না কি তলে তলে চলছিল রজনীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও!

পাড়াপ্রতিবাসীরাও ওঁদের সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশী কিছু বলতে পারলেন না। এ অবস্থায় একটী বয়স্থা ভদ্রকন্যাকে নিয়ে আমি…

রজনীকে 'ভদ্রকন্যা' বলতে আপত্তি করবেন না, এমন লোক আমাদের সমাজে ক'জন আছেন জানি না, তবে আমার…বলেছি তো আমার মত শুধু উদার নয়, সৃষ্টিছাড়া।

আমি সেই মৃত্যুপথযাত্রিণীর শেষ বাক্যে অসংশয়ে বিশ্বাস করি, নিজের মনে জানি রজনী নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক, কিন্তু একথা অপরে বিশ্বাস করবে কেন? এই অপরিচিতা বয়স্থা মেয়েটাকে নিয়ে আমি কি করি, কোথায় রাখি, সে হুঁস হ'ল আমার হাওড়া ষ্টেশনে নেমে।

কল্‌কাতায় আমার ঝি-চাকর নিয়ে সংসার, সেথায় রজনীকে রাখ্‌তে আমার আপত্তি না থাকলেও রজনীর হতে পারে, সে তো আর খুকীটী নয়।

অবশ্য দেশের বাড়ীতে আমার আত্মীয়-আত্মীয়ার অভাব নেই, এক জ্যাঠাইমাও আছেন, যাঁর তত্ত্বাবধানে রজনীকে কিছুদিন স্বচ্ছন্দে রাখা যায়, কিন্তু সেখানে, পল্লীগ্রামের শুচিতার আবেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশাধিকার পাওয়া রজনীর পক্ষে অসম্ভব, — কাজেই ওকে নিয়ে ফাঁপড়ে পড়তে হ'ল।

ভবানীপুরে ……… ষ্ট্রীটে, আমার এক মাসীমা আছেন—আমার মায়ের খুড়তুতো বোন, তাঁরা শিক্ষিত সুসভ্য সম্প্রদায়ে মেলা-মেশা করেন, আধুনিক ষ্টাইলে থাকেন। মাসিমার তিন মেয়ে, বড়টীর সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে, ছোট দু'টী বেথুনে পড়ে, বেশ সভ্য-ভব্য সুখী পরিবার, রজনীকে সেখানে রাখ্‌তে পারলে বড় সুবিধা হয়।

কথাটা মনে আসতেই রজনীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম কপাল ঠুকে। হতাশ হতে হ'ল না। বিপন্না অসহায়া বালিকার প্রতি করুণাপরবশ হয়েই হোক্, কিম্বা খামখেয়ালী বোনপোটীর উপরোধে পড়েই হোক্, মাসিমা রজনীকে কাছে রাখ্‌তে আপত্তি করলেন না, বরং রজনীর আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে — বেশ মেয়েটী তো!—বলে একটুখানি মুখটিপে হাস্‌লেন। সে হাসির প্রচ্ছন্ন অর্থ সুস্পষ্ট করে দিলে মাসিমার বড় মেয়ে সুজাতা, সে মায়ের কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করে বল্‌লেও বেশ শুন্‌তে পেলুম — পবিত্রদা'র বিয়ের ফুল এবার ফুটেছে মা! নইলে এ মেয়েটী কোত্থেকে …

মেজ মেয়ে অজিতা ফিক্ করে হেসে বলে ফেললে — বা রে! এ যে বঙ্কিমবাবুর সেই রজনী! রজনী ধীরে—!

দেখ্লুম রজনীর শুভ্র গাল দু'টীতে একটু লালের আভাস, কথাগুলো তার কাণেও গিয়েছিল নিশ্চয়। যাক্ — যে যাই বলুক, এত বড় একটা দায়িত্ব যখন ঘাড়ে নিয়েছি তখন লজ্জা-সঙ্কোচ করা চল্‌বে না তো!

রজনীকে বল্লুম — তা'হলে তুমি মাসিমার কাছে থাকো রজনী, আমি শীগ্‌গিরই তোমার পড়া-শোনার ভালরকম ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোমার কি ইচ্ছে? পড়বে তো?

রজনী সলজ্জভাবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

মাসিমা জিজ্ঞাসা করলেন — সেখানে স্কুলে পড়তে বুঝি? কতদূর পড়েছ?

— সেভেন্থ্ ক্লাসে পড়ছিলুম তার পর মার অসুখে ······

বাধা দিয়ে শান্তা বলে উঠ্‌ল — মো—টে! দিদি যে এ-বয়সে আই-এ দিয়েছিল, তোমার বয়স কত? আঠারো উনিশ হবে না?

রজনী মাথা হেঁট করে উত্তর দিলে—না ষোলো চল্‌ছে।

— তা'হলে মেজদি'র বয়সী বলো, সেজদি' যে এবার ম্যাট্রিক্ ··· .

— আঃ! তুই থাম্ না শান্তা! সবাই কি সমান পড়তে পারে? এই তো এবার আমাদের স্কুলে একটী মেয়ে আমারি সমবয়সী, — সে ভর্ত্তি হ'ল সিক্সথ্ ক্লাসে, তাতে কি হয়েছে? ভাল পড়তে পারলে প্রমোশনের···

মাসিমা বল্লেন — সে হবে এখন বাপু! তাড়াতাড়িটা কি? আগে একটু বিশ্রাম করুক, খোকনের যা চেহারা হয়েছে কেবল ঘুরে ঘুরে, পারেও তো এত ঘুরতে!

যাক্, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্লুম, বড় ভাবনা হয়েছিল রজনীর জন্যে। এখানে থেকে মাসিমার মেয়েদের সঙ্গে লেখা-পড়া করুক এখন, তারপর দেখা যাবে ওর যেমন ইচ্ছে, মেয়েদেরও একটা স্বাধীন মতামত আছে তো!

ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি দিয়ে নামছি, হঠাৎ কিসের একটু শব্দে থম্‌কে দেখি রজনী সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। আমাকে ফিরতে দেখে সে সঙ্কুচিত হয়ে এসে বল্লে— আপনি—আস্‌বেন তো?

কি ব্যাকুল সে প্রশ্ন! ছল ছল চোখ দু'টীতে তার কি অসহায় বেদনা!

বুকের ভেতর যেন টন্ টন্ করে উঠ্‌ল—আমাকে এমন করে কেউ তো কোন দিন···

—হ্যাঁ আস্‌ব বই কি! আমি রোজ আস্‌ব রজনী! ভয় কি? এই তো কাছেই আমার···

কথাটা বলেই আমি তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে মোটরে বসলুম। আমার মন তখন এত চঞ্চল!

বুঝতে পারলুম না এ চাঞ্চল্য কিসের? পুলকের না ব্যথার?

রজনীকে বলে এসেছিলুম 'রোজ আস্‌ব' কিন্তু তা আর হ'ল না। বাড়ী ফিরেই আমার জ্বর, সে জ্বর ছাড়ল তিন দিনের দিন, সেই দিনই বিকেলে বেরোবো মনে করছি—এমন সময় স্বয়ং মাসিমা এসে হাজির! তাঁর গম্ভীর মুখে উদ্বেগের ছায়া। আমি কিছু বল্‌বার আগেই তিনি বলে উঠ্‌লেন—হ্যাঁ খোকন্! তোর কাণ্ডখানা কি বল্ দেখি? এত লেখা-পড়া শিখে শেষে এই বুদ্ধি···

শঙ্কিত হয়ে বল্লুম—কি? কি হয়েছে মাসিমা?

—হবে আর কি, আমার মাথা! ওই যে মেয়েটী—রজনী, ওর যে জাত-জন্মের কিছু ঠিক্ নেই, তা তো আমাকে···

—সে কি? কে বল্লে?

—কে আর বলবে? ও নিজেই তো কথায় কথায় মেয়েদের কাছে বলে ফেলেছে। আরে এ সব কথা কি

চাপা থাকে বাবা? বিধবা হয়ে মা'য়ের বৈরাগ্য হ'ল তাই কচি মেয়ে নিয়ে একলাটী চলে এলো কাশীবাস করতে! বেশ, বাপের মুখ না হয় না-ই দেখলে, আর কেউ আত্মীয়-কুটুম্ তিন কুলের কারো পাত্তা নেই কি? এতে কি বোঝায় বল তো?

—কিন্তু মাসিমা এমনও তো হতে পারে যে···

—না বাবা আর কিছু হতে পারে না। তুমি জান না কাশী কি রকম সহর,—ও মাগী ঠিক্ ওই মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল তারপর যা হয় তাই!

অন্তরে আহত হয়ে বললুম—এ সন্দেহ আমার মনেও আসে নি এমন নয়, কিন্তু মাসিমা, ধরুন এ সন্দেহ যদি সত্যই হয়, তা'হলে ও বেচারীর অপরাধ কি? ও যদি নিজে নিষ্পাপ হয়···

—তবুও, মায়ের কলঙ্কের ছাপ সন্তানের জীবনে পড়বেই যে; বিশেষতঃ মেয়ে সন্তান, তুমি আমি নিষ্পাপ বললে সমাজ তো শুনবে না।

—না-ই বা শুনলে! সমাজের ও সব ভিরকুটী আমি মানি না—

—তুমি না মানলেও আমাকে যে মানতেই হয় বাবা! এই তো কাল জামাই এসেছিলেন, কত রাগ করতে লাগলেন শুনে, আবার কুটুমবাড়ীতে যদি কথাটা ওঠে···না খোকন, আমি ওকে রাখতে পারব না বাবা, দু' দু'টী মেয়ে আইবুড়ো ঘরে, শেষে একটা কেলেঙ্কারী হয়ে পড়লে তখন···

—না মাসিমা! আপনি ভাববেন না, আমি রজনীর একটা ব্যবস্থা করে ফেলছি শীগ্‌গিরই, চলুন, আপনার সঙ্গেই গিয়ে···

—কি ব্যবস্থা করবে?

—যা ভাল মনে হয় তাই···ওকে এ অবস্থায় ফেলতে তো আমি পারব না।

—তা তো বটেই!

গম্ভীর মুখে খানিক চিন্তা করে মাসিমা বললেন—হ্যাঁ খোকন্! এক কাজ করলে হয় না? ও মেয়েটাকে যদি বোর্ডিংয়ে রেখে দাও···

—দেখি, ওকে জিজ্ঞাসা করে, ও যদি রাজি হয় তা'হলে···

—রাজি যে হতেই হবে, এ ছাড়া ও-মেয়ের আর গতি নেই যে!

গাড়ীতে বসে মাসিমা ইতস্ততঃ করে বললেন—খোকন্! রাগ করিস্ নে বাবা, তোর ভালর জন্যেই আমি···আজ তোর মা কি বাপ থাকলে আমার বলার কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু তা তো নেই, কাজেই বলতে হচ্ছে···

মাসিমার সঙ্কোচ দেখে আমার ভয় হ'ল, না জানি আবার কি গোপন তথ্য আবিষ্কার করলেন তিনি!

উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কি বলছেন, বলুন না?

মাসিমা ঢোক গিলে বাধ-বাধ ভাবে বললেন—বলছিলুম রজনীকে বোর্ডিংয়ে রাখাই ভাল। কি জানি, মানুষের মন, বলা তো যায় না, শেষ-কালে যদি···নাঃ, ও মেয়ে তোমার উপযুক্ত নয় বাবা, তোমাদের এত বড় বংশ-গৌরব, এত সম্মান, ছিঃ! আর এমনি কি সুন্দরী ও! রোগা, ঢ্যাঙ্গা, রংটুকুই যা সাদা ফ্যাক্-ফ্যাকে, কড়ির পুতুলের মত। ও কি তোমার পাশে দাঁড়াবার যোগ্য? রামঃ! কিসে আর কিসে!

মাসিমার সেই অযাচিত উপদেশ বা আদেশ মাথা পেতে নিলুম তখনকার মত, তবে শেষ পর্য্যন্ত নয়।

মনে করেছিলুম সেদিন রজনীর সঙ্গে দেখা করে, বোর্ডিংয়ে থাকা সম্বন্ধে তার মতামত জেনে চলে আস্‌ব, কিন্তু মাসিমাদের বাড়ীর ধরণ-ধারণ দেখে রজনীকে সেখানে আর রাখতে প্রবৃত্তি হ'ল না। ফেরবার সময় আমি ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে এলুম। মাসিমা মুখে একবার—এত তাড়াতাড়ি কিসের বাপু? জলে তো পড়ে নেই?—

বললেও তিনি যে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন, তা বেশ বোঝা গেল।

রজনীকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমাকে আর এক-বার সতর্ক করে মাসিমা যখন ফিরে গেলেন, শুনতে

পেলুম সিঁড়িতে উঠ্তে উঠ্তে তিনি আপশোষ করে বল্‌ছেন—ও কি আর সহজে ছাড়বে? হঁ! একে কাশীর মেয়ে, তায় ওই রকম, কত মন্ত্র-তন্ত্র জানে ওরা, —সত্যি, আমার বড় ভাবনা হয়েছে ছেলেটার জন্তে।

তাঁর কথা শুনে রাগও হ'ল, হাসিও পেল। রজনী একেবারে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে,—পাথরের পুতুলটীর মত!

তার মনে তখন কি জানি কি ভাব —

আমি পাশের সীটে বসে ধীরে ধীরে ডাক্‌লুম — রজনী!

রজনী আনত মুখখানি তুলে বল্‌লে—কি বলছেন?

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, গাড়ীর ভিতর আলো নেই। ঝাপ্‌সা আঁধারে সে-মুখের পানে খানিক নীরবে চেয়ে থেকে, জিজ্ঞাসা করলুম — তুমি বোর্ডিংয়ে থাক্‌তে পারবে?

—কেন পারব না? আপনি যদি বলেন, তা'হলে…

—উহুঁ, আমার বলায় কি হয়? তোমার নিজের সুবিধে-অসুবিধে দেখতে হবে। বোর্ডিংয়ে থাকায় তোমার আপত্তি থাকে যদি …

— না, আপত্তি কিসের? কিন্তু…

—কিন্তু কি? বলো, আমার কাছে তোমার সঙ্কোচ করলে তো চল্‌বে না, তোমার মা যে তোমাকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছেন রজনী! তোমার সুখ-অসুখের জন্ত ,আমাকে দায়ী হতে হবে এখন, তাই বল্‌ছি, যদি তুমি কষ্ট বোধ না করো —

—কষ্ট নয়,—লজ্জা,— সেখানে তো একটী দু'টী নয়, অনেক মেয়ে,— তাদের কাছে যদি এমনি জবাবদিহি করতে হয়,— তা'হলে আমি যে … না, না, আমি তা পারব না, তার চেয়ে আমার মরণ ভাল।

রজনী মুখে হাত চাপা দিয়ে সহসা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌ল।

মায়ের মৃত্যুর পর ওকে এমন করে কাঁদতে আর দেখি নি। আশ্চর্য্য হয়ে গেছি মেয়েটীর অসাধারণ ধৈর্য্য দেখে; সে ধৈর্য্য আজ ভেঙে গেছে। সামান্ত আঘাত তো নয়!

ব্যথিত হয়ে বল্‌লুম — থাক্ রজনী! তোমার কোথাও গিয়ে কাজ নেই আর, তুমি আমার কাছে থাক্‌বে, কেমন?

রজনী চোখের জল আঁচলে মুছতে মুছতে ধরা-গলায় বল্‌লে—যদি দয়া করে রাখেন,—আমি আপনার বাড়ী দাসীবৃত্তি করে…

—ছিঃ! ও কি কথা? তুমি থাক্‌বে আমার শূন্ত ঘরের লক্ষ্মী হয়ে, আমার সঙ্গীহারা জীবনের সাথী হয়ে…

আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি রজনীর হাত ধরে …সেই আমার পাণিগ্রহণ করা! সে হাত আর ছাড়ি নি তো! ছাড়তেও পারব না জীবনভোর!

এ হ'ল কিনা শুধু ভাল-লাগা, বড় লোকের খেয়াল! আর ওই যে আমাদের পাড়ার চৌধুরীর ছেলে নবীন, মাসের মধ্যে দশ দিনও বাড়ী থাকে না, থাক্‌লেও স্ত্রীকে না ঠেঙ্গিয়ে জল গ্রহণ করে না — তবু লোকে ওর ভালবাসা অস্বীকার করবে না, ওর বাপ-মা, স্ত্রী, নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে, — ও যাবে কোথায়?—এ যে সাত পাকের বাঁধনে বাঁধা!

অপরূপ বিধান! সাত পাকের বাঁধনে ছাড়াছাড়ি হবার ভয় নেই, খাওয়াখাই করুক, মারামারি করুক, ছাড়বে না তো!

এই বাঁধন নেই বলেই বেচারী মাসিমা এখনো আশা ছাড়েন নি আমার, বলেন —এ বয়সে পুরুষের অমন হয়ে থাকে গো! ও কিছু নয়, শুধু চোখের নেশা, দু'দিনে কেটে যাবে। বিয়ে করে নি যে এই আমাদের ভাগ্যি।

শুনে আমি নিজের মনেই হাসি। বেশ! যার যা' খুশী বলুক, আমি কিন্তু ও সব বিদ্‌ঘুটে বিধান মেনে চির-সুন্দর চির-মধুর শাশ্বত প্রেমকে বিকৃত, বিস্বাদ করতে পারব না, — যাতে প্রাণের দাবীর চেয়ে সাত পাকের দাবী বড় —

কথাটা যে শুনবে সেই মনে মনে হাস্‌বে —

—আরে বাপু! তত্ত্বালীতে কাজ কি? আসল

কথাই বলো না, ও কুড়িয়ে পাওয়া মেয়েকে ধর্ম্মপত্নীছে বরণ করতে তুমি কুণ্ঠিত, — কিন্তু ভগবান জানেন ··· থাক্‌, নিজের সাফাই করতে চাই না, আমি যা ভাল বুঝেছি, তাই করেছি, আর ভবিষ্যতে করবও, আমার স্বভাবটাই এমনি একগুঁয়ে। যেটা ধরি, — তা ছাড়ি না।

সকলে যা করছে আমাকেও তাই করতে হবে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে, কেন?

আমি তো জানি, — এ পাপাচার নয়, অবৈধ নয়, কিন্তু রজনী,—তার মনে যদি এই রকম একটা ভ্রান্ত সংস্কার থাকে ··· তাই কি?—সে মাঝে মাঝে এমন বিমনা হয়ে পড়ে — আমার আকুল প্রাণের ডাকে ওর প্রাণ সাড়া দিয়ে ওঠে না — আমার উছ্‌লে-ওঠা বুকের আবেগ থম্‌কে যায় ওর শীতল নিঃশ্বাসে, সেই জন্যই কি?

কিন্তু আগে তো এমন হ'ত না, রজনী যে সব জেনে-বুঝে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে, আমি তো তাকে জোর করে ··· কি জানি, বড় বিচিত্র এ নারী-চরিত্র!

(ক্রমশঃ)

বাঁধন নাই

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার

সারাটি জীবন উধাও হইয়া ছুটিতে চায়—
ঘূর্ণী-হাওয়ার ঘুরণ-নেশায় নাচিয়া ধায়,
নিশানা-হীন
স্রোতের ফুলের মতন ভাসিছে রাত্রিদিন;
সমুখে জাগিছে ধূ-ধূ পথ-রেখা, যতটা চাই
পিছনে আঁধার—ক্ষ্যাপা জীবনের
বাঁধন নাই।

কাঁপে আলো-ছায়া, বন-মায়া দোলে
নয়নে মনে
ঝরা-পাতাদের ব্যথায় কাতর গহন বনে,
আকাশে তাই
ভ্রষ্ট-তারার বেদনার আর বিরাম নাই,
মানুষে মানুষে যে-আড়াল ঘন তাহারে ধরি
কেঁদেছি মরণ-মোহানার ধারে জীবন ভরি!

ভাঙে পড়ে ঢেউ—জল উছলায়—সাগর দোলে,
জীবন-মরণ গায়ে-গা'য় দোহে পড়িছে ঢ'লে!
ওপার হ'তে
তট-ভাঙনের ধ্বনি গুমরায় উতলা স্রোতে;
সাগর-পাখীরা উড়ে চ'লে যায়—সমুখে চাই
আকাশে সাগরে জীবনে কোথাও বাঁধন নাই!

বিহারীলাল

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্‌-এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ্‌-আর-ই-এস্‌

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'নিসর্গ-সন্দর্শন', ১৮৬৯

এই সময়ে বিহারীলাল তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিতে আরম্ভ করেন। ১২৭৬ সালে 'নিসর্গ-সন্দর্শন' ও 'বঙ্গসুন্দরী' এবং পর বৎসরে 'বন্ধুবিয়োগ' ও 'প্রেমপ্রবাহিণী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্যটী ৭টী সর্গে বিভক্ত, যথা,—চিন্তা, সমুদ্রদর্শন, বীরাঙ্গনা, নভোমণ্ডল, ঝটিকায় রজনী, ঝটিকাসম্ভোগ ও পরদিনের প্রভাত। তাঁহার "পরমাত্মীয় হিতৈষী মিত্র শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকুমার সেন কবিরাজ মহাশয়ের করকমলে উপহার-স্বরূপ এই কাব্য প্রীতিপূর্ব্বক সমর্পণ" করা হয়। কাব্যের ৩য় ও ৪র্থ সর্গ ১২৭০ সালে, ১ম ও ২য় সর্গ ১২৭২ সালে এবং ৫ম সর্গ ১২৭৪ সালে রচিত হয়। অধিকাংশ কবিতাই 'অবোধ-বন্ধু'র ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগে প্রকটিত হইয়াছিল এবং পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিতাকারে 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্য নামে গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়। উহাতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোহর বর্ণনা সত্ত্বেও বর্ত্তমান পাঠকের নিকট উহা আদৃত হইবে কি না সন্দেহ।

'বঙ্গসুন্দরী', ১৮৬৯

'বঙ্গসুন্দরী' বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলির অন্যতম এবং কবির জীবদ্দশাতেই উহা কিছু আদর পাইয়াছিল। তিনি জীবিত থাকিতেই গ্রন্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। কাব্যখানি দশটী সর্গে বিভক্ত, যথা—উপহার, নারীবন্দনা, সুরবালা, চিরপরাধীনী, করুণাসুন্দরী, বিষাদিনী, প্রিয়সখী, বিরহিণী, প্রিয়তমা এবং অভাগিনী।

'উপহার' সর্গটীর কিয়দংশ ১২৭৪ সালের 'অবোধ-বন্ধু'তে 'প্রিয়সখা' নামে প্রকাশিত হয়।

'চিরপরাধীনী' ১২৭৪ সালের 'অবোধবন্ধু'তে 'পরাধীনা বঙ্গকন্যা' নামে প্রকাশিত হয়। 'করুণাসুন্দরী' ১২৭৪ সালের 'অবোধবন্ধু'তে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গসুন্দরী' বর্ত্তমান আকারে ১২৭৬ সালের 'অবোধবন্ধু'তে প্রকাশিত হয়। 'উপহার'টী কবির বাল্যবন্ধু আচার্য্য কৃষ্ণকমলকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত। উহা কবির প্রগাঢ় বন্ধু-প্রীতির পরিচয় দেয়—

প্রিয়তম সখা সহৃদয় !
প্রভাতের অরুণ উদয়,
হেরিলে তোমার পানে,
তৃপ্তি দীপ্তি আসে প্রাণে,
মনের তিমির দূর হয়।

আহা কিবে প্রসন্ন বদন !
তারা যেন জলে দুনয়ন :
উদার হৃদয়াকাশে,
বুদ্ধি বিভাকর ভাসে,
স্পষ্ট যেন করি দরশন।

অমায়িক তোমার অন্তর,
সুগম্ভীর সুধার সাগর,
নির্ম্মল লহরী মালে,
প্রেমের প্রতিমা খেলে,
জলে যেন দোলে সুধাকর।

সুধাময় প্রণয় তোমার,
জুড়াবার স্থান হে আমার ;
তব স্নিগ্ধ কলেবরে,
আলিঙ্গন দিলে পরে,
উলে যায় হৃদয়ের ভার।

যখন তোমার কাছে যাই,
যেন তাই স্বর্গ হাতে পাই ;
অতুল আনন্দ ভরে,
মুখে কত কথা সরে,
আমি যেন সেই আর নাই।
ইত্যাদি—

'নারী-বন্দনা'টি অতি সুন্দর। আচার্য্য কৃষ্ণকমল বলেন, "'নারী-বন্দনা' কবিতাটী ব্যক্তিবিশেষমূলক নহে। সর্ব্বসাধারণ্যে নারীমাত্রের প্রতি এই বন্দনা সঙ্গত হইবে। আমার মনে হয় যে, কোঁৎ (Comte) যদি এইটী পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ধ্রুবধর্ম্মের গাথাসমূহমধ্যে (hymns) ইহাকে তিনি সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে অগ্রসর হইতেন।" বাস্তবিক সাহিত্যে এরূপ সুন্দর নারী-বন্দনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না—

জগতের তুমি জীবিত-রূপিনী,
জগতের হিতে সতত রতা ;
পুণ্য-তপোবন-সরলা-হরিণী,
বিজন-কানন কুসুম-লতা।

পুরণিমা-চারু চাঁদের কিরণ,
নিশার নীহার, উষার আলা,
প্রভাতের ধীর শীতল পবন,
গগনের নব-নীরদ-মালা।

প্রেমের প্রতিমা, স্নেহের সাগর,
করুণা নির্ঝর, দয়ার নদী,
হ'ত মরুময় সব চরাচর,
না থাকিতে তুমি জগতে যদি।

* * * *

কোলে শুয়ে শিশু ঘুমায়ে ঘুমায়ে
আধ আধ কিবা মধুর হাসে!
স্নেহে তার পানে তাকায়ে তাকায়ে,
নয়নের জলে জননী ভাসে।

যদি এই তব হৃদয়ের ধন,
আচম্বিতে আজি হারায়ে যায় ;
ঘোর অন্ধকার হের ত্রিভুবন,
আকাশ ভাজিয়ে পড়ে মাথায়।

এলোকেশে ধাও পাগলিনী প্রায়,
চেয়ে পথে পথে বিহ্বল মনে,
খুঁজি পাতি পাতি না পেলে বাছায়
কাঁদিয়ে বেড়াও গহন-বনে।

* * * *

হৃদয় তোমার কুসুম কানন,
কত মনোহর কুসুম তায়,
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন,
কেমন পবন সুবাস বায়!

* * * *

অমায়িক দুটি সরল নয়ন,
প্রেমের কিরণ উজল তায়,
নিশান্তের শুক-তারার মতন,
কেমন বিমল দীপতি পায়।

* * * *

দুখীর বালক ধূলায় ধূসর
ক্ষুধায় আতুর মলিন মুখ,
ডাকিয়া বসাও কোলের উপর,
আঁচলে মুছাও আনন বুক!

পরম-করুণ জননীর মত,
ক্ষীর সর ছানা নবনী আনি
মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত,
গায়েতে বুলাও কোমল পাণি।

* * * *

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার সরল মন,
মধুর তোমার চরিত উদার,
মধুর তোমার প্রণয়ধন

সে মধুর ধন ধরে যেই জনে,
অতি সুমধুর কপাল তার ;
ঘরে বসি করে পায় ত্রিভুবনে,
কিছুরি অভাব থাকে না আর।

স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় একস্থানে লিখিয়াছেন — "রমণীকে অনেকেই, অনেকেই কেন, সকলেই সচরাচর দেবী বলে, কিন্তু দেবী বলিয়া অর্চনা, আরাধনা, প্রকৃত প্রস্তাবে দেবীবৎ ব্যবহার তাঁহাকে কয়জন লোকে করিয়া থাকে ; এ পাপ পৃথিবীতে একাল পর্য্যন্ত ছোট বড় কয়জন লোকে করিয়াছেন ? অস্মদ্দেশীয় আর্য্য শাস্ত্রে নারী-পূজার ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু পূজকের পবিত্রতা এবং আন্তরিকতার অভাবে তাহার আধ্যাত্মিকতা নষ্ট হইয়া, সে ব্যবস্থা ক্রমে কৃত্রিম, প্রাণশূন্য এবং শুষ্ক লোকাচারে, কিম্বা জঘন্য বিকৃত ব্যভিচারে পরিণত হইয়াছিল — পরিণত হইয়াই আছে। পরন্তু পাশ্চাত্য ভূমে প্লেতো রমণী-পূজার প্রবর্ত্তক। পরবর্ত্তী কালে মহাত্মা অগস্ত কোমৎ এ পূজার আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠাতা। মহামনস্বী জন্ ইুয়ার্ট মিলেও আমরা এই অনুরক্তির আভাস পাই। ইঁহারা সকলেই দার্শনিক। * * বৈষ্ণব কবি-সম্প্রদায় এবং শাক্ত কবিদিগের কেহ কেহ বটে, রমণী-মাহাত্ম্য অনেক বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সুরলোকের আদর্শ বা অবতার রূপিণী দেবীমাহাত্ম্যের বিবৃতি মাত্র, কচিৎ আন্তরিক অনুভূতিই বটে। * * পক্ষান্তরে কালিদাস হইতে একালের কালাচাঁদ পর্য্যন্ত সকলেই কেবল রমণীর রূপ-বর্ণনা ও রমণীকে লইয়া কষ্টি-নষ্টি মাত্র করিয়াছেন। * * পাশ্চাত্য কবিদিগের মধ্যেও প্রায় এই ভাব। রমণী সমাজের সাহায্যানুকল্পে শেলীর সুনাম আছে বটে, কিন্তু সুনামের সহিত দুর্নামও জড়িত। অতএব কিঞ্চিৎ আত্মগর্ব্ব প্রকাশিত হইলেও আমরা সত্যের খাতিরে বলিতে পারি যে, আমাদের এই অধঃপাতিত বাঙ্গালী জাতির আধুনিক কালের বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে এমন দুইটি কবি জন্মিয়াছিলেন, যাঁহাদের অকৃত্রিম কাব্যোচ্ছ্বাস রমণী-মাহাত্ম্যমূলক এবং সে উচ্ছ্বাস করুণ, অকৃত্রিম, মর্ম্মস্পর্শী ও সার্ব্বভৌমিক।"

ঠাকুরদাস যে দুইজন কবির উল্লেখ করিয়াছেন তন্মধ্যে 'মহিলা'র কবি সুরেন্দ্রনাথ বিহারীলালের পরে সাহিত্যক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। 'বঙ্গসুন্দরী'র সমালোচন-

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি-আই-ই

প্রসঙ্গে ভূদেব মুখোপাধ্যায় যে ইঙ্গিত করেন সেই ইঙ্গিত অনুসারেই 'মহিলা' রচিত হয়। তবে একথা স্মরণ রাখা উচিত সীতা-সাবিত্রীর দেশে নারীকে দেবীরূপে পূজা করার কোন নূতন আদর্শ উপস্থিত করা হয় নাই এবং বাঙ্গালা সাহিত্যেও বিহারীলালের অব্যবহিত

পূর্ব্ববর্ত্তী কবি রঙ্গলাল সতী রমণীগণের পুণ্যোজ্জ্বলা দেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

'বঙ্গসুন্দরী'র অনেকগুলি সর্গ — যথা সুরবালা, অভাগিনী, চিরপরাধীনী প্রভৃতি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত এবং এখনও অনেকে ঘটনাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জানেন। 'প্রিয়তমা' শীর্ষক সর্গটী তাঁহার পত্নী কাদম্বিনীকে অবলম্বন করিয়াই কবি লিখিয়াছিলেন, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত, সি-আই-ই

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া আমরা ইচ্ছা-সত্ত্বেও এই কাব্যের মাধুরী বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে ক্ষান্ত হইলাম। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন, "এত মিষ্ট কবিতা আমি কখন পড়ি নাই। তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী' প্রত্যেক শিক্ষিতা রমণীর পাঠ করা উচিত। উহা পাঠ করিলে পুরুষেরও মন গলিয়া যায়। রমণীর মন অতি রমণীয় হইয়া উঠিবে তাহাতে কি সন্দেহ আছে?" মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তও ইহার সমুচিত সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছেন —

"Beharilal Chakrabarti's *Banga Sundari* and other poems display power and feeling."

'বন্ধু-বিয়োগ', ১৮৭০

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিহারীলালের 'বন্ধু-বিয়োগ' ও 'প্রেমপ্রবাহিনী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে 'বন্ধু-বিয়োগ' কাব্যখানি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইলেও উহা রচিত হইয়াছিল ১৮৫৯

ডাক্তার রায় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর

খৃষ্টাব্দে, তাঁহার প্রথমা সহধর্ম্মিণীর স্বর্গারোহণের অল্প-দিন পরেই। কবি তাঁহার "মাননীয় মিত্র শ্রীযুক্ত সূর্য্য-কুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের করকমলে উপহার-স্বরূপ এই কাব্য প্রীতিপূর্ব্বক সমর্পণ করেন।" বোধ হয় আচার্য্য কৃষ্ণকমলের মধ্যবর্ত্তিতায় সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সহিত বিহারীলালের প্রথম পরিচয় সংঘটিত হয়। সূর্য্যকুমার ও তদীয় অগ্রজ প্রসন্নকুমার কাব্যপ্রিয় ও মাতৃভাষানুরাগী ছিলেন, এই জন্য কবিবরের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে।

'বন্ধু-বিয়োগ' কাব্যের নামেই উহার উদ্দেশ্য প্রকাশ পাইয়াছে। কয়েকজন বন্ধুর অকালবিয়োগে কবি নিরতিশয় শোকসন্তপ্ত হন এবং শোকের এই আবেগেই কাব্যখানি রচিত হয়। শোকের পবিত্র উচ্ছ্বাসে অনেক প্রসিদ্ধ কবির কাব্যের উৎস উন্মুক্ত হইয়াছে। মহাকবি মিল্টনের Lycidas, শেলীর Adonais, টেনিসনের In Memoriam এবং ম্যাথু আর্ণল্ডের Thyrsis শোকের আবেগেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষোক্ত কাব্যগুলি যেমন সাহিত্যে অমর হইয়া গিয়াছে, বিহারীলালের তরুণ বয়সের রচনায় সেইরূপ অমরতা-লাভের উপযুক্ত গুণ-সন্নিবেশ দেখা যায় না। কাব্যখানিতে লক্ষ্য করিবার বিষয় একটি—তাহা কবির অনন্যসাধারণ বন্ধু-প্রীতি ও পত্নীপ্রেম। উহাতে তাঁহার পূর্ণ, বিজয়,* কৈলাস ও রামচন্দ্র নামক চারিজন শৈশব-সহচর ও তাঁহার প্রথমা পত্নীর বিয়োগে তিনি যে শোক অনুভব করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক পংক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। বন্ধুগণ কেহই বিখ্যাত পুরুষ নহেন কিন্তু কবি তাঁহার হৃদয়ে ইঁহাদের স্মৃতি যে কত উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রাখিয়াছিলেন তাহা কাব্যপাঠে বুঝা যায়। এবং একাদশ বৎসর পরে এই কাব্য প্রকাশের সময়েও যে তাঁহার প্রথমা পত্নীর স্মৃতি হৃদয়ে কি ভাবে জাগরূক ছিল তাহারও পরিচয় পাই। এই কাব্যের আর একটি মূল্য আছে। তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুগণের যে সকল সদ্‌গুণের তিনি সমুচিত প্রশংসা করিয়াছেন, কবিও সেই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন, এবং উহার অনেক স্থল আত্মচরিতের ন্যায় মূল্যবান্। যথা—

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী

মাতৃভাষানুরাগ —

জননী জনমভূমি সম মাতৃভাষা,
যত কিছু মঙ্গলের তাঁর প্রতি আশা।

* ইনি মুর্শিদাবাদের নবাবের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান, শোভাবাজার রাজবংশীয় প্রসন্ননারায়ণ দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

তাঁহার মঙ্গলে হবে দেশের মঙ্গল,
তাঁর অমঙ্গলে হবে দেশে অমঙ্গল।
যত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হইবে সঞ্চার,
যত তাঁর আলোচনা হইবে প্রচার ;
ততই প্রবোধ-সূর্য্য হইবে উদয়,
ততই জনমভূমি হবে আলোময়।
এই তত্ত্ব, সার তুমি বুঝেছিলে রাম,
মাতৃভাষা সাধনা করিতে অবিশ্রাম।
কৃত্তি, কাশী, ভারত, মুকুন্দ মহাকবি,
এঁকেছেন যে সকল মনোহর ছবি,
সে গুলি তোমার ছিল নয়নে নয়নে,
বাণী যেন বিহরেণ কমল কাননে।
সাগর সম্ভূত রত্ন, অক্ষয় ভাণ্ডার,
কেহ বলে অপরূপ, কেহ কদাকার,
কিন্তু তুমি কর নাই কিছু অযতন,
বঙ্গের সকলি তব আদরের ধন।
বাঙ্গালা পুস্তকে ছিল অত্যন্ত মমতা,
দুর্দ্দশা দেখিলে তার বুকে পেতে ব্যথা।
ধূলা ঝেড়ে, কোলে ক'রে হ'তে হরষিত,
ছেলে কোলে করে যেন পিতা প্রফুল্লিত।

স্ত্রীজাতির উন্নতি কামনা—

স্বদেশের নারীদের অদৃষ্টের দোষে,
পড়েছে তাহারা সবে বাগ্‌দেবীর রোষে।
মূর্খতা-তিমিরে মন ঘোর অন্ধকার,
চারিদিকে ভ্রান্তি-সিন্ধু অকূল পাথার।
দ্বেষ হিংসা কলহের তরঙ্গ ভীষণ,
উদ্বেগ সন্তাপ বহে প্রচণ্ড পবন,
ঘোরতর অস্তগত বিজ্ঞান মিহির,
কি কর্ত্তব্য, কি করিছে, কিছু নাই স্থির !
সে দিন, কি শুভদিন হইবে উদয়,
যেদিনে তাদের মন, হবে আলোময়।
একেবারে নিবে যাবে কচ্‌কচি কলহ,
পরিবারে পরস্পরে হবে প্রীতি স্নেহ।
সকলেই সকলের হিতে দিবে মন,
অহিতের প্রতীকারে করিবে যতন।
সকলেরই মুখে হাসি খুসি মন প্রাণ,
মহানন্দে সারদার গাবে গুণগান।
কোথাও ললিত বালা অচল নয়নে,
নত মুখে শিল্প-কর্ম্মে আছে এক মনে।
কোথাও জননী লয়ে কুমারী কুমার,
শিখান সহজে কত কথা সার সার।
কোথাও যুবতী সতী প্রাণপতি সনে,
আছেন কবিতামৃত রস আস্বাদনে।
বিনোদিনী বিদ্যার হইলে অধিষ্ঠান,
আহা সেই স্থান কি যে হয় শোভমান!
যে দিন কল্পনা পথে করি বিলোকন,
পরম আনন্দে আমি হতেছি মগন ;
সে দিনে তোমার ছিল সবিশেষ লক্ষ্য,
তার অনুষ্ঠানে হতে সর্ব্বথা স্বপক্ষ।

ইত্যাদি পত্নীস্মৃতির কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

অকালবোধন

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

উপেন্দ্রনাথ নাম। মেসের সকলেই তাহাকে উপীনদা' বলিয়া ডাকে। বয়স প্রায় চল্লিশ।

তা দাদা হইবার বয়স বটে!

তাহার চেয়ে বয়সে বড় মেসে আর কেহ নাই। একজন ছিলেন, পুরা সাত বছর এখানে থাকিয়া এই সেদিন তিনি মেয়েছেলে আনিয়া আলাদা বাসা করিয়াছেন।

সুতরাং বর্ত্তমানে ওই উপীনদা'ই আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ।

কিন্তু উপীনদা' বলে, 'বয়োজ্যেষ্ঠ না ছাই! বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত মেসে-হোটেলে কাটাতে ত' আর পারি না দাদা! এবার যা-থাকে কপালে — একটা বাসা করব।'

অথচ তিন-চারটি ছেলেমেয়ে, স্ত্রীর স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়, আপিসে বেতন যাহা পায় তাহাতে সকলকে কলিকাতায় আনিয়া আলাদা বাসা করিয়া থাকা তাহার পক্ষে কঠিন। কাজেই সে দুঃখ তাহার চিরকালের।

বেশি ভাড়া দিতে পারে না বলিয়া মেসের নীচের তলায় ছোট্ট একটি ঘরের মধ্যে থাকে আমাদের উপীনদা' আর ব্যোমকেশ।

উপীনদা' বলে, 'তোর জ্বালায় আমাকে এ-ঘর ছেড়ে পালাতে হবে দেখছি।'

ব্যোমকেশ বলে, 'কেন উপীনদা'?'

উপীনদা' তাহার বিছানায় শুইয়া ঘুমাইবার জন্য বৃথাই এ-পাশ ও-পাশ করিতে থাকে, ঘুম আর তাহার কিছুতেই আসে না। বলে, 'কেন আবার! চোখের সুমুখে আলো জেলে রাখলে ঘুম আমার হয় না ব্যোমকেশ!'

ইলেক্‌ট্রিকের আলো জ্বালিয়া রাখিয়া রাত্রি প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত ব্যোমকেশ কি যে লেখে কে জানে। বলে, 'এই যে দাদা, আর এই একটুখানি ··· আমার এই হ'য়ে গেল।'

উপীনদা' বলে, 'এত রাত পর্য্যন্ত এক-একদিন তুই কি লিখিস বল দেখি?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলে, 'বুঝতে পার না উপীনদা'?'

উপীনদা' বলে, 'পারি কিছু-কিছু। কাব্যি রোগে ধরেছে হয়ত'। তা ছাপা-টাপা হলো দু'একটা, না অমনি লিখেই চলেছিস?'

ব্যোমকেশ হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে। 'বলতে পারলে না উপীনদা', কবিতা লিখি না, বৌকে চিঠি লিখি।'

'ও ওই একই কথা।' বলিয়া উপীনদা' পাশ ফিরিয়া শোয়।—'যাই হোক্ ভাই একটু তাড়াতাড়ি শেষ কর্।'

দিন কতক পরে—আবার!

ব্যোমকেশ আবার তেমনি আলো জ্বালিয়া বৌকে তাহার চিঠি লিখিতেছিল, উপীনদা' বলিল, 'আজ আবার আরম্ভ করেছিস দেখছি। এই যে সেদিন লিখলি রে!'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি বুড়ো হয়ে গেছ উপীনদা', তুমি কি বুঝবে বল। সপ্তাহে একখানি ক'রে চিঠি — তা-ও লিখব না?'

উপীনদা' কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'এত কথা — কি লিখিস বল দেখি?'

'শুনবে উপীনদা'? কি লিখলাম শুনবে?'

'পড়্ না! শুনি।'

ব্যোমকেশ পড়িল।

পড়া শেষ হইলে উপীনদা' বলিল, 'আর—সে কি জবাব দিয়েছে শুনি?'

'তা-ও শুনবে? আচ্ছা শোনো।' বলিয়া ব্যোমকেশ তাহার স্ত্রীর চিঠিখানিও পড়িয়া শুনাইল।

উপীনদা' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'হুঁ।'

'কি রকম শুনলে উপীনদা'?'

উপীনদা' নিরুত্তর।

'উপীনদা' ঘুমোলে নাকি?'

উপীনদা' বলিল, 'না।'

'কি রকম শুনলে?'

'বেশ।'

উপীনদা'র স্ত্রী আশালতা — তিন-চারটি ছেলে-মেয়ের মা, নিতান্ত প্রয়োজন হইলে একখানা পোষ্টকার্ড কিনিয়া উপীনদা'কে দু'চার লাইন হয়ত' লিখিয়া পাঠায়। জবাবে উপীনদা'ও ঠিক তেমনি করিয়া একখানা পোষ্টকার্ডে মাত্র কাজের কথা-কয়টির জবাব লিখিয়া দেয়, আবার কখনও-বা আলসে-কুঁড়েমির জন্য তাহাও হইয়া ওঠে না। 'প্রিয়তম' 'প্রাণেশ্বর' বলিয়া খামে চিঠি লেখা বহুদিন তাহাদের বন্ধ হইয়াছে।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, এতদিন পরে হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে উপীনদা'র কাছ হইতে শ্রীমতী আশালতার কাছে রঙিন্ একখানি খামের চিঠি গিয়া হাজির! খামখানি রঙিন, চিঠির কাগজখানি রঙিন্ এবং সেই চিঠির কাগজের এক কোণে একটি গোলাপফুলের ছবি আঁকা! তাহা ছাড়া যাহা লিখিয়াছে সেকথা আর বলিবার নয়। বিগত যৌবনের সেই 'প্রাণেশ্বরী' সম্বোধন, অজস্র চুম্বন-নিবেদন — এবং আরও কত কি!

আশালতা ভাবিল, এ ক্ষেপিল না কি? তবু তাহার মন্দ লাগিল না। লুকাইয়া লুকাইয়া চিঠিখানি সে যে কতবার পড়িল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আবার সেই পুরানো দিনের হারানো স্মৃতি তাহার ফিরিয়া আসিল। অনেক দিনের অনেক কথাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

রাত্রে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াইয়া আশালতা তাহার বাক্স খুলিল। অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া জিনিস-পত্র ফেলাইয়া ছড়াইয়া বহু পুরাতন একখানি চিঠির কাগজ বাহির করিয়া আলোর কাছে গিয়া সে চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠির কাগজখানি পুরাতন হইলেও ভালো। একটা জায়গায় মাত্র একটুখানি তেল পড়িয়া গেছে। তা পড়ুক। আশালতা শুঁকিয়া দেখিল — সুগন্ধ তেল, বেশ খোসবুয় ছাড়িতেছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একবার চোখ বুজিয়া, একবার চোখ চাহিয়া দোয়াতের ভিতর কলমটা বেশ ভাল করিয়া বারকতক ডুবাইয়া লইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া শুইয়া সে চিঠি লিখিতে লাগিল।

লেখা যখন শেষ হইল পল্লীগ্রামের নিশুতি রাত্রি তখন চারিদিকে থম্ থম্ করিতেছে, চৌকিদার অনেকক্ষণ ডাক দিয়া চলিয়া গেছে। খোলা জানালার বাহিরে শুভ্র সুন্দর চাঁদের আলো। আশালতা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া সেইদিক পানে তাকাইয়া রহিল। বীরভূমের শুষ্ক রুক্ষ প্রান্তর—নিস্তব্ধ নিদাঘ-রাত্রির নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত হইয়া এমন করিয়া কোনোদিনই তাহার চোখে ধরা পড়ে নাই। বাড়ীর পাশে বুড়া আমগাছটার মুকুলগুলা ঝরিয়া গিয়া ইহারই মধ্যে ছোট ছোট কচি আমের গুটি ধরিয়াছে। আর তাহারই কাছে কলমীলতায় ঢাকা পুকুরটার মাঝখানে ঠিক তাহারই মত একাকিনী একটি ঊর্দ্ধমুখী রক্ত শালুকের ফুল একাগ্রদৃষ্টিতে যেন চাঁদের দিকে তাকাইয়া আছে।

আশালতা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চিঠিখানি তাহার আর-একবার পড়িল। দু'একটা বানান ভুল হইয়াছিল, সেগুলা সংশোধন করিল। বহুদিনের অনভ্যাসের দরুণ এমন একটা কথা লিখিয়া ফেলিয়াছিল যাহা পড়িয়া এ বয়সে তাহার নিজেরই লজ্জা করিতে লাগিল; তাই সে আপনি মনেই ঈষৎ হাসিয়া কথাটা কাটিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিল, তাহার পর নিজের মাথার একগাছি চুল ছিঁড়িয়া খামের ভিতর পুরিয়া জল দিয়া খামখানি বন্ধ করিয়া, হাত বাড়াইয়া আলোটা নিভাইয়া শুইয়া পড়িল।

এমনি করিয়া স্বামী-স্ত্রীর চিঠিপত্র চলিতে থাকে। ওদিক্ হইতে আসে, আবার এদিক্ হইতে যায়। মনে হয় যেন বুড়া বয়সে তাহাদের বিগত যৌবনের বিস্মৃত উচ্ছ্বাস আবার একবার নূতন করিয়া উথলিয়া উঠিয়াছে।

তবে ন'দশ বছরের বড় মেয়েটা পিওনের কাছ হইতে তাহার বাবার চিঠিখানি আনিয়া যখন আশালতার হাতে দিয়া বলে, 'মা, কার চিঠি?' আশালতা তখন লজ্জায় যেন মরিয়া যায়। বলে, 'যারই হোক্ না, তোর কি!'

মেয়েটা ভয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না।

অনেক কথার পর উপীনদা' এবার লিখিয়াছে —

আমার বড় ইচ্ছা করে, বিয়ের পর আমরা দু'জনে যেমন আনন্দে কাটাইয়াছি আবার একবার তেমনি করিয়া দিন কাটাই। তেমনি করিয়া তোমাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা করে, তোমার ভালবাসা পাইতেও ইচ্ছা করে। সেইজন্ত আমি এক মতলব স্থির করিয়াছি — অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য তোমায় আমি একবার এখানে লইয়া আসিব। ছেলেমেয়েরা সঙ্গে থাকিলে বড়ই বিরক্ত করিবে, তাই তাহাদের সকলকেই মায়ের কাছে রাখিয়া একা তোমাকে আসিতে হইবে। তাহারা সকলেই বড় হইয়াছে, এখন তাহারা তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবে। এই মাসের বেতন পাইলেই আমি তোমাকে আনিতে যাইব। এখানে বাড়ীভাড়া করিতে হইবে না, খাবার খরচও লাগিবে না। কারণ আমার এক বন্ধুকে বলিয়া রাখিয়াছি। কিছুদিনের জন্ত সে তাহার বাড়ীর একখানি ঘর আমাদের জন্ত ছাড়িয়া দিতে রাজি হইয়াছে। তাহার বাড়ীতে খাবার বন্দোবস্তও করিয়াছি। তোমার কি ইচ্ছা আমায় জানাইও।

চিঠিখানি পড়িয়া আশালতা সেদিন আর রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিল না। সেইদিনই বৈকালে তাহার জবাব লিখিতে বসিল।

লিখিল—ইহাতে তাহার অমত নাই।

ছেলেমেয়েদের গ্রামে রাখিয়া আশালতা শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতায় আসিয়াছে। তাহার আর আনন্দের সীমা নাই।

উপীনদা'রই কি কম আনন্দ! আপিসে তাহার যে পনেরোটি দিনের ছুটি পাওনা ছিল তাহা সে মঞ্জুর করিয়া লইয়াছে। বন্ধুর বাড়ীখানিও চমৎকার। বন্ধু আর বন্ধুর স্ত্রী। ছেলেপুলে হয় নাই। লোকজনের ঝঞ্ঝাট এক রকম নাই বলিলেই হয়।

প্রথম দিন সকাল-সকাল চারটি খাওয়া-দাওয়া সারিয়া আশালতাকে সঙ্গে লইয়া উপীনদা' বাহির হইয়া পড়িল। আশালতা কখনও কলিকাতার শহর দেখে নাই। তাই তাহারা খানিক হাঁটিয়া, খানিক ট্রামে চড়িয়া, খানিক বাসে চড়িয়া শহর দেখিয়া বেড়াইল। তাহার পর বৈকালে একবার গড়ের মাঠে ঘুরিয়া, হাসিয়া, গল্প করিয়া, টকি-বায়োস্কোপ দেখিয়া রাত্রে বাসায় ফিরিল। প্রতিজ্ঞা করিল — আজ তাহারা রাত্রে আর ঘুমাইবে না। আগে যেমন যা' তা' গল্প করিয়া হাসিয়া ভালবাসিয়া এক-একদিন সারারাত্রি জাগিয়া থাকিত আজও ঠিক তেমনি করিয়া নিশি যাপন করিবে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা রক্ষা তাহাদের আর হইয়া উঠিল না। আরম্ভ করিয়াছিল খুব তোড়-জোড় করিয়া, কিন্তু রাত্রি একটা পার হইতে না হইতেই কোথা হইতে সর্ব্বনাশা ঘুম আসিয়া তাহাদের এমন ভাবে আক্রমণ করিল — কখন্ যে তাহাদের কথা জড়াইয়া আসিয়াছে, কখন্ যে তাহারা চুপ করিয়াছে এবং তাহার পর হঠাৎ কোন্ সময় যে তাহারা ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, কেহ কিছুই বুঝিতে পারে নাই। পারিল যখন তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে। এ উহার মুখের পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কাছে আগাইয়া আসিল।

উপীনদা' বলিল, 'এ কি রকম হ'লো বল দেখি?'

আশালতা বলিল, 'অনেকদিন অভ্যেস নেই কি না, রাত জাগা অভ্যেসের কাজ।'

ভাল কথা। পরদিন — আবার!

সেদিন তাহারা পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, জিনিসপত্র কিনিবে, থিয়েটার দেখিবে।

আশালতার কোনও সাধই উপীনদা' সেদিন অপূর্ণ রাখিল না, সে যাহা চাহিল তাহাই কিনিয়া দিল, তাহার পর থিয়েটার দেখিয়া জিনিসপত্র লইয়া গাড়ী করিয়া বাড়ী যখন তাহারা ফিরিল, রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে।

আহারাদির পর শুইতে গিয়া উপীনদা' দেখিল, দু'দিন ধরিয়া ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া পা দু'টা তাহার রীতিমত ব্যথা করিতেছে। বলিল, 'পা দু'টো কই টিপে দাও দেখি, সেই আগে যেমন দিতে।'

আশালতা স্বামীর পা টিপিতে বসিল। বলিল, 'ছাখো, টুনীর একখানি রঙিন্ শাড়ী কিনলে হ'তো।'

উপীনদা' বলিল, 'কাল কিনে দেবো।'

'আর ছাখো, বুটি-তোলা কাপড়ের সাধ আমার কতদিনের। সবই যখন হ'লো, কাল একখানি দিয়ো বাপু কিনে।'

ঘাড় নাড়িয়া উপীনদা' বলিল, 'দেবো।'

তাহার পর দু'জনেই চুপ।

আশালতা বলিল, 'হ্যাঁগা, এত এত টাকা যে খরচ করছ, পাচ্ছ কোথায়? মাইনের টাকা?'

অন্যমনস্কের মত কি যেন ভাবিতে ভাবিতে উপীনদা' বলিল, 'হুঁ।'

'তবে এই যে বল মাইনের টাকা থেকে তুমি এক পয়সাও বাজে খরচ করতে পার না!'

উপীনদা'র ঘুম পাইতেছিল, সহসা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, 'না না, তা ত' পারি না। আপিস থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছি।'

আশালতার চোখ দুইটা যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! — 'ধার! ধার ক'রে ফুর্ত্তি ওড়াচ্ছ? তারপর এই ধারের টাকা তোমার মাইনে থেকে মাসে মাসে কেটে নেবে ত'?'

'হ্যাঁ, তা নেবে। তা নিক্ না। কেমন আনন্দ হলো বল দেখি?'

উপীনদা'র একটা পা আশালতা তাহার কোলের উপর তুলিয়া লইয়াছিল, সেটা সে টিপ্ করিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল, 'আনন্দ হ'লো না আমার মুণ্ডু হ'লো! টাকা ধার ক'রে এমন আনন্দ আমি চাই না।—ছি ছি ছি ছি, তিন চারটে ছেলের বাপ হলে, তোমার কি আক্কেল-বুদ্ধি কিছুই হ'লো না গা!'

এই বলিয়া সে রাগিয়া একেবারে টং হইয়া তাহার বিছানার একপাশে পিছন্ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন সকালে উঠিয়া উপীনদা' দেখিল, আশালতা তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ডাকিলে সাড়া দেয় না। মুখখানা ভারি।

আশালতার স্বভাব উপীনদা' জানে। বেশি কিছু বলিতে গেলেই এখনই হয়ত' সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিবে। তাহার চেয়ে চুপ করিয়া থাকাই ভালো।

তাহারও সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা। ঘুরিয়া ঘুরিয়া শরীরটা যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

দুপুরে আহারাদির পর উপীনদা' সেদিন বেশ এক ঘুম ঘুমাইয়া লইল। বৈকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই দেখিল, আশালতা বাক্স খুলিয়া তাহার সুমুখে, হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া জিনিষপত্র ভাল করিয়া সাজাইয়া রাখিতেছে।

উপীনদা' একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তা'হলে কি আজ এই ছ'টার ট্রেণেই যাবে?'

শুধু ঘাড় নাড়িয়া আশালতা বলিল, 'হুঁ।'

'সেই ভালো।' বলিয়া উপীনদা' উঠিয়া দাঁড়াইল। 'আর সময় নেই। আমি গাড়ী ডাকতে চললাম।'

বলিয়া উপীনদা' সত্যই একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনিল।

বন্ধু বলিল, 'সে কি হে! পনেরো দিন থাকবার কথা, এরই মধ্যে চললে? এখনও যে তোমাদের কিছুই দেখা হ'লো না।'

ঘাড় নাড়িয়া উপীনদা' বলিল, 'হ্যাঁ ভাই চললাম।' মনে-মনে বলিল, 'দেখবার নিকুচি করেছে!'

এই বলিয়া তাহারা দুই স্বামী-স্ত্রী গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

উপীনদা' 'মেসে' ফিরিয়াছে। রাত্রে সেদিন আবার আলো আলিয়া ব্যোমকেশ চিঠি লিখিতেছিল। বলিল, 'কই আজ যে কিছু বলছ না উপীনদা'?'

উপীনদা' চুপ করিয়া রহিল।

'চিঠিখানা পড়ব উপীনদা', শুনবে?'

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উপীনদা' বলিল 'না, থাক্ ভাই, আমরা বুড়ো হয়ে গেছি।'

বলিয়া সে আলোর দিকে পিছন ফিরিয়া চোখ বুজিয়া জোর করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

সর্ব্বজয়া

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

শেফালীর ডালে শীতের জড়িমা, কুহেলিতে ভরা প্রাণ,
শরত প্রাতের সব সমারোহ হ'য়ে গেছে অবসান।
স্থলপদ্মের কুঁড়িটি কাঁপিছে, আড়ষ্ট তার বুক,
মৌমাছি আর তাহারে ঘিরিয়া করে নাকো কৌতুক।
মল্লীমালতী মুখ লুকায়েছে শ্যামল পাতার ফাঁকে,
গন্ধরাজেরা গন্ধ বিলাতে দখিনারে নাহি ডাকে।
শীতের ভয়েতে ফুলবনে আর ফুল-কলি নাহি ফুটে,
জরার কাঁপনে নীরবে গোপনে প্রাণ গুমরিয়া উঠে।
এমন সময়ে সর্ব্বজয়ার শিহরি' উঠিল ডাল,
অসময়ে আজ ডাক এলো তার —লজ্জায় তাই লাল।
কাননের কোণে কাটায়েছে কাল সুগোপন নিরালায়,
শরতের শুভ মুহূর্ত্ত তার ব্যর্থ হয়েছে হায়!
রজনীগন্ধা সৃষ্টির সুখে কতো না গর্ব্বভরে
তাহার বুকের বন্ধ্যা-দশারে গেছে ইঙ্গিত ক'রে।
ঊষর বক্ষে তখন তাহার ভরিয়া উঠেছে ব্যথা—
সৃষ্টির লাগি' সারা বুক জুড়ে ছিল কত ব্যাকুলতা!
সেদিন সে কেন ফুটিতে পারে নি যেদিন কানন ঘিরে
পুষ্পবিলাসী এসে পুনরায় চলিয়া গিয়াছে ফিরে।

বেশী ত' চাহে নি কিছু,
সেও চেয়েছিল ফুটিয়া উঠিতে সকলের পিছু পিছু।
আজিকে যখন ডাক এলো তার, হয়ে গেলো অসময়,
নিরালা কাননে একেলা এখন কেমনে সে জেগে রয়!
মৌমাছি আর কুঞ্জে আসে না, ভ্রমর ভুলেছে পথ;
মলয় পরশে বারেকো তাহার পুরিবে না মনোরথ?
সকলে তাহারে একেলা ফেলিয়া লুকিয়ে ব্যঙ্গ করে,
অসময়ে এসে এতো অসহায়, কেমনে সে প্রাণ ধরে?
গোলাপের মত সুবাস তাহার নেই, ভালো ক'রে জানে,
রূপের গরিমা গোপনেও কভু জাগে নি কো তার প্রাণে।
শুধু এতো কাল কামনা করেছে দেবতার পায় ধরি'
তাহার বুকের বন্ধ্যা এ দশা নিয়ে যান্ তিনি হরি'।

আর কিছু চাহে নি সে,
শুধু একবার ফুটিতে চেয়েছে সকলের সাথে মিশে।
তাহার বুকের এতো তপস্যা,—এই বুঝি তার ফল,
সারা কাননের উপহাস সহি' কাঁদিবে সে অবিরল?
সময়ে যখন এলো না তখন অসময়ে কেন এলো,
একেলা কাননে সর্ব্বজয়া যে লজ্জায় ম'রে গেলো।

দ্বীপময় ভারতের সভ্যতায় বাঙালীর দান

শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার, এম্-এ

চম্পা, কম্বোজ, জাভা এবং মালয় উপদ্বীপের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ক্রমেই এই ধারণা মনে বদ্ধমূল হইতেছে যে, বাঙালীরা সত্যসত্যই আত্মবিস্মৃত জাতি। ভারতের এবং বহির্ভারতের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপাদানসমূহ হইতে বোধ হইতেছে যে, একদা এসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব মহাসাগর বাঙালীদের চালিত সহস্র সহস্র নৌকায় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত এবং তাহাদের বাণিজ্যের বৈজয়ন্তী মধ্যজাভা, মজপহিত, মালয় উপদ্বীপের ওয়েলেস্‌লি জেলা এবং চম্পা-কম্বোজের তীরে-তীরে উড্ডীন হইয়া বাঙালীর শৌর্য্য ও মহিমার কথা ঘোষণা করিত। সেদিনের কথা আজ স্বপ্নের মত মনে হয়; কিন্তু শিলালেখ, বিদেশী পর্য্যটক, জাভার ইতিহাস, বৃহত্তর ভারতের মন্দির-ছন্দে (Style of temples) যে কাহিনী অমর হইয়া রহিয়াছে, আজ কেমন করিয়া তাহা অস্বীকার করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বাঙালীকে আর্য্য কিংবা অষ্ট্রিক্-ভাষী অনার্য্যের বংশধর বলিব, সে-কথার বিচার না করিয়া দ্বীপময় ভারতের (জাভা, বলি প্রভৃতি দ্বীপ) সভ্যতায় তাহারা কি দান করিয়াছিল, তাহাই শুধু উল্লেখ করিব। কিন্তু বলিয়া রাখা ভাল যে, আমি বাঙালীদিগকে অষ্ট্রিক্-অনার্য্য বলিয়াই মনে করি। ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে পণ্ডিতেরা অনেক প্রমাণই জোগাইয়াছেন; কিন্তু রূপকথার জগৎ হইতেও যে প্রমাণ মিলিতে পারে, একথা কোন দিন ভাবি নাই। বোর্নিও, জাভা-বলি, চম্পা-কম্বোজ, মালয় উপদ্বীপ, ভারতবর্ষ ও তিব্বতের উপকথা পড়িতে-পড়িতে এমন কতকগুলি গল্পের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যেগুলি খুঁটিনাটিতে পর্য্যন্ত হুবহু মিলিয়া যায়। যদি বাংলাদেশ হইতে এগুলির প্রচার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, উপরোক্ত গল্পগুলি মূলতঃ অষ্ট্রিক্; এবং এই মহাজাতি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইবার পূর্ব্বে উহাদের মধ্যে এইগুলি প্রচলিত ছিল। বারান্তরে এ প্রসঙ্গ বিশদভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। এখন এইটুকু স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বহির্ভারতে বাঙালীরা যখন ভারতীয় সভ্যতার অগ্রদূতরূপে দেখা দিয়াছিল, তখন তাহাদের ললাটে আর্য্যের রাজটীকা জ্বলিতেছে। বস্তুতঃ আর্য্য ও অষ্ট্রিক্ সংমিশ্রণে সৃষ্ট অপূর্ব্ব এই বাঙালীজাতি। ইহার মধ্যে আবার মঙ্গোল ও অন্যান্য জাতির ভেজাল কতখানি আছে কে জানে। যদি আধুনিক গবেষণার ফলে বাঙালীরা মূলতঃ অষ্ট্রিক্-ভাষী অনার্য্য বলিয়াই পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে আমরা দ্বীপময় ভারতের অধিবাসীদের সঙ্গে যে সগোত্র বনিয়া যাইব তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাউক, জাভা-বলি দ্বীপের সভ্যতায় বাঙালীর দানের পরিমাণ কিরূপ।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সরকারী প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত কে, এন্, দীক্ষিত মহাশয় লিখিয়াছিলেন (১), পাহাড়পুরে ত্রিতল বা চতুস্তল 'সর্ব্বতোভদ্র' মন্দিরের যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভারতবর্ষে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কালক্রমে হয়তো ঐ ছন্দে মন্দির নির্ম্মাণ করিবার প্রথা লোপ পাইয়া গিয়াছিল। ভারতে ঐ ঢং-এর মন্দির কিংবা স্থাপত্য-শিল্পের বিশেষ কোন চিহ্ন আর না পাওয়া গেলেও, বৃহত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ বর্ম্মা, কম্বোজ এবং জাভার প্রাচীন মন্দিরাদিতে উহার যথেষ্ট প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ পাহাড়পুর মন্দির যে প্রথায় নির্ম্মিত হইয়াছে, ঠিক তাহার অনুরূপ উদাহরণ মিলে মধ্যজাভার অন্তর্গত প্রাম্বানান সন্নিহিত লোরো জংগ্রাঙ্ এবং চণ্ডী সেবু নামক মন্দিরদ্বয়ের স্থাপত্য-শিল্পে। জাভার এই মন্দিরগুলি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে

১। Ann. Rep. Archaeological Survey of India, 1927-'28, p. 39; cf. also N. J. Krom, *Hindoe-Javaansche Geschiedenis*, p. 125.

নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং, বাংলাদেশের মন্দিরগুলিই যে জাভার শিল্পীগণের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছিল, তাহা একপ্রকার অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কেন না, পালযুগে বাংলা দেশের সঙ্গে দ্বীপময় ভারতের যথেষ্ট দহরম-মহরম ছিল এবং পাহাড়পুরের শিল্প যে জাভার চেয়ে কয়েক শতাব্দী আগের তাহা দেশী-বিদেশী পণ্ডিতেরা একপ্রকার স্বীকার করিয়াই লইয়াছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় আশ্বিন-সংখ্যা 'উদয়নে'ও (১) এই কথাই বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum-নামক পুস্তকে (২) অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, বাঙালীদের দোল-মঞ্চ হইতে এই ঢং-এর মন্দির-শিল্পের বিকাশ হওয়া অসম্ভব নয়। আমাদেরও তাহাই মনে হয়। এদেশের কোন কোন পণ্ডিত কিন্তু এখানেই থামেন নাই। ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (৩) মহাশয় লিখিয়াছেন যে, বরবুদুরের প্রসিদ্ধ মন্দিরে যে তক্ষণশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বাঙালীদের দান অনেকখানি আছে। কলিঙ্গ এবং গুজরাট অঞ্চল হইতে যে-সমস্ত কর্ম্মী প্রাচীন জাভা-বলি দ্বীপের সভ্যতার গোড়াপত্তন করিয়াছিল, বাঙালীরা তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াই বরবুদুরের শোভাবর্দ্ধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। বস্তুতঃ, এই বিখ্যাত মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে যে সমস্ত নৌকার চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক তাহার অনুরূপ নৌকা লইয়া বাঙালীরা সিংহল, জাভা, সুমাত্রা, জাপান এবং চীনদেশে উপনিবেশ, ব্যবসা, ধর্ম্ম কিংবা স্থাপত্য-শিল্পের প্রচারের জন্য গমনাগমন করিত। যাহাদের হাতে দ্বীপময় ভারতের শাসনভার ভাগ্যক্রমে গিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক, ডাঃ

১। উদয়ন — আশ্বিন, পৃঃ ৭১৫-৭২২

২। General Introduction, Sec. 8.

৩। A history of Indian shipping and maritime activity from the earliest times, 1912, p. 156.

ক্রোম, (লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়) বলিতেছেন (১) যে রাধাকুমুদবাবুর মত সমর্থনযোগ্য নহে; কেন না বরবুদুরের শিল্পীগণকে নির্দ্দেশ দিবার জন্য যে সমস্ত লেখা প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ করা হইয়াছে, তাহার অক্ষরগুলি 'কবি'তে লেখা। জাভার প্রাচীন ভাষাকে কবি-ভাষা বলা হয়। যদি ভারতীয় শিল্পীদের চালিত করিবার জন্যই উহা উৎকীর্ণ হইয়া থাকিত, তাহা হইলে অক্ষরগুলি সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হইতে কি বাধা ছিল? প্রত্যয়বিহীন সংস্কৃত ভাষায় কবি-অক্ষরে উক্ত লিপিগুলি লেখা হইয়াছে বলিয়াই ক্রোম সাহেবের এত আপত্তি। তিনি মনে করেন যে, বরবুদুরের শিল্পী-গণকে জাভার হিন্দু-জাভানীজ্ শিল্পী-নামে আখ্যাত করিবার পক্ষে কোনই বাধা নাই। তিনি নিজেই একস্থলে স্বীকার করিয়াছেন (২) মাংসপেশী সংবিন্যাসের অভাব এবং অন্যান্য কোন কোন বিশেষত্ব দেখিয়া মনে হয় যে, উহাতে প্রাচীন ভারতীয় প্রভাব বর্ত্তমান আছে। ক্রোম সাহেবের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইলে, আমাদিগকে দুইটী থিয়োরীর একটীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, যথা—(ক) ভারতীয় শিল্পী-গণকে বরবুদুর মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য উহার স্থাপয়িতা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিংবা (খ) জাভা-দ্বীপের শিল্পীরা ভারতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। নতুবা তাহারা ভারতীয় শিল্পের এই বিশেষত্বগুলি কোথা হইতে অর্জ্জন করিয়াছিল? আমাদের মনে হয় যে, শেষোক্ত যুক্তিটীই সমর্থনযোগ্য। কেন না, নালন্দায় কিছুকাল পূর্ব্বে রৌপ্যধাতু নির্ম্মিত যে-সমস্ত বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সহিত জাভার বৌদ্ধ-মূর্ত্তিগুলির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহা অসম্ভব নয় যে, এই মূর্ত্তিগুলি জাভার শিক্ষানবিসী কারিগর, যাহারা নালন্দায় তক্ষণ-শিল্পে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আসিয়াছিল, তাহাদের হাতেরই তৈয়ারী। যদি আমরা তৎকালীন পাল-সাম্রাজ্যের সঙ্গে শৈলেন্দ্ররাজদের

১। N. J. Krom, Barabudur, Vol. II, p. 186.

২। Ibid., p. 187.

(জাভা-সুমাত্রা) সম্পর্কের কথা, মধ্যজাভা ও পাহাড়পুর স্থাপত্যের কথা এবং কেলুরক-লিপির কথা একসঙ্গে চিন্তা করি, তাহা হইলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তটী মানিয়া লইতে কোন বাধা হয় না। রাধাকুমুদবাবুর বর-বুদুরের নৌকা-সম্পর্কিত মন্তব্য সমর্থনযোগ্য বলিয়া কিন্তু মনে হয় না। কেন না, এই শ্রেণীর নৌকা কেবল যে বাংলাদেশেই প্রচলিত ছিল তাহা নহে ; পরন্তু এতদনুরূপ নৌকা অজন্তা-চিত্রেও আছে এবং মালয় উপদ্বীপ, পূর্ব্বজাভা, (১) কম্বোজ, (২) এমন কি চীনদেশে পর্য্যন্ত উহা ব্যবহৃত হইত। আমরা কিসের জোরে হলফ্ করিয়া বলিব যে, এ-নৌকা বাংলা দেশেরই এবং অন্য কোন দেশের নহে? ও-নৌকা আমাদের দেশের বলিবার যতটুকু কারণ আছে অন্যান্য দেশেরও তাহার চেয়ে কম নাই। কাজেই উপস্থিত প্রমাণের জোরে আমরা এতৎসম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ ষ্টুটেরহাইম নামক এক-জন ডচ্ পণ্ডিত একটী নূতন থিয়োরী খাড়া করিয়া ঐতিহাসিকগণকে আশ্চর্য্য করিয়া দিয়াছিলেন। দেব-পালদেবের নালন্দা-লিপি (৩) এবং কেলুরক (জাভার) লিপির (৪) যুক্ত প্রমাণের সাহায্যে তিনি এই কথাই বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মসেতু নামক যে রাজার কথা আমরা কলসন, (৫) কেলুরক এবং নালন্দা-লিপিতে পাই, তিনি বাংলাদেশের পালসম্রাট ধর্ম্মপাল ব্যতীত আর কেহ নহেন। নালন্দা-লিপি অনুসারে ধর্ম্মসেতুর কন্যার নাম তারা। ডাঃ ষ্টুটেরহাইমের মত মানিয়া নিলে বলিতে হয় যে, তারা সম্রাট সঞ্জয়ের উত্তরাধিকারী পনঙ্করনের মহিষী এবং নালন্দা-লিপিতে আমরা যে শৈলেন্দ্র-নৃপতি বালপুত্রদেবের পরিচয় পাই, তাঁহার মাতা। আলোচ্য থিয়োরীটী সত্য না-ও হইতে পারে, কিন্তু এই সময় হইতে বাংলার মহাযান বৌদ্ধমত যে বহির্ভারতে, বিশেষ করিয়া জাভা-সুমাত্রায়, প্রচার লাভ করিতেছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিব্বতী লেখক তারানাথের (১) সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রবীণ মহাযান পণ্ডিত ধর্ম্মপাল সুমাত্রা দ্বীপে গিয়াছিলেন। জীবনের প্রথমভাগ দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীতে কাটাইবার পর তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া প্রায় ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যাপকতা করেন এবং এস্থান হইতেই সুবর্ণদ্বীপে যাইয়া জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। সুবর্ণ-দ্বীপের ভৌগোলিক সংস্থান লইয়া দেশী-বিদেশী পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও মনে হয় যে, আলোচ্য স্থলটী সুমাত্রা ব্যতীত আর কোন জায়গা নহে। ধর্ম্মপাল বিখ্যাত মহাযান পণ্ডিত দিঙ্নাগের শিষ্য ছিলেন এবং জাভার সঙ্ হ্যঙ্ কমহায়ানিকন (২) (আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দ) নামক গ্রন্থে আচার্য্য দিঙ্নাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যোগাচার্য্য দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত অসঙ্গের ছাত্র। এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত উপাদান হইতে বুঝা যায় যে, এককালে নালন্দা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পে কতদূর উন্নত হইয়াছিল। দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মের উৎস যে নালন্দা ছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ডাঃ ক্রোম (৩) লিখিয়াছেন যে, শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে যে সহস্রাধিক বৌদ্ধপণ্ডিত সেখানে বাস করিতেন, তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং পূজা-

১। Ibid., p. 236.

২। *Vide* Le Bayon D'Angkor Thom, publiés par les soins de la commission archéologique de l'Indochine, par la mission Henri Dufour, Paris, 1910, plate 22, nos. 24, 25, plate 23, nos. 26-28, plate 24, nos. 29, 30, plates 91-93.

৩। Epigraphia Indica, vol. XVII, p. 310.

৪। Tijdschrift voor Indische Taal, land en Volkenkunde, 1928, dl. LXVIII, p. 1 ff.

৫। Ibid., 1886, dl. 31, pp. 240-260; also Journ. Bombay-Br. R. A. S., Vol. 17 (1887-89) II, p. 1-10.

১। Geschichte der Buddhismus in Indien Schiefner's translation, p. 161.

২। Sang Hyang Kamahayanikan, ed. J. Kats, 1910, p. 10.

৩। Hindoe-Javaansche Geschiedenis, p. 117.

পার্ব্বণ ভারতীয় মহাযান সম্প্রদায়ের চেয়ে ভিন্ন ছিল না। দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাঁহারা ৪টী সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের দার্শনিক মত মূলসর্ব্বাস্তিবাদ-নিকায়, সম্মিতিনিকায়, মহাসজ্ঞিকনিকায় এবং স্থবির-নিকায়কে অবলম্বন করিয়াই বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ, ৬৮৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি মালাই লিপি হইতে একজন ফরাসী পণ্ডিত প্রমাণিত করিয়াছেন যে, তৎকালে সুমাত্রায় বজ্রযান মত প্রচলিত ছিল। প্রায় একশত বৎসর পরের কেলুরক-লিপি (৭৮২ খৃষ্টাব্দ) হইতে এই কথা আরো বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়। উহার একস্থলে লিখিত আছে —

"মঞ্জুশ্রীরয়ং অপ্রমেয়সুগতপ্রখ্যাত ··· কীর্ত্তিমহা ···
রাজগুরুণা লোকার্থ সংস্থাপিতঃ"

এই লিপিরই অন্যত্র লেখা আছে —

"··· কুমারঘোষঃ স্থাপিতবান্ মঞ্জুঘোষং ইমম্ ···"

কাজেই, মনে হয় যে, কুমার ঘোষই রাজগুরু এবং তিনি "গৌড়িদ্বীপগুরু" অর্থাৎ বঙ্গদেশাগত। অনুমিত হয় যে, মহাযান মত সুমাত্রা হইয়া জাভাতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। এখানে পূর্ব্বে হয়তো শৈব ধর্ম্মেরই বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল; কিন্তু বৌদ্ধমতবাদ প্রচার হওয়ার জন্যও বটে এবং বাংলাদেশের শিববুদ্ধ মতের আমদানী হওয়ার জন্যও বটে—উভয়ে মিলিয়া জাভাতে এই সময়ে একটী ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভাব সৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করিলেই আমাদের মন্তব্য সুস্পষ্ট হইয়া আসিবে।

ডাঃ ফ্রেডারিক ১৮৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দে Voorloopig verslag van het eiland Bali নামে একটী মূল্যবান প্রবন্ধ Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap-এর ২২শ এবং ২৩শ খণ্ডে ছাপাইয়াছিলেন। শৈব এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য উহা হইতে আহরণ করা যায়। যদিও আধুনিক গবেষণার ফলে তাঁহার অনেক সিদ্ধান্ত ওলোট-পালট হইয়া গিয়াছে, তবুও তিনি নিজ চোখে যে-সমস্ত বিবরণ দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য সামান্য নহে। জাভা ও বলিদ্বীপে পুরোহিতগণকে পণ্ডিত বা (বর্ব্বর ভাষায়) পদণ্ড বলিয়া থাকে। তাহারা বলিয়া থাকে যে, বুদ্ধ শিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বাংলা দেশে বুদ্ধদেব যেমন শৈব-ঠাকুর সাজিয়া বসিয়াছিলেন, জাভাতেও একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ঠিক অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। বলিদ্বীপে পঞ্চাবলিক্রম-নামে যে-উৎসব হয়, তাহাতে ৪জন শৈব ও একজন বৌদ্ধ পদণ্ড একসঙ্গে মিলিত হইয়া পূজা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ঐ সমস্ত দ্বীপের কোন রাজা কিংবা রাজবংশীয় কাহারো মৃত্যু হইলে শৈব এবং বৌদ্ধ পুরোহিতের কাছ হইতে পবিত্র জল বা তোয় তীর্থ লইয়া অন্তিমক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হয় (১)। রাজাদের অভিষেকের সময়েও এই প্রথা অনুসৃত হইয়া থাকে। এই শিব-বুদ্ধবাদ জাভা এবং বাংলা-দেশকে কেমনভাবে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহাই এখন বলিতেছি।

জাভাতে যখন এই ধর্ম্মমতের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন সম্রাট ঐরলঙ্গ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পূর্ব্বজাভা শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তখন একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ। এই সম্রাটের একটী অনুশাসন-লিপিতে (২) পাই, "শৈব সোগত ঋষি"। অপর একটী লিপিতে (৩) লেখা আছে, "সোগত মহেশ্বর মহাব্রাহ্মণ"। জাভার সুতসোম নামক কাব্যের (পুঁথি) ১২০ পাতায় লেখা আছে, "ভগবান বুদ্ধ দেব-সম্রাট শিব হইতে ভিন্ন নহেন ··· জীন এবং শিবের প্রকৃতি বিভিন্ন হইলেও তাঁহারা এক।" ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দে রচিত নাগরকৃতাগম নামক পুস্তকের লেখক, কবি প্রপঞ্চও ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আরো অনেক কাব্য হইতে অনুরূপ উক্তি উদ্ধৃত করা

১। Essays relating to Indo-China, second series, Vol. II, p. 98.

২। Brandes-Krom, Oudjavaansche Oorkonden, no. 60.

৩। Ibid., no. 62.

যাইতে পারে; কিন্তু আলোচ্যস্থলে আর বেশী উদাহরণ টানিয়া আনিবার প্রয়োজন নাই।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই মতবাদ কোথা হইতে সৃষ্ট হইল, আর কেনই বা ইহা দ্বীপময় ভারতের সমাজকে এত ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া ধরিল? বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে ধর্মস্রোত জাভাতে প্রবাহিত হইয়া একটী ধর্মসমন্বয় সৃষ্টি করিতে পারে বটে; কিন্তু বাংলাদেশে যখন ঠিক এই সময়েই এই ধর্মমতের চিহ্নগুলি সাহিত্যে ও আর্টে প্রতিফলিত দেখা যায়, তখন সন্দেহ স্বভাবতঃই মনে বদ্ধমূল হইতে থাকে যে, এই বিশিষ্ট মতবাদ বাংলা দেশ হইতে পালরাজত্বের সময়ে বহির্ভারতে তথা দ্বীপময় ভারতে গিয়াছিল। মহাযান ধর্ম বিকাশলাভ করিবার সময়ে নাগার্জ্জুনের সংস্পর্শে অন্ধ্রদেশে ইহার ক্ষীণ আভাষ পাওয়া যায় বটে; কিন্তু ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় নাই। Cult-হিসাবে তো নহেই। শ্যাম দেশেও যে শিববুদ্ধবাদ এক সময়ে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আজও সেখানে অভিষেকের সময়ে যে উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে বৌদ্ধ ও শৈব সম্প্রদায়ের যুক্ত প্রভাবই বর্ত্তমান রহিয়াছে। ৮ম-৯ম শতাব্দীতে বাংলাদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের আর কোথাও এই মতবাদ পরিপুষ্টি লাভ করে নাই বলিয়াই আমরা বলিতে চাহি যে, বাংলাদেশ হইতে ইহা জাভাতে আমদানী হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার লিখিয়াছেন, (১), "বোধিবৃক্ষ নিম্নে উপবিষ্ট বুদ্ধকে ঠিক বিল্ববৃক্ষ তলে আসীন শিবের মত দেখাইত। এবং তাঁহারা এইরূপেই লোকের পূজা পাইতেছিলেন।" ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন (২), "বুদ্ধমূর্ত্তির কাছে শিবের উপাসনা করা হইত।" বস্তুতঃ, রামপালদেবের রামাবতী এবং জগদ্দল মহাবিহারে অনেক লোকেশ্বর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহাদিগকে পন্নগ-ভূষণে এমন করিয়া সাজাইয়া তোলা হইয়াছিল যে, লোকে তাহাদিগকে শিব অথবা বুদ্ধ বলিয়া পূজা করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। ময়ূরভঞ্জের (১) স্থানে স্থানেও এইপ্রকার মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাজেই শিব-বুদ্ধ বাদ একসময়ে যে ব্যাপকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই সম্পর্কে 'বাংলা' একার-ওকারের উপর দুই একটী সাধারণ মন্তব্য করিয়াই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আজকাল আমরা যে একার-ওকার ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার curve বা বক্র-রেখাটী ব্যঞ্জনবর্ণের বাম দিকে ব্যবহার করাই পালযুগ হইতে রেওয়াজ হইয়া গিয়াছে। নাগরীতে অক্ষরের উপরে ডান দিকে এই চিহ্ন দিতে হয়। কাজেই বাংলা ও নাগরীর একার-ওকারের তফাৎ অতিশয় সুস্পষ্ট। এই ধরণের একার-ওকার জাভা, কম্বোজ এবং চম্পার শিলালিপি ও তাম্রশাসনে প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া কোন কোন লেখক (২) মনে করেন যে, উপরোক্ত চিহ্নগুলি বাংলাদেশ হইতে গিয়াছে এবং উহা বাংলাদেশের প্রভাবের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ বটে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রাক্-পালযুগের একটী তাম্র বা শিলালিপিতেও এই ধরণের একার-ওকার ব্যবহৃত হয় নাই। বস্তুতঃ, পাললিপিতে এই সমস্ত চিহ্ন ব্যবহার হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই উহা দাক্ষিণাত্য, (৩), জাভা, চম্পা এবং কম্বোজের অনুশাসন প্রভৃতিতে

১। The Folk-Element in Hindu Culture, p. 165.

২। History of Bengali Language and Literature, 1911, pp. 26-27; cf. also Brandes, Tjandi Djago, p. 98.

১। N. N. Vasu, Archaeological Survey of Mayurbhanja, vol. I, pp. lxxxii ff., plate 42; also N. N. Vasu, The Modern Buddhism and its followers in Orissa, 1911, p. 12.

২। Cf. Bijanraj Chatterji, Indian Cultural influence in Cambodia, pp. 112-113.

৩। Cf. Epigraphia Indica, Vol. XVIII, Kopparam plate of Pulakesin II, pl. I (631 A. D.); Ibid., Vol. X, Inscriptions on the Dharmaraja Ratha at Mavalivaram, nos. 5, 9, 13 (1st half of the 7th century A. D.)

প্রচলিত ছিল। আমার মনে হয় যে, এই ধরণের একার-ওকার এবং মাত্রার উপরে শৃঙ্গ চিহ্ন-বিশিষ্ট হ্রস্ব-ইকার, যাহা দক্ষিণ ভারতীয় লিপির বৈশিষ্ট্য এবং যাহা নাগরীর সহিত পার্থক্য সূচনা করিয়া থাকে, তাহা দাক্ষিণাত্য হইতেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। যতদূর পরীক্ষা করা গিয়াছে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, জাভার দিনজ লিপি (১) (৭৬০ খৃঃ অঃ), কম্বোজের দ্বিতীয় ভববর্মনের লিপি (২) (৬৩৯ খৃঃ অঃ) এবং চম্পারাজ প্রকাশধর্ম্মের (আনুমানিক ৬৫৫—৬৯০ খৃঃ অঃ) ভূঙ্গ-মঙ্গ লিপিই তথা-কথিত বাংলা একার-ওকারের প্রথম দৃষ্টান্তস্থল (৩)। আরো প্রাচীনতর লিপির ফটো পরীক্ষা করিতে পারিলে, উপরোল্লিখিত তারিখগুলি হয়তো আরো পিছাইয়া লওয়া যাইতে পারিবে। তাহাতে ডাঃ চাটার্জ্জীর মন্তব্য আরো না-বাতিল হইয়া যাইবে। আমরা মনে করি যে, এই সমস্ত চিহ্ন দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতার প্রভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয়। ইহাও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৩১৩ শকের একটী লিপিতে (১) এই ধরণের 'একার' আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া অশোকের যুগের বর্গীয় 'জ'কে গোল ছাঁচে ফেলিয়া লইলে যেমন হয়, ঠিক তেমনটি হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে (২) যে, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষাংশে ভারতীয় প্রভাব দ্বীপময় ভারতে ক্রমে-ক্রমে হ্রাস পাইয়া আসিতেছিল। আর্টের তরফ হইতেও অনুরূপ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সমসাময়িক পনতরনের শিল্পের মধ্যে স্বদেশী ভাবের প্রাধান্য দেখি, যাহা প্রাম্বানান-বরবুদুরের যুগে ছিল না বলিলেই হয়। নাগরকৃত্তাগম নামক ঐতিহাসিক কাব্যের ৮৩-তম সর্গে "কর্ণাটকাদি গৌড়" অর্থাৎ গৌড়বাসীদের উল্লেখ থাকিলেও, তাহাদের প্রভাব যে ঐ সময়ে খুব ফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাহা মনে হয় না। কেন না, জাভা ও ভারতের ইতিহাস তখন যুগপৎ তমসাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।

সময় এবং সুযোগ পাইলে, ভবিষ্যতে দ্বীপময় ভারতের হিন্দু-বৌদ্ধ সভ্যতার কাহিনী আরো কিছু বলিব।

১। Cf. Brandes-Krom, Oudjavaansche Oorkonden, plate 1, 5th line.

২। Bulletin De l'Ecole Francaise D'Extreme Orient, t. IV, p. 691.

৩। Ibid., t. XI, p. 262.

১। Cohen Stuart, Kawi Oorkonden, pl. 1, Ins. IV.

২। এই সময়ের অনেকগুলি লিপি পরীক্ষা করিতে পারিলে, অনুমানকে সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইত।

চির-মুকুল

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন কর চৌধুরী, এম্-এ

হাসিভরা প্রভাতের বহি' আনি' নব নিমন্ত্রণ,
তরুণ অরুণ যবে এঁকে দেয় প্রথম চুম্বন
মুদিত মুকুলে,
ধীরে ধীরে, অতি ধীরে সুপ্ত-আঁখি তু'লে
মঞ্জরিকা মৃদু হেসে চায়,
লাজ-অরুণিমা তার সর্ব্ব অঙ্গে তরঙ্গিয়া যায়।
ব্যাকুল সুবাসে
যেন কোন্ বন্দীপ্রাণ চঞ্চল আবেগে ছুটে' আসে,—
ল'য়ে গত-দিবসের শত-ছিন্ন, বিস্মৃত বারতা,
ফুটিবার মত্ত-আকুলতা,
রুদ্ধ অশ্রু-ব্যথা।
উতল পবনে
মদির-সুরভি-ঢালা অধীর চুম্বনে
ভ'রে ওঠে দশদিশি
পুলকে উছসি'।

সিন্ধু-নীল অম্বরের সীমাহারা পশ্চিমবেলায়,
রবি ডু'বে যায়,
অনাগত-আলোকের বাণীহীন অস্ফুট ছায়ায়।
জগতের শ্রান্তি, ক্লান্তি, কোলাহল—কিছু রহে না যে—
কোথা হ'তে নেমে-আসা কি মায়ার মাঝে
মিলায় চকিতে।
উন্মনা এ নিখিলের চিতে —
নাহি জানি কোন্ সুখ-ঘন-বেদনায়,
এক ছন্দে মাঠে-বাটে আকাশে-বাতাসে,
প্রকাশের বিফল-প্রয়াসে,—
কী যেন করুণ গান কণ্ঠহারা ঘুরিয়া বেড়ায়!

সেথা গোধূলির স্নিগ্ধ-নীলাঞ্চল ছায়ে,
পরাণ-উদাস-করা তন্দ্রালস বায়ে,—
দূরে দূরে ভ্রমি' দেশে দেশে
বর্ণহারা মেঘদল আসে ভেসে' ভেসে'
জুড়াইতে অবসন্ন তৃষিত-পরাণ
সেই রূপতীর্থে করি' স্নান।
অস্তসূর্য্য বিদায়ের সে বিষাদ-ক্ষণে,
কিরণের কোমল মৃণাল-পরশনে,
প্রাণের পরশখানি যেন রেখে যায়
কামনার রাঙাচিহ্নে — কাজল মায়ায়।
কূলহারা দু'লে ওঠে একখানি সুখস্বপ্ন সন্ধ্যার তিমিরে,
বিদায় ব্যথার মৌন আরক্ত-আবীরে!
পুলক-আবেশে —
তৃপ্ত-হিয়া মেঘদল চলে' যায় ভেসে
আশা-ভরা প্রীতি-স্মরা কোন্ দূর জ্যোছনার দেশে।
আমি থাকি আনমনে চেয়ে,
নয়নে আঁধার নামে ধরণীর কূল ছেয়ে ছেয়ে।

আজি ভাবি এরি মত কত ছন্দে গানে,—
এ পরাণে —
কত হাসি-অশ্রু, কত আলো-ছায়া মাঝে,
তোমার মধুর বীণা বাজে।
কত নব বরষার অন্ধকার-উতল বর্ষণে,
শিশির-সিক্তিত কত শ্রান্তিহরা মৃদু সমীরণে,
কত ফাল্গুনের ফুলবাসে,
গানের সুরের মত আসে
তোমার ও বসন্ত-পরশ
অমৃত সরস।
তোমার ভুবনজোড়া সেই আলিঙ্গনে,
চির মৌন এ মুদিত-মুকুল-জীবনে—
তবু টুটিল না মোর আঁধার-বন্ধন;
বুঝি, হায়, রবে আজীবন
অনন্ত জগৎ হতে আপনারে বঞ্চিত করিয়া,
ম্লান, মূক, রূপহীন হিয়া।

মুকুল সে,—চিরকাল রহিল মুকুল ;
ফুটিবে না ফুল !

তোমার উদার ওই গরীয়ান্ আকাশের পানে,
নমিত পরাণে,
বিজনে বিরলে আঁখি তু'লে
কখনো কি চাহি নাই ক্ষণিকের ভুলে ?
দীন প্রাণ, দীন হ'য়ে র'লো,

বিরাট নীলিমা তব — শূন্য তবু পূর্ণ নাহি হ'লো !
পরশের ব্যাকুলতা—
ফুটিবার ব্যথা,
হৃদয়ে জাগায়ে রাখে সারাক্ষণ চির-মর্ম্মরতা।
কবে সব বন্ধ টুটি জীর্ণ প্রাণ আসিবে বাহিরে
তব রাত্রি দিবসের আলোকের নির্ঝরের তীরে ?
হে সুন্দর, আর কবে হায়,
তব স্নিগ্ধ প্রাণস্পর্শে পূর্ণ করি' লইবে আমায় ?

শিক্ষা-বিস্তারে গ্রন্থাগার

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, এম্-এ, ডি-লিট্

পাড়ায় পাড়ায় লাইব্রেরী স্থাপন করা আজকাল অনেকটা ফ্যাশানের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে-গ্রামে বা যে-পাড়ায় দু'চার জন উৎসাহী লোক আছেন, সেখানে সখের থিয়েটার, বার-ইয়ারি বা ব্রীজ্ ক্লাবের মত লাইব্রেরীও একটা থাকা চাই। জন-শিক্ষার বিস্তারকল্পে লাইব্রেরীর সংখ্যা যত বাড়ে, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠার মূলে এ উদ্দেশ্যটী আদৌ থাকে না; হাল্কা নাটক-নভেল প্রভৃতি পাঠে যাহাতে অলস অবসরটুকু আরামে কাটানো যায়, প্রায়শঃ সেই উদ্দেশ্যেই বেশীর ভাগ পল্লী-গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। আমেরিকা ও য়ুরোপের অনুসরণে সম্প্রতি আমাদের দেশেও গ্রন্থাগার-আন্দোলন সুরু হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি এখনও গ্রন্থাগারকে জন-শিক্ষার বাহন বলিয়া ভাবিতে শিখেন নাই। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যে পুস্তকের আদান-প্রদান কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইলেই গ্রন্থাগারের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, তাঁহারা দায়মুক্ত হইলেন। যাঁহারা একটু বেশী উৎসাহী, তাঁহারা বড় জোর একটা বার্ষিক সভার অনুষ্ঠান করিয়া তাহাতে কোন বড় লোককে ধরিয়া আনিয়া সভাপতির পদে বসাইয়া দেন; এবং আনুষঙ্গিকভাবে নৃত্য-গীত বা হাসি-তামাসা ও কিঞ্চিৎ 'মিষ্টি মুখের' ব্যবস্থা করিয়া সংবাদপত্রের স্তম্ভে নিজেদের 'জয়-জয়কার' জাহির করেন। সম্বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা জন-শিক্ষার কতটুকু প্রসার হইয়াছে, সে হিসাব তাঁহাদের নিকট কেহ চাহে না এবং উহা প্রদান করাও তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন না। এই শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলিকে মুষ্টিমেয় মস্তিষ্কবিলাসীর ব্যসন-কেন্দ্র ছাড়া অন্য কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না, এবং উহাদের দ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণও বিশেষ কিছু সাধিত হয় না।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে জন-শিক্ষা বিস্তারের বহুবিধ ব্যবস্থা ছিল। শিক্ষার সহিত অক্ষরজ্ঞান বা 'কেতাবতী' বিদ্যার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিলেও, গ্রন্থপাঠ-লব্ধ জ্ঞান ভিন্ন মানুষ যে আদৌ শিক্ষিত হইতে পারে না, এ ধারণা নিতান্তই ভুল। নিরক্ষর জনশ্রেণীর মধ্যেও উচ্চভাব বা চিন্তার বিকাশ আমাদের দেশে কোন দিনই অপ্রতুল ছিল না। বাংলার আউল,

বাউল, ফকির, দরবেশ প্রভৃতি শ্রেণীর মধ্যে বহু জ্ঞানী, ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তির আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও বাংলার নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে আধুনিক রুচিসম্মত ভব্যতাবোধ যথেষ্ট না থাকিলেও, অসভ্য তাহাদিগকে কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। বাংলায় নিরক্ষরতার পরিমাণ শতকরা যতই হউক না কেন, কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত শুর্খা বা হিংস্রপ্রকৃতি আফ্রিদির মত লোক, বাংলার অশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারকরা একজনও আছে কি না সন্দেহ। আজ সাম্প্রদায়িক কলহের বিষে বাংলার আকাশ-বাতাস বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, — তাই বাংলায় অমানুষিক অত্যাচার ও বর্ব্বরোচিত উৎপীড়নের নিত্যাভিনয় দেখিতে পাইতেছি,— শিক্ষার অভাবে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি চলিতেছে। — কিন্তু পঁচিশ বছর পূর্ব্বেও বাংলায় এই পাপের কথা কেহ মনেও ধারণা করিতে পারে নাই। পরস্পরের মাথায় লাঠি মারিতে, এক-জনের ঘরে আগুন দিতে, অসহায়া নারীর উপর অত্যাচার করিতে, তখন বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের অন্তর কাঁপিয়া উঠিত। যে-ধর্ম্মভাব, যে-মনুষ্যত্ব তখনকার দিনে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে বাঙালীকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল,—মানুষের চিত্তের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল, তাহার বাহন ছিল সে-যুগের বাংলার যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ, পাঁচালী, জারি, কীর্ত্তন, গাজীর গীত, আউল, বাউল, ফকির, দরবেশ ও সিদ্ধসাধকদের গীতাবলী। কাল-প্রবাহে জীবন-সংগ্রামের প্রবল আবর্ত্তে পড়িয়া বাঙালীর লোক-শিক্ষা বিস্তারের এই সহজ ও সচ্ছল উপায়গুলি একে একে লোপ পাইতে বসিয়াছে, — সুতরাং লোক-সমাজে অশিক্ষা ও কুশিক্ষার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে।

সভ্যতার বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই। দেশ ও কাল ভেদে সভ্যতার রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। এক দেশের শিষ্টাচার হয়ত অপর দেশে অভব্য বলিয়া পরিগণিত। শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলার শিষ্টসমাজে যে রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল, আজিকার শিক্ষিত বাঙালীর নিকট তাহা অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতারও ঘন ঘন রূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। বিভিন্ন ভৌগলিক সীমার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা ও কৃষ্টির উদ্ভব হয়। পাশ্চাত্যদেশ ত' দূরের কথা, এই ভারতেরই অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় আমাদের বাংলা দেশের কৃষ্টি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। বাঙালীর শিক্ষা-দীক্ষার বিচার করিতে হইবে তাহার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। বাংলার নিরক্ষর সম্প্রদায় বাংলার কৃষ্টি ও সভ্যতার বহির্ভূত নহে; সুতরাং অশিক্ষিত তাহাদিগকে বলা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাংলার লোক-শিক্ষা বিস্তারের সহায় ছিল, বাংলার লোক-সাহিত্য,—যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি। এই শ্রেণীর সাহিত্য লিপিবদ্ধ বা লিখিত পুস্তকরূপে প্রত্যেকের সম্মুখে উপস্থিত না হইলেও, শ্রুতির ন্যায় মুখে মুখে দেশের সর্ব্বত্র চলাচল করিত। সুখের বিষয়, বাংলার জাতীয় জাগৃতির দিনে আজ আবার শিক্ষিত বাঙালীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি এই সকল জাতীয় সম্পদের উপর পতিত হইয়াছে। শহরের রঙ্গমঞ্চেও তাই 'রায়বেঁশে' নৃত্যের অভ্যুদয় দেখিতেছি, রেডিও-র সাহায্যে শিক্ষিত বাঙালীর গৃহে গৃহে আবার পাঁচালী ও কথকতার প্রচার ঘটিতেছে, জাজ্-ব্যাণ্ড হইতে ঢোলসানাই-এর উপর আবার বাঙালীর মমতা-বোধ জাগিতেছে।

জড়-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে ভৌগলিক সীমার লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। এক দেশের কৃষ্টি ও ভাব-ধারা প্রবল বেগে অপর দেশের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। সুতরাং সভ্যতার মধ্যে সাঙ্কর্য্য দেখা দিতেছে। ইহাতে আতঙ্কিত হইবার কিছুই নাই; যুগ যুগ ধরিয়া এই ভাবেই সভ্যতার রূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিতেছে। বাহিরের দানে ভিতরের ঐশ্বর্য্য চিরদিনই বাড়িয়া উঠে। আদিম, আর্য্য, দ্রাবিড়, শক, হুন, আফগান, তাতার সকলেই ভারতের কৃষ্টি-ভাণ্ডারে নূতন নূতন সম্পদ দান করিয়াছে। পাশ্চাত্যের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যে নব-সভ্যতার উদয়

হইয়াছে, ভারত ধীরে ধীরে উহাকেও আপন করিয়া লইতেছে। এই নব-সভ্যতা ও শিক্ষা প্রধানতঃ 'অক্ষর-জ্ঞান'-এর (Literacy) উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইলে 'কেতাবতী' বিদ্যার প্রয়োজন। তাই দেশের সর্ব্বত্র নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এক বিপুল অভিযানের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

বহুদিন পর্য্যন্ত লোকের ধারণা ছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ই শিক্ষাবিস্তারের একমাত্র কেন্দ্র। এখনও অধিকাংশ লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর তারতম্য অনুসারে শিক্ষার লঘুগুরু ভেদ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যাহাদের আদৌ বা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক নাই, এরূপ কয়েকজন মনীষীর গভীর জ্ঞানানুশীলন ও বিদ্যাবত্তার খ্যাতি জগদ্ব্যাপী প্রতিষ্ঠা লাভ করায় লোকের এই ভ্রান্তধারণা অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে। লোকে এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর বাহিরে আরও একটি বিরাট শিক্ষা-কেন্দ্র আছে,—এই শিক্ষা-কেন্দ্রের নাম গ্রন্থাগার। বস্তুতঃ গ্রন্থাগারকে 'বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যালয়' আখ্যা দেওয়াও অসমীচীন নহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইলে যে আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়, যে সময় ও অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন হয়,—উহা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সকলের উপযোগীও নহে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মনোবৃত্তির অনুযায়ী শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাই,—এবং তথায় উহার প্রবর্ত্তন করা সম্ভবও নহে। উচ্চ-শিক্ষার প্রসারে বিশ্ববিদ্যালয় যথেষ্ট সফলকাম হইলেও জনশিক্ষা-বিস্তারের পক্ষে উহার কার্য্যকারিতা অনেকটা সংকীর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় ও তদধীন স্কুল-কলেজসমূহে দিন দিন বেতনের হার যে-ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রগৃহের সন্তানদের পক্ষে বিদ্যার্জ্জন করা বিলাসিতায় পরিণত হইয়াছে। টেক্সট্ বুক বা পাঠ্যপুস্তক প্রায় প্রতি বৎসরই বদলাইতেছে। বর্ষশেষে নূতন নূতন পুস্তকের ফর্দ্দ দেখিয়া অভিভাবকগণের মাথা ঘুরিয়া যাইতেছে। 'অন্ত পরে কা কথা', অঙ্কের পুস্তকগুলিও প্রতি বৎসর নব নব রূপে দেখা দিতেছে। অথচ উহাদের যে কি পরিবর্ত্তন বা উন্নতি-সাধন হইতেছে তাহা ত' ভাবিয়া পাওয়া যায় না। বার-তের বৎসর পূর্ব্বেও যে বাড়ীতে একখানা যাদব চক্রবর্ত্তীর এরিথ্‌মেটিক্, কে, পি, বসুর এ্যালজেব্রা, গৌরীশঙ্কর দে, বা হল্ এণ্ড ষ্টীভেন্স্-এর জিওমেট্রি থাকিত, সে বাড়ীর চার-পাঁচটী ছেলে পর পর উহা পড়িয়াই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ হইয়া যাইত। অথচ এখন দেখুন, এ বৎসর গৃহস্থ একটী ছেলের জন্য ২০৲ টাকা খরচ করিয়া যে পুস্তকরাশি ক্রয় করিলেন, পর বৎসর বা দুই এক বৎসর পরে দ্বিতীয় ছেলেটীর জন্য তাহার একখানিও কাজে লাগিল না। শিক্ষার নামে বই-এর যে বিরাট কারবার এক শ্রেণীর লোক ফাঁদিয়া বসিয়াছেন, তাহা বন্ধ করিবার শক্তি কি শিক্ষা-বিভাগে কাহারও নাই?

প্রকৃত শিক্ষা-বিস্তারের পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি আর একটী প্রধান অন্তরায়। গুণ-গ্রাহিতার ফলস্বরূপ যে পরীক্ষা পাশের বিধান ও ডিগ্রীর প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, উহা এখন বহু কুফল প্রসব করিতেছে। এ যেন 'গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়।' বিদ্যার্থীর পক্ষে এক একটী পরীক্ষা যেন এক একটা ব্যাধি বিশেষ। এই ব্যাধির হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্য পাঠ্য পুস্তকরূপ তিক্ত ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয়। পরীক্ষা পাশের উদ্বেগ ও আতঙ্কে শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের স্বাস্থ্যহানি ত' ঘটেই, শিক্ষারও অর্দ্ধেক আনন্দ উবিয়া যায়। পাঠ্য-তালিকার বাহিরে থাকিয়া যে গ্রন্থ পাঠকের রসানুভূতিকে পরিতৃপ্ত করে, টেক্সট্ বুক্-এর পর্য্যায়ভুক্ত হইলে উহাই আবার বিদ্যার্থীর মনে বিভীষিকার সঞ্চার করে। অথচ এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ দোষী করা যায় না। কারণ, ব্যক্তিগত প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা—বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সহজ ও সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ

আমাদের মতানুযায়ী গঠন করিবার সুবিধাও নাই,—উহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তৃত্ব তৃতীয় পক্ষের হস্তে ন্যস্ত। তাহাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা স্বার্থের প্রতিকূলে কোন সংস্কার সাধন করিতে তাহারা দিবে কি না তাহাও সন্দেহ। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশবাসীর শিক্ষার সার্থকতা ও সম্পূর্ণতার জন্য আমাদিগকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে,—শিক্ষার প্রসারের জন্য আমাদিগকে বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যালয় বা গ্রন্থাগারের শরণ লইতে হইবে।

গ্রন্থাগারের সহায়তায় জন-শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় আরম্ভ হয়। তথায় উহার সফলতা দেখিয়া য়ুরোপও ঐ পন্থা অবলম্বন করে। য়ুরোপের মধ্যে আবার সোভিয়েট রাশিয়া এ বিষয়ে অগ্রণী। ভারতবর্ষের মধ্যে বরোদা রাজ্য গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক। সম্প্রতি ব্রিটিশ-ভারতে এবং অন্য কয়েকটী দেশীয় রাজ্যে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে। গ্রন্থাগার পরিচালনে নূতন প্রণালী অবলম্বনের আবশ্যকতা এখন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই অনুধাবন করিতে পারিতেছেন।

অনেক লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষকে এই বলিয়া গৌরব করিতে শোনা যায় যে, তাঁহাদের গ্রন্থাগারে দশ হাজার কি বিশ হাজার বই আছে। কিন্তু এই বিপুল গ্রন্থরাশির মধ্যে কতগুলি এবং কোন্ কোন্ শ্রেণীর পুস্তক যে সাধারণ কর্ত্তৃক পঠিত হয় তাহাই বিবেচ্য। পুস্তকের সংখ্যা দ্বারা গ্রন্থাগারের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা চলে না। গ্রন্থাগারের উৎকর্ষ নিরূপিত হয় পুস্তক নির্ব্বাচনের দ্বারা এবং পাঠকসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-চর্চ্চার আগ্রহ কতটা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা। গ্রন্থমাত্রেই গ্রন্থাগারে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। এ বিষয়ে আমাদের দেশের 'সাধারণ পাঠাগার' নামে পরিচিত গ্রন্থাগারগুলির বিশেষ দায়িত্ববোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, বাজারে যে-পুস্তক নূতন বাহির হইল, গ্রন্থাগারের নবক্রীত পুস্তক-তালিকায় তাহার স্থানলাভ ঘটিয়াছে। উহা ভাল কি মন্দ, সে বিচার কদাচিৎ কেহ করেন কি না তাহাও সন্দেহ।

আদর্শ গ্রন্থাগারে সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থ থাকা আবশ্যক, যেন কোনও শ্রেণীর জ্ঞান-লিপ্সু বিমুখ হইয়া ফিরিয়া না যান। অকারণ অর্থব্যয়ে এক এক শ্রেণীর বহু গ্রন্থ না রাখিয়া উহার মধ্যে যে-গুলি উৎকৃষ্ট, উহাই সাধারণ গ্রন্থাগারে রাখা সমীচীন বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে যিনি গ্রন্থাধ্যক্ষ হইবেন, তাঁহার দায়িত্বই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারেই প্রকৃত গ্রন্থাধ্যক্ষ বলিয়া কেহ নাই। পাড়ার রামা শ্যামাকে ধরিয়া পুস্তক আদান-প্রদানের 'অনারারি' কাজ করাইয়া লইতে পারিলেই লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, যথেষ্ট কাজ করা হইল। যাঁহারা গ্রন্থাগার আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছেন, দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারের পুণ্য কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, এ বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত বিবেচনা করি। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ গ্রন্থাধ্যক্ষ ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা গ্রন্থাগারের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া দুষ্কর।

কলিকাতার মত বড় সহরে বা তৎসন্নিহিত পল্লী-সমূহে রেডিও, সিনেমা প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনশিক্ষা-বিস্তারের অনেকটা সহায়তা হইতে পারে, কিন্তু সুদূর মফঃস্বলে ইহার অনুরূপ কার্য্য হিসাবে দীপ-চিত্র সংযোগে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা সাধারণ-গ্রন্থাগারেরই করা উচিত। আমাদের মনে হয় প্রত্যেক পল্লী-গ্রন্থাগারের সহিত এক একটী ছোট-খাট চিত্রশালা খুলিতে পারিলে খুব ভাল হয়। ইহার জন্য স্বতন্ত্র গৃহের আবশ্যক নাই, লাইব্রেরীরই একাংশে ইহা অবস্থিত হইতে পারে। এই চিত্রশালায় পল্লীর শিল্পজাত দ্রব্য, দেশ বিদেশের মনীষিগণের প্রতিকৃতি, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাবলী, মৃত্তিকা বা প্লাষ্টার নির্ম্মিত নানা দেশীয় জীবজন্তুর মডেল ও স্বাস্থ্য-রক্ষা বিষয়ক প্রাচীর-পট প্রভৃতি রাখিতে হইবে। এই সকল বস্তুর দ্বারা লোকের চিত্ত যতটা আকৃষ্ট হয় ও লোকে যত সহজে এক এক বিষয়ের

জ্ঞান লাভ করিতে পারে, কেবলমাত্র পুস্তক পাঠের দ্বারা তাহা সম্ভব হয় না। আমাদের আরও মনে হয় যে, পল্লী-গ্রন্থাগারে নাটক নভেল প্রভৃতি যথাসম্ভব কম রাখিয়া জীবনী, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ইতিহাস ও সাময়িক পত্রাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। পাঠাগারের পক্ষে সু-সম্পাদিত সাময়িক পত্রের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সাময়িক পত্রগুলি একাধারে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জীবনী, অর্থনীতি, রাজনীতি, গল্প-উপন্যাস ও বিবিধ তথ্যের আকর। মানুষের কাল্চার বা অনুশীলনকে (?) বাঁচাইয়া রাখিতে সাময়িক পত্রের তুল্য কার্য্যকরী অপর কিছুই নাই।

নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে অক্ষর-জ্ঞান প্রবর্ত্তনের সুবিধা যদি না-ও ঘটে, তথাপি তাহাদিগকে গ্রন্থাগারের সুফল হইতে বঞ্চিত করা উচিত নহে। গ্রন্থাধ্যক্ষ বা তৎপ্রতিনিধি কোন যোগ্য ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে যদি কোন ভাল ভাল বিষয় তাহাদিগকে পাঠ করিয়া শুনান এবং পঠিত বিষয়গুলি সরল ভাষায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন, তবে তাহারা বর্ণজ্ঞানহীন হইয়াও অনেক কিছু শিখিতে পারিবে। আমাদের দেশের লোক-শিক্ষার প্রাচীন উপায়গুলিকে (অর্থাৎ যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী প্রভৃতি) পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে বটে, কিন্তু কেবলমাত্র উহাদের দ্বারা বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজন মিটিবে না। যন্ত্র-প্রধান পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহার সহিত মিল রাখিয়া আমাদিগকে জন-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেবলমাত্র প্রাচীন পদ্ধতিকে অবলম্বন করিলে চলিবে না, জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আজ যে-সব বস্তুর নিত্য প্রয়োজন লোক-শিক্ষার তালিকায় তাহাদেরও স্থান থাকা চাই। এক কথায় বর্ত্তমান জগতের সকল আন্দোলন, সকল চিন্তাই যেন আমাদের দেশবাসীর মনের মধ্যে স্থান পায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-কেন্দ্র স্বভাবতঃই সংকীর্ণ, উহার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য আমাদের থাকে, তারপর শিক্ষার জন্য আমাদিগকে আসিতে হয় এই 'বৃহত্তর বিশ্ববিদ্যালয়ে'—গ্রন্থাগারে; তা' সে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হউক, বা সাধারণ প্রতিষ্ঠানই হউক। জ্ঞানের বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি লাভের জন্য বিদ্যার্থীকে আর কয়খানিই বা গ্রন্থ পাঠ করিতে হয়? আর কতটুকুই বা জ্ঞান তাহার দ্বারা অর্জ্জন করা যায়? বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষার সূচনা, তাহার পরিপুষ্টি হয় গ্রন্থাগারের বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডারে।

আর একটি মাত্র কথার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করা যাইতেছে।

সর্ব্বসমেত আমাদের দেশে অর্থাৎ বাংলায় গ্রন্থাগারের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়, বোধ হয় হাজারের উপর হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে কেবলমাত্র শিশু, মহিলা ও শ্রমিকদের জন্য বিশিষ্ট কোন গ্রন্থাগার আছে কি না জানি না। আমরা মনে করি যে, প্রত্যেক গ্রন্থাগারে এইরূপ এক একটি বিভাগ থাকা উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষা-ক্ষেত্রেও অধিকারী-ভেদ আছে। সকল শিক্ষা সকলের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না। সুতরাং বিশিষ্ট শিশু-বিভাগ, মহিলা-বিভাগ প্রভৃতি থাকার সার্থকতা আছে। অবশ্য যে সকল নারী উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তা তাঁহাদের জন্য স্বতন্ত্র মহিলা-বিভাগের আবশ্যক নাই; কিন্তু আমাদের অধিকাংশ অন্তঃপুরিকারাই স্বল্প-শিক্ষিতা। মহিলা ও শিশু-বিভাগের পুস্তক-নির্ব্বাচন বিশেষ বিবেচনার সহিত করিতে হইবে। শিক্ষাকে কেবলমাত্র মস্তিষ্কের বিলাস (Luxury of the brain) মনে করিলে চলিবে না, উহাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিতে হইবে। সুতরাং যাহার দ্বারা আমাদের জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিতে পারে, সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থাই আমাদিগকে করিতে হইবে। জাতীয় জীবনের সহিত যে শিক্ষার যোগ নাই, উহাকে জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না,—উহা বিজাতীয় ও ভয়াবহ। এই জাতীয় শিক্ষা প্রচারের ভার গ্রহণ করিতে পারে শুধু জাতীয় গ্রন্থাগারগুলি। শিক্ষা

ছাড়া মানুষের মনে কোন মহৎভাব, বড় কল্পনা স্থায়ী হইতে পারে না ; সুতরাং জাতিও জাতি হিসাবে বড় হইয়া উঠিতে পারে না। সবল দেহ ও শিক্ষিত মন—ইহাই হইল জাতির প্রধান সম্পদ—জাতীয়তার একমাত্র ভিত্তি। তাই চিন্তাশীল ভারতনেতা স্বর্গত লালা লাজপত রায় বহুস্থানেই লিখিয়া গিয়াছেন যে, মুক্তিকামী ভারতের পক্ষে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু তিনটী—(১) Milk for the children (শিশুদের জন্ত দুধ); (২) Food for the adults (বয়স্কদের জন্ত খাদ্য); (৩) Education for all (সকলের জন্ত শিক্ষা)।

জগদীশের দিদি

শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি স্বয়ং জগদীশ হইয়া জগদীশ্বরের মহিমা বুঝিলাম না! যদি বা শৈশবের নাম-নির্ব্বাচনের ভিতর বিধাতার সহিত মিতালী পাতাইবার একটা বড় দাবী ছিল, কিন্তু কালক্রমে জগদীশ্বর তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। তাই ভাবিতেছিলাম—জগদীশের প্রতি জগদীশ্বরের এত অকরুণা কি বন্ধুত্বেরই যৎসামান্য পুরস্কার? জীবলোকের এই স্পর্দ্ধা পুণ্যলোকের দেবতা স্বীকার করিবেন, হয়ত যখন কর্ম্ম দিয়া তাঁহার সঙ্গে মিতালী করিতে পারিব—নামে নয়!

আমার প্রবহমান জীবন তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারের ভিতর দিয়া কোথায় গিয়া একদিন শেষ হয়, আজ অভিশপ্ত জীবনের এই কূলে বসিয়া সেই দিনটির প্রতীক্ষায় আছি।

জীবনে একটি দিন সহজে ভুলিব না।

আজ মনে হয়—হয়ত সেই দিনের সেই বিহ্বল মুহূর্ত্তটি ধীরে ধীরে এক সময় দ্বেষমিশ্রিত হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল এবং আমার জীবনের এই পরিপূর্ণ আয়োজনের মধ্যে তাহার সেই শাপতপ্ত নিশ্বাসেই বোধ করি আমাকে এমন বিকল, খঞ্জ, অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়া গিয়াছে! কিন্তু অপরাধের ওই গুরুত্ব দেখিয়া যে হাসি পায়! লঘু এইটুকু অপরাধ, অথচ দণ্ড তাহার যে আরো ভয়ঙ্কর!

একটি পার্কে বসিয়া ভগবানের একটি সৃষ্ট রূপের পানে চাহিয়াছিলাম।

যে চোখে সাধারণতঃ দেখিয়া থাকি, এ চোখ সে চোখ নয়।

অসাধারণত্ব ইহাতে কিছু আছে!

বিস্ময়, কৌতূহল ও সৌন্দর্য্যভরা দুইটি একান্ত নিবিষ্ট স্নিগ্ধ চক্ষু যেন আর ফিরিতে চায় না!

সেই আকর্ণ-বিস্তৃত দুইটি চক্ষু আমি আজো ভুলি নাই! তাহার ভিতর দুইটি নিবিড়কৃষ্ণ তারা আরো দীপ্ত। বাঁশীর মত সেই নাসা। বিস্তৃত সেই ললাট! মাথার উপর অতি কালো ঘন ফাঁপা চুলের সেই স্তবক!

অতৃপ্ত নয়ন ভরিয়া একাগ্রচিত্তে সেই গৌরবর্ণ সুগঠিত দেহের পানে চাহিয়াছিলাম—এই আমার অপরাধ!

আরো গুরু অপরাধ—সেই রূপ জন-মন-লোভা যৌবনদীপ্তা নারীর নয়—পুরুষের।

তাই আমার দৃষ্টির ভিতর কোনরূপ বাধা ছিল না, সঙ্কোচ ছিল না।

পুরুষের এ-হেন গর্ব্বিত অতুল রূপ আর আমি দেখি নাই।

সেদিন ঐ সুদর্শন ছেলেটির পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে এই কথাটাই আমার মনের ভিতর বার বার করিয়া উঁকি মারিয়াছিল—'এমন শ্রীহীন ভাগ্য আমার কেন? ওই লোকটাও ত' আমারি মতো একটি অস্থিমাংসের মানুষ—সে যদি ঐ অত

রূপের অধিকারী হইয়া জন্ম লইতে পারে—বিধি-দত্ত এই ঐশ্বর্য্য হইতে আমিই বা কেন বঞ্চিত ?' সেদিন স্বার্থোদ্ধত ঘন ঘন আক্ষেপের সঙ্গে বারম্বার এই কথাটাই মনে হইয়াছিল—'ওহো !—এই রূপ যদি আমার থাকিত !'

কিন্তু সেদিন এ কথাটা একবারও ভাবি নাই—পথের ধারে ওই যে সব বিকলাঙ্গ, খঞ্জ আতুরের দল সারি বাঁধিয়া বসিয়া রহিয়াছে—ভগবান ঠিক অমনটি করিয়াও ত' আমাকে পাঠাইতে পারিতেন ! সেদিন ভাবি নাই—যাহা পাইয়াছি, তাহাও কম নয়—যাহা পাই নাই, তাহার জন্ম বিধাতার সঙ্গে তুড়ি দিয়া বিবাদ না করিয়া তাঁহার কাছে একটু বিনম্রী হইয়া থাকিলে অপরাধ কিছু বেশী হইত না !

কিন্তু আজ ভাবিবার সময় আসিয়াছে। আজ সেই অতি-প্রত্যক্ষ বিভীষিকাময় রূপটি—অন্য অপরে নয়, বন্ধুবান্ধবদের প্রতি নয়—ভগবানের সেই অজস্র আশীর্ব্বাদ আমারি উপর নৃশংসভাবে বর্ষিত হইয়াছে !

দীর্ঘকাল হাসপাতালে পড়িয়া থাকিয়া যেদিন আমার ঐ সক্ষম পা দুইটাকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া দুইটি ক্রাচের উপর ভর করিয়া বাড়ী ফিরিলাম — তাহা দেখিয়া দিদির আমার দুই চক্ষুতে জল আর মানে না। কি কাঁদাটাই না দিদি সেদিন কাঁদিলেন ! নিজের দুঃখের চেয়ে যেন সেদিন দিদির দুঃখটাই বেশী করিয়া অনুভব করিলাম।

দিদির দুই চক্ষের জল মুছিয়া দিয়া বলিলাম—এ আমার কপালের লিখন দিদি, কেঁদো না। কাঁদলেই কি পা দু'টি আর ফিরে পাওয়া যাবে ?

কিন্তু আমার এ সান্ত্বনাবাক্য কোন কাজে আসিল না। দিদির চক্ষুর জল তাহাতে বাঁধ মানিল না। তিনি আমার শিয়রের কাছে বসিয়া বসিয়া অঝোরে কাঁদিতেই লাগিলেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহার স্নেহ-শীতল দুইটি কোমল হাতের স্নিগ্ধ স্পর্শে—আমার অন্তরের ভিতরে যত কিছু আক্ষেপ, অবরুদ্ধ-বেদনার সেই যে বিপুল ভাণ্ডারটি—এক নিমেষের মধ্যে যেন কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল !

মানুষকে যে মানুষ এমন করিয়া ভালোবাসিতে পারে — এ ভালোবাসা যে পায় নাই, সে তাহা বুঝিবে কি করিয়া ! মা'র-পেটের এমন দিদিরও সংসারে অভাব নাই, এমন ভাইও সংসারে বিরল নয়। কিন্তু আমি জানি — এ তথা-কথিত ভাই-বোনের ভালোবাসা নয়; ইহার সত্যকার রূপ এতই পরিশুদ্ধ, এত খাঁটি যে, তাহা উদ্ঘাটন করিয়া বলা শক্ত।

ইতিপূর্ব্বে দিদি কাঁদিতে কাঁদিতে একসময় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—তোর ও-দু'টি পায়ের দিকে যে আর আমি কিছুতেই চাইতে পারছি নে জগদীশ ! আমার মনে হচ্ছে, আমার নিজের পা দু'টি কেটে ফেলে দিয়ে তোর পাশে এসে বসি, তবু যদি কিছু সান্ত্বনা পাই। তোর এমন রূপ দেখতে হবে, এ যে আমি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি !

দিদির এই মর্ম্মঘাতী বিলাপের মধ্যে এতটুকু অত্যুক্তি নাই,—অভিনয়োচিত এতটুকু ন্যাকামি বা একটুখানি মিথ্যাও ইহাতে নাই। দিদির সরল প্রাণের এই সরল অভিব্যক্তি আমি অন্তর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলাম। আমার কাঠের পায়ের সহিত পাল্লা দিয়া ঠিক আমারই সম্মুখে যে দিদির ঐ তাজা পা দুইটা অহরহ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে, এত বড় প্রকাণ্ড বিদ্রূপকে তাঁহার পক্ষে অতিক্রম করিয়া চলাও যেমন শক্ত, সহ্য করিয়া চলা যেন তাহার চেয়েও ভয়ঙ্কর।

সেদিন কথায় কথায় এই দিদিকে একটু ব্যথা দিয়া ফেলিলাম। নেহাৎ অন্তরঙ্গ আপনার জনকেও যে কত হিসাব করিয়া কথা কহিতে হয়, এ কথাটা আমার সব সময় মনে থাকে না। থাকিলে এমন বিপদে পড়িতে হইত না।

হঠাৎ বলিয়া বসিলাম — দিদি মুক্তেকী পদ ত' ঘুচলো। এমনি ত্রিভঙ্গ অবস্থা নিয়ে মানুষের ঐ

বিদ্রূপ-দৃষ্টির সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াই বা কি ক'রে? মাসে মাসে সামান্য যা-কিছু তোমার হাতে তুলে দিতাম — তাও এইবার থেকে উঠ্‌লো!

বলিয়া ফেলিয়াই লক্ষ্য করিলাম — দিদির ঐ লাল মুখের উপর হঠাৎ যেন কে কালী ঢালিয়া দিয়াছে! আর একটি কথাও না বলিয়া দিদি সক্রোধে আমার মাথার কাছ হইতে দ্রুতপদে উঠিয়া গেলেন। অজ্ঞাতে দিদিকে কত বড় আঘাত দিয়া ফেলিয়াছি — তখন বুঝিলাম। খোঁড়া পা দুইটাকে কোনরূপে টানিয়া লইয়া বারান্দায় গম্ভীরমুখে উপবিষ্টা রোরুদ্যমানা দিদির চরণ-প্রান্তে বসিয়া পড়িয়া তাঁর দুইটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম — মাপ করো দিদি, অমন কথা আর আমার মুখ দিয়ে বের হবে না।

আশ্চর্য্যভাবে দিদির রাগ পড়িয়া গেল। কহিলেন — কিন্তু তুই কি মনে করিস জগদীশ, মাসকাবারে যে তিনশ' টাকা আমার হাতে তুলে দিতিস — তোর পা দু'টোর চেয়ে সেই লোভই আমার বেশী? সখ করে তুই মুন্সেফী করতিস, এই ঢের; নইলে জনার্দ্দনের কৃপায় তিনি যা রেখে গেছেন,— তুই বেশ জানিস — এ ভোগ করবার লোক আমার আর কেউ নেই, তবু ভাই তোরা মানুষের প্রাণে জেনে শুনেও এমন ভাবে যে কি ক'রে আঘাত দিস, এইটেই আমি বুঝতে পারি না জগদীশ!

এ কথা এত সত্য যে, ইহার উপর হাজারবার অপরাধ স্বীকার করিলেও সে-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

কলিকাতার উপরে তিনখানা বাড়ী, তাহার উপর লক্ষাধিক মজুত টাকার একমাত্র ভবিষ্যৎ মালিক যে আমি, ইহাও দিদি আকার-ইঙ্গিতে আমাকে, বহুবার বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং যে অপরাধ আমি এইমাত্র করিয়া ফেলিলাম, তাহার গুরুত্ব আমার ঢের আগে বোঝা উচিত ছিল।

ঘটা করিয়া যে বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছিল—তাহা চাপিয়া গেল।

এই দুইদিনের ব্যবধান দিদিকে আমার কত খর্ব্ব করিয়া ফেলিয়াছে! তাঁহার সেই বিপুল আনন্দের উচ্ছ্বাস আজ থামিয়া গিয়াছে, সদা-স্নিগ্ধ মুখের সেই হাসি আজ মিলাইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতের নীড় বাঁধিবার উজ্জ্বল কল্পনাটি ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। আর মেয়ে যাচাই করিবার ধূম নাই, ঘটকদের যাতায়াত নাই! দিদির অন্তস্তল মন্থন করিয়া এক-একটি ভারী দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে — সে নিশ্বাসবায়ু পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া ব্যথায় ও বেদনায় আচ্ছন্ন হইয়া না পড়িলেও, আমাদের এই ক্ষুদ্র বাড়ীটি যেন সে ব্যথার ভার আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না।

হাসিতে হাসিতে সেদিন দিদিকে বলিলাম —দিদি তুমি বড় কৃপণ!

আমার মন্তব্য শুনিয়া দিদি হাসিলেন। হাসিবার কথা বটে! কারণ দিদি যে কৃপণ নন্‌—এ কথা দিদি নিজেও জানেন, আমিও জানি। নেহাৎ কিছু আমার অর্থের প্রয়োজনেই যে দিদিকে অমন একটি কটু সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলাম—ইহা দিদি বুঝিলেন। আমার কার্য্যও সিদ্ধ হইল! অভিমানের ভাণ করিয়া মুখখানাকে যথাসাধ্য গম্ভীর করিয়া দিদি তাঁহার নিজের ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন।

প্রয়োজনের বেশী আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না।

কিন্তু দিদি ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন—কৃপণের ধন যা কিছু আজ তোমার হাতেই তুলে দিলাম—মিছেমিছি এ অপবাদ মানুষে আর কাঁহাতক সইতে পারে?

বলিয়াই দিদি হাসিয়া ফেলিলেন। আনন্দে তাঁহার মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! কহিলাম— তুমি বেঁচে থাক্‌তে এ দুর্ম্মতি যেন আমার না হয় দিদি। জানি তুমি কল্পতরু, হাত পাতলেই পাবো— সুতরাং এ ভার এখন আমি বইতে পারবো না। বরং তুমি রোজ দু'টি ক'রে টাকা আমার হাতে গুঁজে দিও—ওই আমার প্রয়োজন।—

বলিয়া দিদির ব্যাঙ্কের পাশ-বই, চেক-খাতা, দলিল-পত্র আবার তাঁহার হাতেই তুলিয়া দিলাম।

ভ্রাতার এই সূক্ষ্ম বোধ-শক্তির পরিচয় পাইয়া দিদি সগর্ব্বে সেগুলি ফিরাইয়া লইয়া আবার নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

কয়দিন ধরিয়াই লক্ষ্য করিতেছিলাম — কি একটা প্রশ্ন দিদির ওষ্ঠপ্রান্তে আসিয়া আসিয়া আবার ফিরিয়া যায়। ঠিক গোণাগাঁথা প্রতিদিন দুইটি টাকার আমার প্রয়োজনটুকু জানিবার কৌতূহলই যে দিদির প্রশ্ন — ইহাও বুঝিলাম। চা খাই না, সিগারেট ফুঁকি না, অন্য কোনরূপ বদ নেশাও নাই— এমন কি ট্রাম-বাসের যে খরচটুকু ছিল — তাহাও বর্ত্তমানে উঠিয়া গিয়াছে। অথচ দুইটি করিয়া টাকা পকেটে ফেলিয়া প্রত্যহই সকাল-সন্ধ্যায় ঐ কাঠের ক্রাচ দুইটির উপর ভর করিয়া বাহিরে গিয়া কি-ভাবে যে তাহা আমি খরচ করিয়া আসিতাম — ইহা দিদি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। যাহার হাতে একদিন তাঁহার ব্যাঙ্কের খাতা তুলিয়া দিতে তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই — তাহার হাত দিয়া যে সামান্য দুইটি টাকা খরচের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাও নয়। দিদির কাছে গোপনীয় বলিতে আমার কি-ই বা আছে — অথচ এই ব্যাপারটা আমি পূর্ব্বাপর চাপা দিয়াই আসিয়াছি। হয়ত কৌতূহলটা সেইজন্যই দিদির কিছু বেশী হইয়াছিল এবং একদিন দূত নিযুক্ত করিয়াই হউক বা যেমন করিয়াই হউক—তিনি আমার এই গোপন খরচের তালিকাটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন, কিছুদিন পরেই তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম।

সেদিন সমারোহ করিয়া আমাদের বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার উপরে অন্ধ, খঞ্জ, দুঃখী সব কাতারে কাতারে ভীড় জমাইয়া বসিয়া গিয়াছে। আমাদের বাড়ীর সরকার নিজ হস্তে মুষ্টি মুষ্টি চিঁড়া-গুড় আর দক্ষিণাস্বরূপ একটি করিয়া আনি ব্যগ্র-উন্মুখ ঐ কাঙালীদের প্রসারিত অঞ্চলের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছিলেন। উপরের একটি জানালা খুলিয়া স্বয়ং দিদি তাহার তদ্বির করিতেছিলেন।

নীচের ঘরের চৌকীর উপর বসিয়া বসিয়া আমি প্রত্যেকটি ভিক্ষুককে, বিশেষভাবে ঐ বিকলাঙ্গ প্রাণীগুলিকে, একাগ্রদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া যাইতেছিলাম।

ভাবিতেছিলাম — কি আর তফাৎ!

ভগবানের আশীর্ব্বাদে আজ আমি দেবার মালিক! অমনি করিয়া অঞ্চল বিছাইবার জন্য ঐ হাতকাটা লোকটির পাশে যে বিধাতা আমার কারণও একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখেন নাই — ইহাই ত' আশ্চর্য্য! ভগবানের এই করুণারও ত' সীমা নাই! ওরা যে আজ আমারি বন্ধু; ওদের দুঃখ আমি না বুঝিলে আর কে বুঝিবে? আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। হেলান-দেওয়া তাকিয়াটি দূরে সজোরে একেবারে মেঝের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া — দুইটি কাঠ বগলে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বাহিরে আসিয়া বলিলাম — সরকার মশাই, আমি নিজে হাতে দেবো।

সরকার মহাশয় আমার সঙ্গে সঙ্গে সসঙ্কোচে ধামা লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন;— আমার সাধ্যমত আমি ঐ সব পাতা-আঁচলের উপর দিদির দেওয়া ভিক্ষার আয়োজন বিতরণ করিতে লাগিলাম। হাত-কাটা লোকটির কাছে আসিয়া একটু দাঁড়াইতেই সে তাহার দারিদ্র্য-পীড়িত অতি শুষ্ক মুখখানি আমার দিকে তুলিয়া ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর কহিল — আহা বাবুটির কি কষ্ট!

কষ্ট ত' বটেই! কিন্তু আমার চেয়ে যে তাহার কষ্টও কম নয়; বরং সহস্রগুণে বেশী—একথা হয়ত ওই লোকটা স্বীকার করিতে চাহিবে না। কারণ আমি বাবু! বাবু হওয়ার এই দশাটা যে আমার পক্ষে সত্যই নিদারুণ—ইহাই হয়ত সে বলিতে চায়। অজ্ঞাতে চোখ দুইটি একটু ভিজিয়াও উঠিল। অন্য পাতে সরিয়া গেলাম। ক্রমশঃ এইরূপে একটি পাত হইতে অপরটির দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও অনির্ব্বচনীয় আত্মতৃপ্তিও অনুভব করিতেছিলাম,—যাহা কেবল অনুভব করাই চলে, ব্যক্ত

করা যায় না। কিন্তু আমি ভাবি, যিনি অন্তকার এই আয়োজন করিয়াছেন—সেই দিদির পক্ষে আমার সত্যকার ব্যথা কোথায় সেটা বুঝা হয়ত কিছুই কঠিন নয়; কিন্তু আমার তুষ্টার্থে সেই ব্যথারই কিঞ্চিৎ প্রতিকারের জন্য দিদি আমার প্রাণের একেবারে অন্তঃপুরে ঢুকিয়া এইরূপ অভিনব ব্যবস্থা করিলেন কি করিয়া? তবে কি তিনি আমার দৈনন্দিন সেই দুই-টাকা-ঘটিত গোপন ইতিহাসটুকুর সন্ধানও পাইয়াছেন। আর তাহারই ফলে আমার প্রাণের ক্ষতস্থানে একটু করিয়া হাওয়া দিবার বন্দোবস্ত তিনি এইরূপেই করিয়া দিলেন?

আমার অনুমান মিথ্যা নয়।

সেদিন গত হইয়া গেলেও প্রত্যহই কাঙালীদের ভীড় লাগিয়াই রহিল। স্পষ্ট মুখের উপর একদিন সময় বুঝিয়া দিদিকে প্রশ্ন করিয়া বসিলাম—তোমার দোরগোড়ায় এদের আনাগোণা যে কমছেই না দিদি, কারণ কি?

ব্যথিতকণ্ঠে দিদি বলিলেন—আমার এই দু'টি চোখকে তুই ফাঁকি দিয়ে ভিগ্‌বাজি খেলে বেড়াবি জগু—এত বুদ্ধি তোর আজো হয় নি রে! কোথায় তোর ব্যথা, কোথায় তোর আনন্দ, এও যদি এখনো তোকে ডেকে আমার জিজ্ঞেস করে নিতে হয়, তা হলে তোর অমন দিদির বেঁচে না থাকাই ভালো। তোর ঐ দু'টি কাঠের পায়ের উপর ভর করে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে বেড়াবার আর কোন দরকারই নেই। আজ আমার ঐ ভাই-বন্ধুদের তোর বাড়ীর দোরগোড়ায় ডেকে এনেছি, হাত বাড়ালেই এখন তুই তাদের নাগাল পাবি। রোজ সকাল-সন্ধ্যা মাত্র দু'টি টাকার রেজকী বিলিয়ে তোর বাইরে আনন্দ কুড়িয়ে বেড়াবার প্রয়োজনই বা কি? যা তোর ইচ্ছে—এই ঘরে বসেই মেটাবি—এই আমি চাই।

প্রকাশ্যে দান করার যে লজ্জা—সে ত' ছিলই; অধিকন্তু এ প্রবৃত্তিটা ঠিক স্বতঃ উৎসারিতও নয়,—অকস্মাৎ নিজের অবস্থার বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যে ভাবেরও বিপর্যয় ঘটিয়াছে—সেও কম লজ্জার কথা নয়! দিদির কাছে গোপন করার আর কোন প্রকার হেতুই ছিল না। আর সে কথা আমি অপ্রকাশ রাখিলেও—দিদি তাঁহার নিজের ঐ প্রখর বুদ্ধির অদ্ভুত শক্তি দিয়াই বুঝিয়া লইলেন!

আশ্চর্য্য এই মানুষের মন!

এই পরমাশ্চর্য্য অঙ্গের অদৃশ্য স্থানটুকু—বিধাতার সৃষ্টির একটি জটিল রচনা! কর্মচেতনার সর্ব্ব-প্রকার বীজ ত' ওইখানেই নিহিত আছে; জীবনের বহুব্যাপ্ত আশা ও হতাশা, কামনা ও আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব মনের ঐ বিস্ময়কর অন্তঃপুর হইতেই; যত কিছু দুর্বোধ্য প্রশ্নমালার জটিল মীমাংসা—সেও ঐ মনের সুতীক্ষ্ণ সঙ্কেতেই! এই দুর্নিরীক্ষ্য বস্তুটির প্রেরণা মানুষকে কতভাবেই না উদ্বুদ্ধ করে—যাহার কোন সীমা নাই, সঙ্গতি নাই—আবার সবই আছে! প্রকাণ্ড অনুভূতির অগম্য এই স্থানটির তাই ভালো করিয়া আজো কোনো কিনারা মিলিল না। না-ই বা মিলিল! যুগ যুগ ধরিয়া মর্ম্মবিদেরা মাথা ঘামাইয়া মরুক, সেজন্য আমার মাথা ব্যথা কি! আমার ছোট্ট একটুখানি মাথা—অত সব বৃহৎ বৃহৎ মনোরাজ্যের বিস্তৃত গবেষণা লইয়া ঘামাইবার প্রয়োজন নাই।

নিজের মনের সত্য পরিচয়ই খুঁজিয়া পাই না—সুতরাং পরের মন লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিবার মত দুঃসাহসও আমার নাই।

কিন্তু এ কি বিপাক?

জানিতাম — দিদির স্নেহের অকূল সমুদ্রে আমার জীবনের এই জীর্ণ তরীখানি ছাড়িয়া দিয়াই আমি নিশ্চিন্ত! একদিন সে-তরীখানি একটুখানি দোল খাইয়া, একটুখানি ভাসিয়া, আবার এক সময় ফুটা হইয়া ওইখানেই সে ডুব মারিবে—এইটুকু পর্য্যন্তই জানা ছিল; কিন্তু এটা জানা ছিল না যে — ঐ

অকূল সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরীর শান্তিতে থাকাও কঠিন—জানিতাম না তাহার ঢেউয়ের উদ্দাম ঘাত-প্রতিঘাত তরীটাকে আলোড়িত করিয়া মাঝে মাঝে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াও তুলিবে। তবে স্নেহের ঢেউ—এই যা ভরসা!

একে ত' নিজের এই ঘৃণিত জীবনের মনের খোরাক জোগাইতেই দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছি—তাহার উপর দিদির মনের এই নূতন ও অদ্ভুত খেয়াল! এই খেয়ালকেই বা সমর্থন করি কি করিয়া?

এমন বিপদেও মানুষ পড়ে! বোধ করি বা হাসপাতালের সেই ভয়ঙ্কর অসহ্য যন্ত্রণাও ইহার চেয়ে সুখকর ছিল! কি করি কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। নিকটে এমন একজন পরমাত্মীয় বা পরমবন্ধু নাই যে, তাঁহার কাছে উপদেশ ভিক্ষা চাই। আমার সেই জগদীশ্বর নামক বন্ধুটির সাক্ষাতও ত' সহজে মিলিবে না। কিন্তু এখন করি কি?

দুইদিন অবিরাম তর্ক-বিতর্কের পর পরাজয় স্বীকার করিয়া দিদি সেই যে কোন্ সকালে শয্যা লইয়াছেন—আর ত' তাঁহাকে নড়াইতে পারি না! মধ্যাহ্নও চলিয়া গিয়াছে, অপরাহ্নও যায় যায়—অথচ দিদির অনশন-ব্রত ভাঙ্গি কি করিয়া? নিজের পাকস্থলীর ভিতরও অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছে। দিদি না খাইলে—দিদিকে ফেলিয়া নিজের মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়া কৃতজ্ঞতার বিজয়-পতাকা উড়াইয়া আনন্দ করিবার মত মনের সাহসও ত' আমার নাই।

একবার ভাবিলাম—যাক্ সন্ধ্যা কাটিয়া, থাকুক দিদি পড়িয়া; তবু দিদির এই অসঙ্গত খেয়াল বা আব্দার রক্ষা করিয়া আমার এই লাঞ্ছিত দেহ-যাত্রার উপর আর একটা প্রকাণ্ড বড় মিথ্যা চাপাইয়া দিতে পারিব না।

কিন্তু অবোধ মনের সেই ক্ষণস্থায়ী সান্ত্বনা কতক্ষণই বা টিকিল! দিদির ঐ উপবাসক্লিষ্ট অভিমান-ক্ষুব্ধ গম্ভীর কাতর মুখখানির কথা ভাবিতেই আর স্থির থাকিতে পারিলাম না।

ভিতরে আসিয়া দিদির শিয়রে বসিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম—দিদি খেতে যাও, বেলা নেই! আমার পেটেও কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই পড়ে নি।

উত্তপ্ত কণ্ঠেই দিদি জবাব দিলেন—কারো পেটে কিছু না পড়ুক—এ আমি চাই না; কিন্তু আমাকে যেন কেউ অনুরোধ-উপরোধ করতে না আসে—মাথার দিব্যি দিয়ে রাখ্‌লাম।

মনে মনে হাসিও পাইল, দুঃখও হইল।

জগদীশের দিদি আজ জগদীশের সঙ্গে একজন কল্পিত, অনুপস্থিত তৃতীয় পুরুষকে মধ্যস্থ রাখিয়া বাক্যালাপ করিতেও ইতস্ততঃ করেন না।

কিন্তু দিদির আকাঙ্ক্ষার এই উগ্র উচ্ছ্বাস মিটাই কি করিয়া?

বলিলাম—মাথার দিব্যি এখন তুলে রাখো, তোমার পায়ে পড়ি দিদি। এ সংসারে তোমার এই ভাইটিকে যা বলবে—তা যতই নির্ম্মম হোক্ না কেন তোমার সে-আদেশ একান্ত সুধীর সুবোধ ছেলেটির মতই সে পালন করবে; কিন্তু দিদি, জীবনে আমার এই একটি মাত্র অনুরোধ—তুমি তোমার এই কঠিন আদেশটি ফিরিয়ে নাও!

দিদি জবাব দিলেন—বার বার যেন কেহ আমাকে একটি কথাকেই ফেনিয়ে বল্‌বার জন্য উত্যক্ত না করে! আমি কারো কিছুতে আর নেই, আমি চাই আমার শান্তির যেন কেউ ব্যাঘাত না করে।

নির্লজ্জের মতই আবার বলিলাম—কিন্তু তুমি বুঝতে পারছো না দিদি, তোমার ধন-দৌলত দিয়ে মানুষের আসল ক্ষুধা মেটে না! আমি জানি বাঙ্‌লা দেশে তোমার এই খোঁড়া ভাইটির জন্যও পাত্রীর অভাব হবে না; কিন্তু সে কেবল তোমার ঐ খাজাঞ্চীখানার লোভেই!

হিতে হইল বিপরীত! এমন একটি অভাবনীয়

কাণ্ড ঘটিয়া গেল যে, আমি একেবারে স্তম্ভিত, বিমূঢ় হইয়া পড়িলাম।

দিদি একেবারে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। মেদিনী হয়ত একটু কাঁপিয়াও উঠিল। অকস্মাৎ মধ্যপথে ক্রন্দনের বেগ থামাইয়া দিয়া দিদি আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন — যদি কেউ পারে, হামানদিস্তার ঐ লোহার ডাণ্ডাটি দিয়ে অহরহ আমার বুকের ওপর ঘা দিতে থাকুক, তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কেউ যেন আমার কানের ভেতর দিন রাত্রি খোঁড়া-খোঁড়া বলে·········

দিদির বলিবার আগ্রহ থাকিলেও, আমার শুনিবার স্পৃহা আর ছিল না। বাধা দিয়া দিদির চরণ স্পর্শ করিয়া বলিয়া আসিলাম — তুমি চেষ্টা করো দিদি, আমি তোমার এই পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি— বিবাহ আমি করবো।

দিদির পা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং পৃথিবী ধ্বংস হইয়া গেলেও তাহা আমার রক্ষা করিতেই হইবে।

বিবাহ করিলাম।

বৌ'র নামটি মিষ্টি, মুখটিও মিষ্টি, তবে গায়ের রং কালো। সুপুষ্ট গড়নখানি বেশ মনোজ্ঞ! যৌবনের তুলির স্পর্শও তাহাতে পড়িয়াছে!

বৌ কথা কয়, ডানা মেলিয়া ওড়ে না, গাছের শাখে বসিয়া শিষ দেয় না — তবু বৌ'র নাম পাখী!

তাই বলিতেছিলাম নামটিও মিষ্টি।

এই বৌ-নির্ব্বাচনে দিদির বাহাদুরী আছে।

আমি ভাবি—এক একটি মানুষের দৃষ্টি কত গভীর! একটি করিয়া পা বাড়াইবার সময় এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব করিয়া তাহারা চলে কি করিয়া? কাগজের পাতে অঙ্ক কষার চেয়েও জীবনের এই বাস্তব-খাতায় হিসাবের মিল রাখিয়া চলা যে চের বেশী শক্ত; অথচ ভুলচুক যেন ইহাদের হইতেই নাই — এতই বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, দৃষ্টির এতই প্রসারতা!

শুনিলাম, আমার জন্ত নাকি ইহার চেয়ে আরো কয়েকটি ভালো সম্বন্ধ আসিয়াছিল। আশ্চর্য্য ত' বটেই, কিন্তু সত্য। তাঁহারা উন্মুক্ত হস্তে না হইলেও সাধা-মত দক্ষিণা দিতেও নাকি স্বীকৃত হইয়াছিলেন। অধিকন্তু তাহার ভিতর দুই একটি মেয়ে নাকি আমার বর্ত্তমান গৃহলক্ষ্মীটির চেয়ে সুন্দরী ও সুশ্রী ছিল। তবে সে সম্বন্ধ যে ঠিক আমার জন্তই আসে নাই, আসিয়াছিল টাকার পাহাড়ের জন্তই—তাহাতে কোন ভুল নাই।

যাহা হউক, দিদি একটু হাসিয়াই সে সব সম্বন্ধ ফিরাইয়া দিয়াছিলেন এবং দিদি তাঁহার ঐ অন্তঃপুরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াই তাঁহার অভিজ্ঞ দৃষ্টি ছড়াইয়া দিয়াছিলেন বড়লোকদের দিকে নয়, বাংলার অগণিত দরিদ্রদের দিকে। সেই দরিদ্রদের একটি ভদ্র শিক্ষিত পরিবার হইতেই তিনি বাছিয়া লইলেন একটি মাতৃহীনা কুমারীকে। দিদির এ দূরদর্শিতা যে কত বড় ছিল তাহার পরিচয় তখন পাই নাই, পাইয়াছি পরে। যে জীবনে কোনো দিন আদর পায় নাই, স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা হইতে যে চিরদিনই বঞ্চিতা, কিম্বা অর্থের অভাবে যাহার মাসের ভিতর অর্দ্ধেক দিনই কেবল জল খাইয়াই পেট ভরাইতে হইয়াছে— দিদি এ কথাটা ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে, তাহার অন্ততঃ এই নূতন ধনদৌলতের সম্ভোগে বা দিদির স্নেহের সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়া—আমার এই খোঁড়া পা দুইটার কথা আর মনে পড়িবে না।

কিন্তু আমি মুগ্ধ হইলাম দিদির আনন্দ দেখিয়া সত্যি করিয়াই যেদিন দিদির ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইবার জন্ত গৃহলক্ষ্মীটির আবির্ভাব হইল — সেদিন দিদির সেই আনন্দ-উদ্ভাসিত উজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিয়া পৃথিবীতে যে কোথাও দুঃখ বিরাজ করিতেছে, অনুমান করিতে পারিলাম না। মুগ্ধচিত্তে দিদির হৃদয়াবেগের উদ্ভাসিত কার্য্যাবলী পর পর নিরীক্ষণ করিয়া যাইতে লাগিলাম।

বিলাসের সামগ্রী আসিয়া ঘর ভরিয়া ফেলিল। পাখীর দেহ সোনাদানা জহরতে ঝলমল করিয়া উঠিল। কাশ্মীরি দামী দামী বিচিত্র শাড়ী-ব্লাউজে বৌ'র দুই তিনটি ট্রাঙ্ক ভরিয়া গেল।

তাহার পর দেখি একদিন ছোটো একটি 'বেবী অষ্টিন-কার'ও আমাদের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল! সবই হইল, কিন্তু আমার ভাঙা-পা তবু জোড়া লাগিল না। না লাগিল, দিদির সে-জন্য ভিতরে ভিতরে যত কিছু আক্ষেপই থাকুক না কেন, বাহিরে তাহা প্রকাশ পায় নাই। বরং এই মরুভূমি খুঁড়িয়া একটু-খানি জল বাহির করিবার জন্য দিদির কতই না আকুলতা! অলঙ্কার-বেশভূষায় পাখীর দেহটি প্রত্যহ সন্ধ্যায় আবৃত করিয়া ফেলা হইত। পরিপাটিরূপে নিজ হস্তে সাজাইয়া রোজ দিদি তাঁহার ভ্রাতৃবধূকে লইয়া মোটরে করিয়া বৈকালে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়া যাইতেন। যখন ফিরিতেন তখন দেখিতাম কেবল দিদির মুখখানিই উজ্জ্বল নয়, পাখীর ঐ কালো মুখ-খানিও প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দিদির সর্ব্বপ্রকার আয়োজনই যে সার্থক হইয়াছে, তাহা বুঝিলাম।

সবই ত' বুঝিলাম; মনে মনে দিদির চরণে কোটি কোটি প্রণিপাতও জানাইলাম। আমি ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম—এমনি করিয়াই দিন যাইবে। সাজ-সজ্জার প্রচণ্ড নেশায় মাতাইয়া, মোটরে চড়াইয়া, গড়ের মাঠের হাওয়া খাওয়াইয়া—এই কিস্তির দায়িত্ব দিদি এমনি করিয়াই মিটাইয়া দিবেন। মুক্ত প্রান্তরের হাওয়া খাইয়াই বৌ'র পেট ভরিবে।

কিন্তু তা নয়; দিদির দায়িত্বের দৌড় যে একদিন আমার শয়ন ঘরের চৌকাঠ মাড়াইয়া একেবারে আমার পালঙ্ক পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিবে, ইহা আমি ত' ভাবিতেও পারি নাই।

কিন্তু ভাবা আমার উচিত ছিল।

নারীর যৌবন-সতেজ দেহ কেবল বেনারসী শাড়ীর মসৃণ আবেষ্টনে, কেবলমাত্র ঐশ্বর্য্যের মিথ্যা উপভোগের ভিতরই যে খুশী থাকিতে পারে না; দরিদ্রের কন্যা হইলেও যে তাহার বিখণ্ডিত বিবিধ কামনা, উল্লাস বা সর্ব্বপ্রকার যৌবন-গন্ধই যে শুকাইয়া একেবারে মরিয়া যায় না—এই সত্যটি যদি বা একদিন দিদির সঙ্গে তর্কচ্ছলে উপলব্ধি করিয়াছিলাম—কিন্তু বাস্তবের এই সত্য উপলব্ধিক্ষেত্রে আসিয়া সে-কথা আর স্মরণ করিতে পারিলাম না। এবং এই স্মরণ করিতে না পারাটাও যে আমার পক্ষে খুব অযৌক্তিক—এ কথাই বা আমি স্বীকার করি কি করিয়া? একে ত' দিদির পীড়া-পীড়িতেই এইরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে—তাহার পর হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত নিজের শ্রীহীন দেহের দিকে যতবার ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছি, ততবার এই কথাই ভাবিয়াছি—এ দেহ আর কোন কাজেই লাগিবে না; এখন হইতে এই ব্যর্থ, অকর্ম্মণ্য, কিম্ভূত-কিমাকার দেহটা কেবল মানুষের করুণা ভিক্ষা করিয়াই বাঁচিয়া থাকিবে।

কিন্তু মানুষের এই কৃপাপ্রার্থী দেহের প্রতিও যে একদিন নারীর সেবার জন্য ডাক আসিতে পারে, বসন্তের দুরন্ত বাতাস আসিয়া যে একদিন তাহার কর্ত্তব্য-পালনের তুচ্ছ একটু দাবী লইয়া এই ভাঙা-খোঁড়া বিকৃত জীবনের উপর যৌবনের পর্ব্বদিন ঘোষণা করিয়া বসিতে পারে—ইহা আমি সত্যই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। দেহের একটি শ্রেষ্ঠতম ইন্দ্রিয়ের এই অকস্মাৎ পতনে আমার অন্তরের ভিতর এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, আমার অপরাপর সচেতন ইন্দ্রিয়গুলিও কেবলমাত্র তাহাদের স্ব স্ব নাম লইয়াই বাঁচিয়া আছে। একই দেহের ভিতর একই সঙ্গে এতকাল নিরবচ্ছিন্ন বাসের ফলে পরস্পর ইন্দ্রিয়দের ভিতর একটা ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ্যভাব নিশ্চয়ই জন্মিয়াছিল, গন্ধবিহীন সেই অংশের পানে চাহিয়া চাহিয়া হয়ত একটা গভীর শোকও তাহাদের উথলিয়া উঠিত—এবং সেই শোকের সম-বেদনায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির কর্ম্মচেতনা কেবল লোক-চক্ষুর ভদ্রতাটুকু রক্ষা করিয়াই চলিতে সুরু করিয়া-ছিল। তাই যৌবনের ডাকে তাহাদের আর উত্তর দিবারও কথা ছিল না!

কিন্তু ঘটনাচক্রের বিড়ম্বনায় আবার এ কি খেলা আরম্ভ হইল! এ আদর-সম্ভাষণ যে আজ আমার পক্ষে জুলুম বিশেষ। কি করিয়া যে আজ তাহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিব—ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

* * * *

দরজা ঠেলার শব্দে চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিলাম—ধীর, কুণ্ঠিত পদক্ষেপে, ব্রীড়াবনত মস্তকে পক্ষীরাণী আমার খাটের দিকেই আগাইয়া আসিতেছে।

সঙ্গে সঙ্গেই তড়িৎবেগে বিছানার চাদরের এক প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া দুইটি পা'কে সযত্নে ঢাকিয়া ফেলিলাম এবং বারবারই সতর্কদৃষ্টি নিক্ষেপে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম—চাদরের আবরিত প্রান্তটুকু সরিয়া না যায়!

পালঙ্কের অতি সন্নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেই এইবার পাখীর পানে ভালো করিয়া দুই চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম—দিদির স্বহস্তে ও সযত্নে-রচিত নিপুণ বেশভূষার অপূর্ব্ব পারিপাট্যের ভিতর পাখীর ঐ লাবণ্য-ভরা মুখখানি শ্যামলচ্ছটায় ঢল ঢল করিতেছে। কাণের ঐ হীরার শ্বেত-স্বচ্ছ দুল, আর পরণের শালের ধব্‌ধবে সাদা শাড়ী। সেই শাড়ীকে আবেষ্টন করিয়া বৈদ্যুতিক আলোর তীব্র রশ্মি ছড়াইয়া পড়িয়া পাখীর স্নিগ্ধ কালো রূপের ছটা আমার শয়নঘরটি আলোকিত করিয়া তুলিল—কবি হইলে সে রূপের যথার্থ ছবি আঁকিতে পারিতাম।

কিন্তু আমি কবি নই; আমি খোঁড়া।

আর খোঁড়া বলিয়াই আমার প্রাণে যে শিহরণ জাগিয়া উঠিল তাহা পুলকের নয়—ভয়ের।

ভয়ে ভয়ে সসঙ্কোচে তাহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। বলিলাম—এসো, এসো।

প্রথম সম্ভাষণের শব্দগুলি যদি বা উচ্চারণ করিলাম, কিন্তু আর ত' কথা খুঁজিয়া পাই না!

দুই বৎসর মুন্সেফী করিয়া আসিয়া শেষে যে একদিন একান্ত সাধারণ একটি অষ্টাদশ-বর্ষীয়া কিশোরীর সম্মুখে কথা বলিতে গিয়া এমন অচিন্তিতভাবে স্তব্ধ হইয়া যাইতে পারি—ইহা অন্ততঃ যে-কালে জজ-ব্যারিষ্টারের মেয়েরা আসিয়া দিদির দ্বারস্থ হইতে চাহিয়াছিল, সেকালেও মনে করিতে পারি নাই। বোধ করি বা দশ মিনিট কাল এমনি ভাবেই অতিবাহিত হইয়া গেল। আমার এই আড়ষ্ট-জড়িত ভাব পাখীকেও যে কিঞ্চিৎ বিব্রত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহা পাখীর দুইটি চক্ষুর চঞ্চল গতি-বিধিকে অনুসরণ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম।

জড়িত কণ্ঠে নেহাৎ যেন অপরাধীর মতই বিনীত-ভাবে কহিলাম—বসো, তুমি ভালো করে বসো, পাখী। দিদি তোমাকে খুব ভালোবাসেন?

একটু হাসিয়া ফেলিয়া পাখী অবিচলিত কণ্ঠে কহিল—হাঁ। ভালোবাসেন—খুব বাসেন। তুমিও ত' বাসো!

—হাঁ। হাঁ, আমি—আমিও বাসি বৈ কি! কিন্তু…

সমস্যা-বোধক শব্দটির পর আর কোন শব্দই আমার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইল না। প্রথম আলাপনেই গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিলাম; কিন্তু পাখীর হাবভাবটা যেন অনেকটা সহজ! প্রথমটা একটু বিস্মিত হইলাম—তাহার পর বুঝিলাম, তাহাকে যতটা অশিক্ষিতা বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, সে তাহা নহে। তাহা ছাড়া পাখীর সম্মুখে এই কয়দিন অনবরত দিদি যে হিতোপদেশের ঝুলি খুলিয়া বসিয়াছিলেন তাহার ফলে এই কয়দিনের মধ্যেই পাখী বেশ 'স্মার্ট' হইয়া উঠিয়াছে!

বলিল—থেমে গেলে কেন, 'কিন্তু' কি?

বলিলাম—না, ও কিছু নয়—বলছিলাম অমলের সঙ্গে আলাপ করতে তুমি ইতস্ততঃ করো না। ও আমার সহপাঠী বন্ধু, খুব ভালো ছেলে, অতি বিনীত। ওর সঙ্গে আলাপ করলে সুখ পাবে; আমি ওকে বলে দিয়েছি বিকেলে রোজ আসবে—চা-টা করে দিও—বুঝলে?

—সোজা কথা, বুঝেছি। তোমার 'কিন্তু'র জবাবটা ত' আর দিলে না ?

—না না সে কিছু নয়, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে—বড্ড গরম লাগছে—শুয়ে পড়ি !

পাখী কহিল—রোজই এমনি তোমার ঘুম পায়, না হঠাৎ আজ পেয়েছে ?

ভয়ে ভয়ে কহিলাম—হাঁা, আজকেই পেয়েছে। তুমি যাও—রাত অনেক হলো দিদির কাছে গিয়ে শোও গে।

অসঙ্কোচে পাখী কহিল—আজকে এইখানেই আমার শোবার ব্যবস্থা দিদি করেছেন—হোক্ রাত, তুমি শোও, আমি হাওয়া করছি।

ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলাম—না না, হাওয়া করতে হবে কেন ?

—এই যে বললে—গরম লাগছে।

—ওঃ, তা বললাম বটে—কিন্তু হাওয়া……

লক্ষ্য করিলাম অতি ক্ষীণ একটু শুষ্ক হাসি পাখীর সেই মিঠি ঠোঁটের গায়ে ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল।

কহিল—আবার 'কিন্তু'র প্রয়োজন নেই—তুমি ঘুমোও।

আর কথা কহিলাম না। পায়ের উপর বিছানার চাদরটি ভালো করিয়া টানিয়া লইয়া মড়ার মত পড়িয়া রহিলাম। ঘুমের আধিক্য আমার যতই থাকুক—ঘুম সে-রাত্রে আমার সহজে আসে নাই !

ঠিক এমনি নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকিতে থাকিতে এক সময় স্পষ্ট অনুভব করিলাম—একটি দীর্ঘনিশ্বাস যেন কাহার অন্তর মথিত করিয়া ঐ ঘরটিতে ছড়াইয়া পড়িল ! কল্পিত এই নিদ্রিত মানুষটির অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ সেই নিশ্বাসের গভীর বাষ্পে যে বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল—সে খবর পক্ষীরাণী পাইয়াছিল কি না জানি না। কি কষ্টে যে সে রাত্রিটা অমনি ঘুমের ভাণ করিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়াছিলাম—সে কেবল জগদীশ্বরই জানেন। এক একবার মনে হইল, দিদির দোরগোড়ায় কাঁদিয়া গিয়া পড়ি, চীৎকার করিয়া বলি—দিদি এ তুমি কি করলে ? বাঙ্লাদেশে ঠিক আমারি মত পা-কাটা হাত-কাটা যাহোক একটা কাণা খোঁড়া মেয়ের সন্ধানও কি মিলতো না ? যদি তোমার এই ইচ্ছেই ছিল—অমনি একটি ইন্দ্রিয়-বিহীন মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধন জড়িয়ে দিলে না কেন ? এই সতেজ, সুপুষ্টা, পরিপূর্ণা একটি যুবতীর জীবনকে এমন করিয়া ব্যর্থ করিয়া দিলে কেন ? আজকার এই একটি দীর্ঘনিশ্বাসের বিরুদ্ধে একটি কথা বলিবার অধিকারও যে আমার মত এই সঙ্গতিহীন জীবনের নাই ! তোমার এত বুদ্ধি দিদি, ছোটো খাটো কত কিছু তোমার লক্ষ্যে আসে,—আর এইটুকু বুঝলে না ;—এই ক্ষোভ আজ আমি রাখি কোথায় ? হাবা নয়, বোকা নয়—একটা বুদ্ধিমতী নারীর কৃপার তলে আমি নীড় বাঁধি কি করিয়া ? ঐ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে একটুও ত' আত্মগোপন করিবার মত ঠাঁই খুঁজিয়া পাই না।

সারা রাত্রি নিজের মনে কেবলমাত্র নিজের দুর্ব্বলতার স্বপক্ষেই কাঁদুনী গাহিয়া গেলাম। কিন্তু পাখীর ঐ উদ্বেলিত অন্তরের পানে আমার ব্যাধিগ্রস্ত মন তাহার প্রকাশহীন জীর্ণ চিন্তার বোঝা ক্ষণেকের জন্যও নামাইয়া রাখিয়া একটু সুদৃষ্টি মেলিয়া চাহিল না। চাহিলে হয়ত তখন দেখিতে পাইত—পাখীর ঐ গভীর নিশ্বাস ঘৃণার পাক হইতেই উত্থিত নয় ; বা কেবলমাত্র করুণার পাত্রের প্রতিই তাহা বর্ষিত হয় নাই !—নেহাৎ আত্মজনের ব্যথায়, ও করুণ মূর্চ্ছিত সুর অনাবিল ভাবেই লাঞ্ছিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অধিকন্তু হয়ত বা আমার সেই 'কিন্তু' অব্যক্ত, অস্পষ্ট অভিযোগ—আমার সেই আত্ম-ধিক্কার পাখীর প্রাণে গিয়া স্পষ্ট পরিষ্কার হইয়া উঠিয়া আমারি ব্যথার প্রতিধ্বনিতেই তাহার অন্তর ভরিয়া দিয়াছে। এ বিকলাঙ্গের প্রতি করুণা-নিশ্বাস নয় ; কৃপার জলও নয় !

কিন্তু আমার ঐ অন্ধ দুইটি চক্ষুর অন্ধ-দৃষ্টি দিয়া তখন কি অত সব সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিবার শক্তি ছিল ? বরং মনের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া এই প্রকাণ্ড

বড় সমস্যাটিই পাকাইয়া উঠিতেছিল যে, কি করিয়া এখন পাখীর ঐ ঘৃণা ও করুণ দৃষ্টি হইতে নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারি ? এই নীরন্ধ্র অন্ধকারের ভিতর কোথাও কি এতটুকু ক্ষীণ আলোর রশ্মিও চোখে পড়ে না,—যাহাতে এই মেয়েটির জীবন আবার সম্পূর্ণ করিয়া ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া দিতে পারি ?

পথহারা পথিকের সুপথ নির্দ্দেশের বেলায় আমার পরম বন্ধু জগদীশ্বরের খোঁজ মিলিল না। বরং বর্ত্তমান এই বিক্ষুব্ধ জীবনের বুদ্ধি-শুদ্ধি গোল পাকাইয়া তাল পাকাইয়া এমন সব আজগুবি অসম্ভব অনাচারী কল্পনাই সুরু করিয়া দিল যে, তাহাতে মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল—তাহাও বোধ করি আর থাকে না।

শাস্ত্রমতে যখন পাখীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ পাকা হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার নিয়মকানুনের অন্ততঃ মোটা মোটা ধারাগুলা মানিয়া চলা আবশ্যক এবং আমার অন্তর, ভিতরে ভিতরে অতি সঙ্গোপনে যদি বা কোন বাদ-প্রতিবাদের ঘোলা তর্কজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া আপন খুশীমত কোনোরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়া থাকে—তাহাও বাহিরে অপ্রকাশই থাকুক।

আমি পাখীকে কিন্তু সঙ্কোচ করিয়াই চলিতে লাগিলাম!

শারীরিক অসুস্থতার নালিশ জানাইয়া দিদির কাছ হইতে কোন প্রকারে অনুমতি লইয়া সন্ধ্যার পরেই দরজায় খিল লাগাইয়া শুইয়া পড়িতাম। কিন্তু দিদির অতি-সতর্ক দৃষ্টিকে এড়াইয়া সব রাত্রিতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতাম না; এবং সে-রাত্রিগুলি আমি যে-ভাবে পার করিয়া দিয়াছি, তাহা কেবল আমার অন্তর্য্যামীই জানেন।

আজ-কাল আর দিদি পাখীকে লইয়া বেড়াইতে যান না। সন্ধ্যাবেলায় ভ্রাতৃবধূকে লইয়া সান্ধ্য-ভ্রমণের ভারটি ভ্রাতার উপর ন্যস্ত করিয়াই দিদি মহানন্দে নিরুদ্বেগে দিন কাটাইতেছেন। কিন্তু বৈকালের ঐ মৃদুমন্দ হাওয়াটুকু আমার কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিবার পক্ষে যে যথেষ্ট নহে—এ খবর তিনি রাখিতেন না। তাই কোন প্রকারে কিছু দূর অগ্রসর হইলেই 'বেবী-কার'টি অমল ও পাখীকে লইয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইত; আমি অসুস্থতার ভাণ করিয়া মধ্যপথেই নামিয়া ট্যাক্সি করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম।

দরজায় পা দিতেই দিদির জেরা সুরু হইত।

—চলে এলি যে জগু ?

—গা'টা যেন কেন বমি বমি করছে দিদি—তাই চলে এলাম।

—ওরা ?

—অমলকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি; যখন বেরিয়েছে একটু বেড়িয়ে আসুক!

—প্রায়ই তোর মাঝপথে অসুখ হবে—আর অমলকে দিয়ে তুই বেড়াতে পাঠিয়ে দিবি! কি আক্কেল তোর জগু!

আমি জিব কাটিয়া বলিলাম—ছিঃ দিদি, অমল ভাইয়ের মত, তুমি এ-সব কথা কি বলছ ?

আমার এই অপ্রস্তুত ভাব-বৈলক্ষণ্য বা এই অকাট্য যুক্তিকে মোটেই গ্রাহ্য না করিয়া দিদি বলিতেন—ও-সব পুরানো কথা রেখে দে জগু। আর আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—কিন্তু পাখীও যে কেবলমাত্র তোরি জেদা-জেদিতে তোর মন রেখে চলেছে।

—কেন তোমাকে কিছু বলেছে না কি ও ?

—বলেছে বৈ কি ? আমি তবু চুপ করে ছিলাম; কিন্তু আর ত' পারি নে। ও বালীগঞ্জী-ঢং আমাদের বাড়ীতে চলবে না জগু—এ আমি তোমায় বলে রাখছি।

—আচ্ছা, বন্ধ করে দেবো।

—হ্যাঁ, তাই দিও।—

বলিয়া দিদি আমার শারীরিক ছোটো-খাটো ব্যাধির বিপক্ষে তোড়-জোর সুরু করিয়া দিলেন।

সুখে দুঃখে এমনি করিয়া দিন কাটিয়া যাইতেছিল। সেদিন সন্ধ্যায় চা'র আসরটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

দোতলা সম্পূর্ণ আমারি দখলে।

তেতলা দিদির রাজত্ব। সেখানে তিনি তাঁহার সসম্ভ্রম-ব্যক্তিত্বকে আমাদের চোখের আড়ালে রাখিয়া পূজা-আহ্নিকে ব্যাপৃত থাকিতেন। আমাদের দোতলার খোঁজ তিনি রাখিতেন না। আমি বৌ'কে লইয়া মনের মত করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করি—ইহাই তাঁহার চিরকালের ইচ্ছা।

পাখী ষ্টোভ জ্বালাইয়া চা তৈয়ারী করিতেছিল। অমল তাহার ছোটো-খাটো রসদ জোগাইতেছিল। আমি চুপ করিয়া চৌকীটার উপর বসিয়াছিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি চা খাই না, কারণ আমার অভ্যাস নাই। কিন্তু পাখীরও যে অভ্যাস ছিল, তাহাও নয়; তবে বর্ত্তমানে সে আমার এবং অমলের নেহাৎ অনুরোধেই চা ধরিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং তাহারা দুইজনে দুই বাটি ভাগাভাগি করিয়া লইল— আর আমি একধারে নির্জ্জীবের মতই পড়িয়া রহিলাম। অমল বলিতেছিল—যাই বলো জগদীশ, বৌদি'র আমার হাত মিষ্টি—তুমি চা খেলেও না, বুঝলেও না!

না হাসিলে নয়, তাই একটুখানি হাসিলাম।

আমাকে লক্ষ্য করিয়াই বোধ করি পাখী কহিল—ওগো শুনচো, আমার হাত না কি মিষ্টি—দিন-দিনই নূতন নূতন আবিষ্কার হচ্ছে দেখ্‌ছি।

অকুণ্ঠিত নির্ভীকভাবে অমল কহিল—এ আবার আবিষ্কার কি গো বৌদি'—সত্য কথা বল্লাম মাত্র।

পাখী কহিল—তা বটে, সত্য কথা বটে। তুমি একটি বিয়ে করো অমল ঠাকুরপো।

হো হো করিয়া অমল হাসিয়া উঠিল।

পাখী যেন একটু বিরক্ত হইয়াই কহিল—হাস্‌লে যে—কথাটা বুঝি মনের মত হয় নি, না?

একটু হাস্‌লেই যদি তুমি আমার মনের খোঁজ পাও, তাহলে ত' এখন থেকে তোমায় কিছু না বলে দিলে ও চল্‌বে—কি বল?

—বলাবলির আর কি আছে? তবে এই কথাটা মনে রেখো ঠাকুরপো, এত বড় বিপুল পৃথিবী—একে হাতের মুঠোর ভেতর পুরে ধূলি-মুষ্টির মত ছুঁড়ে ফেলতে চাইলেই তা পারা যায় না! প্রজাপতির মত ডানা উড়িয়ে চলা দু'চারদিন চলে, কিন্তু চিরদিন চলে না, ডানা একদিন খসে পড়েই!

পাখীর কথা শুনিয়া আমিও কিঞ্চিৎ অবাক হইয়া গেলাম!

অমল কহিল— তাক্ লাগিয়ে দিলে বৌদি', তুমি যে আবার লেকচার দিতেও জানো এ ত' কোনদিন শুনি নি। খুব ত' বড় বড় বচন আওড়ে গেলে, আচ্ছা, বিয়ে আমি করতে না হয় রাজিও হলেম; কিন্তু ঠিক তোমারই মত একটি কালো পাখীকে ধরে এনে দিতে পারবে কি?

পাখীর মুখের দিকে লক্ষ্য করি নাই, কেবল তাহার উত্তরগুলি কাণে আসিয়াছিল।

পাখী কহিল—আমায় ব্যঙ্গ ক'রে আর লাভ কি? সত্যই যখন আমি কালো, তখন পটের পরী বলে সম্ভাষণ করলে আমি অন্ততঃ সুখী হবো না। বিধাতার কাছ থেকে এই যেটুকু পেয়েছি এও যদি না পেতাম, তা হ'লেও ত' কিছু বলবার ছিল না!

—তা বটে, কিন্তু ব্যঙ্গ তোমায় করি নি বৌদি', একটুখানি সত্য কথাই বলেছিলাম। চোখ বুজ্‌লেই যেন দেখ্‌তে পাই—কোথায় কোন্ 'ময়না-পাড়ার মাঠে' অনাবৃত, অকুণ্ঠিত কৃষ্ণকলির মত তোমার ঐ মুখখানা! রাগ করো না বৌদি',—একটি সুললিত ছন্দ জিহ্বাগ্রে এসে পড়ে—

'কালো? তা সে যতই কালো হোক্—
দেখেছি তা'র কালো হরিণ-চোখ।'

আচ্ছা জগদীশই বলুক, সত্যি কি না!

হঠাৎ স্ত্রীর দিকে চোখ পড়িতেই লক্ষ্য করিলাম—তাহার কালো মুখটি ইতিমধ্যে কোন্ এক সময়ে আরো

কালো হইয়া উঠিয়াছে! আর বিলম্ব করা চলিল না। ধীরে ধীরে উঠিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলাম।

বহুদিন পরে আজ আবার একটু গভীরভাবে ভাবিতে বসিলাম। ধীরে ধীরে কোন্ সময়ের ভিতর যে অমলের হাব-ভাব আলাপনের ভঙ্গী এত হাল্কা হইয়া আসিয়াছে—এতদিন তাহা টের পাই নাই! তাই আজ তাহার এই অনধিকারের উচ্ছ্বাস—এই প্রগল্ভতা—আমাকে যেন একেবারে তাক্ লাগাইয়া দিল! ইহার অন্তর্নিহিত ভাবটা আজ কতক বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আজ যদি বা তাহা একটু আধটু বুঝিতে পারিয়াই থাকি, তবে তাহার জন্য মনের ভিতর ছিটে-ফোঁটা ক্ষোভেরই বা সঞ্চার হয় কেন? আমার অসুস্থ মনের বীভৎস দুর্ব্বলতাই যে এতদিন ইহার খোরাক জোগাইয়া আসিয়াছে তাহাতে ত' আর ভুল নাই। তাহা না হইলে পাখীর জীবনকে কি ওই সৃষ্টি-ছাড়া অদ্ভুত পথের উপরে এমন করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিতাম? সান্ধ্য-ভ্রমণের মধ্যপথে কি অমন করিয়া পাখীকে ও অমলকে একমাত্র সোফারের দৃষ্টিপথে ফেলিয়া চলিয়া আসিতে পারিতাম?—কিম্বা দিনের পর দিন এই ভাবেই কি একটি চা'র আসর তৈয়ারী করিয়া তাহার ভিতর একটি দ্বিতীয় পুরুষের সান্নিধ্য উপভোগ করিবার জন্য নিজের স্ত্রীকে স্বামী হইয়া ঠেলিয়া দিতে পারিতাম? কিন্তু কৈ তাহাতেও ত' আমার ভাঙ্গা-পা জোড়া লাগিল না; বরং নিজের এই নির্লজ্জ ঘৃণিত নীচতায় নিজেই মরিয়া গেলাম। ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, গ্লানি-বহুল ভাববিকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া আমার অন্তরের মধ্যে একরূপ অদ্ভুত পীড়ার সৃষ্টি করিয়া তুলিল!

মানুষের জীবনের অধ্যায় কয়েকটি হয়ত লেখাই থাকে। সময় ও ক্ষেত্রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাহা ধীরে ধীরে যে জায়গাটায় আসিয়া থামে—হয়ত সেই স্থানেই তাহার পূর্ণচ্ছেদ পড়িবার নিয়ম। প্রায় ক্ষেত্রেই অধ্যায়গুলি মিলমাত্র হয় কি না জানি না; আমি কেবল আমার জীবনের অভিজ্ঞতার কথাই বলিতেছি।—

চা'র আসরে আমি আর যাই নাই।

তাহার চার-পাঁচ দিন পরেই পাখী যেন ঝড়ো-পাখীর মতই উড়িয়া আসিয়া আমার ঘরে পড়িল।

তাহার অসহিষ্ণুভাব ও উত্তপ্ত কণ্ঠ শুনিয়া আমি বিচলিত হইয়া উঠিলাম। পাখী কহিতে সুরু করিল—তোমার পা দু'টোই না হয় গেছে—কিন্তু পা গেলেই কি মানুষের মনুষ্যত্বটুকুও চলে যায়?

মনে হইল পৃথিবীটা যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল! নরম তাকিয়াটাকে যতদূর সাধ্য জোরে চাপিয়া ধরিলাম।

আমার এই আকস্মিক চাঞ্চল্যটুকু এত উদ্বেগের মধ্যেও বোধ করি পাখীর চোখে পড়িয়াছিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যেই সে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারপর আমার কোলের কাছে মাথা রাখিয়া সে কহিতে লাগিল—এই তোমার অতি-বিনীত—অতি ভালো ছেলে! এই বাদের খপ্পরেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখছিলে?

প্রথম সম্ভাষণের ধাক্কাটুকু কাটিয়া গেল।

অমলের সুজনতা যে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে—পাখীর অভিযোগে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তথাপি অপেক্ষাকৃত শান্তকণ্ঠে অথচ সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি, কি হয়েছে?

—কি হয়েছে আবার জিজ্ঞাসা করছো? অন্য কেউ হ'লে হয়ত এতদিন 'কি হয়ে' যেতো।—কিন্তু আমি কি তোমাকে কোনোদিন তোমার দুর্ব্বল ক্ষত-স্থানে আঘাত করে কিছু বলেছি?

—না বলো নি—যদি বলতে সেই ভয় ত' ছিল।

—আমাকে না চিনে, না জেনে অকারণে ভয় ক'রে নিজের জীবনকেই ত' খর্ব্ব করে ফেলেছো, অথচ তাতে আমাকেও সম্মান দেওয়া হয় নি!

—তা ঠিক। ভয়, ব্যথা, সঙ্কোচ — সব মিলে আমার মাথাটা হয়ত একটু বিগড়েই দিয়েছিল!

—কিন্তু কিসের এত ভয়, এত সঙ্কোচ বলতে পার? এই কালো কুৎসিৎ দীন-দুঃখীর মেয়েটিকে আজ ভয় করে চলেছো—কিন্তু যে-দিন তুমি মুন্সেফ ছিলে—যখন তোমার ঐ অঙ্গ দুটোও ছিল—যখন তোমার বাড়ীতে আসবার আমার কোনো কথাই ছিল না—তখনো কি আমার সেই দৈবাৎ আগমনে তুমি আমায় ভয় করে চলতে, না আমাকেই ভয় ক'রে চলতে হতো?—বলতে পারো?

—ওগো ক্ষমা করো, ভুল করে ফেলেছি—তোমায় চেনবার সুযোগ আমি নিজেই নিই নি! স্বার্থপরের মত নিজের যন্ত্রণাটাই বড় করে দেখেছি, তাই তোমার ভালোবাসাটা যে কত বড় কখনো তা তাকিয়ে দেখি নি। তুমি যে আমার দুঃখকেই তোমার দুঃখ বলে ঘাড় পেতে নিতে পারো—সে কথাটা একবারও মনে হয় নি আমার। কিন্তু আমি প্রায়শ্চিত্ত করতেও রাজি আছি। সুতরাং আর দুঃখ রেখো না।—চলো যাই আজ দু'জনে মিলে দিদিকে প্রণাম ক'রে আসি।

বয়ঃসন্ধি

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বিদ্যারত্ন

কোয়েলা ননদী থেকে থেকে ডাকে, বউ-কথা-কও পাখী
বকুলের আড়ে মুকুল-দোলায় নিদ্রা ভাঙ্গালো নাকি!
'চোখ গেল' ওরে 'চোখ গেল' ও যে চোখের কাজল মুছি,
দিবস রজনী কেঁদে কেঁদে মরে কার আঁখি দু'টি খুঁজি!
চক্রবাক কি শুনেছে দু'কানে চক্রবাকীর ডাক,
—ধু ধু বালুচরে মিলন-তিয়াসে বুক পুড়ে হয় খাক!
মহাশ্বেতা কি মগ্ন হয়েছে পুণ্ডরীকের ধ্যানে,
শিবের সমাধি ভাঙিল বুঝি রে পার্ব্বতী-কল্যাণে!
কোন সে যুগের শীরি
পাষাণ-গলানো প্রেমে খুঁজে পায় ফরহাদে
ঘুরি' ফিরি'!

যমুনার জল হ'ল যে উতল, ছল-করা অভিসার,
সন্ধ্যা বেলায় হারাল কি পথ বাঁশি-রবে রাধিকার!
সোনার কাটির পরশ-ছোঁয়ায় রাজকুমারীর চোখ,
পেল কি হঠাৎ সন্ধানে আজ স্বপ্নের মায়ালোক!
আজি কি বালার বক্ষে জেগেছে শকুন্তলার ছল,
দিয়াছে কি লাজ চরণ জড়ায়ে বন-লতিকার দল!
এতদিন ছিল ভুবনের যে সে ধরা দিতে চায় ফাঁদে,
রাঙা-অলকার সন্ধান নিতে বিরহী যক্ষ কাঁদে!
ও বালা কি জানে বিশ্বের দ্বারে উৎসবে রত যা'রা,
শাশ্বত চির সৃষ্টি-লীলায় আহ্বান করে তারা!
কত এতে বিস্ময়,
দিন কতকের মাঝে পাবে তা'র সবটুকু পরিচয়।

দেবমূর্ত্তি-শিল্পের ক্রমবিকাশ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ

কুমারটুলীর সুপরিচিত নবীন দেবমূর্ত্তি-শিল্পী শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল গত বছর সরস্বতীপূজার পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্প-পদ্ধতি-অনুসারে-গঠিত বহুবিধ সরস্বতী মূর্ত্তির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন; সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিবসে, অনুষ্ঠানের সভাপতিরূপে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেবমূর্ত্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেছিলেন—"আমরা হিন্দু; সগুণ ব্রহ্মের নানা মুখে তাঁহার নানা প্রকাশকে তাঁহারই অংশভাবে দেখিতে আমরা অভ্যস্ত, এবং এইরূপ দেখাকে ব্রহ্ম-সাধনেরই প্রথম ছন্দ বলিয়া আমরা মনে করি। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলিকেও আমরা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথ বলিয়া মনে করি। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ — যে-পথেই আমরা অতীন্দ্রিয় জগতের দ্যোতনা পাই, সেই পথই আমরা স্বীকার করিয়া লই। নিজের উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষায়, ব্রহ্ম-সাযুজ্যের আশায়, মানুষ আকার কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারে না—সে আকার হয় রূপময়, না হয় শব্দময়। সেই আকারের প্রকাশ করিবার চেষ্টা হয়—এক, চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকলার সাহায্যে এবং দুই, শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কবিতা ও সঙ্গীতের সাহায্যে।"

শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক মহাশয়ের কথাগুলি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের জীবনে দেব-দেবীর মূর্ত্তির প্রয়োজনীয়তা নিতান্ত গৌণ নয়। আমাদের চিত্তকে ধ্যানলোকের পানে উর্দ্ধায়িত ক'রে তোলবার পথে এই মূর্ত্তিগুলি বহু শতাব্দী ধ'রে প্রচুর সাহায্য ক'রে এসেছে। সুতরাং এই মূর্ত্তিগুলিকে ধ্যান-সম্মত, কলা-সঙ্গত এবং ভক্তি-রস-সমৃদ্ধ রূপ দান করবার জন্তে শিল্পীকে আমাদের অবশ্য প্রয়োজন আছে।

বাঙ্‌লাদেশে বাগ্দেবী বীণাপাণি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পূজিতা; আজকাল বাঙ্‌লার প্রতি ঘরে ঘরেই তাঁর আরাধনা! এবং এই আরাধনার উদ্যোগী বাঙ্‌লার ভবিষ্যত আশা-ভরসা, তার উন্মেষোন্মুখ কিশোর ও যুবক ছাত্রের দল! সুতরাং, অধুনা দেবমূর্ত্তি-শিল্পীরা যদি এই সর্ব্বজনবন্দিতা দেবী সরস্বতীর মূর্ত্তি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে থাকেন, তার মধ্যে আশ্চর্য্যের কিছুই নেই। বরং তা সবিশেষ আনন্দের কথা।

চোখের পথ মেনে নেওয়ায় এবং মানবদেহকে দেবপ্রতীক রূপে ব্যবহার করা দোষের না হওয়ায় হিন্দুর শিল্পে যে ঐশ্বর্য্য এসেছে, জগতে তা দুর্লভ। ঐশী শক্তির বিশেষ প্রকাশ কল্পনা ক'রে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁদের অন্তরে ভাব-গাম্ভীর্য্য, চিন্তার বিরাটত্ব এবং অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবোধ, এই সকল

মনোবৃত্তিগুলির সহায়তায় কতকগুলি মহীয়সী দেবতামূর্ত্তি আমাদের জীবনপথের এবং ধর্ম্মসাধনের সহায়রূপে আমাদের জন্য রেখে গেছেন। বহু যুগের সাধনা এবং আরাধনার ফল—এই সকল দেবমূর্ত্তিগুলি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ ক'রে আজ আমরা ধন্য হয়েছি।

সুনীতিবাবু বলেছেন—"হিন্দুর হাতে দেবমূর্ত্তির গঠন গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। ধ্যানের দেবতার বিশিষ্টতা, তাহার মানবিকতার ঊর্দ্ধে তাহার অধিষ্ঠান এতাবৎ হিন্দু কখনো ভুলে নাই। যে ভাবের ভাবুক হইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঈশ্বরের প্রতীকস্বরূপ দেবমূর্ত্তির কল্পনা করিয়া গিয়াছেন প্রথমতঃ সেই ভাবটি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, এবং আমাদের সাধনায় সেইরূপ ভাবের উপযোগিতাকেও বুঝিতে হইবে। তাহার পরে সেই-ভাবের বিশুদ্ধি যথাসম্ভব রক্ষা করিতে হইবে।"

ভাব-বিশুদ্ধির জন্য শিল্পীকে দেবমূর্ত্তির গঠন-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ হ'তে হবে; দেবমূর্ত্তি গঠন করবার জন্য যে একটি বিশেষ শিল্প-পদ্ধতি আছে সম্যকরূপে সে সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন না ক'রে সচরাচর শিল্পীরা যে-সকল মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন তাদের মধ্যে না থাকে ধ্যানসম্মত ভাবের দ্যোতনা, না থাকে ভক্তি-রস-সমৃদ্ধ রূপের বিকাশ!

দেবমূর্ত্তি বাস্তবের অনুকরণ নয়; বাস্তবের আধারে ভাবের প্রতীক মাত্র। দেবমূর্ত্তি-শিল্প মানবদেহের অনুকরণাত্মক হ'লেও, তার প্রাণ অনুকরণে নয়, ছন্দগতিতে নয়, তার প্রাণ ব্যঞ্জনায়।

এই ব্যঞ্জনার জন্য, ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কতকগুলি বিশেষ উপায় প্রাচীন শিল্পীরা উদ্ভাবন ক'রে গিয়েছেন। সেই প্রাচীন ভাবধারাটিকে এ-যুগের উপযোগী ক'রে যদি তাকে অব্যাহত রাখতে চাই, তা'হলে তখনকার দিনের সেই নির্দ্দিষ্ট উপায়গুলিও আমাদের যথাসম্ভব মেনে চলা উচিত। অন্য উপায় অবলম্বন করলে, ভাব-সঙ্কোচ ঘটবার আশঙ্কা আছে।

দেবী সরস্বতীর আদিকথা সম্বন্ধে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—"সরস্বতী মূর্ত্তি প্রথম প্রস্তুত করেন শ্রীকৃষ্ণ; ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে সে-কথা লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাঁর রূপ-সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত নাই।"

বিদ্যা-জননী-রূপে দেবী সরস্বতী সাধারণভাবে পূজিতা হ'তে থাকেন প্রথম শতাব্দী থেকে। মথুরার কঙ্কাইটিলা নামক স্থানে তাঁর একটি প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। যদিও সে-মূর্ত্তির বহু অংশ ভগ্ন ছিল,

তথাপি তার গাত্র-সংলগ্ন লেখা থেকে বোঝা যায়, মূর্ত্তিটি দেবী বীণাপাণির!

পঞ্চম শতাব্দী থেকে আরম্ভ ক'রে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে দেবমূর্ত্তি-শিল্পের যে পদ্ধতি চ'লে এসেছিল এবং অধুনা যে পদ্ধতি একেবারেই লুপ্ত হয়েছিল, সেই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ পাল তাঁর মূর্ত্তিগুলি রচনা করেছেন। কিছুদিন যাবৎ সাধারণ কুম্ভকারগণ দেবমূর্ত্তি-শিল্পকে

হত্যা ক'রে দেবী-মূর্ত্তির নামে যে-সকল ভাবহীন নারী মূর্ত্তি তৈরী করছিলেন, সে-সকল মূর্ত্তিগুলি আমাদের

মনে ভাব ও ভক্তিরসের উদ্রেক করতে সক্ষম হচ্ছিল না। বহু আয়াসে প্রাচীন ভারতের দেবমূর্ত্তি শিল্পের লুপ্তপ্রায় পদ্ধতিকে সাধনার দ্বারা আয়ত্ত ক'রে সেই সাধনালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে নিতাইবাবু দেবী সরস্বতীর যে-সকল মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণ করেছেন, ভাবের ঐশ্বর্য্যে এবং শিল্পনৈপুণ্যের উৎকর্ষে মূর্ত্তিগুলি বাঙ্‌লার ছাত্রসমাজকে এক নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

বাঙ্‌লার দেবমূর্ত্তি-শিল্পের ক্ষেত্রে নিতাইচরণ যে অভিনব ভাবধারা এনে দিয়েছেন, সেই সম্পর্কে অধ্যাপক সুনীতিবাবু বলেছেন — "যেরূপ অবস্থায় বাঙ্‌লার ছাত্রসমাজ আজকাল পড়িয়াছে তাহাতে সরস্বতী মাতা আর জ্ঞানের দেবতা থাকিতেছেন না; তিনি এখন আমোদের ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া পড়িতেছেন। এবং যেমন সরস্বতী পূজার বাহুল্য দেখা যাইতেছে, সরস্বতী মূর্ত্তির নূতন নূতন পরিকল্পনাও বহুস্থলে তেমনই উৎকট, উদ্ভট বা বাস্তবের পীড়াদায়ক অনুকরণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। একটি সুন্দর নয়নাভিরাম রমণী-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াই অনেকে খুসী হইতেছেন — ধ্যান বা ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখা হইতেছে না।

"এই রূপে যে দেব-মূর্ত্তিকে মাত্র কলা-বিলাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে, তাহার মূলে আছে শিল্পীর অজ্ঞতা। তদুপরি বিদেশীয় শিল্পের মূল কথা, তাহার অবলম্বিত আখ্যায়িকা প্রভৃতির সহিত শিল্পীর পরিচয় না থাকায় অনেক সময় অনেক বীভৎস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কোনও

ক্লাবের অনুষ্ঠিত সরস্বতী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম এবং তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম; এবং ইহাও দেখিলাম

যে, মূর্ত্তির নবীন পরিকল্পনা বিশেষ প্রশংসিত হইতেছে। মূর্ত্তিটি সরস্বতী দেবী তো নহেন; একটি সুন্দরী রমণী, আজকাল সাবানের বিজ্ঞাপনে যে imitation Ajanta-র পোষাক-পরা স্ত্রীমূর্ত্তি খুবই দেখা যায় তদনুরূপ পরিচ্ছদ-পরিহিতা মূর্ত্তি — উঁচু মাটির ঢিবির উপর বসিয়া দুই হাতে একটি হংসকে আলিঙ্গন করিয়া বিদ্যমানা। হাঁসটিও নিজের দীর্ঘ গলা ও মাথা রমণীর পার্শ্বদেশে ও স্কন্ধে বিন্যস্ত করিয়া অবস্থিত। এই মূর্ত্তির তথাকথিত পরিকল্পনা গ্রীক পুরাণোক্ত Leda and the Swan, রমণী লীডা ও হংসরূপী জেউস্ (Zeus) দেবতার উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া অঙ্কিত — কোন ইউরোপীয় চিত্রের নকল মাত্র। সাধারণ গতানুগতিক মূর্ত্তি গঠনোপযোগী শিক্ষাপ্রাপ্ত কুমারের হাতে পড়িয়া ছবিটির দুর্দ্দশা হইয়াছে তো বটেই, উপরন্তু এই ছবিটি অবলম্বনের দ্বারা দেব-মূর্ত্তির ও সরস্বতীর ভাবের যে কত দূর অবমাননা করা হইয়াছে, তাহা এই গ্রীক উপাখ্যান ও ইহাকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন রোমক, ইটালিয়ান ও অন্যান্য ইউরোপীয় কলা-সৃষ্টির কথা যাঁহারা জানেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিবেন।

"এইরূপ ভাববিকার ও রুচিবিকার হইতে দেবতার মর্য্যাদাকে রক্ষা করিতে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। মূর্ত্তি-শিল্পের সম্পর্কে নব নব প্রচেষ্টা হউক, তাহা বাঞ্ছনীয়; কিন্তু ভাবধারাকে পঙ্কিল করিয়া তাহা হইবার নহে; তাহা হইলে, দেবমূর্ত্তি-শিল্প আর দেবমূর্ত্তি সৃষ্টি করিবে না—অনুকৃতি সৃষ্টি করিবে।"

গাজী কামাল পাশা সম্প্রতি এই বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, তুরস্কের প্রতি বিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্রকে প্রতিদিন এই শপথটি গ্রহণ করিতে হইবে :—

"আমি তুর্ক, আমি নিষ্কপট, আমি কর্ম্মনিষ্ঠ! আমা হইতে দুর্ব্বল যাহারা, তাহাদিগকে রক্ষা করা, গুরুজনকে মান্য করা ও একান্তভাবে আমার দেশকে ভালবাসা—আমার কর্ত্তব্য! নিজেকে উন্নত করা এবং ক্রমাগত উন্নতির পথে আপনাকে পরিচালিত করাই আমার আদর্শ! তুরস্কের সেবার জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করিলাম।"

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

(১১)

পিসিমার বাড়ীটা সর্ব্বাণীর বেশ ভাল লাগিল। ছোটবেলা হইতে একঘেয়ে একলা জীবনই সে অতিবাহিত করিতেছে, সঙ্গী-সাথী যা কিছু তার ঐ বাপ। মধ্যে দু'দিন জুটিয়াছিল মণিকা, জীবনের একটা অনাস্বাদিত নূতন স্বাদ দু'দিনের জন্যই সে আর তার ছোট ছেলেটী মিলিয়া তাকে জানাইয়া দিয়াছিল, আর তার পর হইতে তার জীবনে ঢালিয়া দিয়াছিল তেমনই একটানা নিরানন্দ। এখনও এক একবার সর্ব্বাণীর মনে হয়, যদি কখনই সে মণিকাদের সঙ্গে পরিচয়ে না আসিত, তার পক্ষে যাই হোক, অন্ততঃ তার বাপের পক্ষে অনেকখানিই বিড়ম্বনা বাদ পড়িত। নাঃ, মণিকাদের লইয়া অতটা গলিয়া পড়া সর্ব্বাণীর ভাল হয় নাই। সে মনে মনে নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর কখন সে বাহিরের কোন লোককে অমন করিয়া আপনার করিতে যাইবে না, কারণ পর কখন আপন হয় না; অথচ পরকে ভালবাসিয়া, বিশ্বাস করিয়া, কেবল খাযোকা ঠকিয়া মরিতে হয়। মণিকাদের আত্মীয় জানিয়াই তো সে অমন চট্ করিয়া ঐ অর্থগৃধ্নু বরের বাপকে বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছিল,. যিনি বিবাহ-সভায় কনের বাবাকে দানদ্রব্যের অপ্রাচুর্য্যহেতু অবমাননা করিতে কুণ্ঠিত হন না, যিনি ভাবী পুত্রবধূর অঙ্গের অলঙ্কার স্বর্ণকারের মত তৌল করিতেও লজ্জিত নহেন। মণিকার প্রতি ভালবাসা একেবারে মুছিয়া না যাইলেও একটা দুর্জ্জয় অভিমানে তার উপরে যেন একটা আবরণ পড়িয়া গিয়াছিল। মণিকার উহাদের সম্বন্ধে অত বড় সার্টিফিকেট দাখিল করা ভাল হয় নাই। আর কেহ হইলে কি সে অত সহজেই বিশ্বাস করিত?

অথচ সর্ব্বাণী জানে না, অপর কেহ হইলেও অত সহজেই সে বিশ্বাস করিত। কারণ আসলে তাহার সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই তাহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে এবং আজও করিতেছে। মণিকাদের সে যতটা দোষী ভাবিয়া রাখিয়াছে, তারা তা ঠিক নয়! সাধারণতঃ এদেশের বরের বাপেদের এ প্রকার ব্যবহারকে কেহই খুব বেশী হীনতাবাচক মনে করে না; সাধারণতঃ কনের বাপেরা বরের আত্মীয়দের উপরওয়ালার চক্ষেই দেখিতে অভ্যস্ত। 'পায়ে ধরিয়া না কি কন্যাদান' করিতে হয়! অন্ততঃ সম্প্রদানের পূর্ব্বে জামাতা-অর্চ্চন মন্ত্রের এইরূপই একটা বিকৃত ব্যাখ্যা সাধারণতঃ এ দেশের সমাজে করা হইয়া থাকে। 'পায়ে ধরে মেয়ে দিয়েছেন জানেন না!'—

এমনই একটা শাসনবাক্য কর্ত্তৃপক্ষ হইতে কখন কখনও ব্যক্ত হইয়া থাকে। সে জন্য কোনদিন তাঁদের কোন প্রকার সামাজিক দণ্ডদানের ব্যবস্থা হয় নাই। তার উপর এদেশে একটা প্রচলিত প্রবাদই দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, 'লাখ কথার কমে কি একটা বিয়ে হয়!' অতএব কথার কচ্কচিতে বিবাহটা যে না জমিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতেও পারে সে ধারণা কাহার ছিল?

মণিকারা এই আশ্রম-পালিতা শকুন্তলার মত নারী-বর্জ্জিত সংসারের বন্ত হরিণীকে চিনিবেই বা কেমন করিয়া? একদিকে সে যেমন এক কথায় রাজীও হয়, আবার আর একদিকে সে মনের সঙ্গে না-মিল খাইলে গোঁ করিয়া রুখিয়া বসে। বিশেষ উঁদের এই প্রথম ছেলের বিয়ে, কন্তাকর্ত্তাদের সহিত কেমন বনি-বনা হইবে, সে তাঁরা বুঝিবে কিসে? পূর্ব্বতন নজীর তো আর রেকর্ড করিতে পারে নাই।

পিসিমার বাড়ী আসিয়া সর্ব্বাণী আবার তার একটানা জীবনে একটা নূতনত্বের আস্বাদ পাইয়া বসিল। যতই হোক ছেলেমানুষ ত' সে, মনের সঙ্গে তার যতই কঠোর সর্ত্তে বোঝা-পড়াই থাক, এ বয়সে যে মনটা বড় সহজেই গলিয়া পড়ে, কেহ একটু আত্তি দেখাইলেই তাহারই বশীভূত হইয়া পড়িতেই হয়, হইব না বলিয়া পণ করিলে চলে কি? এটা সেই কালের ধর্ম্ম। সর্ব্বাণী দু'চারদিন নিজের পণ বজায় রাখিবার জন্ত আড়ো আড়ো হইয়া রহিল বটে; কিন্তু বেশিদিন তার পণ বজায় রাখিতে পারিল না। ডালি তাহাকে অল্পদিনেই আয়ত্ব করিয়া লইল। বাস্তবিক এমন মেয়ে ডালি যে, তার হাতে একবার পড়িলে আর উদ্ধার নাই। দেখিতে লম্বা, একহারা ছিপ ছিপে পাতলা শরীরটা, ছোট্ট মুখখানিতে বাঁশির মতন নাকটী টিক্ টিক্ করিতেছে, দু'টী চোখ সর্ব্বাণীর চোখের মত বিশালও নয়, অতলস্পর্শী গভীরতাও তাদের মধ্যে নাই; কিন্তু এমন একটুখানি কিছু তার মধ্যে আছে, যাহা চোখে পড়িলে হঠাৎ চোখ ফিরানো চলে না। চঞ্চল-চটুল হাস্তাভাসে ভরা যেন একটী কৌতুকের ঝরণা সেই হাস্তোজ্জল চোখ দু'টীর মধ্যে ঝরিয়া পড়ো পড়ো হইয়া রহিয়াছে। সুন্দরতার তুলনায় হয়ত হার মানে, কিন্তু গভীর চিন্তাশীলতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আভাষে পরস্পর সংযুক্ত সর্ব্বাণীর ওষ্ঠাধরের অপেক্ষা হাসির প্রলেপে সুরঞ্জিত ডালির ঠোঁট দু'খানি যেন ভোরের বেলায় তাজা ফুলের পাপ্ড়ীর মতই দর্শককে তৃপ্তি প্রদান করে। সব চাইতে বড় গুণ, ডালি মেয়েটী বড় মিশুক। সর্ব্বাণীকে সে দিনেরাতে ছায়ার মতই অনুসরণ করিতে থাকে। প্রথম প্রথম সর্ব্বাণীর ইহাতে কতকটা অস্বস্তি বোধ হইত। জন্মাবধি সে ত' কখন এমন করিয়া কাহারও সাহচর্য্যে অভ্যস্ত নয়। তার জীবন-যাত্রার প্রণালী, কাজ-কর্ম্ম, আহার-বিশ্রাম সমস্তই রুটিনে বাঁধা। এখানে আসিয়া তার সেই অভ্যস্তভাবে চলিবার উপায় রহিল না। স্নানের ঘরে খিল দিতে উদ্যত হইয়াছে, পাগলা হাওয়ার মতই উদ্দামভাবে ডালি ছুটিয়া আসিয়া দড়াম্ করিয়া দোর খুলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল—

"সবুদি! সবুদি! 'নো অ্যাড্ মিশন' করো না ভাই! সাবান দিয়ে আমার পিঠ রগড়ে দাও—আমিও হাতে হাতে ঋণ শোধ করে দেবো। একা একা 'চান' করতে ভাই, আমার ভাল লাগে না, অনেকক্ষণ মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়।"

রাত্রে তারা একই ঘরে শোয়। দু'জনের দু'খানা ক্যাম্প খাট। একদিন দেখা গেল দু'খানাকে একত্র জুড়িয়া একটা বিছানা পাতা হইয়াছে। ডালি নিজ হইতেই কাজটার কৈফিয়ৎ এই বলিয়া দিল,—"শুয়ে শুয়ে আমি অর্দ্ধেক রাত ধরে বকে মরি, আর তুমি মজা করে ঘুম দাও; আজ থেকে আর সেটী হচ্চে না; ঘুমোলেই এমনি 'কাইকুতু' দেবো, টেরটী পাবে!"

সর্ব্বাণী এই সকল উপদ্রবে প্রথম প্রথম বাহিরে প্রকাশ না করিলেও মনের ভিতর কখনও ঈষৎ বিষণ্ণ, কখন ঈষৎ বিরক্ত যে না হইয়াছে তাও নয়, কিন্তু বেশী দিন তার মনের আর এ নিস্পৃহভাব থাকিতে পারিল না। ডালি তাকে শীঘ্রই তার প্রতি অনুরক্ত করিয়া তবে ছাড়িল। উপায়ই বা কি? একজন যদি তাকে ভালবাসাইবার জন্ত ভাল করিয়া সেই মতন কাজ করিতেই থাকে, কে এমন বৈরাগী সাধুপুরুষ আছে যে, নিজেকে তার সম্বন্ধে চিরদিনই নির্লিপ্ত রাখিতে সমর্থ হয়? সর্ব্বাণীর দিনে দিনে ডালির অত্যাচার-গুলাকে অভ্যাস হইয়া যাইতে লাগিল। তার শাসন, আব্দারগুলাতে আর তার মন বিরক্ত হয় না, খাড়ী

মেয়ের অত্যাচার বাড়াবাড়ি মনে হয় না; বরং মধ্যে মধ্যে ভালই লাগে। কদাচিৎ না করিলেই যেন ফাঁকা ঠেকে।

ক্রমশঃ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে, তার খুনসুটীর জবাবে সে-ও হয়ত তার গাম্ভীর্য্য ভুলিয়া তার সঙ্গে খুব খানিকটা খুনসুটী করিয়া বসিত, এবং এই লইয়া দু'জনে ছড়াহুড়িও খানিকটা পড়িয়া যাইত। তারপর অনভ্যাস-প্রযুক্ত সমস্ত কান, গলা পর্য্যন্ত লাল করিয়া এক-গা ঘামিয়া সে যখন পরাজিত হইয়া আসিত, ডালি আসিয়া দু'হাতে তার গলা জড়াইয়া ধরিত। নিজের একটা কান তার সামনে আনিয়া আব্দারের সুরে বলিয়া উঠিত,—"আচ্ছা ভাই, এই ঘাট মান্‌লুম, দে এই কানটা মলে, আর যদি কখন তোকে চিমটী কেটেচি তো কি বলেচি—"

তারপরই—"কই দিলি নি?" বলিয়াই তাকে সজোরে 'কাইকুতু' দিয়া খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পালাইত। তখন নুতন উৎসাহে সর্ব্বাণীও রুখিয়া উঠিয়া বলিত,—"দাঁড়া তোকে দ্যাখাচ্চি!"

সুরঞ্জন সর্ব্বাণীর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। বোনের ও ভাগ্নীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় তাঁর চক্ষু গোপনে সজল হইয়া উঠিত। ভাগ্যে গোলাপ তাঁদের তার কাছে আসিতে লিখিয়াছিল! সবু যে এমন করিয়া হাসিতে পারে, এমন হালকা মনে খেলা-ধুলায় মাতিয়া উঠিতেও জানে, এ যেন তাঁর কাছে স্বপ্নের মতই আশ্চর্য্য ঠেকে! বৃদ্ধের সঙ্গে সেও যে বার্দ্ধক্য গ্রহণ করিয়াছিল, যৌবনে জরা আনিয়া যযাতি-সন্তান পুরুর মতই সে যখন পিতৃ-সেবাকেই তার জীবনের ব্রত করিয়াছে, কেমন করিয়া তিনি সে দুঃখের ভার হইতে নিজের মনকে মুক্ত করিতে পারেন?

একদিন দু' ভাই-বোনে এই আলোচনাই হইতেছিল। শান্ত গম্ভীরমুখে উদাসনেত্রে চাহিয়া সুরঞ্জন ঠিক ঐ কথাগুলিই বলিয়া ছোটবোনের অনুযোগের উত্তর দিলেন। গোলাপসুন্দরী যখন তখনই অনুযোগ করিয়া বলেন, "মেয়ের জন্যে তুমি প্রাণটা দিতে বসেছ!"

এই উত্তরের প্রতি কিন্তু গোলাপসুন্দরীর আস্থা হইল না। তিনি মুখ একটু বিকৃত করিয়া কহিলেন,—"ও-সব ভাই শুন্‌তে ভালো! ইতিহাসে, পুরাণে, গল্পে, উপন্যাসে দিলেও মানায়; কিন্তু মানুষের সংসারে ও-ধরণের ধারালো রসালো কথার কোন দাম নেই এবং ও-সব নিস্ফল। মেয়ে যদি তোমার বিয়ে-থা' করে ঘর-সংসার করতো তুমি কি তাতে বেশি সুখীই হতে, না মনের দুঃখে বুক ফেটে যেতে? পুরুর সঙ্গে ওর মিল কি হলো? এখনকার মেয়েরা ঐ রকম মারমুখো গোরার মতই হয়েচে, সেই আদত কথা! ওরা বলতে চায় 'তুম্‌ভি মিলিটারী তো হাম্‌ভি মিলিটারী'।"

বলিয়া নিজেই তিনি হাসিলেন। সুরঞ্জনের মুখেও একটুখানি মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। গোলাপসুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "ধেড়ে করে করে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেওয়া এই যে উঠেছে, এর ফলে দেখো না, এর পরে সমাজের কি অবস্থাটা হয়! সমাজ বলে আর কিছুই এদেশে থাকবে না, এ তারই লক্ষণ! ঐ যে রবিবাবুর একটা পদ্যে পড়েছিলুম, 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন।' তা কবিবরের সে কল্পনা ঘরে ঘরেই সার্থক হবে। বাঙ্গালী ভদ্রসংসার পরে 'আরব বেদুইনে'র মতই দাঁড়াবে! এই আমারই ঘরে দেখো না; অতবড় ছেলে, পড়াশোনা সাঙ্গ হয়ে চাকরী-বাকরীও করচে, দু'পয়সা আছেও তো ঘরে, নেহাৎই ডোক্‌লা নই; বিয়ে কর্ব্বে না।"

সুরঞ্জন কি যেন ভাবিতেছিলেন, গোলাপ চুপ করিয়াছে জানিতে পারিয়াই তাঁর যেন চট্‌কা ভাঙ্গিল, মৃদুকণ্ঠে যেন কতকটা আত্মগতই কহিলেন বা বোনের শেষ কথাটার পুনরুক্তি করিলেন, "বিয়ে কর্ব্বে না!"

গোলাপসুন্দরী কহিলেন, "না, বিয়ে কর্ব্বে না। বিয়ে যে একেবারে কখনও কর্ব্বে না তা' অবশ্য স্পষ্ট বলে না; কি সব বাপু বলে সে ছাই

আমরা বুঝতেও পারি নে। যখনি বলা যায়, বলে, 'এখন নয়। এখনও সময় আসে নি।' কখন যে সেই মহেন্দ্রক্ষণ আসবে, তা' তিনিই জানেন। আমার যেমন পোড়া কপাল! নিজের পেটে হয় নি পরের ছেলে মানুষ করে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে গেছি, নইলে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে দু'জনে তো কাশী-বাস করতাম।"

তারপর আবার বলিলেন, "তাই বা কি বল্‌বো ডালির জন্যে তো আর কম খোঁজাটা খুঁজছি নে, সেই কি এতদিন দিতে পেরেছি? আর তাও বলি বাপু এত দূরে বসে থাকলে কখন কারু মেয়ের বিয়ে হয়? সমানে বলেছি যে, কল্‌কাতায় যাই চলো, তা' তো শুন্‌লে না কেউ আমার কথা!"

সুরঞ্জন এবার সহজভাবেই সাগ্রহকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "আমার সঙ্গে যেও, বল তো কলকাতায় গিয়েই কিছুদিন থাকা যাবে।"

গলার স্বর ঈষৎ নামাইয়া একবার চারিদিকটায় চাহিয়া লইয়া গোলাপ উত্তর দিলেন, "দেখা যাক্ যদি এই ছেলেটার সঙ্গে হয়ে যায়; তা'হলে আর কোন হাঙ্গামাই পোহাতে হবে না; মনে ত' হয়, ডালিকে ওর অপছন্দ হয় নি; এখন মেয়ের বরাত!"

সুরঞ্জন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন ছেলেটা?"

তার কণ্ঠে ঈষৎ বিস্ময়ের রেস।

"সে কি, তুমি দেখ নি? ঐ যে সুকুমারের সঙ্গে প্রায়ই আসে, ওরই সঙ্গে কাজ করে, ওর ওপোরওলা—বাঁড়ুয্যে!"

সুরঞ্জন কহিলেন, "ওঃ! হাঁ, দেখেছি; বেশ ছেলে।"

গোলাপ কহিলেন, "ছেলে বেশ, মাইনেও বেশ মোটা, তবে কেমন যেন কাটখোট্টা ধরণ-ধারণ, আমাদের সেকেলে চোখে খুব পছন্দ হয় না, কিন্তু কি করবো, যে কালের যে ধর্ম! নিজের ঘরই যখন সাম্‌লাতে পারি নে, তখন পরের কাছে বিনয়-নম্রতা চাইতে গেলে পাবো কি করে? এখন ঐ হলেই বেঁচে যাই! মেয়েও আর কম ধাড়ী হয় নি, অমন বয়সে সেকালের মেয়েদের নিজের বিয়ে ছেড়ে মেয়ের বিয়ের সময় হয়ে আসতো।"

যে বাড়ীতে সর্ব্বাণীর পিসিমারা বাস করিতেছিলেন, 'ইষ্ট ক্যানাল রোড'-এর সেই বাড়ীখানির নাম ছিল 'রোজ কটেজ'। গৃহকর্ত্রীর নামের সঙ্গে মিল দেখিয়াই বাড়ীখানি সাগ্রহে ভাড়া করা হইয়াছিল। বেশ উঁচু প্লোরের উপর পরিচ্ছন্ন বাংলো। তিনপাশে নিচু পাঁচিল ঘেরা জমিতে শতাধিক গোলাপগাছ বাড়ীর নামকরণকে সার্থকতা দান করিতেছিল।

দেরাদুন গোলাপফুলের দেশ। এত অজস্র গোলাপ-ফুল বোধ করি আর কোন দেশে ফোটে না। এক একটা গাছে যেন হাজার হাজার ফুল ফুটিয়া চারিদিক আলো করিয়া আছে। একহারা ছোট ফুল, থোকা থোকা বড় ফুল, লাল, সাদা, হল্‌দে কিছুরই অভাব নাই। উপরন্তু গেটের উপর, পাঁচিলের গায়ে, দেওয়ালে দড়ি বাঁধিয়া-তোলা মাচার উপর কুঞ্জকরা গোলাপের লতায় সমস্ত বাড়ীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেন খচিত হইয়া আছে। অন্য কোন গাছপালার বালাই নাই, কেবল প্রাচীরের ধারে ধারে একসারি সরলোন্নত ইউক্যালিপ্‌টাস্ অনবদ্য সুষমা বিস্তার করিয়া সান্ধ্যবাতাসকে মিষ্টগন্ধী ও স্বাস্থ্যময় করিয়া তুলিতেছিল।

সর্ব্বাণীর সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে এই বাগানটী। যখন তখন আসিয়া সে এর প্রত্যেকটী ফুলভারাবনত গাছের কাছে কাছে দাঁড়ায়, গাছের তলায় শুক্‌নো পাতা সরাইয়া দেয়; ঘাসটী থাকিলে তুলিয়া ফেলে, ডাল নামাইয়া ফুলগুলির গন্ধ শোঁকে, কদাচিৎ একটী দু'টী ফুল তুলিয়া নিজে একটী খোঁপায় পরে এবং ডালির জন্য একটী তুলিয়া লয়। নির্ম্মমভাবে ফুল তুলিতে তার প্রাণে ব্যথা বাজে। ডালি প্রথম প্রথম তার পুষ্প-প্রীতি দেখিয়া মালিকে দিয়া বড় বড় গোলাপের তোড়া বাঁধাইয়া আনিয়াছিল; কিন্তু সর্ব্বাণীর তা' মনঃপূত হয় নাই; স্তূপীকৃত-করা দৃষ্টিতে চাহিয়া

অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া সে বলিয়াছিল, "অত করে ফুল নষ্ট করতে মায়া হয় না?"

ডালি অবাক্ হইয়া গিয়া উত্তর দিয়াছিল, "না, মায়া কেন হবে? ফুল ত' তোল্‌বার জন্তেই।"

সর্ব্বাণী কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "যখন তখন যা' তা' করে? যত খুশী?"

ডালি বিস্মিত হইল। সর্ব্বাণীর প্রশ্নটার মধ্যে কোন নিগূঢ় অর্থ নিহিত আছে বুঝিয়া নীরব রহিল, কারণ সে তাহা বোধ করিতে পারিল না। তারপর ফুলের তোড়াটা সজোরে তার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া কহিল, "আজকের মতন নাও তো নাও,—কাল থেকে আর পাবে না! মেয়ের সকলই অনাসৃষ্টি! গাছে গাছে ফল শুঁকে বেড়াবেন, হাতে করে শুঁকলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয় যাবে।"

সর্ব্বাণী হাসিয়া পতনোন্মুখ তোড়াটিকে ধরিয়া ফেলিল, কতকগুলি ফুলের পাপ্‌ড়ী খসিয়া গিয়াছিল, একটা কাঁটা তার হাতে বিঁধিয়া গেল, গ্রাহ্য না করিয়াই সে হাসিমুখে জবাব দিল,—" 'গাছে ফুল শোভে যেমন' গানটা জানো?"—

ডালি হয়ত এ গান জানিত না, কাশ্মীরে পালিতা সে, বাছা বাছা গান গল্প ভিন্ন খুব বেশি বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তার পরিচয়ের সুযোগ ছিল না, তথাপি হার না মানিয়াই দুষ্টহাসি হাসিয়া জবাব দিল, "এই যেমন তুমি শোভা পাচ্চো!"

সর্ব্বাণীও তার কিল খাইয়া কিলটী চুরি করিল না, তৎক্ষণাৎ ফিরাইয়া দিল, "আর তুমিও—"

ডালি ভুরুসমেত দু'চোখ টানিয়া যেন কতই অবাক্ হইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল,—"বা রে! আমি আবার কতটুকুই বা শোভা পাচ্চি! এই তো টেনে হিঁচড়ে তুলে ফেলবার জন্তে চেষ্টা চরিত্র চলেইছে। শোভা নেই বলেই না যতটুকু দেরি হচ্চে তা' হচ্চে। থাকলে এতদিন কোন্ কালে,—হ্যাঁ ভাই সবুদি! তুমি কি তাই বিয়ে করবেই না?"

সর্ব্বাণী এ প্রশ্নের উত্তরের দায় এড়াইয়া এ পর্য্যন্ত এই মেয়েটার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট ছিল, আজ হঠ করেই এই ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া সে যেন ঈষৎ থমকিয়া গেল, চাপা বিরক্তিতে ভ্রূযুগ ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, তারপর মনের সে ভাবটাকে দমন করিয়া লইয়া প্রচ্ছন্ন পরিহাসে সহাস্তেই উত্তর করিল, "দূর আমার কি আবার বিয়ে হয়? আমি যে 'দো-পড়া' মেয়ে রে!" ডালি সবেগে কহিয়া উঠিল, "দূর্ 'দো-পড়া' না হাতী পড়া! সে কি তোর বিয়ে হয়েছিল? সম্প্রদানই তো হয় নি, তা' ছাড়া কুশণ্ডিকা না হলেও বিয়েই হয় না।"

সর্ব্বাণী পরম গম্ভীরমুখে নির্ব্বিকারভাবেই জবাব দিল, "লোকাচার এই রকমই,—হাসচিস্? বিশ্বাস হচ্চে না? পিসিমাকে জিজ্ঞেস কর, এই রকমই হতো কি না, আমাদের ও-দেশে।"

ডালি এবার যেন একটা কূল পাইল, সযত্নে সে হাত মুখ নাড়িয়া বিজয়োল্লাসে কহিয়া উঠিল,—"হতো কি না! ওঃ, সে যদি বলো সে তো অনেক কিছুই হতো। তখনকার বিয়ের কনে না কি আবার চেলি-চন্দন পরে পুঁথি কোলে করে বসে পিঁড়ে ছেড়ে উঠে পালাত? হা হা হা, কি মজারই দৃশ্য! আহা, আমিই শুধু কি না সেটা দেখতে পেলুম না! কি অভাগীর দশা রে আমার!"

ডালির কথা বলার ভঙ্গীতে অসন্তুষ্ট না হইয়া সর্ব্বাণীও হাসিয়া ফেলিল, হাসিয়া বলিল, "ভাগ্যে দেখতে পাস্ নি তাই রক্ষে! যারা যারা পেয়েছিল, তাদের কাছে তো স্ত্রীষ্টানী বয়কটেড্ হয়ে গিয়েছি। তোরা থাকলে তোরাও তো তাই-ই করতিস্ রে বাপু! এ-কথা তো তোকে আর একবারও বলেছি।"

ডালি চট্ করিয়া সরিয়া আসিয়া সর্ব্বাণীকে জড়াইয়া ধরিল, "কক্ষনো না! সত্যি সবুদি! আমি থাকলে সেই সময় একখানা ভাঙ্গা কুলো বাজাতে বসে যেতুম। কানা কড়ি আর ছেঁড়া চুল দিয়ে একটা গোবরের পুতুল গড়ে তার মুখটা সেই অভাগা বরের মুখটার ছাঁচে—"

সর্ব্বাণী তাকে সহাস্যে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আহা বেচারা, তাকে নিয়ে কেন টানাটানি করচিস্, সে তো কিছু করে নি।"

অমনি ডালির কণ্ঠে একরাশ ব্যঙ্গের হাসি উথলিয়া উঠিল; সে তার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িয়া চাপা হাসিতে উদ্বেল হইতে হইতে কহিয়া উঠিল, "সত্যি! তা'হলে তোমার সে বেচারার জন্যে একটু একটু মন কেমন করে? আ হা হা! কোথায় গেলেন তিনি? ঠিকানা যে জানি নে, বললে একটু খবর-বার্ত্তা না হয় নেওয়াই যেত! লাখি মেরে যদি পায়ে ধরতেই চাও, বলো না হয় খুঁজেই দেখি? হা হা হা! সবুদি! কি মজাই তা'হলে কিন্তু হয়?"

সর্ব্বাণী হাত দিয়া ডালিকে একটু ঠেলিয়া দিয়া নির্ব্বিকার নির্লিপ্ততার সহিত উত্তর করিল, "কোন মজাই হয় না! খবর তো সে বেচারী দিয়েই ছিল, আমিই মত করি নি।"

ডালির হাসি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল. সে একটুখানি গম্ভীর হইয়া গিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিয়া ফেলিল, "বাবা! তুমি কি মেয়ে! অগ্নিশুদ্ধি করে নিয়েও জাতে তুলতে পারলে না? সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র যে! আচ্ছা, সে বুঝি দেখতে ভাল ছিল, না?"

"আমি কি তাকে দেখেছিলুম?"

ডালি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়া বসিল, "দেখ নি? মোটে দেখ নি? সে কি ভাই? বর তোমায় দেখতে আসে নি না কি?"

সর্ব্বাণী হাসিয়া ফেলিল, সহাস্যে বলিল, "আমার কি তোর মতন 'কোর্ট-শিপ' করে বিয়ে হচ্ছিল নাকি?

মিষ্টার ব্যানার্জ্জী যে এ-বাড়ীর গোপনে ঈপ্সিত ভবিষ্যৎ জামাতা, সে কথাটা খুব প্রকাশ্য হইয়া না উঠিলেও নিতান্ত অপ্রকাশ্যও তো নয়! ডালি ঈষৎ রাঙিয়া উঠিল, কিন্তু লজ্জা পাওয়া সে স্বীকার করিল না, মিথ্যা সহানুভূতি দেখাইয়া সোদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিয়া উঠিল;—"আহা, তাই বলো! এইবারে সব বুঝেছি! তারই জন্যেই মেয়ের সে বরকে মনে ধরে নি। বিদুষী কন্যাটির ওরকম সেকেলে বিয়ে মামাবাবুই বা কেমন করে দিচ্ছিলেন? আচ্ছা ভাই! তারপরও তো অনেক দিন হয়ে গেল, এর ভেতরও মনের মতন কি তোর কারুকে দেখ্তে পেলি নে? আচ্ছা, তোর কি রকম চেহারা পছন্দ বল্ত? পেশোয়ারী, কাবুলী বা কাশ্মীরীদের মতন গোলাপ-ফোটা রং, ইয়া গোঁফ, ইয়া বুকের ছাতি, সাড়ে ছ'ফুট পোনে সাত ফুট লম্বা, খাসা অ্যাথলেট্, না ননীর পুতুল চেহারাটী, কোঁকড়ানো চুলে বাঁকা করে সিঁথিটা কাটা, গায়ের রংটা হস্তেল ফলানো, গোঁফের রেখাটা দিয়েই মুছে গেছে ক্ষুরের ধারে, গলাটা খাসা মেয়েলী মেয়েলী —"

সর্ব্বাণী ভ্রূকুটি করিয়া বাধা দিল, "দেখ্ ডালি! বেশী বাড়াবাড়ি করিস নে, বলচি! বড় বোন হই না?—" তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "নিজের চরকায় তেল দি'গে দেখি! চল্, চুল বেঁধে দিই গে। গুরুদা সকালে বলছিলেন, আজ হয়ত সন্ধ্যার সময় তাঁর দু'জন বন্ধু চা খেতে আসবেন। যদিও কোন প্রশ্ন করি নি, তথাপি জানাই আছে, তার একজন মিঃ ব্যানার্জ্জী?"

ডালি সর্ব্বাণীকে অনুসরণ করিতে করিতে মুখ ভেঙ্গাইয়া বলিল, "ইঃ, মেয়ের মুখখানিতে তো দেখছি ব্যানার্জ্জীর নামটা লেগেই রয়েচে! ব্যানার্জ্জী শুনতে পেলে নিজের জন্ম সার্থক বোধ করবে! আমি তাঁকে জানিয়ে দোব'খন।"

পর্দ্দা সরাইয়া পাশের কাপড় চোপড় পরার ঘরটায় ঢুকিয়া পড়িয়া ড্রেসিং টেবিলের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে হাসিয়া সর্ব্বাণী তার কথার জবাবে বলিল, "প্রাণ ধরে যদি পারিস তো দিস।"

(ক্রমশঃ)

"রাইতো"র গোরস্থান

কাদের নওয়াজ, বি-এ, বি-টি

পল্লীর চাষী মৃত নর-নারী
এই সে কবরভূমে
ঘুমায়ে রয়েছে গোরের মাঝারে
আজিকে অঘোর ঘুমে।
একে একে হায় একশ' কবর
রয়েছে এখানে দেখি,
একটি কবর এখনই হ'য়েছে
আগে তার কথা লেখি—
সে ছিল বিধবা মঙ্গল-কোটে
একটি তনয়া ল'য়ে,
কোনরূপে হায় জীবন কাটাতো
বহু দুখ্ সুখ্ স'য়ে।
একদা তাহার কি যে হ'ল তাহা
কেহ না বলিতে পারে,
কাঁদিয়া সবারে বলিত সে নিতি
কে যেন ডাকিছে তারে।
"রাইতো"তে গিয়া যেখানে তাহার
মায়ের কবর আছে
বলিত দাঁড়ায়ে—"ঘুমো মা এবার,
আমি আসিতেছি কাছে।"
ভাই বোন তার যেথা সমাহিত
সেই ঠাঁই পানে চাহি
বলিত সে "তোরা ঘুমায়ে আছিস্
থাক্ আর দেরী নাহি—
এক্ষুনি আমি তোদের কাছেতে
ঠাঁই নেব পাশাপাশি,
আর দেরী নাই সেই শুভখণ
কখন পড়িবে আসি।"
এদিকে শুনিনু সেই দিন হ'তে
জ্বরে ধরিয়াছে তারে,
নাড়ীর গতিক বড্ড খারাপ
ক'য়ে গেছে ডাক্তারে।

কন্ঠে তাহার কি হ'ল হঠাৎ—
নিশ্বাস হ'ল রোধ্,
সে কাল ব্যাধিরে চিনিতে নারিল
ডাক্তার বাবু খোদ্।
তিন দিনও হায় পোহাল না আর
দুই দিন পরে দেখি
শু'য়ে আছে সে যে জননীর পাশে
গোরের মাঝারে একি?
এই সেই গোর—তাহার উপরে
রয় খেজুরের পাতা,
তিন ভাই বোন শু'য়ে সারি সারি
সাম্‌নে তাদের মাতা।
দক্ষিণে ঐ চারিটি সমাধি
সাথী আছে যেথা শু'য়ে
"হাসাই" "লহর" "সাবু" "আস্‌গর্"
সেথায় র'য়েছে শু'য়ে
"ইস্‌মালী" সেখ গোর আছে যার
ঠিক্ তাহাদেরি বামে,
সেও যে এদের সাথী ছিল হায়
মঙ্গল-কোট গ্রামে,
পাচজনই তারা সেরা বীর ছিল
একথা সবারি জানা,
পর উপকারে প্রাণ দিত—তবু
শুনিত না কারো মানা।
তাদের পিছুতে আরো পশ্চিমে
ঐ যে সমাধি রাজে,
গ্রামের বৃদ্ধ সেখজী "তাহের"
শয়ান তাহারি মাঝে।
সে ছিল গাঁয়ের সবার পূজ্য
সরদী দুখের ক্ষণে,
সারা গ্রাম জুড়ি হাহাকার উঠে
তাহারি অদর্শনে।

ধার্ম্মিক মোরা তার চেয়ে বেশী
দেখিনিক কোনখানে,
আজো তার কথা ভাবিলে দারুণ
ব্যথা পাই মোরা প্রাণে।
পুঁথি "হয়মুন্দ"(১) "জয়গুণবিবি"(২)
ছিল মুখস্থ তার,
সারাটী "বিদ্যা-সুন্দর" সে যে
মুখে মুখে বারেবার—
করি' আবৃত্তি শুনাত যখনই
একেলা পাইত মোরে,
আজি নিরালায় সেই স্মৃতি স্মরি'
আঁখি আসে জলে ভ'রে।
এইবার ঠিক পূব দিকে যেথা
ফুল পাতা পড়ে ঝ'রে,
অভাগিনী মা'র সাতটি তনয়
অচেতন ঘুমঘোরে।
তারা ছিল এক বিধবার ছেলে
গ্রামের লোকেতে কহে—
সাতজনই তারা ডুবিয়া ম'রেছে
"কুমুর" নদীর দহে।
একদা জননী রুষ্ট হইয়া
সাতটি তনয় 'পর
ব'লেছিল সাঁঝে, "সাত ভাই তোরা
নদীতে ডুবিয়া মর"।
কে জানিত হায় ফলিবে সে বাণী
তাই মাতা ডুকরিয়া—
কাঁদে আর বলে "কাল জিব মোর
কেটে দাও ছুরি দিয়া"
আছাড়ি' আছাড়ি' পড়িত সে ভূঁয়ে
যতদিন ছিল বাঁচি,
কবর তাহার বটতলে যেথা
আমরা দাঁড়ায়ে আছি।

(১) ও (২) দুইটি পুঁথির নাম।

সাত ছেলে তার সারি সারি শু'য়ে,
সেই শুধু মাঝখানে,
তাদেরে পাইয়া আজ বুঝি মাতা
শান্তি লভিছে প্রাণে।
কত শত গোর রয়েছে এখনও
ঠিক্ দক্ষিণ কোণে,
কাহিনী তাদের কেউ জানে নাক'
কাহারো পড়ে না মনে।
তবে পশ্চিমে ঐ যে কবর
ধানের জমির কাছে,
উহা যে একটি নারীর সমাধি
বেশ তাহা মনে আছে।
স্বামীর উপর রাগ করি' সে যে
বিষ করেছিল পান,
দুর্ব্বলা তারে দয়াময় বিধি
মুক্তি করুন দান।
* * * *
একি দেখি হায় খাটুলি লইয়া
হঠাৎ এদিক্‌টিতে
আসিতেছে কারা? মৃতদেহ বুঝি
আনিছে কবর দিতে।
স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়ে ক্ষণিক
কহিনু, "জগৎপ্রভু,
এই ঠাঁয়ে আসে যে জন তারে ত'
ফিরিতে দেখিনে কভু।
এত সুখ-আশা, এত ভালবাসা
এত যে অশ্রুপাত
সবি কি বিফল? মৃত্যুর পরে
হ'য়ে যাবে ধূলিসাৎ?
কাঁদিয়া ফিরিনু।—সহসা সন্ধ্যা
সারাটি কবরভূমে
ফেলিল আঁধার যবনিকা তার
আজি এই মরভূমে।

বাঙলা সাহিত্যের মূল সূত্র

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

২

সাহিত্যের দার্শনিক ভিত্তি

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে Evolution বলে একটা কথা সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আমাদের বাঙলায় তাকে কখন বলি বিবর্ত্তন, কখন বলি অভিব্যক্তি, কখন বলি ক্রমিক প্রকাশ। ঠিক যে ভাবটি ওই ইংরেজী শব্দে বুঝায়, সে ভাব এক কথায় আমাদের বাঙলায় প্রকাশ করা সহজ হয় না। ভাবটা যে কি, তা আমরা এই ধারার পথে চলতে চলতে বলে যাব।

সে কথা বলবার আগে, আমরা পূব-পশ্চিমের দার্শনিক মতামতের কিছু খবর নেবার ইচ্ছা করি। বাঙলা সাহিত্যের কথা বলতে বলতে এ দার্শনিক তথ্য ও তার জ্ঞানের কথা বলবার বিশেষ যে কারণ আছে, সেটা আগের বারে আভাস দেওয়া হয়ে গেছে—অর্থাৎ ইংরেজী আমলে বাঙলা সাহিত্য যে গড়ে উঠেছে, আর সেই হাল আমল থেকেই যে নতুন রূপ নিয়েছে, তাকে বোঝবার আরো একটু সূক্ষ্ম অথচ সহজ পথ করে নিতে চাই।

ইংরেজের কাছে আমরা শিখলাম, সাহিত্য মানে Literature, ধর্ম্ম মানে Religion, মুক্তি মানে Salvation; এরা যখন এল তখন সঙ্গে সঙ্গে তাদের এ ক'টাকেও নিয়ে এল। এরাও যেই পা ফেললে অমনি ধর্ম্ম এল, বাণিজ্য এল, শাসন এল,—সমস্ত জড়িয়ে তাদের জীবনের ধারাকে—আমাদের এই জীবনের ধারার মধ্যে, হঠাৎ যেমন খাল কেটে জল নিয়ে আসে, তেমনি করে তোড়ে এসে বাঁধনটা ভেঙ্গে দিলে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে এই, ওদের দেশে Literature বলতে যা বোঝায় আমাদের সাহিত্য শব্দে তা ঠিক বোঝায় না। আমরা ধর্ম্মের যা মানে করি, ওরা তা করে না, আমাদের দেশে মুক্তির যা অর্থ, ওদের দেশে তা নয়। অথচ ওরা এসেই আমাদের গন্তব্য পথ দেখিয়ে দিলে, আর আমরাও দম-দেওয়া ঘড়ির মত চলতে সুরু করে দিলাম। ওদের ঘড়ি করে টিক্ টিক্—আমরা বলি ঠিক্ ঠিক্। কিন্তু কোন্‌টা যে সত্যি ঠিক,—তা আজও পর্য্যন্ত ঠিক হোল না। অথচ এ হালের যুগের গুরুমশায়, ওই ওরাই হোল।

গুরুরা এসে যে শিক্ষাটা দিলেন তার কথাই আগে বলি, আমাদের ঘরের গুরুমশায়দের খানিকটা আভাস দিয়েছি। আগে এদেরটা বলে আমাদেরটা ফিরে বলবার সুযোগ করে নেব। কেন না, হালের গুরু-মশায়দের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, যতটা ঘনিষ্ঠ, পিছের গুরুদের সম্পর্ক আমরা ভাগ্যের ফেরে ততটা নিকট করে রাখতে পারি নি, কেন না সে ভাষাটায় শুধু অনুস্বর দিয়ে কাশীর বেদ পাঠের ধুয়ো ধরলেই সহজে বোঝা যায় না। আরো একটা বিশেষ কারণ, হালের এরা জ্যান্ত, পিছের যারা তারা মরে ওই যে কি বলে কি হয়, তাই হয়ে গেছে। আমরা ইতিহাস রাখি নি, ওরা ইতিহাস রেখেছে।

ওদের এই ইতিহাসের খবর ওদের মারফতই আমরা যেমন পেয়েছি, আর আমাদের ইতিহাসের খবরও ওদের মারফতই পাওয়া, তবে আজকাল তারপর থেকে যা আমরা একটু আধটু নাড়া-চাড়া করছি। আর্য্য বঙ্কিম একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, "সাহেবরা যদি পাখী মারিতে যান তাহাও ইতিহাসে লিখিত হয়; কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।" এই ইতিহাস না থাকার যে সমস্ত কারণ তিনি দেখিয়েছেন, সে কারণ সঠিক কি না, তা বিচার করবার কোন বিশেষ দরকার এখানে নেই বটে, তবে তিনি বলেছেন, "ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত

গর্ব্বিত জাতি" আর আমরা "অত্যন্ত বিনীত, সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্ত্তা আপনাদিগকে মনে করেন না,…দেবভক্তি অস্মদজাতির ইতিহাস না থাকার কারণ।"…তারপর ওই "ইতিহাস-বিহীন জাতির অসীম দুঃখ" নিবেদন করার মধ্যে নিজের জাতের গর্ব্ব করতে বড় কসুর রাখেন নি। গর্ব্ব বা অহং, সব জাতি ও মানুষের মধ্যেই যে আছে, এটা স্বীকার করা অত্যুক্তি।

মোটের ওপর এইটাই বোধ হয় কথা যে, আমরা হচ্ছি "আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ"র দল, আর ওপারের ওরা হোল "বস্তু বা অরে দৃষ্টব্যঃ"র দল। আমরা হলেম আদিম অবস্তু, আর ওরা হোল প্রত্যক্ষ বস্তু। আমরা চোখ বুজে সমস্ত দেখি, ওরা চোখ খুলে সমস্ত দেখে। ওরা যাকে বস্তু বলে, আমরা তাকে ঠিক বস্তু বলি নি, আমরা আরো কিছু বলি। ওরা বস্তুর ভিতরের খবর বস্তুর ভিতর দিয়ে জানবার জন্মে সাধনা করে চলেছে, আমরা চলেছিলেম বস্তু ফেলে অবস্তুর খোঁজ নিতে—তার সাধনাই আমরা করেছিলেম। শুনে আসছি তাই শ্রুতি, মনে করে রেখেছি তাই স্মৃতি, বিচার করেছি তাই ন্যায়। এটা আগের কথা — ইতিকথা — এখন কান নেই শুনতে পাই নে, ভেজাল খেয়ে খেয়ে স্মৃতি নেই, মনে বেভুল এনেছে, বিচার আর নিজেদের হাতে নেই, তাই সব অন্যায় করে চলেছি। তবে শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় যে সব ফেলে দিয়েছি, তাও নয়। আর তাদের নিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির মাঝে ঠিক বাঙালীর করে নিতে পারি নি।

সাহিত্যের এই দার্শনিক ভিত্তির রূপ ফোটাতে গিয়ে, যে কয়টা কথা ইংরেজী ও বাঙলার মিল বলতে চেষ্টা করেছি, সাহিত্যের দার্শনিক তথ্যের মধ্যে ওই ধর্ম্ম, মুক্তি শব্দ আসবে বলেই, এ কয়টা কথার উল্লেখ আগে করে গেলাম। আরো দু' একটা কথা যখন পরে এর সঙ্গে যোগাযোগে মিলতে হবে, তখন সে কথার কথা তুলব।

পশ্চিমী দেশের মূল কথা

এখন ওরা যাকে Literature বলে, বাঙলায় আমরা তাকেই সাহিত্য বলছি। অথচ Literature-এর ব্যুৎপত্তি হোল Letter—অক্ষরে তার জন্ম।

"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God ….. In him was life……" অর্থাৎ গোড়ায় ছিল বাক্য, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল, এবং বাক্যই ঈশ্বর…তাঁতেই ছিল জীবন, আর সেই জীবনই হোল মানুষের আলো।

ও-দেশের সাহিত্যের জন্ম এইখানে, বাক্য ও জীবন। আমাদের শব্দ-ব্রহ্ম প্রভৃতি কথা আছে, তবে সে শব্দ যে কিরূপে ব্রহ্ম, তার প্রকার অন্যরূপ। সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই। সে তর্ক-কথার এ স্থান নয়, তবে ওদের কথাটা আগে বলে নিয়ে তার পর আমাদের দেশের ধারার সম্বন্ধে কথা তুলব।

এখন ও-দেশে Literature বলতে কি বলে? আগে মোটের ওপর সে কথাটা বলে নিয়ে, পরে তার ধারার কথায় আসা যাবে।

যা কিছু দৃশ্য বস্তু, তা আমাদের কাছে যে ভাবে পৌঁছয়, অথবা আমরা তার কাছে যে ভাবে পৌঁছই কিম্বা সেটা বুঝি বা অনুভব করি, তা দু' দিক দিয়ে—একটা হোল বস্তু নিয়ে, অন্যটি হোল মন নিয়ে। জেগে যখন থাকি, তখন এই খেলাই চলেছে—সেইটেই হোল জীবন। অবশ্য যখন ঘুমিয়ে থাকি, তখন জাগার যে চেতনা, তা থাকে না। দুটো যে দিক্, সেটা কি রকম? আমাদের মনের বাইরে যে জগৎ, তার ধারণা হয় কেমন করে? কতক হোল, বাইরে যে বস্তু সে তার আকার, তার ভাব, তার রূপ, তার ভাব, আমার ভেতরে যে ভাব জাগিয়ে তোলে, অর্থাৎ তার সঙ্গে যে সম্পর্ক ঘটে, তা থেকে যে ভাব আমার দেহ মনে গড়ে ওঠে; আর,—আর একটা হোল, আমার নিজের মন দিয়ে, সেই বস্তুর যে রূপ, তা থেকে আমি

যা নিজে বুঝে নিই বা গড়ে তুলি। জগত চলেছে তার গতি নিয়ে, সেই গতির সঙ্গে সঙ্গে মন দিয়ে আমরা তার ভাব, নিজ-নিজ মনের মত ভাবে ভেবে গড়ে নিই। ছ'দিক্ থেকেই আমরা সত্যকে নেবার সাধনা করে চলেছি। সত্যের এ সাধনার মধ্যে একটা হোল নিছক বাস্তবের সত্য, আর একটা হোল মনের নিছক সত্য। একটা হোল জগতের প্রত্যক্ষ দেখা, অন্যটা হোল ভাব-জগতের মনের খেলা। এই দু'টো খেলা মিলে গিয়ে যে ভাব জন্মায়, সেই ভাব মানুষ যখন দৃশ্য পদার্থ ছাড়া অন্যরূপে প্রকাশ করে, বা তাকে আবার নতুন করে সৃষ্টি করে, সেই সৃষ্টিই হোল কলাকলা বা আর্ট, আর সেই আর্টের বিশেষ দিক্ হোল মানুষের এই সাহিত্য-রচনা।

ও-দেশ যে এইখানেই থেমে গেছে, তা নয়। সাহিত্য জিনিষটাকে বোঝাবার জন্য ওরা অনেক সাহিত্যই রচনা করেছে। সে সব সাহিত্যের ভাব আমাদের মনের ওপর ছাপ দিয়ে আমাদের কুটি-চকের মনকেও ভেঙে গড়ে দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে।

ওরা বলছে, যদি একটু ভেবে দেখা যায়, তা'হলে এটা বেশ বোঝা সহজ হয়ে যাবে যে, মন দিয়ে যে বাইরের জগতটা আমরা দেখি বা অনুভব করি, তাকে আমাদের স্বভাবজাত জ্ঞান, স্মৃতি অথবা এই জ্ঞান ও স্মৃতি দিয়ে তার একটা ধারাবাহিক বিচার করে একটা রূপকে খাড়া করে তুলি। আরো একটু পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সমস্ত জিনিষ আমরা বাইরে থেকে গ্রহণ করি সেটা আমার দৃষ্টি-পথের চার পাশেই বাঁধা থাকে; বাড়ী বল, গাছ বল, পাহাড় বল, মানুষ বল, যাই বল, তার অস্তিত্ব আমার এই ইন্দ্রিয়ের দরজা দিয়েই নিতে হয়। কিন্তু যদি বাইরেটাকে ত্যাগ করে, মনে আমরা সেইটা ভাবি সেই দৃশ্য পদার্থ সম্বন্ধে, তখন শুধু যে এই দেখার ওপরেই সবটা মন নিবিষ্ট হয়ে থাকে, তা নয়, আমার নিজের দেখা ও পরের দেখা, তার কাছে তা শোনা সব জড়িয়ে একটা অভিজ্ঞতাও জমে ওঠে। বস্তুর রূপের পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তখনি তখনি যে ভাব ওঠে, তার সঙ্গে আমার আগেকার যে অভিজ্ঞতা বা জানা-শোনা তাও থেকে যায়, জগতের অভিজ্ঞতাও তার সঙ্গে যোগ দেয়—নিজের ও পরের—উভয়ই। সকল যুগের মানুষ, আগে ও পরে তাদের এই ভাব ও অভিজ্ঞতা নানারূপে প্রকাশ করে গেছে, সৃষ্টি করে গেছে। এক এক সভ্যতার সঙ্গে এক এক রকমের ভাব ফুটিয়ে রেখে গেছে। কোথাও হয়ত একটা মন্দিরের গড়নে, কোথাও বা পাথর কুঁদে কেটে, কোথাও বা সাহিত্য-রচনায়, কোথাও বা সমাজ গড়ায়। জাতির মধ্যে দিয়ে চিরদিনই মানুষ এই সৃষ্টি করে আসছে। তবে সকল রকম সৃষ্টির মধ্যে এই যে Literature বা সাহিত্য-সৃষ্টি সেইটে হল সবার চেয়ে বড়।

সকল কলাকলা বা আর্ট বাইরের বাস্তবকে মনের ভাব দিয়ে রূপদান করে। আর তার প্রকাশের মাল-মসলাও সবই বাইরের জিনিষ, কিন্তু সাহিত্য শুধু একমাত্র সর্ব্বগ্রাসী প্রতিভা নিয়ে প্রকাশ করে, নতুন রকমে তাকে গড়ে তোলে।

একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝালে আরো সহজ হবে। একটা সোজা কথা দিয়ে বলা যাক। মনে কর একজন চিত্রকর, একখানা যুদ্ধের ছবি এঁকেছে, ছবিখানা তোমার ঘরের দেয়ালে টাঙান—বিরাট ছবি। সে যুদ্ধ-ঘটনার যা কিছু বাস্তব সত্য, সবই সে এঁকেছে। তুমুল যুদ্ধ। ইতিহাসের একটা ঘটনা। ওয়াটারলুর রণ-ক্ষেত্র। এমন ভাবে সে ছবি লিখেছে, ঠিক যেমন তুমি বা আমি সেই রণ-ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দেখতাম। মুখে সেই দৃঢ়তা, সেই আগ্রহ, মুখে চোখে জয়ের সেই অসম্ভব উন্মাদনা; বড় বড় সেনাপতি, ঘাড় বাঁকান সাদা ঘোড়া, দূরে কামানের ধোঁয়া, সঙিনের চকচকানি, চারিধারে স্তূপাকার আহত, কত মৃত। লড়ায়ের ভঙ্গী, তাদের সেই তীব্র বেগে আক্রমণ—সবই আঁকা হয়েছে, ঠিক যেন জীবন্ত। দেখলেই মনে হয় যেন, চোখের সামনে যুদ্ধ

হচ্ছে। যুদ্ধটা যে কি তা খানিক বুঝতে পারলাম,—এমনই বুঝলাম, যেন যুদ্ধ সত্যিই দেখেছি। দেয়াল থেকে সরে তখন ওয়াটারলু যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে পড়তে লাগলাম। যে ছবি দেয়ালে দেখলাম, সেই ঘটনার বর্ণনা পড়তে লাগলাম। লেখা অক্ষর আমার স্বাধীন কল্পনাকে জাগিয়ে দিলে। সেখানে সে যুদ্ধের উন্মাদনা, তার সেই তীব্রতা, চোখে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মনের ভাবজগত এমন সজাগ হয়ে উঠল যে, ছবির সেই এক মুহূর্ত্তের ভঙ্গী শুধু নয়, একেবারে তার আগে ও পরে সব, মনের যে চোখ-দরজা তার সামনে এনে ধরে দিলে। সে শুধু লহমার একটা ভাব বা তার কাযের প্রকাশ নয়, এ সব জিনিষটা বলে যেতে লাগল। য়ুরোপের অবস্থার কথা বললে, ফরাসীর প্রতিভার সঙ্গে ইংরাজের প্রতিভার কি তুমুল সংঘর্ষণ, তার কার্য্য-কারণ কর্তৃত্ব সব এমন গুছিয়ে বলে গেল···বড় বড় জাঁদরেলদের যুদ্ধ চালনার ধরণ, জাতির মনের ভেতরের কথা সব বিশ্লেষণ করে জানিয়ে দিলে। কোন্ ঘটনার সঙ্গে কোন্ ঘটনার যোগা-যোগে এই ঘটনাটা ঘটবার সুযোগ পেলে, তার ফল কি হোল, ভবিষ্যতে সেই ফল আবার কি রূপ নেবে; তাও বলে গেল। সাহিত্য-স্রষ্টা হয়ত এ যুগের লোক, পূর্ব্বযুগের ইতিকথা বলতে গেলে—তার যে সব তাৎকালিক ভাবের বাধা, তা তাতে থেকে গেলেও, আমার মনকে সে এমন সজাগ করে দেয় যে, আমার স্বাধীন-কল্পনা তাতে একেবারেই কোন দিক্ দিয়ে বাধা পায় না। অন্যদিকে পটুয়ার যে লেখা ছবি—সে ছবি যতক্ষণ আমি চোখের ওপর দেখি, ততক্ষণই তার জীবন্ত ভাব আমার জাগ্রত মনের কাছে ধরে। স্মৃতি দিয়ে, তার ভাব নিয়ে নতুন কোন কল্পনা করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক হয় না। একেবারে যে স্মৃতি দিয়ে তার সম্বন্ধে ভাববার অবসর হয় না, এমন কথা নয়, তবে যেটা হয়, তার মধ্যেই আটকে থাকে গণ্ডী দেওয়ার মত। অর্থাৎ সেই ফ্রেমে আঁটা ছবির মধ্যেই মন বাঁধা পড়ে থাকে, নতুন কোন ভাব জাগাবার উপায় সহজে হয় না।

কথাটা হোল এই যে, কথা দিয়ে কথা গেঁথে, সাহিত্য এমন একটা রূপ সৃষ্টি করে দিলে, যা ছবি রঙ দিয়ে পারলে না। কাজেই ও-দেশের শাস্ত্রে যে 'In the beginning was the Word' এ কথা প্রত্যক্ষ এবং সাহিত্যে তারা তার প্রতিষ্ঠা করেছে।

এইটে হোল ওদের দেশের সাহিত্যের মোটের ওপর দার্শনিক ভিত্তি। কিন্তু এইখানেই ওরা ত' থামে নি, যুগের পর যুগ ধরে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে। সেই পরিবর্ত্তন বোঝাবার জন্যে সমালোচনারও সৃষ্টি হয়েছে, আবার দর্শনের এক ভাগ নিয়ে সৌন্দর্য্যতত্ত্বও সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বরের সৃষ্টি বোঝাবার জন্যে যেমন দর্শন-বিজ্ঞান হয়েছে, তেমনি মানুষের সৃষ্টি এই কল্পকলা বা আর্ট বোঝাবার জন্যে Æsthetic রচনা হয়েছে। আমাদের দেশে তাকে বলে কাব্য-জিজ্ঞাসা বা অলঙ্কার শাস্ত্র, ওদের দেশে তাকে বলে, Philosophy of Æsthetic,—আমাদের দেশে যেমন সত্য জানবার জন্যে বিভিন্ন যুগে, মানুষ বিভিন্ন দর্শন রচনা করেছে, ওদের দেশেও তেমনি হয়েছে। ওদের দেশের দর্শনের ইতিহাসে কিন্তু ভারত-দর্শনের স্থান নেই। তার কারণ, হয় তারা আমাদের চেয়ে দর্শন বেশী বোঝে, নয়ত অন্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে, যার জন্যে এ দর্শনটাকে স্বীকার করায় তাদের সভ্যতার হয়ত মর্য্যাদা থাকে না।

ওদের দেশের কারো কারো মত হচ্ছে যে, আমাদের দর্শনের ভিত্তি হোল পৌরাণিক কল্পনার ওপর অর্থাৎ Mythology অথচ কোন দেশ বা সভ্যতার গোড়ায় খানিকটা ওই Mythology—বা পৌরাণিকী কল্পনা যেন নেই, আছে কেবল আমাদেরই। যাই হোক, কিছুদিন ধরে একথা বলা হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে, স্বামী বিবেকানন্দের পশ্চিমে যাবার পর থেকে আর রবীন্দ্রনাথের 'নোবেল প্রাইজ' পাবার পর থেকে, ভারতের দর্শন নিয়ে ওরা একটু-আধটু নাড়া চাড়া করছে। কতক হয়ত বাঙালীর লেখা ইংরেজী ভাষায় ভারত-দর্শনের ইতিহাসও

তার কারণ হতে পারে। কিন্তু এই দর্শনের মধ্যে যে একটা শৃঙ্খলা আছে বা তার পদ্ধতিতে যে মানুষের জ্ঞানের একটা বিকাশ আছে তা তারা যে বেশ গলা খুলে স্বীকার করতে রাজী, তা একেবারেই মনে হয় না। তবে আমরা যে তাদের দর্শন ও এই Æsthetic স্বীকার করেছি কি না, তা আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের ধারার সমালোচনায় পাব; আর সঙ্গে সঙ্গে গোড়ায় যে Evolution বা ক্রমিক বিবর্তন কথাটা বলেছি তার রূপ প্রকাশ হয়ে উঠবে।

এই যে Æsthetic কথাটা, যাকে আমাদের ভাষায় বললে সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের মত শোনায়, এটা ওদেরই সৃষ্টি, আমাদের নয়। ওদেরও পুরান কালে ছিল Rhetoric ও Poetry—সেটা আমাদেরই কাব্য-জিজ্ঞাসারই খানিক রকম, তবে তফাৎ অনেক। আমাদের কাব্য-জিজ্ঞাসা বা বৈষ্ণবের রসসাধনার "উজ্জল নীলমণি" ঠিক ওরা যাকে Æsthetic বলে, তা নয়।

আগেই বলেছি, ওদের দেশের ইতিহাস আছে, আমাদের নেই। ওরা এই Æsthetic-এর একটা ধারা-বাহিক ইতিহাস দিয়েছে। সেই ইতিহাস ও সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব আলোচনা করে আমরা সত্যি কি পেয়েছি, আর আমাদের সাহিত্যে তাকে কতটা কাজে লাগিয়েছি, সেটা দেখা দরকার। কেন না আমাদের দুই দিকের ধারা দিয়ে সাহিত্য বিচার করার কথা ঠিক হয়ে গেছে।

পুরান গ্রীকো-রোমীয় সাহিত্য জিজ্ঞাসা

এখন ওদের দেশের Æsthetic জিনিষটা কি?... যদিও ওদের দর্শনশাস্ত্রের আরম্ভ হোল গ্রীক জাতির প্রতিভা থেকে, আর Plato ও Aristotle তার বড় পাণ্ডা, কিন্তু এই Æsthetic শব্দটা প্রথম দেখা দিয়েছে জার্মান দেশে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে।

Plato কবিদের রাজনীতি ও কাজের ক্ষেত্র থেকে বিদায় করবার ব্যবস্থা করেছিলেন এই বলে যে, কবিরা বড় ভাবুক—ওদের দ্বারা কোন কাজ সামঞ্জস্য করে হয়ে ওঠে না, আর তার হাজার দুয়েক বছর পরে ইংরেজ কবি শেলী বললেন—Poets are eternal legislatures."—কবিরা হলেন অনন্তকালের আইন গড়ার লোক। ভেবে দেখলে মনে হয়, দুই ভাই-ই সমান। কেন না, একজন কবিদের দিলেন বিদায়, অথচ জগতের ইতিহাসে এই কথাটাই প্রমাণ হয়েছে যে, চিরকাল রাজতন্ত্রের পাশে একটা করে কবি—আটার মতন লেপ্‌টেই আছে—আর কবি শেলীর কথার মূল্য হোল এই যে, রাজনীতিক্ষেত্রে eternal অর্থাৎ অনন্তকাল ধরে, কোন কথার মূল্য নেই,—কেন না, ঘণ্টায় তেত্রিশ বার প্রয়োজন হলেই আইন বদল হয়। আমাদের কাছে কিন্তু এই eternal-এর চেয়ে এই পরিবর্ত্তনটাই সবচেয়ে বড় সত্য দেখছি।

এই পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টি চলেছে, তার আইন-কানুন ঈশ্বর সব সময় ঠিক রেখেছেন কি না ঈশ্বরেই বলতে পারেন; মানুষ কিন্তু তার সৃষ্টির মধ্যে সত্য অনুসন্ধান করে, তার আইন-কানুন ঠিক করে দিচ্ছে, তার এই Æsthetic দিয়ে। বৈষ্ণবের রস সাধনার মাপকাটি হচ্ছে 'উজ্জল নীলমণি' ওদের রস-সৃষ্টির মাপকাটি হোল Æsthetic।

এখন Plato-র পর্ব্ব হোক্। Plato এই সাহিত্যের কথা বলেছেন তার Republic কেতাবে, নাম দিয়েছেন তাঁর Republic, কিন্তু সব বাদ দিয়ে তাঁর আভিজাত্য খাড়া করার জন্যে ব্যস্ততা পূর্ণমাত্রায় থেকেই গেছে। Plato-ই প্রথম এ সত্য খোঁজবার চেষ্টা করেন। অবশ্য Plato তাঁর গুরু Socrates-এর কাছে এ সব জিনিষ অনেক পেয়েছিলেন। সে জিনিষগুলো পাওয়ারও একটা সে সময় বেশ সুযোগ হয়েছিল। সে সময়ে গ্রীসের কাব্য, ছবি, ভাস্কর্য্য নিয়ে অনেক আলোচনা হোত, সমালোচনা হোত পুরস্কার দেবার জন্যে। সেই সময় Socrates ও Simenides-এর সঙ্গে এ সব বিষয়ে অনেক আলোচনা হোত। Plato তাঁর একটা ধারাবাহিক বিবৃতি দিয়ে গেছেন। তাই থেকে Plato

একটা দর্শনই সৃষ্টি করে গেছেন। তার সকল কথার আলোচনা কিছু এখানে সম্ভবপর নয়, আর যেটুকু সাহিত্যের খাতে আসতে পারে, সেইটুকু বললেই হবে। Plato যা বলেছেন, তাঁর নিজের কথা থেকেই আমরা এখানে সহজ ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করব। এ থেকে Plato-র দর্শনের মোটামুটি নাড়ীজ্ঞান বোধ হয় হতে পারে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এই বলে যে, এই যে আর্ট, এই যে নাটক রচা ও অভিনয় করা, এটা বুদ্ধি-বিচারে ঠিক কি বেঠিক? এর উৎপত্তিটা কোন্ খাদ থেকে—মানুষের মনের যেখানে জ্ঞান বলে পদার্থটা আছে বা যেখানে এই দর্শন ও সদাসৎ বিচার ও সৎপ্রবৃত্তির ঠিকানা সেই খানে, না মানুষের নীচের খাদের ব্যাপার বা যেখানে ইন্দ্রিয়ভোগের থাকের ওপরই সবটা রয়েছে, সেই খানে? অর্থাৎ সোক্রেতিসের সেই Know thyself—'আত্মানং বিজানীয়াৎ'—সেই দেশে গিয়ে পৌছয় কি না? পশ্চিমী দর্শনশাস্ত্রে প্রথম জিজ্ঞাসা সম্ভবতঃ এই Plato-র এই প্রশ্নে।

যাঁরা Plato-র সন্ধান রাখেন, তাঁরা বেশ জানেন যে, এর উত্তর তিনি কি দিয়েছেন। আচার্য্য থাকের মানুষরা ত' চুপ করে থাকবার পাত্র নন। তিনি বলেছেন, এই যে সৃষ্টি, এ ত' ছলনা, এ ত' সত্য নয়। এ সব নাটক ত' তার ছায়া, এ ত' সত্য বস্তুর খবর দিতে পারে না। Plato-র মতে আর্ট 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ'র থাকে উঠতে পারে না। এ শুধু চোখ-কান বাইরের ইন্দ্রিয়ের ভোগ, তার খোরাক জোগাতে পারে; অতএব দূর কর এই নাটক, এই কাব্য, এই অভিনয়, এই কবি—এই বলে তাঁর সাধারণ-তন্ত্র থেকে কবিদের প্রবেশ একেবারে নাকচ করে দিলেন।

আর একটু পরিষ্কার করে Plato-কে বুঝতে হলে, তাঁর নিজের কথা থেকেই মোটামুটি সহজ বাঙলায় তর্জমা করে বলা যাক্। তিনি বলছেন, তাঁর Republic গ্রন্থে—

"চিত্তার উৎকর্ষ, সামঞ্জস্য, তার আকৃতি, তার ছন্দ,—এ সবেরই সংযোগ রয়েছে চরিত্রের উৎকর্ষের সঙ্গে, সৎ প্রকৃতির সঙ্গে···অর্থাৎ হাবা-বোকা ভাবের নয়; ছেঁদো কথায় যাকে সৎ চরিত্র বলে, তা নয়, যাকে সত্য সত্য উন্নত ও ভাল চরিত্র বলে, তাই।

"সেই রকম আর্টিষ্ট বা কলাবিদ্ বা গুণীর আকাঙ্ক্ষা করব, যারা তাদের নিজেদের চরিত্রবল দিয়ে, এমন নিখুঁত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করবে, যাতে আমাদের যুবকরা, চিরকাল ধরে তার সেই সৎ প্রকৃতি ও চরিত্রবলের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়; যেমন একটা ভাল জায়গায়, স্বাস্থ্যকর জায়গায় বাস করলে মানুষ সুস্থ হয়। প্রত্যেক ভাব তার যে ছাপ নেবে, চোখে দেখে বা কানে শুনে নিখুঁত সৌন্দর্য্যের ভেতর থেকে আসবে, আর এই আবহাওয়া যেমন খোলা ভাল-হাওয়ার দেশের বাতাস পেয়ে মানুষ সুস্থ হয়, তেমনি অলক্ষ্যে তার শিশুকাল থেকেই সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য করার পথে নিয়ে যাবে, তার মনে সেই সত্যকে জাগিয়ে দেবে ও সত্যের জন্য একটা প্রাণের ঈপ্সা সৃষ্টি করবে।"

কথাগুলো খুব জোরাল, ভাল কথা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রাজনীতিক্ষেত্রেও Plato-র ওই একই ধাঁজের মত। যারা শ্রেষ্ঠ তারাই শাসন করবে, আর বাকী যারা তারা ওই শ্রেষ্ঠদের মেনে চলবে, যাতে মেনে চলে, তাদের সেই রকমের শিক্ষা দিয়ে তৈরী করে নিতে হবে। Plato-র মত হোল, দার্শনিক যিনি তিনি হবেন রাজা, বাকী সব প্রজা। সৎ ছাড়া অসৎ যেন না থাকে। উদ্দেশ্য ভাল। কিন্তু তার মধ্যে কথা আছে। ইন্দ্রিয়ের ভোগকে দূর করে দাও, পার আর্টকেও দাও দূর করে। আপত্তি করবার কিছু নেই। সবাই তা পারে কি না, এটা ভাববার কথা,—আর ইন্দ্রিয় পদার্থ যে অতি ছোট বস্তু, এটা বিচার সাপেক্ষ। আর সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য ওই কেবল দার্শনিকরাই বোঝেন আর কেউ বোঝে না, এইটে তবে মানতে হয়। এই গুরুগিরী করবার প্রবৃত্তিটা ওদেশেও আছে, এদেশেও আছে।

Plato-র আগে কয়কলা সম্বন্ধে আরো একটা

রক্তের আভাস মেলে। সেটা হোল আনন্দ ও আমোদের জন্যেই এর সৃষ্টি। কিন্তু শুধু ওই দার্শনিকদেরই যে গুরুগিরী করা পেশা ছিল তা নয়, অন্য সাহিত্য-স্রষ্টাদেরও ছিল। যেমন Aristophanes তাঁর Frog-এর মধ্যে বলেছেন, "বালকদের কাছে যেমন গুরুমশায়, তেমনি যুবাদের কাছে কবিরাই হলেন গুরুমশায়।"

তা'হলে গ্রীক Æsthetic-এর গোড়ায় দেখা যাচ্ছে, আনন্দ ও আনন্দ সৃষ্টির ঘাড়ে এসে এই নীতি, সত্য ও গুরুমশায়গিরী চেপেছে। আমরা যাকে লোকশিক্ষা বলি তারই এক পিঠের কথা।

এই সত্য-নীতি খুঁজে ঠিক করে নিতে গিয়ে Plato তাঁর সমসাময়িক গ্রীক সাহিত্যের ওপর অনেক কটাক্ষপাত করেছেন, আর তাঁর সমালোচনার মাপ-কাটিতে পড়ে Homer, Hesiod, Pindar, আর যত বড় বড় গ্রীক নাটককার—সব দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে গেছেন। তাই তিনি বলেছেন, "কবি ও গল্প লেখকরা সবাই মানুষের এই জীবন নিয়ে যে নাড়াচাড়া করে দেখিয়েছেন, তা সবই ভুল! তাঁরা দেখিয়েছেন আর আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যে, যত দুষ্কৃতের দল তারাই সুখী, আর বেশীর ভাগ সৎ লোকের দুঃখের ওর নেই, আর অন্যায় যদি ধরা না পড়ে, তাতে যথেষ্ট লাভ থেকে যায়, আর যারা সৎ ও সততার ব্যবহার সংসারে করে, তাতে তাদের আশ-পাশের লোকের যথেষ্ট উপকার হয় বটে। কিন্তু নিজের তাতে ক্ষতিই হয়।"

উল্টা বুঝ্লি রাম। সাহিত্যে যেটাকে বড় কথা বলা হয়, প্লেতোর সময় সেইটে ছিল উল্টা। বাইরের বস্তু থেকে মনের দরজা দিয়ে গ্রহণ করে কবি স্রষ্টা ও দ্রষ্টা হয়ে যেটা সৃষ্টি করেন, যাকে সাহিত্যের চরম বস্তু বলা হয় সেটা গেল উড়ে। কবি ত' বাইরের সত্য বলবার কথার জন্যে সাধনা করে না, করে তার ভেতরের নিগূঢ় মনের পরিচয় দেবার জন্যে। কাজেই প্লেতো যাকে সত্য বলছেন, তাঁর যা আদর্শ (Ideal) সেটা কবির কাছে সত্য (real) হবে কেন…তিনি ত' সত্য বস্তু প্রকাশ করতে যান নি। অন্য কথায় বলতে গেলে, একটা হোল ইন্দ্রিয়ের সত্য, একটা হোল ভাব-সত্য। অর্থাৎ একটা হোল জ্ঞানবিচারের সত্য, আর একটা হোল কল্পকলার সত্য। প্লেতোর সময়ে সে থাকে এ Æsthetic পৌঁছয় নি, আর সেই জন্যে মন দিয়ে যে ছবি আঁকা, তাকে তিনি অসত্য বলেছেন, আর সেটা যে অকেজো ব্যাপার, প্লেতোর মত সাজ-গোজওয়ালা কাজের লোক শ্রেষ্ঠ-থাকের দার্শনিক, সেটা মোটেই কানে তুলতে রাজী হন নি। কাজেই প্লেতোর কাছে সোফোক্লা, এস্কিলসের মত চিরকালের কবিরাও তাঁদের কলাসৃষ্টিতে দার্শনিক প্লেতোর 'আত্মা বা অরে'র ভবসাগরে কলার ভেলা হ'তে পারে নি।

এই যদি হয়, তবে প্লেতো যত বড় দার্শনিক হ'ন না কেন, তাঁর ঘাড়ে এ Æsthetic-এর বোঝা চাপাবার কারণটা কি? কারণ সম্ভবতঃ তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে তিনি সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন। কিন্তু প্লেতো তাঁর Gorgius, Philebus, Phaedrus প্রভৃতি কেতাবে যে সৌন্দর্য্যের কথা বলে গেছেন, সে এই কল্পকলার রূপসৃষ্টি নয়। 'Beauty'—'সুন্দর' বলতে প্রথম দিকের গ্রীক দার্শনিকরা যতই সূক্ষ্ম বিচার ও কল্পনায় ভরপুর থাকুন না কেন, তাঁদের কাছে, সুন্দর হোল শিব, 'Good' বা যা মঙ্গলকর। কাজেই গ্রীক দার্শনিকদের কাছে, এই সুন্দর যে কি তার প্রশ্ন কোন বিশেষভাবে মীমাংসা পায় নি। তাঁদের গুরুমশায়গিরীর সখ এত বেশী ছিল যে, সবতাতেই তাঁদের বিধি-নিষেধের গণ্ডী ছিল। Strabo এই গুরুগিরীর কথা বলেছেন, কাব্য হোল শিক্ষার একটা অঙ্গ, তিনিও বলেছেন, ভাল লোক না হলে ভাল কাব্য হতে পারে না। Plutarch-এর কাছেও তাই। তিনি বলেছেন, কাব্য হোল একটা সিঁড়ীর ধাপ, দর্শনে পৌঁছবার জন্য।—কবিরা অনেক মিথ্যা বলে!… দার্শনিকরা মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্যে তাদের যা কিছু দৃষ্টান্ত সবই সত্যবস্তু থেকে সংগ্রহ করে,

কবিরা সেই একই রকম কলাকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু তারা এই মিথ্যা নিয়ে গল্প রচে।

ঘুরে-ফিরে সবাই প্রায় একই কথা বলছেন। সকলেই সত্য আর নীতির ওপর জোর দিচ্ছেন। এই প্লেতো থেকে একটা জিনিষ পাওয়া গেছে, যেটা পরবর্তী দার্শনিকেরা এই Æsthetic-এর ক্রমিক বিকাশে লাগিয়েছেন। সেটা হোল সত্য আর সুন্দর। এই সুন্দরের সত্য বোঝবার জন্যে আর বোঝাবার জন্যে সোক্রেতিস অনেক কথা বলে গেছেন, যা Hippias তাঁর Hippias Major গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, কিন্তু তাতেও কোন নিশ্চিত মীমাংসা পাওয়া যায় না।

প্লেতোর আগে গ্রীসে আর একজন দার্শনিক ছিলেন, তাঁর নাম হোল Heraclitus···তিনি বলেছেন, জগতে সব জিনিষই পরিবর্তনশীল,—সৃষ্টিটা প্রতি নিমিষেই বদল হয়ে যাচ্ছে। তাঁর কোন মতামত কিন্তু প্লেতো বা তাঁর পরের আরিস্ততল (Aristotle) তাঁদের এ সৌন্দর্য্য জিজ্ঞাসার মধ্যে আমল দেন নি। এ মতের কথাটা এখানে যে উল্লেখ করলাম, তার কারণ পরে এ বিষয়ে সাহিত্য-সৃষ্টির ধারার সঙ্গে আমরা আলোচনা করব। এই মতবাদের সঙ্গে পরবর্ত্তীকালের বার্গসোঁর (Bergson) দর্শন যে প্রতিষ্ঠা নিয়েছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, আমাদের দেশের সাহিত্য-সৃষ্টিতেও তার ছাপ দিয়েছে।

প্লেতোর পরে যে শ্রেষ্ঠ চিন্তার ধারাকে বইয়ে রেখেছিলেন, তিনিই আরিস্ততল। তিনি এই কল্লকলা ও সাহিত্যের সমালোচনা নিয়ে অনেক কিছু গড়ে গেছেন। আধুনিক যুগে আমাদের বাঙলা সাহিত্যের মধ্যেও তাঁর ভাবের অনেক ছোঁয়াচ লেগে আছে।

আরিস্ততলের বড় গুণ হচ্ছে, তাঁর গাঁথনি বড় পাকা, শিল্পীর সামঞ্জস্য তাঁর বড় চমৎকার। তিনি যে গ্রন্থে এ সব কথা বলেছেন, তার নাম Poetics। তাঁর এই Poetics হল পরবর্ত্তী Æsthetic-ওয়ালাদের ভিত। সেইখানে দাঁড়িয়ে আর সবাই যা বলবার বলেছেন বা গড়বার যা তা গড়েছেন। প্লেতোর যে মতবাদ—কাব্য-সৃষ্টি বা সাহিত্য সম্বন্ধে, আরিস্ততল তার ভুল দেখিয়েছেন। প্লেতোর মতবাদ যেমন কল্লকলা ও নীতির সামঞ্জস্য করে সুন্দর ও মঙ্গলকে এক করতে চেয়েছেন, আরিস্ততলও তেমনি জোরাল এক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। প্লেতো কাব্য-সৃষ্টিকে যে অসত্য বলেছেন, ইনিই তার প্রতিবাদ করে বললেন, সাহিত্য-সৃষ্টি অসত্য নয়। তিনি বললেন, দর্শন-বিজ্ঞানের সত্য এক, আর কাব্য-সৃষ্টি ও কল্লকলার সত্য অন্য। এক মাপকাটি দিয়ে এ দুইয়ের বিচার হতে পারে না। তাঁর Poetics থেকে আমরা তাঁর মতও আমাদের বাঙলায় তর্জ্জমা করে দিতে চেষ্টা করব, তাঁর নিজের কথায় যাতে সবটা আপনিই প্রকাশ হয়ে যায়। তিনি বলছেন, "কবির কাজ হোল সেই কথাটা বলা, যেটা ঘটেছে সেটা নয়, যেটা হতে পারত বা যেটা হবার সম্ভাবনা আছে,—হয় সেটা তার সম্ভব ভাবনা দিয়ে অথবা আগের কর্ম্ম বা ঘটনার সঙ্গে কার্য্য-কারণের যোগাযোগ দেখে। ঐতিহাসিক ও কবির ছন্দ ব্যবহার করা বা না করায় বিশেষ পার্থক্য হয় না। হেরোদোতাসের (Herodotus) সব ইতিহাসটা ছন্দে লেখাটা অসম্ভব নয়। আর তাতে সেটা ইতিহাস থেকে একচুলও খারিজ হবে না—তফাৎ হচ্ছে একটা জায়গায় যে, Herodotus যা ঘটেছে তাই লিখে গেছেন কিন্তু কবি বলতে পারে কি হতে পারত। আর সেই জন্যেই কবিতা বা কাব্যের যে সত্য তার পরিধি আরো বেশী, ইতিহাসের চেয়ে আরো উঁচু দিকে তার নজর। কারণ কাব্যের খোরাক হল বিশ্ব, আর ইতিহাসের খোরাক হল একটা বিশেষ দেশ-কালের গণ্ডীর ভেতর।"

এই কথাগুলো দিয়ে আরিস্ততল যেমন সহজ সরল ভাবে কাব্যের আসল কথাটি প্রকাশ করেছেন তেমনি কাব্য-সৃষ্টির চরম রীতিটুকু পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন, আর সাহিত্যের অন্যান্য ভাগের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য যে কি, তা বিশেষ করেই বলা হয়ে গেল।

আরিস্ততল মোটের উপর সকল কল্লকলা ও কাব্য-

সৃষ্টিকে অনুকরণ ও অনুরঞ্জন বলছেন। তিনি এর মূল সূত্র খুঁজে যা বললেন, তা এই — যেমন শিশুতে তার প্রকাশের ভাষা খুঁজে নেয়, তার মা-বাপের হাব-ভাব অনুকরণ করে-করে আনন্দ পায়, মানুষও তেমনি করে—তার উদ্দেশ্য বা পরিণতি ওই আনন্দ দান ও গ্রহণ। প্লেতো বলেছেন যে, কাব্য শুধু ইন্দ্রিয়ের ভোগকে খোরাক যোগায়, আরিস্ততল বললেন, তা নয়, বরং আরো উন্নত অবস্থায় নিয়ে যায়। প্লেতোর মত হ'ল কাব্য-সৃষ্টি ভাবুকতাকেই জাগিয়ে দেয়, জ্ঞান বিচারের পথ রোধ করে, আরিস্ততল বললেন, তা নয়। যে সোফোক্লা, এস্কিলসের কাব্যের বিরুদ্ধে প্লেতো এত কথা বললেন, তিনি সেই কাব্য-সৃষ্টিকেই বড় জিনিস বলে তুলে ধরলেন। তিনি যা বললেন, তার ভাব এই—"ট্র্যাজেডি হল একটা গভীর, সম্পূর্ণ অখণ্ড কর্ম্মসৃষ্টির অনুকরণ—তার প্রসার ও পরিধি অনেকখানি বড়। এই যে অনুকরণ, ভাষার মাধুর্য্যের সঙ্গে মনের মাধুর্য্য মিশিয়ে প্রত্যেক অংশে তার স্ফূর্ত্তির, তার প্রকাশের পথ করে নেয়। এ জিনিষটা অভিনয় হয়, কথায় শুধু বলা হয় না; এর দ্বারা ভয় ও পরদুঃখকাতরতা, সহানুভূতি জাগান হয়, আর তা ছাড়া আর আর যে ভাব, সব জাগিয়ে তোলে, তাতে আমার চিত্তকে যে ভাব দেয়, তাতে আমার মনের কালি ধুয়ে যায়।"

অপর পক্ষে প্লেতো সে সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা তাঁর নিজের কথা, তার মর্ম্ম আমরা দিচ্ছি, সেটা এই—"মনের যে-ভাগ আমাদের দুর্দ্দিন বা দুর্ঘটনার দিনে কেঁদে উঠতে চায়, বা হা-হুতাশ করে, তার সেই দুঃখের পাত্রটি ভরে উঠে উপ্‌চে পড়তে চায়, তখন তাকে আমরা বেঁধে রেখে দি, বুদ্ধির দ্বারা—বিচারের দ্বারা। কিন্তু কবিরা যে ভাবে এই সব দুঃখকাতরতাগুলো দেখাবার চেষ্টা করে, তাতে এই যে ভাবের উপচে-পড়া বা এই যে ভাবুকতা, তাকে আরো জাগিয়ে তোলে, বিচার ও জ্ঞান যাকে সংযত করে রাখতে যায়, তা তখন রাখতে পারে না।…ফলে যদি আমরা অন্যের দুঃখ দেখে আমাদের নিজেদের সেই ভাবুকতাকে বাড়িয়ে তুলি, তা'হলে নিজেদের দুঃখ-দৈন্যের সময়—সংযত হওয়া আরো কঠিন হয়ে পড়ে।"

আমাদের দেখতে হবে যে, এর কোন্‌টা ঠিক। দুটো মতই বিচারসাপেক্ষ। আরিস্ততল তাঁর ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে বোঝাবার সময় একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন 'Catharsis'—তার মানে আমরা বলব 'ধুয়ে সাফ করে দেওয়া'। এই দুই মতের সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা হয়েছে আধুনিক য়ুরোপীয় সমালোচনায়, সে কথা পরে বলব। মোটের ওপর এইটে এখানে বলা যেতে পারে যে, দুটো মতের মধ্যেই সত্য আছে। সে সত্যটা হচ্ছে প্রকাশভঙ্গী, আর সেইটেই হোল Æsthetic-এর সত্য মানে।

আমরা যদি একটু এ-বিষয়ে ভেবে দেখি, তা'হলে বেশ সহজ হয়ে যায় যে, যখন আমরা একটা অভিনয় দেখে আসি, কিম্বা একখানা নভেল, যাকে বাঙলায় আমরা উপন্যাস বলি, তা পড়ি, আমাদের মনের মধ্যে সে অভিনয় যে ছাপ দেয়, যে সব ভাব বা রস উপচয় হয়, তাতে মনের একটা সোয়াস্তি হয় না কি? পরের সুখ-দুঃখ-গুলোকে নিজের সুখ-দুঃখ করায় তার ভিতর থেকে একটা শান্তি আসে না কি? এ ত' শুধু বুদ্ধি বিবেচনার বা বিচারের কথা নয়,—তত্ত্বজ্ঞান দিয়ে, সংযম দিয়ে, তাকে দাবিয়ে রাখার চেয়ে এই যে ভাবুকতার প্রকাশ পায়, যেটা রুদ্ধ থাকে, সেটা পাঁজরায় আটক না থেকে যদি বের হয়ে যায়, সেটা সোয়াস্তি নিশ্চিত—এই জিনিষটাকেই আরিস্ততল Catharsis বলেছেন। এতে আর একটা জিনিষ হয়; সেটা হচ্ছে কবিরা বা দার্শনিকেরা গুরুগিরী না করেও, মানুষের মনের গতি ফিরাবার, অন্ততঃ মোড় ফিরিয়ে দেবার পথ করতে পারে। পরের দুঃখের সঙ্গে নিজের দুঃখ নিয়ে তুলনা করে, বরং মানুষের জীবনটাকে বোঝবার আমাদের পক্ষে সহজ হয়, আর তাতে শান্তিই আসে। আর মানুষের কাছে মানুষের জীবন জানা বা বোঝা তার

গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে একটা নিগূঢ় পরিচয় করে দেয়, যেটা হয়ত অন্য দিকে সুলভ হোত না।

গ্রীসের এ দু'জন ছাড়া, আর একজনের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করব, এই জন্যে যে আমাদের বাঙলা সাহিত্যেও সে ধাঁজের সাহিত্য-সৃষ্টি আগে ও পরে কতক কতক হয়েছে। তার মূল সূত্র যে গ্রীসে, একথা কেউ যেন মনে না করেন। তার জন্ম আমাদের দেশেই, তবে পরবর্ত্তী আধুনিক সাহিত্য, বেশীর ভাগ গীতিকাব্যের ওপর তার প্রভাব অনেকখানি এসেছে — সেটা দেখবার আগে, এখানে তার কথা একটু বলে যেতে চাই। তিনিও দার্শনিক—তাঁর নাম (Plotinus), প্লোটিনুস··· ইনি প্লেতোর মতের ভেতর থেকেই উঠেছেন, এঁকে ওদেশের লোকে বলেছেন Neo-Platonic অর্থাৎ নব্য-প্লেতোনিক। আজকাল যাদের আমরা বাঙলায় মরমী বলি, ইনি হলেন তাদের গোড়া। তার মানে Mystic, এই Mystic যে কি করে বাঙলায় মরমী হোল, তা আমরা বুঝে উঠতে পারি নে। কেন না, Mystic শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, আত্মা আর ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ মেলামেশা। অথবা ভগবানের অনন্ত-ভাবের মধ্যে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দেওয়া। সেইটে যে মরম, এ কথা কে বললে? মর্ম্মের কথা এক, আর এই সৃষ্টি রহস্যে ডুবে গিয়ে নিজেকে রূপান্তর করে নেওয়া আর এক। এ মরমী কথা কোথা থেকে যে আমাদের গাঁয়ে এল, তার খবর আমাদের মরমী দলের কবিদের সময়ে বলব, এখন প্লোটিনুসের গল্পই হোক্। এই প্লোটিনুসের ভিতর প্রথম যে রহস্যবাদ দেখা দিয়েছিল, তাই পরে পরে জার্ম্মাণ দেশে তার ক্রমিক বিকাশ দেখা দিয়েছে। আর আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবিদের কাব্যের সঙ্গে এ মতবাদের কি সম্পর্ক, তা দেখাবো।

প্লোটিনুস এই দুটো বিভিন্ন জিনিষকে এক করে দিলেন। Art আর Beauty—সুন্দর ও কলাকলা। Plotinus তাঁর Ennead গ্রন্থে বলেছেন —"কলাকলা বা আর্ট শুধু দৃশ্য পদার্থের অনুকরণ করে না, সে ফিরে যায় তার সেই প্রকৃতির মূলে।" তিনি বললেন, সুন্দর সাধারণতঃ চোখের দেখার বস্তুর ভিতরই আছে কিন্তু কানে শোনার ভেতরও ত' আছে, যেমন গানের সুর, আবার এই সৌন্দর্য্য-বোধ শুধু ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বাঁধা থাকে, তা নয়,—ইন্দ্রিয়ের বাইরে আমরা যাকে অতীন্দ্রিয় বলি, তাতেও আছে। ইন্দ্রিয়ের দরজা দিয়ে কলাকলা বোঝা যায় বা তার রস নেওয়া যায় বটে, কিন্তু এই ইন্দ্রিয়ের দরজা ছাড়া, আর একটা চোখ খুলে যায়, সেখানে আত্মা, এই জাগতিক যা দেখা যায় তা ছাড়াও ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দেখতে পায়। কলাকলা তখন ধ্যানের বস্তু হয়ে ওঠে, কেন না যে সৌন্দর্য্য মানুষে সৃষ্টি করে, তার পেছনে থাকে স্রষ্টা-মানুষের মন। কাযেই সে অনুকরণ করার জন্য আর্টকে যে ছোট বলা হয় তা একেবারেই ভুল, কারণ আর্ট সে ভাবে কোন-দিনই প্রকৃতিকে অনুকরণ করে না, সে বরং প্রকৃতি যেখানে সুন্দর নয়, আর্ট সেখানে প্রকৃতিকে সুন্দর করে তোলে। আর প্রকৃতি নিজেই ভগবানের যে ভাব তাই প্রকাশ করবার জন্যে অনুকরণ করছে। এ সমস্ত রূপটাই আত্মার, মানুষের ভেতরের অন্তরতম দেশের কথা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ফিডিয়াস্ (Phidias) যখন জোভের (Jove) মূর্ত্তি পাথর কেটে রচনা করলেন, তখন তিনি কি Jove-কে দেখেছিলেন, না তাঁর আত্মার বা মনের অন্তরে সেই অতীন্দ্রিয় ধ্যানের ভেতর দিয়ে এই রূপটিকে পাথরে ফুটিয়ে তোলেন! তা'হলে, মূলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, কলাকলার সৌন্দর্য্য শুধু চোখের নয়, আর শুধু অনুকরণ বা অনু-রঞ্জনও নয়, যে রহস্য চোখে দেখা যায় না, যে রহস্য অন্তরের কোন গভীর জায়গায় অনুভূতির ভিতর দিয়ে, সেই ঈশ্বরের সঙ্গে মেলামেশার সম্পর্ক রচনা করে ও ভাষায় ফোটায়, সেই হোল Mysticism অথবা রহস্যবাদ।

কিন্তু গ্রীসের দার্শনিক প্রতিভা আরিস্ততলের মধ্যে যেমন শিকলের গাঁথনীর মত একটা বিশেষ প্রণালীতে গড়ে উঠেছিল এমন আর কোন লেখায়

হয় নি। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপের প্রথম দিকে Plotinus-এর প্রভাব খুব বেশী রকম ছিল, তা হলেও আরিস্তত্তলের Catharsis আর Tragedy সম্বন্ধে মতামত, তার নিখুঁত বিশ্লেষণ, কি য়ুরোপে কি আমাদের বাঙলা সাহিত্যের এ যুগে, বিশেষতঃ নাটকে এখন পর্য্যন্ত মেনে চলতে হয়েছে। তিনি এ সাহিত্য বিশ্লেষণ করতে আর সাহিত্যের সৃষ্টির সামঞ্জস্য বোঝাতে যা বলে গেছেন, তা আমরা এখানে অল্পের মধ্যেই দিতে চেষ্টা করব। তিনি কতকগুলো সূত্র ধরে দিয়ে গেছেন, সেগুলি হোল এই —

(১) Plot—অর্থাৎ আখ্যান-বস্তু, অথবা ঘটনার জাল বুননি।

(২) Character—অর্থাৎ চরিত্র, অথবা যে যে চরিত্র আখ্যানে আনা হয়েছে, তার বিশেষ গুণ বা দোষ।

(৩) Diction—অর্থাৎ বলার ভঙ্গী, অথবা চরিত্রদের কথার গাঁথনি কিম্বা চিন্তাকে সহজভাবে প্রকাশের ধরণ।

(৪) Sentiments—ভাব, প্রকৃতিগত মনোভাব অথবা চিত্তবৃত্তি, যার দ্বারা চরিত্রের সকল কাজ ঘাত-প্রতিঘাতে ঘটে ওঠে।

(৫) Stage-representation and Musical Accompaniment—রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় ও গানের সুরের যোগ।

অবশ্য এগুলো সবই নাটকের কথা, আর আরিস্তত্তলের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে নাটককেই সবচেয়ে বড় বলে স্বীকার করে গেছেন। শেষ দিককার দুটো অঙ্গ সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে না থাকতে পারে, কিন্তু মোটের ওপর তাঁর এই ভাগ ও বিশ্লেষণ পরবর্ত্তী যুগে চলেছে, এবং আজও চলছে।

এর পরে Æsthetic নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তা প্রায়ই প্লেতো আর আরিস্তত্তলের মতের ওপরই নাড়াচাড়া হয়েছে। বিশেষ নতুন কিছু হয় নি। তবে Æsthetic-এর ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা আর একজনের কথা বলেন, তাঁর নাম হচ্ছে Philostatus। আরিস্তত্তলের এই যে অনুকরণ ও অনুরঞ্জন মতবাদ, তা থেকে তিনি কল্পনার সৃষ্টির তথ্য কিছু বলেছেন,—কল্পনার দ্বারা সৃষ্টি, চোখে না দেখে। কল্পনার প্রসার যে কতখানি এবং মানুষের ওপর এই কল্পনা কতটা দখল নিয়ে রেখেছে, আর পরবর্ত্তী যুগের রস-সৃষ্টিতে তার স্থান যে কত উঁচুতে, তার কথা পরে হবে। এখানে শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, কল্পনার রাজত্ব কলাকলার হোল আসল কথা। প্লেতো থেকে পরে পরে আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত এই কল্পনাকে আশ্রয় করে বিজ্ঞানের সৃষ্টি ও পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে।

পরের যুগে এ কাব্য ও কাব্য-সৃষ্টির ব্যাপার চলে গেল রোমে। তার কারণ, স্বাধীনতা ও সভ্যতা যখন যেখানে মাথা তোলে, সেইখানে সাহিত্য গড়ে ওঠে। তবে রোমীয় সাহিত্যের মধ্যে এই Æsthetic নিয়ে বেশী কেউ মাথা ঘামায় নি। কেবল এক Cicero আর Quintilian-এর নাম আছে, তবে তাঁদের মত-বাদ অল্প বিস্তর ওই প্লেতো ও আরিস্তত্তলের মত নিয়ে গড়া-পেটা, ভাঙ্গা-গড়া করেছেন। Cicero সৌন্দর্য্য (Beauty) সম্বন্ধে কিছু মতামত প্রকাশ করেছেন বটে, তা কিন্তু এমন জোরাল নয় যে, তা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করলে নতুন কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে। সাহিত্য সমালোচনায় যা কিছু গড়ে উঠেছে তা সবই বাইরের রীতি-নীতি নিয়ে, ভেতরের খবর দেওয়া আর কারো লেখায় পাওয়া যায় না। যদিও খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে Longinus তাঁর বিখ্যাত তথ্য লিখেছিলেন, যা পরে অনুবাদ হয়েছে, সে হোল De Sublimitate অর্থাৎ মহাভাব। তাতে তিনি, প্লেতো ও আরিস্তত্তল যা বলে গেছেন, তা ছাড়া আরো ছোট-খাটো খুঁটি-নাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

বাঙলা সাহিত্যের মূল সূত্র খুঁজতে য়ুরোপীয় Æsthetic-এর ধারা বোঝাবার কারণ হয়ত কারো কারো মনে প্রশ্ন তুলতে পারে, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের

ঘাড়ে যে বাইরে থেকে কত ভাব, কত তথ্য এসে ঢুকেছে, তার কাজ কি ভাবে করেছে বা করছে, সেটা বোঝাতে হোলে এগুলো আগে জানা যে বিশেষ প্রয়োজন, তা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। এই বাঙলা সাহিত্যে রোমীয় সাহিত্যের ছাপও যে কতখানি এসেছে, তা পরবর্তী কালের কাব্য নাড়া-চাড়া করলেই দেখতে পাওয়া যাবে। সেখানেও এই Sublime-এর প্রভাব আছে।

এর পরে আসছে য়ুরোপের মধ্যযুগ ও রেণেসাঁস (Renaissance) অর্থাৎ নবজন্ম। সে যুগের কথা বলবার আগে প্লেতো ও আরিস্ততলের মতামতের একটা চুম্বক এখানে দিয়ে যাব। এই জন্তে যে, তা থেকে মধ্যযুগ তার সৌন্দর্য্যতত্ত্বটা কোথায় নিয়ে গিয়ে তুললে, আর তা থেকে কি তফাৎ হয়ে এই যাকে তারা নবজন্ম বলছে, তার মানে কি ?

প্লেতো থেকে আমরা পেলাম কি ? কারুকলা ও নীতি পরস্পর পিঠোপিঠি ভাইয়ের মত। একজনের ওপর একজনের দরদ ও টান থাকবেই। শুধু যে বড় কবি বা বড় কলাবিদ হ'তে হ'লে ভাল লোক হওয়া দরকার, তা নয়—ভাল লেখা বা মন্দ লেখা অর্থাৎ সৎ ও অসৎ সৃষ্টি, সমাজের নীতি ও দুর্নীতির জন্তও তাঁরা দায়ী। সঙ্গে সঙ্গে কারুকলার সৃষ্টির মধ্যে এই সত্যের স্থান,—প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে খাঁটি সত্যের প্রকাশই হোল কারুকলা ও সাহিত্যের সব চেয়ে বড় মাপকাটি।

আরিস্ততলের কাছে আমরা পেলাম কি ? কাব্যের রূপ, সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে কারুকলার সম্বন্ধ ও সম্পর্ক কি। মানুষের আদিম অবস্থা থেকে, স্বভাব কি করে এই রচনা, এই সাহিত্য-সৃষ্টি গড়ে তুলেছে, তার বিশ্লেষণ ও বিচার।

ভয় ও পরদুঃখকাতরতা, অর্থাৎ তাঁর Catharsis, কেমন করে কল্পনার দ্বারা সেই সত্যকে দুঃখের রূপে গড়ে তুলে, সাহিত্যকে নতুন করে দেয় ও মানুষের মনের সুখ-দুঃখের ময়লা ধুয়ে তাকে খাঁটি করে তোলে।

আখ্যান-বস্তু, চরিত্র, ভাবুকতা প্রভৃতির ব্যাখ্যা করে সাহিত্যকে বোঝবার ও নাটক পড়বার রীতিকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলার যে ভঙ্গী তা দেখিয়েছেন ও সঙ্গে সঙ্গে তার একটা সামঞ্জস্য করা।

সব কথার ওপর একটা কথা কিন্তু আমাদের বলতে হয়। একটা চলতি কথা আমাদের দেশে আছে, 'যার যেমন মন, সে তেমন জন।' তা সে কবিই বল, আর দার্শনিকই বল, আর কলাবিদ গুণীই বল, যার যেমন স্বভাব, তা থেকেই তার ভাব, তা থেকেই তার সব সৃষ্টিই গড়ে ওঠে। যে ধাঁজের যে দর্শন সে গ্রহণ করে সেটা তার স্বভাবজাত সংস্কার থেকেই ফুটে ওঠে। এই সব কবি ও দার্শনিকরা যে দেশে বা যে কালে তারা আসে, সেই দেশ ও সেই কালের যে আব-হাওয়া তারই ভাব ও চিন্তা দানাবাঁধা হয়ে তাদের মধ্য দিয়েই রূপ নেয়। সেই জন্য প্লেতো যে বলেছেন—যে লেখক, কবি বা কলাবিদ বাইরের সত্যবস্তুকে তাদের মনের ছাপ দিয়ে গড়ে—সেটাই হোল অক্ষমতা। অথচ সাহিত্য-সৃষ্টির যে আসল কথা তাতে ওইটেই, ওই মনের ছাপ দিয়ে গড়াটাই সব চেয়ে বড় ক্ষমতার কথা। সোজা কথায় বলা যেতে পারে, প্লেতোর মতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা নেওয়া যে সত্য, আর মনের দ্বারা নেওয়া যে ভাব সত্য, তার দুটোর মধ্যে দুটোই যে পরস্পর আলাদা—এটা বোধ হয় প্লেতোর মত অত বড় দার্শনি-কের কালেও খুব পরিষ্কার ফুটে ওঠে নি। আর সেই জন্তেই কবিরা যে ভাবব্যঞ্জনার দ্বারা, মনের ছবিটা এঁকে দেয় কথা দিয়ে গেঁথে, তাকে তিনি অসত্য বলেছেন, আর সেই জন্তেই এরা শুরুর থাকে উপদেশ বা নীতির পর্য্যায়ে উঠতে পারে না। তারা তখনকার দিনের কবিদের সম্বন্ধে অনেক কিছু যা বলেছেন, তা তাঁরা সেই কবির সৃষ্টি থেকেই পেয়েছেন ও তাঁরাও তাঁদের নিজেদের মনের ছাপ, সেই কবিদের সৃষ্টির ওপর ফেলে তাকে নিজের নিজের মনের ভাবের দিক দিয়ে দেখিয়েছেন, মোটের ওপর এই কথাটা তা'হলে

আসে যে, বাইরেকে আমরা যে দেখি তার রূপ, তার ভাবও আমাদেরি মনের সৃষ্টি। কিন্তু আরিস্তত্তল, প্লেতোর মতকে খণ্ডন করে বলছেন, তা নয়, পাথরের মধ্যে যদি সেই রূপ ফুটে ওঠবার ভাব না থাকে, অর্থাৎ বস্তুতে যদি নিজস্ব ভাব না থাকে, তবে তাকে রূপ দান করা যায় না। পাথরের বুকের ভেতরও সেইরূপ হবার আকাঙ্ক্ষা ভরা, তাইত কলাবিদ্ গুণী তাকে বাটালী দিয়ে কেটে নতুন রূপ দেয়। প্লেতোর সব মত ও তথ্য যে পরবর্ত্তী কালের দার্শনিকরা মেনে নিয়েছেন, এমন কথা বলা যায় না, তবে আরিস্তত্তলের দর্শনের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি যে আজও পশ্চিমী দেশের জ্ঞানের রাজত্বের বুকের ওপর দিয়ে সূর্য্যের সাতঘোড়ার রথের মত আলো ছড়িয়ে হাঁকিয়ে চলেছে, তা প্রত্যক্ষ হয়ে রয়েছে, দেখা যাচ্ছে।

আরিস্তত্তলের Catharsis কথাটার ভেতর ধুয়ে মুছে নেওয়ার সঙ্গে খানিকটা মুক্তির কথা বলেছে, অথবা এর অন্তরের ভেতরকার কথা হল মুক্তি, এ কথাটা বলায় বোধ হয় নিতান্ত দোষ হবে না। পরবর্ত্তী যুগে আমরা দেখব, এই Catharsis শব্দের ভেতরকার কথার মূল্য কত। আর ভয় ও সহানুভূতি বা দুঃখবোধ দিয়ে সেই ধুয়ে নেওয়া কতটা হয়, তাও ভাববার কথা। কেন না ভাব দিয়ে ভাব ধুইয়ে দেওয়াই কাব্য-সাহিত্যের সাধনা, না ভাব দিয়ে ভাব জাগিয়ে রাখাই সৃষ্টির সাধনা, সেটা বিচারের অপেক্ষা রাখে।

এই যে গ্রীকো-রোমীয় Æsthetic, তা যে পুরোদস্তুর আনন্দ ও নীতি মেশান মতবাদ, তা বোধ হয় সহজে বলা যেতে পারে। এই আনন্দ ও নীতি-বাদের কথা আমাদের দেশের আলঙ্কারিকদের ভেতরও দেখা দিয়েছে কি ভাবে, তা পরে আমরা দেখাব। আর প্লেতো-আরিস্তত্তলের এই মতবাদও পশ্চিমে কি ভাবে কালে একটা বিশাল বটগাছের ঝুরি নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার সন্ধান নেব।

গ্রীকো-রোমীয় সৌন্দর্য্যতত্ত্বের গোড়া হলেন প্লেতো, তিনিই প্রথম এ প্রশ্নটা তুলেন। সে প্রশ্ন হোল এই যে, এই আর্ট, এই কারুকলা আত্মার যে উদার রাজত্ব সেইখানে এর জন্ম, যেখানে এই দর্শন বিচারের জ্ঞান ও মানুষের সকল সদ্গুণ জেগে থাকে, সেইখানে, অথবা এ নীচের থাকের কথা, যেখানে শুধু মানুষের ভোগ, ইন্দ্রিয়ভোগ ও পশুপ্রকৃতি জেগে থাকে? এই প্রশ্নের কি মীমাংসা পরে তা আমরা দেখব।

বিশুর ঠাকুর

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

বিশু অর্থাৎ বিশ্বনাথের বয়স বছর ছয়েকের বেশী নয়।

গ্রামের প্রান্তে সরকার-বাড়ীর তিনতলা পাকা-বাড়ীটির ছায়ায় যে খানতিনেক জীর্ণ কুটির কোনোমতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, উহাই বিশুদের বাড়ী।

অতটুকু ছেলে হইলে কি হয়, ভাবনার তার অন্ত নাই। অনেক ভাবিয়াও কিছুতেই সে এ-কথা বুঝিয়া উঠিতে পারে না যে, সরকারদের কেন এত বড় ও অমন সুন্দর পাকা বাড়ী আর তাদেরই বা কেন কুঁড়ে ঘর!

এই যে সেদিন ঝড় হইল, তিন-চারবার তাদের ঘরে কি বিষম ধাক্কাই না লাগিল; বিশু তো ভাবিয়াছিল ঘর পড়িয়াই যাইবে। মা তখন তাকে কোলে করিয়া সরকার-বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। ওঃ, তাদের যদি অমন পাকা বাড়ী হইত, আর সরকারদের হইত কুঁড়ে ঘর, তবে ঝড়ের সময় তাদের পাকা বাড়ীতেই সরকাররা আসিয়া উঠিত,—না? নিশ্চয়ই উঠিত, না হইলে যাইত কোথায়?

তাই বা কেন? সরকারদের যেমন আছে থাক্, তাদেরও কেন পাকা বাড়ী হয় না?

আঃ, কি আরামেই না থাকে সরকাররা। বৃষ্টির সময় ওদের কোনো কষ্টই নাই; নিশ্চিন্তে তখন খুটু — সরকারদের ছেলে, বিশুরই বয়সী — খাটের উপর শুইয়া ঘুমায়—একেবারে কাঁথা মুড়ি দিয়া। নাঃ, কাঁথা কেন, তারা কি আর বিশুদের মত গরীব যে কাঁথা গায়ে দিবে! তাদের আছে লেপ—মস্ত বড় বড়। আর সে সময়—সেই বৃষ্টির সময় বিশুদের কত কষ্ট! সারা ঘরে জল পড়ে, ঘরের চাল তাদের ফুটা কি না, ছাউনির পাতাগুলি পচিয়া জায়গায় জায়গায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। তার মা তখন তাকে এখান হইতে ওখানে, ও-কোণ হইতে সে-কোণে লইয়া যান। ইঃ, সারা ঘরটাতে জল পড়ে, এমন একটু জায়গা নাই যেখানে অন্ততঃ আরামে বসিয়াও একটু থাকা যায়। বৃষ্টির সময় খুটুর মত সেও ঘুমাইতে পারিত—তাদের মোটা কাঁথাটা গায়ে দিয়া!

এই তো বিকালবেলা। খুটু এখন নিশ্চয়ই গরম দুধ খাইতেছে মিছরি দিয়া, তার লুচি খাওয়া এতক্ষণ হইয়া গিয়াছে। বিশুকে খুটুর মা একদিন লুচি দিয়াছিলেন, কি চমৎকার! বিশুর ইচ্ছা করে—ভারী ইচ্ছা করে লুচি খাইতে, কিন্তু পাইবে কোথায়? বিকালে সে তো কিছুই খায় না, মাঝে মাঝে খায়, এই তো গাছে কাল পেঁপে পাকিয়াছিল একটা, মা সেটা কাটিয়া দিয়াছিলেন তাকে খাইতে। আজ নাই কিছুই, থাকিলে এতক্ষণে মা তাকে ডাকিতেন! চাহিবার উপায়ও নাই। এখন যদি মাকে যাইয়া সে বলে—সত্য কথাটা বলে যে, তার ক্ষুধা পাইয়াছে, আর ঘরে যদি কিছু না থাকে, তবে মায়ের মুখখানি যা হইবে, বিশু তা দেখিতে পারে না, মায়ের সে-মুখ দেখিলে তার কান্না পায়, তাই তো সে কখনো কিছু চায় না!

বিশুর বাবা থাকেন কলিকাতায়, চাকরী করেন, মাসে দশ টাকা করিয়া বাড়ীতে পাঠান। দশ টাকা—শুধুই দশ টাকা, বেশী নয়; যদি আরো বেশী হইত! খুটুর বাবাও কলিকাতায় থাকেন, মাসে মাসে অনেক করিয়া টাকা পাঠান, তার বাবা কেন অত টাকা পাঠাইতে পারেন না!

এ সমস্যার সমাধান বিশু কিছুতেই করিতে পারে না। তাদের কেন নাই, ওদের কেন আছে—এ কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সে আর কূল-কিনারা পায় না। মা'র কাছে একথা সে অনেকদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছে। মা বলেন, ভগবান তাদের টাকা দেন না, তাই তাদের নাই। ভগবান সকলকে সব কিছু না কি দেন! কিন্তু তিনি তাদের কেন দেন না, আর ওদের কেন

দেন? দত্তদের বাগানের মালীর মত! ও-বাগানে সেদিন ডাব পাড়ানো হইল, বিশু চাহিল একটা, মালী দিল না। ছুটুরা তখন দত্ত-বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল, ডাব পাড়ানো হইয়াছিল তাদের জন্ত, তারা ডাব খাইল, বিশুকে কিছুতেই মালীটা দিল না একটা।

প্রত্যেকদিন শেষরাত্রে বিশুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, মাও তখন জাগেন, ভোর হওয়া পর্য্যন্ত তিনি কত গল্প করেন, বিশু কত কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, মাও উত্তর দেন।

ভগবান নাকি ভারী সুন্দর, আকাশের মত নীল তাঁর গায়ের রঙ, চারখানা হাত, দেবতা কি না, মানুষের মত তাদের শুধু দুই হাতই থাকিবে কেন? চার হাতে তাঁর শঙ্খ, চক্র, গদা আর পদ্ম। চক্র জিনিষটা কি? শঙ্খ আর পদ্ম বিশু কত দেখিয়াছে। সেবার যাত্রা শুনিতে গিয়া ভীমের হাতে গদাও দেখিয়াছে, কিন্তু চক্র কি? যাক্, দেবতাদের কত কিছুই থাকে। পদ্মের উপর তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন, ভগবান কি না, পদ্ম-সম্বন্ধে যতখানি তার ধারণা একটা মানুষ তার উপর দাঁড়াইতে পারে না। ভগবানের মাথায় চূড়া, তাতে ময়ূরের পাখা, গলায় ফুলের মালা! বিশু চোখ বুজিয়া রূপটা ভাবিবার চেষ্টা করিল, কি সুন্দর, ওঃ, চমৎকার!

ধ্রুব, সে না কি তার মায়ের সঙ্গে বনে থাকিত, রাজার ছেলে হইলেও সে ছিল খুব গরীব, ভগবানের পূজা করিয়া হইয়া গেল সে মস্ত বড় রাজা। তাঁর পূজা করিলে, মা বলেন, বিশুও না কি ধনী হইয়া যাইবে।

বিশুও ভগবানের পূজা করিলেই তো পারে! কিন্তু বনে যাওয়া—মাকে ছাড়িয়া, না সে কিছুতেই পারিবে না, তার চেয়ে চিরদিন সে গরীবই থাকিবে।

গরীব থাকিলেই বা চলে কেমন করিয়া? কত কষ্ট তাদের।

সেই গোপালের কথাটা,—মায়ের মুখেই শোনা আর কি। মা ছাড়া গোপালের আর কেহই ছিল না। কি গরীব ছিল তারা, পরণের কাপড় জুটিত না, দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পর্য্যন্ত পাইত না। তাদের দুঃখের কথা শুনিয়া বিশু তো কাঁদিয়াই ফেলিয়াছিল। সেই গোপাল একদিন মেলা হইতে ভগবানের একটা মাটির মূর্ত্তি কিনিয়া আনিয়াছিল। অনেক কষ্টে মাগিয়া-যাচিয়া চারটি পয়সা জোগাড় করিয়া মা তাকে দিয়াছিলেন—মেলা হইতে যা খুসী কিনিবার জন্ত। সেই পয়সায় গোপাল কিনিয়াছিল একটা ঠাকুর। একমনে সে পূজা করিতে লাগিল। একদিন দুইদিন করিয়া এক মাস যায়—দুই মাস যায়—শেষে একদিন মূর্ত্তি নড়িয়া উঠিল, গোপালের সঙ্গে কথা কহিল, গোপাল ধনী হইয়া গেল ভগবানের দয়ায়।

ভগবান—স্বয়ং ভগবান গোপালের সঙ্গে কথা কহিয়াছেন। বিশুও পূজা করিলে তার সঙ্গেও কথা কহিবেন নিশ্চয়ই। পূজা করিতে করিতে একদিন বিশু দেখিবে, মাটির মূর্ত্তি নড়িয়া উঠিল, সজীব চোখে তার দিকে চাহিয়া মিষ্টি হাসি হাসিতে লাগিল—'লাগিল' নয় তো, 'লাগিলেন', তখন তো আর মাটির মূর্ত্তি নয়, মূর্ত্তি তখন ভগবান; জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিশ্বনাথ! তুমি কি চাও?

বিশুর সারা দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ধ্রুবর মত সে তখন বলিবে,—আমি তোমাকেই চাই ঠাকুর।

ঠাকুর তখন বলিবেন,—আমি তো তোমারই রইলাম, আমি যে চিরদিন ভক্তেরই; তুমি আর কি চাও?

বিশু বলিবে,—আর চাই ঠাকুর, মস্ত বড় বাড়ী—সরকার-বাড়ীর চেয়ে ঢে-র বড়, আর টাকা—লাখ টাকা—কোটি টাকা।

কোটি টাকা যে কতগুলি, কত বড় ঘরে তা রাখা সম্ভব, তার পরিমাপ বিশু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

ঠাকুর—ভগবানের মূর্তি সে পাইবে কোথায়? কি বিশ্রী তাদের গ্রাম, একটি মেলাও হয় না, হইলে সেখান হইতে একটি ঠাকুর কিনিয়া আনা যাইত।

ভগবানের রূপটি যে কি রকম তা তো সে আজও দেখিতে পাইল না।

মুটুদের বাড়ীতে না কি ঠাকুরের ছবি আছে, মা বলিয়াছেন। ছবিখানা একবার দেখিয়া আসা দরকার, বিশু ঠিক করিল, তাদের বাড়ীতে একবার যাইতে হইবে।

বিকালে বিশু সরকার-বাড়ীতে গিয়া হাজির হইল। পাশের বাড়ী হইলেও ও-বাড়ীতে সে বড় একটা যাইত না, বিশেষ ঠেকায় না পড়িলে নয়। সেখানে গেলেই তার মাথায় রাজ্যের ভাবনা সব জড় হইয়া তাল পাকাইয়া উঠে। আজ কিন্তু তার মন অনেকটা প্রফুল্লই ছিল। এদিক ওদিক না চাহিয়া সে সরাসরি সরকার-বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িল।

মুটু কোথায়? তাকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, দেখিতে পাইলে তাকেই জিজ্ঞাসা করা যাইত, কোন্ ঘরে তাদের ঠাকুরের ছবি।

—বিশু, ও বিশু!—ডাকিতে ডাকিতে কোথা হইতে মুটু বাহির হইয়া আসিল। মুটুর জামাটা — কি সুন্দর জামা! এটা বোধ হয় তার বাবা নূতন পাঠাইয়াছেন।

বিশুর হাত ধরিয়া মুটু বলিল—আয় বিশু, খেলবি আয়, বাবা আমার জন্যে কেমন সব পুতুল পাঠিয়েছেন, বড়দা' এল কি না কলকাতা থেকে সে-দিন, তার হাতে বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন, আয় দেখবি।

মুটুর জামার দিকেই বিশুর দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ, বলিল,—আর জামাটাও বুঝি পাঠিয়েছেন?

মুটু বলিল,—হ্যাঁ, জামাটা, আর প্যাণ্ট্, আর জুতো—ভারী সুন্দর জুতো, মোজাও পাঠিয়েছেন, আর টুপি—সাহেবের টুপি, তুই দেখবি আয় না।

বিশুর হাত ধরিয়া সে টানিয়া লইয়া চলিল।

তাই-তো, মুটুর প্যাণ্ট্টার দিকে যে বিশু এতক্ষণ লক্ষ্যই করে নাই, কি সুন্দর প্যাণ্ট্!

মুটুর খেলাঘরে যাইয়া বিশু অবাক হইয়া গেল। কি চমৎকার সব পুতুল; কুকুরটা — ঠিক যেন কুকুরই; একবার হাঁ করিতেছে আবার মুখ বুজিতেছে। হাঁসটাও তো ভারী সুন্দর—ঠিক যেন ডাকিতেছে, শব্দটাই খালি শুনা যাইতেছে না।

উঃ, কিছু নাই—বিশুর কিছু নাই—হাঁস, কুকুর, হাতী, মোটর গাড়ী—তার মাথা ঘুরিয়া উঠিল।

—দাঁড়া, জুতো-টুতোগুলো নিয়ে আসছি, তুই দাঁড়া এখানে।—বলিয়া মুটু ছুটিয়া উপরে চলিয়া গেল।

থাক না মুটুর অত সব, এর চেয়ে বেশী জিনিষ বিশু কিনিবে। ভগবানের পূজাটা যদি সে একবার করিতে পারে, কি ধনীই না হইয়া যাইবে সে তখন! তার জিনিষ-পত্র, তার পুতুল দেখিয়া মুটু তখন কি অবাকটাই না হইবে!

পোষাকপরিচ্ছদ লইয়া মুটু আসিল, বলিল,—এই দেখ, এনেছি।

বিশু বলিল,—না, আগে আমায় তোদের ভগবানের ছবিটা দেখা ভাই।

মুটু একটু বিস্মিত হইয়া বলিল,—কেন, সে দেখে কি হবে?

অধীরভাবে বিশু বলিল,—তুই দেখা না!

—আচ্ছা দেখাব পরে, মুটু বলিল,—আগে এগুলো দেখ।

বিশু চাহিল, বেশ সুন্দর; কিন্তু এর চেয়ে সুন্দর তার হইবে, বলিল,—দেখেছি, এবার তুই চল, আমায় ঠাকুরের ছবি দেখাবি।

শেষরাত্রে মা-ছেলেতে কথা হইতেছিল।

বিশু বলিল,—চারটে পয়সা মা, চারটে পয়সাও তোমার কাছে নেই? দাও মা আমায় একটা ঠাকুর কিনে।

একটা ঠাকুর তার চাই-ই।

মা বলিলেন,—চারটে পয়সা দিলেই তুমি ঠাকুর পাবে কোথায় বাবা?

তাই তো, ঠাকুরই বা সে পাইবে কোথায়? মেলা তো তাদের গাঁয়ে নাই।

কিন্তু রসুইপুরে তো একটা মেলা হয়। বলিল,— রসুইপুরের মেলা থেকে কিনবো।

মেলাটার নামই শুধু সে শুনিয়াছে, সে-সম্বন্ধে কোনো ধারণাও কিন্তু বিশুর নাই, রসুইপুর যে তাদের গ্রাম হইতে কতদূরে তাও সে জানে না।

মা বলিলেন,—সে যে অনেক দূরে, আর সে মেলা হয় মাঘ মাসে যে।

মাঘ মাসে—মাঘ মাসের এখনো কত দেরী সে জানে না।

মা কহিলেন,—মাঘ মাস আসতে এখনো ছয় মাস— অনেক দেরী।

ছয় মাসের কত দেরী, তা বিশু জানে না, শুধু এইটুকুই বুঝিল যে, অনেক — অ-নে-ক দেরী।

সে রীতিমত ভাবনায় পড়িল, তা'হলে উপায় কি?

মা কহিলেন,—আচ্ছা, এখন এক কাজ করো না তুমি, এমনিই পূজো কর, তারপর ঠাকুর যখন কেনা যাবে তখন—

বিশু কহিল,—ঠাকুর কবে কেনা যাবে?

মা বলিলেন,—কলকাতায় চিঠি লিখে দেব, পূজোর সময় উনি বাড়ী আসবেন তো, তখন একটা ঠাকুর তোমার জন্য কিনে আনবেন।

তা ছাড়া আর করাই বা যায় কি? কতক্ষণ চোখ বুজিয়া বিশু ভাবিয়া দেখিল, এর চেয়ে ভাল উপায় আর নাই।

কিন্তু তাই বা হয় কেমন করিয়া। মা তো বলিয়া ফেলিলেন ঠাকুর ছাড়া অমনিই পূজা করিতে। কিন্তু মূর্তিই যদি না হইল, তবে বিশুর জপতপসিদ্ধির দিনে নড়িয়া উঠিবে কে? তার দিকে সজীবভাবে চাহিয়া থাকিবে কার চোখ? তার দিকে চাহিয়া মিষ্টি হাসি ফুটিবে কার মুখে?

মায়ের সর্বজ্ঞতা সম্বন্ধে বিশুর মনে সন্দেহ জাগিল এই প্রথম।

সকালবেলা মা ঘরের কাজ করিতেছিলেন। বিশু ঘরের দরজার কাছে বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল; হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,— আচ্ছা মা, ভগবানের ছবি পূজো করলে হয় না?

ঘর লেপিতে লেপিতে মা বলিলেন,—তাও হয়, কিন্তু ছবিই বা পাবে কোথায়? আর ছবির দামও যে অনেক বেশী। হাতে তো আছে আর সাত আনা তিন পয়সা, এখনো তো তিন-চার হাট চালাতে হবে, তারপর টাকা আসবে।

এত কথা শুনিবার জন্য বিশু বসিয়া রহে নাই, মা চাহিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে সে কোথায় উধাও হইয়াছে।

মা দেখিলেন, এ-ও ব্যাপার হইল মন্দ নয়। কে জানিত যে, ধ্রুব আর গোপালের গল্প শুনিয়া বিশুকে এমন ঠাকুরের বাতিকে পাইয়া বসিবে। তাই বা কি খারাপ? যত সব আজে-বাজে খেলার চাইতে এ-সব দিকে যদি মতি-গতি যায় তো ভালই। আর অতটুকু ছেলের প্রার্থনায় ভগবানের মন গলিয়া-ও হয় তো যাইতে পারে। এ-কথাটা ভাবিতে গিয়া কি জানি কেন তার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

মিনিট-দশেক পরে বিশু ফিরিয়া আসিল, মুখখানি বিষণ্ণ। মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—গিয়েছিলি কোথায়?

বিশু ধপ্ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কহিল,— হুটুর কাছে গিয়ে চাইলাম তাদের ঠাকুরের ছবিখানা, দিলে না।

মাস খানেক পরের কথা।

পাড়ার মধু ঘোষ আসিয়া ডাকিলেন — বিশু, ও বিশু!

বিশু বাহির হইয়া আসিল।

মধু ঘোষের হাতে একটি জুতার বাক্স, কহিলেন,—কলকাতা থেকে এলাম কালকে, তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হল। তোমরা বাড়ী থেকে বুঝি চিঠি লিখেছিলে—তোমার জন্যে একটা ঠাকুর আনতে, তাই তোমার বাবা এটা পাঠিয়ে দিলেন আমার হাতে।

জুতার বাক্সটি তিনি বিশুর দিকে ধরিলেন। আনন্দে বিশু চীৎকারই করিয়া উঠিল,—ঠাকুর, ওরে—ঠাকুর, বাবা পাঠিয়েছেন—আমার জন্যে পাঠিয়েছেন!

তিন লাফে বিশু যাইয়া তার মায়ের কাছে হাজির হইল।

মধু ঘোষ ডাকিলেন,—ওরে চিঠিটা নিয়ে যা বিশু, চিঠি, চিঠিও দিয়েছে একখানা, নিয়ে যা।

কিন্তু মধু ঘোষের উপস্থিতির কথাই তখন বিশু ভুলিয়া গিয়াছে। পিঁড়ির উপর ঠাকুরটিকে দাঁড় করাইয়া অনিমিষ চোখে বিশু চাহিয়া রহিল। নীল রঙ্, হ্যাঁ, ঠিক আছে; চারটা হাত, শঙ্খ কোন্ হাতে?

মা দেখাইয়া দিলেন, উপর দিকের এক হাতে শাদা রঙের একটা যে রহিয়াছে, ওটা শঙ্খ।

বিশু বলিল,—আর নীচের এদিককার হাতে যে লাল ডাণ্ডার মত কি একটা—নীচের দিকটা মোটা—

মা বলিলেন,—ওটা গদা।

বিশু কহিল,—নীচের ওদিকের হাতেরটা—ওই যে লাল—ওটা পদ্ম, না?

মা কহিলেন,—হ্যাঁ, আর ওপরদিকের ও-হাতে গোল সোনালি রঙের যেটা নেপ্টে রয়েছে ওটা চক্র।

—গলায় ওই বুঝি ফুলের মালা, বিশু কহিল, আর ময়ূরপাখা?

ঠাকুরের মাথার চূড়ায় আঁকা ময়ূরপাখাটি মা দেখাইয়া দিলেন।

বিশু বলিল,—ঠাকুর হাসছে মা, দেখেছ? ঠিক টাকা দেবে দেখো।

মুগ্ধ-দৃষ্টিতে ঠাকুরের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বিশু ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

ঠাকুর রাখা হইবে কোথায়? লক্ষ্মীর আসনের পাশে। হ্যাঁ, সেখানে উঁচু একটি বেদী করিয়া তার উপর রাখিলেই মানাইবে ভাল; মায়েরও মত তাই।

বেদী করিতে খানচারেক ইটের দরকার, মা বলিয়াছেন, ছয়খানা হইলে ভাল হয়।

সরকার-বাড়ীতে আছে ইট—অনেক ইট আছে। ফুটুর কাছে চাহিলে ছয়খানা ইট সে দিবে বৈ কি!

বিশু গেল সরকার-বাড়ীতে, ফুটুকে খুঁজিয়া বাহির করিল, বলিল,—আমায় চারখানা ইট দিবি ভাই?

ফুটু জিজ্ঞাসা করিল,—কি হবে ইট দিয়ে?

—বেদী তৈরী হবে, ঠাকুরের বেদী, বিশু কহিল,—ছ'খানা ইট হলে ভাল হয়, দিবি?

ফুটু বলিল,—ঠাকুর এনেছিস বুঝি? আমায় দেখাবি না?

উৎসাহ-সহকারে বিশু জানাইল, দেখাইবে; কিন্তু ইট?

ফুটু আপত্তি করিল না, বলিল,—নিবি কেমন করে?

নেওয়ার উপায়টা আর বিশুর কাছে বলা হইল না, বিশু ছুটিয়া চলিয়া গেল ইটের জায়গায়, ফুটুও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

মা'র কাছে বিশু এক-দুই গণিতে শিখিয়াছে, এক ধার হইতে ছয়খানা ইট সে গণিয়া লইল। বড় ভারী, চেষ্টা সে করিল খুবই, একখানা ইটের বেশী কিন্তু কিছুতেই আল্‌গাইতে পারিল না। তাই হোক, একখানা করিয়া ছয়বারে ছয়খানা নিলেই চলিবে।

একখানা সে মাথায় তুলিয়া লইল, তারপরেই আবার নামাইয়া রাখিয়া ফুটুর দিকে ফিরিয়া বলিল,—দেখ, ছ'খানা ইট তোকে আবার শোধ করে দেবো, আমাদেরো অনেক টাকা হবে কি না, তখন ইট বানাব অনেকগুলো—পাকা বাড়ী করবার জন্যে, সেখান থেকে ছ'খানা তোকে ফিরিয়ে দেবো।

এ বিষয়ে ফুটুর কোন মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া বিশু আবার মাথায় তুলিয়া বাড়ীতে চলিল।

ঠাকুর দেখার জন্ম হুটু তার পিছু লইল। খানিকটা আসিয়া সে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেই বিশু হাবভাবে জানাইয়া দিল যে, অত ভারী বোঝাটা মাথায় করিয়া কথা বলার সাধ্য তার নাই।

ইটখানা ঘরে রাখিয়া বিশু ঠাকুর নামাইয়া লইল। নিজের যেমন, পরকে ঠাকুর দেখাইয়াও তেমনি তার আর আশ মিটে না কিছুতেই।

ঠাকুরের বর্ণনা, তার কোন্ হাতে কি আছে, তার পরিচয় দিতে দিতে অবশেষে কেমন করিয়া সে ধনী হইয়া যাইবে, সে কথাও বিশু হুটুর কাছে বলিয়া ফেলিল। আশ্বাস দিয়া কহিল,—দেখ, রোজ রোজ তোকে তখন লুচি খাবার নেমন্তন্ন করব আমাদের বাড়ীতে, দুধও দেবো, মস্ত বড় একটা গরু কিনে ফেলব—

মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন,—কি সব পাগলের মত বকছিস বিশু?

বিশুর চেতনা ফিরিল। সটান উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—একখানা ইট এই এনেছি মা, আরো আনছি গিয়ে, তুমি ঠাকুরটা তুলে রাখো।

সকাল বেলা।

দত্ত-বাগানের মালীর হাতে বিশু ধরা পড়িয়া গেল। ঠাকুরপূজার জন্ম দু'টি ফুল নেওয়া যে অপরাধের কিছু, তা জানিলে ফুল নিতে সে কখনো আসিত না। বলে কি-না চুরি! 'না বলিয়া লইলেই চুরি করা হয়'—এ শিক্ষা বিশু মায়ের কাছে পাইয়াছে। তাই বলিয়া ঠাকুরের তৈরী গাছের ফুল তাঁরি পূজার জন্ম নিলে সেটাও যে চুরি করা হয় একথা বিশু বিশ্বাস করিতে পারিল না। স্থির করিল, বাড়ী যাইয়া মা'র কাছে এ-কথা জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু বাড়ীতে যাইতেই যে পারিতেছে না, মালীটা কিছুতেই যে ছাড়িয়া দেয় না!

অগত্যা মালীকে সে বুঝাইয়া বলিল যে, ধনী হইয়া গেলে তাকে সে অনেক টাকা দিবে।

মালী জিজ্ঞাসা করিল, ধনী হইবে কেমন করিয়া।

বিপদে পড়িয়া বিশু তার ধন পাওয়ার গুপ্ত মন্ত্র মালীর কাছেও বলিয়া ফেলিল। মালী কিন্তু অবিশ্বাসের ভরে হাসিয়া উঠিল।

জগড়োনাথের বাড়ীর এত কাছে থাকিয়াও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধে সে আজও জয়লাভ করিতে পারিল না, কাজেই বেচারী উড়িয়া মালী বিশুর কথা বিশ্বাস করিতে পারিল না। জোর করিয়া ফুলগুলি কাড়িয়া লইয়া জানাইল যে, বিশুর ধনী হওয়ার পর যা টাকা পাইবে, তার চেয়ে বেশী পাওয়া যাইবে যদি ফুলগুলি বাজারে বিক্রয় করে।

দয়া করিয়া মালী সাজিখানা ফিরাইয়া দিল। বিশু চোখ মুছিতে মুছিতে বাড়ীতে চলিয়া আসিল।

মায়ে-ছেলেতে পরামর্শ হইল, বাড়ীতেই ফুলের গাছ লাগানো হইবে, কাহারো বাগানে আর এর জন্ম যাওয়ার দরকার নাই।

গাছ লাগানো হইবে, তাতে ফুল ফুটিবে সেই কবে। এতদিন পূজা চলিবে কি দিয়া? মা বুঝাইয়া দিলেন, ভক্তিই সব চেয়ে বড় উপাদান। বিশু কিন্তু সে কথা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। বাড়ীর আশে পাশে অনেক খোঁজাখুঁজির পর আবিষ্কার করিল, পুকুরের ওপাড়ে নাম-না-জানা কাঁটার ঝোপে হলদে রঙের ফুল ফুটিয়াছে গুটিকতক, রোজই ফুটে।

সেগুলি তুলিতে গিয়া কাঁটায় হাত-পা-পায়ের অনেক জায়গা ছড়িয়া গেল, কিন্তু ফুল পাওয়ার আনন্দের মাঝে বিলীন হইয়া গেল কাঁটা-ফোটার যাতনা।

স্নান করিয়া বিশু পূজায় বসিল।

মন কেমন উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। আগের দিনও ফুলে ফুলে ঠাকুরের পা, বেদী সব ছাইয়া গিয়াছিল, কি সুন্দরই না দেখাইয়াছিল, কিন্তু আজ শুধু ঠাকুরের পায়ের উপর দু'টিখানি ফুল।

চোখ বুজিয়া হাতজোড় করিয়া কতক্ষণ সে বসিয়া রহিল, তারপর চোখ মেলিয়া ঠাকুরের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া আবার চোখ বুজিল, মনে মনে বলিতেছিল,—

টাকা দাও ঠাকুর, অনেক টাকা, আমাদের ধনী করে দাও ঠাকুর, টুটুদের চেয়ে বড় বাড়ী করে দাও।

ওই তার মন্ত্র যেন।

এমনি করিয়া রোজ বিশু পূজা করে। চোখ মুদিয়া বসিয়া থাকে—ধ্যানমগ্ন ছোট্ট যোগীটি যেন মাঝে মাঝে চোখ মেলিয়া চাহে বড় আশা করিয়া—হয় তো এবার ঠাকুর নড়িয়া উঠিবে, জীবন্ত চোখে বিশুর দিকে চাহিবে। প্রত্যেকবারই কিন্তু দেখে, ঠাকুর অনড়, অটল—মূর্তি মূর্তিরই মত দাঁড়াইয়া আছে।

তবে, এই অল্প কয়দিনের পূজাতেই কি আর ঠাকুর তার সঙ্গে কথা কহিবেন!

মাস দেড়েক চলিয়া গেল।

এখন আর বিশু শুধু দিনে একবার করিয়াই পূজা করে না, যখনি সময় পায়, তখনি আসিয়া ঠাকুরের সামনে চোখ বুজিয়া বসে। এ যেন তার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।

সেদিন শেষরাত্রে সে মাকে ধরিয়া বসিল, ধ্রুবর গল্পটি আবার বলিতে হইবে। মা বলিলেন।

শুনিয়া বিশু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল, তারপর বলিল,—দেখো মা, আমি ঘরে বসে পূজো করছি, তাই তো ঠাকুর আমার সঙ্গে আজো কথা কইলেন না। কাল থেকে বনে গিয়ে পূজো করতে হবে।

মা প্রমাদ গণিলেন, বলিলেন,—সে কি, বনে যেতে হবে কেন? গোপালের গল্প তো বলেছি তোকে, সে তো বনে গিয়ে পূজো করে নি।

তা করে নাই সত্য, কিন্তু ঘরে বসিয়াই যে পূজা করিয়াছে, তারও তো কোনো নজীর নাই।

বন সম্বন্ধে বিশুর ধারণা বিশেষ নাই। বন বলিতে সে বুঝে চণ্ডী-পুকুরের উত্তরপাড়ের বাগানটার কথা! বাঘ না থাক, শিয়াল যে সেখানে আছে, এ তো তার নিজের চোখে দেখা। এই সেদিনও তো আনারস-ঝোপের মাঝখানে বিড়ালের মত, ছোট, গায়ে বাঘের মত ডোরা-কাটা কি একটা সে দেখিয়াছে, মা বলিয়াছেন, ওগুলোর নাম 'বাঘটাঁশ'।

না, সেখানে যাইতে বিশুর সাহস হয় না, যদিও মা বলিয়াছেন, ওগুলোতে কামড়ায় না, তবুও কেমন জানি তার ভয় ভয় করে। কাজ নাই ওখানে গিয়া। তার চেয়ে তাদের গুপারী-বাগানটাতে হইলে কেমন হয়? তার মনে হইল, মন্দ হয় না। মা'র কাছে মতামত জিজ্ঞাসা করা হইল, হাসিয়া তিনি সম্মতিই দিলেন।

ঘরের ভিতর হইতে বিশুর ঠাকুরের বেদী এবার গুপারী-বাগানে উঠিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর তো গেলই।

অবশ্য একটু অসুবিধা হইল। ঠাকুরকে রোজ সেখান হইতে আনিয়া ঘরে রাখিতে হয়, কি জানি কেহ যদি চুরি করিয়া লইয়া যায়!

মায়ের এ কথাটায় তার কেমন একটু খট্‌কা লাগিল, মাকে তাই সে জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা মা, ঠাকুর তো ভগবান, তাঁকে কেমন করে চুরি করে নেবে?

মা একটু সমস্যায় পড়িলেন। একটু ভাবিয়া কহিলেন,—এখনো তো ওতে ভগবানের ভর হয় নি।

বিশু বলিল,—পূজো করতে করতে যেদিন ঠাকুর আমার সঙ্গে কথা কইবেন, তারপরে আর তাঁকে কেউ চুরি করতে পারবে না, না?

গুপারী-বাগানে বিশু বড় আশা-ভরা বুক লইয়া পূজা করিতে বসিল। 'টাকা দাও ঠাকুর, টাকা দাও'—এই তার মন্ত্র। অনেকক্ষণ সে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ সে আঁৎকিয়া উঠিল, তার পাশেই গায়ের সঙ্গে লাগিয়া কি-না-কি একটা খালি একটানা 'গ-র্‌র্‌র্‌' শব্দ করিতেছে। চোখ মেলিতে সাহস হইল না, চোখ মেলিলেই যদি দেখে যে, কি একটা

জানোয়ার হাঁ করিয়া আছে! ধ্রুব যখন ভগবানের আরাধনা করিতেছিল তখনো তো কত জানোয়ার তার সামনে আসিয়া তাকে ভয় দেখাইয়াছিল। যদি তেমনি হয়, তবে বিশুও অমনি ধ্রুবর মত জানোয়ারটার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে,—ওগো, তুমিই আমার হরি?

পাছে সুবর্ণ-সুযোগটা হারাইয়া ফেলে, অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে চোখ মেলিতেই বিশু দেখিল, তাদের শাদা বিড়ালটা! কখন যে ও আসিয়া পাশে বসিয়াছে, সে তা টেরই পায় নাই। বিড়াল আবার ওরকম গ-র্‌র্‌র্‌ শব্দ করে না কি! ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, শাদা মেনিটাই বটে—তাতে কোনো সন্দেহ নাই। নিরাশায় রাগও হইল কম নয়, বিড়ালটার পিঠে সজোরে এক কিল মারিয়া তাড়াইয়া দিল।

কতক্ষণ বসিয়া কি সে ভাবিল, তারপর উঠিয়া গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা মা, ধ্রুব যে পূজো করেছিলো, তার তো অমন ঠাকুর ছিল না!

মা বুঝাইয়া দিলেন, ঠাকুর ছিল না বলিয়াই অত কঠোর সাধনা ধ্রুবকে করিতে হইয়াছিল, আর ঠাকুর ছিল বলিয়াই গোপাল অত সহজে ঠাকুরের দেখা পাইয়াছিল।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিশু বলিল,—আচ্ছা, ভগবান কি রকম করে আমাদের টাকা দেবেন মা? থলিতে করে অনেকগুলি টাকা দিয়ে দেবেন বুঝি, না?

থলিতে করিয়া স্বহস্তে ভগবানের টাকা দান বা ধ্রুবর মত রাজ্য-দান সম্বন্ধে মায়ের সন্দেহ ছিল বিস্তর। তবে অতটুকু ছেলের অমন আকুল ডাক ভগবান না শুনিয়া পারিবেন না—এ বিশ্বাসও তাঁর ছিল, তাই তিনি মনে করিতেন যে, আর কিছু না হোক, বিশুর পূজার জোরে তার বাপের মাহিনাটাও অন্ততঃ বাড়িয়া যাইবে।

সে কথাই তিনি বিশুকে বলিলেন। বিশু কহিল,—বাঃ, তা'হলে ভগবান আমায় দেখা দেবেন না?

মা দেখিলেন, বিশু নিরাশ হইয়া পড়িতে পারে, তাই বলিলেন,—তা তো বলা যায় না, কাকে যে তিনি কি ভাবে দয়া করেন, তার তো কিছু ঠিক নেই।

এর পর হইতে বিশু প্রতিদিন তার বাবার চিঠি আসার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিত, কোন দিন হয় তো তাঁর চিঠিতে জানা যাইবে যে, তাঁর অনেক—অ-নে-ক টাকা মাহিনা হইয়াছে। বাবার চিঠি আসিয়াছে কি না, আসিলে তাতে কি লিখিয়াছেন, এ-সবের খোঁজ বিশু আগে কখনো রাখে নাই, এবার হইতে রাখিতে আরম্ভ করিল।

দুই-এক সপ্তাহ পর পরই বাবার চিঠি আসিত। মাকে দিয়া পড়াইয়া সে চিঠির আদি-অন্ত শুনিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মাহিনা বৃদ্ধির খবরটা যে কোন-খানাতেই থাকে না! না পাইলেও শীঘ্রই একদিন যে এ সু-খবর সে পাইবেই, এ-বিশ্বাস তার হইয়া উঠিল অটল।

সে দিনটি ছিল মেঘলা। মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপটায় গুপারীগাছের আগাগুলি প্রবল আপত্তিতে মাথা দোলাইয়া উঠিতেছিল। তারি মাঝে বাগানের ভিতর বিশু পূজা করিতেছিল। অনেকক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিয়াছে। বাতাসের বিষম একটা ঝাপটা আসিতে তার চোখ খুলিয়া গেল, সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, ঠাকুর নড়িতেছে!

বিপুল আনন্দে বিশু কোলাহল করিয়া উঠিল,—মা, মা, ঠাকুর নড়্‌ছে, দেখে যাও, ও মা দেখে যাও!

এক ছুটে যাইয়া বিশু মায়ের কাছে হাজির হইল।

মা বিস্মিত হইলেন, বলে কি! একি সত্য? হয় তো হইতেও পারে! অতটুকু ওই শিশুর ডাক ভগবান হয় তো শুনিতে পাইয়াছেন! কিন্তু এত ভাগ্য কি তাঁর বরাতে আছে? উঠিতে তাঁর সাহস হইল না, কি জানি যাইয়া কি দেখেন! বিশুকে কহিলেন,—সত্যি, তুই দেখেছিস্?

চোখ দু'টি বড় করিয়া বিশু বলিল,—তুমি বিশ্বাস করছ না মা? দেখে যাও না তুমি!

মায়ের হাত ধরিয়া বিশু টানিয়া লইয়া চলিল। যাইয়া তিনি দেখিলেন, নিত্যকার মত ঠাকুর অটল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বিশু অবাক হইয়া গেল, বিপন্নকণ্ঠে কহিল,—বাঃ, আমি যে দেখলুম মা, নিজ চোখে দেখেছি, দেখে তখনি তোমার কাছে ছুটে চলে গেছি।

মা ভাবিলেন, বিশুর চোখের ভুল, দিনরাত ওই একই কথা সে একমনে ভাবিতেছে। মনে-প্রাণে যা লোকে ভাবে, তাই না কি অনেক সময় চোখেও দেখে, বিশুরও এ হয় তো তেমনি দেখা।

বিশু কহিল,—আচ্ছা মা, আমি আবার পুজোয় বসছি, দেখি আবার নড়ে ওঠেন কি না।

সে পূজায় বসিল।

পাশের গুপারীগাছটির সঙ্গে হেলান দিয়া মা দাঁড়াইয়া রহিলেন। তেমনি যদি বিশু দেখিয়া থাকে, সেই দেখাই কি কম কথা! এমনি দেখিতে দেখিতেই তো সাধক সিদ্ধিলাভ করে।

এমনি এক দিনই তো ধ্রুব পাইয়াছিল তার ভগবানের সাক্ষাৎ। এমনি সেদিন আকাশ ছিল মেঘে ছাওয়া, বিজলী চম্‌কাইতেছিল, বইতে লিখিয়াছে, এমনি ছিল সেদিনকার মেঘ-গর্জন। সে দিনের মতই তো আজিকার দিন।

অন্তর তাঁর পুলকিত হইয়া উঠিল, রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল সারা দেহ। এক দৃষ্টে তিনি ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সোঁ-সোঁ করিয়া বাতাসের একটা ঝাপ্‌টা বহিয়া গেল। মা দেখিলেন, সেই বাতাসে ছোট্ট, হাল্কা মাটির ঠাকুরটি ধীরে ধীরে দুলিয়া উঠিল। বাতাসের পরশে বিশুরও ধ্যান ভাঙিয়া গেল; চোখ মেলিয়া সে দেখিল, ঠাকুর আবার নড়িতেছে। আনন্দে বিশু চিৎকার করিয়া উঠিল,—দেখ মা, ওই দেখ।

মায়ের বুকের তল হইতে বাহির হইয়া আসিল একটি দীর্ঘশ্বাস—হতাশায় ভরা। বলিলেন,—ও যে বাতাসে নড়ছে।

বিশুর মুখের সবখানি দীপ্তি নিভিয়া গেল।

মা দেখিলেন, বলিয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। তখনকার মত বলিলেন,—তা' আজ না হোক, একদিন ঠাকুর তোমায় দেখা দেবেনই বিশু। ঠাকুর এখন ঘরে নিয়ে এসো, যা মেঘ করেছে, বিষ্টি নামবে এখনি।

সেই দিন বিকাল বেলা।

গ্রামের পিয়নদাদা আসিয়া ডাকিল,—অ বিশু, চিঠি নিয়ে যা।

ঊর্দ্ধশ্বাসে বিশু ছুটিয়া গেল।

আজ বিশুর কেমন জানি মনে হইতেছে। প্রায় সারাটি দিনই সে আজ পূজা করিয়া কাটাইয়াছে। বাগান হইতে ঘরে আনিবার পর অবশ্য ঠাকুর আর একবারও নড়ে নাই। বিশু ঠিক বুঝিয়াছে যে, তখন বাতাসেই নড়িয়াছিল। তা হইলেও, বিশুর মনে হয়, আজ যেন কি একটা হইবে। হয় তো বা এতদিনের পূজার ফল সে আজ পাইবে।

চিঠি নিশ্চয়ই তার বাবার, তা নয় তো চিঠি আসিবেই বা আর কার?

এ-চিঠিতে যদি লেখা থাকে যে, তার বাবার অনেক টাকা মাহিনা হইয়া গিয়াছে!

পিয়ন চিঠি দিয়া চলিয়া গেল।

চিঠির উপরের লেখাগুলি চাহিতে চাহিতে সে মায়ের কাছে চলিল। যদি সে এ-সব পড়িতে পারিত—দূর্, কোনো কাজের নয় সে, এই তো মাত্র 'ক-খ' সে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, চিঠি পড়িতেও পারে না। তার আর এতে দোষ কি, দোষ তো মা'রই, কেন তিনি বিশুকে আরো বেশী লেখাপড়া শিখাইয়া ফেলেন নাই!

চিঠির কোন্ জায়গাটিতে তার বাবার মাহিনা

বুঝির সু-খবরটি লেখা আছে, তাই সে অনুমান করিতে চেষ্টা করিল।

মা বোধ হয় পুকুর ঘাটে গিয়াছিলেন, সেখান হইতে আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিতেই দেখিলেন, উঠানে দাঁড়াইয়া বিশু নিবিষ্টমনে চিঠিখানি হইতে কি যেন আবিষ্কার করার চেষ্টায় আছে। বলিলেন,—চিঠি এসেছে বুঝি বিশু, আমায় দেখাস নি কেন? কি দেখছিস ওতে?

ওঃ, সকলের আগে বিশুই যদি সে সু-খবরটি জানিতে পারিত! কিন্তু তার উপায় নাই, সে যে পড়িতে পারে না। চিঠি সে মায়ের হাতে দিল।

ঘরে আসিয়া মা চিঠি পড়িতে লাগিলেন, বিশু কহিল,—একটু বড় করেই পড়ো না মা!

বড় করিয়া তিনি পড়িলেন না। বিশুর ভারী বিরক্তি ধরিল, চিরটি কাল সে দেখিয়া আসিল, চিঠি আসিলেই মা একবার মনে মনে পড়িয়া লন, তারপরে বিশুকে পড়িয়া শুনান!

মনে মনে পড়িতে পড়িতে—বিশু দেখিল—মায়ের হাত হইতে চিঠিখানি পড়িয়া গেল। অবাক হইয়া সে তাঁর মুখের পানে চাহিয়া রহিল, এমন ভাব মা'র মুখে আর কোন দিন সে দেখে নাই।

শেষ পর্য্যন্ত খবরটি বিশুও শুনিল, তার বাবার চাকরী গিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, চাকরী যাওয়ায় এমাসে টাকা তো পাঠাইতে পারিলেনই না, কবে পারিবেন তারও কিছু ঠিক নাই। আবার যদি কোন দিন কোথাও চাকরী জুটে তখন টাকা পাঠাইবেন, তার আগে আর বাড়ীতে আসিবেন না, কি হইবে শুধু হাতে বাড়ীতে আসিয়া!

খবর শুনিয়া বিশুর যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, আকাশের পানে চাহিয়া সে বহুক্ষণ নীরবে উঠানে দাঁড়াইয়া রহিল, এই তার এতদিনের এত করিয়া ঠাকুর-পূজা করার ফল?

ধীরে ধীরে আসিয়া সে ঘরে ঢুকিল।

ঘরে আসিয়া মা দেখিলেন, ছোট একটি লাঠি হাতে করিয়া বিশু পাগলের মত দৃষ্টিতে সামনের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে; আর তার সম্মুখে মাটিতে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ফেলা তারি ঠাকুরের অংশগুলি!

মা বুঝিলেন, বিশুর এতদিনকার সাধনা ব্যর্থ হইয়াছে, নিরাশায় সে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, অটুট বিশ্বাস তার চুরমার হইয়া গিয়াছে, তাই হাতের ওই লাঠিটি দিয়া তার এত সাধের ঠাকুরকে ভাঙিয়া সে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। তিনি দেখিলেন—তার চোখ দিয়া তখন যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে।

মা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন,—ও কি করলি বিশু? ঠাকুর—তোর ঠাকুরটা ভেঙে ফেল্‌লি?

মা'র স্নিগ্ধ স্বরে বিশুর ভিতর সম্বিত যেন ফিরিয়া আসিল! নিজের কীর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিয়াই সে শিহরিয়া উঠিল। এ কি করিয়াছে সে! উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া বিশু এবার তার ভাঙা ঠাকুরের টুকরাগুলি কুড়াইয়া লইল। তারপর মায়ের বুকের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে হাহাকার করিয়া উঠিল।

জাগিবে না মৃত্যু-ম্লান সে যে পুনরায়—

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী, এম্-এ

মৃত্যুর শীতল স্পর্শে ছিন্নমালা সম
শয্যাপরে প'ড়ে আছে শুধু দেহখানি,
অস্ফুট হাসির মাঝে অকথিত বাণী ;
বিদায়ের বার্ত্তা বহে বুঝি অনুপম !
বৃন্তচ্যুতা মালতীর শোভা অপরূপ
সর্ব্ব-দেহে ছেয়ে আছে স্নিগ্ধ করুণায়
প্রাণহীন নয়নের সৌন্দর্য্য আভায়
পৃথিবীর কোলাহল হোয়েছে নিশ্চুপ।

তবু যেন মনে হয় প্রশান্ত নিদ্রায়
মগ্ন আছে প্রিয়া মোর মায়ার পরশে
এখনি মেলিবে আঁখি শান্ত ছলনায় ;

জীবনের ছন্দ মাঝে অপূর্ব্ব হরষে
জাগিবে না মৃত্যু-ম্লান সে যে পুনরায়—
হায়, হায়, এ যে সত্য—বেদনা বরষে।

সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতি

শ্রীসুধাংশুকুমার রায়

সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতির নাম আজ প্রায় সকলের নিকট পরিচিত। বাংলার এত বড় একটি জন-হিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্ম-ইতিহাস এবং সমিতির নানা বিভাগের কার্য্যবিবরণী, প্রত্যেক লোকের জানা প্রয়োজন।

শ্রীহেমলতা দেবী
সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতির সম্পাদিকা

সাধ্বী সরোজনলিনীর মনে একদিন এই সত্য-তত্ত্বের উপলব্ধি হয়েছিল যে, "যতদিন আমাদের কল্যাণী-রমণীকুলের জীবন, বিধি-বিধানের সীমাহীন নিগড়ে আবদ্ধ থেকে নিতান্ত দীনহীনের ন্যায়, নিরানন্দের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে, ততদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক উন্নতি এবং আর্থিক শ্রী-বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টাই বৃথা।" বিশেষ করে বাংলার পল্লীর জন্য তাঁর মন আরো বেশী করে কেঁদে উঠেছিল। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের দেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথম পল্লী-নারীর ব্যথা-বেদনার কথা সহরের লোকের গোচরে এনে, দুঃখমোচনের জন্য সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছিলেন। 'প্রবাসী' পত্রিকায় লিখিত তাঁর একটি প্রবন্ধ থেকে এ কথার প্রমাণ হবে। প্রবন্ধের গোড়াতেই তিনি লিখেছিলেন, "কলিকাতায় আসবার পর থেকে আমি কতকগুলি নারী-সমিতিতে যোগ দিয়েছি,...... কিন্তু যেটুকু করা হচ্ছে, দেখছি আর শুনছি, তার বেশীটুকুই কলিকাতার অধিবাসীদের জন্যেই হচ্ছে।...... আমার মনে হয়, সেই সঙ্গে যাতে পল্লীগ্রামের বা মফঃস্বলের সাহায্য হতে পারে, সে রকম কাজ আমাদের মধ্যে কারো-কারো হাতে নেওয়া উচিত।"

তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি নিজে এ-বিষয়ে হাত দিয়েছিলেন। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সহধর্ম্মিণী হিসাবে বাংলার তিনটি জেলায় চারটি মহিলা-সমিতি তিনি নিজের চেষ্টায় গড়ে তোলেন। গ্রামে গ্রামে আরও মহিলা-সমিতি গড়ে তুলবার তাঁর একান্ত বাসনা ছিল। এবং এই সমস্ত গ্রাম্য-সমিতির পরিচালনভার কলিকাতার একটি "বঙ্গীয় মহিলা-কেন্দ্র-সমিতি" স্থাপন করে তার হাতে দিতে চেয়েছিলেন। একান্ত দুঃখের বিষয় যে, তিনি নিজে এটি গড়ে তুলবার আগেই ভগবান তাঁকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

পুণ্যশীলা সরোজনলিনী গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৯-এ জানুয়ারী পরলোক গমন করেন। সরোজনলিনীর শেষ-ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত ও তাঁর পবিত্র-স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করবার জন্য তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধু ও স্বদেশ-

বাসিগণ গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৩-এ ফেব্রুয়ারী এই কেন্দ্র-সমিতি স্থাপন করেন। আট বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশের কয়েকটি বিভিন্ন পল্লীতে সাত-আটটি সমিতি নিয়ে কেন্দ্র-সমিতির কার্য্য আরম্ভ হয়েছিল। আজ বাংলাদেশের এমন একটি জেলা নেই, যেখানে কেন্দ্র-সমিতি একাধিক শাখা-সমিতি স্থাপন করেন নি। বাংলা ছাড়িয়ে বিহার, উড়িষ্যা, আসামের নানা স্থানে, দিল্লী ও সিমলায় এবং ব্রহ্ম-দেশেও সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতি ধীরে ধীরে দেশের সমগ্র মানব-সমাজের অর্দ্ধেক অংশকে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সামাজিক উন্নতিতে, আর্থিক সচ্ছলতায় সুসংবদ্ধ করার জন্য সঙ্ঘ-বদ্ধভাবে, সমিতি-বদ্ধ প্রণালীতে অসংখ্য মহিলা-সমিতি গঠন করছেন। এই আন্দোলন নারী-সমাজের মনে এরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তারা সমাজের ও নিজ নিজ সংসারের উন্নতির জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করতে আরম্ভ করেছেন। কেন্দ্র-সমিতি মহিলাদের স্পন্দনহীন জীবনে একটি নূতন শক্তির চেতনা এনে দিয়েছেন। এই নূতন শক্তির প্রভাবে গার্হস্থ্যনীতি, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, কুটীর-শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানার্জ্জনের ইচ্ছা বেড়েছে। শাখা-সমিতিগুলি পল্লীবাসিনী মহিলাগণের জীবনে একটি নূতন শক্তি, নূতন প্রেরণা এনে দিয়েছে। জীবনকে জ্ঞানে ও কর্ম্মে প্রকাশ করবার জন্য তাঁদের মধ্যে একটা ব্যাকুল আগ্রহ জেগে উঠেছে। বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদ, সঙ্গীত প্রভৃতির দ্বারা নিরানন্দময় পল্লী-জীবন নবীন আনন্দালোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সভা-সমিতি, বক্তৃতা, পাঠ, শিল্প ও শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা পল্লী-সমিতিগুলি প্রকৃতই জাতীয় জীবন-গঠনের শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়েছে।

সরোজনলিনী শিল্প-বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা ও সমিতির সহ-সম্পাদিকা
শ্রীনীরজবাসিনী সোম, বি-এ, বি-টি

কেন্দ্র-সমিতির কার্য্যাবলী মোটা-মুটি নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:— (ক) নূতন মহিলা-সমিতি স্থাপনের জন্য প্রচার; (খ) গ্রাম্য মহিলা-সমিতিগুলির কাজ একটা নির্দ্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে পরিচালনা; (গ) গ্রাম্য-সমিতিগুলির জন্য উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী প্রেরণ; (ঘ) কেন্দ্র-সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গলক্ষ্মী'র পরিচালনা; (ঙ) কলিকাতার 'সরোজ-নলিনী শিল্প-শিক্ষালয়' পরিচালনা; (চ) কলিকাতার

একটি নার্সিং স্কুল পরিচালনা; (ছ) পুরী বসন্ত-কুমারী-বিধবাশ্রম পরিচালনা এবং (জ) মহিলাদের শিক্ষা ও উন্নতিমূলক বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা।

মফঃস্বলে প্রচার ও শিক্ষয়িত্রী প্রেরণ

কেন্দ্র-সমিতির দুইজন প্রচারক ও মহিলা-কর্ম্মী বিভিন্ন পল্লীতে গিয়ে মহিলা-আন্দোলন সম্বন্ধে প্রচার করে থাকেন; এবং এই আন্দোলনকে স্থায়ী করবার জন্য মহিলা-সমিতি স্থাপন করার চেষ্টাই বেশী ক'রে করে থাকেন; আর যাতে সমিতির ভেতর দিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-শিক্ষা, শিশুপালন, প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও ধাত্রী-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্যই সমিতির একটা স্থায়ী কার্য্যধারা স্থির করে দিয়ে থাকেন; এই কাজগুলির প্রতি মহিলাদের আকর্ষণ বাড়াবার মানসে এই সব সমিতির ভেতর কেন্দ্র-সমিতির উদ্যোগে মাঝে মাঝে ম্যাজিক-লণ্ঠন বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা হয়, এই বক্তৃতায় বিভিন্ন প্রদেশে মহিলা-সমিতি কিরূপ কাজ করেন এবং কিরূপ কাজ করাই বা সম্ভবপর, বিশেষভাবে এগুলিরই আলোচনা করা হয়, এবং ছবিতেও সে সব দেখান হয়। মহিলা-সমিতির গঠন ও পরিচালন-প্রণালী সম্বন্ধে মুদ্রিত পুস্তক প্রত্যেক সমিতিকে দেওয়া হয় এবং সে সম্বন্ধে উপদেশও দেওয়া হয়। এই সব উদ্দেশ্য ও কার্য্যধারা নিয়ে, কেন্দ্র-সমিতির প্রচার ও প্রচেষ্টায় মফঃস্বলে চার শতেরও বেশী মহিলা-সমিতি গঠিত হয়েছে; এবং প্রায় সর্ব্বত্রই সন্তোষজনক কাজ হচ্ছে। এই সব সমিতির শিক্ষা-সৌষ্ঠবার্থে কেন্দ্র-সমিতির শিল্পবিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তা ১২ জন শিক্ষয়িত্রী নির্দ্দিষ্ট আছেন; যে সমিতির যখনই প্রয়োজন হয়, তখনই কেন্দ্র-সমিতি থেকে শিক্ষয়িত্রী দেওয়া হয়, এঁদের মাহিনার অর্দ্ধাংশ মফঃস্বল-সমিতিকে বহন করতে হয়, অবশ্য যে-সব সমিতির সভ্যাদের শিক্ষায় প্রবল আগ্রহ অথচ অভাব-নিবন্ধন শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করতে পাচ্ছেন না, সে সব জায়গায় কেন্দ্র-সমিতি সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করে থাকেন। এমনি ভাবে ৬।৭ মাস এক এক জায়গায় শিক্ষা দিয়ে তাঁরা সেখানে একজন বা দু'জন মহিলাকে তাঁদের অবর্ত্তমানে শিক্ষা দিবার যোগ্য করে রেখে ফিরে আসেন; আবার তিনি অন্যত্র যান; এমনি ভাবে তাঁরা প্রায় সব জায়গায়ই ঘুরে ঘুরে শিক্ষা দিতে সমর্থ হচ্ছেন। এই সব সমিতিতে শুধু শিল্প-কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয় না; সামাজিক উন্নতিমূলক আলোচনা, স্বাস্থ্য-রক্ষায় নিয়মপালন, পল্লী-হিতৈষী ব্যাপারের আয়োজন প্রভৃতি বহু বিষয়েরই আলোচনা হয়ে থাকে; অনেক মহিলা-সমিতি এ সবকে কার্য্যেও পরিণত করেছেন।

সরোজনলিনী শিল্প-বিদ্যালয়ের 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট'
শ্রীপ্রতিভা সেন, বি-এ

'বঙ্গলক্ষ্মী'র পরিচালনা

কেন্দ্র-সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গলক্ষ্মী' মাসিক পত্রিকা দিয়ে কেন্দ্র-সমিতির প্রচার-কার্য্যেও বিশেষ সুবিধা হচ্ছে; সাধারণের কাছে সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্য-

ধারা সাময়িক-পত্রের মারফতে করতে পারলে যেমন সুবিধা হয়, অন্য কোনরূপে তা' হয় না; তাই কেন্দ্র-সমিতি খুব মনোযোগের সঙ্গে এর পরিচালনা করছেন; এর সুবিধার জন্য কেন্দ্র-সমিতির সম্পাদিকা শ্রীহেমলতা দেবী নিজেই সম্পাদনার ভার নিয়েছেন। এতে মহিলা-আন্দোলন এবং মহিলা-সমিতি গঠন ও পরিচালন-বিষয়ে যে সব মনীষীদের লেখা বাহির হয়, সেগুলিকে পল্লীর মহিলাদের সামনে ধরবার জন্য মহিলা-সমিতির সম্পাদিকারা এখানি বিনামূল্যে পেয়ে থাকেন।

শ্রীগীতাদেবী, বি-এ, বি-টি ও শ্রীদীপ্তি দেবী, বি-এ,-বি-টি—
সরোজনলিনী সমিতির সহ-সম্পাদিকা ও বিদ্যালয়ের অবৈতনিক শিক্ষয়িত্রী

সরোজনলিনী নারী-শিল্প-শিক্ষালয়

সরোজনলিনী নারী-শিক্ষালয় গত আট বৎসরে বঙ্গীয় মহিলা-সমাজের বিশেষ উন্নতিসাধন করেছে। গত ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মাত্র ৩০ জন ছাত্রী

নিয়ে শিক্ষালয়ের কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল। বর্তমানে এর ছাত্রী-সংখ্যা কম পক্ষে ২০০ শত হয়েছে। গত ৬ বৎসরের মধ্যে এই শিক্ষালয়ে প্রায় আটশত মহিলা ভর্ত্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৬০ জন শিল্প-শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য গ্রহণ করে কেন্দ্র-সমিতির অধীনে এবং বিভিন্ন বালিকা-বিদ্যালয়ে উপযুক্ত বেতনে কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষালয়ের ছাত্রীগণের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক বিধবা এবং বিবাহিতা মহিলা।

সরোজনলিনী শিল্পবিদ্যালয়ের 'এম্‌ব্রয়ডারী' ক্লাস

শিক্ষালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়—(১) সেলাই ও ছাঁট-কাট; (২) এম্‌ব্রয়ডারী এবং ড্রয়িং; (৩) কার্পেট ও সতরঞ্চি বুনা; (৪) বাংলা, ইংরাজি, অঙ্ক, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষা; (৫) ঠক্‌ঠকি তাঁতে গামছা, ঝাড়ন প্রভৃতি সকল প্রকার জামার ছিট, টুইল, শাড়ী ও ধুতি প্রস্তুত; (৬) চাটনি, জ্যাম ও জেলি প্রস্তুত; (৭) বেতের বাক্স, মোড়া, সাজি প্রভৃতি নানাপ্রকার বেতের কাজ; (৮) সূতায় ও কাপড়ে রং করা; (৯) পিতলের উপর জয়পুরী মিনার কাজ; (১০) কলে মোজা, মাফ্‌লার ও সোয়েটার বুনা; (১১) সঙ্গীত এবং (১২) সুকুমার কলা-শিল্প। দুই বৎসর কাল শিক্ষালাভ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। শিল্প-শিক্ষার জন্য কোন বেতন দিতে হয় না।

শিক্ষালয়ের ছাত্রীরা সকলে মিলে একটি মহিলা-সমিতি গঠন করেছেন। প্রতি মাসে সমিতির সভায় প্রবন্ধ-পাঠ ও নানা বিষয়ের আলোচনা হয়ে থাকে। এই ভাবে ছাত্রীগণ সরোজনলিনীর জীবনের আদর্শকে সামনে রেখে পরস্পর মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদান এবং নানাপ্রকার হিতকর কাজের অনুষ্ঠান করে থাকেন। স্কুলের ছাত্রীগণ অধিকাংশই পূর্ণবয়স্কা মহিলা। এখানে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে মেলা-মেশা করে পরস্পরের দৃষ্টান্তে অনেক নূতন জিনিষ শিখবার সুযোগ

পেয়ে থাকেন। ছাত্রীগণের নানাবিধ পুস্তক-পাঠের সুবিধার জন্ম শিক্ষালয়ে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে। শ্রীমতী গীতা দেবী এবং শ্রীমতী দীপ্তি দেবী স্কুলে অবৈতনিক অধ্যাপকের কাজ করে সমিতির বিশেষ উপকার সাধন করছেন।

কেন্দ্র-সমিতির সহ-সভানেত্রী শ্রীযুক্তা নীরজবাসিনী সোম শিল্প-শিক্ষালয়ের সম্পাদিকারূপে যে অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন এবং কচ্ছেন, তারই ফলে এই শিক্ষালয় দিন দিন উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

বিধবাশ্রমের পরিচালনভার সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতির হাতে দিয়ে যান।

গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতি যখন এর পরিচালনভার গ্রহণ করেন, সে সময়ে বিধবাশ্রমটি একটি শিল্পশিক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষ অনুরোধে বিধবাশ্রমের সহিত একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। স্থানীয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী-গণ এবং সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ বিধবাশ্রম ও বালিকা-

সরোজনলিনী শিল্প-বিদ্যালয়ের কার্পেটের ক্লাশ

পুরী বসন্তকুমারী-বিধবাশ্রম

পরলোকগত স্যর অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী ৺ লেডী বসন্তকুমারী দেবী কিছুদিন পূর্ব্বে পুরীতে একটি বিধবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।—মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি

বিদ্যালয়কে এরূপ আগ্রহের সহিত সাহায্য করছেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ৭০ জন হয়েছে। বিধবাশ্রম ও আশ্রম-বিদ্যালয় পরিচালনের জন্য পুরীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন্, পি, থাডানি, আই-সি-এস্ মহাশয়কে সভাপতি করে এবং পুরীর

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ভদ্রমহোদয়গণকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিহার-উড়িষ্যার গভর্ণমেন্ট এবং পুরী মিউনিসিপ্যালিটি এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-প্রণালী অনুমোদন করে এর সুপরিচালনের জন্য অর্থ-সাহায্য করছেন।

বিধবাশ্রমের শিক্ষা-বিভাগ কলিকাতা সরোজ-নলিনী নারী শিক্ষালয়ের আদর্শে গঠিত হয়েছে। প্রাপ্ত-বয়স্কা মহিলাগণকে নিম্নবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে—ইংরাজি, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস, সঙ্গীত প্রভৃতি সাধারণ শিক্ষা, সেলাই ও ছাঁট-কাটের কার্য্য, নানাপ্রকার সূচী-শিল্প, ড্রয়িং এবং বস্ত্রবয়ন। বিধবা-শ্রমের শিক্ষা শেষ করতে তিন বৎসর সময় লেগে থাকে।

নগরের কোলাহল হতে দূরে সমুদ্র-তটের উপর অতি সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর স্থানে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমবাসিনীগণ যখন প্রত্যুষে উঠে সূর্য্য-কিরণ-রঞ্জিত নীল জলরাশির সম্মুখে স্তোত্রগান করেন, তখন সত্য সত্যই মনে হয় ছাত্রীগণের বৈধব্য-জীবনে একটা আনন্দময় নূতন জীবনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে। সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল-সমিতির সম্পা-দিকা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী এই আশ্রমটিকে একটি আদর্শ বিধবাশ্রম করে গড়ে তুলতে যে পরিমাণ শ্রম স্বীকার করেছেন এবং আজও করছেন, মনে হয় এই আশ্রমের সমুন্নতির মূলে সেইটেই প্রধান সহায়।

বটকৃষ্ণপালের বাগানে সরোজনলিনী শিল্প-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের 'বনভোজন'

এই রকম একটি ছোট প্রবন্ধে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী কার্য্যধারার সবিস্তার আলোচনা সম্ভবপর নয়; আর এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্ম লোক-চক্ষুর সামনে ফুটিয়ে রাখারও বিশেষ দরকার আছে এর কার্য্যধারার প্রচার ও প্রসারের জন্যে।

শিল্পীর স্ত্রী *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

এপারে স্বর্ণগড়। ওপারে নন্দন। মাঝখানে বেগবতী।

কবে যে এপারের লোক ওপারে যেতে 'অচল' সেতু সৃষ্টি করেছিলো—কেউ তা জানে না। সেতু অচল, কিন্তু অক্ষয় নয়। একদিন যে বেগবতীর স্রোতকে সে উপেক্ষা করেছিলো—সে-দিন আবার সেই বেগবতীর বুকেই সে ভেঙে পড়লো।

দিনের আলোয় যখন দেখা গেলো—অচল সেতু নেই, স্বর্ণগড়ে একটা হাহাকার পড়ে গেলো। মেয়েরা বেগবতীর জলে কলসী ভ'রতে এসে দেখ্‌লো—নদীর জল ঘোলা; অচলের চিহ্নও নেই।

তারপরে অনেক দিন কেটে গেলো—অচলকে আর ফিরিয়ে আনা গেল না। যদি-বা ফিরিয়ে আনে—বেগবতী আবার তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মানুষের শক্তি বেগবতীর কাছে হার মান্‌লো।

নন্দনের পাখীর গান, ময়ূরের নাচ—শোন্‌বার, দেখবার কেউ নেই। অজস্র ফুল ফোটে—কেউ তোলে না, দেখে না। স্বর্ণগড়ের কবি কাব্য লেখা ছাড়লো।

রাজা পণ করলেন—যে 'অচল'কে ফিরিয়ে আনতে পারবে—আমি তাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দেবো।

কিন্তু অসম্ভব ব'লে কেউ আর অর্দ্ধেক রাজত্বের দুরাশা করে না। দিন যায়—

একদিন হঠাৎ কোন্ দেশ থেকে এক শিল্পী এসে উপস্থিত। সঙ্গে শিল্পীর স্ত্রী। শিল্পী এসে রাজাকে বল্‌লো—'আমি দেবো অচল সেতু গ'ড়ে।'

কেউ বিশ্বাস করে না। রাজা বলেন—'প্রমাণ। প্রমাণ আছে কিছু?'

'না মহারাজ, প্রমাণ কিছু নেই বটে, তবে আমি পারবো।'

'কি করে বুঝ্‌বো পারবে?'

'মহারাজ, যদি না পারি আমার প্রাণ যাবে।'

'তার মানে?'

'তার মানে—সেতু তৈরী হ'লে আমি তার ওপর দাঁড়াবো, সেদিন তার কাঠাম খুলে নেওয়া হবে—যদি সেতু ভেঙ্গে পড়ে—আমায় নিয়েই পড়বে। অচলের সঙ্গে আমিও ডুববো।'

রাজা বল্‌লেন—'বেশ কথা।—তোমার যতো খুসী লোক নাও, যতো খুসী টাকা নাও; যদি পারো—অর্দ্ধেক রাজত্ব তোমার—'

শিল্পী পত্নীকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কানে কানে বল্‌লো—'এতোদিনে শিল্পীকে লোকে চিন্‌বে।'

বছর কাট্‌লো, আর এক বছরও; আরো এক বছর। এবার অচল ফিরে এলো। বেগবতীর উন্মত্ত স্রোত আবার অচলের বুকে বাধা পেয়ে—আবর্ত্ত রচনা ক'রে ছুটলো। শিল্পী যেয়ে রাজাকে বল্‌লো—'মহারাজ, আমার কাজ শেষ, অচল সেতু গড়া হয়েচে; দেখ্‌বেন চলুন।'

পরদিন অচলের উদ্বোধন-উৎসব। স্বর্ণগড় ফুল-পাতায় ছেয়ে গেছে। রাজপথে আলোর মালা রাতকে দিন ক'রে তুলেচে।

শিল্পীর মন খুসীতে ভারী হ'য়ে উঠ্‌লো। আনমনা চলতে চলতে শিল্পী সেতুর ওপর গিয়ে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শিল্পী দেখলো—আকাশের ঈশান কোণে একখণ্ড কালো মেঘ আস্তে আস্তে আকাশের অনেকখানি ছেয়ে ফেল্‌লো। একবার, দু'বার বিদ্যুৎ

[* পোলীর গল্প অবলম্বনে]

চম্‌কে চম্‌কে উঠ্‌লো। তারপর শোঁ শোঁ করে পাগ্‌লা হাওয়া ছুটে এসে সারা আকাশে কালো মেঘের তুলি বুলিয়ে দিলো। বেগবতীর জল ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠ্‌লো; আর হঠাৎ যেন শিল্পীর পায়ের তলায় অচল থর-থর ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো। অকস্মাৎ ব্যর্থতার আশঙ্কায় শিল্পীর মুখ পাণ্ডুর হ'য়ে উঠ্‌লো। অন্ধকারে বেগবতী অট্টহাস্য ক'রে উঠ্‌লো। শিল্পী অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় চল্‌তে চল্‌তে বাড়ী ফিরে এলো।

স্ত্রী এতোক্ষণ শিল্পীর পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। কাছে আস্‌তে স্বামীর বিবর্ণ মুখ দেখে তার বুক কেঁপে উঠ্‌লো। স্বামীর দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মুখের কাছে মুখ তুলে স্ত্রী বল্‌লো—'তুমি অমন করছ কেন? তোমার কি অসুখ করেছে?—না না, আমাকে ফাঁকি দিও না, নিশ্চয়ই তোমার কিছু—'

শিল্পী প্রাণপণে নিজেকে সংযত ক'রে বল্‌লো—'কিছু না—'

স্ত্রী অভিমান করে বল্‌লো—'এই প্রথম তুমি আমার কাছে কথা লুকোচ্ছো!—তুমি কি আর আমায় ভালোবাসো না?

চোখের জল এবার আর বাধা মান্‌লো না, শিল্পী বল্‌লো—'আমায় সন্দেহ ক'রে আর দুঃখের বোঝা বাড়িও না।'

স্ত্রীর অভিমান বরঞ্চ বেড়ে গেল: স্বামীকে পরাজয় স্বীকার ক'রে বল্‌তে হ'লো—'আমাদের সমস্ত সুখের স্বপ্ন ভেঙে গেছে। আমারই ভুলে কাল অচল ভেঙে পড়বে; সঙ্গে সঙ্গে যে অচলকেও গড়েছিলো—সে-ও—'

স্ত্রী স্বামীর মুখ চেপে ধ'রে বল্‌লো—'তা-ও কখনো হয়? অচল কখনো ভেঙে পড়তে পারে?'

শিল্পী বল্‌লো—'অচল ভাঙবেই; উপায় নেই। কালই অচলের উদ্বোধন-উৎসব; কালই শিল্পীর শেষ দিন। মৃত্যু ছাড়া আমার আর গতি নেই।'

স্ত্রী স্বামীকে বুকে টেনে নিয়ে অবোধ শিশুর মতো তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লো।

অনেক রাত্রিতে শিল্পী স্ত্রীর কোলে ঘুমিয়ে পড়লে, অতি সন্তর্পণে স্বামীর মাথা নামিয়ে রেখে স্ত্রী নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের বাইরে এসে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বল্‌লো—'এই সুযোগ!'

ভীষণ দুর্য্যোগের রাত্রি। অন্ধকারে, বাতাসের ভীষণ শব্দে, মেঘের গর্জ্জনে, কিছু দেখা যায় না। নিঃশব্দে একখণ্ড জলন্ত কাঠ হাতে ক'রে শিল্পীর স্ত্রী ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লো। একটু পরে অচলের বুকে দড়ি-দড়া, শুক্‌নো কাঠে দাউ-দাউ করে আগুন জলে উঠ্‌লো।

ওপরে আকাশ—নীচে বেগবতী লালে লাল হ'য়ে উঠ্‌লো। পরদিন রব উঠ্‌লো বজ্রের আগুনে অচল ধ্বংস হ'য়েচে। কিন্তু কেউ জান্‌লো না—কি আগুনে পুড়ে অচল ভেঙে পড়লো;—শিল্পীও না।

দু'বছর পরে আবার মহাসমারোহে অচলের উদ্বোধন-উৎসব হয়ে গেলো। এবার আর শিল্পীর ভুল হয় নি।

বঙ্গনারীর আত্মরক্ষা—অন্তঃপুরে ও বাহিরে

মাহ্‌মূদা খাতুন সিদ্দিকা

বঙ্গনারীর অন্তঃপুরে ও বাহিরে আত্মরক্ষার কথা বলিতে হইলে অনেক কিছুই বলিতে হয়।

বঙ্গনারী বলিতে আমি কেবল হিন্দুরমণীকেই বলিতেছি না; মোস্লেম নারীরও উল্লেখ করিতেছি। দীর্ঘকাল যাবৎ নারীকে এই ভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছে যে, তাহার দ্বারা রন্ধন-কার্য্য ও সন্তান-প্রসব, এই শ্রেণীর কার্য্য ছাড়া আর কিছুই হওয়া সম্ভবপর নহে। দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকায় এবং তাহার স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে খর্ব্ব করায় সে হইয়া গিয়াছে দীর্ঘকাল পিঞ্জরাবদ্ধ শক্তিহীন, আপন-কর্ম্ম-বিস্মৃত পশুর মত। তাহার কি গিয়াছে, আর কি আছে — তাহা সে ভাবেও না, ভাবিবার ক্ষমতাও তাহার নাই; কারণ তাহার জ্ঞান ছিল—বিকাশের পথ ছিল না। আত্মা ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতরেই আবদ্ধ হইয়া থাকায়, ছড়াইয়া পড়িতে পারে নাই। এই ভাবে সে মানবত্বের দাবী হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে সমাজের কল্যাণ হয় নাই, বরঞ্চ বহু দিক্ হইতে ক্ষতি হইয়াছে। সন্তান-পালনে জ্ঞানহীনা নারী শিশুকে স্বাস্থ্য-সম্পদে বা চরিত্রে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে নাই এবং নারীর দান হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে। নারীকে এই ভাবে রাখায় সমাজের যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা মোস্লেম সমাজের নারী-দিগের প্রতি দৃক্‌পাত করিলেই অনুমান করা যায়। তাহারা হিন্দুরমণীর বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার কারণ তাহারা পর্দ্দাকে সর্ব্বস্ব করিয়া একান্ত-ভাবে গৃহকোণে আশ্রয় লইয়াছেন। ইহাতে জীবনের সহস্র বিকাশ রুদ্ধ হইয়া জীবন ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া বিলাসী হইয়া উঠিয়াছে। আত্ম-সুখ-নিরত অলস জীবনযাত্রা চিরদিনই হেয় — গৃহকোণে একান্তভাবে বদ্ধ থাকায় তাহারা এই প্রকার জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ বন্দিনী-জীবনের কোন গৌরব নাই। মূর্খ জীবন-যাত্রার প্রণালী ইহা ছাড়া আর কি-ই বা হইবে? নারীকে মূর্খ করিয়া রাখিয়া ফাঁকি দিবারও সুবিধা হইয়াছে; মূর্খতা হেতু বহুস্থলে তাহারা নানা-ভাবে ফাঁকিতে পড়িয়া থাকে, অনেক স্থলে তাহাদের উৎপীড়নও সহিতে হয়।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাহারা নারীকে কেবল অল্পশিক্ষিতা করিয়া রাখিতে চাহেন, অর্থাৎ নারীর পত্র-লেখা অবধি জ্ঞানকেই যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু, ইহার যে এমন কোন কোন দিক্ থাকিতে পারে যদ্দ্বারা অনিষ্ট-সাধন হইতে পারে, তাহা তাঁহারা ভাবিতেও চাহেন না। উপার্জ্জনাক্ষম নারীকে যে সর্ব্বতোভাবে পুরুষের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় তাহাতে তাহার আত্ম-সম্মান রক্ষা হইতে পারে না, বরঞ্চ আত্মসম্মানবোধ এই অক্ষমতার নিম্নে হারাইয়া যায়। ইহাতে সে পুরুষের ক্রীড়া-পুত্তলী হইয়া পড়ে। যাহাকে কেবল ক্রীড়া-পুত্তলী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, তাহার প্রতি অন্তরের প্রেম জাগরূক হইয়া উঠে না — যাহা জাগিয়া উঠে তাহা কামনা মাত্র। যাহার ভাবে ইহাই প্রকাশ পায় — যাহা ইচ্ছা করিতে পার, আমার তাহাতে বাধা দিবার বা বলিবার কিছু নাই — এবম্প্রকার সত্তাহীনা নারীর প্রতি ইহা ছাড়া আর কি-ই বা জাগিতে পারে? ভোগের মাঝখানে যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছে, তাহাকে ভোগাগ্নি হইতে কে রক্ষা করিবে? ব্যভিচার কেবল বাহিরেই ঘটে না, ঘরেও ঘটিয়া থাকে। ইহাতে মনোবৃত্তি হীন হইতে থাকে, ফলে উভয়ের কেহই যথার্থ সুখী হইতে পারে না, এই ভাবে অতৃপ্ত জীবন কাটিতে থাকে। দাম্পত্য-জীবনে আদর্শ না থাকিলে নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ, আদর্শবিহীন দম্পতির সন্তানসন্ততি পিতামাতা

হইতে চরিত্রগত দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় যে হীনস্বাস্থ্য মেয়েটী জন্মগ্রহণ করে, তাহার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন ভাবী বৈবাহিকের ভ্রূকুটি, তাহার বিবাহের জন্য কত বেগ পাইতে হইবে ভাবিয়া শিশুটীর প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া উঠেন। অনাদর-অবহেলার মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া ভবিষ্যতে শিশুটী প্রফুল্লতাবিহীন নির্জীব স্বাস্থ্যহীন হইয়া একটু বড় হইয়া উঠিতেই পিতা-মাতা আবার তাহাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন। যদি মনে হয়, ইহা অপেক্ষা ভাল পাত্র জুটাইবার মত অর্থ তাঁহাদের নাই (কারণ হিন্দু সমাজে ভাল পাত্র আনিতে অর্থের প্রয়োজন; যাহারা বিবাহ-ব্যাপারে পণ গ্রহণ করে আমাদের দেশের লোকের তাহাকে ভাল পাত্র বলিতে বাধে না) তখন সে চাহুক বা না-চাহুক, তাহার মনোবৃত্তি বিকশিত হইয়া উঠুক বা না-উঠুক, তাহা লক্ষ্য করা চলে না; তাহাকে পাত্রস্থা করা হয়। তাহার পর সে কিছু না-বুঝিতে, না-চাহিতে তাহার অকাল-মাতৃত্ব লাভ হয়, ফলে দাম্পত্য-জীবন যতখানি মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠা উচিত, তাহা হয় না। হৃদয় বিকশিত হইয়া না উঠিতেই চাপা পড়িয়া যায়। ইহাতে জীবনের হানি ঘটে, কারণ কেবল বাঁচিয়া থাকাই জীবনের লক্ষণ নহে, অন্তরের বিকাশই জীবন। আমাদের দেশের লোক তাহা বুঝে না বলিয়া, সেই হৃদয়ই সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। অকাল-মাতৃত্বের ফলে আরও জীবনের যত রকম হানি ঘটিতে পারে আজ-কালকার দিনে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সমাজ নারীর প্রতি সংকীর্ণ বলিয়া তাহার বিবাহ-ব্যাপার অত্যন্ত জটিল। এই বিবাহ-ব্যাপার তাহাকে অত্যন্ত হীন করিয়া রাখিয়াছে। তাহার বিবাহ অন্যের উপর নির্ভর করে এবং বিবাহ-ব্যাপারে তাহাকে এমন ভাবে দেখা হয়—যেন সে বাজারের পণ্য। সে যে মানুষ—তাহার জ্ঞান-বিবেক, তাহার মনুষ্যত্বই যে তাহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তাহা সকলেই বিস্মৃত হন। সে উপার্জ্জনাক্ষম, ইহার কারণ তাহাকে কেবল অশিক্ষিতা করিয়া রাখা এবং বিবাহ ছাড়া অন্য কোন সদুপায়ে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করার পন্থা না থাকা; ইহা ছাড়াও একটী কারণ তাহার বিবাহ নিয়মের নাগপাশে বদ্ধ। অকাল-বিধবাকে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, চক্ষু-লজ্জার খাতিরে বিধবা থাকিতে হয়। অত্যাচারী স্বামীর গৃহে অসহ জীবন সহিতে হয়, অনেকে সহিতে না পারিয়া সমাজের বুকে অনেক অমঙ্গল আনিয়া থাকেন। হিন্দু-সমাজে ইহার কোন প্রতিকার নাই। যে নারী নির্মম অত্যাচার সহিয়া চলে, আমাদের দেশের লোক তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহার ভিতরে হীনতা ও উপায়হীনতা দুই-ই আছে, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না। উপায় থাকিলে মানুষে অমানুষিক অত্যাচার সহিত না। অনেকের ধারণা ইহাই নারীর মহত্ত্ব কিন্তু আমরা একথা বলি, লোকটা কুকুর নহে অমন করিয়া পড়িয়া থাকে? ইহাতেই অনুমেয় হয় যে, ইহা সহনশীলতা নহে বরং হীনতা। ইহাতেই নারীর জীবন-যাত্রার পথ জটিল হইয়া গিয়াছে। এ বিষয়ে ইস্‌লাম নর-নারীকে তফাৎ করে নাই বলিয়া নারীর স্থান পুরুষের নিম্নে নহে, বিবাহ তাহার সম্পূর্ণ হাতের ভিতরে, সাবালক নরনারীর বিবাহ সম্পূর্ণ তাহার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে; কেবল স্থান-বিশেষের জন্য নাবালক পুত্র-কন্যার বিবাহ পিতা-মাতার মতের উপর নির্ভর করে। নারী ইচ্ছা করিলে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারে, তাহার বৈধব্যের কোন কঠোর বিধান নাই এবং অত্যাচারী স্বামীর হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইবার উপায় তাহার আছে বলিয়া অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে পায় না। মানব-চরিত্র সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ এবং জীবনে মানব কত রকম অবস্থায় পড়িতে পারে—এ বিষয়ে যাঁহার জ্ঞান আছে, তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, বিবাহে নারীর স্বাধীনতা থাকা উচিত; তাহা হইলে নারীকে পুরুষের নিকট হেয় হইতে হয় না।

অবশ্য বর্ত্তমানে মোস্লেম বিবাহ-প্রথা মোস্লেম-সমাজে প্রচলিত নাই, তাহার কারণ মোস্লেম-শাস্ত্র জ্ঞানচর্চ্চা অভাবে এবং দীর্ঘকাল হিন্দুর পাশে বাস করায় সংসর্গগুণে সংস্কারাধীন হইয়া পড়িয়াছে, এ কারণ বর্ত্তমানে বহুল পরিমাণে মোস্লেম-রমণীর অবস্থা শোচনীয়। অনেকে মনে করেন বিবাহ-ব্যাপারে নারীকে কঠোর নিয়মে রাখিলে সমাজে শৃঙ্খলা রহিবে; কিন্তু অতিরিক্ত কঠোরতার ভিতরে কোন জিনিষই সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে না, বরং বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়। মুক্তির ভিতরে স্বাচ্ছন্দ্য আছে, বন্ধনের ভিতরে তাহা নাই; বাঙ্গালীর ঘরের বধূ-জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা অনুমান করা যায়। তাহাকে যদি শাশুড়ীর পছন্দ না হয় তবে সে-গৃহে তাহার স্থান হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। এমন কি অতি তুচ্ছ কারণে সে পরিত্যক্তাও হইয়া থাকে। আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে 'বজ্র আঁটুনী ফস্কা গেরো'—কথাটা সত্য। জোর করিয়া যাহা মিলে—যাহা বাধা-বাধকতার ভিতরে আসে, তাহা পাওয়া নহে; কারণ তাহাতে পাওয়ার তৃপ্তি নাই। একজন আর একজনকে ভালবাসিলে তাহার প্রণয়াস্পদের জন্য সে আপনিই দুঃখ সহিবে। আমাদের দেশে যে সব সতীদের আদর্শ শুনা যায়, তাহার মূলে নিহিত আছে প্রেম। বিবাহ যে ব্যবসায় নহে, এ জ্ঞান প্রত্যেক নর-নারীরই থাকা কর্ত্তব্য; কারণ, তাহাই জীবনের গভীরতম অনুভূতি। এ-বিষয়ে এক পক্ষে বিবেচক অপর পক্ষে বিবেচনাহীন হইলে বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা।

কেবলমাত্র অন্তঃপুর লইয়া নারীর কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র, কিন্তু দীর্ঘকাল তাহার অশিক্ষিতা থাকার দরুণ এবং সর্ব্ব বিষয়ে অতিরিক্ত অধীন হওয়ার দরুণ সে-স্থানে সে যে ভাবে বাস করে, তাহাতে তাহাকে দেখিয়া মনে হয় না যে, সে সেই গৃহের কর্ত্রী। বিচার করিয়া দেখিতে গেলে যে স্থানে তাহার সম্মান, তাহার দাবী সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্য, সে-স্থানে সে বাস করে ঠিক দাসীর মত, কারণ তাহার বধূ-জীবনে থাকিবার অধিকারটুকু পাঁচজনের উপরই নির্ভর করে, তাই তাঁহাদের মন যোগাইয়া চলাই হইয়া উঠে একমাত্র লক্ষ্য—তাই তাহার চলা-ফেরার ভিতরে রাজ্ঞীর ভাব না ফুটিয়া দীনতা-হীনতাই ফুটিয়া উঠে। এই অসহায় মনোভাব সৃষ্টি হইবার কারণ হিন্দু রমণীরা সম্পত্তির অংশ প্রাপ্ত হন না, এই স্থানে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত খাটো করিয়া রাখা হইয়াছে। এক দিকে নারী সম্পত্তির অংশ পাইবে না—অপর দিকে তাহার বিবাহে পণ দিতে হইবে, তাহাকে বাজারের মত যাচাই করিয়া লইতে হইবে, একটু কালো হইলে মেয়েকে লইয়া পিতা-মাতাকে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। এই সব কারণে নারীর পারিবারিক জীবন অত্যন্ত দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছে, অন্তঃপুরে তাহার আত্ম-রক্ষার উপায় নাই। অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার যো নাই। কারণ, চতুর্দ্দিক হইতেই সমাজ তাহাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া হীনবল করিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্ব বিষয়েই যাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, চলিতে পায়ে পায়ে যাহার বাধা, কঠোর বিবাহ-নিয়ম যাহাকে ভোগের ভিতরে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছে — তাহার আত্মরক্ষার উপায় কোথায়? অন্নের সংস্থান না থাকিলে শক্তিশালী সিংহও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। নারীর উপার্জ্জনের অক্ষমতা, জ্ঞানের অভাবে আপনার অভাব-অভিযোগকে বুঝাইবার অক্ষমতা, তাহাকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে দেয় না, অধিকন্তু হীন করিয়া রাখে। যে অন্তঃপুর নারীর স্নেহ, প্রীতি, সেবা নহিলে বাঁচিতে পারে না, সেই অন্তঃপুরে সে পরমুখাপেক্ষী। সে মাতা, কিন্তু তাহারই পুত্র-কন্যার বিবাহ তাহার মতের বড় অপেক্ষা করে না। নারীর বৈধব্য ঘটিলে সামান্য উদরান্নের নিমিত্ত অনেক লাঞ্ছনা সহিতে হয়, কারণ সে সে-পরিবারের অংশীদার নহে, খাইবার থাকিবার অধিকার তাহার নাই, তাই সে হইয়া পড়ে সম্পূর্ণ করুণার পাত্রী; কিন্তু

এইরূপ হইয়া থাকা কতদূর শোচনীয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

সেবা নারীর ধর্ম্ম, মানব মাত্রেরই ধর্ম্ম; নিঃস্বার্থ ভাবে সেবা করার যে কি বিপুল তৃপ্তি, তাহা যিনি করেন নাই, তিনি বুঝিবেন না। কিন্তু সেবা যদি স্বেচ্ছায় না আসিয়া বাধ্য-বাধকতার ভিতর দিয়া আসে, তবে তাহার সে-মূল্য থাকে না। কারণ, অন্তঃকরণ কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মত নারীকেও এ-বাড়ী হইতে ও-বাড়ী বেড়াইতে যাইতে হইলে স্বামীর বিনানুমতিতে যাইবার অধিকার নাই; এই চলিবার-ফিরিবার স্বাচ্ছন্দ্যহীনতাও অন্তরকে ছোট করে—অথচ তাহার অজ্ঞতার দরুণ তাহার বিবেকের উপর নির্ভর করা চলে না। এই ভাবে নারীর অন্তঃকরণ-প্রসারের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলা হয়। তাহার সে ভীরু, কুণ্ঠিত ভাব, সে দুর্ব্বলতা—তাহার যে শিশুটী জন্মে সেও সেই আব-হাওয়ার ভিতরেই গঠিত হয়—বলিয়া তাহাতেও সঞ্চারিত হয়। এই ভাবে সমগ্র জাতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। বহির্জ্জগতে বঙ্গনারীর কোন বিকাশ নাই বলিয়া তাহার কোন উচ্চাসনও নাই, কারণ বিশ্বের সকল প্রকার যোগ হইতে সে ছিন্ন হইয়া ভেকের মত আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডিতে নির্ব্বিবাদে বসিয়া আছে। এ কারণ বহির্জ্জগতের কোন কর্ম্মে তাহার নৈপুণ্য ফুটিয়া উঠে নাই। মানব বলিয়া আপনাকে বুঝাইতে হইলে মানবের কর্ম্মবিকাশ—মনুষ্যত্বের বিকাশ না হইলে তাহার দাবীও থাকে না। তাই গৌরব করিবার মত তাহার কিছু নাই। যত দিন সে এই ভাবে তাহার জীবনকে ক্ষুদ্র গণ্ডিতেই আবদ্ধ রাখিবে, যতদিন না আপনাকে মানুষ বলিয়া বুঝাইবার ও বুঝিবার গৌরব অর্জ্জন করিবে, ততদিন সে অবহেলার পাত্রীই হইয়া রহিবে। নারী বলিতেই আমাদের দেশে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়া উঠে, কারণ সে কোন পদার্থ নহে বা তাহাতে তেমন কিছুই নাই—এই ধারণাও তাহার সম্মান-হানি করে। তাহার এ সম্মানের হানিকর ধারণা ঘুচাইবার জন্য, তাহাকে মানুষ বলিয়া বুঝাইবার জন্য বহির্জ্জগতে আসিতে হইবে এবং আপনার শুচি-শুভ্রতা লইয়া সকল কর্ম্মে গৌরব অর্জ্জন করিতে হইবে, বহির্জ্জগৎ নারীর জন্য বিপজ্জনক বলিয়াও কতকটা গৃহকোণে তাহার অবস্থিতি হইয়াছে। বহির্জ্জগতে সে চলিতে অভ্যস্ত নয় বলিয়াও বিপজ্জনক হইয়াছে, এই কারণ তাহাকে বাহিরে আসিবার পূর্ব্বে তাহাকে সকল রকম আত্মরক্ষার উপায় শিখিয়া আসিতে হইবে; যথা—লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, আততায়ীকে পরাস্ত করিবার কৌশল, তড়িৎবেগে পলায়ন করিতে পারা ইত্যাদি, এবং তাহা ছাড়া বিপদে পড়িলে বুদ্ধিভ্রংশ না হওয়ার মত মানসিক বল ও বুদ্ধি অর্জ্জন করিতে হইবে। বহির্জ্জগতে ভ্রমণ কালে নারীর নিকট একখানি অস্ত্র থাকা বাঞ্ছনীয়। ইহা ছাড়া অলঙ্কারের বাহুল্য বর্জ্জন করা এবং বেশভূষা সাধারণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়—কারণ, ইহাতে নারীর অনেক বিপদ ডাকিয়া আনে—বিশেষ তাহাকে যখন একা কোথাও যাইতে হয়, তখন বিশেষভাবে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। নারীর দৈহিক শক্তি, স্বাস্থ্য-সম্পদ যাহাতে বৃদ্ধি পায়—বহির্জ্জগতে আসিতে হইলে তাহাই সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে সকল কারণ নারীর মানসিক বল ও দৈহিক শক্তির অন্তরায়—তাহা সমূলে বিনাশ করিতে হইবে—যেমন পর্দ্দা-প্রথা ও বাল্য-বিবাহ ইত্যাদি। একদিন রাণী ভবশঙ্করী (রায় বাঘিনী), চাঁদ সুলতানা সমরক্ষেত্রে অস্ত্রচালনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন কিন্তু আজ নারী অস্ত্রের নাম শুনিলে, ভয়ে শিহরিয়া উঠে। তাহার কারণ পর্দ্দা-প্রথা তাহাকে অন্তরে-বাহিরে দুর্ব্বল করিয়া দিয়াছে। অতিরিক্ত পর্দ্দা-অনুরাগ অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করাইয়া অসহায় করিয়া তুলিয়াছে,—সকল দিক হইতে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এবম্প্রকার পর্দ্দা-প্রথা নারীর পক্ষে বা জাতির পক্ষে কল্যাণকর

নহে। অন্তরে-বাহিরে শক্তিশালী হইলে তবেই নারী আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে পারিবে। যে সকল সামাজিক কুসংস্কার নারীর অন্তঃপুরে ও বাহিরে আত্মরক্ষার অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে—তাহাদিগকে অচিরে বিনাশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহার জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে, কারণ যতদিন না নারী আপনার মূল্য বুঝিবে ও বুঝাইতে পারিবে, আত্মসম্মানবোধ তাহার যতদিন জাগিয়া উঠিবে, ততদিন অন্তঃপুরে ও বাহিরে তাহার আত্মরক্ষা অপরে করিতে পারিবে না।

প্রতীক্ষা

শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরী

এম্‌নি ক'রে রইবো ব'সে
বন-বীথির পরে,
অচেনা-যে পালিয়ে বেড়ায়
তারেই চেনার তরে।

পাতায় ফুলে রঙ্‌ লাগিয়ে
হয়তো বা সে এ পথ দিয়ে
কোন্‌ লগনে যাবে চ'লে
দখিন্‌-বায়ু-ভরে।

পাখীর গানে দিয়ে যাবে
কোমল সুধা-স্বর।
চরণ-রেখা রেখে যাবে
শ্যামল তৃণ প'র।

আকাশ-পারে সন্ধ্যা-মেঘে
অঙ্গ-বরণ রইবে লেগে,
বিদায়-ব্যথা উঠ্‌বে বেজে
করুণ-মর্ম্মরে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

কিন্তু নাম লইয়া পিণ্টুলীর হইল মহা দুশ্চিন্তা। ভাল নাম একটা প্রত্যেক মেয়েরই আছে। তাহারই বা থাকিবে না কেন?

পিণ্টুলী বলিল, 'ভাল নাম যে আমার একটা ঠিক ক'রে দিতে হবে মা!'

মাসি বলিল, 'যাহোক্ একটা ঠিক ক'রে নিস বাছা, আমি আর কি বলব।'

পিণ্টুলী বলিল, 'কি ঠিক করি বল দেখি?'

বলিয়া চোখ বুজিয়া সে নাম ভাবিতে বসিল। পাড়ায় তাহার যতগুলি সঙ্গী আছে, নাম তাহাদের কাহারও ভাল নয়।—ভবানী, তারা, পেঁচি, ষষ্ঠী, শোভা। এই 'শোভা' নামটাই যা একটুখানি ভাল। তাই বলিয়া যে নাম একজনের আছে সে নাম ত' আর রাখা চলে না! সারাদিন ধরিয়া পিণ্টুলী শুধু নামই ভাবিতে লাগিল।

অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া একটা ছাড়িয়া আবার আর একটা ধরিয়া শেষে 'প্রতিমা' নামটি তাহার বেশ ভাল লাগিল। লোকে বলে চেহারা তাহার নাকি খুব ভাল। প্রতিমার মতই দেখিতে। সুতরাং ওই নামটাই ভাল। শ্রীমতী প্রতিমা দেবী।

রাত্রে শুইবার সময় সে মাসিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা মা, প্রতিমা নামটি কেমন?'

মাসি বলিল, 'কি বললি? পিতিমে?'

পিণ্টুলী হাসিতে লাগিল।—'পিতিমে নয়, পিতিমে নয়,—প্রতিমা।'

মাসি বলিল, 'ওই একই কথা মা, আমাদের মুখে বেরোয় না, তাই পিতিমে বলি। হ্যাঁ, বেশ নাম! তোমার চেহারা ত' ঠিক পিতিমের মতই বাছা, ওই নামই বেশ হয়েছে।'

যাক, নাম তাহা হইলে একটা ঠিক হইয়াছে এবং ভালই হইয়াছে। পিণ্টুলী এইবার নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে পারিবে। নামটা যাহাতে সে ভুলিয়া না যায়, তাই বার-বার মনে মনে 'প্রতিমা' কথাটা উচ্চারণ করিতে করিতে রাত্রে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পিণ্টুলী যে শুধু দেখিতেই সুন্দরী তাহা নয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। পড়াশুনা সে দেরিতে আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া ক্ষতি তাহার বিশেষ কিছুই হইল না, অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করিয়া সে উপরের ক্লাসে উঠিয়া গেল।

পিণ্টুলী বড় হইয়াছে। এখন সে ফ্রক ছাড়িয়া শাড়ী পরিতেছে। ফ্রক আর এখন তাহাকে মানায় না। পরিতে লজ্জাও করে। আগে বেণী দোলাইত, এখন এলো-খোঁপা করিয়া একরাশ চুল সে ঘাড়ের উপর জড়াইয়া রাখে। গায়ের রং হইয়াছে আরও ফর্সা, মুখখানি হইয়াছে আরও সুন্দর। এত সুন্দর যে, সেদিক পানে একবার তাকাইলে আর সহজে সেদিক হইতে মুখ ফিরাইবার উপায় নাই।

হেড মিষ্ট্রেস একদিন নিজে আসিয়া মাসির

সঙ্গে দেখা করিলেন। বলিলেন, 'মেয়ে আপনার খুব চমৎকার পড়ছে, সেই কথা আপনাকে আজ আমি নিজে বলতে এলাম।'

মাসি একেবারে আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিল, 'বেশ মা বেশ, তোমাদের হাতেই ত' দিয়েছি, তোমরা ওকে ভাল ক'রে শিখিয়ে-টিখিয়ে দিয়ো।'

মিস্ট্রেস বলিলেন, 'গানও খুব ভাল গাইতে শিখেছে। এইবার কিন্তু বাড়ীতে বাজাবার জন্যে ওকে একটি হারমোনিয়াম কিনে দেবেন।'

ইস্কুলে লেখাপড়াই শেখানো হয় ইহাই সে জানে। বলিল, 'গান? গান শিখে কি হবে? আজ-কালকার মেয়েগুলো গায় বটে, কিন্তু ও-সব শিখে কি হবে মা, দু'দিন বাদে বিয়ে দেবো, শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে হয়ত ভাত রাঁধতে হবে, গান হয়ত রইবে শিকেয় তোলা।'

মিস্ট্রেস বলিলেন, 'তা হোক, শিখে রাখা ভাল। ওর মত গলা আমার ইস্কুলে আর কোনও মেয়ের নেই। এবার গানের জন্যে ওকে একটা মেডেল দেবো।'

'তা যা দিতে হয় দিয়ো মা, কিন্তু গান-টান ওকে তোমরা শিখিয়ো না। তার চেয়ে রান্না শিখিয়ে দিতে পার ত' দিয়ো। কাজে লাগবে।'

মিস্ট্রেস হাসিতে লাগিলেন। দেখিলেন ইঁহার সঙ্গে এই লইয়া তর্ক করা বৃথা। বলিলেন, 'সবই শেখাব। আপনি ওর জন্যে ভাববেন না।'

মাসি বলিল, 'ভাবনা ত' আর কিছুর জন্যে নয় মা, ভাবি শুধু ওর জন্যে একটি ভাল দেখে বর আমি কোথায় পাই। খোঁজবার লোকজন ত' আমার নেই মা, তোমাদের সন্ধানে যদি একটি থাকে ত' আমায় খবর দিয়ো। এইটি শুধু আমি তোমার হাতে ধরে বলছি বাছা।'

মিস্ট্রেস বলিলেন, 'আমিও আপনার হাতে ধরে বলছি মা, এখন থেকে প্রতিমার বিয়ের কথা আপনি ভাববেন না। ও ত' নিতান্ত ছেলেমানুষ।'

'দশ-এগারো বছরের মেয়ে আবার ছেলেমানুষ কোথায় মা? তার ওপর ওই ত' ফন্ ফন্ ক'রে বাড়ছে। না মা, সে তোমরা যাই বল, তেরো বছর আমি পেরোতে দেবো না।'

মিস্ট্রেস হাসিতে হাসিতে বিদায় লইলেন। যাইবার সময় পিন্টুলীর পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়া গেলেন, 'বিয়ে তুমি কিছুতেই কোরো না প্রতিমা, উনি বললেও কোরো না।'

পিন্টুলী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'কখখনো না।'

মিস্ট্রেস চলিয়া যাইতেই মাসি বলিল, 'মাগীর কথা ছাখো দেখি! বলে, মেয়ের বিয়ে দিয়ো না। হ্যাঁ, বিয়ে না দিয়ে তোদের মত অমনি থুবড়ি ক'রে রাখি আর কি!'

পিন্টুলী বলিল, 'না মা, বিয়ে আমি সত্যি করব না।'

মাসি বলিল, 'ওই জন্যেই ত' তখন ইস্কুলে আমি দিতে চাই নি বাছা! বিয়ে দেবো না, তারপর তোর সেই সৎ-মার মত কাউকে নিয়ে একদিন পালাবি। পালিয়ে চোরের মতন লুকিয়ে লুকিয়ে—আহা মরি মরি, কি সুখ গো!'

পিন্টুলী হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'না মা, তোমার আমি পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি—তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।'

মাসি বলিল, 'তা না হয় না গেলি, কিন্তু আমিই কি আর ততদিন বেঁচে থাকব বাছা! আমি মরে গেলে তোর ওই আগুনের মতন চেহারা…পাঁচ ভূতে তখন টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি করবে, কে তখন তোকে সামলাবে মা?'

পিন্টুলী বলিল, 'না মা, তুমি এখন মরো না, আমিও মরে যাবো তা'হলে।'

'মরা-বাঁচার কথা মানুষে বলতে পারে না মা,

তা যদি পারতো তা'হলে আর কিছু বাকি থাকতো না।'—এই বলিয়া মাসি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ রে, তোর ওই মাষ্টারণী আমার এই বিছানাটা ছুঁয়েছিল নাকি?'

পিন্টুলী আবার হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'কেন, তা'হলে ও-গুলো আবার কাচবে বুঝি? না মা, না ছোঁয় নি, তুমিই যেমন। উনি বামুনের মেয়ে, আর তুমি ওঁকে ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে একবার বসতেও বললে না।'

মাসি সে কথা বিশ্বাস করিল না।—'হ্যাঃ, বামুনের মেয়ে না আরও কিছু! যাক্ গে, ছুঁলে আর কি করছি বল্; তুইও ত' দিনরাত ওদের ছোঁয়াছুঁয়ি করেই আসচিস। এসে মরুক্ গে, একবার কাপড়টা কাচিস বাছা।'

মাসি নীচে নামিয়া যাইতেছিল, পিন্টুলী বলিল 'কোথায় যাচ্ছ? চল না মা, তোমায় আজ আমি বেড়িয়ে নিয়ে আসি।'

'দাঁড়া বাছা, কাপড়টা আগে কেচে আসি।' বলিয়া মাসি নীচে নামিয়া গেল। পিন্টুলী হাসিতে হাসিতে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল।

কাপড় কাচিয়া মাসি উপরে উঠিয়া আসিয়া শুনিল পিন্টুলী আপন মনেই গান গাহিতেছে। সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খানিক সে তাহাই শুনিল তাহার পর ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'মাষ্টারণী তোর বাজনা না কি কিনে দিতে বললে, তার দাম কত?'

আনন্দে পিন্টুলীর মুখখানা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিল, 'কিনে একটা দেবে মা? বড় ভাল হয় তা'হলে।'

শুকনো কাপড় ছাড়িতে গিয়া মাসি বলিল, 'তা' বললে যখন, তখন কি আর না কিনিয়ে ছাড়বে ভেবেছিস? তা না হয় একটা দিলাম কিনে, কিন্তু খেমটাউলীদের মতন যা তা গান যেন শিখিস নে বাছা, ঠাকুরদের গান-টান শিখিস যে, তবু দু'একটা শুয়ে শুয়ে শুনবো।'

পিন্টুলী বলিল, 'তা আজ যদি আমায় একটা হারমোনিয়াম কিনে দাও মা, তা'হলে কালই তোমায় আমি ঠাকুরদের গান শুনিয়ে দেবো দেখো।'

মাসি বলিল, 'তবে আর দেরী করছিস কেন মা? যা তবে কাপড়-চোপড় কেচে গা ধুয়ে জামা জুতো পরে তৈরী হ'য়ে নে শীগ্গির। কোথায় পাওয়া যায় জানিস্ ত'? শেষে আবার ঠকিয়ে না নেয় যেন।'

পিন্টুলী তাড়াতাড়ি নীচে নামিতে নামিতে বলিল, 'আমাদের গানের টিচারের বাড়ী আমি জানি মা, যাবার সময় তাঁকে সঙ্গে নেবো, তা'হলেই হবে।'

এমনি করিয়া আরও কয়েক বৎসর পার হইয়াছে।

পনেরো-ষোলো বছরের মেয়েকে যদি যুবতী বলা চলে, তাহা হইলে আমাদের সেই বালিকা পিন্টুলী এখন যুবতী প্রতিমা।

তাহার বিবাহের জন্ম মাসি ত' একেবারে পাগল হইয়া পড়িয়াছে। বাড়ীতে যে আসে, পাড়া-পড়শী যাহার বাড়ী বেড়াইতে যায়, তাহাকেই বলে, 'আর ত' মেয়েকে আমি রাখতে পারি না মা, বিয়ে এবার দিতেই হবে। যদি কারও সন্ধানে কোথাও একটি ভাল ছেলে থাকে ত' দাও মা যোগাড় ক'রে।'

সবাই ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'দেখি।'

পিন্টুলী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'এবার তা'হলে তুমি আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চাও, নয় মা?'

মাসির চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসে। পিন্টুলীকে তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বলে, 'তাড়িয়ে কেন দেবো মা, মেয়ে জামাই দু'জনেই আমার কাছে থাকবে।'

'তেমন জামাই তুমি যদি না পাও মা?'

মাসি বলে, 'কেন পাব না মা, আমার লোকজন নেই, তাই। নইলে তোর মতন মেয়ের আবার বরের ভাবনা বাছা।'

সে কথা সত্য।

পথে চলিতে গিয়া পিন্টুলী ত' দেখিয়াছে, কত যুবক কতবার তাহার মুখের পানে তাকাইয়া আর চোখ ফিরাইতে পারে নাই, কতজন তাহার পিছু-পিছু ধাওয়া করিয়াছে, পথ চলিতে চলিতে কত প্রেমের চিঠি তাহার পদপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে, কত আত্মহারা যুবকের কত প্রলুব্ধ দৃষ্টি এড়াইয়া, কত সাবধানে কত সতর্ক হইয়া যে তাহাকে পথে বাহির হইতে হয়, তাহা একমাত্র সেই জানে।

বরের অভাব তাহার নাই সত্য। একটুখানি চোখের ইঙ্গিতে কত বর যে আসিয়া জুটিতে পারে তাহার আর ইয়ত্তা নাই, কিন্তু যাহাকে ভালবাসিয়া চিরজীবনের সঙ্গী করিয়া লইতে হইবে, চিরারাধ্য দেবতার আসনে বসাইয়া যাহার পদপ্রান্তে দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করিতে হইবে—তাহার সে দেবতাও কি ওই সব প্রলুব্ধ উপযাচকের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে? পিন্টুলী কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করিতে পারে না। উহাদের চোখে সে দেখিয়াছে শুধু জঘন্য লোলুপতা, কামনাতুর দীনতা ছাড়া সেখানে কোনও অপূর্ব্ব বিস্ময়ের সন্ধান সে পায় নাই।

দেবুর কথা এক একবার তাহার মনে হইয়াছে। —সেই দেবু, তাহার সেই শৈশবের সাথী—দেবু। মনে পড়ে, তখন সে তাহাকে কতবার বলিয়াছিল—'তুমি আমার বর হবে।' সে কথা এখন ভাবিতে গেলে লজ্জায় তাহার গাল দুইটি রাঙা হইয়া উঠে। এখন সে কত বড় হইয়াছে, কি করিতেছে জানিতে ইচ্ছা করে। তাহাকে তাহার মনে আছে কি না, তাই বা কে জানে। দেখিলে আজ আর কেহ কাহাকেও হয়ত চিনিতেও পারিবে না।

বিবাহ করিবে না পিন্টুলী বলিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা সে মাত্র মুখে বলিয়াছে, মন থেকে বলে নাই। যৌবনের যে অপরূপ রূপৈশ্বর্য্যে সমগ্র দেহ-মন তাহার বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রকৃতিদত্ত সে ঐশ্বর্য্য-সম্ভার কাহারও পদপ্রান্তে সমর্পণ করিতে পারিলে যেন সে বাঁচে—এমনই তাহার মনে হয়। কিন্তু কোথায় সে নারীর দেবতা, মন যেন তাহারই সন্ধান করিয়া ফেরে।

পিন্টুলীদের ইস্কুলে সেদিন পুরস্কার-বিতরণী সভা। চারিদিকে প্রাচীর দিয়া ঘেরা ইস্কুলের মাঠে চাঁদোয়া খাটাইয়া মণ্ডপ তৈয়ারী হইয়াছে। নিমন্ত্রিত বহু নর-নারী চারিদিক ঘিরিয়া বসিয়াছে। নারীর সংখ্যাই বেশি। অভ্যাগত পুরুষ যাঁহারা আছেন—সকলেই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অভিভাবক। ছাত্রীরা মাঝখানে বসিয়াছে।

প্রতিমা দেবী গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিবে।

হেড মিস্ট্রেস উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রতিমাকে কাছে ডাকিলেন। অপরূপ রূপলাবণ্যবতী প্রতিমা হাসিতে হাসিতে তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

হেড মিস্ট্রেস বলিলেন, 'এই মেয়েটি আমাদের ইস্কুলের গৌরব। এত বুদ্ধিমতী, এত সুন্দরী মেয়ে আমরা আর একটিও পেলাম না, এমন গানের কণ্ঠ যে, ইস্কুলের যতগুলি গানের পুরস্কার এই মেয়েটিই বরাবর পেয়ে এসেছে। এরই একটি গান দিয়ে আজকের এ সভার উদ্বোধন হবে।'

তারপরেই প্রতিমার গান।

সভানেত্রীর পাশে দাঁড়াইয়া টেবিল হারমোনিয়াম বাজাইয়া যে গান সে গাহিল, তাহা যে কত সুন্দর না শুনিলে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। মন্ত্রমুগ্ধের মত বিস্মিত দৃষ্টিতে সকলে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। যেমন অদ্ভুত তাহার রূপলাবণ্য, তেমনি অপূর্ব্ব তাহার কণ্ঠস্বর। দেবী প্রতিমার মত দাঁড়াইবার সে কি লীলায়িত ভঙ্গী!

গান থামিল। সকলেই স্তব্ধ, নির্ব্বাক! চারিদিক যেন থম্ থম্ করিতেছে। কাহারও মুখে কোনও কথা নাই।

হাত দুইটি জোড় করিয়া নতমস্তকে সভার সকলকে প্রণতি জানাইয়া প্রতিমা তাহার নিজের জায়গায় গিয়া বসিল।

বসিয়া যেই সে তাহার মুখ তুলিয়া তাকাইয়াছে, সুমুখে নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে দেখিল, প্রিয়দর্শন এক যুবা তাহার দিকে একাগ্র মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। এমন ত' অনেকেই চায়, কিন্তু এ যেন একটুখানি বিভিন্ন। প্রতিমাও সেদিক হইতে সহজে মুখ ফিরাইতে পারিল না।

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই কেমন যেন একটুখানি জোর করিয়াই সেদিক হইতে তাহার চোখ ফিরাইয়া লইয়া প্রতিমা ভাবিল, ছি ছি, এ সে করিতেছে কি!

ওদিকে সভার কাজ চলিতে লাগিল। মেডেল, বই, সেলাই-এর বাক্স, প্রতিমা অনেক কিছু পাইল। কতবার তাহাকে যে উঠিয়া যাইতে হইল তাহার ঠিক নাই। কিন্তু একটিবারের জন্ত সেদিকে আর সে মুখ তুলিয়া তাকাইল না।

তাহার পর সভা ভঙ্গ হইল। মেয়েদের সঙ্গে প্রতিমাও উঠিয়া দাঁড়াইল। পুরস্কারের এত এত জিনিস একা সে বাড়ী লইয়া যাইতে পারিবে না। ইস্কুলের ঝিকে ডাকিয়া বলিল, 'এগুলো তুমি আমাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এসো ঝি।'

প্রতিমার কাছেই বাড়ী। পায়ে হাঁটিয়া একাই সে যাইতে পারে। সেদিনও বাড়ী যাইবার জন্ত ইস্কুলের ফটক পার হইয়া যেমন সে রাস্তায় নামিয়াছে, পিছন হইতে ছোট একটি মেয়ে ছুটিতে ছুটিতে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।—'প্রতিমাদি, আমার দাদা আপনাকে কি বলবে।'

প্রতিমা পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিল, কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে যাহাকে সে সভায় দেখিয়াছে, সেই ছোক্‌রাটি তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে।

মেয়েটিকে প্রতিমা চিনিত না। সে তাহার নিজের পরিচয় নিজেই দিতে লাগিল। —'এই ইস্কুলের ক্লাস 'ফোরে' আমি পড়ি, আপনারা বড় মেয়ে তাই আপনাদের সঙ্গে কথা কইতে ভয় করে।'—

বলিতে বলিতেই তাহার দাদা আসিয়া দাঁড়াইল। আসিয়াই সে প্রতিমার দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আমার এই বোন্‌টিকে আপনি গান শিখিয়ে দেবেন?'

প্রতিমা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'কেন দেব না? তুমি ত' এই ইস্কুলেই পড়, আমাদের বাড়ী যেতে পারবে?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, পারব। কোথায় আপনাদের বাড়ী, চলুন—দেখিয়ে দেবেন।'

কিন্তু মাসির কথা মনে হইতেই প্রতিমা বলিল, 'দেখুন, আপনাদের বাড়ী গিয়েও আমি শিখিয়ে আসতে পারি। বাড়ী কি আপনাদের কাছেই?'

মেয়েটির দাদা বলিল, 'খুব কাছে। চলুন না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলার চেয়ে—বেড়াতে বেড়াতে ···আবার আমি আপনাকে না হয় বাড়ী পৌঁছে দেবো।'

প্রতিমা বলিল, 'তাই চলুন। বাড়ীতে আপনার কে কে আছেন?'

মেয়েটি বলিল, 'মা আছেন, বাবা আছেন, আর আমার একটি ছোট ভাই আছে।'

তিনজনে পাশাপাশি পথ চলিতে লাগিল।

মেয়েরা স্বভাবতঃই আস্তে হাঁটে। প্রতিমা ও ছোট মেয়েটি পিছনে পড়িয়া রহিল, ছেলেটি একটু-খানি আগাইয়া গেল।

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার নামটি কি খুকি?'

মেয়েটি বলিল, 'আমার নাম পুষ্পলতা দেবী।'

হঠাৎ কি ভাবিয়া মাথা হেঁট করিয়া চুপি চুপি সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার দাদার নাম?'

পুষ্পলতা বলিল, 'দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।'

দেবেন্দ্রনাথ! প্রতিমা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহাদের সেই দেবু নয় ত'? আবার হেঁট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বলে ডাকে বল দেখি?'

'কাকে? আমাকে?'

'না, তোমার দাদাকে।'

'কেন, দেবু বলে ডাকে।'

প্রতিমার গতি আরও মন্থর হইয়া আসিল।—তবে কি সেই?

পুষ্পর দাদা একবার পিছন ফিরিয়া বলিল, 'একটু তাড়াতাড়ি আয় পিন্টুলী, গাড়ী আসছে, একটু সাবধানে।'

প্রতিমা বলিল, 'কি বলে ডাকলে? পিন্টুলী?

পুষ্প বলিল, 'হ্যাঁ, পিন্টুলী বলেই ত' আমাকে সবাই ডাকে।'

পুষ্পর দাদা তাহাদের লইয়া বড় রাস্তাটা পার হইবার জন্য দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। কথাটা তাহার কানে গেল। প্রতিমার দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'হাঁা, ওর ওই অদ্ভুত নামটা আমি রেখেছি।'

বলিয়াই একটুখানি সাবধানে এদিক ওদিক তাকাইতে তাকাইতে বড় রাস্তাটা তাহারা পার হইয়া গেল। ওপারে গিয়া দেবেন্দ্র বলিল, 'পিন্টুলী নামটা রাখবার একটা ভারি মজার ইতিহাস আছে।'

প্রতিমা চুপ করিয়া রহিল। দেবু বলিতে লাগিল, 'ছেলেবেলা আমার মনে পড়ে, আমার বাবার অবস্থা তখন ভাল ছিল না, আমরা থাকতাম ছোট্ট একটা এঁদো পচা বাড়ীতে। সেখানে আমাদেরই পাশাপাশি আর-একজনরা থাকতো, তাদেরও অবস্থা ছিল ঠিক আমাদেরই মত। পিন্টুলী বলে তাদের একটি ভারি সুন্দরী ফুটফুটে মেয়ে ছিল, বুঝলেন? মেয়েটি আমারই সঙ্গে খেলা করতো, একসঙ্গে চব্বিশঘণ্টা ছুটে ছুটে বেড়াতাম, মা বলতেন, তোদের দু'জনের বিয়ে দিয়ে দেবো। তারপর—হলো কি, বাবা বাড়ীভাড়া না কি দিতে পারেন নি, বাড়ীউলি বুড়ী আমাদের দিলে তাড়িয়ে। অন্য বাড়ীতে উঠে এলাম। তারপর আমার এই বোনটা হলো। কি নাম রাখা হবে? আমি কিন্তু তখনও সেই পিন্টুলী নামটা ভুলতে পারি নি, মেয়েটিকে আমার খুব ভালও লেগেছিল, মাকে বললাম, মা, এরও নাম রেখো পিন্টুলী। ব্যস্‌, সেই থেকে ওরও নাম হয়ে গেল—পিন্টুলী।'

প্রতিমার মুখ দিয়া কিছুক্ষণের জন্য কথা বাহির হইল না। খানিক পরে সে একটা ঢোক গিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তারপর সে পিন্টুলীদের আর কোনও খোঁজ খবর নিলেন না?'

দেবু বলিল, 'শুনলাম তারাও সে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কোথায় উঠে গেছে। তা সত্ত্বেও এক একবার যেতে ইচ্ছে করতো, কিন্তু তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, আর তা ছাড়া বাবাও বকতেন।'

কথা কহিতে কহিতে তাহারা বাড়ীর দরজায় আসিয়া পড়িল। চমৎকার একখানি দোতলা বাড়ী। দেবু বলিল, 'আসুন।'

প্রতিমা জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কি ভাড়া বাড়ী?

দেবু বলিল, 'না, আমাদের নিজের বাড়ী। আগে ত' ওই বললাম অবস্থা আমাদের ভাল ছিল না, তারপর বাবা চাকরী ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করে অবস্থাটা একটুখানি ফিরিয়েছেন।'

দেবু তাহাদের আগেই উপরে উঠিয়া গিয়া মাকে তাহার জানাইল যে, পুষ্পকে গান শিখাইবার জন্য ইস্কুল হইতে একটি মেয়েকে সে ধরিয়া আনিয়াছে।

নারায়ণী ভাবিয়াছিল যে সে মেয়ে হয়ত হইবে, কথাটা তাই সে আর তত গ্রাহ্য করে নাই। কিন্তু পুষ্পর সঙ্গে প্রতিমা আসিয়া যখন তাহার পায়ের কাছে হেঁট হইয়া একটি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল তখন সে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া তাহার রূপ দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেল।

নারায়ণী বলিল, 'বোসো মা, বোসো।'

এই বলিয়া প্রতিমাকে কাছে বসাইয়া বলিল, 'দেবুর ঝোঁক মা, বোনকে গান শেখাবে। বলি,

তা বেশ বাবা, শেখা। শেখালে বিয়ের যদি কিছু সুরাহা হয়,—আমরা বামুন মানুষ।'

প্রতিমা মাথা হেঁট করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, 'কত মাইনে নেবে মা? ভাল শেখাতে পারবে ত'?'

দেবু কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'হারমোনিয়ামটা এনে একবার দিয়েই ছাখো না মা, গান শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।'

সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া মুখ তুলিয়া তাকাইতেই দেবুর সঙ্গে প্রতিমার চোখোচোখি হইয়া গেল।

প্রতিমা বলিল, 'মাইনে আমি নেবো না, এমনিই শেখাব।'

এই বলিয়া সে নারায়ণীর দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিল।

নারায়ণী বলিল, 'ছাখ্ দেবু, এমনি হাসি আমাদের সেই পিন্টুলীর ছিল।'

দেবু বলিল, 'পিন্টুলীর কথা ওঁকে আমি রাস্তায় এতক্ষণ বলছিলাম মা।'

প্রতিমা বলিল, 'পিন্টুলীকে আপনাদের এখনও ত' ঠিক মনে আছে?'

বলিয়া পিন্টুলী আবার হাসিতে আরম্ভ করিল।

নারায়ণী বলিল, 'হাস্‌লে তারও গালে এমনি টোল পড়তো'····বলিতে বলিতে নারায়ণী তাহার মুখের উপর সহসা ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, 'কই দেখি?' বলিয়া প্রতিমার মুখের উপর কি যেন তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে গিয়া নারায়ণী তাহাকে দুই হাত দিয়া একেবারে তাহার বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, 'আরে আরে দুষ্ট মেয়ে, আমার চোখকে ফাঁকি দিবি?—আরে দেবু, তুইও কি চিনতে পারিস নি বাবা? ডাক তোর বাবাকে ডাক্—! ছেলেবেলায় একদিন বলেছিলাম, 'পিন্টুলী, তোকে আমি আমার বৌ করব।' তোর মনে আছে মা?'

ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে লজ্জায় পিন্টুলী তখন নারায়ণীর বুকের কাছে মুখ লুকাইয়াছে।

নারায়ণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'যাক্, ভগবান আমার মুখ রক্ষা করেছেন।'

(সমাপ্ত)
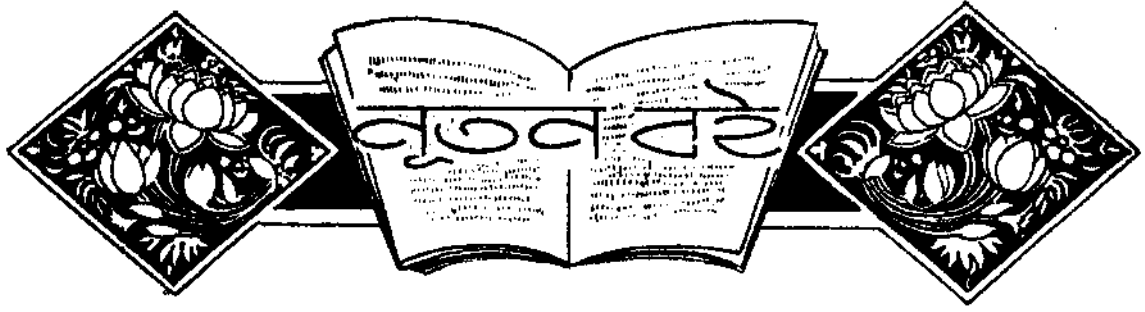
['উদ্বোধনে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

মহাপ্রস্থানের পথে—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত। আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাধাকান্ত নাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—দুই টাকা।

নিজেরই যখন মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিবার সময় সমাগত, এমনই দিনে শ্রীমান্ প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' পুস্তকখানি হাতে আসিয়া পড়িল। তীর্থের পবিত্রতা, বিত্তের স্বল্পতা এবং সামর্থ্যের দৈন্য—নানা দিক্ হইতে এই সকল কথা ভাবিয়া মন যখন সে-পথে পা বাড়াইতে দ্বিধাগ্রস্ত, তখন দুধের সাধ ঘোলে মিটাইবার জন্য গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিলাম। দেখিলাম, পাকা শিল্পীর নিপুণ তুলিকা-পাতের রেখায় রেখায় আগাগোড়া পথটি আলোয়, ছায়ায়, রঙে, রূপে যেন একেবারে ঝলমল করিতেছে; কিন্তু যাঁহার উদ্দেশে এই কষ্টবহুল দীর্ঘ পথ চলা, যাঁহার সামীপ্যলাভের আশায় এই দুষ্কর যাত্রা, সেই বিগ্রহ-মন্দিরের চিত্রটিই একান্ত ঝাপ্‌সা; যেমন-তেমন করিয়া অযত্নে ও অশ্রদ্ধায় যেন তাহা অবহেলায় অঙ্কিত হইয়াছে। লেখক অবশ্য নাম দিয়াছেন—'মহাপ্রস্থানের পথে'। তা দিন। কিন্তু 'মহাপ্রস্থান' বলিতে যাহা বুঝায়, শব্দের সহিত মনের মধ্যে যে উচ্চ সাত্ত্বিক কল্পনা ও বহুকালাগত আনুষঙ্গিক ভাবসত্তার (associations) মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, এমন সুলিখিত গ্রন্থমধ্যে তাহার স্থান নাই। হিন্দুর মহতী কীর্ত্তি, হিন্দুর সুপবিত্র তীর্থ, হিন্দুর ঐশ্বর্য্যময়ী কল্পনার কৃতি সম্বন্ধে, হিন্দুর মনে ইহাতে আঘাত লাগে। তথাপি রচনা-শিল্পের দিক্ দিয়া গ্রন্থখানিকে একটি উপাদেয় সৃষ্টি বলিতেই হইবে। ইহার পথ-প্রীতি, ইহার রচনা-ভঙ্গী, ইহার বিন্যাস ও পরিকল্পনা পাঠকচিত্তে রস-সঞ্চার করে। উপন্যাসের মত এই পথের কথা চিত্তগ্রাহী এবং উপন্যাসের মতই এই একটানা দীর্ঘপথ অনায়াসেই পাঠককে টানিয়া লইয়া যায়। শিল্পীর কৌশল, সংযম ও বস্তুবিন্যাসের শক্তির পক্ষে ইহা বড় সহজ কথা নহে।

লেখক পথেরই প্রীতি দাবী করিয়া পথকেই ফুটাইয়াছেন এবং সেই পথের চিত্র ফুটিয়াছেও চমৎকার। ঘটনার স্বল্পতায় মাঝখানটা একটু ঢিলা হইলেও, শেষের দিকের মানবতার স্পর্শে (human touch-এ) তাহা আবার একান্ত উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। একটি সহজ মধুর রচনাভঙ্গী, একটা সাবলীল গতিচ্ছন্দ গ্রন্থখানিকে একটি romantic অভিযানের মত মধুর করিয়া তুলিয়াছে। মিষ্ট গল্প-রচনায় প্রবোধবাবুর যে হাত আছে, এই সুমিষ্ট পথ-যাত্রার কথায় সে হাত আরেক দিক্ দিয়া তাঁহার কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আরব্য উপন্যাস — শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সুশোভন সচিত্র সংস্করণ। বহু ত্রিবর্ণ, দ্বিবর্ণ ও একবর্ণ চিত্র সম্বলিত। মূল্য—পাঁচ টাকা।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় বাংলা সাহিত্যে একজন

প্রতিষ্ঠাবান কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর গল্প-সাহিত্যের ভাষা যেমন মধুর তেমনি চিত্তগ্রাহী। লেখকের লিখন-ভঙ্গী যে তাঁর রচনার প্রধান সম্পদ—হেমেন্দ্রলাল তা বুঝেন, তাই তাঁর রচিত গল্প বা প্রবন্ধ (কবিতার কথা না হয় নাই বল্লাম) পড়তে গিয়ে কখন বিরক্তি অনুভব করি নি। তিনি যা বলতে চান তা এমনি রসের সঙ্গে বলেন যে, তাঁর বক্তব্য বস্তুকে খুঁজে নেবার জন্তে আমাদের বিশেষ আয়াস স্বীকার করতে হয় না, কারণ তাঁর ভাষার স্রোতে গা ভাসিয়ে আমরা স্বচ্ছন্দে তাঁর বিষয়-বস্তুর কূলে এসে পৌঁছাই।

অনুবাদকের পক্ষে যা সব চেয়ে বড় গুণ তা হ'ল তাঁর এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাষা—ভাষা যদি কোন রকমে তার চলার শক্তি হারিয়ে ফেলে, তা'হলে অনুবাদ অপাঠ্য হ'য়ে ওঠে এবং পীড়াদায়ক হয়। কিন্তু হেমেন্দ্রলাল-সম্বন্ধে এ অভিযোগ খাটে না—এবং এ-সত্য তাঁর যে কোন রচনা পড়লেই উপলব্ধি করা যায়।

বাংলাদেশের ছেলে-মেয়ে হ'য়ে আরব্য উপন্যাস পড়ে নি বা তার গল্প শোনে নি, একথা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়। কিন্তু কেন যে এক দেশের এক গল্পের বই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এমনি আদর লাভ করেছে, তার সঠিক কারণটি আমার পক্ষে বলা কঠিন। তবে মনে হয় প্রতি মানুষের মধ্যেই এমন একটি মানুষ আছে, যে গল্পকে কখন অবজ্ঞা করতে পারে না। আধুনিক গল্পের সংজ্ঞা নিয়ে, রীতি নিয়ে, এমন কি রুচি নিয়ে কত আলোচনাই না চলেছে, কিন্তু আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলি সম্বন্ধে কখন যে এই চুল-চেরা বিচার হয়েছে তা বিশেষ চোখে পড়ে না। সেগুলি গল্প—গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়—এই সত্যই তাদের সম্বন্ধে প্রচারিত হয়েছে—এবং সেই নবম শতাব্দী থেকে এই বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আজও সেগুলি গল্পই রয়ে গেছে—কোন সমালোচকের তীক্ষ্ণ লেখনী তাদের জাতিচ্যুত করতে পারে নি। জানি না, কে এর রচয়িতা—কি তার নাম—আর কেমন করেই বা মরুভূমির মধ্য থেকে তিনি এমন চিরযুগের মানব-মনের খোরাক জুগিয়ে গেলেন। শুনেছি, এই গ্রন্থের আসল নাম নাকি 'অলফ-লয়লা।' তা সে যা-ই হোক—কিন্তু 'আরব্য-রজনী' বা 'একাধিক সহস্র রজনী' বা 'আরব্য-উপন্যাস' যে 'গল্পের রাজত্ব' এবং সে রাজত্বে যে কখন পাঠকদের বিদ্রোহ ঘটে না তা অবিসংবাদী সত্য।

এই বিশ্ববিশ্রুত ও বিশ্ববিমোহন গল্প-সমষ্টি থেকে সবগুলি গল্প অনুবাদ করা সহজসাধ্য নয়, তাই হেমেন্দ্রলাল এই গ্রন্থে মাত্র কয়েকটি গল্প অনুবাদ ক'রে আমাদের উপহার দিয়েছেন, এবং বিদেশীয় ভাব ও ভাষার অন্দরমহল থেকে তিনি যে-ভাবে গল্পগুলিকে আমাদের সাহিত্যের অন্তঃপুরে এনে উপস্থিত করেছেন তাতে কোথাও তারা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে নি। মনে হয় তারা আমাদেরই অন্তঃপুরের অধিবাসিনী—শুধু জল হাওয়া বদলাবার জন্তে তারা কিছুদিন আমাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল—এখন হেমেন্দ্রলালের লেখনী লক্ষ্য করে তারা আবার তাদের নিজেদের ঘরে ফিরে এসেছে।

এই গ্রন্থের অঙ্গ-সজ্জা চিত্রিত করেছেন সুপরিচিত শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। তাঁর তুলির রেখা যে কল্পলোকের মায়া সৃষ্টি করেছে তার জন্ত তিনি আমাদের আন্তরিক প্রশংসা দাবী করতে পারেন। এই দুর্দ্দিনে এমন ব্যয়-বহুল গ্রন্থ প্রকাশ করে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সও ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল

তচনচ — উপন্যাস। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষাল প্রণীত। মূল্য—দেড় টাকা। শ্রীপ্রমোদ সরকার কর্ত্তৃক বাতায়ন পাবলিশিং হাউস, ১৪৪ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের প্রথম উপন্যাস। প্লট ও ভাষা মনোজ্ঞ এবং মনোরম। স্থানে স্থানে তাহার মধ্যে অপরাজের কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের লিখনভঙ্গীর

সুস্পষ্ট ছাপ পড়িয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির যাহা প্রধান বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ dialogue-এর মধ্য দিয়া চরিত্রগুলিকে রূপায়িত করিয়া তোলা, অবিনাশবাবু এইখানে সেই বৈশিষ্ট্যটুকু ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। Characterisation এবং Psychology of human mind আলোচ্য উপন্যাসখানিতে নিখুঁত না হইলেও যে reach towards perfection, একথা অস্বীকার করা যায় না। অতি আধুনিক একটি সমস্যাকে লইয়া উপন্যাসের আরম্ভ এবং শেষে গ্রন্থকার যে ইঙ্গিতটুকু দিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, আধুনিক নারী-প্রগতির পরিণাম সম্বন্ধে তিনি খুব আশান্বিত নন। যে ক'টি স্ত্রী-চরিত্র তিনি আঁকিয়াছেন, তাহার একটিকে বাদ দিয়া সব ক'টিকেই শেষ পর্যন্ত একই স্তরে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। 'সুজাতা', 'প্রীতি', 'মিস্ সেন', 'বেলা' প্রভৃতির পরিণাম যদি নিতান্তই কাল্পনিক না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং শিক্ষা-দীক্ষা কি নিদারুণ পরিণাম আমাদের সমাজে আনিয়া দিতেছে এবং ভবিষ্যতে এই বিষময় ফল যে-বৃক্ষের জন্মদান করিবে তাহার ছায়াতলে বসিয়া নর ও নারীর জীবনে আর যাহাই কেন ঘটুক না, সুখ, শান্তি, প্রেম এবং chastity বলিয়া যে কোন বস্তু তাহার আওতায় বসিয়া পাওয়া যাইবে না, একথা সুনিশ্চিত। এ বিষয়ে গ্রন্থকারের অন্তর্দৃষ্টি যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাহার চেয়ে ভয়ের কারণ আর কিছুই থাকিতে পারে না। নর ও নারীর অবাধ মিলনের ফলে যে যৌন-সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে লেখক সেইটুকুই মাত্র কয়েকটি চরিত্রের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

চরিত্রগুলি আপন আপন ক্ষেত্রে ভাল করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। শশাঙ্কর মত scoundrel সমাজের মধ্যে অভাব নাই। এই দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্রটি বিশেষরূপে সাফল্যলাভ করিয়াছে। 'সুজাতা', 'প্রীতি' এবং 'মিস্ সেনের' চরিত্রগুলিও সাফল্য-অর্জনে অক্ষম হয় নাই। তবে 'বেলা' সম্বন্ধে ও-কথা খাটে না। আমাদের মনে হয় এই চরিত্রটি শুধু abnormal হয় নাই, কিছু পরিমাণে অশ্লীল এবং অসংযতও হইয়াছে। কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিতা কুমারী কন্যার যে এতটা অধঃপতন হইতে পারে তাহা আমাদের ধারণারও অতীত। মদ্যপান হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ রূপোপজীবিনীর মত পরকে নিজের দেহ গ্রহণে প্ররোচিত এবং লোলুপ করিয়া তোলা—কিছুই 'বেলা'র চরিত্রটির মধ্যে বাকী নাই। এই চরিত্রটির মধ্যে লেখকের অন্তর্দৃষ্টির অভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়।

'অনিতা'র চরিত্রটি সব চেয়ে ভাল লাগিয়াছে। অনিতা শুধু সুন্দর নয়, মিষ্ট এবং মধুর। শেষ অবধি অনিতাই জয়ী হইয়াছে এবং সেই জয়ের গৌরবটুকু উপভোগ করিয়া আমরাও সুখী হইয়াছি। ললিতা নিজেকে জোর করিয়া unsexed করিতে গিয়া যে ভয়াবহ পরিণতিতে আত্মাহুতি দিয়াছে, তাহাই উপন্যাসখানির tragedy। অনিতার পাশে ললিতাকে দেখিলে আমাদের ললিতার জন্য দুঃখই হয়। অনিতা এবং ললিতা—এই দু'টি চরিত্রের মধ্যে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ-শক্তি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী, এম্-এ

বাংলায় নারী-ধর্ষণ

বাংলা দেশে প্রতিবৎসর কত নারী ধর্ষিতা হয়, তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। না পাওয়ার কারণ—আমাদের নিজেদেরই একটা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা। পারিবারিক কলঙ্কের কথা জন-সমাজে প্রকাশ করতে আমরা লজ্জা পাই—বিশেষভাবে লজ্জা পাই সেই সব কলঙ্কের কথা প্রকাশ হ'তে দিতে, যার সঙ্গে আত্মীয়া নারীর সংস্রব আছে। সেই জন্যই যে-সব ক্ষেত্রে এই ধরণের কোন কলঙ্ক গোপন করা অসম্ভব না হয়, সে সব ক্ষেত্রে কলঙ্কটা চাপাই থাকে। ফলে নারী-ধর্ষণের সমগ্র ইতিহাস দেশের জানার সুযোগ হয় না। তা না হ'লেও এর একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া যায়—নারী-হরণ সম্পর্কীয় মামলাগুলি হ'তে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে এই সম্পর্কে বাংলা দেশে যতগুলো মামলা হয়েছে তার সংখ্যা নীচে দেওয়া গেল —

জেলা	মামলার সংখ্যা	জেলা	মামলার সংখ্যা
নদীয়া	৬৮	মেদিনীপুর	২৮
ময়মনসিংহ	৬৬	হুগলী	২৮
২৪ পরগণা	৬২	দিনাজপুর	২৮
ঢাকা	৪৮	পাবনা	২৪
মুর্শিদাবাদ	৪৪	রাজসাহী	২৪
রংপুর	৪১	যশোহর	২৩
ত্রিপুরা	৪১	বীরভূম	২০
বর্দ্ধমান	৩২	বগুড়া	১৯
বাখরগঞ্জ	৩১	খুলনা	১২
নোয়াখালী	১১	মালদহ	৫
চট্টগাম	৯	হাওড়া	৩
দার্জ্জিলিং	৮	বাঁকুড়া	২
জলপাইগুড়ি	৬	ফরিদপুর	০

এই হিসাব অনুসারে তিনটি জেলায় নারী-হরণের মামলা বৎসরে সংখ্যায় ৬০-কেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ মাসে এসব জেলায় নারী-হরণের মামলা হয়েছে অন্ততঃ পক্ষে ৫টি ক'রে। এ সংখ্যা যে কম নয় তা বলাই বাহুল্য। পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বাংলায় নারী-হরণের মামলা হয়েছে ৩৯০ টি। এদিক দিয়ে যদি হিসাব ক'রে দেখা যায় তবে সে সংখ্যাও খুব কম ব'লে বিবেচিত হ'বে না। যে-দিক দিয়েই বিচার ক'রে দেখা যাক্ না কেন—নারী-হরণ বাংলার ললাটে একটা দুরপনেয় কলঙ্কের ছাপ টেনে দিয়ে গিয়েছে।

এ কলঙ্ক তার আরও লজ্জাকর হ'য়ে উঠেছে এই জন্য যে, এ অপরাধটা না কমে বরং দিনের পর দিন বাংলায় বেড়েই চলেছে। আর এ বৃদ্ধিটা এতই সুস্পষ্ট যে, যে-কর্ত্তৃপক্ষ এ কথাটা বরাবরই স্বীকার করতে দ্বিধা করেছেন, এতদিন পরে তাঁরাও আর তা অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই এসম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে স-কাউন্সিল গভর্ণর বাহাদুরও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "Cases of offence committed against women under sections 366 and 354, Indian Penal Code, showed an increase of 94 over the

figure of the previous year." অর্থাৎ ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৬৬ এবং ৩৫৪ ধারা অনুসারে নারীদের বিরুদ্ধে যে অপরাধ করা হয়েছে, তার সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যার অপেক্ষা ৯৪টি বেশী।

কেবল তাই নয়, তাঁরা একথাও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, "As in the past, investigation into such cases will be pursued zealously with a view to check an evil which has been the object of public comment to a steadily increasing extent in recent years." অর্থাৎ এই ধরণের পাপগুলির বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে জনসাধারণের সমালোচনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এই সম্পর্কে যে-সব মামলা দায়ের করা হ'বে, অতীতের মতই বর্ত্তমানেও তার তদন্তের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখা হ'বে।

'অতীতের মত' কথাটা সম্ভবতঃ কেবল পাদ-পূরণের জন্তই ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ গবর্ণমেন্ট যদি এসম্বন্ধে খুব কড়া রকমে সচেতন হ'তেন, তবে নারীর উপর অত্যাচারের প্রতিকার সত্য সত্যই ঢের সহজ হ'য়ে উঠ্‌ত। অত্যাচার যারা করে তারা জানে যে, এসব দিক দিয়ে পুলিশের গতিবিধি অত্যন্ত শিথিল। তারা জানে যে, অভিযোগ যদি পুলিশের কাছে করাও হয়, তবে চলা-ফেরায় পুলিশ এত সময় নেবে যে, সে সময়ের ভিতরে অপরাধ ক'রে সরে পড়াও তাদের পক্ষে খুব কঠিন হ'বে না। বস্তুতঃ এসব অভিযোগের তদন্তে পুলিশের এই শৈথিল্য যে এই শ্রেণীর অপরাধীদের সাহস ঢের বাড়িয়ে দিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং শুধু কথায় নয়, পুলিশের কাজের ভিতর দিয়েও যদি বুঝ্‌তে পারা যায় যে, এসম্বন্ধে পুলিশের গতি-পথের পরিবর্ত্তন হয়েছে, তবে অত সহজে নারীর উপর অত্যাচার কর্‌তেও আর তারা সাহস পাবে না। এই জন্তই আমাদের মনে হয়, পুলিশের তৎপরতা নারী-ধর্ষণ নিবারণের একটা বড় পথ। আর একটা পথও গবর্ণমেন্টের হাতে আছে। সেটা হচ্ছে—যারা অপরাধ করে তাদের তাড়াতাড়ি দণ্ড দেওয়া ও অত্যন্ত কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করা। সাধারণতঃ দেখা যায় নারী-ধর্ষণের এই মামলাগুলির জের দীর্ঘদিন ধ'রে টেনে চলা হয়। মাসের পর মাস—এমন কি বৎসরও গড়িয়ে চ'লে যায় এক একটি মামলার নিষ্পত্তি হ'তে। এতে অপরাধী দণ্ড পেলেও সাধারণ মানুষের কাছে সে দণ্ডের তীব্রতা লঘু হ'য়ে পড়ে। কারণ একটা ঘটনার জের দীর্ঘদিন মনের ভিতরে টেনে চল্‌বার শক্তি সাধারণ জন-সমাজের নেই। তার চেয়ে তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা যদি এমন করা যায় যে, ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কঠোর সাজাও হ'য়ে যায়, তবে এসব অপরাধ সম্বন্ধে মনের ভিতর অতি সহজেই আতঙ্কের সৃষ্টি করা যেতে পারে।

নারী-ধর্ষণ সম্পর্কীয় ঘটনাগুলি নিয়ে একটু অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করলে এদিক দিয়ে এমন কতকগুলি ব্যাপার চোখে পড়ে যা, যেমন পুলিশের পক্ষেও লজ্জাকর, তেমনি জন-সাধারণের পক্ষেও লজ্জাকর। অনেকগুলি ঘটনায় দেখা গিয়েছে যে, ধর্ষিতা নারীকে স্থান হ'তে স্থানান্তরে বহুদিন ধ'রে টেনে নেওয়া হয়েছে—গৃহ হ'তে গৃহান্তরেও নিয়ে রাখা হয়েছে তাদের। এমন কি কোন কোন স্থানে তাদের স্থান দেওয়া হয়েছে পরিবারের ভিতরেও। তবু তাদের নিশানা পুলিশ বা'র কর্‌তে পারে নি। এত বড় অপরাধ যদি এত আড়ম্বর ক'রে করা সম্ভব হয় এবং তা সত্ত্বেও যদি তা ধরা না পড়ে, তবে তার ভিতর দিয়ে পুলিশের অক্ষমতার প্রচণ্ড পরিচয়ই পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। তা ছাড়া তার ভিতর দিয়ে এ পরিচয়ও পাওয়া যায় যে, এ দেশের জন-সাধারণ হয় চোখ বুজে পড়ে থাকে—না হয় তারা এতই স্বার্থপর যে, নিজেদের স্বার্থের ব্যাপার ছাড়া আর কোন ব্যাপার নিয়েই তারা মাথা ঘামাতে রাজি নয়। অর্থাৎ নাগরিক বা মানুষের সামাজিক দায়িত্ব-বোধই আজও তাদের ভিতরে বিকাশ লাভ করে নি।

যায়গায় যায়গায় একটি নারীকে টেনে নিয়ে বেড়ান, তাকে পুলিশের চোখ হ'তে গোপন ক'রে

রাখা—কেবল একজন বা দুইজন অপরাধীর দ্বারা সম্ভব হয় না, বিশেষতঃ অপরাধীরা যেখানে বিশেষ অর্থবান নয়। নারী-ধর্ষণের অনেকগুলি মামলায় দেখা গিয়াছে যে, অপরাধীরা সত্য সত্যই অত্যন্ত সাধারণ অবস্থার লোক এবং তারা সাহায্য পেয়েছে নানা অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে। যারা অপরাধ করে তারাই কেবল অপরাধী নয়, সেই অপরাধ গোপন করায় যারা সাহায্য করে তারাও অপরাধী। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কেবল অপরাধীকেই শাস্তি দেওয়া নয়, যারা তাদের সেই অপরাধ গোপন করায় সাহায্য করেছে বা অন্য কোন রকমে সাহায্য করেছে তাদের সকলকেই শাস্তি দান করা। এত বড় পাপের সাহায্যকারীর শাস্তিও হালকা হওয়ার কারণ নেই—সে শাস্তিও অত্যন্ত কঠোর হওয়া দরকার। গবর্ণমেণ্ট যদি এই দিক্ দিয়ে তৎপরতা এবং কড়া ন্যায়বুদ্ধির পরিচয় দেন—তা হ'লে নারীর প্রতি অত্যাচার অনেকটা কমে যাবে। সাম্প্রদায়িকতার অনেক গোড়ামি যে এদেশে নারী-ধর্ষণকে সহজ করে তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই। গবর্ণমেণ্টের শাস্তি সাহায্যকারীদের সম্পর্কেও কঠিন হ'লে, সম্প্রদায়কে খুসী করবার জন্যও কেহ এ ধরণের অপরাধকে প্রশ্রয় দিতে সাহস পাবে না।

কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ঘাড়েই সব দোষ চাপিয়ে এবং প্রতিকারের জন্য তাঁদের উপরে পুরাপুরি নির্ভর ক'রেই যদি আমরা এর সব দায়িত্ব হ'তে খালাস পেতে চাই, তবে তার মত অদ্ভুত ব্যাপারও আর কিছু হ'তে পারে না। নিজেদের দুঃখ সম্বন্ধে যারা নিজেরা উদাসীন থাকে, তাদের দুঃখ, তাদের দুর্দ্দশা কেহই ঘুচাতে পারে না। সুতরাং নারী-ধর্ষণের এই কলঙ্ক দূর করবার জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর সচেতন হ'য়ে ওঠা দরকার। কেউ যাতে নারীর উপর অত্যাচার করতে না পারে, সেজন্য তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হ'বে—সাহসী হ'তে হ'বে, সর্ব্বস্ব পণ করতে হ'বে। নারী-ধর্ষণকারী যাতে সামাজিক হিসাবে দণ্ড পায়, সেজন্য গ্রামের সব লোক তার সঙ্গে সব রকমের সম্পর্ক বর্জন করবেন। আদালতে তার শাস্তির ব্যবস্থার জন্য অর্থ দিয়ে, দেহের শ্রম দিয়ে সমবেতভাবে সকলে চেষ্টা করবেন। নারীকে যারা ধর্ষণ করে, কলঙ্ক কেবল তাদেরই নয়, কলঙ্ক তাদেরও যারা নারীকে ধর্ষিত হ'তে দেয়, এবং যারা অত্যাচারীর দণ্ড-বিধানের সম্পর্কে উদাসীন হ'য়ে থাকে।

বোম্বাই-এ রবীন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বোম্বাই-ভ্রমণ সব দিক্ দিয়েই সার্থক হ'য়েছে। তিনি সেখানে যেরূপভাবে অভিনন্দিত হয়েছেন—সে রকমের অভিনন্দন লাভ করা পৃথিবীর খুব বেশী লোকের ভাগ্যে ঘটে না। তাঁর অভিনন্দনের বিবরণ বোম্বাই-এর একখানা কাগজ হ'তে আমরা ভাষান্তরিত ক'রে দিচ্ছি। 'ইণ্ডিয়ান সোশাল রিফর্ম্মার' ২রা ডিসেম্বরের কাগজে লিখেছেন—

"রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বোম্বাই-এ যে অভ্যর্থনা লাভ করছেন তা বিস্ময়কর। তাঁর সৌম্য মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে জন-গণ মুগ্ধ ও বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌ত। রঙ্গ-মঞ্চের সামনে তিনি স্থির ভাবে ব'সে দেখ্‌তেন দর্শকদের। আলো, বর্ণ ও শব্দ এবং তাঁর নিজের রচিত গানের সুর রঙ্গমঞ্চের সামনে সৃষ্টি করতে থাক্‌ত একটা মায়া রাজ্যের। 'এক্‌সেলসিয়র রঙ্গমঞ্চটি'র (Excelsior Theatre) ছাদ হ'তে মেঝের উপর পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান প্রতিদিনই লোকে লোকে একেবারে লোকাকীর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ত। তাঁর নাটকের অভিনয়-গুলিও সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে। এই সাফল্যে আমরা আনন্দিত হ'য়েছি। কারণ এই সাফল্যের ফলে বিশ্ব-ভারতীর বোঝাও ঢের হাল্‌কা হ'য়ে উঠ্‌বে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও কবিকে লাভ করবার জন্য যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিনিয়ত তাঁকে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে হ'য়েছে এবং এত আমন্ত্রণের ভিড় হ'তেও বোম্বাই-এর ছাত্রেরা তাঁর কাছ থেকে আদায় ক'রে নিয়েছে একটি অভিভাষণ। টাউন হলে

হয়েছিল ছবির প্রদর্শনী। কবির প্রতিভা বোলপুরে যে আন্তর্জাতিক শিক্ষা-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেছে তার বহু-বিচিত্র কর্ম্মধারার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে এই ছবির প্রদর্শনী থেকে।…"

রবীন্দ্রনাথের বোম্বাই পরিভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ব-ভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহ করা। তাঁর সে উদ্দেশ্যও নিষ্ফল হয় নি। তাঁর নাটকের অভিনয় হ'তে কত টাকা উঠেছে তা আমরা জান্‌তে পারি নি বটে, কিন্তু সেখানকার সুধীজন তাঁর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে যা দান করেছেন তার পরিমাণও উল্লেখের অযোগ্য নয়। নিজাম ইতিপূর্ব্বেও বিশ্ব-ভারতীকে এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন, এবারেও এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাজা ধনরাজগীর দিয়েছেন ১৫ হাজার টাকা। এ ছাড়া মাড়োয়াড়ী সভা দিয়েছেন ১,৭৫০৲, উকিল সভা দিয়েছেন ১,৫০০৲, শিক্ষক সমিতি দিয়েছেন ১,০০০৲, এবং সেকেন্দ্রাবাদের জনসাধারণ দিয়েছেন ৭৫০৲ টাকা।

উদার-নৈতিক দলের বৈঠকের

সভাপতির অভিভাষণ

এবার জাতীয় উদার নৈতিক দলের (Liberal Federation) বৈঠক বসেছিল মাদ্রাজে। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন—শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু। তাঁর অভিভাষণের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তাতে অযথা বাগাড়ম্বর ছিল না—ছিল স্পষ্ট কথা, দেশের মনের কথা। দেশের এই মনের কথা তিনি অত্যন্ত নির্ভীক-ভাবেই ব্যক্ত করেছেন। আর সেই জন্যই তাঁর উক্তি স্থানে স্থানে অত্যন্ত কড়া হ'য়ে উঠেছে। White Paper—যা নিয়ে আজ এদেশে এবং বিলেতে এত হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হ'য়েছে তার সম্বন্ধে মন্তব্য কর্‌তে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"একটা জাতির আর্থিক সাচ্ছল্যতার উপরেই নির্ভর করে তার জীবনীশক্তি এবং বিকাশ। White Paper এ সত্যকে একেবারেই গণনার মধ্যে আনে নি। ভারত-সচিব তাঁর নিজের মনোনীত লোকগুলিকে নিযুক্ত করবেন রাজ-কর্ম্মচারীদের পদে, তাদের বেতনও তিনিই স্থির ক'রে দেবেন, ভারতবর্ষকে রক্ষা করবার জন্য এখানে ব্রিটিশ-বাহিনীও থাক্‌বে, তাদের বেতনও দিতে হ'বে ভারতবাসীকে। ভারতের ভাবী গবর্ণমেন্ট রোগ নিবারণ ও স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য কোথা থেকে টাকা পাবেন, জন-সাধারণের ভিতর শিক্ষা-বিস্তারের জন্যই বা কোথা থেকে টাকা আস্‌বে—এ বিষয়ে মাথা ঘামান ভারত-সচিব প্রয়োজন বোধ করেন না।"

সুশাসনের পরিচয় কেবল কড়া শাসনের ভিতর দিয়েই পাওয়া যায় না। শাসকবর্গের চারিদিকে একটা আড়ম্বর এবং ভয়ের গণ্ডি রচনা করাও সুশাসনের নিরিখ নয়। প্রজার দেহে স্বাস্থ্য নেই, ঘরে অন্ন নেই, মনে শিক্ষার আলো নেই—অবস্থা যদি এই রকমের হয়, অথচ প্রজা যদি তা নীরবে সহ্য করে এবং তা নিয়ে নালিশও না জানায়—তা'হলেও প্রজার সেই নিরুপদ্রব শান্ত অবস্থাকেও সুশাসন বলা যায় না। দেশ তখনই সুশাসিত হচ্ছে বলা যায়, যখন তার জন-সাধারণের স্বাস্থ্যের অবস্থা এবং শিক্ষার অবস্থা সমান ভাবে উন্নতিপথ ধরে চলে এবং ক্ষুধার সময় তাদের ঘরে অন্নের ব্যবস্থা থাকে। বর্ত্তমানের সভ্য দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা কর্‌লে এদিক দিয়ে ভারতের অভিযোগ করবার যে যথেষ্ট কারণ আছে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ভাবী শাসন-ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাতে দেশ এই সব দিক দিয়ে তার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি করবার সুযোগ পায়। White Paper যদি সে সুযোগ না দেয়, তবে সে তো সাদা কাগজের মতই অর্থহীন বস্তু—তা পেলেও দেশের উপকার হ'বে না, না পেলেও ক্ষতি হ'বে না।

বাংলার কোন কোন স্থানে হিন্দু অধিবাসীদের উপর বিশেষ ট্যাক্স বসান হয়েছে। অভিভাষণে সভাপতি এ ব্যবস্থাটারও কড়া প্রতিবাদ করেছেন।

ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর বসিয়েছিলেন— তাঁর সাম্রাজ্যের তা একটা বড় কলঙ্ক হ'য়ে রয়েছে। সে যুগে এরকমের বৈষম্য চললেও এ যুগের শাসন-ব্যাপারে এ ধরণের ব্যবস্থা অচল—শাসকদের পক্ষেও তা সর্বাপেক্ষা কলঙ্কের কথা। যতীনবাবু প্রশ্ন করেছেন – ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকেরা এই বৈষম্যের কথা নিয়ে কি মত প্রকাশ করবেন, সে কথাটা কি ব্রিটিশ রাষ্ট্র-তন্ত্রের লোকেরা একবার ভেবে দেখেছেন?

যতীনবাবু কংগ্রেসের লোক নন। যাঁরা অনর্থক হৈ চৈ ক'রে নাম জাহির করতে চান তাঁদের দলের লোকও তিনি নন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যাঁদের বন্ধু ব'লে মেনে নিতে পারেন তিনি তাঁদেরই একজন। তাঁর কথাগুলি তীব্র হয়েছে, তবু তা হিত কথা এবং সত্য কথা। ব্রিটিশ রাষ্ট্র-তরণীর কর্ণধারেরা তাঁর কথাগুলি নিয়ে একটু ধীরভাবে আলোচনা করলে তাতে যেমন এদেশের, তেমনি তাঁদেরও উপকার হবে—একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়।

বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণ

এবার বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির আসন অধিকার করেছিলেন ডাঃ মেঘনাদ সাহা। এই সভায় তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেছেন, বিজ্ঞানের নূতন কোনও আবিষ্কার বা গবেষণার দিক দিয়ে তার দাম কতখানি তার বিচার করবার সামর্থ্য আমাদের নেই। তার বিচার করবেন তাঁরাই যাঁরা বৈজ্ঞানিক। কিন্তু আর একদিক দিয়ে তাঁর এই অভিভাষণটিকে আমরা খুব দামী ব'লেই মনে করি। এর সে দাম মানবতার দিক থেকে। সত্যকারের বিজ্ঞানের কাজ কি, প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব কোথায়—এ অভিভাষণে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় সেই কথাটাই তিনি ব্যক্ত করেছেন।

ডাঃ সাহা মোটামুটিভাবে এই কথাই বলেছেন যে, জগতে আজ হানাহানিরও অন্ত নেই দুঃখেরও অন্ত নেই। এ দুঃখের কারণ মানুষের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতরে সামঞ্জস্যের অভাব। বিজ্ঞান এই সামঞ্জস্য এনে দিতে পারত, কিন্তু সে তা দেয় নি। বরং ধ্বংসলীলার অজস্র হাতিয়ার তৈরী ক'রে মিলনের পথে—সাম্যের পথে সে বাধার প্রাচীরই গ'ড়ে তুলছে।

এ কথাটার ভিতরে যে ভুল নেই তা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়। কেবল ডাঃ সাহা নন—পশ্চিমের বড় বড় মনীষীরাও চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন আজ বিজ্ঞানের এই ব্যভিচার দেখে। দুনিয়ায় জ্ঞানের ভাণ্ডার অসম্ভব রকমে বেড়ে উঠেছে। কিন্তু দেবতা নয়, সে জ্ঞান কাজে লাগাতে সুরু ক'রে দিয়েছে দানবে। এর ফল যা হবার তাই হচ্ছে। যে জিনিষটা ছিল জীবন রক্ষার উপায়, তাই হ'য়ে উঠেছে আজ হত্যার হাতিয়ার। বিজ্ঞানের সাহায্যে তৈরী হচ্ছে—মানুষের দুঃখ যাতে দূর হ'তে পারে তার পথ নয়, তৈরী হচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস, দূরতম পাল্লার শব্দহীন বন্দুক, পর-রাজ্য আক্রমণ করবার জন্য উড়ো জাহাজ ইত্যাদি।

কিন্তু ডাঃ সাহা আশা করেন—ভবিষ্যতে এ অবস্থার পরিববর্তন হ'বে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলির ভিতরে জেগে উঠ্‌বে মৈত্রী ও সহযোগিতারই আকাঙ্ক্ষা —ভেদের নয়। তখনই বিজ্ঞানের সত্যিকারের কাজ সুরু হ'বে। মানব-ধ্বংসের বদলে বিজ্ঞান তখন আরম্ভ করবে মানব-কল্যাণের কাজ।

পৃথিবী বিদ্বেষে, দ্বন্দ্বে, স্বার্থপরতায় মানুষের বাসের অযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। দিন-রাত হানাহানি চলছে মানুষের সঙ্গে মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির। এ অবস্থার পরিবর্তন যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল। সুতরাং আমরা কায়-মনোবাক্যেই কামনা করি—ডাঃ সাহার এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হোক্। যান-বাহনের সুবিধা, সংবাদ আদান-প্রদানের সুযোগ—এ সকলের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে বিজ্ঞান সমস্ত মানুষকে এক পরিবারে পরিণত হবার পথ ক'রে দিয়েছে। এক পরিবারে আমরা পরিণত হ'তে পারছি নে আমাদের মনের জন্য। আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতার বিকৃত আদর্শের জন্য। আমাদের মনের, আমাদের

শিক্ষা ও সভ্যতার আদর্শের সেই পরিবর্তনই সাধিত হোক যাতে বিজ্ঞানের নব যুগের এই প্রারম্ভটা ব্যর্থ না হয়, বিজ্ঞানের এই প্রচণ্ড শক্তি যাতে সত্যিকারের সার্থকতা লাভ করতে পারে।

রক্ষণ শুল্ক

শিশু শিল্প-গুলিকে প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য প্রায় প্রত্যেক দেশেই বিদেশী পণ্যের উপর একটা আমদানী শুল্ক চাপান হয়। এইভাবে শুল্ক চাপানর প্রয়োজন আছে। কোন একটা শিল্প তার গোড়াপত্তন থেকেই বড় হ'য়ে উঠতে পারে না—অনেক চেষ্টা, অনেক শ্রম, অনেক রকমের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে চলার পর তবে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু গোড়াতেই যদি সে প্রতিযোগিতার হাতে মার খেতে থাকে, অর্থাৎ যদি অন্য কোনও দেশ থেকে—যেখানে দীর্ঘ দিন ধ'রে চলার ফলে শিল্পটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সেখান থেকে অনুরূপ পণ্য এসে সেই শিশু-শিল্পের প্রতিযোগিতা করতে থাকে, তবে নব প্রতিষ্ঠিত শিল্পের পক্ষে টিকে থাকাই দুঃসাধ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। বস্তুতঃ এমনি ভাবের প্রতিযোগিতার ফলে এদেশের অনেকগুলি শিল্প যথেষ্ট সম্ভাবনা নিয়ে সুরু হ'লেও প্রতিযোগিতায় টিকতে পারে নি—হয় ফেল পড়েছে, না হয় অনিচ্ছায়, ফেল হবার ভয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।

তরুণ শিল্পগুলির উপরে এই ধরণের অন্যায় যাতে অনুষ্ঠিত হ'তে না পারে, সেইজন্য ভারত সরকারের বাণিজ্য-সদস্য স্যর যোসেফ ভোর ছোট-খাট কতকগুলি শিল্পের সংরক্ষণের জন্য একটি আইন পাশের প্রস্তাব ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করেছেন। এই পাণ্ডুলিপিতে যে সব শিল্প সম্বন্ধে সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বনের প্রস্তাব করা হয়েছে মোটামুটি ভাবে তাদের নাম করা যাচ্ছে :—

পশমী মোজা, গেঞ্জি ও কাপড়, পশম-মিশ্রিত অন্যান্য পণ্য, সূতার তৈরী গেঞ্জী, সূতার তৈরী মোজা, টালি, মাটির বাসন, পোরসিলেনের পণ্য; কাচের চিমনি, লোহার উপরে কলাই করা বাসনপত্র, গায়ে মাখিবার সাবান, মাছের তেল, মিছরি, ছাতা, জুতা ইত্যাদি।

শুল্কের পরিমাণ অবশ্য সব পণ্যের উপরে সমান হবে না। পণ্য অনুযায়ী শুল্কের পরিমাণও কম বেশী করা হবে। এই ব্যবস্থায় কেবল যে দেশী শিল্পগুলিই দাঁড়াবার সুযোগ পাবে তা নয়, গবর্ণমেণ্টও শুল্ক বাবদ একটা মোটা আয়ের পথ ক'রে নিতে পারবেন ব'লে মনে করছেন। তাঁরা ভরসা করেন—তাঁদের আয়ের পরিমাণ এসে দাঁড়াবে ২০ লক্ষ টাকা হ'তে ৪০ লক্ষ টাকার ভিতরে।

এ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'লে অনেক সস্তা জিনিষের দাম অবশ্য বেড়ে যাবে। সস্তায় বিদেশী জিনিষ কেনায় অভ্যস্ত দেশবাসীর পক্ষে তা অল্লাধিক পরিমাণে অসুবিধারও সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে লক্ষ্য ক'রে এসব অসুবিধাও সহ্য করতে হবে দেশের লোককে। আজ সস্তায় জিনিষ-পত্র কিনতে পারা যায় বটে, কিন্তু তার ফল হচ্ছে এই যে, দেশের শিল্পগুলি ক্রমেই অন্তর্হিত হ'য়ে যাচ্ছে। দেশের পক্ষে এ যে কত বড় একটা দুর্ভাগ্য তা বোঝা কিছু মাত্র কঠিন নয়। এর ফলে দেশ ক্রমেই দরিদ্র হ'য়ে পড়ছে, তার বেকার সমস্যা দিনের পর দিন তীব্রতর হ'য়ে উঠছে। সুতরাং কেবল দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্যই নয়, দেশের বেকার সমস্যা দূর করবার জন্যও দেশের ছোট-খাট শিল্পগুলিকে বাঁচান দরকার। তার একটা বড় পথ হচ্ছে এই সব শিল্পের উপর সংরক্ষণ-শুল্কের প্রবর্তন। এদেশে বহু শিল্পের উপকরণ অত্যন্ত সুলভ — শ্রমিকও দুর্লভ নয়। সুতরাং অসম প্রতিযোগিতার হাত হ'তে যদি মার খেতে না হয়, এবং বেশ শৃঙ্খলা ও সততার সঙ্গে যদি কাজ করা যায়, তবে বহু শিল্পের ভবিষ্যৎ এদেশে যে অত্যন্ত উজ্জ্বল তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

নিখিল ভারত নারী-সম্মিলন

কলিকাতায় নিখিল ভারত নারী-সম্মিলনের একটি অধিবেশন সম্প্রতি হ'য়ে গিয়েছে। লাহোরের লেডী আব্দুল কাদের সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। সভায় নারীদের সম্পর্কে সময়োপযোগী অনেকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। কতকগুলি প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করতে পারলে নারীদের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতির পথ যে পরিষ্কার হবে তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু দু' একটি বিষয়ে সমিতি দুর্ব্বলতারও পরিচয় দিয়েছেন। যেমন নারী-হরণ সম্পর্কে। সভায় নারীদের ছোট-খাট সুবিধা-অসুবিধার সম্পর্কেও বহু প্রস্তাব পাশ হয়েছে, কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপার সম্পর্কে কোন প্রস্তাবই পরিগৃহীত হয় নি। হয়ত ব্যাপারটি কেবলমাত্র বাংলার ব্যাপার ব'লেই উপেক্ষিত হয়েছে। কারণ সাধারণতঃ লোকের ধারণা নারী-ধর্ষণ কেবল বাংলাতেই চলেছে। কিন্তু নারী-ধর্ষণের ব্যাপারকে কেবল বাংলার ব্যাপার বলে নিখিল ভারতও উপেক্ষা করতে পারে না। কারণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও নারী-ধর্ষণ চলেছে এবং কোন কোন স্থানে বাংলার চেয়েও বেশী পরিমাণে চলেছে। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ভারতের তিনটি প্রদেশে নারী-ধর্ষণের যতগুলি মামলা হয়েছে তার অঙ্ক নিয়ে উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া গেল—

দেশ	অপরাধের সংখ্যা
পাঞ্জাব	৫০৪
আগ্রা-অযোধ্যা	৭১১
বাংলা	৬৯৩

উপরোক্ত অঙ্ক হ'তেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, নারী-ধর্ষণের ব্যাপারটি নিখিল ভারতের সমস্যাগুলির অন্যতম হওয়ারও অযোগ্য নয়। এই সম্পর্কে শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার সম্মিলনে যা বলেছেন নিম্নে আমরা তা উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

"এই নিখিল ভারত নারী-সম্মিলনের সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বপ্রধান আলোচনার বিষয় নারী-হরণ সম্বন্ধে হওয়া উচিত ছিল। বাংলার কয়েক জন এই বিষয়ে প্রশ্ন তুলিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা তুলিতে দেওয়া হয় নাই। নারী-হরণ সম্বন্ধে প্রত্যেক ভগ্নীরই সজাগ হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের ভগ্নীগণ গৃহে থাকিয়াও নিরাপদ নহেন। সভ্য নাগরিকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও লজ্জার বিষয় আর কিছু থাকিতে পারে না। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে যদি একটি নারীও নির্য্যাতিতা হ'ন, তাহা হইলে প্রত্যেক নারীরই সেই সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ সজাগ হওয়া কর্ত্তব্য। নিজেদের ধর্ম্মরক্ষার জন্য অনেক নারী প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। যাহাতে সেই দুর্বৃত্তগণ শাস্তি পায়, তজ্জন্য আমাদিগের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার জন্য বিশেষ আদালত, বিশেষ আইন প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে এই নারী-সম্মিলন ব্যর্থ হইবে। আমাদের এখন এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে নারীহরণরূপ দুরপনেয় কলঙ্ক ভারত হইতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয়। নারী-সম্মিলন হইতে ইহার জন্য একটি বিশেষ সাব-কমিটী গঠন করিয়া যাহাতে এই নারী-হরণের প্রতিকার হয় তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা উচিত।"

নারী-ধর্ষণের মত ব্যাপার উপেক্ষা করা যে নারী-সম্মিলনের পক্ষে সঙ্গত হয় নি একথা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম

এসিয়ার যে সব ছাত্র শিক্ষার জন্য রোমে বাস করছেন সম্প্রতি তাঁরা এক সম্মিলনে মিলিত হয়েছিলেন। চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, পারস্য, আফগানিস্থান, শ্যাম ও মিশরের প্রায় ৬ শত ছাত্র যোগদান করেছিলেন এই সম্মিলনীতে। ইটালির রাষ্ট্র-নায়ক মুসোলিনী নিজেও সম্বর্দ্ধিত করেছেন এশিয়ার এই ছাত্রগণকে। বর্ত্তমান ইউরোপের একটা সুপ্রতিষ্ঠিত মতকে তাঁরা দিয়েছিলেন কিছুদিন পূর্ব্বে ইংরেজ কবি রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং। সে মতটি হচ্ছে—

"East and West will never meet."

মুসোলিনী অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় এই মতের প্রতিবাদ করেছেন। ইতিহাসের ফিরিস্তি খুলে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এ উক্তির ভিতর কিছুমাত্র সত্য নেই। রোমের সঙ্গে প্রাচ্যের মিলন মানব-সভ্যতার মহাদুর্দ্দিনে অন্ততঃ যে দু'বারও হয়েছে, তার প্রমাণ ইতিহাসেই আছে।

আমরাও মনে করি পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন অসম্ভব নয়। বর্ত্তমানে যে মনোভাব জেগে উঠেছে তার উদ্ভব হয়েছে কেবল অল্প দিন হ'ল পশ্চিমের ঔদ্ধত্যে। শক্তির দম্ভে মত্ত হ'য়ে সে স্ফীত হ'য়ে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তার জড়বাদের অহমিকায় ঘেরা সভ্যতা ঘৃণা করতে সুরু ক'রে দিয়েছে পূর্ব্বদেশের মানুষকে। সে ঘৃণা এমন যে, প্রতীচ্য এশিয়ার লোককে মানুষ ব'লে মনে করতেও আজ দ্বিধা বোধ করে। কথাটা যে অত্যুক্তি নয় তার পরিচয় তাদের ছোট-বড় বহু ব্যাপারের ভিতর দিয়েই পাওয়া যায়। এখানে একটা ছোট-খাট উদাহরণের উল্লেখ করছি। হেগেনবেক্ তার পশুশালা নিয়ে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য আজ এদেশে এসে হাজির হয়েছে। কিছুদিন আগে এই হেগেনবেকই ভারতবর্ষের প্রায় দু'শত অতি-দরিদ্র লোককে খাঁচায় পুরে পশুর সামিল ক'রে দেখিয়ে পয়সা উপার্জ্জন করেছে ফরাসী দেশ থেকে। কত বড় অহমিকা মনের ভিতরে জমে উঠ্‌লে যে একাজ করতে পারা যায় তা বোঝা কঠিন নয়। মুসোলিনী যাই বলুন—মনের ভিতর থেকে এই শ্রেষ্ঠত্বের স্পর্দ্ধা পশ্চিমের যতদিন না দূর হ'বে ততদিন পূবে পশ্চিমে মিলন সম্ভব হ'বে না। তবু যে এ মিলন আমরা অসম্ভব ব'লে মনে করি নে তার কারণ—পূর্ব্বদিক-প্রান্তেও উষার অরুণচ্ছটা দেখা দিয়েছে। এশিয়াও জাগছে। জাগ্রত এশিয়াকে ইচ্ছা থাক্‌লেও ইউরোপের পক্ষে অপমান করা সম্ভব হ'বে না। তার আভাসও আজ সুস্পষ্ট। আর যেখানে জোর-জবরদস্তি না চলে, ইউরোপ যে সেখানে মানিয়ে চলতে জানে, ইতিহাসে তার প্রমাণের অভাব সেকালেও ছিল না—একালেও নেই।

নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী

আমরা শুনে বিশেষ সুখী হলুম যে, 'নিউ ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোম্পানী'র জীবন-বীমা বিভাগের প্রথম ভ্যালুয়েশনের ফলে, ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১-এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসরের জন্য যাবজ্জীবন বীমায় ১৫৲ এবং মেয়াদী বীমায় ১০৲ হারে বোনাস্ দেওয়া স্থির হয়েছে। পরবর্ত্তী ত্রৈবার্ষিক ভ্যালুয়েশন হবে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩১-এ মার্চ্চ। সেই সময়ের পূর্ব্বে যে বীমা-পত্রের দাবী উপস্থিত হবে বর্ত্তমান বৎসরে এবং আগামী দুই বৎসরের জন্য তারাও উক্ত হারে বোনাস্ পাবে।

সাধারণতঃ যে-হারে লাভ অনুমান ক'রে বোনাস্ দেওয়া হয়, নিউ ইণ্ডিয়া তা হ'তে অপেক্ষাকৃত কম হার ধরে বোনাস্ দিয়েছেন, নতুবা, এ অপেক্ষাও ভাল বোনাস্ দেওয়া তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হ'ত না। কোম্পানীর এই প্রথম ভ্যালুয়েশন, এবং অত্যন্ত কষাকষি হিসাবে লাভালাভের বিচার হয়েছে—এই সব বিবেচনায় বোনাস্ আশাতীত রূপ ভাল হ'য়েছে বলতে হবে।

কোম্পানী কেবল বোনাস্ দিয়েই সন্তুষ্ট না থেকে আরও স্থির করেছেন যে, তাঁদের নূতন এবং পুরাতন বীমাকারীদের মধ্যে যাঁরা বার্ষিক কিস্তিতে চাঁদা দিয়ে থাকেন তাঁদের সকলকে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে চাঁদার টাকা থেকে বাদ দেওয়া হবে।

নিউ ইণ্ডিয়া ভারতের সাধারণ বীমা কোম্পানী সমূহের মধ্যে বৃহত্তম। জীবনবীমা বিভাগের প্রথম ভ্যালুয়েশনের এই সাফল্যে কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তা-দিগকে আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বেথুন কলেজের নূতন মহিলা অধ্যক্ষ

এই জানুয়ারী মাস হ'তে শ্রীযুক্তা তটিনী দাস, এম্-এ, বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রের এম্-এ এবং শিক্ষাদান-কার্য্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞা। দেশী ও বিদেশী উভয়বিধ শিক্ষারই ছাপ তাঁর ভিতরে আছে। সুতরাং তাঁর নিয়োগে বেথুন কলেজ যে যোগ্যা একজন অধ্যক্ষ পেল তা বলাই বাহুল্য। আমরা তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।
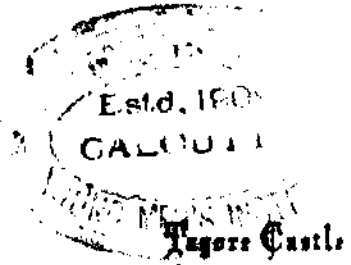
২৯ মাঘ ১৩৪০।

বাঙ্গলা সাহিত্যে "উদয়নের" দীপ্তি নবোদিত অরুণের দীপ্তির মতই স্নিগ্ধ ও সুন্দর। "উদয়ন" আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। আমি ইহার দীর্ঘ জীবন ও পরিপূর্ণ কল্যাণ কামনা করি।——

সঙ্গীত

(মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের সৌজন্যে)　　শিল্পী — স্যর এডওয়ার্ড বার্ন-জোন্স্

(একাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এর উদ্যোগে কলিকাতা মিউজিয়ামে নিখিল ভারত চিত্রকলা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত)

ফাল্গুন [illegible] বর্ষ
১৩৪০ একাদশ সংখ্যা

আদ্য বাংগালী জাতি — মারাং-বুরু মানব

শ্রীহরিদাস পালিত

ভারতে 'মারাং-বুরু' মানবের আবির্ভাব

কাল পরিমাণ কত, ইহার নির্ণয়-চেষ্টা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে যে নাই তাহা নহে কিন্তু সেকালের কথা প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা বলিবার উপায় নাই এবং বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। স্বীকৃত হউক বা না হউক কিন্তু একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। এই রকমের আনুমানিক হিসাব নৃতত্ত্ববিদেরাও অন্য উপায়ে করিয়া থাকেন।

ভারতে চারি যুগের নামে,—সৃষ্টির একটা কাল পরিমাণ করিবার পদ্ধতি চলিত আছে। সত্যাদিযুগ পরিমাণের হিসাবও পঞ্জিকায় আছে, তবে সম্ভবতঃ এই কালসংখ্যা নির্ণয় খুব সুপ্রাচীন নয়। ইহাও আনুমানিক হিসাব।

চালদিয়ার পঞ্জিকাতেও এই রকমের হিসাব রাখা হইত। চালদিয়ার মহাজলপ্লাবন কালটি কম করিয়া ধরিলেও খ্রীষ্টজন্মের বত্রিশ হাজার বৎসরের পূর্ব্বের ঘটনা। তখন চালদিয়া, বাবিলোনিয়া ইত্যাদি জনপদবাসীরা বিশেষ সভ্যতার কোঠায় উঠিয়াছিল।

এ সকল পৌরাণিক হিসাব, ঐতিহাসিক বা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ আদৌ বিশ্বাস করিতে চান না। তাঁহারা নানা উপায়ে ধরিত্রীর বয়স-সম্বন্ধীয় ঠিকুজি-কোষ্ঠী রচনা করিয়াছেন। তথাচ ইহাতে সকল পণ্ডিতের সম্মতি পাওয়া যায় নাই।

জে, কলিন ব্রাউন্ নামক জনৈক নৃতত্ত্ববিশারদ্ পণ্ডিত বিবিধ হেতু মূলে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন,—'য়ুরোপের প্রস্তর কাল' খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বের। তিনিই অনুমান করিয়াছেন—ভারতের প্রস্তর (পাষাণ-অস্ত্র-কাল) যুগটি তথাকথিত কালের।

সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, বহু বাদ-প্রতিবাদ সত্বেও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, আদি মানব যখন পাষাণ অস্ত্রাদির ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিল, সে কালটি খুব প্রাচীন, খুব কম হইলেও ধরিয়া লওয়া গেল, বর্ত্তমান কাল হইতে পনের লক্ষ এক হাজার নয় শত তেত্রিশ (১৫,০১,৯৩৩) বৎসরের প্রাচীন।

তথাকথিত কালে ভারতের লোকেরা পাষাণ অস্ত্র-শস্ত্রাদির ব্যবহার করিত। পণ্ডিতেরা পাষাণ কালকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন। প্রাচীন পাষাণ-অস্ত্রের কাল এবং নবীন পাষাণ-অস্ত্রের কাল। দ্বিতীয়

কালের পাষাণ-অস্ত্রগুলি অনেকটা সুমার্জ্জিত সুতরাং সুন্দর। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে অরূপ ছিল না।

ভারতের পাষাণ কাল, ১৫,০১,৯৩৩ বৎসর গত হইল বিদ্যমান ছিল। সেকালের পাষাণ-অস্ত্রাদি ভারতের নানা স্থানে, বিভিন্ন সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইগুলির তথ্যসহ চিত্রও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত হিমালয়ের পাদ-মূলে, তথাকথিত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতের স্থানবিশেষের আবিষ্কৃত কতিপয় তথ্য নিয়ে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

পশ্চিম রাঢ় এবং উহার পারিপার্শ্বিক

স্থান বিশেষে, কয়েক স্থানে কয়েক প্রকার পাষাণ-অস্ত্রাদির প্রাপ্তির তালিকা—

১। পরেশনাথ পাহাড়ের পাদমূলে ছেদন অস্ত্র।

২। রাণীগঞ্জের বোখারোর কয়লার খাদে কুঠার।

৩। ছোটনাগপুরের বুড়াডিহ গ্রামে কুঠার ফলক।

৪। সুবর্ণরেখার বালির চড়ায় একাধিক কুঠার-ফলক। (সিংভূম)

৫। চক্রধরপুরের আট ক্রোশ দূরে—ছুরিকাস্ত্র। (সিংভূম)

৬। সিংভূম চাঞবাসায় কয়েকটি পাষাণ অস্ত্র।

৭। রাঁচি (বর্ত্তমান বিহার ও উড়িষ্যা বিভাগ) পারিপার্শ্বিক ভূ-ভাগে, বহুতর পাষাণ-অস্ত্র এবং গৃহ-কর্ম্মের উপযোগী যন্ত্রপাতি।

এই ক্ষুদ্র তালিকা অবলম্বনে বলা যাইতে পারে, ঐ সকল ভূ-ভাগ সুপ্রাচীন কালে রাঢ় (রাঢ় ?) ভূমির অন্তর্গত ছিল। পরেশনাথ (পরবর্ত্তীনাম) পাহাড়শ্রেণী, হাজারিবাগ পার্ব্বতীয় প্রদেশ, মন্দরশৈল, মধুপুর, গিরিডি, আসানসোল, রাণীগঞ্জ, রাঁচি, পুরুলিয়া, পঞ্চকোট, সিনি, চাঞবাসা প্রভৃতি ভূ-ভাগসকল, প্রাচীন হড় জাতি (সাঁওতাল) গণের আদি লীলাক্ষেত্র ছিল।

'মারাং-বুরু' মানব ভারতের আদিম অধিবাসী, বৈদেশিক পণ্ডিতেরা ইহাদিগকে কোলারীয়ন, দ্রাভিডিয়ান নাম দিয়া আগন্তুক জাতি মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। তাহারা যাহারাই হউক না কেন, বিবিধ ব্যাপারে তাহারা কাঠ এবং পাথরের নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত।

নর্ম্মদা নদীর নিকটবর্ত্তী 'ভূত্র' নামক স্থানে—পুরাকালের সঞ্চিত কাঁকর ও বালির মধ্যে হেকেট্ নামক জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অতিকায় প্রাণীর কঙ্কালসহ কতকগুলি পাষাণ-অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সকল বিবরণ "দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার"-এর ৯০—৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে। এই উক্তি ও আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা বুঝা যায়, বিন্ধ্য পর্ব্বতমালার দক্ষিণ-ভাগে তথাকথিত মানবেরা একদা বাস করিত।

ওয়াইনী ও ব্রুস্ ফুট নামক বৈদেশিক পণ্ডিতদ্বয়, গোদাবরী এবং কিষ্কিন্ধ্যার পারিপার্শ্বিক স্থানে, বিস্তর প্রাচীন 'পাষাণ কালে'র নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কার্লাইল নামক জনৈক ইংরেজ কর্ম্মচারী বিন্ধ্যগিরির কোন সঙ্কট পথে এবং বাঘেলখণ্ড, রেবা ও মির্জ্জাপুর জেলার স্থানবিশেষে ক্ষুদ্রাকার পাষাণ-অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন (দি ইঃ এম্ঃ ৯০—৯১ পৃঃ)। তথাকথিত ক্ষুদ্রাকার দ্রব্যগুলিকে পিগ্মি ফ্লিন্টস্ (বামন-শিলা) নাম দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ সেগুলি শিশুর ক্রীড়নক দ্রব্য। কার্লাইল পর্ব্বত-গুহার তলদেশে ভস্ম ও অঙ্গার দেখিয়াছিলেন এবং তথাকথিত গুহার ভিত্তিগাত্রে গিরিমাটির দ্বারা নানা রকমে চিত্র লেখা ছিল। অধিকন্তু কোন কোন গুহায় কার্লাইল মৃতের সমাধি মধ্যে নরকঙ্কাল, মাটির পাত্রাদি এবং পাষাণ-অস্ত্র-শস্ত্রাদিও আবিষ্কার করেন (ঐ)। অঙ্গার দ্বারা অগ্নিদগ্ধ মৃৎপাত্র ব্যবহারের পরিচয় পাই।

দেখা যাইতেছে, দক্ষিণ ভারতে 'নব-পাষাণ' কালের 'মারাং-বুরু' মানবের বিশাল উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ব্রুস ফুটের অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসতি (পল্লী বিশেষ) এবং শিল্প-শালার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কর্মশালায় বিস্তর পাষাণ-অস্ত্রাদি, মৃৎ-পাত্র পাওয়া গিয়াছিল। তথাকথিত মাটির পাত্রাদি চক্রসাধিত।

অতএব 'নব-পাষাণ' কালের 'মারাং-বুরু' মানবেরা, গুহায় এবং পল্লীতে বাস করিত। ভিত্তিগাত্রে গিরি-মাটি দিয়া ছবি আঁকিত। মৃতদেহের সমাধি দিত। অগ্নির ব্যবহার জানিত, চক্রসাধনে মাটির পাত্র প্রস্তুত করিত।

হাজারিবাগ এবং রাঁচির মধ্যে দামোদর নদ প্রবাহিত। এই নদের উৎপত্তি-ক্ষেত্র হাজারিবাগ পাহাড়শ্রেণী। যে শৈলমালা হইতে দামোদর জন্মলাভ করিয়াছে, তথায় আদি বাংগালী হড়জাতির আদি প্রস্রোক। তথাকথিত পাহাড়িয়া বনভূমিতে হড়জাতি প্রথম আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের শ্রুতি আছে। হাজারিবাগ পাহাড়শ্রেণীকেই ইহারা 'মারাং-বুরু' বলিয়া থাকে। তাহাদের আদি জন্ম-স্থানের আদি-বন্থার নদ—'দাঃ মুদাঃ'। সংস্কৃতে উহাকেই 'দামোদর' নাম দেওয়া হইয়াছে। এই নদকে হড় জাতিরা পরম পবিত্র জ্ঞানে সম্মান ও ভক্তি করিয়া থাকে।

রাঁচি ও তাহার পারিপার্শ্বিক ভূ-ভাগ

হড় জাতির আদি লীলার স্থান। রাঁচি ও তাহার পারিপার্শ্বিক স্থানে যে সকল পাষাণ নির্মিত দ্রব্যাদির আবিষ্কার হইয়াছে, উহার সংখ্যা ও গৃহস্থালীর উপযোগী পেষণ-যন্ত্রাদিও দেখিলে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, তথায় পাষাণ কালের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। তথাকথিত পাষাণ দ্রব্যাদির যাহারা ব্যবহার করিত, তাহারা সভ্যতার সোপানে উন্নীত হইয়াছিল এবং সেই জাতির কেন্দ্রস্থান তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তথায় নব-পাষাণ কালের চিহ্ন সুস্পষ্ট। তাহারা যে জাতিই হউক না কেন, তাহাদিগকে 'মারাং-বুরু' মানব নামে অভিহিত করা গেল। কেন না হড় জাতি তথাকথিত পাহাড় শ্রেণীকে 'মারাং-বুরু' (শ্রেষ্ঠ-পাহাড়) বলিয়া থাকে।

'মারাং-বুরু' মানব

গণের প্রধান কেন্দ্র রাঁচি ও তাহার পারিপার্শ্বিক ভূ-ভাগে একদা বিদ্যমান ছিল। উড়িষ্যার (বর্তমান) ঢেকানল, আংগুল, তালচের, সম্বলপুর প্রভৃতি স্থানে একাধিক পাষাণ-অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাদ্রাজ প্রদেশের স্থানবিশেষে পাষাণ দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভিনসেন্ট বল গবেষণাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—রাণীগঞ্জাদির পাষাণ-অস্ত্রাদি এবং উড়িষ্যার অস্ত্রাদি একই প্রকার এবং উভয় অঞ্চলের পাষাণ-অস্ত্রাদির পাথর একই প্রকারের। অধিকন্তু মাদ্রাজের প্রস্তর অস্ত্রাদির পাথর ও আকৃতি-গঠন বাংলাদেশেরই মত। তিনি এই তথ্য অবলম্বনে স্থির করিয়াছেন যে, দক্ষিণ দেশবাসী এবং উত্তর দেশবাসী পাষাণ কালের মানবগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। আমরাও সাদৃশ-উপাদান দৃষ্টে উভয় দেশবাসীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, ইহা বুঝিতে পারিয়াছি।

মিঃ বল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পাষাণ-মানব দক্ষিণ ভারত হইতে উত্তরে আসিয়াছিল। কেবল আমরা এই অনুমানটি গ্রহণ করিতে পারি নাই। নানা উপায়ে অবগত হওয়া যায় যে, হড়জাতির (কোল প্রভৃতি) আদি প্রস্রোক দামোদর নদের উৎপত্তি স্থল হাজারিবাগ গিরিমালা (মারাং-বুরু), তথা হইতে রাঁচি, মানভূম, সিংভূম অতিক্রম করিয়া কালে বর্তমান উড়িষ্যা দেশে এবং কোন কোন দল বিন্ধ্য পর্বতমালার সঙ্কটপথ অতিক্রম করিয়া এবং চিহ্ন রাখিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। দক্ষিণ দেশ হইতে 'পাষাণ-মানব' উত্তর ভারতে আসে নাই। কোল এবং সমেতাল (হড়) একই মূল জাতির বিভিন্ন শাখা মাত্র। দক্ষিণ ভারতে হড়-কোল প্রাধান্য সর্ব-প্রথমে ছিল না। হড়-কোল অ-ভারতীয় জাতিও নহে। 'প্রস্তর কাল' যদি পনের লক্ষ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের হয়, তাহা হইলে তাহারাই 'মারাং-বুরু' মানব। নৃতত্ত্ববিদ্যা-বিদ্গণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হিমালয়ের দক্ষিণে

আদিকালে মানবের আবির্ভাব হইয়াছিল। আমরা দেখিতেছি, রাঁচিকে কেন্দ্র করিয়া পাষাণ-মানবদের একটা সুবৃহৎ আড্ডা গড়িয়া উঠিয়াছিল। সেটি সুপ্রাচীন রাঢ়দেশকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। দক্ষিণ ভারতে রাঁচির মত পাষাণ-মানবগণের প্রাথমিক কেন্দ্র কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। শস্য পেষণের মুষল রাঁচিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা উন্নতির পরিচায়ক।

অ-ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ, পবিত্র বাইবেলের সম্মান রক্ষার্থে বোধ হয় ভারতে কোন মানব জাতির আদি দম্পতির প্রকটের উল্লেখ করেন নাই। ধর্ম্ম-শাস্ত্রের এতাদৃশ পৌরাণিক মতবাদ বর্ত্তমান ইতিহাসে শোভা পায় না। সাম্প্রদায়িক তথাকথিত মতবাদ এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে। বৈদেশিক তথাকথিত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। কোলপ্রমুখ জাতি এবং দ্রাবিড় জাতি যে অ-ভারতীয়, এ উক্তি বিশ্বাসযোগ্যও নয়। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রচেষ্টায় সত্য ক্রমশঃ ব্যক্ত হইতেছে। হিমালয়ের দক্ষিণে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পনের লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে যদি পাষাণ কালের মানব বিদ্যমান থাকার প্রমাণ হয়, তাহা হইলে তথাকথিত কালের পূর্ব্বে ভারতে আদি মানববিশেষের প্রকট হওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে জলময় ভারতে, প্রথমে পরেশনাথ গিরিশ্রেণী এবং দক্ষিণ ভারতে নীলগিরিশ্রেণী মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল। হড়-প্রকৃতির মত প্রকৃতি দক্ষিণ ভারতের কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই। নীলগিরি অঞ্চলে যে সকল প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, যথা এড়্‌ক প্রভৃতি, সেগুলি কিঞ্চিৎ সভ্যতার নিদর্শন বহন করিতেছে।

দ্রাবিড় জাতিরা দক্ষিণ ভারতের আদি অভিনেতা। তাহারা প্রাথমিক হড়জাতির কিছু উন্নত অবস্থার লোক। বৈদিক, পৌরাণিক সাহিত্য প্রভৃতিতে — হিমালয় (উত্তরমেরু বা মেরু) প্রদেশই — আদি নর-মিথুনের প্রকটস্থল। কিন্তু ভূ-তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, উহা পরেশনাথ পাহাড়শ্রেণীর পরবর্ত্তী কালের। 'মারাং-বুরু'-সর্ব্বাদি শৈলমালা উত্তর ভারতের।

পুরুলিয়ার পশ্চিমে, বাঁকুড়া হইতে একশত মাইল দূরে, একটা প্রকাণ্ড গভীর খাত ছিল। ঐ প্রকারের গভীর গর্ত্ত (হ্রদ) এক সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে ছিল। সেই জলময় ভূ-ভাগে বহু শৈল-শিখর দেখা যাইত। বর্ত্তমান চিল্কাহ্রদের মধ্যে যদ্রূপ ছোট-খাট পাহাড় দেখা যায় যাহা ক্রমশঃ পলি পড়িয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে উন্নত হইয়াছে, তদ্রূপ প্রথায় উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শৈল পারিপার্শ্বিক ভূমিগঠিত এবং উন্নত হইয়াছে। শৈলমালার পারিপার্শ্বিক স্থান সর্ব্ব-প্রথমে প্রকট হইয়াছিল এবং অপরাংশ জলময় ছিল। 'মারাং-বুরু' শৈলমালা হইতে তথাকথিত 'মারাং-বুরু' মানবের শৈলমালা বা উহার সংলগ্ন উন্নত স্থলভাগ অবলম্বনে পশ্চিমে এবং দক্ষিণে গমন ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না। অতএব হাজারিবাগ হইতে শৈলময় ভূ-ভাগ অবলম্বনে ময়ূরভঞ্জ হইয়া উড়িষ্যায় যাওয়াই সম্ভব, ক্রমে পূর্ব্বঘাট শৈলমালা অবলম্বনে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি যাওয়া বিচিত্র নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা সম্ভব নয়।

তাম্র-অস্ত্রগুলি

পাষাণ-অস্ত্রের দ্বিতীয় অবস্থাতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে, তখনও ভারতের নানাস্থানে পাষাণ-অস্ত্রের ব্যবহার চলিত ছিল। নব্য পাষাণ কালেই তাম্র-অস্ত্রের প্রবর্ত্তনকাল ধরা চলে।* ঋগ্বেদে তাম্র শব্দের প্রয়োগ নাই। (হিস্‌টরি অব্ দি ভেদিক লিটারেচার—৫৫ পত্র)।

হাজারিবাগের পচম্বা নামক স্থানে তামার অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। মেদিনীপুর ঝাটিবনির তামা-জুড়ি

* নব-পাষাণ কালের শেষ অবস্থায়, 'ব্রোঞ্জ' নামক মিশ্র ধাতব দ্রব্যের ব্যবহার প্রচলিত হয়। পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতে ইহার বিকাশ হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্ব্বতশ্রেণীর কোন কোন প্রদেশের প্রাচীন সমাধি (এড়্‌ক) মধ্যে উক্ত ধাতব দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে।

গ্রামে তামার অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডাক্তার সইনি বারগুণ্ডা তাম্রখনির নিকট কিছু তামার অলঙ্কার এবং একখানি তামার বৃহৎ কুঠার প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। সিংভূম জেলার পাহাড় অঞ্চলে একাধিক প্রাচীন তামার খাতের গর্ত বিদ্যমান আছে।

'দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার' ৯৭ পত্রে দেখা যায়—১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য ভারতের বালাঘাট জেলার গাংগেরিয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী একটা গর্ত্ত-মধ্যে কতিপয় তামার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিয়াছেন—সেগুলি খুবই প্রাচীন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন, তথাকথিত তাম্রদ্রব্যাদি খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুই হাজার হইতে দেড় হাজার বৎসরের। এ ছাড়া কানপুর, ফতেগড়, মৈনপুরী এবং মথুরা ইত্যাদি জেলার স্থান বিশেষে তামার অস্ত্র-শস্ত্র অনেকগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তামার খনির অভাব ভারতে নাই। হিমালয়ের দার্জ্জিলিং হইতে কমায়ুন পর্য্যন্ত তামার আকর আছে। কিন্তু এতদঞ্চলের তামার পাথর হইতে তথাকথিত কালে তামা প্রস্তুত করিবার কোন নিদর্শন এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত সিংভূমে (মঃ ভারতে) এবং দক্ষিণ ভারতের নেলোর জেলায় তামা যথেষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে। সিংভূমের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাচীন কূপ-খাত দেখিয়াছি। তথায় তামা প্রস্তুতের নিদর্শন-স্বরূপ অঙ্গাররাশি ও আবর্জ্জনা দেখা গিয়াছে। সে সকল যে কত পুরাতন বলিতে পারা যায় না। বি, এন, আর কোম্পানী যখন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, শুনা গিয়াছে তখন তামার তাল কোন কোন প্রাচীন কর্ম্মশালার নিকট পাওয়া গিয়াছিল।

তথাকথিত কালে উত্তর ভারতে সিংভূমের তামাই ব্যবহার হইত। যাহারা তাম্রশিল্পী তাহাদিগকে 'সারাক' বলা হইত। এই জাতি এখন বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁতের কর্ম্ম করে। সিংভূম 'মারাং-বুরু' মানবের সুপ্রাচীন কেন্দ্র। যে সকল স্থানে তামার দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সম্ভবতঃ সে সকলই সিংভূম অঞ্চল হইতে গিয়া থাকিবে। সিংভূমবাসীরা তথাকথিত কালে যে ঐ সকল জনপদে গিয়াছিল ইহা অনুমিত হয়। দক্ষিণ ভারতের নেলোর জেলায়, প্রাচীন কালে তামা প্রস্তুত হইত কি না, নিঃসন্দেহে বলা যায় না। হাজারিবাগ হইতেই তামা দক্ষিণ ভারতে গিয়া থাকিবে।

তামার পাথর হইতে যে উপায়ে তামা বাহির করা হইত, হয়ত ঐ প্রণালীতে দৈবাৎ তৎসদৃশ লোহার পাথর দগ্ধ করিয়া লৌহ প্রথমে আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। হাজারিবাগ অঞ্চলে লৌহপ্রস্তরের অভাব নাই। মনে হয় হাজারিবাগেই প্রথমে লৌহ আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে। বহু 'মারাং-বুরু' মানববংশীয় হড় প্রভৃতি জাতি লৌহ প্রস্তুত করিত। তাহাদিগকে 'লোহাড়' বলে। হাজারিবাগ পাষাণ, তাম্র এবং লৌহ-কালের পরিচয় প্রদান করে।

লৌহের ব্যবহার

সম্বন্ধে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অভিমত যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব নবম শতকে মিশরে লৌহ প্রচলিত হয় নাই। কিন্তু চালদীয় বাবিলনীয় রাজ্যে মিশরের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে লৌহের প্রচলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তথাকথিত দেশের প্রাচীন বৈদেশিক জাতিরাই লৌহের ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকিবে। তথাকথিত দেশের সুমারীয়-আকাদ দেশবাসীরা, আদৌ ভারতীয় (হল্, এন্সিয়েন্ট হিস্টরি)। ঋগ্বেদে ১।১৬৩।৯ — ৭৪ টীকায় ভারতকে সর্ব্বাদি সভ্য দেশ বলিয়া উক্তি আছে। * (দি ভেদিক লিটারেচার—৭৭ পৃষ্ঠা)। বৈদেশিক বর্বে, হাচিন্স, অলী প্রভৃতি

---

* য়ুরোপের দ্রুমবাসী অল্‌পাস্নো বা ক্রগ্‌গো জাতি নব-পাষাণ কালে এশিয়া খণ্ডেরই আদিম অধিবাসী। ডাক্তার মন্‌রো বলিয়াছেন,—তাহারা সম্ভবতঃ এশিয়ার আদিম বাসী, তাহারা কৃষ্ণসাগর এবং ভূমধ্যসাগর উপকূল হইয়া য়ুরোপে প্রবেশ করে। তাহাদের কেন্দ্র সুইজারল্যাণ্ডেই স্থাপিত হয়। হচিন্‌সন কৃত 'প্রি হিস্টোরিক ম্যান এণ্ড বিস্টস্'—১৮৭ পৃঃ। এবং 'ম্যান বিফোর হিস্টরি'—১১৯-১২৫ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এ জাতি অতি প্রাচীন মারাং-বুরু মানবের শাখা বংশ বলিয়া ধারণা করিবার হেতু আছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে পাষাণাদি কাল চতুষ্টয় অন্যূন চার হাজার বৎসর ব্যাপিয়া স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। ভারতে তদ্রূপ হইয়াছিল কি না বলা যায় না, বোধ হয় 'প্রস্তর কালে'র পর অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে ভারতে তথাকথিত কালের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে।

ভগবান বাল্মীকি সুগ্রীবের মুখে বলাইয়াছেন—

এতাবদ্বানরৈঃ শক্যং গন্তুং বানরপুঙ্গবাঃ।
অভাস্করমমর্য্যাদং ন জানীমস্ততঃ পরম্॥ ইত্যাদি
(বাঃ কিষ্কিঃ, ৪০ সর্গ ৬৮)।

সত্য হউক, কল্পনা হউক, পাইতেছি যে, ভারতের আদিম জাতিরা এশিয়ার বহু প্রদেশের খবরাখবর জানিত। সম্ভবতঃ তথাকথিত জাতিরা ভারতের বহির্ভাগে যাতায়াত করিত।

অতনুর জন্ম

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

কাঁপিছে শীতের সন্ধ্যা প্রসবের বেদনায় ভরা,
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস আসন্ন মূর্চ্ছার ছায়া আনে,
কে আসিছে জানা নাই—ব্যথা শুধু বজ্রবাণ হানে,
বুনিছে স্বপ্নের জাল তারি তরে মুগ্ধা বসুন্ধরা।
বুনিছে স্বপ্নের জাল তন্দ্রাতুরা পাংশু পাণ্ডু ধরা,
অন্তরে করিছে মূর্ত্ত সুন্দরে সে ছন্দে আর গানে,
তাই তো নামিয়া আসে অকস্মাৎ ধরণীর পানে,
বসন্তের কান্ত-তনু—যৌবনের আনন্দ পশরা।

হে প্রিয়ে, তোমারো বুকে ঘনায়েছে কালো অভিমান,
থর থর কাঁপে বুক, অশ্রু-চিহ্নে মূর্চ্ছার আভাস,
নীরবে নামিয়া আসে অকরুণ কঠিন নিঃশ্বাস,
আমি জানি—তারি মাঝে নব ভ্রূণ লভিতেছে প্রাণ।
অপূর্ব্ব অতনু শিশু—মর্ম্মের জমাট অভিলাষ—
হাতে যার পুষ্পধনু, চোখে যার অব্যর্থ সন্ধান।

রবীন মাষ্টার

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্‌-এ, ডি-এল্‌

১

ছেলে বেলায় বাপ-মা তাকে ডাকতো 'খোকা' ব'লে, বড় হ'লে সবাই তাকে ব'লতো 'রবি ঠাকুর'; কিন্তু আজ তিরিশ বছর দশখানা গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাই তাকে জানে 'রবীন মাষ্টার'। আর জানে যে, সে বদ্ধ পাগল।

তিরিশ বৎসর আগে সে বি-এ ফেল ক'রে এসে গাঁয়ে ব'সেছিল, কেন না তার প'ড়বার আর সঙ্গতি ছিল না। কিন্তু লোকটা তখন ছিল ভারী উৎসাহী আর বিলক্ষণ জোগাড়ে। কতকগুলি ছেলে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে সে ক'রলে একটা মাইনার ইস্কুল—নিজে হ'ল তার হেড মাষ্টার। লোকে ব'ললে, এ-পাড়াগাঁয় কি ইস্কুল চ'লবে? মাত্র তিন মাইল দূরে যেখানে একটা এণ্ট্রান্স ইস্কুল র'য়েছে! কিন্তু রবীন মাষ্টার দমবার ছেলে নয়। দশটি ছেলে নিয়ে ইস্কুল বসালে, দেখতে দেখতে হ'য়ে গেল সেখানে একশো ছেলে।

গাঁয়ের জমীদার ভুবনবাবু দু'খানা ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর গোটা পঁচিশেক টাকা দিয়েছিলেন। তাই সম্বল ক'রে রবীন মাষ্টার নিজের খাটুনী আর উৎসাহের জোরে রীতিমত একটা জম-জমাট ইস্কুল ক'রে ফেললে।

তারপর সে ক'রলে বিয়ে। বিয়ে সে আগে করে নি, কেন না বউ এনে খাওয়াবার সঙ্গতি তার ছিল না। নইলে মন তার চেয়েছিল অনেক আগেই তার জীবন-সঙ্গিনী, শুধু বুক ভেঙ্গে ফেলে সে চেপে রেখেছিল তার সে বাসনা। ইস্কুল যদিও হ'ল, তবু তা' থেকে রবীন মাষ্টারের মাইনে আদায় হ'তে লাগলো অনেক দিন। যখন তিরিশ টাকা মাইনে সত্যি সত্যি হাতে আসতে লাগলো, তখন সে ভাবলে, এখন বিয়ে করা যায়।

তারপর তার ঝোঁক চাপলো, ইস্কুলটাকে হাই স্কুল ক'রতে হবে। ভুবনবাবুর কাছে অনেকদিন দরবার ক'রে, উঠলো দু'খানা টিনের ঘর—পত্তন হ'ল 'ভুবনমোহন হাই স্কুলে'র।

সেই বারে যোগে-যাগে রবীন মাষ্টার বি-এ-টা আবার দিলে। নইলে চলে না। হাই স্কুলের হেড মাষ্টার, নিদেন বি-এ না হ'লে দেখায় ভাল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে ফেল হ'ল ইংরাজীতে। ঐ ইংরাজীটা সে কিছুতেই তেমন রপ্ত ক'রতে পারলে না।

সে কি হাঙ্গামা! ছেলে জুটিয়ে আনা, টাকা ভিক্ষে করা, বই জোগাড় করা, ইনস্পেক্টরের দরবার করা—সব ক'রলে রবীন মাষ্টার একা।

বছর দুই বাদে যখনই ইস্কুলটা বেশ চ'লতে লাগলো, তখন ইনস্পেক্টর এক লম্বা ফর্দ্দ দিলেন। ব'ললেন, একটা কমিটি ক'রতে হবে, গ্রাজুয়েট হেড মাষ্টার চাই, মাষ্টার বাড়াতে হবে, বই কিনতে হবে— এমনি সব কত কি!

রবীন মাষ্টার খেটে খুটে সব জোগাড় ক'রলে—হ'ল কমিটি।

নতুন মাষ্টারের জন্তে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল—অনেক দরখাস্ত এলো—এম-এ, বি-এ কত। কমিটি থেকে বাছাই ক'রতে অসুবিধা হ'ল। তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন সব দরখাস্ত ইনস্পেক্টরের কাছে। ইনস্পেক্টর বাছাই ক'রে ফেরত দিলেন।

একজন এম-এ-কে তিনি ক'রলেন হেড মাষ্টার, একজন হালের বি-এ হ'লেন সেকেণ্ড মাষ্টার। রবীন মাষ্টারকে থার্ড মাষ্টার হ'য়ে থাকতে হুকুম হ'ল মাইনে—সেই তিরিশ টাকা।

ইস্কুলটা ভারী জমে গেল। একে ত' সেই সময় এই অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে ছেলেদেরকে পণ্ডিত ক'রবার জন্তে হঠাৎ ঝোঁক লেগে গেল। তারপর 'ভুবন মোহন ইস্কুলে'র নাম প'ড়ে গিয়েছিল ভারী। গাঁথ

পিটে ঘোড়া ক'রবার খ্যাতি হ'য়েছিল এ ইস্কুলের। আর রবীন মাষ্টারেরই সেই খ্যাতি ষোল আনা পাওনা। সে এমন যত্ন ক'রে আর এমন উপায়ে ছেলেদের পড়াত সে, অতি বড় বোকা ছেলেও ত'রে যেত।

প্রথম যে বারে ইস্কুল থেকে ছেলে পাঠান হ'ল—তখনও রবীন ছিল হেড মাষ্টার। সেই বারেই একটা ছেলে পেলে কুড়ি টাকার একটা সরকারী জলপানী। আর যায় কোথায়? চার দিক থেকে ছেলে ভেঙ্গে আসতে লাগলো।

রবীন মাষ্টার যতদিন ইস্কুল চালাচ্ছিল, ততদিন সে ছেলেদেরকে ইস্কুলে যা পড়াত পড়াত, আর বাড়ী নিয়ে তাদেরকে পড়াত, আবার মাঠে-ঘাটে তাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াত—কি গুষ্টির মাথা ক'রতো তাদের নিয়ে সেই জানে। নিয়ম-কানুনের ধার সে বড় ধারতো না। কোন্ ক্লাসে কোন্ ঘণ্টায় কতখানি কি পড়ান হবে, তার সম্বন্ধে নিয়ম লেখা থাকতো বটে, কিন্তু সে লেখাই থাকতো! রবীন মাষ্টার যখন যে ক্লাশে খুশী ঢুকে যেতো। একটা ছেলেকে হয় তো অঙ্কের ঘণ্টায় জিওগ্রাফী পড়াত, আর একটাকে বাঙ্গলার ঘণ্টায় পাঠিয়ে দিত অন্য মাষ্টারের কাছে ইংরেজী প'ড়তে। এমনি এলোমেলো তার ব্যবস্থা ছিল। মাষ্টারেরা তার এসব ব্যবস্থা বুঝতে পারতো না, তারা হাসতো আর আপনা-আপনির মধ্যে বলাবলি ক'রতো, বদ্ধ পাগল রবীন মাষ্টার!

নতুন হেড মাষ্টার এলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এলো গভর্ণমেণ্টের সাহায্য—মোটা টাকা—আর এলো ছক-কাটা আট-ঘাট বাঁধা আইন-কানুন।

হেড মাষ্টার সেই আইনের খাতা খুলে সব মাষ্টার-দের বুঝিয়ে দিলেন যে, সব আইন মেনে চলতে হবে।

রবীন মাষ্টারের আস্পর্দ্ধার সীমা নেই। এম-এ পাশ, পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্সের হেড মাষ্টারকে সে অম্লান বদনে ব'ললে, "দেখুন, ওতে অসুবিধা আছে। ওই শচে' ঘোষ, ওকে রোজ একঘণ্টা ইংরেজী আর একঘণ্টা ইংরেজী গ্রামার পড়ান মিথ্যে, কেন না যেটা ক্লাশে পড়ান হবে তার চেয়ে ঢের বেশী ওর জানা আছে। অথচ অঙ্কে সে কাঁচা, তাকে সেই সময় অঙ্কের ক্লাশে বসিয়ে দিলে ঢের ভাল হবে। আর সুরেন ভট্টচাজ্জি, ওকে সংস্কৃত ক্লাশে বসিয়ে রাখা মিথ্যে—ও মুগ্ধবোধ, রঘুবংশ শেষ ক'রে ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'য়েছে! আবার সত্য মিত্তির—"

বি-এ ফেল থার্ড মাষ্টারের এ স্পর্দ্ধায় হেড মাষ্টার মহাবিরক্ত হ'য়ে ব'ললেন—"না ম'শায় না। অমন এলোমেলো ক'রে ছেলে শেখান চলে না। ইস্কুলের discipline তাতে থাকে না। ঠিক এমনি সব ক'রতে হবে।"

মুখ চুণ ক'রে রবীন মাষ্টার ব'ললে "হোক।"

বছর খানেক বাদে সেকেণ্ড মাষ্টার হেড মাষ্টারকে গিয়ে ব'ললেন, "মশায়, এখানকার মাইনে তো যা'—ভেবেছিলাম প্রাইভেট পড়িয়ে কিছু পাবো; কিন্তু ঐ রবীন মাষ্টারের জালায় আর কিছু হবার জো নেই। ও সব ছেলেকে ওর বাড়ীতে নিয়ে পড়াচ্ছে অমনি—তা লোকে প্রাইভেট মাষ্টার রাখবে কেন?"

কথাটা শুনে হেড মাষ্টার একদিন রবীন মাষ্টা-রের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। দেখলেন সেখানে এক পাল ছেলে। কেউ ব'সে ঘুড়ি তৈরী ক'রছে, কেউ বাঁশ চিরে দিচ্ছে, আর কয়েকজন চাটাই বানাচ্ছে। খুব ছোট ছোট কয়েকটা ছেলে কাগজ কেটে নানা রকম প্যাটার্ণ ক'রছে।

রবীন মাষ্টারের বাহির বাড়ীতে একখানা বড় খ'ড়ো ঘর, আর তার সামনে উঠান—ও-ধারে দু'টো গরু বাঁধা আছে। উঠানে ছেলেরা এই সব ক'রছে। গরুর কাছে একদল ছেলে দাঁড়িয়ে গরু দেখছে, কয়েকজন গরু-বাছুরের ছবি আঁকছে।

ঘরের ভিতর পাঁচটা ছেলে ব'সে প'ড়ছে। রবীন মাষ্টার দেয়ালে টাঙ্গান একটা ম্যাপের কাছে দাঁড়িয়ে ম্যাপ দেখিয়ে দেখিয়ে কি সব গল্প ক'রছে আর খুব হাসাহাসি ক'রছে ছেলেদের সঙ্গে।

হেড মাষ্টারকে দেখে রবীন মাষ্টার ব্যস্ত-সমস্ত

হ'য়ে তাড়াতাড়ি তাঁর একমাত্র চেয়ারখানা ঝেড়ে ব'সতে দিলেন। হেড মাষ্টার মুখ ভার ক'রে উঠানের ছেলেদের দেখিয়ে বললেন—"এরা সব এ কি ক'রছে?"

বিনীতভাবে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "একটু Manual training আর Nature study করাচ্ছি ওদের।"

তখন বি-টি মাষ্টারের যুগ নয়, এ সব জিনিষ হেড মাষ্টারবাবুর জানা ছিল না। তিনি গম্ভীরভাবে ব'ললেন, "ওদের মাথাটি খাচ্ছেন। এই সব খেলা-ধূলায় যদি মাষ্টারের কাছেও ওরা উৎসাহ পায়, তবে কি আর ওরা বই নিয়ে ব'সবে?"

রবীন মাষ্টার মৃদুস্বরে ব'ললেন, পেষ্টালট্‌সি ও ফ্রেবেলের কথা। তাদের নাম হেড মাষ্টারের জানা ছিল না। তিনি ব'ললেন, "রেখে দিন ওসব বিলিতি থিওরী। এদেশে ছেলেদের কাণ ধ'রে বই না পড়ালে ওদের শেখাই হবে না। এ সব বন্ধ করুন—এতে এদের সবার মাথা খাওয়া যাবে। আর এদের আপনি পড়াচ্ছেন? কি পড়াচ্ছেন? জিওগ্রাফী তো আপনার পড়াবার কথা নয়—আপনি পড়াবেন হিষ্টরী। সুরেন বাবুকে ডিঙ্গিয়ে যদি আপনি জিওগ্রাফী পড়াতে যান তবে discipline-এর কি হবে?"

বিনীত ভাবে রবীন মাষ্টার ব'ললে, "আজ্ঞে এখন জিওগ্রাফী নয়, হিষ্টরীই ওদের পড়াচ্ছিলাম। ম্যাপ দেখে হিষ্টরী প'ড়লে অনেক জিনিষ বেশ পাকা হ'য়ে যায়। ভারতের general history-টা বেশ সুন্দর বোঝান যায় ম্যাপের সাহায্যে!"

ম্যাপ দেখিয়ে হিষ্টরী পড়ান! এমন সৃষ্টি-ছাড়া কথা কেউ কখনও শুনেছে? হেড মাষ্টার ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে উঠে ম্যাপটা উল্টে দেখে ব'ললেন, "এ তো দেখচি ইস্কুলের ম্যাপ!"

রবীন মাষ্টার ব'ললে, "আজ্ঞে হাঁ, আমি রোজ নিয়ে আসি আবার রোজ নিয়ে যাই।"

"কি সর্বনাশ! ইস্কুলের property আপনি এমনি বাড়ী নিয়ে আসেন?"

"বরাবরই তো তাই ক'রছি—এতে দোষ কি?"

"আপনি বরাবর যা ক'রেছেন সে তো দেখতেই পাচ্ছি। ইস্কুলটাকে ক'রে তুলেছিলেন আপনার ঘরোয়া সম্পত্তি। কিন্তু এসব চ'লবে না। ওহে ছোকরারা, তোমরা বাড়ী যাও সব।"

এইবার রবীন মাষ্টার তেতে উঠলো, সে বললে "কখনও না। বরং আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আমার বাড়ী আমার দুর্গ—এখানে আপনি যদি আসেন সে আমার অনুমতি সাপেক্ষ।"

ম্যাপখানা আগেই জড়িয়ে ফেলেছিল রবীন মাষ্টার। সে ম্যাপখানা এবং ইস্কুলের দু'খানা বই হেড মাষ্টারের হাতে দিয়ে সে ব'ললে, "এই নিয়ে যান আপনার ইস্কুলের সম্পত্তি! আর বাড়ীতে আমার কাজে হাত দেবেন না।"

এই শান্ত, নিরীহ লোকটির এতটা স্পর্দ্ধা দেখে হেড মাষ্টার অবাক্ হ'য়ে গেলেন। কি ব'লবেন ঠিক ক'রতে না পেরে ম্যাপখানা আর বই দু'খানা বগলে ক'রে তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

এর পর হেড মাষ্টার আদা-জল খেয়ে লাগলেন রবীন মাষ্টারের পেছনে। গাঁয়ে একটা হৈ চৈ লেগে গেল।

ভুবনবাবু ছিলেন ইস্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট। হেড মাষ্টার তাঁর কাছে গিয়ে ব'ললেন, "রবীন মাষ্টারকে না ছাড়ালে ইস্কুলের ডিসিপ্লিন থাকবে না।"

ভুবনবাবু যদিও এই দিগ্‌গজ এম-এ-টিকে যথেষ্ট সমীহ ক'রতেন, তবু একথা শুনে তিনি ব'ললেন, "রবীনকে তাড়াবে? তাবি এ ইস্কুল! তাকে তাড়াবার তুমি আমি কে হে?"

সতীশ চৌধুরী কমিটির আর একজন সভ্য। তাঁর কাছে গিয়ে হেড মাষ্টার মৌখিক সহানুভূতি পেলেন, কিন্তু তিনি বুদ্ধিমানের মত ব'ললেন, "ওকে তাড়ালে যদি ও আর একটা ইস্কুল খুলে ব'সে, আপনার ইস্কুলে ছেলে থাকবে না একটিও।

নিরুপায় হ'য়ে হেড মাষ্টার তাঁর মুরুব্বী

ইনস্পেক্টরকে ধ'রলেন। তিনি ব'ললেন, "না হে না, ও থাক। বেচারা এত ক'রে ইস্কুলটা ক'রেছে!"

কাজেই রবীন মাষ্টারকে তাড়ানো গেল না। কিন্তু নির্য্যাতন হ'ল তার বিষম।

রাগের ঝোঁকে একটা বেতমিজি ক'রে ফেলেছিল রবীন মাষ্টার, কিন্তু ঝগড়া করা তার স্বভাব নয়। তাই হেড মাষ্টারবাবুর সব অত্যাচার সে নীরবে সহ্য ক'রলে। বাড়ীতে ছেলে পড়ান সে ছেড়ে দিলে, সবই ছেড়ে দিলে, শুধু ইস্কুলের ছক্-কাটা রুটিন দেখে নিয়ম বেঁধে পড়াতে লাগলো—হিষ্টরী আর হাইজীন।

সেই থেকে রবীন মাষ্টার বদলে গেল।

আগে গ্রামে যা কিছু হ'ত তার ভিতর সে-ই মাথা পেতে দিত সবার আগে। এখন সে কোনও কিছুতেই যায় না। চুপ-চাপ ইস্কুলের কাজ করে, আর ঘরে বসে কি যে করে সারাদিন, কেউ খবর রাখে না। তার অসাধারণ কাজের মধ্যে আছে শুধু বছরে দু'বার ক'লকাতা যাওয়া। পুজোর ছুটি আর গরমের ছুটিতে ক'লকাতা তার যাওয়াই চাই।

ক'লকাতায় তাকে দেখা যায় শুধু পুরোনো বইয়ের দোকানে, আর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কিম্বা অন্য কোনও লাইব্রেরীতে। পুরোনো বইয়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে সে বই নিয়ে পড়ে, আর নেহাৎ দায় প'ড়লে এক আধখানা কেনে।

বই কিনে নিয়ে সে বাড়ীতে আসে চোরের মতন। চুপি চুপি বাড়ীতে ঢুকে সে কোনও মতে বইয়ের পোঁটলা তার বাইরের ঘরে এক কোণায় লুকিয়ে রেখে তার ক্যাম্বিশের ব্যাগ নিয়ে বাড়ীর ভিতর যায়। এতটা লুকোচুরীর হেতুটা খোলসা ক'রে বলা দরকার।

২

রবীন মাষ্টার বিয়ে ক'রেছিল একটু বেশী বয়সে। তার স্ত্রী ছিল তখন ছোট।

কিছু দিন তার বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে কাটলো। নিস্তারিণী বয়সে ছোট হ'লেও কাজ-কর্ম্মে খুব পটু। সংসার সে খুব গুছিয়ে ক'রতে জানে। বারো বছরের মেয়ে সে, সংসারের সব কাজ-কর্ম্ম একা ক'রতে পারে। রবীন কিন্তু দেয় না তাকে সব ক'রতে। এতদিন সে আর তার মা ছিল—মাকে বসিয়ে রেখে নিজে খেটে-খুটে কাজ করাই তার ছিল অভ্যাস। এখনও সে স্ত্রীর সঙ্গে হাতে হাতে সব কাজ ক'রে দেয়, মনের আনন্দে।

এতে কিন্তু নিস্তারিণীর ক্রমে একটা বদভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল। স্বামীর কাছে কাজ পাওয়াটা তার অভ্যাস হ'য়ে গেল। এবং সতেরো বছর না পার হ'তেই সে স্বামীকে রীতিমত কাজের হুকুম ক'রতে লাগলো।

এতে হ'ল এই যে, রবীন মাষ্টার আগে যেটা ক'রতো মনের আনন্দে, সেই কাজ হ'য়ে গেল তার একটা দারুণ বোঝা! বিশেষ, এখন তার ইস্কুলের কাজ বেড়ে গেছে; আর তার একটা বই পড়বার বাতিক দাঁড়িয়ে গেছে। কাজেই তার অবসর বড় কম। তাই স্ত্রীর ফরমায়েস তাকে ক্রমে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললো। আর দেখা গেল যে, সে নির্ব্বিবাদে সব ফরমায়েস খাটে ব'লেই ফরমায়েসের বহর দিনে দিনে বিষম বেড়ে চ'ললো।

এই সময়ে রবীন মাষ্টার বাড়ীতে ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ ক'রলে। সকালে সন্ধ্যায় সব সময়েই তার কাছে একদল না একদল ছেলে আসেই।

এতে একটা সুবিধা হ'ল এই যে, ছেলেরা অনেক সময় ফরমায়েস খাটতে লাগলো। দশের লাঠি একের বোঝা! কাজেই ছেলেদের কারও খাটুনি গায় লাগে না, তারা মনের আনন্দে নিস্তারিণীর হুকুম তামিল করে। রবীন মাষ্টারের হাড়টায় এতে একটু বাতাস লাগলো।

কিন্তু কাজও বেড়ে গেল।

সতেরো বছর পার না হ'তেই নিস্তারিণী তিনটি পুত্র-কন্যা প্রসব ক'রলেন। প্রত্যেকটির সঙ্গে সঙ্গে

এলো লম্বা কাজের ফর্দ। আরও অনেক জটিলতার সৃষ্টি হ'ল।

ছেলে হবার পর তাদের মানুষ করা নিয়ে একটা সংগ্রাম ঘনীভূত হ'য়ে উঠলো। নিস্তারিণীর ছেলে মানুষ করবার পদ্ধতি খুব সহজ এবং সংক্ষিপ্ত। সময়ে অসময়ে তাদেরকে খাবার দিয়ে বসিয়ে রাখা এবং অবসর সময়ে তাদের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করা। ইহার অতিরিক্ত কোনও কিছু প্রয়োজন সে অনুভব ক'রতো না।

ইস্কুল থেকে রবীন গোড়ায়ই শিক্ষা-পদ্ধতির কয়েকখানা বই আনিয়েছিল। সেই বই প'ড়ে সে আনিয়েছিল ফ্রেবেল ও পেষ্টালট্‌সির নিজের বই। তারপর সে প'ড়তে আরম্ভ ক'রেছিল সাইকলজির বই। ইতিহাস পড়ার ব'লে সে প'ড়তে লাগলো রাজ্যের ইতিহাসের বই। তারপর তার বই পড়বার বাতিক বেড়ে বেড়ে সোসিয়োলজি আর ইকনমিক্‌সে এসে জমে গেল। ছেলে হবার সম্ভাবনা হ'তেই সে নিজের পয়সা খরচ ক'রে আনালে শিশুপালন ও শিক্ষার দু'খানা বই।

সেই সব বই প'ড়ে প'ড়ে সে তার ছেলেদের মানুষ করবার পদ্ধতি মনে মনে ঠিক ক'রে তেমনি ক'রে ছেলেদের মানুষ ক'রবে স্থির ক'রলে। বলা বাহুল্য, সে পদ্ধতির সঙ্গে সময়ে অসময়ে মুড়ীর কাঠা সামনে দিয়ে বসিয়ে রাখা বা চপেটাঘাত করা একেবারেই খাপ খায় না।

এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে লাগলো বচসা। নিস্তারিণী স্পষ্ট ক'রে বলে দিলে, "অত শত আমি পারবো না—আমার ছেলে রাখা পছন্দ না হয়, নিজে কর সব—পোহাও এদের হাঙ্গামা, দু'দিন দেখি।"

কাজেই রবীন মাষ্টারকে নিজেই ছেলেদের ভার নিতে হ'ল। নিস্তারিণী ক'রলে সম্পূর্ণ নন্‌-কো-অপারেশন।

তিনটি ছেলে-পিলে যখন পাঁচটি হ'ল, আর তারপর বড় দু'টিকে যখন যমের হাতে তুলে দিতে হ'ল—তখন রবীন হাল ছেড়ে দিলে। ছেলেদের মানুষ করবার ভার থেকে সে ছুটি নিলে।

কিন্তু সে ছুটি নিতে চাইলে হয় কি? ছেলেগুলো স্বভাবতঃই তার নেওটা হ'য়ে উঠেছিল। মায়ের ধারে-কাছেও তারা যেতে চায় না। তাই কম্‌লি ছাড়লো না। আর নিস্তারিণীও এতদিন গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়িয়ে চট্‌ ক'রে ছেলেদের ঝক্কি নিজের ঘাড়ে নিতে মোটেই রাজী হ'লেন না। কাজেই রবীন যতই চেষ্টা করুক ছেলেদের হাঙ্গামা ছেড়ে তার কাজ ক'রতে—ছেলেরা তার ঘাড়ে রইলোই। যদি বা কখনও তারা তার কাঁধ ছাড়ে, অমনি দেখতে না দেখতে নিস্তারিণী তাদের কুড়িয়ে এনে রবীনের কাছে দিয়ে বলে, "বলি, এদের দু'টোকে রাখ না একটু—অস্থির ক'রে তুললে যে আমায়।"

নিস্তারিণীর কোনও দোষ নেই। সংসারের কাজ—ভারী ভারী কাজ, তরকারী কোটা, রান্না বাড়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, লেপা পোঁছা, কাঠ শুকোনো, ধান শুকোনো, এই সব গুরুতর কাজে সে সদা ব্যস্ত। ছেলে দেখবার সময় তার কোথায়? অথচ স্বামীটি তার বিবেচনায় কোনও কাজই করে না। শুধু ঘরে ব'সে নিরর্থক কতকগুলো বই পড়ে, গোটা কয়েক বাইরের ছেলে টেনে এনে হৈ চৈ ক'রে, আর টো টো ক'রে বেড়ায়, সব নেহাৎ বাজে কাজ! এমন নিকর্ম্মা মানুষ—ছেলেগুলো যদি ধরে তবু তো একটা কাজ হয়।

পঁচিশ বছর বয়স হ'তে না হ'তে নিস্তারিণীর শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেল। সে হ'য়ে গেল রীতিমত বুড়ী—অস্থিচর্ম্মসার, কালো—এবং অতিশয় খিটখিটে। খাটা-খুটি তার পক্ষে সম্ভব রইলো না, তাই রবীনকে ধ'রে আনতে হ'ল তার এক বিধবা দূর সম্পর্কের পিসতুতো বোন মাতঙ্গীকে।

তারপর নিস্তারিণী কাজে একেবারে ইস্তাফা দিল। যা পারে সে, তাও সে করে না। করবার দরকারই বা কি? মাতঙ্গী আছে। বিধবা মেয়ে, তিন কুলে তার কেউ নেই তারা ছাড়া—সে খাটবে। না খাটবে কেন? নইলে বিধবা হ'ল কেন?

বিধবা আত্মীয়া, যাদের খাবার-পরবার নেই তারা এই ক'রতেই তো আছে। ভগবান দয়া ক'রে এই বিধবাদের যদি না সৃষ্টি ক'রতেন তবে আমাদের সনাতন হিন্দু-সমাজ চ'লতোই না। এরা দাসীর মত খাটবে, অথচ মাইনে দিতে হবে না এদের, খাবে—সেও এক বেলা। কালে-ভদ্রে দু'চার আনা পয়সা যদি চায়—কি দরকার তাদের? পেলেই হয় তো অন্যায় কিছু ক'রে ব'সবে! খাও, ছেঁড়া-খোঁড়া যা পাও পর আর খেটে যাও—যেহেতু বিধাতা সমাজের প্রতি দয়া ক'রে তোমাদের এরই জন্যে বিধবা ক'রেছেন। পুরস্কার?—তোমাদের ত্যাগ, সেবা, নিষ্ঠা ও দেবীত্ব নিয়ে খাসা খাসা কবিতা লিখবো, প্রবন্ধ লিখবো!—আর কি চাও?

ঘরের কাজ করে মাতঙ্গী—বাইরের কাজ, ফুট-ফরমাস করবার জন্যে আছে রবীন মাষ্টার, আর তার ছাত্রগুলো! কাজেই এর পর নিস্তারিণীর গিন্নীপনা কেবল হুকুম করায় পর্য্যবসিত হ'ল। সকালে উঠে ঘরের দাওয়ায় ব'সে সে আরম্ভ করে চেঁচাতে, রাত-দুপুরে তার বাইরের ফরমাস শেষ হয়। তারপর ফরমাস চলে একা রবীনের উপর সারারাত্রি—যখনি নিস্তারিণীর ঘুম ভাঙ্গে।—বেশ চলে।

বিয়ের পর কিছুদিন রবীন চেষ্টা ক'রেছিল নিস্তারিণীকে নিজের মনের মত ক'রে ছাঁচে ঢেলে মানুষ ক'রতে। অল্পদিন বাদেই সে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। ছেলেপিলে হবার পর সে চেষ্টা ক'রেছিল নিস্তারিণীকে ডিঙিয়ে ছেলে মানুষ ক'রতে—নিজের ইচ্ছা বহাল রাখতে। সে চেষ্টাও সে ছেড়ে দিয়েছিল। এখন সে হাল ছেড়ে লাঙুল গুটিয়ে প'ড়ে থাকে তার বাইরের ঘরে।—ইস্কুলে পড়ায়, ইস্কুলের দরকারে যতটা প্রয়োজন বাইরে ছুটাছুটি করে।—আর দিনরাত, যখনি ফাঁক পায় ব'সে ব'সে পড়ে।

যখন হেড মাষ্টারের কড়া শাসনে তার ছাত্রদেরকে ছেড়ে দিতে হ'ল, তখন হ'ল মহাবিপদ। রবীন মাষ্টার দেখলে তার ছুট্-ফটানি মিথ্যে, যত আইডিয়াই তার থাক, তা নিয়ে কাজ করা তার হবে না; পরকে মানুষ করবার ভার সে নিয়েছিল, কিন্তু সমাজের হুকুম হ'ল যে কেউ তার হাতে মানুষ হবে না। এখন সে করে কি?

অনেকগুলো আদর্শ নিয়ে সে কাজ আরম্ভ ক'রেছিল। তার ছোট দুনিয়াটাকে পারে তো রাতা-রাতি বদলে তার চেয়ে ভাল ক'রবে, এই পণ ক'রে অনেক কিছু কাজে সে হাত দিয়েছিল। সে সব কাজ একটি একটি ক'রে তার হাত-ছাড়া হ'য়ে গেল। কচ্ছপ যেন সব ক'টি পা বের ক'রে চলছিল, এক একটি পায় ঠোকা খেয়ে সে গুটিয়ে নিলে সেগুলো ক্রমে তার খোলসের ভিতর! চারিদিকে রবীন হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে ছিল, সবগুলি গুটিয়ে নিয়ে সে আপনার ভিতর আপনি ঢুকে বসে রইলো।

বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক তার মিটে গেল, তাই তার কর্ম্ম-পিপাসা ছড়িয়ে প'ড়লো অন্তর জগতে।

যখন ইস্কুল খোলে সে, তখন থেকেই সে প'ড়তে আরম্ভ করেছিল। তার প্রয়োজন অনুসারে প'ড়তে প'ড়তে তার পড়ার ক্ষেত্রটা প্রয়োজন ছাড়িয়ে অনেক বেশী দূর প্রসারিত হ'য়ে প'ড়েছিলো।

তাই যখন তার বাইরের কাজ ঘুচে গেল তখন সে লাগলো প'ড়তে। সমস্ত দিন সে প'ড়ে থাকে তার ঘরে, আর ব'সে ব'সে পড়ে। তিরিশ থেকে বাড়তে বাড়তে তার মাইনে হ'ল চল্লিশ টাকা। তাতে খোরাক পোষাক চলাই ভার—চলে যে, সে কেবল দু'চারখানা ক্ষেত আছে ব'লে। তবু সে তারই ভিতর বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বই কিনতে লাগলো। বই কেনে বা ধার করে সে, আর নেহাৎ লোভে প'ড়লে এক আধখানা চুরিও যে না করে তা নয়। আর দিনরাত সে প'ড়ে থাকে সেই বই নিয়ে।

থাকে না—থাকতে চায়, কিন্তু পারে না। কেন না বাইরের হাঙ্গামা মিটে গেলেও তার ঘরের হাঙ্গামাটি পূর্ণ-গৌরবে বর্ত্তমান ছিল। যতদিন ছেলেরা বাড়ীতে

আসতো ততদিন হাঙ্গামার বেশীর ভাগ পড়তো তাদের উপর—এখন রইলো শুধু রবীন নিজে।

তাই স্ত্রীর ফরমায়েসে সে বেশীর ভাগ সময় ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে থাকে—যেটুকু সময় পায় সে পড়ে।

ওই যে ঘরের মধ্যে গোঁজ হ'য়ে দিনরাত হাত পা ভেঙ্গে নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে পড়ে থাকা এটা—কাজের লোক নিস্তারিণী—দু' চক্ষে দেখতে পারে না। তাই সে প্রায়ই তাড়া ক'রে এসে রবীনকে শুনিয়ে যায় যে নিস্তারিণী সমস্ত সংসারের হাঙ্গামা মাথায় ক'রে যেখানে খেটে ম'রছে, সেখানে রবীনের এমনি একেবারে নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে লজ্জা করা উচিত!

একদিন এমনি তাড়া ক'রে এসে নিস্তারিণী দেখতে পেলে যে, রবীন পিয়নকে দুটো টাকা দিয়ে কি একটা জিনিষ নিলে। খুলে দেখে—ওমা — ছেঁড়া খোঁড়া পুরোনো দু'খানা বই।

পিত্ত জ্বলে গেল নিস্তারিণীর। কি কষ্টে যে সংসার চালায় সে সেই জানে, আর মিন্সে কি না সেই কষ্টের সংসারের টাকা এমনি ক'রে অপচয় করে—বই কিনে! কি না — পড়বে! কাজের মত কাজ ক'রবে না একটা—শুধু প'ড়বে!

এমন একটা লম্বা বক্তৃতা সেদিন হ'য়ে গেল যে, তাতে রবীনের জন্মের মত শিক্ষা হ'য়ে গেল। বই পড়া সে ছাড়তে পারলে না, কেনাও সে ছাড়লে না, কিন্তু সব ক'রতে লাগলো গোপনে।

তাই সে প্রতি ছুটিতে ক'লকাতা যায়, দোকানে দোকানে ঘুরে যতদূর পারে বই পড়ে আর সস্তায় ভাল বই পেলে সামান্য দু'চারখানা সে কিনে আনে—অতি গোপনে, যাতে নিস্তারিণী কিছুতেই জানতে না পারে।

পুরোনো বইয়ের দোকানে অনেক সময় অনেক ভালো ভালো বই থাকে। খুঁজে খুঁজে রবীন মাষ্টার সেগুলো বেছে নিয়ে প'ড়তে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে প'ড়েই যাচ্ছে। এমন অনেকদিন হ'য়েছে যে দোকানদার ধমকে উঠেছে, "সারা বইখানা এখানে দাঁড়িয়ে প'ড়বে বাবু? এখানে বই পড়বার জায়গা নয়।" মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে অমনি রবীন ভয়ে ভয়ে জিগ্‌গেস করে দাম কত। দাম শুনে মুখ কালি ক'রে বইখানা রেখে দেয়। আর একখানা টেনে নেয়, আর দুই চার খানা হাত ফিরিয়ে, এদিক ওদিক চেয়ে আবার সঙ্গোপনে সেই বইখানাই টেনে নেয়। তারপর তার সাধ্যের ভিতর অল্পদামের এক আধখানা বই কেনে। পরের দিন আবার যায়—এদিক ওদিক চেয়ে আবার সেই দামী বইখানা টেনে নেয়।—এমনি ক'রে পাঁচ সাতদিন ঘুরে সে একখানা বড় বড় বই শেষ ক'রে ফেলে। ঘরে ফিরে, যা প'ড়লো তার চুম্বক ক'রে রাখে।

বইয়ের দোকানে এমনি ঘুরে ঘুরে তার কত যে নাকাল হ'তে হ'য়েছে তার সীমা নেই। তবু এমন তার বই-ক্ষেপামী যে, সে সেখানে না গিয়ে পারে না। এর জন্যে ঘরে খায় বকুনি, বাইরের লোকে তাকে ঠাট্টা করে, পাগল বলে। ঘরে বাইরে কথা শুনে ভারী সঙ্কোচ হয় তার। সে পড়ে—গোপনে। লোকের সাড়া পেলে বই লুকোবার পথ পায় না—যেন কত বড় অপকর্ম্ম সে ক'রছে।

এত যে পড়ছে সে, এত শিখছে, অন্য লোকের হয় তো হ'ত দম্ভ, ক'রতো তারা বড়াই। রবীন মাষ্টার দম্ভ ক'রবে কি, ভয়েই সে সারা! প'ড়ে সে একটা দিগ্বিজয় ক'রছে এমন ধারণা তার ছিল না। ভারী পণ্ডিত হ'য়েছে সে, এ সন্দেহও তার মনে হয় নি কোনও দিন। পড়তো সে—শুধু না প'ড়ে পারতো না ব'লে। খিদে-তেষ্টার মত ছিল তার এই পাঠ-বুভুক্ষা। এতে ক'রে সে যে অন্য লোকের চাইতে বড় বা ভাল কিছু কাজ ক'রছে এ কথা ভাবতে পারতো না সে। ভাবতো, ক'রছে এমন একটা কাজ যা সবার বিচারে—পাগলামী, একটা নিদারুণ অকার্য্য—যেটা কোনও মতে চেপে রাখাটাই সুযুক্তি।

মান-ইজ্জত তার নেই ব'ললেই চলে। ঘরে নিস্তারিণী তাকে যা নয় তাই ব'লে বকে। বাঁদর,

কুকুর, ছাগল, জানোয়ার—এ সব তো তার নিত্য ব্যবহার্য্য বিশেষণ। গাল খেয়ে সে চুপ করে মাথা নীচু ক'রে—বেড়ায়। এমন—ঢোকে সেই তার পড়ার ঘরেই, আর লুকিয়ে লুকিয়ে সেই বই নিয়েই প'ড়তে বসে যার জন্য তার এত নাকাল।

ইস্কুলে হেড মাষ্টার তাকে উঠ্‌তে ব'সতে নাকাল করেন। ছেলেদের সামনে বকাবকি করেন। রবীন মাষ্টার মুখ নীচু ক'রে থাকে, হেড মাষ্টার স'রে গেলে সে হাসে—আর ছেলেদের পড়াতে আরম্ভ করে, যেন কিছুই হয় নি।

একদিন একটা কাণ্ড হ'য়েছিল।

সেবার ক'লকাতায় গিয়ে পুরোনো দোকানে এক আনায় একখানা ছেঁড়া বই পেয়ে সে কিনে ফেললে—সেখানা মার্কস্-এর কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টো। বইখানা প'ড়ে তার তাক লেগে গেল। বার বার প'ড়ে সেটা হজম করে ফেললে। এই বইয়ে মার্কস মানব সমাজের পরিণতির একটা সাধারণ ইতিহাস দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে যুগে যুগে লোকে ক্ষুধার তাড়নায় কেমন ক'রে দলাদলি ক'রে লড়াই ক'রতে ক'রতে সমাজ গঠনের প্রণালী, সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তন ক'রেছে।

প'ড়ে তার মনে হ'ল যে, ভারতের ইতিহাসের ধারাটা তা' হ'লে কি রকম হ'য়েছে? ভারতবর্ষের ইতিহাস তার পড়াতে হয়, তাই সে প'ড়েছে অনেক ইতিহাসের বই। যে বই সে পড়ায় তাতে মামুলী ভাবে যুগের পর যুগের কথা লেখা হ'য়েছে, ইতিহাসের বিবর্ত্তনের পরিচয় নেই কিছুই। সে ভেবে ভেবে নিজের মনে মার্কস্-এর ধারা অনুসারে ভারতের ইতিহাসের বিবর্ত্তন একটা গ'ড়ে ফেললে।

একদিন প্রথম শ্রেণীতে ইতিহাস পড়াতে গিয়ে সে ছেলেদের বোঝাতে আরম্ভ ক'রলে তার এই বিবর্ত্তনবাদ। বোঝাতে বোঝাতে অনেক নতুন কথা তার মনে এলো। বেড়েই চললো তার কাহিনী। এমনি ক'রে সে ঝাড়া একমাস ছেলেদেরকে ভারতের ইতিহাসের হিন্দু যুগের materialistic বিবর্ত্তন-ব্যাখ্যা ক'রে গেল। এক আধটা ছেলে বেশ বুঝলো, বেশীর ভাগই শুনে গেল, বেশী বুঝলো না।

একমাস বাদে একটি ছেলের বাবা ছেলেকে পড়াতে গিয়ে দেখলেন যে, এ এক মাসের মধ্যে হিষ্টরী বইয়ের এক পাতাও পড়ান হয় নি। 'কি পড়িয়েছে মাষ্টার?'—এ কথা ছেলেকে যখন জিজ্ঞেস ক'রলে, তখন সে বুদ্ধিমান ছেলে বললে, তিনি খালি বলেন "thesis, antithesis, synthesis" সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে এই তিনটে কথাই তার মনে ছিল। বাবা তো চটে লাল। বুঝলেন রবীন মাষ্টার ডাহা ফাঁকি দিচ্ছে। তিনি এফ্-এ ফেল, ভুবনবাবুর সদর নায়েব। হিষ্টরী তাঁর পড়া আছে—তার ভিতর এ তিনটে কথার একটাও তিনি কোনও দিন শোনেন নি।

তেড়ে মেরে তিনি হেড মাষ্টারের কাছে গেলেন।

হেড মাষ্টার একখানা খাতা ক'রেছিলেন, তার ভিতর কোন দিন কোন মাষ্টার কোন্ বইয়ের ক' পাতা পড়ালেন তা লেখবার নিয়ম ছিল। জানা ছিল, রোজ হেড মাষ্টার দেখবেন সে খাতা, কিন্তু তিনি দেখতেন না মোটেই। এখন সদর নায়েববাবুর এই আক্রমণের ফলে খাতাখানা টেনে নিয়ে দেখে তাঁর চক্ষু স্থির।—এ একমাস রবীন মাষ্টার লিখেছেন শুধু "general lecture."

খেলে যা! এক মাস বাদে কোয়াটারলি। তাতে সমস্ত হিন্দু পিরিয়ডের পরীক্ষা হবে। এতদিন এক পাতাও বই প'ড়লে না ছেলেরা!

রবীন মাষ্টারের তলব হ'ল। হেড মাষ্টারবাবু তাকে এমন ঝাড়ন ঝেড়ে দিলেন যে, অন্য মাষ্টার হ'লে না খেতে পেলেও চাকরী ছেড়ে দিত। রবীন মাষ্টার শুধু মুখ কালির মত ক'রে ক্লাসে গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ এইবারে অশোকের চ্যাপ্টার—অশোক হলেন কে? চন্দ্রগুপ্তের ছেলে বিন্দুসার, তার ছেলে অশোক"—ইত্যাদি। Materialistic interpretation of Indian History ক্লাসে আর শোনা গেল না।

ফল কথা, অপমান হজম করবার অসামান্য শক্তি

ছিল এই লোকটার। খুব বেশী অপমান হ'লে সে মাথা নীচু ক'রে ঢোকে গিয়ে তার বইয়ের ঘরে. আর সেখানে প'ড়তে বসে। প'ড়তে প'ড়তে সব ভুলে যায়।

এমনি দিন যায় তার। দিন যেতে যেতে তার চুলগুলো পেকে উঠলো বারো আনা, দাড়ি গোঁফ পাকলো আট আনা রকমের। সেগুলিতে চিরুণী লাগাবার কোন বালাই ছিল না, নাপিতেরও হাত প'ড়তো না ন' মাসে ছ'মাসে। পরণের কাপড় তার একে খাটো তার দারুণ ময়লা! জামা প্রায় থাকতো না—স্কুলে যাবার সময় প'রে যেত একটা চেক ছিটের পিরাণ, তার অর্দ্ধেক বোতাম থাকতো না, আর কাঁধে ফেলে যেত পাট ক'রে ভাঁজ করা একখানা চাদর যা ধোপার ঘর ছ'মাস দেখে নি। চটী জুতো একজোড়া কখনও থাকতো কখনও থাকতো না—পেটেও ভাত যে সব দিন নিয়ম ক'রে থাকতো এমন নয়, কেন না নিস্তারিণীর অনেক দিনই রান্নার দেরী হয়ে যেত—সেদিন না খেয়েই বেরুতে হ'ত।

দিনে দিনে খ্যাতি তার বেড়েই গেলো। দশ বিশখানা গ্রামের যে কেউ তাকে দেখলেই এক ডাকে বলে দিতে পারতো, এ সেই পাগলা মাষ্টার!

অনেক বছর আগে যে এই পাগলা মাষ্টারই এই ইস্কুল গ'ড়ে তুলেছিল, সে কথা যারা জানতো তারা কতক গেছে ম'রে, বাদ বাকী লোকে গেছে ভুলে। এখন সবাই জানে যে সে হ'ল চিরন্তন থার্ড মাষ্টার—এবং চিরদিনের পাগল।

(ক্রমশঃ)

অনেক পাঠক-পাঠিকা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—'রোহিণীকে মারিয়া ফেলা হইল কেন?' অনেক সময় উত্তর দিতে বাধ্য হইয়াছি, 'আমার ঘাট হইয়াছে।' কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যাসমূহের ব্যাখ্যামাত্র। একথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্মৃত হইয়া, কেবল গল্পের অনুরোধেই পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এসকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধ্য হই।

—বঙ্কিমচন্দ্র

বিহারীলাল

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্‌.এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ্‌-আর-ই-এস্‌

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'প্রেমপ্রবাহিনী', ১৮৭০

এখানিও 'বন্ধুবিয়োগে'র ন্যায় পয়ার ছন্দে রচিত। ইহার কিয়দংশ 'প্রেমবৈচিত্র্য' নামে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে 'পূর্ণিমা' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয় এবং 'পতন' শীর্ষক প্রথম কবিতাটি ১২৭৪ সালে (১৮৬৭ খৃঃ) 'অবোধ-বন্ধু'তে প্রকটিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 'প্রেমপ্রবাহিনী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রের স্বত্বাধিকারী কৃষ্ণগোপাল দত্তের নামে এই গ্রন্থ উৎসৃষ্ট হয়। কৃষ্ণগোপাল কাব্যানুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার মুদ্রাযন্ত্রেই বন্ধু বিহারীলালের অধিকাংশ পুস্তক মুদ্রিত হয়।

বিহারীলালের যৌবনকালে রচিত অন্যান্য কাব্যগুলির ন্যায় ইহাতেও সাহিত্যে অমরতা লাভের উপযুক্ত গুণের বিকাশ দেখা যায় না।

> এই আমি অন্ধকারে করিতেছি রব,
> একদিন এই আমি, আমি নাহি রব।
> চলে যাব সেই অনাবিষ্কৃত দেশ,
> হয় নাই যার কোন কিছুই নির্দ্দেশ ;
> অদ্যাবধি কোন যাত্রী যার সীমা হ'তে,
> ফিরিয়া আসে নি পুন আর এ জগতে।

ইত্যাদি পদে ইংরাজী বোট্‌কা গন্ধ প্রবলভাবে বিদ্যমান — হউক উহা সেক্সপীয়রের অমর কাব্য হইতে গৃহীত।

কোন কোন পদ যথা—

> কিছুতেই যখন তোমারে না পেলেম,
> একেবারে আমি যেন কি হয়ে গেলেম।

প্রভৃতি পদ্যই নহে।

তথাপি ইহার স্থানে স্থানে উচ্চ ভাব আছে, এবং এক একটি শ্লোকে 'সারদামঙ্গলে'র ভবিষ্যৎ কবির আবির্ভাবসূচনা দেখা যায়, যথা—

> সূর্য্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ,
> এরা নয় জগতের দীপ্তির কারণ,
> প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয়,
> তাইতো প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয়!

পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গ ও বৈষয়িক কার্য্য পরিচালনা

এই সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ কবির পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি একমনে বাণীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, বৈষয়িক কোনও কার্য্যে লিপ্ত হন নাই। যৌবনে 'নিসর্গসন্দর্শনে'র অন্তর্গত 'চিন্তা' শীর্ষক একটি কবিতায় তিনি লিখিয়াছিলেন—

> দুই গতি আছে এই কুটিল সংসারে ;
> হয় তুমি তেজোমান দিয়া বলিদান,
> পড়গে কোমর বেঁধে টাকার বাজারে,
> নয় ব'সে ঘরে পরে হও অপমান।
> হা ধিক হা ধিক! আমি স'ব না কখন,
> অপদার্থ অসারের মুখ বেঁকা লাগি,
> করে প্রিয় পরিবার করুক ক্রন্দন
> শুনে যদি ফেটে যায় ফেটে যাক্‌ ছাতি।
> অয়ি সরস্বতি দেবি! ছেলে বেলা থেকে
> তব অনুরক্ত ভক্ত আমি চিরকাল,
> ভুলিব না কমলার কামরূপ দেখে,
> ভুগিতে প্রস্তুত আছি যেমন কপাল।

সত্য সত্যই কবি জীবনে এই সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্নেহের পিতাও

সারদাপ্রেমিক পুত্রের উপর সংসারের কোনও ভারার্পণ করেন নাই। বরঞ্চ তাঁহার সাধনায় যতদূর সাধ্য সুযোগ দিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আচার্য্য কৃষ্ণকমল-কথিত একটি ঘটনার উল্লেখ করি— "এই সময় মনিয়ার উইলিয়্যামস্ শকুন্তলার এক অপূর্ব্ব সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন; কালিদাসের শকুন্তলার প্রতি মুদ্রণকার্য্যে কেহ কখনও এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই; বইখানির দাম দিয়াছিল উনিশ টাকা; বিহারীদের যদিও অন্নকষ্ট ছিল না, তথাপি ১৯৲ টাকা দামের একখানি শকুন্তলা কিনেন, এরূপ সঙ্গতিপন্নও তাঁহারা ছিলেন না। বিহারী পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাই তাঁহার আব্দার অগ্রাহ্য হয় নাই; পিতা ১৯৲ টাকা দিয়া পুত্রকে শকুন্তলা কিনিয়া দিয়াছিলেন। আমিও অতি আনন্দের সহিত বিহারীর সঙ্গে সেই শকুন্তলা একত্রে পড়িলাম।"

এই অবাধ বাণীসেবা অধিক দিন চলিল না। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, যখন কবি 'সারদামঙ্গল' রচনা আরম্ভ করিলেন, সেই সময়েই তাঁহার পিতার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইল, এবং কবিকে কমলারও কৃপাপ্রার্থী হইতে হইল।

সৌভাগ্যবশতঃ কবির বাল্যবন্ধু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় তখন কাশ্মীর মহারাজের রাজস্ব-সচিব। তিনি কাশ্মীরজাত রেশমের ব্যবসায়ে দেশের আর্থিক উন্নতি সংসাধনে তখন যত্নবান। ঐ রেশম বাজারে প্রচলিত ও য়ুরোপে রপ্তানী করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ঐ উদ্দেশ্যে কলিকাতায় তিনি একটি কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বিহারীলালকে ঐ কার্য্যালয়ের সমস্ত ভার অর্পণ করেন। বিহারীলালের চেষ্টায় কাশ্মীরের রেশমের ব্যবসায় দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছিল এবং প্রতি সেরের মূল্য ১৩৲ হইতে ৪০৲ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিন চারি বৎসর প্রশংসনীয় সাধুতা ও উত্তম সহকারে এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া তিনি আত্মসম্মানের হানি ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিয়া ইহা পরিত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে এই উন্নতিশীল ব্যবসায়টিও উঠিয়া যায়।

'সারদামঙ্গলে'র রচনারম্ভ, ১৮৭০-৭৪

যখন বিহারীলাল এইরূপে কমলাকে প্রত্যাখ্যান করেন, সেই সময়েই 'সারদামঙ্গল' রচিত হয়। ১২৭৭ সালে (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) যখন প্রথমা পত্নী-স্মৃতি-সম্বলিত 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্য মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল তখনই 'সারদামঙ্গলে'র রচনা আরম্ভ হয়, এবং অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে। ১২৮১ সালে ভাদ্র হইতে

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ

পৌষ মাস পর্য্যন্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র 'আর্য্যদর্শনে' সেই অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই 'সারদামঙ্গল' প্রকাশিত হয়। উহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কবির পিতা কাশ রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। অবশেষে এই রোগেই তিনি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৬৪ বৎসর বয়সে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। বিহারীলালের কাব্য রচনা স্থগিত রহিল। তিনি পিতার পৌরোহিত্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। ধনী সুবর্ণবণিককুলের পৌরোহিত্য করিয়া তিনি মাসে মাসে ২০০।২৫০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

'ভারতী'

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তদীয় অনুজ-অনুজা ও বন্ধুগণকে লইয়া 'ভারতী' নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। অনুমান ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুমেলার সুকবি বিহারীলালের সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম আলাপ হয় এবং এই আলাপ প্রগাঢ় সখ্যে পরিণত হয়। উভয়ে একত্রে কাব্যা-

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
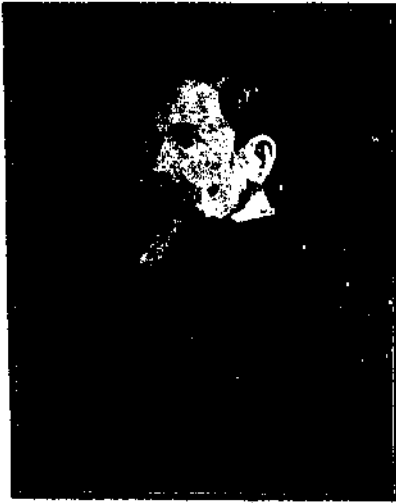
লোচনা করিতেন। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' ও দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' রচনাকালে কবিদ্বয় নিজ নিজ রচনা পরস্পরকে শুনাইয়া আনন্দ অনুভব করিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুজদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় 'ভারতী'র প্রকাশারম্ভ হইতে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তদীয় জীবন-স্মৃতিতে বলিয়াছেন—

"'ভারতী' প্রকাশ হইতেই আমাদের আর একজন বন্ধুলাভ হইল। ইনি কবিবর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। আগে তিনি বড় দাদার কাছে কখন কখনও আসিতেন, কিন্তু আমার সঙ্গে তেমন আলাপ ছিল না। এখন 'ভারতী'র জন্য লেখা আদায় করিবার জন্য আমরা প্রায়ই তাঁহার বাড়ী যাইতাম এবং এই সূত্রে তিনিও আমাদের বাড়ী আরও ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত একজন খাঁটি কবি। সর্ব্বদাই তিনি ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। একটা ডাবা হুঁকা টানিতে টানিতে তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করিতেন। যখন কোনও সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা হইত, অথবা কোনও গভীর বিষয় চিন্তা করিতেন, তখন তামাক টানিতে টানিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি বুজিয়া আসিত, তিনি আত্মহারা হইয়া যাইতেন। আমাদের বাড়ী যখনই আসিতেন, তখনই তিনি আমায় বেহালা বাজাইতে বলিতেন। আমি বাজাইতাম আর তিনি তন্ময় হইয়া শুনিতেন।"

কবির আদর কেবল ঠাকুর পরিবারের বহির্বাটীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্তঃপুরিকাগণের

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী কাদম্বরী দেবী

মধ্যেও কবির অনেক ভক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের সহধর্ম্মিণী কাদম্বরী দেবী সর্ব্বপ্রধানা। রবীন্দ্র-নাথ তদীয় জীবন-স্মৃতিতে বলিয়াছেন—

"এই সময়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল'-সঙ্গীত 'আর্য্যদর্শন' পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৌঠাকুরাণী এই কাব্যের মাধুর্য্যে অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন এবং নিজ হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একখানি আসন দিয়াছিলেন।

এই সূত্রে কবির সঙ্গে আমারও বেশ একটু পরিচয় হইয়া গেল। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দিনে দুপুরে যখন তখন তাঁহার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাঁহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত। তাঁহার মনের চারিদিক্ ঘেরিয়া কবিত্বের একটি রশ্মিমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিত — তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল। তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যখনি তাঁহার কাছে গিয়াছি সেই আনন্দের হাওয়া খাইয়া আসিয়াছি। তাঁহার তেতলার নিভৃত ছোট ঘরটাতে পঙ্খের কাজ করা মেঝের উপর উপুড় হইয়া গুন্ গুন্ আবৃত্তি করিতে করিতে মধ্যাহ্নে তিনি কবিতা লিখিতেছেন, এমন অবস্থায় অনেক দিন তাঁহার ঘরে গিয়াছি — আমি বালক হইলেও এমন একটা উদার হৃদ্যতার সঙ্গে তিনি আমাকে আহ্বান করিয়া লইতেন যে, মনে লেশমাত্র সঙ্কোচ থাকিত না। তাহার পরে ভাবে বিভোর হইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন, গলায় যে তাঁহার খুব বেশী সুর ছিল তাহা নহে, একেবারে বেসুরাও তিনি ছিলেন না—যে সুরটা গাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাজ পাওয়া যাইত। গম্ভীর গদগদ কণ্ঠে চোখ বুজিয়া গান গাহিতেন, সুরে যাহা পৌঁছিত না, ভাবে তাহা ভরিয়া তুলিতেন। তাঁহার কণ্ঠের সেই গানগুলি এখনো মনে পড়ে—

'বালা খেলা করে চাঁদের কিরণে,'
'কে রে বালা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে বিহরে।'

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (যৌবনে)

তাঁহার গানে সুর বসাইয়া আমিও তাঁহাকে কখনো কখনো শুনাইতে যাইতাম।"

'ভারতী'তে প্রকাশিত বিহারীলালের কবিতায় মধ্যে মায়াদেবী, দেবরাণী এবং প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা সঙ্গীতত্রয় উল্লেখযোগ্য। মায়াদেবীর প্রথম ৩টি শ্লোক কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশের রচনা।

(ক্রমশঃ)

সন্ধ্যায়

শ্রীকালিদাস রায়

সূর্য্য গেল অস্তাচলে জীবনের শতদলে
খ'সে গেল একটি পাপড়ি,
দিনের মরণ এসে রক্ত গোধূলির বেশে
একটি দিবস নিল হরি'।
সন্ধ্যায় এমনি ক'রে সবগুলি গেছে ঝ'রে,
একে একে প্রাণবৃন্ত হ'তে,
বাকী বেশি নাই আর একে একে খসিবার,
ভাসিবে তারাও কাল স্রোতে,
বৃন্ত হয়ে দলহারা কিছুদিন র'বে খাড়া
স্মৃতিরূপে বান্ধবের মনে,
প'চে গ'লে তারপরে ডুবে যাবে চিরতরে
চিহ্ন আর র'বে না ভুবনে।

বাঁচা মানে ধীরে মরা ফোটা মানে ঝ'রে পড়া
এইত জীবন হায় হায়,
বয়সেতে হই বড় এ জীবন হ্রস্বতর
হয় তত প্রত্যেক সন্ধ্যায়।

পদ্মবনে করি কেলি পদ্মে পদ্মে পদ ফেলি
হে প্রভু করিছ বিহরণ,
কৃপা করি একবার জীর্ণ-শীর্ণ-দলদার
এ জীবনে ছোঁয়াও চরণ।
যেই ক'টি গেছে গ'লে যাক তারা যাক চ'লে,
ছিল তারা শোভাগন্ধহীন,
যেই ক'টি আছে বাকী তোমার করুণা মাখি
হোক তারা সুরভি নবীন।
আজি এ সন্ধ্যায়, হরি, শোন শোন কৃপা করি,
আকিঞ্চনময়ী এ পূরবী,—
বাকী এই ক'টি দল ঝ'রে যেন ও চঞ্চল
কালস্রোতে বিতরে সুরভি।

উমাচরণের কবিতা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অল্প-বয়সে যদি কাহারো কবিতা-লেখার খেয়াল জাগে, তাহা হইলে সে-খেয়ালের যাহোক একটা অর্থ বুঝা যায়! কিন্তু বয়স পঁয়তাল্লিশের কোঠা পার হইবার পর ও-খেয়াল জাগিলে চিকিৎসার প্রয়োজন ঘটে!

পঞ্চাশের কাছাকাছি উমাচরণকে যখন দেখিলাম কবিতা লিখিতে এবং সে-কবিতা নিত্য-নিয়মিত মাসিক পত্রে ছাপাইবার দিকে সে দারুণ উদ্যোগী, তখন আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না!

বিস্ময়ের অনেক কারণ ছিল। যথা, ওকালতি-ব্যবসায়ে উমাচরণের পশার-প্রতিপত্তি এবং অর্থ প্রচুর। মক্কেলের কাজ সে করিত পুরা-দমে এবং পুরা ফী লইয়া। বেগার খাটিবার দুর্বুদ্ধি বা অবসর—দু'টার কোনোটার সে ধার ধারিত না! চোখের জল বা অন্ত 'সেন্টিমেন্ট'-গুলাকে সে বলিত, পুরুষের সাজে না!

আমাদের সঙ্গে সখ্য শৈশব হইতে। খেলা-ধূলায় এক কালে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে—সে কিন্তু ওকালতিতে পশার জমিবার পূর্ব্বে। মক্কেল এবং পয়সা আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজের চারিদিকে এমন কঠিন গণ্ডি সে রচিয়া তুলিল যে, ব্রীজের আড্ডা, গানের আসর, বাগানবাড়ীর পার্টি—সব জায়গাতেই সে হইল দুর্লভ! লোক-লৌকিকতার দিকেও সম্পূর্ণ উদাসীন!

লোক-লৌকিকতায় সচেতন থাকিবার প্রয়োজন ছিল না! চার-পাঁচ বৎসর প্রাক্টিশ করিয়াছে, এমন সময় জীবনের পথ হইতে স্ত্রীটি সরিয়া পড়িল! সেদিকে যেন তার লক্ষ্য রহিল না! মক্কেলের মামলা-মকর্দ্দমায় এমন তন্ময় যে, তার বন্ধুর দল আমরা তাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম! ভাবিলাম, মক্কেলের দাপে লোকটা স্নেহ-মায়া বিসর্জ্জন দিয়া অর্থেরই সাধক বনিয়া গিয়াছে!

পয়সার সাধনায় মানুষ কতখানি অধঃপাতে যাইতে পারে, উমাচরণ তার জাজ্বল্য প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইল! সে-সাধনার তলে চাপা পড়িয়া গেল তার সংসার, তার সারা পৃথিবী!

উমাচরণের কথা লইয়া আমরা বলিতাম, স্ত্রীর শোকে, হয়, লোকটার মন একদম মরিয়া গিয়াছে—নয়, ও-মন পাথরে তৈরী! তাহাতে স্নেহ নাই, মায়া নাই, প্রেম নাই! শিরায় রক্তও বুঝি নাই! প্রাণটা কোনোমতে বহিয়া চলিয়াছে আইনের 'সেক্শন' আর রাজ্যের নজীর ধরিয়া।

দেখাশুনা কি হইত না? হইত। সে দেখাশুনায় কথার কোনো অবকাশ ছিল না। হয়তো সে মকর্দ্দমার সূত্র রচনা করিতেছে, নয় আইনের মোটা কেতাব পাড়িয়া তাহার আড়ালে নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে!

দয়া-দাক্ষিণ্য ছিল। কেহ গিয়া হাত পাতিলে নিরাশ হইয়া ফিরিত না—তা সে মেয়ের শ্বশুর-বাড়ীতে তত্ত্ব পাঠানোর খরচ হোক, কিম্বা লটারীর টিকিট বিক্রয় হোক! গৃহে ছিল একরাশ জ্ঞাতি-কুটুম! তাদের বরাত! উমাচরণের পয়সায় যে আরাম-আয়াস তারা ভোগ করিত, সরকারী পেন্সনেও তেমন আরাম মিলে না!...

দু'চারিটা ঘটক পিছনে লাগিয়াছিল—স্ত্রী-বিয়োগের অব্যবহিত পরক্ষণে। কিন্তু পাত্তা না পাইয়া তারা সরিয়া পড়িল। উমাচরণের কাছে কথাটা পাড়িবার তারা সুযোগ পাইত না। যদি-বা ধৈর্য্যের পাহাড়ে বসিয়া সে-সুযোগ আয়ত্ত করিয়া এ-কথা তুলিত, উমাচরণ মামলার কাগজ-পত্র হইতে চোখ তুলিয়া সুগভীর মনোযোগে ঘটকের পানে চাহিয়া থাকিত পাঁচ মিনিট—সাত মিনিট—দশ মিনিট। উমাচরণ বলিত,—কি মকর্দ্দমা? কাগজ-পত্র এনেচো?

ঘটক নিশ্বাস ফেলিয়া জানাইত, মকর্দ্দমা নয়। সে

ঘটক—আসিয়াছে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া! হাসিয়া উমাচরণ জবাব দিত,—বিবাহ! তা মন্দ হয় না! কিন্তু সময় কৈ?

ছোট্ট জবাব! জবাবের পর আবার সেই মামলার কাগজ-পত্র, নয় নজীরের কেতাব! ঘটকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত।

মামলার চর্চ্চায় তার মন এমন রূপ ধরিয়াছিল যে, কোনো বিষয়ে মতামত দিতে সে চিন্তা করিত অত্যুগ্র-রকম—এবং যে-মত দিত, একেবারে অটল, পাকা!—খবর রাখিত সে অনেক বেশী। কথা যা বলিত, নিজের ব্যক্তিত্ব বাদ দিয়া!

এমনি করিয়া দিনে দিনে আমাদের প্রাণের কাছ হইতে ক্রমে সে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। তার কাছে আমরা গিয়া পৌঁছিব, সাধ্য ছিল না। তার চারিদিকে আইনের পাঁচিল!

প্রায় বিশ বৎসর পরের কথা বলিতেছি। বিশ-বৎসরের মধ্যে এমন কোনো ঘটনা ঘটে নাই উমা-চরণকে লইয়া—যে-ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন।

বড়দিনের মরশুম। সহর সরগরম।

তখন সন্ধ্যা। মাঘ মাসের কাগজ বাহির হইবে—একরাশ প্রুফ লইয়া হিমসিম্ খাইতেছি। প্রুফটা সন্তোষবাবুর লেখা গল্পের। কম্পোজিটাররা তাঁর হাতের লেখা পড়িতে পারে না। অক্ষর ছোট—লেখার ভঙ্গী এমন দ্রুত যে, আমরা তাঁকে তামাসা করিয়া বলি,—আপনি লেখেন? না, কতকগুলো পিঁপড়েকে দোয়াতে ফেলে পর-মুহূর্ত্তে দোয়াত থেকে তুলে সাদা কাগজের উপর ছেড়ে দেন?

তাঁর লেখা গল্প নহিলে কাগজ চলে না—তাই। নহিলে এ লেখা কোনো কাগজ ছাপিত না!

পাঠক-পাঠিকা তাঁর গল্প পড়িয়া খুশী হন। তাঁরা তো জানেন না, কি-কষ্টে সে-লেখা ছাপার হরফে তুলিয়া আমাদের সাজাইতে হয়!

সেই লেখার প্রুফ দেখিতেছি, হঠাৎ উমাচরণ আসিয়া হাজির। আমার বিস্ময়ের সীমা নাই! কহিলাম—উমাচরণ···

উমাচরণ কহিল,—হাঁ!

—মক্কেলরা ছাড়লো যে!

উমাচরণ একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল, হাসিয়া কহিল—না! একটু অবসর না নিলে আর চলছে না!

আমি কহিলাম—অবসরের সৌভাগ্য···

উমাচরণ ঘরটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।—তারপর কহিল—তাতে কি? কাগজ?

কহিলাম—হ্যাঁ।

উমাচরণ কহিল—কাগজ থেকে আয় বেশ হয় তো? মানে, এই থেকেই খরচ-পত্র চলে?

আমি কহিলাম—টেনে-টুনে। আজকাল যে দিন-কাল পড়েচে। লোকে খেতে পাচ্ছে না—তা কাগজ পড়বে!

উমাচরণ কহিল—তোমার কাগজের নাম না 'মন্দানিল'?

আমি কহিলাম—হাঁ।

উমাচরণ কহিল—আমার ভাগ্নে শিবচরণ বল-ছিল, 'মন্দানিল' কাগজটাই সেরা কাগজ। তাকে জিজ্ঞাসা করছিলুম। সে তোমার নাম করলে। বললে—তুমিই মালিক, তুমিই সম্পাদক। তুমি যে ভালো লিখিয়ে হবে, আমি তা জানতুম! কলেজে থাকতেই তো তোমার কবিতার বই ছাপা হয়। কি সে বইটার নাম?

আমি কহিলাম 'যজ্ঞানল'।

—হাঁ, হাঁ। আমাকে একখানা বই দিয়েছিলে না?···দু'চার পাতা যেন পড়েছিলুম।···তা, আমায় এক ব্যাধিকে পেয়েচে ভাই।

—ব্যাধি!

সবিস্ময়ে উমাচরণের পানে চাহিলাম।

একটু থামিয়া উমাচরণ কহিল,—Blood-pressure-এর লক্ষণ হয়েছিল। ডাক্তার বললে একটু rest

নিতে। তাই এই ছুটিটায় মামলা-মকর্দ্দমার চিন্তা স্থগিত রেখেছি।···কিন্তু কিছু করা চাই তো। তাই···

উমাচরণ পকেটে হাত ঢুকাইল। আমার কৌতূহলের অন্ত রহিল না। সাগ্রহ দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিলাম। পকেট হইতে ক'খানা কাগজ বাহির করিয়া উমাচরণ কহিল—কবিতা লিখেছি।··· ভাবলুম, যখন লিখেছি, তখন ছাপতে দিই। Idle thoughts—তবু বাক্স বন্ধ করে তার সার্থকতা নষ্ট করি কেন? শিবচরণকে জিজ্ঞাসা করছিলুম—কোন্ মাসিক-পত্র ভালো? তোমার কাগজের নাম করলে। তোমার নাম শুনেই তোমার কাছে এলুম।··· নেহাৎ ছাপার অযোগ্য হবে না বোধ হয়।

উমাচরণ — পাথর-পুরীর উমাচরণ! সে কবিতা লিখিয়াছে! হাসিব, না কাঁদিব? কি করিব,—বুঝিতে পারিলাম না। কহিলাম—আইনের উপর কবিতা?

কথাটায় উমাচরণ যেন একটু মুষড়াইল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল—না। পড়ে দ্যাখো···

কবিতার কাগজ লইয়া পড়িলাম। উমাচরণ লিখিয়াছে—

> শশধরে দেখি আজ গগনের পথে—
> উদাস পাণ্ডুর মুখ, হিম-ভরা আঁখি!
> নদী বহে কুলুকুলু বিষাদে করুণ,—
> কাননে মলিন ফুল,—গাহে নাকো পাখী!

সম্পাদকী করিয়া কবিতা-সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। গ্রীকের পাহাড়ে বসিয়া গ্রীক সরাইয়া উমাচরণকে এই কবিতা লিখিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। এ কবিতা লিখিবার বয়স তার গিয়াছে — বহুকাল! এ কবিতা লেখে কলেজের থার্ড-ইয়ার, ফোর্থ-ইয়ারের তরুণ ছাত্র—অবশ্য ছন্দ পালটাইয়া! উমাচরণ হঠাৎ···

উমাচরণ আমার পানে চাহিয়াছিল পরম আগ্রহে! কবিতা পড়া শেষ হইলে তার পানে চাহিলাম। উমাচরণ কহিল—ছাপা চলবে?

বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! আর কেহ এ কবিতা লিখিয়া পাঠাইলে দু'লাইনের বেশী পড়িবার প্রয়োজন হইত না। তৎক্ষণাৎ 'অমনোনীত' ছাপ আঁটিয়া ফেলিয়া দিতাম! কিন্তু রায় উমাচরণ মিত্র বাহাদুর, নামজাদা এ্যাডভোকেট — তার উপর বাল্য-বন্ধু উমাচরণ!···একটা ঢোক গিলিয়া কহিলাম, —এ-মাসের কাগজেই দিয়ে দেবো!

উমাচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—জীবনটা কেমন যেন মিছে মনে হচ্ছে! এত পয়সা রোজগার করচি,—তবু কোনো সুখ নেই। ভাবি, সারা জীবন কি করলুম! নিঃসঙ্গ—একা! মুখের পানে চায়, এমন কাকেও দেখচি নে···! ভারী ফাঁকা! বাঁচি-মরি, কারো তাতে কিছু এসে যায় না!

দুঃখ কোথায়—বুঝিলাম। দশ বৎসরে প্রায় বিশ-পঁচিশ টাকার লেখকের লেখা মনস্তত্ত্ব ঘাঁটিয়াছি! তবু যথাসাধ্য মনের রাশ বাগাইয়া ধরিয়া কহিলাম—কেন! ভাগ্নে, ভাইপো, ভাইঝী···এত লোক বাড়ীতে···

উমাচরণ আর একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া কহিল,—পয়সায় কোনো আরাম নেই। সুখও নেই!

আমি কহিলাম,—তখন যদি বিয়ে করতে!··· একটি স্ত্রী···মনকে কতখানি যে ভরে রাখে! আমরা তো বুঝচি! এই যে শান্তিতে কাজ-কর্ম্ম করচি, জীবনে যুদ্ধ করে করে চলেছি নানা বাধা, নানা বিপত্তির সঙ্গে —দমচি না—এ শুধু স্ত্রীর কল্যাণে!

উমাচরণ কহিল,—হুঁ! কিন্তু এখন তো বিয়ে করা চলে না। বয়স খুব বেশী হয়ে গেছে। লোকে হাসবে। তা ছাড়া আমার মনের মত কিশোরী স্ত্রী পাবো কেন?···ডাক্তারের কথায় বিশ্রাম নিতে বসে হঠাৎ কাল আকাশের পানে নজর পড়লো। আকাশে দেখি, সেই চাঁদ! চাঁদের কথা মন থেকে মুছে গিয়েছিল! দুনিয়ায় মক্কেল আর মামলা ছাড়া যে আর কিছু আছে, তাও ভুলে গেছলুম। মানুষের অস্তিত্ব মনে জাগতো না! মানুষ দেখলে ভাবতুম, মক্কেল, নয় সাক্ষী, নয় হাকিম-পেয়াদা! এমন দশা কখনো

কল্পনা করেচো? অতীত দিনগুলোর পথে মনকে নিয়ে ফিরছিলুম—যেন ভূতের মত। সব অস্পষ্ট! আবছায়া! ফাঁকা!

উমাচরণ চুপ করিল। তার পানে চাহিয়াছিলাম, বুকে আঘাত বাজিল। সম্পাদকী গদিতে বসিয়া যে মনস্তত্ব ঘাঁটিয়াছি, তা সত্য নয়……এ একেবারে প্রত্যক্ষ সত্য! কহিলাম,—বিয়ে করলে হয়তো যোগ্যা স্ত্রী পাবে! পয়সায় কি না মেলে!

উমাচরণ আমার পানে চাহিয়া রহিল—কেমন উদাস দৃষ্টি! ভঙ্গী হতভম্বের মত!

সে কহিল—পাগল! পয়সায় একটা স্ত্রীলোক কেনা যেতে পারে। সে হবে দাসীর মত—মুহুরির মত। পয়সার দামই বুঝবে! মনের দাম বুঝবে…উহু, পাওয়া অসম্ভব!—বললুম তো, বয়স ভারী এগিয়ে গেছে। খেয়াল ছিল না! আকাশের পানে চাইতে মন ভারী হয়ে উঠলো! মনে হলো, কি করলুম এ্যাদ্দিন! কিসের লোভে? কিসের আশায়? কবিতাটা আপনা-আপনি কেমন মাথায় এলো! কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসে গেলুম। লিখে একটু আরাম পেয়েচি! সত্যি,—যদি ছাপো, তা'হলে আরো কবিতা লিখবো, ভাবচি। লেখায় আরাম আছে!

আমি কহিলাম—বেশ। কবিতা লিখে যদি আরাম পাও, লেখো। লিখে আমায় পাঠিয়ো—আমি আমার কাগজে ছাপবো!—আরো দু'একখানা জানা কাগজে যাতে ছাপা হয়, দেখবো।

উমাচরণ যেন স্বস্তি পাইল!

কথাটা পরের দিন হরিশকে বলিলাম। শুনিয়া হরিশ হাসিল, হাসিয়া বলিল,—ব্যাধি!

আমি কহিলাম—ব্যাধি নয়। ব্যাধি এতে আরাম হতে পারে। সত্যি, যে-রকম মুখ-চোখ দেখলুম… এই loneliness—ওকে রীতিমত কাতর করে তুলেচে!

হরিশ কহিল—বিবাহ করুক। একটা বিজ্ঞাপনের ওয়াস্তা! এত পয়সার মালিক—why, he could get an old maid…আজকাল মেয়ে অভাব নেই। অনেক মিস্ আছে…quite eligible—মেয়ে-মনে রীতিমত পালিশ, জৌলুশ্…or a willing widow—a merry widow!

আমি কথা কহিলাম না। উমাচরণ তা চায় না! স্পষ্ট বলিয়াছে—এ বয়সে সে-দরদ…

কঠিন বস্তু! যখন হোক, বিবাহের মন্ত্র পড়িলেই সে-দরদ মেলে না!—ইহার মন্ত্র পড়িবার লগ্ন-তারিখ, দিন-ক্ষণ আছে। এই তো এত গল্প-উপন্যাস ছাপিলাম, মানুষের মন কি শুধু পয়সাতেই তৃপ্তি পায়? উমাচরণ পাইতেছে না!

উমাচরণের কবিতা লেখার বিরাম নাই! নিত্য সে সন্ধ্যায় আসিয়া কবিতা পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। কবিতায় যৌবনের চপল সুর! ছন্দ লীলায়িত না হোক, প্রকাশ-ভঙ্গী আধুনিক না হোক, কবিতার বিষয়-বস্তুতে সেই যৌবনের হাহাকার! নৈরাশ্য-বেদনার সেই শাশ্বত সুর!

সেদিন সে কবিতা আনিয়াছিল—

তোমার তরে বসে আছি, জেগে রাত্রি-দিবা!
কোথায় তোমার দেখা পাবো? কে-বা দিবে খবি?
কাননে ফুল ফুটলে ছুটি! বইলে বাতাস, চাহি!
কোথায় তুমি? কোথায় ওগো? মনকে দিয়া ছলি!

কবিতা পড়িয়া উমাচরণের পানে চাহিতে পারিলাম না।

উমাচরণ কহিল—মন যেন কাকে চাইচে! কেউ যদি থাকতো…আমায় দরদ করে!…এ সব ছেড়ে নদীর ধারে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর—তার সঙ্গে ছোট্ট একটু বাগান—আর পাশে সে!… তা'হলে কোনো দুঃখ থাকতো না! ..

উমাচরণ চুপ করিল। আমি তার পানে চাহিলাম। সমস্যা ক্রমে ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে! বিবাহ ছাড়া উপায় কি!

উমাচরণ কহিল—তোমার কাছে অনেক [illegible]।

ভাবো তো, লোকে পাগল বলবে না? এ বয়সে আমি এ কি ছেলে-মানষী করচি! কিন্তু—সত্যি, কবিতা লেখার জন্ত তো আমি এ-সব লিখচি না! আমার মনে যেমন ভাব আসচে, লিখচি। লিখে আরাম পাই। না লিখলে অস্বস্তি ধরে। ছন্দ কি জীবনে কখনো মিলিয়েচি? না, ছন্দ মেলাবার কল্পনা কখনো আমার মনে জেগেচে?—তাই ভাবি, পাগল হবো না তো!

বিচিত্র নয়! বেদনা বোধ করিলাম।…কিছু বলিতে পারিলাম না।

উমাচরণ কহিল,—এ কবিতার উত্তরে কেউ কোনো কবিতা লিখে তোমার কাগজে ছাপাবার জন্য পাঠায় নি?

কথাটা বুঝিলাম না। কৃতূহলী দৃষ্টিতে উমাচরণের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

উমাচরণ কহিল--বিলেতে এমন ঘটে তো! কোনো কবি কবিতা লিখলেন—TO AN UNKNOWN GIRL. তার জবাবে কোনো কিশোরী লিখলে—IN REPLY…এমনি…? অর্থাৎ আমার এ কবিতা কেউ পড়চে…মানে, কোনো পাঠিকা…পড়ে তার প্রাণে একটু ব্যথা…! তা জানতে পারলেও একটু আরাম পাই। কাগজে এ কবিতা ছাপাবার একটা উদ্দেশ্যও…

বুঝিলাম। কহিলাম,—হয়তো জবাব আসবে। এখনো আসে নি!

—এমন হয় তা'হলে? এদেশেও?

কহিলাম —হয় বৈ কি! এই যে আমার কাগজেই কবিতা লিখতেন শ্রীমতী অম্বালিকা সেন। প্রেমের লিরিক! ব্যথা-বেদনায় ভরা! 'শূন্য পরাণ', 'শূন্য মন', 'শূন্য জগৎ',—ক'টা কবিতা উপরি-উপরি কাগজে বেরোয়। এ তিনটে কবিতা বেরুলে জবাবে কবিতা এলো—'পূর্ণ প্রাণ', 'পূর্ণ মন', 'পূর্ণ জগৎ',—বোধিসত্ত্ব সিঙ্গীর লেখা।…এই কবিতার মারফৎ তাদের জমলো পরস্পরের প্রতি প্রেম—এবং সে প্রেমের ফলে ঘটলো দু'জনের বিয়ে। অম্বালিকা ছিলেন প্রৌঢ়-বিধবা—আর বোধিসত্ত্ব ছিল বিপত্নীক তরুণ।

উমাচরণের মুখে প্রসন্নতার দীপ্তি ফুটিল। দুই চোখে সে দীপ্তির স্নিগ্ধ আভা গোপন রহিল না!

উমাচরণ কহিল—তা'হলে হয়?

উৎসাহ-ভরে কহিলাম,—হয় বৈ কি!

উমাচরণ কহিল—দেখা যাক! তা'হলে নয় দেখা যাবে, যা বলছিলে! ঐ বোধিসত্ত্ব সেন আর অম্বালিকা সিঙ্গীর মতন…

আমি কহিলাম—বোধিসত্ত্ব সেন নয়, 'সিঙ্গী'—অম্বালিকা ছিলেন সেন—এখন অবশ্য সিঙ্গী হয়েচেন।

উমাচরণ কহিল,—কবিতা যা ছাপতে আসে তোমার কাগজে, সমস্তগুলোর উপর তুমি একটু লক্ষ্য রেখো।

কহিলাম,—রাখবো।

কথাটা সে-রাত্রে গৃহিণীকে বলিলাম। উমাচরণের আসল পরিচয় দিলাম। তার কবিতা লেখার উদ্দেশ্যও গোপন রাখিলাম না।

শুনিয়া গৃহিণী কহিলেন—ধরে বিয়ে দাও। না হলে পুরুষ মানুষ—বুড়ো বয়সে যদি একটা কীর্ত্তি করে বসেন! পয়সা-কড়ি আছে।

কীর্ত্তি! গৃহিণীর পানে চাহিলাম।

গৃহিণী কহিলেন—ঐ বিজয় বাবু—তোমাদেরই তো বন্ধু! স্ত্রী মারা গেলে ছ'মাস তর সইলো না! কি কালি মাখলেন!

ঠিক! হতভাগা বিজয়! থিয়েটারের একটা অভিনেত্রী ……

আমি কহিলাম,—উমাচরণ ইতর নয়—respectable—he is above such vulgarities.

স্ত্রী কহিলেন,—কি বলে তিনি ভাবচেন, কাগজে তাঁর কবিতা পড়ে কোনো ভদ্রমহিলার প্রাণ কেঁদে উঠবে! আর অমনি বরমাল্য নিয়ে সে ছুটে আসবে! তা যদি হতো, তা'হলে তোমাদের মাসিক-পত্র আজ জমকে উঠতো! দেশেও কন্যা-দায় থাকতো না!

আমি কহিলাম—এমন কখনো ঘটে নি, তা নয়। ঐ অম্বালিকা সেনের সঙ্গে বোধিসত্ত্ব সিন্ধীর বিবাহ। তারপর তড়িৎ চক্রবর্তীর বিয়ে হলো হাসনুহানা দেবীর সঙ্গে। হাসনুহানা দেবী গান লিখতেন স্বর-লিপি দিয়ে—তাই থেকেই তড়িৎ চক্রবর্তী···

বাধা দিয়া গৃহিণী কহিলেন—ছাখো তা'হলে। উমাচরণবাবুর 'শশধর' কবিতা পড়ে কোনো বিদ্যাধরার বুক যদি দুলে ওঠে!

উমাচরণের কবিতায় ক্ষোভ আর নৈরাশ্য ফুটিতে লাগিল বেশী করিয়া! সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহল খুব। প্রায় আসিয়া সে প্রশ্ন করে,—জবাব পেলে?

উমাচরণ কহিল—মাসে একটি দু'টি কবিতা ছাপা হচ্ছে, তাতে আশ মিটচে না। কোনো দৈনিক কাগজে যদি কবিতা ছাপানো যেতো, তা'হলে রোজ একটি করে বেরুতে পারতো। জবাব পাবার চান্সও তাতে বাড়তো!

প্রুফ দেখিতেছিলাম — ফুট-নোটে জর্জরিত এক বিরাট গবেষণামূলক প্রবন্ধের। কাজেই মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলাম না।

উমাচরণ কহিল—এ-সব কবিতা কোনো দৈনিক কাগজে দেওয়া চলে না? যারা কবিতা ছাপে? এবং যে-সব কাগজের পাঠক-পাঠিকা বেশী?

'সদর-অন্দর' কাগজখানার কথা মনে পড়িল। দৈনিক নয়, সাপ্তাহিক। সে কাগজে পলিটিক্স ছাপা হয়, সংবাদ ছাপা হয়, গল্প, কবিতা, বীমা, থিয়েটার, সিনেমা, মায় বাজার-দর অবধি। অর্থাৎ দুনিয়ার কোনো জিনিষ তারা বাদ দেয় না! কাগজটা নেহাৎ পাৎলা—ঘুড়ির কাগজ বলিলেও চলে! চুটকি-চাটনি ছাপে বলিয়া বিক্রয় খুব। তার মালিক ত্রিলোচন সরকারকে চিনি।

কহিলাম,—হাঁা, তেমন কাগজ আছে। দৈনিক নয়, সাপ্তাহিক।

উমাচরণ কহিল—তা'হলে ব্যবস্থা করে দাও না! কী হপ্তায় দুটো করে যদি ছাপে! না হয় কিছু পয়সা আমি দেবো।

ত্রিলোচন সরকারকে এ-কথা বলিলাম। সে বলিল—শ' দুই টাকা দিয়ে যদি উনি সাহায্য করেন, তা'হলে আইভরি-ফিনিস কাগজ দিই। দু'চারখানা ব্লকও অমনি। উনি দেবেন? মানে, ওঁর patronage পেলে···

উমাচরণ বলিল—দু'শো কেন! শ'পাঁচেক নিক—কাগজখানার উন্নতি হবে তো! এত পয়সা রোজগার করলুম। বাঙলা সাহিত্যের উন্নতিতে না হয় কিছু সাহায্য······

ত্রিলোচনের বরাত! 'সদর-অন্দরে'র শ্রী ফিরিয়া গেল!

কাগজের প্রথম পৃষ্ঠা উমাচরণের কবিতার জন্ত রিজার্ভ রহিল। সাহিত্যিক হইলেও ত্রিলোচন বেইমান নয়—নিমকের মর্য্যাদা রাখিল।

প্রথমেই উমাচরণের যে-কবিতা বাহির হইল,—তার ছন্দ ত্রিলোচন কাটিয়া-ছাঁটিয়া বদল করিয়া তাকে দাঁড় করাইল নূতন আধুনিক বেশে—

আর কতকাল আকাশ-পানে চেয়ে
এমনি করে আশার ফুলে মালা
গাঁথবো ওগো? বুকে আগুন জলে!
শুকায় হৃদয়—সইবো দু-খ্ জালা?

কোথায় আছো লো রূপসী সখী,
বুক-সাহারায় নাচো নূপুর পায়ে!
শিঞ্জিনীতে তুলিয়ে অমল-বাহু,
দাও সাহারায় শ্যামল তৃণ-ছায়ে!

'সদর-অন্দরে' কবিতার স্থান হইবার পর আমার গৃহে উমাচরণের যাতায়াতের মাত্রা বাড়িল।

গৃহিণী কহিলেন—ওঁর কবিতা তুমিই না হয় দু'চারটে করে কী মাসে ছাপতে! পাঁচশো টাকা তোমার হাতে আসতো!

তা আসিত। কাগজওয়ালার পক্ষে পাঁচশোর আমানৎ সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু···

না। এখন আর হয় না। তা ছাড়া উমাচরণ বন্ধু! আমি মাসিক কাগজের সম্পাদক! আর যে কাজ করি, ভিখারীর মত হাত পাতিতে পারিব না। Dignity আছে! গ্রাহকের অভাব ঘটিলেও Dignity ত্যাগ করা সম্ভব নয়!

মাসখানেক পরের কথা। সকালে এক গাদা কাপি লইয়া বসিয়াছি, উমাচরণ আসিয়া উপস্থিত। তার হাতে এ-সপ্তাহের 'সদর-অন্দর'।

উমাচরণের মুখে হাসির দীপ্তি! সে কহিল—তোমার কথা ফলেচে। জবাব বেরিয়েচে। আমার সেই যে কবিতাটা—'আর্ত্তের হাহাকার'—তার জবাব। এ জবাব লিখেচেন এক লেখিকা। লেখিকার নাম, শতদল দেবী।

উমাচরণ জবাব-কবিতা দেখাইল। পড়িলাম,—

> ছল বয়ে এই যে নিতি মর্মরিছে বুকের ব্যথা—
> ওগো আর্ত্ত, বেচারী গো, আর বলো না এমন কথা!
> যে-সরসী নয় ধরণী—শুকোয় নি প্রাণ—নয় এ মরু!
> নদীর বুকে অথৈ বারি—তীরে শ্যামল ছায়া-তরু!
> তপন-তাপে দগ্ধ তুমি —শিরে তোমার অনল-জ্বালা!
> এসো কাছে—বাহু-লতায় রচে দিব আরাম-ডালা!
> আমার বুকে আছে দরদ—আছে প্রীতির ভাগীরথী—
> সেই বুকে শির রাখো পথিক,—জুড়াবে বুক,—শান্ত মতি!

সবিস্ময়ে আমি কহিলাম—তাইতো! এ যে রীতিমত রোম্যান্স!

উমাচরণ কহিল—এর জবাবে আমার তো আবার কিছু লেখা চাই!

আমি কহিলাম—নিশ্চয়।

উমাচরণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, পরে কহিল—ভয় নেই। তোমার সেই অমালিকা সিন্নী আর সাধন সেনের যত কিছু ঘটবার···

উমাচরণের ভুল শুধরাইয়া দিয়া কহিলাম,—অমালিকা সেন—বোধিসত্ত্ব সিন্নী!

অপ্রতিভভাবে উমাচরণ কহিল—হাঁ, হাঁ, অমালিকা সেন, বোধিসত্ত্ব সিন্নী।

আমি কহিলাম—কেন হবে না?

উমাচরণ কহিল—তাদের বয়স, আর আমার বয়স!···

আমি কহিলাম—তাতে কি! প্রেম বয়স দেখে না।

উমাচরণ কহিল—আমি যদি এখন শতদল দেবীকে তাঁর এ কবিতার সুখ্যাতি করে চিঠি লিখি—ধরো, ধন্যবাদ দিয়ে—দোষের হবে?

আমি কহিলাম,—এখনি নয়। আরো দু'একটা কবিতা লিখে ত্যাখো—তাতে সাড়া পাও কি না।··· না হলে এ যদি ক্ষণেকের খেয়াল মাত্র হয়···

উমাচরণ কহিল—আমিও সেই কথা ভাবছিলুম।···

আরো দু-চারিটা কবিতায় উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিল। উমাচরণ আবার আসিয়া হাজির। দু'খানা 'সদর-অন্দর' খুলিয়া কহিল—পড়ো···

তার স্বরে উৎসাহ। আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। সেই উমাচরণ! মক্কেলের মায়ায় সারা দুনিয়া যে ভুলিয়া বসিয়াছিল···

কহিলাম—Blood Pressure এখন কেমন?

উমাচরণ কহিল—ডাক্তারের কথা শিরোধার্য্য করে চলেছি! Absolute rest.

আমি কহিলাম—হুঁ!

কবিতা দু'টি পড়িতে হইল। উমাচরণ লিখিয়াছে—সে কবিতার ভাব যে—তার মনের অনল-জ্বালা শতদলের হাওয়ায় ঘুচিতেছে! শতদলের সুরভি তার প্রাণের শুষ্কতাকে ভরিয়া দিতেছে! শতদল দেবী লিখিয়াছেন,—

> অনল-জ্বালা নয় ও—রবির কর গো!
> শতদলের জলদ-আধার নির্ভর ও!
> নয়ন-ভরা পিয়াস মিটাও নয়ন-কিরণে!
> পাঁকে-জাগা শতদলে নাচাও হিরণে!

আমি কহিলাম—দেখলুম।

—কি বলো ?

কহিলাম—কিসের সম্বন্ধে ?

উমাচরণ কহিল—এই শতদল দেবীকে যদি চিঠি লিখি ?

আমি কহিলাম—আমি কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি। মানে, এই শতদল দেবী—সত্যই কোনো মহিলা··· ?

উমাচরণের মুখে নিমেষের বিবর্ণতা।

উমাচরণ কহিল,—কেন ?

আমি কহিলাম—তোমার সঙ্গে জানা নেই, শোনা নেই! তুমি কে—তোমার বয়স কত—তাও জানে না। অথচ হপ্তার পর হপ্তা কবিতায় এমনি সাড়া দিয়ে চলেছেন···

উমাচরণ কহিল—এ পুরুষের লেখা নয়। আমি কাপি দেখেছি—ত্রিলোচন বাবু আমায় দেখিয়েছেন।

আমি কহিলাম,—হুঁ···

আকাশ-পাতাল অনেক কথা ভাবিতে বসিলাম। ঠিক!

উমাচরণ কহিল,—কি ভাবচো ?

আমি কহিলাম,—কাগজে তোমার লেখার সঙ্গে 'রায় বাহাদুর' খেতাব শুরা ছাপচে ?

—ছাপচে।

—হুঁ!

উমাচরণ কহিল,—আবার কি ভাবচো ?

কহিলাম—শতদল দেবী মহিলা। তাতে ভুল নেই। কাপি যখন তুমি চোখে দেখে এসেচো! তবে তাঁর বয়স···

উমাচরণ আমার পানে চাহিয়া রহিল।

আমি কহিলাম—কিশোরী নন—তবে কুমারী। যাকে বলে, old maid···এদেশেও এখন প্রচুর কি না! ···ইনি···মানে, কিন্তু মহিলা হলেও যদি কৌতুক-ছলে···কল্ করে তুমি চিঠি লিখবে ? তিনি হয়তো ভাববেন, তুমি খেয়ালের বশে কবিতা লিখেচো—কিম্বা ছেলে-বয়সের লেখা এখন ছাপাবার সখ হয়েচে! এমন তো হয়!···নিজের সম্পাদকী অভিজ্ঞতায় দেখচি। মানে, কবিতায় কোনো সময়েই মানুষ মনের খাঁটী কথা লেখে না। বেশীর ভাগ কবিই কবিতা লেখবার সময় হয় বেজায় artificial। এও যদি তাই হয় ?

উমাচরণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—বহুক্ষণ। তারপর কাগজ দু'খানা হাতে লইয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। ফেলিয়া বলিল—থাক্ তবে! চিঠি লিখবো না।

শুষ্ক মুখে উমাচরণ চলিয়া গেল।···

কিন্তু ব্যথাটুকু আমার মনে লাগিয়া রহিল। যদি ···আহা! লিখিয়া একটু আরাম পায়···

পরের দিন উমাচরণের সঙ্গে গিয়া আমি দেখা করিলাম। কহিলাম — খপর নিয়েচি হে। তুমি তাঁকে চিঠি লিখতে পারো।

উমাচরণ মৃদু হাসিল; হাসিয়া কহিল,—চিঠি লিখেচি ···না লিখে পারলুম না! It was so irresistible···

কহিলাম—বেশ করেচো।

উমাচরণ কহিল—চিঠির সঙ্গে একরাশ ফুল পাঠিয়েচি···

আমি কহিলাম—ঠিকানা কোথায় পেলে ?

উমাচরণ কহিল, — ত্রিলোচনবাবু ঠিকানা দিয়েচেন। ভারী ভদ্র লোক এই ত্রিলোচনবাবু!

আমি কহিলাম,—তাঁকে কি বললে ?

উমাচরণ কহিল,—কথাটা অবশ্য গুছিয়ে বলেচি। এতদিন ওকালতি করচি—বুদ্ধিতে শাণ আছে তো! তাঁকে বললুম,—কবি শতদল দেবী আমাকে চিঠি লিখেছিলেন নিমন্ত্রণ করে। তাঁর চিঠিখানা হারিয়ে ফেলেচি—ঠিকানা মনে নেই। আপনি যদি···

হাসিয়া আমি কহিলাম,—Then you have not lost your senses!

চার-পাঁচদিন পরে উমাচরণের সঙ্গে আবার দেখা। প্রশ্ন করিলাম—শতদল দেবীর কি খবর ?

ম্লান মুখে উমাচরণ কহিল,—ফুল পেয়ে খুব আনন্দ হয়েচে তাঁর। সেই সঙ্গে ছোট একটু চিঠি লিখে জানিয়েচেন,—নানা কারণে ইচ্ছা থাকলেও আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় সম্ভব নয়—এবং চিঠিপত্র লেখাও উচিত হবে না। নিষেধ করেচেন—কোনো উপহার যেন তাঁকে না পাঠাই। ইচ্ছা থাকলেও নানা কারণে আমার উপহার নেওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হবে না!...

কথাটা বলিয়া উমাচরণ নিশ্বাস ফেলিল।

আমিও নিশ্বাস রোধ করিতে পারিলাম না; কহিলাম—বুঝেচি।

উমাচরণ কহিল,—কি বুঝলে?

কহিলাম,—তাঁর বিবাহ হয়েচে। হয়তো সংসার...

উমাচরণ কহিল,—তাই! সংসারে তিনি সুখে থাকুন!...

এ ঘটনার পর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। উমাচরণ কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিল।

আমার কাগজে শ্রাবণ-সংখ্যার জন্য কোনো কবিতা সে পাঠায় নাই। নিজে তার গৃহে গেলাম। শুনিলাম, ডাক্তারের পরামর্শে উমাচরণ পশ্চিমে গিয়াছে হাওয়া খাইতে। ভাগ্নে শ্যামাচরণ সপরিবারে সঙ্গে গিয়াছে।

হরিশ বলিতেছিল—যাবার দিন আমার সঙ্গে দেখা ষ্টেশনে। কেমন মুষড়োনো ভাব! কবিতার কথা তুললুম। বললে, ছেলে মানুষী বাতিক! তা থেকে মুক্তি পেয়েচে।

বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। বেচারী!...

ছ'মাস পরের কথা!

উমাচরণের সঙ্গে দেখা-শুনা হয় না! সময় নাই। কাগজের সম্পাদকী হইতে ম্যানেজারী, প্রুফ-রীডারী—একা সব কাজ করিতে হয়! তার উপর বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়িয়া গিয়াছে। দেড় হাজার গ্রাহক-গ্রাহিকাকে ছিঁড়িয়া কুটিয়া ভাগ করিয়া লইয়াছি আমরা চার-পাঁচখানা কাগজওয়ালা!

সেদিন খবরের কাগজ খুলিয়া দেখি, একটা কলমের মাথায় বড় বড় হেড-লাইন—রায় বাহাদুর উমাচরণ মিত্র—পরলোকে!

বুকটা ঝন্‌ঝনিয়া উঠিল। এমন নিঃশব্দে...এমন অকস্মাৎ...!

উইল করিয়া গিয়াছে। উইলের খবরও শুনিলাম—কবি শতদল দেবীকে দিয়াছে কলিকাতার প্রকাণ্ড বসত-বাড়ীখানি এবং নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা। তাঁর কবিতায় দরদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তাই!...

কাছে হরিশ বসিয়াছিল। আমি কহিলাম,—ভাগনে-ভাইপোদের বরাত-জোর!

হরিশ কহিল,—কেন? তারা তো সবই পেতো...গেল। শতদল দেবীর জন্যই পথে বসলো!

আমি কহিলাম—উইল অসিদ্ধ।

—কেন?

আমি কহিলাম,—শতদল দেবীর অস্তিত্ব আছে কি? তা যদি না থাকে, তা'হলে ও-সম্পত্তি তো intestate...

—Intestate! হরিশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। আমি কহিলাম,—শতদল দেবী বলে কোনো মহিলা নেই। থাকলেও সে-সব কবিতা তিনি লেখেন নি।

হরিশের কৌতূহল বাড়িল...

আমি কহিলাম,—বেচারীর মনের ভাব বুঝে আমিই সে-কবিতাগুলো লিখে 'সদর-অন্দরে' পাঠাতুম। আমার স্ত্রী সেগুলো নকল করে দিতেন। যদি আরাম পায়...বেচারা!...

হরিশ কহিল,—ইদানীং তার আরাম যা ছিল, তা ঐ একটি চিন্তায়...যে, শতদল দেবী দরদ করেচে!

আমি কহিলাম,—বন্ধুকে এটুকু আরাম দিতে পেরেচি—হোক কৌতুক—সেইটেই মস্ত সান্ত্বনা!

'বর্গী এল দেশে'

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

বাদসাহ আওরঙ্গজীব একদিন যাহাদিগকে 'পার্ব্বত্য-মূষিক' বলিয়া উপহাস করিতেন; যাহারা নিবিড় কাননবেষ্টিত গিরিসঙ্কটে ও পার্ব্বত্যদুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া পরাক্রান্ত হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টায় নিয়ত যুদ্ধশিক্ষায় ব্যাপৃত ছিল, তাহারা আর 'পার্ব্বত্য-মূষিক' নাই। আওরঙ্গজীবের মৃত্যুতে মোগলের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মন্দীভূত হইয়াছে, শিবজীর স্বর্গারোহণে বিপুল মহারাষ্ট্র-সেনা বন্ধনহীন হইয়াছে,—সুতরাং মহারাষ্ট্রগণ এখন সেই সকল দুর্গম গিরিগুহার নিভৃত নিরালা পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পঙ্গপালের মত ছাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদিগের অবিশ্রান্ত আক্রমণ ও দেশব্যাপী লুণ্ঠন-যাতনায় বঙ্গভূমি জর্জ্জরিত হইতেছে, ধন-প্রাণ লইয়া নিরীহ প্রজাপুঞ্জ বন-জঙ্গলে পলায়ন করিতেছে, অরাজকতায় দস্যু-তস্করের আস্ফালন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রজার জীবন রক্ষা করিবার জন্য নবাব নিজে তরবারি হস্তে কখন হস্তিপৃষ্ঠে, কখন পদব্রজে উড়িষ্যার গিরিশৃঙ্গে অথবা বীরভূমের শালবনে সতর্ক প্রহরীর মত নিশিদিন ভ্রমণ করিয়াও অত্যাচারের গতিরোধ করিতে পারিতেছেন না।

মহারাষ্ট্রগণ যে দেশে উপস্থিত হইতে লাগিলেন, সেখানেই রাজকরের চতুর্থাংশ 'চৌথ'-স্বরূপ পাইবার দাবী করিতে লাগিলেন; না দিলে সে দেশের পল্লীতে পল্লীতে মহারাষ্ট্র সেনা প্রজার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া ধন-মান লুণ্ঠন করিতে লাগিল; গোলাজাত শস্য অগ্নিদাহে বা লুণ্ঠনক্রমে নষ্ট হইতে লাগিল, মাঠের ফসল অশ্বারোহী সেনার পদদলনে দলিত হইয়া গেল। বাঙ্গালাদেশে অনেক রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, বাঙ্গালার স্বর্ণসিংহাসন লইয়া হিন্দু-মুসলমানে এবং মোগল-পাঠানে অনেক কলহ-বিবাদ হইয়াছে; কিন্তু কোন কারণেই বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে হাহাকার উঠে নাই,—বর্গীর হাঙ্গামায় গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে হাহাকার উঠিতে লাগিল, রাজা-প্রজা সকলেই ধন-প্রাণ বাঁচাইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়গণ উড়িষ্যা ও বীরভূমের পথ দিয়া অলক্ষিতে সহস্র সহস্র অশ্বারোহী লইয়া চকিতের ন্যায় বাঙ্গালার সমতল প্রান্তরে ছাইয়া পড়িল,—ভাগীরথীর পশ্চিম পার একেবারেই উৎসাদিত হইতে লাগিল, লোকে যে যেখানে পারিল প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাজসাহী রাজ্যের অধিকাংশ স্থানই ভাগীরথী এবং পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী, সুতরাং বর্গীর হাঙ্গামায় ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী প্রদেশগুলি বিপর্য্যস্ত হইতে লাগিল। স্বয়ং নবাব পর্য্যন্তও বিচলিত হইয়া উঠিলেন এবং পদ্মার উত্তরপারস্থিত রাজসাহী রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী গোদাগাড়ী নামক স্থান নিরাপদ ভাবিয়া পরিবারবর্গ তথায় পাঠাইয়া দিয়া স্বয়ং অসিহস্তে শত্রু-দমনে বাহির হইলেন।

বর্গীর হাঙ্গামায় সম্মুখ-যুদ্ধ ছিল না, চতুর মহারাষ্ট্র-সেনা সম্মুখ-যুদ্ধে নবাবের সৈন্যদলের সহিত বল পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইত না। দেশ লুণ্ঠন করিয়া, প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, নবাব-সৈন্যকে পরিশ্রান্ত করিয়া অবশেষে কোনরূপে নবাবকে 'চৌথ' প্রদানে সম্মত করাই ছিল তাহাদিগের লক্ষ্য। সে লক্ষ্য সাধন করিবার জন্য তাহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া চারিদিকে লুঠপাট আরম্ভ করিয়া দিল। নবাব সসৈন্যে গ্রামে গ্রামে ছুটিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। পথে, ঘাটে, মাঠে, পল্লীতে, প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে, নিশীথে—সর্ব্বত্র সকল সময়েই যুদ্ধ-কোলাহল, অস্ত্র-ঝন-ঝনা, ঘোড়া-দড়বড়ি চলিতে লাগিল, তিন দিন এইরূপ অদ্ভুত যুদ্ধ করিয়া আলিবর্দ্দী শিবিরে ফিরিলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে শিবির লুঠিয়া লইয়াছে, রাজধানী হইতে সংবাদ পাইলেন যে,

তিনি একদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন কিন্তু আরও শত শত দলে বিভক্ত হইয়া মহারাষ্ট্র সেনা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিয়াছে এবং জগৎশেঠের বাটী লুণ্ঠন করিয়াছে! আলিবর্দ্দী অনেক যুদ্ধ যুঝিয়াছেন, কিন্তু এমন লুণ্ঠন-পরায়ণ চতুর শত্রুসৈন্যের সঙ্গে কখনও শক্তি পরীক্ষা করেন নাই। রোষে, ক্ষোভে আলিবর্দ্দী ভাগীরথী পার হইয়া মহারাষ্ট্রদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে তাড়াতাড়ি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার আসিবার সংবাদ পাইয়াই শত্রু সেনা রাজধানী ত্যাগ করিয়া গ্রাম নগর লুণ্ঠন করিতে করিতে দূরস্থানে সরিয়া পড়িল।

দেখিতে দেখিতে বর্ষাকাল আসিয়া পড়িল, মহারাষ্ট্র সেনা বর্ষাকালে কাটোয়ার দুর্গে বিশ্রাম করিতে লাগিল; সে বিশ্রামে দূরবর্ত্তী প্রদেশগুলি কয়েক মাসের জন্ত কতক পরিমাণে নিরাপদ থাকিলেও কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি নিরাপদ হইতে পারিল না। জলপ্লাবন ভাল করিয়া শেষ না হইতেই যুদ্ধ-কুশল নবাব বিখ্যাত সেনাপতি মীরজাফর ও মুস্তাফা খাঁকে লইয়া সহসা মহারাষ্ট্র শিবির আক্রমণ করিলেন। চতুর মহারাষ্ট্র সেনা এইবার চতুরতায় পরাস্ত হইল,—ভাস্কর পণ্ডিত সসৈন্যে বিষ্ণুপুরের বনপথ দিয়া প্রাণ লইয়া স্বদেশে পলায়ন করিলেন।

দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল; দলে দলে প্রজাপুঞ্জ আপনাদের গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া ঘরবাড়ী বাঁধিয়া হলচালনা আরম্ভ করিল, নবাব রাজধানীতে ফিরিয়া বিশ্রাম-লালসায় যুদ্ধ-সজ্জা ত্যাগ করিলেন; এমন সময় সহসা উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে রণদুর্ম্মদ মহারাষ্ট্র সেনার বিজয় ভেরী বাজিয়া উঠিল। দেখিতে না দেখিতে পার্ব্বত্য নদীর অবরুদ্ধ জলস্রোতের ন্যায় গ্রাম-নগর উৎসন্ন করিতে করিতে মহারাষ্ট্র সেনা বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, এবার উৎকল-পথে যে মহারাষ্ট্র সেনা বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আসিয়াছে তাহারা সংখ্যায় বরং অল্প, কিন্তু পুণায় মহারাষ্ট্র দলপতি বালাজি রাও অগণিত অশ্বারোহী লইয়া বিহার প্রদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে বাংলা দেশে আগমন করিতেছেন।

রঘুজি ও বালাজি উভয়েই পুণার পেশোয়া হইবার জন্ত লালায়িত। বালাজি দিল্লীশ্বরকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বাঙ্গালার নবাবের নামে এগার লক্ষ টাকা 'চৌথ' আদায়ের আদেশ লইয়া সসৈন্যে বাঙ্গালায় আসিতেছেন। নবাব একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন; অবশেষে এক পক্ষকে হস্তগত করাই পরামর্শ হইল; বালাজিকে প্রার্থিত টাকা দিয়া তাঁহার সৈন্যদল লইয়া রঘুজিকে আক্রমণ করিলেন। রঘুজি পলায়ন করায় লুঠ-পাট বন্ধ হইল,—রাজকোষের অনেক অর্থক্ষয় হইল বটে, কিন্তু ভাগীরথীর পূর্ব্বপারের গ্রাম-নগরগুলি লুঠ-পাট হইতে পারিল না।

এক বৎসর নিরাপদে কাটিতে না কাটিতে ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিত আবার বিশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া বাঙ্গালাদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার যুদ্ধ-বিশারদ আলিবর্দ্দী পূর্ব্ব হইতেই মানকিরার প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করিয়া সম্মুখ-যুদ্ধের প্রতীক্ষায় বসিয়া-ছিলেন; মহারাষ্ট্র সেনা মানকিরার নিকট আসিয়া সশস্ত্র নবাব সৈন্যের যুদ্ধবেশ দেখিয়া সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল! মানকিরার প্রান্তরে যুদ্ধ হইল না, কিন্তু আলিবর্দ্দী এই প্রান্তরে স্বহস্তে আপনার কলঙ্ক-স্তম্ভ স্থাপন করিলেন। 'চৌথ' প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া ভাস্কর পণ্ডিতকে ১৯ জন অনুচর সহ আপন শিবিরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ বনশার্দ্দূলের ন্যায় নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া ছত্রভঙ্গ মহারাষ্ট্র সেনা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে এক অভাবনীয় নূতন বিপদ উপস্থিত হইল,—নবাবের বিশ্বস্ত অনুচর সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হইয়া আট সহস্র অনুচর লইয়া সিংহাসন আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন, এবং তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া মুঙ্গের ও রাজমহল লুঠ করিতে করিতে পাটনায় উপস্থিত হইয়া দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। আলিবর্দ্দী বাহুবলে তাঁহাকে পাটনা হইতে তাড়াইয়া

দিলেন বটে, কিন্তু মুস্তাফা খাঁ সসৈন্যে মহারাষ্ট্রদলে প্রবেশ করিলেন। রঘুজী আবার স্বয়ং বাঙ্গালাদেশে পদার্পণ করিলেন, কিন্তু এবার পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

ক্রমে বর্গীর হাঙ্গামা একটি বার্ষিক ঘটনায় পরিণত হইল। বর্ষাশেষে প্রজারা যখন ধীরে ধীরে হল-চালনা আরম্ভ করে তখনই বর্গীর দল আসিয়া লুঠ-পাট করিতে আরম্ভ করে, আর বর্ষার জলপ্লাবন আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আজ এখানে কাল সেখানে, এইরূপে চারিদিকে লুঠ-পাট চলিতে থাকে। মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও নদীয়ার নিকটবর্ত্তী অধিকাংশ স্থানের লোকেই পিতৃপিতামহের পুরাতন ভিটা-মাটির মমতা ছাড়িয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে পলায়ন করিতে লাগিল, গ্রাম-নগর জনশূন্য হইতে লাগিল, উর্ব্বর শস্যক্ষেত্র কণ্টকবনে পরিণত হইতে লাগিল। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। চারিদিকেই যখন ঘোর বিপ্লব, একাকী নবাব তখন শত্রুদমনে অশক্ত হইয়া সকলকেই আপনাপন ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য আবশ্যকীয় ক্ষমতা দিতে বাধ্য হইলেন। ইংরেজ বণিক সেই ক্ষমতা পাইয়া দুর্গ-সংস্কার ও কলিকাতা রক্ষার জন্য মহারাষ্ট্র-খাদ খনন করিলেন; যেখানে যেখানে তাঁহাদের বাণিজ্যালয় ছিল, সেখানে সেখানে আবশ্যকমত সৈন্য রাখিতে আরম্ভ করিলেন; যাঁহারা কেবলমাত্র বাণিজ্য-ব্যবসায়ী-তাঁহারাও কিয়ৎ পরিমাণে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা যুদ্ধ-নিপুণ উদ্যমশীল সভ্যজাতি, তাহাদের বল-বুদ্ধির পরিচয় মহারাষ্ট্রদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল না; তাহারা ইংরাজদিগের বাণিজ্যালয় বা পণ্যদ্রব্য আক্রমণ করা নিরাপদ মনে করিল না। প্রজাসাধারণ যখন দেখিল যে, বর্গীর দল ইংরাজ সীমায় পদার্পণ করে না, তখন অনেকেই নিরাপদ হইবার জন্য ইংরাজদিগের কুঠীর নিকটে বাস করিতে ও ইংরাজ-দিগের সঙ্গে বাণিজ্য বিষয়ে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে কলিকাতা একটী গণ্ডগ্রাম হইতে মহানগরে পরিণত হইতে লাগিল, দেশের লোকের নিকটেও ইংরাজের মহিমা বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।

১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে নবাব নিজে যুদ্ধ-যাত্রা না করিয়া সেনাপতি মীরজাফরকে মহারাষ্ট্র দমনে নিযুক্ত করিলেন। মীরজাফর মেদিনীপুর পর্য্যন্ত আসিয়াই বিলাস তরঙ্গে ডুবিয়া পড়িলেন! তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নবাব আতাউল্লাকে পাঠাইলেন। তিনি সেনাপতিকে সাহায্য না করিয়া তাঁহার সাহায্যে আলিবর্দ্দীকে হত্যা করিয়া নবাব হইবার আশায় ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। আলিবর্দ্দীর ভাগ্যে বিশ্রাম-সুখ ছিল না, তিনি অগত্যা অসি-হস্তে বাহির হইয়া বিদ্রোহ ও বর্গীর লুণ্ঠন দমন করিতে ধাবিত হইলেন।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রঘুজির পুত্র জানোজি বাঙ্গালা দেশ লুঠ করিতে আসিলেন; নবাব তাঁহাকে সম্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করিবার জন্য মেদিনীপুর যাইতেছিলেন, পথি-মধ্যে শুনিলেন বিহারে বিদ্রোহী-দল ভ্রাতা হাজি মহম্মদ ও জামাতা জিন মহম্মদকে নিহত করিয়া নবাব-কন্যাকে বন্দী করিয়াছে। শোকে, অপমানে, মর্ম্ম-পীড়ায় ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া নবাব মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া আসিলেন, পদচ্যুত মীরজাফর ও আতাউল্লাকে কোরাণ শপথ করাইয়া রাজ্য-রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং বিহার যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, বাঙ্গালা দেশের নরনারী হয় আত্ম-রক্ষা করুক, না হয় যে যেখানে পারে পলায়ন করুক। দেশের মধ্যে চারিদিক হইতে নিরাশার হাহাকার উঠিল। নবাব এবারের যুদ্ধে বিদ্রোহীগণকে পরাজিত করিয়া কন্যার বন্ধন মোচন করিলেন, এবং দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বিহারের শাসন-কর্ত্তা করিয়া রাজা জানকীরামের হস্তে সমুদায় কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিলেন। আতাউল্লা অধিক দিন নবাব-দরবারে থাকিতে পারিলেন না, বিদ্রোহ অপরাধে নির্ব্বাসিত হইয়া তিনিও বর্গীর দলে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু জানোজী মাতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শীঘ্রই স্বদেশে প্রত্যাগমন করায় সে বৎসর বাঙ্গালা-দেশে বিশেষ উপদ্রব হইতে পারিল না।

১৭৫০ ও ১৭৫১ খৃষ্টাব্দেও পূর্ব্ববৎ বর্গীর হাঙ্গামা চলিতে লাগিল। অনবরত যুদ্ধ-শিবিরে জীবন যাপন করিয়া নবাব ক্রমেই ক্ষীণ-বল হইতেছেন, রাজকোষ ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, কৃষি-বাণিজ্য ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, অথচ অনবরত শোণিতপাত করিয়াও দেশের দুর্দ্দশা দূর হইতেছে না। অগত্যা ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নবাব বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা 'চৌথ' প্রদানে সম্মত হইয়া সন্ধি স্থাপন করিলেন, বর্গীর হাঙ্গামা সেই দিন হইতে শান্তিলাভ করিল।

বাঙ্গালাদেশ যখন এই সকল বিপদে জর্জ্জরিত হইতেছিল, দিল্লীর বাদশাহ তখন দিন দিনই শক্তিহীন ক্রীড়া-পুত্তলী হইয়া উঠিতেছিলেন। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ সাহ আবদালী নাদির সাহার ন্যায় দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া গিয়াছিল; ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বাদসাহ মহম্মদ সাহার মৃত্যু হওয়ায় দিল্লীর ক্ষমতা একেবারেই তিরোহিত হইয়া গেল। আলিবর্দ্দীও বাদসাহকে রাজ-কর দেওয়া রহিত করিয়া দিলেন।

হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বালেশ্বর, বীরভূম, রাজমহল এবং নিজ রাজসাহী বর্গীর হাঙ্গামায় একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। রাজকোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় নবাব বাঙ্গালার জমিদারদের নিকট এক কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে ঋণ শোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। সৈন্যবলে দেশ-রক্ষার অধিকার পাইয়া জমিদারগণ প্রায়ই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বাধীনতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুর্গ সংস্কার ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইংরেজগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নানাবিধ অত্যাচারে অন্তর্বাণিজ্য ক্রমেই বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত হইতে লাগিল, গ্রাম-নগর উৎসন্ন গিয়াছিল, সুতরাং দেশের দীন-দুঃখীদিগের দুঃখ-দুর্দ্দশা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

যে-দুঃখী, যে-অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জ্জনের উপর তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেইদিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠসম্পদে শেষকড়া পর্য্যন্ত দেউলে হোলো।

— রবীন্দ্রনাথ

সর্ব্বাণী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(১২)

রাজপুরে যাওয়ার চওড়া পথের দু'ধারে বরাসফুলের গাছগুলি গাঢ় গোলাপী রংয়ের বড় বড় ফুলের থোকায় নিজেদের অঙ্গকে খচিত করিয়া তুলিয়া পথ-ঘাট যেন আলোকমণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। সুউচ্চশীর্ষ বাঁশঝাড় সরলোন্নত হইয়া যেন গগনস্পর্শের স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিতে করিতে হিমকণাস্পর্শসুশীতল বাতাসে মৃদু মর্ম্মর রব করিতেছিল, অসংখ্য ইউক্যালিপটাসের সতেজ সৌরভে চারিদিক যেন স্বাস্থ্যপূর্ণ ও সানন্দপক্ষীকলরবে মুখর হইয়া রহিয়াছে। মোটরে করিয়া সর্ব্বাণীরা রাজপুর গিয়া সেখান হইতে ডাণ্ডিতে মুসুরীপাহাড় বেড়াইতে গিয়াছিল, হপ্তা দুই সেখানে থাকিয়া আজ অপরাহ্নে সেখান হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। খানিকটা মোটরে আসার পর হঠাৎ কি খেয়াল চাপিল, ডালি প্রস্তাব করিল, "সবুদি, এসো ভাই আমরা হেঁটে যাই, আর তো মোটে মাইল দুই বাকি আছে।"

ডালি পশ্চিমের মেয়ে, তার স্বাস্থ্যও ভাল, হাঁটিতে সে মজবুত, সর্ব্বাণী পথ-হাঁটায় অভ্যস্ত নয়; তথাপি ডালির পাল্লায় পড়িয়া এখানে এই মাসখানেকের মধ্যে তাহাকেও খানিকটা হাঁটার অভ্যাস করিতেই হইয়াছে, কিন্তু ডাণ্ডিতে পাহাড় হইতে নামার সময়ে ডালির হাঙ্গামায় তাকে খুব খানিকটা হাঁটিয়া উৎরাই নামিতে হওয়ায় তার পায়ে ব্যথা হইয়াছিল। কারণ চড়াই চড়া কষ্টকর হইলেও উৎরাই নামায় পা বেশি ব্যথা হয়। আবার মাইল দুই পথ হাঁটিতে তার খুব বেশি আগ্রহ ছিল না; কিন্তু না থাকিলেই বা শোনে কে? ডালি তাকে নামাইয়া ছাড়িল। অবশ্য সর্ব্বাণীর পিসিমারও যে এ প্রস্তাবে বিশেষ অনুমোদন ছিল, তা নয়; তিনি প্রবলভাবেই আপত্তিও তুলিয়াছিলেন; কিন্তু হইলে কি হয়, মেয়ে তো আর কথা শোনার মেয়ে নয়! সে তৎক্ষণাৎ মায়ের কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "সঙ্গে দাদাকে নিচ্চি, তোমার আর আপত্তির কি আছে! মেয়ে-ধরায় তো আর ধরতে পারবে না যে, তুমি ভয় পাচ্চো! আর দিনের আলোয় রাস্তার ওপোর ডাকাতের দলও ঘাপ্‌টি মেরে বসে নেই যে, আমাদের কান ছিঁড়ে সোনার ঝুমকো চারটে ছিনিয়ে নেবে। অনর্থক বারণ করচো কেন বল ত' মা?"

গোলাপসুন্দরী অপ্রসন্নকণ্ঠে কহিলেন, "তা' না হয় কোন ভয়ই নেই স্বীকার করচি; কিন্তু তোমাদেরই বা অনর্থক রাস্তায় দেরি করে কি লাভটা হবে, তাই আমায় বল ত' বাছা? এত বেড়িয়েও কি তোমাদের বেড়ানোর সাধ মিটলো না?"

ডালি উত্তর করিল, "ঐ মুসুরী পাহাড়টাই এত বড় পৃথিবীটার প্রতিভূ নয় যে, ঐখানে ঐটুকু বেড়িয়েই আমাদের এ-জন্মের মত বেড়াবার সাধ মিটে যাবে। আচ্ছা মা! তুমি আমাদের কত বড় অপদার্থ মনে কর?"

মাকে বাক্যবিমুখ দেখিয়া নিজেকে বিজয়ী বুঝিয়া হাঁকিল, "ড্রাইভার! গাড়ী থামাও!"

সামনের আসন হইতে সুকুমার তখনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া প্রশ্ন করিল, "কার মাফ্‌লার উড়ে পড়লো? কার হ্যাণ্ডকারচিফ?"

তখনও গতিবেগে-স্পন্দমান গাড়ী হইতে অত্যাহ্ করিয়া নামিয়া পড়িয়া ডালি উচ্চহাসি হাসিয়া উত্তর দিল, "তোমার! এখন শীগ্‌গির করে নেমে এসো, শীগ্‌গির, সবুদি! বাঃ, মজা করে বসে রইলে যে বড়? ওঃ বুঝেছি, মা না বললে আমার কথায় নামা হবে না? সুশীলা বালিকা!—মা! শীগ্‌গির ওকে নামতে বলে দাও, কেন মিছে মামাবাবুর চা খাবার দেরি করে দিচ্চো, আর ড্রাইভার বেচারার তেল পোড়াচ্চো, শীগ্‌গির বলে ফেলো।"

গোলাপসুন্দরী মনে মনে খুব পছন্দ না করিলেও মেয়ের কাছে পার পাওয়া সম্ভব নয় জানিয়াই নীরব হইয়া ছিলেন। এখন শুষ্কভাবেই জবাব দিলেন, "ও তো আর তোমার মতন ধিঙ্গী নয়; যাও মা যাও, যে কাঠ-গোঁয়ারের পাল্লায় পড়েছ, খানিক হায়রাণ হয়েই এসো গে।"

সর্ব্বাণী গায়ের শাল প্রভৃতি সামলাইয়া লইয়া মোটর হইতে নামিতে নামিতে অস্ফুটকণ্ঠে যেন কতকটা আত্মগতই কহিল, "ওই করেই তো তোমরা আমাদের আস্কারা দিয়ে দিয়ে এই রকম করেছ!"

এদিকে ততক্ষণে ডালিও মায়ের তিরস্কারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছিল,—"হাঁ, তা বই কি! ভাইঝিটী তো ওঁর মোটেই ধিঙ্গী নন, যত অপরাধ যেন আমারই!"

গোলাপসুন্দরী দু'জনকার দু'রকম মন্তব্য শুনিয়া আর রাগ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, অনিচ্ছা-সত্বেও ঈষৎ হাসিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তাই বলিয়াই মেয়ের কাছে হার স্বীকার করিলেন না; গলার স্বরে যথেষ্ট ঝাঁজ দেখাইয়া ধমক দিলেন,—"চুপ করে থাক ডালি, মরুন কথার কথা কওয়া কি রে! আজ-কাল-কার মেয়েগুলো সব হলো কি!"

ডালি সর্ব্বাণীর গা টিপিয়া তার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, "জানলে সবুদি! মা'র [illegible] নিশ্চয়ই মায়েদের ওই কথা বলে বকেছে! মায়েরাও তো একদিন আজ-কালকার মেয়ে ছিল!"

বলিতে বলিতে সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তখন ড্রাইভার মোটরে ষ্টার্ট দিয়াছে, গভীর গর্জ্জনে অন্তরের সুগভীর উষ্মারাশি বর্ষণ করিতে করিতে (হয়ত অহেতুক গতি বন্ধ করার জন্তই বা!) অধীর গতিবান দ্রুত ধাবনের আগ্রহে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, ডালির সেই জয়রবময় কৌতুকহাস্ত তাহার কলরবে চাপা পড়িয়া গেল, নতুবা বোধ করি গুরুজনের কথায় উপহাস করার জন্ম তাহাকে আরও একবার ভৎ'সিত হইতে হইত। অথচ ভৎ'সিত হইলেই কি কখন স্বভাব যায়? এই হাস্ত ও কৌতুকই যে তার প্রাণের উৎস—জীবনের রস।

ঘোর রবে একরাশ ধূলা উড়াইয়া দিয়া মোটর ছুটিয়া চলিয়া গেল। সর্ব্বাণী অকস্মাৎ উড়িয়া-আসা ধূলার ঝাপ্‌টা হইতে চোখ-মুখ বাঁচাইবার আগ্রহে তাড়াতাড়ি তার গায়ে জড়ান শালটা তুলিয়া মুখ ঢাকা দিয়াছে দেখিয়া সুকুমার চেঁচাইয়া বলিল, "নাও, সামলাও এখন ধাক্কা! তোমারই বা এ দুর্মতি হলো কেন সর্ব্বাণি? তুমি তো অনায়াসেই না নামলেই পারতে। তা'হলে ধুলো খেয়ে এ দুর্গতি ঘটাতে হতো না, তোফা বাড়ী গিয়ে আত্মারামের তৈরী গরম গরম চা খেয়ে খবরের কাগজ নিয়ে বসতে পারতে।"

সর্ব্বাণী ততক্ষণে মুখের ঢাকা খুলিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তার কথা কহিবার পূর্ব্বেই ডালি ফোঁস করিয়া উঠিল, "আচ্ছা দাদা! তুমি তো বেশ! একেই সবুদি মায়ের ভয়ে ভয়ে শিষ্ট শান্তটী হয়ে থাকতেই ভালবাসে, তার উপর আবার তুমি এসে ওকে নীতিপাঠ পড়াতে! আমার দিক্ হয়ে যদি একজনও কখনও একটা কথা কইবে!"

সুকুমার উঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, "তোমার হয়ে একজন শুধু একটা কথা নয়, অনেক কথাই কইবে, ইচ্ছাও না আর খুব বেশী দেরি নেই।"

কথাটা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বটে, সংক্ষেপও যথেষ্ট, কিন্তু ছোটখাট একটী বক্তৃতারই মত লিপিতার্থক। ডালির

তা বুঝিতে বাধিল না, সে ঈষৎ সলজ্জ হইয়া কৃত্রিম কোপে ভাইকে একটা কিল দেখাইয়া সবেগে বলিয়া উঠিল,—"যাও!"

তারপর সাম্‌লাইয়া লইল, "জানো সবুদি! দাদার আজকাল নিজের সর্ব্বদাই একজনের জন্যে মন ছট্‌ফট্‌ করচে কি না, তাই ও ভাবে সব্বাইকারই যেন ওই ভাবনা! মা-বাবারও কি রকম যে অন্যায়, কেনই যে আমাদের বউদি আনতে এত দেরি করচেন জানি না! ভেবে ভেবে শেষে ছেলের মাথা খারাপ হয়ে গেলে তখন কি করবেন?"

সুকুমার অতিশয় গম্ভীরচালে পা ফেলিতে ফেলিতে সুগম্ভীর স্বরে গায়ে-পড়া উত্তর করিল, 'কাঁকে'তে যে-রকম বন্দোবস্ত করে রেখেচে দেখে এসেছি, তার পর আর করবার কিছুই দরকার হবে না, কিন্তু তা' যেন হলো সর্ব্বাণি! তুমি যেমন কবি-প্রকৃতি-মানুষ, হয় তো মর্ত্তজীবদের চাল-চলন তোমার চক্ষেও ঠেকে না; আমাদের ডালিয়ারাণীর বিয়ের ফুল যে এই 'সীজ্‌নে'ই ফুটে উঠ্‌ছে তার কোন খবর-টবর রাখচো? ওর ওই ফুলটীও বোধ করি ডালিয়াই হবে, শীতের সময়ই তো ফোটে।"

শুনিয়া সর্ব্বাণীর চিত্ত আহ্লাদে ভরিয়া উঠিল, পিসিমাকে এই বিবাহের জন্য একান্ত চিন্তিত দেখিয়া তারও অনেক সময় মনে হইয়াছে, বর যখন উপস্থিত তখন বিবাহ তো হইয়া গেলেই চুকিয়া যায়! নিজের কাণ্ডে তার পিতার দুর্দ্দশা দেখিয়া মেয়ের বিয়ে যে কি ভীষণ জিনিষ তার কতকটা আন্দাজ তো তার হইয়াছে। সাগ্রহে সে বলিয়া উঠিল,—"কথাবার্ত্তা সব ঠিক হয়ে গেছে বুঝি? পাকা দেখা হবে কবে?"

সুকুমার কহিল, "কথাবার্ত্তা কইলে কে যে ঠিক হয়ে যাবে? কথা তো ও নিজেই কইবে, আর 'পাকা'? সে কি কখন হয়? এমন কি আধখানা বিয়ে হলেও তো শুনেছি বিয়ে কেঁচে যায়। যায় না সর্ব্বাণি?"

সর্ব্বাণী, তাহার প্রতি ইঙ্গিতের এই প্রচ্ছন্ন পরিহাসে মনে মনে ঈষৎ অসন্তুষ্ট হইলেও, বাহ্যতঃ তাহা প্রকাশ না করিয়াই পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "না না, সত্যি বলো না সুকুমারদা! ডালির বিয়ের কিছু স্থির হলো? আচ্ছা, কাছেই যখন বর রয়েছে, তখন মিথ্যে দেরি করে কি হচ্চে? আমরা থাকতে থাকতে হয়ে গেলেই তো হয়।"

সুকুমার কহিল, "সেই জন্যেই তো হচ্চে না।"

"যথা?—"

"হলেই হয় তো তোমরা এখান থেকে চলে যাবে।"

সর্ব্বাণী হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে কহিল, "তোমার 'লজিক' বটে! কি বলিস্‌ ভাই ডালি! আমাদের ধরে রাখবার জন্যে তুই বিয়ে বন্ধ করে বসে থাকবি? না বাপু, শেষকালে কি তোর অভিসম্পাতে পড়বো না কি! আমি বাড়ী গিয়েই দাঁড়াও না পিসি-মাকে তাড়া দিচ্চি!"

কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া পথ চলিতে চলিতে তাহারা অনেকখানিই অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। সূর্য্যাস্ত না হইলেও সমুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর অন্তরালে অস্তশায়িত তপনের ক্লান্তমূর্ত্তি ঢাকা পড়িয়াছে, আকাশের গায়ে গায়ে সোনালী রেখাগুলি ক্রমশঃ ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিতেছিল, কেবল 'রাজপুর রোডে'র দু'ধারের সারি সারি উচ্চশীর্ষ ইউক্যালিপটাস শ্রেণীর মাথার উপর হিরণ্ময় মুকুটের মতই সেই অস্তসূর্য্যের কনকরশ্মিমালা ঝলমল করিতে করিতে যেন রাজপুর-রাজপথের নামের সার্থকতা জ্ঞাপন করিতেছিল, আর অদূরে পরিবেষ্টিত সুনীল বনের সুদৃঢ় দুর্গপ্রাকারবৎ উচ্চাবচ গিরিমালার অঙ্গে তাহা নিকষের অঙ্গে সুবর্ণরেখার মত সমুজ্জ্বলতর দেখাইতেছিল। আসন্ন সন্ধ্যার একটী বিচিত্র রাগিণী সেই নির্জ্জন প্রদেশের চারিদিকেই যেন একটী অপরি-চিত রাগিণীতে শব্দিত হইয়া উঠিতেছে।

সুকুমার কতকটা তটস্থ হইয়া পড়িয়া যেন কতই শিহরিয়া মন্তব্য করিয়া উঠিল, "অমন কাজটীও করতে যেও না। তুমি যেমনি পিসিমাকে তাড়া লাগাবে, অমনি তিনি সুদশুদ্ধ পুষিয়ে নেবেন আমার এই ঘাড়টী দিয়ে।"—এই বলিয়া সে সশব্দে নিজের স্কন্ধের উপর একটী চাপড় মারিল।

সর্ব্বাণী হাসিতে লাগিল, "ভালই তো হবে সুকুমারদা! তোমারও তা' হলে একটু চাড় হবে, বন্ধুটীকে—"

ডালি এতক্ষণ ইহাদের সান্নিধ্য রাগ করিয়া পরিহার করিয়া জোর পায়ে অগ্রগামী হইয়াছিল, বেশিক্ষণ তা' পোষাইল না, কিছু দূর আসিয়া একটা অসংখ্য গোলাপী ফুলে ভরা বরাস গাছের তলায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া উচ্চশাখার ফুলের দিকে লোলুপচক্ষে তাকাইয়াছিল। ইহারা দু'জন গল্প করিতে করিতে কাছে আসিতেই ঝোঁপে লুকানো বাঘের মতই সে তাদের মধ্যে ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পড়িল।

"এই জন্যেই বুঝি মা'র বকুনি খেয়ে আমি তোমাদের মোটর থেকে নামাতে গেছলুম? না বাপু, এর চাইতে তোমরা গাড়ী চড়ে বাড়ী ফিরে গেলেই ভাল হতো। আর কখনো যদি আমি তোমাদের জন্যে কিছু করি!"

ডালি অন্ধকার মুখ করিয়া মুখ ফিরাইল।

সুকুমার বলিল, "তারই জন্যেই তো আমরা তোকে ভাল করে আশার বাণী শোনাচ্ছি রে! আশা, আশা, জানিস্ যত রাজ্যের দেশ-বিদেশের কবি সব্বাই মিলে বাস্তবের চাইতে আশারই কথা দু'গুণে চৌদ্দগুণ ক'রে আশারই গুণগান করে গেছে। আ রে গেছেই বা বলছি কেন? কবিরা কি যায়? রক্তবীজের মত এক যায় আর তার জায়গায় শতকরা নিরানব্বুই পারসেণ্ট হিসেবে বাড়ে! সত্যি বলচি, আমি এর একশোটা অন্ততঃ নজীর দিতে পারি; অবশ্য যদি তোমরা অনুমতি দাও, নতুবা,—আচ্ছা, টেনিসন কি বলেছেন আগে তাই একটু সাবহিত হয়ে শোন,—

ডালি ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিল, "নতুবাই থেকে যাক্, এবং টেনিসন ও তোমার ঐ একশোটা নজীর তুমি তোমার নিজের জন্যে তুলে রেখে দাও গে, আমার বরঞ্চ তার বদলে এই গাছটা থেকে একটা মস্ত থোকা বরাস ফুল পেড়ে দাও দেখি।"

দু'জনেই তখন অদূরবর্ত্তী গাছটার দিকে চাহিল। সর্ব্বাণীর মুখ দিয়া সহসা বিস্ময়প্রশংসাসূচক একটা ধ্বনি নির্গত হইয়া আসিল,—"বাঃ!"

তাহার কাছে উৎসাহ পাইয়া ডালি সমুৎসাহিত হইয়া উঠিয়া সুকুমারের কাঁধ ধরিয়া নাড়া দিয়া সাগ্রহে কহিল,—"শুধু আমি নয়, আমি নয়; সবুদি'রও খুব সখ হয়েছে, দাও দুটো থোকা পেড়ে। সবুদি! তুমিও একটু বলো না ভাই দিতে, দেখচো তো কত বড় বড় ফুল, যেন মস্ত বড় এক একটা তোড়া বাঁধা রয়েচে!"

সর্ব্বাণী বিস্মিত-স্মিতমুখে সুকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বড় সুন্দর ফুল, না?"

সাগ্রহে সুকুমার, জামার আস্তিন গুটাইতে গুটাইতে গাছের দিকে অগ্রসর হইয়া সহাস্যমুখে সর্ব্বাণীর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "তোমার বুঝি একটা চাই সর্ব্বাণি।"

উত্তর সর্ব্বাণী দিল না, সুকুমারও তা আশা করে নাই, শুধু তার অধরপ্রান্তের সম্মতিসূচক হাস্যাভাসটুকুই উত্তরের পক্ষে পর্য্যাপ্ত! সুকুমার অগ্রসর হইয়া গেল।

পশ্চিমের আকাশ হইতে একটা রক্তরাগ স্বর্ণ-দীপ্তি আসিয়া ঐ ঝাড় বাঁধা বাঁধা অসংখ্য গোলাপ ফুলের আভাসংযুক্ত পুষ্পগুচ্ছের বর্ণ সুষমার সৌন্দর্য্য যেমন বর্দ্ধিততর করিতেছিল, তেমনই ঈষৎ উন্নমিতাননা সপ্রশংসমুখী আত্মভোলা সর্ব্বাণীর সৌকুমার্য্যপূর্ণ পরিপুষ্ট মুখের উপর পড়িয়া তাহারও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে পূর্ণতর করিয়া তুলিয়াছিল, ফুলের গোছাটা হাতে দিতে আসিয়া সহসাই সুকুমারের চোখের দৃষ্টি বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিল। হাঁা, প্রথম দেখার দিনে ডালি ঠিকই বলিয়াছিল! তার নজর আছে বলিতে হইবে। সর্ব্বাণীর চেহারাটা বাস্তবিকই কবিত্বপূর্ণ। ঐ ঘন নীলাভকৃষ্ণ সুনিবিড় কেশপাশ ঠিক তার তলাতেই কি মসৃণ ও চন্দ্রার্দ্ধবৎ সুগঠিত ললাটপট, মনে হয় যেন মৃদু তরঙ্গায়িত গভীর কালো নদীর জলে চাঁদের ছায়াটুকু ভাসিয়া আছে। আর কি গভীর কালো ও অতলস্পর্শী তার ঐ

দু'টী চোখ! ওদের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলে মনে হইবে, নিজেসুদ্ধ যেন ওর মধ্যে ডুবিয়া কোথায় তলাইয়া যাইতেছি! সুকুমার বিব্রতভাবে নিজের দৃষ্টি নত করিয়া ফেলিয়া হাত বাড়াইয়া ফুলের গুচ্ছটা তার দিকে ধরিয়া ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে কহিল, "এই নাও সর্ব্বাণি!"

উদ্যত উপহার সাগ্রহস্মিত মুখে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাণী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—'থ্যাঙ্ক্‌স্‌' দিতে হবে না কি?

ডালি ছুটিয়া আসিয়া সাশ্চর্য্য বিরসকণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল, "কি ছেলে মা! আমার ফুল কই? বাঃ রে! আমিই বল্লুম, আর আমারই ভাগ্যে জুটলো না! দাদা!—"

সুকুমার তাহার দিকে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় দেখাইয়া সর্ব্বাণীর কথার জবাব দিল, "সে তোমার খুশী আর আমার বরাত! তবে ফুলটা পাড়তে একটা কাঠ-পিঁপ্‌ড়ে কামড়ে দিয়েছে এটা নির্ঘাত সত্য এবং সেইটুকু জেনে রাখো।"

সর্ব্বাণী ব্যস্ততা দেখাইয়া কহিয়া উঠিল, "আহা, সত্যি? কোথায়? সে দংশিত স্থান দেখার জন্য ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িল। ডালি তাকে এক ঠেলা দিয়া বিকৃত মুখে বলিয়া বসিল, "থাক্ থাক্, অত আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না, ঢের হয়েছে! কামড়াবে না ওকে পিঁপড়ে? গাছের ডাল যে মাথায় ভেঙে পড়ে নি সেই ঢের হয়েছে! সমস্তক্ষণ আমার সঙ্গে আজ কি লাগাই না লেগেছে! বাব্বাঃ! সেই মুসুরী পাহাড়ের 'হাকম্যান্স' হোটেল থেকে সুরু করে একটানা এখন পর্য্যন্ত!"

পিপীলিকাদষ্ট স্থানে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিতান্ত করুণ-মুখে সুকুমার সর্ব্বাণীকে মধ্যস্থ রাখিয়া কহিতে লাগিল, "ও যে আমায় অত করে গাল দিচ্ছে, আচ্ছা সর্ব্বাণি! তুমি ওকে জিজ্ঞেস কর তো, আমি কথা কইলেই এখনি কি দোষ বেরোবে তাই আমি কইবো না,—কিন্তু তুমি জিজ্ঞেস করলে কোন দোষ হবে না; ও বলুক না ওর জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত কবে আমি ওর সঙ্গে লাগি নি যে, আজই আমাকে ও নতুন করে ওর সঙ্গে লাগতে দেখলে আর অমন করে শাপ দিলে? ঐ অত মোটা গাছের ডাল মাথায় পড়্‌লে মাথার কি হয়, সে কথা কি জানে না? ও তা'হলে চায় যে, আমার মাথা ভেঙে—"

"দাদা! কি যে তুমি সব বলো! না ভাই, লক্ষীটি! পায়ে পড়ি, তুমি থামো। আমি কি তাই বলেচি? কেন তুমি আমার জন্যেও একটা ফুল আনলে না?"

সুকুমার কহিল, "পিঁপড়ে কামড়ালো যে, তা'ছাড়া—"

"চুপ করলে কেন?"

"না, চুপ করবো কেন? ভাবছিলুম বলবো কি না,—যা তুই ছিঁচ-কাঁদুনী! নাঃ, না-বল্‌বোই বা কেন? সত্যং ব্রূয়াৎ—তোকে দেবে তোর ডালি! চেয়ে দেখ্ সত্যি কি না! হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুণ্‌তে শিখেছি না! ঐ দেখ মিষ্টার জি, পি, ব্যানার্জ্জী স্বয়ং সশরীরে বহাল তবিয়তে তোমার জন্যে তার বিধি-নির্দ্দিষ্ট 'ডালি' হাতে নিয়ে সহসা উপস্থিত! কি হে ব্যানার্জ্জী! পথ ভুলে, না পথ চিনে?"

বাস্তবিকই অনতিদূরেই একটা এই রকমেরই আরক্তাভ অত্যুজ্জ্বল রাগরঞ্জিত পুষ্পখচিত বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া সুকুমারের বন্ধু মিঃ ব্যানার্জ্জী এমনই একটা পুষ্পগুচ্ছ সংগ্রহ করিতেছিল, সে ইহাদের দেখিতে পাইয়াছিল কি না বলা যায় না, বাহ্য প্রকাশে যেন সাক্ষাৎটা দৈবাধীন বলিয়াই মনে হইল।

"এ কি! মুসুরী থেকে ফেরা হ'লো কখন? সকালেও তো খবর নিয়েছিলুম, চাকর বল্লে, ফেরার কোন খবর আসে নি।"

সুকুমার কহিল, "এই তো আমরা ফিরছি, ওঁরা ম্যালে মোটরে গেছেন, পথে দেখ নি?"

ব্যানার্জ্জী কহিল, "না, আমি ঘণ্টাখানেক যে আনন্দ-ভবনে জীবনবাবুর ওখানে বসেছিলুম কি না, এই কতক্ষণ মাত্র ওখান থেকে কফি খেয়ে বেরিয়েছি—"

"তোমার হাতের এ ফুলের ঝাড়টার প্রতি কোন ব্যক্তির লোভ লেগেছে বলে কি তোমার কিছুমাত্র সন্দেহ হচ্ছে না?"

মিষ্টার জি, পি, ব্যানার্জ্জী ভদ্রতার খাতিরে তার যে চোখের দৃষ্টিকে অন্যত্র ফিরাইয়া রাখিয়াছিল, এখন তাদের টানিয়া আনিয়া একবার ফরিয়া তার সম্মুখবর্ত্তিনী দুই জন মহিলার প্রতিই তাহা সন্নিবিষ্ট করিল এবং পরক্ষণেই সম্ভ্রমপূর্ণভাবে ঈষৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া ফুলটী ডালির সামনে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "অনুগ্রহ করে নিলে বাধিত হবো।"

"ধন্যবাদ"—বলিয়া ডালি ফুল লইল। তার মুখচোখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল, হাত বাড়াইতে হাতটাও কাঁপিতেছিল, এত সুস্পষ্ট সে কম্পন যে, মিঃ ব্যানার্জ্জী ঈষৎ যেন বিস্ময়ভরেই ফুল দিবার সময় তার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। প্রথমটা তার মনে হইয়াছিল অতিরিক্ত পথশ্রমের ফলে এ কম্পন, কিন্তু ডালির মুখের দিকে এক লহমার মত চকিতদৃষ্টি বুলাইতে গিয়াই সহসা তার একটা নূতন তথ্যের আবিষ্কার হইয়া গেল। সুকুমারের প্রস্তাব সে পূর্ব্বাবধিই পাইয়া রাখিয়াছে, বড় বেশী কান দেয় নাই; কিন্তু আজ এই গোধূলীর মিশ্রালোকের ধারায় মধ্যে সেই চঞ্চলা তরুণীর এই লজ্জাবিনম্র স্নিগ্ধ মুখে যেন তাহারই পুনরুক্তি শুনিতে পাইল। ঈষৎ বিমনা হইয়া সে মুখ ফিরাইয়া লইল, বাস্তবিকই কি ইহাই সত্য! অথবা সুকুমারের ঘটকালীর ধারায় কল্পিত ইহা তাহার নিছক কল্পনা? কিন্তু—কিন্তু যদি তাই হয়, ইহাতে কি অধিকার আছে তার?

সুকুমার তখন এই বলিয়া তার বোনকে ক্ষ্যাপাইবার এমন সুযোগটাকে সার্থক করিয়া লইতেছিল, "আমি তোকে কেন ফুল পেড়ে দিই নি দেখ্‌লি তো ডল? তুই মনে করছিলি তোকে বুঝি দেখতে পারি নে বলেই দিই নি। আচ্ছা দেখ—গণৎকার হয়েচি কি না! তবু জ্যোতিষ-শাস্ত্র পড়ি নি।"

মুখরা চপলা ডালি ভ্রূ বাঁকাইয়া চাহিয়াই তার মৃদু প্রতিবাদ গোপন করিল, কি জানি কি জন্য এই লোকটির সামনে থাকিলে ঝগড়া করা তার আসে না। সুকুমারের পক্ষে এ যেন হইয়াছে ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে শিখণ্ডী!

(ক্রমশঃ)

রাতের আকাশ

শ্রীনীলিমা দাস

মাঝ-রাতে ঘুম ভাঙে ; আকাশেরো চোখে ঘুম নাই ;
এ-তারাটি কথা কয়, ও-তারাটি মিটিমিটি হাসে,—
আকাশ জাগিয়া শুনে তাই !
এক ফালি বাঁকা চাঁদ একখানি পৃথিবীর বুক ভরে আলোর তিয়াষে,
সে-আলোতে মুখ দেখে আকাশ—নিজের মুখ—দেখে আর হাসে !
কোথা' হ'তে ভেসে' আসে কোথাকার উতলা বাতাস,
থেকে' থেকে' উন্মনা হ'য়ে ওঠে রাতের আকাশ ;
চারিদিক চুপচাপ্—দূরে কাঁপে হলুদের বন,
এ-রাতে চোখের ঘুম অকারণে টুটে' যায়, মন উচাটন !

রাতের নদীর বুকে রাতের আকাশ পড়ে নুয়ে' ;
সে-আকাশে এ-আকাশে কথা চলে মাঝ-রাতে,—
আমি শুনি বিছানায় শুয়ে' !
চুপি চুপি ছুটে আসে ঘুমে-পাওয়া হাওয়া,
নদী-বুকে দোল লাগে, থেমে' যায় আকাশে-আকাশে চুমু খাওয়া !
জোনাকীরা দল বেঁধে কী যে খোঁজে, জোনাকীরা জানে ;
এ-রাতে চোখের ঘুম অকারণে টুটে' যায়, মন ছোটে বাহিরের পানে !

আকাশের কোল-ঘেঁষা খোলা-মাঠে ফসলের ভিড়,
শিশিরের জলে নেয়ে' ভোরের আলোয় তারা শুকোয় শরীর ;
দূরে দু'টি দেবদারু—উঁচু শির তারালোক পানে,
আকাশের ভাষা বুঝি তারা আনে এ মাটির মানুষের কানে !
মাঝে মাঝে মাঠ-পারে আলেয়ারা জলে' নিভে' যায় ;
এ-রাতে চোখের ঘুম ছেড়ে' যায় চোখের কুলায় !

সহসা বাতাস বহে, কোথা' হ'তে ভেসে' আসে শাদা ছেঁড়া মেঘ,
আকাশের বুক বেয়ে বেয়ে চলে, প্রাণ-ভরা কিসের আবেগ !
মনে হয়, এমনি আবেগ বুকে নিয়া
ভেসে' যাই আজি অই এলোমেলো আকাশের ছায়াপথ দিয়া ;
তারালোকে পৃথিবীর প্রথম প্রণয় আর প্রণাম জানাই !
মাঝ-রাতে আজ তাই নয়নের নিদ্ ভাঙে, আকাশেরো চোখে ঘুম নাই

সাহিত্যের ভাষা

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

মনের কথাটি সত্য ক'রে বলা কতই না কঠিন। যে-কথাটি রয়েচে আমার মনে, সেটি তো সেখানে শুধু বর্ণমালার বানান করা একটি কথামাত্র হ'য়ে নেই। বানান-করা কথাটা তো কঙ্কাল, সেটাকে পরীক্ষাগারে নিয়ে হয়ত নাড়াচাড়া করা যেতে পারে, কিন্তু সাধারণের সামনে যদি সেটাকে তুলে ধরা যায়, সেটা তো একটা বিভীষিকা। আমরা চাই কঙ্কালকে আবৃত করে রক্তে মাংসে জীবন্ত যে-একটি রূপের প্রাণময় প্রকাশ সেটিকে প্রত্যক্ষ করতে এবং আপন মনে আপন কথাটিকে তেমনি ক'রেই প্রত্যক্ষ ক'রেও থাকি।

কিন্তু সেই কথাটিকে প্রত্যক্ষ করানো নিয়েই তো যত গোলমাল। তার কারণ বাইরের কথা আর মনের কথা এক নয়। কথাটি যতক্ষণ আছে আমার মনে, ততক্ষণ সে কথাটি আমার প্রাণচ্ছন্দে ছন্দিত হচ্চে; তার মাঝে আছে প্রাণের দোলা, আছে গতি, আছে তার আশ্চর্য্য লীলা। বাইরে ভাষায় তাকে ব্যক্ত করা যাবে কেমন ক'রে? মনের ভাব হ'ল এক জাতের, ভাষা বা শব্দগ্রন্থি হ'ল আরেক জাতের।

মানুষ মনোজগতের বিষয়টিকে ধ্বনিজগতে এনে যে রূপায়িত করবার প্রয়াস পেয়েচে, এইটে হ'ল তার একটা আশ্চর্য্য লীলা।

যা হ'ল ভাবজগতের অর্থাৎ মানুষের মনোময় ভাবনার বা কল্পনার ব্যাপার, তাকে যখন স্থূলধ্বনির জগতে এনে প্রকাশ করতে হ'ল তখন একটা অসাধ্য সাধন করতে হ'ল। এইখানেই মানুষ তার একটি আশ্চর্য্য শক্তিকে আবিষ্কার করল। সে হচ্চে কথা দিয়ে কথার অতীতকে প্রকাশ করবার কৌশল।

মানুষের মনে যে এত কথা, যা সে বলতে চায়, এই সব ভাব এবং অনুভব কি তার মনে জন্মকাল থেকেই সঞ্চিত হয়ে ছিল? না, তার কোনো প্রমাণ তো আমাদের কাছে নেই। মানুষের এই মন বস্তুটা কি, সেটা তার দেহের সঙ্গে কি ভাবে সংশ্লিষ্ট, সেই সব তত্ত্ব নির্ণয় করা মনস্তত্ত্বের বিষয়, এখানে আমাদের তা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনও নেই। আমরা জানি যে, আমাদের একটি এমন শক্তি আছে যা দিয়ে নিজের দেহের এবং বাইরের জগতের সম্বন্ধে নানা বিচিত্র অনুভব এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করচি। নানা ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে যত কিছু আমাদের সমুখে উপস্থিত হচ্চে, সেই সমস্তকে অর্থবত্তা দিয়ে জ্ঞানে অনুভবে রূপায়িত করাই হচ্চে তার কাজ।

সুতরাং এক হিসাবে বাইরের জগৎ থেকেই মন তার কথার উপাদান সংগ্রহ করচে; মন সেই সব শব্দ, বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদিকে নিজের মধ্যে গ্রহণ ক'রে তাকে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতায়, তার নিজের মনের কথায় রূপায়িত করচে। একই জগৎ থেকে উপাদান নিয়ে বিভিন্ন মনে তাই বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন রকমের কথার সৃষ্টি হচ্চে। বাইরের জগতের যদি একটা নিরপেক্ষ চিত্র—যেমন ফটোগ্রাফ—আঁকা যেত তা হ'লে দেখা যেত যে, সেটার সঙ্গে আমাদের মনে যে-জগতের চিত্র রয়েচে তার মিল কত কম।

আমাদের মন বাইরের জগৎ থেকে উপাদান নিয়ে তার মনের মত একটি জগৎ সৃষ্টি করেচে: সেই জগতের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈচিত্র্য রয়েচে বলেই সেটাকে সে বাইরের জগতের যত দশ জনের উপভোগ্য করে তুলতে চায়। এইখানেই মানুষের মনের কথা বলবার প্রেরণা জাগে। ভাষাসৃষ্টির মূলে হয়ত এই আত্মপ্রকাশের প্রেরণাই প্রধান। সর্ব্বপ্রথম যখন মানুষ কথা বলতে আরম্ভ করেছিল তখন তার প্রত্যেকটি শব্দই ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব প্রকাশ। তারপর ধীরে ধীরে ভাষা ব্যক্তিগত আত্মপ্রকাশের গণ্ডি পার হয়ে সামাজিক রূপ

ধারণ করেচে। অর্থাৎ ভাষা পরস্পরের সাধারণ ভাব আদান-প্রদানের বাহন হয়েচে। তাতে ভাষা মানুষের সাধারণ প্রয়োজন মেটানোর কাজে লাগচে।

ভাষার কাজ কিন্তু এইটুকুই নয়। গরুটা কয় সের দুধ দেয় তা জানানোর পক্ষে যে-ভাষা বা যে-শব্দসমষ্টির প্রয়োজন তাতে কোনো অস্পষ্টতাই নেই, থাকা বাঞ্ছনীয়ও নয়। প্রত্যেকটি শব্দ তার অর্থকে এখানে সঙ্কীর্ণ ক'রে আনতে বাধ্য: কারণ, তা না হ'লে ব্যবহারিক জগতের আদান-প্রদান ব্যাপারে রীতিমত গোলযোগ ঘটার সম্ভাবনা রয়েচে। দশজন মানুষকে নিয়ে আমরা যেখানে কারবার করি সে জগৎটা আমাদের কারু নিজস্ব জগৎ নয়, সেটা একটা কাটাছাঁটা জগৎ। দশের প্রয়োজনের দ্বারা সে সীমাবদ্ধ। তাই সেই জগতের মাঝে আমাদের প্রত্যেকেরই সহজ নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে বাধা লাগে। প্রয়োজনের দায় এড়িয়ে তাই আমরা প্রত্যেকে আমাদের মনের জগতে ফিরে আসি।

এই যে ভোর বেলা আমি শরৎকালের আকাশটিকে দেখচি, ওই যে মাঠের পথ দিয়ে রাখাল চলেচে, হাটের পথে পসারিণী চলেচে, ওই যে স্নিগ্ধ হাওয়ায় শস্যক্ষেত্রের ওপর দিয়ে শ্যামল ঢেউ খেলে যাচ্চে, এসব আমার চোখে ঠিক যেমনটি ঠেকচে, আমার মনে এই সব যে বিচিত্র বিস্ময়কর রূপ নিয়ে প্রকট হয়েচে তেমনটি কি আর কারু চোখে লাগচে? জোর করেই বলতে পারি, না; অন্য রকম হয়ত লাগচে, অন্যরূপ নিয়ে অন্য বিস্ময় নিয়ে হয়ত আরেক জনের মনে অন্য একটি জগৎ জাগচে, কিন্তু এই যে আমার মনের জগৎ এ কখনো আর কারু মনে নেই।

দশের জগতে চলা-ফেরা করতে করতে অনেকের মন এমনি অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তারা অনেকে ভুলেই যায় যে সত্যি তাদের নিজের নিজের একটি স্বতন্ত্র জগৎ আছে আর সেইটিই তাদের সত্যিকার জগৎ। প্রয়োজনের দায়ে মানুষ নিজস্ব জগৎ থেকে সাময়িক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে বাধ্য হয়। কিন্তু ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের মত আবার মানুষ তার নিজের ভুবনতলে ফিরে আসে। কিন্তু দিনান্তেও ফিরে আসবার সৌভাগ্য যাদের নেই, যারা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নিজের দেশটিকে ছেড়ে থাকতে বাধ্য হয় তারা কি দুর্ভাগা!

অথচ প্রয়োজনের দায়ে কত মানুষই এই দুর্ভাগ্য নিয়ে চলেচে। তারা নিজের জগৎ থেকে চিরতরে নির্ব্বাসিত বললেও চলে। কখনো কখনো গভীর শোকে, সন্তাপে, আনন্দে, উৎসবে, নিঃসহায়তার একাকিত্বে হয়ত তারা ফিরে আসে তাদের একান্ত নিজস্ব জগতের মাঝে কিন্তু তারা যেটুকু সময় সেখানে বাস করে সেটুকুও বিমূঢ়চৈতন্য হয়ে। তারা তা যেন বুঝতেও পারে না।

কিন্তু যে-জন এই নিজস্ব (ব্যক্তিগত এবং তার পক্ষে যা একান্ত সত্য সেই) জগতে একটু বেশি সময় বাস করে, সে স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারে যে, তার এই জগৎটি সাধারণের জগতের চেয়ে কত বিচিত্র। এই বিচিত্রতা তাকে ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল ক'রে তোলে: সে-ই এই জগৎকে দশের সমুখে উপস্থিত করতে চায়। সাধারণ জগতের সাধারণ ভাষা দিয়ে সে তার এই বিশিষ্ট এবং অসাধারণ জগৎটিকে প্রকাশ করবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করে। তখন ভাষাকে তার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে আরো বেশি প্রকাশ করতে হয়। সর্ব্বসাধারণের নিকট কোনো শব্দের যে-পরিচয় সে-পরিচয়কে অতিক্রম ক'রে তখন সে ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব অনুভূতি এবং দৃষ্টিকে প্রকাশ করবার কঠিন সাধনায় অগ্রসর হয়।

আত্মপ্রকাশের জন্য ভাষাকে তখন একটা রূপান্তর গ্রহণ করতে হয়। সাধারণ ভাষা আর ব্যক্তির আত্ম-প্রকাশের ভাষায় তাই একটা বিপুল ব্যবধান রয়েচে। এই ব্যবধানটির স্বরূপ বুঝতে পারলেই আমরা সাধারণ ভাষা আর সাহিত্যের ভাষায় প্রভেদ কোথায় বুঝতে পারব।

তার পূর্ব্বে দেখা যাক আমাদের মনের ভাবনা এবং অনুভবগুলো ভাষায় শব্দের সঙ্গে কি ভাবে জড়িত

হয়ে যায়। একেবারে আদিকালে আদিম মানবের মুখে কেমন ক'রে ভাবের আবেগে ভাষা ফুটে উঠেছিল সে কাল্পনিক আলোচনা ছেড়ে যদি আমরা শিশু-জীবনে ভাষার আবির্ভাব থেকে সুরু ক'রে পরিণত জীবনে ভাষার পরিণতি একটু ভালো ক'রে আলোচনা করি, তা'হলে দেখতে পাই যে, কোনো দু'টি মানুষ একটি বিশেষ বস্তুকে একই মানসিক অবস্থায় এবং একই পারিপার্শ্বিকের ও পারিপ্রেক্ষিকের মাঝ দিয়ে প্রত্যক্ষ করে না। এই কারণেই সাধারণ বস্তুপরিচয়ের মাঝেও আমাদের একটা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থেকে যায়। দশের সঙ্গে যেখানে আমরা মিলি সেখানে হয়ত কোনো একটি বস্তুর সাধারণ লক্ষণটি নিয়েই নাড়াচাড়া করি, কিন্তু যদি অন্তরের দিকে তাকানো যায় তা'হলে দেখা যাবে যে, প্রত্যেকটি বস্তুকে আশ্রয় ক'রে আমাদের প্রত্যেকের নানা বিচিত্র স্মৃতি, কল্পনা, রাগ, বিরাগ জড়িয়ে আছে। তাই প্রত্যেকটি বাহ্যবস্তুই নামের দিক দিয়ে সকলের কাছেই এক বলে পরিচিত হলেও বস্তুতঃ আমাদের প্রত্যেকের কাছে সেই বস্তুটির বাস্তবিক রূপটি একান্ত স্বতন্ত্র। তাই একই শব্দ উচ্চারণ ক'রেও সেই শব্দ দিয়ে আমরা মনের সামনে প্রত্যেকেই একটি স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট বস্তুকে জাগ্রত করে তুলি।

এই কারণেই ভাষার দু'টি রূপ স্বীকার না ক'রে উপায় নেই: একটি হ'ল তার সামাজিক রূপ: সে হ'ল যেন কাটাছাঁটা একটা মূর্তি। ভিন্ন ভিন্ন চেহারা-গুলোকে একের ওপর অন্যটিকে ছেপে যদি কোনো রূপ গড়ে তোলা যায় সেই রূপটিকে আমরা ভাষার সামাজিক রূপের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কিন্তু ভাষার আসল রূপটি ব্যক্তিগত; সেইখানেই ভাষা যথাসম্ভব সার্থক। কারণ আমার ভাষাটি কেবলমাত্র আমার মনেই আমার উদ্দিষ্ট ভাবটিকে ঠিক তার পরিপূর্ণতায় প্রকাশ করতে পারে, আর কোথাও নয়।

এই যে ব্যক্তিগত ভাষা সেইটিকে সমাজগত করে তোলার দুঃসাধ্য সাধনাই হ'ল সাহিত্যের ভাষার লক্ষ্য। দশের ভাষায় যে শব্দ একটি সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রযুক্ত হয়ে চলেছে, আমার কাছে সেই শব্দের আছে একটি বিশেষ অর্থ। ওই শব্দটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার সাধারণ অর্থের সঙ্গে আরো কত অলক্ষিত ভাব-অনুভব, কত অনুচ্চারিত সুর ও ছন্দ, কত গোপন বর্ণ এবং গন্ধও আমার চেতনাকে দোলা দেয়: ওই সব বিচিত্র অনুভবের জন্য আমি অন্য কোনো শব্দ রচনা করি নি। কারণ আমার পক্ষে ওই একটি শব্দই পর্যাপ্ত হয়েছিল।

কিন্তু আজ আমার মনে যখন আমার এই বিশিষ্ট উপলব্ধিটিকে তার সমগ্রতায় দশের নিকট উপস্থিত করবার কামনা জাগল তখন আমাকে একটা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হ'ল। যুগ যুগ ধ'রে সাহিত্যিক এই সমস্যাকেই পূরণ করবার চেষ্টা করে চলেছে। সাধারণ ভাষাকে নিয়েই সাহিত্যিকের কারবার অথচ তার কাজ হচ্ছে অসাধারণকে, বিশিষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে তার বাস্তবতায় প্রকাশ করা।

কেমন ক'রে এটি সম্ভব হয়েছে তার উত্তর দিতে হ'লে সাহিত্যের রাজ্যে প্রবেশ করতে হবে এবং সাহিত্যিকের ভাষাকে নিয়ে পরীক্ষা করে কোথায় তার অসাধারণত্ব তা বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

একটা ঝড়ের বর্ণনা নিই—

"রাগী মানুষ কথা কইতে না পারলে যেমন ফুলে ফুলে উঠে, সকাল বেলাকার মেঘগুলোকে তেমনি বোধ হ'ল। বাতাস কেবলই শ ষ স, এবং জল কেবলি বাকি অন্তঃস্থ বর্ণ য র ল ব হ নিয়ে চণ্ডীপাঠ বাধিয়ে দিলে, আর মেঘগুলোকে জটা দুলিয়ে ভ্রূকুটি ক'রে বেড়াতে লাগল। অবশেষে মেঘের বাণী জলধারায় নেবে পড়লো।......ঝড় ক্রমেই বেড়ে চললো। মেঘের সঙ্গে ঢেউয়ের সঙ্গে কোনো ভেদ রইল না। সমুদ্রের সে নীল রঙ নেই,—চারিদিকে ঝাপসা, বিবর্ণ। ছেলে-বেলায় 'আরব্য উপন্যাসে' পড়েছিলুম, জেলের জালে যে ঘড়া উঠেছিলো তার ঢাকনা খুলতেই তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে প্রকাণ্ড দৈত্য

বেরিয়ে পড়লো। আমার মনে হলো সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেছে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে আকাশে উঠে পড়ছে।"—রবীন্দ্রনাথ।

আরেকটি বর্ণনা শোনা যাক্—

"হঠাৎ বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই,—সমস্ত ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে। পরক্ষণেই একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই, এমন কিছুই জানি না।

"ছেলেবেলায় অন্ধকার রাত্রে ঠাকুরমার বুকের ভিতর ঢুকিয়া সেই যে গল্প শুনিতাম, কোন্ এক রাজপুত্র এক ডুবে পুকুরের ভিতর হইতে রূপার কৌটা তুলিয়া সাতশ' রাক্ষসীর প্রাণ—সোনার ভোমরা হাতে পিষিয়া মারিয়াছিল, এবং সেই সাতশ' রাক্ষসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, এও যেন তেমনি কোথায় কি একটা বিপ্লব বাধিয়াছে। তবে রাক্ষসী সাতশ' নয়; শত-কোটি;—উন্মত্ত কোলাহলে এইদিকেই ছুটিয়া আসিতেছে, আসিয়াও পড়িল। রাক্ষসী নয়—ঝড়। তবে এর চেয়ে বোধ করি তাদের আসাই ঢের ভালো ছিল।"— শরৎচন্দ্র।

ইংরাজী সাহিত্য থেকে আরেকটি সামুদ্রিক ঝড়ের বর্ণনা—

"The tremendous sea itself, when I could find sufficient pause to look at it, in the agitation of the blinding wind, the flying stones and sand and the awful noise confounded me. As the high watery walls came rolling in, and, at their highest tumbled into surf, they looked as if the least would engulf the town. As the receding wave swept back with a hoarse roar, it seemed to scoop out deep caves in the beach, as if its purpose was to undermine the earth... Undulating hills were changed to valleys, undulating valleys (with a solitary storm-bird sometimes skimming through them) were lifted up to hills; masses of water shivered and shook the beach with a booming sound; every shape tumultuously rolled on, as soon as made, to change its shape and place, and beat another shape and place away; the ideal shore on the horizon, with its towers and buildings, rose and fell; the clouds fell fast and thick,—I seemed to see a rending and upheaving of all nature."—Dickens.

এই তিনটি বর্ণনা শুধু মনে মনে পড়বার নয়, কানে শোনার, এই কথাটিই কি বর্ণনা পড়তে গিয়ে মনে হয় না? বাইরের যে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের বর্ণনা তিন জন দিয়েচেন তার মাঝে কি আমরা কেবল একটা নৈসর্গিক ঘটনার বিবরণ মাত্রই পাই? একটু বিবেচনা ক'রে দেখলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে, তা নয়। ওই বর্ণনার মাঝে যা আমাদের মনকে আনন্দ দেয় সেটা হচ্চে ওই ঘটনার ওপর দ্রষ্টার মনের নানা অনুভবের এবং কল্পনার বর্ণপাতে যে চিত্রটি ফুটে উঠেচে সেইটি। ওই চিত্র তিনটি কিন্তু বাইরের জগতে কোথাও ছিল না। প্রত্যেকটি চিত্রই এক একটি দ্রষ্টার নিজস্ব সম্পদ্। বর্ণনা কেবল বিবৃতি হয় নি প্রত্যেকটি বর্ণনা হয়েচে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। এই কারণেই বর্ণনাগুলো কেবলমাত্র ঘটনাবিশেষের বর্ণনাই হয় নি, তার মাঝে দ্রষ্টাও নিজকে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েচেন। প্রত্যেক লেখকের ব্যক্তিত্বটি আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য হয়েচে ওই বর্ণনার বিষয় এবং বর্ণনার ভাষায়।

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, ভাষায় তো কোনো বিশেষত্ব নেই, সেই তো কতকগুলো সাধারণ শব্দ কতকগুলো বাক্যে বিন্যস্ত হয়েচে। কিন্তু যদি শব্দের এবং বাক্যের ধ্বনির দিকে লক্ষ্য করা যায়

তা হলেই ধরা পড়বে শিল্পীর শব্দবিন্যাসের এবং বাক্য-রচনার আশ্চর্য্য কৌশল। ওই বর্ণনার মধ্যে লেখকের নানা কল্পনা এবং অনুভূতির সমবায়ে যে চিত্র ফুটে উঠেচে তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে কেবল যে শব্দের অর্থই সহায়তা করচে তা নয়; প্রত্যেকটি শব্দের ধ্বনিও তাতে আশ্চর্য্যভাবে বর্ণপাত করচে। প্রত্যেকটি বাক্যের মাঝে শব্দবিন্যাস এমনি সুকৌশলে করা হয়েচে যে, যদি আমরা সেই শব্দের শৃঙ্খলাটিকে বদলে দিই অথবা অন্য প্রতিশব্দ প্রয়োগ করি তা হলেই বর্ণনায় যে রূপটি প্রকাশ পেয়েচে সেটি তেমন করে প্রকাশ পাবে না।

সাহিত্যিকের ভাষায় এই ছন্দটিই হচ্চে সেই সোনার কাঠি যার স্পর্শে অতি সাধারণ ভাষা দ্যুতিময় হয়ে উঠে ব্যক্তির অন্তরের কত অলক্ষ্য ভাব এবং ভাবনাকে রূপায়িত ক'রে তোলে। জীবন্ত মানুষের চলায় যেমন একটি ছন্দ আছে তেমনি জীবন্ত ভাবেরও একটি ছন্দ আছে। যখন ভাষায় তার ঠিক ঠিক প্রকাশ ঘটে তখন ভাষাও হয়ে ওঠে অপরূপ। চলার ছন্দটিকে যেমন বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো চলে না, অথচ চক্ষুষ্মানের কাছে যেমন তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তেমনি ভাষার অপূর্ব্ব ধ্বনিচ্ছন্দটিও সাহিত্যরসিকের কানকে এড়িয়ে যেতে পারে না।

শব্দ এবং বাক্য নিয়ে এই যে ধ্বনি-বিন্যাস এটিকে সব চেয়ে বেশি কাজে লাগানো হয়েচে কাব্যে। কিন্তু তা বলে কাব্যেই যে তাকে একচেটিয়া ক'রে নেওয়া হয়েচে তা নয়। শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যিকের রচনায়ও লক্ষ্য করলেই আমরা এই ছন্দটিকে অনুভব করতে পারি। শব্দের ধ্বনির পারস্পরিক বিন্যাসটি এমনি একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার যে, তাকে অনুভব করা গেলেও সব সময় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ একটি সাধারণ লেখকের লেখার পাশাপাশি কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের রচনা রেখে দেখলেই এই বিভেদটি তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে।

অবশ্য ভাষার ধ্বনি-বিন্যাসই যে মনের কথাটিকে পরিপূর্ণ, ক'রে ব্যক্ত করার একমাত্র উপায় তা নিশ্চয়ই নয়। ধ্বনিবিন্যাসের পশ্চাতে ভাব-বিন্যাসের কারু-কর্ম। যে-কোনো বাহ্যিক দৃশ্যকেও যখন ভাষায় প্রকাশ করতে হয়, তখন কেবলমাত্র কতকগুলো চিন্তা এবং ভাবকে সংগ্রহ ক'রে একত্র করলেই তা চিত্রে পরিণত হয় না। ভাষাশিল্পীকে নিজের কল্পনার দ্বারা নির্ব্বাচিত ভাবরাশিকে একটি বিশেষ পরম্পরায় বিন্যস্ত করতে হয়। এই বিন্যাসের মাঝেই শিল্পীর ব্যক্তিত্ব, দৃষ্টিভঙ্গী এবং বর্ণিত বস্তুর বৈচিত্র্য এবং অপরূপত্ব ফুটে ওঠে।

ঝড়ের বর্ণনায় যা কিছু দৃশ্য তার যদি হুবহু তালিকা দেওয়া যায় তা হ'লে কখনো আমাদের মনের সামনে সেই দৃশ্যটি প্রকট হ'ত বলে মনে হয় না। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের বা শরৎচন্দ্রের মনে ঝড় যে বিচিত্র রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে তো হ'তই না। ঝড় কাকে বলে, তার অর্থ হয়ত বৈজ্ঞানিক অভ্রান্ত নিখুঁত ভাবেই দিতে পারবেন, কিন্তু সে বর্ণনা কোনোকালেও সাহিত্য হবে না। সে বর্ণনা হবে শব্দের সাধারণ অর্থের মতই বর্ণহীন, রূপহীন, কাঁটাছাটা একটা ব্যাপার। কিন্তু ভাষাচিত্রীর সেই সাধারণ অর্থ নিয়ে কি হবে? তিনি চান ঝড়ের সেই চিত্রটিকে সম্পূর্ণভাবে দিতে যেটি তাঁর মনে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তাই যখন শুনি সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেচে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে আকাশে উঠে পড়ছে, তখন একটা ভয়ানক বিস্ময়কর দৃশ্য মনের সামনে আবির্ভূত হয়ে মনকে অভিভূত করে ফেলে। এই ভাষার শিল্প। দৈত্যকে কেউ আমরা চোখে দেখি নি অথচ সেই দৈত্যের সঙ্গে যখন কালো মেঘের তুলনা হ'ল অমনি কালো মেঘের আয়তন এবং তার ভীষণ রূপটি সুগোচর হয়ে উঠল।

শরৎচন্দ্রের বর্ণনায়ও তাই, "লাক্ষ রাক্ষসী মৃত্যু-যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে করিতে পদভরে সমস্ত পৃথিবী মাড়াইয়া গুঁড়াইয়া ছুটিয়া আসিতেছে"—এমন দৃশ্য কে কবে কোথায় বা দেখেচে? অথচ যেই অন্ধের সঙ্গে

তাদের সেই ভয়ানক আবির্ভাবের তুলনা হ'ল, অমনি ঝড়ের সেই প্রলয়ঙ্কর রূপটি কি বাস্তব হয়েই না উঠল! ইংরাজ শিল্পী ডিকেন্সের ঝড় বর্ণনায়ও আমরা এই ব্যাপারটিই লক্ষ্য করি না কি? কল্পনার রসায়নে এই যে রূপায়ন একে সাহিত্যিক ভাষায় প্রধান বিশেষত্ব বললেও ভুল হবে না।

অথচ মজার ব্যাপার এই যে, ব্যক্তিগত কল্পনার রসায়নে বিচিত্র হয়ে যখন কোনো একটি চিত্র আমাদের দশের সমুখে উপস্থিত হয় তখন তা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে না। যখন সাহিত্যিক তাঁর মনের গোপন কল্পনা দিয়ে কোনো একটি দৃশ্যকে রঙিয়ে আমার নিকট নিয়ে এলেন তখন তাকে অপরূপ বিচিত্র এবং সুন্দর বলে মনে হ'লেও তাকে আমরা যেন অপরিচিতের মত মনে করতে পারি না। যেন কোথায় কবে দেখেছিলাম তার পর যেন আবার কবে তাকে ভুলে গিয়েছিলাম; কতকাল পরে সেই ভুলে-যাওয়াকে যেন শিল্পী কোথা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন, এমনি মনে হয়। আসল কথা, শিল্পী সাধারণ কথা দিয়ে যখন তাঁর মনের কথাটিকে ব্যক্ত করেন তখন সেই কথাটি যে আমাদেরও মনের কথা তাই বুঝতে পারি। যে-কথা আমাদেরও মনের কোনো গোপনে লুকিয়েছিল, যাকে আমরা হয়ত কোনো কালেও এই ব্যবহারিক জগতের প্রয়োজনের ভাষা দিয়ে প্রকাশ করতে পারতুম না, শিল্পী তাঁর আশ্চর্য্য মায়াবলে যেন সেই কথাটিকে প্রকাশ করে আমাদের মনের কথাকে মুক্ত করলেন।

তাই না কবি-সাহিত্যিক আমাদের এত প্রিয়!

দেবতা কি কেবল তোমাদেরই দেবতা, তোমাদের বিষয়-সম্পত্তির মতো। দেবতা সম্বন্ধে এমন ধারণার মতো দেবতার অপমান আর কিছুই হ'তে পারে না। ভারতবর্ষে দেবতা অপমানিত এবং মানুষ অপমানিত।

— রবীন্দ্রনাথ

বৈদ্যনাথ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিন দিন ধরিয়া কলিকাতায় বেজায় বর্ষা নামিয়াছে। এ ধরণের বর্ষা এ বছর পড়ে নাই। ছাতিতে জল আটকায় না কারণ সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াও তেমনি, রাস্তায় রাস্তায় জল বাধিয়া গিয়াছে। ট্রামে দিনের বেলা আলো জ্বালানো, দোকানে দোকানে সামনের দিকে তেরপল ফেলা, পথে ঘাটে লোকজনও খুব বেশী যে চলা-ফেরা করিতেছে এমন নয়।

আপিসে যাইতেছি, বেলা দশটা কি বড় জোর দশটা পনেরো। ট্রামে যাইতে পারিতাম কিন্তু এ বর্ষায় হাঁটিয়া যাইতে বড় ভাল লাগিতেছিল, ট্রাম লাইন পার হইয়া হাঁটা পথ ধরিলাম।

বৌবাজারের মোড়ে কে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল—দাদা, — ও দাদা — দাদা শুনুন —

আমাকেই ডাকিতেছে না কি? ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম। যে ডাকিতেছিল, সে কাছে আসিল। বছর পনেরো ষোল বয়স, পরণের কাপড় যৎপরোনাস্তি ময়লা, গায়ে চার-পাঁচ জায়গায় ছেঁড়া কোট, মাথার চুল রুক্ষ, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া, খালি পা; রাঙা রাঙা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—চিনতে পাচ্ছেন না দাদা, আমি বদ্দিনাথ।

ও! সেজ মামার ছেলে বোধে! এর বয়স যখন বছর দশেক তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তারপর বছর পাঁচ-ছয় আর দেখি নাই। কিন্তু না দেখিলেও ইহার বিষয় সব শুনিয়াছি। অতি বদ্ ছোকরা, দশ বছর বয়সে বাড়ী হইতে পালাইয়া হুগলীতে কোন্ যাত্রার দলে ঢোকে, বছর খানেক খোঁজ খবর ছিল না, হঠাৎ রাজসাহী হইতে এক বেয়ারিং পত্র পাওয়া যায় যে, বদ্দিনাথ টাইফয়েডে মর-মর, শেষ দেখা করিতে হইলে কালবিলম্ব না করিয়া ইত্যাদি। সেজ মামার ছেলের উপর তত টান ছিল না। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া কায়েমী সংসার পাতাইয়াছেন—প্রথম পক্ষের অবাধ্য ছেলে বাঁচুক্ বা মরুক্, তাঁর পক্ষে সমান কথা। কিন্তু বদ্দিনাথের পিসি কাঁদা-কাটা সুরু করাতে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বড় শালাকে রাজসাহীতে পাঠাইয়া দেন! সে যাত্রা বদ্দিনাথ বাঁচিয়া উঠিল, চুল-ওঠা জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা লইয়া বাড়ীও ফিরিল কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যেই আবার উধাও, আবার নিখোঁজ। এবারও আর এক যাত্রাদলে বছর খানেক ঘুরিয়া বোধে নগদ সতেরোটি টাকা হাতে বাড়ী আসিল ও সৎমায়ের কাছে টাকাটা জমা রাখিল। অত বড় ছেলে বাড়ী বসিয়া খায় ও দু' তিনদিন অন্তর সৎমায়ের কাছে পয়সা চাহিয়া লয়, আজ আট আনা, কাল তিন আনা, তারপর দিন এক টাকা। চুল ছাটিতে হইবে, শার্ট তৈরী করিতে দিতে হইবে, বন্ধু-বান্ধবে খাইতে চাহিয়াছে, নানা অজুহাত। আসলে জানা গেল যে, বিড়ি-সিগারেটেই বদ্দিনাথের মাসে চার-পাঁচ টাকা লাগে। তা ছাড়া চা, বাবুগিরি, স্যাবান, কলিকাতায় যাওয়া ইত্যাদি আছে। সে সতেরো টাকার মধ্যে টাকা দুই সংসারের সাহায্যে লাগিয়াছিল, বাকীটা বদ্দিনাথের ব্যক্তিগত সখের খরচ যোগাইতে ব্যয়িত হয়। সেজ মামার সংসারের অবস্থা খুব সচ্ছল নয়, দুই টাকায় যখন বদ্দিনাথ সাত মাস বসিয়া খাইল এবং নিজের টাকা ফুরাইলে জোর-জুলুম গাল-মন্দ করিয়া বিমাতার নিকট হইতে আরও চ'চার টাকা আদায় করিল—তখন সেজ মামা স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন তাহাকে এরূপ ভাবে বসিয়া খাওয়াইতে তিনি পারিবেন না। বদ্দিনাথ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আরও সাত মাস বসিয়া সংসারের অন্নধ্বংস করিল, খুব নিশ্চিন্ত মনেই করিল—আরও কয়েক টাকা সৎমায়ের নিকটে আদায় করিল, বৈমাত্র ভাই-বোনের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ মার-ধোর করিল—শেষে সেজ মামার শ্বশুর

বাড়ীর (শ্বশুর বাড়ীর গ্রামেই মেজমামা ইদানীং বাস করিয়াছিলেন) কাহার পকেট হইতে টাকা চুরি করিয়া একদিন দুপুরে আহারাদির পরে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। সে আজ বছর দুই আগেকার কথা।

কিন্তু এ সকল কথাই আমি শুনিয়াছিলাম এক তরফা—বদ্দিনাথের শত্রুপক্ষের মুখে। অর্থাৎ তার সৎমা ও বাবার মুখে। বদ্দিনাথের স্বপক্ষেও হয়ত অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সে কথা আমি শুনি নাই। বদ্দিনাথকে আজ এ অবস্থায় দেখিয়া মনে মনে তাহার উপর সহানুভূতি হইল—বলিলাম—ভিজছিস্ কেন? আয় ছাতির মধ্যে। তারপর এ অবস্থায় কোথা থেকে? শ্রীরামপুরে যাস্ নি আর?

শ্রীরামপুরেই মেজ মামার শ্বশুর বাড়ী।

বদ্দিনাথ রাঙা দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিল।

—না দাদা, সেখানে বাবা বাড়ী ঢুকতে দ্যায় না। বলে, টাকা রোজগার করবি নে তো বসে বসে তোকে খাওয়ায় কে? গেছলুম আষাঢ় মাসে। বাবা হুকুম দিয়ে দিলে আমার ভাত বন্ধ করে দিতে। রাত্তিরে ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম। বাবা দোকানে খাতা লিখতে বেরিয়ে গেলে মাকে গিয়ে বলতুম, ভাত দাও নৈলে কি আমি না খেয়ে মরবো না কি? মা চুপি চুপি খাইয়ে দিত। আবার এসে সারাদিন ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম। এ রকম কোরে ক'দিন কাটে? সত্তোরই আষাঢ় বাড়ী থেকে বেরিয়েচি আবার।

বলিলাম — এ ক'দিন ছিলি কোথায়?

— গাড়ীতে গাড়ীতে বেড়াচ্চি। পরশু দিল্লী এক্সপ্রেসে বেনারস গেছ্‌লুম, আজ এই এলুম। পথে পথেই ঘুরচি ক'দিন — আমার তো আর টিকিট লাগে না? ধরবে কে? এ গাড়ীতে চেকার এল, ও গাড়ীতে গিয়ে বসলুম। নিতান্ত ধরলে বলুম, গরীব ভিখিরী, পয়সা নেই। বল্লে, নেমে যাও। নিতান্ত গালমন্দ দিলে তো নেমে গিয়ে পরের ট্রেণে আবার চড়লুম। গাড়ীর মধ্যে বসে থাক্‌লে তবু তো বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচি?

বৃষ্টিটা আবার জোরে আসিল। দু'জনে একটা গাড়ী-বারান্দার নীচে দাঁড়াইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম —তোর মামার বাড়ীতে যাস্ নে কেন, শুনিচি তাদের না কি বেশ অবস্থা ভালো?

— ভালো তো, কিন্তু তারা আমায় দেখ্‌তে পারে না। সেবার বসিরহাটে আমাদের দলের গাওনা ছিল তো, ওখান থেকে মামার বাড়ী গেলুম। বড় মামা বল্লে — এখানে কি জন্তে এলি? দিদিমা বল্লে—যাকে নিয়ে সম্বন্ধ, সে-ই যখন চলে গিয়েছে তখন তোর সঙ্গে আর সুবাদ কিসের? তুই আর এখানে আসিস্ নে। সেই থেকে আর যাই নে।

একটা খাবারের দোকানে বসাইয়া বদ্দিনাথকে কিছু খাওয়াইলাম। সে যেরূপ গোগ্রাসে খাইতে লাগিল, তাহাতে বুঝিলাম কয়েকদিন তাহার অদৃষ্টে আহার জোটে নাই বোধ হয়। মনে কষ্ট হইল — ছোঁড়াটার নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ, এই বৃষ্টি-বর্ষায় ছেঁড়া কাপড় পরিয়া খালি পেটে আশ্রয় অভাবে আজ দিল্লী, কাল বেনারস করিয়া রেলে রেলে বেড়াইতেছে, দূর দূর করিয়া শেয়াল-কুকুরের মত সবাই তাড়াইয়া দিতেছে, এমন কি নিজের বাবা পর্য্যন্ত! বেচারী তবে যায় কোথায়? বলিলেই তো হইল না।

ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম—এক কাজ কর বোদে, তুই রাণাঘাটে আমার বাসায় গিয়ে থাক্। চল্ আমি তোকে টিকিট কেটে গাড়ীতে উঠিয়ে দিচ্চি—সেখানে বাড়ীর ছেলের মতন থাকবি, কোন কষ্ট হবে না, চল্।

টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া বদ্দিনাথের হাতে আনা দুই পয়সা দিয়া বলিলাম — পথে যদি দরকার হয় রৈল তোর কাছে।

শনিবারে রাণাঘাটে গিয়া দেখিলাম বদ্দিনাথ বাড়ীতে মেয়েদের কাছে খুব আদর-যত্ন পাইতেছে। কাপড়-জামা মেয়েরা সাবান দিয়া কাচিয়া দিয়াছে,

বদ্দিনাথের চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মাথার চুল দশ আনা ছ'আনা ছাঁটা, বেশ টেরী কাটা, পথের মোড়ে সাঁকোর উপর বসিয়া বিড়ি খাইতেছিল, আমায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিল।

দাদার ছোট মেয়ে পাঁচীর জন্য একখানা সাবান আনিয়াছিলাম, দুপুরের পরে সেখানা ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে দিতেছি, বদ্দিনাথ ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া বলিল—ও সাবান কি করবে দাদা, দিন্ আমায় দিন্—দিন্ না?···

আমি একটু অবাক্ হইয়া গেলাম। ষোল-সতেরো বছরের ছেলে, নিতান্ত খোকাটি নয়—সাত-আট বছরের মেয়ে, সম্পর্কে তার ছোট বোন্ হয়—তার জিনিস কাড়িয়া লইতে যায়, আর বিশেষ করিয়া আমার হাত হইতে! পাঁচীকে বলিলাম—পাঁচী, এ সাবানখানা তোর দাদাকে দে—তোর জন্তে এখানকার বাজার থেকে আর একখানা আনিয়ে দেবো'খন। কেমন তো?

পাঁচী আমার কথার প্রতিবাদ করিল না। নীরবে কাঁদো কাঁদো মুখে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সাবানখানা বদ্দিনাথ লোভ-লোলুপ ব্যগ্রতার সহিত আমার হাত হইতে একরূপ লুফিয়াই লইল। মনটা আমার কেমন অপ্রসন্ন হইয়া গেল।

দু'দিন পরে দেখিলাম বদ্দিনাথ বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের সকলকে শাসন করিতে সুরু করিয়াছে। কাহাকেও বলিতেছে, হাড় ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিব, কাহাকেও বলিতেছে, পিঠে জলবিছুটি দিব ইত্যাদি। হয়তো কেউ খাবারের জন্তে বাড়ীতে বিরক্ত করিতেছে, কেহ বা বলিতেছে সে আজ কিছুতেই চুল ছাঁটিবে না, কেহ বা তেতো ওষুধ খাইতে চাহিতেছে না, কিংবা হয়তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়াছে—এই সব তাহাদের অপরাধ। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কেষ্ট ঠাকুলি মার-ধর করে—এ আমি একেবারেই পছন্দ করি না। বদ্দিনাথকে ডাকিয়া বলিয়া দিলাম—ওদের কথায় তোর থাকবার দরকার কি রে বোদে?···ওরা যা খুসি করুক্ না, তুই ওরকম করে বকিস্ নে ওদের।

মাঝে আর একবার রাণাঘাটে গেলাম। বদ্দিনাথকে বাড়ীতে না দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—বদ্দিনাথ কোথায়, দেখ্‌চি নে যে?

শুনিলাম সে বাড়ীতে প্রায় থাকে না, দু'বেলা খাওয়ার সময় হাজির হয় মাত্র, ষ্টেশনের কাছে—কোন্ পাউরুটির দোকানে তার আড্ডা—সেখানে দিন-রাত বসিয়া ইয়ার্কি দেয়। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরা তাহার নামে নানা অভিযোগ উত্থাপিত করিল। দাদার মেয়ে বলিল—আমার সে সাবানখানা বদ্দিনাথ কাকা কেড়ে নিয়েচে, বল্লে—যদি না দিস্ তবে তোকে মেরে চিংড়ি মাছ বানাবো।

সন্ধ্যার সময়ে মোহিত ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারীতে বসিয়া চা খাইতেছি—বদ্দিনাথ আসিয়া বলিল—চার আনা পয়সা দিন্, বৌদি বলে দিলেন বাজার থেকে আলু নিয়ে যেতে হবে। বদ্দিনাথের উপর মনটা তত প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু পয়সা দিতে গিয়া মনে মনে ভাবিলাম—যাই হোক্, দুষ্টুমিই করুক্ আর যাই করুক্, বাসার একটু আধটু সাহায্য তো ওকে দিয়ে হচ্চে।···বয়েস কম, দুষ্টুমি একটু-আধটু করেই থাকে!

দু'তিন দিন পরে বৌদি আবার কতকগুলি নূতন অভিযোগ বদ্দিনাথের বিরুদ্ধে যখন আনিলেন—তখন ওই কথাই আমি বলিলাম। বৌদি বলিলেন—কবে কোন্ কাজ করে ও? কে বলেছে তোমায় ঠাকুর-পো? শুধু খাওয়া আর পাউরুটির দোকানে না কোথায় বসে ইয়ার্কি দেওয়া, এ ছাড়া আর কি কাজ ওর?

বলিলাম—কেন, হাট-বাজার তো প্রায়ই করে। এই তো সেদিনও তুমিই ওকে বাজার কর্তে দিয়েছিলে, আলু না কি—এর আগেও তো অনেকবার—

বৌদিদি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আমি? কবে—কৈ—আমার তো মনে হয় না, কে বল্লে?

আমি বলিলাম—বল্‌বে আবার কে? আচ্ছা দাঁড়াও, ভজিয়ে দিচ্চি।

আমার মনেও কেমন সন্দেহ হইল। বদ্দিনাথকে ডাকাইলাম কিন্তু তাকে বাড়ীতে পাওয়া গেল না। বৌদিদি বলিলেন তিনি দিব্য করিতে প্রস্তুত আছেন যে, বদ্দিনাথকে কখনও কিছু কিনিয়া আনিতে তিনি দেন নাই। তখন মনে পড়িল বদ্দিনাথ এটা ওটা বাড়ীর ফরমাজের ছুতায় আমার নিকট হইতে দু'আনা চার আনা অনেকবার আদায় করিয়াছে, প্রায়ই যখন মোহিত ডাক্তারের ডিস্‌পেন্‌সারীতে বসিয়া আড্ডা দিই, সেই সময় গিয়া চায়—উঃ, ছোক্‌রা কি ধড়িবাজ, ঠিকই বুঝিয়াছিল যে, আমি যখন আড্ডায় মজ্‌গুল, তখন পয়সা চাহিলেও আমি তার কাছে কোনো কৈফিয়ৎ চাহিব না, কেন পয়সা, কিসের জন্য পয়সা—অথবা বাড়ীতেও সে বিষয়ের উল্লেখ করিতেও ভুলিয়া যাইব।

ভাবিলাম, ছোঁড়াকে এমন শিক্ষা দিব যাহাতে ওপথে আর কখনো না যায়, কিন্তু সেদিন আমি আহারাদি করিয়া রাত্রের ট্রেণে যখন কলিকাতা রওনা হইলাম, তখনও পর্য্যন্ত বদ্দিনাথ বাড়ী ফেরে নাই।

পুনরায় বাড়ী আসিলাম মাসখানেক পরে।

বদ্দিনাথের কথা তখন নানা কাজে একরূপ চাপা পড়িয়া গিয়াছে—তাহার উপর রাগটাও পড়িয়া গিয়াছে। পূজার অল্পই দেরী, রাণাঘাটের বাজারেই প্রতি বছর কাপড় চোপড় কিনি, কে বহিয়া আনে কলিকাতা হইতে? হইল না হয় দু'এক পয়সা দর বেশী। বাড়ীর ছেলে-মেয়ে সঙ্গে লইয়া কাপড়ের দোকানে গিয়া তাদের পছন্দসই জিনিষ কিনিবার বেশ একটা আনন্দ আছে, কলিকাতা হইতে মোট বাঁধিয়া কাপড় কিনিয়া আনিলে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বদ্দিনাথ আর্জ্জি পেশ করিল, তাহার কাপড় চাই, জুতা চাই, সার্ট চাই, গামছা চাই, একটা টিনের তোরঙ্গ চাই।

দেখিলাম অনেক টাকার খেলা। তোরঙ্গের কি দরকার এখন? থাক এখন, পূজার পর দেখা যাইবে। দু'জোড়া কাপড় কেন, এখন এক জোড়াই চলুক, একটা সার্টেই পূজা কাটিয়া যাইবে এখন। জুতা একেবারেই নাই? পায়ের মাপটা দিলে বরং আস্‌চে শনিবার চীনে বাড়ী—

পূজার সপ্তমীর দিন একটা ঘটনা ঘটিল। বৈঠক-খানায় বসিয়া দৈনন্দিন বাজার হিসাব লিখিতেছি, বাহির হইতে অপরিচিত চড়া গলায় কে বলিল—এইটে কি সামন্ত পাড়ার বিনোদ চৌধুরীর বাড়ী?

জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলাম—আমারই নাম। কি চাই?

মড়ুইপোড়া বামুনের মত চেহারা একটা পাকসিটে গড়নের লোক ঘরে প্রবেশ করিল। মাথার চুল কাঁচায় পাকায় মেশানো, আর লম্বা লম্বা, গায়ে আধ ময়লা গেঞ্জির ওপরে একটা চাদর। হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ভালোই হলো, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রণাম হই চৌধুরী মশায়। কথাটা বল্‌তেই হয় শেষকালটা। আপনার ছোট ভাই সুরেন আমাদের দোকান থেকে—

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—আমার ছোট ভাই সুরেন?

—হ্যাঁ, ঐ যে লম্বা, একহারা কালোমত চেহারা, ছোক্‌রা—ষোল-সতেরো বছর বয়স—

বুঝিতে বিলম্ব হইল না লোকটা কাহার কথা বলিতেছে। বলিলাম হ্যাঁ, কি করেচে শুনি?

—কি আর করবে, সর্ব্বনাশ করেছে মশাই। আমাদের ঐ ইষ্টিশানের মোড়ে রুটি-বিস্কুটের কারখানা আর দোকান—দেখেচেন বোধ হয়, বাবু তো ওইখান দিয়েই যান আসেন। আমারই নাম রতন ঠাকুর, শ্রীরামরতন বাঁড়ুয্যে। আজ্ঞে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়, কি করি, পেটের দায়ে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—তারপর কি হয়েচে বল্‌ছিলেন?

সে এক লম্বা গল্প করিয়া গেল। বদ্দিনাথ ওখানে বসিয়া আড্ডা দিত, আমার সহোদর ভাই এবং নাম সুরেন এই পরিচয় দিয়া সেখানে খুব খাতির জমাইয়াছিল। বলিত, দাদার সঙ্গে বনিতেছে না, শীঘ্রই সে না কি পৃথক হইবে। রাধাবল্লভতলায় একখানা বাড়ী আছে, তাহারই ভাগে পড়িবে সেখানা। তখন সে-ও রতন ঠাকুরের রুটি-বিস্কুটের ব্যবসায় যোগ দিবে, কিছু মূলধন ফেলিতেও রাজী আছে। রতন ঠাকুর তাহাকে বিশ্বাস করিয়া দোকানে বসাইয়া মাঝে মাঝে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নিজের ভেণ্ডারদের কাছে যাইত — এরকম আজ মাস দুই চলিয়া আসিতেছে, রতন কোন অবিশ্বাস করিত না। ইদানীং রতন তাহারই উপর কেনা-বেচার ভার দিয়া হয়তো দু'পাঁচ ঘণ্টার জন্য দোকানে অনুপস্থিত থাকিত। গত কল্য রতন চাকদায় গিয়াছিল কি কাজে; বদ্দিনাথকে দোকানে বসাইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে ক্যাশ মিলাইতে গিয়া রতন দেখে ছাব্বিশ টাকা তেরো আনা ক্যাশ বাক্স হইতে উধাও হইয়াছে। নিশ্চয়ই এ বদ্দিনাথ ছাড়া আর কাহারও কাজ নয়, হইতেই পারে না, তাই সে সকালেই ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়াছে।

কোনো রকমে বুঝাইয়া ভরসা দিয়া রতন ঠাকুরকে বিদায় দিলাম। যখন আমার সহোদর ভাই বিশ্বাসে রতন ঠাকুর তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, তখন সে আমার যেই হোক্—টাকা মারা যাইবে না রতনের। না হয় আমি নিজেই দিব।

বদ্দিনাথকে রতনের সামনে ডাকানো আমি উচিত বিবেচনা করিলাম না। ঘরের ভিতর তর্কাতর্কি কথা কাটাকাটি আমি পছন্দ করি না।

রতন চলিয়া গেলে বদ্দিনাথকে ডাকাইয়া বলিলাম— আমার এখানে থাকা তোমার পোষাবে না বদ্দিনাথ, তুমি অন্য জায়গা দেখে নাও।

বিকালে বদ্দিনাথ পোটলা-পুটলি লইয়া বিদায় হইল। এর পরে বদ্দিনাথকে দেখি নাই আর অনেক দিন।

মাস পাঁচ ছয় পরে ট্রেণে কলিকাতা হইতে ফিরিতেছি, বারাকপুরের প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ দেখি অতি মলিন এক কাচা গলায় বদ্দিনাথ। ব্যাপার কি? সেজ মামা ও মামীমা দিব্য সুস্থ দেহে বর্ত্তমান আছেন, গত শনিবারেও দেখা করিয়া আসিলাম, তবে বদ্দিনাথের গলায় কাচা কিসের? ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই বদ্দিনাথ আমার গাড়ীর দরজাতে আসিয়া পৌছিল এবং ইনাইয়া বিনাইয়া যাত্রীদের কাছে বলিতে লাগিল যে, সম্প্রতি তার মাতৃ-বিয়োগ হইয়াছে, তাহার আর কেহ নাই, কি করিয়া মাতৃদায় উদ্ধার হইবে ভাবিয়া ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না, অতএব—ইত্যাদি

আমি দেখিলাম, আমার কামরায় আসিল বলিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সে কামরা হইতে নামিয়া অন্য একখানা গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। কি বিপদ! কি বিপদ! এমন বিপদেও মানুষে পড়ে!

একদিন বড় মামার বাসায় গিয়া গল্পটা করিলাম। বড় মামা বলিলেন — ওর কথা আর বোলো না। মধ্যে কি মাসটা এখানে তো এল। তোমার মামীমা বল্লেন, বোদে তুই তো এলি—তোর পকেটে তো একটা পয়সাও নেই দেখ্ছি—আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে রে। বোদে বল্লে, আমারও ভয় হচ্ছে জ্যাঠাইমা, টুনুর গলার হার, ছোট খুকীর বালা সাম্‌লে রাখো। তোমার মামীমা তখুনি তাদের হার বালা সব খুলে ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরলে। খুব সকালে বদ্দিনাথ চলে গেল আমি তখনও মশারীর মধ্যে শুয়ে। একটু বেলা হোলে দেখি, আমার বাঁধানো হুঁকোটা ঘরের কোণে নেই। খোঁজ্ খোঁজ্, আর খোঁজ্!... ...কার কীর্ত্তি বুঝ্‌তে বাকী রইল না। সেই থেকে আর তাকে দেখি নি। ছোকরাটা এমন করে উচ্ছন্নও গেল! ওর বাবারও দোষ নেই। ওকে মানুষ করবার চেষ্টা যথেষ্ট করেছিল কিন্তু যে মানুষ না হবার, তাকে মানুষ করে কার সাধ্যি? পুজোর পরে সেজ মামার পত্রে জানিলাম, দত্তপুকুরের

জমিদার কাছারী হইতে একখানা পুরানো কাপড় চুরি করিবার ফলে বদ্দিনাথের জেল হইয়াছে তিন মাস। জেল হইতে বাহির হইবার অনেক দিন পরে সে একবার রাণাঘাটে আমার বাসায় আসিল। সবারই মুখে শুনিতে পাইলাম বদ্দিনাথ ভালো হইয়া গিয়াছে, কি করিয়া তাহারা এ কথা জানিল, আমি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ দেখি বদ্দিনাথকে বাড়ীর সবাই খুব যত্ন আদর করিতেছে। দিন দুই তিন বাসায় থাকিল, একদিন সকালে বদ্দিনাথ চা খাইতে খাইতে আমারই সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে, বৌদিদি আসিয়া বলিলেন, বোদে, এই বাটি রইল আর ঠাকুরপোর কাছ থেকে দশটা পয়সা নিয়ে ওই মোড়ের দোকান থেকে সর্ষের তেল নিয়ে আসিস্ তো। বদ্দিনাথকে পয়সা বাহির করিয়া দিলাম চা খাওয়ার পরে। বদ্দিনাথ কাঁসার বাটিটা হাতে করিয়া পয়সা ট্যাঁকে গুঁজিয়া বাহির হইয়া গেল। সকাল সাড়ে সাতটার বেশী নয়।

বদ্দিনাথের সঙ্গে পুনরায় দেখা বছরখানেক পরে, হঠাৎ একদিন কলিকাতায়, 'সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে'র মধ্যে একটা গলির মোড়ে। জীর্ণ, মলিন, ছন্নছাড়া মূর্ত্তি—খালি পা, বড় বড় ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, যেমন ময়লা কাপড় পরণে, ততোধিক ময়লা জামা গায়ে।

প্রথম কথাই আমার মুখ দিয়া কি জানি বাহির হইয়া গেল—হ্যারে, বোদে, বাটিটা কি করলি রে?—

এই একবৎসর যেন ওই কথাটা জানিবার জন্যই হাঁ করিয়াছিলাম। বদ্দিনাথ বিপন্নমুখে কি একটা জবাব দিবার দু'একবার চেষ্টা করিতে গিয়া যেন বিষম খাইল এবং হঠাৎ সুড়ুৎ করিয়া পাশের গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কথিত আছে, বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক নিউটন বলিয়াছিলেন—'আমি জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।' এই দীনতা বিস্ময়ের বস্তু এবং তাঁহার জ্ঞানের গভীরতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই! দীনতার প্রতীক এই অনন্যসাধারণ মনীষীর পুণ্যস্মৃতি জগৎ শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে পূজা করিতেছে।

আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু

বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন, ভারতের মুকুটমণি আচার্য্য জগদীশচন্দ্র একদিন জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন—'আমাদের জ্ঞান কতটুকু! আমরা যদি প্রকৃতির গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চাই, যদি পথের বাধা দূর করিতে চাই, তবে আমাদের অজ্ঞতা ঢাকিলে চলিবে না; জানিতে হইবে—আমরা কতখানি জানি না',—সত্যদ্রষ্টা মনীষীর এই উক্তি আমাদিগকে নিউটনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায়, বিস্ময়ে আপনা-আপনিই আমাদের মস্তক অবনত হইয়া পড়ে।

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক্ হইতে অনেকেই অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী বৈজ্ঞানিক কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গেলেও এক বিরাট গ্রন্থ লিখিতে হইবে; কাজেই এ প্রসঙ্গে আমরা একটি মাত্র আবিষ্কার এবং তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অপরাপর দিক্ হইতে সাধারণভাবে দুই একটি কথা বলিব।

ভারওয়ার্থ প্রমুখ পণ্ডিতেরা প্রাণী ও অপ্রাণীর

পার্থক্য নিরূপণকল্পে প্রাণীদেহে 'জীবনী-শক্তি'র অস্তিত্ব এবং অপ্রাণীতে তাহার অনস্তিত্বমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু জীবনের চরম রহস্য সমাধানের অগ্রগতির পথে এ সিদ্ধান্ত বিশেষ কোন সহায়তা করে নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র তাঁহার অক্লান্ত সাধনায় যখন প্রাণী, উদ্ভিদ ও অপ্রাণী—এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইলেন—যখন এই তিনের মধ্যে কোন সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা দেখিতে পাইলেন না, তখনই এই চিরন্তন রহস্যের আর একটি গুপ্ত-দ্বার তাঁহার চক্ষের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া গেল। তখনই তিনি 'জীবনী-শক্তি'র অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব-জ্ঞাপক হেঁয়ালীপূর্ণ সিদ্ধান্তের ভ্রান্তিনিরসন কল্পে 'ইম্পিরিয়েল ইনষ্টিটিউটে'র সভায় সদস্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—'আমার মনে হয়, জীব ও উদ্ভিদের সাড়ালিপির এই আশ্চর্য্য-জনক সৌসাদৃশ্য দেখাইয়া আমি প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, জীব ও উদ্ভিদে একই প্রকার প্রাণ-স্পন্দন বিদ্যমান, অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে একই প্রকার 'জীবনী-শক্তি' কার্য্য করিতেছে! যদি আমরা কখনও জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান করিতে সমর্থ হই, তবে তাহা অপেক্ষাকৃত সরল শারীরিক গঠনবিশিষ্ট দেহের ভিতর অনুসন্ধানের ফলেই সম্ভব হইবে। সহজ কথায় বলা যায়—অপ্রাণীর ভিতর অনুসন্ধানের ফলেই প্রাণী-দেহের 'জীবনী-শক্তি'র রহস্যের সন্ধান পাইব। পরীক্ষায় যতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তাহাতে আমার এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, জৈব, অজৈব সমস্ত পদার্থের 'সাড়া'ই উত্তেজনা-প্রসূত আণবিক স্পন্দনের ফল।'

জগতের কোন ঘটনাই যখন বিনা কারণে ঘটে না, তখন এই জীবন-স্পন্দন কিরূপে স্বতঃসিদ্ধ হইল? ইহার মূলে 'জীবনী-শক্তি' রহিয়াছে—এই উত্তরে কেবল মাত্র বাক্‌চাতুর্য্যই প্রকাশ পায়, অজ্ঞতা লুকাইবার প্রচেষ্টাই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাই আচার্য্যদেব এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—যখন প্যারীর 'সায়েন্স একাডেমী'তে প্রথম ফনোগ্রাফ যন্ত্রের কার্য্যকারিতা প্রদর্শিত হয় তখন কোন সদস্যই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, যন্ত্রসহযোগে সত্য সত্যই মনুষ্য-কণ্ঠস্বর উৎপন্ন করা সম্ভব। কেহ কেহ ইহাকে Ventriloquist-এর চাতুরী মনে করিয়া টেবিলের নিম্নে লুক্কায়িত ব্যক্তির সন্ধানে অগ্রসরও হইয়াছিলেন; কিন্তু নিরাশ হইয়া অবশেষে স্থির করিলেন—নিশ্চয়ই ইহা কোন অদৃশ্য ভৌতিক শক্তির কার্য্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, যখনই আমরা কোন বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হই, তখনই সাময়িক আত্মতৃপ্তির জন্য বাক্‌-চাতুর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকি। প্রাণীদেহে 'জীবনী-শক্তি'র ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুরূপ মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন Mesopotamia বা Abracada-bara বলিলে শব্দের আড়ম্বরই উপলব্ধি হয় মাত্র অর্থবোধ কিছুই হয় না, সেইরূপ 'জীবনী-শক্তি' বলিলে ক্ষণিকের তরে আত্মবিস্মৃতি ঘটে মাত্র; কিন্তু ক্ষণকাল পরে সে মোহ ঘুচিয়া যায়। তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইহা অজ্ঞতা ঢাকিবার একটী উপায় মাত্র।

সত্যানুসন্ধান জগদীশচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র। যশ ও প্রতিপত্তির তুলনায় তাঁহার জীবনের উপর সত্যানুসন্ধিৎসাবৃত্তির প্রভাব কিরূপ পরিস্ফুট, তাহা এই জড় ও জীবনের সাড়াবিষয়ক গবেষণার গোড়ার দিকের কথা একটু আলোচনা করিলেই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়-মান হইবে। পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণায় জগদীশচন্দ্রের যশ ও প্রতিপত্তি যখন অত্যন্ত উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, সেই সময়ে হঠাৎ এক নূতন রহস্য তাঁহার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি কিন্তু খ্যাতি-প্রতিপত্তির দিক্‌ চাহিয়া পদার্থ-বিজ্ঞানের গণ্ডিতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখিতে পারিলেন না। অনিশ্চিত, নূতন মতবাদে তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত সুপ্রতিষ্ঠ অধি-কার বিপন্ন হইতে পারে ইহা জানিয়াও সত্যানু-সন্ধানে বিরত হইলেন না, পদার্থ-বিজ্ঞান হইতে জীবতত্ত্ববিদ্যার কোঠায় চলিয়া আসিলেন। ইহার ফলভোগ তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল যথেষ্টই; কিন্তু নির্ভীক বীরের ন্যায় জগদীশচন্দ্র তাহাতে ভ্রূক্ষেপও

করেন নাই। কাহারও নিকট হইতে উৎসাহের অপেক্ষায় না থাকিয়া আপনার বিশ্বাসে আপনি অগ্রসর হইয়াছেন। তখন তারবিহীন তড়িদ্বার্তার যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরীক্ষা করিবার পর দেখিতে পাইলেন, হঠাৎ কোন অজ্ঞাত কারণে যন্ত্রের সাড়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গেল। মানুষের লেখা-ভঙ্গী হইতে যেমন তাহার শারীরিক অবসাদ, উত্তেজনা অনুমান করিতে পারা যায়, যন্ত্রের সাড়া লিপিতেও সেই একই প্রকার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিবার পর যন্ত্রের ক্লান্তি দূর হইয়া গেল এবং পূর্ব্বের ন্যায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে সাড়া দিবার শক্তি বৃদ্ধি পাইল। আবার বিষ প্রয়োগে সাড়া দিবার শক্তি একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের অন্যতম প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার একই রূপ ক্রিয়া দেখিতে পাইলেন। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা 'রয়েল সোসাইটী'র সমক্ষে পরীক্ষা সহ প্রমাণ করা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত মত-বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার কোন কোন অগ্রণী ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি পদার্থবিদ্, তাঁহার স্বীয় গণ্ডি পরিত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন গণ্ডিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার প্রচেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। গতানুগতিকপন্থী পণ্ডিতমণ্ডলীর বিরোধিতায় বহু বৎসর যাবৎ তাঁহার সমুদয় কার্য্য পণ্ড-প্রায় হইতেছিল। জয়মাল্য লইয়া তখন কেহই তাঁহার প্রতীক্ষায় ছিল না, কিন্তু সেই অসম সংগ্রামে অবশেষে ভারতেরই জয় হইল। তাঁহার জ্ঞানের সুতীব্র জ্যোতিঃ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে নিষ্প্রভ করিয়া দিল। যে জাতের বিজ্ঞানানুশীলন একরূপ স্পর্দ্ধা স্বরূপই বিবেচিত হইত, তাহাদের ভিতর হইতে যিনি সেই সময়ে, সেই স্পর্দ্ধার গৌরবের সমুন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াও গৌরবের মোহে আচ্ছন্ন না হইয়া, অজ্ঞাত ও অনিশ্চিতের সন্ধানে ছুটিয়া গিয়াছিলেন—তাঁহার প্রতি মস্তক স্বতঃই শ্রদ্ধায় অবনমিত হইয়া পড়ে। এ সব ব্যাপারে কত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল! নূতন পথের সন্ধানে যখন ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন—বিফলতায় যাহার পূর্ব্বার্জ্জিত অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি নিঃশেষে চূর্ণীকৃত হইতে পারিত—এসব ভাবিবারও অবসর পান নাই। মন তাঁহার সত্যের সন্ধানে ছুটিয়াছিল; সত্যানুসন্ধানে জীবন তো তুচ্ছ—জীবনাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়—যশ, প্রতি-পত্তি উপেক্ষা করিয়া মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন—এই মন্ত্রে উদ্দীপিত হইয়া বিপদ সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া-ছিলেন।

তারবিহীন তড়িদ্বার্তা সম্পর্কীয় গবেষণার পর তিনি যখন জড় ও অ-জড়ের সাড়া, বৃক্ষ-দেহে জীবন-স্পন্দন প্রভৃতি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তখন হইতেই সাধারণের মনে এই প্রশ্ন জাগরিত হইয়াছিল যে, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের এই জাতীয় গবেষণার পরিণতি কি? ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই বা ইহাদের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? উত্তরে কৃষি ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার বহুবিধ প্রয়ো-জনীয়তার উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং এ সম্বন্ধে বহু পূর্ব্বেই অনেক আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। কাজেই এ স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি না করিয়া অন্য দিক হইতে এই আবিষ্কারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করিব। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা তাঁহার আবিষ্কারের একটা গৌণ দিক্ মাত্র। কেবল এই দিক্ দিয়া দেখিলেই আমরা জগদীশচন্দ্রের আবি-ষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব না। আপাতঃ দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে মনে হয়, এডিসন, মার্কনি, লুথার বার্ব্যাঙ্ক প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তিবলে ব্যবহারিক জগতের সুখ-সমৃদ্ধি যতখানি বাড়াইয়া দিয়াছেন, ফ্যারাডে, গ্যালভ্যানি, ম্যাক্সওয়েল প্রভৃতি মনীষিগণ তত্তুলনায় সেই ক্ষেত্রে কি করিয়াছেন! কিন্তু আজ আমরা বুঝিতে পারিতেছি, ফ্যারাডের সেই তড়িৎ-বিষয়ক গবেষণা, গ্যালভ্যানির মৃত ব্যাং পরীক্ষার ফলেই বিদ্যুৎ শক্তির আবিষ্কারে পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ম্যাক্স-

ওয়েলের তড়িৎ তরঙ্গের গাণিতিক সিদ্ধান্ত যে পরবর্ত্তীযুগে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা বিপর্য্যয় ঘটাইবে—তাহা কি তিনিই ধারণায় আনিতে পারিয়াছিলেন ? এই জন্যই বৈজ্ঞানিক জগতে ফ্যারাডে, ম্যাক্সওয়েল প্রভৃতি মনীষিগণ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত এবং এডিসন, মার্কনি প্রভৃতি উদ্ভাবয়িতাগণ প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার পর্য্যায়ভুক্ত। ভারতের গৌরব জগদীশচন্দ্রও আজ একই কারণে উক্ত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের সমপর্য্যায়ভুক্ত। তিনি যদি জড় ও জীবনের সাড়া সম্বন্ধীয় এই একটী মাত্র গবেষণা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তথাপিও তিনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেন। কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিতেছি। এই যে জীবন-মরণ সমস্যা, এই যে জীবদেহের পেশীবিশেষের স্বতঃ স্পন্দন—এই রহস্য নিরূপণে মানুষ কোন্ অতীত যুগ হইতে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছে, আজও তাহার মীমাংসা খুঁজিয়া পায় নাই। এই মীমাংসাই জীবের চরম আকাঙ্ক্ষা, দার্শনিকই বল, বৈজ্ঞানিকই বল—সকলেই এই অজ্ঞাত চরম রহস্যের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। 'জীবন'কে জানিলেই 'মৃত্যু'কে জানিব। অতএব জীবন কি ? কোথায় জীবনের সুরু ? এবং জীবনী-শক্তির পরীক্ষাই বা কি ? কিন্তু মানুষ কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই খেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। সমস্যা জটিল। এতকাল এই চিরন্তন প্রশ্নের জটিলতার কিছুমাত্র সমাধান হয় নাই। অনুসন্ধানকারীগণ 'এমিবা' পর্য্যায়ভুক্ত সর্ব্বনিম্নস্তরের এক কোষিক জীব পর্য্যন্ত যাইয়াই ফিরিতে বাধ্য হইয়াছেন। ডারুইন-প্রমুখ পণ্ডিতগণের প্রবর্ত্তিত বিবর্ত্তনবাদ, ক্রমোন্নতিবাদ ওখান হইতেই সুরু। ইহা জীবজগতের ক্রমোন্নতির মধ্য-অধ্যায়ের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস মাত্র। তারপর পথের রেখা শুধু অস্পষ্ট নহে, একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। আচার্য্যদেবের এই অশ্রুতপূর্ব্ব আবিষ্কার সেই হারাণো পথের সন্ধান দিয়াছে। বিশ্বের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব প্রতিপাদক এই অভাবনীয়, যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে সেই অচিন পথের যাত্রীদিগের মনে অপরিসীম বিস্ময় এবং উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহারা নবীন উদ্যমে আচার্য্যদেব প্রদর্শিত অগ্রগতির পথে যাত্রা সুরু করিয়াছে। যদি প্রাণী, উদ্ভিদ ও অপ্রাণীর মধ্যে কোন সুনির্দ্দিষ্ট সীমা রেখা না-ই থাকিয়া থাকে, তবে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদিত হয় যে, ইহাদের মধ্যে যোগ-সূত্র কোথায় ? এই যোগ-সূত্রের সন্ধান পাইলেই মানুষ, প্রকৃতির এই গভীর রহস্যের অনেক দূর উদ্ঘাটনে সমর্থ হইবে। হয়ত ভবিষ্যতে দেখিতে পাওয়া যাইবে, মানুষ এই দুর্জ্জ্ঞেয় রহস্যের সমাধানে সফলতা অর্জ্জন করিয়াছে। এই রহস্য সমাধানের পথে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার দান যে কত বড় তাহা আগত সুদিনের মানুষেরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিবে সন্দেহ নাই।

বিশ্বের দরবারে যিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় আর নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র আজ বিশ্বের নিকট পরিচিত। তাঁহার কর্ম্মবহুল বিরাট জীবনের পরিচয় এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভবপর নহে এবং দিবার চেষ্টাও করিব না, কারণ সেরূপ চেষ্টা প্রদীপের আলোকে সূর্য্যকে দেখাইবার মতই নিষ্ফল। মানুষ হিসাবে জগদীশচন্দ্র-সম্বন্ধে এস্থলে দুই একটী কথা বলিব।

ভুল-ভ্রান্তি, অজ্ঞতা-বিজ্ঞতা লইয়াই মানুষ; কিন্তু অনেকেই তাঁহাদের দোষ-ত্রুটী বিজ্ঞতার আবরণে ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টিত হন। জগদীশচন্দ্রের জীবনে ইহার বিপরীত ভাবই পরিলক্ষিত হয়। প্রায় চৌদ্দ পনেরো বছর পূর্ব্বের তাঁহার একটী সাধারণ কথা হইতেই ইহা পরিস্ফুট হইবে—"প্রায় বিশ বছর পূর্ব্বে কোন প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, 'বৃক্ষজীবন যেন মানব জীবনেরই ছায়া',—কিছু না জানিয়াই লিখিয়াছিলাম। স্বীকার করিতে হয়, সেটা যৌবন-সুলভ অতি-সাহস এবং কথার উত্তেজনা মাত্র। আজ সেই লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং স্বপ্ন, জাগরণ আজ একত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে।"

'রাণী-সন্দর্শনে' স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার সহানুভূতিশীল অসীম দরদী-হৃদয়ের পরিচয় পাই।

বাংলাদেশের এই দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যহীনতা জগদীশচন্দ্রের বুকে চিরকালই বড় বাজিয়াছে। এই যে ম্যালেরিয়াতে জনপদ নির্ম্মূল হইতেছে, দেশী শিল্প জাপানের প্রতিযোগিতায় উচ্ছন্ন যাইতেছে, বিবিধ সংক্রামক ব্যাধি দেশকে ছারখার করিতেছে, মন্থরগতিতে শিক্ষাবিস্তার, পল্লীগ্রামে পানীয় জলের অপব্যবহার ইত্যাদি কোন সমস্যাই তাঁহার মাতৃভূমির প্রতি দরদী-হৃদয় উপেক্ষার চক্ষে দেখিতে পারে নাই। বহু বৎসর পূর্ব্বেই তিনি ইহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেশবাসীর সহযোগিতার জন্য আকুল আহ্বান করিয়াছিলেন, সাধারণে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য কথকতার প্রচার, যাত্রা, আদর্শ পল্লী-গঠন, পর্য্যটনশীল মেলাস্থাপন, তাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে ছায়াচিত্রযোগে উপদেশ, স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়াম প্রচলন, গ্রামের শিল্প-বস্তুর সংগ্রহ, কৃষি-প্রদর্শনী প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন (বিক্রমপুর সম্মিলনে সভাপতির অভিভাষণ দ্রষ্টব্য)। জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে এবং স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া সুদূর অতীতে তিনি যাহা প্রচার করিয়াছিলেন—আজ জাতীয়তাবাদীদের মুখে তাহারই প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিতেছি।

আজ যুগমানব মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন আন্দোলন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু বহু বৎসর পূর্ব্বে জগদীশচন্দ্র এই সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"* * * ছেলেবেলার সখ্যতাহেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে, তাহা বুঝিতেও পারি নাই। সেদিন বাঁকুড়ায় 'পতিত অস্পৃশ্য' জাতির অনেকে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতেছিল। যাহারা যৎসামান্য আহার্য্য লইয়া সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, অনশনে শীর্ণ পুরুষেরা সাহায্য অস্বীকার করিয়া মুমূর্ষু স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেয় আহার্য্য পাইয়া তাহা দশজনের মধ্যে বণ্টন করিল। ইহার পর প্রচলিত ভাষার অর্থ করা কঠিন হইয়াছে। বাস্তবপক্ষে কাহারা পতিত, উহারা না আমরা?"

আজকাল প্রায়ই সর্ব্বত্রই কৃষক আন্দোলন হইতেছে। বহু কৃষক-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কৃষকদের দুঃখ-দারিদ্র্যে ব্যথিত হইয়া বহু পরদুঃখকাতর প্রাণ তাহাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু যখন এ সকল আন্দোলনের চিহ্নমাত্র ছিল না তখন হইতেই জগদীশচন্দ্রের করুণ হৃদয় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দ্দশায় কিরূপ ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের বিক্রমপুর সম্মিলনীর সভাপতি হিসাবে তাঁহার অভিভাষণ হইতে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে—"আর এক কথা, তুমি ও আমি যে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজকে উন্নত করিতে পারিয়াছি এবং দেশের জন্য ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তৃত রাজ্যরক্ষার ভার প্রকৃত পক্ষে কে বহন করিতেছে? তাহা জানিতে হইলে সমৃদ্ধশালী নগর হইতে তোমার দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পল্লীগ্রামে স্থাপন কর। সেখানে দেখিতে পাইবে, পঙ্কে অর্দ্ধ নিমজ্জিত, অনশন-ক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্ম্মসার এই 'পতিত' শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা না কি ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়! অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই। কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চির-বেদনা নিহিত আছে।"

তাঁহার বীরহৃদয়ে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই, তাহা অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে, কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় একটিমাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। বর্ত্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জার্ম্মান অধ্যাপক ফেফারের অর্দ্ধশতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল, জগদীশচন্দ্রের কয়েকটী আবিষ্কার ফেফারের মতের বিরুদ্ধে। ইহাতে তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছেন ভাবিয়া জগদীশচন্দ্র

তাঁহার ইউরোপ-ভ্রমণ প্রাক্কালে লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে ফেকার তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র নিজেকে তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ফেকারের শিষ্যপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া যে উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—"* * * ইহাই ত' চিরন্তন বীরনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বীরধর্ম্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, 'সার্থক আমার শিক্ষাদান। এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনের।" ইহা হইতেই তাঁহার উদার হৃদয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

অধিকাংশ কাল নীরস বিজ্ঞানের অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিলেও ললিতকলা, রস-সাহিত্য, শিল্প-কলা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে জগদীশচন্দ্রের অনুরাগ তত্তৎ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদিগের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। বিশেষতঃ একাধারে তিনি বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যিক, তাঁহার রচিত প্রবন্ধাবলী সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত।

বহু শতাব্দীর জড়তায় আচ্ছন্ন ভারতের গ্লানি-ভার মুক্ত করিয়া স্বীয় মহিমায় গৌরবোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আচার্য্যদেব বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। এই দেশের নালন্দা, তক্ষশিলা, কাঞ্চীর পুণ্যস্মৃতি তিনি একদিনের তরেও ভুলিতে পারেন নাই। লুপ্ত এবং বিস্মৃত জাতীয় গৌরব উদ্ধারে ঐকান্তিক আগ্রহ এবং দুর্দ্দমনীয় প্রচেষ্টা, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কাজেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই প্রচেষ্টা এবং আজন্ম-পোষিত সাধনার ফল 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির'। বিজ্ঞানে তাঁহার দান অতুলনীয়, এসম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু দেশের এবং জগতের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির' তাঁহার কীর্ত্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দিলীপের চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে গিয়া মহাকবি কালিদাস ভারতে জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্।
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্।"

অর্থাৎ ত্যাগের জন্য ছিল সঞ্চয়, সত্যের জন্য ছিল মিত-ভাষিতা, যশের জন্য ছিল জয়েচ্ছা এবং প্রজার জন্য ছিল গৃহী হওয়া। এই যে ত্যাগার্থে সঞ্চয়, ইহাই হইল জগদীশচন্দ্রের জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যের অন্যতম। এই 'বিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠার পথও তাঁহার জন্য কেহ কুসুমাস্তীর্ণ করিয়া রাখে নাই। রাজর্ষি জনকের ন্যায় তিনি ভোগের মধ্যে ত্যাগী সাজিয়া জীবনের সমস্ত শক্তি, সমস্ত সঞ্চয় জাতির তথা জগতের কল্যাণে তিল তিল করিয়া নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াছেন।

এই বিরাট ত্যাগের মহিমা যদি আমরা সকল গৌরবে গ্রহণ করিতে না পারি, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'বিজ্ঞান-মন্দিরে' তিনি যে জ্ঞান-প্রদীপ জ্বালিয়াছেন তাহার জ্যোতিঃ অম্লান রাখিতে চেষ্টা না করি, সে শুধু আমাদের ক্ষুদ্রতা, আমাদেরই দৈন্য।

লোচনের খোল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

['চৈতন্যমঙ্গল' প্রণেতা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি লোচনদাসের জন্মভূমি শ্রীপাট কোগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত]

যে খোল বাজায়ে গাহিল লোচন,
'এসো এসো বঁধু' গান,
প্রেম আঁখি নীরে অভিষেক হ'ল,
যে খোলের দেহ প্রাণ ;
যে খোলের সনে মিশিয়া রয়েছে
মনোহরশাহী সুর,
জনম অবধি শুনি বাণী যার
পিয়াসা হ'ল না দূর,
ফাগের রঙ্গে আজও জাগে যাতে
বিগত ঝুলন দোল,
লোচনের পাটে টাঙ্গানো থাকিত
সেই সে প্রাচীন খোল।
যে দিন নিশীথে মহান্ত দিত
সাধকের খোলে হাত,
সুদূরে নূপুর মুরলী বাজিত
সুরভিত হ'ত রাত।
উঠিল এ কথা বর্দ্ধমানের
প্রতাপচাঁদের কাণে,
'আনাও সে খোল শুনিব বাদ্য'—
ছুটে লোক গ্রাম পানে।
এ কি দুর্দ্দিন ঘরে ঘরে শুধু
হায় হায় করে লোক।
গ্রাম ছাড়ি যাবে সাধকের খোল
তাই গ্রাম ভরা শোক!
"ওগো মৃদঙ্গ! যেও না যেও না,
হয় যে ব্যাকুল মন,
চিন্তামণির দেওয়া মণি তুমি
সাতটা রাজার ধন!"
নৃপতি আদেশে হাজির হইল
খোল মহান্ত সহ,
গ্রামের লোকের নাহি সান্ত্বনা
দুঃখ দুর্ব্বিসহ।
শোন মহারাজ, ক'ন মহান্ত
ভীতি বিহ্বল স্বরে,
এ খোলের সাড়া বড় নিদারুণ
থাকিতে দেয় না ঘরে।
শুনে কাজ নাই বাজাতেও মানা
বিরাগীর এই খোল,
জ্বালাময় করে ঘর সংসার
শুনিলে অমঙ্গল।
তবুও আবার রাজ অনুরোধ
এড়াতে না পারি আর,
সাধু মহান্ত চুম্বিয়া খোলে
প্রণমে বারম্বার।
প্রভু নাম স্মরি, ঘা দিলেন খোলে,
বাজে মৃদঙ্গ জোরে,
নাচে মহান্ত তা থেই তা থেই,
রাজ-অঙ্গনে ঘোরে।
রাজোদ্যানের দ্বার টুটে যায়
ময়ূর ময়ূরী নাচে,
বাঁটে ঝরে ক্ষীর সবৎসা গাভী
আসিয়া দাঁড়ায় কাছে।
তমাল তরুর তল উঠে ভিজি
কদম পুলকে ফাটে,
প্রলয় বাদনে কি ঘূর্ণী এলো
বিলাসের রাজ-পাটে।
মীননাথ পুরী সম কাঁপে বাড়ী
রাজা ভিজে উঠে ঘামে,
গুরু গম্ভীর বাজে মৃদঙ্গ
থামাইলে নাহি থামে।
রাজা কহিলেন, 'ধন্য ধন্য
সিদ্ধ এ খোল বটে',—
প্রেমের মতন অশ্রু ঘুরিছে
আঁখির সন্নিকটে।
শ্রীপাটে ফিরিয়া মহান্ত আর
তুলিতে পারে না হাত,
কি দোষে আসিল নিষ্পাপ করে
দারুণ পক্ষাঘাত?
দু'দিনের পর প্রতাপচাঁদের
পেলে না কেহই খোঁজ,
তোরণে শাস্ত্রী দাঁড়াইয়া থাকে
আশাপথ চেয়ে রোজ।

ঘোড়াশালে তাঁর প্রিয় ঘোড়া কাঁদে,
হাতীশালে কাঁদে হাতী,
রাজ-অঙ্গনা কাঁদেন কাতরে
ভূমিতে আঁচল পাতি।

বহুদিন পর ফিরিলেন রাজা
চিনিল না কেহ তাঁরে,
গৃহের মালিক ভিখারীর মত
ফিরে গেল এসে দ্বারে।

সামরিক ব্যয়-হ্রাস

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

দেশের লোকের দারিদ্র্য-হেতু কর-বৃদ্ধি করিয়া আয়-বৃদ্ধির আশা করা যায় না। সুতরাং ব্যয়-সঙ্কোচেই অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সরকারের ব্যয়ের তালিকায় সামরিক ব্যয় সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। সেই জন্য এ দেশের লোকমত সেই ব্যয় হ্রাস করিবার জন্যই সরকারকে বিশেষ অনুরোধ জানাইয়া আসিয়াছে। দেশের লোকের এই আন্দোলন অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। সরকার ব্যয়-সঙ্কোচের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যে সমিতি গঠিত করিয়াছেন, সেই সমিতিও এই বিভাগে ব্যয়-হ্রাসের পরামর্শ দিয়াছেন।

সম্প্রতি বিলাতের সরকারের একটি সিদ্ধান্তে এই বিভাগে ভারত সরকার বার্ষিক প্রায় দুই কোটি টাকা লাভ করিবেন। যখন দেখা যায় যে, এ দেশে সরকারের সমগ্র ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ এবং প্রদেশগুলিকে ছাড়িয়া দিলে, ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৫২ ভাগ সামরিক বিভাগে যায়, তখন এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কারণ, ভারত সরকারের প্রায় ১৫ বৎসরের চেষ্টায় বিলাতের সরকার ভারত সরকারকে এই টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন।

এ দেশে বৃটিশ সেনার ("গোরা") অবস্থিতি যে ভারতের সামরিক ব্যয়ের আধিক্যের অন্যতম কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, এই সৈনিকদিগকে বিলাতে সংগ্রহ করিয়া শিক্ষিত করিতে হয়। বিলাতে শ্রমিকদিগের বেতনের হার অধিক হওয়ায় সৈনিকদিগকেও ভারতের তুলনায় অধিক বেতন দিতে হয়। স্যর শিবস্বামী আয়ার দেখাইয়াছেন, এ দেশের সেনাবলের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বৃটিশ হইলেও এই এক-তৃতীয়াংশের ব্যয় অবশিষ্ট অংশের দ্বিগুণ। কারণ, যে পরিমাণ ভারতীয় সেনাবলের ("সিপাহী") জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, সেই পরিমাণ বৃটিশ সেনাবলের জন্য বার্ষিক ২১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হয়। বৃটিশ সৈনিকের বেতনের হার অধিক, তাহার বেশ-বাসের ব্যবস্থা অধিক ব্যয়সাধ্য এবং সে যখন দেশে ফিরিয়া যায়, তখন তাহাকে কিছু অর্থ দিতে হয়। অথচ ইহারা ভারতীয় সেনাবলের অন্তর্ভুক্ত নহে—বিলাতের সেনাবল হইতে অস্থায়ী ভাবে আসিয়া থাকে; ইহাদিগের কার্য্যকাল গড়ে ৫ বৎসর ৪ মাস।

ইহাদিগকে বিলাতে সংগ্রহ করিবার ও শিক্ষা দিবার ব্যয়-ভার ভারতবর্ষকে বহন করিতে হয়। বিলাতে সামরিক বিদ্যালয়ের ব্যয়ের একাংশও ভারতের তহবিল হইতে প্রদান করিতে হয়। বিলাতের সৈনিকদিগের বেতনে ও ব্যবস্থায় কোন পরিবর্ত্তন হইলে ভারতেও তাহা প্রবর্ত্তিত করিতে হয়। জার্ম্মাণ যুদ্ধের পূর্ব্বেও এই কারণে দুই বার (১৯০২ খৃষ্টাব্দে ও ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে) বৃটিশ সৈনিকের বেতন-বৃদ্ধি হইয়াছিল; এবং তাহার ফলে ভারতের সামরিক ব্যয় বৎসরে এক কোটি ৫ লক্ষ টাকা বাড়িয়া গিয়াছিল। বৃটিশ সেনাবলের ব্যয়াধিক্যের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য আমরা নিম্নে একটি হিসাব দিতেছি।

ভারতে প্রত্যেক বৃটিশ সৈনিকের জন্য বার্ষিক ব্যয় হয়—২ হাজার ৫ শত ৩ টাকা।

সিপাহীর জন্য বার্ষিক ব্যয় হয়—৬ শত ৩১ টাকা।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, বৃটিশ সৈনিকদিগকে সংগ্রহ করিবার, শিক্ষা দিবার ও তাহাদিগের যাতায়াতের ব্যয় অধিক। এই যে সংগ্রহের ও শিক্ষার ব্যয় ইহাই 'ক্যাপিটেশন চার্জ্জ' নামে অভিহিত। যখন ভারতের আয়-ব্যয়ের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য ওয়েলবী কমিশন নিযুক্ত করা হয়, তখন সেই কমিশনে স্যর হেনরী ব্র্যাকেনবেরী বলিয়াছিলেন—ভারতে কেহই এই ব্যয় ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন না। সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে (১৮৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে) ইহা চলিয়া আসিয়াছে। কারণ, এই সময়ে যে নূতন ব্যবস্থা হয়, তদনুসারে এ দেশে বৃটিশ সেনাবল বিলাতের সেনাবলের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়; তাহার ফলে বৃটিশ সামরিক অফিস ভারতের সামরিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন এবং ভারত সরকারের নিকট হইতে ভারতে রক্ষিত সেনাবলের সংগ্রহ ও শিক্ষার ব্যয় গ্রহণ আরম্ভ হয়। আর সেই জন্যই ভারত সরকারকে ভারতে রক্ষিত সৈনিকদিগের বেতন বিলাতের সৈনিকদিগের বেতনের হারে দিতে হয়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যে কমিটী গঠিত হয়, সে কমিটী স্থির করিয়া দেন, 'ক্যাপিটেশন চার্জ্জ' হিসাবে ভারত সরকারকে প্রত্যেক বৃটিশ সৈনিকের জন্য বার্ষিক এক শত চল্লিশ টাকা দিতে হইবে।

সেই সময় হইতেই ভারত সরকার এই ব্যবস্থা অসঙ্গত বলিয়া ইহাতে আপত্তি করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু বৃটিশ সামরিক বিভাগ সে আপত্তিতে কর্ণপাত করেন নাই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারত সরকারকে 'ক্যাপিটেশন চার্জ্জ' প্রভৃতি বাবদে বৃটিশ সরকারকে বার্ষিক প্রায় ৯১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬ শত ৬০ টাকা দিতে হইত।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার এই টাকা দিতে অস্বীকার করেন এবং কয় বৎসর ভারত সরকার বার্ষিক ৬৬ লক্ষ টাকা দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন।

ইহার পর লর্ড নর্থব্রুকের কমিটী স্থির করেন, 'ক্যাপিটেশন চার্জ্জ' হিসাবে ভারত সরকারকে প্রত্যেক সৈনিকের জন্য ১ শত ১২ টাকা ৮ আনা দিতে হইবে। ইহার পর ওয়েলবী কমিশনে ভারত সরকার এই মত প্রকাশ করেন যে, এই টাকার পরিমাণ অযথা অধিক। কিন্তু কমিশনের অধিকাংশ সভ্য মত প্রকাশ করেন যে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। পাঁচ বা ছয় বৎসর ইহাই বহাল থাকুক; তাহার পর সাধারণ ভাবেই পরিবর্ত্তিত হইবে।

কমিশন কয় বৎসর পরে যে পরিবর্ত্তনের কথা বলিয়াছিলেন, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাহা করা হয় এবং ফলে 'ক্যাপিটেশন চার্জ্জ' বাড়িয়া ১ শত ৬৫ টাকা ৮ আনা হয়! কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার ইহা আরও বাড়াইয়া ৪ শত ২০ টাকা করিতে বলেন এবং ভারত সরকার নিরুপায় হইয়া সেই হিসাবেই টাকা দিতে থাকেন। পর বৎসর ভারত-সচিব বলেন, যখন বৃটিশ সৈনিকের শিক্ষাকাল ১২ মাস হইতে ৬ মাস করা হইয়াছে, তখন এই টাকাও কমাইতে হইবে। কিন্তু এই যুক্তি সঙ্গত হইলেও গৃহীত হয় না। পর বৎসর বিশেষ চেষ্টার ফলে প্রত্যেক সৈনিকের জন্য দেয় ব্যয় প্রায় ৫৫ টাকা হ্রাস করা হয়।

ওয়েলবী কমিশনে মিষ্টার বুকানন বলেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর কোন স্থানে এইরূপ ব্যবস্থা নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী'র বৃটিশ সেনাবলের স্থান বৃটিশ সরকারের সেনাবল গ্রহণ করার পর হইতে ভারতবর্ষকে সৈনিকদিগের সংগ্রহ ও শিক্ষার ব্যয়ের কতকাংশও বহন করিতে হইতেছে। ভারত সরকার প্রথমাবধিই ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিয়া আসিতেছেন এবং ভারতে রাজকর্ম্মচারীরা ও ভারতের লোক মনে করেন, এই ব্যবস্থায় ভারতের প্রতি অবিচার করা হইতেছে। এই ব্যয়ভার বৃটিশ সরকারের বহন করাই সঙ্গত; কারণ, বৃটিশ সেনাবল কেবল ভারতের নহে — সমগ্র

বৃটিশ সাম্রাজ্যের। ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের রক্ষা-কার্যে যে সাহায্য করিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিয়া বৃটিশ সরকারের এই ব্যয়ভার বহন করা কর্ত্তব্য।

ভারতীয় সেনাবল যে সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতের সীমা-বহির্ভাগে নানা দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। চীনে, মিশরে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ইহা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ইহার দ্বারাই ইরাক জয় হইয়াছে — ফ্রান্সে জার্ম্মাণ-বাহিনীর প্রতিরোধ করা সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় এদেশে পূর্ব্ববৎ বৃটিশ সৈনিক প্রেরণ বন্ধ হইলেও ভারতবর্ষ হইতে যথারীতি টাকা লওয়া হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে—১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতের সরকার সৈনিক-প্রতি টাকা বাড়াইয়া লয়েন।

কিন্তু ভারতের জনমত সমর্থিত হইয়া ভারত সরকার ইহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তাহার ফলে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে স্থির হইল—এই বিষয় বিচারের জন্য এক সমিতি নিযুক্ত করা হইবে।

এই স্থানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে হয়। যখন মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার-রিপোর্ট রচিত হয়, তখনও জার্ম্মাণ-যুদ্ধ চলিতেছে — সেই জন্য সে রিপোর্টে এই বিষয় যথাযথভাবে আলোচিত হয় নাই। কিন্তু তাহার পর যখন সাইমন কমিশন নিযুক্ত হয়, তখন কমিশনকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে হইয়াছিল।

ভারতীয় সেনাবল যে বার বার সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতের বহির্ভাগে অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে, সাইমন কমিশন তাহা স্বীকার করেন। ইহার পূর্ব্বে ভারতীয় সেনাবল সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, সেই এশার কমিটী ভবিষ্যতে ইহা ভারতের বাহিরে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা কত অধিক তাহা বলিয়াছিলেন। কমিটী বলেন —

"ভবিষ্যতে সম্ভাবিত সামরিক ব্যাপারের ভার-কেন্দ্র পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে আসিয়াছে। ভবিষ্যতে যে যুদ্ধকালে মধ্য এসিয়ার জন্য বৃটেনকে কতকটা ভারতেরও উপর সৈনিক ও সমর-সজ্জার জন্য নির্ভর করিতে হইবে, এ সম্ভাবনা অবজ্ঞা করা যায় না।"

ইহাতেই বুঝা যায়, বৃটিশ বিশেষজ্ঞরাও মনে করেন, ভারতে যে বৃটিশ সেনাবল রক্ষিত হয়, তাহা কেবল ভারতের প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই নহে। সুতরাং ইহার ব্যয়ের কতকাংশ বৃটিশ সরকারের তহবিল হইতে প্রদান করাই সঙ্গত। ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানকালে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন, সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ২০ বৎসরে ভারতে নানা স্থানে যুদ্ধ হইলেও সৈনিকদিগের বাবদে ব্যয় অল্প হইত। তখন সে ব্যয় বর্ত্তমান ব্যয়ের প্রায় অর্দ্ধেক ছিল—প্রত্যেক সৈনিকের জন্য ৭ শত ৭৫ টাকার অধিক বার্ষিক ব্যয় হইত না। বলা বাহুল্য, 'ক্যাপিটেশন চার্জ্জ' ব্যয়-বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ।

এই সঙ্গে সৈনিকদিগের যাতায়াতের ব্যয়েরও উল্লেখ করিতে হয়। এই ব্যয় পূর্ব্বে ভারতবর্ষকেই সম্পূর্ণ-ভাবে বহন করিতে হইত। ওয়েলবী কমিশন স্থির করেন—ইহার অর্দ্ধভাগ বৃটিশ সরকারকে বহন করিতে হইবে। তদনুসারে এ পর্য্যন্ত বৃটিশ সরকার ভারত সরকারকে বৎসরে প্রায় ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দিয়া আসিতেছেন।

সাইমন কমিশন অবশ্যই জানিতেন, ভারত সরকার প্রথমাবধি 'ক্যাপিটেশন চার্জ্জে'র প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন এবং ভারতের লোকমত এই বিষয়ে ভারত সরকারকে সমর্থন করিয়াছে। তাঁহারা বোধ হয় ইহাও জানিতেন যে, একাধিক বৃটিশ শাসক বলিয়া গিয়াছেন—যদি বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া ভারতের ব্যয় ভার লাঘব করা না হয়, তবে হয় ত' ভারতের পক্ষে এই ভার বহন করা অসম্ভব হইবে। কেহ কেহ এ দেশে স্বতন্ত্রভাবে বৃটিশ সেনা সংগ্রহের ও রক্ষার ব্যবস্থা করিতেও বলিয়াছেন। তাহা হইলে সে সব সৈনিক ৫ বৎসর ৪ মাস মাত্র কাষ না করিয়া প্রায় ২০ বা ২৫ বৎসর কাষ করিতে পারিবে।

কমিশন বলেন, বিষয়টি জটিল এবং বর্ত্তমানে বৃটিশ ও ভারত সরকারদ্বয়ের বিবেচনাধীন বলিয়া তাঁহারা ইহার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু ভারত সরকারের বক্তব্য, তাঁহারা যে ভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, তাঁহারা ভারত সরকারের প্রস্তাবের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন।

তখন ভারত সরকার যেমন এই ভার (প্রায় ২ কোটি টাকা) হইতে অব্যাহতি চাহিতেছিলেন, তেমনই বৃটিশ সরকার তাহা বর্দ্ধিত করিয়া প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকায় পরিণত করিতে চাহিতেছিলেন।

এই অবস্থায় যখন গোল-টেবিল বৈঠকের অনুষ্ঠান হয়, তখন বাঙ্গালার অধিকাংশ প্রতিনিধি সামরিক ব্যয় সঙ্কোচের যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন, তাহাতে 'ক্যাপিটেশন চার্জ্জে'র উল্লেখ ছিল। সেই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইবার পরই পার্লামেন্টে ভারত-সচিব বলেন, এই বিষয় বিচার-জন্য এক স্বতন্ত্র ট্রাইবিউনাল নিযুক্ত করা হইবে। যে ট্রাইবিউনাল নিযুক্ত করা হয়, তাহাতে কমিটী ব্যতীত ৪ জন সদস্যের মধ্যে ২ জন ভারতবাসী ও ২ জন ইংরাজ।

এই ট্রাইবিউনালের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইয়া ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী সেদিন পার্লামেন্টে বলিয়াছেন যে, বৃটিশ সরকার অতঃপর ভারতের সৈনিক-ব্যয়ের জন্য বৎসরে প্রায় ২ কোটি টাকা (১৫ লক্ষ পাউণ্ড) দিবেন। বর্ত্তমানে বৃটিশ সৈনিকদিগের যাতায়াতের ব্যয় বাবদে ভারত সরকারকে বার্ষিক যে টাকা (প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা) প্রদান করা হইত, তাহা এই টাকার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

ভারত সরকার এই নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন—বৃটিশ সরকার যে টাকা বার্ষিক দিবেন, তাহা 'ক্যাপিটেশন ট্রাইবিউনালে'র নির্দ্ধারণানুযায়ী হইলেও ভারতের সাধারণ সামরিক ব্যয়ে বৃটিশ সরকারের তহবিল হইতে প্রদত্ত হইতেছে, বলা হইয়াছে। ইহাতে যে ভারতীয় করদাতার ভার লাঘব হইবে, ভারত সরকার তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ভারতবাসী এতদিন যাহা চাহিয়া আসিয়াছেন, বিলাতী সরকারের নির্দ্ধারণে তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রদত্ত হয় নাই। ভারতবাসীরা চায়—

(১) দেশরক্ষার অধিকার দেশের লোককে দিতে হইবে।

(২) সামরিক ব্যয় হ্রাস করিতে হইবে।

(৩) যে সেনাবল সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে রক্ষা করিতে হয়, তাহার ব্যয় ইংরেজকে বহন করিতে হইবে।

এই সব দাবী যে সঙ্গত, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা প্রভৃতি দেশকে ইংরাজ স্বদেশ রক্ষার অধিকার প্রদান করিয়াছেন এবং তাহার ফলে সে সকল দেশে সামরিক ব্যয়-হ্রাস হইয়াছে। সাইমন কমিশন সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। ভারতে যে সেনাবল রক্ষিত তাহা যে কেবল ভারতের প্রয়োজনেই রক্ষিত নহে, তাহাও দেখা গিয়াছে। সুতরাং ভারতে রক্ষিত সেনাবলের আরও ব্যয় ইংলণ্ডের বহন করাই সঙ্গত। সে ব্যয়ের ভাগ কিরূপ হইবে, তাহা যথাযথভাবে স্থির করিয়া লইতে হইবে। আজই যে ভারতবর্ষ তাহার সেনাবল গঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে না, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। তবে ভারতের সেনাবলে ভারতীয় নিয়োগ যথাসম্ভব দ্রুত করিতে হইবে।

বিলাতের সরকার ভারত সরকারকে বৎসরে এই যে দুই কোটি টাকা দিতে সম্মত হইয়াছেন, ইহার গুরুত্ব কেবল টাকায় পরিমাপ করিলে চলিবে না। কারণ, ইহাতেই প্রথম বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল, ভারত সরকার ভারতের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রায় ৭৫ বৎসর ধরিয়া যে দাবী করিয়া আসিয়াছেন, তাহা সঙ্গত—বৃটিশ সেনাবলের যে অংশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে ভারতে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যয় বৃটিশ সরকারের বহন করাই ন্যায্য।

রাতের ফুল

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রজনীর কথা

কি যে হয়েছে,—বুঝতে পারি না।

বুকের মধ্যে থেকে থেকে কেমন হু হু করে, কে যেন চুপি চুপি কাণে কাণে বলে যায়—তোর সুখের স্বপন ফুরিয়েছে, ওরে অভাগী! আর কেন?—যদি সত্যি সত্যি তাই হয়—এ স্বপন আমার যদি ভেঙেই যায়, উঃ!—না না!

দেবতা আমার! স্রোতে-ভাসা মালাগাছটি তুলে, আদর করে তুমি গলায় পরেছিলে, তাই না তার এ শোভা, এ সার্থকতা! তোমার সৌন্দর্য্যেই সে যে সুন্দর হয়েছে, হে সুন্দর! তোমার গৌরবেই তার গরব!

আজ যদি মালার আদর ফুরিয়ে যায়, গলা থেকে খুলে ওকে পায়ের তলায় ফেলে দাও, তবে ওর অনুযোগ বা আপশোষ করবার কি আছে? সে কেন মনে করবে না, এই পায়ের তলায় পড়ে থাকাই তার লাঞ্ছিত জীবনের পরম সুখ, চরম সার্থকতা?

এ 'কেন'র উত্তর আমার সারা অন্তরখানি তন্ন তন্ন করেও পাই না তো! ভয় হয়, শুধু ভয় হয়, যদি পায়ের তলায়ও স্থান না পাই, যদি, যদি······

নাঃ, মানুষ এমনি করেই পাগল হয় বুঝি?

উনি বলেন—এ তোমার হিষ্টিরিয়ার পূর্ব্ব-লক্ষণ রোজি, এখন থেকে সাবধান হও, মনকে প্রফুল্ল রাখো সর্ব্বদা। কি সব ছাই-ভস্ম ভেবে ভেবে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে লাভটা কি বল তো? ভগবান কোনো দুঃখই তোমাকে দেন নি, তবু দুঃখকে জোর করে খুঁচিয়ে বার করতে চাও কেন?

কথাটা মনে লেগেছিল। সত্যিই তো, আমার কিসের দুঃখ? কি আমি পাই নি?

এত ধন-ঐশ্বর্য্য, দাস-দাসী, আনন্দ-আরামের শত আয়োজন, অমন ইন্দ্রতুল্য স্বামী! আঃ! কি মিষ্টি কথাটি 'স্বামী'! হ্যাঁ, স্বামীই তো! অনাঘ্রাত কুমারী-হৃদয়ের প্রথম প্রেমের অর্ঘ্য দিয়ে আমি যাঁকে বরণ করেছি,—তিনিই আমার স্বামী, জন্ম-জন্মান্তরের!

মন্ত্র পড়ে কপালে সিঁদুর ঢেলে দিলেই বুঝি······ তবু কেমন যেন আশঙ্কা লেগে থাকে।

ওই যে চারিদিককার বিষাক্ত বাতাস, যার ছোঁয়াচ লাগবার ভয়ে ওঁর সঙ্গে আমার এ নিভৃত নিরাপদ দুর্গের বাইরে যেতে সাহস হয় না।

ওঃ! সেদিন সিনেমায় গিয়ে যা লজ্জায় পড়েছিলুম, জ্যোতিশবাবুর স্ত্রী যখন আমাকে······কি বলব? বলতেও যে লজ্জায় মরে যাই!

আবার সেই যে পরশু সন্ধ্যায় ওঁর সঙ্গে 'লেকে' বেড়াতে গিয়ে—উনি একটু তফাতে ছিলেন তাই শুনতে পান নি, দু'টি ভদ্রলোক আমার দিকে ইসারা করে কি বলাবলি করছিলেন—ইনিই বুঝি অমুকবাবুর······

উঃ! কাণের মধ্যে কে যেন গরম সীসে ঢেলে দিলে! মরমে মরে গিয়ে বললুম—ধরণী, তুমি দ্বিধা হও!

এ সব কথা ওঁর কাছে তুললে কখনো···

—আহা, বলতে দাও না—গায়ে ফোস্কা পড়ে নি তো!—বলে হেসে উড়িয়ে দেন, কখনো বা গম্ভীর মুখে নিঃশ্বাস ফেলে বলেন—তোমার ভালবাসায় এখনো সংশয় আছে রজনী, নইলে এ সব তুচ্ছ কথা তোমার অন্তর স্পর্শ করে কেন? লজ্জা, ভয়, মান-অপমান ত্যাগ করতে না পারলে প্রেমের পূর্ণ

পরিণতি হয় না, প্রেমের রাণী রাধা কি কলঙ্কের ভয় রেখে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেছিলেন ?

সত্যই তো……

কি আর বলি ? চোখ ফেটে জল এসে পড়ে, মনে হয় বুকখানা একবার দেখাতে পারতুম যদি !

হায় ! কেমন করে বলব ? কি করে বোঝাব, যেখানে ভালবাসা, সেইখানেই সংশয়, নইলে কৃষ্ণকে কাছে, অতি কাছে পেয়েও শ্রীমতীর 'হারাই হারাই' ভাব কেন ?

পারি না যে, কিছুই বোঝাতে পারি না। নিজের এই অক্ষমতার অপারগতার দুঃখই আমাকে সব চেয়ে বেশী ব্যথা দেয়। আমার যদি ওঁর পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতাই থাক্‌ত তা'হলে……

ঐ দেখ, আবার ! এ ছাই-ভস্ম ভাবনাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় কি করে ? যতক্ষণ উনি কাছে থাকেন— বেশ থাকি, চোখের আড়াল হ'লেই প্রাণে কি রকম একটা ব্যাকুলতা অনুভব করি, এ ব্যাকুলতা যে কিসের……

আচ্ছা, ওঁকে আজকাল এত বেশী অন্যমনস্ক দেখি কেন ? কেমন যেন উড়ু-উড়ু, ছাড়-ছাড় ভাব, বাড়ী ফিরতে প্রায়ই দেরী হয়ে যায়, জিজ্ঞাসা করলে বলেন— কাজ পড়ে গেছে।

তাবি হ'বেও বা !

কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি সেই দিন থেকে, সেদিন মাসিমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে উনি গেছ্‌লেন, শান্তার জন্মতিথি উপলক্ষে…উনি তো যেতেই চাইছিলেন না, আমিই জোর করে পাঠালুম। আমার জন্য নিজের আত্মীয়-স্বজনের সাথে বিরোধ করা কেন ?

ফিরতে ওঁর রাত হয়ে গেল।

আমি ওঁর অপেক্ষায় তখনো জেগে—বই পড়ে পড়ে চোখ দু'টো জ্বালা করছিল।

জিজ্ঞাসা করলুম—এত দেরী যে ? অনেক লোক হয়েছিল বুঝি ?

—হাঁ,—না, অনেক আর কই ? বাছা বাছা জনকতক, জ্যোতিদা'ও ছিলেন—

—ওঁর সঙ্গে মাসিমাদের আলাপ আছে বুঝি ?

—বিশেষ নয়, তবে আমার বন্ধু বলেই হয় তো…

হেসে বললুম—ইস্‌ ! আজকাল ভারি খাতির তো তোমার।

—হুঁ, তুমি এখনো ঘুমোও নি ? বারোটা বেজে গেছে যে !

—বাজুক্‌—ঘুম না এলে কি করি ?

উনি আর কিছু না বলে, বিছানায় বসে আমার বোতাম খুলতে লাগলেন।

সাম্‌নের টেবিলে-রাখা শুভ্র গ্যাসের আলো তাঁর সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। দেখলুম, মুখে চোখে কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন ভাব। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল, চম্পক গৌর কান্তিতে ওঁর মাখন রংয়ের সিল্কের ঢিলা পাঞ্জাবীটি কেমন মানিয়েছে ! সিঁথির সূক্ষ্ম রেখায় দু'ভাগ করা থোকো থোকো ঢেউ-খেলানো চুলগুলি কপালের দু'পাশে এসে পড়েছে কি মধুর অলসভাবে ! এঁর কাছে আমি ! হায় !

রবিবাবুর সেই লাইনটি মনে পড়ে গেল—

পূজার তরে হিয়া উঠে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে বলো কি দিয়ে ?

—এখনো বসে আছ ? শুয়ে পড়ো না—

চকিত হয়ে মুগ্ধ চোখ দু'টিকে ওঁর মুখের ওপর থেকে নামিয়ে নিয়ে বললুম—তুমি শোবে না ?

—হ্যাঁ, এক গেলাস জল—থাক্‌, আমি নিচ্ছি।

জল খেয়ে কাপড় ছেড়ে উনি আবার বিছানার কাছে এলেন, কিন্তু শুলেন না।

—তুমি শোও রজনী ! আমি একটু পরে…… গোলমালে ঘুমটা চটে গেছে কি না !

আলোটা সরিয়ে রেখে উনি ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন, বললেন—গরম বোধ হচ্ছে, না ? ফ্যানটা খুলে দেব ? তোমার ঠাণ্ডা লাগে যদি……থাক্‌।

গরম কই ? শিয়রের জানলা দু'টো খোলা, ফাল্গুন

রাতের ফুলের গন্ধে আকুল স্নিগ্ধ মধুর বাতাস ঝির্ ঝির্ করে এসে গায় লাগছিল। বললুম—আমার ঠাণ্ডা লাগবে না, ক্যান্ খুলে দিচ্ছি—

—থাক্ না, তুমি শোও, দরকার হলে আমিই···

আজ এমন উন্মনা ভাব কেন? মাসিমা কিছু বলেছেন না কি? কিন্তু উনি তো গ্রাহ্য করেন না কারো কথা।

একটা ক্ষোভের নিঃশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লুম। খানিক এদিক্ সেদিক্ ঘুরে, মিনিট কতক টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে উনি জানালার কাছে গিয়ে বস্‌লেন।

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করছি, একটু যেন তন্দ্রার আবেশ এসেছে, শুন্‌তে পেলাম উনি গান করছেন গুন্ গুন্ করে—

তোমার ও সুন্দর মুখপানে চাহিয়া থাকিতে
শুধু ভালবাসে এই আঁখি,
তাই অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া
আমি অবাক্ হইয়া থাকি!

বাঃ! বেশ গানখানি তো! ওঁর মিষ্টি গলায় আরো মধুর লাগ্‌ছিল। শুন্‌তে শুন্‌তে আমার তন্দ্রার ভাবটুকু কেটে গেল, চোখের পাতা ভিজে উঠ্‌ল।

অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া
অবাক্ হইয়া থাকি।

এ গান যে আমারই প্রাণের অনুভূতি দিয়ে রচনা করা! মাঝখানে থামতে দেখে আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বললুম—তারপর?

—তারপর? আর মনে পড়ছে না যে। তুমি এখনো জেগে না কি? আমি ভেবেছি ঘুমিয়েছ।

উনি এসে আমার পাশে বসলেন। আমার গায়ে হাত রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন—তুমি এস্রাজ্ শিখবে রোজি? মেয়েদের হাতে ওটা ভারী মিষ্টি লাগে।

—আজ মাসিমাদের ওখানে শুনেছ বুঝি? কে বাজাচ্ছিল?

—অজিতার এক বন্ধু, চমৎকার হাত মেয়েটির, তেমনি বাঁশীর মত গলা।

—দেখ্‌তেও খুব সুন্দর বোধ হয়।

উনি যেন থমকে গিয়ে আমার মুখপানে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি করে জানলে?

—যে অমন সুন্দর গাইতে বাজাতে পারে—

—তাকে সুন্দর হতেই হবে, কেমন? বাহবা! শুধু কল্পনাই নয়, তোমার অনুমান শক্তিও খুব প্রখর রোজি!

উনি হেসে উঠ্‌লেন।

আমি থতমত খেয়ে চুপ করে গেলুম। কিন্তু হায় রে কৌতূহল! খানিক পরে উনি শুয়েছেন দেখেও আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলুম—সে মেয়েটির বিয়ে হয় নি বুঝি?

—আমি কি তা জিজ্ঞাসা করতে গেছি? কী মুস্কিল!

মেয়েটি ভাল গান-বাজ্‌না জানে এইটুকু বলেছি, ব্যস্, আর কোথায় আছে! মেয়েদের কেমন যে স্বভাব!

ওঁর কথার ভঙ্গীতে বিরক্তির ভাব সুস্পষ্ট।

—আর নয়, ঘুমিয়ে পড়ো এবার।

বলে উনি পাশ ফিরে শুলেন।

এমন লজ্জা হল! ছি! ছি! কেন যে মরতে···

কিন্তু এই দু'টি সহজ তুচ্ছ প্রশ্নে এতখানি বিরক্তির কি হেতু ছিল, তা বুঝ্‌তে পারলুম না।

সেই—সেই দিন থেকেই ওঁর প্রকৃতিতে কেমন একটু পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি, হতে পারে এ আমার মনের ভ্রান্তি।

কিন্তু শুধু তাই নয় আরো কত খুঁটিনাটি······

আগে আমাকে বাইরে বার করবার জন্যে উনি কি রকম পীড়াপীড়ি করতেন, কোনোদিন থিয়েটার, কোনোদিন বায়োস্কোপ, কোনোদিন কিছু, আজকাল সেদিকেও আর উৎসাহ দেখি না তেমন। এই গেল শনিবারেই তো আমায় বলে গেলেন তৈরী হয়ে থাকতে,

'চিত্রা'র কি একটা ভাল নূতন ফিল্‌ম দিয়েছে, যেতেই হবে।

ও মা! সেজে গুজে বসে রইলুম, এলেন রাত দশটার পর! হঠাৎ কি একটা জরুরী কাজ পড়ে গিয়েছিল না কি!

কিন্তু বিশুর মা ড্রাইভারের মুখে শুনেছে, বাবু সিনেমাতেই গেছ্‌লেন, একলা কি দোকলা, তা আর জিজ্ঞাসা করতে আমার প্রবৃত্তি হল না।

ওঁকে সেই কথার একটু আভাস দিয়েছিলুম, তাতেই সোফার বেচারা ধমক খেয়ে ম'ল।

যাক্ গে, আর বেশী কিছু জেনে দরকার নেই আমার!

কেঁচো খুঁড়তে শেষে সাপ বেরিয়ে পরে যদি······ গোবিন্দলালের ভ্রমরের মত যদি আমারও কপালে······ আহা! বেচারী ভ্রমর! সেদিন বায়োস্কোপে ভ্রমরের দুঃখের চিত্র দেখে কেঁদে বাঁচি না! উনি হাস্‌তে লাগ্‌লেন — বাস্তবিক কি 'সেন্টিমেন্টাল্' তোমরা?

হায়! ভ্রমর স্বামীর 'পরে রাগ-অভিমান করেছিল যে অধিকারে, সে অধিকার আমার কোথায়?

আমি ওঁকে আজ কিসের জোরে······

দূর করো ছাই! কেবল ওই চিন্তা। কেন? ভালবাসার কি কোনো দাবী নেই? ওঁর ভালবাসাই তো আমাকে রাজরাণী করেছে, নইলে এই যে হীরার হার, মোতির মালা, এগুলোর দাম কি?

কিছু না! সেই ভালবাসাতেই যদি বঞ্চিত হতে হয়, তা'হলে······ওঁর কাছে আমি শুধু দয়া ভিন্ন আর কিসের প্রত্যাশা······না না, অমন করে শুধু দয়ার পাত্রী হয়ে বেঁচে থাক্‌তে আমি চাই না, চাই না গো! ওঃ! সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই আমার মৃত্যু দিও, হে ভগবান্!

(ক্রমশঃ)

নিখিল ভারতীয় রম্যকলা-প্রদর্শনী

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

সম্প্রতি Academy of Fine Arts-এর উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান ম্যুজিয়াম'-ভবনে রূপশিল্পের যে নিখিল-ভারতীয় প্রদর্শনী উন্মোচিত করা হয়, তা' নানা কারণে এদেশে একটা স্মরণীয় ব্যাপার হয়েছে। এরূপ সার্ব্বজনীন অভিনন্দন কোন প্রদর্শনী ইদানীং পেয়েছে কি না সন্দেহ এবং সর্ব্বতোভাবে এরূপ উৎসাহ ও উদ্যমে এ উৎসবটি মণ্ডিত হয়েছিল, যা'তে দেশের ক্লান্ত চিত্তে একটা ভাবের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। প্রতিদিনই প্রদর্শনীটি জনসঙ্গমে মুখরিত হ'ত এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেণীর দর্শকই এরূপ একটা আয়োজনের সম্মুখীন হওয়াকে সৌভাগ্য মনে করেছে।

প্রদর্শনীর চিত্র নম্বর নং ৬৩৫
শিল্পী—শ্রীফণীভূষণ সান্যাল

মহারাজা শ্রীযুক্ত প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের আনুকুল্যে ও উৎসাহে এই বিরাট ব্যাপারটি সফল করা সম্ভব হয়েছিল। উদ্যোগটির প্রাথমিক অনুষ্ঠানও একটা বিশিষ্ট মর্য্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিল। ইদানীং ভেদ-বুদ্ধির প্রাবল্যে দেশ যেরূপ শতধা বিভক্ত হয়েছে তা'তে কোন মিলনমেলার অনুষ্ঠান একটা বায়বীয় কল্পনাতে পর্য্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু পরিষদের সভাপতি মহারাজা বাহাদুরের রাজোচিত প্রতিভা এবং সম্পাদক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসুর অক্লান্ত শ্রমে এই স্বপ্নটি বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। যদিও জগতে আর্টের খাতির সকলে মেনে চলে এবং সৌন্দর্য্যের প্রাঙ্গনে জাতি ও

প্রদর্শনীর চিত্র নং ৩৮১
শিল্পী—শ্রীযামিনী রায়
(পাতিয়ালার মহারাজাধিরাজের সৌজন্যে)

সম্প্রদায় কোন সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্রতায় আকৃষ্ট হয় না তবুও শিল্পীদের চক্র বড়ই আত্মপর ও অনাত্মঘাতী—এক একটি চক্র অন্য চক্রকে আহত করতে না পারলে তৃপ্ত হয় না। জগতের জনতা সৌন্দর্য্যের রসসুধা পান ক'রে আত্ম-পর বিস্মৃত হ'য়ে যায়—কিন্তু লঘুচিত্ত শিল্পীরা অনেক সময় সুরাসুরের যুদ্ধে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

সকল দেশেই এরকম অবস্থা হয়ে থাকে। এরকম লঘু ক্ষুদ্রতা দূর করবার জন্যই ফরাসী দেশে Salon de Independent-এর সৃষ্টি হয়। এদেশেও সর্ব্বশ্রেণীর শিল্পীকে উৎসাহ ও প্রসার দেওয়ার জন্য এমন একটা ব্যবস্থা দিন দিন অপরিহার্য্য হয়ে উঠছে—যা'তে ক'রে কোন বিশিষ্ট দল বা চক্র মারাত্মক ভাবে বহুমুখী শিল্প-চেষ্টার পরিপন্থী না হয়। যে ক্ষেত্রে অন্তরের উদারতম প্রেরণার কাজ করা উচিত, সেখানে ক্ষুদ্রতা ও পঙ্গুতা জাতির চিত্তে একটা অবাক্ত বিভীষিকা জাগ্রত ক'রে তোলে। Academy of Fine Arts-এর অনুষ্ঠাতারা এই বিশ্বভারতীয় প্রদর্শনীতে কোন বিশিষ্ট শিল্পের দ্বারই রুদ্ধ করেন নি। ভারতীয় কলার নিরুপম সৌকুমার্য্যের সহিত একাসনে স্থান পেয়েছে প্রতীচ্য রস-স্রষ্টার কঠোর তপস্যার ফল। বিশ্বমানব পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সৌন্দর্য্যের এক বিরাট যজ্ঞে আত্মহারা হয়ে আছে—যে আত্মদানের ফল সাহিত্যে ও রস-ব্যঞ্জনার বহু ক্ষেত্রে নৈবেদ্যের মত জগতের চক্ষুগোচর হচ্ছে প্রতি যুগে। কোন বিশিষ্ট শিল্পীর পক্ষে সে সম্বন্ধে ভ্রান্ত আত্মাদরে উচ্ছ্বসিত হওয়া কাজের কথা নয়। রসশিল্পীরা সমগ্র জাতির বেদনা ও স্বপ্নকে শরীরী ক'রে তোলে মাত্র—একান্তভাবে নিরুপাধি ব্যক্তিত্ব ব'লে কোন পদার্থ নেই। অখণ্ড মানবত্ব, নানা সাধনা ও সঙ্কল্পের তরঙ্গভঙ্গে জীবন-সমুদ্রে আত্মাকে দ্যোতিত করছে। জগতের বিশ্বরসশিল্পী মানবের ভৌতিক ও তুরীয় রূপাভিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়-স্বরূপ—এ কথা মনে করলে অবান্তর কলহ-কল্লোল অনেকটা শান্ত হয়ে যায়। বস্তুতঃ সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্রে সর্ব্বতোভাবেই ক্ষুদ্র স্তরের সঙ্ঘর্ষগুলিকে নির্ব্বাসিত করা উচিত। আধুনিক রস-পিপাসুগণ মিশরের রূপ-বৈচিত্র্য, চৈনিক স্বপ্ন, ভারতীয় রসমরীচিকা, পারস্য সাধনাসম্ভার প্রভৃতির আকর্ষণে সমভাবেই মুগ্ধ হয়।

তাজমহল বা অজান্তা দেখে কেউ সে সমস্তকে জাতি ও ধর্ম্মের দিক থেকে বিচার করতে উৎসাহিত হয় না—যে সমস্ত সাধারণ বিশ্বমানবের সম্পদ্—অসীম মানবের সুখ-দুঃখ, কল্পনা ও স্বপ্নের সঙ্গে যে সমস্ত জড়িত—তা'তে শ্বেত, কৃষ্ণ বা পীতত্বের প্রশ্ন উঠে না।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ এজন্যই কোন ইতর-বিভেদকে মুখ্য ক'রে তোলেন নি। এ-দেশের সাধারণের সহিত সুপরিচিত করতে প্রতীচ্য দেশের ওস্তাদ শিল্পীদের কয়েকখানি মূল চিত্র প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সাধারণের পক্ষে এ সব চিত্র দেখবার সুযোগ ইতিপূর্ব্বে আর হয় নি—এজন্য পরিষদ সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। তাঁরা যেন কিছুকালের জন্য ভারতের একটি প্রধান নগরে সৌন্দর্য্যের একটা অন্নছত্র খুলেছিলেন যাতে সর্ব্বতোভাবে সকলেই রসাস্বাদন ক'রে চরিতার্থ হয়েছে। বাংলার রাজপ্রতিনিধি এ প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন ক'রে সকলের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছেন। এ অনুষ্ঠান দেখে মনে হয়—মানুষের ভিতরকার যে অনাত্মস্থ রস-সম্পর্ক আছে তার একটা ডাক আছে—সে ডাক রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধ ও বিধি-ব্যবস্থাকে অতিক্রম ক'রে একটা সার্ব্বভৌম মঞ্চে সকলকে আহ্বান করে—যেখানে মানুষ মাত্রই রস-নাট্যের অভিনেতা এবং সকলের স্থানই সমান। বস্তুতঃ বিশ্ব-বিধাতার বিরাট রাসলীলায় মানবজীবনের অফুরন্ত ভাব-কোরকপুঞ্জ হিল্লোলিত হচ্ছে নানা রূপে, আধারে ও পরিচ্ছদে। এ দুর্দ্দিনে সকলের ভিতর এরকমের একটা যোগসূত্র স্থাপন ক'রে একটা আন্তরিক বোঝা-পড়ার অবসর দেওয়াটি এক অসামান্য ব্যাপার হয়েছে।

এই প্রদর্শনীতে প্রায় সহস্রাধিক চিত্র-সংগ্রহ স্থান পেয়েছিল। 'ইণ্ডিয়ান মুজিয়ামে'র অলিন্দটিতে এমনি ভাবে যেন একটা রূপের দীপালিতে আলোকিত হয়েছিল। শুধু ইংরাজ ও ফরাসী রসজ্ঞের দ্বারা যে এই চিত্র-পর্য্যায় অভ্যর্থিত হয়েছিল তা' নয়—কলা পরিষদের শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি হচ্ছে ভারতীয় নৃপতিগণের সাহচর্য্য লাভ করা। এরকম অনুষ্ঠানে ভারতের একটা অখণ্ডতা দীপ্যমান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নবীন উদ্যোক্তারা এই অসামান্য ব্যাপার সুসম্পন্ন ক'রে সকলেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়েছেন।

প্রদর্শনীর চিত্র নং ৫৮১
শিল্পী—শ্রীযামিনী রায়
(পাতিয়ালার মহারাজাধিরাজের সৌজন্যে)

তাঁদের উৎসাহ ছাড়া এ কাজ সম্ভব হ'ত না এবং মহারাজা বাহাদুর ঋত্বিক না হ'লে এই রাজসূয় যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হ'ত না। এমন কোন শিল্পী নেই যিনি এই ব্যবস্থার জন্য পুলকিত হবেন না। শোনা যায় প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার চিত্র-সংগ্রহ এই সম্পর্কে বিক্রীত হয়েছে। উৎসাহের অভাবে নিখিল-ভারতীয় সমবায়ের সূচনা করতে পারে নি। Academy of Fine Arts-এর চেষ্টায় সাময়িক ভাবে যেন কলিকাতা সনাতন মর্য্যাদা ফিরে পেয়েছিল।

প্রদর্শনীর চিত্র-সংগ্রহ বিশেষভাবে অনুধাবনার বিষয়। প্রাচ্য চিত্রকলার একটা সুবিন্যস্ত সারি সকলেরই চিত্তবিনোদন করেছিল। আনন্দের বিষয়,

প্রদর্শনীর চিত্র নং ৪৭৯

গ্রাম্য-পূজা

(পাতিয়ালায় মহারাজাধিরাজের সৌজন্যে) শিল্পী—শ্রীশৈলজ মুখার্জ্জী

মৃতপ্রায় শিল্পীদের পক্ষে এটি কি সামান্য ঘটনা? বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু এই ব্যাপার সফল ক'রে চিত্রশিল্পীমাত্রেরই অনুরাগভাজন হয়েছেন। কাশ্মীর, পাতিয়ালা প্রভৃতি দেশের মহারাজগণ বহুকাল পরে এরূপ একটা অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন। কলিকাতা ভারতের রাজধানী পদ হ'তে বিচ্যুত হওয়ার পর থেকে এরূপ একটা অনেক তরুণ শিল্পীর চিত্র-সম্ভারে এ অংশটি পরিপূর্ণ ছিল। ভারতের যে প্রাচীনধারা এখনও নানা স্রোতে, নানা রূপসম্ভার সৃষ্টিতে উৎসারিত হচ্ছে—তা'র নিবিড় মোহ হ'তে এদেশ কখনও মুক্ত হ'তে পারবে না। যে সমস্ত নবীন শিল্পীরা সে গঙ্গোত্রীর দুর্গম অরণ্যে ছুটে গেছে, তাদের সুষমাপূর্ণ সৃষ্টি দিন দিন আলেয়াতে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু সমগ্র রূপচেষ্টা শুহাবদ্ধ

করে আধুনিক ভারতীয় সাধনাকে শৃঙ্খলিত ও কারারুদ্ধ করা উচিত নয়। প্রাচীন সৃষ্টির মাদকতা চিরকালই প্রাচ্যাঞ্চলকে মুগ্ধ করবে সন্দেহ নেই, কিন্তু এযুগের কঠিনতর আবেষ্টন এবং নিষ্ঠুরতর সমস্যা অহরহ নূতন রসজিজ্ঞাসা জাগ্রত ক'রে তুলেছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের বজ্রবেষ্টনী দশদিকে ভারতের নব্য বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিদ্বারা দিন দিন দৃঢ়ীভূত হচ্ছে—পাশ্চাত্য সভ্যতে জর্জ্জরিত প্রাচ্যচিত্ত নূতন আয়ুধ ও নূতন কঞ্চুক চায় যাতে ক'রে শুধু মাত্র আত্মরক্ষা হবে না, আত্মবিস্তারও হবে। পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষুরধার শাণিত সম্পর্কে তুর্কী, চীন ও জাপানের দিবাস্বপ্ন ঘুচে গেছে—আরাম আলয়ে পিয়ার নৃত্য, অহিফেনসেবন বা অলস স্নানাগারে কুণ্ডলায়িত আলবোলায় দীর্ঘমধ্যাহ্ন ধূমপান—এযুগে আর চলছে না। এ যুগে মননের ধারা ফিরে গেছে, স্বপ্নের রঙও বদলে গেছে। নূতন প্রশ্ন ও অধিকার, সাধন ও সঙ্কল্প সমগ্র বিশ্বকে পেয়ে বসেছে। কেউ একাকিত্বের অসূর্য্যম্পৃষ্ট অন্তঃপুরে বাস করতে পারছে না। ভারতীয় কবিও এজন্য ইংরাজী ভাষায় নব্য জগতের রসপ্রশ্নের আলোয় সঞ্চার ক'রে পশ্চিমের হৃদয় অধিকার করতে সাহসী হয়েছে। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্যে কি বিশ্বজনবাসরে জগতের নব্য ভাষায় ভারতের কিছু দান করবার নেই? ভারতে ত্রি-মূর্ত্তির ত্রি-নয়নের দু'টিই বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে আছে—অতীত-সর্ব্বস্ব হয়ে থাকা ভারতের ধর্ম্ম নয়—আধুনিক ভারতের দেবতা কি একচক্ষু হয়ে থাকবেন? শুধু অতীতের পঙ্কিল আবর্ত্তে স্থূলকায় গণ্ডারের মত আত্মনিবদ্ধ হয়ে তৃপ্তিলাভ করতে প্রাচ্যদেশের কোন অংশই প্রস্তুত নয়। ভারতের দর্শনে ও চিন্তার ইতিহাসে সকল সাধনারই সমন্বয় হয়েছে। বিশ্বগ্রাসী শক্তিসাধনার সমগ্র উপাদান ভারতের আত্মভবে স্বীকৃত হয়েছে। আধুনিক শক্তিসাধনায় মত্ত যুগে কি নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার তপোবন-সুলভ অলস খেয়াল নিয়ে ভারতের তারুণ্য আত্মঘাতী হবে?

নূতন আবেষ্টনীর ভিতর আধুনিক বিশ্ব আত্মপ্রকাশের নানা রূপ ও ছন্দ আবিষ্কার করেছে—ভারতবর্ষই শুধু এ সব সম্পদসঞ্চয় হ'তে বঞ্চিত হবে? নব্য চীন, নব্য জাপান ও নব্য তুর্কী সকল দিকেই আত্মনিয়ন্ত্রণে অগ্রসর হয়েছে—এমন কি পশ্চিমকেও কোন কোন বিষয়ে এদের নিকট হার মানতে হয়েছে। জগতের জাগ্রত জীবনে সেকেলে অন্ধসংস্কার ও অন্ধের যষ্টি নিয়ে থাকলে নিজের রুগ্নতা ও বার্দ্ধক্যকেই ঘনীভূত করা হবে—জাতির আত্মপ্রকাশের বৃহত্তর রাজপথকে রুদ্ধ করা হবে মাত্র। সকল দিকে একটা প্রবল ঝড় বিশ্বময় ছুটেছে—এ ঝড়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা কোন জাতিরই নেই।

এই প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে Black-and-whites, Portraiture, Etching প্রভৃতি তরুণ শিল্পের নব্যপথে ভারতীয় শিল্পযৌবন নির্ভয়ে ছুটেছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এ সমস্ত প্রচেষ্টাকে সম্বর্দ্ধিত ক'রে জয়ধ্বনি করার কোন আয়োজনই নেই। দুঃখের বিষয় ভারতের ভীরু অন্তর গুহার ভিতর লুকিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে—বিস্তীর্ণ মরুভূমির কর্কশ ক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে অগ্রসর হ'তে কুণ্ঠা প্রকাশ করাকে অতীতের মাহাত্ম্য ঘোষণা ব'লে মনে করে। এই শোচনীয় অব্যবস্থার ভিতর এই চিত্র-প্রদর্শনী-পরিক্রমা একটা পরম শিক্ষাস্থানীয় ব্যাপার। যে সমস্ত শিল্পী লঘু করতালির প্রলোভন হ'তে মুক্ত হয়ে জগতের সার্ব্বজনীন পথে এসে পড়েছে এবং বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হ'তে জয়মুকুট আহরণ করবার স্পর্দ্ধা করছে, তাদের সম্বন্ধে দু'টি সম্ভাষণ কি জাগ্রত ভারতের কর্ত্তব্য নয়? আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-ক্ষেত্রে ভারত অনেক দুর্লভ পুরস্কার জগতের দরবার হতে আহরণ ক'রে জয়যুক্ত হয়েছে—রম্যতর রূপসৃষ্টিক্ষেত্রে ভারত কি লাঞ্ছিত হয়ে থাকবে? বস্তুতঃ এই প্রদর্শনীতে এমন অনেক চিত্রচেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় যা' সর্ব্বত্র সমাদৃত হওয়ার যোগ্য। ভারতীয় শিল্পীর ভূ-চিত্রগুলিতে (landscapes) এমন একটা সরস মাদকতা ও গুন্ঠিত শ্রী আছে, যা' পশ্চিমে শিল্পীর পক্ষে

দান করা কঠিন। এদেশের আরণ্য-সম্পদ ও প্রাকৃতিক রূপ-ধারা অন্যত্র দুর্লভ—এজন্য এই চিত্রকলা-পর্য্যায়ের চারিদিকেই এমন একটা বিচিত্র জগৎ ফুটে উঠেছে যা' দেশ-বিদেশের কোন একটি শিল্প-কেন্দ্রে বা প্রদর্শনীতে দেখতে পাওয়া যাবে না! পর্ব্বতচারী পরিচ্ছদ-প্রাচুর্য্যে ভরপূর কাবুলী, গঙ্গাতীরে স্নানের উৎসব, শরৎ প্রভাতের গৌরব, সূর্য্যরশ্মির বর্ণকারুতা, মন্দিরদ্বারের পূজকমণ্ডলী, বিপণির বিচিত্র সজ্জা, সাপুড়ের বাঁশী ও বোঝা, হিমালয়শৃঙ্গে তুষাররাশি প্রভৃতি অজস্র দৃশ্য-পট প্রাচ্য দেশের জীবনের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য এবং সূর্য্যকরোজ্জ্বল জগতের অনবগুণ্ঠিত স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যকে উদ্‌ঘাটিত করে। এ পর্য্যায় হ'তে আধুনিকতম রাজপ্রতিনিধি ও কবির চেহারাও বাদ পড়ে নি। বস্তুতঃ ভারতের আধুনিক চিত্রের বিচিত্র ভাব-গমকের সুষ্ঠু প্রতিফলন এ সমস্ত চিত্র-পর্য্যায়ে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এক দিকে প্রাচ্য হৃদয়ের এই উন্মাদনা, অন্য দিকে প্রতীচ্য শিল্পীর প্রাচ্য রস ও দৃশ্যে ভরপূর রচনা পূর্ব্ব ও পশ্চিম লোকব্যাপী এক বিচিত্র রূপের রামধনু রচনা ক'রে আমাদের তৃপ্তি বিধান করে।

বস্তুতঃ জগতের সকল শিল্পীর নিকট ভারতবর্ষ একটা সৌন্দর্য্যগত প্রেরণা লাভের ভূমি। বিষয় ও ভাব-বৈচিত্র্য, বর্ণ ও রেখার অসীম কারুতা, আলো-ছায়ার আলেয়া, মেরুরাজ্যের শীতার্ত্ত সম্পদ্ এবং মরুভূর বহ্নি-সমারোহ—প্রাকৃতিক কোন সম্পদই ভারতে দুর্লভ নয়। নরনারীরও অসংখ্য বৈচিত্র্য ও বিধান ভারতবর্ষকে জগতের একটা দ্রষ্টব্যস্থানে পরিণত করেছে—এজন্য সকল দেশ হ'তে রূপ-শিল্পীরা এসে ভারতবর্ষের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করতে উৎসাহিত হয়। এ সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিভাবের ছায়া প্রদর্শনীর ক্ষুদ্র পরিসরেও দেখতে পাওয়া যায়। ভারতের চিত্র-শিল্পীরা নিজের দেশ-মাতৃকার ঐশ্বর্য্য নানা ভাবে দ্যোতিত করবে—ইহা খুবই স্বাভাবিক। এ সমস্ত রূপস্বপ্ন বিশ্বের দরবারে অর্পণ করার মহার্ঘ অধিকার এ দেশের শিল্পীর আছে। বস্তুতঃ রস-জগতের এই সমস্ত সম্ভার জগতের নিকট সৌন্দর্য্যের বাণীরূপে প্রতিভাত হয়ে পড়ে। নিখিল ভারতীয় শিল্পকলা-প্রদর্শনী এমনি ভাবে ভারতের একটা বিচিত্র বার্ত্তা জগতের নিকট উপস্থিত করেছে।

প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ মূর্ত্তিকলারও কিছু সংগ্রহ উপস্থাপিত করেছেন—সে সমস্তও পরম লোভনীয় হয়েছে। ভারতের সকল সীমান্তের শিল্পীরাই এই সমস্ত রচনায় যোগদান ক'রে এ সৌন্দর্য্য-যজ্ঞের সৌষ্ঠব বিধান করেছে। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব, গুর্জ্জর প্রভৃতি ভারতের মুখ্য কেন্দ্র হ'তে শিল্পীরা অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বাঙ্গালা দেশের এই আধুনিক রূপ-বিপণিতে এরূপ আদান-প্রদানে একটা বিশ্ব-ভারতীয় আত্মীয়তার সূত্রপাত হয়েছে এবং সকল শ্রেণীর দর্শক ও রস-ভোক্তা দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে ব্যাপারটি একটি স্মরণীয় ব্যাপার হয়ে পড়েছে।

মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার নিজের সংগ্রহ হ'তে Mather Brown-এর 'Meerzaffer and Clive' নামক ঐতিহাসিক চিত্র, Luca Giordano কৃত 'Venus', 'Cupid' এবং 'Psyche' নামক চিত্রগুলি এবং Jacomb-Hood-এর 'Imperial Durbar, Delhi, 1912'—এ সমস্ত চিত্র প্রদর্শন করেছেন। ইংলণ্ড হতে Mr. Richard Haworth, চিত্রশিল্পী Sir Edward Burne-Jones এর 'Music' এবং 'Poetry' নামক দু'খানি ছবি এবং Alma-Tadema-র 'The Mummy' নামক ছবিটিও প্রদর্শন করেছেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের সংগ্রহ হ'তে Van Dyke-এর 'Portrait of Marquis Spinolo' নামক ছবিখানি প্রদর্শিত হয়েছে। এ সমস্ত য়ুরোপীয় ওস্তাদের চিত্র-সংগ্রহ এ দেশের সাধারণের চোখে নূতন সম্পদ্। বস্তুতঃ প্রতীচ্য শিল্পীর সাধনা ও সম্পদ ভারতের তরুণ শিল্পীরা এই প্রদর্শনীতে দেখবার সুযোগ পেয়েছে। শিক্ষিত নরনারীর পক্ষেও এরূপ উচ্চস্তরের ভোগ সচরাচর ঘটে না। য়ুরোপীয় শিল্পতা নানা সঙ্ঘর্ষ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বন্ধুর পথে যুগে যুগে অগ্রসর হয়েছে। নানা সমস্যা ও সাধনার ধারা সেখানে

জটিল জীবন-পথে বার বার নরনারীকে জাগ্রত ক'রে তুলেছে—এ সমস্ত চিত্র-পর্য্যায়ে সে বিরাট ভাব-যাত্রার রক্তাক্ত চিহ্ন আছে। গ্রীকো-রোমান্ সভ্যতার সরল কারুতা, মধ্য-যুগের অধ্যাত্ম আলোড়নের কুজ্ঝটিকা, রিনের্শাস যুগের বিচিত্র ভোগবাদ এবং আধুনিকতার পল্লবগ্রাহী বিশ্বসম্পর্ক এক মরীচিকা রচনা করেছে শিল্পীদের রচনার মধ্যে। রস-পিপাসুদের চোখে স্তরে স্তরে প্রতীচ্য চিত্র-স্বপ্নের মধ্যে বিচিত্র বায়বীয় রঙের খেলায় ন্যায় এ সমস্ত উদ্ভাসিত হয়।

একদিকে য়ুরোপের এই সংগ্রহ অন্যদিকে প্রাচীন ভারতীয় ধারায় রচিত চিত্র-পর্য্যায়—যেন দু'টি মেরু হ'তে দু'টি ঝঙ্কারের মত চিত্তকে ব্যাকুল করে তোলে। প্রাচীন ভারতীয় প্রথার সুষমা স্বীয় ক্ষেত্রে অপরাজেয়। অনেক নব্য শিল্পী এই অংশটি লোভনীয় ক'রে তুলেছে। প্রমোদ চ্যাটার্জ্জী, সারদা উকিল, রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মণীন্দ্র গুপ্ত, চৈতন্য চাটার্জ্জী, ভুবন বর্ম্মণ প্রভৃতি শিল্পীরা নূতনভাবে প্রাচীন ভারতীয় রূপকারদের ইন্দ্রজাল রচনা করতে উৎসাহিত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ সমস্ত তরুণ শিল্পীদের স্বপ্নসৌন্দর্য্যে শুরুধরের রীতিই অনুসৃত হয়েছে। পূর্ব্ব ভারতের রূপ-মরীচিকার বার্ত্তা তেমনভাবে এ প্রদর্শনীতে প্রস্ফুট না হ'লেও যামিনী রায়ের চিত্রধারা কতকটা সে ক্ষতি পূরণ করেছে। যামিনী রায়ের প্রাচীন (archaic) ধারা ঘাত-প্রতিঘাতের বর্ত্তমান যুগে একথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ভাব-প্রকাশের উপায় ও পথ সীমাহীন—সূক্ষ্ম ও লঘু লালিত্য এবং ইন্দ্রিয়জ, মাংসজ আকর্ষণে যা' পাওয়া যায় না, সবল তুলিকার টান ও বলিষ্ঠ বর্ণসংহতি তার চেয়ে আরও গভীরতর প্রদেশে সাড়া দেয়—যে দেশে কম্পাস কাঁটা নিয়ে মাপ বা ওজন করবার উৎসাহ কারও থাকে না। প্রাচীন বাঙ্লার এই ভাবনিবিষ্ট বলিষ্ঠতা বাঙ্গালী জাতিকে এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছে। এই রীতি বহু পরিমাণে আধুনিক য়ুরোপীয় Post Expressionist পদ্ধতির আবহাওয়াকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু বাঙ্গালীর এই প্রাচীন চিত্রকলায় প্রসার ও প্রকাশের বিপুল সাধনার সঙ্গে সঙ্গে একটা শীলতাগত আত্মসংহতি লক্ষ্য করা যায়, যাতে ক'রে এই শিল্পকলা ছিন্নমস্তা হ'তে উৎসাহিত হয় নি। য়ুরোপের বিদ্রোহ-বিধি শিল্পীদের রূপের বৈয়াকরণিক ক'রে তুলেছে—কিন্তু বাংলাদেশের এই রসচর্চ্চা কাব্যস্থানীয়। প্রতীচ্য দেশ ন্যায় ও গণিতের পথে এসে এই রস-বিপ্লবেরও হিসেব নিকেশ করতে উৎসাহিত হয়েছে। Picasso বা Archipenko প্রভৃতি শিল্পীরা এ জন্যই স্থায়িত্ব দাবী করতে পারে নি। আশা করা যায় বাঙ্লার শিল্পীরা শুধু একটিমাত্র রীতিতে আবদ্ধ না থেকে পূর্ব্ব ভারতীয় শীলতা ও সৌন্দর্য্যবিধির বিচিত্র ও বিশিষ্টতাকে নানা আধারে জগতের সামনে উপস্থিত করবে। ভারতবর্ষ একটি বিরাট মহাদেশ—এদেশে নানা শিক্ষা, সাধনা ও রসবিধি উৎসারিত হয়েছে, যদিও নানা দিক হ'তে সমস্ত সৃষ্টি-পর্য্যায়ই একটা অন্তঃকেন্দ্র আকর্ষণে রঞ্জিত হয়ে নিজের বিশিষ্টতাও আত্মীয়তাকে প্রকাশ করেছে। কাজেই আত্মনিষ্ঠ স্বাধীন পূর্ব্ব ভারতের রসচর্চ্চা নূতন নূতন পথে গেছে—পশ্চিম ভারতের গুহা-শিল্পকে একমাত্র বরেণ্য ব্যাপার মনে করে নি এবং ক্রমশঃ এই মহার্ঘ দানটি নেপাল, তিব্বত, চীন ও জাপানেও বিস্তৃত করেছে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

সমাপন

শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ

অত্যল্প বয়সে নিতান্ত অসময়ে জগতের ভোগ-বাসনা অতৃপ্ত রাখিয়া বেদনা-ভারাক্রান্ত চিত্তে করুণা যখন শেষ শয্যা আশ্রয় করিল, একমাত্র সন্তান উন্মেষের ভবিষ্যৎ চিন্তাই তখন তার প্রতি মুহূর্তটি আরও অশান্তিময় করিয়া তুলিতেছিল। উন্মেষ! বড় দুরন্ত, বড় অবুঝ সে! স্নেহাঞ্চলের ছায়ায় ঢাকিয়া জননী এতদিন অতি সন্তর্পণে সকল বিঘ্ন-বিপদ হইতে দূরে দূরে সকলের বিরক্ত দৃষ্টির আড়াল করিয়া রাখিতেন। কিন্তু এবার! করুণা আকুল-চিত্তে নিয়ত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিত নিরাময় হইবার জন্য! ব্যর্থ কামনা তার হয়ত তাঁর চরণে পৌঁছিল না। কিম্বা তার যাইবার প্রয়োজনই হয়ত বেশী ছিল! দুরারোগ্য ব্যাধি দেহ আশ্রয় করিয়া নিয়ত মরণকে ডাকিতেছে। সে-ও সে আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে নাই। মৃত্যু অত্যন্ত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে— নিষ্ফলে ফিরিবে না। দিন যত নিকট হইতেছিল, করুণার অধীরতা ততই বাড়িতেছিল —মরণের ভয়ে নয়, সন্তানের ভাবনায়! স্বামী-পুত্র রাখিয়া মরিতে পারাটা হিন্দু নারীর ঐকান্তিক কাম্য, কিন্তু সেই কাম্য জিনিষটাই করুণার কাছে আজ ভয়ের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। তার অবর্তমানে উন্মেষের কি দশা হইবে? স্বামীর স্বভাব তার অজ্ঞাত নয়। কঠোর প্রকৃতি তাঁর, কাহারও এতটুকু দোষ-ত্রুটী সহ্য করেন না। তা সে অপরাধ তার ইচ্ছা-কৃতই হোক, আর অনিচ্ছাতেই অনুষ্ঠিত হোক।

তিনি কখনো ঐ দুরন্ত শিশুর অন্যায় দৌরাত্ম্য সহ্য করিবেন না। তার ফলে? ভাবিতেও করুণার দুর্বল দেহ-মনে আঘাত লাগে। তারপর একটা অপ্রিয় চিন্তা অনিচ্ছাতেও মনে আসে। করুণার স্থান শূন্য থাকিবে না, এ নিশ্চিত! যে সে অধিকার গ্রহণ করিবে, সেও কি ওকে সুনয়নে দেখিবে? অসম্ভব! জননীর অভাব অভাগা বালকের কত কষ্ট, কত বড় দুর্ভাগ্যের কারণই না হইবে! কে তাহার শত উপদ্রব, সঙ্গত অসঙ্গত সহস্র আবদার সহিবে? মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত, তৃষিত, বিশুষ্ক চিত্তে স্নেহের অমৃতধারা বর্ষিয়া কেই বা তাহাকে তৃপ্তি দিবে? উন্মেষের পিতা? তার স্বামী? স্বামীর কথা মনে হইলেই একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস করুণার জীর্ণ বক্ষ আলোড়িত করিয়া দেয়। স্নেহ, মমতা, করুণা প্রভৃতি সুকোমল মনোবৃত্তি তিনি সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়া থাকেন। কোন রকম ভাবপ্রবণতা তাঁর দুই চক্ষের বিষ। পৌরুষের দৃঢ় বর্ম তাঁর অন্তর আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। তাই বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত এ অবধি এতটুকু স্নেহ-মধুর ব্যবহার করুণা পায় নাই! শত আশাময় স্নেহ-বুভুক্ষিত চিত্ত তার এতদিন ধরিয়া কঠিন আঘাতে যেন অসাড় হইয়া আসিয়াছে। উপেক্ষা, অনাদর, অবহেলা! হয়ত এই জন্যই এত সত্বর শেষ-শয্যা তাকে বিছাইতে হইল। যাক, তুচ্ছ নারী-জীবন, অমন কত অযত্নে শুকাইয়া অকালে ধরণীর বক্ষচ্যুত হইয়া যাইতেছে। কার কি ক্ষতি তাতে? চিন্তা শুধু ঐ অবোধ শিশুর জন্য! অহর্নিশি ভাবনা। করুণার অবসন্ন, ক্লিষ্ট জীবন অতি দ্রুত গতিতে অবসানের পথে চলিয়াছিল।

কীটদষ্ট কুসুমটির মত করুণার শুষ্ক দেহখানা শয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। উদাস দৃষ্টি মুক্ত বাতায়ন-পথ বহিয়া দূর দিগন্তে গিয়া মিশিতেছে। কি ভাবিতেছিল, সে-ই জানে। বাহিরে যেন পায়ের শব্দ ধ্বনিয়া উঠিল। করুণা ফিরিয়া দ্বারের দিকে চাহিল। দমকা হাওয়ার মত অস্থির গতিতে উন্মেষ ঘরে আসিয়া জননীর পাশে বসিল। গভীর স্নেহভরে বিকম্পিত হাতখানা তুলিয়া করুণা উন্মেষের গায়ে রাখিল। স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কিছু খেয়েছিস?

উন্মেষ সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া আপন মনে বলিতে লাগিল, বাবা আমায় আজ একটা চড়

মেরেছে। আমি কিচ্ছু করি নি, শুধু শুধু মারলে! বাবার কাছে আর কখ্খনো আমি যাব না। আমায় খালি মারে আর বকে।

করুণা কষ্টে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুই কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

—ছাতে বল খেলছিলুম, আমি আর কাকু। একবার বল ছুঁড়ে কাকুর মাথায় এমন কোরে মেরেছি, কি বলব, খুব লেগেছে।

হি হি করিয়া উন্মেষ কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল! মৃদু তিরস্কারের সুরে করুণা কহিল—তুমি বড় দুষ্ট হয়েছ খোকা। লক্ষ্মী বাবা আমার, একটু শান্ত হও দেখি। সকলে বকে, রাগ করে তোমার দুষ্টুমীর জন্যে, সে কি ভাল? বেশ শান্ত লক্ষ্মী ছেলে হও, সবাই কত আদর করবে, ভাল বলবে, কেমন?

জননীর কথার দিকে উন্মেষের তখন লক্ষ্য ছিল না, একদৃষ্টিতে দেখিতেছিল অদূরস্থ গৃহ-গাত্রসংলগ্ন একখানা আলোক-চিত্রের দিকে। এ দেখার ফল শেষ কি দাঁড়াইবে করুণার জানা ছিল, তাই শঙ্কিত হইয়া পুত্রের মন অন্য দিকে ফিরাইবার জন্য বলিল, উষা, তোর খরগোসগুলো কত বড় হয়েছে রে? এখানে এনে আমায় দেখা না একবার! যা, চাকরদের কাকেও বল গিয়ে তারা নিয়ে আসবে।

খরগোস আনিবার জন্য কোনও আগ্রহ না দেখাইয়া উন্মেষ কহিল, ওটা কার ছবি মা? বাবার? ঐ ছবিটা আমি নেব।

—ছবি নিয়ে কি হবে? ও কি খেলবার জিনিষ?

—না, আমি নেব। দাও নাবিয়ে, ও মা দাও না! দাও আমাকে!

ব্যস্ত ভাবে করুণা বলিল—উষা, ও রকম অন্যায় আবদার কোর না! ছবি নিয়ে কি করবে তুমি? যাও, বাইরে গিয়ে খেলা কর গে।

—না, আমি ঐ ছবি নেব। দাও তুমি!

—আমি কি উঠতে পারি যে দেব?

—তবে আমি পেড়ে নিচ্ছি চেয়ারে উঠে।

পালঙ্ক ছাড়িয়া উন্মেষ ছুটিল চেয়ারের দিকে! করুণা অতি কষ্টে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে ডাকিল—উষা, এদিকে আয়, যাস নি ছবি পাড়তে।

মহা উৎসাহে উন্মেষ তখন একখানা চেয়ার টানিয়া এদিকে আনিতেছিল, দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া কণ্ঠে আনিয়া করুণা প্রাণপণে চেঁচাইতে লাগিল—ওরে উষা, কথা শোন, যাস নি ছবি নাবাতে। যদি পড়ে যায় উনি তা'হলে তোকে আস্ত রাখবেন না। জানিস তো তাঁকে!

জানিত বৈ কি! পিতাকে সে বেশ জানিত। কিন্তু শিশু-চিত্ত দর্পণের মত। কিছু স্থায়ী হয় না। পিতার কঠিন শাসনের পাশ যতক্ষণ তাহাকে ঘিরিয়া থাকিত ততক্ষণই তাহা মনে থাকিত। যেমনি একটু মুক্তি মিলিত, অমনি সব ভুল হইয়া যাইত। তিনি সম্মুখে নাই, করুণার ক্ষীণ নিষেধ উন্মেষ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিল না। চেয়ারে উঠিয়া সবেগে ছবি ধরিয়া টান দিল। ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় শঙ্কিত চক্ষে করুণা তার দিকে চাহিয়াছিল। উঠিয়া বসা, একসঙ্গে এতগুলা কথা বলায় তার দুর্বল দেহ গভীর অবসাদে ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিলেও সে যেমন বসিয়াছিল, তেমনই রহিল। দুরন্ত ছেলে, কি কাণ্ডই না জানি বাধায়! চেয়ার হইতে ছবিটা নাবান গেল না! উন্মেষ সেখান হইতে একটা পাথরের বড় ব্র্যাকেটে উঠিল! করুণা আতঙ্কে আবার চিৎকার করিয়া উঠিল, এখনি পড়ে যাবি, সব ভাঙ্গবে। নাব ওখান থেকে, নাব বলছি। ওরে উন্মেষ, তোর জ্বালায় কি আমি মরব? নাব ওখান থেকে, হাল্কা জিনিষ—যদি পড়ে যাস, সব যাবে!

উন্মেষ তখন ছবি ধরিয়া টানাটানি লাগাইয়াছে।

—কি হয়েছে, এত চেঁচাচ্ছ কেন? ও কি, তুই ওখানে যে? হাতে ছবি কেন? কে ও ছবি নাবিয়েছে? হতভাগা ছেলে, আয় এদিকে!

নিশীথ আগাইয়া উন্মেষের কাছে আসিলেন। স্বামীর ক্রোধ-রক্তিম মুখের দিকে একবার চাহিয়াই

করুণা নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল। পিতাকে দেখিয়াই শান্ত সুবোধ শিশুতে উন্মেষ রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। ছবি লইবার জন্ত ক্ষণপূর্ব্বেকার সে আগ্রহ আর তাহাতে এতটুকুও ছিল না। শুষ্কমুখে সেখানা পায়ের কাছে ব্র্যাকেটের উপর নামাইয়া রাখিয়া ত্রস্ত পায়ে নামিবার উদ্যোগ করিতেই চঞ্চল পায়ের স্পর্শে ব্র্যাকেটস্থিত কাঁচের ফুলদানিটা মাটিতে পড়িয়া শতধা বিচূর্ণ হইয়া গেল। একটা দামী সেন্টের শিশিও সেখানে ছিল সেটাও পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। উন্মেষের সুগৌর মুখখানা একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছিল—কম্পিত দেহে নামিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, নিশীথ তাহার হাত ধরিয়া আটকাইয়া রাখিলেন।

বিশুষ্ক কণ্ঠে কোনমতে স্বর ফুটাইয়া করুণা বলিল, ইচ্ছে করে ভাঙ্গে নি। পা লেগে পড়ে গেছে।

—চুপ। ছেলের হয়ে সাফাই গাইতে এস না। বারণ করে দিচ্ছি। উন্মেষ, ও ঘরে চল্।

আকুল কণ্ঠে করুণা কহিল, আজ আর কিছু বলো না ওকে। আর কখন করবে না। ছেলেমানুষ হঠাৎ—

—আবার! চুপ করে থাক। এই উন্মেষ, আয় আমার সঙ্গে।

প্রতিকারহীন নিষ্ফল ব্যথায় শরাহত পাখী যেমন মাটিতে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করে, অবরুদ্ধ মর্ম্ম-যাতনায় তেমনই ভাবে শয্যার উপর করুণা লুটাইতেছিল, পাশে সুপ্ত উন্মেষ। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ঘরে মলিন ছায়া—যেন বিষাদের আবরণ। উতল হাওয়ায় করুণার রুক্ষ বিশৃঙ্খল চুলগুলি উড়িতেছিল। ধীর পায়ে ঘরে আসিয়া প্রেমল করুণার মাথার কাছে বসিল। উত্তপ্ত কপালের উপর একটা হাত রাখিয়া সোদ্বেগ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—গা যে আজ বড় গরম দেখছি বৌদি'! জ্বর কি বেশী হয়েছে?

ক্লিষ্ট কণ্ঠে করুণা বলিল—কে জানে! দেখি নি আজ। তুই কখন এলি প্রেমল? খেয়েছিস কিছু? না, এসেই এখানে এসেছিস।

অল্প হাসিয়া প্রেমল কহিল—এই ত' বাড়ি এলুম। খাব এখন। ও সব ভেবে কেন তুমি ব্যস্ত হও বৌদি'? 'থার্ম্মোমিটার'টা কই? দেখি একবার টেম্পারেচারটা, সারাদিনে জ্বরটাও দেখা হয় নি।

—না হোক। সেজন্তে তুই ব্যস্ত হোস নি। যা খেয়ে আয়। এত করে বলি, বাড়ি এসে খেয়ে একটু বিশ্রাম করে তবে আসিস এখানে। তা যদি তুই শুনবি! বেলা গেছে, যা ভাই কিছু খেয়ে আয়।

—যাচ্ছি। উষী এই অবেলায় ঘুমোচ্ছে কেন বৌদি'? ডাক নি কেন? এই উষা!

উন্মেষের গায়ে হাত দিয়াই প্রেমল শিহরিয়া উঠিল।

—বৌদি' কি হয়েছে? উষার সারা গায়ে এত দাগ কেন? রক্ত জমে কাল হয়ে আছে। ফুলে উঠেছে। কি হয়েছে? পড়ে গেছে? এমন করে কি করে পড়ল?

পড়ে নি, তোর দাদা মেরেছেন, একটা ফুলদানি আর এক শিশি এসেন্স ফেলে দিয়ে ভেঙ্গেছে ও—সেই জন্তে।

—সেই জন্তে মেরেছেন?

উন্মেষের দিকে চাহিয়া প্রেমল স্তব্ধ হইয়া রহিল। প্রেমল নিশীথের দূর সম্পর্কের ভাই। অল্পবয়সে পিতা-মাতা হারাইয়া এখানে আশ্রয় লয়। সেই হইতে এ পর্য্যন্ত করুণার স্নেহময় অঙ্কে বাড়িয়া জনক-জননীর অভাবের ব্যথা সে একেবারেই ভুলিয়াছিল। বৌদি' তার পিতামাতা উভয়ের স্থানই পূর্ণ করিয়াছে। ক্ষুদ্র চিত্তের সবটুকু শ্রদ্ধা মমতা দিয়া সে করুণাকে মায়ের মতই দেখিত। উন্মেষও ছিল তার তেমনই প্রিয়। যন্ত্রণার্ত্ত কণ্ঠে একটা অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া করুণা কছে ফিরিল। ব্যগ্র কণ্ঠে উন্মেষ প্রশ্ন করিল—বৌদি', কি কষ্ট হচ্ছে তোমার?

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া আকুল কণ্ঠে করুণা কহিল—বড় কষ্ট প্রেমল! বড় কষ্ট! আর সহ্য করতে পারছি

না রে! মনের এ যন্ত্রণার কাছে দেহের সব কষ্টও তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে ভাই! শেষ সময়টাও একটু শান্তি পেলুম না। ভগবান!

কয় বিন্দু অশ্রু শীর্ণ কপোল বহিয়া বালিশের উপর ঝরিয়া পড়িল। বাধা-বিজড়িত স্থির দৃষ্টি কয় মুহূর্ত করুণার গভণ-লাগা চাঁদের মত লুপ্তশ্রী পাণ্ডুর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া ধীরস্বরে প্রেমল ডাকিল—বৌদি'!

—প্রেমল! ভাই!

—উষার জন্যেই তোমার যত চিন্তা, নয়?

একটু থমকিয়া করুণা বলিল—ঠিক তাই! শুধু ওরই চিন্তা ভাই! ওর ভাবনায় এক পল আমার শান্তি নাই। দেখছিস কি দুরন্ত। তোর দাদাকেও জানিস; আমার অবর্তমানে ওর কি হবে প্রেমল?

—আমাকে বিশ্বাস করতে পার বৌদি'?

—কিসের জন্যে?

—উষার সম্বন্ধে। বৌদি', ভগবানের নাম করে বলছি উষা যাতে কোন কষ্ট না পায়, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, সে আমি দেখব। তুমি নিশ্চিন্ত হও বৌদি'। ওর জন্যে কিছু চিন্তা কোর না, ওর সব ভার আমার।

গাঢ় মেঘে ক্ষণিক বিদ্যুত-বিকাশের মত হর্ষের দীপ্তি করুণার ম্লান মুখখানা ক্ষণতরে উজ্জ্বল করিয়াই আবার ততোধিক অন্ধকারে ডুবাইয়া দিল। হতাশা-জড়িত কণ্ঠে সে বলিল, প্রেমল, তুই নিজেই ছেলে-মানুষ, তুই কি করে ওকে দেখবি? কি করে ওর ভার নিবি? তারপর—

কথাটা করুণা শেষ করিল না। প্রেমল বুঝিল কি সে বলিতে চায়; স্থির দৃঢ় স্বরে কহিল—তুমি আমার উপর নির্ভর কর বৌদি'। আমি বলছি উষাকে কোন কষ্ট পেতে কখনও দেব না, যদিও আমি নিজেই পরাশ্রিত। তারপর তোমার অবর্তমানে হয়ত এবাড়ীতে আমার স্থান হবে না। কিন্তু তুমি বিশ্বাস কর, দাদা যদি আমায় তাড়িয়েও দেন, তবুও আমি উষাকে ছেড়ে এখান থেকে এক পা সরব না। আমার সমস্ত সামর্থ্য আজ থেকে তার জন্যেই নিয়োগ করলুম।

করুণার মুখে আশার দীপ্তি প্রকাশ পাইল। গভীর আগ্রহভরা কণ্ঠে কহিল, পারবি ভাই। পারবি তুই?

—তুমি আশীর্বাদ কর বৌদি', আমি নিশ্চয় পারব।

তৃপ্তির হাসিতে মৃত্যু-রাজ্য-যাত্রিণীর রক্তহীন মুখ-খানা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গাঢ়কণ্ঠে কহিল—ওরে প্রেমল, কত শান্তি যে আজ আমায় দিলি তুই, সে বলে জানাতে পারব না। এই এক চিন্তায় শেষ দিন কাছে এসেছে জেনেও আমি ভগবানকে পর্য্যন্ত ডাকতে পারি নি। আমি আজ নিশ্চিন্ত হলুম। উষা তোর! তোরই হাতে তাকে দিয়ে যাচ্ছি! আমায় যে তৃপ্তি তুই আজ দিলি তার পুরস্কার ভগবান যেন তোকে দেন। আমি জন্ম-জন্মান্তর ধরেও তোর এ ঋণ শোধ করতে পারব না ভাই!

উচ্ছ্বসিত অশ্রুর প্রবাহে করুণা আর কিছু বলিতে পারিল না। প্রেমল নীরবে বসিয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

—কাকু, ওরা বলছিল আজ আমার মা আসবে। কৈ মা? মা তো এল না।

উন্মেষের প্রশ্নে কয় বিন্দু অশ্রু অলক্ষ্যে মুছিয়া আর্দ্র কণ্ঠে প্রেমল কহিল—ঐ তো তোমার মা এসেছেন উষা!

—বাঃ রে, ও কেন আমার মা হবে? মা কি ঐ রকম? অত কাল, বিশ্রী! কাকু, তুমি বুঝি আমার মার কথা ভুলে গেছ?

আকস্মিক কষাঘাতে আহত যেমন চমকিয়া উঠে, প্রেমল তেমনই ব্যথিত চমকে কাঁপিয়া উঠিল উন্মেষের শেষ কথাটায়। সে ভুলিয়া গিয়াছে করুণাকে? তাও কি সম্ভব? অবোধ শিশু জানে না, তার সারা অন্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে মাতৃ-স্বরূপা বৌদি'র স্মৃতিতে। সে ভুলিবার নয়! কয়

মুহূর্ত অন্য দিকে চাহিয়া থাকিয়া উদ্গত দীর্ঘশ্বাসটাকে বক্ষমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াই, শান্ত সহজ কণ্ঠে প্রেমল বলিল—চল উষা, আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে।

নিশীথের বিবাহ-উৎসবের আনন্দ-কলরোল অতি কঠিন সুরেই তার মনের দ্বারে আসিয়া আঘাত করিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে অরুন্তুদ ব্যথায় মনে জাগিতেছিল পরলোকবাসিনী করুণার কথা। মাত্র দুইটি মাস তিনি এ গৃহ ছাড়িয়া গিয়াছেন। এখনও এ ভবনের সমস্ত স্থান হইতে তাঁর স্পর্শচিহ্ন মুছিয়া যায় নাই। চারিদিক তাঁরই পুণ্য স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল, স্নেহ-কোমল পরশে মধুময়। এ বাড়ীর অণু-পরমাণুর সঙ্গে তিনি যেন জড়াইয়া রহিয়াছেন। কক্ষে কক্ষে আজও যেন তাঁর কোমল স্নিগ্ধ কণ্ঠধ্বনির রেশটুকু রণিয়া ফিরিতেছে হাস্য-দীপ্ত মূর্ত্তিখানি এখনও চোখে চোখে ভাসিতেছে। আজও যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় না, তিনি গিয়াছেন, তিনি নাই! এরই মধ্যে, এত শীঘ্র, এমন সহসা কে একজন আসিয়া তাঁর আসন অধিকার করিয়া লইল? সে আসিত! আসিবেই! এ তো জানা কথা। কিন্তু তবু? প্রেমলের কেবলই বোধ হইতেছিল, এ যেন বড় শীঘ্র, বড় সহসা! দু'টা দিন বিলম্ব করিয়া মৃতার স্মৃতিটুকুকে একটু সম্মান দিতে কেন এ কার্পণ্য? উষার অলক্ষিতে দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া প্রেমল কহিল—চল উষা, আমরা বেড়িয়ে আসি।

উন্মেষের শিশু-চিত্ত এ হর্ষ-উৎসব ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছিল না। মাথা নাড়িয়া বলিল—না কাকু, তুমি বাড়িতেই থাক। কত লোক আসছে। কেমন মজা! আজ আমি তো বেড়াতে যাব না।

প্রেমলের চোখ দুইটা আবার সজল হইয়া আসিল। উন্মেষকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—তবে এখানেই থাক। ওদিকে যেও না। দরজাটা বরং বন্ধ করে দিই, কি বল?

উন্মেষের মন এতেও সায় দিতেছিল না। তবুও কাকার দিকে চাহিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে বলিল, আচ্ছা এখানেই থাকি।

প্রেমলের ছোট খাটখানার উপর শুইয়া তারই বুকে মাথা রাখিয়া উন্মেষ আপন মনে কত কি বলিয়া যাইতেছিল, সহসা বিহ্বল পাংশু মুখে উঠিয়া বসিয়া বলিল—কাকু, বাবা!

দ্বার খুলিয়া নিশীথ ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। প্রেমল ব্যস্তভাবে শয্যা ছাড়িয়া নামিল। ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত রাত্রে ক্ষুদ্র বিহঙ্গ শিশুটি যেমন গভীর নির্ভরতায় জননীর পক্ষপুটে লুকাইয়া থাকে, তেমনই ভাবে উন্মেষ তাহাকে জড়াইয়া রহিল। তীক্ষ্ণ নেত্রে একবার দুইজনের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রুক্ষ গম্ভীর কণ্ঠে নিশীথ বলিলেন — উন্মেষ! আমার বসবার ঘরের বড় ঘড়িটা ভেঙেছে কে?

হাওয়ায় কাঁপা তরুশাখার মত উন্মেষ কাঁপিয়া উঠিল।

সরোষ গর্জ্জনে নিশীথ বলিলেন — নিশ্চয় তুই ভেঙেছিস। হতভাগা উল্লুক! চল ওদিকে! কি করি আজ দেখ!

অস্ফুট কম্পিত কণ্ঠে উন্মেষ বলিল—কাকু!

আরও জোরে সে প্রেমলকে জড়াইয়া রহিল। বারেক তার দিকে চাহিয়া দেখিয়া ব্যস্তভাবে প্রেমল কহিল — ওকে বকবেন না দাদা। ঘড়ি তো ও ভাঙে নি! আমার হাত থেকে পড়ে গিয়ে ঘড়িটা ভেঙে গেছে!

—তুমি ভেঙেছ? তুমি ও ঘরে গেছলে কি করতে? ঘড়িতেই বা হাত দিয়েছিলে কেন? ঘড়ি কি খেলবার জিনিষ? জান, ও ঘড়িটার কত দাম! এমন করে ভেঙেছ যে, সারাবার পর্য্যন্ত উপায় নেই। যত সব লক্ষ্মীছাড়া নিয়ে হয়েছে আমার ঘর-সংসার। এমন আপদেও পড়া গেছে! যাক্, বারণ করছি তোমরা আমার ঘরে কখনো যেও না। ও হতভাগাটাও যেন না যায়।

বিক্ষুব্ধ চিত্তের গভীর উচ্ছ্বাসটুকু অপ্রকাশ রাখিয়াই প্রেমল বলিল, আচ্ছা।

নিশীথ চলিয়া যাইতেছিলেন। সহসা কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উন্মেষকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

দিন-রাত্তির এই ঘরে থেকে কি করিস তুই! বাড়িতে আর কি জায়গা নেই? যা ওদিকে তোর মার কাছে গিয়ে বস। ওঠ!

উন্মেষ নড়িল না। ভয়ে ভয়ে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল — ও তো আমার মা নয়!

নিশীথ গর্জ্জিয়া উঠিলেন—হতভাগা বাঁদর, কে বলেছে ও তোর মা নয়? কে শেখাচ্ছে এ সব তোকে? ঐ তোর মা! চল, ওর কাছে!

পিতার মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে উন্মেষের মুখ শুখাইয়া গিয়াছিল। তবুও দুষ্ট ঘোড়ার মত নিজের জেদ সে ছাড়িল না। একভাবেই সে বলিল—না, ও মা নয়! কখ্খনো মা নয়! মা বুঝি অম্নি দেখতে? অম্নি কালো, মোটা, দাঁত বার করা! ও কেন আমার মা হতে যাবে! ও মা নয়!

নবোঢ়া দ্বিতীয়া পত্নীর রূপ-সম্বন্ধে এমন সহজ সরল বিবৃতি নিশীথকে ধৈর্য্যচ্যুত করিল। প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া উন্মেষের হাত ধরিয়া টানিয়া সজোরে তার গালে পিঠে গোটা কতক চড় কিল বসাইয়া দিলেন। প্রহৃত বালক নিঃশব্দে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রেমল প্রথমটা হতবাক হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর হাত বাড়াইয়া উন্মেষকে কাছে টানিয়া লইতেই নিশীথ গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

—খবরদার, তুই ওকে কাছে রাখবি নি। আমি বুঝতে পারছি, তুই-ই এই সব কথা ওকে শেখাচ্ছিস! তুই ওর মাথা খাচ্ছিস! নইলে ঐটুকু ছেলে, ও কি করে জানবে যে, ও ওর মা নয়! এ সব তুই বলেছিস!

ছয় বৎসরের ছেলে, নিতান্ত শিশু নয়, মাত্র দুই মাস তার জননী পরলোকগতা, ইহারই মধ্যে সে যে তাহাকে ভুলিয়া যাহাকে তাহাকে তার মা বলিয়া ভাবিবে, এটা আশা করাই অনুচিত। মানুষের মনের দাগ ঠিক জলের রেখার মতই ক্ষণস্থায়ী নয়, কথাটা বলিতে গিয়াও প্রেমল উচ্চারণ করিল না। নীরবে উন্মেষের পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল। বকিতে বকিতে নিশীথ কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

কলেজ হইতে ফিরিয়া উন্মেষকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে প্রেমল অদূরস্থ ভৃত্যটার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল — মধু, উন্মেষ কোথায় রে?

মধু সম্মার্জ্জনী হাতে বাহিরের দিকে যাইতেছিল, প্রেমলের প্রশ্নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, তাকে বাবু আজ সারাদিন সিঁড়ির নীচের ছোট ঘরে আটকে দরজায় চাবী বন্ধ করে রেখেছেন। কিচ্ছু খেতে দেন নি। 'কাকু' 'কাকু' বলে সারাদিন যা কেঁদেছে সে—

প্রেমল শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য দাঁড়াইল না। হাতের বই ক'খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দ্রুত পায়ে অন্তঃপুরে আসিয়া একটা ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিল—উন্মেষ, উনা, কাকুমণি!

ভিতর হইতে অশ্রুজড়িত কণ্ঠে উত্তর আসিল—কাকু!

উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারায় উন্মেষ আর কিছু বলিতে পারিল না। তার অস্ফুট রোদন-ধ্বনি বদ্ধ গৃহের মধ্য হইতে বাহিরে আসিয়া প্রেমলের কাণে আঘাত করিতে লাগিল। গভীর মর্ম্ম-ব্যথা আপনাকে একেবারে প্রকাশ করে প্রকৃত মরমী মনের কাছেই। শিশু-চিত্তেও এর ব্যতিক্রম বড় হয় না। পিতার নিকট হইতে প্রহার লাঞ্ছনা পাইয়া সারাদিন অভুক্ত থাকিয়াও উন্মেষ এতটা কাঁদে নাই, যতটা কাঁদিল প্রেমলের কণ্ঠস্বর শুনিয়া। সজল দৃষ্টি তুলিয়া প্রেমল ঘরের দিকে চাহিল। দ্বারে প্রকাণ্ড তালা, চাবী দিয়া বন্ধ! প্রতি দরজায় তালা। জানালা ক'টি পর্য্যন্ত বন্ধ! দেখিয়া দেখিয়া তার দুই চোখ বহিয়া কয় বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অভাগা মাতৃহীন বালক!

গাঢ় কণ্ঠে বলিল, কাঁদিস না উনা। দাদার কাছ থেকে চাবী এনে আমি এখনি দরজা খুলে দিচ্ছি।

নিশীথের ঘরের সামনে আসিয়া প্রেমল ডাকিল—দাদা!

দাদা ঘরে ছিলেন না। ভিতর হইতে নারী কণ্ঠের উত্তর আসিল, তিনি বেড়াতে গেছেন।

ব্যগ্রভাবে প্রেমল বলিল, উষার ঘরের চাবীটা আমায় দিন। ওকে বার করি। শাস্তি তো যথেষ্ট হয়েছে।

বিরক্তকণ্ঠে নিশীথের দ্বিতীয়া পত্নী সুরমা বলিল, উনি না বললে চাবী আমি দিতে পারব না।

—দাদা না বললে? কিন্তু তাঁর তো ফিরতে ঢের দেরী, ততক্ষণ পর্যান্ত ও বন্ধ থাকবে? না খেয়ে থাকবে? মরে যাবে যে!

শ্লেষভরা স্বরে সুরমা কহিল—ভয় নেই, মরবে না! মরবার ছেলে ও নয়। একটুক্ষণ না খেয়ে থাকলে ও মরবে না।

সুরমা ভিতর হইতেই কথা বলিতেছিল। তাহাকে দেখা যাইতেছিল না। তার শেষ কথাটায় গভীর ঘৃণা-ভরে প্রেমল একবার ঘরের দিকে চাহিল। রমণী! মাতৃ জাতি! না, সত্যই বিমাতা! এই জন্যই লোকে বলে, দ্বিতীয় তৃতীয় পক্ষের বধূ যারা হয় তাদের তেমনই ভাবে গড়িয়া সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র করিয়াই বিধাতা পৃথিবীতে পাঠান। ধরণ-ধারণ, প্রকৃতি সবই তাদের যেন বরাবরই অন্য রকম। বেশীক্ষণ কথা কাটা-কাটি করিতে প্রেমলের ভাল লাগিতেছিল না।

সংক্ষেপে প্রশ্ন করিল, চাবী আপনি দেবেন না?

—না, না—কত বার বলব?

—বেশ, আমি তবে তালা ভেঙেই উষাকে বাইরে আনছি!

—কি, আপনি তালা ভাঙবেন?

—অগত্যা। আপনি যখন চাবী দেবেন না, কি করব!

—দেখুন বারণ করছি আপনাকে, দরজা খুলবার চেষ্টা করবেন না, আপনার দাদা তা'হলে—

—হ্যাঁ, তাঁর যা ভাল মনে হয় যেন করেন।

প্রেমল চলিয়া গেল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া সুরমা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সপত্নীবিদ্বেষ নারীজাতির মজ্জাগত। জীবিত সতীনের তো কথাই নাই! মৃতা সতীনের উপর পর্য্যন্তও আক্রোশ চলে। তার যদি সন্তানাদি থাকে তা'হলে তো কথাই নাই। নারী-অন্তরস্থ সহজ মাতৃত্ব, কোমলতা যে তাহাদের বেলায় কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, এ নির্ণয় করাই দুরূহ। রমণী-মনের এ এক গভীর রহস্য! সপত্নীর উপর এমনই বিদ্বেষ যে, তারা এ-কথা পর্য্যন্তও বলিতে পারে, 'স্বামী যমকে দেওয়া যায় তবু সতীনকে দেওয়া যায় না!' আশ্চর্য্য! এ গৃহে পা দেওয়া অবধি উন্মেষ এবং সঙ্গে সঙ্গে তার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রেমলকে সুরমা দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। উন্মেষকে কিছু বলিবার উপায় নাই। প্রেমল যেন শতবাহু দিয়া তাহাকে বেড়িয়া রহিয়াছে। তার কেন পরের সন্তানের উপর এত মমতা? প্রেমলকে এ বাড়ি হইতে বিদায় করিবার সুযোগও যে সে অনুসন্ধান করে নাই, এমন নয়। কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়াছে।

নিশীথের তর্জ্জন-গর্জ্জন বেশ স্থির শান্তভাবে প্রেমল শুনিয়া গেল, তারপর বলিল, আর কিছু বলবার নেই তো! আমি যাব এখন?

—হ্যাঁ যা। তোর জিনিসপত্র নিয়ে আজই এখান থেকে যা।

সহজ শান্ত কণ্ঠে প্রেমল বলিল, এখান থেকে আমার যাওয়া হবে না দাদা। আমি এখানেই থাকব।

নিশীথ অবাক হইয়া গেলেন। এত কটু-কাটব্যের পরও এমন ধীর স্বরে কেউ কথা বলিতে পারে, তাঁর বড় জানা ছিল না। খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কি? তুই যাবি না?

—না, আমাকে আপনি যাই বলুন, যাই করুন, আমি যাব না!

—তোর জোর না কি? আমি যদি থাকতে না দিই?

—দিন আর না দিন, আমি থাকবই!

গভীর বিস্ময়ে নিশীথের মুখে কথা ফুটিল না।

প্রেমল একবার তাঁর দিকে চাহিয়া কহিল, হ্যাঁ,

আমি থাকবই। আপনারা যত চেষ্টাই করুন, আমাকে তাড়াতে পারবেন না। কাজেই অনর্থক বৃথা চেষ্টা করে কষ্ট পাবেন না। আমি এখান থেকে যাব না।

ধীর পায়ে প্রেমল ঘরের বাহির হইয়া গেল। কিছুক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া সুরমাকে লক্ষ্য করিয়া নিশীথ বলিলেন, নেহাৎ লক্ষ্মীছাড়া!

নিতান্ত অকারণেই প্রেমল কলেজ ছাড়িয়া দিল। তার এ নির্ব্বুদ্ধি বা দুর্ব্বুদ্ধির জন্য যে যা খুশী বলিয়া তিরস্কার করিল। নিশীথের কাছেও কম লাঞ্ছনা ঘটিল না। অকারণ? সাধারণ লোক-চক্ষে অকারণ বৈ কি! কিন্তু এ কারণ যে কত বড়, সে জানিলেন শুধু সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী যিনি, তিনিই! যেটুকু সময় সে কলেজে কাটাইত, ততটুকু সময়ই উন্মেষের কষ্টের অবধি থাকিত না। দুরন্ত শিশুর ত্রুটি-অপরাধ পদে পদে ঘটিত। তাহা লইয়া অত্যাচারের সীমা ছিল না তার উপর। প্রতিকারের উপায় নাই। বাধ্য হইয়া প্রেমল কলেজ ছাড়িল। স্বাভাবিক অধ্যয়ন-স্পৃহা, উচ্চ-শিক্ষার প্রলোভন তার চিত্তকে পীড়িত না করিতেছিল এমন নয়, কিন্তু তার অপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তার মনের মধ্যে স্বর্গগতা করুণার মূর্ত্তি। তিনি যে বড় নির্ভরতায় তার হাতে উন্মেষকে দিয়া গিয়াছেন। হয়ত, হয়ত কেন নিশ্চিত সেই দূর দূরান্তর হইতে গভীর আগ্রহে আজও তিনি প্রেমলের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন, উন্মেষ সারাদিন তার চোখের অন্তরালে এই যে নানা কষ্ট বিমাতার উৎপীড়ন সহ্য করে, এও কি তিনি দেখিতেছেন না? সকল দ্বিধা সরাইয়া প্রেমল কলেজের খাতা হইতে নাম কাটাইয়া আসিল। উন্মেষের দিন সুখেই কাটিতে লাগিল।

মাস কয়েক পর একদিন প্রেমলকে ডাকিয়া নিশীথ বলিলেন, শুনছিস প্রেমল, আমাদের শ্রীনাথবাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে তোর বে দিতে চান, ভারী ধরেছেন আমায়। মেয়ে সুন্দরী, দেবেনও বেশ। ঐ এক সন্তান। কি বলিস তুই? কথা দেব তাঁকে?

শ্রীনাথ মিত্র নিশীথের প্রতিবেশী! তাঁর একমাত্র কন্যা লহরীকে প্রেমল অনেকবার দেখিয়াছে। সুন্দরী শান্ত মেয়েটি। এমন পত্নীলাভ সৌভাগ্যের কথা। ক্ষণেকের জন্য প্রেমলের মনটা উদ্বেল হইয়া উঠিল। মানুষের মন শুধু যন্ত্রমাত্র নয়—ক্ষণেক প্রেমল ইতস্ততঃ করিল।

নিশীথ আবার বলিলেন, মাঘ মাসের প্রথমেই ভাল দিন আছে। আমি বলি, ঐ দিনেই বে হয়ে যাক, তারপর—

তারপর কি হইবে, না শুনিয়া প্রেমল বলিল, না দাদা, বিয়ে আমি করব না।

অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া নিশীথ কহিলেন, বিয়ে করবি না কেন? শুনি?

—আমার ইচ্ছে নেই ওতে।

—এ রকম ইচ্ছা না থাকবার কারণটাই আমি জানতে চাইছি।

প্রেমল উত্তর দিল না। খানিকটা ব্যর্থ অপেক্ষা করিয়া বিরক্তভাবে নিশীথ বলিলেন, সবই কি তোর অদ্ভুত? পরীক্ষার দু'মাস বাকী, দিলি পড়া ছেড়ে। বি-এ-টা পাশ করতে পারলে তবু একটা কিছু করতে পারতিস! তা না, পড়া ছেড়ে না-এদিক না-ওদিক হয়ে রইলি। যাক্! বিয়ের সম্বন্ধ এল, তোর পক্ষে আশাতীত সম্বন্ধ এ, তাও বলিস যে করব না। কি তোর ব্যাপার আমায় বলতে পারিস?

প্রেমল তবুও স্তব্ধ রহিল।

ঈষৎ কোমল কণ্ঠে নিশীথ কহিলেন, কেন মিথ্যে আপত্তি করছিস, রাজি হ'। তোর পক্ষেও ভাল হবে, আমারও অনেকটা সুবিধা হয়। জমিদারী নিয়ে মামলা-মকর্দ্দমা তো লেগেই আছে। শ্রীনাথবাবু 'অ্যাড্‌ভোকেট', তাঁকে পেলে অনেকটা লাভ হ'ত। কি বলিস তুই?

তাহার বিবাহের জন্য নিশীথের একটা আগ্রহের

কারণ প্রেমল এবার বুঝিল। সব বিষয়ে সব কাজে নিজের স্বার্থ কতটা তাই দেখিয়াই মানুষ চলিয়া থাকে। তাই তাহাকে এত উপরোধ। অতি ক্ষীণ হাসির রেখাটি, ক্ষণিক বিজলী বিকাশের মত তার ওষ্ঠে ফুটিয়া চকিতে মিলাইয়া গেল। এ বিবাহে সকলকারই সুবিধা হইত সত্য, কিন্তু প্রেমল অন্য মনে মুক্ত বাতায়ন পথ দিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিল। তারপর স্থিরস্বরে বলিল—না, আমি বিয়ে করব না।

দীর্ঘ পনর বছর পর। সেদিনকার অশান্ত শিশু উন্মেষ আজ কমনীয় কান্তি তরুণ। প্রেমল যৌবনের সীমান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দিন যায়। সকলেরই দিন যায়, তবে সুখে, আনন্দে, হাসিমুখে, কিম্বা গভীর দুঃখ, ব্যথা-দীর্ণ বুকে অশ্রু মুছিতে মুছিতে। দীর্ঘ পনরটি বছর প্রেমলের গিয়াছিল, এখনও দিন কাটিতেছে। তবে দুঃখে কি সুখে সে কথা জানিতেন শুধু তার অন্তর্য্যামীই। একনিষ্ঠ সাধক যেমন অন্তরটিকে সমস্ত দিক্ হইতে সরাইয়া শুধু অভীষ্টটুকুতে নিবিষ্ট করিয়া রাখে, সে-ও যেন তেমনই ভাবে সমস্ত মনটা শুধু উন্মেষের উপরই ফেলিয়া রাখিয়াছে। অহোরাত্র-ব্যাপী চিন্তা ও চেষ্টা, সে কিসে ভাল থাকিবে, কিসে তার সব বিষয়ে সুবিধা হইবে! উন্মেষ বড় হইয়াছে, কলেজে পড়ে, সকল সময় তার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া রাখিবার, এখনও তার প্রতি কাজটি করিয়া দিবার কোন দরকারই আর নাই—একথা অন্য সকলেও বলিত, প্রেমলও স্বীকার করিত। তবুও ষোল বৎসরের অভ্যাস তার এতটুকুও বদলায় নাই। আজও উন্মেষ তার চোখে শিশু বৈ আর কিছু নয়! বাড়ীতে অশান্তি লাগিয়াই আছে — নিশীথ, সুরমা কেউই প্রেমলের উপর সন্তুষ্ট নয়। অশেষ দোষ তার। আজ বার-তের বছর ধরিয়া সে চাকরী করিতেছে, অথচ উপার্জ্জনের একটি পয়সা এ সংসারে আসে না। সব যায় উন্মেষের ব্যয়ে। হাঁ, হয়ত সময়মত উন্মেষের প্রয়োজনীয় জিনিষটি তাঁরা আনিয়া দিতে পারেন না। কি করিয়াই বা পারিবেন? সে-ই তো তার একটি ছেলে নয়, সুরমারও তো পাঁচটি সন্তান আছে। বিশেষ তাহারা শিশু, তাহাদের ব্যবস্থা না করিয়া তো আর বুড়ো ছেলের সখ মিটানো যায় না। কিছু ত্রুটি হইলেই অমনি মহা সর্ব্বনাশ। তাই প্রেমলের উপার্জ্জনের সবই যায় উন্মেষের জন্য। সুরমা দেখিয়া জ্বলিয়া যান। এত কেন? বলিয়া কহিয়া অনেক দেখা হইয়াছে। তাড়াইয়া দিলেও যে যায় না, এমন লোককে আর কি করা যাইতে পারে? নিরুপায়!

অপরাহ্ন। ক্ষণ-পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আর্দ্র বাতাস দেহে শিহরণ জাগাইয়া তুলিতেছিল, কার্য্যস্থান হইতে ফিরিয়া ব্যস্তভাবে জামা-কাপড় বদলাইয়াই প্রেমল ষ্টোভ জ্বালিল। উন্মেষ এখনি ফিরিবে। তার চা জলখাবার চাই। দুই বেলার আহার্য্য ভিন্ন অন্য কিছু আর নিশীথের সংসার হইতে উন্মেষের ভাগ্যে ঘটিত না—এ সব ভারই প্রেমলের। নিশীথ অবশ্য প্রেমলকে এ ভার লইতে বলেন নাই। তাঁর ও সুরমার মত, উন্মেষ যথেষ্ট বড় হইয়াছে; দুধ, দুইবেলা জলখাবার প্রভৃতি জিনিষ তার পক্ষে অনাবশ্যক। আবশ্যক হইলে কি তাঁরা সে ব্যবস্থা করিতে পারেন না? নিশ্চয়ই পারেন! প্রেমলের কেন যে এজন্য এত শিরঃপীড়া, তাহা তাঁরা ভাবিয়াই পান না। করুক, তার যা খুশী।

ম্লান, বিষণ্ণ মুখে উন্মেষ আসিয়া প্রেমলের পাশে বসিল। চায়ের জল ফুটিতেছিল, ষ্টোভ হইতে পাত্রটা নামাইয়া কাঁচের টি-পটে জল ঢালিতে ঢালিতে প্রেমল বলিল—উষা, এত শান্ত যে—

উন্মেষ অল্প একটু হাসিল—জোর করিয়া টানিয়া আনা প্রাণহীন শুষ্ক হাসি! কথা কহিল না, প্রেমল চাহিল। কাকলীপ্রিয় বিহঙ্গমের আকস্মিক স্তব্ধতার মত উন্মেষের এ একান্ত শান্ত স্থিরতা তাকে অত্যন্ত বিস্মিত করিল। উন্মেষের নিষ্প্রভ মুখখানা লক্ষ্য করিয়াই ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করিল — উষা, কি হয়েছে তোর—

—কৈ, কিছু তো হয় নি, কাকু।

—কিছু হয় নি?

ক্ষণকাল তার মুখে স্থির দৃষ্টি বদ্ধ রাখিয়া ক্লিষ্ট কণ্ঠে প্রেমল বলিল—ঊষা, আমার কাছেও লুকোচ্ছ?

ক্ষুদ্র শিশুর মত উন্মেষ প্রেমলের বুকের উপর মাথা রাখিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল—আমি আজ বাবাকে আমায় বিলেতে পাঠাবার কথা বললুম, কাকু। বাবা তাতে বললেন, ও সব হবে না, তাঁর অত টাকা নেই।

প্রেমল কয় মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর প্রশ্ন করিল—আই-সি-এস্ না হলে সেন সাহেব তাঁর মেয়ের সঙ্গে বে দেবেন না, সে কথা বলেছিস তাঁকে—

প্রেমলের বুকে তেমনিই ভাবে মুখ রাখিয়াই উন্মেষ উত্তর দিল—বলেছি, বাবা বললেন, না দেন, না দেবেন, ওর চেয়ে ঢের ভাল মেয়ে পাওয়া যাবে। কাকু, আমি লীলাকে ছাড়া···

উন্মেষ কথাটা শেষ করিতে পারিল না। প্রেমলের কাছে তার কোন কথাই অজ্ঞাত ছিল না। অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুর মত সকল কথাই সে প্রেমলকে জানাইত। বৎসর দুই হইতে রিটায়ার্ড জজ মনীন্দ্র সেনের বাড়ীতে উন্মেষ যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কি একটা উপলক্ষে পরিচয় হওয়ার পর হইতে মনীন্দ্রনাথ এই প্রিয়-দর্শন ছেলেটিকে বড় সুচক্ষে দেখিয়াছিলেন। উন্মেষের তরুণ-চিত্তে সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাঁর একমাত্র সন্তান লীলা। কথাটা উন্মেষ প্রেমলের অজ্ঞাত রাখে নাই। তার কাছ হইতে নিশীথও শুনিয়াছিলেন। বিবাহের প্রস্তাবও হইয়াছিল। মনীন্দ্রনাথ বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁর অন্য কোন আপত্তি নাই, কিন্তু বিবাহের পূর্বে উন্মেষকে সিভিলিয়ান হইতে হইবে, কারণ তাঁর প্রতিজ্ঞা, সমকক্ষ ভিন্ন অন্য কারো হাতে কন্যা দিবেন না। কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু নিশীথ শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সোজা কথা! ছেলেকে সাগরপারে পাঠাইয়া আই-সি-এস্ করিয়া আনা কি তাঁর মত সামান্য লোকের সাধ্য! পুত্রের বার বার অনুরোধের উত্তরে তাহাকে খুব পোটা কত কড়া কথা শুনাইয়া এমন সব অসম্ভব আশা ছাড়িয়া দিতে উপদেশ দিলেন। আরও বলিলেন, যে-পাত্রীর পিতার এমন ধনুর্ভঙ্গ পণ, তার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন না হওয়াই কাম্য। যে যেমন, সে তেমন ভাবেই থাক। আশাতীত বস্তুর দিকে চাহিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন অপ্রয়োজনটুকু নিক্তির ওজনে মাপিয়া যদি সংসারের লোক চলিতে পারিত, তাহা হইলে দুঃখ, অশান্তি, নৈরাশ্য প্রভৃতির প্রাবল্য হয়ত থাকিতে পাইত না। একজন যেটা নিতান্ত অনাবশ্যক ভাবে, অন্যে হয়ত তাকেই বড় দরকারী মনে করে, পাইতে লালায়িত হয়। কোন্‌টা প্রয়োজন, কোন্‌টা অপ্রয়োজন, বুঝিয়া উঠাই যে দুরূহ। নিশীথ যাহা অনাবশ্যক ভাবিলেন, উন্মেষের কাছে তাই হইল একান্ত বাঞ্ছিত। একজনের সহিত একজনের মতের এ বৈষম্য চিরদিনই ঘটিয়া আসিতেছে। উন্মেষ ক্রমশঃই অধীর হইয়া উঠিল। প্রেমল বুঝিল, তার অন্তরের ব্যথা দূর করা তার সাধ্যের অতীত। তার সামান্য সম্বল যে সমুদ্র-যাত্রার খরচও কুলাইবে না।

বিশুষ্ক মুখে উন্মেষ বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। প্রেমল নিষ্পলক নয়নে কিছুক্ষণ তার আশাহত ব্যথাভরা মুখখানার দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর কাঁচের ডিসে সাজান খাবারগুলা তার সামনে রাখিয়া কোমল কণ্ঠে কহিল—ঊষা খেয়ে নে—

ঊষা চাহিল। খাইবার ইচ্ছা তার একটুও ছিল না, তবুও ডিসটা টানিয়া লইল। তার না খাওয়ার ব্যথা প্রেমলের মনে কতটা কঠিন হইয়াই বাজিবে, এটা সে জানিয়া রাখিয়াছিল। জগতের মধ্যে এই একমাত্র স্নেহের স্থানটুকুকে সেও সাধ্যমত সর্ব্ববিধ আঘাত হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে চায়। স্নেহই স্নেহের পাত্রকে যেমন আপন করে, এমন আর কিছুই পারে না। ভালবাসা পাইতে হইলে আগে ভালবাসিতে হয়। চায়ের কাপ তুলিয়া লইয়া সহসা উন্মেষ প্রশ্ন করিল—আচ্ছা কাকু, আমার মা'র তো অনেক টাকার গয়না ছিল—

—ছিল বৈ কি, তিনি বড়লোকের মেয়ে ছিলেন, তোমার মাতামহ তাঁকে যা গয়না দিয়েছিলেন, তার দামই পনের ষোল হাজার টাকা।

—সেগুলো তো আমারই প্রাপ্য, কাকু। আমার মা'র জিনিষ কেন বাবা নতুন মা'কে দিলেন? মা'র গয়নাগুলোও যদি বাবা আমায় দিতেন, তা'হলেও তো আমি বিলেত যেতে পারি। কাকু, তুমি একবার বাবাকে বলবে?

সেগুলো দেবার জন্তে সহস্রবার বলিলেও নিশীথ যে সে সব অলঙ্কার দিবেন না, একথা উন্মেষ না বুঝিলেও প্রেমলের বিলক্ষণ জানা ছিল।

করুণার সমস্ত জিনিসই সুরমার অধিকারে। উন্মেষের পাইবার কোনও আশা নাই। উন্মেষের আশাদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া এ সত্য কথাটা সে উচ্চারণ করিতে পারিল না। অভাগা! প্রেমল যত যত্ন-আদরই করুক, জননীর অভাব তার জীবনের অনেকখানিই অসম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে! মনোমত পত্নীলাভে হয়ত ব্যর্থতার ব্যথা কালে সে ভুলিতে পারিত! কিন্তু তাই বা হয় কৈ? তরুণ-মনে আশাভঙ্গের ব্যথা কত তার আঘাত দেয়, প্রেমলের অজ্ঞাত ছিল না। সেই ব্যথাই আজ তার সর্ব্বস্ব। জগতের মধ্যে একমাত্র আপন হইতেও আপন যে তারই অন্তর দগ্ধ করিতেছে। প্রতিকার? প্রেমল অনেকক্ষণ ভাবিল, করুণার মূর্ত্তি আজও যেন তার চোখের উপর দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। বড় আশায়, বড় নির্ভরতায় উন্মেষকে তিনি তার হাতে দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কৈ, সে তো তাহাকে সুখী করিতে পারিল না। সে যা চায় তাহা যে প্রেমলের সাধ্যাতীত। নিজের জীবনের প্রায় সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছে উন্মেষের জন্ম, কিন্তু তবু কি ফল হইল? এরই নাম বুঝি ভাগ্য! মানুষের সব চেষ্টা দুরদৃষ্টের একটি ইঙ্গিতে এমনই ব্যর্থতার ঘায়ে শতধা হইয়া পড়ে। তাই কি? মানুষ কি সত্যই এতটা শক্তিহীন? স্থান বিশেষে হয়ত তাহাই। কিন্তু এখানে সে কি কিছুই করিতে পারে না? উন্মেষ সুখী হইবে, শান্তি পাইবে, তার জীবনের গতি ফিরিবে। একটা দীর্ঘশ্বাস বক্ষে চাপিয়া প্রেমল বলিল, উষা, টাকার ব্যবস্থা আমি করব।

বিচার-গৃহ। বিচারক আদেশ দিলেন, পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। অপরাধীর স্থানে অবস্থিত প্রেমল অদূরে উপবিষ্ট নিশীথের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। কেন, কে জানে! নিশীথ সে হাসি দেখিয়া একটু ত্রস্তভাবেই মুখ ফিরাইয়া লইলেন। প্রহরী-বেষ্টিত প্রেমল বিচারগৃহের বাহির হইয়া যাইতেছিল। সহসা কি ভাবিয়া তাহাদের একজনকে বলিল, আমি ওঁকে দু' একটা কথা বলতে চাই।

নিশীথের দিকে সে লক্ষ্য করিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিশীথ নিকটে আসিলেন। স্নিগ্ধ হাসির সহিত প্রেমল বলিল, দাদা, আজীবন ধরে খাইয়ে পরিয়ে যেমন বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তার যোগ্য প্রতিদান দিয়েছি বৌদি'র গয়না চুরি করে। অপরাধী যাতে শাস্তি পায়, সে চেষ্টা আপনি করেছেন, আমিও আমার কাজের ফল পেয়েছি। তাই অনর্থক আর আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে সময় নষ্ট করব না। শুধু একটা মিনতি,—উন্মেষ যত দিন বিলেতে থাকে, তাকে এসব কিছু জানতে দেবেন না। সে ফিরে এলেও যদি পারেন এটা তার কাছে গোপনই রাখবেন,—আমি চোর, চুরি করে জেলে গেছি, এই সে জানুক! কিন্তু কেন চুরী করেছিলুম, এটুকু তাকে জানিয়ে তার মনটা অশান্তিতে ভরে দেবেন না।

বাণী-বোধন *

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

নিরুপম রূপ যাঁর সেই বাগ্‌-দেবতার
বোধন-উৎসবে,
প্রবাসী বাঁশীর তানে সাড়া দেয় প্রাণে-প্রাণে
সেবকেরা সবে।
বেদ-মূর্ত্তি শ্বেত-ভুজা মায়েরে দিতেছে পূজা
প্রসাদ-আশায়,
জয় আদি বাণী জয়, অধন্য সে ধন্য হয়
যাঁহার কৃপায়।
লক্ষ্মী-মেধা-ধরা-পুষ্টি গৌরী-প্রভা-ধৃতি-তুষ্টি,—
অষ্ট-তনু যিনি,
চন্দ্রের তরুণ কলা অলঙ্কৃতা, চিত্রোৎপলা-
সরসী-বাসিনী ;
বর্ণরূপ-অক্ষমালা, অমৃত-কলস-ঢালা
পয়োধরে যাঁর
মূঢ় সন্তানের তরে জ্ঞানের পীযূষ ঝরে
অবারিত-ধার।
চমকি' কিরীট-চূড়া উর' দেবি হংসারূঢ়া
মানস-আসনে,
জাগহি বরদা-বাণী, প্রসীদ মা বীণাপাণি,
কমল-লোচনে।
কল্যাণের গন্ধ-ধূপে, প্রদীপ্ত কর্পূর-স্তূপে
আরতি তোমার,—
বিপুল দুরাশা বহি' এনেছি মা, জ্যোতির্ম্ময়ী,
দীন উপহার।
রসের পরিবেশনে যে রাগিণী পুরাতনে
করে পুনর্নব,
শুনেছি ঝঙ্কার তা'র,— নতি করি কোটিবার
পদপ্রান্তে তব।
নমো নমো বিদ্যারম্ভে, নমস্তে ত্রিলোকোত্তমে,
মাগি শ্রেষ্ঠ বর,
দাও বুদ্ধি যার বলে সাহিত্য-রসালে ফলে
সুফল সুন্দর।

---

* প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন, একাদশ অধিবেশন, গোরক্ষপুর, ১৩৪০, উপলক্ষে রচিত।

নব্য মনোবিজ্ঞান ও আমাদের মন

শ্রীবাণী দত্ত, এম্-এস্-সি

ভিয়েনার ডাক্তার সিগমণ্ড ফ্রয়েড্ নব্য মনোবিজ্ঞান (১) বা মনোবিশ্লেষণের জন্মদাতা। তিনি মানুষের মনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করেছেন। সে তিনটে ভাগের ইংরেজী নাম conscious, subconscious ও unconscious (২)। আমরা তাদের বলবো বোধী, দুর্বোধী ও অবোধী মন। এদের প্রকৃতি কি, সেটাই আমরা এ প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। এখানে বলে রাখা ভাল যে, আমাদের এ আলোচনা সাধারণের জন্য—বিশেষজ্ঞের জন্য নয়। নব্য মনোবিজ্ঞান আজও শৈশব অবস্থায়—এর অনেক বিষয় স্বীকার্য্য কি না, আজও সে বিষয় নিয়ে তর্ক চলছে — সে সব আমাদের আলোচনার বাইরে। মোটামুটি যেটুকু জানলে এর মূল তথ্যগুলি জানা যায়, সেটুকুই সহজ করে বলতে চেষ্টা করবো।

অধ্যাপক মায়ার সাহেব মনের এই তিনটে ভাগ বোঝাতে গিয়ে আমাদের মনকে তিনি আলোক বিজ্ঞানের বর্ণচ্ছটার (spectrum) সঙ্গে তুলনা করেছেন। সূর্য্যের আলো যদি একটা তে-শিরা কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, তা'হলে তাতে রামধনুর রং-এর মত লাল, বেগুনী ইত্যাদি সাতটা রং দেখতে পাওয়া যায়। এটা প্রায় সকলেই লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এ ছাড়া আরও অনেক অদৃশ্য রং এর মধ্যে থাকে, যা চোখে দেখা যায় না—শুধু বোঝা যায় যন্ত্রপাতির মধ্যে দিয়ে তাদের কাজ দেখে। এই বর্ণচ্ছটার যেটুকু চোখে দেখতে পাওয়া যায়, তার তুলনায় যা চোখে দেখা যায় না, সে যে কত বড় তা ধারণা করা যায় না।

আমাদের মনও ঠিক এই বর্ণচ্ছটার মত—এর সামান্যই আমরা বুঝতে পারি। বাকী সবটা পারি না—অন্ততঃ সহজে না। যেটুকু পারি তার নাম বোধী মন, বোধী মন কি তা বোঝা কারও পক্ষেই শক্ত নয়—যদিও তার সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত। আমি যে লিখছি, এ আমি বুঝতে পারছি—সুতরাং এ আমার বোধী মনের কাজ। আপনি যে পড়ছেন, এ আপনি বুঝতে পারছেন—এ আপনার বোধী মনের কাজ। রাম দেখছে যে, চেয়ারটা ঘরে আছে—হরি শুনছে, কে তাকে ডাকছে—যদু চিনিটা খেয়ে দেখলে, সেটা মিষ্টি, নুণ নয়—হরি জলটা ছুঁয়ে দেখলে সেটা ঠাণ্ডা, গরম নয়—এ সব তাদের বোধী মনের কাজ। এক কথায় যা আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝতে পারি, করাতে পারি তা সবই বোধী মনের কাজ—অর্থাৎ বোধী মন, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য মন।

এখানে অনেকে প্রশ্ন করবেন যে, মন মানেই ত' তাই—যা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের বোধ জন্মায়—এ ছাড়া আবার মন কি? সত্যি, আমরা সাধারণ লোক মন বলতে এই বোধী মনকেই বুঝি—যখন আমরা কিছু ভুলে যাই তখন বলি—'আমার মনে নেই'। আমাদেরই বা দোষ কি, ফ্রয়েডের আগে মনোবিজ্ঞান-বিদ্‌দের কেউ-ই এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য মন ছাড়া অন্য কোন মনের অস্তিত্ব জানতেন না। বোধী মন ছাড়া অন্য মন যে আছে তার অনেক প্রমাণ আছে। আচ্ছা বলুন ত', বঙ্কিমবাবুর কোন্ বই-এ আছে 'আমার সূর্য্যমুখী, কাহার এমন ছিল' ইত্যাদি—যাঁরা পড়েছেন তাঁদের অনেকের হয়ত নামটা টপ করে মনে পড়বে—কিন্তু

(১) Psycho-analysis-এর বাঙলা—মনোবিশ্লেষণ, মনোব্যাকরণ, মনোবিকলন ইত্যাদি অনেকে অনেক রকম করেছেন। মনোবিশ্লেষণ শব্দটি প্রতিশব্দ হিসাবে সুন্দর বলে আমি ব্যবহার করলাম। এখানে আর একটু বলা দরকার যে, অন্যান্য বিজ্ঞানের মতই নব্য মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা আজও নির্দিষ্ট হয় নি—কিছু কিছু আলোচনা হচ্ছে মাত্র। আমার প্রবন্ধে যে সব পরিভাষার প্রয়োগ পাওয়া যাবে তার কতকগুলি অন্যের ও কতকগুলি আমার নিজের।

(২) Sub-conscious-কে Subliminal, Pre-conscious, Fore-conscious; এবং Unconscious-কে কখনও কখনও True unconscious-ও বলা হয়।

অনেকের মনে পড়বেও না—। যাঁদের মনে পড়বে না, তাঁদেরকে যদি বলি, সেই যে যে-বই-এ বিষময় সংসারের কথা আছে, কুন্দ না কি নাম মেয়েটির—তখন আবার অনেকের মনে পড়বে—তখনও হয়ত এমন দু'চারজন থাকবেন যাঁদের নামটা বলে না দেওয়া পর্যান্ত মনে পড়বে না। ইঙ্গিতে বা অন্য কোন রকমে যাঁদের এই 'বিষবৃক্ষ' নামটা মনে করিয়ে দিতে হল—নামটা নিশ্চয়ই তাঁদের মনের কোথাও লুকিয়েছিল — তাকে খোঁজাখুঁজি করে বের করতে হল। তা'হলে দেখা গেল যে, ইন্দ্রিয় দিয়ে বোঝা ছাড়া লুকিয়ে রাখাও আমাদের মনের একটা কাজ। এ মন যে বোধী মন নয়, তার প্রমাণ এ মন দিয়ে বোঝা যায় না, বোঝা যায় এ মন থেকে টেনে বের করার পর। বুঝতে না দেওয়াটাই এর কাজ। তা'হলে এই যে মন—কষ্ট করে যার লুকোনো জিনিষ টেনে বের করে বুঝছে, তাকে যদি দুর্বোধী মন বলা যায়—ভুল হয় কি ?

কিন্তু এ ছাড়া মনের আর একটা ভাগ আছে যা একেবারেই ধরা দেয় না—মনোবিশ্লেষণ জানলে যার আভাস মাত্র পাওয়া যেতে পারে। সে হল অবোধী মন। উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক সেটা কি।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা অনেক বয়স পর্যান্ত আঙুল চোষেন, পেন্সিল চোষেন, একটা কলমের মত কিছু পেলেই চুষতে থাকেন। অভ্যাসটা যে ভাল নয়, তা' তাঁদের অনেকেই স্বীকার করবেন—এমন কি অনেকে অনেকবার প্রতিজ্ঞা পর্যান্ত করে বসবেন যে, এ বদ অভ্যাস তাঁরা ছেড়ে দেবেন ; কিন্তু আবার অন্যমনস্ক হলেই তাঁরা সেটা করে বসবেন। এখন কথা হচ্ছে, বোধী মন দিয়ে যে কাজ এত অন্যায় তাঁরা মনে করেন, সে কাজ তাঁরা অন্যমনস্ক হয়ে করেন কেন ? কোন্ মন তাঁদের এ কাজ করায়—কেন করায় ? নিশ্চয় বোধী মন করায় না—আর এ করানোর স্বপক্ষে যুক্তিও নেই। একটু গভীর ভাবে দেখলে দেখা যায়, এ অভ্যাসের মূলে আছে অত্যন্ত শিশু অবস্থায় চুষিকাঠী বা আঙুল চোষার অভ্যাস। শিশুরা আঙুল চুষে বা চুষিকাঠী চুষে আনন্দ পায়—তার অনেক কারণ আছে। সে আনন্দের স্মৃতি আমাদের মনের এক গভীর কোণে লুকিয়ে আছে। যাঁরা বয়সকাল পর্য্যন্ত আঙুল বা পেন্সিল চোষেন তাঁরা সেই ছেলেবেলাকার চুষিকাঠী চোষার আনন্দ পেতে চান বলেই চোষেন—একথা যদি বলা যায় তা'হলে তাঁরা কেউ-ই এ কথা স্বীকার করবেন না, চুষিকাঠী চোষার কোন স্মৃতিই আজ তাঁদের মনে পড়বে না—হাজার চেষ্টা করুন মনে করিয়ে দেবার—কিছুতেই না। অথচ এটা যে সত্যি, তা' একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়। সুতরাং এই যে মন যা হাজার চেষ্টাতেও বোঝা যায় না—এ হল অবোধী মন।

আর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা পুকুর দেখলে ভয় পান। তাঁদের মধ্যে অনেকে হয়ত গঙ্গা সাঁতরে পেরিয়ে যাচ্ছেন—অথচ একটা সামান্য পুকুর বা ডোবা দেখলেই তাঁদের ভয় হয়। কেন যে হয়, কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা কোন যুক্তিই দেখাতে পারেন না। কিন্তু চেষ্টা করে এর যদি কারণ খোঁজা যায় ত' দেখা যাবে, অত্যন্ত ছোট বয়সে তাঁরা হয়ত একটা পুকুরে বা ডোবায় বা চৌবাচ্চায় ডুবে গেছলেন, বা হয়ত অন্য কেউ ডুবে গেছলেন যা দেখে তাঁদের সেই অতি অল্প বয়সে ভয় হয়েছিল, যার স্মৃতি আজও তাঁদের অজ্ঞাতে তাঁদের মনের এমন এক গভীর কোণে লুকিয়ে আছে যা ধরা দায়। তাঁদের কারও সে ঘটনার কথা মনে নেই—মনে করিয়ে দিলেও মনে পড়বে না, কিন্তু তাঁদের মা-বাবা কি বাড়ীর পুরোনো লোকদের জেরা করলে হয়ত তার সন্ধান পাওয়া যাবে। সুতরাং এই যে মন—যেখানে তাঁদের অতি অল্প বয়সের স্মৃতি লুকিয়ে আছে এবং যে মনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও তাঁদের স্মরণ হয় না, এ হল তাঁদের অবোধী মন।

আমরা দুটো উদাহরণ দিলাম, কিন্তু এমনি কত রাশি রাশি জিনিষ যে আমাদের অবোধী মনে লুকিয়ে

আছে, তার ইয়ত্তা করা যায় না। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় যেদিন মানুষ জন্মায় সেদিন থেকে সে যা খায়, যা করে, যে আঘাত পায়, তার অনেক কিছুর স্মরণাতীত স্মৃতি থাকে তার এই অবোধী মনের মধ্যে। অথচ এই অবোধী মন আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নয়, চেষ্টা করলেও তাকে আয়ত্তে আনা যায় না! ঘুমন্ত মানুষ আপনা আপনি না জাগলে, কখনও বা একটু, কখনও বা অনেক ধাক্কা-ধাক্কি করে তাকে জাগাতে হয়; দুর্বোধী মনকে তেমনি কষ্ট করে খোঁচা দিলে সে জাগে, কিন্তু যে মানুষ আফিং খেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে তাকে যেমন যতই খোঁচা-খুঁচি করুন না, জাগাতে পারেন না, যতক্ষণ না আফিমের ঘোর তাঁর মাথা থেকে সরাতে পারেন। তেমনি অবোধী মনকে কিছুতে জাগাতে পারেন না, যতক্ষণ না তার মনের ভার টেনে বের করতে পারেন। এ তাঁরাই পারেন, যারা নব্য মনোবিজ্ঞান জানেন।

দুর্বোধী ও অবোধী মনের আর একটা দিক বিশেষ ভাবে বলা দরকার নইলে তাদের সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা ভুল ধারণা রয়ে যাবে। উপরে যা বলেছি তা থেকে অনেকের হয়ত এই ধারণা হবে যে, বোধী মন হল কর্ম্মী—আর দুর্বোধী ও অবোধী মন হল নিষ্কর্ম্মা। এরা যেন অন্ধকার একটা ঘর, ভুলে-যাওয়া ধারণাগুলো লুকিয়ে রাখবার জন্তই তৈরী হয়েছে—মানুষের প্রতিদিনকার জীবনে এদের প্রভাব যেন কিছু নাই। এ রকম ধারণা যদি হয় তা হবে ভুল—কেন না দুর্বোধী ও অবোধী মনের প্রভাব, এদের কাজ-কর্ম্ম এত বেশী যে, তার তুলনায় বোধী মনের প্রভাব ও তার কাজ-কর্ম্ম কিছুই নয়। কি ভাবে অবোধী মন কাজ করে তার দৃষ্টান্তে আসা যাক।

লিওনার্দো ডা ভিঞ্চি ছিলেন একজন বিখ্যাত আর্টিষ্ট। তিনি তাঁর ছাত্রদের ছবি আঁকার সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে বলতেন—তোমরা যদি একটা শাদা দেওয়ালে বা কাগজের ওপর কালি ছিটিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে দেখো, তবে তোমাদের মনে হবে যে, শাদা কাগজটা যেন একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য,—আর কালির ফোঁটাগুলো যেন পাহাড়-পর্ব্বত, গাছ-পালা, নদী-ঝরণা আরও কত কি! অথবা তারা যেন মনে হবে কতকগুলো মানুষের মূর্ত্তি—কত রকম পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছে—কত কথা বলতে চাইছে। *

বোধী মনের কাছে যেটা সামান্য একটা কালি-ছিটানো কাগজ ছাড়া কিছু নয়, অবোধী মনের কাছে সেটা একটা অফুরন্ত কল্পনার উৎস। এমনি ধারা কবিদের, ভাবুকদের, চিত্রকরদের, ভগবদ্ভক্তদের যত-কিছু কল্পনা—যা বোধী মনের কাছে হাস্যকর ও অদ্ভুত—তা সব অবোধী মনের কাজ। এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথের হিজিবিজি কাটা কালি-জাবড়ান কতকগুলি কবিতা যা প্রায় বছর দুই আগে কোন কোন মাসিক পত্রিকায় ব্লক বেরিয়েছিল, তার উল্লেখ করতে পারি। কবিতা লিখতে লিখতে, কখনও বা কবিতা লেখার পর কবিতার উপরে মনের খেয়ালে কালি দিয়ে নানা রকম বিচিত্র চিত্র তিনি কেটেছিলেন। অনেকেই সেগুলির মধ্যে গভীর অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন—যদিও সাধারণ বিচার-বুদ্ধি দিয়ে দেখলে তার কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ নিজেই না কি বলেছেন যে, সেগুলি তাঁর মনের খেয়াল মাত্র—তিনি বলুন আর নাই বলুন, মনো-বিশ্লেষকদের কাছে সেগুলি তাঁর অবোধী মনের খেয়াল—কেন না বোধী মন দিয়ে এই সব অর্থহীন হিজি-বিজি-কাটা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকার মতই অসম্ভব।

অবোধী মন মানুষকে হাতে ধরে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেমন করে লিখিয়ে নেয় তার উদাহরণ ফ্রয়েড্ দিয়েছেন।

ডাঃ ব্রিলের একটি রোগী ভয়ে তার কোন চাকরীতে জবাব-পত্র লিখছিল। তার ইচ্ছা ছিল বিনীত ভাবে

* ম্যাক্ কার্ডি সম্পাদিত লিওনার্দো ডা ভিঞ্চির নোট খাতার ১৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সে লেখে—'অনিচ্ছাকৃত ঘটনাক্রমে'···কিন্তু সে লিখে বসল—'ইচ্ছাকৃত ঘটনাক্রমে'···।

একবার একজন নেতা নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করতে গিয়ে ইচ্ছা করেছিল লিখবে—'দেশের জন্য চিরদিনই আমি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছি'—কিন্তু সে লিখে বসল—'দেশের জন্য চিরদিনই আমি স্বার্থভাবে কাজ করেছি'—আর তাই কাগজে ছাপা হয়ে গেল।

সুতরাং এই যে লিখতে গিয়ে কলম দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে যাওয়া বা বলতে গিয়ে হঠাৎ মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে যাওয়া—ইংরেজীতে যাকে বলে slip—এ হল অবোধী মনের কাজ।

প্রথম শেখা হয়ে যাবার পর অভ্যস্ত হয়ে যাঁরা হারমোনিয়াম বাজান বা টাইপরাইটারে টাইপ করেন, বা সাইকেল চালান—তাঁরা জানেন যে, তাঁদের ভাববার আগেই তাঁদের হাত বা পা চলে—সুতরাং এ-ও হল তাঁদের অবোধী মনের কাজ।

অবোধী মনের কাজ তখনই বেশী হয়, যখন বোধী মন অসাড় ও অনেকটা নির্জীব হয়ে পড়ে—যখন বোধী মন তার প্রেরণা-শক্তি হারিয়ে বসে। অমনি অবস্থা হয় মানুষের যখন সে ঘুমোয় বা যখন তাকে কেউ হিপনোটাইজ করে বা ক্লোরোফরম্ করে। সবাই জানেন ঘুমন্ত অবস্থায় বা হিপনোটাইজড্ অবস্থায় বা ক্লোরোফরমড্ অবস্থায় মানুষ এমন অনেক অবুঝের মত বকে বা কাজ করে, যা জাগ্রত অবস্থায় সে কখনই করত না। এ রকম করতে পারে, কেন না এই সব অবস্থায় তার বোধশক্তি থাকে না, বিচারশক্তি থাকে না—অর্থাৎ তার বোধী মন সম্পূর্ণ রকমে থাকে সুপ্ত। যা কিছু সে ভাবে, বলে বা করে তা করায় তার অবোধী মন। সুতরাং এই সব অবস্থায় মানুষ যদি কিছু অসম্ভব কাজ বা অলৌকিক কিছু করতে পারে তা'হলে তার বাহাদুরি নিশ্চয় দিতে হয় অবোধী মনকে। আমরা সকলেই জানি, এ রকম অসম্ভব সম্ভব। এমন ঘটনা বিরল নয় যে, একজন লোক সমস্ত দিন তার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে যে অঙ্ক হয়ত সারা দিনে কসতে পারে নি—হঠাৎ স্বপ্নে সে অঙ্ক সে কসে ফেলেছে—শুধু স্বপ্নে কসা নয়—পরক্ষণেই সে জেগে উঠে স্বপ্নের প্রণালীমত অঙ্ক ক'সে দেখেছে যে, সে অঙ্ক ঠিক হয়েছে। এমন ঘটনাও বিরল নয় যে, সমস্ত দিন শত চেষ্টা করেও একটা জিনিষ কোথাও ফেলে রেখে যে লোক খুঁজে পায় নি, স্বপ্নে হঠাৎ সে তা খুঁজে পেয়েছে। স্বপ্নে কত লোক কত হাত পা ছোঁড়ে, কত লোক চলে (স্বপ্নসঞ্চরণ), কত লোক কাঁদে, হাসে—এ ত' আমরা সবাই জানি। মানুষের হিপনোটাইজড্ বা ক্লোরোফরমড্ অবস্থায়ও ঠিক একই অবস্থা। এ সব অবোধী মনের কাজ। কেন না এ থেকে বোঝা যায় যে, যা মানুষের বোধী মনের ক্ষমতারও বাইরে, সে সব অসম্ভবও অবোধী মনের দ্বারা সম্ভব।

কথা-প্রসঙ্গে এখানে আর একটু বলতে চাই, এই যে স্বপ্নে বা ক্লোরোফরমের ঘোরে মানুষ যে সব কথা বলে বা যে সব কাজ করে তা আমরা সকলেই অসংলগ্ন, আবোল-তাবোল 'ভিরমি' বকা বলে হেসে উড়িয়ে দিই। কিন্তু আমরা জানি না যে, এদের একটাও অসংলগ্ন নয়, অকারণও নয়—এদের প্রত্যেকটারই অর্থ আছে, আর সে অর্থ অত্যন্ত গভীর—নব্য মনোবৈজ্ঞানিকেরা অনেক চেষ্টায় তা' বের করতে পারেন। ফ্রয়েড্ বলেন—বোধী মন মানুষের পদে পদে মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা আচরণ করে, কিন্তু অবোধী মন কখনও মিথ্যা কথা বলে না। একথা খুবই সত্যি, কেন না মানুষ যত বড় সরল সত্যবাদীই হোক, সমাজে সকলের সামনে যখন সে বেরোয়, রীতি, নীতি ইত্যাদি নানা আবরণ নিয়ে সে বেরোয়—তার সত্যিকার পরিচয় তাতে পাওয়া যায় না—তার যত কিছু লালসা, যত কিছু বাসনা তাকে চেপে চলতে হয়। কিন্তু অবোধী মন উলঙ্গ, সে সমাজ, রীতি-নীতি কিছু জানেও না, মানেও না। তাই এই আবোল-তাবোল বকা, অবোধী মনের এই যে বিকাশ এই হল—মানুষের সত্যিকার পরিচয়।

এখন দেখা গেল—অবোধী মন জড় নয়, নিষ্কর্মা নয়—তার প্রভাব জীবনের প্রতি পদে পদে। মানুষ অন্যমনস্কভাবে যা ভাবে, যা করে, যা বলে; স্বপ্নে, ক্লোরোফরমড্ বা হিপনোটাইজড্ অবস্থায় যা কিছু করে বা বলে; অভ্যাসবশতঃ বা সহজ প্রেরণায় (intuition) কলের পুতুলের মত যা কিছু করে; কবিদের যত কিছু কল্পনা, দার্শনিকদের যা কিছু মতবাদ, আর্টিষ্টদের যা কিছু পরিকল্পনা; ভগবদ্ভক্তদের যা কিছু প্রেরণা; প্লানচেট, অটোমেটিক রাইটিং, দূরদর্শন—এ সবের অনেক কিছুই হল এই অবোধী মনের কাজ। সুতরাং অবোধী মনের প্রভাব যে মানুষের জীবনে কত বেশী তা সহজেই অনুমান করা যায়। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গিলবার্ট মারে একবার বলেছিলেন—

জ্ঞানতঃ আমরা যে সব আদর্শকে জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করি তাদের প্রভাব জীবনে অতি সামান্য—তারা ঝড়ের মুখে খড়ের মত শক্তিহীন; অজ্ঞাত মনের গোপন যে আদর্শ তারাই সত্যিকার শক্তি যা মানুষের জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যায়।

কথাগুলোর সত্যতা এখন আর অস্বীকার করা যায় কি?

এ সম্বন্ধে আর একটা মাত্র কথা বলে এ প্রবন্ধ শেষ করব। কথাটা এই যে, ঊর্ধ্বোধী ও অবোধী মনের ধারণা হিন্দুদের কাছে নতুন নয়—যদিও যে পন্থায় আজ এদের অস্তিত্ব ও শক্তি ধরা পড়েছে, স্বীকার করতেই হবে সে পন্থাটা সম্পূর্ণ নতুন। প্রাচীন কালে হিন্দুরা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে নিজস্ব কি কি আবিষ্কার করে গেছেন—বা কতদূর এ সব বিষয়ে অগ্রসর ছিলেন, এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে—কিন্তু হিন্দু-দর্শনের নতুনত্ব ও মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করতে অতি বড় শত্রুও আজ সাহসী হবেন না। আর হিন্দু-দর্শনের বিশেষত্ব যদি কিছু থাকে, তা এই মানুষের মনের গভীরত্বের ও বিচিত্রতার অনুভূতিতে। তাঁরা মনকে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর করে দেখে গেছেন। আজ সময় এসেছে তাঁদের সেই আবিষ্কারকে নব্য বিজ্ঞানের এই নব আলোকে নতুন করে দেখবার।

ভোজ *

শ্রীফণীভূষণ রায়, এম্-এ

পোল্ স্তারফিসের বাড়ীতে প্রীতি-ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল। আয়োজনের ঘটা ও রকমারিত্বে বন্ধুবরের 'ভোজনবিলাসী' নাম রটে গেল। সব চেয়ে চমৎকার হয়েছিল কিন্তু 'ইল' মাছের রান্নাটা—পাতে পড়তেই সকলে বাহবা দিয়ে উঠল।

—'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'—লাঁসিয়ে বলল—এমন রান্না কে করলে হে?

—হাঁ, হাঁ—তার নাম, তার নাম বল—সকলে তারস্বরে চীৎকার করে উঠল।

—বন্ধুগণ! স্তারফিস জবাব দিল—বলতে পারি, কিন্তু বিশেষ কোন কাজে যে লাগবে, বুঝি না! পাফিল বর্দ্দর নাম শুনেছ—

—কে পাফিল?

—পাফিল বর্দ্দ।

—এ কি তোমার নূতন পাচকের নাম না কি?

—না, না, বলছি শোন। 'লোয়ার' নদীর তীরে আমার কয়েক শ' বিঘে জমি আছে—তবে সত্যি বলতে কি, যে জমীর কথা বলছি—তা' ঠিক জমী নয়, জলা। সেই জলাতে 'রুস্' নামে এক রকম ছোট গাছ জন্মে এবং নদীর ধারে ধারে অজস্র গজায়। আবাদের পূর্ব্বে 'রুস্' গাছের প্রাচুর্য্যে সেই জলা জমী একটা বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র বলে মনে হয়—বর্ষাকালে সব তলিয়ে যায়—দু'চারটা মাটির ঢিবি ছাড়া, যেখানে খালি কয়েক জমিতে চাষ-আবাদ হয়।

—তা'হলে এ জমীদারীতে জমীদার টাকা-পয়সা যতটা না পান, ম্যালেরিয়ার কৃপা পান তার চেয়ে অনেক বেশী······

—ঠিক বলেছ বন্ধু—'রুস্ ব্রাঁস্'-মহল খুব লাভের জমীদারী নয়—তবে আছে হে, এরও একটা লাভের দিক আছে। মোটে তিন-চার শ' বিঘে জমী—তার মধ্যে বদ্ধ জলাই বেশীর ভাগ। সুতরাং বার মাসই বেলে হাঁস মেলে প্রচুর, আর শীতের সঙ্গে সঙ্গে চখা, কালিম আর হাজারো রকমের জলচর পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়তে সুরু করে···আর ওখানে তিন-চারটে যে ছোট্ট ছোট্ট বিল আছে—ওখানকার লোকে বলে (আর কথা মিথ্যা নয়) যে, ও-অঞ্চলের সব মাছ ও-গুলির মধ্যেই ভিড় করে আছে—সত্যি বলতে—পাকাল, কই, মাগুর, শিঙ্গী মাছের ছড়াছড়ি; সুতরাং মাছ-ধরা আর পাখী শিকার করার এমন স্থান 'ভূ-ভারতে' আর নাই···আমাকে তিন তিনটে লোক রাখতে হয়েছে—পিয়ের, দিদিয়ে এবং আন্তানাজকে পাহারা দেবার জন্য—কারণ একটু ফাঁক পেলেই মাছ এবং পাখী উধাও হয়···কিন্তু যখনই আমি যাই—শুনি যে, ওরা তিনজনে সামলাতে পারছে না—বিশেষ করে এক নম্বরের সয়তান একটা লোক ওখানে থাকে—নাম পাফিল বর্দ্দ। তার জ্বালায় রাত্রিদিন ওরা ব্যতিব্যস্ত—অন্ততঃ দশবার ওকে ওরা ধরেছে তবু নাছোড়-বান্দা, পাজী, জোচ্চোর···যাক, বরাবর ওদের নালিশই শুনি, কান দিই না, এবার কৌতূহল হল। আন্তানাজকে জিজ্ঞাসা করলাম—কে হে লোকটা, কি করে···

—অত্যন্ত হতভাগা নচ্ছার—কাজের মধ্যে অর্দ্ধেক রাত ও বিলের চারপাশে ঘোরাঘুরি করে কাটায়—তবে শুনি না কি ও ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ জানে, তবে টেবিল চেয়ার মেরামত করার চেয়ে ওর চুরি বিদ্যাই···

—কিন্তু একটা লোকের ত' আর কেবল চুরিতেই চলে না···

—আজ্ঞে যা' বলেছেন। ও 'আরবোজ' গ্রামের সরাইখানার মালিকও বটে। তবে এখানে বহুত

* একটি ফরাসী গল্প হইতে।

সরাইখানা আছে—তাই উপার্জ্জন কম, তবে ও বেশ চালিয়ে নিচ্ছে। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলে এমন কোন সরাইখানা নাই—যেখানে অমন রান্না পাওয়া যায়, বিশেষতঃ মাছের 'কারী' কি মুখরোচক, কি সুগন্ধি! একবার খেলে চিরকাল মনে থাকে···

—হাঁ, হাঁ—খুব সমজদারের মতন কথা বলছ, আতানাজ···

—সত্যি মসিয়ে—আমি যা' শুনেছি, তাই বলছি—তবে যা' রান্না করে খাওয়ায় তার অধিকাংশই চুরির জিনিস। এই রকম করে তার স্ত্রী এবং সে এক-পাল ছেলেপুলে নিয়ে বেশ আছে। বড় ছেলেটির বয়স তেরোর বেশী হবে না, এর মধ্যেই সে স্কুল পরীক্ষায় 'প্রাইজ' পেয়েছে···

—বাঃ ছেলেটি ত' মন্দ নয়—পড়া যদি চলে তবে ত'···

—কি হবে মসিয়ে, ধরলাম ওর বুদ্ধি আছে, পড়া-শুনার উপর ঝোঁক আছে, কিন্তু জানেন 'বাপকা বেটা সিপাহীকা ঘোড়া'! রক্তের গুণ যাবে কোথায়! আপনি কি মনে করছেন ও আমাদের জ্বালায় না? বিলক্ষণ! আপনি যদি দয়া করে আর একজন পাহারাদার নিযুক্ত করেন···

—আচ্ছা, আচ্ছা, কি বলছিলে, রান্নার কথা নয়! দেখ, কোন প্রকারে পাঁফিলের কাছ থেকে রান্নার 'জায়'টা বের করা যায় না—কিছু নিয়েও ও যদি বলে···

—আপনাকে মসিয়ে—বিক্রী করবে! অনেকেই ত' এর আগে চেষ্টা করেছে—পাঁফিল কিছুতেই বলতে চায় নি—ওকে চেনেন না মসিয়ে···

যাক—অতি অল্পদিনের মধ্যে আশ্চর্য্য রকমে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হল।

—একদিন সন্ধ্যার একটু আগে আমি এবং আতানাজ ডিঙ্গী নৌকোয় শিকার করতে বেরিয়ে-ছিলাম—নভেম্বর মাস, দেখতে দেখতেই অন্ধকার হয়ে গেল—কিন্তু রাত্রি হবার আগেই আমরা পাতিহাঁস এবং চখাতে নৌকো ভর্ত্তি করে ফেললাম। আরও আধ ঘণ্টা চুপচাপ বসে রইলাম, কিন্তু ডানার ঝটাপট শব্দ আর কাণে আসে না—তখন আতানাজকে বললাম—ফিরেই চল। এদিকে খিদে যা' পেয়েছিল—রাক্ষসের মত, বিশেষ করে পাঁফিল বর্দ্দর রান্নার সুখ্যাতি শুনে··· ডিঙ্গী অগভীর জলের উপর দিয়ে মসৃণ, অবারিত গতিতে বয়ে চলল, পাশের নল-খাগড়ার বন ঈষৎ কম্পিত হতে লাগল এবং যেখানে-যেখানে পুষ্পাঞ্জলির মত চন্দ্রকিরণ পতিত হয়েছিল—সেখানকার জলস্রোত, নৌকাচালনের জন্য, দ্রব রৌপ্যধারার মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হতে লাগল। আমার শিকার-স্পৃহা কমে এসেছিল—প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যার মৌন শান্তি আমাকে পেয়ে বসেছিল এবং সেই সুবিস্তীর্ণ জলাভূমির গম্ভীর এবং রহস্যময় আত্মা যেন একটা অনির্দ্দিষ্ট বিষণ্ণতায় আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল—

আমার তখন জেগে ঘুমানো অবস্থা—তাই একটা ধাড়ী হাঁসকে লক্ষ্য করে দু' দু'বার গুলি ছুঁড়েও সুবিধা করতে পারলাম না—সেটা 'কক্ কক্' শব্দ করে লম্বা ডানা মেলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু নিজেকে ধিক্কার দেবার অবকাশ পাই নি—কারণ ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই পাঁচ সাত হাত দূরে—কে যেন তীব্র-কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল—দেখতে না দেখতেই নল-খাগড়ার বন থেকে বেরিয়ে একটা ছায়া রাত্রির অন্ধকারে মিশে যেতে চাইল। কিন্তু একটু যেতে না যেতেই সে বসে পড়ল···আতানাজ শব্দ শুনেই এক লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় উঠেছিল। চেঁচিয়ে বলল—ইজিদোর—পাঁফিলের ছেলে—কি হে, পাজী ছোকরা—এখানে কেন? এইবার তোমায় ধরেছি—এখন হুমো বিড়ালের মত ঘোজরাচ্ছ কেন?

—আ—আ—বড় লাগছে—বড় লাগছে—

—কোথায়—কিসে লাগছে—

—পিঠে—এই একটু নীচে—আগুনের মত জলে যাচ্ছে, ছররাগুলীর সবটা আমার পিঠের উপর এসে পড়েছে—

—ঠাট্টা করছিস বুঝি? কাজিল ছোঁড়া কোথাকার! কাণ মলে দেব বলে আগে থেকেই কান্না জুড়েছিস···

আমিও তাড়াতাড়ি লাফিয়ে ডাঙায় উঠলাম যেয়ে—কি জানি যদি ছেলেটা আহত হয়েই থাকে! তা' আতানাজ পরীক্ষা করে দেখে আমাকে আশ্বস্ত করে বলল—কিছু না—একটু ছড়ে গেছে বই ত' নয়—বলতে গেলে—গুলীটা লাগেও নি।

তারপর ওর দিকে চেয়ে বলল—যাও, আর চেয়ে রয়েছ কেন? দে ছুট্, দে ছুট্······

আমি আতানাজকে বললাম—তা' হবে না—ইজিদোর আমাদের সঙ্গে যাবে, আজই সব পরিষ্কার হওয়া দরকার···

ও কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল—আমায় ছেড়ে দিন—কখন আর এমুখো হব না—

—চুপ—আতানাজ বলল—দেখলেন ছোঁড়ার মায়া-কান্না···

যাক, আর কথা কাটা-কাটি করলাম না। ছেলেটাও বুঝলে, না যেয়ে উপায় নেই—তখন ও ওর পোষাক ঝেড়ে-ঝুড়ে ঠিক করে নিতে লাগল—কিন্তু আমাদের একটু অন্যমনস্ক দেখে ঝপাং করে একটা থলী ও ছুঁড়ে মারল। আতানাজ সেটাকে হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল—থলী-ভরা ইল মাছ!

চীৎকার করে আতানাজ বলল—বেশ হয়েছে, মাছগুলো মসিয়ের সান্ধ্য-ভোজে লাগবে—আর আমি এখন পুলিশ ডাকি। থলে-সুদ্ধ দিই ধরিয়ে তোকে—

পুলিশের কথা শুনে নতজানু হয়ে ছেলেটি আতঙ্কের স্বরে বলল—মসিয়ে আতানাজ, মসিয়ে আতানাজ—আমাকে ধরিয়ে দেবেন না—ধরিয়ে দেবেন না···

—এই আবার ন্যাকামো সুরু করেছে—

—ন্যাকামো নয়—মসিয়ে—হা ভগবান—পুলিশ—বাবা যদি জানতে পারেন···

—ভালই হবে, সে বদমায়েসের রাজা—জুয়াচোরের শিরোমণি—সে বরং তোমার গুণে মোহিত হবে···

—বাবা,—জানি আমি তাকে—নিশ্চয়ই খুন করবে আমায়···

কথাটা বড় ভয়েই সে বলেছিল—তাই তার কথা আমার হৃদয় স্পর্শ করল।···কিন্তু এই সুযোগে যদি—পাকিলের কাছ থেকে রান্নার 'জার'টা বের করা যায়—সুতরাং প্রকাশ্যে বললাম—আচ্ছা না হয় তোমাকে পুলিশে এবার না-ই দিলাম—কিন্তু আবার যে তুমি কালকে আরম্ভ করবে না—কে জানে! সুতরাং তোমার বাপের সঙ্গে বোঝা-পড়া হওয়ার দরকার। বল, সে কোথায় আছে! ডাকতে পাঠাই···

—বলতে পারব না—মসিয়ে—পারব না···

আতানাজ বলল—দেখলেন কেমন শিক্ষা—ইজিদোর যে বলছে না ওর বাপ কোথায়, তার মানে ও জানে ওর বাপ কি মহৎ কার্য্যে ব্যস্ত রয়েছেন···

এই কথা শুনে ছেলেটির মুখ আবার কাঁদ কাঁদ হয়ে উঠল।

তখন আদরের সুরে আমি বললাম—ভয় করো না—আতানাজকে পাঠাব না—নিজেই আমি তোমার বাপের খোঁজে যাব—সে যা' কিছু করুক না কেন—আমি দেখেও দেখব না—

তখন ইজিদোর থেমে থেমে বলল—হয়ত বাবা রয়েছেন বাঁধের কাছে—যেখানে সব মাছ জীয়ান থাকে। এই এখান থেকে মিনিট দশেকের রাস্তা মসিয়ে···

—আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি আর আতানাজ 'কুঠী'তে যাও সেখানে মাদাম তাদিভেল এমন পুলটিস লাগিয়ে দেবেন যে, ব্যথা আর টেরও পাবে না, তবে শোন আতানাজ, আমি ফেরবার আগে যেন 'ইল' মাছ রান্নায় না চড়ায়—এই বলে আমি বাঁধের দিকে চললাম।

বেশীদূর যেতে হয় নি,—সেদিন পাকিল বুড়ির দিনটা নেহাৎ খারাপ ছিল সন্দেহ নাই।

ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি—কি করে অতর্কিতে উপস্থিত হয়ে তাকে পাকড়াও করব, এমন সময় দূর

হতে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ কানে এল—আমার আর দুইজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে পাকিলের তখন 'বালী-সুগ্রীবের' যুদ্ধ লেগে গেছে—অনেক কষ্টে তারা পাকিলকে বাগে আনল। আমি এগিয়ে যেয়ে বললাম—ছেড়ে দাও ওকে, ওর সঙ্গে আমার কথা আছে। ওরা ছেড়ে দিল, কিন্তু আমাকে একা রেখে যেতে ওরা ভয় পাচ্ছিল। পাকিলের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে গিয়েছে, নাকে-মুখে রক্ত জমেছে, একটা সাংঘাতিক কিছু করা ওর পক্ষে বিচিত্র নয়। তবুও ওদের যেতে বললাম এবং বাঁধের ওধারে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেলে আমি পাকিলকে বললাম—তোমাকে একটা দুঃসংবাদ শোনাই। তোমার ছেলে ইজিদোর মাছ ধরতে এসে ধরা পড়েছে এবং আত্তানাজ তাকে পুলিশে দেবে ঠিক করেছে…

কথাটা শুনে তার মুখের ভাব কি রকম হল—রাত্রির অন্ধকারে তা আমার বোঝবার উপায় ছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে বলল—না, এটা মিথ্যা কথা। আমাকে ভয় দেখাবার জন্য বলছেন। ইজিদোর ঐ কাজ কখনই করে নি—অসম্ভব!

—অসম্ভব কেন?—তুমি ত' প্রতিদিনই করে বেড়াচ্ছ। সে তোমার দেখাদেখি করবে,—এ অসম্ভব কি! এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ছেলে বাপের আদর্শে চলে—

—স্বাভাবিক—বলবেন কুশিক্ষা—অত্যন্ত ক্ষোভের স্বরে সে বলতে লাগল। আমি ত' কোন শিক্ষাই পাই নি—আমি ত' ক-খ-ও চিনি নে—ছোট বেলায় বাপ-মা ত' আমায় শিখায় নি—কারণ আমি 'কুড়িয়ে পাওয়া' ছেলে—বরঞ্চ কুশিক্ষা পেয়েছি।

—তুমি তোমার অসৎ কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত?

—অনুতপ্ত হই আর না-ই হই—তাতে কি যায় আসে! তারা কি দণ্ড দেবার সময় কসুর করবে—ক্ষিপ্তভাবে সে বলতে লাগল। তবে আমায় নিত—নিত—কিন্তু ইজিদোর—আমাদের বড় ছেলে—ওর মায়ের চোখের মণি—জরিমানা—না হয় কয়েদ—ভাবতেও লজ্জায় মাথা মাটিতে মিশে যায়…এই ত' আমার জীবন—আরও কপালে কি আছে—কে জানে…

ভাবলাম বলি—কেন কপালে কি আর থাকবে—আমার বিল হাতড়িয়ে যা মাছ পেয়েছ—সরাইখানায় ফিরে দিবা 'কালী' বেঁধে……প্রকাশ্যে বললাম—সত্যিই ইজিদোরের কথা তোমার ভাবা উচিত—এই বয়সেই যদি ছেলেটা খারাপ হয়ে যায়—

—মসিয়ে—আমি চাই না যে, সে তার বাপের মত হয়…

—কিন্তু সে ত' তোমার মত হয়েছে—অধঃপতনের পথে প্রথম পা বাড়ানোই সর্ব্বনাশ…

—সেইটেই ত' চিন্তার কথা—পাকিল বলল।

—এ ত' জানা কথা—তুমি তাকে মারতে পার, গাল-মন্দ দিতে পার—কিন্তু তারপর? তুমি জান চুরি-বিদ্যে…একবার অভ্যস্ত হলে—হাড় পর্য্যন্ত কালী করে দেয়! তবে তুমি যদি শোধরাও—আস্তে-আস্তে তোমার ছেলেও ভাল হবে—

—মসিয়ে, আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি এ কাজ আর করব না—ছেলেটা জেলে যাবে—কয়েদী হবে—না না—আমি যেমন বন্য, বন্য ভাবেই আমার জীবন কাটবে—কিন্তু ছেলেটা…

একটু থেমে বলল—আমি সখ করে এ কাজ করি নে—এক পাল ছেলে-পুলে নিয়ে সংসার চালান। অসম্ভব…

—আচ্ছা, এর কি কোনো উপায় হয় না…

—এক ভগবান ছাড়া আর কেউ যে কিছু করতে পারেন—জানি না। কিন্তু ছেলেটা…বলতে বলতে তার গলা ভারী হয়ে উঠল।

—দেখ, পাকিল, তোমাকে একটা কথা বলছি—খুব ধীর-স্থির হয়ে শোনো—আত্তানাজরা বলছে, আর একজন পাহারাওয়ালা না হলে ওরা কিছুতেই পারছে না—তুমি ত' এতদিন আমার সম্পত্তি লুঠে বেড়িয়েছ—আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে এই সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাহারাওয়ালা নিযুক্ত করি…

কথাটা শুনে সে অবাক হয়ে রইল—বিশ্বাস করতে পারছিল না—এতদিন যে চুরি করেছে—তাকে আমি কি করে বিশ্বাস করব—না, না, আমি হয়ত তাকে ঠাট্টা করছি—কিন্তু আমার স্বরের গাম্ভীর্য্যে তার যেন প্রত্যয় হল। সে নতজানু হয়ে উজ্জ্বল কৃতজ্ঞতায় আমাকে ধন্যবাদ দিল। আমি তাকে থামিয়ে বললাম—চল এখন কুঠীতে যাই।

যেয়ে দেখি আতানাজ ইজিদোরের সঙ্গে বসে আছে—পাকিলকে দেখে আতানাজ চোখের পাতা একটু উঠিয়ে দেখলে—ইজিদোর কিন্তু ভয়ে কাঠ হয়ে গেল—তাকে আস্ত খুন করে ফেললেও সে নড়ে বসতে পারত না। মাদাম ত্যদিভেলের মুখের প্রসন্নতা দেখেই বুঝলাম—ইজিদোরের আঘাত মোটেই সাংঘাতিক নয়। যাক, আমি আতানাজকে বললাম—তুমি বলতে না যে, একজন নূতন পাহারাওয়ালা না হলে আর চলে না।

—মসিয়ে আজকে ত' আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন—ইজিদোরের দিকে তাকিয়ে আতানাজ বলল।

—বেশ, বেশ এতদিন যা' চেয়েছ—তাই আজকে বন্দোবস্ত করছি···দেখি পাকিলের এ বিষয়ে কি মত!

—পাকিল! এ বিষয়ে পাকিলেরও মতামত আছে?

—নিশ্চয়ই — সর্ব্বাগ্রে ওরই, বিশেষতঃ—পাকিলই যে তোমাদের জুড়িদার হবে—হেসে আমি বললাম। আতানাজের মুখে বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। যাক, পাকিলের দিকে তাকিয়ে বললাম—তোমার বিচার করলাম—এখন ইজিদোরের অপরাধের বিচার ত' করা উচিত।

—আজ্ঞে, আমাকে আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন? ইজিদোরকে ডাকলাম—তোমাকে উপযুক্ত সাজা দেব—এদিকে এস—পিছন দিয়ে দাঁড়াও ত'—এখনও লাগছে।

—উঃ-উঃ করে ইজিদোর এসে দাঁড়াল।

—জান পাকিল — ছর্‌রা লেগে ওর পিঠ ছড়ে গিয়েছে—তা' মাদাম ত্যদিভেল যা পুলটিস্ লাগিয়েছেন তাই যথেষ্ট। ইজিদোর যা' সাজা পেয়েছে—এতেই খুব হবে—এ ব্যাপারের এখানেই শেষ হল—হাঁ, এখন থেকে ও যাতে ভাল করে পড়া-শুনা করে—দেখো···

—আর কিছু আদেশ আছে মসিয়ে!

—হাঁ, একটা কথা ভুলে গেছি—ইজিদোরের থলিতে যে মাছ পাওয়া গিয়েছিল—তা' এখনও রান্না হয় নি, আমার ইচ্ছে তুমিই রান্নাটা করে ফেল। আর কৌশলটা মাদাম ত্যদিভেলকে শিখিয়ে দাও। অবশ্যই তোমার কাছে তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দানই চাইছি ··

ক্ষণেকের জন্য সে স্তম্ভিত হয়ে রইল। তারপর ইজিদোরের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

—বন্ধুগণ,—স্যারফিস্ আমাদের সবাইকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল — পাকিলের রান্নাই তোমাদের পাতে দেওয়া হয়েছে। এখন বল, খুব বেশী দাম দিয়ে রান্নার 'জায়'টা কিনেছি কি না!

বিচিত্রা

ভূমিকম্প

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

গত ১লা মাঘ যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহা ভারতবর্ষের চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দিয়া গিয়াছে। নাড়া দিবার কারণও আছে। এই ভূমিকম্পে মহাকাল ভারতের প্রায় ৩০ হাজার নর-নারীর জীবন বলি গ্রহণ করিয়াছেন। ধন-সম্পদের ক্ষতি যে তাহার কত শত
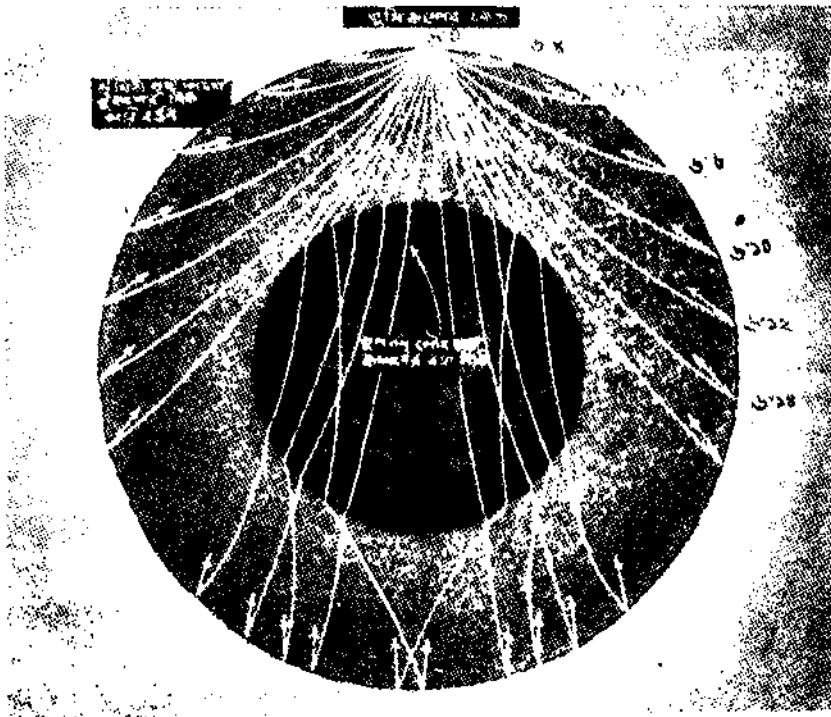
কম্পন-তরঙ্গ ছড়াইয়া পড়িবার চিত্র—নং ১

কোটি টাকার হইয়াছে, এখনও তাহার হদিস পাওয়া যায় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ভূমিকম্প নূতন জিনিষ নহে। পৃথিবীতে এমন দেশও আছে যেখানে ভূমিকম্প প্রায় বারো মাসই লাগিয়া আছে। আমাদের এই ভারতবর্ষেও ভূমিকম্প অনেক বার হইয়া গিয়াছে।

সে সব ভূমিকম্পের ভিতর দুইটি ভূমিকম্পই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহাদের একটি হইয়াছিল ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে, আর একটি হইয়াছিল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রেল তারিখে। প্রথমটিতে আসামের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা অবর্ণনীয়। শিলং সহরটি তাহাতে একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়, পাহাড় ফাটিয়া চৌচীর হইয়া যায়, নানা যায়গায় বিরাট গহ্বরসমূহ গড়িয়া উঠে। এই ভূমিকম্পের জের সেবার বাংলাতেও অনুভূত হইয়াছিল। সেবারকার ভূমিকম্প উত্তর বঙ্গের

যে ক্ষতি করিয়াছিল তাহার পরিমাণও সামান্ত ছিল না।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের ঝোঁক পড়ে উত্তর ভারতের উপরে। তাহার আলোড়নে আফগানিস্থান হইতে পুরী পর্য্যন্ত ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্যে দুলিয়া উঠিয়াছিল। আনুমানিক প্রায় ২০ হাজার লোক সেবার প্রাণ হারাইয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীতে এরূপ ভূমিকম্পও হইয়া গিয়াছে যাহার তুলনায় ভারতবর্ষের এই বড় বড় ভূমিকম্পগুলিও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইবে। নিম্নে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় কয়েকটি ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থান ও তাহাতে যত লোক মারা মৃত্যু ও ধ্বংসের মহোৎসব পড়িয়া যায়, আর যেবার তার কম্পন হয় মৃদু, সেবার ধ্বংসের বহর হয় অপেক্ষাকৃত কম। জাপানে ভূমিকম্পের এই আধিক্যই ভূমিকম্প সম্বন্ধে সেখানকার লোককে সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। ফলে ভূমিকম্পের কারণ কি, কি করিয়া তাহার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়—এই সব তথ্যের নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণাও সুরু হইয়াছে। ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে চরম কথা এখনও জানা গিয়াছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন না। তবে এই সব আলোচনার ফলে অনেক অদ্ভুত রহস্য যে ধরা পড়িয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই।
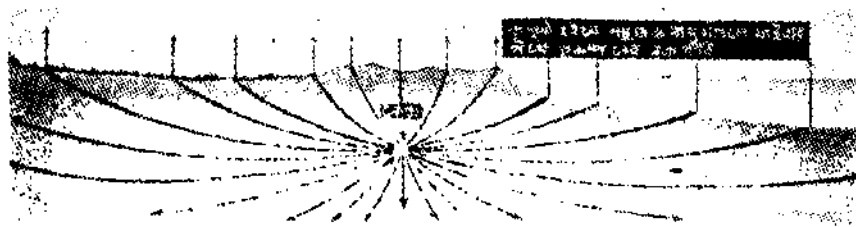
কম্পন-তরঙ্গ ছড়াইয়া পড়িবার চিত্র—নং ২

গিয়াছে তাহার আনুমানিক সংখ্যা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

স্থান	বৎসর	মৃত লোকের সংখ্যা
লিসবন	১৭৫৫	৬০,০০০
কেলেব্রিয়া	১৭৮৩	৩০,০০০
জাপান	১৮৯৬	২৯,০০০
ভারতবর্ষ	১৯০৫	২০,০০০
মেসিনা	১৯০৮	১,০০,০০০
ইটালী	১৯১৫	৩০,০০০
চীন	১৯২০	প্রায় ২,০০,০০০
জাপান	১৯২৩	১,৫০,০০০

যে সব দেশে ভূমিকম্প হামেসাই হয় ইটালী তাহাদের অন্যতম। কিন্তু ভূমিকম্পের মার সব চেয়ে বেশী ভোগ করে সম্ভবতঃ জাপান। বৎসরে সেখানে প্রায় হাজার বার করিয়া বাসুকী মাথা নাড়া দেন। যেবার নাড়াটা একটু বেশী রকমের তীব্র হয়, সেবার

বৈজ্ঞানিক যুগ সুরু হইবার আগে ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে নানা দেশের মনে নানা রকমের অদ্ভুত সব ধারণা ছিল। আমাদের দেশের ধারণা ছিল এবং অশিক্ষিত লোকদের মনে এ ধারণা এখনও আছে যে, আমাদের এই সসাগরা পৃথিবীকে সহস্র-ফণা বাসুকী তাঁহার মাথার উপরে ধারণ করিয়া আছেন। কিন্তু একটা জীবন্ত প্রাণীর পক্ষে একেবারে নিশ্চল পাথরের মতো থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং মাঝে মাঝে বাসুকীরও বিরক্তি আসে, তাহারও মাথা টলে এবং তাহারই ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পের সময় এদেশে শঙ্খ বাজানো হইয়া থাকে। এই শাঁখ বাজানোর মূলে আছে হয়তো ক্রুদ্ধ বাসুকীকেই স্তবে তুষ্ট করিবার চেষ্টা। জাপানের লোকেরা মনে করিত—তাদের দেশ দাঁড়াইয়া আছে একটা অতিকায় মাছের উপরে। এই মাছ যখন নড়ে তখনই সারা দেশ নড়িয়া উঠে। খৃষ্টান জগতের ধারণা ছিল—ভূমিকম্প হয়

মানুষের পাপের ফলে। দেশের ভিতর পাপ যখন অতিমাত্রায় বাড়িয়া উঠে, ভগবান তখন ভূমিকম্পের দ্বারাই তাহার দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। সোডম ও গোমরা যখন পাপের ভারে ভারি হইয়া উঠিয়াছিল, তখন ভগবান ভূমিকম্পের দ্বারাই ও দুইটি সহরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এমনি ধরণের কাহিনী বাইবেলে আজও আছে। এ ধারণা যে আজও বহু খৃষ্টানের মনের ভিতর হইতে মুছিয়া যায় নাই, এই ভূমিকম্পের সম্পর্কে যে সব প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে আঘাতে বহুদূর পর্যন্ত ধরা-পৃষ্ঠ দুলিয়া উঠে। ভূমিকম্পের এই এক কারণ। যে সব স্থানে আগ্নেয়গিরি আছে, সে সব স্থানে প্রায়ই ভূমিকম্প হইতে দেখা যায়। মাটির ভিতরে যে সব বাষ্প আছে বা উষ্ণ ধাতব দ্রব্যাদি আছে অগ্ন্যুৎপাতের সময় তাহা বিরাট বলে বাহির হইয়া আসিতে চেষ্টা করে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ ভীষণভাবে দুলিতে থাকে। ইহাই আগ্নেয়গিরি-পরিবেষ্টিত অঞ্চলের ভূকম্পনের কারণ। তাহা ছাড়া এই সমস্ত দেশে কখনো
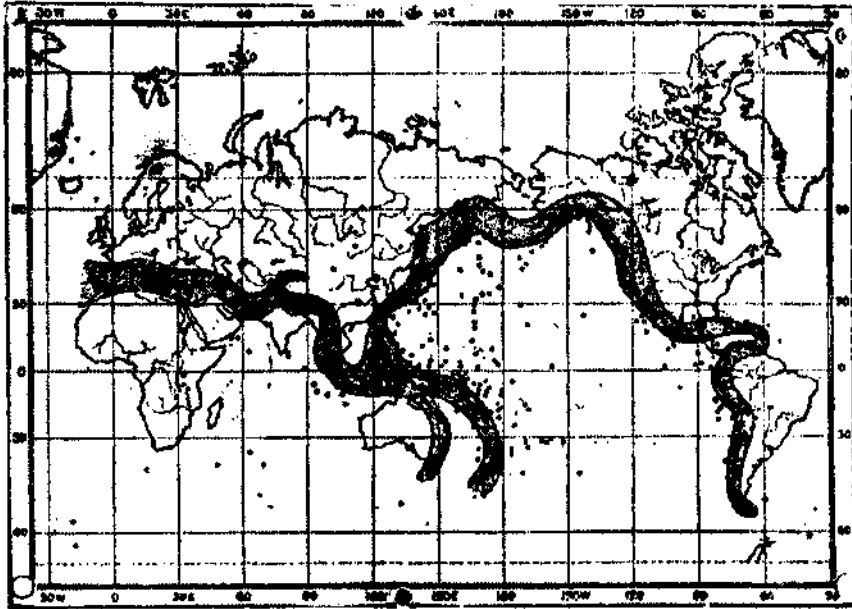
ভূমিকম্প-প্রধান স্থানসমূহের চিত্র

তাহার কোনো কোনোটির ভিতর দিয়াও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ভূমিকম্পের সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে এত সব বিভিন্ন রকমের ধারণা জমিয়া আছে যে, তাহার হিসাব দেওয়াও সম্ভবপর নয়।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ফলে এই সব যুক্তি বা ধারণা অবশ্য ক্রমেই বদলাইয়া যাইতেছে। বৈজ্ঞানিকদের মতেও ভূমিকম্পের কারণ একটি বা দুইটি নহে। নানা কারণে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। কোনো যায়গায় যদি কখনো কোনো কারণে খুব বড় কোনো পাহাড় ধ্বসিয়া পড়ে, তবে তাহার কখনো অগ্ন্যুৎপাতের আলোড়নে বড় বড় পাহাড় নিজেদের স্থানও পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। তাহার ফলেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভূগর্ভে অনেক বিরাট পাহাড় গায়ে গায়ে মিশিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বরও আছে। নানা প্রাকৃতিক কারণে এই সব পাহাড়ের উপরে যে চাপ থাকে সময়ে সময়ে তাহার ভিতরেও বৈষম্য দেখা দেয়। তখন সেই সব স্থানে যে অসমান চাপের সৃষ্টি হয়, তাহাতে মাটির অভ্যন্তরের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়ও স্থানচ্যুত হইয়া যায়।

পাহাড়ের এই স্থানচ্যুতিতে যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয় তাহাও ভূমিকম্পের আর একটি কারণ। সব চেয়ে বড় ভূমিকম্প যেগুলি তাহার সহিত সাধারণতঃ পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ঠের অবস্থারই যোগ থাকে। রবারের সাধারণ ধর্ম্ম সঙ্কোচনের দিকে; তাহা টানিলে বড় হয়, কিন্তু বাহিরের এই চাপ উঠাইয়া লইলেই সে সঙ্কুচিত হইয়া আবার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ভূ-পৃষ্ঠও কতকটা এই রবারের মতই। বাহিরের নানা চাপে তাহা ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠে—প্রসারিত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই বাহিরের চাপগুলি কোনো কারণে যখন কমিয়া যায় তখন পৃথিবী আবার ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করে তাহার পূর্ব্বের অবস্থায়। তখনই সুরু হয় ভীষণ আলোড়নের। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় ভূমিকম্পগুলির অধিকাংশেরই উৎপত্তি এইভাবে।

প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী স্থানগুলিতেই সাধারণতঃ বেশী ভূমিকম্প হইয়া থাকে। মঃ বেলোর (Montessus de Ballore) মনে করেন এই ভূমিকম্প-প্রধান স্থানগুলি দুইটি কোমরবন্ধের (belt) আকারে ভূমণ্ডলকে জড়াইয়া আছে। এই কোমরবন্ধ দুইটির একটি সুরু হইয়াছে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে নিউজিলাণ্ডের নিকট হইতে। সেখান হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া তাহা ক্রমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে চীনের পূর্ব্ব প্রান্তে। এইখান হইতে উত্তর-পূর্ব্বদিকে বাঁকিয়া জাপান ও কামস্কাটকার ভিতর দিয়া বেরিং প্রণালী অতিক্রম করিয়া এই 'বেল্ট'টি অবশেষে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে আসিয়া হাজির হইয়াছে। অন্য 'বেল্ট'টিকে এই প্রথম 'বেল্ট'টির একটি শাখা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইষ্ট-ইণ্ডিজ হইতে আরম্ভ হইয়া উহা প্রথমে আসিয়াছে বঙ্গোপসাগরে এবং তারপর ব্রহ্মদেশ, আসাম, হিমালয়, তিব্বত, তুর্কিস্থান, পারস্য, ইতালি, স্পেন ও পর্ত্তুগাল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে এবং তারপর আতলান্তিক মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া মেক্সিকোর কাছে প্রথম 'বেল্ট'র সহিত মিলিত হইয়াছে। কিন্তু এই 'বেল্ট'-নির্দ্দিষ্ট ভূকম্পন-প্রধান স্থানগুলি ছাড়াও ভূমিকম্পের আরও অনেকগুলি কেন্দ্র আছে। চীন, মাঞ্চুরিয়া, মধ্য আফ্রিকা, ভারত সাগরের পশ্চিম অংশ, দক্ষিণ আতলান্টিক মহাসাগর, সুমেরু সমুদ্রেও ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

ভূমিকম্পের দ্বারা পৃথিবীর বুকের উপরে ধ্বংসলীলার যে অভিনয় চলিতেছে তাহাই ভূমিকম্পের দিকে বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহারা ভূমিকম্পের কারণ নির্ণয়ে সচেষ্ট হ'ন। তাহার আগেও যে এ সম্বন্ধে আলোচনা হয় নাই তাহা নহে। আরিষ্টটল, ষ্ট্রাবো, লিভি, প্লিনী প্রভৃতি দার্শনিকেরাও ইহা লইয়া আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে নেপ্‌লসের ভূমিকম্পের পর। আইরিশ একাডেমির অধ্যাপক ম্যালেট'র নাম এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিয়াপোলিটান ভূমিকম্পের পর ম্যালেট ঐ অঞ্চলে তাঁহার অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অনুসন্ধানের ফল বাহির হয়। তিনি বলেন—ভূগর্ভে ৭।৮ হাত নিম্নে আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলেই ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রস্থানে কম্পন সোজাসুজি ভাবে নীচ হইতে উপরের দিকে চলিয়াছিল এবং তারপর তাহা দূরে গিয়া তির্য্যকভাবে চলিতে থাকে। সেখানকার বাড়ীগুলির ফাটলের অবস্থা দেখিয়া তিনি এই তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে এই প্রথাতেই কম্পনের ধারা নির্ণীত হয়। এই সব কম্পনের তরঙ্গ আছে। সে তরঙ্গ কতকটা জলের তরঙ্গের মতোই, কিন্তু তাহার গতি অসাধারণ দ্রুত। ভূমিকম্পের কম্পন-তরঙ্গ তিনটি বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়—ঠিক সোজাসুজিভাবে, এপাশে ওপাশে বেঁকিয়া এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া (up and down, to and fro and a twist)।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জাপানের ইয়োকোহামায় একটি ভীষণ ভূমিকম্প হয়। তাহার পর হইতে সেখানেও ভূমিকম্পের সম্বন্ধে তথ্য নির্ণয়ের বিরাটভাবে চেষ্টা হইতে থাকে। জাপানে 'সেস্‌মলজিকাল সোসাইটি' যে সব তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাও খুব মূল্যবান। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ফলে Seismometer (ভূ-স্পন্দন-পরিমাপক যন্ত্র) নামে যে যন্ত্রটির আবিষ্কার হইয়াছে তাহা এই সব কম্পনের স্বরূপ নির্ণয়ের একমাত্র উপায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যন্ত্রের সঙ্গে একটি সূক্ষ্ম সূচ সংযুক্ত থাকে। কাগজের উপরে তাহাই কম্পনের সরু রেখা টানিয়া যায়। Seismology-তে যাহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা এই রেখা দেখিয়া কম্পনের বেগ, দিক, স্থিতিকাল প্রভৃতি নির্ণয় করিতে পারেন।

কম্পনের গতি সমস্ত ভূমিকম্পেই সমান নয়। যে সব স্থান দিয়া কম্পনের তরঙ্গ প্রবাহিত হয় সেই সব স্থানের মৃত্তিকার গঠন ও অবস্থার উপরেই ইহার গতির দ্রুততা ও মন্থরতা নির্ভর করে। কম্পনের তীব্রতা যদি খুব বেশী হয় তবে তাহার গতিও দ্রুততর হইয়া উঠে। ভূমিকম্পের কম্পনের গতি ঘণ্টায় ৩০,০০০ মাইল পর্যন্ত উঠিতে দেখা গিয়াছে। যেখানে ভূমিকম্পের উদ্ভব সেইখানে ইহার গতি সর্বাপেক্ষা দ্রুত। ক্রমে কম্পন যত দূরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, গতিও ততই কমিতে থাকে। ভূমিকম্পের স্থিতিকালের সম্বন্ধেও কোনো নিশ্চয়তা নাই। কোথাও বা দুই চার সেকেণ্ডেই তাহা শেষ হয়, আবার কোথাও বা তাহা দুই চার দিন ধরিয়াও চলিতে থাকে। কেলেব্রিয়ার ভূমিকম্প চার বৎসর ধরিয়া চলিয়াছিল।

ভূমিকম্পের তীব্রতার উপরেই নির্ভর করে তাহার কম্পনের বিস্তার। হাজার মাইল দূরেও কম্পনের ঢেউ ছড়াইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, কম্পনের তরঙ্গ কখনো উপরে ও নীচে সোজাসুজিভাবে চলে, কখনো বা পাশাপাশিভাবে চলে, আবার কখনো বা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তির্যাক গতিতে চলে। ইহার কারণ স্পন্দনগুলি ভূগর্ভে নানা বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের দিক পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে লৌহ আছে। অনেকে মনে করেন, ভূগর্ভের কম্পন এই লৌহের সংস্পর্শে আসিয়া বক্রগতি ধারণ করে। অনেক সময় আবার কোনো কোনো স্পন্দন ভূপৃষ্ঠের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়া আবার ভিতরের দিকে ফিরিয়া আসে।

১লা মাঘের ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা উত্তর বিহার ও নেপালের ভিতরকার স্থানগুলিতেই বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভূমিকম্পের কারণ যে কি তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। অনেকে মনে করেন, ভূগর্ভে খানিকটা জায়গা ধ্বসিয়া যাওয়ার ফলেই এই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার মনে করিতেছেন যে, হিমালয় এবং বিহারের ভিতরে কোনো স্থানে ভূগর্ভে আগ্নেয়গিরি সুপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। সেই আগ্নেয়গিরির ঘুম হয়তো ভাঙ্গিতেছে এবং তাহারই ফলে সৃষ্টি হইয়াছে এত বড় একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপারের এবং ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হওয়াও অসম্ভব নহে। এই অঞ্চলে সত্য সত্যই হয়ত আগ্নেয়গিরি আছে। কিন্তু এ ভূমিকম্প যে তাহারই ফল, সেরূপ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আবার কেহ কেহ ইহার অন্য কারণও নির্দেশ করেন।

এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ভূমিকম্প হইয়াছে, বহু প্রাচীন পুঁথি-পত্র ঘাঁটিয়া রবার্ট ম্যালেট তাহার একটা তালিকা গড়িয়া তুলিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক জগতও সে তালিকাকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই তালিকা হইতে প্রমাণ করা যায় যে, ভূমিকম্পের কারণ যাহাই হোক, পৃথিবীতে ভূমিকম্পের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। মিঃ জন মিল্‌নে, ডি-এস্‌-সি, এফ-আর-এস্‌, এ সম্বন্ধে যে তালিকা দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—

শতাব্দী	সংখ্যা	শতাব্দী	সংখ্যা
প্রথম	১৫	একাদশ	৫৩
দ্বিতীয়	১১	দ্বাদশ	৮৪
তৃতীয়	১৮	ত্রয়োদশ	১১৫
চতুর্থ	১৪	চতুর্দ্দশ	১৩৭
পঞ্চম	১৫	পঞ্চদশ	১৭৪
ষষ্ঠ	১৩	ষোড়শ	২৫৩
সপ্তম	১৭	সপ্তদশ	৩৭৮
অষ্টম	৩৫	অষ্টাদশ	৬৪০
নবম	৫৯	উনবিংশতি	২১১৯
দশম	৩২		

এই তালিকাটি 'British Association for the Advancement of Science'-এর তত্ত্বাবধানে করা হইয়াছিল এবং ইহাতে কেবল সেই সব ভূমিকম্পকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে যাহাতে লোকের জীবন ও ধন-সম্পদ ধ্বংস হইয়াছিল। চীনে ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে খুব একটা বড় ভূমিকম্প হয়। তাহার পর হইতে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৮৩৭ বৎসরে খুব বড় ধরণের যে সব ভূমিকম্প হইয়াছে তাহার সংখ্যা ২৩টি। কিন্তু ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মাত্র ৫৮ বৎসরেই এই ধরণের ভূমিকম্পের সংখ্যা ৩০টি। সুতরাং ভূমিকম্প এবং তাহার ফলে নগর ও নাগরিকদের ধ্বংসের সংখ্যা যে ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এটা বিজ্ঞানের যুগ। তাই বিজ্ঞান চেষ্টা করিতেছে, কি করিয়া এই ধ্বংসকে রোধ করা যায়। বিপদ যদি আকস্মিক হয়, তবে তাহাকে রোধ করা সব চেয়ে কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্যই বিজ্ঞান আজ চেষ্টা করিতেছে, সেইরূপ কোনো যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য যাহার সাহায্যে ভূমিকম্পের সংবাদটা আগেই পাওয়া যাইতে পারে। গ্রহ-নক্ষত্রের সমাবেশ দেখিয়া আমাদের জ্যোতির্বিদেরা যে সব গণনা করেন, কখনো কখনো তাহা ঠিক হয়—এবারেও তাহা ঠিক হইয়াছিল। কিন্তু তাহা অনেক সময়েই 'কাকতালীয়' রকমের ব্যাপার। তাহার উপরে নির্ভর করা যায় না। তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন—গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে ভূমিকম্পের বিশেষ কোনো সম্পর্কও নাই। কিন্তু বিজ্ঞানও এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য এখন পর্য্যন্ত লাভ করে নাই। মৃত্তিকার ভিতরে দুইশত মাইল নীচের খবর যদি কোনো যন্ত্রের সাহায্যে জানা কখনো সম্ভব হয়, তবেই মানুষ ভূমিকম্প সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। অবশ্য জাপানে আর একদিক দিয়া সমস্যাটা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে। সেখানকার ইঞ্জিনিয়াররা ঘর-বাড়ী প্রভৃতি এমনভাবে নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, যাহাতে ভূমিকম্পে তাহাদের কোনো ক্ষতি করিতে না পারে। যে সব স্থানে হামেসাই ভূমিকম্প হয়, সে সব স্থানের পক্ষে এ ব্যবস্থার যে যথেষ্ট প্রয়োজন আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু অপ্রত্যাশিত স্থানেও ভূমিকম্পের পরিমাণ তো কম নয়। সে সব স্থানে প্রকৃতির এই নির্দ্দয় পীড়ন মানুষকে নিতান্ত নিরুপায়ের মতোই সহ্য করিতে হয়। তবে বিজ্ঞানের উপর বিশ্বাস হারাইবারও কোনো কারণ নাই। বিজ্ঞান যখন চেষ্টা করিতেছে, তখন একদিন হয়তো তাহার দ্বারা এ সমস্যারও সমাধান হইয়া যাইবে—অন্ততঃ এ ধরণের একটা আশা রাখাও ভালো। এত বড় অসহায় অবস্থায় তাহাতেও খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

ছোট গল্প ও প্রভাতকুমার

শ্রীঅবনীনাথ রায়

প্রভাতকুমারের মৃত্যুতে বাংলা-সাহিত্যের কতটা ক্ষতি হয়েচে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তার বিচার সম্ভব নয়। তাঁর অভাবে বাংলা কথা-সাহিত্যের কতখানি স্থান অপূর্ণ থেকে গেল, তা' বুঝতে হলে কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়। সুতরাং আমার ধারণা, বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে প্রভাতকুমারের সাহিত্যিক দান সম্বন্ধে পুরোপুরি বিচার হবে না।

প্রবন্ধের গোড়ায় এ-কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, প্রভাতকুমার বাংলা-সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখক। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাগ্‌দেবীর সেবা করে গেছেন। তিনি যা' লিখে গেছেন তার সংখ্যা নেহাত তুচ্ছ নয়—ছোট গল্পে এবং উপন্যাসে সবশুদ্ধ তাঁর ৬৩ খানি বই। পাঁচ ভাগে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এবং তাঁর লেখা যে জনপ্রিয় হয়েচে তার প্রমাণ তাঁর অনেকগুলি বই-এর একাধিক সংস্করণ বেরুতে পেরেচে।

প্রভাতকুমার সম্বন্ধে একটি কথা সর্বাগ্রে আমাদের মনে রাখা দরকার—সেটি হচ্চে এই যে, তিনি যে সময় ছোট গল্প লিখতে সুরু করেছিলেন, সে সময় এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের অপর কোন ধুরন্ধর লেখক তাঁর পথপ্রদর্শক ছিলেন না। স্বর্ণকুমারী দেবী, প্রমথ চৌধুরী, জলধর সেন—এঁরাও সে সময়ে গল্প লিখেছিলেন কিন্তু সে গল্পের সংখ্যা বেশি নয়। শুনতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমতঃ 'ইন্দিরা' ছোট গল্পের আকারেই লেখেন, পরে ওটিকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করেন। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রভাতকুমার ছোট গল্প রচনা করবার সময় এক রবীন্দ্র-সাহিত্য ব্যতীত অপর কোন আদর্শের সাহায্য বেশি পরিমাণে লাভ করতে পারেন নি, অর্থাৎ তাঁর গল্পের উপকরণ তাঁর নিজের মন থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যোগাতে হয়েচে।

প্রত্যেক সাহিত্যিকারের সৃষ্টি সম্বন্ধেই অবশ্য এ কথা খাটে যে, সে সৃষ্টি অপর সৃষ্টি হতে নিরপেক্ষ হবে। কিন্তু তবু এটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করতে পারা যায় যে, পূর্ব্বতন মনস্বীদের রচনাসম্ভার অনুগামীদের পক্ষে সম্পদ বলেই গণ্য হয় এবং সৃষ্টি-রহস্যের দুর্গম পথকে অপেক্ষাকৃত সুগম ক'রে তোলে। সে যাই হোক, তবুও অল্প দিনের মধ্যেই প্রভাতকুমার ছোট গল্প লেখায় নিজস্ব পথ বেছে নিলেন এবং তাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন।

ছোট গল্পের ভিতর দিয়ে যে অত্যন্ত উঁচু ধরণের রস-সৃষ্টি করতে পারা যায়, এ বিষয়ে আজ কারুর মনে কোন সন্দেহ নেই। সত্যি কথা বলতে কি, সভ্যতার আদি যুগ থেকে মানুষের মনে গল্প-শ্রবণ-পিপাসু এক চির-কিশোর বিরাজ করচে। এ কিশোর স্থান, কাল এবং পাত্রের বাধা এড়িয়ে গল্প শুনতে চায়। সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মানুষ কথা বলতে শেখার পর প্রথমে মুখে মুখে গীতি-কবিতা রচনা করতো, তার পরই গল্প বলতে সুরু করেছিল। তখনো ভাষার সৃষ্টি হয় নি। তাই অনেক আগেকার (১৪০০ খৃঃ পূঃ) মিশর দেশের গল্প শুনে আমরা আশ্চর্য্য হই নে। চীন দেশেও অনাদি কাল থেকে গল্প বলার রীতি চলে আসচে। বাইবেলের যুগে ইহুদী মেষপালকের এবং যোদ্ধাদের মনে ছাপ দেওয়ার জন্যে যে কত গল্প রচিত হয়েচে, যাঁরা Old Testament, The Apocrypha, The New Testament এবং The Talmud পড়েচেন তাঁরা বলতে পারবেন। হোমারের সময়ের গ্রীকেরা এবং সিজারের সময়ের রোমকগণ গল্পের নামে পাগল হ'য়ে উঠতেন, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সেখানকার গল্পও কম দিনের পুরানো নয়। রামায়ণ এবং মহাভারত মহা-

কাব্যে অবশ্য ছোট গল্পের উপকরণের অপ্রতুলতা নেই। কিন্তু তার চেয়েও ছোট গল্পের রত্ন-ভাণ্ডার হচ্চে বৌদ্ধ জাতক, পঞ্চতন্ত্র এবং সোমদেবের কথা-সরিৎ-সাগর। শেষোক্ত গ্রন্থখানি খৃষ্ট-মৃত্যুর ১০৭০ বছর পরে রচিত।

উপরে যে সমস্ত কেতাবের নাম করলুম তার ভিতর যে গল্প দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলি রচনা করার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্য হয় নীতি-প্রচার, না হয় ধর্ম্মের কোন একটা মত প্রচার, নতুবা যিনি গল্প শোনাচ্চেন তাঁর জাতির গুণকীর্ত্তন বা এই রকম একটা কিছু। বাইবেলের parable-গুলি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে পৌছে গল্প-সাহিত্য আর্টের একটি স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করলে। তখন কথা-সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক না হয়ে মানুষের হাসি-কান্নার ইতিহাস নিয়ে রচিত হ'তে লাগলো। বিশ্ব-সাহিত্যের বড় বড় গল্পলেখকগণই উনবিংশ শতাব্দীর লোক। উদাহরণস্বরূপ ডিকেন্‌স, হার্ডি, পল্ হেস্ (Paul evse), কেলার (Gottfried Keller), বালজাক (Honore de Balzac), মোঁপাশা (Guy de Maupassant), দা'মুনৎসিয়ো (Gabriele D' Annunzio), দেলেদ্দা (Grazia Deledda), টলষ্টয় (Leo Tolstoy), শেকভ (Anton Chekhov), এলেন পো, (Edgar Allan Poe), জেমস্ (Henry James) প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতেও ছোট গল্পের রচনা-পদ্ধতি নিয়ে একটা বিশেষ মত ছিল—সে হচ্ছে এই যে, ছোট গল্পের আকার দৈর্ঘ্যে এতটা হবে, তার বিষয়-বস্তু একটিমাত্র ঘটনা বা গল্প হবে, তার মধ্যে একটা অর্থগত ঐক্য বা unity থাকবে ইত্যাদি, অর্থাৎ গল্প-লেখক নিজের লেখার মধ্যে নিজেকে অবাধে ছেড়ে দিতে পারবেন না, তাঁর লেখা কতকগুলি *a priori* principles মেনে চলবে। বলা বাহুল্য, এ কৃত্রিম নীতি সমস্ত সৃষ্টির কাজেই বাধা দেয় এবং এ নীতি আজ পরিত্যক্তও হয়েচে। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস ক্লার্ক সাহেব (Barrett H. Clark) ছোট গল্প সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সে সংজ্ঞা উনবিংশ-শতাব্দীর প্রতি-নিধি-মনের পরিচায়ক ছাড়া আর কিছুই নয়। সে সংজ্ঞা হচ্চে এই —"A short story is a tale which holdeth children from play and old men from chimney corner." (Preface to the great short stories of the world. p. vii). একে যদি ছোট গল্পের সংজ্ঞা বলে গ্রাহ্য করা যায় তবে প্রভাত-কুমারের অধিকাংশ গল্পই যে এই হিসাবে সার্থক হয়েচে, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

ছোট গল্প সম্বন্ধে সব দেশেই মতের একটু আধটু বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায়—সুতরাং আমাদের দেশেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কোন কারণ নেই কেন না রস বিচারের কোন সর্ব্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড বা absolute standard আবিষ্কৃত হয় নি। পাঠক তত-খানিই রস উপলব্ধি করতে পারেন যতখানি তিনি ধারণ করতে সক্ষম অথবা জীবনের বহুমুখী ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যতখানি অনুভূতি তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আছে সেই অনুপাতে। মানুষের ভাগ্য-বিধাতা জীবনের রহস্যকে সকল মানুষের সামনে একই প্রণালীতে উদ্ঘাটিত করেন না—অতএব সকল মানুষের অভিজ্ঞতা এক নয়। সুতরাং এ বিষয়ে মতদ্বৈধ অনিবার্য্য। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রবীন্দ্র-নাথের সুপ্রসিদ্ধ 'একরাত্রি' গল্পটি ধরা যাক। বহু পাঠকের মতে গল্পটি সর্ব্বাংশে অনবদ্য কিন্তু এমন সমালোচকও আছেন, যাঁরা বলেন, গল্পটি বাস্তব জীবনের সত্য থেকে বিচ্যুত, অতএব ও-গল্পে রসের উদ্বোধন হয় নি। কথাটা আরো পরিষ্কার করে বলা দরকার। এই শ্রেণীর সমালোচকেরা বলেন যে, পায়ের তলায় উত্তাল জলস্রোত রেখে যে দু'টি নর-নারী একটি দ্বীপের উপর এসে আশ্রয় নিলে, তারা পরস্পরের পূর্ব্ব-পরিচিত হয়েও যে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করলে না, এ শুধু অস্বাভাবিক নয়, সম্পূর্ণ অবাস্তব।

জীবনের বস্তুতন্ত্রের উপর এর ভিত্তি নয়। কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব। মানুষ কোন্ অবস্থায় কি কাজ করবে, তার মেজাজ সম্বন্ধে এমন সুনিশ্চিত নির্দ্দেশ তার অন্তর্য্যামীও দিতে পারেন কি না সন্দেহ। তবে মোটামুটি এইটুকু বলা যেতে পারে যে, বস্তুতান্ত্রিকতাই রসসৃষ্টির একমাত্র উপকরণ নয়। বস্তুর রাজ্য পেরিয়ে যে কল্পনার রাজ্য—যার আভাস মানুষ কেবলমাত্র সঙ্কেতে, ইঙ্গিতে পায়—তার স্থানও কথা-সাহিত্যে আছে। Mystery tales তার প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পে কবি বস্তু থেকে অ-বস্তুতে উত্তীর্ণ হ'তে পেরেচেন বলেই গল্পটির সমাদর।

কিন্তু প্রভাতকুমারের গল্প সম্বন্ধে এমন তীক্ষ্ণ মতদ্বৈধ নেই বলেই আমার বিশ্বাস। তিনি যা' লিখেচেন তা' হাস্য-রসের উজ্জ্বল ধারায় ঝলমল করচে—মানুষকে তা' অনাবিল আনন্দরসে অভিষিক্ত করে। তাঁর গল্প পড়তে সত্যিই ছেলেরা খেলা ফেলে ছুটে আসে এবং বুড়োরা শীতের সময় রোদ পোয়ানোর চাইতেও তাকে আরামের বলে মনে করে। তাঁর ভাষায় কোন আস্ফালন নেই, সাদাসিদে কথায় মনের ভাব প্রকাশ করেচেন। জীবনের যে অংশ তিনি চিত্রিত করতে চেয়েচেন তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড়—তাই কোথাও অসঙ্গতি ধরা পড়ে না। সবটাই সুসমঞ্জস রসে টলটল করচে।

কিন্তু এ কথা বললে ভুল করা হবে যে, প্রভাতকুমার কেবলমাত্র আমুদে গল্পই লিখেচেন, তাঁর গল্প পাঠককে হাসিয়ে আমোদ দেয় মাত্র। তাঁর অনেক গল্পে করুণ রসেরও অবতারণা আছে। কি রকম ক'রে যেন আমার মনে হয় যে, pathos-ই হচ্ছে ছোট গল্পের প্রাণ। গল্পকে চিরঞ্জীবী করে রাখার ঐ হচ্ছে সনাতন পদ্ধতি। তার কারণ করুণ রস মানুষের অন্তরের যে প্রদেশ পর্য্যন্ত পৌছায় অন্য রস ততদূর প্রবেশ করতে পারে না। ও একেবারে মানুষের চিত্তবৃত্তির মূল ভিত্তিতে গিয়ে পৌছে সবলে আলোড়ন জাগায়—মানুষের চেতনাকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে ধরে। করুণ রসের আবেদন সর্ব্বজাতির, সর্ব্বকালের মানুষের কাছে।

আর এই আবেদন সত্য বলেই আমরা এ ধরণের গল্পকে সহজে ভুলতে পারি নে। চারু সমুদ্রের এপার থেকেই যে তার ঠাকুরপো অমলকে 'অমল' 'অমল' বলে ডেকেছিল, সে আজকের কথা নয়, তারপর জীবনের পট-ভূমিকায় অনেক নাট্য অভিনীত হ'ল, কিন্তু সে ডাক যেন আকাশে কান পাতলে আজও শুনতে পাওয়া যায়। দামিনী গুহার মধ্যে রাতের অন্ধকারে শচীশের পা ধ'রে বড় কান্নাটাই কেঁদেছিল—তাতে শচীশের চোখের জল কতটা পড়েচে জানা নেই কিন্তু অজস্র মানুষের চোখের জল পড়েচে, আজও পড়ে। রাজলক্ষ্মী ট্রেণের ডেলি প্যাসেঞ্জারের মেয়ের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে একখানা শাড়ি মেয়েটির উদ্দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল, এ ঘটনা অসাধারণ নয় কিন্তু তবু কি করে ঘটনাটি অতি-অসাধারণত্বের তুচ্ছতা এড়িয়ে মনের মধ্যে অক্ষয় হ'য়ে আছে। সকল দিক থেকে উৎপীড়িত, অবমানিত, অবহেলিত বাংলা দেশের নিরক্ষর চাষী নিরতিশয় দৈন্যের অপরিমেয় জ্বালায় তার সাধের পুত্রপালিত পশু মহেশকে নিজের হাতে খুন করেছিল, এ খুনের জ্বালা বাড়বানলের শক্তি নিয়ে মানুষের বুকে অনির্ব্বাণ জ্বলচে। প্রভাতকুমারের 'আদরিণী' গল্পেও এ শক্তির পরিচয় পাই। আদরিণী জয়রাম মুখুজ্যের বড় আদরের হস্তিনী। বৃদ্ধ মোক্তারের সংসার যখন আয়ের অভাবে অচল হ'য়ে দাঁড়ালো, তার উপর পৌত্রীর বিবাহ তার সমস্ত ব্যয়ভার নিয়ে মাথার উপর উদ্যত হ'য়ে উঠলো, তখন নিতান্ত নিরুপায় হয়েই জয়রাম কন্যাসম হস্তিনীটির বিক্রয়ের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু আদরিণী মেলায় যাওয়ার পথেই মারা গেল। সেই মৃত-দেহের উপর প'ড়ে বৃদ্ধের কি আকুলি-বিকুলি কান্না! বলতে লাগলেন, 'অন্তর্যামী কি না, তাই বুঝতে পেরেছিল। তাই রাগ ক'রে

চলে গেল।' মনে হয় মূক প্রাণীটির জন্তে অস্তাচল-গামী স্থবিরের ঐ যে আকুল আর্তনাদ ওর কাছে মুখর মানুষের ভয়াবহ শোকও যেন ম্লান হ'য়ে গেছে।

উপরের উদাহরণ থেকে আর একটা কথাও প্রমাণ হবে। সে হচ্ছে এই যে, গল্পের রূপই হচ্চে সাহিত্যের প্রাণবস্তু। মৌলিক চিন্তা, গভীর গবেষণাও অপটু শিল্পীর হাতে প'ড়ে জবড়-জং হ'য়ে ওঠে। আবার তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও শক্তিমান লেখকের হাতে অসূর্য্যম্পশ্যরূপার রূপ পায়। এই রূপায়নের মধ্যেই শিল্পীর শক্তি নিহিত। প্রভাতকুমার এই শিল্পীদেরই একজন, একথা আজ স্বীকার করি।

চুম্বন

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটি চুম্বনে গলে'
চলে যেতে চাই তব অন্তরের তলে।
তাই আমি নিত্য তব চুম্বন-পিয়াসী।
একদা চুম্বনে এক এ প্রাণ তিয়াসী
ঝরে যাবে তব বুকে। সেই আরাধনা,
তারি লাগি করি আমি চুম্বন-সাধনা।
জান না কি প্রিয়া, আঁধারের গভীর চুম্বনে
তারারা ঝরিয়া পড়ে আকাশের অন্তর-প্রাঙ্গণে ?
তারা ? সে তো আঁধারের চুম্বনের দাগ
আকাশের বুকে—পরিতৃপ্ত প্রণয়ের রাগ।

কত চুমা দিয়ে যায় বায়ু প্রেমভরে
পর্ব্বতের কঠিন অধরে।
সব ব্যর্থ যায়। একদা সে বসন্তের দিনে, একটি চুম্বনে
নিজেরে গলায়ে বায়ু ঢেলে দেয় পাহাড়ের মনে।
তাই তো ঝরণা ঝরে পড়ে। ঝরণার জল,
সে তো গিরি-বুকে গলে-যাওয়া বাতাসের চুম্বন-তরল।
প্রিয়া, হৃদয়-গলানো সেই সফল চুম্বন
তোমার অধরে দেবো, সেই মোর অন্তর-স্বপন ॥

মার্কিণের সংরক্ষণ-নীতি

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এ, বি-এস্

দুনিয়াব্যাপী যে আর্থিক দুর্য্যোগ দেখা দিয়াছে, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মার্কিণের সংরক্ষণ-নীতিকেই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং একথাও বলিতে শুনা যাইতেছে যে, মার্কিণ যদি এই সংরক্ষণ-নীতি বর্জ্জন করিয়া দেশের মধ্যে অবাধ-ভাবে বৈদেশিক পণ্য প্রবেশ করিতে দেয়, তাহা হইলে ইউরোপীয় দুঃস্থ, অধমর্ণ দেশগুলিরই যে শুধু মঙ্গল হইবে তাহাই নহে, মার্কিণের আর্থিক উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী। মার্কিণ সে কথা কাণে না তুলিয়া শুল্ক-প্রাচীর উচ্চতর করিয়াই চলিয়াছে। বিদেশজাত পণ্যের আমদানী রোধ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা চলিলেও কয়েকটী পণ্য তথাচ মার্কিণ-দেশে প্রবেশ করিতেছে। মার্কিণের চিনি যোগায় কিউবা। আমেরিকায় চিনি উৎপাদন করা চলে না যে এরূপ নহে, কিন্তু উৎপাদন-খরচা যাহা পড়িবে তাহা অপেক্ষা সস্তায় কিউবা হইতে চিনি আসে; সুতরাং চিনি উৎপাদনের পরিবর্ত্তে আমদানীই মার্কিণের পক্ষে আর্থিক হিসাবে অধিক লাভজনক। কিন্তু সংরক্ষণ-নীতি, বৈদেশিক পণ্যের আমদানীর পথে বাধা দিবার নেশা, মার্কিণদিগকে এমনি পাইয়া বসিয়াছে যে, স্বাদেশিকতার নিষ্ঠায় এমনও বলিতে শোনা যাইতেছে যে, এই সকল দ্রব্যের উপরও চড়া হারে শুল্ক বসাইয়া দেশীয় চিনি প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া তোলা হউক।

সংরক্ষণ-নীতির গোড়ার কথা ভয় ও হিংসা। ভয়, পাছে অন্য কোন দেশ চোখে ধূলা দিয়া লাভ করিয়া বসে। অপর কোন দেশ লাভ করিতেছে জানিলে স্বতঃই হিংসা হয়। ইংলণ্ড আমেরিকার সংরক্ষণ-নীতির নিন্দা করিয়া অবাধ বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে বলিতেছে; সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, ইংলণ্ড নিজের লাভের পথ পরিষ্কার করিতে চাহিতেছে; এবং ইংলণ্ডের যখন লাভ হইবে, তখন নিশ্চয়ই আমেরিকার কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইবে—প্রকারান্তরে এই হইতেছে সংরক্ষণবাদীদের চিন্তার ধারা। বাজারে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সংহত করিয়া আত্মকর্তৃত্ব বজায় রাখাই সংরক্ষণ-নীতি। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ অ্যাডাম স্মিথের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ইংলণ্ডেরও ছিল এই নীতি। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ওয়েলথ অফ্ নেশন্‌স্' (জাতীয় ধনদৌলৎ) কেতাবে এই নীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া আর্থিক স্বাধীনতা, অবাধ বাণিজ্য ও অবাধ প্রতি-যোগিতার জয় ঘোষণা করেন। তাঁহার মতবাদ অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ড ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে অবাধ বাণিজ্য-নীতি অবলম্বন করে ও কালক্রমে আর্থিক ক্ষেত্রে ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে মহাপরাক্রমশালী জাতি হইয়া উঠে। অবাধ বাণিজ্য-নীতির এই সুফল চোখের সম্মুখে দেখিয়াও সকলদেশের চৈতন্য হয় নাই। পক্ষান্তরে দেশ-বিদেশে শুল্কপ্রাচীর অধিকতর অবলম্বিত হইতেছে। আরও মজার কথা এই যে, সেই অ্যাডাম স্মিথের ইংলণ্ডেই সংরক্ষণ-নীতির বংশীধ্বনি শোনা যাইতেছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, প্রথমতঃ নিতান্ত আবশ্যক বোধে কোন কোন পণ্য বিষয়ে সংরক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য করা হয়, এবং পরে সেই অনুসৃত পণের স্বপক্ষে নানা যুক্তি-তর্ক লাগাইয়া সেই নীতিকে কায়েমী করা হয়। আমেরিকার ইতিহাস পাঠ করিলেও এই কথা প্রমাণিত হয়।

১৮০৭ খৃষ্টাব্দে 'জেফার্সন্ এম্বার্গো অ্যাক্ট' পাশ হয়, তাহার পর ১৮০৯ খৃঃ 'নন্ ইণ্টারকোর্স অ্যাক্ট' পাশ হয় এবং ১৮১২ খৃঃ ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। ইহার ফলে ১৮০৭ খৃঃ হইতে ১৮১৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ইউরোপ হইতে মাল আমদানী প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং এতদিন যে সকল জিনিষ আমদানী করিয়া অভাব মিটাইতে হইতেছিল, সেই সকল পণ্য এই কয় বৎসরের আমদানী বন্ধের জন্য দেশের মধ্যেই ক্রমশঃ

উৎপাদন হইতে আরম্ভ করিল। যুদ্ধ যখন থামিয়া গেল ও শান্তি স্থাপিত হইল, তখন বিদেশী প্রতিযোগিতার আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া এই নবীন উৎপাদকেরা সংরক্ষণ-শুল্ক দাবী করিয়া বসিল—এই সকল নবীন উৎপাদকদিগের মধ্যে অনেকের টাকা-খাটানো যুক্তি-যুক্ত হয় নাই, ধনবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'আন্-ইকনমিক্যাল ইনভেষ্টমেণ্ট' বলা চলে। যাহারা দেশের বিপদ কালে দেশকে সাহায্য করিয়াছে, তাহাদের কিঞ্চিৎ সাহায্য করা দেশনায়কগণ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে করিলেন—চিরস্থায়ী সংরক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের কোন কালেই ছিল না; স্বল্পকাল সাহায্য করিয়া শিল্পগুলিকে শক্তিশালী করিবার মতলবই করিয়াছিলেন। তাই ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে শতকরা ২৫% হারে শুল্ক তুলাজাত দ্রব্যের উপর ধার্য্য করা হয় এবং বলা হয় যে, তিন বৎসর পরে তাহা কমান হইবে এবং ক্রমশঃ কমাইয়া একেবারেই উঠাইয়া দেওয়া হইবে। কাঁধের উপর বোঝা চাপিলে তাহা নামান দায়; শুল্কের বোঝা কমানোর কথা থাকিলেও উৎপাদকদের চীৎকারে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেও তাহা বলবৎ রহিল। এইভাবেই সংরক্ষণ-নীতি কায়েমী হইয়াছে। ইহার পরও কত যুদ্ধ হইয়াছে, সরকারকে কতবার এই সব শিল্পের মুখ চাহিতে হইয়াছে; এই ভাবে শুল্কের জের টানিতে টানিতে তাহা জাতির মনে প্রাণে বসিয়া গিয়াছে।

মার্কিণদেশে সংরক্ষণ-নীতি যখন কায়েমী হইয়া গেল, তখন এই নীতির ব্যাখ্যার জন্য নূতন নূতন তত্ত্ব বিবৃত হইতে লাগিল। আমরা জানি যে, চারা গাছকে প্রথম প্রথম খুব যত্ন না করিলে তাহা মরিয়া যায়; টীকাকারগণও প্রথম প্রথম বলিতেন যে, শিল্পের শৈশব অবস্থায় বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা না করিলে, তাহা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। তাই, উৎপাদন-খরচা যদি কিঞ্চিৎ অধিকও লাগে তথাপি যতদিন শিল্প প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন শুল্কের প্রাচীর তুলিয়া শত্রুর হাত হইতে তাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহাকেই ইংরেজী পরিভাষায় 'প্রটেক্টীং ইন্‌ফ্যাণ্ট্ ইণ্ডাষ্ট্রী' বলে। কিন্তু ১০০ বৎসর ধরিয়াও যদি কোন শিল্প শিশুই থাকিয়া যায় তবে আর এ যুক্তি খাটে না; তাই এ যুক্তি মার্কিণ প্রদেশে আজ কাল কম শোনা যায়। আমাদের দেশে অবশ্য কথায় কথায় এই যুক্তিরই অবতারণা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যে, কোন-নূতন শিল্পে সহজে কেহ টাকা ঢালিতে চাহেন না; তাই প্রথম প্রথম সরকার শুল্কনীতি অবলম্বন করিয়া শিল্পকে উৎসাহ দেন। চিনি-শিল্পে ১৫ বৎসরের জন্য একটা মোটা হারে আমদানী-শুল্ক বসান হইয়াছে বলিয়া বাংলাদেশে অনেক পুঁজিপাতিরই নজর আজ এদিকে পড়িয়াছে। মার্কিণ সংরক্ষণবাদীর ইহাও ছিল এক যুক্তি। কিন্তু কর্পোরেশন ট্রাষ্ট প্রভৃতি বড় বড় সঙ্ঘের হাতে মোটা টাকা উদ্বৃত্ত জমিয়া উঠায় এ যুক্তিও নিরর্থক হইয়াছে।

কোন পণ্যের উপর আমদানী-শুল্ক একবার ধার্য্য করিলে, তাহার শৈশব অবস্থা আর কাটিতে চাহে না; সুতরাং ভবিষ্যতে পণ্যের দর সস্তা হইবে, এই আশায় দীর্ঘকাল ধরিয়া অনর্থক চড়া দর দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই; কেন না, এই সুদূর ভবিষ্যৎ যে কবে বর্ত্তমান হইয়া উঠিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। সুতরাং এই সংরক্ষণ-নীতি সমর্থন করিতে হইলে, দেখা দরকার বর্ত্তমানে কি কি সুবিধা হইতেছে। মার্কিণ সংরক্ষণবাদীরা উত্তর দিবেন যে, সংরক্ষণের ফলে মজুরদের 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড অফ্ লিভিং' বা জীবনযাত্রার মাত্রা বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, কেন না, সংরক্ষণের ফলে উৎপাদকেরা অধিকতর মুনাফা করিতে পারেন বলিয়া মজুরীর হারও বাড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কি তিনি তাহা দেন, না, দিতে পারেন? শিল্পধুরন্ধরগণ যত অল্প হারে পারেন মজুর নিয়োগ করেন; যেহেতু তিনি যদি চড়া মজুরী দিয়া মজুর রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিযোগী শিল্প-কর্ত্তা, সস্তা মজুরীর সুযোগ লইয়া অপেক্ষাকৃত সস্তায় মাল বেচিয়া তাঁহাকে কাবু করিবেন। অপরাপর শিল্প-

কর্ত্তাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অবাধ-মজুর-বাজার হইতে (ওপন্ লেবার মার্কেট) মজুর নিয়োগ করিতে না পারিলে পণ্যের উৎপাদন ত্যাগ করিতে হইবে; সুতরাং অধিক মজুরী দেওয়ার কল্পনা, কল্পনাই! অবশ্য আমেরিকায় মজুরীর হার অন্য দেশের তুলনায় কিছু চড়া। কিন্তু তাহার কারণ অন্য। আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদ এত অধিক যে, তাহা কাজে লাগাইতে হইলে যে পরিমাণ শ্রমিকের দরকার তাহার অভাব; অধিকন্তু কর্ষণোপযোগী জমি সস্তায় প্রচুর পাওয়া যায়; সুতরাং কল-কারখানায় মজুরী করিবার জন্য লোককে প্রলোভিত করিতে হইলে, মজুরী কিছু চড়াই দিতে হয়। এই চড়া মজুরীর জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু তাহারই ফলে শ্রম বাঁচাইবার নতুন নতুন পন্থাও উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং তাই অল্প শ্রমে স্তূপাকারে পণ্য উৎপাদিত হইতে পারিতেছে। মজুরীর হার যেখানে সস্তা সেখানে এত অধিক লোক মজুরীর উপর নির্ভর করে যে, 'অটোমেটিক মেসিন' বসাইয়া মজুরের পরিমাণ কমাইয়া ফেলা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে, ফলে মজুরীর হার খুব সস্তাই থাকিয়া যায় ও উৎপাদনের পরিমাণও অল্প হয়। বিলাতের তুলা-শিল্পের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে।

সংরক্ষণ-নীতির ফলে জরাজীর্ণ বা 'অবসলিট্' জিনিস টিকিয়া যায়। অভাববোধ না করিলে আবিষ্কার হয় না; সংরক্ষণ-নীতির ফলে এই অভাববোধই জাগে না। 'পাড্লিং' ও 'রোলিং' পন্থা উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে লৌহ-উৎপাদন খরচা ইংরাজের বহু পরিমাণে কমিয়া যায়; ইংলণ্ডের প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষার মানসে আমেরিকা 'রোল্ড্ আয়রণে'র উপর ১৫০% শুল্ক চাপাইয়া দেয়; এই সংরক্ষণ-নীতির ফলেই আমেরিকায় গতানুগতিক প্রাচীন জরাজীর্ণ লৌহ-উৎপাদন প্রণালী টিকিয়া গিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত আমরা অর্থ-শাস্ত্রের তরফ হইতেই সংরক্ষণ-নীতির আলোচনা করিলাম। এই নীতিটা আরও একটু পরিষ্কাররূপে অন্যান্য দিক হইতেও আলোচনা করিয়া দেখা যাক। অবাধ বাণিজ্য-নীতি অবলম্বনের ফলে কয়েকটা বিশেষ পণ্যে বিশেষ উৎকর্ষ বা 'স্পেশিয়ালাইজেশন' দেখা দেয় এবং তাহার ফলে অনেক বিষয়ে বিদেশের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। যতদিন দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ না হয় ততদিন কাটে ভাল, কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই স্পেশিয়ালাইজেশনের অসুবিধা ধরা পড়ে। যুদ্ধের পূর্ব্বে 'লেন্স্ লেন্স্' ভাল ভাল ফিল্ড-গ্লাসের জন্য ব্যবহৃত হইত, জার্ম্মাণীর এটা একরকম একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডকে এই জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাই ইংলণ্ডকে এই পণ্যটা উৎপাদন করিতে নামিতে হইয়াছে এবং সংরক্ষণ-শুল্কের দ্বারা তাহাকে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, কোন দেশ যদি শুধু কারখানা শিল্পেই মনঃসংযোগ করে ও অপর কোন দেশ শুধু খাদ্যদ্রব্যই উৎপাদন করিতে থাকে তাহা হইলে কারখানা শিল্পে নিযুক্ত দেশটাকে প্রাণধারণের জন্য অপরটার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। জার্ম্মাণী ও ইংলণ্ড এই ভুল করিয়াছিল বলিয়াই যুদ্ধের সময় এত মুস্কিলে পড়িয়াছিল। অবাধ বাণিজ্য-নীতি অবলম্বন করিলে এই এক-দেশভাব আরো বাড়িয়া যায়। ইংলণ্ডই ইহার প্রকৃত উদাহরণ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, দেশ-রক্ষা বা ন্যাশানাল ডিফেন্সের জন্য সংরক্ষণ আবশ্যক হইয়া পড়ে।

শেষ পর্য্যন্ত দেশের উপকার হইবে এই আশাতেই সংরক্ষণ-নীতি সমর্থিত হয়; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সংরক্ষণের ফলে মাত্র বিশেষ কয়েকজন লোকই সুখভোগ করে, লাভবান হয়। অধিকন্তু শুল্কের হার ক্রমশঃ চড়িতেই থাকে। ধনবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত টাউসিগ দেখাইয়াছেন যে, অনেক ক্ষেত্রে আমেরিকার শুল্কের হার ১৫০% পর্য্যন্ত বৃদ্ধি

পাইয়াছে। আর একটী দোষ এই যে, সংরক্ষণ-নীতি একবার পাইয়া বসিলে মনে হয় যে, তাহা ধন্বন্তরির মত কাজ করিবে; দেশের মধ্যে কোন একটা সঙ্কট উপস্থিত হইলেই লোকে মনে করিয়া বসে যে, একমাত্র সংরক্ষণ-শুল্কই নিদানের কাজ করিবে। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে আর্থিক বিপর্যায় উপস্থিত হইলে মার্কিণেরা তখন এই সংরক্ষণ-শুল্কের আড়ালেই আশ্রয় খুঁজিয়াছিল।

আন্তর্জাতিক লেন-দেন ব্যাপারেও সংরক্ষণের জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। গত মহাযুদ্ধের পর আমেরিকা ইউরোপীয় দেশগুলির উত্তমর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; এই খাতকদেশগুলি একমাত্র পণ্য চালান দিয়াই মার্কিণের ঋণ শোধ দিতে পারে; কিন্তু সু-উচ্চ শুল্কপ্রাচীর তুলিয়া দিয়া আমেরিকা এই ঋণ শোধে বাধা দিতেছে; তাই অধমর্ণদেশগুলি ঋণের কিস্তি দেওয়াও একরূপ বন্ধ করিয়াছে, ফলে এই বিশাল ঋণ মার্কিণের পক্ষে রেহাই দেওয়ার সামিলই হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং শেষ পর্যান্ত হয়ত রেহাইও দিতে হইবে। যে যুগ চলিয়াছে তাহাতে অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্যিক যোগ ছিন্ন করা বা 'ইকনমিক্ আইসোলেশন' চলে না, অথচ শুল্কপ্রাচীর উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর করার অর্থই 'ইকনমিক্ আইসোলেশন'।

মার্কিণের প্রাকৃতিক সম্পদ অগাধ বলিয়া অনেক মার্কিণের মুখে একথা শুনা যাইতেছে যে, সে দেশের পক্ষে 'ইকনমিক্ আইসোলেশন' ক্ষতিকর নহে; তাঁহাদের যুক্তি এই যে, যে-সব দেশকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় তাহারাই অন্যদেশের সহিত বাণিজ্যিক-সম্বন্ধ চ্যুত করিতে পারে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে আমরা এমন সব নূতন পণ্যের সন্ধান পাইয়াছি যাহা একান্ত আবশ্যকীয় নহে অথচ অভ্যাস ও ব্যবহারের ফলে না হইলেও চলে না···সেই সব কৃত্রিম ব্যবহার্য্য সামগ্রী বা 'আর্টিফিস্যাল নেসেসিটী' সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা যায় না। জীবনধারণের জন্য যেগুলি না হইলেই নয় অর্থাৎ 'অ্যাবসলিউট্ নেসেসিটীস্' তাহা হয়ত সবই মার্কিণদেশে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু অনেক 'আর্টিফিস্যাল নেসেসিটী'র জন্য বিদেশের মুখ চাহিতেই হইবে। যেমন রবার; মার্কিণ দেশে রবার উৎপন্ন হয় না, অথচ আধুনিক সভ্যতার ইহা একটি অঙ্গবিশেষ। সুতরাং মার্কিণ যদি আত্মনির্ভরশীল হইতে চায়, 'ইকনমিক আইসোলেশন' চায়, তাহা হইলে রবার উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, যখন মার্কিণ রবার পূরামাত্রায় উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হয়ত এমন একটা নূতন কোন পণ্যের উদ্ভব হইবে যাহা না-হইলেও চলে না অথচ উৎপাদনও হয় না। অতএব বোঝা যাইতেছে, 'ইকনমিক আইসোলেশন'-নীতি অচল।

সুতরাং এই দীর্ঘ আলোচনা হইতে আমরা এটুকু বেশ বুঝিতেছি যে, যে সংরক্ষণ-নীতি এতকাল প্রবলভাবে মার্কিণ চালাইয়া আসিয়াছে তাহা ত্যাগ না করিলে তাহার মঙ্গল নাই।
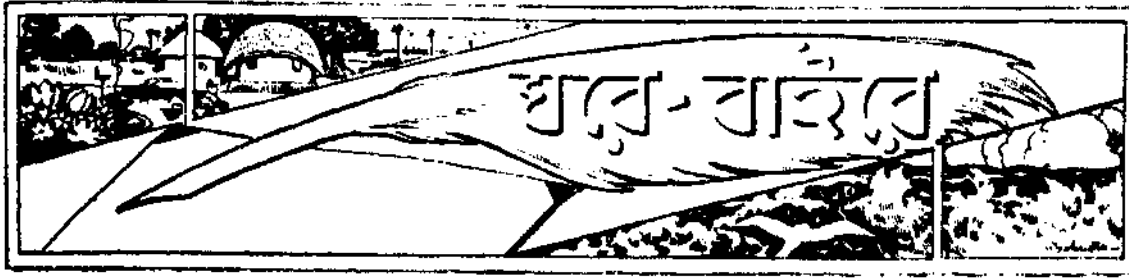
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি বাঙলা ভাষায় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, যার নাম হচ্ছে 'চিন্তয়সি'। এ পুস্তকে তিনি আমাদের চিন্তা করতে আদেশ করেছেন, অথবা উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীমান ধূর্জ্জটিপ্রসাদ হচ্ছেন একজন অধ্যাপক। কোন অধ্যাপকের পক্ষে এ আদেশ দেওয়ার অন্তরে একটু নূতনত্ব আছে। কারণ বর্ত্তমান অধ্যাপনার আর্টই হচ্ছে, কাউকে চিন্তা না করিয়ে সকলকে পণ্ডিত করে' তোলা। অবশ্য ধূর্জ্জটিপ্রসাদ এ উপদেশ শিক্ষার্থীদের দেননি, দিয়েছেন শিক্ষিত সমাজকে। যে সব বিষয়ে তিনি আমাদের চিন্তা করতে অনুরোধ করেছেন, যথা—বিজ্ঞান ও মানবধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম ও সাহিত্য, দেশের কথা ও প্রগতি ইত্যাদি—সে সব বিষয়ে আমরা যত বলি তত ভাবি কি না, সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে। তবে সকলেই যদি সকল বিষয়েই চিন্তা করতে আরম্ভ করেন, তাহলে তার ফল কি ফলবে বলুন ত'! সকলের চিন্তাই যে এক মার্কার হবেনা, তা বলাই বাহুল্য। সকলে একমত হবার সহজ উপায় হচ্ছে, কারো চিন্তা না করা। চিন্তা না করে' বাঁধা পথ ধরে' চলে যাওয়াই হচ্ছে মানবের সমাজধর্ম্ম। আজকের দিনে যে নানা জাতি Dictator-এর এত ভক্ত হয়ে পড়েছে, তার একটি কারণ Dictator সমাজকে চিন্তার দায় হতে অব্যাহতি দেন। Lenin কিম্বা Mussolini কি কাউকে হুকুম করেছেন—'চিন্তয়সি'? করেননি বলেই যাঁরা তাঁদের দ্বারা শাসিত নন, তাঁরাই শুধু Bolshevism ও Fascism নিয়ে এত চিন্তায় আকুল হচ্ছেন। কিন্তু স্বাধীন চিন্তা বলে' কোন জিনিষ রাশিয়াতেও নেই, ইটালিতেও নেই।

২

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ আমাদের যে সব বিষয়ে চিন্তা করতে বলেছেন, সে-জাতীয় চিন্তাকে সুচিন্তা বলা যেতে পারে। আমরা সুচিন্তা করি আর না করি, দুশ্চিন্তার দায় আমরা কেউই এড়াতে পারিনে। পৃথিবীতে কখনো কখনো এমন এক একটি ভীষণ ও বিরাট কাণ্ড ঘটে, যা আমাদের সকলকেই চিন্তা করতে বাধ্য করে। গত ১৫ই জানুয়ারীতে বেহারে যে ভূমিকম্প ঘটেছে, ও যার ধাক্কায় বাঙলাও মিনিট পাঁচেক ধরে কম্পান্বিত হয়েছে, সে বিষয়ে আজ কেউ উদাসীন নন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমাদের সকলেরই মন অল্পবিস্তর নাড়া খেয়েছে। আর বাঙালী সমাজ যে আমাদের প্রতিবেশীদের বিপদে কাতর হয়েছে, এর জন্য আমাদের জাতের উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেছে। বাঙালী যে বেহারের বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, এর থেকে প্রমাণ হয় যে, আমরা কেবলমাত্র নিজের সুখ-দুঃখের কথাই ভাবিনে, আর আমাদের মন জাতীয় স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ নয়। এ অবস্থায় আমরা অপরকে সাহায্য করতে পারি, এক অর্থ দিয়ে আর এক সামর্থ্য দিয়ে। আমরা বাঙালীরা এই ইকনমিক দুর্গতির দিনে দেশশুদ্ধ লোক নিতান্ত অর্থকষ্টে পড়েছি।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাঁরা এরকম ব্যাপারে অনায়াসে একশ' টাকা দান করতেন, আজকের দিনে তাঁদের পক্ষে পাঁচ টাকা দান করাও কঠিন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙলা বেহারের সাহায্যার্থে যে টাকা ঘর থেকে বার করে দিয়েছে, তা' যথার্থই বিস্ময়কর। অবশ্য রিলীফের জন্য চাঁদা একমাত্র বাঙালী হিন্দুই দেয়নি, বর্ণধর্ম্ম নির্ব্বিচারে বাঙলার সকল শ্রেণীর লোকই দিয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ঘোর বিপদের দিনে আমরা সকলেই এক মন, এক প্রাণ—অপরের বিপদ সম্বন্ধে আমরা কেউই উদাসীন নই।

৩

বেহারে এই ভূমিকম্পের দরুণ কত লোকের যে মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে দেখতে পাই লোকের মতভেদ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, অসংখ্য সুস্থ সবল লোক পৃথিবীর এক ধাক্কায় ভবলীলা সংবরণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের জন্য অবশ্য আর কিছু করবার নেই,—এক তাদের মৃতদেহের সৎকার করা ছাড়া।

কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, হতদের চাইতে আহতদের সংখ্যা ঢের বেশী। যারা জীবন ও মরণের মধ্যে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় রয়েছে, তাদের অনেকের জীবনরক্ষা করা, অন্ততঃ কষ্টের লাঘব করা মানুষের সাধ্যের অতীত নয়। চিকিৎসা-শাস্ত্র হচ্ছে প্রকৃতির মারাত্মক শক্তির সঙ্গে লড়াই করবার শাস্ত্র।

চিকিৎসা-বিদ্যাতে আমরা কেউই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নে, কারণ এ বিদ্যা মানুষকে অমর করতে পারেনি এবং কস্মিনকালে পারবেও না। অথচ এ বিদ্যার উপর আমাদের সকলেরই আস্থা আছে। কারণ চিকিৎসকেরা যে মানুষের দৈহিক যন্ত্রণার উপশম করতে পারে আর তার মৃত্যুর তারিখ পিছিয়ে দিতে পারে,—এ ত' সর্ব্বলোকবিদিত প্রত্যক্ষ সত্য।

এখন সুখের বিষয় এই যে, বাঙালী জাতির ভিতর অনেকে এ বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। বেহারবাসীদের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে বাঙালী ডাক্তাররা যে দলে দলে তাদের স্বেচ্ছাসেবক হয়েছেন, এটা যে বাঙালী জাতির সহৃদয়তা ও গৌরবের কথা, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না,—এমন কি তাঁরাও নয়, যাঁরা Bengalee Babu-দের বাক্যবাগীশ বলে' অবজ্ঞা করেন।

৪

অবশ্য এ কথাটা যেন আমরা ভুলে না যাই যে, হত-আহতদের সংখ্যা যদি হাজার হাজার হয়, তাহলেও জীবিতদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। এই লক্ষ লক্ষ লোকও বিষম বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এ বিপদ থেকে তাদের আশু উদ্ধার করা মানুষের সাধ্যের অতীত। প্রকৃতি পাঁচ মিনিটে যা ধ্বংস করে, মানুষে হাজার বৎসরেও তা গড়ে' তুলতে পারেনা। মানুষের হাতে এমন কোনও আলাদিনের প্রদীপ নেই, যার প্রসাদে সে এক নিমেষে উত্তর বেহারকে পূর্ব্ব বেহার করে তুলতে পারে। এই ভূমিকম্পের ফলে ও প্রদেশের যে ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে, তা সকলকেই মেনে নিতে হবে, ও তার উপরেই নূতন বেহার গড়ে' তুলতে হবে। বেহার যাদের মাতৃভূমি, প্রধানতঃ তাদেরই নিজ চেষ্টায় নূতন বেহার গড়ে তুলতে হবে। অন্য প্রদেশের লোকে এ বিষয়ে তাদের বিশেষ সাহায্য করতে পারবে না। এখন যা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব, সে হচ্ছে তাদের সাময়িক অন্ন-বস্ত্রের অভাব কতকটা দূর করা। এবং সে চেষ্টা সমগ্র ভারতবর্ষের লোক আজ করতে ব্রতী হয়েছে। অবশ্য সে দেশের রাস্তা-ঘাট ঘর-বাড়ী সবই আবার re-build করতে হবে। আমাদের মত লোকের পক্ষে, ঘরে বসে relief committee-কে কোনও পরামর্শ দেওয়া অনধিকার চর্চ্চা করা। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এক্ষেত্রে আমাদের যা করা উচিত, তা বেহারীদের ভিক্ষা দেওয়া নয়, তাদের এই re-building-এর কাজে নিয়োজিত করা, এবং আমাদের সাধ্যমত তাদের অর্থ-সাহায্য করা। অর্থাৎ relief works-এ তাদের ব্রতী করা, এবং তার জন্য তাদের খাটুনির দাম দেওয়া।

বেহারের লোকও আমাদের মতই মানুষ; আর মানুষ ভিখারীর জাত নয়, হতেও চায় না।

৫

এই ভূমিকম্পের প্রচণ্ড ধাক্কায় শুধু পৃথিবী নামক মৃৎপিণ্ড নয়, আমাদের মনোজগতও যে ঈষৎ বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে, তার প্রমাণও লোকের কথাবার্তায় নিত্য পাওয়া যায়। আমার জনৈক বন্ধু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোন University সহর থেকে আমাকে যে চিঠি লিখেছেন, তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। উক্ত সহরে ভূমিকম্পের কোনও উপদ্রব হয়নি, তথাপি সেখানকার বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকদের অর্থাৎ প্রফেসারদের মনের চেহারা যে একটু বদলে গিয়েছে, উক্ত চিঠিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বন্ধুবর লিখেছেন যে, "একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন—ভূমিকম্পের ফলে লোক কত ধার্ম্মিক হয়েছে?—অবশ্য হিন্দুধর্ম্মে, অর্থাৎ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাসী। ভগবৎ বিশ্বাসের কথা আসছে না, সেটা বরং কমেছে, কারণ তিনি বড় নিষ্ঠুর প্রতিপন্ন হয়েছেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আস্থার সঙ্গে সঙ্গে লোকে দার্শনিক হয়ে উঠেছে—মানুষ কত ছোট, সহরে সভ্যতা কত ক্ষণভঙ্গুর ও প্রকৃতি দেবী ভীষণ খামখেয়ালী। কিন্তু ধর্ম্মকে দোষ দিই কেন? লোকে, সকলে নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আস্থাবান লোকে—অধ্যাপকের দল—কি রকম বৈজ্ঞানিক হয়ে পড়েছে দেখছেন? লোকে ভূতত্ত্ব, আবহাওয়ার তত্ত্ব, Geo-Physics কেমন শিখে ফেলেছে দেখছেন?"

৬

এ চিঠি অবশ্য কতকটা বিদ্রূপ করে লেখা। কিন্তু মানুষ যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায় যে, পায়ের নীচের মাটি অটল নয়, তখন মনের দেশে idea-র ভিত্তিই যে অটল, এ বিশ্বাস একটু টলমলায়মান হবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি। কতকগুলি তথাকথিত বিজ্ঞান-সম্মত idea যে আমাদের মনোরাজ্যের অটল ভিত্তি, এই হচ্ছে আমাদের নব-শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাস। কালিদাসের ভাষায় বলতে গেলে—বৈজ্ঞানিক সত্য সব 'স্থিরভক্তি-যোগসুলভ।' কোনও কোনও বিষয়ে আমাদের স্থিরভক্তি অস্থির হয়ে পড়েছে, আমার মতে সেইটেই আমাদের মনের লাভ। অর্থাৎ আমরা বিজ্ঞানের axiom-গুলোকে postulate হিসেবে দেখতে শিখব। বন্ধুবর নিশ্চয়ই জানেন যে, আজকের বিজ্ঞানের সঙ্গে গতকল্যের বিজ্ঞানের ঝগড়াই এই নিয়ে যে, গত-কল্যের axiom গুলোর দিকে আজকে আমাদের পিঠ ফেরাতে হয়েছে। যাক্, এসব বড় বড় পণ্ডিতমণ্ডলীর আলোচ্য বিষয়ে বেশি কিছু বলব না। তবে একটি কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, New Physics ব্যাপারটা মনের দেশে ভূমিকম্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

সে যাই হোক্, বন্ধুবরের বিশ্বাস যে, হিন্দুধর্ম্ম ও astrology—দুই একই জিনিষ। তিনি কি একথা জানেন না যে, ইউরোপে Renaissance-এর মুখে যখন লোকে ধর্ম্মবিশ্বাস হারালে, সেই সময়েই তারা astrology-র অতিভক্ত হয়ে পড়ে? ভগবদ্ভক্তির স্থান তখন গ্রহ-নক্ষত্রভক্তি গিয়ে অধিকার করে। এ যুগটা আমাদের Renaissance-এর যুগ, অতএব সম্ভবতঃ ফলিত জ্যোতিষের ভক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সত্য কথা এই যে, ফলিত জ্যোতিষে কিম্বা ধর্ম্মে মানুষে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও করেনা, সম্পূর্ণ অবিশ্বাসও করেনা। তারপর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে ধর্ম্মের শিকড় আলগা হয়ে গেছে, অথচ বিজ্ঞান আজও শিকড় গাড়েনি। সুতরাং এই ভূমিকম্পের ধাক্কায় এ দুই বিশ্বাস যে পরস্পর ভেঙ্গে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

৭

আমার বন্ধুবর আরও লিখেছেন যে, "আমার মতে দেশের প্রকৃত লাভ হল এই ভূগোল সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধি। লোকে জানত না কোথায় মজঃফরপুর, কোথায় দারভাঙ্গা ইত্যাদি; কেবল জানত চাকর-দের বাড়ী ঐ সব দেশে—কেন না 'মেড়কির সাদি'

দিতে কিম্বা 'গওনা' করতে তারা ছুটি নিয়ে ঐ সব দেশে যেত ; আর সাত দিনের বদলে ৬'মাসে আসত।"

ভাল কথা। আর একটি দেশ ছিল, যা এই ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছে, যে দেশ থেকেও পাহাড়ী চাকররা আসে—অর্থাৎ নেপাল। সে দেশের Geography-ও কি আমরা জানি ?

তা'ছাড়া ভূমিকম্পের পূর্ব্বের উত্তর বেহারের Geography কি বাতিল হয়ে যায়নি ? ও প্রদেশের পুরোনো ম্যাপ থেকে কি আর ও-দেশের চেহারা বোঝা যাবে ? গভর্ণমেন্টের রিপোর্টে দেখলুম যে, ও-দেশে পূর্ব্বে যেখানে স্থল ছিল, এখন সেখানে জল ; পূর্ব্বে যেখানে মাটি ছিল, এখন সেখানে সুধু বালি। উত্তর বেহার এখন যথার্থই বিদেশ হয়ে গিয়েছে ; ভবিষ্যতে এ দেশের আবার নূতন ম্যাপ আঁকতে হবে। আমরা ও-দেশের Geography শিখি আর নাই শিখি, এ জ্ঞান আমাদের হবে যে, Geography কোন দেশেই চিরস্থায়ী নয়। পৃথিবীর যে শুধু খোসা আছে তাই নয়, তার শাঁসও আছে ; আর শাঁসের গতিবিধি খামখেয়ালী অর্থাৎ অজ্ঞাত। পৃথিবীর পেটের খবর আমরা জানিনে।

গত ভূমিকম্প যে অভূতপূর্ব্ব বিরাট, তার প্রমাণ এ ভূমিকম্পের epicentre মোতিহারি থেকে মুঙ্গের পর্য্যন্ত ১৩৫ মাইল লম্বা, উপরন্তু এর নাকি একটি দ্বিতীয় epicentre আছে, যা মাঝপথে বেঁকে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত গিয়েছে। Epicentre মানে সেই স্থান, যেখান থেকে ভূমিকম্প ফুটে ও ফেটে বেরোয়। পৃথিবীর শাঁস যখন তরল, তখন তার খোসা অটল থাকবে কি করে ? ডালিমের খোসার চাইতে পৃথিবীর খোসা বেশী টক নয়, ভিতরের ঠেলায় যখন-তখন ফেটে ওঠে।

৮

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কালি-ফোর্ণিয়াতে যে সর্ব্বনেশে ভূমিকম্প হয়েছিল, তার সঙ্গে এ ভূমিকম্পের তুলনা হতে পারে।

এ যুগের একজন অগ্রগণ্য বৈজ্ঞানিক দার্শনিক William James প্রকৃতির এই ধ্বংস-লীলার সময় সে দেশে উপস্থিত ছিলেন, আর সে সময় তাঁর মনের দেশে কিরকম বিপ্লব ঘটে, তার একটি চমৎকার বর্ণনা লিখে রেখে গিয়েছেন। Bergson-এর মতে সে বর্ণনা একটা অপূর্ব্ব psychological দলিল।

James-এর মনে এই নৈসর্গিক উৎপাতের দরুণ কোনরূপ ভয় হয়নি, বরং তাঁর মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাকে exhilaration বলা যায়। কিন্তু তাঁর মনে ভূমিকম্প-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তন্মুহূর্ত্তে একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এবং তার পরিবর্ত্তে এই ভূমিকম্প একটি ব্যক্তির আকার ধারণ করে দেখা দিয়েছিল, যেন সে ব্যক্তি ইচ্ছা করেই তাঁদের উপর এই অত্যাচার করছে। Bergson বলেন যে, শিক্ষিত লোকমাত্রেরই অন্তরে এক একটি আদিম মানব আছে, আর এইরূপ দুর্ঘটনার তাড়ায় সভ্য মানবের অন্তর্নিহিত সেই আদিম মানব গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। আর তখন সে প্রাকৃতিক ঘটনাকেও personify করে। Mythology-র জন্মও এই কারণে ঘটে। সুতরাং আমার বন্ধুবরের অধ্যাপক বন্ধুরা যে এই ভূমি-কম্পের ধাক্কায় ফলিত জ্যোতিষে আস্থাবান হবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ? Astrology-তে তখনই বিশ্বাস করা চলে, যখন আমরা গ্রহ-নক্ষত্রদের personify করি, আমাদের মতই তাদের অন্তরে ইচ্ছা, অভিপ্রায় প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির আরোপ করি, এবং আকাশ-দেশের এই সব জড়পিণ্ডের সঙ্গে মনে মনে শত্রুতা ও মিত্রতার সম্বন্ধ স্থাপন করি।

৯

প্রচণ্ড ভূমিকম্প আমার কাছে অপরিচিত নয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের উত্তরবঙ্গের বিরাট ভূমিকম্পের সময় আমি নাটোরে উপস্থিত ছিলাম। তখন উক্ত সহরে বাঙলার বহু গণ্যমান্য লোক একত্র হয়েছিলেন, কেননা

সেখানে তখন বাঙলার প্রাদেশিক পলিটিকাল Conference-এর বৈঠক বসেছিল। সেদিন বেলা দুটো আড়াইটের সময় জনৈক ভদ্রলোক যখন মহা বক্তৃতা করছেন, এমন সময় হঠাৎ মাটির নীচে ট্রেণ চলবার আওয়াজ পাওয়া গেল। ৺গুরুপ্রসাদ সেন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ব্যাপার কি? আমি উত্তর করলুম যে, ভূমিকম্প আসছে। তার পরেই পৃথিবী গা-মোড়ামুড়ি দিতে আরম্ভ করলে। তারপর বাইরে চেয়ে দেখি গরু-বাছুর সব পাগলের মত ছুটোছুটি করছে, ও আকাশ লাল হয়ে গেছে। বুঝলুম যে বাড়ী-ঘরদোর সব ভেঙ্গে পড়েছে, আর সুরকি উড়ে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। আমার সমবয়সী একটি আত্মীয় আমাকে বললেন, নাটোরের শিশু মহারাজকুমারকে বৈঠকখানায় শুইয়ে রেখে এসেছে, চলুন দেখিগে তার কি অবস্থা হল। এর পরেই আমরা দু'জনে ছুটলুম। প্যাণ্ডাল থেকে নাটোরের রাজপ্রাসাদ বোধহয় আধ মাইল পথ। এই পথটি বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আসতে হল। প্রথমতঃ দেখলুম ধরণী বহু স্থানে দ্বিধা হয়ে গেছেন, সে সব ফাঁক আমাদের লাফিয়ে উত্তীর্ণ হতে হল। তারপর দেখি রাজবাড়ীর প্রকাণ্ড দ্বিতল প্রবেশদ্বার ভূমিসাৎ হয়েছে আর পিলখানা ভেঙ্গে পড়ায় একটি মহাকায় দাঁতনা হাতী দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে। পশু-পক্ষীরা ভূতত্ত্ব জানেনা বলেই এ অবস্থায় ভয়ে তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। কোনরকম করে, হাতীটির পাশ কাটিয়ে, ইটের স্তূপের উপর দিয়ে একরকম হামাগুড়ি দিয়ে এসে দেখি, মহারাজের বৈঠকখানা দাঁড়িয়ে আছে, আর মহারাজকুমারের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া ছাড়া আর কোনও বিপদ ঘটেনি।

অবশ্য সেবারেও মাটি ফেটেছিল, কিন্তু সে ফাটলের ভিতর দিয়ে বালিও ওঠেনি, জলও ওঠেনি, গন্ধকের ধোঁয়াও নির্গত হয়নি। বর্ত্তমান ভূমিকম্পের তুলনায় সে ভূমিকম্প একরকম দোল বললেও হয়; যদিও সে ভূমিকম্পের ফলে উত্তরবঙ্গের জিওগ্রাফি অনেকটা বদলে গেছে।

এখন আমার সেদিনকার মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। এ ব্যাপারে ভয় আমার বিন্দুমাত্রও হয়নি, বরং অপরের ভয়ের পরিচয় পেয়ে আমার একটু হাসি পেয়েছিল। এর কারণ বোধহয় তখন আমার পূর্ণযৌবন, আর তখনও আমি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিনি। দ্বিতীয়তঃ, William James-এর মত কোনরূপ দার্শনিক মনোভাব আমার মনে উদয় হয়নি। মনে আছে, আমার বন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি আমাকে এসে বললেন —

"যোগস্থ কুরু কর্ম্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।"

যদিচ আমিও যোগস্থ হইনি, আমার বন্ধুও হননি, তবুও আমি নানা ছোট-খাটো কাজ নিয়েই সেদিন ব্যস্ত ছিলুম। এর কারণ বোধহয় প্রকৃতির এই কাঁপুনিটে একটা ক্ষণিক ব্যাপার—এই বিশ্বাস আমার মনে তখন বদ্ধমূল ছিল। আমার বিশ্বাস, আমাদের অধিকাংশ লোকের মনোভাবও এই।

কিন্তু আজকের দিনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, বেহারের এই দুর্ঘটনার ফলে বাঙলারও অনেক ইকনমিক পরিবর্ত্তন ঘটবে। এর মানে বহু বেহারী বাঙলায় আসতে বাধ্য হবে, দেশে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে। ফলে জনগণের মধ্যেও একটা ওলট-পালট হবে। এই ভূমিকম্পের জের ভবিষ্যতে আমাদের অনেকদিন টানতে হবে। মনে রাখবেন দ্বারভাঙ্গা আসলে দ্বারবঙ্গ। ঐ দুয়োর দিয়েই এদেশে আর্য্য সভ্যতা এসেছে, অনার্য্য ভূমিকম্পও এসেছে।

['উদয়নে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন]

মঞ্জুলা — শ্রীরামেন্দু দত্ত প্রণীত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৭১-বি-২, চক্রবেড় রোড, নর্থ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—দেড় টাকা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানে পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত রামেন্দু দত্ত পরিচিত কবি ও গল্প-লেখকদের মধ্যে একজন। তাঁহার 'দুলালী', 'রসায়ন', 'মঞ্জরী' প্রভৃতি অনেকেই পড়িয়াছেন। কি গদ্যে, কি পদ্যে সর্ব্বত্রই তাঁহার সরল মনের ভাবের অভিব্যক্তি পাওয়া যায়। তাহা কোথাও হেঁয়ালী ছন্দে পাঠকের নিকট জটিল হইয়া উঠে না ; বরং এই সরল মাধুরীই পাঠককে মুগ্ধ করে। এই গুণটা কতকটা ইংরেজ স্ত্রী-কবি Mrs. Hemans-এর লেখার মত,—স্বচ্ছন্দ, লীলায়িত ও মর্ম্মস্পর্শী।

কবিতাগুলি কেমন মর্ম্মস্পর্শী ও করুণ তাহার একটি নমুনা দিতেছি ; 'বসন্ত-বিদায়' শীর্ষক কবিতাটি হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল —

"বিদায় দিয়েছি তোমারে প্রেয়সী চৈত্র রাতের শেষে
রজনী শেষের চন্দ্রেরি মত পাণ্ডুর হাসি হেসে !
....
আহা সে সে-দিন ! সেই একদিন ! সকল দিনের সেরা !
সারা বসন্ত দিয়ে সেই এক চৈত্রের রাত্তি ঘেরা !
বিদায় দিয়েছি কেঁদে কেঁদে, সই তুমিও গিয়াছ কাঁদি'
রাঙা আঁখি দু'টি মুছিতে মুছিতে শিথিল কবরী বাঁধি !
তারই সাথে সাথে ডুবে গেছে শশী,
জ্যো'স্না গিয়াছে চ'লে—
শেষ বসন্ত-রাতি চলিয়াছে বোশেখী প্রভাত কোলে।"

লেখার সর্ব্বত্রই এইরূপ একটি কবিত্বপূর্ণ করুণ হৃদয়ের আবেগ আছে। অপর কোনো কবির সুরের সঙ্গে তাঁহার সুর মিশিয়া যায় নাই। এই বিপ্লবাত্মক যুগে, ভাঙ্গা-গড়ার সন্ধিস্থলে—কবি যুগোপযোগী ভাষার সৌষ্ঠব লইয়া মানস-রাজ্যের সেই সনাতন প্রেমগীতি গাহিয়াছেন, যাহাতে ভাঙ্গা-গড়ার কোন চিহ্ন নাই, যাহা কোকিল বা পাপিয়ার কণ্ঠের ন্যায় সর্ব্বকালের আদৃত ও যাহা ধূলি-মলিন মাটির পৃথিবী হইতে সর্ব্বদাই উর্দ্ধে শোনা যায়।

(ডক্টর) শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন (বি-এ, ডি-লিট্)

ডিকেণ্টার—শ্রীশুভ ঠাকুর প্রণীত—দাম ১৲ টাকা, প্রকাশক—পি, সি, সরকার এণ্ড কোং—২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানি কবিতার বই। বাহিরের সৌষ্ঠব মন আকৃষ্ট করে, ভিতরের সৌন্দর্য্যও আহত করে না। ছন্দের উপর লেখকের বেশ দখল আছে। শব্দ-চয়নেও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি বয়সে তরুণ, তাই তিনি লেখার ভিতর যথেষ্ট সাহসেরও পরিচয় দিয়েছেন। তবে অনেকের কাছে তাঁর সাহস দুঃসাহস ব'লেই মনে হ'বে। সংযমের অভাব যে বইখানার ভিতরে নেই তা জোর ক'রে বলা যায় না এবং সংযম যে সব লেখার পক্ষেই একটা বড় জিনিষ তাও অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই। কিন্তু তাই বলে রুচি-বাগীশের রুচি-বিকারও সংযম নয়। অস্কার ওয়াইল্ড্ অনেক

বাজে কথার ভিতরে একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন এবং সে কথাটি হচ্ছে এই—"There is no such thing as good book or bad book. Books are well-written and badly written. That's all." এ বইখানি যে সুলিখিত তা বিশেষ দ্বিধা না ক'রেও বলা যায়।

কবির সম্ভবতঃ এই প্রথম গ্রন্থ। নদীর জলের ধারার মত তাঁর লেখার ভিতরে গতি আছে এবং সেইটেই সব চেয়ে বড় জিনিষ ব'লে আমি মনে করি। বর্ষার প্লাবনে নদীর জলের সঙ্গে অনেক ধূলোমাটি এসে মেশে, তখন তা' পান করা খুব নিরাপদ নয়। কিন্তু বর্ষার তোড় যখন কমে যায়, এবং ধূলোমাটি থিতিয়ে জল নির্ম্মল হয় তখন সেই জলই হয় সব চেয়ে সুস্বাদু পানীয়। এই তরুণ কবির ভিতরেও উচ্ছ্বাসের আধিক্য আছে প্রচুর। কিন্তু উচ্ছ্বাস যখন স্বাভাবিক নিয়মেই ক'মে আস্‌বে তখন যে আমরা তাঁর কাছ থেকে ঢের ভালো ও খাঁটি জিনিষ পাবো, এই প্রথম গ্রন্থখানি থেকেই তার আভাস পাওয়া যায়।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

মাধুকরী — কবিতার বই। শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীশান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বেঙ্গল বুক সোসাইটি, ১৮৩ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—চার আনা।

পনেরটি কবিতা লইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। কবি তরুণ, সুতরাং তারুণ্যের প্রভাব কবিতাগুলির ভিতর বেশ আনা বিদ্যমান। অধিকাংশ কবিতাই নিছক প্রেম-মূলক।

ছন্দ, ভাব ও ভাষার দিক্ দিয়া কবিতাগুলি অসাধারণ না হইলেও উহাতে চিন্তাশীলতার ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়।

মূল্যের তুলনায় পুস্তকের ছাপা, কাগজ মোটের উপর ভালই বলিতে হয়।

শ্রীনিধিরাজ হালদার

ময়ূরপঙ্খী রাজকন্যা—শ্রীহেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ১৯৯ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীবসুদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—আট আনা।

শিশু-সাহিত্যে যাহারা নূতন ব্রতী হইয়াছেন, হেমদাবাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন। গল্প-লেখক হিসাবে নূতন হইলেও চিত্র-শিল্পী হিসাবে তাঁহার নাম আছে। এই বইখানিই তাঁহার প্রথম পুস্তক।

এই বইখানির মধ্যে চারিটি শিশু-পাঠ্য গল্প আছে এবং প্রথম গল্পটির নামানুসারে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। বালক-বালিকাদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার ও তাহাদের আনন্দ দিবার উপাদান এই গল্পগুলির মধ্যে আছে। প্রত্যেক গল্পের মধ্যে একাধিক এক-বর্ণ চিত্র আছে। তাহা ছাড়া দুইখানি আর্ট পেপারে ছাপা-চিত্রও বইখানির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। চিত্রগুলি আঁকিয়াছেন গ্রন্থকার স্বয়ং এবং শ্রীঅমর দাশ গুপ্ত, শ্রীসমর দে ও শ্রীযতীন সাহা প্রমুখ কয়েকজন পরিচিত শিল্পী।

প্রচ্ছদপট বেশ চমৎকার হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল, তবে মুদ্রাকর-প্রমাদ মাঝে-মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবিনয় দত্ত

সাময়িকী

১লা মাঘের ভূমিকম্প

১লা মাঘ বিহার হতে নেপাল পর্য্যন্ত ভূমিকম্পের ভিতর দিয়ে রুদ্রদেব যে তাণ্ডব নৃত্য করে গেছেন আজ ২৮-এ মাঘ—অর্থাৎ একমাস পরেও তার কথা মনে হতে বুক কেঁপে ওঠে। শোনা যায় যে, এর চেয়ে ঢের বড় ভূমিকম্পও না কি পৃথিবীতে হয়ে গেছে, এমন ভূমিকম্পও হ'য়েছে যাতে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ছ'লক্ষের কাছাকাছি উঠেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এত বড় ভূমিকম্প আর কখনও হয় নি। ক্ষতির পরিমাণ এখনও সঠিক জানা যায় নি। এসম্বন্ধে মতদ্বৈধেরও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে প্রত্যহ যে সব খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মৃত্যুর সংখ্যা যে পঁচিশ-ত্রিশ হাজারে এসে দাঁড়াবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করা কোন মতেই চলে না। ধন-সম্পদের ধ্বংসের মাত্রা হয়ত কোটি কোটি টাকাও ছাড়িয়ে উঠ্‌বে। কারণ মুঙ্গের, মজঃফরপুর, জামালপুর, দ্বারবঙ্গ, পুর্ণিয়া প্রভৃতি অনেকগুলি বড় সহর একেবারে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হয়েছে।

ভূমিকম্পের তীব্রতা যে কিরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, তা তখনই ধরা পড়ে যখন দেখা যায় যে, এত বড় একটা সর্ব্বনাশের খবরও জনসাধারণ ঘটনার পরে পরেই পায় নি। পেয়েছে ঘটনা ঘটার অন্ততঃ তিন চার দিন পরে। ধ্বংসের অবস্থা কতখানি ভীষণ হলে যে এ রকমের একটা ব্যাপার সম্ভবপর হয়, তা বোঝা কঠিন নয়। শুধু ঘর-বাড়ী নয়, পথ-ঘাটও এমন ভাবেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, সংবাদ পাঠাবার উপায়টি পর্য্যন্ত ছিল না। রেল লাইনে রেল চলতে পারে নি, হাঁটা-পথে মানুষ চলতে পারে নি, টেলিগ্রাফের লাইন নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে, এক মজঃফরপুর সহরেই নাকি প্রায় ৭,০০০ তারের খবর এসে পড়ে ছিল—বিলি হতে পারে নি। অনেক পরিবার একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে—মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী কেউ বেঁচে নেই। অনেক পরিবারে আবার হয়ত দু'একজন মাত্র বেঁচে আছেন। যে সব পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে তারা মরে বেঁচেছে, কিন্তু যে সব পরিবারে দু'একজন মাত্র বেঁচে আছে—যারা বেঁচে আছে তাদের দুঃখ, তাদের ব্যথা ত' অবর্ণনীয়! এই অবর্ণনীয় দুঃখ তাদেরও, যারা ভূমিকম্পের কাছে হাত, পা বা ঐ ধরণের কোন একটা অঙ্গ বলি দিয়েও বেঁচে রয়েছে।

ভূমিকম্পের তীব্রতার এই এক দিকের পরিচয়, অন্য দিকের পরিচয় বিধ্বস্ত স্থানগুলি। অনেক স্থানের চেহারা এমনভাবে বদ্‌লে গেছে যে, তাদের দেখে আর চিন্‌বারও উপায় নেই। ঘর-বাড়ী ধ্বসে গেছে, পুকুর হয়ত সেঁধিয়ে গেছে মাটির ভিতরে, যেখানে মাঠ ছিল সেখানে হয়ত গড়ে উঠেছে একটা প্রকাণ্ড গহ্বর।

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিলেতে মিঃ এণ্ড্রুজের কাছে যে তার করেছেন এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। কারণ তা থেকে এর ব্যাপকতার পরিচয় আরও ভালভাবে পাওয়া যাবে। তিনি লিখেছেন— "যে সব অঞ্চল ভূমিকম্পের ফলে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে তার পরিমাণ প্রায় ত্রিশ হাজার বর্গ মাইল * * * মুঙ্গের, মজঃফরপুর, দ্বারবঙ্গ, মতিহারী

প্রভৃতি বারটি সমৃদ্ধশালী সহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। অন্ততঃ তিন হাজার বর্গ মাইল পরিমিত কৃষি-জমি ভূগর্ভ হতে উৎক্ষিপ্ত বালুকায় মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। * * * ক্ষেতে যে সব শস্য ছিল তার গুরুতর অনিষ্ট ঘটেছে। বিধ্বস্ত অঞ্চলে পনেরটি চিনির কলের ভিতর দশটি একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে, বাকি পাঁচটিও কাজের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। * * * ছয় হাজার লোক মরেছে বলে সরকার অনুমান করেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা তার ঢের বেশী। অন্ততঃ বিশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়েছে। একমাত্র মুঙ্গের সহরেরই যারা মারা গেছে, তাদের সংখ্যা দশ হাজারের কম হবে না। এখনও ধ্বংস স্তূপের নীচে হাজার হাজার লোকের মৃতদেহ রয়েছে বলে মনে হয়।"

ভূমিকম্পের মার অকস্মাতের মার। সাবধান হবার উপায় নেই, নিতান্ত নিঃসহায়ের মত এর মারকে সহ্য করতে হয়। মরতে হয়, আত্মীয়-স্বজনকে হারাতে হয়, গৃহশূন্য হয়ে, সহায়-সম্পদ শূন্য হয়ে পথে এসে দাঁড়াতে হয়। এর দুঃখ এমনিই অপ্রত্যাশিত, এমনিই অনিবার্য্য!

ভূমিকম্পের পরের দুঃখ

ভূমিকম্প যে দুঃখ নিয়ে আসে তার জের তখন তখনই মেটে না—দীর্ঘ দিন ধরে মানুষকে তার জের টেনে চলতে হয়। সে দুঃখও এত মর্ম্মান্তিক যে, তা মনকে বিহ্বল করে ফেলে—অভিভূত করে ফেলে। এই দারুণ শীতেও মানুষের আশ্রয় নেই, তারা পথে প্রান্তরে আচ্ছাদনহীন অবস্থায় পড়ে আছে, প্রকাণ্ড দেশ বুভুক্ষু, তবু ক্ষুধার্ত্তের অন্ন-সংগ্রহের উপায় নাই। অসংখ্য আহত ও অঙ্গহীন লোক দুঃসহ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করছে—এমন লোক নেই যে তাদের শুশ্রূষা করবে, সেবা করবে। ভূমিকম্পের তোড়ে বহু পুকুর ও কূপ শুষ্ক বালুস্তরে পরিণত হয়েছে। সুতরাং পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠেও জন-সাধারণ পানের জন্য জলটুকুও পায় না। ধনী-দরিদ্রে ভেদ নেই, সকলের অবস্থাই প্রায় সমান। পরিবারের ভিতরে যে উপার্জ্জনক্ষম ছিল সে-ই হয়ত মারা গিয়েছে, ফলে সে পরিবারের যারা বেঁচে আছে, অনাহারে তারা প্রতি মুহূর্ত্তে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। সত্য সত্যই এমনি দুরবস্থা—এমনি অবর্ণনীয়

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত দ্বারবঙ্গের মহারাজার প্রাসাদ—পাটনা

দুঃখের সৃষ্টি হয়েছে বিহারে, নেপালে—এই ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত স্থানগুলিতে। তা' হলেও মুহ্যমান হয়ে এলিয়ে পড়বার সময় এ নয়। এখন প্রয়োজন এই সব আর্ত্তদের—এই সব বিপন্নদের পরিত্রাণের ব্যবস্থা করবার। যারা

পাটনার সাধারণ হাসপাতালের নার্সদিগের আবাসস্থলের ধ্বংসাবশেষ

আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে, শীতে, অনাহারে ও ব্যাধিতে যারা ক্লিষ্ট, তাদের দুঃখ দূর করার দিকে নজর দেওয়াই এখন আমাদের পক্ষে একমাত্র কর্ত্তব্য। আর সে জন্য প্রচুর অর্থ চাই, দরদী প্রাণ চাই, নিঃস্বার্থ কর্ম্ম-শক্তি চাই, সেবার জন্য উন্মুখ ও একাগ্র মন চাই।

আমরা বিহারের সহরগুলির খবরই প্রতিনিয়ত পাচ্ছি। কিন্তু পল্লীতে যে ভীষণ দুঃখের সৃষ্টি হয়েছে তার খবর তেমনভাবে পাচ্ছি নে। খবর না পেলেও দুঃখ পল্লীতেও সামান্য নয়। এ ব্যাপারে সহর এবং পল্লীর ভিতরে যাতে কোন রকম ভেদের রেখা দেখা না দেয় তার দিকেও তীব্র দৃষ্টি রাখতে হবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখে, কোথায় কে বিপন্ন তার খোঁজ করে, সেবাকে ব্রত হিসেবে নিয়ে কাজ না করলে ভূমিকম্প সারা দেশের বুকের উপরে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তার গ্লানি দূর করা কখনও সম্ভব হবে না।

অর্থের প্রয়োজন

টাকা দিয়ে এ ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব নয়। তবু বহু টাকার প্রয়োজন আছে। গৃহ ভেঙ্গে পড়ায় যারা নিরাশ্রয় হয়েছে তাদের মাথা গুঁজ্‌বার মত কোন একটা আশ্রয় গড়ে দেওয়ার জন্য টাকা আবশ্যক। যাদের দেহে বস্ত্র নেই, উদরে অন্ন নেই, যারা ব্যাধিতে পীড়িত, যারা ভূমিকম্পের অনুগ্রহে অঙ্গহীন, তাদের সকলকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যও অর্থের আবশ্যক। সুতরাং কোটি কোটি টাকারই প্রয়োজন এসে পড়েছে। এদিক দিয়ে সাড়া যে একেবারে পাওয়া যায় নি, তাও নয়। অনেকগুলি আর্ত্ত-ত্রাণ-ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে এই কয় দিনের ভিতরেই। ভারত-সম্রাট সাহায্য করেছেন, বড়লাট খুলেছেন তাঁর আর্ত্ত-ত্রাণ-সমিতি। বাংলা দেশেও কয়েকটি সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হয়েছে। কিন্তু তবু এ সাহায্য যথেষ্ট নয়। এত বেশী জায়গা নিয়ে, এত ভয়ঙ্কর ভাবে এই বিপদ দেখা দিয়েছে যে, এ পর্য্যন্ত যে টাকা উঠেছে প্রয়োজনের তুলনায় তা একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হবে। যাঁদের অর্থ আছে এর চেয়ে বড় কাজে সে অর্থ লাগারও সুযোগ আর তাঁরা পাবেন না। সুতরাং তাঁদের দান করবার এইটেই সব চেয়ে বড় অবকাশ। এই দানের প্রসঙ্গে দ্বারবঙ্গের মহারাজা বাহাদুরের দান উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর নিজের ক্ষতির পরিমাণ ৫।৬ কোটি টাকাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। তথাপি তিনি দুর্গতদের দুঃখ দূরের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডারে লক্ষ টাকা দান করেছেন এবং প্রজার ঘর-বাড়ী তৈরী করার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। গণ্ডালের মহারাজার নামও করা দরকার এই সঙ্গেই। কারণ এই সাহায্য-ভাণ্ডারে তিনিও লক্ষ টাকা দান করেছেন। যাঁদের সামর্থ্য আছে, শক্তি আছে,—এঁদের এই উদাহরণ তাঁদের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। যাঁদের শক্তি খুব বেশী নেই তাঁদেরও যথাসাধ্য দান করা উচিত। তবে এই সম্পর্কে আর একটা দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সঙ্গত বলে আমরা মনে করি। এইরূপে সংগৃহীত অর্থের প্রত্যেকটি পয়সা যাতে ঠিক ভাবে ব্যয় হয় সে সম্বন্ধে সেবা-প্রতিষ্ঠানগুলির সর্ব্বদা সচেতন হ'য়ে থাকা দরকার। অনেক সময় দানের কড়ি, কাজে যতটা না হোক্ আড়ম্বরেই ব্যয় হয়ে যায়। এখানেও যে সে আশঙ্কা একেবারে নেই তা নয়। আর সেই জন্যই গোড়া থেকে এ সম্বন্ধে সাবধান হয়ে চলার প্রয়োজনও আছে।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য

এই দুর্দ্দিনে দুর্গতের সাহায্য দেশের লোক অবশ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই করবেন, কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী সাহায্য করবার শক্তি গবর্ণমেণ্টের হাতেই আছে। এই বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি গড়ে তোল্‌বার জন্য যে ভাবে মুক্ত হস্তে দান করা দরকার তা কেবল সরকারই করতে পারেন। কারণ যে ভাবে সাহায্য করলে গঠনের কাজ সব চেয়ে বেশী কার্য্যকরী হতে পারে সেভাবে সাহায্য করা এক গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই সম্ভব। এখনকার মত খাদ্য যোগান এবং আসন্ন দুর্দ্দশার হাত হতে মুক্তি দেওয়ার কাজ সাময়িক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা চলতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যে-বিধ্বস্ত সহর ও পল্লীগুলিকে আবার নূতন করে গড়ে তুল্‌তে হবে তা ত' কোনও বাইরের প্রতিষ্ঠান দিয়ে চল্‌তে পারে না। সেজন্য সাহায্য প্রয়োজন গবর্ণমেণ্টের। প্রজাদের ঘর-বাড়ী গড়ে তোলার জন্য বিনাসুদে তাদের ঋণ দেওয়া দরকার হবে। বাইরের কারো কাছ থেকে এই ঋণ নিতে গেলে তা পাওয়া যাবে না, আর পাওয়া গেলেও পরিণামে তার জন্য প্রজাদের হয়ত প্রভূত দুঃখ ভোগ করতে হবে।

সুতরাং এই গঠনের দায়িত্ব নিজের ঘাড়েই তুলে নিতে হয় গবর্ণমেণ্টের। এখানেও গবর্ণমেণ্টের হাতে টাকা না-থাকার প্রশ্ন আসতে পারে। কিন্তু হাতে টাকা না থাকলেও ঋণ করেও এইভাবে প্রজাদের সাহায্য করা তাঁদের কর্ত্তব্য। তা ছাড়া দীর্ঘদিন তাঁরা প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্বও আদায় করতে পারবেন না। বিনা করে প্রজাকে বাস করতে দিতে হবে, যে সব জমি চাষ-আবাদের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে সেগুলি যাতে আবার চাষের যোগ্য করে তোলা যায় তার জন্য অর্থব্যয় করতে হবে।

ভূমিকম্পে বিদীর্ণ ভূগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত জলরাশি

এই গঠনের কাজ কোন্ পদ্ধতিতে চলা দরকার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ তারও একটা আভাস দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধ থেকে তাঁর পদ্ধতির অনুক্রম আমরা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—(১) ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার এবং প্রোথিত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করতে হবে; (২) কূপগুলির পুনরুদ্ধার করতে হবে; (৩) নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করতে হবে; (৪) বালি পড়ে বা জল জমে যে সব জমি কর্ষণের অযোগ্য হয়েছে সেগুলির উন্নতি-সাধন করতে হবে; (৫) ফসল ও কৃষি ক্ষেতগুলি নষ্ট হওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে অন্নাভাব দেখা দিবেই, সুতরাং তখন যাতে খাদ্য সরবরাহ করতে পারা যায় তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে। (৬) যাদের শিল্প ব্যবসা প্রভৃতি নষ্ট হয়েছে তাদের যতদূর সম্ভব স্বব্যবসায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; (৭) যে সব স্থানে জমির উন্নতি-সাধন করা অসম্ভব সে সব অঞ্চলের কৃষকদের স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করতে হবে; (৮) জমির খাজনা, সেস, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স ইত্যাদির সম্বন্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে হবে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে জাপানের প্রায় দেড় লক্ষ লোক মারা যায়—সহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বিধ্বস্ত সহরকে গড়ে তুলবার জন্য জাপ সম্রাট এক কোটি ইয়েন (১ ইয়েন প্রায় দুই শিলিং দেড় পেন্স) দান করেছিলেন এবং জাপ-গবর্ণমেণ্ট দিয়েছিলেন ৩ কোটি ৭ লক্ষ ৮০ হাজার ইয়েন। অত্যন্ত তৎপরতার সহিত সংস্কারের কাজ আরম্ভ হয়। তাঁদের উদাহরণ ভারত-গবর্ণমেণ্টও অনুসরণ করতে পারেন।

বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য

কিন্তু কে কি করবেন সে সম্বন্ধে আমাদের যতটুকু আলোচনা করা দরকার, তার চেয়ে বেশী দরকার আমরা বাঙ্গালীরা কি করব সেই সম্বন্ধে আলোচনা করার। বিহার বাংলার সঙ্গে গায়ে গায়ে লাগা দেশ। অতীত ভারতে বহুদিন পর্য্যন্ত এই উভয় প্রদেশ এক দেশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে বিহারের একটা অচ্ছেদ্য যোগও আছে। তাছাড়া বহু বাঙ্গালী বিহারে যেয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে সুরু করেছিলেন। দ্বারবঙ্গ, মজঃফরপুর, মুঙ্গের, পূর্ণিয়া প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীদের একটা বড় উপনিবেশও গড়ে উঠেছে। তাই এবারকার ভূমিকম্পে বাঙ্গালীর মৃত্যুর সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য নয়। সুতরাং বিহারের দুঃখকে অনায়াসে বাংলার নিজের দুঃখ বলেই ধরা চলে। আর সেইজন্যই অর্থ নিয়ে, কর্ম্মী নিয়ে, সেবার অনুপ্রেরণা নিয়ে বিহারের যে সব স্থানে দুঃখের সমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠেছে সেই সব স্থানেই আজ বাঙ্গালীর ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।

পরলোকে স্যর প্রভাসচন্দ্র

স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার বেলা দু'টার সময় পরলোকের পথে যাত্রা করেছেন। তাঁর মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক। সেই জন্যই তাঁর মৃত্যু আমাদের মনকে আরো গভীর ভাবে পীড়িত করে তুলেছে। বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে চিন্তাশীল লোক বলে যাদের খ্যাতি আছে, স্যর প্রভাস তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য ও দূরদর্শিতার জন্য এদেশের ইংরেজ শাসকেরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর মতকে তাঁরাও সহজে উপেক্ষা করতে পারতেন না।

স্যর প্রভাসচন্দ্রের জীবন অত্যন্ত কর্ম্মময় ছিল এবং কর্ম্মের ভিতরেই তিনি অকস্মাৎ অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর মত এমন অকস্মাৎ মৃত্যু খুব কম লোকেরই ঘটে থাকে। স্যর প্রভাসচন্দ্র বাংলা গবর্ণমেণ্টের শাসন পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাই অনেক সময় তাঁকে অতিবাহিত করতে হত এই পরিষদের কাজেই। মৃত্যুর দিনও বেলা প্রায় একটা পর্য্যন্ত পরিষদের কাজে তিনি ব্যয় করেন। সেদিন সকালে 'গবর্ণমেণ্ট হাউসে' শাসন পরিষদের সদস্য এবং মন্ত্রীদের সম্মিলিত একটি বৈঠকের অধিবেশন হয়। তিনি বেলা ৯টার সময় সেই বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। বৈঠকের কাজ শেষ করে তিনি 'কাউন্সিল হাউসে' যান। সেখানকার কাজ শেষ হয় তাঁর প্রায় একটার সময়। তারপর বাড়ী ফিরে এসে স্নানের ঘরে প্রবেশ করেন। সেইখানেই হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং অত্যন্ত আকস্মিক যে তাঁর মৃত্যু তা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বেই বলেছি, স্যর প্রভাসচন্দ্রের জীবন অত্যন্ত কর্ম্ম-বহুল ছিল। প্রথম জীবনে স্যর সুরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মীরূপে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তারপর নিজের যোগ্যতায় তিনি দু'বার মন্ত্রী এবং অবশেষে শাসন-পরিষদের সদস্যের পদও অধিকার করেছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি যখন বিলেতে গিয়েছিলেন তখন প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করেন। তাঁর ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্র ছিল। তাঁর সামাজিক জীবনে যে তাঁর সংস্পর্শে এসেছে সে-ই মুগ্ধ হয়েছে। স্যর প্রভাসচন্দ্র মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করলেন। তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে দেশ অসময়ে একটি কৃতী সন্তান হারাল। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করি। তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতিও আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

ট্যারিফ বোর্ডের প্রস্তাব

ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প এখনও তার শিশু অবস্থা কাটিয়ে ওঠে নি। অথচ এ শিল্পের একটা প্রকাণ্ড সম্ভাবনা রয়েছে এ দেশে। কারণ ভারতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে

তুলা জন্মায়। কাঁচা মাল যে দেশে তৈরী হয়, সেই দেশেই যদি তা দিয়ে পণ্য তৈরীরও ব্যবস্থা করা যায়, তবে শিল্প-জগতে তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কিছুই হতে পারে না। তা ছাড়া বস্ত্র-শিল্পের সম্পর্কে আরও একটা বড় কথা রয়েছে। বস্ত্র প্রত্যেক দেশের নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ। যে সব জিনিষ নিত্য-প্রয়োজনীয় তার সম্পর্কে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকার মত দুর্ভাগ্য আর কিছুই হতে পারে না। এজন্যও ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় বস্ত্র যাতে ভারতবর্ষেই তৈরী হয় তার দিকে দেশের লোকের সব শক্তি নিয়োগ করা দরকার।

ভারতের প্রয়োজনীয় বস্ত্র ভারতবর্ষে তৈরী করা কঠিন একেবারেই নয়। কিন্তু এদিক দিয়ে প্রকাণ্ড বাধার সৃষ্টি হয়েছে বিদেশী প্রতিযোগিতায়। ল্যাঙ্কাশায়ার, জাপান প্রভৃতি দেশ ভারতবর্ষে কোটি কোটি টাকার বস্ত্র প্রেরণ করে। ভারতের মিলগুলিকে লড়াই করতে হয় এই সব বিদেশী মিলের সঙ্গেই। তাদের মিলগুলি বহুদিনের পুরান — সুপ্রতিষ্ঠিত। নূতন মিলের পক্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত মিলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করা একরূপ দুঃসাধ্যই, যদি না রক্ষণ-শুল্কের প্রতিষ্ঠার দ্বারা তাকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করা হয়।

এ সম্বন্ধে কি করা যায় সে সম্পর্কে ট্যারিফ বোর্ডের মতামত সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই মতামত যেরূপ মূল্যবান তেমনি সকলেরই প্রণিধান-যোগ্য। ট্যারিফ বোর্ডের নির্দ্দেশ নিম্নে মোটামুটি ভাবে উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল। বোর্ড দশ বৎসরের জন্য বিদেশী কার্পাস বস্ত্রের উপর শুল্ক স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করে মন্তব্য করেছেন—"ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ কাপড়ের কলের অবস্থাই শোচনীয়। উপযুক্ত ভাবে সাহায্য না করলে, অথবা রক্ষণ-শুল্ক স্থাপন না করলে ভারতীয় কলগুলির পক্ষে লাভ করা ত' দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে খরচা উঠানও সম্ভব হবে না। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রক্ষণ-শুল্ক প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতবর্ষের মিলগুলির অবস্থা অনেকটা উন্নত হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনও এই মিলগুলির ঢের সাহায্য করেছে। কিন্তু এখনও চলেছে মন্দার বাজার। এই মন্দা অতিক্রম করবার পূর্ব্বে রক্ষণ-শুল্ক বাতিল করে দিলে ভারতের কলগুলির সর্ব্বনাশ করা হবে।"

রক্ষণ-শুল্ক ধার্য্য করার উদ্দেশ্যে সমস্ত কাপড়কে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—(১) সাদা, কোরা, (২) পাড়ওয়ালা, কোরা, (৩) ধোলাই, (৪) ছাপার কাপড় ও রঙ্গিন কাপড়। এই কাপড় গুলির উপরে নিম্নলিখিত হারে শুল্ক ধার্য্য করার তাঁরা প্রস্তাব করেছেন—

(১) সাদা কোরা—প্রতি পাউণ্ড পাঁচ আনা।

(২) পাড়ওয়ালা কোরা—প্রতি পাউণ্ড পাঁচ আনা তিন পাই।

(৩) ধোলাই—প্রতি পাউণ্ড ছয় আনা।

(৪) ছাপা কাপড় ও রঙ্গিন কাপড়—প্রতি পাউণ্ড ছয় আনা চার পাই।

কাপড়ের শুল্ক প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এই তাঁদের মোটামুটি কথা। অবশ্য ছোটখাট পরিবর্ত্তনের বা অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তনের ভার গবর্ণমেণ্টের হাতেই তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন।

সূতার সম্বন্ধে ট্যারিফ বোর্ড প্রস্তাব করেছেন যে, ৫০ নম্বর ও তার কম নম্বরের সূতার উপরে আমদানী শুল্ক পাউণ্ড-প্রতি এক আনা করে হ্রাস করা উচিত।

হোসিয়ারী পণ্যের উপরে শুল্ক বসানর সম্বন্ধে ট্যারিফ বোর্ডের সিদ্ধান্ত এইরূপ—

সমস্ত অন্তর্ব্বাসের (underwear) উপর ডজন প্রতি দেড় টাকা।

মোজা ও হাফ মোজার প্রতি ১২ জোড়ার উপরে আট আনা।

সূচি-শিল্প-জাত হোসিয়ারীর উপরে প্রতি পাউণ্ড ছয় আনা।

ফিতার উপরে প্রতি পাউণ্ড সাড়ে ছয় আনা।

রেশমের সম্পর্কে বোর্ড প্রস্তাব করেছেন যে, রেশমে প্রস্তুত মালের শুল্ক তার বিক্রয়-মূল্যের শতকরা ৮০ টাকা এবং রেশম ও কার্পাস-মিশ্রিত স্তায় প্রস্তুত মালের শুল্ক তার বিক্রয়-মূল্যের শতকরা ৬০ টাকা

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত লাট-প্রাসাদ—দার্জ্জিলিং

পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা দরকার। কাঁচা রেশম ও রেশমের স্তার উপরে শুল্কধার্য্য করা উচিত শতকরা ৫০ টাকা। কৃত্রিম রেশমের উপর পাউণ্ড-প্রতি এক টাকা হিসাবে শুল্ক ধার্য্য করা সঙ্গত।

ট্যারিফ বোর্ডের এই মন্তব্যগুলি গ্রহণ করা না করার উপরে ভারতের বস্ত্র-শিল্পের ভবিষ্যৎ যে নির্ভর করছে তাতে সন্দেহ নেই। গবর্ণমেণ্টও এ কথা স্বীকার করেন এবং স্বীকার করেন বলেই তাঁরা বস্ত্র-সংরক্ষণ বিল প্রণয়ন করে তা ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু তাঁরা ট্যারিফ বোর্ডের মত পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করেন নি। জাপ-ভারত-বাণিজ্য-চুক্তি এবং

মোদি-ল্যাঙ্কাশায়ারের চুক্তির দোহাই দিয়ে কতকগুলি রদ-বদল করে এই সর্ত্তগুলি তাঁরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন—তাঁরা যে বিল উপস্থিত করেছেন তা থেকেই এ কথাটা প্রমাণিত হয়েছে। এই রদ-বদলের দ্বারা ভারতের কল্যাণই হবে—এই অবশ্য গবর্ণমেণ্টের মত। জাপ-ভারত-বাণিজ্য-চুক্তি এবং মোদি-ল্যাঙ্কাশায়ার-চুক্তি—এ উভয়েরই মূল কথা হচ্ছে এই যে, জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ার ভারতবর্ষের তুলা কিনবে এবং তার বদলে এদেশে বস্ত্র বিক্রয় করবার অপেক্ষাকৃত সুবিধা দিতে হবে জাপানকে এবং ল্যাঙ্কাশায়ারকে।

ভারতের তুলা না কিনবার যে আশঙ্কার কথা সাধারণতঃ বলা হয়, ভারতবর্ষে বস্ত্র-শিল্পের যদি সত্য সত্যই বড় রকমের উন্নতি হয়, তবে সে আশঙ্কার কোনও দামই থাকে না। আজ ভারতবর্ষে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হচ্ছে তা ভারতীয় জনসাধারণের প্রয়োজন মিটাতে পারে না। সুতরাং মিলগুলি ভাল ভাবে চল্‌লে, যে-তুলা ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় তার বেশীর ভাগ ভারতীয় মিলেই ব্যবহৃত হতে পারবে। সুতরাং সে দিক্ দিয়ে আশঙ্কা করবার খুব বিশেষ কোন কারণ নেই।

মহাত্মাজীর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

মহাত্মা গান্ধীর বাংলায় আসার সময় আগত-প্রায়। এই সময়টাতে জনসাধারণের ভিতর তাঁর বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষের ভাব জাগিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মত লোককে বিদ্বেষের দ্বারা ছোট করা যায় না—যাঁরা ছোট করতে চেষ্টা করেন তাঁরাই ছোট হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ 'ইউনাইটেড প্রেসে'র মারফৎ বাংলার জন-সাধারণকে জানিয়েছেন—"মহাত্মা গান্ধীর বর্ত্তমান কর্ম্ম-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমার দেশবাসীর ভিতর একদল লোকের বৈর মনোভাব আমি কিছু কাল থেকে লক্ষ্য করে আস্‌ছি। খাঁটি সমালোচনা হলে তাতে কারও কোনও আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু সমালোচনা ও কুৎসা-রটনার ভিতর পার্থক্য একটা চিরদিনই আছে। যিনি প্রকৃত মহৎ তাঁর কাছে স্তুতিবাদও যেমন অসার, টিট্‌কারীও তেমনি মূল্যহীন এবং আমি জানি মহাত্মাজীর ভিতর সে মহত্ত্ব আছে। তথাপি তাঁর বিরুদ্ধে যে কুৎসা-প্রচারের কাজ চলেছে, তার প্রতিবাদ যদি আমি না করি তবে আমার কর্ত্তব্যের পালনেই ত্রুটি থেকে যাবে।

"মহাত্মাজীই একমাত্র ব্যক্তি যিনি জন-সাধারণকে বহু শতাব্দীর দাসত্বজাত নৈরাশ্য ও আত্মাবমাননার পঙ্ককুণ্ড হতে উদ্ধার লাভের সর্ব্বাপেক্ষা সহায়তা করেছেন। তাঁর আশা ও বিশ্বাসের বাণী যেন এক রাত্রির ভিতরেই জন-সাধারণের সমগ্র মনোভাব বদলে দিয়ে গেছে। * * * যিনি তাঁর আশ্চর্য্য ক্ষমতায় এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন তাঁকে আমরা আমাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি না দিয়ে পারি না। সময়ে সময়ে মতভেদ ঘটে বলেই যখন তাঁর মত মানব-সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবনকে কুৎসা-লিপ্ত করা হয়, তখন মনে হয়, জনসাধারণের অকৃতজ্ঞতা নীচতার শেষ সীমায় উপনীত হয়েছে।"

এর পর গান্ধীজীকে কবি-গুরু বাংলায় অভ্যর্থনা করেছেন। তিনি বলেছেন—"আমি তাঁকে অন্তরের সঙ্গে বাংলা দেশে অভ্যর্থনা করছি।" কবি-গুরুর এই অভ্যর্থনার সঙ্গে সমগ্র বাংলা যে সুর মিলিয়েছে তাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পরলোকে মধুসূদন দাস

উৎকলের প্রবীণ নেতা মধুসূদন দাস গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মধুসূদন জন-নায়ক ছিলেন সত্যই, কিন্তু তাঁকে কেবল প্রবীণ নেতা বললে অন্যায়ই করা হয়। পুরান উৎকলকে ভেঙ্গে চুরে যিনি নূতন করে গড়ে তুলেছেন তিনি এই মধুসূদন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে তাঁর এই সাধনা চলে। উড়িষ্যার রাজনৈতিক আন্দোলনে,

শিল্পোন্নতির প্রচেষ্টায়, শিক্ষা বিস্তারে — সব দিকেই মধুসূদনের অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ছাপ এখনও স্পষ্ট হয়ে জেগে আছে। 'উৎকল ট্যানারী' তাঁর একটা বড় কীর্তি। উড়িষ্যার রৌপ্য-শিল্প অতুলনীয় ছিল। এই শিল্পটির পুনরুদ্ধারের জন্যও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। মধুসূদন কয়েক বৎসরের জন্য বিহার-উড়িষ্যার মন্ত্রিত্বও গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বেতন নিয়ে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধের সৃষ্টি হয়। তিনি মন্ত্রীদের বেতন নিয়ে কাজ করার বিরোধী ছিলেন এবং এই মতদ্বৈধের ফলেই তিনি মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন।

মধুসূদন উৎকলের লোক হলেও বাঙ্গালার প্রতি তাঁর গভীর প্রীতি ছিল। জীবনের অনেকগুলি দিন তিনি বাংলায় অতিবাহিত করে গেছেন। তাই তিনি বাংলাকে নিজের দেশ বলে মনে করতেন। ধর্মে তিনি খৃষ্টান ছিলেন, কিন্তু তাঁর ভিতরে কিছুমাত্র সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। মধুসূদন যে বয়সে মারা গিয়েছেন তা' মৃত্যুর পক্ষে অযোগ্য নয়। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ৮০ বৎসর পেরিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু তাঁর মৃত্যু আমাদের মনকে ব্যথিত ও পীড়িত করে তুলেছে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা শ্রদ্ধেয় আত্মীয়-বিয়োগের ব্যথাই অনুভব করছি।

বাংলার লাইনোটাইপ

প্রেসের সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক আছে এবং ছাপার সম্বন্ধে যাঁদের রুচি-বোধ আছে তাঁরা জানেন বর্তমান বাংলা টাইপের কাছ থেকে ভাল ছাপা আদায় করা কি কঠিন। কেবল তাই নয়, তাড়াতাড়ি কোন জিনিষ বাংলায় ছাপাতে গেলে তাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সেই সনাতন রীতিতে একটি একটি করে টাইপ তুলে এখনও বাংলায় লাইনের পর লাইন সাজিয়ে যেতে হয়। সুতরাং দেরী অনিবার্য। অথচ আজকালকার দিনে ছাপার উন্নতি ও সৌন্দর্য্য সভ্যতার একটা কষ্টিপাথর। এই কষ্টিপাথরে কষে যদি যাচাই করে দেখা যায়, তবে তাতে যে বাংলার খুব গৌরবের পরিচয় ফুটে উঠ্‌বে না, তা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি আমরা সংবাদ পেলুম যে, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু ও গৌরাঙ্গ প্রেসের শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার বাংলায় লাইনোটাইপ তৈরীর ছাঁচ ছকে দিয়েছেন। এ সংবাদ যেমন বিস্ময়কর তেমনি আনন্দদায়ক। কারণ এ যে কত বড় দুঃসাধ্য কাজ বাংলা অক্ষর এবং লাইনোটাইপ তৈরীর পদ্ধতির সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই বুঝতে পারবেন। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বাবু অদ্ভুতকর্মা লোক। তিনি যাতে হাত দিয়েছেন তা কখনও ব্যর্থ হয়েছে বলে আমরা জানি নে। তাই এত বড় দুঃসাধ্য কাজও বেশ ভাল ভাবেই উৎরে যাবে—এই ভরসা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে এর পরে আমরা বিশেষভাবে আলোচনা করব। আপাততঃ আমরা রাজশেখর বাবুকে এবং সুরেশ বাবুকে তাঁদের এই প্রচেষ্টার জন্য আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

ট্রপিকাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী

মিঃ ডি, এন, বসু মজুমদারের নাম বীমা-জগতে সুপরিচিত। জীবন-বীমার কাজে ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। বিগত আড়াই বৎসর কাল ইনি কলিকাতার 'গ্রেট ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্স' কোম্পানীর ভারপ্রাপ্ত 'অর্গানাইজার' হিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিপূর্বে ইনি 'এম্পায়ার অফ্‌ ইণ্ডিয়া ইন্‌সিওরেন্সে'র কলিকাতার 'অর্গানাইজার' ছিলেন। সম্প্রতি মিঃ বসু মজুমদার দিল্লীর 'ট্রপিক্যাল ইন্‌সিওরেন্স লিমিটেড্‌'-এর কলিকাতা শাখার কার্য্যভার গ্রহণ করেছেন। মিঃ বসু মজুমদারের ন্যায় একজন কৃতী বীমা-বিশারদের সহায়তায় ও সুদক্ষ পরিচালনাধীনে ট্রপিক্যালের কলিকাতা শাখা যে ক্রমোন্নতি লাভ করবে, এ বিশ্বাস আমাদের যথেষ্টই আছে। আমরা মিঃ বসু মজুমদারের এই বীমা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

ইটালীতে শিক্ষার্থী বাঙালী

অনেক বাঙ্গালী ছাত্র শিক্ষার জন্য বিদেশে যান। সাধারণ জ্ঞানার্জ্জনের জন্য, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতিতে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিদেশে যাওয়ার আমরা অপক্ষপাতী নই। কিন্তু আমরা তার চেয়েও বেশী পক্ষপাতী সেই সব বৈজ্ঞানিক বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জনের জন্য বিদেশে যাওয়ার, এদেশে যে সব বিষয়ের সম্বন্ধে

মার্কোনি (মধ্যে)
এবং শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীমহাদেব বসু

মহামান্য শ্রী ক্যাভালিয়েরি ষ্টেরাটি

ভাল জ্ঞান লাভের সুবিধা নেই। এটা বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের সবগুলি শাখা-উপশাখায় অন্যান্য সভ্য জাতির জ্ঞানের অনুরূপ জ্ঞান যে দেশের নেই সে দেশকে নানা রকমে ঠকতে হয়। এই জন্য এদেশের যাঁরা বিদেশে গিয়ে বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের নাম জানতে পারলে আমাদের মন খুশীতে ভরে ওঠে।

শ্রীযুক্ত মহাদেব বসু ও শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র ঘোষ এমনি ধরণের দু'জন কৃতী বাঙ্গালী ছাত্র। তাঁরা ইটালিতে গিয়াছেন ইলেক্‌ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে। মিলান সহরে মেরিলী কোম্পানীর বিখ্যাত বৈদ্যুতিক কারখানায় বর্ত্তমানে বৈদ্যুতিক পণ্যসম্ভার তৈরীর কাজ শিক্ষায় তাঁরা নিযুক্ত আছেন। ইটালির এই মিলান সহরেই আরও একজন বাঙ্গালী ছাত্র 'টেক্‌সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং' শিখছেন। তাঁর নাম শ্রীযুক্ত রাজসিংহ চট্টোপাধ্যায়। ইনি শিখছেন বিশেষ করে রেশমের পণ্য-সম্ভার তৈরীর কাজ। ইটালি গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারী, মুসোলিনির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ মহামান্য ষ্টেরাটীর সঙ্গে এঁদের বিশেষভাবে পরিচয় হয়েছে। তিনি এবং ইটালির আরো অনেক প্রতিপত্তিশালী লোক এঁদের নানা বিষয়ে সাহায্য করছেন। বাংলার এই তিনটি বিদ্যার্থী সন্তানের সাফল্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

গায়ক

[পাতিয়ালা মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সৌজন্যে]. শিল্পী — ডি. এ. মলি

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

প্রশস্তি

১২, লাউডন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
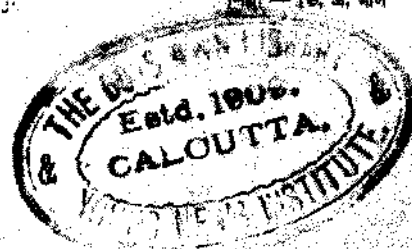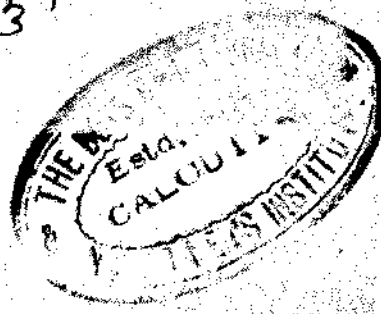
জাতীয় সাহিত্য জাতির চরিত্রগঠনের এবং চিন্তা ও কর্ম্মশক্তির বিকাশের বিশিষ্ট সহায়ক। বাঙ্গালীর চরিত্রে, চিন্তায় ও কর্ম্মে নবশক্তির অভ্যুদয় এনে 'উদ্বোধন' সার্থক হোক।

২০শে অগ্রহায়ণ
১৩৪০

শ্রীগুরুসদয় দত্ত

চৈত্র ১৩৪০
প্রথম বর্ষ দ্বাদশ সংখ্যা

সাহিত্য ও জন-সমাজ

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে জ্ঞানের প্রসার না হইলে অতি উচ্চতম জ্ঞানীর জ্ঞানের ফল রক্ষিত হইতে পারে না। দেশকে যাঁহারা জ্ঞানে সমৃদ্ধ করিতে চান, তাঁহাদের এ কথাটি স্মরণ রাখা ভাল। আমাদের প্রাচীন কালের বিশেষ গৌরবের দিনে আভিজাত্যের মর্য্যাদায় পুষ্ট কয়েকটি শ্রেণীর লোকের মধ্যেই সুশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু জন-সাধারণের লেখাপড়ার তেমন ব্যবস্থা ছিল না। উহার ফলে যে অনেক জ্ঞানীর আবিষ্কৃত সত্য দেশে একেবারেই উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারত-গৌরব পণ্ডিত আর্য্যভট্ট যখন নির্ণয় করিয়াছিলেন যে, পৃথিবী বর্ত্তুলের মত গোল, আর সেই গোলক সূর্য্যের চারিদিক বেড়িয়া ঘুরিতেছে, তখন তাঁহার এই সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত সত্যটি ভারতের নানা কেন্দ্রে তেমন ভাবে আলোচিত ও প্রচারিত হয় নাই যাহাতে সেই সত্য দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ও সেই সত্যের আলোকে নূতন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হয়। জগদ্গুরু আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তী জ্যোতিষী পণ্ডিত লল্লগুপ্ত ও ব্রহ্মগুপ্ত ঐ সত্যের ধারণা করিতে পারেন নাই। লল্লগুপ্ত তাঁহার গ্রন্থে তর্ক তুলিয়াছিলেন, যদি পৃথিবী ঘুরিয়া দূরে যায় তবে পাখীরা উড়িয়া দূরে গেলে আপনাদের বাসায় ফিরিবে কেমন করিয়া। তাঁহার এ তর্ক যদি পুঁথি-বদ্ধ না হইত, যদি এ সন্দেহের কথা জ্ঞানের কেন্দ্রে কেন্দ্রে আলোচিত হইত, তবে নিউটনের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি প্রাকৃতিক তথ্যগুলি এই ভারতে আবিষ্কৃত হইতে পারিত। এইরূপ অবস্থার দিকে তাকাইয়াই ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞেরা বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ বহু সত্যের আদি জন্মভূমি, কিন্তু সত্যগুলি ভারতবর্ষেই পুষ্ট হইয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই।

এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, জ্যোতিষের আলোচনায় বরাহমিহিরের সময় পর্য্যন্ত দেখিতে পাই—ভারতের পণ্ডিতেরা বিদেশের রোমক-সিদ্ধান্ত, পৌলিশ-সিদ্ধান্ত প্রভৃতির আলোচনা করিয়া সে সকল সিদ্ধান্তের দোষ ধরিয়াছেন ও নিজেদের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিদেশের জ্ঞানের আলোচনা তখন জ্ঞানের উন্নতির সহায় বিবেচিত হইত; তাই নানা জ্ঞান প্রসার লাভ করিয়াছিল। জ্ঞানের ভূমি যত

প্রসারিত হয়, সমাজ যত বিস্তৃতি লাভ করে, ততই যে উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হয়, ইহা বিশেষভাবে সকলকে স্মরণ রাখিতে হইবে। সুকুমার সাহিত্যই হউক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানই হউক বা অন্য যে কোনও বিদ্যাই হউক, সকল বিদ্যার উন্নতিকল্পে প্রাদেশিকতার গণ্ডি এড়াইয়া সমাজকে প্রসারিত হইতে হইবে।

একদিন আর্য্যভট্টের আবিষ্কার এদেশে প্রায় উপেক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু সারাসেনদের জ্ঞানচর্চ্চার ক্ষেত্রে অরিঅভট্ ও তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যের আদর দেখিতে পাই। আমরা জানি যে, স্পেনে সারাসেনদের প্রভাব বাড়িবার যুগে ইউরোপ সারাসেনদের জ্ঞানে পুষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু ইহা ধরা কঠিন বা দুঃসাধ্য যে, গালিলিও-র জ্ঞানের মূলে 'অরিঅভটে'র প্রতিভার আলোক ছিল কি-না। যাহাই হউক দ্বাদশ শতাব্দীতে অল্-বেরুণির আগমনের পর ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তে আর্য্যভট্টের আবিষ্কারের সমর্থন পাই; আর এই পণ্ডিতের গ্রন্থে গ্রীক্‌দের হোরা প্রভৃতি ও সারাসেনদের প্রভাবের অনেক কথার ছাপ আছে। এখনও আমরা ভারতের তুলা ও পাট বিদেশে পাঠাইয়া ঘরে ফিরাইয়া আনিতেছি সেই-সেই মালের তৈরী পদার্থ। কাজেই জ্ঞানের প্রসারের পথ ভাল করিয়া চিনিতে হইবে।

একদিন ভারতের আর্য্যদের সমাজ কি আশ্চর্য্য রকমে প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় বা নিশ্চিত ইঙ্গিত পাই মহাভারত-সংহিতায়। সেকালের সামাজিক বিকাশ ও বিস্তৃতির ইতিহাস নাই; আর অতি প্রাচীন ভারতী-কথা, মহাভারত-সংহিতার মধ্যে একটুখানি বিক্ষিপ্ত ভাবে রক্ষিত আছে দেখিতে পাই। সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের মাপকাঠি দিয়া মাপিতে গেলে দেখিতে পাই যে, যাহা বহু প্রসারিত সামাজিক অভিজ্ঞতায় লাভ করা সম্ভব, তাহাই পাই ভারতী-কথার চরিত্র-চিত্রে। বহু বিষয়ের সংগ্রহ অর্থাৎ সংহিতারূপে সৃষ্ট পঞ্চমবেদ নামে পরিচিত মহাভারতের কেন্দ্রে মূল ভারতী-কথা প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেও, চরিত্র-চিত্রের এই মহিমা দেখিয়া বিস্মিত হই যে, ঐ ভারতী কাব্যে বহুসংখ্যক পুরুষ ও নারীর লীলা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু কোন পুরুষ বা কোন নারী অন্য পুরুষ বা অন্য নারীর দূর সম্পর্কেও অনুরূপ নয়; প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব অতি স্বতন্ত্রভাবে পরিস্ফুট। খাঁটিভাবে বহুশ্রেণীর মানবের প্রত্যক্ষ লীলার অভিজ্ঞতা ছাড়া এরূপ চরিত্রের অঙ্কন সম্ভব নয়। একালের অনেক দক্ষ লেখকের গল্পে ও নাটকে অল্পই গোটাকতক পুরুষ ও নারীর লীলার কথা থাকে; তবুও দেখিতে পাই একখানি বই-এর পুরুষ ও নারী অন্য বই-এ যেন ভোল্ ফিরাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভারতী-কথার যখন সৃষ্টি হয় তাহার—সেই বিস্মৃত যুগের অনেক পরে কালিদাস ও ভবভূতির যে অতি মনোহর রচনা পাই, তাহাতে ভারতী-কথার যুগের বিস্তৃত সামাজিক প্রসার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বুঝিতে পারি, কিন্তু সামাজিক জীবনের জীবন্ত অবস্থার চমৎকার পরিচয় পাই। উহার পরবর্ত্তী সময়ে যখন প্রাদেশিকতার গণ্ডি বেশি বাড়িয়াছিল ও কর্ম্মহীনতার ফলে মানব-চরিত্রের সত্যকার বিচিত্রতা যখন প্রাণে প্রাণে অনুভূত হইতে পারে নাই, তখন আর কবিতায় জীবন্ত প্রাণের স্পর্শ পাই না; পাই কেবল ঘষা-মাজা কথার তুলিতে আঁকা মৃত প্রাণের কৃত্রিম চিত্র-পট—মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতির রচনায় পাই কেবল কথার বাহার বা শব্দের ভেল্কি। সমাজে পুরুষ-নারীর পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে প্রেমে-পড়া যখন ছিল না, তখন নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন—এই কল্পনা করিয়া প্রেমের কল্পিত বর্ণনা করা হইয়াছে ও প্রাচীন কালের গোটাকতক কথা কুড়াইয়া প্রেম, বিরহ প্রভৃতির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কথার বাহারের জন্য 'সর্ব্বতোভদ্র' প্রভৃতি এমনভাবে রচিত হইয়াছিল যাহাতে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া পড়িলে একই কথা পড়া যায়; তাহাতে কবিতার রস নাই বা ভাবের মাধুরী নাই—আছে কেবল 'রমাকান্ত কামার'। প্রেমে বিরহ চাই ও বিরহ-বর্ণনায় কোকিল, মলয়-সমীরণ প্রভৃতি চাই; কাজেই অনুষ্ঠানের ত্রুটি না করিয়া দময়ন্তীর বিরহ-বর্ণনায়

পাইলাম মরা কোকিলের ডাকের ১৭টি শ্লোক, আর দুর্গন্ধ মলয়-সমীরণের প্রবাহের ২১টি শ্লোক। উহাতে দময়ন্তীর বিরহের ব্যথা বুঝিবার আগে পাঠকেরা কাব্য পড়িবার ব্যথা বেশি অনুভব করেন।

মানুষেরা যখন অল্প পরিসর গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে, তখন জীবনের অভিজ্ঞতা অতি ক্ষুদ্র হয়। জীবনের স্বাধীন গতির ও লীলার বিচিত্রতার অভাবে লেখকেরা নিজেদের রচনা মনোহর করিতে গিয়া কেবল শরীরের আয়তনটুকু খুঁড়িয়া যৌন আকর্ষণের উত্তেজনার দিকটুকু বর্ণনা করিতে বসে ও জীবনক্ষয়কর কুৎসিৎ সাহিত্য রচনা করে। এক সময়ে অনেক রাজসভায় এই শ্রেণীর রচনা অধিক হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে প্রাচীন-কালের শিক্ষা ও সংস্কারের ঐতিহ্য সমাজকে বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল; জনসাধারণ বিকৃত রুচিকেই বরণ করে নাই। মুসলমান আমলে সুদূর মৈমনসিংহ অঞ্চলের পল্লীতে পল্লীতে প্রেম ও বিরহের যে সকল গাথা রচিত হইয়াছিল, তাহা প্রাণের লীলায় ও পবিত্রতায় অতি মনোহর।

দূর বিদেশের বৈদ্যুতিক স্পর্শটুকু লাগিতেই দেশের যথার্থ প্রাণ সতেজে মাথা তুলিয়াছিল; তাই বিদেশের স্পর্শের প্রথম যুগেই রাজা রামমোহনের অভ্যুদয় হইয়াছিল ও কত কবি তাঁহার পরে প্রাণের লীলার সাহিত্য রচিয়াছেন। এই জন্যই ললিত সাহিত্যে আমরা জগদ্বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথকে পাইয়াছি, বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রকে পাইয়াছি ও সুশিক্ষাবিধানে আশুতোষকে পাইয়াছি।

আমরা অতি প্রাচীনকালের সামাজিক প্রসারের পুণ্যবলে তাজা আছি,—ক্ষুদ্র গণ্ডির বেষ্টনে একেবারে পচিয়া মরি নাই। এখানে গণ্ডির বেষ্টনের দুর্গতির কথা একটু বলিব। আদি যুগে মানুষেরা খাদ্যের খোঁজে দলে দলে নানাদিকে ছুটিয়াছিল ও যে সকল দলের লোকেরা পাহাড়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আড়ালে বাসভূমি রচিতে পারিয়াছিল, তাহারা পরবর্তী অন্যান্য দলের আক্রমণ এড়াইয়া সহজে যথেষ্ট খাদ্য পাইয়া জীবিত থাকিতে পারিয়াছিল। অন্যদিকে যাহারা সমতলক্ষেত্রে নদীর তীরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাদিগকে ক্রমাগত নূতন নূতন দলের লোকেদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু এই সকল লোকেরাই বহু দলের সঙ্গে মিশিয়া জীবনরক্ষার নূতন নূতন নিয়ম উদ্ভাবন করিয়া শরীরের ও জ্ঞানের বল বাড়াইতে পারিয়াছিল ও সভ্য হইয়াছিল। আর্যেরা এই শেষোক্ত দলের লোকের মত বাড়িয়াছিলেন। অন্যদিকে বন-পাহাড়ের গণ্ডিতে যাহারা নির্ব্বিবাদে বাড়িয়াছিল, তাহারাই পরে হইয়াছে অসভ্য বর্ব্বর। বহুজাতির লোকের সঙ্গে রক্ত মিশ্রণ করিতে না পারিয়া যাহারা নূতন বল লাভ করিতে পারে নাই, এ যুগে তাহাদের হইয়াছে নানা দুর্দ্দশা। আফ্রিকার বান্টু ও বুশমান প্রভৃতিদের মধ্যে দেখা যায় যে, তাহারা কোণ-ঠেসা থাকিয়া মস্তিষ্কের ব্যাবৃত্তি বাড়াইতে পারে নাই। যৌবন-আরম্ভের অল্প পরেই তাহাদের মাথার হাড়গুলি এমনভাবে জুড়িয়া যায়, যাহাতে জ্ঞানের বিকাশ অসম্ভব হয়। বহুশ্রেণীর বা জাতির লোক মিলিয়া অথবা নিদানপক্ষে পঞ্চজন এক সঙ্গে মিলিয়া যাঁহারা বড় হইয়াছিলেন, ভারতে তাঁহাদের মিলিত দলের ছিল পাঞ্চজন্য শঙ্খ; যাঁহারা পাঞ্চজন্য শঙ্খ ফেলিয়া ক্ষুদ্র গণ্ডির একতারা বাজাইতে চান, তাঁহারা বান্টু, বুশমান্ সাহিত্য রচনা করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইবেন।

অনেকে একালের বহু কুৎসিৎ রচনার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, আর সেই হীনতা নিবারণের জন্য কি ঔষধের ব্যবস্থা করা যায়, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমি জনকতক লোকের কুৎসিৎ প্রবৃত্তির কথা শুনিয়া ভীত নই। যাহার রুচি ও শিক্ষা যেমন সে সেইরূপ সাহিত্য রচিয়া থাকে ও পড়িয়া থাকে। তর্ক তুলিলে ঐ দলের লোকেরা আস্কারা পাইয়া বাড়িয়া ওঠে। কোন তর্ক না তুলিয়া যখন বঙ্কিমচন্দ্র নূতন মনোহর সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, তখন নূতনের মনোহারিতায় মুগ্ধ হইয়া দেশের লোক অজ্ঞাতসারে প্রাচীন কুৎসিৎ সাহিত্য ছাড়িয়াছিল।

এখন সমাজের প্রসার বাড়িতেছে, শিক্ষা বাড়িতেছে ও জীবনে যাহা যথার্থ মনোহর, তাহার অভিজ্ঞতা বাড়িতেছে। মনোহর নূতন সাহিত্যের প্রভাবে কুৎসিৎ সাহিত্য আপনার বিষে জর্জ্জর হইয়া মরিবে—ইহাই আমার বিশ্বাস। কাজেই কুৎসিৎ সাহিত্যের ভয় না করিয়া সাহিত্যের রস যাহাতে সমাজের সকল স্তরের ভিতরে ছড়াইয়া পড়িতে পারে—আজ তাহারই দিকে দৃষ্টি দিবার দিন আসিয়াছে—জনসাধারণ যাহাতে দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানীদের জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হইতে পারে—তাহারই ব্যবস্থা করিবার সময় আসিয়াছে।

বাঘিনী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

১

ঘরকন্নাই করে নাক' কেবল,
শুধুই পালন করে নাক' শাবক,
এরা আবার বাঘের চেয়ে ভীষণ—
একেবারে জ্বালামুখীর পাবক।

২

ঝঞ্ঝা যখন ঝাঁঝর বাজায় বনে,
হাওয়ার সোহাগ হিয়ার নিয়ে নাচে,
কাণ পাতিয়া প্রলয় বিষাণ শোনে
চামুণ্ডা দল ভুঁখা হয়েই আছে।

৩

ভয় করে না মৃত্যু এবং খাঁচা,
পাষাণও যায় ক্ষয়ে এদের নখে,
বাঞ্ছা এদের উল্লাসেতে নাচা
রক্তবীজের রক্ত অলক্তকে।

৪

বটে এরা অবলারি জাতি,
কিন্তু এরা মহিষ মেরে খায়;
একেবারে মহাকালীর জাতি,
রক্তজবা নিত্য শোভে পায়।

৫

অবজ্ঞা যে সইতে নাহি পারে
অধীনতার ইঙ্গিতে সে রাগে,
গণ্ডার এবং সিংহও শঙ্কিত,
হিংস্রতায় বাঘ বা কোথায় লাগে।

৬

বৃকোদরীর দারুণ কোপানলে,
পলকেতে নিত্য প্রলয় ঘটে,
পুরুষ না হ'ক পৌরুষে অতুল,
জোয়ান না হ'ক 'জোয়ান ডি আর্ক' বটে!

৭

জন্মে এরা নরের ঘরে যদি
ভাবছি এরা থাকবে আটক কি না,
ভালবাসার লোহার বাঁধন প'রে
খড়্গ ছেড়ে ধরবে কি না বীণা।

৮

স্বামীর সাথে সমান অধিকারই
নারী জন্মে যদিই করে দাবী,
কেমন করে দাবিয়ে রাখা যাবে,
আমরা এসো এখন থেকে ভাবি।

রবীন মাষ্টার

ডক্টর শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম্-এ, ডি-এল্

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

৩

দু'একজন লোক আছেন যাঁরা সেকালের রবীন মাষ্টারের কথা একটু মনে ক'রে রেখেছেন, তার মধ্যে ভুবনবাবু একজন।

ভুবনবাবু বুড়ো হ'য়েছেন খুব, তিনি আর কাজ-কর্ম্ম কিছু দেখেন না, দেখে তাঁর বড় ছেলে যোগেশ। গাঁয়ের মাথা এখন তিনি নন, যোগেশ। যোগেশের ঘরেই যত দরবার হয়, আড্ডা বসে, গ্রামের পলিটিক্সের চর্চ্চা হয়।

ভুবনবাবু থাকেন সাড়ম্বর পূজা-আহ্নিক ধম্ম-কম্ম, আর—দাবা নিয়ে।

এই দাবা খেলবার জন্য তাঁর দরকার হয় রবীন মাষ্টারকে, আর রবীন মাষ্টারের দরকার হয় তাঁকে।

রবীন মাষ্টার আসে। কোনও কথা না ব'লে চুপ চাপ কুলুঙ্গির উপর থেকে দাবা ব'ড়ে আর ছক নামিয়ে সাজিয়ে বসে ভুবনবাবুর সামনে, আর খেলা সুরু হ'য়ে যায়। কথাবার্ত্তা কিছু, ব'লতে গেলে, হয়ই না তাদের।

রবীন মাষ্টারের খেলাটা সাধারণ খেলোয়াড়ের মত নয়। সে খেলতে ব'সবার আগে মনে মনে গোটা খেলার সবগুলি মোটা মোটা চাল ঠিক ক'রে নিয়ে গোঁ ধ'রে সেই চালের অনুসরণ করে। এই সব চাল কতক সে বই প'ড়ে শেখে, আর কতক নিজের মনে ভেবে ভেবে তৈরী করে। যে চাল সে নিজে আবিষ্কার করে তাতে সে দু'চার দিন ঠ'কে শেষে সেটা এমন ক'রে দুরস্ত ক'রে নেয় যে, সে জেতেই। পাকা খেলোয়াড় যারা তারা প্রথমে তার চাল দেখে মনে মনে হাসে—ভাবে ম'ল এই। শেষে এমন প্যাঁচেই তারা পড়ে যে, সামলাতে হিমসিম খেয়ে যায়।

যে দিন দাবার বৈঠক বসে সে দিন আর সময়ের কোনও ঠিকানা থাকে না। খেলেই যায় দু'জনে। যখন রবীন মাষ্টার বাড়ী ফেরে তখন দেখতে পায় নিস্তারিণী ভাত ঢাকা দিয়ে রেগে টং হ'য়ে ব'সে আছে—যদি না ঘুমিয়ে পড়ে থাকে। গালাগালি খেতে খেতে সে কোনও মতে মাথা গুঁজে দু'টো খায়—সব দিন খেতে পায়ও না। তারপর তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরে গিয়ে বই নিয়ে পড়া ছাড়া আর তার গত্যন্তর থাকে না।

* * *

ভুবনবাবু খেলছিলেন দাবা।

তাঁর পিলটা টিপে দিয়ে ভুবনবাবু ব'ললেন "কিস্তী!"

যোগেশ ঘরে এসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। এই-বার ফাঁক পেয়ে ব'ললে, "বাবা, একটা কথা আছে।"

ভুবনবাবু ব'ললেন, "কি কথা বাবা?"—ব'লেই একবার ছকের দিকে চাইলেন। রবীন মাষ্টার তখন ছকের উপর ঝুঁকে প'ড়ে যেন চোখ দিয়ে সেটা গিলে খাচ্ছে।

যোগেশ ব'ললে, "হেড মাষ্টারবাবু এসেছেন স্কুলের কয়েকটা কথা ব'লতে।"

ইতিমধ্যে রবীন রাজাকে একপদ সরিয়ে দিয়ে তেমনি তীব্র দৃষ্টিতে ছকের দিকে চেয়ে রইলো। ভুবন-বাবুর আর শোনা হ'ল না। তিনি ব'ড়ে ঠেলে পিলটাকে জোর দিলেন।

তারপর ঠিক তিন চালে ভুবনবাবু মাৎ!

ভুবনবাবু মহা বিরক্ত হ'য়ে যোগেশের উপর ক্ষেপে প'ড়লেন, ব'ললেন, "বাপু হে, তোমার ও ঘোড়ার ডিমের কথাটা ব'লবার আর সময় পেলে না, এলে ঠিক এই সময়! কোথায় আমি মাৎ ক'রবো, না মাৎ হ'য়ে গেলাম। একটু কাণ্ডজ্ঞান যদি তোমার থাকে।"

মহা বিরক্তভাবে চিৎ হ'য়ে প'ড়ে তিনি গড়গড়া টানতে লাগলেন।

রবীন চুপ চাপ আবার ছক সাজাতে লাগলো।

সাজান হ'য়ে গেলে ভুবনবাবু ব'ললেন, "রেখে দাও হে, ও আর এখন হবে না। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। এমন বে-আক্কেল ছেলেটা—একটু যদি বুদ্ধিশুদ্ধি থাকে। একেবারে খেলার সঙ্গীন সময়টায়—ওর না কি আমার কাছে দরকার! কিসের দরকার হে বাপু? দরকার থাকে, নিজে বুদ্ধি খাটিয়ে ক'রতে পার না? আমি এতদিন বেঁচে আছি এইটেই যেন আমার অপরাধ, নইলে ম'রে গেলে কার কাছে গিয়ে ব'লতে? তখন তো নিজের বুদ্ধিতেই সব ক'রতে হ'ত। সব তো দিয়েছি ছেড়ে তোমার হাতে—যা বোঝ, কর না বাপু! আমি বুড়ো মানুষ ধম্মকম্ম নিয়ে আছি—আমাকে কেন ঘাঁটাও?"

এই বক্তৃতার মাঝখানে রবীন মাষ্টার দাবার ছক আর গুটি তুলে নিয়ে কুলুঙ্গীর উপর রেখে কাউকে কোনও কথা না ব'লে ছাতা বগলে ক'রে হন হন ক'রে চ'লে গেল। যেতে যেতে নিজের মনে মনে কি যেন ব'লতে লাগলো, আর হাত নেড়ে চেড়ে ঠিক যেন একটা কাল্পনিক বোর্ডের উপর জিওমেট্রীর নক্সা আঁকতে লাগলো।

এতই অন্যমনস্ক হ'য়ে ছিল সে যে, তার পথ ছেড়ে যে সে ঘাসের উপর গিয়ে পৌছেছে সেটা তার খেয়াল ছিল না, আর সেখানে যে যোগেশের ছোট ছেলে খেলা ক'রছে, তাও তার হুঁস হয় নি।

হুমড়ি খেয়ে সে ছেলেটার ঘাড়ের উপর প'ড়তেই রবীন মাষ্টার মহা অপ্রস্তুত হ'য়ে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে আদর ক'রতে লাগলো। তাতে হিতে বিপরীত হ'ল। কেন না এই পাগলা মাষ্টার ছিল এ যুগের ছোট ছেলেদের মহা ভীতির কারণ। বেশী কান্নাকাটি ক'রলে বয়স্কেরা তাদের এই পাগলা মাষ্টার দেখালেই তারা ঠাণ্ডা হ'য়ে যেতো। সেই পাগলা যখন তাকে ধ'রে কোলে নিলে, যোগেশের ছেলে তখন ভয় পেয়ে একেবারে আরও বিকট চীৎকার ক'রে উঠলো।

যোগেশ ছুটে গিয়ে ছেলেকে রবীন মাষ্টারের কোল থেকে কেড়ে নিয়ে মাষ্টারকে দিলে এমন ধাক্কা যে, সে প'ড়তে প'ড়তে কোন মতে টাল সামলে গেল, তারপর লাগালে এমন গালাগালি যে, তাতে মরা মানুষ হয়তো ক্ষেপে উঠতো—কিন্তু রবীন মাষ্টার সুধু মাথা নীচু করে মুখ কাঁচু মাচু ক'রে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগলো।

যোগেশ ছেলেটাকে চাকরের কোলে দিয়ে চাকরটাকে আচ্ছা ক'রে কান ম'লে দিলে। তারপর দম্ দম্ ক'রে পা ফেলে সে ফিরে গেল বাপের কাছে—বেশ চটা মেজাজে।

ভুবনবাবুকে সে ব'ললে, "দেখলেন লোকটার আক্কেল! কাণা নয়, অন্ধ নয়, তবু পথ চ'লতে লোক চাপা দেয় ভর দুপুরে!"

ভুবনবাবু ব'ললেন, "না, রবীনটা দেখছি একেবারেই ক্ষেপে যাবে এবার! নইলে বুড়ো তো আমিও ওর চেয়ে ঢের বেশী, কই, আমার তো অমন হয় না।"

যোগেশ বেশ তাতের সঙ্গেই ব'ললে, "ওরই কথা ব'লতেই তো এসেছেন হেড মাষ্টারবাবু। নইলে ইস্কুলের কথা নিয়ে আপনাকে ঘাঁটাব কেন?"

খেলায় হেরে গিয়ে ভুবনবাবুর মেজাজ চ'টেই ছিল, তিনি ব'ললেন, "তা যাও, নিয়ে এসো তোমার হেড মাষ্টারকে! বাবা গো বাবা, শান্তি এরা দেবে না কিছুতেই! দু'দণ্ড যে ব'সে ভগবানের নাম ক'রবো

তার উপায় নেই! সংসারে এসে যেন দাসখত লিখে দিয়েছি, জীবনের ওয়াদা পেরিয়ে গেল, তবু নারায়ণ নিচ্ছেন না—না জানি কত দুঃখ আছে কপালে।"

যোগেশ গেল হেড মাষ্টারকে ডাকতে, ভুবনবাবু তাড়াতাড়ি তাঁর মালার থলে হাতে নিয়ে গট্ হ'য়ে ব'সলেন।

হেড মাষ্টার বিনীত ভাবে ঘরে ঢুকে ভুবনবাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে তফাতে ব'সলেন। যোগেশ দাঁড়িয়েই রইলো।

ভুবনবাবু ব'ললেন, "কি হে বাপু, তোমার কথাটা কি? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, ঘাটে পা বাড়িয়ে র'য়েছি, তবু তোমরা আমায় দেখছি শান্তি দেবে না। দু'দণ্ড নিশ্চিন্দি হ'য়ে যে ভগবানের নাম ক'রবো তাও যে পারি না দেখি!"

হেড মাষ্টার ঘাড় নেড়ে ব'ললেন, "ভারি অন্যায় আমাদের আপনাকে বিরক্ত করা। আপনার মত লোক, ঋষি ব'ললেই হয়, তাঁকে বিষয়-কর্ম্ম নিয়ে জ্বালাতন করা পাপ। কিন্তু যোগেশবাবু ব'ললেন যে, এ কথাটা না কি আপনাকে না ব'ললে চলে না, তাই এলাম। নইলে আমি কখনও আসি—সুধু আপনার কাছে ধর্ম্মের উপদেশ শুনতে ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে?"

কতকটা নরম সুরে ভুবনবাবু ব'ললেন, "কিন্তু ব্যাপারটা কি, তাই শুনি? আমার সময় বড় কম, এখনি পূজোয় ব'সতে হবে, চট্-পট্ ব'লে ফেলো।"

হাত কচলাতে কচলাতে হেড মাষ্টার ব'ললেন, "কথাটা আমাদের রবীনবাবুকে নিয়ে, ওঁকে নিয়ে তো আর কাজ চ'লছে না।"

"কেন? কি হ'য়েছে?"

"আজ্ঞে, একে উনি বি-এ ফেল—"

"বি-এ ফেল তাই কি? সেকালের বি-এ এত সস্তা ছিল না হে বাপু। সেকালের বি-এ ফেল আজ-কালকার গণ্ডা গণ্ডা এম-এ পাশের সমান!"

"আজ্ঞে, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু, কি জানেন, ওঁর মাথাটা একেবারে খারাপ হ'য়ে গেছে।"

ভুবনবাবু উগ্রস্বরে ব'ললেন, "মাথা খারাপ হ'য়েছে—বটে? খেলে দেখ তো একবাজী দাবা ওর সঙ্গে—টেরটি পাবে কেমন মাথা খারাপ।"

হেড মাষ্টার দিশেহারা হ'য়ে যোগেশের দিকে চাইলেন। যোগেশ তাঁর কাছে ব'লেছিল যে, ভুবনবাবু এইমাত্র ব'লছিলেন যে রবীনের মাথা বিগড়ে গেছে। তাতেই খুব ভরসা ক'রে তিনি এই কথাটা ব'লেছিলেন। এ কথার এই উত্তর শুনে তিনি আর হালে পানি পেলেন না। তাঁর আশা হ'ল যে, যোগেশ কিছু ব'লবে হয়তো।

যোগেশও ব'ললে, "দাবা উনি যতই ভাল খেলুন বাবা, মাথার ওঁর ঠিক নেই।"

ভুবনবাবু খুব চটে ব'ললেন, "দেখ আর যে-ই বলুক, তুমি ওকথা বলো কি ব'লে? ওই রবীন মাষ্টারের কাছে পড়েছ তো তুমি? গুরু, হাজার খারাপ হোন, শিষ্যের মুখে তার নিন্দা—এত বড় পাপ আর নেই। পাগল বলো তুমি তোমার গুরুকে!—আমার ছেলে হ'য়ে! কালে কালে ধর্ম্ম দেখছি রসাতলে চ'ললো।"

যোগেশ মুখ লাল ক'রে ব'সে রইলো চুপ ক'রে। বাপের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক ক'রবার ছেলে সে নয়।

হেড মাষ্টারবাবু তারপর এক নতুন চাল চাললেন। তিনি ব'ললেন, "কিন্তু দেখুন, রবীন মাষ্টার যদি বেশী দিন ইস্কুলে থাকেন তবে যাও বা ধর্ম্ম আছে, আজকাল তাও লোপ পাবে। ধর্ম্মকর্ম্মের ছিঁটে-ফোঁটাও নেই ওঁর, ঠাকুর দেবতাকে কোনও দিন প্রণাম করেন না। এতেই তো ছেলেদের পক্ষে একটা কুদৃষ্টান্ত হয়। তার-পর উনি ছেলেদের শেখান সব এমন কথা, যা শুনলে আপনি কানে হাত দেবেন। হিষ্টরী পড়ান উনি, উনি ছেলেদের শিখিয়েছেন যে, আমরা না কি সব অনার্য্য! বলেন, সেকালে অনার্য্যেরা ছিল খুব সভ্য আর আর্য্যেরা ছিল অসভ্য! আরও শিখিয়েছেন তাদের যে, ঠাকুর দেবতার পূজা—এ সব বেদে নেই! এমন সব ভয়ানক কথা যদি ছেলেরা বিশ্বাস ক'রতে

আরম্ভ করে, তবে তাদের মধ্যে কি আর ধর্ম্ম-টর্ম্ম থাকবে?"

"বটে!"—ব'লে ভুবনবাবু চুপ ক'রে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর ব'ললেন, "তা তোমরা ক'রতে চাও কি?"

হেড মাষ্টার ব'ললেন, "আমি তো চাই নে কিছু ক'রতে, কিন্তু আমার ভয় হয় যে, ইন্‌স্পেক্টারবাবু এলে তিনি হয়তো ইউনিভারসিটি থেকে ইস্কুলের নাম কাটিয়ে দেবেন। তাই ভাবছিলাম যে, সামনের বছর থেকে ওঁকে বিদায় ক'রে দিলে হয়।"

ভুবনবাবু গর্জ্জে উঠলেন, "কি? তারই ইস্কুল থেকে বিদেয় করবে তাকে? তুমি কে হে? কে তোমায় জানতো? পেতে কোথায় এ ইস্কুল যদি রবীন মাষ্টার না থাকতো? দেখ হে, মাথার উপর এখনও ধর্ম্ম আছেন। এত অধর্ম্ম সইবে না। ওসব হবে টবে না।"

হতাশ হ'য়ে হেড মাষ্টার যখন উঠলেন, তখন ভুবনবাবু আবার তাঁকে ব'ললেন, "আর শোন। আমি এখন তোমাদের কমিটির কেউ নই—কাজেই আমার কথা তোমাদের শোনবার দরকার হয় তো নেই। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—রবীন মাষ্টার যতক্ষণ মরে না যাচ্ছে, কি নিজের ইচ্ছেয় চাকরী ছেড়ে না দিচ্ছে, ততক্ষণ যদি সে ও ইস্কুলে না থাকে, তবে, কর গে তোমরা যেখানে পার ইস্কুল, আমার ও জমী-বাড়ী আমি দেব না।"

একথা তিনি ব'লতে পারতেন, কেন না 'স্কুল কোড' তখনও হয় নি, আর জমী-বাড়ী কোনও লেখা-পড়া ক'রেও তিনি দেন নি। আর সেই জন্তেই হেড মাষ্টারের ভুবনবাবুর কাছে দরবারের এত গরজ!

দরবারে কিছু ফল হ'ল না দেখে হেডমাষ্টার তো বিষণ্ণমনে চ'লে গেলেন। কিন্তু সন্ধ্যেবেলায় ভুবনবাবু রবীন মাষ্টারকে ডেকে পাঠালেন।

ভুবনবাবু ব'ললেন "হ্যাঁ হে মাষ্টার, তুমি না কি ঠাকুর দেবতা মান না?"

রবীন হো হো ক'রে হেসে উঠলে, ব'ললে, "এক দেবতা মানি সে পেট, এর চেয়ে বড় দেবতা নেই। এই পেট মানুষকে কিসের থেকে কি ক'রেছে? পেটের খিদের জন্তে বনের বাঁদর হ'য়েছে আজ প্রায় জ্যান্ত দেবতা। আর এই পেট দেবতাই সৃষ্টি ক'রেছেন সব ঠাকুর দেবতা — কেন না তা নইলে বামুনের দেবতা ভরে না।"—ব'লেই সে আবার বেজায় হাসতে লাগলো।

কানে হাত দিয়ে ভুবনবাবু ব'ললেন, "রাম, রাম, এ সব কথা শুনলেও পাপ।"

"তবে কেন শোনেন? হুকটা নামিয়ে আনি?" ভুবনবাবু মানা ক'রে ব'ললেন, "না, না, ও আজ থাক। শোন, বয়েস তো গেল মাষ্টার, এখনও যে এমনি ক'রছ, তোমার যে নরকেও স্থান হবে না।"

"কেমন ক'রে হবে? কেন না যেটা নেই তাতে স্থানও নেই। আর যদি সত্যিকার নরকের কথা বলেন, সেখানে তো আছিই। দিব্বি স্থান হ'য়েছে আমার এখানে।"

"শোন, ও সব মস্করা রাখ, ভজন পূজন একটু কর।"

"ক'রছিই তো — আমার যিনি দেবতা তাঁর ভজন পূজন সে তো ক'রছিই, নইলে ইস্কুল মাষ্টারি ক'রতে যাব কেন? আর আপনারাই বা তার চেয়ে বেশী কি বড় ক'রছেন। একটা ঠাকুর খাড়া ক'রে আপনারা যে ভোগ দিচ্ছেন, শেষে সে তো যাচ্ছে ঐ পেট দেবতার কাছেই — হয় আপনার নয় তো আর কারও।"

"হুঁ!"—ব'লে ভুবনবাবু একটু চুপ ক'রে রইলেন। পরে ব'ললেন, "আমরা যে আর্য্য, এ কথা না কি তুমি মান না।"

হেসে রবীন ব'ললে, "শশকের শিং আছে কি না ব'লতে পারেন? বাঁজা মেয়ের যে ছেলে তা দেখেছেন? আর্য্য জাতি সেই শশবিষাণ—সেই বন্ধ্যাপুত্র। আর্য্য জাতি নেই যে।"

"কি বল তুমি? পাগল হ'লে না কি?"

হো হো ক'রে হেসে মাষ্টার ব'ললে, "ঠিক ধ'রেছেন। বুদ্ধিমানেরা চিরদিনই পাগল। জানেন, নিউটনকে পাগলা গারদে ধ'রে নেবার জন্তে তাঁর পড়শী থানায় খবর দিয়েছিলেন?"

ভুবনবাবু বুঝলেন ছেলে মিথ্যা বলে নি, রবীন মাষ্টারের মাথা খারাপই হ'য়ে গেছে। ভুবনবাবুকে এজন্ত দোষ দেওয়া যায় না, কেন না, শুধু তিনি কেন, এ দেশের অনেক বড় বড় পণ্ডিতই জানেন না যে, রবীন মাষ্টার যা ব'লছিল সেইটাই পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত।

বড় দুঃখ হ'ল ভুবনবাবুর। রবীন মাষ্টারকে তিনি ভালবাসতেন। আর, হেড মাষ্টার যোগেশকে অতখানি ধমকে দেবার পর শেষ যদি তাঁকেই স্বীকার ক'রতে হয় যে, রবীন পাগল হ'য়ে গেছে তাতে তাঁকে বড় খেলো হ'য়ে যেতে হবে। তাই তিনি ভাবলেন, "দেখা যাক একটু বুঝিয়ে।" তাই ভেবে তিনি ব'ললেন, "শোন মাষ্টার, ও সব পাগলামী এখন তাকে তুলে রাখ। নইলে যে দেবতাকে তুমি মান, তাঁর সমূহ বিপদ, পেট চলা কঠিন হবে।"

"কেন?"

"চাকরী থাকবে না। হেড মাষ্টার আজই এসেছিল আমার কাছে নালিশ ক'রতে—তুমি ঠাকুর দেবতা মান না, ছেলেদের না কি শেখাও যে, আমরা আর্য্য নই—অনার্য্যেরা না কি সভ্য ছিল সেকালে, আর্য্যেরা না কি অসভ্য ছিল, বেদে না কি ঠাকুর দেবতা নেই—এই সব কথা! সে ব'লেছে, এ সব শেখালে চাকরী রাখা দায় হবে তোমার।"

রবীন মাষ্টার চমকে উঠে ব'ললে, "অ্যাঁ! একথা এতক্ষণ বলেন নি? তাই তো! কি ক'রতে হবে বলুন!"

"প্রথমে ঐ ঠাকুর ঘরে গিয়ে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রে আসতে হবে এখন—তারপর রোজ এসে দু'বেলা প্রণাম ক'রে যাবে।"

রবীন মাষ্টার তখনি উঠে গিয়ে ঠাকুর ঘরের সামনে প্রণাম ক'রে এলো। তারপর ব'ললে, "এ হয় হ'ল। কিন্তু ছেলেদের শেখাব কি? যা বলেন হেড মাষ্টারবাবু তাই শেখাতে রাজী আছি। পৃথিবী চ্যাপ্টা আর সূর্য্য একটা ঠাণ্ডা জিনিষ, এ সবই ব'লতে রাজী আছি। কিন্তু কেমন ক'রে শেখাই? যে বই তিনি ছেলেদের পড়াতে দিয়েছেন, তাতেই যে ছাই ঐ সব কথা আছে—আছে আমরা অনার্য্য, অনার্য্যেরা ছিল সভ্য—এই সব।"

"তাই না কি? কি বই সে।"

রবীন মাষ্টার বইয়ের নাম বললে, আর তারপর নামটা লিখে দিলে একখানা কাগজে।

"আচ্ছা, এখন তুমি যাও"—ব'লে ভুবনবাবু রবীনকে বিদায় ক'রলেন। দোরের কাছে গিয়ে সে ফিরে এসে ব'ললে, "দেখুন, আজ ঐ যে পিলের কিস্তি দিয়েছিলেন তার পরে, ব'ড়েটা না ঠেলে যদি দাবার কিস্তি দিতেন, তবেই মাৎ হ'তেন না আপনি, খেলাটা চ'টে যেতে।"

ভুবনবাবু ব'ললেন, "আচ্ছা যেতো তো যেতো—তুমি এখন বাড়ী যাও। মনে থাকে যেন যে সব কথা ব'লে দিলাম।"

"নিশ্চয়"—ব'লে রবীন মাষ্টার হন্ হন্ ক'রে হেঁটে চ'ললো। অনেকদিন পর্য্যন্ত রবীন মাষ্টারের একথা সত্যি মনে ছিল। ঠাকুর দেবতা দেখলেই সে সবার আগে গিয়ে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রতো।

ভুবনবাবুর বাড়ীতে থেকে অনেক ছেলে ইস্কুলে প'ড়তো। তাদের একজনের কাছে সেই হিষ্ট্রী বই বেরুলো। ভুবনবাবু তাকে ডেকে ব'ললেন, "আর্য্য জাতি সম্বন্ধে কোথায় কি আছে দাগ দিয়ে দাও তো।" সে দিল।

তারপর যোগেশকে ডেকে ভুবনবাবু ব'ললেন, "এই বইয়ের এই ক'টা জায়গা প'ড়ে মানে কর তো।"

ভুবনবাবু ইংরেজী জানেন না, যোগেশ জানে।

যোগেশ প'ড়ে মানে ক'রে গেল।

ভুবনবাবু ব'ললেন, "তবে? রবীন মাষ্টারের দোষটা কি? হেড মাষ্টার যে বড় গলায় তার নামে ব'লে গেল, এ কী বই সে পাঠ্য ক'রেছে, তার শুদ্ধির মাথা?"

"তাই তো! তাই তো!"—ব'লে যোগেশ চ'লে গেল।

তার পর দিন রবীন মাষ্টার ফার্ষ্ট ক্লাশে হিষ্টরী পড়াচ্ছিল। পড়ান হ'চ্ছিল হুমায়ুনের কথা। দোরের কাছ দিয়ে হেড মাষ্টারকে যেতে দেখে রবীন মাষ্টার খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'লতে লাগলো, "আর্য্যজাতি জগতের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি। রাজপুতেরা ছিল আর্য্য, আর আমরা আর্য্য। কিন্তু হুমায়ুন ছিল মোগল—অসভ্য অনার্য্য।"

হেড মাষ্টার শুনতে পেলেন। তিনি বুঝলেন সব, কিছু ব'ললেন না। ব'লবার মুখ ছিল না তাঁর।

কিন্তু আর এক দিক দিয়ে এতে বিপদ ঘটলো। ক্লাশে নতুন একটি মুসলমান ছেলে এসেছিল। একথা শুনে সে ভয়ানক চ'টে গেল। যদিও মোগলের সঙ্গে তার শত পুরুষের কারও সংশ্রব ছিল না, তবু হুমায়ুনকে অসভ্য অনার্য্য বলায় তার নিজের ব্যক্তিগত-ভাবে ভারি অপমান বোধ হ'ল।

বাড়ী গিয়ে ছেলেটি ইনস্পেক্টার আফিসে পাঠিয়ে দিলে এক বেনামী চিঠি। সেই চিঠি উঠতে উঠতে গেল লাট সাহেবের কাছে আর নামতে নামতে নেমে এলো হেড মাষ্টারের কাছে। হেড মাষ্টার রবীন মাষ্টারের কাছে লিখিত জবাব চাইলেন।

রবীন মাষ্টার ঝেড়ে অস্বীকার ক'রে লিখলে যে, হুমায়ুনের কথা সে মোটেই বলে নি, বলেছিল আটিলার কথা। তবু সে ক্ষমা প্রার্থনাটাও করে রাখলে।

সেদিন ভুবনবাবুর সঙ্গে দাবা খেলতে গিয়ে সে ব'ললে, "দেখুন বিপদ। আপনাদের আর্য্য ক'রতে গিয়েও যে চাকরী যায় আমার!"

কিন্তু চাকরী গেল না।

(ক্রমশঃ)

যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ী-দিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।

— বঙ্কিমচন্দ্র

বিহারীলাল

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্‌-এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ্‌-আর-ই-এস্‌

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'সারদামঙ্গল', ১৮৭৯

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 'সারদা-মঙ্গল'-এর রচনা আরব্ধ হয় এবং উহার চারি বৎসর পরে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই কাব্যখানি 'আর্য্যদর্শনে' প্রকাশিত হয়। ১২৮৬ সালে অর্থাৎ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে 'সারদামঙ্গল' সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই কাব্য প্রকাশের বহু-পূর্ব্বেই রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অমর কাব্যসমূহ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল। গীতি-কবিতার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অনুকরণে অনেকে কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধরলাল সেন, মনোমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি কবি সামান্য প্রতিভার অধি-কারী ছিলেন না।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

'সারদামঙ্গল' প্রকাশিত হইলে কয়েকজন রসজ্ঞ সাহিত্যিক উহার মাধুর্য্যে ও অভিনব প্রকাশ-ভঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণে উহার আশানুরূপ সমাদর করে নাই। সত্য বটে, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'সারদামঙ্গলে' "রমণীয় সৌন্দর্য্যের উদ্দাম বিকাশ" দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিলেন, এবং চন্দ্রনাথ বসু বাঙ্গালার শাসন বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ-বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন, "Sarada Mangala is a lyrical effusion of a kind which marks its author Babu Beharilal Chakravarti as one of the best of Bengali poets." কিন্তু কবির মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ যথার্থই দুঃখের সহিত বলিয়া-ছিলেন, "বিহারীলালের কণ্ঠ সাধারণের নিকট তেমন সুপরিচিত ছিল না।" তিনি লিখিয়াছিলেন, "আজ কুড়ি বৎসর হইল 'সারদামঙ্গল' 'আর্য্যদর্শন' পত্রে এবং ষোল বৎসর হইল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে; 'ভারতী' পত্রিকায় কেবল একটিমাত্র সমা-লোচক ইহাকে সাদর সম্ভাষণ করেন। তাহার পর হইতে 'সারদামঙ্গল' এই ষোড়শ বৎসর অনাদৃত ভাবে প্রথম সংস্করণের মধ্যেই অজ্ঞাতবাস যাপন করিতেছে।" 'সারদামঙ্গল' বিহারীলালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং উহারই উপর বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান নিরূপিত হইবে। সেই 'সারদামঙ্গল'কে 'ভারতী'র সমালোচক ভিন্ন আর কেহই সাদর সম্ভাষণ করিলেন না কেন? 'ভারতী'র পরিচালকগণের সহিত বিহারী-

লালের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে 'ভারতী'র সমালোচনা যে পক্ষপাতদুষ্ট হয় নাই, তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ বিহারীলালকে অনেকেই তখন 'ঠাকুর-বাড়ীর কবি' নামে অভিহিত করিতেন। অনেক গ্রন্থ আছে যাহার মূল্য সাধারণে নিরূপণ করিতে পারে না। কিন্তু উপযুক্ত সমালোচক এই সকল গ্রন্থের মূল্য বুঝিতে পারেন। যে সময়ে 'সারদামঙ্গল' প্রকাশিত হয়, সে সময়ে বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণধী সমালোচকের অভাব ছিল না। রাজেন্দ্র-লাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি সুধী সমালোচকগণ সকলেই কি অহেতুকী বিদ্বেষবশতঃ কাব্যখানিকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখিলেন? বঙ্গসাহিত্যে বিহারীলালের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমরা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিব। আপাততঃ 'সারদামঙ্গল' কাব্যখানি মোটামুটিভাবে দেখা যাউক। সাধারণের নিকট 'সারদামঙ্গলে'র উদ্দেশ্য ও অর্থ কি তাহা সহজে বোধগম্য হয় না। "এমন নির্ম্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, ভাষার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।" তথাপি উহার

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্দেশ্য ও অর্থ প্রশংসাবাদে সহস্রমুখ 'ভারতী'র সমালোচক বুঝিতে পারেন নাই। এবং কবির প্রিয়-শিষ্য রবীন্দ্রনাথ—যিনি উচ্ছ্বসিত স্তুতিপূর্ণ সমালোচনায় বিহারীলালকে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে অত্যুচ্চ স্থান দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন—তিনিও লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, "প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম তখন তাহার ভাষায়, ভাবে এবং সঙ্গীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম; অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না" এবং অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "প্রকৃত পক্ষে 'সারদামঙ্গল' একটি সমগ্র কাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না।" কিন্তু তাই কি? রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাহাতে সন্দেহবান। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, "কবি যে সূত্রে 'সারদামঙ্গলে'র এই কবিতাগুলি গাঁথিয়াছেন তাহা ঠিক ধরিতে পারিয়াছি কি না জানি না—মধ্যে মধ্যে সূত্র হারাইয়া যায়, মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বাস উন্মত্ততায় পরিণত হয়।"

যদি 'সারদামঙ্গল' একটি সমগ্র কাব্য না হইয়া কেবল মাত্র অসংলগ্ন কবিতা হইত তাহা হইলে কবি কি অখণ্ড কাব্যের আকারে উহা প্রকাশ করিতেন?

কবির অন্যতম ভক্ত ও বন্ধু অনাথবন্ধু রায় কবিকে কাব্যখানির উদ্দেশ্য কি জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে কবি তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন—"মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি 'সারদামঙ্গল' সঙ্গীত রচনা করি।

"সর্ব্বাদৌ প্রথম সর্গের প্রথম কবিতা হইতে চতুর্থ কবিতা পর্য্যন্ত রচনা করিয়া বাগেশ্রী রাগিণীতে পুনঃ পুনঃ গান করিতে লাগিলাম; সময় শুক্লপক্ষের দ্বিপ্রহর রজনী, স্থান উচ্চ ছাদের উপর, গাহিতে গাহিতে সহসা বাল্মীকি মুনির পূর্ব্ববর্ত্তী কাল মনে উদয় হইল, তৎপরে বাল্মীকির কাল, তৎপরে কালিদাসের। এই ত্রিকালের ত্রিবিধ সরস্বতী মূর্ত্তি রচনানন্তর আমার চির আনন্দময়ী, বিষাদিনী সারদা কখন স্পষ্ট, কখন অস্পষ্ট, কখন বা তিরোহিত ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন, বলা বাহুল্য যে, এই বিষাদময়ী মূর্ত্তির সহিত বিরহিত মৈত্রীপ্রীতির ম্লান করুণামূর্ত্তি মিশ্রিত হইয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

"এখন বোধ করি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি কোন উদ্দেশ্যেই 'সারদামঙ্গল' লিখি নাই।

"মৈত্রী ও প্রীতিবিরহ যথার্থ সরল সহজভাবে বুঝাইতে হইলে আমার সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত লেখা আবশ্যক করে, এবং সরস্বতীর সহিত প্রেম, বিরহ ও মিলন বুঝাইতে হইলে অনেকগুলি অসর্ব্ববাদীসম্মত কথা কহিতে হয়, কি করি বলুন, আমাকে কুক্টে ভাবিবেন না। একান্ত শুশ্রূষা বুঝিলে সারদা-প্রেমের অসর্ব্ববাদীসম্মত কথা পত্রান্তরে লিখিব, কেবল জীবনবৃত্তান্ত এখন লিখিতে পারিব না।"

নবীনচন্দ্র সেন

এই পত্রখানি কবির স্বর্গারোহণের পরে প্রকাশিত 'সারদামঙ্গলে'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকার পর মুদ্রিত হইয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রবন্ধ লিখিবার সময় উহা দেখিবার সুযোগ পান নাই। এই পত্র পাঠে প্রতীত হয় যে, কাব্যখানির সহিত তাঁহার জীবনের একটি গূঢ় রহস্য (যাহা তিনি তখন প্রকাশ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না), জড়িত আছে। কবি যে চির-আনন্দময়ী বিষাদিনী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া কাব্যখানি রচিত করিয়াছিলেন, তাহা কি নিছক কল্পনা হইতে উদ্ভূত, না কোনও রক্তমাংসের মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া তিনি তাঁহার অশরীরিণী ছায়াময়ী মানসীর মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন, এই প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। এবং এই প্রশ্নের সমাধান যে কাব্যটিকে বুঝিবার সহায়তা করিবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

এস্থলে স্মর্ত্তব্য যে 'বন্ধুবিয়োগ', 'নিসর্গ-সন্দর্শন', 'প্রেম-প্রবাহিণী' প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী রচনাসমূহে কবি বাস্তবকে অবলম্বন করিয়াই তিনি তাঁহার কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

'পঞ্চপুষ্পে'র একজন লেখক লিখিয়াছেন—"বিহারীলালের দুই পত্নীই তাঁহার কাব্য-রচনায় ভাবের

প্রস্রবণ-রূপিণী ছিলেন। প্রথমা পত্নী সরলা দেবীকে * সম্বোধন করিয়া 'বন্ধু-বিয়োগ' কাব্যের তৃতীয় সর্গ রচনা করেন। ইহাতে ইঁহার জীবনের কথা কিছু কিছু দেওয়া আছে। আর দ্বিতীয়া পত্নী কাদম্বিনী দেবীকে স্মরণ করিয়া 'সারদামঙ্গল' নামক সমস্ত কাব্যটাই রচনা করেন।

ইঁহার মতে কবির দ্বিতীয়া পত্নী কাদম্বিনীকে উদ্দেশ করিয়া সমগ্র 'সারদামঙ্গল' রচিত। এরূপ অনুমানের

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কারণ, বোধ হয় 'শান্তি' নামে মুদ্রিত 'সারদামঙ্গলে'র শেষ সঙ্গীতটী। সে সঙ্গীতটী এই—

প্রিয়ে, কি মধুর মনোহর মূরতি তোমার!
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার!
সদা যেন ঘরে ঘরে,
কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেববীণা বাজে সারদার!

* ইঁহার প্রকৃত নাম 'অভয়া'

ধাইয়ে হরষ-ভরে
কল-কোলাহল ক'রে,
হাসে খেলে চারিদিকে কুমারী কুমার!

হয়ে কত জ্বালাতন,
করি অন্ন আহরণ,
ঘরে এলে উলে যায় হৃদয়ের ভার!

মরুময় ধরাতল,
তুমি শুভ্র শতদল,
করিতেছে ঢল ঢল সম্মুখে আমার!

ক্ষুধা তৃষা দূরে রাখি,
ভোর হয়ে ব'সে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার!—
তোমায় দেখি অনিবার!

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক্ গে এ বসুমতী যার খুসি তার!

এই কবিতাটী যে কবি তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী কাদম্বিনীর উদ্দেশে লিখিয়াছেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু 'সারদামঙ্গলে'র প্রথম গীতটী পড়ুন,

নয়ন-অমৃতরাশি প্রেয়সী আমার!
জীবন-জুড়ান ধন, হৃদি ফুলহার!
মধুর মূরতি তব
ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখ শশী জাগে অনিবার!

কি জানি কি ঘুমঘোরে,
কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।

তবুও ভুলিতে হবে,
কি লয়ে পরাণ রবে,
কাঁদিয়ে চাঁদের পানে চাই বারেবার !

কুসুম-কানন মন
কেন রে বিজন বন,
এমন পূর্ণিমা-নিশি যেন অন্ধকার !

হে চন্দ্রমা, কার দুখে
কাঁদিছ বিষণ্ণ মুখে !
অয়ি দিগঙ্গনে কেন কর হাহাকার !

হয় তো হ'ল না দেখা,
এ লেখাই শেষ লেখা,
অন্তিম কুসুমাঞ্জলি স্নেহ-উপহার,—
ধর ধর স্নেহ-উপহার !

এ কবিতাটী কিছুতেই তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর উদ্দেশে লিখিত হইতে পারে না। কাদম্বিনী দেবী কবির মৃত্যুর পরেও জীবিতা ছিলেন, সুতরাং 'তবুও ভুলিতে হবে' ইত্যাদি বাক্য এবং গীতে ধ্বনিত বিষাদময়ী সুর তাঁহার উদ্দেশে রচিত কবিতায় বিদ্যমান থাকা অসম্ভব। তবে উহা কাহাকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত ?

বিহারীলালের এক প্রতিবেশী গৃহস্থের বাটীতে এক পরমা সুন্দরী বালবিধবা ছিলেন। বিহারীলাল ইঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন এবং সেই যুবতীটীও তাঁহাকে ভালবাসার প্রতিদান দিয়াছিলেন। বিহারীলালের এই পরিবার মধ্যে স্বচ্ছন্দ যাতায়াত ছিল এবং ইঁহাদের মিলনের পথে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু অবৈধ দৈহিক মিলনে সেই বালিকার ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপ দুর্বিষহ ও কলঙ্কময় হইবে, তাহা নিয়ত মনে স্মরণ থাকায় বিহারীলাল কেবল তাঁহার সৌন্দর্য্যই নয়ন ভরিয়া উপভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পাপের পথে পদার্পণ করিতে দেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন, 'সারদামঙ্গল' এই রমণীকেই তিনি উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু এ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত ও অমূলক। যদিও এইরূপ কল্পনায় 'তবুও ভুলিতে হবে, কি লয়ে পরাণ রবে' ইত্যাদি অংশের সমর্থ করা সম্ভব, তথাপি যে চরিত্রবান পুরুষ সমস্ত সুযোগ সত্ত্বেও একজন ভদ্রমহিলার সম্ভ্রম রক্ষার্থ নিজের প্রবৃত্তিকে বলিদান দিয়াছিলেন, তিনি যে প্রকাশ্য ভাবে কাব্যের উৎসর্গ-পত্রে তাঁহার প্রতি প্রেম নিবেদন করিবেন, ইহা অসঙ্গত মনে হয়। যে কাব্যের শেষ

মনোমোহন বসু

সঙ্গীতে তিনি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর স্তুতিগান করিয়াছেন, তাহারই প্রথম সঙ্গীতে তিনি কি অবৈধ আসক্তির অভিব্যক্তি প্রকাশ করিতে পারেন ? তাহার পর 'সারদামঙ্গলে'র মধ্যভাগে —

সেই আমি, সেই তুমি,
সেই এ স্বরগ-ভূমি,
সেই সব কল্পতরু, সেই কুঞ্জবন ;
সেই প্রেম সেই স্নেহ,
সেই প্রাণ, সেই দেহ ;
কেন মন্দাকিনী-তীরে দুপারে দুজন !

ইত্যাদি পদ দৃষ্টে মনে হয় যে, তাঁহার উদ্দিষ্ট প্রেয়সী মন্দাকিনীর অপর পারে—ইহজগতে নাই। অথচ যে মহিলার কথা উল্লিখিত হইল, তিনি বিহারীলালের স্বর্গারোহণের পরেও জীবিতা ছিলেন।

আমি যখন প্রথম 'সারদামঙ্গল' কাব্যখানি পাঠ করি, তখন উহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেও উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আমার মাতৃদেবীর শরণাপন্ন হইলাম!

শিবনাথ শাস্ত্রী

তাঁহার ব্যাখ্যা অনুসারে 'সারদামঙ্গল' কবির প্রথমা পত্নীর স্মৃতি অবলম্বন করিয়া লিখিত। প্রথম গীতটিতেই কবির হারানো প্রেয়সীর শোকময়ী স্মৃতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি একমাত্র জাগ্রত দেবতা মানিতেন তাঁহার চির-উপাস্যা সারদা—যাঁহার উদ্দেশে তিনি কাব্যান্তরে বলিয়াছেন —

যেন মা ও পদ্ম পরশি পরশি
হৃদয়ে আমার জীবন বয়!
মা তোমার রাঙা চরণ দুখানি
ধরিলে থাকে না মরণ-ভয়।

কলিযুগে সব দেবতা নিদ্রিত,
কেবল জাগ্রত তুমি;
আলো কোরে আছ লাবণ্য-কিরণে।
পবিত্র স্বরগ-ভূমি!

কবির হৃদয় যখন প্রিয়তমা পত্নীর বিরহে গভীর শোকে আচ্ছন্ন, যখন—

সর্ব্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাপালা,
উঃ! কি জলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুণ্ডে পতঙ্গ-পতন।

লোক-মাঝে দেঁতো-হাসি হাসি,
বিরলে নয়ন-জলে ভাসি;
রজনী নিস্তব্ধ হ'লে,
মাঠে শুয়ে দূর্ব্বাদলে,
ডাক ছেড়ে কাঁদি ও নিশ্বাসি।

শূন্যময় নির্জ্জন শ্মশান,
নিস্তব্ধ গম্ভীর গোরস্থান,
যখন যখন যাই,
একটু যেন তৃপ্তি পাই,
একটু যেন জুড়ায় পরাণ।

তখন কবি শান্তিলাভের আশায় ইষ্টদেবী সারদার ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং শমন-অপহৃতা পত্নীর কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার পরলোকগতা পত্নী ও সারদার মধ্যে যেন কোন পার্থক্য দেখিতে পাইলেন না। সমস্তই একাকার হইয়া গেল। কিন্তু

কখনও ধ্যানে সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পান, কখন পান না। 'সারদামঙ্গলে'র শেষ গীতির নাম 'শান্তি'। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর আবির্ভাবে, তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর প্রত্যেক কার্য্যে, তাঁহার প্রথমা পত্নীর কার্য্যের লীলার পুনরাবৃত্তি দেখিয়া তাঁহার মনে শান্তির উদয় হইল, তখন তাঁহারই মধ্যে তাঁহার হারানো প্রিয়তমাকে যেন খুঁজিয়া পাইলেন, তিনি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন —

প্রিয়ে, কি মধুর মনোহর মুরতি তোমার !
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার !
সদা যেন ঘরে ঘরে,
কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেববীণা বাজে সারদার !

চন্দ্রনাথ বসু

কিছুকাল হইল কবির জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত আমার এই বিষয়ে আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, তিনি তাঁহার পিতাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন 'সারদামঙ্গল' কাহাকে অবলম্বন করিয়া লিখিত কিন্তু তাঁহার পিতা কোন কথা না বলিয়া মৌনাবলম্বন করিতেন। তাঁহার জননীও কিছু জানিতেন না।

ইহা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়া পত্নী—যিনি সংসার পুনরায় সুখময় করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার নিকট যে প্রকাশ করিতে চাহেন যে, তিনি প্রথমা পত্নীর স্মৃতি সাদরে হৃদয়ে জাগরূক রাখিয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের পুত্রের নিকটেও ইহা প্রকাশ করা সমুচিত নহে।

অবিনাশবাবু (কবির জ্যেষ্ঠপুত্র) আমাদের ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "উহাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। এতদিনে আমি যেন 'সারদামঙ্গলে'র প্রকৃত অর্থ জলের মত বুঝিতে পারিলাম।"

রামগতি ন্যায়রত্ন

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, যখন তাঁহার প্রথমা পত্নীর স্মৃতিসম্বলিত 'বন্ধুবিয়োগ' কাব্যের মুদ্রাঙ্কন হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই 'সারদামঙ্গলে'র রচনাকার্য্য আরব্ধ হয়। ইহাতেও এই বিশ্বাসের সমর্থন করে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, এ বিষয়টি তিনি দ্বিতীয় পক্ষের সংসারের নিকট গোপন রাখিলেও ঠাকুরবাড়ীর অন্তরঙ্গ বন্ধুগণের মধ্যে উহা প্রকাশ করেন নাই কেন ? কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক বন্ধুগণের নিকট প্রণয়িনীর মধ্যে ইষ্টদেবীর লীলার প্রকাশরূপ বৈষ্ণবকবিজনোচিত ভাব-প্রকাশ কি উন্মাদের প্রলাপ বলিয়া উপহসিত হইত না ?

রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের তৃতীয় সংস্করণে লিখিত হইয়াছে—

"বৈষ্ণবেরা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে ভগবৎসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্ত্রে মাতৃ, কন্যা ও পত্নীভাবে সাধনের ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবের মধুর ভাবের ভজনে নিজের পুরুষাভিমান দূর করিতে হইবে, নিজেকে স্ত্রী হইতে হইবে। কিন্তু নিজের পুরুষভাব রক্ষা করিয়াও মধুর রস আস্বাদ করিবার এক উপায় সাধকগণ কেহ কেহ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই সাধনাই পত্নীভাবে ইষ্টদেবী লাভ। কবিও তাঁহার ইষ্টদেবী সারদাকে পত্নীরূপে ভজনা করিয়াছেন এবং প্রাণমাতোয়ারা ললিত সুছন্দে ভাব-তরঙ্গের উল্লাস-কল্লোলে আত্মহারা হইয়া কখন আগ্রহ, কখন মিলন, কখন বিরহ, কখন উৎকণ্ঠার মোহন চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।"

সাধারণ পাঠক 'সারদামঙ্গলে'র প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না এবং কেহ কেহ উহাকে উন্মত্তের প্রলাপ বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। শুনিয়াছি অক্ষয়-কুমার বড়াল মহাশয়ের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মনোযোগ সহকারে কাব্যখানি পাঠ করেন। পাঠ সমাপনান্তে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, উহা কাব্যই নহে, উহার কোনও উদ্দেশ্য নাই, উহা পাঠ করিয়া মনে কোনও স্থায়ী উচ্চ ভাবের উদয় হয় না। বিহারীলালের ভক্ত শিষ্য অক্ষয়কুমার ইহার উত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার উৎকৃষ্ট কাব্যের রসাস্বাদ,—উহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য অনুভব করিবার ক্ষমতা নাই।"

আমাদের মতে উভয়েই আংশিক সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট কাব্যের যদি কোনও উদ্দেশ্য না থাকে, উহা পাঠ করিয়া যদি মনে কোনও উচ্চভাব স্থায়ী না হয়, তাহা হইলে সে কাব্য কিরূপে সমাদরণীয় হইতে পারে? অপর পক্ষে কাব্য নীতিগ্রন্থ নহে, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি উহার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তবে এই সৌন্দর্য্য কোনও সন্নীতিকে আশ্রয় না করিলে, উহা কিরূপে সুধীগণের মনোহরণ করিতে পারে? 'সারদা-মঙ্গলে' যে অপরূপ সৌন্দর্য্যের বিকাশ দেখা যায় তাহা উহাকে বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যে যে শ্রেষ্ঠ কাব্যসমূহের মধ্যেও উচ্চ স্থান দিয়াছে, একথা অবিসম্বাদিত সত্য। আবার ইহাও সত্য যে, "সূর্য্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মত 'সারদামঙ্গলে'র সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয় কিন্তু কোন রূপকে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্য্য স্বর্গ হইতে একটী অপূর্ব্ব পূরবী রাগিনী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সাধারণে 'সারদামঙ্গলে'র উপযুক্ত সমাদর না করিলেও অনেক তরুণ কবি বিহারীলালের ভক্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার বড়াল, রাজকৃষ্ণ রায়, অধরলাল সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রিয়নাথ সেন সর্ব্বপ্রধান। রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার প্রকাশ্যভাবে বিহারীলালকে তাঁহাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রথম

রচনায় বিহারীলালের কিছু কিছু প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু অন্য কোনও কবির রচনায় তাহা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের রচনায় বিহারীলালের কাব্যের ভাষা ও রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু নারীর যে পবিত্র দেবীমূর্ত্তি বিহারীলালের মানসনয়নের সমক্ষে আবির্ভূতা হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বত্র তাহার দর্শন পান নাই। তাঁহার কবিতা অনেকস্থলেই গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কেবল hazy নহে—sensuous। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার তাঁহার গুরুর গুণ পূর্ণমাত্রায় অধিকার করিয়াছিলেন, সময়ে সময়ে মনে হয় তিনি তাঁহার কাব্য-গুরুকেও অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে নিরর্থক বাক্‌চাতুরী নাই, তাঁহার কাব্য কুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন নহে, অথচ তাঁহার ভাষার সংযম কাব্যের সৌন্দর্য্যকে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করে নাই।

(ক্রমশঃ)

বন্দী সে রহিবে অনুক্ষণ

শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

দুরন্ত যৌবন মোর উচ্ছ্বসিয়া ছুটিবারে চায়
ধরিত্রীর সর্ব্বদেশে ; সর্ব্ব তার : হবে তার জয়
হবে জয়, হবে জয়—নাহি ক্ষতি, নাহি কোনো ভয়—
এই সে সান্ত্বনা-বাণী ঊর্দ্ধ হ'তে কে যেন জানায়।
কে যেন জানায় মোরে আমি কবি, অমৃতের বাণী
কণ্ঠে মোর জাগে নিত্য,—অনুরাগে মত্ত রহি তাই,
আলোর অমৃত দানি' জিনি' যাব সর্ব্ব দুনিয়াই
জিনি' যাব সর্ব্ব হিয়া, হরি' যাব সর্ব্ব দুঃখ-গ্লানি।

যৌবনের অশ্ব ছুটে,—শিরে তার জয়-পত্র লিখা,
যে রুধিবে অশ্ব মোর, তার সাথে সংগ্রাম ভীষণ,
পুষ্পধনু করে মোর,—বুকে মোর আছে আলো শিখা,
সংগ্রামে জিনিয়া তার নিব কাড়ি প্রেম আর মন।
বন্দীজনে মুক্তি দেব। তবু জানি হারায়ে মণিকা
কোথা সে নারিবে যেতে, বন্দী সে রহিবে অনুক্ষণ।

মালতী

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

১

ভাদ্রের নদী কানায় কানায় ভরা; কোথাও তরঙ্গের ভঙ্গী নাই; দুই তীরের সুবর্ণ বর্ণের শস্যক্ষেত্র জলময়; সুবিস্তীর্ণ জলরাশি দিগন্ত ব্যাপিয়া—শান্ত পরিপূর্ণতার রূপ। শরত-প্রভাতের স্বচ্ছ আলোকে হরিত-শ্যাম চিত্রপট ঝলমল করিতেছে; মাঝে মাঝে নদী-জলধারা মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হইয়া ছলছল করিয়া উঠিতেছে।

ডেপুটিবাবুর বজরা ধীরে চলিয়াছে। মাঝিরা সারা রাত্রি লগি ঠেলিয়া ঠেলিয়া এক প্রকাণ্ড বিল পার হইয়া শ্রান্ত; ভোর বেলা বজরা বড় নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে; সকালের বাতাস উঠিতেই পাল তুলিয়া দিয়া মাঝিরা তাম্রকূট সেবনের বন্দোবস্ত করিতেছে।

সুকুমার 'টুরে' বাহির হইয়াছে। সঙ্গে স্ত্রী মনোরমা। বিবাহ বহুদিন হইয়াছে কিন্তু ডেপুটি-গৃহিণীর কোন সন্তান হয় নাই। স্বামী 'টুরে' বাহির হইলে তিনিও স্বামীর সহিত বাহির হ'ন। তা ছাড়া, এবার জমিদার-বাড়ীর বজরা পাওয়া গিয়াছে, পৃথক রান্নাঘর, স্নানের ঘর প্রভৃতি অত্যন্ত সুবন্দোবস্ত; পাড়িও দীর্ঘ।

বজরার ছাদে এক বেতের চেয়ারে বসিয়া সুকুমার শারদ নদীর শোভা দেখিতেছিল, জলময় অগাধ পরিপূর্ণতা, দিকে দিকে রৌদ্রোজ্জল শ্যামশ্রী, আকাশে নির্মল নীলিমা। পৃথিবী যে কি অপূর্ব্ব সুন্দরী, তাহা সে কোনদিন এমন গভীর ভাবে অনুভব করে নাই। কিন্তু এই বাধাহীন সোনালি আলোকময় আকাশ, এই বহুদূর বিস্তৃত স্তব্ধ জলরাশি, এই মৃদু হিল্লোলিত শস্য-ক্ষেত্রের গাঢ় সবুজ হইতে চঞ্চল মেঘস্তূপের মায়াময় শুভ্রতা পর্য্যন্ত অসীম পৃথিবী ভরিয়া যেমন গভীর শান্তি তেমনি করুণাপূর্ণ বিষাদ। সুকুমারের দুই চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের সহিত বুঝি গভীর বেদনা জড়িত।

নদীটি একটু সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে, অদূরে ছোট গ্রাম, তীরে বড় নারিকেল, খেজুর, আম নানা প্রকার ছায়াতরু, বাঁশবন, শরবন।

একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ, অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের মত, জীর্ণ, স্তব্ধ। পাতা প্রায় সব ঝরিয়া পড়িয়াছে, শুধু সুদীর্ঘ শাখা-প্রশাখাগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া বিদ্যুল্লতার মত কোন মত্ত আবেগে দিগ্‌বিদিকে প্রসারিত! মাঝিরা সেই পুরাতন বটবৃক্ষের নীচে বজরা বাঁধিল।

চাপরাসী সেলাম করিয়া নিবেদন করিল, "হুজুর নন্দিগ্রাম যেতে হলে এখানে নামতে হবে। নন্দিগ্রামের পেয়াদা ঘাটে বসে আছে দেখছি।"

পথে নন্দিগ্রামে ইন্‌স্পেক্‌সানে যাইবার কথা। সুকুমার উঠিয়া দাঁড়াইল। কোট প্যাণ্ট পরিয়া চা খাইয়া সে তৈরীই ছিল। চাপরাসীকে বলিল, "আমার হ্যাট ও ছড়ি নিয়ে এসো। নন্দিগ্রাম এখান থেকে কতদূর?"

চাপরাসী উত্তর দিল, "আজ্ঞে তিন মাইল পথ হবে।"

সুকুমার বুঝিল, দেড় ক্রোশের কম হইবে না, ঘোড়া পাইলে সুবিধার হইত। পাল্কী বা গরুর গাড়ীতে যাওয়ার চেয়ে হাঁটিয়া যাওয়া ভাল। শীঘ্র বাহির হওয়া দরকার।

ডেপুটি-গৃহিণী বজরার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন, "ওগো, বেশী দেরী কোরো না। আর আরদালীকে দিয়ে দু'টো মুরগী পাঠিয়ে দিও, শীগ্‌গির, মিঠে কোর্ম্মা করব, কেমন?"

সুকুমার তাহার স্ত্রীর দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিল। আট বৎসর তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, তবু মাঝে মাঝে

কেন মনে হয়, তাহার স্ত্রী তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিতা, সে অবাক হইয়া যায়।

স্ত্রী বলিলেন, "কি, অমন হাঁ করে চাইছ কি? দেখো আলু আর দু'দিন হবে, এ গ্রামে যদি আলু পাওয়া যায়, দেখো ত'।" "আচ্ছা"—বলিয়া সুকুমার মাথায় সোলার টুপি দিল।

২

তীরে নামিয়া একটু চলিতেই সুকুমার চমকিয়া উঠিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে বিস্মিত নয়নে দেখিতে লাগিল। এই গ্রাম, এই পথ তাহার বহু-পরিচিত মনে হইল, যেন কোন পূর্ব্ব-জন্মে দেখা, কোন স্বপ্নে জানা। তাহার মনে হইল, এমনি এক করুণ মধুর প্রভাতে ওই বটগাছের নীচে তাহাদের নৌকা আসিয়া লাগিল, সে তাহার বন্ধুর সহিত উৎসুক অন্তরে আনন্দে তীরে নামিল—হাস্যে, গল্পে গ্রাম্য-পথ মুখরিত করিয়া চলিল। সে কি কোন স্বপ্নে এই শান্ত সৌন্দর্য্য-লোকে আসিয়াছিল?

ধীরে সুকুমারের মনে পড়িল। বোধ হয় নয় বৎসর পূর্ব্বে হইবে। তখন সে এম্-এ পড়ে। সতীশ রায় তাহার অন্তরের বন্ধু ছিল। সে কলিকাতার মানুষ, বাঙ্‌লার গ্রামের সহিত বিশেষ পরিচিত নয়। কোন ছুটিতে সতীশ তাহাকে জোর করিয়া নিজের দেশে লইয়া আসিয়াছিল। এমনি সুন্দর প্রভাতে সতীশ ও সে কি আনন্দে ওই বটগাছের ধারে নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল! বটগাছটি এমন জীর্ণ কঙ্কালসার ছিল না, তাহার শাখা-প্রশাখা ঘন সবুজ পাতার ভারে আনত ছিল, তাহার স্নিগ্ধ ছায়ার পারাপারের খেয়াঘাট ছিল। তখন শরৎ কি শীত, কি বসন্তকাল মনে পড়িল না, সে প্রভাতে আকাশের আলো আরও নির্ম্মল, আরও উজ্জ্বল ছিল, বাতাসের স্পর্শ আরও মধুর ছিল, প্রকৃতির শোভায় কোথাও বিষণ্ণতা ছিল না। সে আকাশ, সে আলো কোথায় গেল? এ জীবনে আর কি তাহার দেখা মিলিবে না?

ওই শূন্য মাঠে হাট বসিয়াছিল, এই বিজন নদীতীর বিপণি-নৌকায় ভরা ছিল, নদী এত শীর্ণ, এত শান্ত ছিল না, কিন্তু সুকুমারের মানস-নদী ছিল কূলে কূলে ভরা।

সতীশ ও সুকুমার তীরে নামিতেই এক বালিকা-কণ্ঠে "দাদা" আহ্বানধ্বনি তাহাদের কানে আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু সুমিষ্ট আহ্বানকারিণীকে কোথাও দেখা গেল না। সতীশ হাসিয়া বলিল, "ও মালতী, কোথায় নিশ্চয় লুকিয়ে আছে, বটগাছের পেছনে হবে। মালতি!"

বটগাছের পেছন হইতে এক কিশোরী হাসিয়া ছুটিয়া আসিয়া "দাদা" বলিয়া সতীশকে প্রণাম করিল। সতীশ তাহাকে একটু আদর করিয়া বলিল, "ইনি আমার বন্ধু সুকুমার, মস্ত কবি।" মালতী মুগ্ধ চোখে সুকুমারের দিকে চাহিল, সদ্য-ফোটা শেফালির মত স্নিগ্ধ চাহনি। দাদার বন্ধুকেও প্রণাম করা উচিত ভাবিয়া সুকুমারকে প্রণাম করিতে আসিল। "না, না, কর কি?"—বলিয়া সুকুমার একটু পেছনে সরিয়া গিয়া মালতীর হাত ধরিল, মালতী ঘাড় হেঁট করিয়া কোন মতে প্রণাম সারিয়া লইল। তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

"দাদা শীগ্‌গির চলো, মাসীমা বড় ভাবছেন, তোমাদের কাল সন্ধ্যেতে আসবার কথা ছিল, মাসী সারারাত ঘুমোন নি—"

সতীশ বলিল, "বা, আমরা যে কাল তীরনের বিলে পথ হারিয়ে সারারাত ঘুরেছি—চল্, তোর জন্যে ভাল শাড়ী আর ছবির বই এনেছি।"

তিনজনে গ্রামপথ দিয়া চলিল। মধ্যে সতীশ, এক পার্শ্বে সুকুমার, অপর পার্শ্বে মালতী। মালতী সতীশকে বাড়ীর ও গ্রামের নানা সংবাদ বলিতে বলিতে চলিল, তাহার সুমিষ্ট কুমারী-কণ্ঠে সরল হাস্যলহরী চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সুকুমার নীরব মুখে মালতীর কণ্ঠস্বর বাক্যধারা শুনিতেছিল, বাঙ্‌লাভাষা যে এত সহজ, এত মিষ্ট হইতে পারে, তাহা সে কোনদিন ভাবে নাই।

মালতীর কথা সে সতীশের নিকট বহুবার শুনিয়াছে। পিতৃমাতৃহীনা এই বালিকা সতীশের মাসতুতো বোন। সতীশের মা'র কোন কন্যা সন্তান নাই, তিনি মালতীকে আপন কন্যার অধিক যত্নে রাখিয়াছেন। সতীশের ইচ্ছা মালতীকে কলিকাতায় আনিয়া স্কুলে পড়ায়। কিন্তু সতীশের মাতা কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে চান না—গ্রামের জমিজমা দেখিবার ভার নায়েব মহাশয়ের হাতে দিতে তিনি নারাজ। একবার কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই বদ্ধ নগরে ক্ষুদ্র বাড়ীর মধ্যে দু'দিনেই হাঁপাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, সতীশ তাঁহার একমাত্র পুত্র; আপন বুদ্ধি পরিশ্রমে ক্ষুদ্র জমিদারীর পরিচালনা করিয়া তিনি সতীশকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। মালতীও সতীশের মাকে ছাড়িয়া থাকিতে চায় না, সেজন্য কলিকাতায় আসিয়া তাহার শিক্ষালাভ হইল না। সে গ্রামের স্কুলে কিছুদিন পড়িয়াছে, তারপর সতীশ যখন ছুটিতে যায় তাহাকে পড়াইতে বসে; বই পড়া বিশেষ হয় না, নানা গল্পে সে দেশের বিজ্ঞানের নানা কথা তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করে

মালতীকে সুকুমারের অপূর্ব্ব বোধ হইল। ডুরে শাড়ীপরা, কোঁকড়া চুল পিঠে দুলিতেছে, আয়ত কৃষ্ণ চক্ষু দু'টিতে স্নিগ্ধ সরলতা, সহজ হাসি মাখান; সুস্থ দীর্ঘ তনু বিকশিত, সদ্য-প্রস্ফুটিত মৃণালের মত, কিন্তু মুখখানি অতি কচি; শ্যামবর্ণ, এই শরতের শ্যামশ্রীর মধ্যে গৌরবর্ণ মানায় না, তাহার শ্যামবর্ণ-ই সব চেয়ে সুন্দর দেখায়; বালিকার চঞ্চলতা তাহার চক্ষের নাচনে, দেহের ভঙ্গীতে; নিষ্কলুষ চিত্তের স্বচ্ছতা সরল সুকুমার মুখে প্রকাশিত। বিকচোন্মুখ কুঁড়ির উপর ভৃঙ্গের মত তাহার কিশোরী তনুতে যৌবন আসিয়া বসিয়াছে, তাহার অন্তরবাসিনী সে সংবাদ এখনও জানে না।

গ্রাম ছাড়াইয়া তাহারা অবারিত মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল; যতদূর চক্ষু যায় সোণালী ধানের ক্ষেত, হরিতে হিরণে, সবুজে সুনীলে কি অপরূপ শোভা! ক্ষেতের মধ্য দিয়া একটি পায়-হাঁটা পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, এই পথ দিয়া সতীশের বাড়ী যাইতে হইবে। চারিদিকে সতীশদের জমি, কয়েক শত বিঘা।

"হুজুর ওদিকে পথ নেই, নন্দিগ্রাম যাবার পথ এদিকে—"

যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া চমকিয়া সুকুমার চাহিল। সম্মুখে তকমা-ধারী দুই পেয়াদা, চারিদিকে শূন্য প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, কোথাও ধানকাটা হইয়া গিয়াছে, কোথাও পোড়ো জমি, কোথাও জল জমিয়া পানায় ভরিয়া গিয়াছে। ডেপুটি-জীবনের মূর্ত্তিমান সাক্ষ্যস্বরূপ পেয়াদা দুইটি আবার বলিয়া উঠিল, "হুজুর পথ এদিকে, ওদিকে মাঠের মধ্যে কোথায় যাবেন?"

সুকুমার গম্ভীরস্বরে বলিল, "রায়দের বাড়ী যাবার পথ কোন্ দিকে হবে?"

স্থানীয় পেয়াদাটি উত্তর দিল, "কোন পথ নেই হুজুর, আলে আলে যেতে হবে। তাঁদের ত' কেউ নেই হুজুর, বাড়ী ভেঙ্গে পড়েছে, সব জঙ্গল হয়ে গেছে।"

সুকুমার বলিল, "আচ্ছা, তোমরা যাও। আজ আর নন্দিগ্রামে যাওয়া হবে না, তোমরা ফিরে যাও, আমার এদিকে একটু কাজ আছে।"

পেয়াদারা অতি বিস্মিত হইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

কাদা ভাঙিয়া, আল পার হইয়া, কাশবনের পাশ দিয়া, বাঁশবনের মধ্য দিয়া জঙ্গলময় বাগানে ঢুকিয়া সুকুমার এক ভগ্ন অট্টালিকার সন্ধানে চলিল। মাথা হইতে টুপি কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, জামা দু'জায়গায় ছিঁড়িয়া গেল, হাত পা ক্ষত বিক্ষত হইতেছে, সেদিকে তাহার লক্ষ্য নাই। তাহার মনে হইল, তাহার সহিত সতীশ ও মালতী হাসিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে।

মালতী বলিল, "দেখ দাদা, কি সুন্দর ধান হয়েছে।"

সতীশ উত্তর দিল, "যা খুব খুসি!"

"হাঁ দাদা, মাসীমা তিনটে নূতন গোলা করেছেন ; জানো দাদা, কাল দয়ের ওদিকে কাদাখোঁচা পাখী দেখেছি, তোমার বন্ধু বন্দুক ছুঁড়তে জানেন ?"

"বন্দুক ত' একটি এনেছেন, কি শিকার করেন দেখা যাক।"

"জানো দাদা, কালিগ্রামে বাঘ বেরিয়েছে, আহা পরশু দু'টো বাছুর নিয়ে গেছে না কি, তোমার বন্ধুকে বাঘ শিকার করতে নিয়ে যাও।"

"ওরে বুড়ি, উনি কবি যে, উনি কি এখানে বাঘ শিকার করতে এসেছেন, উনি এসেছেন প্রকৃতির শোভা দেখতে,—গাছ, ফুল, পাখী চিনতে, পাড়াগাঁতে চাষারা কেমন থাকে তাই জানতে।"

"দাদা, এবারে কিন্তু আমাদের কপির চাষ করতে হবে।"

আম-জাম-বাগান ভরিয়া বাতাস মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল। মালতীর সরল হাস্যোচ্ছ্বাস সুকুমারের কানে বাজিতে লাগিল।

৩

কোথায় সেই দহ ? দহটি প্রথম দেখিয়া সুকুমার চমৎকৃত হইয়াছিল। চার মাইল লম্বা ও প্রায় এক মাইল চওড়া এই দহ হ্রদের মত মনে হয়। সতীশের পিতা এই দয়ের তীরে পৈতৃক পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বৃহৎ ভগ্ন অট্টালিকার সম্মুখে সুকুমার আসিয়া দাঁড়াইল। দরজা-জানালার পাল্লাগুলি কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে, সম্মুখের বারান্দা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দেওয়ালে বহুস্থানে বালি খসা, একদিকের ছাদ নীচু হইয়া বাড়ীটি যেন হেলিয়া গিয়াছে, নানা বন্যলতা বাড়ীর সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে খেজুর নারিকেল গাছের ভীড়।

জলাভূমি ; সেই দিগন্তবিসারী নির্ম্মল দ আর নাই। শোলা, কলমী, কচুরী পানা, চেঁচো ঘাসে বদ্ধ জলা। তীরের নিকট কোথাও বা লাল সাদা নানা রং-এর শাপ্‌লা ফুল। কাকচক্ষু অগাধ জলরাশি গলিত রজতধারার মত টলমল করিত, সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তে তাহাতে রং-এর হোলিখেলা হইত, মেঘের ছায়া পড়িত, চাঁদের মায়া ঘনাইত, অন্ধকার রাত্রে দর্পণের মত চকমক করিয়া উঠিত। কোথায় সেই দ ?

ভাঙা ঘাটে এক পাথরের উপর সুকুমার বসিয়া পড়িল। তাহার যেন আর দাঁড়াইবার শক্তি নাই। ঘাটের বাঁধানো বসিবার স্থান অশ্বত্থমূলবিদারিত। চারিদিকে প্রাচীন শাখাবহুল বৃক্ষগুলি আন্দোলিত করিয়া হা হা করিয়া বাতাস বহিয়া গেল। সম্মুখে সবুজের পঙ্কিল আস্তরণের মধ্যে একটু জল রৌদ্রে ঝিকমিক করিতেছে, অশ্রুভরা নয়নের মত করুণ।

স্বপ্নছবির পর ছবি ভাসিয়া উঠিল। কোন পূর্ব্ব সুখ-জীবনের কথা। বহু বৎসর পূর্ব্বে সতীশ ও মালতীর সহিত কাটানো এই দহের ধারের দিনরাতগুলি। গল্পের একটানা সূতায় সে কথা সে ভাবিতে পারিল না, বেদনার টানে সূতা বার বার ছিঁড়িয়া গেল। স্মৃতি কথক নহে, সে চিত্রশিল্পী, চিরপ্রবহমান জীবন হইতে কয়েকটি দৃশ্য বাছিয়া সে ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে। সুকুমারের মনে পড়িল খণ্ড খণ্ড ঘটনা।

কলিকাতায় কখনও সে ভোরে উঠিত না। কিন্তু সতীশদের গ্রামে আসিয়া প্রতিদিন সে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উঠিত। দহের ধার দিয়া, শিশির ভেজা ঘাসের উপর বহুদূর চলিয়া যাইত, তাল নারিকেল পত্রগুলির মধ্য দিয়া সূর্য্যোদয় দেখিতে বড় ভাল লাগিত। এক ঊষায় জাগিয়া দেখিল, সতীশ তখনও ঘুমাইতেছে, তাহাকে জাগাইল না, একা ঘর হইতে বাহির হইল। চারিদিক তখনও ছায়াভরা, প্রকাণ্ড প্রাঙ্গনে ধানের গোলাগুলি পার হইয়া সে গোয়াল ঘরের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। পরিচ্ছন্ন বৃহৎ গোয়াল ঘর, তাহার আঙ্গিনাতে এক পরিতৃপ্ত, পরিপুষ্ট গাভীর পার্শ্বে মালতীর স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, আবছায়ায় রহস্যময়। সুকুমার পা টিপিয়া গাভীর

দিকে অগ্রসর হইল। তরল অন্ধকারে অজানা মানবমূর্ত্তি দেখিয়া গাভীটি ভীত হইয়া লাফাইয়া উঠিল, তাহার পায়ের আঘাতে দুধে-ভরা এক পেতলের বাল্‌তি উল্টাইয়া পড়িল। মালতী চেঁচাইয়া উঠিল, "পুঁটি কি করলি!" তারপর সুকুমারকে দেখিয়া উচ্চহাস্যে বলিয়া উঠিল, "ও আপনি! বেশ! চোরের মত আসছেন কেন, আপনার জন্যে কি হ'ল দেখলেন?"

সুকুমার বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমার জন্যে?"

মালতী উত্তর দিল, "বা, আপনাকে দেখে ভয় পেয়েই পুঁটু বাল্‌তি ওল্টালে। তা বেশ, মাসীমা বলেছিলেন, আপনার জন্যে ক্ষীর-কমলা আর চন্দ্রপুলী করবেন, তা আর খেতে পেলেন না।"

সুকুমার লজ্জিত হইল। বলিল, "দেখ, মাসীমাকে বোলো না, তুমি গাঁ থেকে কিছু দুধ আনবার ব্যবস্থা কর।" মালতী কলহাস্য করিয়া উঠিল, "আচ্ছা আচ্ছা, আপনার দুধের কথা ভাবতে হবে না।" তাহার সবল হাসির মত সুন্দর, শুভ্র ফেনময় দুগ্ধস্রোত গোষ্টপ্রাঙ্গনে প্রবাহিত হইয়া গেল। গাভী পুঁটু মালতীর হস্তের একটি মৃদু চপেটাঘাত লাভ করিল।

সুকুমার দহের তীরে আসিয়া বসিল, শুকতারার দপ্‌দপানি, উষার আলো, জলের শীতল অতলতা তাহার বড় মধুর লাগিল।

একদিন প্রভাতে মালতী আসিয়া সতীশকে বলিল "দাদা, আজ দয়ে সাঁতার কাটবে চল; তোমার বন্ধু সাঁতার কাটতে জানেন?"

সুকুমারের সাঁতার শিক্ষা কলিকাতায়, গোলদিঘি-সুইমিং ক্লাবের সে এক উৎসাহী সভ্য।

তিনজনে মিলিয়া সাঁতার কাটিতে চলিল। সতীশের মাতা মালতীর এত দুরন্তপনা পছন্দ করিতেন না, কিন্তু সতীশ তাহাকে প্রশ্রয় দিত বলিয়া তিনি বাধা দিতে পারিতেন না।

গাছ হইতে জলে লাফাইয়া পড়া, জল ছোঁড়াছুঁড়ি, মাতামাতি, ডুব-সাঁতার—সে কি সহজ সুখ!

তিনজনে সাঁতার-প্রতিযোগিতা। সুকুমার বেশী দূর যাইতে পারিল না, দহের জল যেন ভারী। সতীশ ইচ্ছা করিয়াই, অতি পরিশ্রান্ত, এরূপ ভাব দেখাইল। প্রতিযোগিতায় জিতিয়া মালতীর কি হাসি, কি আনন্দ! বহুদূর সাঁতার কাটিয়া গিয়া তিনজনে যখন দহের তীরে বিশ্রাম করিতে বসিল, সুকুমার মুগ্ধনেত্রে দেখিল, মালতীর জলে-ভেজা কালোচুলে সূর্য্যালোকের ঝল-মলানি, হাস্যদীপ্ত আননে অধরে স্মিতহাস্যের রেখায় রেখায় আলোক-লীলা। যেন কোন স্বপ্নময়ী নাগবালা সূর্য্যাংসিত জলরাশির অতলতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে।

বিজন স্তব্ধ মধ্যাহ্ন; দহের স্থির জলে শুভ্র মেঘ-স্তূপের ছায়া, বাঁশবন তালবনের ছায়া।

সুকুমার এক গাছের তলায় বসিয়া একটি ইংরাজি কবিতার বই পড়িতে চেষ্টা করিতেছিল। গাছের ওপর হইতে একটি পেয়ারা তার বই-এর ওপর আসিয়া পড়িল। সে উপরে চাহিয়া দেখিল, গাছের পাতার আড়ালে মালতী লুকাইয়া। ধীরে সে গাছে উঠিতে চেষ্টা করিল, মালতী গাছ হইতে লাফাইয়া পালাইতে গেল, সুকুমার তাহার পেছন ছুটিল, আম-বাগানে দু'জনে ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। লাফাইয়া পড়িতে গিয়া মালতীর পা একটু মচকাইয়া গিয়াছিল, সুকুমার সহজে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, তাহার কোমল হাত দৃঢ় করিয়াই ধরিল। মালতী হাসিয়া চেঁচাইল, "উঃ, লাগছে ছেড়ে দিন।" তাহার সমস্ত মুখ আরক্ত। সুকুমার আরও দৃঢ় করিয়া দুই হাত ধরিল। সহসা মালতী কাঁদিয়া ফেলিল; তাহার সত্যই লাগিতেছিল। সুকুমার হাত ছাড়িয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে বলিল, "মালতী, আমায় ক্ষমা করো।"

লজ্জায় কান্না চাপিয়া মালতী চলিয়া গেল।

সুকুমারের চোখে প্রখরালোকদীপ্ত পৃথিবী বড় শূন্য মনে হইল। সে আন্‌মনা গাছতলায় বসিয়া পড়িল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মালতী এক শালপাতার ঠোঙাতে অপরিমিত লঙ্কা-লবণ মিশ্রিত আমের আচার লইয়া আসিয়া যখন বলিল, "খাবেন?" লঙ্কা খাওয়া অভ্যাস না থাকিলেও সে হাসিমুখে 'উঃ' 'আঃ' করিয়া সমস্ত আচার শেষ করিল।

সে সন্ধ্যাটি সে জীবনে ভুলিতে পারিবে না। ঘর অন্ধকার, বারান্দায় বসিয়া সে সূর্য্যাস্ত দেখিতেছিল। পূর্ব্বাকাশ কালো মেঘে ছাওয়া, পশ্চিমাকাশের মেঘ-স্তূপে রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি, দহের জল গলিত স্বর্ণের মত।

সুকুমার দেখিল, অদূরে অঙ্গন দিয়া মালতী প্রদীপ হস্তে চলিয়াছে, তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিয়া যাইতেছে, দেবী প্রতিমার মত মুখখানি প্রদীপের শিখায় উদ্ভাসিত, কি স্নিগ্ধ, কি অপরূপ!

তাহার ইচ্ছা হইল, সে বলিয়া ওঠে, মালতি, আমার গৃহ অন্ধকার, ওই প্রদীপ হস্তে তুমি আমার গৃহে এসো, ওই মঙ্গলস্নিগ্ধ শিখায় আমার জীবন আলোকিত করিয়া তোল।

সুকুমারের যৌবন-হৃদয়ের যে বিজন গৃহে জীবন-প্রিয়ার জন্য আসন পাতা হইয়াছে, প্রেমারতির প্রদীপ অনাগতার প্রতীক্ষায় নীরবে জ্বলিতেছে, সে গৃহে মালতী কখন নিঃশব্দ চরণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সে জানিতে পারে নাই। সে সন্ধ্যায় প্রেম-প্রদীপ জলজল করিয়া উঠিল।

আর একটি দ্বিপ্রহর, নিঝুম উদাস আলোর দিবা-স্বপ্নের জাল বোনা যায়।

জমিদারীর কোন মকর্দ্দমা তদারকের জন্য সতীশকে সহরে যাইতে হইয়াছে, সেখানে কয়েকদিন থাকিতে হইবে। তা ছাড়া মালতীর জন্য এক সৎ-পাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, কোন উকীলের পুত্র। তাহাকেও দেখিয়া সব খোঁজ খবর লইয়া আসিবে।

সুকুমার এক কদমগাছের তলায় বসিয়া টুর্গেনিভের 'অন্ দি ইভ' বইখানি পড়িতেছিল। বইখানি তাহার দুইবার পড়া, আর একবার পড়িতে চেষ্টা করিয়া আন্‌মনা হইয়া উঠিতেছিল। মালতী সহাস্যে আসিয়া বলিল, "বা, বেশ, সারাক্ষণ নিজে নিজে বই পড়ছেন, আমায় ত' একটু পড়ান না?"

"শুনবে এই বইয়ের গল্প?"

"বলুন, নিশ্চয় শুনব।" মালতী চুল এলাইয়া গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া পা ছড়াইয়া বসিল।

সুকুমার টুর্গেনিভের উপন্যাসের গল্পটি বলিয়া যাইতে লাগিল। তরুশ্রেণীর মর্ম্মরে, মক্ষিকাদলের গুঞ্জরণে, দিগন্তে পুঞ্জিত সবুজের স্তব্ধতায়, দহের জলের ঝিকিমিকিতে, বাঁশের পাতায় আলোর কম্পনে, মালতীর স্নিগ্ধ কালো চোখের চাওয়ায় দিবস আরও মধুর, আরও উদাস হইয়া উঠিল।

সুকুমার যখন গল্প শেষ করিল, করুণ-কাহিনী শুনিয়া মালতীর মুখ ছলছলিয়া উঠিয়াছে। মালতীকে বড় সুন্দর দেখাইল।

সুকুমার মালতীর হাত নিজ হাতে টানিয়া লইল। মালতী কোন বাধা দিল না; শ্যাম চিত্রপটে ছবির মত বসিয়া রহিল।

সুকুমার ধীরে বলিল, "মালতি, তোমাকে আমি ভালবাসি।" যেন টুর্গেনিভের গল্পের উপসংহারে নিজ জীবনের গল্প বলিতেছে।

মালতী যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল, হাত টানিয়া লইল, আয়ত কালো চোখ দু'টি আরো কালো হইয়া উঠিল।

সুকুমার বলিল, "শোন মালতি, আমায় তুমি বিয়ে করবে, কেমন রাজী?"

মালতী আবার স্বপ্নাবিষ্ট হইয়া গেল।

সুকুমার বলিল, "কি মৌনং সম্মতি লক্ষণং?"

মালতী মায়াময় হাসিয়া বলিল, "তার মানে?"

সুকুমার বলিল, "তার মানে হচ্ছে, তুমি রাজী বলেই চুপ করে আছ।"

মালতী উচ্চহাস্যে বলিল, "বা, আমি কি জানি?"

সুকুমার বলিল, "তুমি জানো।"

এবার মালতী গম্ভীর হইল, ধীরে বলিল, "সত্যি বলছেন?"

সুকুমার অস্ফুটস্বরে বলিল, "হাঁ সত্যি।"

মালতীর মুখ রাঙা হইল। সে বলিল, "বেশ, তা'হলে দাদাকে, মাসীমাকে বলুন।"

সুকুমার বলিল, "তোমার দাদা আসুন।"

মালতী নিমেষে উঠিয়া অন্তর্হিত হইল। জলে নীলাকাশের ছায়ার দিকে চাহিয়া সুকুমার বসিয়া রহিল।

তারপর দুইদিন মালতীর বিশেষ দেখা পাওয়া গেল না। ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া সে পালায়।

সুকুমার দেখিল, তাহার হাস্য মৃদু, তাহার গমন মন্থর, তাহার দৃষ্টি গভীর হইয়াছে। কোন গম্ভীর স্নিগ্ধ নারীপ্রকৃতি চঞ্চলা সরলা বালিকার দেহে মনে ধীরে ভরিয়া উঠিতেছে। কখন যাদুমন্ত্রে তাহার বালিকা-জীবন শেষ হইয়া নারী-জীবন আরম্ভ হইল, সে জানিতে পারিল না।

তৃতীয় দিন মালতী ধরা দিল।

রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে চমৎকার। দহের ঘাটে সুকুমার বসিয়াছিল চুপ করিয়া, এ কোন রূপকথার মায়াপুরী।

মালতী আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "নৌকো চালাবেন?" ঘাটে একটি ছুই দাঁড় নৌকা বাঁধা।

দুইজনে নীরবে নৌকায় গিয়া উঠিল, অতি মৃদুভাবে দাঁড় টানিয়া চলিল, জলের ছপ্ ছপ্ শব্দে জ্যোৎস্না রাত্রি শিহরিত হইয়া উঠিল।

দুইধারে মায়াময় বৃক্ষশ্রেণীর মর্মরিত অন্ধকার, সম্মুখে রজতশুভ্র টলমল জলপথ, ঊর্দ্ধে স্তব্ধ নীলাকাশ জ্যোৎস্নাধৌত। কয়েকটি সামান্য কথা, মাঝে মাঝে হাসি, দাঁড় ছাড়িয়া এলাইয়া বসা।

পদ্মবনে তাহারা নৌকা থামাইয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। চেঁচাইয়া কথা কহিতে পারিল না, সহাস্য মৃদু গুঞ্জরণ।

গভীর রাত্রে যখন তাহারা বাড়ী ফিরিল, তাহাদের দেহমন কোন অতল সুধারসে কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

পরদিন অপরাহ্নে সুকুমারের বাড়ী হইতে টেলিগ্রাম আসিল। সুকুমার তাহার প্রিয় গাছের তলায় বসিয়াছিল, বোধ হয় মালতীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। চতুর্দিকে যে প্রাণ-ধারা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, শাখায় শাখায় আলোকের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে, এই পল্লবিত পুষ্পিত প্রাণোচ্ছ্বাসের স্পন্দন আপন অন্তরে অনুভব করিতেছিল।

টেলিগ্রাম লইয়া আসিলেন সতীশের মা। উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন দুঃসংবাদ নয় ত'?"

সুকুমার ভীতস্বরে বলিল, "মা'র বড় অসুখ আমায় আজই যেতে হবে। তাঁর হার্ট খারাপ, বাড়াবাড়ি হয়েছে।"

সতীশ সহর হইতে ফিরিয়া আসে নাই। তাহার জন্য প্রতীক্ষা করা চলিবে না। সতীশের মাতা সুকুমারের কলিকাতা যাবার সব বন্দোবস্ত করিতে চলিলেন। সন্ধ্যার সময় নৌকায় বাহির হইলে ভোরে ট্রেণ পাওয়া যাইতে পারে।

সতীশের মাকে প্রণাম করিয়া সুকুমার যখন তাহার হাণ্ড-ব্যাগ লইতে সন্ধ্যার আলোছায়াময় গৃহে প্রবেশ করিল, দেখিল, মালতী ভূমিতে নতজানু হইয়া তাহার বিছানাতে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। ধীরে সে মালতীর হাত ধরিল, মাথায় হাত বুলাইল, মালতী কাঁপিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, তাহার বুকে মুখ গুঁজিল, দুই চক্ষু দিয়া দুই কপোল বহিয়া অশ্রু অঝোরে ঝরিতে

লাগিল। এই চিরহাস্যময়ীর ক্রন্দন সুকুমার বেশীক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না, তাহার বুক বুঝি ভাঙ্গিয়া যাইবে। সে শুধু বলিল, "মালতি, কেঁদো না, আমি গিয়েই চিঠি দেব।"

মাঝিরা যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, সূর্য্যের স্বর্ণ-রেখা মিলাইয়া গিয়াছে, আকাশ তারায় তারায় ভরা। সুকুমার ব্যথিত ক্ষুধিত চোখে তটভূমির দিকে চাহিয়া রহিল, বটবৃক্ষের অন্তরালে কে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে, মনে হইল। সে মালতী।

তটভূমি ছায়ার মত মিলাইয়া গেল, চারিদিকে সজল গম্ভীর অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল।

তারপর ?

তারপরের দিনগুলির কথা সুকুমারের ভাবিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু স্মৃতির ধারা মুক্তি পাইয়া অদম্য স্রোতে প্রবাহিত, কে তাহার গতি রোধ করিতে পারে!

কলিকাতায় ফিরিয়া সুকুমার দেখিল, মা সারিয়া উঠিয়াছেন, একদিন অসুখ একটু বাড়িয়াছিল, সেজন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। সতীশকে সে চিঠি লিখিল কিন্তু তাহাতে মালতীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই লিখিল না। মালতীকে একটি ছোট চিঠি লিখিবে ভাবিল, কোন কথা খুঁজিয়া পাইল না।

মালতী যেন কোন গ্রাম্য রূপকথার স্বপ্ন। নদীর তীরে, আম্রবনের ছায়ায়, গোলাভরা গোষ্ঠপ্রাঙ্গণে, হ্রদের পদ্মবনে, চন্দ্রালোকের মায়ায় তাহাকে মানায়; কলিকাতার কৃত্রিম সভ্য-জীবনে অর্থগর্ব্বিত সমাজে তাহার স্থান কোথায়? সুকুমার বুঝিল, মালতীকে তাহার জীবন-সঙ্গিনী করা অসম্ভব। সে যদি কোন চরের ধারে নিভৃত শান্ত পল্লীতে জীবন যাপন করিত, তাহা হইলে মালতীকে বিবাহ করিয়া সুখী হইত।

এদিকে সুকুমারের অসুস্থা মাতা অতি শীঘ্র পুত্রবধূর মুখদর্শনের জন্য ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহিত করিবার লোকের অভাব ছিল না। মনোরমার পিতা সুকুমারের পিতৃবন্ধু; মেয়েটিকে মায়েরও পছন্দ; তাহার ভ্রাতা সুকুমারের স্কুল-কলেজের সহপাঠী। পিতৃবন্ধু স্বয়ং আসিয়া যখন প্রায়ই সুকুমারকে চায়ে বা রাতের ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়া যাইতে লাগিলেন, সুকুমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। মনোরমাদের বাড়ীর 'টেনিস-ক্লাবে' সে নিয়মিত সভ্য হইয়া উঠিল। কিছুদিন পর দেখিল, মনোরমার হাতে-তৈরী চা'র একটা অপূর্ব্ব মিষ্টতা আছে ও মনোরমাও বিশেষ 'চার্মিং'; সাধারণ মেয়েদের মত সে নয়।

বিকেলবেলা টেনিস্-র‍্যাকেট ঘোরাইতে ঘোরাইতে সুকুমার বালীগঞ্জের দিকে যাইতেছিল, পথে সতীশকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। সতীশের মুখ মলিন, চুল উস্কোখুস্কো।

সতীশ একটু কর্কশ স্বরেই বলিল "বেশ, তোমায় তিনখানা চিঠি দিলুম, কোন উত্তর নেই, তোমার বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিলুম।"

সুকুমার লজ্জিত হইয়া বলিল, "বড় অন্যায় হয়ে গেছে; কবে এলে? মায়ের অসুখে—"

সতীশ দৃঢ়স্বরে বলিল, "শোন, মা ও মালতীকে নিয়ে এসেছি, আমার সেই পুরানো ঠিকানা—"

"ওঁরা এসেছেন?"

"হাঁ, মালতীর যে কি অসুখ করেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না—তুমি চলে আসার পর থেকেই—যেমন রোগা তেমি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে—বলে, বুকের মধ্যে কি রকম একটা ব্যথা করে, মাঝে মাঝে একা ছাদে গিয়ে কাঁদে—বলে, খানিকটা কাঁদলে বুকের ব্যথাটা কমে—"

"হঠাৎ কি অসুখ"—সুকুমার আর বলিতে পারিল না, কোন রকমে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিল।

"মা বললেন, চলো কলকাতায়, ডাক্তারদের দেখাই, কি যে হয়েছে, মেয়েটা মুখ ফুটে বলে না, কেঁদে কেঁদেই কি প্রাণটা দেবে! তাই নিয়ে এসেছি কলকাতায়। দু' তিনজন ভাল ডাক্তার দেখালুম, সবাই বলে মনের

অসুখ। জান ত', ওর কি কচি মন ; ওর কষ্ট দেখে আমার রাতে ঘুম হয় না—কি যে ওর ব্যথা, কিছু মুখ ফুটে বলে না—র‍্যাকেটটা যে তোমার হাত থেকে পড়ে গেল—"

সুকুমার কোন উত্তর করিল না।

"শোন, আজ সন্ধ্যেতে এসো, মা তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান—তোমার কথা রোজই বলছেন—"

"দেখ ভাই, আজ আমার একটা বিশেষ 'এন্‌গেজ-মেন্ট' রয়েছে, আমি কাল যাবো—"

"আচ্ছা, কাল নিশ্চয় এসো, আমি সারাদিন বাড়ী থাকব।"

বালীগঞ্জ যাইতে সুকুমারের আর ইচ্ছা করিল না, কিন্তু কে যেন তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। দুইদিন হইল মনোরমার সহিত তাহার 'এন্‌গেজমেন্ট' হইয়া গিয়াছে।

পরদিন সতীশের বাড়ী যাওয়া হইল না। চন্দন-নগরে গঙ্গার ধারে এক সুন্দর বাগান পাওয়া গিয়াছে, 'পিক্‌নিকে'র ব্যবস্থা হইয়াছে। বহু প্রতিবাদ সত্ত্বেও সুকুমারকে মনোরমাদের সঙ্গে যাইতে হইল।

তার পর দিন 'টেনিস-টুর্ণামেন্ট' আরম্ভ ; প্রথম খেলাতেই সুকুমার।

সত্যই কি সে একটু সময় করিয়া মালতীকে দেখিতে যাইতে পারিত না ?

দিনের পর দিন আপনাকে নানা কাজে অকাজে জড়াইয়া সে মনকে বোঝাইতেছিল, তাহার সময় নাই।

ভাবী শ্বশুরের সুপারিশে গভর্ণমেন্ট-চাকরির চেষ্টা চলিতেছিল। বঙ্গ-গবর্ণমেণ্টের কয়েকজন উচ্চতম ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত দেখা করা বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, সে দার্জ্জিলিং চলিয়া গেল।

সাতদিন পরে যখন সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, সতীশ তাহার মা ও বোনকে লইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছে।

সতীশকে চিঠি লিখিয়া কোন খবর লইতে সে লজ্জা বোধ করিল।

সংবাদটি কোন সহপাঠী বন্ধু তাহাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল। তিন মাস পরে হইবে।

মনোরমার সহিত মহা ধূমধামে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ডেপুটিগিরি চাকরিও লাভ হইয়াছে।

বাঙলার কোন ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত সহরে গিয়া সে ম্যালেরিয়াক্রান্ত। অসুখের সংবাদ জানিয়া মনোরমা তাহার পিতার সহিত স্বামীর নব কর্ম্মস্থলে যেদিন আসিল, সেই দিনই সন্ধ্যায় বন্ধুর পত্র আসিল।

অপরাহ্নে প্রচুর কুইনিন খাইয়া র‍্যাগ্ মুড়ি দিয়া সুকুমার 'সার্কিট-হাউসে'র বারান্দায় বসিয়াছিল। ডাক-পিয়ন চিঠি দিয়া গেল। দীর্ঘ পত্রটি দুইবার পড়িল, সব যেন বুঝিতে পারিল না, কুইনিন খাইয়া তাহার মাথা ঝিমঝিম করিতেছে।

শুধু এইটুকু বুঝিল, মালতীর মৃতদেহ দহের জলে পাওয়া গিয়াছে। অন্ধকার রাত্রে একটি ছোট নৌকা লইয়া মালতী দ পার হইতে চেষ্টা করে ; দহের মধ্যস্থানে গিয়া তাহার নৌকা উল্টাইয়া যায়। সে অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। সে ইচ্ছা করিয়া ডুবিয়াছিল, না, তাহার সাঁতার কাটিবার শক্তি ছিল না, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সে রাত্রে সুকুমারের আবার জ্বর আসিল, জ্বর উঠিল একশ ছয় ডিগ্রি ; সমস্ত রাত্রি ও পরদিন সে বিকারগ্রস্ত হইয়া ভুল বকিল, 'মালতি' 'মালতি'!

অর্দ্ধসংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিতে হইল চিকিৎসার জন্য।

দেড়মাস পরে যখন সে সুস্থ হইয়া উঠিল, সতীশকে দীর্ঘ পত্র লিখিল। কোন উত্তর আসিল না।

খোঁজ লইয়া জানিল, মালতীর মৃত্যুর সাতদিন পরেই সতীশের মাতার মৃত্যু হইয়াছে। সতীশ তাহার সমস্ত জমিদারী বেচিয়া ব্রেজিলে চলিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকায় জমি কিনিয়া সে বসবাস করিবে। শুধু পৈতৃক বাড়ী ও দহ বৃদ্ধ নায়েবের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছে।

কোথায় সেই হ্রদ? শরতের মধ্যাহ্নালোকপ্লাবিত শৈবালপূর্ণ হ্রদের দিকে চাহিয়া সুকুমার দুই চক্ষের অশ্রু আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না, ছোট শিশুর মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

জনহীন জীর্ণ বনানী উদাস বাতাসে মাঝে মাঝে হা হা করিয়া উঠিল।

৪

অতি পরিশ্রান্তভাবে সুকুমার যখন বজরাতে ফিরিল, সূর্য্য মধ্যগগন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। চারিদিকে শুষ্ক প্রখর আলো।

মনোরমা স্বামীকে দেখিয়া উদ্বিগ্নভাবে ছুটিয়া আসিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে, পেয়াদারা খুঁজে খুঁজে হায়রাণ হয়েছে। এ কি, রোদে মুখ কালী হয়ে গেছে, অসুখ করে নি ত'?"

মনোরমা স্বামীর কপালে মুখে হাত বুলাইয়া দেখিলেন। "কি ঠাণ্ডা তোমার হাত, গা যেন হিম। শোন, আর স্নান কোরো না, গরম জল করে রেখেছি, হাত মুখ ধুয়ে খেতে এস। মাংসটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল,—"

একটু পরে মনোরমা যখন সকল খাবার আনিয়া টেবিলে রাখিলেন, দেখিলেন স্বামী অতি ক্লান্ত, অতি উদাসভাবে চেয়ারে বসিয়া।

"যা, ওঠ, হাতে মুখে একটু জল দিয়ে এসো। ওগো, দেখ ত' মাংসটা কেমন হয়েছে!"

একটি ছোট প্লেটে মুরগীর মিঠে কোর্ম্মা আনিয়া মনোরমা স্বামীর সম্মুখে ধরিলেন। সুকুমার এক টুক্‌রা মাংস হতাশভাবে মুখে পুরিল, মাংসখণ্ড তাহার অতি তিক্ত মনে হইল; কিন্তু মুখ হইতে জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতে পারিল না। তিক্ত মাংসখণ্ড কোনরূপে গিলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার যেন দম আটকাইয়া যাইতেছে।

বেগে বাহিরে গিয়া সে মাঝিদের হুকুম দিল, নোঙর তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিতে।

তকমাধারী পেয়াদাটি বলিল, "হুজুর, নন্দিগ্রামে—"

সুকুমার তিক্তকণ্ঠে হুকুম দিল, "দরকার নেই—নোঙর তোল, চল, এগিয়ে চল—"

প্রাচীন ভারতবর্ষে লীডিয়, পারসিক ও গ্রীসিয় মুদ্রা

শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত, এম্-এ

যে সমস্ত উপকরণ দ্বারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস গঠিত হইতেছে, তন্মধ্যে প্রাচীন মুদ্রা অন্যতম। অধ্যাপক র‍্যাপ্‌সনের মতানুসারে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় সাহিত্য, প্রাচীন বৈদেশিক সাহিত্য, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় অনুশাসন ও প্রাচীন ভারতবর্ষীয় মুদ্রা ভারতবর্ষের ইতিহাস-গঠনের প্রধান উপাদান এবং ইহাদের মধ্যে অনুশাসন ও মুদ্রাই শ্রেষ্ঠ উপাদান। প্রাচীন যুগে প্রাচ্য ভূখণ্ডে অসুর, বাবিলন, পারস্য, মিশর, চীন ও ভারতবর্ষে এবং পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের গ্রীস ও রোমে সভ্যতার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। চীন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশের প্রাচীন লিখিত ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং এই সব দেশের যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে লিখিত ইতিহাস কতদূর প্রাঞ্জ হইতে পারে, তাহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন যথার্থ লিখিত ইতিহাস না থাকাতে, প্রাচীন অনুশাসনের সহিত প্রাচীন মুদ্রাও ভারতবর্ষীয় ইতিহাস-গঠনের প্রধান উপাদান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্যাক্ট্রিয়াবাসী গ্রীসিয়, শক, পারদ ও কুষণ রাজবংশের যে বিবরণ পাই, তাহা প্রধানতঃ মুদ্রা হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আমরা প্রাচীন মুদ্রা হইতে জানিতে পারি। অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য সভ্যদেশের যে আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ছিল তাহা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে ও মোহেঞ্জো-দড়োর যুগান্তকারী আবিষ্কারের দ্বারা এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। মোহেঞ্জোদড়োর আবিষ্কার প্রমাণ করিয়াছে যে, আনুমানিক ৩০০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে সিন্ধুনদের উপত্যকাতে এক অতি সভ্য জাতি বাস করিত ও সুমের প্রভৃতি এশিয়া মাইনরস্থিত দেশ-সমূহের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। অধ্যাপক জেমস্ কেনেডি প্রমাণ করিয়াছেন যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দের পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান পারস্যোপসাগরের পথ দিয়া ভারতবর্ষের সহিত বাবিলনের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল ও হখামানিষীয় (Achaemenian) বংশীয় পারসিক সম্রাট খুরুষ (Cyrus), কাম্বাইসেস (Cambyses) ও দরিয়াবুষ (Darius) পঞ্চনদের কিয়দংশ আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। ৩২৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে দিগ্বিজয়ী আলেক-জাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ও পঞ্চনদের অনেকাংশ স্বীয় সাম্রাজ্য-ভুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রথম সিলিউক (Seleukos Nikator) মাসিডন সাম্রাজ্যভুক্ত অংশের প্রভু হন। অতঃপর পিপ্পলীবনের মৌরীয় বংশজাত মগধ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সিলিউককে যুদ্ধে হারাইয়া দেন। সুতরাং এক সময়ে ভারতবর্ষে যে পারস্য, মাসিডন ও সিরিয় নৃপতিগণের আধিপত্য ছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সেই জন্য ভারতবর্ষে যে পারসিক, আলেকজাণ্ডারের ও সিলিউকবংশীয় নৃপতিগণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা খুব স্বাভাবিক; কিন্তু কি প্রকারে লীডিয় ও এথেন্সীয় মুদ্রা ভারতবর্ষে আসিল, তাহা আমাদের আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মতানু-সারে লীডিয়াধিপতিগণ জগতের সর্ব্বপ্রাচীন মুদ্রার স্রষ্টা। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহাশয় ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সিন্ধুনদের উপকূলস্থিত মারি নামক স্থানে এক মুদ্রা-বিক্রেতা হইতে একটী মুদ্রা ক্রয়

করেন ও ইহার প্রতিকৃতির সহিত একটী প্রবন্ধ রচনা করেন। নিম্নে মুদ্রাটীর বিবরণ প্রদত্ত হইল —

তৌল—১৬৪'৭৫ গ্রেইন।

ধাতু—সুবর্ণ।

আকৃতি—অনেকটা ডিম্বাকৃতি।

সম্মুখ—মধ্যস্থানে পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি একটি বৃষের ও সিংহের মুখ।

বিপরীত—মধ্যস্থানে দুইটী সমচতুষ্কোণ চিহ্ন; একটী অপরটী হইতে কিঞ্চিৎ বড়।

এখন দেখিতে হইবে যে, এই মুদ্রাটী কৃত্রিম না অকৃত্রিম। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ব্রাউন ইহাকে অকৃত্রিম বলিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মহাশয় ইহাকে লীডিয়া-রাজ ক্রিসাসের মুদ্রা বলিয়াছেন। এই মুদ্রাতে কোনও লিপি লিখিত নাই সুতরাং ইহা কাহার মুদ্রা, তাহা জানিতে হইলে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। লীডিয়ার ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে আমরা জানিতে পারি যে, ইহা এক সময়ে অসুর-সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। যখন অসুর-সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন বাবিলন ও মিডিয়ার সহিত অধীনতা-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লীডিয়া এক ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া উঠে। যে রাজবংশ লীডিয়াকে এত উন্নত করিয়াছিল, তাহা মারমনাদ বংশরূপে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইহাদের বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল—

প্রথম { (১) গাইজেস্, খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ ৭০০ ⋮ (২) আরদিস্

|

দ্বিতীয় { (৩) সাড্যাইতেস্ | (৪) আল্যাইতেস্

|

তৃতীয় { (৫) ক্রিসাস্

প্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ হেড 'The Coinage of Lydia and Persia' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লীডিয় মুদ্রাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম ভাগে গাইজেস্ ও আরদিস্, দ্বিতীয় ভাগে সাড্যাইতেস্ ও আল্যাইতেস্ এবং তৃতীয় ভাগে ক্রিসাসের মুদ্রা। গাইজেস্ সুবর্ণখণ্ডকে চিহ্নদ্বারা ব্যবহার এবং চন্দ্রহেম (electrum) ধাতুর দ্বারা মুদ্রা নির্ম্মাণ করিতেন। আরদিস্‌ও এই ধাতুর দ্বারা মুদ্রা নির্ম্মাণ করাইতেন। গাইজেস্ ও আরদিসের চন্দ্রহেম নির্ম্মিত মুদ্রার সম্মুখে কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু বিপরীতে তিনটী অঙ্কচিহ্ন (punch-mark) বিদ্যমান। সাড্যাইতেস্‌ও চন্দ্রহেম ধাতুদ্বারা মুদ্রা নির্ম্মাণ করাইতেন কিন্তু তাঁহার এবং গাইজেস্ ও আরদিসের মুদ্রার মধ্যে প্রভেদ এই যে, গাইজেস্ ও আরদিসের মুদ্রাগুলির সম্মুখে কোনও চিহ্ন নাই কিন্তু সাড্যাইতেসের মুদ্রার সম্মুখে পদাবদ্ধ সিংহ ও বৃষের মুখ রহিয়াছে। এই চিহ্নটীই কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ক্রিসাস্ তাঁহার মুদ্রার সম্মুখ-চিহ্নরূপে ব্যবহার করেন। আল্যাইতেস্ চন্দ্রহেম মুদ্রা ব্যতীত ফোকীয় রীতি (Phocaic standard) অনুসারে এক প্রকার সুবর্ণমুদ্রা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আল্যাইতেসের পুত্র ক্রিসাস্ চন্দ্রহেম মুদ্রা উঠাইয়া দিয়া সুবর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রার প্রচলন করেন। হেডের মতানুসারে ক্রিসাসের সুবর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার বিশেষত্ব হইতেছে, সম্মুখে বৃষ ও সিংহের মুখ। ('The money of Croesus, both of gold and silver, is distinguished by one invariable device, which is the same on all the denominations, from the gold stater to the smallest silver coins—the foreparts of a Lion and a Bull')। শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে মুদ্রাটীর যে চিত্র দিয়াছেন, তাহার সহিত হেডের 'The Coinage of Lydia and Persia' নামক পুস্তকে নিবদ্ধ লীডিয় মুদ্রার চিত্র মিলাইয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই মুদ্রাটী ক্রিসাসের। শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের মতানুসারে এই মুদ্রাটীর তৌল ১৬৪'৭৫ গ্রেইন। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ হেডের মতানুসারে ক্রিসাস্ দুই রকম তৌল-পদ্ধতি প্রচলন করিয়াছিলেন— বাবিলনীয় রীতি (Babylonian standard) ও যাবনিক রীতি (Euboic standard)। বাবিলনীয় রীতি অনুসারে নির্ম্মিত ষ্টেটরের ওজন ১৬৮ গ্রেইন্ ও যাবনি

রীতি অনুসারে নির্ম্মিত ষ্টেটরের ওজন ১২৬ গ্রেইন্। সুতরাং শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের মুদ্রাটী যে বাবিলনীয় রীতি অনুসারে নির্ম্মিত ষ্টেটর তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ক্রিসাসের মুদ্রার সম্মুখে আমরা যে সিংহের ও বৃষের মুখ দেখিতে পাই, তাহার তাৎপর্য্য কি? এই প্রকার চিহ্ন আমরা গাইজেস্, আর্দিস্ ও সাল্যাইতেসের মুদ্রাতে দেখিতে পাই না; কিন্তু আল্যাইতেসের মুদ্রাতে এই প্রকারের চিহ্ন একটু বিভিন্ন-ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। হেডের মতে তৎকালে লীডিয়া দেশে প্রচলিত ধর্ম্মমত হইতে এই চিহ্নটীর উৎপত্তি হইয়াছিল ('This imperial device—the Arms of the City of Sardes, so to speak—was doubtless of religious origin')।

এই মুদ্রাটী কি প্রকারে ভারতবর্ষে আসিল তাহা আলোচনা করা দরকার। হিল বলিয়াছেন যে, বাবিলনীয় রীতি অনুযায়ী নির্ম্মিত মুদ্রাগুলি প্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যবহৃত হইত। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী বলিয়াছেন যে, এই মুদ্রাটী ভারতবর্ষে ব্যবসায়-সূত্রে আসিয়াছিল, কিন্তু এই মত আমি নিম্নলিখিত কারণবশতঃ গ্রহণ করিতে পারি নাই। প্রথমতঃ, এই মুদ্রাটী যখন খনন করিয়া পাওয়া যায় নাই, তখন এই মুদ্রাটী কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল, তাহা বলা একেবারে অসম্ভব, এবং এই মুদ্রাটী সত্যই ভারতবর্ষে ব্যবসায়-সূত্রে আনীত হইয়াছিল কি না, তাহা বলাও অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, একটী মাত্র মুদ্রা হইতে ভারতবর্ষের সহিত লীডিয়ার যে কোনও ব্যবসায়-সম্বন্ধ ছিল তাহা বলা যায় না। সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমরা ভারতবর্ষে একাধিক লীডিয় মুদ্রা খনন করিয়া না পাইব, সে পর্য্যন্ত আমরা কিছুতেই বলিতে পারিব না যে, ভারতবর্ষের সহিত লীডিয়ার আদান-প্রদানের কোনও সম্বন্ধ ছিল।

লীডিয় মুদ্রা ব্যতীত ভারতবর্ষে যে পারসিক মুদ্রাও প্রচলিত ছিল, তাহা আমরা অদ্যাবধি প্রাপ্ত পারসিক মুদ্রা হইতে জানিতে পারি। প্রাচীন ভারতবর্ষের সহিত যে প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমরা মুদ্রা ব্যতীত অন্য তথ্য হইতেও জানিতে পারি। পণ্ডিতগণের মতানুসারে প্রাচীন পারসিকগণ ও প্রাচীন ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ এক সময়ে একত্র বাস করিতেন। ভারতবর্ষীয় বেদ ও পারসিক অবেস্তার মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক হুগো ভিন্‌কলের উত্তর-পূর্ব্ব এসিয়া মাইনরে বোঘাস্‌কই নামক স্থানে লিপিসম্বলিত কয়েকটী ইষ্টক আবিষ্কার করেন। ১৪০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে মিতানী ও হিতাইৎবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে যে সকল সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকটীর কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। যে সকল দেবগণ এই সন্ধিগুলির সাক্ষ্যরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন তাঁহাদের উল্লেখ আমরা বেদেও দেখিতে পাই। বৈদিক মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, নাসত্য—ইহাতে যথাক্রমে মি-ইত-র, উ-রু-ও-ন, ইন-দ-র ও ন-স-অত-তি-ইঅ রূপে অভিহিত হইয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহার পরে সপ্তম খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের সহিত পারস্যের যে ব্যবসায়-সম্বন্ধ ছিল, তাহা জেমস্ কেনেডি বিশ্বাস করেন। ষষ্ঠ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ হইতে ভারতবর্ষের সহিত পারস্যের যে ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমরা অকাট্য প্রমাণ হইতে জানিতে পারি। এই সময় হইতে আনুমানিক ৩৩০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রদেশগুলি পারসিক সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহা আমরা প্রধানতঃ হেরোডোটাস্, টিসিয়াস্, জেনোফোন, ষ্ট্রাবো, আরিয়ান্, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীসিয় ও রোমক ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থ হইতে এবং হখামানিষীয় পারস্য সম্রাট্ দরিয়াবুষের বাহিস্তান্, পার্সিপোলিস্ ও নাক্সি-রুস্তম শিলালিপি হইতে জানিতে পারি। ৫৫৮ ও ৫৩০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের মধ্যে হখামানিষীয় সম্রাট্ খুরুষ ভারতবর্ষের সহিত পারস্যের যে সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা হেরোডোটাস্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ক্যাম্‌বাইসেস্ এই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। দরিয়াবুষ যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রদেশগুলি স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন,

তাহার অকাট্য প্রমাণ পূর্ব্বোক্ত শিলালিপিত্রয় ও হেরোডোটাসের বিবরণ। ভারতবর্ষের এই প্রদেশগুলি যে খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ ৩৩০ পর্য্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহা আমরা তৃতীয় দরিয়াবুষের সহিত দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জাণ্ডারের আর্‌বেলা প্রান্তরে যুদ্ধের বিবরণ হইতে জানিতে পারি। সুতরাং আনুমানিক ১৪০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ হইতে সপ্তম খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সহিত পারস্য সাম্রাজ্যের যে ভাবের আদান-প্রদান এবং ষষ্ঠ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ হইতে চতুর্থ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত যে রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে। সুতরাং ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তস্থিত প্রদেশগুলিতে পারসিক মুদ্রার প্রচলন ছিল, তাহা বলা যাইতে পারে; সেই জন্যই উক্ত প্রদেশগুলি হইতে প্রাচীন পারসিক মুদ্রা-প্রাপ্তি খুব স্বাভাবিক।

মুদ্রা-আলোচনার একটী প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে মুদ্রাগুলির প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে অভ্রান্ত ধারণা। ভারতবর্ষীয় মুদ্রা-সংগ্রহের প্রথম যুগে এই বিষয়টী মুদ্রা-সংগ্রাহকগণ বুঝিতে পারিতেন না এবং সেই জন্য তৎকালে যে সমস্ত পারসিক মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাদের প্রাপ্তি-স্থান সম্বন্ধে কোন বিবরণ লিখিত হয় নাই। সেই জন্য ১৯২২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Cambridge History of India, Vol. I-নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষে প্রাপ্ত পারসিক মুদ্রার ইতিহাস লিখিতে গিয়া প্রসিদ্ধ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড বলিয়াছেন—"Properly authenticated records of finds are virtually unknown." কিন্তু ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দের Archaeological Survey of India, Annual Reports-এ তক্ষশিলাতে প্রাপ্ত পারসিক মুদ্রার বিবরণ স্যর জন্ মার্শাল্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—"Most valuable of all is a collection of coins and jewellery found in an earthenware 'ghara' near the eastern limits of the excavations. The 'ghara' in question is found about 6 feet below the present surface, that is, in association with the second stratum, which had already been judged to belong to the 3rd or 4th century B.C. What gives this find of coins a unique value is the presence in it of three Gk. coins fresh from the mint, two of Alexander the Great and one of Philip Aridaeus, besides a well-worn siglos of the Persian empire." এই সকল মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান লিপিবদ্ধ না হইলেও, এগুলি যে হথামনিষীয় যুগে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, সে বিষয়ে মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে কোনও মতভেদ থাকিত না। ফরাসী পণ্ডিত বাবেলোর মতানুসারে সম্ভবতঃ চতুর্থ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে দ্বি-ষ্টেটর (Double Stater) মুদ্রাগুলি ভারতবর্ষেই নির্ম্মিত হইত। ধাতু-অনুসারে আমরা পারসিক মুদ্রাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—যথা, স্বর্ণ ও রৌপ্য। যে সকল পারসিক স্বর্ণ-মুদ্রা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহারা দ্বিবিধ যথা, দ্বি-ষ্টেটর বা দ্বি-দারিক (Double Stater or Doublic Daric) ও ষ্টেটর্ বা দারিক্ (Stater or Daric) ও যে সকল পারসিক রৌপ্য-মুদ্রা ভারতবর্ষে প্রচলিত তাহা এক প্রকার যথা সিগ্লোস্ বা সেকেল্ (Siglos or Shekel)। পারসিক স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রাগুলির আকৃতি গোলাকার। স্বর্ণ-মুদ্রাগুলির সম্মুখে আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে, পারস্য সম্রাট বামহস্তে ধনু ও দক্ষিণ হস্তে বল্লম ধারণ করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছেন; বিপরীতে কয়েকটী চিহ্ন বিদ্যমান। রৌপ্য মুদ্রাগুলির সম্মুখেও আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই যে, পারস্য সম্রাট বাম হস্তে ধনু ও দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা ধারণ করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছেন; বিপরীতে অনেক মুদ্রাতে কতকগুলি চিহ্ন রহিয়াছে। এইগুলিকে অধ্যাপক র‍্যাপ্‌সন ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষর বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একণে আমরা পারস্য মুদ্রাগুলির তৌল লইয়া আলোচনা করিব। যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষীয় সীমান্ত প্রদেশগুলি পারসিক সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল ও পারসিক স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইতেছিল, তখন পারসিক সম্রাটগণ নিজেদের তৌলরীতি এই মুদ্রাগুলিতে ব্যবহার করেন। পারসিক

স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রাগুলি ওজন করিয়া পণ্ডিতগণ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

স্বর্ণমুদ্রা

দ্বি-দারিক বা দ্বি-ষ্টেটর—২৬০ গ্রেইন
দারিক বা ষ্টেটর—১৩০ গ্রেইন

রৌপ্যমুদ্রা

সিগ্লোস্ বা সেকেল্—৮৬·৪৫ গ্রেইন

ভারতবর্ষে পারসিক রৌপ্য মুদ্রা অনেক পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু স্বর্ণ-মুদ্রা বেশী পাওয়া যায় নাই। এই সম্বন্ধে মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ ম্যাক্‌ডোনাল্ড বলিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে এত অধিক পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যাইত যে, ভারতবর্ষে বিদেশী স্বর্ণ-মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা ছিল না বলিলেই হয়। ভারতবর্ষে ১ ভাগ স্বর্ণ ৮ ভাগ রৌপ্যের সমান বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু পারস্যে ১ ভাগ স্বর্ণ ১৩·৬ ভাগ রৌপ্যের সমান বলিয়া পরিগণিত হইত। সুতরাং ভারতবর্ষে পারসিক স্বর্ণমুদ্রার আবশ্যকতা যে ছিল না বলিলেই হয়, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। এই নিমিত্তই ভারতবর্ষে পারসিক স্বর্ণ-মুদ্রা খুব কম পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত খনন করিয়া ভারতবর্ষে কোনও পারসিক স্বর্ণ-মুদ্রা পাওয়া যায় নাই, অন্ততঃপক্ষের সে প্রকার কোনও লিখিত বিবরণ নাই। ভারতবর্ষে যে সকল প্রচলিত পারসিক স্বর্ণ-মুদ্রার বিবরণ আমরা পাই, সেগুলি কানিংহাম কর্ত্তৃক সংগৃহীত মুদ্রা। কিন্তু ইহা উল্লেখ-যোগ্য যে, এই সকল স্বর্ণ-মুদ্রাতে এমন কোনও চিহ্ন নাই যাহাতে আমরা বলিতে পারি যে, এইগুলি ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল। সেইজন্য ম্যাক-ডোনাল্ড বলিয়াছেন—'It is significant that in no single instance do these bear counter-marks or any other indication that could possibly be interpreted as suggestive of a prolonged Indian sojourn'. কিন্তু অন্যান্য প্রমাণ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পারসিক স্বর্ণ-মুদ্রা ভারতবর্ষে অল্প-বিস্তর প্রচলিত ছিল।

ভারতবর্ষে পারসিক রৌপ্য-মুদ্রা সিগ্লোস যে খুব প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। কানিংহাম প্রভৃতি মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ, ভারতবর্ষে যে যথেষ্ট পরিমাণে সিগ্লোস পাওয়া গিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সম্প্রতি তক্ষশিলাতে খনন করিয়া স্যার জন্ মার্শাল্ একটী অনেককাল-ব্যবহৃত সিগ্লোস, দুইটী প্রায় অব্যবহৃত আলেকজাণ্ডারের মুদ্রা ও ফিলিফ আরিডিয়াসের একটী মুদ্রার সহিত পাইয়াছেন। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই যুগে ভারতবর্ষে অতি অল্প পরিমাণে রৌপ্য পাওয়া যাইত; সেই জন্য এত অধিক পরিমাণে পারসিক রৌপ্য-মুদ্রা ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়াছিল। তাই ম্যাক্‌ডোনাল্ড বলিয়াছেন—"The relative cheapness of gold would act like a lode-stone. Silver coins from the west would flow into the country freely, and would remain in active circulation.' এই সকল পারসিক রৌপ্য-মুদ্রার অনেকগুলিতে চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ র‍্যাপ্‌সন প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই চিহ্নগুলির মধ্যে অনেকগুলি ব্রাহ্মী ও অনেকগুলি খরোষ্ঠী অক্ষর।

প্রাচীন পারসিক সিগ্লোসের উপর ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষরের উপস্থিতি দেখাইয়া র‍্যাপ্‌সন প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই সকল মুদ্রা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে র‍্যাপ্‌সন এই মত প্রচার করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতে এই মত অভ্রান্ত বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে হিল্ তাঁহার Catalogue of Greek coins—Arabia, Mesopotamia and Persia নামক গ্রন্থে এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, র‍্যাপ্‌সন-পঠিত ব্রাহ্মী বো, ব, খ, প, জ যথাক্রমে সাইপ্রাসীয় সি, অন্থ, লিসীয় একপ্রকার চিহ্ন, ফিনীসীয় প ও গ্রীসীয় ইটা (E) রূপে পঠিত

হইতে পারে। খরোষ্ঠী অক্ষররূপে যে সব অঙ্কচিহ্ন র‍্যাপ্‌সন পাঠ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে হিল্ বলেন যে, 'ম' পাঠ সম্বন্ধে র‍্যাপ্‌সন নিজেই সন্দিহান। হিলের মতানুসারে র‍্যাপ্‌সনের 'মে' এক-জাতীয় পুষ্প, তাঁহার 'মং' হিলের পুস্তকে লিপিবদ্ধ ১১৩ নং চিহ্নের ন্যায়, তাঁহার 'তি' কিনীসীয় 'সিং' ও তাঁহার 'দ' ও 'হ'-এর চিহ্ন পরিষ্কার নহে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের Numismatic chronicle-এ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ ময়েল এই প্রকার আরও অনেকগুলি অঙ্কচিহ্ন ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষররূপে পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু হিল্ ইহাতেও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। হিলের পূর্ব্বে ফরাসী ঐতিহাসিক মসিয়ে বাবেলোও বলিয়াছিলেন যে, এই সকল অঙ্কচিহ্নযুক্ত পারসিক সিগ্লোসগুলি লিসিয়া, প্যাম্‌ফিলিয়া, সিলিসিয়া ও সাইপ্রাসে প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, যে সকল অঙ্কচিহ্ন র‍্যাপ্‌সন ও ময়েল ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষর বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেগুলি বাবেলো ও হিল্ 'ভারতবর্ষীয় নহে' বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে যে, র‍্যাপ্‌সন ও হিল্ কর্তৃক আলোচিত মুদ্রাগুলি যথার্থই ভারতবর্ষে প্রচলিত পারসিক মুদ্রা কি না! র‍্যাপ্‌সন ও হিল্ যে সকল মুদ্রা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলি মুদ্রা সংগ্রহকারিগণের সংগৃহীত মুদ্রা, খনন করিয়া প্রাপ্ত মুদ্রা নহে। স্যর জন্ মার্শাল্ তক্ষশিলা খননকালে যে পারসিক সিগ্লোস প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা ব্যতীত আর কোনও পারসিক মুদ্রা ভারতবর্ষে খনন করিয়া পাওয়া যায় নাই। এই মুদ্রাটিতে এমন কোনও চিহ্ন নাই যাহা ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষররূপে পঠিত হইতে পারে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে খনন করিয়া প্রাপ্ত পারসিক মুদ্রাগুলিতে র‍্যাপ্‌সন ও ময়েল্ কর্তৃক পঠিত ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষর না পাওয়া যাইবে ততদিন তাঁহাদের মত অভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া হিল্ যে যুক্তির দ্বারা র‍্যাপ্‌সন ও ময়েলের মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞানসম্মত বলা যুক্তিযুক্ত নহে। হিল্ দেখাইয়াছেন যে, যে অক্ষরগুলি ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষররূপে পঠিত হইয়াছে সেগুলির মধ্যে অনেকগুলি লিসিয়, প্যাম্‌ফিলিয় ও ফিনিসীয় অক্ষর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। হিলের এই যুক্তি মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ অনেক বিভিন্নভাষার অক্ষরের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যথা, গ্রীসিয় ইটা (E) অশোকের যুগের ব্রাহ্মী 'ঙ'-এর ন্যায় দেখিতে। সুতরাং হিলের মত গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এক্ষণে আমরা ভারতবর্ষে প্রচলিত গ্রীসিয় মুদ্রা লইয়া আলোচনা করিব। গ্রীসিয় মুদ্রা বলিতে আমরা এথেন্সীয় পেচকমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা, আলেকজাণ্ডার, প্রথম সিলিউক, প্রথম আন্তিয়োক, দ্বিতীয় আন্তিয়োক, তৃতীয় আন্তিয়োক ও দ্বিতীয় সিলিউকের মুদ্রা বুঝিব। এই সকল মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান, তৌল, সম্মুখ ও বিপরীত বর্ণনা ও ধাতুজ বিভাগ আমরা আলোচনা করিব। ভারতবর্ষে প্রচলিত এথেন্সীয় পেচকমূর্ত্তিযুক্ত মুদ্রা হেড, গার্ডনার, কানিংহাম, র‍্যাপ্‌সন, বন্দ্যোপাধ্যায়, ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রমুখ মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ আলোচনা করিয়াছেন। বাণিজ্য-সূত্রে এথেন্সীয় মুদ্রা যে প্রাচ্যে আসিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু এই প্রকার মুদ্রা ভারতবর্ষে আনীত হইত কি না, তাহা বলা দুঃসাধ্য। কারণ এই প্রকার মুদ্রা ভারতবর্ষে কোথাও খনন করিয়া পাওয়া যায় নাই। এইজন্য ম্যাক্‌ডোনাল্ড লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, "Enquiry has failed to bring to light any trustworthy records of the actual discovery of 'owls' in India." এথেন্সীয় এই জাতীয় মুদ্রা জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হইত। সেই জন্য যখন ৩২২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে এথেন্সের মুদ্রাশালার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, তখন পৃথিবীর যে সকল স্থানে এই জাতীয় মুদ্রা প্রচলিত ছিল সেই সকল স্থানে এই মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা নির্ম্মিত হইতে থাকে। ভারতবর্ষে এই

অনুকরণ-মুদ্রা নির্ম্মিত হইয়াছিল কি না, সে সম্বন্ধে অধ্যাপক র‍্যাপসন বলিয়াছেন—"When the supply from the Athenian mint grew less (i. e., for about a century before B. C. 322, when the mint was closed), imitations were made in N. India." কিন্তু এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে খনন করিয়া এই জাতীয় মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। ম্যাক্ডোনাল্ড লিখিয়াছেন—"The imitations acquired by the British Museum at Rawalpindi appear to have been brought without exception from the northern side of the frontier and thus to be of Central Asian, rather than of Indian, origin." কিন্তু যদিও এই জাতীয় মুদ্রা ভারতবর্ষে খনন করিয়া পাওয়া যায় নাই, তথাপি এই সকল মুদ্রা যে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল তাহার অন্য প্রমাণ আছে। সোফাইটীসের (Sophytes) মুদ্রার সম্মুখ ও বিপরীত দিক এই জাতীয় মুদ্রার এক বিভাগের সহিত তুলনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, সোফাইটীসের মুদ্রা এই প্রকার মুদ্রার অনুকরণ। আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন সোফাইটীস্ পঞ্চনদের কিয়দংশের রাজা ছিলেন। সুতরাং এই অনুকরণ-মুদ্রা যে ভারতবর্ষে নির্ম্মিত ও প্রচলিত ছিল তাহা বলা যাইতে পারে। এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে, কোন্ সময় এই মুদ্রা ভারতবর্ষে নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেক ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন যে, এথেন্সীয় পেচকমুদ্রা ভারতবর্ষে আসিত এবং যখন এথেন্সের মুদ্রাশালা বন্ধ হইয়া যায়, তখন ইহার অনুকরণে ভারতবর্ষে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইটী যদি আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে কোন্ সময়ে এই জাতীয় মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা ভারতবর্ষে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি। এথেন্সের মুদ্রাশালা ৩২২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে বন্ধ হইয়া যায় ও সোফাইটীসের মুদ্রা আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক। সুতরাং এই সময়ে যে এই মুদ্রার অনুকরণ ভারতবর্ষে হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি।

যে সকল এথেন্সীয় অনুকরণ-মুদ্রা ভারতবর্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়াছে, তাহাদিগকে আমরা দুইভাগে বিভক্ত করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীর মুদ্রা প্রায় এথেন্সীয় পেচকমুদ্রার ন্যায় দেখিতে। এই মুদ্রার সম্মুখে এথেনা দেবীর মুখ দক্ষিণ দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে; বিপরীতে সম্মুখদিকে নিবদ্ধ-দৃষ্টি পেচক রহিয়াছে, দক্ষিণে AΘE লিখিত আছে। এই শ্রেণীর আর এক প্রকার মুদ্রার সম্মুখ ও বিপরীত ঠিক এই প্রকারের, কেবল AΘE-এর পরিবর্ত্তে AII' লিখিত আছে। এই শ্রেণীর মুদ্রার দ্বিতীয় উপবিভাগের সম্মুখ ও বিপরীত এই প্রকারের, কেবল বিপরীত দিকে একটি চিহ্ন ও দ্রাক্ষাগুচ্ছ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর মুদ্রা নির্ম্মিত হইবার কিছুকাল পরে আর এক শ্রেণীর মুদ্রা নির্ম্মিত হয়। এই শ্রেণীর মুদ্রার বিশেষত্ব হইতেছে যে, বিপরীত-দিকে পেচকের পরিবর্ত্তে আমরা দক্ষিণদিক্নিবদ্ধ-দৃষ্টি ঈগল পক্ষী অঙ্কিত দেখি। এই জাতীয় মুদ্রা হইতেই সোফাইটিসের (Sophytes) মুদ্রা অনুকরণ করা হইয়াছিল। এই জাতীয় মুদ্রা রৌপ্যনির্ম্মিত। ইহাদের আকৃতি গোলাকার।

এক্ষণে আমরা এই জাতীয় মুদ্রার তৌল লইয়া আলোচনা করিব। প্রথম বিভাগের প্রথম উপবিভাগের মুদ্রার ওজন সাধারণতঃ ত্রি-দ্রাক্মার সমান। দ্বিতীয় উপবিভাগের মুদ্রা তিন প্রকারের, যথা, ত্রি-দ্রাক্মা (Tetradrachm), দ্বি-দ্রাক্মা (Didrachm), দ্রাক্মা (Drachm)। দ্বিতীয় বিভাগের মুদ্রা দুই প্রকারের, যথা দ্রাকমা ও দ্বি-ওবল (Diobol)।

ভারতবর্ষে প্রচলিত আলেকজাণ্ডারের মুদ্রা লইয়া এক্ষণে আমরা আলোচনা করিব। এই মুদ্রার যথার্থ প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে আমরা বলিতে পারি যে, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই জাতীয় মুদ্রা ভারতবর্ষে খনন করিয়া পাওয়া যায় নাই। স্যর জন্ মার্শাল তক্ষশিলা খনন করিতে করিতে এই জাতীয় মুদ্রা পান। তিনি বলিয়াছেন—"Most valuable of all is a collection

of coins and jewellery found in an earthenware 'ghara' near the eastern limits of the excavations. The 'ghara' in question is found about 6 feet below the present surface, that is, in association with the second stratum, which had already been judged to belong to the 3rd or 4th century B.C. Most of the coins are punch-marked Indian issues, including a number of the local Taxilian types. What, however, gives this find of coins a unique value is the presence in it of three Greek coins from the mint, two of Alexander the Great and one of Philip Aridaeus, besides a well-worn siglos of the Persian empire [Arch. Surv. Ind. An. Rep. 1924-25, P.47-48, Pl. IX] সুতরাং এক্ষণে আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডারের মুদ্রা প্রচলিত ছিল ; এবং যেহেতু এই জাতীয় মুদ্রা খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দের স্তরে পাওয়া গিয়াছে, সে হেতু আমরা বলিতে পারি যে, এই সময়েই আলেকজাণ্ডারের মুদ্রা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। এই মুদ্রাটী ব্যতীত আরও কয়েক প্রকারের আলেকজাণ্ডারের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, যাহাদিগকে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল বলিয়া অভিহিত করা হয়। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে আলেকজাণ্ডারের চতুষ্কোণ মুদ্রার ব্যবহার ছিল না এবং ভারতবর্ষেই চতুষ্কোণ মুদ্রার প্রচলন ছিল। কেবলমাত্র এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অনেক মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই মুদ্রাটী ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল। র‍্যাপ্সন ও গার্ড্নার বলিয়াছেন যে, এই মুদ্রাটী ভারতবর্ষে নির্ম্মিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছিল। ডানেন্বের্গ্ এই মুদ্রাটী ব্যাকট্রিয়াতে প্রচলিত ছিল বলিয়াছেন। রেপ্লিং ও ম্যাক্ডোনাল্ডের মতানুসারে এই মুদ্রাটী ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল না। এই মুদ্রার চতুষ্কোণত্ব ও ভারতবর্ষে প্রচলনের মধ্যে যে কোনও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না।

আলেকজাণ্ডারের এক জাতীয় রৌপ্য দ্বি-ড্রাক্‌মা পাওয়া গিয়াছে। *ইহা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল কি না,* তাহা আমরা দেখিব। এই জাতীয় মুদ্রার সম্মুখে গ্রীসিয় দেবরাজ জিয়াসের (Zeus) মুখ দক্ষিণ দিকে নিবদ্ধ রহিয়াছে ; বিপরীতে ঈগল পক্ষী বামদিকে তাকাইয়া বজ্রের উপর দাঁড়াইয়া আছে, বামদিকে, উপরি ভাগে অলিভ্ (olive) গুচ্ছ রহিয়াছে ও দক্ষিণ দিকে মধ্যভাগে ক্ষত্রপ-শিরস্ত্রাণ রহিয়াছে ও গ্রীক্ ভাষাতে AAEΞAN ΔPOY লিখিত আছে। এই জাতীয় মুদ্রা যে আলেকজাণ্ডারের সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই মুদ্রা যে প্রাচ্য-ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল তাহা হেড্ প্রমাণ করিয়াছেন। ম্যাসিডন্-নৃপতি তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রাচ্য অংশেই ক্ষত্রপ বা শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই জাতীয় মুদ্রাস্থ ক্ষত্রপ-শিরস্ত্রাণ হইতে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, এই জাতীয় মুদ্রা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রচলিত ছিল না, কেবলমাত্র প্রাচ্য-ভূখণ্ডেই প্রচলিত ছিল। এখন দেখিতে হইবে যে, প্রাচ্য-ভূখণ্ডের কোন্ দেশে ইহা প্রচলিত ছিল। এই শ্রেণীর মুদ্রার প্রাপ্তি-স্থান একেবারে অজ্ঞাত বলিলেই চলে। রাওলপিণ্ডি হইতে এই প্রকার একটী মাত্র মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে এবং এই জাতীয় দ্বি-ওবল ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মধ্য এশিয়াতে তাস্খণ্ড্ নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় মুদ্রার সহিত এথেন্সের অনুকরণে নির্ম্মিত ঈগল-মুদ্রার সহিত ইহার এরূপ সাদৃশ্য থাকায় আমরা অনুমান করিতে পারি যে, এই জাতীয় মুদ্রা ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল। ঈগল-মুদ্রার ন্যায় আমরা ইহার বিপরীতে ঈগল-পক্ষী দেখিতে পাই। তৌল আলোচনা করিলেও আমরা এই মুদ্রার সহিত ঈগল-মুদ্রার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ম্যাক্ডোনাল্ডের মতানুসারে এই জাতীয় মুদ্রা মধ্য-এশিয়াতে প্রচলিত ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে, কিন্তু ইহাকে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল বলিয়া অভিহিত করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হয়।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে একটি রৌপ্য দশ-ড্রাক্‌মা রক্ষিত আছে। ইহার সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট একজন যোদ্ধা

বল্লম দ্বারা হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট দুইজন যোদ্ধাকে আক্রমণ করিতেছেন, বিপরীতে বামদিকে নিবদ্ধদৃষ্টি যোদ্ধা বক্স এবং বল্লম লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার কোমরে তরবারি ঝুলিতেছে ও বামদিকে নিম্নভাগে গ্রীক অক্ষরে একটি সংক্ষিপ্ত লেখন আছে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ গার্ডনার ইহার বিবরণ প্রকাশ করেন। তিনি এই মুদ্রাটিকে ব্যাক্ট্রিয়ার মুদ্রা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মতে এই মুদ্রাটী খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দের কোনও ব্যাক্ট্রিয়াবাসী গ্রীক-নৃপতির সহিত অসভ্য ইয়ুচিজাতির যুদ্ধের বিবরণ অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ হেড্ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—"It belongs to Alexander's own time, and it records the historical event of his invasion of the Punjab in 326 B. C." তাঁহার মতে সম্মুখে রাজা পুরু ও তক্ষশীলা নৃপতির যুদ্ধ অঙ্কিত হইয়াছে ও বিপরীতে আলেকজাণ্ডারকে গ্রীক দেবতা জিয়াস্-রূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। তাঁহার মতে এই মুদ্রাটী আলেকজাণ্ডারের নামে তক্ষশিলা নৃপতি কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রীক অক্ষরে লিখিত উপরে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত লেখনের অর্থ কি? পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, ইহা ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ গ্রীকলিপির সংক্ষিপ্ত লেখন (monogram) এবং এই পাঠ-সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই। তক্ষশিলা খননকালে স্তর জন্ মার্শাল আলেকজাণ্ডারের যে দুইটী মুদ্রা পাইয়াছিলেন তাহার বিবরণ এক্ষণে প্রদত্ত হইবে। প্রথম মুদ্রাটীর সম্মুখে বিন্দু-নির্ম্মিত গোলাকার বেষ্টনীর মধ্যে দক্ষিণদিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি জিয়াসের মস্তক; বিপরীতে সিংহচর্ম্ম পরিহিত গ্রীক দেবতা হেরাক্লিস্ বামদিকে তাকাইয়া সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার দক্ষিণপদ সিংহাসনের সম্মুখে বামপদের সহিত লগ্ন রহিয়াছে, বিস্তারিত দক্ষিণ হস্তে ঈগল পক্ষী রহিয়াছে, বামহস্তে যষ্টি রহিয়াছে, দক্ষিণ হস্তের নিম্নে একটী চিহ্ন বর্ত্তমান ও তাঁহার পশ্চাতে গ্রীকভাষাতে সংক্ষিপ্ত লেখন (monogram) অঙ্কিত আছে। গ্রীকভাষাতে জনৈক নৃপতির নাম লিখিত ছিল, কিন্তু মুদ্রাটী অত্যন্ত ব্যবহৃত বলিয়া অনেকগুলি অক্ষর আর পড়া যায় না। তবে যাহা পড়া গিয়াছে তাহা এই—ΒΑΣΙΛΕΩ * * * * * * * * * * * *। দ্বিতীয় মুদ্রাটীর সম্মুখ ও বিপরীত প্রায় এই প্রকার, কেবল মাত্র পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত লেখনের পরিবর্ত্তে অন্য একটি চিহ্ন অঙ্কিত রহিয়াছে। গ্রীকভাষাতে ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ লিখিত আছে। এই মুদ্রাটী হইতেই আমরা বলিতে পারি যে, পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাটীও আলেকজাণ্ডারের।

(১৪৬৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মুদ্রাগুলির বিস্তৃত বিবরণ ক্রোড়-পত্রে দ্রষ্টব্য)
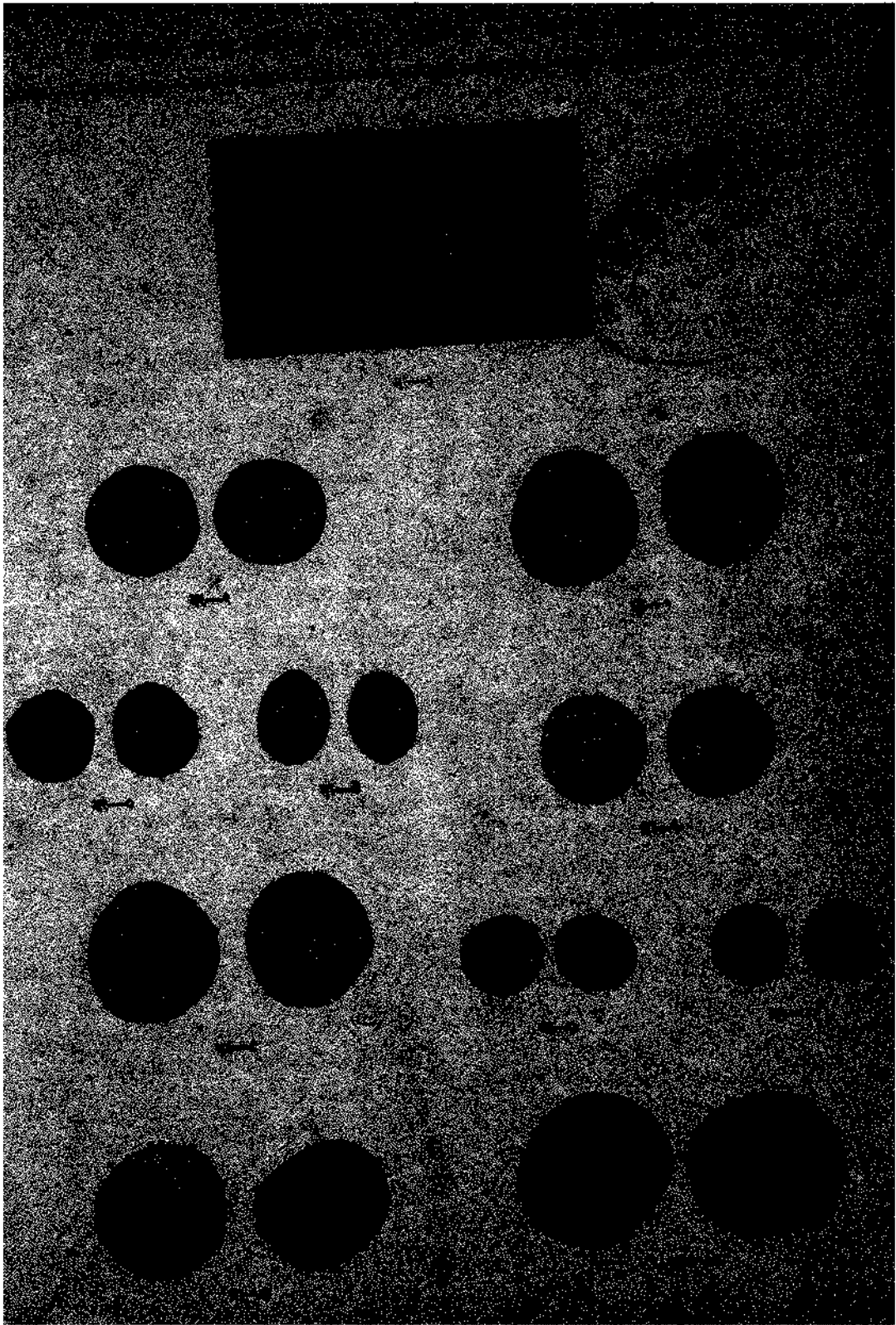
প্রবাহ

শ্রীবজ্রানন্দ গুপ্ত

হে প্রবাহ, তুমি চল ধীরে,
তুমি চল অলক্ষিত নীরে,
সীমাহীন দিশাহীন আদি-অন্ধ হ'তে
বাহিরিয়া প্রচুর আলোতে।

দূরপথে জাগিছে মানুষ,
জাগিছে অসীম জীবলোক,
জাগিছে অরণ্যমাঝে শ্যামল পুলক,
স্ফুরিছে জ্যোতির লিপি উগ্র নিষ্কলুষ।—
তোমার জাগার সুর, তোমার ঠিকানা
তবু নাহি গেলো জানা।
কবে কোন্ অসীমের ঘূর্ণাবর্ত্ত হ'তে
ওই ব্যোমে, এই মর্ত্ত্য-পথে
অকস্মাৎ ছিঁড়িয়া আপনা
নিক্ষেপিলে, নাহি জানি, ওগো অন্যমনা!
শুধু এইটুকু জানি—
তোমার ভাষার সুর আঁকিল যে অপূর্ব্ব বিচিত্র পথখানি
স্বপ্নে মোর,—সে ডাকে আমায়
বারম্বার—আয়, আয়, আয়।
দিন নাই, রাত নাই, সেই সুর বাজে,
তাহার পক্ষের ধ্বনি ডাকে মোরে কাজে ও
অকাজে।

আর নয়, আর নয়, ওরে আর নয়
নিবিড় স্নেহের নীড়, আরাম নিশ্চয়,
নয়—নয়,
প্রিয়া সাথে গৃহকোণে বিরহ প্রণয়।
দূরে ওই তারকার হাতছানি কহে ইশারায়
—নভোনীল পাঠায়েছে লিপির লহর—
ওই শুনি সাগরের কল্লোল মুখর,
'ভিসুভিয়াসের' ধোঁয়া ওই যে ঘনায়।
গৃহ ছাড়ি' পান্থ তাই ব'রে নিল পথের পাথার,
হে প্রবাহ, তুমি শুধু চল সাথে তার।

ভেসে গেল গৃহ-মায়া, মুছে গেলো জানা কিছু সবি
—একটি নদীর ধার,—একটি চাঁদের আলো,
একটি প্রিয়ার মুখচ্ছবি।
জগতের আরো গৃহ, অন্য প্রিয়া আজি ডাকে তারে,
আজি তার নিশি কাটে অন্য এক নদীর কিনারে।
আজ তার নব স্বপ্ন, নবতম প্রাপ্তির আশায়
দিন কেটে যায়।
এই যে নবীন আলো, এই যে নবীন আশা
তুমি দিলে তারে,
পথিক সুদূর দেশে তারি তরে স্মরিছে তোমারে।

লণ্ডন
২১-এ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২

জ্যোতিষের জয়

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিরঃপীড়া

কালীঘাট ট্রাম-ডিপোর সন্নিকটস্থ এক জ্যোতিষীর গৃহে একদিন মধ্যাহ্নে দুইজন লোকের মধ্যে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

—সন্তানাদি আপনার অদৃষ্টে নাই বলিয়াই মনে হইতেছে।

—কোষ্ঠীখানা ভাল ক'রে দেখেছেন?

—না দেখিয়া বলিব কেন?

উভয়েই কিয়ৎকাল নীরব। বলা বাহুল্য, একজন জ্যোতিষী; অপরজন ফলাফল জানিতে উৎসুক! ইঁহার নাম কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়। বয়স প্রায় চল্লিশ। সুপুরুষ, চল্লিশ বৎসর বয়স হইলেও, দেখায় ত্রিশ বত্রিশ। লোকটি অবস্থাপন্ন, চেহারায় ইহাও সুপ্রকাশ।

কুমুদনাথ কহিলেন, দেখুন, আমাদের বংশে আমি একমাত্র পুরুষ, আমার সন্তানাদি না হ'লে বংশলোপ পাবে! আমার মাতাঠাকুরাণী বেঁচে আছেন, তাঁর ইচ্ছা, আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করি।

জ্যোতিষী মহাশয় ঠিকুজীখানি দেখিতেছিলেন, পূর্ব্ববৎ শুদ্ধ-লেখ্য ভাষায় কহিলেন, বিপরীত কথাও লিখিত নাই!

কুমুদনাথের মুখ বিমর্ষ হইল, এক মুহূর্ত্ত পরে দক্ষিণ হস্তখানি জ্যোতিষীর পানে প্রসারিত করিয়া বলিলেন, হস্তরেখাটা দেখবেন একবার?

জ্যোতিষী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, হস্তরেখা ও ঠিকুজী-কোষ্ঠি ভিন্ন কথা বলে না।—বলিয়া তিনি হাতখানি লইলেন এবং একটি বার দেখিয়াই সহাস্যে কহিলেন—না, আপনি ভাগ্যবান্ ন'ন।

—তার মানে?

—'ভাগ্যবানের বৌ মরে'—জানেন না, কিন্তু আপনার অদৃষ্ট তাদৃশ সুপ্রসন্ন নয়।

অধিক বাক্যব্যয় বৃথা জানিয়া, কুমুদনাথ মাণিব্যাগ খুলিয়া একখানি পাঁচ টাকার নোট জ্যোতিষী মহাশয়ের হাতে দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। জ্যোতিষী মহাশয় ঠিকুজী-কোষ্ঠীটি গুটাইয়া তাঁহার হাতে দিলেন। নমস্কার করিয়া বলিলেন—আচ্ছা, কুমুদবাবু নমস্কার! ভবিষ্যতে প্রয়োজন হইলে স্মরণ করিবেন।

কুমুদনাথ নমস্কার করিলেন কিন্তু কথার উত্তর দিলেন না। জ্যোতিষী মহাশয় দ্বার পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া, আবার একবার নমস্কার করিয়া বিদায় লইলেন। কুমুদনাথ চিন্তিত মুখে কয়েক পা আসিয়া ট্রাম-ডিপোর সামনে দাঁড়াইয়া টালিগঞ্জের ট্রামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কত ট্রাম আসিতেছে যাইতেছে, টালিগঞ্জের গাড়ী আর আসে না। কুমুদ-বাবুর মনে হইতেছিল, তাঁহার মুখখানা কালীপানা হইয়া গিয়াছে, আর পথচারী সকলেই হাঁ করিয়া তাঁহাকে দেখিতেছে। লোকে যাহাতে তাঁহাকে দেখিতে না পায়, তিনি সেই ভাবে মুখখানা আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

টালিগঞ্জের ট্রাম আসিল, কুমুদনাথ একেবারে সামনের বেঞ্চখানিতে গিয়া বসিলেন। কেহ যাহাতে তাঁহার 'কালীপানা' মুখখানা দেখিতে না পায়, সেইজন্য ডানদিকে একটু কাৎ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

বাড়ী পৌঁছিয়া শয়ন-কক্ষে ঢুকিয়া জামা কাপড়গুলি বদলাইয়া শয়ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহার মাতাঠাকুরাণী আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মা প্রথমেই কথা বলিলেন, দেখা হ'ল? গণৎকার কি বললে?

কুমুদনাথ বলিলেন, সেই একই কথা। এরা কোথায়?

—পাশের বাড়ীর সেজ বৌ এসেছিল, তার সঙ্গে সরগুপ্তের বাড়ী গেছে। তুই ভাবিস নে কুমুদ, ঠিকুজী-কোষ্ঠী সব যদি ঠিক হোত, তা'হলে আর ভাবনা ছিল কি? কথায় বলে—জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে। এ তিন ব্যাপারে মানুষের গণনা খাটে না। আমি দু'এক জায়গায় খবর পাঠিয়েছি একটি ভাল মেয়ের সন্ধানে।

—না মা, ওর বড় মনঃকষ্ট হবে।

—প্রথম দিনকতক, তারপর সব স'য়ে যাবে। তোমার ঠাকুর্দ্দার যে তিন সংসার ছিল, তিন ঠাকুমাই ত' ঘর করতেন। তোমার ছোট ঠাকুমার পেটেই ত' উনি হয়েছিলেন।

—কিন্তু মা, সে ছিল সেকালের কথা, একালের মেয়েরা…

—শোনো বাছা, আমি যা ভেবে রেখেছি, তা তোমায় বলি।

কুমুদনাথ সভয়ে কহিলেন, এসে পড়বে না ত' মা?

—না, বাছা না, সদর দরজায় খিল দেওয়া আছে। ওরা ফিরলে কড়া নাড়বে 'খন।

কুমুদনাথ বলিলেন, তুমি বস না মা।

—বসি বাবা।—মাতা বসিয়া বলিতে লাগিলেন, তুমি দিনকতকের জন্যে কোথাও বাইরে এস গিয়ে। তুমি গেলে পর আমি বৌমাকে বলবো যে, তুমি বিয়ে করতে গেছ। নির্ব্বংশ হয়ে কে থাকতে চায় বল, আমিই পরামর্শ দিয়ে তা'কে বিয়ে করতে পাঠিয়েছি। শুনে বৌমা চুপ-চাপ থাকেন, ভাল; না হয় তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ী বলাগড়ে পাঠিয়ে দোব। তারপর তিনি চলে গেলে, তুমি যে যায়গায় থাকবে, সেইখান থেকে আমায় চিঠি লিখো, আমি সেই ঠিকানায় পত্র দিলে তুমি চলে আসবে। এরই মধ্যে আমি সব ঠিক ক'রে ফেলবো, তুমি এলেই শুভকর্ম্ম হ'তে পারবে।

কুমুদনাথ নতমস্তকে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কথাগুলা যে তাঁহার অন্তরে সমর্থন পাইতেছে না, তাহা বুঝিতে তাঁহার মাতারও বিলম্ব হইল না।

মা কহিলেন, না বাবা, তুমি অত ভেবো না, এ ছাড়া আর উপায় নেই। আমার শ্বশুরের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না, তোমার পিতৃপুরুষ এক গণ্ডুষ জল পাবেন না, আমি থাকতে এমন অধর্ম্ম হ'তে দিতে পারব না।

কুমুদনাথ ভগ্নপ্রায় কণ্ঠে কহিলেন, কিন্তু মা, জ্যোতিষী যে বলেছেন—

—সে ভার আমার! ভাত ছড়ালে কাকের দুঃখু? বাঙলাদেশে আমার ছেলের আর একটা বিয়ে দিতে না পারি যদি, গলায় দড়ি দোব না? সে ভার বাছা আমি নিলুম, তুমি কবে যাত্রা করবে তাই ঠিক করো।

বাধ্য পুত্রের মত কুমুদনাথ বলিলেন—তুমি বলো।

—আমি বলি কি, দেরী করা চলবে না! আজ প্রতিপদ, কাল দ্বিতীয়া, পরশু তৃতীয়া, তুমি পরশুই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ো।—মা একটু থামিয়া গলাটা একটু কঠিন করিয়া কহিলেন, এই দু'দিন বাছা মনটা একটু শক্ত ক'রে রেখো। আমি বলি কি, বাইরে বাইরেই না হয় থাকলে, দু'টো দিন বই ত' নয়!

কুমুদনাথ নীরব।

মা বলিতে লাগিলেন, আজ পাঁচ পাঁচটি বছর সাধছি বাবা, আমার কথা শুনলে, কবে চাঁদপানা ছেলের মুখ দেখে বর্ত্তাতে!

বাহিরে কড়া নড়িয়া উঠিল। মাতাপুত্রে চোখে চোখে কি কথা হইয়া গেল, মা বাহিরে গিয়া অন্নদা নাম্নী পরিচারিকাকে ডাকিয়া দ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন।

নলিনী বাড়ীর বধূ। মোটা সোটা গোল গাল দেহ, রং ফর্সা, মুখ-চোখও বেশ, গিন্নিবান্নীর মত চেহারা। শয়নকক্ষে ঢুকিয়া দেখিল, স্বামী দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়া আছেন। জিজ্ঞাসিল, অসময়ে শুলে কেন গো?

—শরীরটে ভাল নেই, মাথা ধরেছে।

—চা করি?

—না, বড্ড মাথা ধরেছে।—বলিয়া কুমুদনাথ চক্ষু মুদিলেন। বলা বাহুল্য, মাতৃ-আজ্ঞা অলঙ্ঘ্য; তিনি 'শক্ত হইতেছেন'।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুনরাগমনায়চ

মাথাটা পরদিনও ছাড়িল না। সকলেই, বিশেষ করিয়া নলিনী বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। ডাক্তারকে খবর দিতে চাহিল, শাশুড়ী মুখখানা গোমড়া করিয়া রহিলেন। রোগীও এমনই বেয়াড়া যে, 'কেহ' কাছে বসিয়া যে মাথাটা টিপিয়া দিবে কিম্বা গায়ে হাত বুলাইয়া দিবে, তাহাতেও আপত্তি। ভাল লাগে না! কুমুদ খুব 'শক্ত' হইয়াছে।

তৃতীয় দিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া কুমুদনাথ ঘোষণা করিলেন, বায়ু পরিবর্ত্তনার্থ তিনি কয়েকদিনের জন্ত দেওঘর যাইতেছেন। দেওঘরে তাঁহার এক বন্ধু সপরিবারে আছেন, তাঁহাদেরই অতিথি হইবেন।

মা বলিলেন, তা ভাল কথাই তো। দিনকতক ঘুরে আসা ভাল।

কুমুদনাথ সমস্তদিন বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহে ফিরিতেই, নলিনী কহিল, আমি যাব।

কুমুদনাথ সংক্ষেপে জবাব দিলেন, শুনছো, আমি উঠবো এক বন্ধুর বাড়ীতে! লোকের বাড়ীতে গুষ্টি-শুদ্ধ যায় না কি?

নলিনী আতপতাপদগ্ধা নলিনীর মত শুকাইয়া গেল।

ন'টা রাত্রে আহারাদি সারিয়া, ট্যাক্সি ডাকাইয়া কুমুদনাথ বাক্স, পোঁটলা-পুঁটলী লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। নলিনী প্রণাম করিল, কুমুদনাথ গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অধিকতর বিসদৃশ ব্যাপার এই যে, যাত্রাকালে কুমুদনাথ তাঁহার মাতাকে একটা প্রণাম পর্য্যন্ত করিলেন না। তিনি অসুস্থ, তাহা তো দেখাই যাইতেছে কিন্তু এমন কেন? কর্ত্তব্যে এমন অবহেলা ত' কখনই দেখা যায় নাই; এ সকল দুর্লক্ষণ ছাড়া আর কি? নলিনী ভাবিয়া সারা হইতে লাগিল।

সেদিন মধ্যাহ্নে নলিনী আহারাদি শেষ করিয়া তাঁহার ঘরে বসিয়া পাণ সাজিতেছিল। শাশুড়ী ও প্রতিবেশিনী বোস-গৃহিণীর কথাবার্ত্তার কিয়দংশ শুনিতে, তাহার মাথায় যেন বাজ পড়িয়া গেল। তাহার শাশুড়ী বলিতেছিলেন, আমি আর কতকাল অমত ক'রে থাকি বল? আমার ঐ এক ছেলে, শ্বশুর বংশের একমাত্র বংশধর। শ্বশুরের বংশ লোপ হ'তে দেখে অমত করিই বা কোন্ প্রাণে? বৌমার যদি বয়স থাকতো, আরও কিছুদিন না হয় চুপ ক'রেই থাকতুম—ছিলুমই ত' চুপ ক'রে—বৌমার ছেলে-পুলে হবার বয়স উত্তীর্ণ হয়ে গেছে ব'লেই না আবার কুমুদ বিয়ের কথা বলতেই আমি রাজী হলুম।

পাণ খাওয়া নলিনীর ঘুচিয়া গেল, তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল, ধরণী যেন ভূকম্পে দুলিতে লাগিল।

বোস-গৃহিণী জিজ্ঞাসিলেন, বৈদ্যনাথে বিয়ে করতেই গেছে বুঝি?

শাশুড়ী কহিলেন, ওর এক উকীল বন্ধুর একটী বোন আছে, বড়-সড় মেয়ে, দেখতে শুনতেও ভাল, তারা দেওঘরে থাকে, তাই দেখতে গেছে। পছন্দ হয় যদি—

নলিনী আর শুনিতে পাইল না, কাণের মধ্যে রেল এঞ্জিন ছুটিতে লাগিল, মাথাটাকে কে যেন করাত দিয়া চিরিয়া ফেলিতেছিল। ভিজা চুলের গোছাটাকে তাল পাকাইয়া মাথার নীচে চাপিয়া নলিনী সেইখানেই ধূলার উপরে শুইয়া পড়িল।

বিকালে শাশুড়ীর সঙ্গে চোখাচোখি হইতে, নলিনী জিজ্ঞাসিল, বোস-গিন্নীকে যা বলছিলেন, সব সত্যি?

—তুমি কোত্থেকে শুনলে বৌমা?

নলিনী এ কথার জবাব দিল না, মাতৃসম্বোধনও করিল না, বলিল, সত্যি কি না তাই বলুন?

—তা, হাঁ, তা সত্যি বই কি! বংশলোপ হয়!

নলিনীর মাথায় তখনও আগুন জ্বলিতেছিল, বলিল, আমি বোধ হয় নতুন বৌয়ের ঝি থাকবো?

শাশুড়ী অপ্রসন্নমুখে কহিলেন, ঝি হ'তে যাবে কো বাছা? তুমি বাড়ীর বড় বৌ, যেমন গিন্নি-বান্নী আছ

তেমনই থাকবে। তোমার শ্বশুরের, দাদা-শ্বশুরের বংশনাশ হয়, সেই কি তোমার ইচ্ছে ?

—আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেতে কি যায় আসে ? আপনাদের এ সংসারে গিন্নি হয়ে থাকবার ইচ্ছে আমার আর নেই। আমার ভায়েরা গরীব দুঃখী বটে, তবু তাদের সংসারে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পাবো। সরকার মশায়কে বলে দিন, আমাকে যেন কালই বলাগড়ে রেখে আসেন।

শাশুড়ী আপনমনে যে সকল কথা আওড়াইতে লাগিলেন, তাহা শুনিবার প্রবৃত্তি নলিনীর ছিল না, কিন্তু ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক কতকগুলা কথা কাণে আসিতে লাগিল, যাহার মর্ম্ম এইরূপ—আজকালকার বৌ-ঝি এমনই স্বার্থপর বটে ! সেকালের পুরুষেরা জনে জনে পাঁচ সাত দশ বিশ পঞ্চাশটা বিয়ে করতো, তাই দেখে কোন্ বৌ-ঝি ফরফরিয়ে বাপের বাড়ী চলে গেছে, বাপের জন্মেও ত' এমন কথা শুনি নি বাছা।

তিনি শুনুন আর নাই শুনুন, নলিনী পিত্রালয়ে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল এবং এক সময়ে ঝির দ্বারা বৃদ্ধ সরকার মহাশয়কে ডাকাইয়া কাল সকালের গাড়ীতেই যাইতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিল। নলিনীর শাশুড়ী কোন কথাই আর বলিলেন না।

নলিনী শাশুড়ীকে প্রণাম করিতে, শাশুড়ী আশীর্ব্বাদ না করিয়া পারিলেন না। তা' না করিয়া কি পারা যায় গা ? পনেরো কুড়ি বছর যে উহাকে লইয়া ঘর-সংসার করিয়াছেন। রূপে-গুণে অমন বৌ কি হয় গা ? ভগবান যে মুখ তুলিয়া চাহিলেন না, নহিলে— ! চোখের কোণ দুইটা ভিজিয়া আসিল ; শাশুড়ী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, দশদিন ঘুরে এস মা ! তোমার ঘর, তোমার সংসার, তোমার স্বামী, তোমার সর্ব্বস্ব ! তোমাকে আসতেই হবে।

নলিনী মুখে কিছুই বলিল না, মনে মনে বলিল, এ কাঠামোয় না !

বৈদ্যনাথধামে পত্র গেল, কুমুদ যেন ফিরিতে দেরী না করে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চতুরচন্দ্র

মাসখানেক পরে কুমুদনাথ বৈঠকখানায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন, একটি না-যুবা না-প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক বৈঠকখানায় ঢুকিয়া ঘরের কোণে ছাতিটি রাখিয়া নমস্কার করিয়া, একগাল হাসিয়া কহিল—এই যে মুখুজ্জে মশায়, ভাল আছেন ত' ?

কুমুদ আগন্তুককে চিনিতে পারিল না, বলিল, বসুন। আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

—সে কি মুখুজ্জে মশায়, চিনতে পারলেন না ? আমি যে চতুরদা'। আপনার বিয়ের সময় বাসরে আপনাকে খুব জ্বালিয়েছিলুম। আমার বাড়ী পাঁচ-পাড়া, বলাগড় থেকে মাত্র দেড় ক্রোশ। স্বর্গীয় রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পর্কে আমার জ্যেঠামশায় হতেন, নলিনী আমার দূর সম্পর্কের ভগিনী হয়।

কুমুদনাথের মুখ অপ্রসন্ন হইল ; ভাবিলেন, বিঘ্ন উপস্থিত। নিশ্চয়ই ধর-পাকড় করিতে আসিয়াছে। বলিলেন, দেশ থেকে আসছেন না কি ?

আগন্তুক কহিলেন, না ! আপনার স্মরণশক্তি বড়ই খারাপ দেখছি। তখনই ত' শুনেছিলেন, আমি কাশীতে ওকালতী করি। বর্ত্তমানে কাশীধাম থেকেই আসছি। আপনি সিগারেট টিগারেট খান না না-কি ?

কুমুদনাথের ও সব বালাই ছিল না, ভৃত্য অনঙ্গকে ডাকিতেছিলেন, আগন্তুক কহিল, সে এই মাত্র বোধ হয় ঝুড়ি-টুড়ি নিয়ে বাজারে গেল, তার কাছেই ত' জানলুম, আপনি বাড়ীতেই আছেন, বৈঠকখানাতেই আছেন। আরও দু'দিন শুভাগমন হয়েছিল, মশায় গৃহে অনুপস্থিত ছিলেন।—বলিয়া, হাসিয়া ভদ্রলোক পকেট হইতে বিড়ি ও দেশলাই বাহির করিলেন। বিড়িটাকে বারকতক ঠুকিয়া, সরল করিয়া লইয়া, ফুঁ দিয়া, অগ্নি-সংযোগ করিয়া এক ঝলক ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন, খোট্টাদেশের মানুষ, বুঝলেন না মুখুজ্জে মশায় ! বিড়িই

বলুন, সিগারেটই বলুন, চতুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অরুচি কিছুতেই নেই।

কুমুদনাথ নীরবে বসিয়া রহিলেন।

চতুরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, এইবার কাজের কথা বলি শুনুন। কাশীতে থাকতেই খবর পেলুম, আমার স্বর্গীয় জ্যেঠামশায়ের কন্যা নলিনীকে আপনি ত্যাগ করেছেন—

কুমুদনাথ প্রতিবাদ স্বরূপ কহিলেন, না, না, ত্যাগ নয়—

চতুরচন্দ্র বলিলেন, আমি সব শুনেছি মশায়। নলিনী, সে-ও ত' আমারই সম্পর্কে বোন, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হ'ল, হ্যাঁ তা হ'ল বৈ কি, আজও ছেলেপুলে হ'ল না, ত্যাগ না করলেও আপনি অন্য একটি বিবাহের চেষ্টা করছেন। কিছু অন্যায় করছেন না মশায়! আমি হ'লেও তাই করতুম! চতুরদা' অমন বাজে কথা বলে না; খাঁটি কথা বলতে বাপের খাতিরও সে রাখে না, দোষই বলুন, গুণই বলুন, খোট্টা দেশের লোক, ছাতু ভুট্টা খাই, স্বভাব অমনি হয়ে গেছে। কৈ আপনার অনঙ্গদেব ফিরলেন?

—আমি সরকার মশাইকে বলছি।

—অমনি একটু চায়ের কথাও বলে দেবেন।

—আপনি বসুন, আমি খবর দিয়ে আসি—বলিয়া কুমুদনাথ অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন এবং পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া স্বস্থানে উপবিষ্ট হইলেন।

চতুরদা' কহিলেন, শুনুন আমার একটি ভগ্নী আছেন, কাশীতেই থাকেন, বাপ মায়ের অবস্থা ভারি খারাপ, বিয়ে হয় নি। সুশ্রী, গৌরবর্ণা, বয়স্কা, লেখা-পড়া জানেন, গান-বাজনাও যে না জানেন, তা নয়; রূপে, সংসারের কাজকর্মে এক-আধারে লক্ষ্মী সরস্বতী। এই ভগ্নীটিকে আপনার গ্রহণ করতেই হবে।—চতুরদা' চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া কুমুদনাথের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিলেন।

কুমুদনাথ কহিলেন, চতুরদা' বসুন বসুন, সব শুনি আগে।

—আর কি শুনতে চান বলুন! মেয়েটি সর্ব্বগুণযুক্তা, দোষের মধ্যে বড় গরীব; বড় গরীব। চতুরদা'র চোখে যেন জল আসিয়া পড়িতেছিল,—আমার সঙ্গে ফটো আছে, দেখবেন?—বলিয়া চতুরদা' বুক পকেট হইতে একখানি মলিন খাম টানিয়া বাহির করিলেন, তন্মধ্য হইতে কার্ডবোর্ডে আঁটা পোষ্টকার্ড সাইজের একখানি ফটো বাহির করিয়া কুমুদের হাতে দিলেন।

কুমুদ জিজ্ঞাসিলেন, ব্রাহ্ম ট্রাহ্ম নয় ত'?

চতুরদা' হাসিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মিকা ধরণের কাপড় পরা দেখে বলছেন বুঝি? আজ-কালকার ফ্যাসানই ত' ঐ. দেশশুদ্ধ মহিলারা ঐ রকম ঘুরিয়ে পেঁচিয়েই কাপড় পরে থাকেন। তাঁরা সকলেই যদি ব্রাহ্ম হন, কুমুদিনীও ব্রাহ্ম!

—কুমুদিনী তাঁর নাম বুঝি?

চতুরদা' লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আশ্চর্য্য মিল হবে কিন্তু! এটা আমার আগে মনেই হয় নি! আশ্চর্য্য মিল! এ যেন একেবারে যোগেযোগ যোগ্যং কি বলে যুজ্যতে না কি, তাই! কি বলবো ইদানীং কবিতা লেখা ছেড়ে দিইছি, নইলে, হায় হায়!—

'কুমুদ মিলিত হলো কুমুদিনী সনে'

—আর একটা ছত্র দোব না কি?

কুমুদনাথ প্রফুল্লমুখে কহিলেন, দিন না!

'দেখে হেসে ঢলে পড়ে শশী ঐ গগনে।'

—কেমন, হ'ল ত'? লিখি নে মশাই, তাই। নইলে ঘষা-মাজা থাকলে রবি ঠাকুর না হই, ছবি ঠাকুরও হতে পারতুম!

কুমুদনাথ হাসিতে লাগিলেন।

চতুরদা' কহিলেন, শুধু হাসলে হবে না দাদা, শুভস্য শীঘ্রং, শুভ কার্য্যটি যাতে অবিলম্বে হয়, তা করতে হবে। মা ঠাকরুণকে আমার নাম ক'রে বলুন গিয়ে, টাকা-কড়ি কিছুই দিতে পারব না বটে, তবে মেয়েটি বা দোব, হাঁ!

এই সময়ে পাচক-ব্রাহ্মণ চা প্রভৃতি লইয়া ঘরে

ঢুকিল। কুমুদনাথ বলিলেন, চতুরদা' চা খান বসে, আমি আসছি।—বলিয়া তিনি অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য, ফটোখানি হাতেই ছিল।

কিয়ৎ কাল পরে কুমুদনাথ ফিরিয়া আসিলেন, হাতে এক বাক্স স্বদেশী সিগারেট ও একটি দেশলাই—ফটোখানিও আছে—টেবিলের উপর সেগুলি রাখিয়া বলিলেন, আপনারা কি এই মাসের মধ্যেই কাজ করতে চান?

—মাস কি বলছ দাদা! এই হপ্তা হ'লে বর্তে যাই! মাছের কাঁটা গলায় আটকেছে দাদা, প্রাণ যায়!

—ক'লকাতাতেই হবে ত'?

চতুরদা' একটি সিঙাড়া খাইতেছিলেন, কতকাংশ হাতেই ছিল, ক্ষিপ্রহস্তে সেটিকে মুখগহ্বরে ফেলিয়া দিয়া দু'টি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, ঐ অনুরোধটি ক'রো না দাদা, দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বো। দু'মুঠো অন্নই জোটে না, ক'লকাতায় আসার খরচ কোথায় পাবো দাদা! শুধু তাই নয়! কুমুদিনীর মা বুড়ো মানুষ, থুড়থুড়ে অবস্থা, এখন-তখন হ'য়ে আছেন, একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে, বুড়ী মরবার আগে দেখে যেতে পারবে না, সেই বা কেমন করে হয়?

কুমুদনাথ বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চতুরদা' কহিলেন, আমি যা ব্যবস্থা করবো, বলি শোন দাদা! আমার জ্যাঠাইমারা থাকেন বাঁশ-ফটকায়। বিশ্বনাথ গলিতে আমার এক আত্মীয়া থাকেন, সেই বাড়ীতে গিয়ে তুমি উঠতে পারবে, সেইখান থেকে আমরা অর্থাৎ বরযাত্রিরা বর নিয়ে বাঁশ-ফটকায় যাব। বিয়ের দিনের সামান্য যা কিছু খরচ, তাঁদের অর্থাৎ বিশ্বনাথ গলির আত্মীয়াদের ধ'রে দিলেই হয়ে যাবে'খন। আর হ্যাঁ, বলেছি ত' জ্যাঠাইমার অবস্থা ভারি খারাপ, যে দু'চারজন বরযাত্রী নিয়ে যাব আমরা, তাদের খাওয়ানোর খরচটা আমাদেরই বহন করতে হবে।

কুমুদনাথ বলিলেন, বরযাত্রী নিয়ে যাবার দরকারই বা কি?

—দরকার একটু আছে বৈ কি দাদা! বিয়েটা ত' একটা আইন ঘটিত ব্যাপার কি না, যাকে বলে contract! তাতে বরযাত্রিরাই হ'ল সাক্ষী। বিয়ের বর বা ক'নেকে বাদ দিয়ে যেমন বিয়ে হয় না, বরযাত্রী বাদ দিয়েও তেমনি বিয়ে হয় না! ভারি ত' খরচ সে!—হ্যাঁ!

কুমুদনাথ কহিলেন, খরচের জন্য আমি বলছি নে চতুরদা', এ-বিয়েটা ওর নাম কি, বিশেষ ইয়ে নয় কি না।

চতুরদা' মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বলিলেন, ইয়ে নয় মানেটা কি শুনি! স্ত্রীর ছেলে হয় নি, হবার আশা নেই, বংশনাশ হয়, তোমার পুনর্ব্বার বিবাহে দোষটা কি শুনি?

কুমুদনাথ এক মিনিট কি চিন্তা করিয়া লইলেন, তাহার পর কহিলেন, তা'হলে তাই হোক! তবে কি জান দাদা, কাশী যায়গা কি না, আর আজ-কালকার ছোঁড়াগুলো সব গুণ্ডা গোছের, কোনমতে খবরটা ফাঁস হয়ে গেলে—

চতুরদা' চটিয়া উঠিলেন—হয়ে গেলই বা ফাঁস, কি হবে শুনি? গুণ্ডোর গ্র্যাণ্ডো ফাদার হচ্ছেন তোমার এই চতুরদা'! কাশীতে চতুরদা'র প্রতাপ দেখ নি কি না, তাই ভেবে সারা হচ্ছ! দেখলে বুঝবে হ্যাঁ, ইয়ে বটে!

কুমুদনাথ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, তা দু'বাড়ীর খরচ কত হবে মনে হয়?

—কত আর! হ্যাঁ—ভারি ত' খরচ—বলিয়া তাচ্ছিল্য-ভরে চতুরদা' কিছুক্ষণ একটু চিন্তা করিয়া লইলেন, পরে বলিলেন, শ' পাঁচেকই যথেষ্ট। কি বল দাদা?

সেই অদৃষ্টপূর্ব্বা, সুকেশিনী, সুহাসিনী, সুবেশিনী, সুন্দরী, সুরমার ছবি-খানি টেবিলের উপরেই রাখা ছিল, তৎপ্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র কুমুদনাথ সম্মত হইলেন।

বলিলেন, টাকাটা কি আগাম দিতে হবে?

—বথা অভিরুচি, বলিয়া চতুরদা' জোরে জোরে সিগারেট টানিতে লাগিলেন। কুমুদনাথ বলিলেন, মা'র সঙ্গে পরামর্শ করে আসছি, আপনি বসুন চতুরদা'।

চতুরদা' সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অন্তঃপুরের পানে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন, মা'কে বিশেষ ক'রে বল ভাই, গরীব বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার দায়টি তাঁকে উদ্ধার করতেই হবে। নইলে—কুমুদনাথ বাধা দিয়া কহিলেন, আর নইলেতে কাজ কি দাদা! মা ত' মত দিয়েছেনই,—বলিয়া হাসিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, দিন কবে স্থির হচ্ছে?

হর্ষোৎফুল্ল আননে চতুরদা' কহিলেন, পঞ্জিকাখানা ত' আনাতে হয় ভাই।

পঞ্জিকা দেখিয়া দিন ধার্য্য হইল, ২৯-এ শ্রাবণ, সোমবার। স্থির হইল, ২৮-এ শ্রাবণ, রবিবার কুমুদনাথ ভৃত্যসহ বেনারস এক্সপ্রেসে কাশী রওনা হইবেন, চতুরদা' সোমবার প্রভাতে কাশী (বেনারস নহে!) ষ্টেশনে তাঁহাকে নামাইয়া লইবেন। কুমুদনাথ পাঁচখানি নোট চতুরদা'র হাতে দিলেন, চতুরদা' আর একটি সিগারেট ধরাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, ভাল কথা। রবিবার যাত্রা করবার দিনটা ত' দেখে দিয়ে গেলাম না। তা ভায়া, সেটা তুমিই দেখে ঠিক ক'রে নিও, আর একটি কাজ করো। তেরো গণ্ডা পয়সা, উঁহু, সেদিন আবার রবিবার, অর্ডিনারী 'অয়ার' ত' হবে না, এক্সপ্রেস্ করতেই হবে, একখানি 'অয়ার' আমাকে করে দিও। জ্যাঠাইমার ঠিকানাতেই ক'র—৪৯ নং বাঁশকটকা, চতুরচন্দ্র—। চতুরচন্দ্র একটা কথা, একসঙ্গে না লিখলে দু'টো কথা ধরে ব্যাটারা। চট্টোপাধ্যায়। বুঝলে ত'? তোমার টেলিগ্রাম পেলে তবে আমি গায়ে-হলুদের এবং অন্যান্য সকল ব্যবস্থা করবো। আর হ্যাঁ, মা ঠাকরুণকে একটিবার ঐ দরজার পাশে দাঁড়াতে বলো, প্রণাম ক'রে যাই।

কুমুদনাথ বাহির হইয়া গেলেন এবং একমুহূর্ত্ত পরে ফিরিয়া আসিয়া ইঙ্গিতে জানাইলেন, মাতা দ্বারপার্শ্বে।

চতুরদা' ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, আজ আপনি আমাদের যে উপকার করলেন, তার মুখে মুখে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করতে পারবো না। সে চেষ্টাও আমি করবো না। আমার শুধু এই মিনতি, অনাথা ব্রাহ্মণকন্যার উপর এই সদাশয়তা যেন চিরদিন থাকে। আর পুত্র-কন্যা? ভাগ্যে থাকলে, আপনার ঘরে, এত বড় বাড়ীতেও ঠাঁই দিতে পারবেন না! থাক্ বেশী কথা ব'লে লাভও নেই, বলতেও চাই নে। সকল ব্যবস্থাই পাকা রইল, কুমুদদা' বুধবারের বেনারস এক্সপ্রেসে ফিরবেন বৌ নিয়ে। সঙ্গে আমায় ত' আসতেই হবে, ঘটক বিদেয় না হ'লে যে বিয়ে মঞ্জুরই নয়।

দরজার ভিতরকার কড়া ঠক্ ঠক্ করিয়া নড়িয়া উঠিতেই কুমুদনাথ দ্বারপার্শ্বে গেলেন এবং সেখান হইতেই মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসিলেন, ঘটক বিদেয় কি কি চাই ব'লে রেখে গেলে ভাল হয় না?

চতুরদা' হাসিয়া বলিলেন, এ ত' আর 'প্রোফেসনাল' ঘটক নয় যে, ফাঁটা লাখিতে সারবে দাদা! সে আমি তখন মা'র কাছ থেকে নিয়ে যাব। আচ্ছা মা, আর একবার প্রণাম করি, আর এইখান থেকেই পা'র ধুলো নিই।

চতুরদা' চলিয়া গেলে, কুমুদনাথ ফটোখানি হাতে লইয়া বসিলেন। মেয়েটি আধুনিকা এবং সুন্দরী তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু মন খুশী হয় না কেন? নলিনীও সুন্দরী! হায়, নলিনী যদি একটি সন্তান উপহার দিতে পারিত!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অভ্রান্ত গণনা

বেনারস এক্সপ্রেস গাড়ী কাশী ষ্টেশনে থামিতেই চতুরচন্দ্র এক লাফে সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠিয়া কুমুদনাথের গলায় মস্ত একটা গোড়ে দুলাইয়া দিলেন।

গাড়ীতে একজন ইংরাজ আরোহী ছিলেন, তিনি প্ল্যাটফর্মের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, খদ্দর-বৃতাজ স্বেচ্ছাসেবকদের দেখিতে না পাইয়া ব্যাপারটা রহস্যাবৃত মনে করিয়া পুনরায় স্বহস্তধৃত মাসিকপত্রে মন দিলেন। সাহেব সম্ভবতঃ কুমুদনাথকে কংগ্রেসের কোন নেতা ও চতুরকে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন।

বাহিরে ওয়েলার-বাহিত টঙ্গা ভাড়া করাই ছিল, কুমুদনাথের ভৃত্যকে চালকের পার্শ্বে উঠাইয়া, ইঁহারা পশ্চাদ্ভাগে আরোহণ করিলেন।

চতুরদা' চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন, চা-টা খেয়েছ না কি হে ভায়া ?

কুমুদনাথ অপরাধীর মত বলিলেন, হাঁ। দাদা, কেলনারের করুণ আবেদন অগ্রাহ্য করা গেল না, বক্সারেই ওটা চুকিয়ে ফেলা গেছে।

চতুরদা' বলিলেন, হাঁ হাঁ, ও সব কোট্-ফিনারা আজ কাল কেউই মানে না! যাক্, এ দিকের সব ঠিক আছে। আটটায় লগ্ন। আমাদের এক মাড়োয়ারী বন্ধুর জুড়ী গাড়ী একখানা বলে রেখে দিইছি। এখন বাসায় গিয়ে তুমি বিশ্রাম করবে চল, আমি দই, মিষ্টি, মাছটাছগুলো এনে ফেলি, গায়ে হলুদটা পাঠাতে হবে ত' !

যথাসময়ে গায়ে-হলুদ চলিয়া গেল। কুমুদনাথের জননী একগাছি জড়োয়ার সূক্ষ্ম হার পাঠাইয়াছিলেন, কুমুদনাথ নিজে পছন্দ করিয়া বহু মূল্যের একখানি সিল্কের শাড়ী আনিয়াছিলেন, তত্ত্বের ক্রোড়-পত্র হিসাবে কুমুদের ভৃত্য মারফত তাহাও প্রেরিত হইল। চতুর-দা'কে দু'বাড়ীই দেখাশুনা করিতে হইতেছে, তিনিও সঙ্গে গেলেন। কুমুদের ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া সদুঃখে নিবেদন করিল, গায়ে-হলুদের এখনও দেরী, বৌ ঠাকরুণ হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাওয়ায় ডাক্তার আসিয়াছে। তাহার বৌ দেখিয়া আসার ইচ্ছা ছিল কিন্তু হইল না।

কিয়ৎপরে চতুরদা' আসিয়া জানাইলেন যে, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। উপবাস করার ফলে কুমুদিনীর মাথাটা ঘুরিয়া গিয়াছিল, এক ডোজ আর্সেনিকেই চমৎকার কাজ হইয়াছে।

সন্ধ্যা ৭টার সময় মাড়োয়ারী বন্ধুর বর্ম্মা-পণিযুগল-বাহিত, ল্যাণ্ডোয় চড়িয়া তিনজন বরযাত্রীসহ বর কাশীর রাজপথ দিয়া বাঁশফটকাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; চতুরদা' বরের ঘরের মাসি ও ক'নের ঘরের পিসী, কাজেই তাঁহাকে আগেই যাইতে হইয়াছে। বরযাত্রী কয়টিকে বাঙ্গালী বলিয়াই মনে হইতেছে কিন্তু তাঁহাদের বাঙ্গালীত্ব নাই। নীরস, নীরব, যেন থিয়েটারের কাটা সৈন্য, দাঁড়াইতে হয়—দাঁড়াইয়া আছে; বসিয়া আছে ত'—বসিয়াই আছে; চলিতে হয় ত'—চলিয়াছে।

গলির মোড়ে চতুরদা' পুষ্পমাল্য লইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, আরও কয়েকজন লোক ছিলেন, তাঁহাদেরই একজন হাত ধরিয়া বরকে নামাইয়া লইলেন। চতুরদা' মাল্য দিলেন, একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আতর-গুলাব চর্চ্চিত করিয়া গেল।

তবুও, ক'নের বাড়ীর আবহাওয়াটা কেমন ভাল লাগিতেছিল না। যে ঘরে বর বসিয়াছে, সে ঘরে বেশী লোক নাই বটে কিন্তু বাহিরে অনেক লোক, অ-বাঙ্গালীই বেশী, আনাগোনা করিতেছে। তাহারা যে নিছক বর-দেখার কৌতূহল লইয়াই আসা-যাওয়া করিতেছে না, ইহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ না থাকিলেও, তাহাই মনে হইতেছিল।

যাহাই হোক, আটটা বাজিতেই বিবাহসভায় যাইতে হইল। পুরোহিত যথারীতি মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন, কুমুদনাথও নির্ভুল আবৃত্তি করিয়া চলিলেন। যে সময়ে অবগুণ্ঠনবতী ক'নে সভাস্থলে নীতা হইলেন, সেই সময়ে সহসা বাহিরে কতকগুলি পুরুষের পরুষকণ্ঠে ভয়াবহ গোলমাল উত্থিত হইল। দু'একটি ছত্র যাহা কাণে গেল, তাহাতে অঙ্গ হিম হইবারই কথা!

শুনা গেল, দুই তিনজন উচ্চকণ্ঠে বলিতেছে, স্ত্রী থাকতে আবার বিয়ে করতে এসেছে! এই লাঠির এক ঘায়ে বিয়ের সাধ মিটিয়ে দোব না ?

শুনা গেল, চতুরদা' শান্ত করিতেছেন, সে সব আমি পরে তোমাদের বুঝিয়ে বলবো ভাই। বিশেষ দোষ নেই······ইত্যাদি।

ইত্যবসরে পুরোহিত মহাশয় অনেকদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন, যজমান তাঁহার নাগাল ধরিতে পারে নাই। পুরোহিত তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন, চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ, চারি চক্ষুর মিলন হোক্—ওদিকে বাহিরে সেই মোটা লাঠির ঠক্ ঠক্ শব্দ আর হেঁড়ে গলার সেই আস্ফালন, অ্যাঁ, স্ত্রী থাক্‌তে······

চারি-চক্ষুর মিলন আর হইল না—হইতে পারিল না। বিবাহ শেষ হইয়া গেল।

চতুরচন্দ্র কুমুদকে লইয়া খাইতে বসিলেন কিন্তু কুমুদনাথ খাইবেন কি ?—তাঁহার হাত-পা পেটের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাল-ঘোল পাকাইতেছে, খাওয়া কি যায় ?

দ্বিতলের ঘরে বাসর সজ্জিত হইয়াছে, চতুরদা' কুমুদকে সেখানে বসাইয়া—হংসমধ্যে বকের মত—বিদায় লইলেন। সামনে খোলা বারান্দা দিয়া কতক-গুলা লোককে যাওয়া-আসা করিতে দেখিয়া কুমুদনাথ সেই যে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হইয়া বসিলেন, কাণ ফুলিয়া গেল, চিমটিতে চিমটিতে সর্ব্বাঙ্গে কালশিরা পড়িল, তাঁহার মুখ দিয়া হাঁ-না একটি শব্দও বাহির হইল না। বৌ বেচারা এক কোণে কম্বল মুড়ি দিয়া বেদগান করিতে লাগিল।

চতুরদা' দুই একবার দেখা দিয়া গিয়াছেন এবং অভয় উচ্চারণও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই লোক-গুলাকে দেখিবামাত্র কি যে মনে হয়, বলা বড় শক্ত, তবে এইটুকু বোঝা সহজ যে, হাত পায়ের গাঁটগুলা যেন খুলিয়া না-হয় খসিয়া যাইতেছে।

যাঁহারা বাসর জাগিতেছিলেন, ভোরের দিকে তাঁহারা রণে ভঙ্গ দিলেন, সেই অযাচিত, রবাহুত ও ভীতিপ্রদ লোকগুলাকেও আর দেখা যাইতেছে না, কুমুদনাথ যথেষ্ট সতর্কতার সহিত নববধূর গায়ে আস্তে আস্তে একটু ধাক্কা দিলেন। বধূর বড় লজ্জা, আরও জড়সড় হইয়া কম্বল চাপিয়া ধরিল। কুমুদনাথ আরও সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন, বধূ কুকুর-কুণ্ডলী। আগুন যেমন জ্বলিতে জ্বলিতে তেজবৃদ্ধি করে, ইঞ্জিন যেমন চলিতে চলিতে গতিশক্তি বৃদ্ধি করে, কুমুদনাথও তদ্রূপ, 'যা থাকে বরাতে গোছ'-ভাবে দুই হাতে জাপটিয়া বধূকে বসাইয়া দিলেন এবং কম্বল সরাইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর যাহা দেখিলেন, তাহাতে এবার তাঁহার কাল ঘাম ছুটিয়া গেল।

কুমুদিনী বটে, কিন্তু পুরাতনরূপে ও পুরাতন নামে নলিনী! বিজ্ঞজন না-কি বলেন, স্ত্রীলোকের লজ্জা একবার ভাঙ্গিলে, নদীর বাঁধের মত, বাছ-বিচার থাকে না। হইবেও বা! নলিনী কুমুদকে ধরিয়া কি জোরে জোরেই না চুম্বন সুরু করিয়া দিল! স্থান, কাল, অবস্থা, বয়স কিছুই সে মনে রাখিল না।

কুমুদনাথের যে আনন্দ হয় নাই, তাহা নহে, তা' হইয়াছিল, আরও আনন্দ হইতেছিল এই ভাবিয়া, কাশীর গুণ্ডা ব্যাটারা আর লাঠি ঠক্ ঠক্ করিবে না।

চুম্বন যদি শেষ হইল, বাক্যবাণ! নলিনীর কথা আর থামে না। চতুরদা' চতুরতায় অদ্বিতীয় হইলেও আসলে তিনি চতুরচন্দ্র নহেন, তাঁর নাম নকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তিনি নলিনীর জ্যাঠতুতভাই এবং নলিনীর (কুমুদিনীর নহে।) বিবাহের সময় সত্য-সত্যই তিনিই এরকম কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন। নলিনীর সহোদরত্রয় সকলেই তখন অপ্রাপ্ত-বয়স্ক। গরমের ছুটীতে দেশে গিয়াছিলেন, দেশ হইতে নলিনীদের কাশী পাঠাইয়া, ঘটকালী করিতে কলিকাতায় গিয়া যাহা যাহা করিয়াছেন, তাহা কুমুদনাথের অজ্ঞাত নাই! নলিনী কথাগুলা বলে আর মাঝে মাঝে—আরে ছিঃ ছিঃ কি-বলে, ইয়ে করে!

সকালে চতুরদা'র দর্শন পাওয়াই দায়! অনেক বার ডাকাইয়া, অনেক কাকুতি-মিনতিসূচক সংবাদ পাঠাইয়া তাঁহাকে আনান গেল।

কুমুদনাথ বলিলেন, ভাই, গাড়ী ফেল না করি।

চতুরদা' বলিলেন, সে কি দাদা! তুমি এমন ব্রিলিয়েন্ট স্কলার, ডবল বি-এ, তুমি করবে কেন! গাড়ী-টাড়ী সব ঠিক আছে, যথাকালে যথাস্থানে পৌঁছে দেবে'খন।

কুমুদনাথ আলনায় রক্ষিত জামার পকেট হইতে সেই ফটোখানি বাহির করিয়া চতুরদা'কে ফেরত দিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কিন্তু ছবিটা কার?

চতুরদা' বলিলেন, কার্ড-বোর্ডটা খুলে ফেল, নামটি স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে।

কুমুদ দেখিলেন—ফিরোজা বাঈ, ১৭২, ডালকি-মণ্ডী, বেনারস সিটি।

চতুরদা' বলিলেন, ডালকিমণ্ডী পাড়ার নাম নিশ্চয়ই শুনেছ! দেখতে চাও?

কুমুদ নমস্কার করিয়া করজোড়ে কহিলেন, চতুরালী যে ততদূর গড়ায় নি, সেই ভাগ্য দাদা!

চতুরচন্দ্র ছোট একটি থলি ও একখানি কাগজ কুমুদনাথের হাতে দিয়া বলিলেন, হিসেব-পত্র সব লেখা আছে, টাকাও কিছু ফিরেছে, দেখে নিও!

* * * *

কলিকাতায় ফিরিয়া কুমুদনাথ চতুর-প্রদত্ত 'ব্যালেন্স' হইতে পঁচিশটি টাকা জ্যোতিষীকে পাঠাইয়া দিল, লিখিল, জ্যোতিষ-গণনা যে এমন অভ্রান্ত হয়, তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারিতাম না।

জ্যোতিষী মহাশয় কিছু বুঝিলেন না। তা না বুঝুন, টাকাগুলা অবুঝ ছিল না, দুঃসময়ে অনেক কাজে লাগিল।
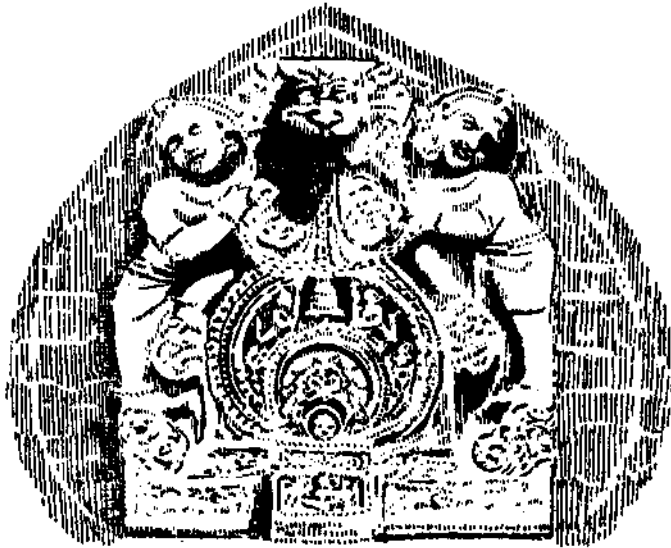
নিখিল ভারতীয় রম্যকলা-প্রদর্শনী

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বিশ্বের নূতন অনুভূতি ও রূপার্চ্চনার পদ্ধতিতে জাপান যেমন অগ্রসর হয়েছে, ভারতও তেমনি পশ্চাৎপদ হয় নি; অনেককেই এপথে প্রলুব্ধ হতে হয়েছে। গগনেন্দ্রের চিত্রসমূহ ভারতীয় কারুতায় মণ্ডিত হয়ে য়ুরোপীয় উল্লাসকে শরীরী করে তুলেছিল—যা সকলেরই উপভোগ্য হয়েছিল। অবনীন্দ্রের প্রতিকৃতি রচনায় দেখা যায় শিল্পীর অসামান্য প্রতিভার স্বপ্ন-প্রয়াণ আধুনিকতার মায়া-রূপও ধারণ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রচেষ্টাও প্রতীচ্য প্রাকাশিক রীতি (Expressionist School) অবলম্বন করে বিচিত্র ভাবপুঞ্জের বাহন হওয়ার অধিকার খুঁজেছে। এ প্রদর্শনীতে মুক্ত ও ব্যাপকভাবে নবীন শিল্পীরা বিশ্বের ভাষাকে আয়ত্ত করে এক একটি রূপযাত্রার কর্ণধার হয়েছে। বিখ্যাত চিত্র-শিল্পী অতুল বসুর 'We are three' চিত্রখানিতে একটা বিশিষ্ট মাদকতা আছে, যা এ শ্রেণীর চিত্রে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। চিত্রখানি একাধারে বিবৃতি ও কাব্যস্থানীয়—ভারতীয় স্নিগ্ধতা ও সংযমের একটা নিবিড় আলেয়ায় রচনাটি ওতঃপ্রোত। এ বিশিষ্ট রসটুকু উগ্র, প্রখর ও যুযুৎসু য়ুরোপীয় চিত্রকর কখনও দান করতে পারে না। এ চিত্র-শিল্পীর কয়েকখানি ভূ-চিত্রে (landscape) জলবর্ণের সূক্ষ্মতর পর্য্যায়ের একটা অপূর্ব্ব কারুতা লক্ষ্য করা যায়—যাতে মনে উদ্ভাসিত হয় একটু রূপকথার মায়ালোক—এ রকম সৃষ্টি য়ুরোপীয় তুলিকা হতে আশা করা বৃথা।

য়ুরোপীয় চিত্র-শিল্পীর উপস্থাপিত রচনা এ প্রদর্শনীতে নানা কারণে উপভোগ্য হয়েছে। লেডি ব্রেকের 'উত্তকামণ্ড', মিসেস্ ডেভিড মায়ের শ্রীনগর, অম্বালা ও সিমলাপুরের চিত্রসমূহে ভারতীয় সম্পদকে য়ুরোপীয় অর্ঘ্যরূপে দান করা চিত্তাকর্ষক হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মিসেস্ কার্জটন স্মিথের চিত্রও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে V. A. Moli, L. N. Taskar, V. J. Kul Karni প্রভৃতির রচনাও উপভোগ্য হয়েছে।

বস্তুতঃ এ ক্ষুদ্র পরিসরে একটা বিশ্ব-পরিক্রমার ফললাভ সম্ভব হয়েছিল। সকল দেশের রসিকদের এরূপ একটা মিলনক্ষেত্র ঘটিয়ে তুলেছে বলে প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের কোনরূপ সঙ্গতির আশা করা এ যুগে একটা আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়েছে, এমন কি প্রতীচ্যের ভিতরই কোনরূপ বিশ্বমানবিকতার বোঝাপড়া অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সব জায়গায় 'সাজ সাজ' রব এবং নূতনতর কুরুক্ষেত্র রচনার জন্য উগ্র জাতিরা ব্যস্ত। এ রকমের সঙ্ঘর্ষের ভিতরই প্রতীচ্য মানবত্ব ফুটে উঠেছে। এরূপ অবস্থায় পূর্ব্বাঞ্চলেই একটা বোঝাপড়া এবং সম্মিলন-ব্যবস্থার আদর্শ জাগ্রত হওয়া সম্ভব। ভারতবর্ষ চিরকালই বিশ্ব-সামাজিকতার সাধনা করে এসেছে। বাইরের শত্রু বার বার আঘাত করলেও ভারতবর্ষ সে শত্রুকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছে, এমন কি স্তন্য দ্বারা পুষ্ট করেছে। বিশেষতঃ আর্য্যজাতি বলে ভারতের সহিত ইউরোপের রক্ত-সম্পর্ক আছে—যা প্রাচ্য ভূখণ্ডে চীন ও জাপানের সঙ্গে নেই। এ অবস্থায় ভারতবর্ষই দু'টি ভূগোলার্দ্ধের ভিতর নব্য সম্পর্ক ঘটিয়ে তুলতে পারে। ভারতবর্ষের শিল্পীরা এরূপ একটা প্রদর্শনীতে প্রমাণিত করেছে—আকরিব ও রূপের ভাষায় দূরত্ব দূর করে একটা বিরাট মানবত্বের পীঠ রচনা করা অসম্ভব নয়। অতি নিপু

etching-গুলিতে ভারতীয় শিল্পীরা কিরূপ অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখিয়েছে তা সহজেই চোখে পড়ে। তা ছাড়া Black-and-Whites, রেখাঙ্কন, ভূচিত্র, প্রতিকৃতি প্রভৃতি আধুনিক ভাব-প্রকাশের নানা পথে ভারতীয় শিল্পী নিজেদের দক্ষতা দেখিয়ে সকলকে পুলকিত করেছে। সম্প্রতি প্রশ্ন হচ্ছে এসব শিল্পীদের রক্ষা করা এবং তাদের প্রতিভার প্রসারতার সুযোগ দেওয়া। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে নিপুণ ভারতীয় গায়কের কণ্ঠকে ফাঁসিতে দেওয়া যেমন মূঢ়তা, বিশ্বের দরবারের প্রতীচ্য রূপের ভাষায় যে প্রাচ্য কবি আলেয়া সৃষ্টি করেছে তাকে নির্ব্বাসিত করা যেমন আরণ্য প্রবৃত্তি মাত্র, তেমনি বিশ্বকলারাজ্যের অশেষ কারুবার্ত্তাকে বর্ণে, ধ্বনিতে ও মর্ম্মরে যে সব শিল্পী বিকশিত করে তুলবে তাদের ধ্বংস করতে উদ্যোগী হওয়া ভারতীয় শীলতার ধর্ম্ম নয়। 'একাডেমী অব ফাইন আর্টস্' একটা বিরাট ছত্র খুলেছে যেখানে সকল দেশের শিল্পীরা ভারতীয় উদারতার সংস্পর্শ লাভ করবে। বলা প্রয়োজন, সমগ্র প্রাচ্যভূমিই আজ নানা অনিবার্য্য কারণে নব নব ভাবপুঞ্জের সহিত পরিচিত হয়েছে। শীতের শীতত্ব মুছে যাচ্ছে এ যুগের বিশ্বগ্রাসী আন্তর্জাতিক আগ্নেয় সম্পর্কে। ভারতবর্ষের গুহাধর্ম্মকে —'Short' ও 'Shirts' না হোক্—একান্ত নগ্নতা বা আত্যন্তিক প্রাচুর্য্য বর্জ্জন করে বিশ্বের সহিত একাসনে বসতে হবে। জগতের বিরাট চন্দ্রাতপতলে আজ বিজয়লক্ষ্মীর স্বয়ম্বর সভা বসেছে। সকল দেশই সমাসীন হয়েছে চারু ও আধুনিক স্থান ও কালের উপযোগী সজ্জায়। ভারতই কি শুধু অদ্ভুত পরিচ্ছদে এ সভায় উপস্থিত হবে? অলস রসিকদের বদ্‌খেয়াল, প্রাচীনতার গলিত পঙ্ক, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দুর্ম্মূল্য আবর্জ্জনা—এসব বহন করবার সময় কি আছে? সমগ্র জাতিকে যুগোপযোগী ক্ষিপ্রতায় দীক্ষিত করতে হবে—হিমালয় হতে কুমারিকা পর্য্যন্ত,—গুর্জ্জর, মারাঠা, মান্দ্রাজী, বাঙ্গালী সকলকেই সারি-সারি দাঁড়িয়ে যেতে হবে নূতন মিলনবাদ্যে, নূতন চিন্তার ধ্যানে। এর ভিতর আর মধ্যপথ নেই। আধুনিক ভারতীয় তারুণ্য শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে সন্ন্যাস ও অর্দ্ধনগ্নতার দুর্ব্বল আদর্শে এবং প্রাচ্য ভোগবিলাসমূলক রূপার্ঘ্যের দুর্ব্বহ বাহুল্যে—এ দু'টির কোন পথই এ যুগের বন্দনীয় নয়। সঙ্গীত, চিত্র, কবিতা ও ভাস্কর্য্যের নূতন বিদ্রোহীরা বিশ্বতোমুখী আত্ম-প্রসারের জন্য অধীর হয়ে উঠ্‌ছে—এ পথেই জগতের মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব লাভ করা যাবে—'বসুধৈব কুটুম্বকং' বাণী সার্থক হবে। 'একাডেমী অফ ফাইন আর্টস' যদি এরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বন্ধুত্ব ঘটিয়ে তুলতে পারে তবে ভবিষ্য ভারত কৃতজ্ঞতার সহিত চিরকাল এ প্রতিষ্ঠানকে স্মরণ করবে। যে সমস্ত শিল্পীরা কোনরূপ বিশ্বস্পর্শ পেয়েছে, তারাই হবে এ যজ্ঞের ঋত্বিক—তাদের কর্ত্তব্য হবে পশ্চিম ও পূর্ব্বের প্রাচীনতাকে বাহবা না দেওয়া এবং আধুনিক হোমাগ্নিকে বরণ করা। বস্তুতঃ এ নূতন সাধনাতে তপস্যা ও আত্ম-নিবেদন চাই। কল্পনাহীনতা, ভাবোচ্ছ্বাসের দৈন্য রূপলোকে দীপশিখার কাজ করতেই পারে না। ভারতের পক্ষেও এই বিরাট বিশ্বযজ্ঞে ভাবাহুতি প্রদান কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে কারও মনে যেন কোন সন্দেহ জাগ্রত না হয়। এমন এক সময় ছিল যখন ভৌগোলিক কোন বিশিষ্ট সীমা কিম্বা নৃতাত্ত্বিক কোন বিশিষ্ট বিধির সঙ্কীর্ণতার ভিতর মুক্তাগুচ্ছের ন্যায় জাতিগত বা দেশগত সুষমার বিকাশ হত। এযুগে সমগ্র জগতই যান্ত্রিক বাহনাদির দ্বারা একান্ত আত্মীয় হয়ে পড়েছে। আকাশ-যান, ধ্বনি-প্রবাহক তড়িৎকম্পন প্রভৃতি দ্বারা হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য তুষারাচ্ছন্ন কিরীট পর্য্যন্ত মানবীয় সামাজিকতায় এসে পড়েছে। সমগ্র জগতের বিধি-ব্যবস্থা, আচার-অর্চ্চনা প্রভৃতি এক বিরাট কটাহে নিক্ষিপ্ত হয়ে পরীক্ষিত হচ্ছে এবং শাণিত শক্তিরও এক বিশ্বময় পূজা চলেছে। এরূপ অবস্থায় অসহায় ও অলস একাকিত্বের ভিতর মজ্জিত থাকা শোভন নয়—নিরাপদও নয়। সকল দেশের সঙ্গে সকল দেশের বোঝাপড়া

হওয়া চাই; সে বোঝাপড়ার ভাষা হাজার বছর প্রাচীন কোন রূপের পুথি নয়—তা জাপানী ক্যাকিমনো বা চৈনিক লণ্ঠনই হোক্ বা ভারতীয় ভোজের পুত্তলিকাই হোক্! এ যুগের ভারতবাসীর গৃহেও রেডিও-র সঙ্গীত শোনা যায়—বৈদ্যুতিক বিধানে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনচর্চা নিয়ন্ত্রিত হয়—এসব দিক্ হতে আধুনিক নাগরিক ভারত বা ফরাসীদেশে বিশেষ পার্থক্য নেই। সকল বোঝাপড়াই এযুগে যান্ত্রিক হয়ে পড়ছে, এমনি করে সকল দেশেই একটা সাম্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর ভিতর জোর করে শুধু মাত্র অলীক আলাদীনের পুরানো দীপের স্থান-প্রতিষ্ঠা এবং নিভৃত গুহারক্ষার সম্ভাবনা কোথা? এসব বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ আবেষ্টনীকে তুচ্ছ ও অস্বীকার করে কোন ফেনিল অবাস্তবকে নিয়ে মাতোয়ারা হওয়া জাতীয় রুগ্নতাকে ঘনীভূত করার উপায়। চণ্ডীমণ্ডপের আরতি-ধ্বনি আজ নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দ ঝিল্লীর করুণ অন্তর্দ্ধানের ভিতর! পল্লীর কোণেও যান্ত্রিক সংগ্রহ স্তূপীকৃত হয়ে জীবনের সেকেলে তালকে ভেঙ্গে দিচ্ছে। রসশিল্পী বা রসার্থীরা এর ভিতর কোন্ দিকে যাবে?

যে দিকেই যাক্, ভারতীয় রসধর্ম্মের একটা বিশেষ কারুতার প্রলেপ ভারতীয় সৃষ্টিতে থাকতে বাধ্য। ইংরাজী ভাষার 'গীতাঞ্জলি'তেও ভারতীয় শীলতার রস-সম্পুট রয়েছে এবং বিশ্বমানবের স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েও তা এদেশের পক্ষে অপরিচিত হয় নি। এজন্য জগতের রস-সম্পর্ক সৃষ্টিতে পরাধীন বলে ভারতের ভীত হওয়া ঠিক নয়। প্রাচীন শীলতা ও সভ্যতার যদি কোন অন্তর্গূঢ় শক্তি থাকে তবে ভারতীয় ব্যঞ্জনায় তা দীপ্ত হয়ে উঠবে। শুধু যারা অবিশ্বাসী ও দুর্ব্বল—ভারতের অসীম শক্তি-নির্ঝরে যাদের আস্থা নেই তারাই পশ্চাৎ-পদ হবে। ইদানীং ঊনবিংশ শতাব্দীর এবং প্রাথমিক বিংশ শতাব্দীর রসবিলাসের লঘুতা চলে গেছে। য়ুরোপের শিল্পীরা চীন, ভারত এমন কি নিগ্রোভূমি হতেও সৌন্দর্য্যের খাদ্য আহরণ করতে পশ্চাৎপদ নয়—কারণ প্রতীচ্য দেশ ভীরু নয়। যে ভারত বাইরের অসীম ঘাত-প্রতিঘাতকে সহ্য ও বরণ করে গ্রীক, মোগল প্রভৃতি শীলতার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করেছে, সে ভারত আজ জীবনযুদ্ধে অলীক ও অলস মাদকতার মগ্ন থাকবে, এ ব্যাপারটি একান্ত দুঃসহ। যুগে যুগে নূতন সৃষ্টি হয়েছে—নটরাজের তাণ্ডবে অতীতের প্রলয় সূচিত হয়ে ভবিষ্যতের বিরাট সমুত্থান হয়েছে। এযুগেও নবসৃষ্টির মহান মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। জাগ্রত ভারত-বাসীকে শবসাধনা করে গলিত অতীতের মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে নবীনের ভুবনেশ্বরী প্রতিমা—তবেই যুগের সৃষ্টি সার্থক হয়ে উঠবে।

যে 'একাডেমী অফ আর্টস্' এই বিরাট ব্যাপার সংঘটন করেছে তার ইতিহাস অল্পকালের হলেও রোমাঞ্চকর ঘটনায় তা পরিপূর্ণ। অনেক বাধা অতিক্রম করে এ অনুষ্ঠানটির গোড়াপত্তন হয়েছে। বোম্বাইয়ের কোন কোন অংশ হতে বাংলার গৌরবের এই নূতন মুকুটকে প্রত্যাখ্যানের অনেক চেষ্টা হয়েছে। এ সময়ে বাঙ্গালা দেশকে সকলেই একটু মলিন করতে উৎসাহী — তাদের সে চেষ্টা সফল হয় নি। উপাখ্যানের মত সে কৌতুককর কাহিনী বাঙ্গালীমাত্রেরই অবশ্য জ্ঞাতব্য। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে পড়ছে বলে সে আলোচনা সম্ভব হল না।

পরিশিষ্ট

২০-এ ডিসেম্বর 'একাডেমী অফ আর্টস'-এর উদ্যোগে নিখিল ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটিত করা হয়। মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এ প্রসঙ্গে পুরোভাষণ পাঠ করেন। বাঙ্গালার গভর্ণরও একটি অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করে দ্বার উদ্ঘাটন করেন। এ প্রসঙ্গে য়ুরোপীয় এবং ভারতীয় বক্তাদের দ্বারা দু'টি বক্তৃতা দেওয়ারও বন্দোবস্ত করা হয়। সব চেয়ে স্মরণীয় ও মধুর ব্যাপার হয়েছিল মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমারকে প্রদর্শনীর শেষ দিন আর্টিষ্টগণের একটা অভিনন্দন-পত্র প্রদান। তাতে প্রায় শতাধিক শিল্পীর নাম-স্বাক্ষর ছিল। বস্তুতঃ বহুকাল পরে মহারাজা বাহাদুর স্বর্গত

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গৌরবলাভের অধিকারী হয়েছেন। স্বর্গীয় মহারাজের সাহিত্য ও শিল্পাদি বিষয়ে উৎসাহ সমগ্র ভারতে পরিচিত ছিল। ঠাকুর-দুর্গের বর্তমান অধিকারী সে মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বাঙ্গালা দেশে আবার যে কৃতিত্বের মর্য্যাদা দানের ব্যবস্থা করেছেন, তা তাঁর যোগ্য কাজই হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহারাজা যে বক্তৃতাদান করেন তা অতি সুন্দর ও সময়োপযোগী হয়েছিল। তজ্জন্ত তিনি সকলেরই ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

প্রতিষ্ঠা—১৫ই আগষ্ট Indian Museum ভবনে স্তর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর সভাপতিত্বে 'একাডেমী অফ ফাইন আর্টস'-এর প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার উদ্দেশ্য কার্য্য-বিবরণীর ভিতর এইভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে :—The Academy will encourage Painting, Sculpture, Architecture, Engraving, Chasing, Seal Cutting, Medal designing and other kindred branches and will be opened to any nationality of British Subject... It will hold an annual art exhibition in Calcutta.

এ সভায় মহারাজা স্তর প্রদ্যোৎকুমারের বক্তৃতা অতি চিত্তাকর্ষক হয়। তিনি ইহার উদ্দেশ্য, প্রসার ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ মন্তব্য করেন। তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল।

"এই অপরাহ্ণে আমাদের সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি শিল্পকলা-পরিষদ স্থাপন করা এবং এ সম্পর্কে একটি প্রদর্শনী আহ্বান করে নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান করা। এরূপ একটি পরিষদ স্থাপন এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পের একটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হলে শিল্পীদের আন্তরিক কামনার পরিপূর্ণতা সাধনের সাহায্য করা হবে। বিশেষতঃ এরূপ প্রতিষ্ঠায় শিল্পীরা নানাভাবেই উৎসাহ লাভ করবে এবং তাদের সহায়তায় নানা উপায় ও পথ উন্মুক্ত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, সাধারণ চিত্রকরেরা এর সাহায্যে আলো ও ছায়ার প্রতিফলন পরিপ্রেক্ষিতের (perspective) সম্বার শিক্ষার একটা সুযোগ পাবে—যাতে নাটক বা ছায়াচিত্রকলার অনেক সাহায্য হয়। এ ছাড়াও প্রতিকৃতি, মূর্ত্তি এবং কাল্পনিক বিষয় শিক্ষারও একটা সুযোগ হবে। ভূ-চিত্রকর, তক্ষণকার, নক্সাকারক, এবং ভাস্কর—এরা সকলেই এই ব্যবস্থায় উপকৃত হবে; আমরা জানি চারিদিকের নানা কাজে এদের সংখ্যা সামান্য নয়। সকলেই অনুভব করে এদেশে য়ুরোপের মত সাধারণ চিত্রশালা নেই—ব্যক্তিগত যে কয়টি চিত্রশালা আছে সেগুলিতে সাধারণের যাতায়াতের সুযোগ নেই······

"কাজেই আমি একথা বলতে চাই, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সকল শ্রেণীর কলাবিদ্যার উৎকর্ষের জন্য এ রকমের একটি পরিষদ স্থাপন করা প্রয়োজন এবং বার্ষিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ও প্রয়োজন যেমনিভাবে সিমলা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে শিল্পকলা প্রদর্শনী হয়ে থাকে। ক্রমশঃ এ পরিষদের উদ্দেশ্য হবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কলা শিক্ষাদান করা—শিল্পীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে নিজের পথ নির্ব্বাচন করে নেবে প্রচলিত রীতিবদ্ধ চক্রাদির ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতাকে তুচ্ছ করে।

"ভারতীয় কলাপরিষদ কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী শুধু যে অধ্যয়নের জায়গা হবে তা নয়, ভারতবাসীদের একটা শিক্ষারও কেন্দ্র হবে, তাতে করে বহুকালের প্রার্থিত একটা ইচ্ছাও পরিপূর্ণ হবে—সেটা হচ্ছে ছাত্রদের ও সকল শ্রেণীর কৃতী শিল্পীদের চিত্রাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

"আমাদের বহু পরিশ্রমের শেষ ফল হবে অতি স্বল্পকালের ভিতর পরিষদকে সকল শ্রেণীর শিল্পীর কৃতিত্ব ও দক্ষতার একটা পরিমাণের ব্যবস্থা করা, যাতে করে শিল্পীরা পরিশেষে অবৈতনিক কর্ম্মকর্তারূপে পদস্থ ও শিক্ষিত মহিলা ও ভদ্রলোকদের গ্রহণ করবে। পরিষদের একটা বার্ষিক ভোজ হবে যাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিভাবান সকলেরই একসঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ ঘটবে।

"ভারতের ও বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধিদের

পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে পারলে, অনুষ্ঠানের সফলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ব্যবস্থা হয়। তাঁদের কিছু বাণী লাভ করলে সমগ্র ভারতের শিল্পী ও শিক্ষার্থীরা আশীর্বাদের ন্যায় গ্রহণ করবে।"

উদ্দেশ্য প্রচার

'একাডেমী অফ ফাইন আর্টস'-এর উদ্দেশ্য বিবৃতির জন্য সম্পাদক চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করেন। তাতে করে সব জায়গায় এ সম্বন্ধে একটা আগ্রহ ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন—

২৩-এ ডিসেম্বর, শনিবার বাঙ্গালার রাজপ্রতিনিধি প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করেন। এ উপলক্ষে কলিকাতার গণ্যমান্য বহু ভদ্রলোক সমবেত হন। মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর এ প্রসঙ্গে বলেন—

"আমি আশা করি এ উপলক্ষে আমি যে আত্ম-প্রকাশের একটা সুযোগ পেয়েছি, তাতে সকলেই আমাকে গভর্ণর বাহাদুরের নিকট আমার সরল ও আন্তরিক ধন্যবাদ নিবেদনের অনুমতি দেবেন, কারণ এ সম্বন্ধে তিনি আমাকে নানা উপদেশ দিয়েছেন। যখন আমরা এ বিষয়ে প্রথম প্রস্তাব করি তখন সকলেই উৎসাহ ও সহৃদয়তার সহিত তা অনুমোদন ও গ্রহণ করেন। কিন্তু কেউ কেউ এ অনুষ্ঠানকে ভয়ের চক্ষে দেখেন এবং একটা অতি আধুনিক রকমের নূতনত্ব প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন। আমি একথা বলতে পারি, ইংলণ্ডেও কলাবিদ্যার প্রথম প্রচলনকে মধ্যযুগের ব্যবস্থা হতে স্বতন্ত্র একটা নতুন রকমের ব্যাপার মনে করা হয়— যা তখনকার ধারা হতে দূরে ছিল। যাহোক আমরা এ বিষয়ে এমন দেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি দু'শ বৎসর পর্য্যন্ত যেখানে নূতনত্বের সৃষ্টি হয়েছে যাতে সমগ্র জগত চকিত হয়ে পড়েছে।

"যে যুগে সকল দেশেই সঙ্গীত ও কলাবিদ্যা প্রচারের সাধনা করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক দেশের সম্পদের অনুরূপে সমগ্র সভ্যজগতে সাধারণ কলাশালা ও সঙ্গীত পরিষদ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা চলছে, সে যুগে আমাদের পক্ষে এই প্রগতির বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত শৃঙ্খল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা একটা লজ্জার বিষয়। যারা মনে করে, এই পরিষদের প্রতিষ্ঠায় যারা আমাদের দেশ আবার সঙ্গীতে ও কলাবিদ্যায় পীঠস্থান হবে, তাদের মতে স্যর জন এণ্ডারসন ও দেশীয় নৃপতিদের আনন্দজনক সম্পর্ক এ প্রতিষ্ঠানটি বাঙ্গালার ইতিহাসে একটা মহান যুগের সূত্রপাত করবে।"

গভর্ণর বাহাদুর উত্তরে একটা সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। যাঁরা এ প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন তাঁদের সন্দেহ নিরাকরণের জন্য রাজপ্রতিনিধির উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তিনি বক্তৃতায় বলেন—

"আমি মনে করি এই ব্যাপারটির ভিত্তি অতি সুচারু ও সত্যোপেতভাবে নিহিত করা হয়েছে। সম্প্রতি উদ্যোক্তাগণের কর্ত্তব্য হচ্ছে তাঁদের যথাশক্তি চেষ্টা করা এর স্থায়িত্ব ও সম্প্রসারণের জন্য—যাতে করে কলিকাতার বার্ষিক প্রদর্শনীটি সমগ্র ভারতের কলা-জগতের একটা প্রধান ঘটনা বলে বিবেচিত হয়। এই সৎসাহসের কাজটিতে আমার গভীর সহানুভূতি ও সমর্থন আছে। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার সফলতা নির্ভর করবে শিক্ষিত নর-নারীর ক্রমশঃ বিবর্দ্ধমান সাহচর্য্যের উপর। আমি আশা করি সিমলা শিল্পকলা-সমিতি যেমন ষাট বছরের সাম্বৎসরিক উৎসব সে দিন সাফল্য করেছে, তেমনি এই অনুষ্ঠানের পরবর্ত্তী হোতারা কলিকাতায়ও ষাট বছর পরে এই পরিষদের সাম্বৎসরিক উৎসব করবেন।

"আমি আনন্দের সহিত এই সম্মিলনের আকার ও মর্য্যাদা হতে দেখতে পাচ্ছি, কলিকাতা রূপকলার জন্য কিরূপ উৎসাহ অনুভব করে—কারণ এই খ্রীষ্টমাসের চারিদিকের নানা আকর্ষণের ঘটাও সামান্য নয়। অনেকেই আমাদের এই নগর সম্বন্ধে এই সমালোচনা করেন যে, এ সহরটি শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি ও খেলা নিয়ে মত্ত—যাতে করে উচ্চতর কলাচর্চ্চার

সুযোগই পাওয়া যায় না। আমি আশা করি, এই উক্তির যদি কোন প্রত্যুক্তির প্রয়োজন হয়, তবে এই প্রদর্শনী এবং ইহার পরবর্ত্তী প্রদর্শনীগুলিই যথাযোগ্য উত্তরস্থানীয় হবে।

"আমার বাকি আছে শুধু এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত হল বলে ঘোষণা করা এবং যাঁরা উপস্থিত আছেন তাঁদের অবসর মত দ্রষ্টব্য জিনিষগুলিকে দেখতে আমন্ত্রণ করা। আমি এই নূতন প্রতিষ্ঠানের বলিষ্ঠ জীবন ও ফলপ্রদ ভবিষ্যৎ কামনা করি।"

সভাপতির আমন্ত্রণ—

৩১-এ ডিসেম্বর—একাডেমীর সভাপতি মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমার সকল নৃপতিদের এ উপলক্ষে চা-পানের একটি আমন্ত্রণে আহ্বান করেন।

৪ঠা জানুয়ারী—

মহারাজা পাতিয়ালার প্রদর্শনীতে আগমন।

৫-ই জানুয়ারী—

Lord ও Lady Willingdon প্রদর্শনীতে আগমন করেন।

৭-ই জানুয়ারী—

মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎকুমারকে অভিনন্দন। শিল্পীগণের অভিনন্দনপত্র দান।

(সমাপ্ত)

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

শ্রীচন্দ্রশেখর আঢ্য, এম্-এ

আজি কেন মুগ্ধ হই, লুব্ধ হই হেরি দু'টি আঁখি?
হে সুন্দরি, তোমার মন্দিরে সারা রাত্রি ধরি' জাগি।
উজ্জ্বল রতন-দীপ, উচ্ছ্বসিত ধূপের সৌরভ—
তোমার বন্দনা গাহি, অনুপম দেহের গৌরব।
অতুলন তনু-লতা পুষ্পভারে সাজাই শোভন,
চম্পক-পারুল-গুচ্ছে বিকশিত চিত্ত বিমোহন,
অনুরাগ-সিক্ত হিয়া—চেয়ে আছি বিমুগ্ধ নয়নে,
চুম্বনের চাঁদখানি আঁকি দেই ললাট-গগনে।

আমি ত' বিশুষ্ক মরু, শাখী মোর নিত্য ফুলহীন,
শিখী দু'টি মূক-কণ্ঠ, নাচে না ত' বাজায়ে কিঙ্কিণ;
স্তব্ধ-তার বীণা-বুকে উছলিল তরঙ্গ ঝঙ্কার
মুক্তধারা নির্ঝরিণী—আজি কেন নামিল জোয়ার!
বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—তাই মোর নয়নে স্বপন,
ভুবন-শোভন আজি, তুমি প্রিয়া, তাই অতুলন।

রাতের ফুল

শ্রীমতী পূর্ণশশী দেবী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

জ্যোতিশের কথা

গতিক ভাল নয় দেখছি।

ব্যাপারটা যে শেষকালে এই রকম দাঁড়াবে, আগেই তা ভেবেছিলুম, তবে এত শীগ্‌গির আশা করি নি। এ যে একেবারে উপন্যাসের নায়কের মত, প্রথম সাক্ষাতেই ভায়া আমার যাকে বলে 'লাট্টু' বনে গেলেন!

এর মধ্যে ওর মাসিমার হাত আছে নিশ্চয়, নইলে বেছে বেছে পবিত্রর সঙ্গেই মিস ব্যানার্জ্জীর অত ঘটা করে আলাপ করানো হল কেন? আমার মনে হয়, সেদিনকার পার্টিটা শুধু এই উদ্দেশেই······যাক্—

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে দরকার কি? বন্ধু বলে মানে, তাই আমাকেও ওর ভাল মন্দ দেখতে হয়, দরকার বুঝলে মুখ ফুটে দু'কথা বলতেও হয়।

তা এর মধ্যে কিছু বলবার কইবার সময়ও তো পাচ্ছি না ছাই! আফিসে কাজের এত ভিড়,—পবিত্র আগে প্রায়ই আসত, এখন কখনো কচিৎ।

শুভা সেজন্যে অনুযোগ করলে যা হোক একটা বুঝিয়ে দেয়, কিন্তু আমার কাছে তো লুকোবার উপায় নেই!

একাধিক বার ইসারায় ওকে সতর্ক করেও দিয়েছি, মানে, এ তো আর রজনী নয়, ধনীর দুলালী,—এবং বিদুষী মহিলা, এঁর দিকে একটু বুঝে সুঝে······

কিন্তু,—এখন কে রোধে তাহার গতি?

এই উদ্দাম উচ্ছ্বাসের মুখে বাধা দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা, তাই চুপ করে ছিলুম, শুভাকেও কিছু বলি নি। কিন্তু শুভা যখন উদ্বিগ্ন হয়ে বললে—পবিত্র ঠাকুরপোর হল কি গো? আজ তো রবিবার, ছুটী আছে, একবারটি খোঁজ নাও না, কদ্দিন আসেন নি, বেচারার অসুখ বিসুখ হয়ে থাকে যদি···

তখন আমি আর থাকতে না পেরে বললুম—না, বেচারা ভালই আছে শুভা! এই তো সেদিন পার্কে দেখা হল, সে এখন ভারি ব্যস্ত—

—কিসে ব্যস্ত? পূর্ব্বরাগের জের এখনো চলছে বুঝি? রজনীকে চোখের আড়াল করে······

—রজনীর এখন মাথুরের পালা! পূর্ব্বরাগ চলছে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে।

—সে কি গো?

শুভা সবিস্ময়ে বলে উঠল—এর মধ্যে চন্দ্রাবলী জুটল আবার কোথায়? কে তিনি?

—তিনি মিস লিলি ব্যানার্জ্জী, ব্যারিষ্টার-দুহিতা, রূপসী, বিদুষী, সুগায়িকা, যাকে বলে আপ্‌-টু-ডেট্ আর কি?—যোগাযোগ ভালই হয়েছে, ঐ রকম স্ত্রীই পবিত্রর হওয়া উচিত, কিন্তু গোল বাধছে রজনীকে নিয়ে। ও হতভাগা মেয়েটার ভাগ্যে কি জানি······

শুভা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—সত্যি ভারি দুঃখ হয় ওর জন্যে, কি অভিশাপ নিয়েই ও জগতে এসেছিল! আচ্ছা, সেই মেয়েটি,—কি নাম বললে—লিলি? সে কি রজনীর চেয়ে সুন্দরী?

—তা কি করে বলব? সৌন্দর্য্য নিজের নিজের চোখে, একজন আর্টিষ্টের চোখে লিলির চেয়ে রজনী সুন্দর লাগবে হয় তো—

—তবে? তোমার বন্ধুটি ওদিকে ঝুঁকেছেন যে? নতুনত্বের নেশা? সত্যি! পুরুষের মন কি চঞ্চল

বাপু! এদ্দিন একেবারে রজনী বলতে অজ্ঞান, সেই রজনী এখন……

—শুধু নতুনত্বের নেশাই নয় শুভা, নারী-সৌন্দর্য্যের যে জিনিষটি পুরুষের মনকে সব চেয়ে বেশী আকৃষ্ট করতে পারে, তোমার রজনীতে তা নেই।

—সেটি কি শুনি?

—যৌবনের চাপল্য, উজ্জ্বলতা,—যা নারীর হাবে ভাবে, ঠোঁটের হাসিতে, চোখের চাহনীতে, মুখের বাণীতে মাদকতার সৃষ্টি করে, পুরুষের চক্ষে লোভনীয় করে তোলে, তাতে আবার মার্জ্জিত রুচি, পালিশ করা……

—বাস্ বাস্! এতও জানো তুমি! তা এখন সেই মার্জ্জিত রুচিকে নিয়েই তোমার বন্ধু বুঝি…

—একেবারে মসগুল্! হাবু-ডুবু খাচ্ছেন আর কি!

—আর বেচারী রজনীকেও নাকানি চোবানি খাওয়াচ্ছেন! সত্যি, কি অন্যায় বলো দেখি? একটা মেয়ের জীবন এভাবে নষ্ট করা যে কত বড় পাপ—

—তোমার ও পাপ-পুণ্যের ধার ওরা ধারে না শুভা,—ন্যায় অন্যায়ও বোঝে না, বড় লোকের ছেলে, মাথার ওপর কেউ নেই, নিজের খেয়ালে চলে বাঁধন-হারা জীব—

—বাঁধন দিতে হবে, জোর করে—

—সেই চেষ্টাই তো করা হচ্ছে, পবিত্রর মাসিমা সেই ব্যবস্থা করবার জন্যেই এবার লিলিকে নিয়ে…

—ও! এ মাসিমার কন্যা বুঝি? তবে আর…

শুভা মুখখানি ম্লান করে উদাস সুরে বললে—তা'হলে কি করা যায়? ও অভাগী মেয়েটার যে এখন গলায় দড়ী ভিন্ন আর উপায় নেই!

—সেজন্যে দুঃখ করে আর কি হবে বলো? ও যে নিজের হাতেই গলায় ফাঁস পরেছে। রজনী একটু শক্ত হলে হয় তো ব্যাপারটা এতদূর গড়াত না। যাক্, এমনই কি হয়েছে? এক পাশে ও-ও পড়ে থাকবে 'খন, সেকালের রূপকথার দুয়োরাণী হয়ে, ওটা তো বড়মানুষী চালের একটা অঙ্গ।

—পোড়া কপাল অমন বড়মানুষী চালের! একটা গরীব মেয়ের সর্ব্বনাশ করে…নাঃ, এর একটা প্রতিকার না করলে……

—প্রতিকার করবে কে? তুমি না আমি? হুঁ! নিজের অধিকারের বাইরে যেতে নেই শুভা! তা'হলে এতদিনকার বন্ধুত্ব আমাদের মাটি হয়ে যাবে। উচিত বললে সুহৃদ বিগ্ড়োয়, জান তো?

—তাই বলে, চোখের সামনে এত বড় একটা অন্যায় হচ্ছে—দেখেও চুপ করে থাকবে?

—নেহাৎ চুপ করে আমি নেই, চেষ্টা করে দেখছি, বন্ধুত্বের জোরে যতদূর হতে পারে।

মনে একটা অভিমান এসে পড়েছিল,—যাকে আমি ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসি, স্নেহ করি, তার কাছে উপযাচক হয়ে যেতে হবে? কিন্তু যেতেই হল শ্রীমতীর নিৰ্ব্বন্ধাতিশয্যে।

আজ আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, গলি ছাড়িয়ে রাস্তায় পড়তেই দেখি, মোটর বাইকের বিকট হুঙ্কারে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করে পবিত্র—

আমাকে দেখেই সে—হ্যাল্লো! জ্যোতিশদা' যে!—

বলে বাহনের গতি স্থগিত করে নেমে পড়ল, বললে—তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম জ্যোতিশদা'!

—কেন? হঠাৎ এ দুর্ম্মতি হল যে?

—ইঃ! রাগ তো হবারই কথা,—কদ্দিন আসতে পারি নি—

পবিত্র সহাস্যে আমার হাত ধরে বললে—কি করি ভাই?—এমন ঝামেলায় পড়ে গেছি……

—তা আর আমায় বলতে হবে না বন্ধু! তোমার চেহারাতেই বোঝা যাচ্ছে। আশীর্ব্বাদ করি এমনি ঝামেলায় যেন জন্ম জন্ম তুমি……

—ঠাট্টা না দাদা, বাস্তবিক, ভারি মুস্কিলে পড়েছি

জানি, তাই তো ছুটে এলুম তোমার অভয় চরণে শরণ নিতে।

—ভাল ভাল! দয়া করে এসেছই যদি তবে দীনের কুটীরে একবার পদার্পণ……তোমার বউদি' 'ঠাকুর পো, ঠাকুর পো' করে একেবারে অস্থির, বলে, একবারটি খোঁজও নাও না, এ তোমাদের কি রকম বন্ধুত্ব?

—তা আমি জানি, বউদি' আমাকে যে রকম স্নেহ করেন—

পবিত্র গলার স্বর খাটো করে সলজ্জভাবে বললে—বউদি' শুনেছেন না কি? শিশির কথা—বলেছ? তা'হলে আর শর্ম্মা ওদিকে ঘেঁসছেন না!

—কেন বলো দেখি? পরাজয়ের লজ্জা? তাতে আর হয়েছে কি! তোমাকে একবারটি যেতেই হবে ভাই, ও ভারি উৎকণ্ঠিত হয়েছে তোমার জন্যে।

পবিত্র খানিক নির্ব্বাক থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—আজ নয়, আর একদিন যাব, বউদি'কে বলো, আমায় ক্ষমা করেন যেন, আর তুমিও—তুমিও আমাকে মাপ করো জ্যোতিশদা'!

পবিত্রর কণ্ঠস্বর গাঢ়, চোখ যেন ছল ছল করছে, ব্যাপার কি?

আমার রাগ অভিমান সব উড়ে গেল, বললুম—ক্ষমা চাইবার দরকার নেই ভাই! তবে তোমার যাতে ভাল হয় তাই করো, আমরা তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী! হঠাৎ না বুঝে সুঝে ঝোঁকের মাথায় একটা কিছু করে ফেললে সেটা পরে দুঃখের কারণ হতে পারে।

—তাই তো ভাবছি। এধারে এসো জ্যোতিশদা'!

রাস্তার যে দিকটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন, সেইখানে এসে পবিত্র মিনতির সহিত বললে—জ্যোতিশদা,' আমার একটি অনুরোধ রাখবে তুমি?

—কি অনুরোধ ভাই, অত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? আমাকে তোমার জন্যে কি করতে হবে বলো

—তোমার সঙ্গে মিঃ ব্যানার্জ্জী একবার দেখা করতে চান।

মিঃ ব্যানার্জ্জী? শিশির পিতা? তাঁর সাথে আমার কতটুকুই বা পরিচয়? সেদিনকার পার্টিতে যা দু'একটি কথা হয়েছিল তা শুধু পবিত্রর বন্ধু বলে। তিনি এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করলেন কেন?

আমি বিস্মিত হয়ে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম—কেন বলো দেখি, হঠাৎ এ গরীবের ওপর অনুগ্রহ হল কেন? না ভাই, ও সব সাহেবী মেজাজের লোককে আমার বড় ভয় করে—

—'না' বললে ছাড়ব না জ্যোতিশদা,' তোমাকে তাঁর কাছে একবার যেতেই হবে, অন্ততঃ আমার অনুরোধ রাখতে, নিতান্ত দরকার বলেই তোমায় কষ্ট দিচ্ছি। বলো, যাবে?

পবিত্রর ব্যগ্রতা দেখে আর 'না' বলতে পারলুম না, বললুম—বেশ, কবে যেতে হবে?

—আজই, এখনি চলো না আমার সঙ্গে।

—এখনি?

—হ্যাঁ, তোমার কোনো কাজ আছে না কি?

—না, তোমার খোঁজেই বেরিয়েছিলুম, আচ্ছা, চলো তা'হলে।

—এসো, এই বাইকেই,—হ্যাঁ, যাবার আগে একটা কথা বলে রাখছি জ্যোতিশদা', আমি মিঃ ব্যানার্জ্জীকে রজনীর কথা বলি নি এ পর্য্যন্ত, শুধু বলেছি জীবনে আমার এমন একটা 'সিকরেট' আছে, যে জন্যে দিন কতক ভাববার সময় চাই। উনি শীগ্‌গির পাকা-পাকি করে ফেলতে চান কি না, তোমাকে সেই সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করবেন বোধ হয়।

—তা'হলে কি সত্যি সত্যি তুমি মিস্ ব্যানার্জ্জীকে… কিন্তু এবার বিয়ে তো? না, তোমার সেই চির মধুর বাঁধন-হারা স্বাধীন প্রেম?

—আর আমাকে লজ্জা দিও না ভাই, আমি কি যে করব, কি না করব, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছি না, আমার বর্ত্তমান অবস্থা কেমন জানো? কর্ণধারহীন নৌকোর মত টলমল করছে, একবার

এদিক, একবার ওদিক। বাস্তবিক, এ দোটানায় পড়ে প্রাণান্ত হবার যোগাড়!—

—বুঝেছি, তোমার এখন হয়েছে 'শ্যাম রাখি, না কুল রাখি!' কিন্তু এমন ভাবে দু'নৌকোয় পা দিয়ে থাকা বেশীদিন তো চলবে না। হ্যাঁ, ভাল কথা, মিষ্টার ব্যানার্জ্জী যদি রজনী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন তা'হলে কি বলব? আমার তো মনে হয় তুমি না ভাঙলেও উনি সব জেনে গেছেন। এরকম কথা কি চাপা থাকে?

পবিত্র গম্ভীরমুখে একটুখানি ভেবে বললে— তা'হলে যা সত্যি তাই বলে দিও, লুকোবার দরকার নেই। বলো, এ দুর্ব্বলতা যদি ঝেড়ে ফেলতে পারি তবেই···নইলে তাঁর মেয়ের আশা আমি ছেড়ে দেব, তাতে আমার যত কষ্টই হোক, প্রতারণা আমি করব না—

শেষের দিকটা পবিত্রর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। নাঃ, এ যে একেবারে রীতিমত নভেল! পবিত্র তার সমস্যাটা এবার যথার্থই জটিল করে তুলেচে দেখছি, এ সমস্যার সমাধান করা কি আমার কর্ম্ম?—দেখি, ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু কুলোয়।

সাহেবী মেজাজের হলেও মিঃ ব্যানার্জ্জী লোকটা মন্দ নয়, দেখলুম। পবিত্রর সেই 'সিক্রেট' জানতেই আমার তলব পড়েছে বটে। তাঁর কন্যার জন্য নির্ব্বাচিত বর এখন সাগরপারে শিক্ষার্থী, কিন্তু পবিত্রকে দেখে তাঁর মত পরিবর্ত্তিত হয়েছে,—লিলিও পবিত্রর অনুরাগিণী। মাতৃহীনা মেয়েটিকে অসুখী করতে তিনি চান না, কিন্তু পবিত্রর এই 'দোমনা' ভাব তাঁকে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না, সুতরাং······

ভদ্রলোক বস্তুতঃই বড় উদ্বিগ্ন হয়েছেন, দেখলুম রজনীসংক্রান্ত ব্যাপারটা তাঁর অজ্ঞাত নেই। পবিত্র যা বলেছিল, আমি তাই বলে আশ্বাস দিলুম তাঁকে অর্থাৎ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবার জন্য আপাততঃ পবিত্রকে কিছু সময় দেওয়া হোক, পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করলেই হবে, ইত্যাদি—

যাক্ আমি তো বলে খালাস, এখন বিধির নির্ব্বন্ধ

(ক্রমশঃ

বাঙলা সাহিত্যের মূল সূত্র

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত

৩

ভারত অলঙ্কারের মূল ভিত্তি

"আর এখন আমি যা বলেছি, একটা রূপক দিয়ে তা বোঝাব; আমাদের এই স্বাভাবিক প্রকৃতি তাতে কতখানি আলো পায়, আর কতখানি আলো না পাওয়ার অন্ধকারে থাকে; — দেখ, শোন! মানুষগুলো যেন বাস করছে একটা মাটির ভেতরের গুহার ভেতর, যার শুধু এক মুখ খোলা আছে আলো আসবার জন্যে; আর সে আলোটা সমস্ত গুহাটার শেষ পর্য্যন্ত এসে পড়ছে। এখানে তারা তাদের একেবারে জন্মকাল থেকেই আছে। আর তাদের পা আর ঘাড় এমন শেকল দিয়ে বাঁধা, তাতে তারা একটুও নড়তে চড়তে পারে না, শুধু তারা দেখতে পায় সুমুখের দিকে, শেকল বাঁধার জন্যে তাদের ঘাড়ও ফিরিয়ে দেখতে পায় না। তাদের ঠিক ওপরে ও পেছনে, একটু দূরে জ্বলছে ভীষণ আগুন। আর সেই আগুন ও সেই বন্দীদের মাঝখানে একটা উঁচু পথ আছে লোকের যাতায়াতের জন্যে। তুমি দেখতে পাবে, যদি ভাল করে দেখ, একটা নীচু পাঁচিলের মত সেখানটায় গাঁথা রয়েছে। ঠিক যেমন একটা পর্দা, যা পুতুল-নাচওয়ালাদের সামনে থাকে টাঙানো, আর ওপর দিয়ে তাদের পুতুল নাচের খেলা দেখায়, প্রায় ঠিক তেমনি।

"আমি দেখছি।

"আর আমি যা বলেছি, তুমি বেশ করে দেখছ, লোকে ওই পাঁচিলের ধার দিয়ে চলাচল করছে, হাতে করে নিয়ে চলেছে নানা রকমের পাত্র, ভাঁড়, কত রকম মূর্ত্তি, জন্তু-জানোয়ারের পুতুল, কাঠ ও পাথর দিয়ে গড়া কিম্বা অন্য অনেক জিনিষ দিয়ে তৈরী, যা ওই দেয়ালের ওপর দেখা যাচ্ছে।...

"আপনি আমাকে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখালেন, সত্যাই তারা এক আশ্চর্য্য রকমের বন্দী।

"ঠিক আমাদেরই মত, আমি উত্তর করলাম,— আর তারা শুধু তাদের নিজেদের ছায়া দেখছে অথবা ওই আগুনের আলো ও বিপরীত দিকে গুহার পাঁচিলের গায়ে সে সব অন্য ছায়া ফেলছে— তাই দেখছে।

"সত্যিই ত', তিনি বললেন, যদি কখন কোন রকমে তারা মাথা না নাড়তে পারে, তবে কি করে ওই ছায়াগুলো ছাড়া তারা আর অন্য কিছু দেখতে পায়?

"আর তা'হলে যে সমস্ত পদার্থ বা বস্তু ওই রকম করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাতে তারা ঐ বস্তুর স্বরূপ না দেখে ছায়াই শুধু দেখছে?

"তিনি বল্লেন,—হাঁ।

"তাদের আমি বললাম,—সত্য আসলে আর কিছুই নয়, শুধু ওই সব আসল বস্তুরই ছায়া।"

মনীষী প্লেতোর সাধারণতন্ত্র (Republic) থেকে আমরা এটা তর্জ্জমা করে দিলাম, প্লেতো এই কথাগুলো দিয়ে সত্যকে বোঝাবার একটা রূপক রচনা করেছেন। মানুষের কাছে জগতের যা কিছু সত্য, সবই এমনি আসল সত্য বস্তুর ছায়ারই মতন। সাহিত্যে যে উপমা সৃষ্টি করি, সে এই সত্যকে রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে যাই। সেইখান থেকেই অলঙ্কারের জন্ম হয়। এখন আমাদের দেশে সেই অলঙ্কার কি ভাবে যে গড়ে উঠেছে সেই কথা বলব।

আগে আমরা পশ্চিমের গ্রীকো-রোমীয় সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের কথা যা বলেছি তা সমস্তটাই খৃষ্ট-পূর্ব্ব-যুগের কথা। ও দেশের মধ্যযুগ ও নবজন্মের যুগের

কথা বলবার আগে ভারত-অলঙ্কারের কথা বলবার কারণ হচ্ছে এই যে, খৃষ্ট-পূর্ব্বকালে যেমন ওদের দেশে Poetics-এর সৃষ্টি হয়েছিল, আমাদের দেশে ঠিক তা হয় নি বা হয়েছে কি না, তার আজও কোন বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না। ওদেশের মধ্যযুগ আরম্ভ হয়েছে প্লেতো-আরিস্ততলের অনেক পরে অর্থাৎ খৃষ্ট-জন্মের প্রায় এগারশ বছর পরে। আমাদের দেশে আবার তেমনি খৃষ্টের ছ'শ বছর পর থেকে অলঙ্কারের সন্ধান পাওয়া যায়।

গ্রীস দেশে যে প্রায় কবিতার জন্মের সমসাময়িক কালেই অলঙ্কারের সৃষ্টি হয়, তার একটা সহজ কারণ পাওয়া যায়। গ্রীস দেশ আমাদের এই সুবে বাঙলার একটা বড় জেলার মতই দেশ। সেখানে যে ঘটনাটা ঘটেছে বা যা কিছু জ্ঞানের চর্চ্চা হয়েছে, সেটা জানা বা কবিদের নাটক অভিনয় দেখার সুযোগ সব কাছা-কাছির ব্যাপার। আমাদের এ ভারতবর্ষ এত বড় আর এত বিচিত্র এই দেশের ভাব যে, এক দেশ থেকে আর এক দেশে খবর পৌঁছুতেই কাল কেটে যেত। বিশেষতঃ পাটলীপুত্রের সাম্রাজ্য গড়ে উঠবার আগে, পথ-ঘাট, চলাচল, জানা-শোনা ও জ্ঞানের প্রসার হতে অনেক দেরী পড়ে যেত। এক দেশ থেকে খবর আসতেই এক যুগ কেটে যেত। কাজেই জানা-শোনা জিনিষটা গড়ে উঠতে বেশ একটু সময়ই লাগত।

মহাভারত, হরিবংশে বা ওই পৌরাণিক যুগে যে সব নাটক অভিনয়ের সন্ধান মেলে, সে সব নাটকের খবর বড় একটা কিছুই নেই, শুধু অভিনয় হত এই পর্য্যন্ত—গানের চর্চ্চা হত, হল্লীস নাচ হত। সে গান, সে নাটক, সে হল্লীসের কোন হদিশ কোন মাটি খুঁড়ে আজও পাওয়া যায় নি। হরপ্পাতেও সে সন্ধান নেই, নালন্দারও সে সন্ধান নেই। ভূমিকম্পে যদি অত বড় দেশ চাপা পড়তে পারে, শতদ্রু, বিপাশা, সিন্ধু, ইরাবতী যদি শুখিয়ে যেতে পারে, কেতাবগুলোও যে যায় নি, তাই বা কে বলবে, আর কেতাবগুলো যে ছিল সে কথাই বা বলতে কে ফিরে আসছে?

তারপর ধর্ম্মের খেয়ালে যদি আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার জলে যায়, এখানেও সে খেয়ালের এক পসলা যে ছেড়ে দিয়ে গেছে তা ত' নয়। ইংরেজের কৃপায়, তাদের বিদ্যের জোরে, আজ বরং কিছু তবু ফিরে পাই। আর যা পাই তারও গোড়া ঘোর অমাবস্যার মেঘলা রাতে অন্ধকারের আলোয় কালীর অক্ষর পড়ারই মত। কাজেই অন্ধকারের ওপর অন্ধকার গড়িয়ে জমাট হয়ে আছে। সে কালের বন্ধ-দরজা খোলবার চাবি আজও মেলে নি।

যেটুকু পাওয়া যায়, তা ওই সেই কানা মামা নিয়েই খেলা আর গল্প চলেছে। অন্ধ দেখাচ্ছে অন্ধকে হাতী।

অন্ধকারের গল্প আলোয় বলা যায়, যদি সে অন্ধকারকে চেনা যায়, সে চেনবার উপায় নেই। সেই জন্যেই, 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'—বলে, কিন্তু বিচার-বুদ্ধিতে পাক ধরলে, সে বলবে, 'কানা মামার চেয়ে নেই মামাই ভাল'।

আগের বারে বলেছি, ওদের দেশের ইতিহাস আছে, আমাদের দেশের নেই। এইটুকু খুঁজে পেতে পণ্ডিতেরা বলছেন যে, ভাষাটাই না কি আগে সংস্কৃত ছিল না। খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে, পশ্চিম ভারতের শক-ক্ষত্রপের মধ্যে রুদ্রদমন বলে এক রাজা ছিলেন, তিনিই না কি প্রথম সংস্কৃতের চল করে গেছেন। আর তিনি যে সব নামকরণ করে গেছেন, তাই না কি ভরত নাট্য-শাস্ত্রের নাটকের সূত্রের ভিতর সেই সব পদ ব্যবহার করেছেন। যে সমস্ত মহাকাব্য ছিল, তা ছিল প্রাকৃত ভাষাতে, পরে তাকে সংস্কৃত করে নেওয়া হয়েছে। আগে সবই না কি প্রাকৃত ছিল।

কথাটা অনেকটা দাঁড়াচ্ছে, চলতি ভাষাটা হয়ে গেল সংস্কৃত সাধু ভাষা। পুরুত ঠাকুররা পণ্ডিত লোক, রাজা বা মহাজনেরা তাদের হাতের মুঠোর ভেতর। সাধারণ লোকদের মুখ থেকে ভাষাটা কেড়ে নিয়ে নিজেদের করে নিয়ে, তাদের পর্দাটা বন্ধ করে দিয়ে বোবা করলে। তারপর আর্য্য মহাপুরুষরা এদেশে এসে জঙ্গলীদের কতক পেয়ে,

কতক বেশ বদলে টেনে নিলেন, ভাষাটাকে দিলেন বদলে। দেশভাষা অর্থাৎ সাধারণে যে ভাষায় কথা কইত, তার কিছু কিছু গাথায় ও আখ্যানে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যি যে কোন্ সময়ে এ ভাষাটা সংস্কৃত হয়ে গেছে, তা পণ্ডিতেরা বলে দিলেও মেনে নেওয়া খুব সহজ নয়।

আর একটা কথা ভাববার আছে। পশ্চিমদেশে যে দর্শন-শাস্ত্র সুরু হয়েছে, ইতিহাসের দিক দিয়ে, ভাবের দিক দিয়ে, তাদের একটা ক্রমিক গতি ও স্ফূর্তির প্রকাশ ধরা যায়, যেমন প্লেতো থেকে আরম্ভ করে ক্রোচে, আলেকজাণ্ডার এমন কি আর্ল অফ লুষ্টাবেল পর্যান্ত শিকলী গেঁথে দেখান যায় — তা যতই কালের ফাঁক মাঝখানে পড়ুক। আমাদের দেশের দর্শন যেন একলা-একলা নিজেরা এক সারডোল ভাব নিয়ে গড়ে উঠেছে, কার সঙ্গে কার তেমন বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাব দেখা যায় না, শুধু কিছু কিছু মিল পাওয়া যায় মাত্র। আমাদের দেশের অলঙ্কার শাস্ত্রগুলোও প্রায় সেই রকমেরই ব্যাপার। কেউ কেউ হয় ত' বলবেন যে, শ্রুতি আমাদের দেশে হিমালয় পর্ব্বত, ওই বুড়ি ছুঁলেই এ দর্শনের চোর-চোর খেলায় বাজি জিৎ। পশ্চিমীরা বুড়ি ছোঁয়ই নি। আমরা ছুঁয়েছি। যেমন করে হোক বুড়ি ছুঁতে পারলেই হল। তা সে তর্কের উত্তর হবে পরে, তবে ভাবের দিক দিয়ে তাদের কোন কোন বিষয়ে কার কার মিল হয় ত' কিছু আছে বটে, কিন্তু একেবারে যথার্থ ইতিহাসের কাল ঠিক করেও বলা যায় না—আর, সেই সেই কালে যে সব আলঙ্কারিকরা জন্মেছেন, তাদের একজনের সঙ্গে আর একজনের আসা বা আবির্ভাবের মাঝখানে শয়ে-শয়ে বছর কেটে গেছে। সন তারিখ ত' নেই, যা আছে তা তাদের লেখার পদ্ধতি ও পূর্ব্ববর্ত্তীর নাম দেখে মিলিয়ে নেওয়া, ওই কানা মামার সঙ্গে খেলা-গল্প করার মতই হয়ে ওঠে।

আবার ওদিকে সে সময়ের দেশের অবস্থা ও কালের অবস্থা, জ্ঞান বিস্তারের রীতি যে কি ছিল, সমাজ ও ধর্ম্মের যে কি ধরণ ছিল তাও ঠিক পাওয়া খুব শক্ত। যে যেখানে যা জানিয়ে দিয়ে পাণ্ডিত্যের বড়াই করছে, সেও তার বর্ত্তমান কাল থেকে সে অতীতের কাল—কালও যতদূরে ছিল, আজও ঠিক ততদূরেই রয়েছে। কোন্ সঙ্গত কারণে যে শাস্ত্রের এ সব সূত্র ঠিক হল তার গোড়া কিছুই নেই, তবে তার কতক পাওয়া যায় তাদের কথায় অর্থে ও মারপ্যাচে। তার পেছনে যে কি দার্শনিক তথ্য আছে, সামাজিক বা বিশেষ ভাবে মানসিক বা দেশের কোন্ আবহাওয়ায় যে তার জন্ম হল তার কিছুই পাওয়া যায় না। কাজেই ধারাবাহিক যে একটা বীজ থেকে তার পরিণতি দেখানোর বিশেষ সুযোগ আছে, তা নয়।

আমাদের আলঙ্কারিকদের গোড়ার কথা হচ্ছে, কাব্য বুঝতে হলে, রস নিয়ে রসিক হতে হলে, অলঙ্কার শাস্ত্র পাঠ করা দরকার। কেন না এসব কাব্য পণ্ডিত কবিদের লেখা, আর পণ্ডিতদের জন্যে। যে পুরুতরা বেদ পড়া বন্ধ করেছিলেন, এসব আলঙ্কারিকরাও ত' তাঁদেরই বংশধর। কিন্তু সে যতই হোক, এখানেও সেই কাব্যের গোড়া আর কাব্যের অলঙ্কার শাস্ত্রের গোড়া যে কোথায়, তাও সেই অন্ধকারে, কেন না কোন সূত্রকারও সে কথা বলেন নি, ভাষ্যকারও তথৈবচ, বৃত্তিকারও সেই এক খাদেরই মাটির ঢেলা।

তবে মোটের ওপর আমরা এই অলঙ্কারের ধারা বোঝাবার জন্যে একটা ইতিহাসের পারম্পর্য্য গড়ে নিতে চাই; আমাদের কাজের, অর্থাৎ এই রস-অলঙ্কারের পরিণতি ও গতির কথাটা সহজে বোঝাবার জন্যে সেটা হল এই যে, খৃষ্ট ছয় শতাব্দী থেকে আট শতাব্দীর মধ্যে প্রথম যে আলঙ্কারিকের ঠিকানা পাওয়া যায়, তাঁর নাম ভরত মুনি। কোথায় যে তাঁর ঘর, তা জানা যায় না। বরং তাঁর কথা নিয়ে অনেক গাল-গল্পও রচা হয়েছে। কেউ বলেছেন বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ রচনা করে তাঁর হাতে দিয়েছিলেন প্রেক্ষা কাব্য যোজন করবার জন্যে।

কেউ বলেন, তিনি মহাকবি ভাসের সম-সাময়িক, কেউ বলেন, ভরত-নাট্যশাস্ত্রের ভেতর থেকে যে হদিশ পাওয়া যায়, যাতে শক, যবন, পল্লব, সব যখন আছেন, তখন খৃষ্ট আট শতাব্দীতে তাকে টেনে নিয়ে এস। আছুন তারা ভরতকে টেনে যে কোন শতাব্দীতে কিন্তু আসলে কিছুই স্থির নির্দিষ্ট হয় না। তা নিয়ে বিশেষ ভাবনা দুঃখুর কথা নেই, ইতিহাসের সন-তারিখ আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে পাঁজির পুরুতের ছবির মত। বগলে পুঁথি, মাথায় টিকী, হাতে নড়ি, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সাতাশটা নক্ষত্র তাকে ঘিরে রেখেছে, সে ঠক্ ঠক্ করে নড়ি দিয়ে খোঁচা দেয়, আর মানুষের সুখ-দুঃখ, লাভা-লাভ, জয়-পরাজয় তারই খোঁচায় বেরোয়। ভারত-অনুসন্ধান-সমিতি ভরতের কাল নিরূপণ করতে গিয়ে হয়ে গেছেন জড়-ভরত। এখন আর ইতিহাসের সুখ-দুঃখ আমাদের নেই—তবে ওই নড়ির খোঁচায় যা জেগে ওঠে। আত্ম-বিস্মৃত জাতি বলে ত' কাব্যের ধূয়ো ধরলেই হয় না। ইতিহাসকে ধরে রাখতে পারি নি। এখন ইতিহাস জানতে হলে জার্ম্মাণ ভাষা জানতে হবে, প্রাকৃত, পালি জানতে হবে, তবে আমাদের ইতিহাস খুঁজে পাব — অর্থাৎ যে তিমিরে সে তিমিরেই। ইতিহাসের ঠেলায় পড়ে আমাদের দেশে রামায়ণকেই আদি-কাব্য বলা হয়। আর রামায়ণ, মহাভারত জন্মের যে কত বছর পরে এই অলঙ্কার শাস্ত্র জন্ম নেয়, সে কথা পুব-পশ্চিমের পণ্ডিতেরা যতই সন তারিখের ব্যবস্থা করুন, তাকে মেনে নেবার বা মানিয়ে দেবার সুযোগ কল্পনায় খানিকটা হয় ত' হয়, আসলে কিছু হয়ে ওঠে না।

তবে আমাদের অলঙ্কারের গোড়া হলেন ভরত মুনি। দেবতা আর মুনিরা আমাদের সবেরই গোড়া। তবে পণ্ডিতেরা বলেন যে, ভরত-নাট্যশাস্ত্র প্রায় মহাকবি ভাসের এক কালেরই ব্যাপার। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পর থেকে আমাদের এপারে Æsthetic রচনা হয়েছে। সে অলঙ্কার আর পশ্চিমী অলঙ্কার, দুটোর মধ্যে অনেক ভেদ আছে, সে কথা আগেই বলেছি। অবশ্য কোন কোন জায়গায় তার কিছু মিলও পাওয়া যেতে পারে।

এখন কথা হল এই যে, রামায়ণ হলেন আদি কাব্য, তার আগে আর তা'হলে সাহিত্য রচনা হয় নি বলতে হয়। বক-মিথুনের বুকে বিঁধল বাণ, কবির প্রাণ কেঁপে উঠল, শুধু কাঁপল না, তাঁরও বুক চিরে গেল, রক্তধারা ঝরল, কাব্য সৃষ্টি হয়ে গেল। এই কথাটাই কি ঠিক? বেদকে অপৌরুষেয় রাখার মতন রামায়ণের স্কন্ধে একটা অপৌরুষেয় ভাব চাপাবার সাধনা হয়েছে। রাম জন্মাবার দশ হাজার বছর আগে বাল্মীকি না কি এই গ্রন্থ রচনা করেছেন, নারদ মুনি বীণা বাজিয়ে তার সুর অনুরণন করে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন। কথাটা মানতে হয় মান, না মানতে হয় ভাল করে বোঝ।

তবে এর ভেতর থেকে দুটো কথা পাওয়া যেতে পারে। একটা হল, যদি কবি আগে তাঁর কল্পনা বা ধ্যান বা যাই বল, তাই দিয়ে রচনা সৃষ্টি করে থাকেন, সে কল্পনা সত্যে পরিণত হয়েছে; অথবা আর একটা হল, রাম জন্মে যে রাবণ বধ করে সাম্রাজ্য গড়েছিলেন, তার সত্য ঘটনা বা সেই ইতিহাসের ওপর নির্ভর করে সেই সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে এ কাব্য রচনা হয়েছে—কোন্‌টা?

ইতিহাসের তথ্য-বিশ্লেষণ দিয়ে এর কোনটাই ঠিক করা যায় না, কেন না ত্রেতাযুগের আগের দশ হাজার বছরের কাব্যকে আজকালকার পণ্ডিতরা বলেন, ঈশার জন্মের মোটে ছয়শ বছর আগের বই। এও মানতে হয় মান। আমরা বলব, ও কথাই নয়, ইতিহাস নেই। প্রশস্তি নিয়ে যত অবস্তিই দেখাও, আর তাম্র-ফলকে যতই মাথা খোঁড়, ও খুঁজে পাবে না বাপু—ও অতীত আঁকড়ে কিছু সুবিধে করতে পারবে না। কল্পনার রাজত্বে সৃষ্টির বাহাদুরী কিছু দেখাবার রাস্তা করতে পার, আসলে কিছু হবে না।

অতীতের মূল্য চিরদিনই বর্তমানে দর করে দেয়। অতীত চিরকালই অতীত। একটা লহমা পর্য্যন্ত চলে গেলে অতীত হয়। তার কথা বর্তমান দিয়ে বলা ছাড়া কোন উপায় আজও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কার হয় নি।

এখন এই রামায়ণই আদি কাব্য কি না? সবাই ত' বলছে যে, আদি কাব্য। বাল্মীকি উই-এর ঢিবি হয়ে ছিলেন, হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে উঠে কাব্য লিখতে সুরু করে দিলেন। রামায়ণই আদি কাব্য। কিন্তু তা বোধ হয় নয়। আদি কাব্যের সন্ধান কেউ দিতে পারে নি, পারেও না। কেন না মানুষের সৃষ্টি কবে হয়েছে, একথা কেউ বলতে পারে না। যতদিন অবধি মনে থাকে, ততদিন স্মৃতি। যেটা মনে থাকে না, সেটা ভ্রান্তি। ভ্রান্তি ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা করে। সব দেশের বড় বড় ইতিহাস এই ভ্রান্তির ওপরই ভিত গেড়ে বসেছে।

একটু খুঁজে দেখলে পাওয়া যায় যে, বেদের কাল আর রামায়ণের জন্মকালের মাঝখানে, আরো অনেক কাব্য রচনা হয়েছে, যার খবর হয় ত' আমরা কেউ রাখি নি। রাখলে রামায়ণকে আদি কাব্য বলতাম না। বেদ, উপনিষদ, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ এদের মাঝখানে ও রামায়ণের আগে আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়, যা ছাপা হয়েছে পশ্চিমে জার্ম্মাণী দেশে, তার নাম 'সুপর্ণা অধ্যায়'। তাতে প্রচলিত মহাকাব্যের অনেক গুণ আছে। কাজেই রামায়ণকে না হয় আদি কাব্য নাই বললাম। যে যে কারণে রামায়ণকে মহাকাব্য ও আদি কাব্য বলা হয়েছে, সেই সেই কারণ যদি পরবর্ত্তী সংস্কৃত ও বাঙলা সাহিত্যে আরোপ করা যায়, তবে এক ওই রামায়ণ-মহাভারত ছাড়া আর কোন কাব্যই মহাকাব্য হয় না। অথচ রামায়ণ যদি আদি কাব্য হয়ে গেল, তার আগের 'সুপর্ণা অধ্যায়' কি কাব্য-নয় হয়ে গেল?

আজকের দিনে আমরা নানা বিষয়ের অনুসন্ধান করাকেই জীবনের পরিচয় বলে মনে করি। আর জ্ঞান যে কার কেবল পৈত্রিক সম্পত্তি বা আধিকারিক, এ কথা সম্ভবতঃ না মানা যেতে পারে। সেই দিয়েই এই রামায়ণকে আদি কাব্য বলে বিচার করা অসঙ্গত নয়। কেন না রাম-রাবণের যুদ্ধও আর্য্য-অনার্য্য বা তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার বিষয়-বস্তু থেকেই বিরচিত — মহাভারতও কতকটা তাই। 'সুপর্ণা অধ্যায়' সেই রকম আর একটা পৌরাণিক যুদ্ধেরই আখ্যান। কদ্রু, বিনতা ও গরুড়ের ব্যাপার নাগ-জাতির যুদ্ধ। তাতে যে কাব্য আছে, ছন্দ আছে, তাকে ফেলে দিয়ে ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠার কাব্যকেই আদি কাব্য বলার কারণ সম্ভবতঃ আঁচড়েই বোঝা যায় যে, দোলো-সাহিত্য মানুষের বড় মুখরোচক ও কানে শোনায় মিষ্টি।

আর এক কথা, বেদকে কাব্য-শাস্ত্রের তথা অলঙ্কার-শাস্ত্রের ভেতর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, উপনিষদের সাহিত্য সৃষ্টিকেও অলঙ্কারে নেওয়া হয় নি। তার কারণ কি? অথচ আলঙ্কারিকদের মতে 'ঔপনিষদিক' বলে সাহিত্য-পুরুষের এক শাখা ছিল। সে কথা পরে বলব। বেদের অনেক ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গী, রামায়ণ-মহাভারতেও আছে, — শুধু সেকালের সংস্কৃত কাব্য কেন, আধুনিক ও প্রাচীন বাঙলার ভেতরও তার ভাব, ভাষা, ছন্দের ধ্বনি অনুকরণের চেষ্টা কেউ ছাড়ে নি। না, সেগুলো অপৌরুষেয়, ব্রহ্মা চার মুখে ফুঁ পাড়লেন, আর হাওয়ায় বেধে গিয়ে, ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব ঝরে পড়ল!

আমরা বলব, বেদও সাহিত্য, উপনিষদও সাহিত্য, মানুষেরই রচা। রমণ ও রমণী যিনি নন, তিনি রচেন নি, রচেছে এই মানুষেই। আছে তাতে রক্ত-মাংসের কথা, মানুষেরই আশা-ভরসা, সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, ন্যায়-অন্যায়,—সবই তাতে আছে। বিচার-বুদ্ধির কথাও আছে, অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথাও আছে। যার ভাব, ভাষা, গাম্ভীর্য্য, যার অর্ন্তদৃষ্টি, যার প্রতিভার বিকাশ আজকের দিনের কবির ভেতরও সব সময় প্রায় দেখা যায় না। রামায়ণ-মহাভারত যদি সাহিত্য হয়, তবে

বেদও সাহিত্য, আর মানুষেরই সৃষ্টি। যা মানুষের সৃষ্টি, তা মানুষে সমালোচনা করবে, এ নতুন নয়। আর মানুষে বাক্য দিয়ে যা সৃষ্টি করবে, তা তার নিজেরই সৃষ্ট বস্তু। ব্রহ্মারও নয়, ব্রাহ্মণেরও নয়।

ওদেশের কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন যে, সত্য যা কাব্যের রীতি, তা বৈদিক স্তোত্রের মধ্যে নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে, সত্য কাব্য কি? কবি আগে, না কাব্য আগে? তোমার অলঙ্কার যদি তার পরিমাণ করতে না পারে, তবে সে কাব্য নয়? অথবা আমার দেশের অলঙ্কার তাকে পরিমাণ করে নি বলে সে কাব্য নয়?

এখন আমার দেশে এই কাব্য বলছে কাকে? যাঁরা বলছেন, কাব্য কি, আর যাঁরা তার মীমাংসা করেছেন, তাঁদের কথা আগে মুখপাতে কিছু বলে নিই, তার সঙ্গে তাঁদের মতামত বলা যাবে।

খৃষ্টের পরে নবম শতাব্দীতে রাজশেখর বলে এক জন আলঙ্কারিক জন্মেছিলেন। তাঁর কেতাবের নাম 'কাব্যমীমাংসা'। রাজশেখর এক চমৎকার গল্প ফেঁদে বলছেন — বাক্‌দেবীর অর্থাৎ সরস্বতীর নিজের একটি ছেলের জন্যে প্রাণ কাতর হয়ে উঠল! কি করেন, তার জন্যে অনেক ধ্যান-ধরা দিয়ে শাস্ত্রে যাকে কৃচ্ছ্র-সাধন বলে তা করলেন, তারপর তাঁর ছেলে হল, তার নাম 'কাব্যপুরুষ'। কাব্যপুরুষ একলা ঘুরে বেড়ান। পথে তাঁর সঙ্গে দেখা হল বাল্মীকির। সঙ্গে সঙ্গে দেখা হল তাঁর আর একজনের সঙ্গে, তার নাম দ্বৈপায়ন। ইনি বাল্মীকির কাছে শ্লোক লেখা শিখে শেষে লক্ষ শ্লোকে 'ভারত সংহিতা' লিখলেন। কাব্যপুরুষের সঙ্গে এঁদের মেলা-মেশা হল। তারপর কাব্যপুরুষের হল বিয়ে। তাঁর নাম সাহিত্যবিদ্যা, তিনি হলেন বধূ। দেশ-বিদেশে ঘুরে তাঁর ভেতর নানা ভাবের কাব্য গাঁজিয়ে উঠল, তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ ভাব হল, তিন রকমের রীতি,—গৌড়ীয়, পাঞ্চালী ও বৈদর্ভী। এই নাকি হল অলঙ্কারের জন্ম।

আশ্চর্য্য এই যে, আসমান আর দেব-দেবী ছাড়া কার জন্মই আমাদের দেশে হয় না। কাব্যপুরুষ তিনিও দেবতার আভিজাত্য রাখেন, বধূ হয় সাহিত্যবিদ্যা।

আচ্ছা, তারপর? এখন তিন ভুবনে এই বিদ্যা শেখাবার জন্যে (কাব্য বিদ্যাটা যেন অলঙ্কার শাস্ত্র পড়লেই হয়?) তাঁর ইচ্ছা থেকে জন্মলাভ করলে সতেরটি শিষ্য অর্থাৎ মানসপুত্র। সেই যে দেবতার দল তাঁরা শিখলেন আঠারটা অধিকরণ। সতেরটা ছেলে, বিদ্যে শিখলে আঠারটা। কোনটা যে দুটো শিখলে তাও জানা যাচ্ছে। এই রকমে তাঁরা আবার শাস্ত্র তৈরী করতে সুরু করে দিলেন। সহস্রাক্ষ লিখলেন, —কবিরহস্য; উক্তিগর্ভ—ঔক্তিক; সুবর্ণাভা—রীতি; প্রচেতায়ণ—অনুপ্রাস; চিত্রাঙ্গদ লিখলে দুটো, যমক ও চিত্র; শেষ—শব্দশ্লেষ; পৌলস্ত্য—বাস্তব; ঔপকায়ন—উপমা; পরাশর—অতিশয়; উতথ্য—অর্থশ্লেষ; কুবের—উভয়ালঙ্কার; কামদেব—বৈনেদিক; ভরত—রূপক; নন্দিকেশ্বর—রস; দিশান—দোষ; উপমন্যু—গুণ; আর কুচমার লিখলেন—ঔপনিষদিক।

যাই হোক্, সমস্তটা তালরসের খেলা হলেও, অলঙ্কারের এই আঠারটা ভাগ ও রীতির খবর এতে আছে। এখানে ভরতের নামে নাট্যশাস্ত্র শুনে আসা যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে রূপকের স্রষ্টা হলেন ভরত। নন্দি-কেশ্বরের একখানা বই পাওয়া যায়, তার নাম 'অভিনয় দর্পণ'। কিন্তু আমরা এখানে ঠিক সংস্কৃত অলঙ্কারের ইতিহাসের খবর দেবার পথও পাব না, শুধু যে মতামতের ওপর আমাদের সাহিত্যের ধারা গড়ে উঠেছে বা গড়া যেতে পারে তারই খবর দেব। তবে এটা এখানে আবার বলে যেতে হয় যে, এই ভরতমুনি, নাট্যশাস্ত্রবিদ মহাকবি ভাসেরই না কি সমসাময়িক লোক, পণ্ডিতেরা তাই বলছেন। হতেও পারে, নাও পারে। সে তর্ক পুরাতত্ত্বের আমাদের নয়। তথ্যটা কি আছে, তাই দেখা যাক।

ভরতকে সকলেই বলেন প্রামাণ্য। প্রামাণ্য অপ্রামাণ্যের কথা ছেড়ে এই কথাটা বোঝা যায় যে,

বেদকে যেমন অপৌরুষেয় করে রেখে দেওয়া হয়, ব্রাহ্মণাদি ছাড়া তার আর গতি নেই, তেমনি এই সব কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রও ওই সব দিগ্‌গজদের জন্তে রচা, আর কার জন্তে নয়। বিশেষতঃ প্রায় সকল কাব্য ও অলঙ্কার এই কথাই বলে যে, রসসৃষ্টি যা কিছু তা হল বিজ্ঞজনের জন্য। অজ্ঞেরা কেবল তাল গাছ থেকে পাতা কেটেই মরুক। পাশীরা তাল-রস খাক, পাতা কাটুক, পণ্ডিতরা কাব্য লিখুন।

যাক, এখন ভরত মুনির গল্প হোক। এঁর যে নাট্যশাস্ত্র পাওয়া যায়, সে অতি বৃহৎ ব্যাপার। নাট্য-শাস্ত্রে প্রধানতঃ নাটকের কথাই বেশী, তার সঙ্গে কাব্যের ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সমস্ত নাট্যশাস্ত্রের কথা এখানে বলা সম্ভবপর নয়, শুধু মূল কথাই এখানে বলবার চেষ্টা করব।

এতে এইটে মনে হয় যে, আগের দিনে নাটকই আগে হয়েছে, কাব্য বা মহাকাব্য পরে।

ভরত সর্ব্বপ্রথমে কাব্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন। লক্ষণ একটি আধটি নয়, একেবারে 'ষট্‌ত্রিংশৎ এতানি'। কিন্তু কথা হচ্ছে, সেই সেই লক্ষণ দিয়ে কাব্যের বা নাট্যের বিচার করে কেউ নাটক লিখেছে কি না। পরবর্ত্তী কালে দেখা গেছে যে, ওই অলঙ্কার শাস্ত্র মেনে অনেকে রচনা করেছেন বটে, আবার অনেকে করেন নি। মোটের ওপর ভাগ করলে পাওয়া যায় গুণ, অলঙ্কার, ভাব ও সন্ধি। তাকে আবার ভাগ করে বলছেন, কাব্যালঙ্কার কি কি? উপমা, রূপক দীপক, যমক। তারপর হল, দোষ ও গুণ। দশ রকম দোষ, আর দশ রকম গুণ। এই দোষ ও গুণ যে পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকরা সব মেনে নিয়েছেন, তা নয়, তারাও এতে অনেক তর্ক তুলেছেন—আমরা এখানে শুধু সেই দোষ ও গুণ ক'টা বলে যাব।

ভরত কাব্যের গুণ বলছেন কি?

(১) শ্লেষ—কথার যোগা-যোগ, এমনভাবে কথা মিলিয়ে দেওয়া যার ভেতরে গভীর তাৎপর্য্য থাকে; অর্থাৎ কথাটা এমনি বেশ সহজ, কিন্তু অর্থ তার গূঢ়। (২) প্রসাদ—স্বচ্ছতা, যে ভাব চাপা আছে তা সহজ কথায় প্রকাশ হয়, আর বেশ সহজে বোঝা যায়। (৩) সমতা—সব বেশ মিলান। কোথাও কোন জাড়-চোর নেই—না ভাবের, না কথার। (৪) সমাধি—সবটা যেন এলিয়ে পড়েছে, সব শিথিল হয়ে আসছে, অথচ তার মধ্যে একটা গভীরতাও আছে। (৫) মাধুর্য্য—মিষ্টতা। যেখানে বাক্য বার বার শুনলেও কানে খারাপ না লেগে বরং মিষ্ট লাগে। (৬) ওজস—শক্তি, অর্থাৎ বড় বড় সমাসযুক্ত পদ দিয়ে বাক্যের মাধুর্য্য ও শক্তি বাড়ান। (৭) সৌকুমার্য্য—নরম, যেমন ফুলের মতন। যেমন একটা নরম মধুর ভাব মধুর কথা দিয়ে প্রকাশ করা। (৮) অর্থব্যক্তি—সহজে ভাব-প্রকাশ যা অল্পকথায় প্রকাশ করা শক্ত, তাকে পরিচিত, জানা শব্দ দিয়ে বস্তুর সেই ভাব প্রকাশ করা। (৯) উদার—উঁচুভাবের কথা। অর্থাৎ যেখানে অতি-মানুষের ভাব প্রকাশ করা হয়, তার উৎকর্ষ দেখান হয়। (১০) কান্তি—শ্রী। কান ও মন দুই যাতে তৃপ্তি পায়।

যতগুলি গুণের কথা বলেছেন, ততগুলি দোষের কথাও বলছেন—

(১) গূঢ়ার্থ—ঘুরিয়ে নাক দেখান। (২) অর্থান্তর—অসংলগ্ন বাক্য বা অযথা অন্ত কথা বলা। (৩) অর্থহীন—অসম্বন্ধ কথা বা অনেক মানে এক সঙ্গে জড়ান। (৪) ভিন্নার্থ— অসভ্য বা গ্রাম্য, আর যে ভাব প্রকাশ করা উচিত তা না করে অন্ত ভাবে প্রকাশ করা। (৫) একার্থ—এক কথা বার বার বলা। (৬) অভিপ্লুতার্থ—কতকগুলি কথা বা পদ, যা অসম্পূর্ণ বাক্যে ভরা। (৭) ন্যায়াৎ অপেতম্—ন্যায় থেকে ভুল হওয়া, ভুল বিচার (প্রমাণ বর্জ্জিত)। (৮) বিষম—ছন্দতালে ভুল। (৯) বিসন্ধি—কথার সঙ্গে যে কথা গাঁথা বা যোগ তার ঠিক মিলন নেই। (১০) শব্দহীন—ব্যাকরণ-ভুল শব্দ ব্যবহার।

ভরত এই যে গুণ ও দোষ দেখিয়ে দিলেন, আর তার ভাগ করলেন তার বনেদে কতখানি বিচার

আছে, সেটা ভাববার কথা ; আর এই যে ভাগ করে দিলেন পরের আলঙ্কারিকরা তা যে মেনে না চলেছেন তা একেবারে নয়।

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকরা যে 'রস' শব্দ ব্যবহার করেছেন, সে রস-বিচার ভরতে খুব পরিস্ফুট নয়। সেইজন্তে পরের আলঙ্কারিক, যেমন রাজশেখর, ভরতকে রস সম্বন্ধে বড় মানতে চান নি, নাট্যকলার কথা কিছু মানতে চেয়েছেন। ভরতের রূপকই হল নাটক।

কথা হচ্ছে এই যে, এই রস শব্দ অনেক আগের যুগের কথা। আর তার গোড়া হচ্ছে সেই 'রসঃ বৈ সঃ'। অথচ উপনিষদ কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে নয়। সেই রস কাব্য-স্বষ্টিতে কি ভাবে এসেছে তা আমরা পরে দেখাব। এখন ভরতের রস সম্বন্ধে কতটুকু পাওয়া যায়, তাই দেখা যাক। তিনি বলেছেন, ভাব হচ্ছে সকল রসের গোড়া। তার প্রকাশ হয়, বাক্, অঙ্গ, আর অন্তঃকরণের ভেতরে যে রূপ নেয় তাই দিয়ে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, ভরত নাটক সম্বন্ধেই বেশী কথা বলে গেছেন। ভরতের এই রস-বিচার এখানে না বলে, পরের আলঙ্কারিকদের ভাব-বিচারের সঙ্গে একসঙ্গেই বলতে চেষ্টা করব, কেন না—ভরতের এই রস-বিচার থেকে তাঁরা অনেক ভাঙ্গ-চোর করে নিয়ে এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছেন, যা পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-দর্শনের রস-বিচারে এসে মিশিয়ে গেছে। আর এ কথাটাও বলা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, ভরত তাঁর রসপর্ব্ব নন্দীকেশ্বরের কাছ থেকেই পেয়েছেন বা নিয়েছেন।

ভরত রসকে আট ভাগ করেছেন। তার মধ্যে চারটি হল প্রধান, তারা এই—শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর, বীভৎস আর বাকী চারটি ওই থেকেই উৎপত্তি হয়েছে, তারা হল হাস্য, করুণ, ভয়ানক ও অদ্ভুত। হাস্ত এলেন শৃঙ্গার থেকে, করুণ এলেন রৌদ্র থেকে, ভয়ানক এলেন বীভৎস থেকে, আর অদ্ভুত এলেন বীর রস থেকে।

কিন্তু এই যে রস ও রসসৃষ্টির বিচারের কথা বলা হল, এর পিছনে যে দার্শনিক ভিত্তি ছিলে আজকালকার মন ও বুদ্ধি গ্রহণ করে, সে বিষয়ে কিছুই পাওয়া যায় না। শুধু কতকগুলো ধারা সৃষ্টি করে দিলেন, তাই দিয়ে কাব্য বিশেষতঃ নাটকের বিচার করতে হবে। ভাবের মধ্যে আবার অনুভাব, বিভাব, স্থায়ীভাব ব্যাখ্যার কথাও আছে। যা থেকে পরে পরে ভরত মনস্তত্ত্বের একটা আলোচনা করেছেন। কিন্তু কাব্যের বা এই সাহিত্য-স্বষ্টির কারণটা যে কি, তা গ্রীকো-রোমীয় দার্শনিক ও আলঙ্কারিকদের মত তিনি বিশেষ করে কিছু বলেন নি।

ভরতের পর এলেন ভামহ আর দণ্ডী, এঁরা দু'জনেই প্রায় সমসাময়িক এবং মতেও পরস্পর বিরোধী। ভামহ এসে বললেন, কাব্যের একটা প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন কি ? তার ফল কি—

ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষেষু বৈচক্ষণ্যং কলাসু চ।
করোতু কীর্ত্তিং প্রীতিঞ্চ সাধুকাব্যনিষেবণাৎ॥

কাব্য বলতে, ভামহ সাধুকাব্য বলেছেন। আর সাধুকাব্য নিষেবণ করলে কি হয়, না—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গ ত' হয়ই, তার উপর হয় প্রীতি আর কীর্ত্তি।

কাব্যের ফল হল চতুর্ব্বর্গ। তাতে প্রীতিও আছে, কীর্ত্তিও আছে। পরবর্ত্তী অভিনবগুপ্ত বলেছেন, শুধু তাই নয় চতুর্ব্বর্গ ত' বটেই—'ইতি তথাপি প্রীতিরেব প্রধানম্' অর্থাৎ এই সবই ঠিক, তথাপি প্রীতিই হল প্রধান।

ভরতও তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ওই ধাঁজের কথাই বলেছেন, ক্রীড়নকম্, বিনোদ-করণম্ অর্থাৎ অভিনয় হল খেলা, আর তা চিত্তবিনোদ করে। ভরত, ভামহ ও অভিনবগুপ্তের অনেক পরে বিদ্যাধর বলেছেন তাঁর 'একাবলী' গ্রন্থে যে, বেদ হল—'প্রভু-সম্মিত', ইতিহাস হল 'মিত্র-সম্মিত', কাব্য হল 'কান্তা-সম্মিত'। অভিনব

আবার বলেছেন 'জয়-সম্মিত'। কাব্যের কাজ হল রসসৃষ্টি ; আর তার ফল হল প্রীতি অথবা আনন্দ। মোটের উপর এই হল কাব্যের সেকালের চরম কথা। অভিনবের মতে কাব্য হল জয় করার মত।

এর সঙ্গে আমরা গ্রীকো-রোমীয় তত্ত্বের কিছু সাহায্য পেতে পারি। য়ুরোপ যাকে Hedonistic Moral Theory বলছে অর্থাৎ আনন্দ ও নীতির ভাবের তত্ত্বকথা। প্লেটো যে সত্য ও সুন্দর বলেছেন, ঠিক সে দিক কিন্তু নয়, প্লেটোর নীতির দিক বরং এতে আছে—কারণ ভামহ বলছেন 'সংকাব্য নিষেবণ'—সাধুকাব্য।

দণ্ডী বলছেন তাঁর 'কাব্যাদর্শে'—

"ইদং অন্ধং তমঃ কৃতস্নম্ জায়েত ভুবনত্রয়ম্।

যদি শব্দাহ্বয়ম্জ্যোতি আসংসারম্ ন দীপ্যতে॥"

এই আলো, যাকে বলি বাক্য, তা যদি কিরণ না দিত, তা'হলে এই তিন লোক অন্ধতমে ডুবে যেত।

বাক্য যে আলো, একথা ওদেশের সাহিত্যেরও হল গোড়ার কথা, In the beginning there was Word,.........

বামন বলছেন,

"কাব্যং সদৃষ্টাদৃষ্টার্থম্ প্রীতিকীর্তিহেতুত্বৎ"

কাব্য, প্রীতি ও কীর্তির হেতু, এর ফল দু' রকম, দেখাই হোক বা অদেখাই হোক।

তারপর বলছেন মম্মট—

কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।

সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তা সম্মিত তয়োপদেশযুজে॥

কাব্য যশদান করে, সংসারের ব্যবহার শিখায়, অসৎকে শিবেতর করে দূর করে দেয়, সদ্য আনন্দ দান করে। কি রকম? না কান্তা-সম্মিত, প্রিয়তমার মত আনন্দ ও উপদেশ দুই দেয়।

(ক্রমশঃ)

কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি, কেহ বা বিষয়-জ্ঞান উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন,—আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারো সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না,—বিরোধে ফলও নাই।

— রবীন্দ্রনাথ

রাখালী মেয়ে

বন্দে আলী মিয়া

রাখালী সে মেয়ে থাকে বালুচরে পদ্মানদীর পার,
উহারে ঘেরিয়া জলের পরীরা গান গায় বার বার ;
বাতাস তাহার চুলেরে দোলায়—আলো চলে সাথে সাথে
উহার পায়ের চিহ্ন লইয়া বালুতট মালা গাঁথে।
মেঘ-কালো-মেয়ে কুচ্‌কুচে মুখ—নিটোল সকল গাও
চক্ চক্ করে রোদের আঁচেতে লিক্‌লিকে হাত পাও—
দুই চোখে ওর মাটির মমতা অঢেল করুণা ঝরে
পায়ে পায়ে ওর ফুটে যেন ওঠে চেঁপ্‌ ফুল থরে থরে।

বিহানের রোদ আসিয়া পড়ে সে ওদের বাব্‌লা গাছে
পাতায় পাতায় আলোর শিশুরা হাত ধরে ধরে নাচে।
সেই বেলা উঠি ধামা কাঁখে নিয়ে রাখালী চরেতে যায়
গোবর শুকায়ে হইয়াছে ঘুঁটে—কুড়াইয়া লয় তায়।
এ গাছে সে গাছে ফুটিয়াছে ফুল কাঁটা-গাঁথিলার বনে
সোনালি সে ফুল তুলে তুলে নিয়ে মালা গাঁথে সযতনে ;
গলায় পরে সে পরে দুই হাতে খোঁপায় গুঁজিয়া পরি
দেমাক্ করিয়া নেচে নেচে চলে আল্‌পথ ধরি ধরি।

গাঙের কিনারে আসে বেলা হলে—আসে সে ধামাটি কাঁখে
ঘোলা জলে সব শিশু ঢেউ দল হাত তুলে তায় ডাকে ;—
চরের যতেক পাখীর পালক হেথা সেথা পড়ে রয়
কুড়ায়ে কুড়ায়ে আঁটি বাঁধে আর বালু মাখে দেহময়।
ছোটো আর বড়ো নানান্ রকম শামুক কুড়ায়ে নিয়া
ঝিনুকের সাথে রাখে এক ঠাঁয় আঁচলেতে গেরো দিয়া।

পানির কিনারে ছোটো বালুকণা চক্ মক্ চক্ করে
তারে ঘিরে ঘিরে পদ্মার ঢেউ আছাড়ি জমিনে পড়ে ;—
ভেয়া উড়ে যায়—উড়ে চলে চখা—বক ওড়ে সারি সারি
মেঘ দল বেঁধে চলে যায় ভেসে দেশ হতে দেশ ছাড়ি।
রাখালীর মন ছোটে ওর সাথে চড়ি মেঘ ভেলা 'পরে
সেইখানে আজ রাজার কুমার ঘুম যায় অকাতরে।
চান সেরে ঘরে আইসে রাখালী দুপহর অবেলায়
ওর চারিধারে দিক্-সীমা যেন ঝাঁ ঝাঁ করে হতাশায়।
পদ্মার চরে ভরে আছে যেন বালি আর শুধু বালি,
কোনো ক্ষেতে ধান—কোথায়ো চোতেলি—
কারু ক্ষেত আছে খালি
সবুজে হলুদে মেশামিশি আর নীল সাথে ধূপ্‌ছায়া
রঙে আর রঙে মিলিয়া যেন সে গড়িয়াছে রূপ-মায়া।

কদ্‌বাঁশী নিয়ে দূরের মাঠেতে রাখাল বাজায় গান
উহার সুরেতে জেগে ওঠে আজ রাখালীর মন প্রাণ।
ভাটেল বেলায় থামে গান তবু চেয়ে রয় দূর পথে
অজানা সুরের স্বপন মোছে না দু'টি তার আঁখি হ'তে।

অফর বিহানে কোনো কোনো দিন নিরজনে বসি বসি
রাখালী ভাডায় ছোটো বোনেদের ছেঁড়া চুল দিয়ে দশি ;
বাদল দুপুরে কোনো কাজ হাতে যখন রহে না আর
বসে একা একা সফেদ পাটেতে বুনে যায় সিকা-হার—
মাথা নীচু করে দু'হাতে ভাডায়—গান গায় আনমনে
কত কথা তার ভিড় করে আসে কিশোর বুকের কোণে।

'—সকলি গরল ভেল'

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

একদিন কাল-বৈশাখীর অপরাহ্নে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথম ঝাড়া উঠিল সরকারদের গৃহ-অঙ্গনে।

ছোট ভাই রামতারণ গোয়ালের আগড়ের নিরেট এবং পরিপক্ব বংশদণ্ডখানা ভীম-বিক্রমে উঁচাইয়া ধরিয়া বড় ভাই রামতারকের উদ্দেশে বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা করিল যে, হয় সেই বংশ দ্বারা তাহার অগ্রজের মস্তক চূর্ণ করিবে এবং তজ্জন্য সে নিজে ফাঁসি যাইতে হয় যাইবে, আর নয় ত—ইত্যাদি।

'নয় ত'-র সূত্র টানিয়া যে ভাবে রামতারণ তাহার বক্তব্যের উপসংহার করিল, তাহার অর্থ এইরূপ দাঁড়ায় যে, নয় ত সে কলুদের নিকট হইতে আদায়ী খাজনা ৪৮/৭॥ গণ্ডার অর্দ্ধেক অংশ রামতারকের নিকট হইতে কড়ায়-গণ্ডায় ভাগ করিয়া লইয়া তবে ছাড়িবে। অর্থাৎ খাজনার চুল-চেরা ভাগ পাইলে আর মাথা চিরিবার আবশ্যক হইবে না।

পাঠক-পাঠিকাগণের সকলেই যদি জ্যোতিষ-গণনায় সিদ্ধ হইতেন, তাহা হইলে তদ্বারা সহজেই জানিতে পারিতেন যে, রাগের কারণটা ঠিক খাজনার ভাগ লইয়া নহে। আদি এবং অকৃত্রিম কারণ ভুলু ঠাকুর্দ্দা।

দুই ভাই—তারক ও তারণ একঅন্নে না থাকিলেও এযাবৎ ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন গোলযোগের সৃষ্টি হয় নাই। উঠানে রাং-চিত্রার বেড়া দিয়া, বাড়ী তুল্যাংশে ভাগ হইয়া গিয়াছিল। তবে হয় ত রাং-চিত্রার ক্ষুদ্র রাঙ্গা ফুল, কোনদিন দুই-চারিটা ওদিকে বেশী ফুটে, কোনদিন বা দুই-চারিটা এদিকে বেশী ফুটে। তাহাতে ত্যাগস্বীকার উভয়পক্ষ বরাবরই করিয়া আসিতেছে। ক্ষেত-খামার, পড়া-পতিত, নগদ-টাকা, তৈজস-পত্র—তাহাও সব ভাগা-ভাগি হইয়া গিয়াছিল। ঘরের আসবাব-পত্র, ঝাঁটা-কুলা, দা-কোদাল-কুড়ুল—কিছুরই ভাগ-বাটোয়ারা হইতে বাকী ছিল না। কুকুরটা পড়িয়াছিল তারকের দিকে, সুতরাং বিড়ালটা লইয়াছিল ছোটবৌ। টিয়া পাখীটার সম্বন্ধে কোন কিছু সুবিধা না হওয়াতে বড়বৌ তাহার খাঁচার দরজা খুলিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিয়াছিল। সুতরাং গোলযোগের কিছুই ছিল না। সে সময় কথঞ্চিৎ গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ গৃহদেবতা। পাড়ার পাঁচ জনে ৬ মাস করিয়া ঠাকুরসেবার পালা যখন উভয়কে ভাগ করিয়া দেয়, তখন বড়বৌ ঝঙ্কার দিয়া কহিয়াছিল—"বোশেখ-জষ্টির কাট-ফাটা রোদ্দুর আর আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষার সেবা পড়লো আমার পালায়, আর ছোট রাণীর পড়লো গিয়ে ঝরা-শুকনো শীতকাল আর ফাগুন-চোতের ফুর-ফুরে দক্ষিণে হাওয়ার দিনে। মরে যাই আর কি! মাস-ভাগের বদলে, ঠাকুরকেই ভাগ করে দেওয়া হোক। আমি লক্ষ্মীকে নোব, ও নারায়ণকে নিয়ে যাক।" ছোটবৌ সমান সুরে উত্তর দিয়াছিল,—"তাই হোক। কিন্তু আমার নারায়ণের চেয়ে লক্ষ্মী যতটা ভারে বেশী হবে, ততখানি আমি লক্ষ্মীর অঙ্গ থেকে—।" বাকীটুকু আর ছোট-বৌয়ের মুখ ফুটিয়া বলিবার ভরসা হয় নাই। রাগের মাথায় দেবতার সম্বন্ধে যেটুকু সে বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারই জন্য তিন দিন ধরিয়া তাহার দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। অবশ্য ব্যাপারটা পরে মিটমাট হইয়াই গিয়াছিল। সুতরাং ইহাদের মধ্যে নূতন করিয়া গোলযোগের কিছুই ছিল না। কলুদের জমিটা ইহাদের কাহারও নহে। স্বর্গীয় প্রিয় ঘোষালের দেবোত্তর সম্পত্তি, কি একটা ফিকির-ফন্দি করিয়া গত বৎসর তারক ইহা হস্তগত করিয়াছে এবং তাহারই খাজনা ৪৮/৭॥ উপলক্ষে তারণের অহঙ্কার এই 'হয় ত' এবং 'নয় ত'র আস্ফালন।

উপলক্ষের কথা ছাড়িয়া লক্ষ্যের কথা বলিতে গেলে ভুলু ঠাকুর্দ্দার কথাটাই সর্ব্বাগ্রে বলিতে হয়।

ভুলু ঠাকুর্দা—অর্থাৎ ভোলানাথ সরকার। ইহাদেরই জ্ঞাতি ঠাকুর্দা। বহুকাল যাবৎ তিনি গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ বিদেশে বাস করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন। এক্ষণে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুকাল নিকটবর্তী জানিয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বৎসর দশ-বার হইল স্ত্রী গত হইয়াছেন। সংসারে আর কেহ ছিল না। সুতরাং তিনি নিজে এবং তাঁহার আজীবনের সঞ্চিত অর্থে সিন্দুকটি লইয়া তিনি তাঁহার বহুদিন পরিত্যক্ত ভবনে ফিরিয়া আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বহু বৎসরের অবসরে গৃহের সকল ঘরগুলাই সংস্কারাভাবে ভূমিসাৎ হইয়াছিল। তাহারই একখানাকে কোন রকমে বাসোপযোগী করিয়া লইয়া তিনি মাস তিন চার হইল বাস করিতেছেন। তাঁহার আহারাদি, পরিচর্য্যা, সেবা-শুশ্রূষার ভার লইয়াছে তারক।

ঠাকুর্দার সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ সম্বন্ধে গাঁয়ের লোকে নানা রকম কথা বলিয়া থাকে। কেহ বলে—এক লাখ, কেহ বলে—পঞ্চাশ হাজার। ভুলু ঠাকুর্দা নিজে মৃদু মৃদু হাসিয়া বলেন—"ওরে বাপু, অত টাকা থাকবে কোথা থেকে। হাজার আট-দশ টাকা আমার পুঁজি। তাই ব্যাঙ্কে-ফ্যাঙ্কে আর রাখি না, কবে ফেল মেরে এই বৃদ্ধ বয়সে আমায় পথে বসাবে! এখন এই মরণকালে যে আমায় দু'টি তৈরী ভাত দেবে, দেখবে-শুনবে, সেবা-যত্ন করবে, তাকেই আমার ঐ যা কিছু আছে দিয়ে যাব। তা তারক ভাই আমায় যে রকম সুখে-স্বচ্ছন্দে রেখেচে, তাকেই সব দিয়ে যাব।"

তারক ভাইয়ের এই অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনাই তারণ ভাইয়ের মনকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। আট-দশ হাজারই যদি হয়, সেও ত বড় কম নয়। তারক হঠাৎ এত বড় একটা দাঁও পাইয়া গেল, ইহা তারণের একেবারেই অসহ্য। ছোটবৌয়ের ততোধিক। তাই সামান্য এক-আধটুকু উপলক্ষ লইয়া দু'তরফে আজকাল প্রায়ই সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সংঘর্ষটা দুই বউয়ের মধ্যেই বেশী হয়; তারণও মাঝে মাঝে গর্জ্জাইয়া আসে। কিন্তু তারক চুপ-চাপ। তাহার বেশী হাঁক-ডাক নাই। অদূর ভবিষ্যতে ভুলু ঠাকুর্দার অর্থ-প্রাপ্তির আনন্দে সে স্থির, ধীর এবং গম্ভীর।

সেদিন যৎকালে বংশদণ্ড হাতে লইয়া তারণ উঠানে তাহার রাং-চিত্রা বেড়ার সীমানার ধারে আসিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল, তখন তারক ঘরের মধ্যেই ছিল। বড়বৌ আসিয়া কহিল—"কি গো, শুনতে পাচ্ছ না?"

তারক জানালার ধারে বসিয়া বাহিরের দিকে কি দেখিতেছিল, কহিল—"পাচ্ছি বই কি!"

"কি পাচ্ছ?"

স্থির, ধীর, গম্ভীর তারকের রসিকতা করার অভ্যাস কিন্তু ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা ছিল। তারক বড়বৌয়ের প্রশ্নে কোন উত্তর না দিয়া, কৌতুক দৃষ্টিতে শুধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বড়বৌ আবার জিজ্ঞাসা করিল—"বল না,—কি পাচ্ছ?"

তেমনিভাবে চাহিয়া থাকিয়া, মুখ ও চোখের ভঙ্গীর সহিত তারক কীর্ত্তনের সুরে মৃদু মৃদু গাহিল—

"যেন, মুরলীর ধ্বনি শুনি গো—
পায়ের নূপুর, রুনু ঝুনু ঝুনু
তার সাথে মিশে বাজে গো॥"

বড়বৌ রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ওদের এত বড় একটা ব্যাপারে এ-পক্ষ যে এমনভাবে চুপ চাপ থাকিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া লইবে, ইহা সে কোনমতেই সহ্য করিতে পারিল না।

তারক ও তারণদের এক পাঁচিলেই ভুলু ঠাকুর্দার বাড়ী। দুই বাড়ী এক করিয়া অন্দরের প্রাচীরে দরজা লাগান হইয়াছে। তারকের দিকেও হইয়াছে, তারণের দিকেও হইয়াছে। সেই দরজা দিয়া বড়বৌ ঝড়ের মত ঠাকুর্দার ঘরে গিয়া হাজির হইল। ঠাকুর্দা তখন গড়গড়ায় ধূমপান করিতেছিলেন, দুই বউ তাঁহার সহিত নিঃসঙ্কোচে কথা কহিত। বড়বৌ কহিল—"সব

শুনলেন ত ঠাকুর্দ্দা, কি রকম হুমকীর বহর! কলুদের জমিখানা কি কারও পৈতৃক? শিবু কলুর ঐ জমিখানা কত ফিকির-ফন্দী করে গেল বছর উনি……। এ সব কাণ্ড, শুধু ছোটবৌয়ের পরামর্শে জানবেন। সংসারটাকে জ্বালিয়ে দিলে—জ্বালিয়ে দিলে!"

ছর্-ছর্ করিয়া পিছন হইতে তাহার মাথায় এক ঘটি জল ঢালিয়া দিয়া ছোটবৌ কহিল—"জ্বালিয়ে যেমন দিয়েছি, তেমনি জল ঢেলে ঠাণ্ডা করি। মরণ আর কি! ফাঁকি যদি দিবি, 'হা অন্ন—যো অন্ন' করে মরতে হবে। এত দর্প, এত তেজ ভগবান সইবেন না।"

চক্ষের নিমেষে ছোটবৌ অদৃশ্য হইয়া গেল।

খিড়কীর ঘাট হইতে বড় এক ঘটি জল হাতে করিয়া বাড়ী ঢুকিবার সময় বড়বৌকে ঝড়ের মত ঠাকুর্দ্দার ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া কখন যে ছোটবৌ সকলের অলক্ষ্যে দরজার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। সুতরাং সহসা ছোটবৌয়ের এই কাণ্ড দেখিয়া, ঠাকুর্দ্দা ও বড়বৌ উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত হতভম্বের মত উভয়েই নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

খিড়কীর পুকুরের পচা জল মাথায় ঢালার অপমান বড়বৌয়ের শেলের মত বাজিয়াছিল। এ অপমান সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। তারককে কহিল—"দেখ, তুমি যদি এর কিছু বিহিত করতে না পার, ত তোমার ভাই-ভাদ্দরবৌকে নিয়ে তুমি থাক, আমাকে নারাণপুরে পাঠিয়ে দাও।"

নারাণপুর—অর্থাৎ বড়বৌয়ের বাপের বাড়ী।

পরদিন সকালে তারক ভুলু ঠাকুর্দ্দাকে ঔষধ খাওয়াইয়া তাঁহার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছিল। পাড়ার বিমু ঘোষাল, হর চক্কোত্তি এবং দত্তদের মেজকর্ত্তাও সেখানে বসিয়াছিল। ঠাকুর্দ্দা মেজকর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তুমি যা বলচ তিনকড়ি, মন্দ যুক্তি নয়। কিছু টাকা—অর্থাৎ হাজার পাঁচ-সাত গাঁয়ের মধ্যে সুদে খাটালে কিছু কিছু আসে বটে। তবে কি জান বাবা, যে রকম শরীর গতিক আজকাল বুঝতে পারছি, তাতে করে কবে একদিন পীগ্‌পিরই পটল তুলে বসবো। তখন টাকাগুলো তুলতে তারক ভাইকে আমার বেগ পেতে হবে। তবে, তোমরা পাঁচজনে যদি পরামর্শ দাও, না হয় তাই করা যাক। কিন্তু আমি মনে করি যে, আমার ঐ সিন্দুকে যা আছে, তাতে আমার মন ভরা আছে, তারক ভাইকে কোন কষ্ট পেতে হবে না। তবে, ওকে আমি বলে রেখেছি, আর তোমাদেরও সকলের সামনে বলছি, নারাণপুরের বৌকে যেন আমার টাকা থেকে দু'টি হাজার টাকার গয়না গড়িয়ে দেওয়া হয়।"—বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। পার্শ্বে রক্ষিত গামছা দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল—"নিজের পুত্র-কন্যা নেই বটে, কিন্তু থাকলেও, এই অসময়ে এমন সেবা-যত্ন বোধ হয় তাদেরও দ্বারা হোত না। আশীর্ব্বাদ করি, আমার ডবল পরমায়ু নিয়ে যেন এরা দু'টিতে বেঁচে থাকে।"

চক্কোত্তি মশায় জিজ্ঞাসা করিল—"রাত্রে কি খান?"

ঠাকুর্দ্দা কহিলেন—"খানকতক লুচি, একটু মিষ্টি, আর আধসের-টাক দুধ। মিষ্টি আর এ পোড়া-গাঁয়ে কি-ই বা পাওয়া যাবে! তবু তারক ভাই হাট থেকে বাস্না দিয়ে, সরেস যা সন্দেশ আর রসগোল্লা, তাই আমার জন্যে নিয়ে আসে। আমার জন্যে ও কি কম করছে? বিকেলে ডাক্তার ফল খেতে বলেচে, তা তারক সমানে কোলকাতা থেকে ভাল ভাল ফল আমার জন্যে আনাচ্চে। তাই ত বলছিলুম যে, নিজের ছেলেতেও এত করত না।"

এমন সময় ভিতর দিক হইতে দরজার কড়া-নাড়ার শব্দ হওয়াতে তারক উঠিয়া গেল ও এক হাতে একখানি জলখাবারের রেকাবী এবং আর এক হাতে এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিয়া ঠাকুর্দ্দার সম্মুখে রাখিল। ঠাকুর্দ্দা কহিলেন—দেখ দেখি, একবার নাত-বৌয়ের কাণ্ডটা! ওই অতগুলো মিষ্টি, আবার এই

এতটা হালুয়া। মিষ্টির মুখে চা মিষ্টি লাগবে না বলে পাঁপরও ভেজে দিয়েছে। নাতবৌ আমার—”

তারক জিজ্ঞাসা করিল—“একবাটি গরম দুধ দেবে কি?”

“হাঁ, সব আমায় খাইয়ে তোরা দু'জনে দাঁতে দাঁত দিয়ে থাক। একবাটি চা খাব, আবার গরম দুধ কেন? তবে বলচ যখন, তখন আধ বাটি-টাক না হয় নিয়ে আয় ভাই। একটু না খেলে যে তোরা ছাড়বি না, তা জানি।”

তারক দুধ আনিতে পাঁচিলের দরজা দিয়া নিজের বাড়ীর মধ্যে গেল।

তারণ দোকান হইতে বড় এক ভাঁড় তেল হাতে ঝুলাইয়া খিড়কী দিয়া বাড়ী ঢুকিতেছিল। ছোটবৌ তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া কহিল—“বুড়োর অসুখ বোধ হয় সকালে বেড়েচে, পাড়ার সব এসে টাকা-কড়ির কি সব ব্যবস্থা হচ্চে। এই সময় একবার যাও না। ঘরের ভেতর চুপচাপ বসে থাকলে কি হবে। ওদের ত একলার ঠাকুর্দ্দা নয়। শীগ্‌গির যাও একবার, যদি কিছু—”

ছোটবৌয়ের তাড়াতে তারণ সেই অবস্থাতেই অর্থাৎ তেলের ভাঁড় হাতে লইয়াই তাঁহাদের দিকের পাঁচিলের দরজা খুলিয়া উঁকি দিয়া দেখিল যে, তারক ঘরের মধ্যে নাই। তারক না থাকিলে সে মধ্যে মধ্যে আসিয়া ঠাকুর্দ্দার কাছে বসিত। তারণ ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কেমন আছেন আজ, ঠাকুর্দ্দা?”

তারক ঘরে ঢুকিতেছিল। তারণের প্রশ্নের উত্তর পিছন হইতে সে-ই দিল, কহিল— “ভাল!” বলিয়াই তারণের হাত হইতে ক্ষিপ্রগতিতে তেলের ভাঁড়টা ছিনাইয়া লইয়া, তাহার সমস্ত তেলটা তারণের মাথায় ঢালিয়া দিয়া কহিল—“কিন্তু তোমাদের ব্যাধিটা এখন সেরে গেলেই বাঁচা যায়।”

তারণের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত, আড়াই সের তেলের স্রোত বহিতে লাগিল। ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া সে হুঙ্কার দিয়া উঠিল—“দেখুন একবার ঠাকুর্দ্দা।”

তারক কহিল—“ঠাকুর্দ্দাও দেখুন, এঁরাও সকলে দেখুন। এতেও যদি না হয়, তখন সাহেব ডাক্তারকেও দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তোমরা দিন দিন যে রকম টগ্ বগ্ করে ফুলে ফেঁপে উঠছ, তেলই হচ্ছে তার একমাত্র ওষুধ। এ বিজ্ঞানেরই কথা। যার পরামর্শ শুনে লাফা-লাফি, দাপা-দাপি সুরু করেছ, তাকেই জিজ্ঞাসা কর গিয়ে, বেশী আঁচে ডাল-ঝোল ফুলে-ফেঁপে উত্‌লে উঠলে তৈল-প্রক্ষেপেই তার নিবৃত্তি।”

তারণ কট্‌ মট্‌ করিয়া তারকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া রাগে ফুলিতে লাগিল। বিনু ঘোষাল, হর চক্কোত্তির দল উঠিয়া পড়িয়া আপন আপন জুতা খুঁজিতে লাগিল এবং ভুলু ঠাকুর্দ্দা খাবারের রেকাবী-খানার উপর দৃষ্টি আনত করিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

মিনিট দশেক পরে তারক যাইয়া বড়বৌকে কহিল—“কালকের জল ঢালার দাগ আজ তেল দিয়ে তুললুম।”

তৈল-প্রক্ষেপের ফলে বৈজ্ঞানিক কারণে কিছুদিন যাবৎ অবস্থা প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াই ছিল। মধ্যে মধ্যে একটু-আধটু বিক্ষোভ যাহা ঘটিত, তাহা প্রবলও হইত না, স্থায়ীও হইত না। যে সময় ঠাকুর্দ্দার রোগ বৃদ্ধি পাইয়া অবস্থা একটু খারাপ হইয়া পড়িত, সে সময়টা বড়বৌয়ের প্রকৃতিতে হঠাৎ প্রসন্নতার একটা ভাব দেখা দিত এবং অপর দিকে ছোটবৌয়ের মেজাজটা একটু বিগড়াইয়া যাইত। আবার ঠাকুর্দ্দা একটু ভালর দিকে ফিরিলে উভয় বধূর এই অবস্থার বিপরীত পরিবর্ত্তন ঘটিত। একদিন রাত্রে ঠাকুর্দ্দার হঠাৎ বুকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হয়। ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে সে যন্ত্রণা ছোটবৌও সমানে ভোগ করিতে থাকে। ছোটবৌ

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কেবলই সে রাত্রে নারায়ণকে ডাকিয়াছিল—"হে নারায়ণ, হে মধুসূদন, ঠাকুর্দার যেন কিছু না ঘটে। ঠাকুর্দা যেন দু'শো বছর বেঁচে থাকে ঠাকুর।" বড়বৌও প্রসন্ন মনে সে রাত্রে ঠাকুরের কাছে মনে মনে নিবেদন করিয়াছিল— "কি আর বোলব তোমায়, একটু কৃপা-দিষ্টিতে চাও হরি; আশায় নৈরাশ কোরো না।"

ভূধর ডাক্তারের ঔষধে সে রাত্রে ঠাকুর্দা সুস্থ হইয়া উঠিলে বড়বৌ ক্ষুণ্ণ মনে তারককে বলিল—"ডাক্তার ভাল বটে কিন্তু ক্যাম্বেলের পাশ ডাক্তার আবার ডাক্তার! যা বল আর যা কও, আমার কিন্তু ভূধর ডাক্তারের ওপর মোটেই ভক্তি নেই। ডাক্তার বটে—আমাদের নারাণপুরের সিধু ডাক্তার।" ছোটবৌ পরদিন প্রাতে খিড়কীর ঘাটে নিস্তারিণী ঠাকুরঝিকে প্রসন্ন মনে জ্ঞাপন করিল,—"ইচ্ছে করে, আমার অসুখ হোক, আর ভূধর ডাক্তারকে দিয়ে চিকিচ্ছে করাই; ডাক্তার বটে! আহা, বেঁচে থাক।"

বাতাস যখন এইরূপ, তখন হঠাৎ একদিন বড়বৌ সমস্ত বাড়ী মাথায় করিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছোট-বৌয়ের চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ করিতে লাগিল। ছোট-বৌয়ের বিড়াল এ বাড়ীর রান্নাঘরের কুলুঙ্গী হইতে হাঁড়ির সরা ঠেলিয়া সমস্ত ভাজা মাছ খাইয়া গিয়াছে। বড়বৌয়ের হুঙ্কারে ও পদভরে খিড়কীর পুকুরের জীয়ন্ত মাছগুলাও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তারককে গিয়া কহিল—"দেখ, মুখ বুজে থাকা ভাল-মানুষির কাজ নয়। এর একটা হেস্ত-নেস্ত না করলে আমি কিছুতেই ছাড়বো না। হয়, এর বিহিত কর, আর নয় আমাকে—".

"আর নয় তোমাকে নারাণপুরে পাঠিয়ে দেবো ত?"

"হ্যাঁ।"

"দু'টোর একটা করা যাবে এখন, নিশ্চিন্ত থাক।"

নিশ্চিন্ত হয়ত বড়বৌ হইল কিন্তু ক্রোধে স্থির থাকিতে পারিল না। বড়বৌয়ের ভাগের কুকুর ভুলো পাঁচিলের ধারে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াছিল। রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তিতে বড়বৌ তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"মুখপোড়া, অকম্মার ধাড়ী কোথাকার! তুমি খালি গিলবে আর শুয়ে শুয়ে ন্যাজ নাড়বে! তুমি ওদের গুষ্টিশুদ্ধুকে চিবিয়ে খেয়ে আসতে পার না?"—বলিয়াই পৈঠার পাশ হইতে কোদালের বাঁটখানা তুলিয়া লইয়া এমন জোরে তাহাকে ছুঁড়িয়া মারিল যে, পিছনকার একটা পায়ে গুরুতর আঘাত পাইয়া সে চীৎকার করিতে করিতে ও খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে খিড়কীর দিকে পালাইয়া গেল।

তারক আসিয়া বড়বৌকে কহিল—"বললুম ত, বিহিত একটা যা হোক কোরবই। তবে আজকে হবে না,—কাল।"

সত্যই ছোটবৌয়ের বিড়াল বড়বৌয়ের রান্নাঘর হইতে যতগুলি ভাজা মাছ ছিল, তাহার সবগুলাই খাইয়া গিয়াছিল। তারকের মনেও ইহার জন্য যথেষ্ট আঘাত লাগিয়াছিল। কারণ সকালে অনেক বেলায় তারক যখন সারখেলদের পুকুর হইতে মাছটা ছিপে ধরিয়া আনে তখন রান্না শেষ হইয়া গিয়াছিল। তবুও বড়বৌ রাঁধিয়া দিবার উদ্যোগ করিতে গেলে তারকই নিষেধ করিয়া বলিয়াছিল যে, ভাজিয়া রাখা হোক, রাত্রে সকলে ভাল করিয়াই খাইবে। সুতরাং তারকেরও মনে ইহাতে যৎপরোনাস্তি ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল এবং তাহার ফলে পরদিন সকালে ঠাকুর্দাকে ঔষধ, জলখাবার, চা ইত্যাদি খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সে শিবু জেলের বাড়ীর উদ্দেশে নিষ্ক্রান্ত হইল।

ঘণ্টা দুই পরে কে একজন আসিয়া তারণকে চুপি চুপি খবর দিল—"তুঁই-পুকুরের মাছ যে সব উজোড় করে দিলে, একটা চুনো-পুঁটিও বুঝি বা রাখলে না।"

তারণ তেল মাখিতেছিল। চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কে?"

"বড় কর্ত্তা।"

সেই তৈলাক্ত দেহেই, বাঁশের লাঠীগাছটা হাতে করিয়া তারণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

ইহারই ঘণ্টাখানেক পরে যখন তারণের রক্তাক্ত দেহ কয়জনে ধরা-ধরি করিয়া আনিয়া রোয়াকের উপর শোয়াইয়া দিল, তখন ছোটবৌ ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওরে, কে এ সব্বনাশ করলে রে?"

তাহাদের মধ্যে কে একজন তারকের ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

* * * *

ও-পাড়ার ভুঁই-পুকুরটা তারণেরই ষোল আনা সম্পত্তি। কয়েক বৎসর হইল সে ইহা চাটুয্যেদের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিল।

তৈলাক্ত কলেবরে বাঁশের লাঠীগাছটা হাতে করিয়া তারণ ছুটিয়া অর্দ্ধপথে শীতলাতলার নিকটে যাইতেই দেখিল যে, শিবু জেলে ও তারক মাছ ধরিয়া ফিরিতেছে! শিবুর কাঁধে জাল ও এক হাতে একটি সের চারি পাঁচ ওজনের রুই। প্রায় ঐরূপ ওজনের আর একটি রুই ছিল তারকের হাতে।

তারণ জ্ঞানশূন্য হইয়াই ছুটিতেছিল। ইহা দেখিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সে সজোরে শিবুর পায়ে এমন লাঠীর আঘাত করিল যে, এক আঘাতেই সে জাল ও মাছ শুদ্ধ পথের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল। শিবুর পড়িয়া যাইবার সঙ্গে-সঙ্গেই তারক তাহার হাতের মাছ মাটিতে রাখিয়া দিল এবং তারণের হাত হইতে লাঠীটা চক্ষের নিমেষে ছিনাইয়া লইয়া তদ্দারা তাহার স্কন্ধোপরি প্রচণ্ড এক আঘাত করিল। পথিপার্শ্বে কতক গুলা ফণী-মনসার ঝোপ ছিল। ভীষণ আঘাতের ফলে তারণ সবেগে তাহারই মধ্যে গিয়া ঠিকরাইয়া পড়িল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। আঘাতটা কানের উপরেও লাগিয়া সেখানটা গুরুতররূপে জখম হইয়াছিল। সেখান হইতেও রক্তধারা বহিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেখানে লোক জমিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তারণের দিকে, কেহ কেহ তারকের দিকে। যাহারা তারণের দিকে, তাহাদের মধ্যে জন দুই-চারি ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাটীতে আনিয়া ফেলিল।

তাহার পর তারণের দলের যাহারা, তাহারা তাহাকে পরামর্শ দানের সহিত উত্তেজিত করিতে লাগিল এই বলিয়া যে, দু'নম্বর ফৌজদারী রুজু করিয়া দেওয়া হোক,—অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক মৎস্য চুরি এবং সাংঘাতিক ভাবে মারপিট, যেহেতু উভয় মকদ্দমাতেই সাক্ষীর অপ্রতুল হইবে না!

তারকের দলের লোকেরা তারককে বুঝাইতে লাগিল—"কি করবে ওরা করুক না। মারপিটের কেসটায় না হয় বড় জোর গোটা পনের কুড়ি টাকা জরিমানা হবে। তবে চুরি কেসটা নিয়েই কথা। প্রমাণ করতে পারলে, অবশ্য—, কিন্তু কি করে প্রমাণটা করে দেখা যাবে।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভুলু ঠাকুর্দ্দা কহিলেন—"এ সব দিন দিন কি হচ্ছে বুঝতে পাচ্চি না। আমি দেখচি, আমাকে উপলক্ষ করেই এদের মধ্যে এই সব গোলযোগ সুরু হোয়েচে। ওরে বাপু, আমার কি-এমন দু'লাখ পাঁচ লাখ আছে যে, তাই নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে লাঠা-লাঠী, মারা-মারি, রক্তা-রক্তি! ঊর্দ্ধসংখ্যা হাজার বিশ-পঁচিশই যদি বা আমার থাকে, ত যার বরাতে আছে সেই তা পাবে। তাই নিয়ে এই রকম—। না বাপু, আমার এ সব ভাল লাগে না। আমি না হয় যেমন ছিলুম, তেমনি কোলকাতায় গিয়ে থাকি গে। দেশের মাটিতে মরা আর আমার ভাগ্যে ঘটলো না।"

বড়বৌ বলিল,—"কি করবে নালিশ মকর্দ্দমা করে, করুক না। তোদের বেড়াল আমার মাছ খেয়ে যায় কেন? নালিশ অমনি করলেই হল আর কি!"

তারক এ ব্যাপারে কিছুই মন্তব্য প্রকাশ করে নাই। সে নালিশ-মকদ্দমার কথা শুনিয়া মনে মনে বেশ একটু ভয় পাইয়াছিল। সে উদ্ধত-প্রকৃতি, চতুর এবং ফন্দীবাজ হইলেও, নালিশ-মকদ্দমাকে যথেষ্ট ভয় করিত। সুতরাং কয়দিন ধরিয়া ছোট-তরফে যখন শলা-পরামর্শ চলিতে লাগিল, বড়-তরফটি তখন দুর্ভাবনা ও ভয়ে

ভাঙ্গিয়া পড়িয়া নীরবে ও উৎকণ্ঠায় দিন কাটাইতে লাগিল।

এইভাবে দুই দিন কাটিয়া গেল।

তৃতীয় দিনে সত্য সত্যই হুগলীর কোর্টে তারকের বিরুদ্ধে দুই দফা নালিশ রুজু হইয়া গেল।

এক দফা, ৩৭৯ ধারা—চুরি, আর এক দফা, ৩২৫ ধারা—গুরুতর মারপিট।

হুগলীর কোর্টে উকীলের নিকট পরামর্শ জানিতে গেলে তারকের উকীল প্রথমে তাহাকে জানাইল, বিশেষ কোন ভয় নাই। তাহার পর সবিশেষরূপে জানাইতে গিয়া জানাইল—"মারপিটের কেসটাতে যদি প্রমাণ হয় ত বড় জোর না হয় গোটা পঁচিশ টাকা জরিমানা হবে। কিন্তু চুরির কেসটাতে—"

তারক উকীলবাবুর মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কিন্তু চুরির কেসটাতে কি হতে পারে?"

তাহার মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছিল। উকীল বলিল—"ওটা ৩৭৯ ধারার কেস কি না। আর বোধ হয় প্রমাণও হয়ে যাবে। সুতরাং—"

তারকের গলার স্বর ধরিয়া আসিয়াছিল, কহিল—"সুতরাং কি হবে?"

"এমন আর হাতী-ঘোড়া কি হবে। মাস ছ'চ্চার—"

বাকী কথা উকীলবাবুর মুখ হইতে বাহির হইলেও তারকের কর্ণে তাহা প্রবেশ লাভ করে নাই। আতঙ্কে তাহার চোখের সামনে যেমন অন্ধকার জমিয়া আসিয়াছিল, কর্ণছিদ্রের মধ্যেও তেমনি কিছু জমিয়া সে পথও যেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

দাঁড়াইয়া উঠিতেই তারকের মাথা ঘুরিয়া উঠিল। তবু সে এক-পা এক-পা করিয়া চলিয়া গেল।

কিন্তু সে আর গৃহে ফিরিল না।

* * * * *

সন্ধ্যার পর ঠাকুর্দার ঘরে বৈঠক বসিয়াছিল।

বৈঠকে ছিলেন ঠাকুর্দা, তারণ, বিনু ঘোষাল, হর চক্কোত্তি, দত্তদের মেজকর্তা প্রভৃতি।

আজ দশদিন হইল তারক নিরুদ্দেশ এবং শুধু নিরুদ্দেশই নয়, আজ চারি দিন হইল কলিকাতা হইতে তাহার মৃত্যুসংবাদ আসিয়াছে। সে ঘৃণায়, লজ্জায়, গ্লানিতে আত্মহত্যা করিয়াছে। আজই মকদ্দমার দিন ছিল। তারণ কোর্টে দরখাস্ত করিয়া মকদ্দমা উঠাইয়া লইয়াছে।

ছোটবৌ বাহিরে শোকাচ্ছন্ন হইলেও ভিতরে যাহাতে আচ্ছন্ন তাহা ঠিক শোক নহে। বরং সুখ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভিতরটাকে সে খুব সাবধানে ও সন্তর্পণে বাহির হইতে লুকাইয়া রাখিয়াছে। পাঁচ জনের কাছে সে চোখ মুছিতে মুছিতে বলিতেছে—"ঝগড়া হোক, ঝাটি হোক, মাথার ওপর একটা ভাসুর ছিল, এমনি পোড়া অদেষ্ট আমার যে—" ইত্যাদি।

বড়বৌ হাতের লোহা খুলিয়া, সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া বৈধব্য-বেশে নিজের ঘরটির মধ্যেই পড়িয়া থাকে, আর মাঝে মাঝে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠে।

কয়দিন হইতে ঠাকুর্দার ভার তারণের হাতেই আসিয়াছিল। তারণ তাঁহাকে কহিল—"আপনার জলখাবার আর চা এনে দি, ঠাকুর্দা? রাত ন'টায় আবার ওষুধটা খেতে হবে।"

ঠাকুর্দা কহিলেন—"সে হবে'খন তারণ। সেবা-যত্নে তুই দেখছি তারককেও হারিয়ে দিলি ভাই।" তারপর দত্তদের মেজকর্তার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"আমি বলি কি, ওই ভদ্রলোককে, যিনি চিঠি লিখে খবরটা দিয়েছেন, একখানা চিঠি লিখে কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার। কেন না, তিনি সংবাদটা না দিলে আমরা হয় ত কিছুই জানতেও পারতুম না।"—কথা কয়টি বলিয়া তিনি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিলেন।

দত্তদের মেজকর্তা কহিলেন—"সেটা উচিত বটে, তাঁর ঠিকানাটা আছে ত?"

তারণ কহিল—"হ্যাঁ; চিঠিতেই তাঁর ঠিকানা দেওয়া আছে।"—বলিয়া পকেট হইতে তারণ চিঠিখানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল।

বিন্নু ঘোষাল কহিল—"হেঁকেই পড় না কেন; হরনাথ ভায়া শোনে নি ক', শুনুক।"

তারণ পড়িল—

"কর্ত্তব্যের অনুরোধে একটি কঠোর দুঃসংবাদ জানাইতে বাধ্য হইতেছি। ক্ষমা করিবেন। আজ দুইদিন হইল রামতারক সরকার নামক একটি লোক আমার আড়তের সম্মুখস্থ মানিকতলা খালের পোলে দড়ি ঝুলাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর হইবেন। কারণ যে স্থানে তিনি আত্মহত্যা করেন, সেই স্থানে মাটির উপর, আমাদের কয়াল ভূতনাথ ঘোষ একখণ্ড কাগজ কুড়াইয়া পায়। সম্ভবতঃ রামতারক বাবুর জামার পকেট হইতে উহা পড়িয়া গিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল—'ভাইয়ের প্রতি দুর্ব্যবহারের লজ্জায় আত্মহত্যা করিলাম।' নীচে তাঁহার নিজের নাম ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ও ঠিকানা লেখা ছিল। পাছে আপনাদের এই দুঃসময়ে আবার পুলিশের এনকোয়ারীর দুর্ভোগ ভুগিতে হয়, এজন্য ঠিকানা লেখা ঐ কাগজটুকু আমরা পুলিশকে না দিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি।

"অদ্যকার দৈনিক কাগজগুলিতেও এই সংবাদটি বাহির হইয়াছে। 'সমাচার-সমুদ্র' হইতে সেই অংশটুকু কাটিয়া এতৎসহ পাঠাইলাম। বিপদে ধৈর্য্য ধারণই জ্ঞানবানের কাজ,—এইটিই এসময়ে মনে রাখিবেন। অধিক আর কি লিখিব—ইতি—

শ্রীব্রজবল্লভ সাহা
৩৮।৩। বি, রামশঙ্কর পালের লেন,
শ্যামবাজার।

"পুঃ—পুলিশ লাস সনাক্ত করিতে না পারিয়া এ বিষয়ে চুপচাপ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনারা কেহ আর এ বিষয় লইয়া এখানে আসিবেন না, তাহাতে হয় ত আবার নূতন করিয়া আপনাদিগকে এই হাঙ্গামায় জড়িত হইতে হইবে।"

পত্রখানি পড়িয়া তারণের চোখে জল দেখা দিল। কোঁচার খুঁটে সে চোখ মুছিতে লাগিল।

বিন্নু ঘোষাল কহিল—"কাগজের সংবাদটুকুও একবার পড়।"

চক্কোত্তিমশাই কহিল—"ও আর শুনে কি হবে! চল — ওঠা যাক, বড্ড অন্ধকারটা হোয়ে পড়ল। আমায় আবার জেলেপাড়ার তেঁতুল-তলাটা দিয়ে যেতে হবে।"

একটা ধমক দিয়া দত্তদের মেজকর্ত্তা কহিল— "তুমি বুড়ো হোয়ে মরতে চললে চক্কোত্তি, তবু তোমার ভূতের ভয় আর গেল না।—পড় পড়,—তারণ, কাগজটুকু একবার পড়।"

'সমাচার সমুদ্রে'র টুকরাটি হাতে লইয়া তারণ পড়িল—

"গত সোমবারে একটি হৃষ্ট-পুষ্ট মধ্যবয়সের বাঙালী ভদ্রলোক মানিকতলার খালের পোলের লৌহদণ্ডে দড়ি খাটাইয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। লোকটির—

বাধা দিয়া চক্কোত্তি কহিল — "আমায় তেঁতুল-তলাটা একটু পার করে দিও বিন্নু ভাই।"

মেজকর্ত্তা কহিল—"তারপর? পড়ে যাও।"

তারণ পড়িতে লাগিল—

"লোকটির বুকে রা-তা-স লেখা একটি উল্কী ছিল। কপালে বাম-ভ্রূর বাঁদিকে একটা বড় জড়ুল এবং মস্তকের সম্মুখভাগে টাক ছিল। দক্ষিণহস্তের অনামিকায় সপ্তধাতু নির্ম্মিত একটি অঙ্গুরীও ছিল। পুলিশের—

মেজকর্ত্তা কহিল—"রা-তা-স-টা এই সে বছর লিখেছিল। তারপর?"

"পুলিসের বহু চেষ্টাসত্ত্বেও লাস সনাক্ত না হওয়াতে, লাস অবশেষে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিন্নু ঘোষাল কহিল— "ও পিঠটাও পড় কি লেখা আছে।"

কাগজটুকু উল্টাইয়া তারণ কহিল — "ও স্পৃষ্ট-

অস্পৃশ্যদের মন্দির-প্রবেশের একটা খবর। কোথায় এই নিয়ে দু' দলে খুব মারা-মারি হোয়ে গেছে। তাই একজন ঠাট্টা করে লিখচে যে, মন্দিরে মন্দিরে সব তালাবন্ধ করে দেওয়া হোক। স্পৃশ্যও ঢুকতে পারবে না, অস্পৃশ্যও ঢুকতে পারবে না। বহুদিন পরে দেবতারা সব একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচুন।"

চক্কোত্তি কহিল—"কোত্থেকে একটা মন্দির-প্রবেশের হাঙ্গামার সৃষ্টি করে দেশটাকে একেবারে—ওরে বাবা গো! ধরলে গো! খেলে গো—গো—গো—ওঁ—ওঁ—ওঁ!" চক্কোত্তি ঠিকরাইয়া গিয়া একেবারে ঘোষালের উপর গিয়া পড়িল।

দত্তদের মেজকর্ত্তা কম্পিত কলেবরে রামনাম উচ্চারণ করিতে করিতে তারণকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার গায়ে ঢলিয়া পড়িল এবং তারণ ডেরিকেনের লণ্ঠন, মেজকর্ত্তা, হুঁকা, বৈঠক ও পিকদানী সমেত সশব্দে গিয়া পড়িল ঠাকুর্দ্দার উপর।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে তখন একদিকে চক্কোত্তির গোঁ-গোঁ শব্দ এবং আর এক দিকে মেজকর্ত্তার মুখ-নিঃসৃত রামনাম ছাড়া আর কাহারো কোন সাড়া-শব্দই রহিল না।

ব্যাপারটা কিন্তু বিশেষ কিছুই নয়। যৎসামান্য। পরলোকগত তারক হঠাৎ স-শরীরে পুনরায় ইহলোকে অর্থাৎ ঠাকুর্দ্দার ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছিল।

তারকের মরণ ও বাঁচনের কাহিনীটা এইরূপ—

তাহার উকিল পর্য্যন্ত যখন তাহাকে জেল হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানাইল, তখনি তারক আর গ্রামে না ফিরিয়া বরাবর কলিকাতায় চলিয়া যায় এবং তথায় একজনকে দিয়া ঐ পত্রখানি লিখাইয়া লয়। তৎপরে কোন এক ছাপাখানা হইতে এক পৃষ্ঠায় স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের কথাটা ও অপর পৃষ্ঠে তাহার নিজের আত্মহত্যার সংবাদটা ছাপাইয়া লইয়া তাহা ওই পত্রের সহিত তারণের নামে ডাকে পাঠাইয়া দেয়। তারপর সে হুগলীতে আসিয়া, কয়দিন কোন স্থানে লুকাইয়া কাটায়। পরিশেষে মকদ্দমার দিন সে যখন খবর লইয়া জানিতে পারে যে, তারণ তাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া মকদ্দমা তুলিয়া লইয়াছে, অমনি সে বাঁচিয়া উঠিয়া বাটী ফিরিয়া আসে এবং হঠাৎ তাহার আগমনে, সেদিন ঠাকুর্দ্দার ঘরে যে কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহা অতীব চমৎকার!

অবশ্য পরে চক্কোত্তি মশায়ের গোঁ-গোঁ শব্দ যদিচ থামিয়া গিয়াছিল এবং দত্তদের মেজকর্ত্তারও কম্পিত কণ্ঠে রাম নাম উচ্চারণের আর আবশ্যক ঘটে নাই কিন্তু বৃদ্ধ, রুগ্ন, ঠাকুর্দ্দার ক্ষীণ দেহের উপর সকলে হুড়-মুড় করিয়া আসিয়া পড়ায়, তাঁহার বক্ষদেশের পঞ্জরে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল। এ কয় দিনে সেই আঘাত-জনিত বেদনা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছিল এবং তদ্দরুণ প্রত্যহই এখন একটু করিয়া জ্বর আসিতেছিল। ডাক্তার নিত্যই আসিতেছে। কিন্তু এই একটু জ্বর ও ব্যথা উপলক্ষ্য করিয়াই হয় ত বা ঠাকুর্দ্দাকে এবার যাইতে হয়, এ আশঙ্কাও তিনি করিতেছেন।

বড়বৌ চোখের জল মুছিয়াছে। আবার তাহার সিঁথিতে সিঁদুর ও হাতে লোহা উঠিয়াছে এবং তাহার বিরস বদনে আবার হাসি ফুটিয়াছে।

সেদিন মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বড়বৌ তারককে কহিল—"ধন্যি যা হোক তুমি!"

তারক গর্ব্বের ভাবে কহিল—"আমি ধন্যি নয় ত কি, তারণ ধন্যি? ও হোল গিয়ে একটা মহা মুখ্যু—আকাট নিরেট;—ওর কি আমার চালবাজীর কাছে দাঁড়াবার সাধ্যি আছে? মকদ্দমা করতে যে তাল ঠুকে গেলি, কেমন—তুলে নিতে হোল ত? গবাকান্ত এটা বুঝতে পারলে না, কোলকাতার কোন জায়গায় কি রামশঙ্কর পালের লেন আছে? ডাইরেক্টারী পাঁজিখানা খুলে দেখবারও বুদ্ধি হোল না? তা' ছাড়া, খবরের কাগজের কাটাটুকু দেখেও ওর ধরে ফেলা উচিত ছিল যে, 'সমাচার-সমুদ্র' পাতলা লালচে কাগজে চিরকাল ছাপা হোয়ে আসচে; ঐ রকম টিটেগড়ের ফুলস্ক্যাপ কাগজে কখন খবরের কাগজ ছাপা হয়?"

তারণ চাল-বাড়ীতে তারকের সমকক্ষ না হইলেও এবং তারক তাহাকে গবাকান্ত বা হবাকান্ত যেরূপ হউক আখ্যা প্রদান করিলেও, ঠাকুর্দ্দাকে সে কিন্তু এবার হস্তগত করিয়া আর পরিত্যাগ করে নাই। অর্থাৎ তারকের অবর্তমানে সে ঠাকুরর্দ্দাকে লাভ করিয়া, তারকের পুনরাগমনে সে ঠাকুর্দ্দার দাবী পরিত্যাগ করে নাই। ফলে, ঠাকুর্দ্দাকে দেখাশুনা এখন তারকও করিতেছে এবং তারণও করিতে ছাড়িতেছে না; যেহেতু ছোটবৌ পরামর্শ দিয়াছে—"ওদের ত স্বকৃত উপার্জ্জনের ঠাকুর্দ্দা নয়। পৈতৃক ঠাকুর্দ্দা। আমরাও সমান ভাগের ভাগ নিয়ে ছাড়বো। ভয়ে পেছিয়ে এলে চলবে না।" তাই এখন ঠাকুর্দ্দার অসুখবৃদ্ধির এই সময়টাতে, তারকের ডাক্তার ঠাকুর্দ্দাকে যেমন দেখিয়া চলিয়া যায়, অমনি তারণও তাহার ডাক্তারকে ডাকিয়া আনে। তারকের ডাক্তার খাওয়ায়—এ্যালোপ্যাথিক মিক্সচার, তারণের ডাক্তার গিলাইয়া যায়—হোমিওপ্যাথীর গ্লোবিউল। বড়বৌ খাওয়াইয়া গেলে সাবু, বাতাসা, কমলালেবু; ছোটবৌ আসিয়া খাওয়ায় বার্লি, শঠির পালো, শাঁকআলু। যদি কোনদিন তারক ঠাকুর্দ্দার পাশে বসিয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলায়, অমনি তারণ ছুটিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি পাখা লইয়া জোরে জোরে ঠাকুর্দ্দাকে বাতাস করিতে থাকে।

আগে হইলে তারক কিছুতেই এমনটা হইতে দিত না, কিন্তু বড় মার-পিটটার পর হইতে তারক আর এখন কোন গোলযোগ্ বাঁধাইবার ইচ্ছা করে না। এ সম্বন্ধে বড়বৌ প্রতিবাদ জানাইলে তারক বলে—"যা করে করুক না। মরবার পর আসলের বেলায়—বোঝা যাবে এখন।"

এইভাবে আরও কয়দিন কাটিয়া যাইবার পর, ঠাকুর্দ্দার অসুখ হঠাৎ খুব বৃদ্ধি পাইল। ডাক্তারদের ঔষধে এ যাবৎ কোন ফল হয়ও নাই, হইলও না। এ্যালোপ্যাথিক বলেন—"হোমিও পরিত্যাগ না করলে ওষুধে কোন ফলই হবে না।" হোমিও বলেন—"সমস্ত ওষুধের ক্রিয়া এ্যালো সব নষ্ট করে দিচ্ছে।"

সুতরাং অতি-চিকিৎসার ফলে ঠাকুর্দ্দার রোগ চরম অবস্থায় আসিয়া পড়িল।

একদিন মধ্যাহ্নে ঠাকুর্দ্দার অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হইয়া পড়ে। তারক তাড়াতাড়ি আসিয়া বড়বৌকে এ খবর দিতে, বড়বৌ প্রথমটা থত-মত খাইল এবং পরক্ষণেই দালানে একখানা মাদুর পাতিয়া তদুপরি পা ছড়াইয়া বসিয়া, ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ছোটবৌ খিড়কীর পুকুর-ঘাটে পুঁটির পিসির সহিত হাসিতে হাসিতে কি একটা গল্প করিতেছিল। বড়-বৌয়ের কান্নার শব্দ তাহার কানে আসা মাত্র সে বাড়ীর মধ্যে ছুটিয়া আসিল এবং হাতের বালতীটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া দাওয়ায় বসিয়া কাঁদিতে গিয়া কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিল এবং বরাবর ঠাকুর্দ্দার ঘরের মধ্যে গিয়া চীৎকার করিয়া ক্রন্দন সুরু করিয়া দিল।

তারক ও তারণ ও প্রতিবাসীদের কেহ কেহও সে সময় উপস্থিত ছিল। তারক ঠাকুর্দ্দার কোমর হাতড়াইয়া ঘুন্‌সি হইতে লোহার সিন্দুকের চাবিকাঠীটা লইবার চেষ্টা করিলে, তারণ বাধা দিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আহা—হা, কর কি! এ অবস্থায় ওঁকে আর নাড়া-চাড়া কোর না।" তারক থত-মত খাইয়া সরিয়া আসিয়া বসিল। কিন্তু তারণের নিষেধে তাহার এই ক্ষান্ত হওয়াটা সে দুর্ব্বলতা বলিয়াই মনে করিল। কিন্তু সে কোমর ত্যাগ করিলেও তৎসন্নিহিত স্থান ত্যাগ করিল না, অর্থাৎ ঠাকুর্দ্দার কোলের কাছে শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

সে রাত্রে ছোট-তরফ এবং বড়-তরফ সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ঠাকুর্দ্দাকে ঘিরিয়া রাত কাটাইল। রান্না-বান্না, কাজ-কর্ম্ম সকলেরই বন্ধ। একবার উঠিয়া এ-পক্ষও কিঞ্চিৎ মুড়ি এবং গুড় খাইয়া আসিল, অপর পক্ষও একবার গিয়া ঐরূপ কিছু জলযোগ করিয়া আসিল।

কিন্তু রাত্রে কিছুই হইল না। সারা রাত টাল-মাটালে কাটিয়া গিয়া ঠাকুর্দ্দার ঘরে পুবের খোলা

জানালা দিয়া পরদিনের সূর্য্যের আলো আসিয়া পড়িল। তখন পাড়ার অনেকেই একে একে দেখিতে আসিতে আরম্ভ করিল। ছোটবৌ তারণকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিল—"মুখ-অগ্নিটা তুমিও কোরো। শ্মশানে গিয়ে যেন ভ্যাবা-গঙ্গারাম হোয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না।" বড়বৌ তারককে চুপি চুপি কহিল—"তাড়া-তাড়ি সব ফেলে রেখে যেন শ্মশানে যেও না। ভাল করে তালা-চাবির বন্দোবস্ত করে তবে—বুঝেছ ত?"

যাহা হউক মধ্যাহ্নও কাটিল।

কিন্তু অপরাহ্ণ আর কাটিল না। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে,—তারক, তারণ, বড়বৌ, ছোটবৌ, ঘোষাল-মশাই, হর চক্কোত্তি, দত্তদের মেজকর্ত্তা প্রভৃতির সামনে ঠাকুর্দ্দার জীবন-সূর্য্য চির-অস্তাচলে অদৃশ্য হইল। সঙ্গে-সঙ্গেই তারক তাঁহার কোমরের ঘুনসি অধিকার করিল এবং তারণ ক্ষিপ্রতার সহিত তারকের উপর আসিয়া পড়িল। বধূযুগল যথাসময়েই ক্রন্দনের রোল তুলিয়া দিয়াছিল এবং চক্কোত্তি প্রভৃতি ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

কাড়া-কাড়ি, ধাক্কা-ধাক্কি, কোলাহল, ক্রন্দনের মধ্যে পরিশেষে উপস্থিত সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে ইহাই স্থির হইল যে, মেজকর্ত্তাকেই সিন্দুক খুলিতে দেওয়া হউক। সুতরাং দত্তদের মেজকর্ত্তাই ঠাকুর্দ্দার ঘুনসি হইতে চাবি খুলিয়া লইলেন।

সিন্দুক খোলা হইল।

শূন্য—শূন্য—শূন্য! শূন্য সিন্দুক যেন হাঁ করিয়া সকলকে ভ্যাংচাইতে লাগিল। হাজার হাজার সঞ্চিত টাকার পরিবর্ত্তে ঠাকুর্দ্দার স্বহস্ত লিখিত এক টুকরা কাগজ ভাঁজ করা অবস্থায় সিন্দুকের একধারে পড়িয়া ছিল। মেজকর্ত্তা হাঁকিয়া তাহা পাঠ করিল—

"টাকা-কড়ি আমার কিছু নেই। তা থাকলে আর এই বনের ভেতর মরবার জন্যে আসি? সময়ে যা রোজগার করেছিলুম, অসময় পড়বার আগেই তা ফুঁকে দিয়েছি। তোমরা কিছু মনে কোরো না,—আমায় ক্ষমা কোরো।

—ঠাকুর্দ্দা

"পুঃ—

সিন্দুকটা শিবপুরের এক ভদ্রলোকের। কিছুদিনের জন্যে চেয়ে এনেছিলুম। তিনি নিতে এলে তাঁকে দিয়ে দিও। তাঁর শ' দুই টাকাও আমি ঋণী আছি। দয়া করে দুই ভাই মিলে সেটা শুধে দিও। ইতি।"

চক্কোত্তির একটু-আধটু কীর্ত্তন-গানের অভ্যাস-আলোচনা ছিল। তাহার খুব ইচ্ছা হইতেছিল, সে একবার কীর্ত্তনের সুরে চণ্ডীদাসের গানখানার বদলে গায়—

আমি টাকার লাগিয়া এতেক করিনু
সকলি গরল ভেল।
রজত সাগরে সিনান করিতে
কমলা মিলিয়া গেল।

জনৈক ফরাসী স্ত্রী-কবি

(আনা, কঁতেস্‌ দ্য নোয়াইল, ১৮৭৬-১৯৩৩)

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

সম্প্রতি আমার এক ফরাসী বান্ধবী তাঁদের দেশের একটি বিখ্যাত স্ত্রী-কবির মৃত্যু উপলক্ষ্যে কোন সাপ্তাহিক সাহিত্য-পত্রিকার স্মৃতি-সংখ্যা আমাকে দেখতে পাঠিয়েছেন। সেটি পড়ে, কি জানি কেন, আমার ইচ্ছা গেল তার স্মৃতিলিপি ও সমালোচনার কিয়দংশ বাঙ্গলা মাসিক-পত্রের পাঠকদের উপহার দিতে—তাই এই প্রবন্ধ।

তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ত' ছিলই না, তাঁর লেখাও বিশেষ-ভাবে আমার চোখে পড়েনি; বলতে গেলে তাঁর নাম ছাড়া আর কিছুই ইতিপূর্ব্বে আমার জ্ঞানগোচর ছিলনা। তবে কেন এ অহেতুকী বাসনা?—বলা শক্ত। বোধ করি তাঁর স্বদেশীদের উচ্ছ্বসিত স্মৃতি-স্তুতির কিছু ছিটে-ফোঁটা আমার গায়ে এসে পড়েছে; কিম্বা বিদেশিনী হলেও তিনি নারী হিসেবে আমার স্বজাতি বলে' পরোক্ষে তাঁর গৌরবের যৎকিঞ্চিৎ আমাতে সংক্রামিত হয়েছে। অথবা পৃথিবীতে এমন দু'চারটি জিনিষ আছে, যার দেশকাল পাত্রভেদ নেই, যা সার্ব্বজনিক ও সার্ব্বভৌমিক,—যথা মৃত্যু, যথা কাব্য।

E. A. Poe বলেছেন যে, খণ্ড-কবিতাই একমাত্র যথার্থ কবিতাপদবাচ্য। কারণ সেই হচ্ছে কবিতা, যা আমাদের মনকে ঊর্দ্ধলোকে নিয়ে যায় এবং উদ্দীপিত করে। সে উদ্দীপিত অবস্থায় যেহেতু দীর্ঘকাল থাকা অসম্ভব, সেহেতু সত্যকার কবিতা দীর্ঘ হতেই পারেনা;—প্রকৃতপক্ষে সেরকম কবিতা খণ্ড-কবিতারই সমষ্টিমাত্র। সে যাই হোক, উৎকৃষ্ট কবিতা যে পাঠকের মনে এক আনন্দময় উত্তেজনার সৃষ্টি করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দুঃখের বিষয়, অনুবাদে সে ভাষার ইন্দ্রজাল রক্ষা করা আমাদের মত সাধারণ লোকের সাধ্যায়ত্ত নয়; সুতরাং সে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইনি।

আনা, কঁতেস্‌ দ্য নোয়াইল — যৌবনে

তবে এস্থলে নিতান্ত নিরস্ত্র নিঃসম্বলভাবেও কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইনি। আমার প্রধান সহায় ও বল-ভরসা হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা স্বর্গীয়া কঁতেসের স্বদেশী, স্বজাতি ও স্বধর্মী; যাঁরা একই পথের পথিক ও একই ভাবের ভাবুক। যাঁরা আজ তাঁদের নবরত্ন-সভার একটি উজ্জ্বল রত্নকে হারিয়ে, কতরকমেই না তাঁদের অভাব বোধ প্রকাশ করেছেন, কত দিক থেকেই না তাঁর অসামান্য নারীপ্রতিভার গুণকীর্ত্তন করেছেন, কত ভাবেই না স্ব স্ব প্রকৃতি, রুচি ও পরিচয়ের তারতম্য অনুসারে তাঁদের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সমালোচনাগুলি পড়তে পড়তে বাস্তবিক এই জাতীয়

স্মারকলিপি সম্বন্ধে একটা নতুন আদর্শ মনে মনে গড়ে ওঠে, এবং ওদের কাছ থেকে এ বিষয় আমাদের অনেক শেখবার আছে বলে বোধ হয়।

প্রথমেই 'কতিপয় তারিখ' শীর্ষক একটি পরিচয় পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করে' অপরিচিতা কবির রেখা-চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক, যথা :—

"জন্ম—১৫ই নবেম্বর, ১৮৭৬।

নাম—Anne Elizabeth, Princess of Bessaraba de Brancovan।

পিতৃবংশ—Valaque দেশের এক বংশ, যাতে সামন্তরাজ্যের অনেক বিখ্যাত মন্ত্রীর উদ্ভব হয়েছে।

মাতৃবংশ—Musurus নামক এক বংশ, যারা শিক্ষার উৎকর্ষের জন্য খ্যাত, এবং যাতে অনেক ক্ষমতাশালী লেখক ও শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন Canon Mark Musurus, যিনি Erasmus ও Manucci-র বন্ধু।

কিন্তু কঁতেসের জন্ম হয় পারীতে, তাঁর বাল্যকাল কাটে সাভয়ে, এবং কৈশোরাবধি আবার সেই পারীতেই এসে বাস করেন।

বিবাহ—কঁৎ দ্য নোয়াইলের সঙ্গে, ১৮-ই অগষ্ট, ১৮৯৭।

সন্তানাদি—Anne নামক এক পুত্রসন্তান।

পুস্তক প্রকাশ—পনেরো বৎসর বয়স থেকেই তিনি যে-সকল কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন, সেগুলি পরে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রথম সংগ্রহাকারে গ্রথিত হয়। ১৮৯২ খৃঃ Litanies নামে তাঁর প্রথম রচনা Review of Paris-এ প্রকাশিত হয়। সেই অবধি এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর যোগস্থাপন হয়, এবং এতেই তাঁর অনেক কবিতা বেরোয়। ১৯০১ থেকে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে তিনি প্রায় দশখানি কাব্যগ্রন্থাদি এবং চারখানি উপন্যাস রচনা ও প্রকাশ করেন। * * * মাদাম দ্য নোয়াইল ১৯৩১-এর জানুয়ারি মাসে Legion d'honneur-এর নেত্রীপদে উন্নীত হন; তিনিই প্রথম মহিলা, যিনি এই বহুমানাস্পদ খেতাবের পদবন্ধে ভূষিত হবার অধিকার প্রাপ্ত হন।"

কিন্তু কঙ্কাল দেখে সুন্দর শরীরের রূপকল্পনা, আর এইরূপ কয়েকটি নীরস তথ্য থেকে জীবন্ত মানুষের স্বরূপ নিরূপণের প্রয়াস, উভয়ই সমান ব্যর্থ হতে বাধ্য। তার চেয়ে তাঁর স্বনামধন্য স্বদেশী সাহিত্যিকদের কাছ থেকে শোনা যাক্ তাঁর বিষয় তাদের কি বলবার আছে, যারা এখনো তাঁর শোকে কাতর, তাঁর সত্যগত সান্নিধ্য স্মৃতিতে ভরপুর, তাঁর অশেষ গুণাবলীর ব্যাখ্যায় মুখর।

"এই মহীয়সী নারী সম্পূর্ণ একটি যুগের ব্যথিত, পীড়িত তরুণ সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ছিলেন; তাঁর কবিতা আমাদের কৈশোরের ক্রন্দনধ্বনি। অপরের কাছে আমরা চেয়েছি সান্ত্বনা ও আলো, তাঁদের বলেছি আমাদের দোলা দিতে, আমাদের ঘুম পাড়াতে। কিন্তু যে-সকল আবেগের কোনকালে উপশম নেই, ইনি ছিলেন তারই চুম্বকস্বরূপা। * * * *

লোকসমাজে বহুসমাদৃতা, পূজিতা, মানুষের ভাগ্যে যত কিছু দান থাকতে পারে, সে-সবে যেন ভারাক্রান্তা ও অভিভূতা হয়ে, তিনি আমাদের দশ বৎসর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন, শুধু এই সত্যটি জানিয়ে দেবার জন্যে যে, সব-কিছু হাতে এলেও কিছুই পাওয়া হয় না, এবং সমগ্র বিশ্ব জয় করলেও কিছুই আসে যায় না। * * *

যৌবনাবধিই এই সুন্দর ঈগলপক্ষীটি মৃত্যুকে চোখে চোখে চেয়ে দেখেছেন। সত্য কথা বলতে গেলে, আমাদের রোমান্টিক দলের বড় বড় কবির মত, ইনি সে মুখ থেকে কখনো চোখ ফেরাতে পারেননি। আর সেই জন্যই তাঁর মৃত্যু এত আশ্চর্য্য বোধ হয়! অধিকাংশ লোকের পক্ষে মৃত্যু একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা; তারা হোঁচট খেয়ে ফাঁদের ভিতর আচমকা অদৃশ্য হয়ে যায়, অসতর্ক জন্তুর মত। কিন্তু যে-ব্যক্তি এতকাল ধরে' তাঁর ভবিষ্যৎ ধ্বংসের ধ্যান-ধারণা, এমন কি প্রতীক্ষা করে এসেছেন,—তাঁর নিস্তব্ধতা ও নিঃসাড়তা যেন মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। এই চিরনিদ্রিতাকে

আমি যীশুখৃষ্টের সেই কথা আবার বলি, যে কথা তিনি শেষ ভোজের পর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন—'এখন ত তোমরা জেনেছ ?'—এখন তিনি জেনেছেন। তিনি জেনেছেন, তিনি দেখেছেন।"

—Francois Mauriac.

"মাদাম গু নোয়াইল বেশ জানতেন যে, জীবনের চেয়ে মৃত্যুই আমাদের অনেক বেশি সময় অধিকার করে থাকে। এবং যশোলিপ্সাই মানুষের বাঁচবার প্রবৃত্তির একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বলে' তিনি যেন দীর্ঘকালের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবার মত করেই জীবন যাপন করেছিলেন। * * * *

মাদামের সুন্দর কোঁকড়া তামাটেরঙের চুল, তাঁর কিশোরী ও শিকারীপাখী-মিশ্রছাঁদের মুখ, তাঁর বেশের বৈরাগিণী শ্রী, ও সর্ব্বোপরি তাঁর সেই অপরূপ হাসি, যে-হাসিতে সমস্ত মাড়ি দেখা যায় এবং যাদের কোন-কিছু দৈন্য লুকোবার নেই তাদের অন্তস্তল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয়—এই সব নিয়ে তিনি অমৃতসদনে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছেন, সেই খাটের উপর শুয়ে যেখানে তিনি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখাশুনা করতেন, যেখানে তিনি এদানিং দিন কাটাতেন ও কথাবার্ত্তা কইতেন—যে খাটের বাঁধন-দড়ি ছিঁড়ে অকূলে পাড়ি জমাবার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

কবিদের পক্ষে বেঁচে থাকা মানে যেন সময় নষ্ট হবার ভয়ে ভয়ে থাকা ; আমি দেখেছি তাঁরা নৌকার তলায় বোঝাই-করা ধরা-মাছের মত ধড়ফড় করেন, আছড়ে পড়েন, ও নিজেকে নিজে আঘাত করতে থাকেন। মৃত্যু কবিকে তাঁর নিজস্ব এলাকায় পৌঁছে দেয় ; তাঁর অতিরিক্ত শক্তি, তাঁর ভয়ঙ্কর ক্ষিপ্রতার জন্য যে বাধায় প্রতিহত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তিনি সেই বাধা প্রাপ্ত হন।

তরুণেরা একদিন বুঝতে পেরে অবাক হবে, কি অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল এক মৃতা ব্যক্তির, যাঁর একমাত্র কষ্ট এই যে তিনি আর মর্ত্ত্যে জীবিত থাকতে পারেন না ; যেমন মর্ত্ত্যে অবস্থানকালে তাঁর এই দুঃখ ছিল যে, মৃতদের বিশিষ্ট অধিকারলাভে কেন তাঁর বিলম্ব হচ্ছে।"

—Jean Cocteau.

"ঘুমায়েছিলাম, জাগিলাম ; ব্যথা জাগিল আবার,
যেন হৃদয়ের মাঝে কামান ছুঁড়িল কে আমার,
বেদনার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি গরজিল অনিবার॥

তিনি যা ছিলেন, যেরূপ ছিলেন, সেই ভাবেই তাঁকে নিতে হবে ; যদি জন্মকবি পৃথিবীতে কেউ থেকে থাকেন ত' সে তিনি,—মহৎ তাঁর অন্তঃকরণ, আশ্চর্য্য তাঁর শিশুসারল্য ! তিনি ছিলেন খামখেয়ালী, অত্যাচারী, অতৃপ্ত ; মাসের গতিতে হতেন অধীর, সপ্তাহের গতিতে যেতেন ক্ষেপে। জলন্ত ছিল তাঁর মনের আবেগ, শিশুসুলভ ছিল তাঁর বিদ্রোহ, তাঁর অশ্রু, তাঁর অন্ধকারের ভয়। * * * তাঁর জীবন ও কর্ম্মের এই অবিচ্ছিন্নতা অনুভব করে', মৃত্যুর বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহভাবে আমাদের মন অভিভূত হয়ে পড়ে।

আজি এ মধুর সাঁঝে, বৃষ্টিশেষে সিক্ত গাছগুলি
লভিছে আরাম ; ছায়া দীর্ঘ হয়, মৃদু শ্বাস টানে ;
রেলগাড়ী দেয় সিটি, কেহ যেন পর্দ্দা দেয় তুলি,
বাতাসে মর্ম্মরধ্বনি ;—কিছু নাহি পশে তব কানে।
তবু মনে ভাবি, আকাশের তলে, আসন্ন সন্ধ্যায়,
কিছু যবে নাহি মোছে আমাদের, সবই থেকে যায়,—
ভাবি সেই অন্তহীন কাল, অন্তহীন দেশ হতে
তুমি নাহি বাহিরিতে পারিবে কথনো কোনমতে॥"

—Léon-Paul Fargue.

"এই কয়টি ছত্রে আমি কেবলমাত্র সেই মহান আত্মাকে আমার বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে চাই, যাঁর অন্তর্দ্ধানে আমার অন্তরে একটি অপূরণীয় শূন্যতা রয়ে গেল।

প্রেম ও মৃত্যু,—এই দু'টি বিষয়ই ছিল তাঁর কাব্য-প্রেরণার মূল উৎস। * * * * * * * *

এই প্রেমের কবি, প্রেমের অমৃত-বিষ ছিল যাঁর গানের বিষয়—তিনি চিরজীবন মানুষের মনোরাজ্যের গভীরতম দার্শনিক সমস্যার উপর ঝুঁকে পড়েছিলেন।

কতদিনের কত সময়ের কথা মনে পড়ে, যখন তিনি অদম্য কৌতূহলের সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করেছেন,—সে নিয়মের চিরস্থায়ী অবিচলিত ধর্ম্ম, সেই নক্ষত্রখচিত আকাশের অসীম বিস্তৃতি, যেখানে আমাদের দূরবীণ প্রবেশ লাভ করে এবং যেখান থেকে সত্যের কিয়দংশও আহরণ করে এনে দেওয়া তার উচিত। Montaigne তাঁর একটি পরিচ্ছেদের শিরোভাগে লিখেছিলেন—'তত্ত্বালোচনা করা মানে মরতে শেখা।' 'মরতে শেখা',—এইটিই ছিল কঁতেস দ্য নোয়াইলের একান্ত আন্তরিক আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়।"

Paul Painlevé.

"শত্রুদের পক্ষে তিনি ছিলেন ভয়াবহ, কিন্তু বন্ধুদের পক্ষে অমৃতসমান; তারাও যেন ভেবে পেতনা কি করে' তাঁর জীবনকে মধুরতর করে তুলবে। তিনি প্রায়শঃ দুই পরস্পরবিরোধী দল থেকে বন্ধু চয়ন করতেন, কিন্তু সর্ব্বদাই যথার্থ মহত্ত্ব চেনবার এমন একটি ক্ষমতা তাঁর ছিল, যেটি মনে হয় তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধু Barrés-র কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন। উক্ত মনীষী তাঁর সম্বন্ধে পাতা পাতা সুন্দর কবিতা ও ব্যাখ্যান লিখেছেন। তাঁরই Oronte নামক বইয়েতে সেই সুন্দর কথাটি পাওয়া যায়, যেটি একাধারে ফরাসী ভাষার সুন্দরতম বাক্য এবং কঁতেস সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা যথাযথ, সংক্ষিপ্ত ও মমতাময় সমালোচনা—'এই ক্ষুদে মৌমাছিটি মধুভরা, কিন্তু ওড়বার সময় তার হুলটি সাঙ্ঘাতিক।' * * * আনা দ্য নোয়াইল তাঁর ধর্ম্মমাতৃভূমির সেই সকল সন্তানেরই সঙ্গসুখ বাঞ্ছা করতেন, যাঁরা বুদ্ধিমত্তায় বা সহৃদয়তায় শ্রেষ্ঠ। * * * *

আমাদের চক্ষুকর্ণের কাছে যিনি এতই জীবন্তরূপে প্রতীয়মান ছিলেন, সব জেনেশুনেও তাঁর মৃত্যুতে প্রত্যয় করতে মন সরছে না; এখনো পর্য্যন্ত কল্পনা করতে পারছিনে যে, কাল পারীনগরবাসী তাঁর দেহাবশেষের প্রতি যথাযোগ্য সম্মানপ্রদর্শন করলে পর, প্রিয়তম আত্মীয়গণ তাঁর অন্তিম অনুরোধানুসারে তাঁর দেহ থেকে হৃৎপিণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করতঃ জিনীভা হ্রদের তীরবর্ত্তী একটি দেবালয়ে সেটি স্থাপন করতে নিয়ে যাবেন; তার অনতিদূরে আছে একটি পুণ্যক্ষেত্র, যেটি তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের প্রাচ্য জন্মভূমি স্মরণ করিয়ে দেবে। এইরূপে তাঁর হৃদয় নিয়ে তিনি একাকী সেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বিরাম লাভ করবেন, যেখানে তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে শৈশবকালে কাব্যামৃতের প্রথম রসাস্বাদ করেছিলেন।"

Maurice Martin Du Gard.

"এখানে যে-কয়টি সংবাদপত্র হাতের কাছে পেলুম, তা'তে দেখে কিঞ্চিৎ বিরক্তি বোধ হল যে, মাদাম দ্য নোয়াইল সম্বন্ধে যে-সব বড় বড় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তা'তে সমালোচকেরা কবির যথাযোগ্য গুণকীর্ত্তন করলেও, ঔপন্যাসিকের কথা যেন তাঁদের কারোই মনে উদয় হয়নি। সম্ভবতঃ এঁরা তাঁর শেষের উপন্যাসগুলি থেকেই তাঁকে বিচার করেছেন; কিন্তু তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নবীন আশা'কেও কি সকলে ভুলে গেলেন? এই বইখানি আমি অনেকবার পড়েছি; তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমার আছে, এবং আমি জোর করে' বলতে পারি যে, সেটি আধুনিক উপন্যাস-সাহিত্যের একটি দুর্লভ রত্নবিশেষ। এই রচনাটির মধ্যে কেবলমাত্র 'কবিত্বে'র সৌন্দর্য্য স্বীকৃত হলেই আমি যথেষ্ট মনে করব না। কঁতেস দ্য নোয়াইল ঔপন্যাসিক হিসেবে জীবনধনে ধনী ছিলেন। 'নবীন আশা'য় অঙ্কিত চারটি প্রধান চরিত্রই জীবন্ত, জটিল ও সুসঙ্গত ব্যক্তিবিশেষ; তাদের সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারা যায় না, কিন্তু তারা প্রত্যক্ষ, এবং বই বন্ধ করবার পরেও তারা বেঁচে থাকে ও তাদের ভোলা যায় না।

যদি আপনার পত্রিকা অবশেষে 'নবীন আশা'কে তার প্রাপ্য মহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, তা'হলে আমার বিশ্বাস একই সঙ্গে একটি জলন্ত অন্যায়ের প্রতিকার করা হবে, ভবিষ্যত কালের বিচার বর্ত্তমানেই

সমর্থন করা হবে, এবং যিনি সম্প্রতি অন্তর্হিত হয়েছেন, তাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায্য ও সঙ্গত সম্মান দেখানো হবে।"

—Roger Martin Du Gard.

"তাঁর সেই নরম গালিচা-পাতা, বিরল অথচ দামী আসবাব-সজ্জিত বৈঠকখানায় আমরা কত রাত পর্য্যন্ত কত না বিশ্রম্ভালাপে সময় কাটিয়েছি। এই সব সময়ে মাদাম দ্য নোয়াইলকে তাঁর সেই অত্যুজ্জ্বল, অবর্ণনীয়, কথোপকথনের সূত্রপাত করতে শুনেছি, যে কথাস্রোতে তিনি তাঁর অনুভূতি ও বুদ্ধিবৃত্তির পূর্ণমাত্রা ঢেলে মিশিয়ে একাকার করে দিতেন। কারণ তিনি যে শুধু একজন বড় কবি ছিলেন, তা নয়; তাঁর তীক্ষ্ণ ধীশক্তি যেন একটিমাত্র বিদ্যুতের ঝিলিকে জীবনের সকলপ্রকার রূপকে ফাঁদে ফেলত। * * *

তিনি সে সময়ে কিছু অধিক সামাজিকপ্রকৃতির মহিলা ছিলেন, যদিও চিরকালই সাহিত্যকেই সব চেয়ে বেশী পছন্দ করতেন। তখনো তাঁর কথোপকথনে সেই আশ্চর্য্য প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পায়নি; কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি অসাধারণ বাগ্মীতা ও চতুরতার অধিকারী হয়েছিলেন। যখন রঙ্গ করতে ইচ্ছে করতেন, তখন অতি উত্তমরূপেই করতে পারতেন, এবং আমরা সকলেই পালাক্রমে তাঁর হাস্যকৌতুকের লক্ষ্য হতুম।"

—Fernand Gregh.

"কঁতেস দ্য নোয়াইল যে-সকল যুবককে উন্নত স্তরে তুলেছিলেন, তাদের মধ্যে একজনের সাক্ষীমাত্র আমি তাঁর কাছে নিবেদন করতে চাই।

কিশোরবয়স্কদের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করা অনেক সময় আবশ্যক হয়ে পড়ে। গুরুভার আশায় প্রপীড়িত, অতিনবীন বাসনাবিদ্ধ তরুণ কখনো কখনো এমন একটি মধুরোক্ত কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য লালায়িত হয়, যেটি তার স্বপ্নকে নির্দিষ্ট আকার দেবে, তার খোরাক যোগাবে। আমার পক্ষে মাদাম দ্য নোয়াইল ছিলেন সেই কণ্ঠস্বর। আরও শত শত লোকের পক্ষেও তিনি তাই ছিলেন; এবং বংশপরম্পরায় যে-সকল বালক পৃথিবীতে আসবে, তাদের পক্ষেও চিরকাল তিনি তাই হবেন বলে আমার বিশ্বাস। আজ যদি আমরা স্মরণ করি যে, তাঁর দৌলতে আমরা যৌবনকালে কত প্রদীপ্ত প্রশান্ত প্রহর উপভোগ করেছি, তা'হলে বোধহয় তাঁকে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর অর্ঘ্য দেওয়া হবে।

আমরা সকলেই এমন কোন একটি উজ্জ্বল অপরাহ্ন, এমন কোন একটি নির্ম্মল প্রভাত মনে করতে পারি, যেদিন আমরা তাঁর কবিতার বই আত্মসাৎ করে' এমন কয়েকটি উন্মাদ মুহূর্ত্ত যাপন করেছি, যা জীবনযাত্রার পথচিহ্নস্বরূপ থেকে যায়।

আমার মনে পড়ে ব্রিটানিতে কয়েকদিন, যখন আমি একটি নির্জ্জন সুদীর্ঘ সমুদ্রসৈকতে একলা বেরিয়ে পড়ে, তাঁর 'Eblouissements' বইখানিতে ঝাঁপ দিতুম। সে সময়ে আমি যেন যুগপৎ নিজের অতি নিকটে ও বহুদূরে অবস্থান করতুম,—এমন একটি প্রাঞ্জল উত্তুঙ্গ অবস্থায়, যা কখনো ভোলবার নয়।

এই ধরণের স্মৃতি বোধ করি আমাদের সকলেরই কিছু-না-কিছু আছে। এস, আজ আমরা সেই সকল রহস্যময় আত্মিক কুসুমের অঞ্জলি তাঁর দেহাবশেষের উপর নিক্ষেপ করি, যিনি তার জন্মদাত্রী।"

—Robert Honnert.

"ক্রীটদেশীয় বংশে তাঁর মায়ের জন্ম বলে' আনা দ্য নোয়াইল অহঙ্কার করে' বলতেন যে, দেবভূমির সঙ্গে তিনি আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। তাঁর বাল্য কবিতা-সংগ্রহের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—'আদিকাল হতে আগত সুমহান কণ্ঠস্বর শুনে আমি পৃথিবী ও মানবের ইতিহাস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেছি। তাদের দৃপ্ত ছন্দেই আমার ইচ্ছাশক্তি পরিচালিত হয়েছে, এবং সেই জন্যই পরম শোকের মুহূর্ত্তেও আমি পার্থিব সত্যকে অগ্রাহ্য করে', চোখ তুলে সেই বিজয়ী মেঘের মধ্যেই মৃতদের অনুসন্ধান করেছি, যেখানে আমার সুদূর পূর্ব্বপুরুষ-দের কাছে উত্তরাধিকারে লব্ধ আনন্দময় দেবতাদের চিরহাস্যে তাঁরা লীন আছেন বলে' বুঝতে পেরেছি। বাল্যকালাবধি আমি সমাধি, ভস্ম ও শূন্যতা সম্বন্ধে

গান রচনা করেছি বটে; কিন্তু সে সবে আমার আস্থা ছিলনা। আমি বিশ্বাস করতুম এক অনির্ব্বচনীয় অনন্ত লোকে, যেখানে আমার হৃদয় সীমাহীন নীলাম্বরের লঘুতা এবং উচ্চতার আভাস প্রতিফলিত দেখতে পেত। কবিদের উচ্ছ্বসিত স্তবপাঠে আমার মনের আগুন বাড়ত বই কমত না, কোন নির্দ্দিষ্ট পথও দেখতে পেতুম না; তার চেয়ে বরং দার্শনিক ও নৈতিক লেখকদেরই আমি ক্ষীণ হস্তে টেনে এনে আমার বাল্য শিয়রের কাছে ধরে রাখবার চেষ্টা করতুম। মননশক্তির কাছেই আমি মাথা নত করেছিলুম।' * *

পুরাকালের ঈষৎমত্ত গ্রীকরমণীর ন্যায় লীলালাস্যময়ী অথচ মেধাবিনী এই রমণীর অন্তর তাঁর পূর্ব্ব-পুরুষদের মতই নিজ সসীম অস্তিত্বের মধ্যে অসীমের আভাস অনুভব করতে পারত। এই সীমাবোধরূপ বিশিষ্ট গ্রীক মনোভাবের মহান বিষণ্ণ ছড়ের টানেই তাঁর হৃদয়তন্ত্রীর গভীরতম স্বরসকল সাড়া দিত। উপরন্তু এই একই মনোভাববশতঃ তিনি সাকারের প্রতি সেই প্রত্যক্ষ প্রেম, সীমার প্রতি সেই নিষ্ঠা এবং বাস্তব ও সুনির্দ্দিষ্টের প্রতি সেই সূক্ষ্ম মমত্ব বোধ করতেন, যার প্রসাদে আপেল ফলের সুগোল ডৌল থেকে সূর্য্যের বিস্তীর্ণ পরিধি পর্য্যন্ত, গঠন ও প্রাণবিশিষ্ট বস্তুমাত্রেরই উপাসনা ও বন্দনা করা তাঁর পক্ষে ছিল স্বভাবসিদ্ধ।

সকলপ্রকার মাদকতায় মত্ত এই রমণী,—আর কেউ পারতনা তাঁর মত সব সময়ে আবিষ্কার করতে এবং সকল স্থানে অনুভব করতে সেই আনন্দ, যা' ওতঃপ্রোত প্রত্যেক চলন্ত মুহূর্ত্তে, এবং বিক্ষিপ্ত সেই বিস্তৃত আকাশে, যেখানে ঘটনাপরম্পরা হাত ধরাধরি করে অসীমতা পর্য্যন্ত জের টেনে চলেছে। তাঁর মত করে' কেউ জানতনা অনন্ত প্রগতি থেকে প্রতিদিন মাধুর্য্য আহরণ করতে, বর্ত্তমানকে সর্ব্বদা হাসিমুখে বরণ করতে, এবং প্রত্যেক ঊষার উন্মেষকে শিশিরসঞ্জীবিত নবীন প্রাণ দিয়ে স্বীকার করে নিতে। * * * *

মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য্য!—আনা দ নোয়াইল ছিলেন তার ভগবৎপ্রেরিত স্তাবক। তাঁর হাতের আঙুলের সূক্ষ্ম সুকুমার ডগা দিয়ে, তাঁর সূর্য্যোপম বুভুক্ষু টানা চোখ দিয়ে আলো ঠিক্‌রে পড়ত। সোৎসাহে তিনি ঘোষণা করেছেন—'আমিও, আমিও সুন্দরকে ভাল-বেসেছি; অনন্ত বিশ্বে আমি তার ধ্যান করেছি, তার স্তব করেছি। সৌন্দর্য্যই মানুষের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং উন্নতির পথে নিয়ে যায়; সহস্র বিরোধী মূর্ত্তি ধরে' তাকে আনন্দ দান করে, বুদ্ধির শক্তিকে ও হৃদয়ের দৃপ্ত মত্ততাকে পোষণ করে। শ্রান্তি, রোগ, শ্রম, শরীর মন ও আত্মার দুঃখরূপ মুখোস পরে ছদ্মবেশী রহস্যময় সৌন্দর্য্য চির-বিরামের ন্যায় এক মধুর রাজ্যে ইন্দ্রিয়গ্রামকে উড়িয়ে নিয়ে যায়।'

দেবতাত্মা বিশ্বপ্রাণের এই কবি নদীগর্ভেনিহিত অপ্সরার চক্ষু দেখতে পেতেন, এবং পর্ব্বত ও বৃক্ষের ভাষাহীন আলাপ শুনতে পেতেন। প্রকৃতির মতই, প্রত্যেক জিনিষ বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে যে সূত্রধারা যুক্ত তার মনের সঙ্গেও সেই সূত্রে গ্রথিত ছিল। প্রতি বস্তুই তাঁকে বিশ্ববোধে পৌঁছে দিত, এবং সমগ্রের সঙ্গে অতি ক্ষুদ্রের যে সম্বন্ধ, তার তীক্ষ্ণ অনুভূতির উদ্রেক করত।"

Mario Meunier.

"তাই মনে হয় যে, গীতিকবিতায় সর্ব্বদাই যেন একটা পালার ক্রম দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ একটি গীতিকবিতা যেন দুই ব্যক্তির কথোপকথনের রূপ ধরে;—প্রিয়জনের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে, মৃত্যুর সঙ্গে, সুখের সঙ্গে, প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে কবির আলাপ। কিন্তু এই তিন খণ্ড কাব্যগ্রন্থে মাদাম দ নোয়াইল যেন একটি দীর্ঘ স্বগতোক্তি শুনিয়ে গেছেন, যাতে একটি বই দ্বিতীয় কোন প্রাণীর কথা কর্ণগোচর হয় না। এর মধ্যে প্রেমের কবিতা আছে সত্য, যদিও অতি অল্প; কিন্তু সেগুলিতে মনে হয় যেন কামনার আবেগ একাই উচ্ছ্বসিত

হয়ে উঠেছে, এমন একটি প্রতিধ্বনিহীন ধ্বনির মত, যার কোন সাড়া নেই। এ যেন প্রেমের এমন এক নির্য্যাস — যার প্রকাশেতেই তৃপ্তি বোধ হয়, যা' কোন ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করবার ক্ষমতা রাখেনা বা আবশ্যকতা বোধ করে না ; অন্ততঃ প্রিয়জনের গোপন সাড়া বা অস্তিত্বের কোনরকম লক্ষণ যাতে প্রকাশ পায়না। এই কবিতাগুলিতে প্রাণের যে স্পন্দন অনুভূত হয়, তা' গভীর ও দুর্লভ ; কিন্তু সে প্রাণ এমন একজন ব্যক্তির, তার নিজের অস্তিত্বই যার কাছে যথেষ্ট, পৃথিবীতে একমাত্র জীব হলেও যে সমানই সতেজে জীবনধারণ করত। এবং এই যে নিশ্চয়তা, এই যে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা তার সত্তার অন্তরতম প্রদেশ থেকে উত্থিত হয়, তা' সে সত্তাকে স্ফীত করে, কিন্তু তার থেকে কখনো মুক্তি পায়না। সমস্ত বইখানি প্রকৃতির ভাবে ভোর, কিন্তু সে প্রকৃতি কেবলমাত্র কবির জন্য অঙ্কুরিত ও প্রস্ফুটিত হয়েই সন্তুষ্ট থাকে, কবি রস ও গন্ধ গ্রহণ করবে বলেই তার অস্তিত্ব, কবির প্রত্যেক ইন্দ্রিয়-বোধোদয়ে সে নিজেকে বিতরণ ও নিঃশেষ করে ফেলে।"

—Léon Blum.

"যখন মাদাম দ্য কঁতেস দ্য নোয়াইল সাহিত্য-ভুবনে আবির্ভূত হলেন, তখন লোকের চোখ ঝলসে গেল। তারা দেখলে—একটি প্রাচ্যদেশীয়, সুন্দরী, বাগ্মী, সাত্ত্বিক, তরুণী রাজকুমারী রোমান্টিক দলের মহতী বীণা তুলে নিয়ে দৈবী অবলীলাক্রমে তা'তে প্রচুর ঝঙ্কার দিলেন। যাঁরা আমাদের অনুবর্ত্তী, তাঁরা কখনোই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না, এই মনোহর মূর্ত্তির আবির্ভাবে সকলের মনে কি পরিমাণ মুগ্ধ বিস্ময়, ভক্তি এবং মোহের উদ্রেক হয়েছিল। তাঁর মর্ম্মরশুভ্র মুখশ্রী, জলন্ত দীর্ঘ চোখ, টিকলো নাক ও সূক্ষ্ম অবয়ব ; তাঁর লঘু, চঞ্চল চলন-ভঙ্গী ও ভাষার নিক্কণ নিয়ে মাদাম দ্য নোয়াইল ঘরে প্রবেশ করবামাত্রই সমবেত মণ্ডলী তাঁকে সাগ্রহ এবং সাশ্চর্য্য আদর-আপ্যায়নে অভিভূত করে ফেলত। তিনি যখন কথা কইতেন, তাঁর সুরেলা সূক্ষ্মশ্রুতিপূর্ণ তীক্ষ্ণ তারস্বর সাম্রাজ্ঞীর আদেশবৎ তৎক্ষণাৎ সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করত! তাঁর মত করে কে কবে কথা বলতে পেরেছে? * * এই বাক্যালাপে তাঁর সকল শক্তি নিঃশেষিত হত ; স্তবরচনার মত করেই তিনি নিজেকে তা'তে নিয়োজিত করতেন।

গত মহাযুদ্ধের আগে, একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি শুনেছিলুম তাঁকে অল্পকথায় মানবসমাজের মহত্তম প্রতিভাবান ব্যক্তিদের বর্ণনাপূর্ব্বক সাহিত্যের একপ্রকার ব্যাপক রেখাচিত্র আঁকতে। Aeschylus, Villon এবং Goethe ছাড়া কাউকেই তিনি বড় একটা উচ্চ আসন দেননি। কিন্তু বিদ্যুতের এক ঝিলিক সময়ের মধ্যে তিনি প্রত্যেকের এমন একটি ব্যাখ্যা করলেন, যা যথাযথ, অপ্রত্যাশিত এবং স্থানে স্থানে কৌতুকপূর্ণ। সেই সঙ্গে তিনি কোন্‌খানে কার কি দুর্ব্বলতা, কোন্‌টি কার নশ্বর অংশ, তার বাড়াবাড়ি বা তার অভাব কোন্‌খানে, সে সব এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন এমন দ্রুতগতিতে, যেন স্মৃতিমন্দিরের উপর দিয়ে অশ্বারোহী সেনার আক্রমণের মত। আমি এমন আশ্চর্য্য জিনিষ জীবনে কখনো শুনিনি। * * * *

যুদ্ধের পরবর্ত্তী কাল তাঁর পক্ষে হয়েছিল কষ্টকর। যুবজনের যে স্তুতিআরাধনার মধ্যে তিনি এতকাল বাস করেছিলেন, সেই ধূপের ধোঁয়া তাঁর পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের পরে যৌবন হল তাঁর প্রতি বিমুখ। * * একটি যুগান্তরের সূচনা হল, যার যুবকবৃন্দের আদর্শ স্বতন্ত্র, এবং তারা তথাকথিত যুদ্ধপূর্ব্ব লেখকগণের প্রতি অতি রূঢ়ভাব ধারণ করলে। * * * * মাদাম দ্য নোয়াইল এই আংশিক বিদ্রোহে বড়ই ব্যথিত হলেন। * * * কোন কোন বিশেষ স্পর্শকাতর চিত্ত আছে, যাদের পক্ষে নিজের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া আবশ্যক, নইলে তারা মৃত্যু এবং উপেক্ষার হিমশীতল সান্নিধ্য অনুভব না করে পারেনা। যদিও তিনি

জানতেন যে, তিনি এমন কতকগুলি কবিতা লিখেছেন যা' টি'কবে যাবত ফরাসী ভাষা বেঁচে থাকবে। তবু তিনি হতাশভাবে সেই কিম্বদন্তীরূপ উষাকালের স্মৃতির প্রতি ফিরে চাইতেন, যার কিরণসম্পাতে একটি সমগ্র যুগ জ্যোতির্ম্ময় হয়েছিল। তা'হলেও সে সময়ে ভবিষ্যৎ-বাণীরূপ এই শ্লোকটি তিনি রচনা করেছিলেন—

অন্ধকারভরা মুখ, আর্ত্তনাদভরা দুই আঁখি,
এমনই প্রচণ্ড রবে করিব তোমারে ডাকাডাকি,—
মোর সেই আহ্বানের কলরব সহিতে না পারি,
মরণ তুলিয়া লবে দলিত এ হৃদয় আমারি॥"

—Edmond Jaloux.

উপসংহার

পূর্ব্বেই বলেছি যে, মাদাম দ্য নোয়াইল গ্রীক বংশে জন্মগ্রহণ হেতু গর্ব্ব অনুভব করতেন।

Barrés যখন নিম্নলিখিতভাবে তাঁকে তাঁর 'Voyage de Sparte' গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন, তিনি তাই দ্বিগুণ আনন্দ লাভ করেছিলেন—

"প্রত্নতাত্ত্বিকগণ যে গ্রীক সৌকুমার্য্যের নিস্তেজ ধারণামাত্র আমাদের করাতে পারেন, তুমি এসেছ * * আমাদের কাছে দেখাতে তার জীবন্ত অথচ বহু শতাব্দীর নির্ব্বাসনদ্বারা বিনম্র প্রতিরূপ। তোমার পৈতৃক নাম শুনলে অটমান ভাষাসঙ্কট থেকে প্রাচীনজাতির মুক্তিলাভের প্রচেষ্টার কথা মনে পড়ে। কত নিগূঢ় শিহরণ, কত রাজকীয় জরবিকার—এক ফোঁটা গ্রীক রক্তের ইতিহাস দিয়ে কি সুন্দর গ্রন্থ না রচনা করা যেতে পারে!"

কিন্তু Jules Renard-র নিয়ম ছিল যে, তাঁর সমসাময়িক কোন লেখককেই ছেড়ে কথা কবেন না। কঁতেস দ্য নোয়াইল সম্বন্ধে পর্য্যন্ত তিনি এই কড়া মন্তব্য প্রকাশ করেন,—"তাঁর প্রতিভা অতিরিক্ত আছে, কিন্তু ক্ষমতা যথেষ্ট নেই।"

কোন সাহিত্যিক ভোজে যখন তাঁর বিষয় কথা ওঠে, তখন এর উত্তরে J. H. Rosny বলেছিলেন—"যাই বল না কেন, তিনি একমাত্র স্ত্রীলোক যিনি পুরুষমানুষের নকল করেন না।"

Legion of Honour-এর নেত্রীপদস্থ মাদাম দ্য নোয়াইল যেন ফরাসী সাধারণতন্ত্রের জাতীয় কবি হয়ে উঠেছিলেন। তিনি উৎসব ও জুরিসভায় নেত্রীত্ব করতেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থপরিচয় করাতেন, টাউনহলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বিদেশীয় বড়লোকদের অভ্যর্থনা করতেন, ইত্যাদি। বড় বড় জাতীয় অনুষ্ঠানের উদ্যোগকর্ত্তাদের যেন নিয়মই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাঁকে সময়োপযোগী কবিতা লিখে দিতে অনুরোধ করা।

আনা দ্য নোয়াইলের জীবনে টেলিফোন একটি মস্ত স্থান অধিকার করেছিল। যখন অসুস্থতাবশতঃ তিনি বাড়ীর বার হ'তে বা বাড়ীতে দেখা-সাক্ষাৎ করতে অপারগ হতেন, তখন ঐ যন্ত্রটিকে মধ্যস্থ করে' বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দীর্ঘ বাক্যালাপ চালাতে ভালবাসতেন। তাঁর Livre de ma vie (আমার জীবনগ্রন্থ) পুস্তকের ভূমিকায় তিনি প্রশ্ন করেছেন,—'যখন আমি মরে যাব, তখন কে টেলিফোন করবে?' এই ভূমিকারই শেষে এমন ক'টি পংক্তি আছে, যা আজ পড়তে গেলে মন বিচলিত না হয়ে পারে না। "আমি যখন অতিশয় ক্লান্ত বোধ করেছি, যখন অনিবার্য্য অবসাদগ্রস্ত হয়েছি, আশাহত হয়েছি, যখন যুগপৎ নীচতার শেষ সীমা এবং অসীমের শূন্যতার সমক্ষে ত্রাষ্য আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়েছি, তখন অনেকবার মনে মনে বলেছি—আমার মনে হয় আমি কোন কাজে লাগি নি, কিন্তু আমার স্থান পূর্ণ হবার নয়…"

কিন্তু আর কেন? তাঁর নিজের কথা দিয়েই শেষ করা যাক্। এত করে'ও তাঁকে কিছু বুঝতে বা বোঝাতে পারলুম কি না—তাই ভাবছি। নিজের দেশের কবিদেরই কি সম্পূর্ণ বোঝা যায়? ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও আসল মানুষটি সমান সুদূরে থেকে যেতে পারে। তবু ত' তাঁরা নিজের কবিতাস্বরূপ পরিচয়পত্র

নিজেই দিয়ে যান; তারও অর্থ ভিন্ন পাঠকে ভিন্ন ভিন্নরূপ বোঝে। আর এ স্থলে ত' আমাদের কাছে মূল পাঠ দুষ্প্রাপ্য,—টীকাভাষ্যমাত্র সম্বল। আমার নিজের কথা এইটুকু বলতে পারি, তাঁর সমালোচনাবলী থেকে এই সারমর্ম উদ্ধার করেছি যে, তাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরতিশয় সচেতন ছিল,—স্বভাবের সৌন্দর্য্যকে যেন সমস্ত শরীর দিয়ে পান করতেন, জীবন ও জীবনের সুখ-দুঃখকে যেন দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইতেন। তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে—

"প্রকৃতি, জীবন্ত তোমা ধরেছি এ বাহুর মাঝারে।
নিতান্ত কি আসিবে সেদিন,
যেদিন এ আঁখি দু'টি ভরিয়া আসিবে অন্ধকারে?
যেতে হবে সেই দেশে, যেথা নাহি শ্যামলতা-লেশ,
বায়ু নাহি, আলো নাহি, নাহি যেথা প্রেমের প্রবেশ!'

অথবা এটি ওদের জাতেরই ধর্ম্ম; এবং আমাদে সঙ্গে ওদের এইখানেই তফাৎ। আমরা বেঁচে মরে থাকি, আর ওরা প্রতি মুহূর্ত্তের জীবনর পরিপূর্ণ জীবনী-শক্তি দিয়ে টেনে নেয়, মাতৃস্তন্যে দুগ্ধের মত। আন্তস্তে সকলেই সমান, কিন্তু মধ্যে ওদেরই জয়।

"পড়ে' থাকা পিছে মরে' থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই?"

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব্বপশ্চিমের মিলন-যজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল, সেই দিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে তাহার কারণ এ-সাহিত্যে সেই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে, যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনার করিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

—রবীন্দ্রনাথ

সর্ব্বাণী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(১৩)

সেদিন সন্ধ্যাধূসর প্রকৃতির মধ্যে অলস চরণে চলিতে চলিতে সর্ব্বাণীরা তিনজন আর তাদের পথে-পাওয়া নূতন সাথী, এই চারিজন মিলিয়া গল্প-গুজব করিতে করিতে বাড়ী ফিরিলে, বিলম্বে ফেরার জন্য গোলাপসুন্দরীর অনুযোগপূর্ণ উদ্যত রসনা সহসাই নীরব হইয়া গেল। তাদের সঙ্গে যে আসিল, তাঁর মন নিতান্ত ঔৎসুক্যসহকারে তাহাকেই প্রত্যাশা করিতেছিল। ডালি যে নিতান্ত ধিঙ্গী হইয়া উঠিতেছে, তার বিবাহের বিলম্ব আর একান্তভাবেই অন্যায়—একথা তিনি সারা পথ এবং বাড়ী ফিরিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত নানা যুক্তি দিয়াই তাঁর নির্ব্বাক শ্রোতা দুইটীকে, তাঁর স্বামী এবং ভাইকে, অবিশ্রামেই শুনাইয়া চলিয়াছিলেন। একটীবার মাত্র অভয়াচরণ কি জানি কেমন করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "কেন অত রাগ করচো, নেহাৎ ছেলেমানুষ!" তারপর আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। যে বাপ নিজের মেয়ের বয়সের হিসাব রাখে না, তার মেয়ের ভবিষ্যৎ কিই বা না হইতে পারে! এই ঘোরতর দুশ্চিন্তার সমস্তক্ষণটাই গোলাপসুন্দরীর অক্লান্ত রসনা নির্ব্বিবাদে আপশোষ বর্ষণ করিয়া চলিল, অভয়াচরণ মোটরে থাকিতে নির্নিমেষ নেত্রে হিমালয়ের মেঘধূমল গিরিরাজী এবং বাড়ী ফিরিয়া 'পাইওনিয়ারে'র দিকে চাহিয়া বামহস্তের অঙ্গুলীধারা নিজের ধবল চামরের মতই সুন্দর শ্বেত শ্মশ্রুজালকে মৃদু মৃদু আন্দোলিত করিতে থাকিলেন। পত্নীর রসনা যখন সাংসারিক বুদ্ধি-বিহীন পতির উদ্দেশ্যে অনুযোগ বর্ষণ করিতে থাকে, পতির তখন তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বা প্রতিবিধের কিছুই না থাকায়, নিজের শ্বেতশ্মশ্রুর প্রতি একান্তভাবে মনোযোগী হইয়া পড়া ছাড়া উপায় থাকে না। তিনি দেখিয়াছেন এই পথটীই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদের পথ। কিন্তু সুরঞ্জনের পক্ষে ঠিক এরকমভাবে নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব ছিল না। বাহ্যতঃ তাঁহাকে পরম উদাসীনবৎ দেখাইতে থাকিলেও ছোট বোনের কথার মধ্যে এক একটা হুল আসিয়া তাঁহার মনকে ভিতরে ভিতরে যেন বিঁধিয়া দিয়া যাইতেছিল। আসল কথা, মনের মধ্যে তাঁর যে ঘা হইয়া রহিয়াছে, যেখান হইতেই যে অঙ্গেই ধাক্কা লাগুক না কেন, সেই খানেই আঘাত বাজিয়া উঠে। গোলাপসুন্দরীর মুখ দিয়া আধুনিক মেয়েদের সম্বন্ধে যে সব তীব্র মতবাদ বাহির হইতেছিল, তার ভিতর সর্ব্বাণীর প্রতিও অনেকখানি 'ঠেস' রহিয়াছে বলিয়া তাঁর মনে হইল, মন তাহাতে ব্যথিত হইয়াও উঠিতে লাগিল; কিন্তু প্রতিবাদ করিবার সাধ্য কোথায়? এ ব্যথা যে তাঁর অপ্রতিবিধেয়! সামাজিক নরনারীর চক্ষে সর্ব্বাণীর অপরাধ ত' বাস্তবিকই নিতান্ত তুচ্ছ নয়; তার ভিতরকার খবর কেই বা কতটুকু জানে, জানিলেই বা তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতে পারে কয়জন? যারা তাকে চেনে না, তারা ত' তাকে নিবিড় করিয়াই কাদি

মাথায়, আর যারা তাকে চেনে, তারা তাকে উদ্দাম-আধুনিক বলিয়া নিন্দা ছাড়া আর কি-ই বা করিতে পারে? সুরঞ্জন নিজেই কি তার কাজটাকে অন্তর দিয়া সমর্থন করিতে পারিয়াছেন? অথচ অন্তর ব্যথায় যে ভরিয়া উঠিতেও ছাড়ে না!

ছেলেমেয়েরা বাড়ী ফিরিয়াছে খবর পাইয়াই তিনি বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সুকুমারের বন্ধু সঙ্গে আসিয়াছে, সে সংবাদ তখনও জানা যায় নাই, তাই মনে হইল এখনই গোলাপ তাদের ভৎর্সনা করিতে থাকিবেন। সর্ব্বাণীকে যদি বা একটা কঠিন কথা বলিয়া বসেন, প্রতিবাদ করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়; আবার অপ্রতিবাদে তাহাকে তিরস্কৃত হইতে দেখাও তাঁর পক্ষে তেমনই অস্বচ্ছন্দকর। এ স্থলে এখান হইতে সরিয়া যাওয়াই তাঁর সমীচীন বোধ হইল। 'রোজভিলা' একতলা বাড়ী হইলেও এর উপরতলায় বেশ প্রশস্ত একখানি রোদ-পিঠে ঘর ও একটা বাথরুম ছিল। অভ্যাসানুযায়ী নিরিবিলি হইবে বলিয়া গোলাপ-সুন্দরী সুরঞ্জনের সেই ঘরখানিতেই থাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকাল-সন্ধ্যায় খোলা ছাদে পায়চারী করিতে করিতে নীলকান্ত মণিপ্রভ ও কাজলকালো পর্ব্বতরাজীর পিছন হইতে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত—গভীর রাত্রে ইহারই মুক্ত জানালা দিয়া উত্তর ধারে মুসুরী পর্ব্বতোপরি অসংখ্য নক্ষত্রপ্রভ আলোকরাজীর বিস্ময়কর পরিদর্শন, চারিদিকের অনেকদূর পর্য্যন্ত উন্মুক্ত প্রকৃতির পাশাপাশি নাগরিক এবং বস্তুমূর্ত্তির বিচিত্র অপরূপতা প্রভৃতি দর্শন করিয়া তাঁর চির-দিনের আশাহত, ব্যথাকাতর অথচ বাহ্যতঃ পূর্ণ নির্ব্বিকার চিত্ত যেন গভীর শান্তির স্পর্শে স্নিগ্ধ হইয়া আসিত, বহু বহু দূর হইতে পর্ব্বতারণ্যে ও গহন কান্তার-বিহারী, অসংখ্য ফল-পুষ্পে বিচরণশীল সৌরভিত ও স্বাস্থ্যপূর্ণ মন্দানিল তাঁর অন্তর্দ্দাহপূর্ণ ললাট অতি স্নিগ্ধস্পর্শে ছুঁইয়া যাইত, জীবনের তাপদাহ যেন মায়ের হাতের স্পর্শের মতই সে মুছিয়া লইয়া যাইত। অবসাদময় জীবনের একটুখানি প্রতিক্রিয়ায় যেন স্নায়ুমণ্ডল ঈষৎ সবল ও সুস্থ হইয়া উঠিতেছিল। দিবসের অধিকাংশকাল সুরঞ্জন তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট এই ঘরখানিতেই কাটাইতে ভালবাসিতেন। চারিদিকের চারিটা জানালা খুলিয়া দিলে প্রখর রৌদ্রালোকে ঘরখানি এই প্রথম শীতের তীক্ষ্ণ শীতলতা হইতে যথেষ্ট রূপেই উপভোগ্য হইয়া দাঁড়ায়; অভয়াচরণও স্ত্রীর এলাকার কতকটা বাহিরের এই স্থলটাকে অনেকটা নিরাপদবোধে সুবিধা পাইলেই খবরের কাগজটা হাতে লইয়া উপরের এই ঘরটীতে সমবয়সী শালার কাছে আসিয়া জোটেন, দু'জনে মিলিয়া সুখ-দুঃখের কথা বেশী হয় না বটে; বেশীর ভাগ দেশের ও দশের কথাই হয়। তবে মধ্যে মধ্যে যে সমাজের কথায় উদাহরণ-স্বরূপ নিজ নিজ ঘরের কথাও আসিয়া পড়ে না তা বলা চলে না; কিন্তু নিজের ঘরের কথার আলোচনা সুরঞ্জনের পক্ষে যে একটুখানিও আকর্ষণীয় নহে এবং হয়ত সেই হেতুই পরের ঘরের খবরও যে তাঁর কাছে সমানরূপেই আকর্ষণীয়, তাহা দু'দিনেই বুঝিয়া লইয়া অভয়াচরণ ঐ বিষয়ে যথেষ্টরূপেই সাবধানাবলম্বন করিয়াছিলেন। এই চিরসহিষ্ণু স্বামী ও পিতাকে তিনি গভীর সমবেদনার শ্রদ্ধা মনে মনেই অর্পণ করিয়া তাই বড় বেশী সতর্কতার সহিত তাহাকে ভুলাইয়া রাখিতে সচেষ্ট রহিলেন।

তিনি জানিতেন, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারিলেই গোলাপসুন্দরীর সমস্ত রাগটা এখন একা তাঁর উপরেই নয় প্রায় সমান ভাগেই দু'জনকার উপর আসিয়া পড়িবে।

সুরঞ্জন উপরের ঘরে চলিয়া গেলে অভয়াচরণও তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া পড়িতেছিলেন। গোলাপসুন্দরী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "ছুটে পালিও না বাবু, একটু দাঁড়িয়ে শুনে যাও—"

এই ভূমিকাটা করিয়াই বক্তব্যটা এইরূপে প্রকাশ করিলেন, "ওই জি, পি, বাঁড়ুয্যে; কি নাম তা জানি নে বাবু! আজকালের ত' ওই এক ঢঙের নাম করা হয়েচে, তা ওকে ডালির জন্তে একটু ভালো করে

ধরো দেখি নি। সুকুকে বললে সে ত' উড়িয়েই দেয়, তুমি নিজে একবার বলো।"

অভয়াচরণ দাড়ী চুলকাইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "কিন্তু কি জানো! আমার বলার চাইতে সুকুমার বললেই যেন ভাল দেখায়, না? ওদের সমবয়সী, মনের কথাটা যে ওরাই ভাল বুঝতে পারবে কি না; মানে, ওর ডালিকে বিয়ে করতে মত আছে কি না, সেইটে ত' জানা চাই আগে।"

গোলাপসুন্দরীর বিরক্তি-বিরস চিত্ত এই প্রতিবাদে তিক্ত হইয়া উঠিল। ঈষৎ উত্তেজিতকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সে সব জানা হয়ে গেছে! সেবারে সুকুর কাছে বলে নি যে, 'তোমার বোনটী ত' বেশ আপ-টু-ডেট্!' কি বাবু তার মানে জানি নে! সে না কি এখনকার ছেলেমেয়েদের খুব প্রশংসার কথা। সুকু বলেছিল, 'তোমার ওকে পছন্দ হয়ে থাকে ত' বলো, তার ব্যবস্থা করি!' তাতে বলেছিল, 'দাঁড়াও চাকরীটা পাকা হোক, তখন ওসব ভাবা যাবে।' তা চাকরী ত' শুনচি পাকা হয়েই গ্যাছে। এইবারে সোজাসুজি কথা বলে পাকা করাই ভাল।"

"আচ্ছা, সুকুর সঙ্গে কথা বলে দেখি, সে কি বলে।"

বলিতে বলিতে অভয়াচরণ ঈষৎ যেন চিন্তিতমুখেই বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, বাহিরের দিক হইতে জুতার শব্দ শুনিয়াই হঠাৎ এই ঘরটার বাহিরের দিকের দুইটা দরজা দিয়া দু'দল হইয়া চারজন ছেলেমেয়ে একসঙ্গেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। তাদের মধ্যে বোধ করি কোন একটা বাজী রাখিয়া দৌড় হইয়াছিল! কিন্তু মেয়েরা দু'জনেই বিলক্ষণ হাঁপাইয়া পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া সর্ব্বাণী! সে ঘরে ঢুকিয়াই সব্বার চাইতে নিকটস্থ চেয়ারখানায় ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল এবং বসিয়াও ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিল। কিন্তু ডালি পরিশ্রান্ত হইলেও তার মতন গভীরভাবে ক্লান্ত হয় নাই, পুরুষ দু'জনকার দিকে হাস্যোজ্জ্বলনেত্রে চাহিয়া উৎফুল্লস্মিতমুখে বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে সুকুমারকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল,—"কি হলো মশাই! মেয়েরা অকর্ম্মণ্য, ননীর পুতুল, তুলে ধরতে গলে পড়ে, না? সুযোগ পেলে তারাও যে তোমাদের সঙ্গে সকল বিষয়েই সমান পাল্লা দিতে পারে, এটা তো এক্ষুণি 'প্রুফ' করে দিলুম কি না?

সুকুমার হঠাৎ হাসিয়া গড়াইয়া পড় পড় হইল;— "হু-উ, হি-হি-হি! ঐ যে আর একজন কি রকম মূর্ত্তি করে রয়েছে দেখতে পাচ্চো না! এক্ষুণিই হয়ত তিনি 'প্রুফ' করে দেবেন যে—, ও 'ইয়েস্'! আমি যে জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে পড়েছি এটাও আজ দেখছি বারে বারেই 'প্রুফ' করছি!"

সুকুমার এক লাফে দুই পা ধূলা লইয়াই সর্ব্বাণীর গদি-মোড়া চৌকি-খানার পাশে গিয়া উপস্থিত হইল। দূর হইতেই সে দেখিতে পাইয়াছিল, সর্ব্বাণীর সর্ব্বাঙ্গ অবসাদে যেন এলাইয়া আসিতেছিল এবং শীতার্ত্তের মতই সে থর-থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাদের এই দৌড়ানোর প্রতিযোগিতাটা যে আজিকার পরিশ্রমের উপর সর্ব্বাণীর পক্ষে অসঙ্গত উপদ্রব হইয়া পড়িয়াছে, মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা বুঝিয়া তার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গিয়া তাহাকে ঈষৎ ভীত করিয়া তুলিল। ত্বরিতে কাছে আসিয়া সে দেখিল, ততক্ষণের মধ্যেই সর্ব্বাণীর দাঁতে দাঁতে চাপিয়া গিয়াছে; সমস্ত শরীর তার অবশ ও শীতল।

এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। তারা যখন ঘরে ঢোকে, মায়ের হাতের চুড়ির শব্দ যেন শুনিতে পাইয়াছিল; কিন্তু এখন ইতস্ততঃ চাহিয়া কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইল না। মনে মনে ইহাতে আপাততঃ ঈষৎ আশ্বস্ত হইলেও ভয়-ভাবনাও ত' বড় কমও হয় নাই। ইঙ্গিতে মিঃ ব্যানার্জ্জীকে কাছে ডাকিয়া দু'জনে ধরিয়া তাহাকে নিকটস্থ কৌচে শোয়াইয়া দিল। ডালি শুষ্কমুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গভীর অনুশোচনাপূর্ণ আত্মগ্লানিতে তার সমস্তদিনের সব কিছু আশা-উৎসাহ এবং মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বের জয়ের আনন্দ নিঃশেষ হইয়া ডুবিয়া গিয়াছিল

এবং তাদের স্থলে জাগিয়া উঠিয়াছিল একটা নিদারুণ আশঙ্কাময় গভীর উদ্বেগ। উঃ, তার জন্তই, শুধু তার জন্তই এই হইল! কেন সে মা'র কথা শোনে নাই, কেন সে নারী-পুরুষের সহ-সামর্থ্য প্রমাণ করিতে গিয়া সারাদিনের পরিশ্রান্ত এবং চিরদিনের সমতলবাসিনী সর্ব্বাণীকে পাহাড় হাঁটার পরে আবার এত বড় একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া শ্রান্ত করাইল? এখন যদি সে না বাঁচে?

সর্ব্বাণীকে ভাল করিয়া শোয়াইয়া দিয়া সুকুমার তার গায়ের শালখানা সন্তর্পণে খুলিয়া ফেলিতে লাগিল, আর মিঃ ব্যানার্জ্জী ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়া ডালির নিকটে দাঁড়াইয়া তাহার ভয়ার্ত্ত মুখের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভয় পাবেন না, ক্লান্তিতে ফিট হয়েচে, এক্ষুণি কেটে যাবে। একটু ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসুন, আর শীগ্‌গির যাতে গরম দুধ কি চা পাওয়া যায় তারই ব্যবস্থা করুন।"

গভীর আশ্বাসের নূতন বলে বলীয়ান হইয়া ডালির আড়ষ্ট দেহ-মন যেন উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিল, সে আজ্ঞাপালনার্থ ছুটিয়া চলিয়া গেল। যাওয়ার সময় সুকুমার উঠিয়া আসিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিল,—"আমরা নাড়ী দেখেছি, কোন ভয় নেই; দেখিস মা যেন টের না পান, বকুনি খেয়ে মরবি।"

সর্ব্বাণীর দিকে ভয়ের বিশেষ কারণ নাই জানিতে পারিয়াই—ডালির এই ভাবনাই প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। মা আজ আর রক্ষা রাখিবেন না। বাস্তবিক সেই ত' যত অনর্থের মূল! সুকুমার যে তাকে আড়াল করিবার জন্ত মা'র কাছে এত বড় কাণ্ডটা লুকাইতে প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা জানিয়া তার মন গভীর কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

শিশু-সাহিত্য কিরূপ হওয়া উচিত ও এ বিষয়ে মহিলাদিগের কর্ত্তব্য

শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক, বি-এ, বি-টি, ডিপ্লোমা অফ এডুকেশন (লণ্ডন)

শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? এই প্রশ্নের উত্তর মাত্র একটি কথায় হইতে পারে না, নানা ভাবে নানা দিক দিয়া এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হয়। তবে সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক—এই তিনের স্ফুরণ ও উন্নতি। যাহাতে এই তিনটি দিক দিয়াই শিশু পূর্ণবিকাশ লাভ করিতে পারে, সেজন্য শিশুকে বিনা বাধায় বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ দিতে হইবে।

সকলের উপরে দরকার মানসিক স্বাধীনতা। মন যাহাতে স্বাধীনভাবে বাড়িতে পারে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যে মন বাঁধা, জড়, তাহা বর্দ্ধিষ্ণু নহে, উন্নতিশীল নহে। সেইরূপ নরনারীপূর্ণ সমাজও জড়, দেশও জড়।

শিশুর মনের এই প্রসার যাহাতে হইতে পারে তাহার জন্য ছেলেমেয়েরা যাহাতে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারে, মনের ভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত করিতে পারে, শৈশব হইতে সে সুযোগ তাহাদের দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঐ দুয়েরই একান্ত অভাব দেখা যায়। এটি অবশ্য আমাদেরই শিক্ষা-প্রণালীর দোষ; আমাদের ছেলেমেয়েরা শৈশব হইতেই নির্ব্বিচারে মুখস্থ করিতে শিখে। স্কুল-কলেজের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এই মনোভাবই দেখা যায় যেন যাহা কিছু শিখিতেছে সব পরীক্ষা পাশের জন্য; পরীক্ষা পাশ করিলেই সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। শৈশব হইতে যাহাতে ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত হয়, মনের চিন্তাগুলি স্পষ্ট ও সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারে, তাহার জন্য পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী সকলেরই কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার।

প্রথমতঃ, আমাদের নিজেদের মন মুক্ত, স্বাধীন রাখিতে হইবে। নিজেদের মনে কোনও রকম bias বা repression থাকিলে চলিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, শিশু যাহাতে তাহার সকল রকম পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সহিত নিজেকে মিলাইয়া লইতে পারে, সেজন্য তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষা-প্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা শিশুর শিক্ষায় অগ্রসর হইয়া থাকেন এবং সেজন্য তাঁহারা আশ্চর্য্য রকম উন্নতিও করিয়াছেন।

আমাদের দোষ, আমরা শৈশব হইতে শিশুদিগকে নানা প্রকার suggestion দিয়া থাকি। "এটা কোর না, ওটা কোর না"—এ তো আছেই; সকল ব্যাপারেই তাহারা আমাদের কথা মানিয়া চলুক, এই চাই। তাহাদের অভিজ্ঞতা নাই, বিচার-বুদ্ধি বিকশিত হয় নাই সুতরাং কিছু পরিমাণে suggestion দিয়া তাহাদের চালনা করা দরকার হয় কিন্তু আমরা সাধারণতঃ ভুল পথে তাহা খাটাইয়া থাকি। অতিরিক্ত suggestion-এর ফলে শিশুরা আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে না, মায়ের আঁচল ধরা ছেলেমেয়ে তৈরী হইয়া উঠে।

জুজুর কথা বলিয়া, ভূতের গল্প বলিয়া অনেক স্থলে শিশুর দৌরাত্ম্য থামান হয়, অনিচ্ছুক শিশুকে দুধ খাওয়ান হয়, ফলে শৈশব হইতেই দুর্ব্বল ও ভীরু চিত্ত গঠিত হইয়া উঠে। ইহা হইতেই পরে নৈতিক ভীরুতার সৃষ্টি হয়।

এই সকল দিকে পিতামাতা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর যেমন দৃষ্টি রাখা দরকার, অপর দিকে শিশুরা যাহাতে সৎসাহিত্য পড়িতে পারে, তাহাও দেখা দরকার। অনেক শিশুপাঠ্য গল্পের বই ও পত্রিকায় দেখিয়াছি, গল্পের বিষয় থাকে ভূত; গল্পগুলি এবং তাহার ছবিগুলি এমন যে শিশু ভয় পায়। চুরি, জুয়াচুরি, ঠকানো, শিক্ষকদের প্রতি অবজ্ঞা

ও অসম্মানজনক ভাবের গল্প ইত্যাদি। শিশুচিত্তের পক্ষে এই সকল বিষয় অত্যন্ত অনিষ্টকর। এই সকল বিষয় বাদ দিয়াও তাহাদের আনন্দ দিবার জন্য অন্য নানা রকমের গল্প তাহাদের জন্য লেখা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের এবং অন্যান্য দেশের ইতিহাস হইতে অনেক গল্প সহজ সরল করিয়া তাহাদের জন্য লেখা যাইতে পারে; দেশীয় ও বিদেশীয় পৌরাণিক কাহিনী, সহজ ভাষায় সরল ভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, জীবজন্তু, ফুলফল, পাখী প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা, বিভিন্ন দেশের বৃত্তান্ত, লোকেদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি, বিশেষ করিয়া বিভিন্নদেশের শিশুদের বিষয়, নানা দেশের বীর নর-নারীর কাহিনী প্রভৃতি লইয়া শিশুদের উপযোগী পুস্তক লেখা যাইতে পারে, আনন্দ দিবার জন্য এমন অনেক গল্প লেখা যায় যাহা তাহাদের পক্ষে অনিষ্টকর হইবে না।

সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রসার, কল্পনা ও চিন্তার অনুশীলন এবং আনন্দলাভ। ঐ সকল বিষয় হইতে এ সকলই হইতে পারে।

শিশু-সাহিত্যের বিষয়গুলি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা দেখা গেল। কি প্রণালীতে সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা একটু বলিতে ইচ্ছা করি। নানারূপ সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া দেশের ভাল ভাল লেখকদিগের নাম বা তাঁহাদের ইতিহাস বা তাঁহাদের সমস্ত লেখার বিষয় কেবল জানায় কোনও উপকারিতা নাই। শিশু এবং প্রবীণ সকলের সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। প্রকৃতপক্ষে দরকার সৎসাহিত্যের সহিত বাস্তবিক পরিচয়; সাহিত্য এমন ভাবে আয়ত্ত করিতে হইবে যাহাতে সেই সাহিত্যের রচনা-ভঙ্গীর (style) প্রভাব শিশুর উপর পড়ে। রচনা-ভঙ্গী বলিতে কেবল ভাষা বুঝাইতেছে না; লেখা ও ভাব, ভাষা ও চিন্তার ধারা উভয়কেই বুঝাইতেছে। শিশুর হাতে এমন সাহিত্য দেওয়া উচিত, যাহার ভাষা ও ভাব উভয়ের প্রভাব যেন তাহার মনের উপর কাজ করিতে পারে। সাহিত্যের এই সৎ প্রভাব অনেক পরিমাণে শিশুদের উপর পড়িতে পারে যদি তাহাদের কিছু কিছু মুখস্থ করানো যায়। মুখস্থ দ্বারা এই উপকার পাওয়া যায় যে, ভাষার সৌন্দর্য্য শিশুরা কিছু কিছু আয়ত্ত করিতে পারে; তাহাদের নিজেদের কথাবার্ত্তা ও লেখার মধ্যে এই সৌন্দর্য্য তাহারা ফুটাইয়া তুলিতে পারে। ভাল ভাল লেখা পড়িলে, ভাল ভাল লেখার সহিত পরিচয় থাকিলে, সহজেই চিন্তার উন্নতি হইতে থাকে এবং সুন্দররূপে নিজের চিন্তা প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। সকল কাজের জন্য যেমন অভ্যাস দরকার, ভাষা শিক্ষার জন্যও তেমন অভ্যাস দরকার, চিন্তা করিতে শিক্ষা করা দরকার। সৎসাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিলে চিন্তার অভ্যাস গঠিত হয়; সেইজন্যই অনেক সময় মুখস্থ করানো দরকার।

মুখস্থ কিরূপে করিবে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। কতকগুলি কবিতা বা ভাল ভাল উক্তি অথবা রচনাংশ কেবল মুখস্থ করিলেই কাজ হয় না। অনেক সময় তাহাতে শিশুদের বিরক্তি আসে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। মুখস্থ এবং অভিনয় যদি এক সঙ্গে করানো যায়, তাহাতে অনেক উপকার হয়। খেলা ও অভিনয় করিতে শিশু অত্যন্ত ভালবাসে। দেখা যায় তিন বৎসরের পর হইতে নিজে কিছু করিতে শিশু অত্যন্ত আনন্দ পায়, তাহারা নিজ হইতেই এইরূপ নানা খেলা করে। শিশুদের এই স্বাভাবিক বৃত্তির সুযোগ আমরা কাজে লাগাইতে পারি। বিভিন্ন বয়সের উপযোগী নানারূপ ভাল কবিতা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের শিখাইয়া, তাহাদের দিয়া আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতি করাইতে পারি। ভাল ভাল গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনচরিত বা ঐতিহাসিক ঘটনা প্রভৃতি শিশুদের পড়াইয়া তাহার পর তাহা লইয়া খেলা, আবৃত্তি, অভিনয় চলিতে পারে। পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী অনায়াসেই ইহা করাইতে পারেন। শিশুরা যখন এইরূপ অভিনয় করিবে তখন কেবল যে নিজের নিজের অংশের বক্তব্যই জানিবে বা শিখিবে তাহা নয়, সকলেই সমস্ত অংশটুকু শিখিবে।

এইরূপে খেলার মধ্য দিয়া বিষয়টি তাহাদের মনের মধ্যে দীর্ঘকালস্থায়ী হইবে অথচ তাহার জন্য কোনও রূপ বেগ পাইতে হইবে না, বেশ আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির মধ্য দিয়া তাহারা শিখিবে।

সৎ সাহিত্যপাঠে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে শিশু আনন্দও লাভ করে। যে সাহিত্য হইতে শিশু মনে আনন্দ পায় না, তাহা হইতে কোন জ্ঞানও বিশেষ লাভ করিতে পারে না। সুলিখিত গল্প শিশুদের পাঠ করিতে দিতে হইবে। কোনও তুচ্ছ আবেগপূর্ণ বা অসার বিষয় শিশুদের হাতে দেওয়া একেবারেই অনুচিত; Robinson Cruso, Gulliver's Travels এই ধরণের পুস্তক যে শিশুদের পক্ষে কত ভাল তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; এই সকল পাঠে শিশু যেমন জ্ঞান লাভ করে, তাহার কল্পনার অনুশীলন হয়, তেমনি রসও পায়।

শিশু-চরিত্রের মধ্যে একটা দিক আছে, তাহারা নিজেদের ছোট বলিয়া ভাবিতে একেবারেই ইচ্ছা করে না; নিজেদের বড় বলিয়া ভাবিতে, বড়দের মত আচরণ করিতে উহারা ভালবাসে। তাহাদের চারিদিকে যে জগৎ দেখে, বড়দের যে কাজ করিতে দেখে, নিজেদের সেই রকম কল্পনা করিয়া সেই ভাবে কাজ করিতে ভালবাসে। তাহাদের কার্য্য seriously না লইলে তাহারা ক্ষুণ্ণ হয়, অপমানিত বোধ করে। সেই জন্য শিশুদের উপযোগী পুস্তকে তাহাদের কার্য্যকলাপ লইয়া কোনও রকম উপহাস করা উচিত নয়।

শিশুদের জন্য সুলিখিত পুস্তক বয়স্কদেরও পড়িতে ভাল লাগে।

সাহিত্য মানব সমাজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়। যে সমাজ, যে দেশ যত উন্নত, তাহার সাহিত্যও তত উন্নত হয়। শিশু-চরিত্র গঠন করিয়া তুলিতেও সাহিত্যের একান্ত দরকার। আমাদের দেশে শিশুদের উপযোগী সাহিত্যের অভাব এখনও খুব আছে; আমাদের সচেষ্ট হইয়া এই অভাব দূর করা উচিত। যাঁহাদের লিখিবার ক্ষমতা আছে তাঁহারা অগ্রসর হউন, দেশের শিশুদের জন্য সৎসাহিত্য সৃষ্টি করুন। দেশের শিশুদের উপরই জাতির ও দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

আলো-ছায়া

শ্রীগীতা দেবী

"ঐ সূর্য্য ডুবে গেল, দিগন্তের মুখে বিবর্ণ হাসি, আস্তে আস্তে তাও মিলিয়ে আসছে, আমিও হঠাৎ হয়ত অমনি করে একদিন মৃত্যু-সাগরে ডুবে যাব, তখন কোন ডুবুরীই খুঁজে পাবে না আমায়। এই সতের বছর বয়সেই জীবনের পরিভ্রমণ আমার শেষ হয়ে গেল? আমি চলব—আরো দূরে চলব—অনেক দূরে! সবাই এগিয়ে যাবে আর আমি এমনি বালিশে ভর দিয়ে দিন কাটাব? না—না, কেন—?"—জানুর ওপর মুখ রেখে শিলা আরো কতক্ষণ এমনি অর্থহীন চিন্তায় ডুবে থাকত তার ঠিক নেই, পেছনে শাড়ীর খস্‌খস্ ও মিষ্টি হাসির শব্দে আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে একটু হেসে অভ্যর্থনা জানালে, "বস ভাই।" মাধবী পরিহাস-তরলকণ্ঠে বললে, "বাব্বা, এত ধ্যানে তন্ময়, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি লক্ষ্যও নেই, কি এত ভাবছ বলত?" "ভাবছি?"—একটু অন্যমনা হ'য়ে শিলা উত্তর দিলে, "ভাববার আর কি আছে, কেবল নতুন নতুন 'প্রেসক্রুপ্‌সানে'র স্বপ্ন দেখছি।"

মাধবী কাছে সরে এল, শিলার হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, "সুদেববাবুর কথা ভাবছ, না ভাই?" বুকের দীর্ঘশ্বাসটা সবলে প্রতিরোধ করে শিলা জোর করে একটু হাসলে—কোন জবাব দিলে না।

স্বভাবতঃই সে স্বল্পভাষী, কিন্তু মাধবীর মত হাস্য-চপল মেয়ের সে জন্য সখীত্বে কোন বাধা হয় নি, সে আপন মনে নিজের স্বামী-সৌভাগ্যের গল্প করে যায়, অনেকক্ষণ বকে যাবার পর অপর পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে তার চমক ভাঙে, ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, "যাও,—তুমি কিছু শুনছ না, আমি কেবল বকে মরছি।" কথায় কথায় আদুরে মেয়ের মতন ঠোঁট ফুলানো তার স্বভাব।

শিলার মন তখন বর্ত্তমানের গণ্ডি ছাড়িয়ে অতীতে ফিরে গেছে, তার অল্প কয়েকদিনের স্বামী-সাহচর্য্যের ছোট-খাটো ঘটনার টুকরোগুলি দিয়ে স্বপ্ন-রচনা করতে লেগেছে। কবে তাকে অসুস্থ দেখে সুদেব তার নিত্য নৈমিত্তিক সান্ধ্যভ্রমণ স্থগিত রেখে কাছে বসেছিল, কপালের ওপর সেই স্পর্শটা এখনও বেশ অনুভব করতে পারে শিলা। একদিন সে সুদেবের 'রিষ্ট-ওয়াচ্' লুকিয়ে রেখে বেচারাকে যা জব্দ করেছিল!—এমনি সব বিক্ষিপ্ত স্মৃতি! মাধবীর কথায় তার সংজ্ঞা ফিরে আসে, লজ্জিত হাস্যে বলে, "বা রে, শুনছি বৈ কি।"

মাধবীর মুখে সেই এক প্রসঙ্গ। ওর কেশ-বেশ, কথা-বার্ত্তা, প্রতি পদক্ষেপটি পর্য্যন্ত স্বামী-প্রেমে অভিষিক্ত। শিলা মুগ্ধচোখে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ মাধবী সেই সনাতন প্রশ্ন করে বসে, "তুমি কি করে এতদিন ছেড়ে আছ ভাই? আমি হলে কক্ষণো পারতুম না।" এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারলেই শিলা বেঁচে যেত কিন্তু এই অবুঝ মেয়েটা কিছুতেই যে বোঝে না তার ব্যথা কোথায়! তার কথার উত্তরে যেন আত্মরক্ষা করবার জন্যই বললে, "জান তো, বিচ্ছেদ না হলে ভালবাসার দাম বোঝা যায় না!" মাধবী অবজ্ঞাভরে ঠোঁট ওল্টালে, "কাজ নেই আমার দাম বুঝে। দাম বুঝতে বুঝতেই যদি মরে গেলুম, তবে দর-দস্তর করে লাভ কি?" ওর দিকে চেয়ে চেয়ে শিলার চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। তার সযত্ন-অঙ্কিত সিঁদুর টিপটি থেকে আরম্ভ করে, পায়ের আলতা, ঠোঁটের পান—সমস্ত যেন অনুরাগে লাল।

"ওকি তুমি কাঁদছ ভাই?"—মাধবী ব্যস্ত হয়ে তার মুখ তুলে ধরে। অপ্রতিভ হাস্যে চোখের জল ঢাকতে গিয়ে আরো অবাধ্য হয়ে ওঠে, ধরা গলায় শিলা বললে, "ধেৎ, কাঁদব কেন, এই সময়টা জ্বর আসে কি না!" মাধবীর মুখে সকরুণ সহানুভূতি ফুটে ওঠে। আহা,

এই বয়সেই যেন সব সাধ ফুরিয়ে গেছে, বেচারা!

মাধবী উঠে পড়ল, "যাই ভাই, আসবার সময় হল। জানোই তো আপিস থেকে এসে সবার আগে এই প্যাঁচা মুখটি না দেখলে চক্ষে অন্ধকার দেখেন।" গর্ব্বসুখ-উচ্ছ্বসিত সলজ্জ হাস্যে তার চোখ-মুখ জ্বল্ জ্বল্ করে। সেই দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে শিলা বলে, "আচ্ছা, কাল এস কিন্তু।" এত হাসি, এত সুখ, তার দুর্ব্বল দেহ-মন সহ্য করতে পারে না।

২

পিওন এসে দাঁড়ায়। শিলার আশাব্যাকুল চোখ দু'টি চঞ্চল হয়ে ওঠে, বুকের ভেতর হৃদপিণ্ড দ্রুত তালে নৃত্য সুরু করে, তবু সাহস করে চিঠির জন্য হাত বাড়াতে পারে না, পাছে সমস্ত দুরাশা তার সংক্ষিপ্ত একটি নীরস 'না'-র আঘাতে চুরমার হয়ে যায়।

দু' সপ্তাহ, উঃ কতদিন—মনে হয় যেন কত যুগ পরে আজ চিঠি এল। বার বার পড়েও তৃপ্তি হয় না। অনন্ত বিচ্ছেদ-সমুদ্রের এই একটি মাত্র সেতু। এর আবিষ্কর্ত্তাকে সে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানায়।

মেয়ের শীর্ণ শুষ্ক মুখে প্রফুল্লতার ছায়া দেখে মা'র চিন্তাপীড়িত হৃদয়ও খুসীতে ভরে ওঠে, "আজ একটু শরীরটা ভাল মনে করছিস, না রে রাণী?—ডাক্তার সাহেবের ওষুধের গুণ আছে বৈ কি!" শিলার অন্তঃস্তলের দীর্ঘশ্বাস গুমরে ওঠে, ভাবে, মা'র স্নেহান্ধ দৃষ্টি শুধু দেহের ওপরেই নিবদ্ধ কেন?—সুস্থতার উৎস কোথায় তা কি জানতে পারেন না?

• • • •

পুব দিকের জানালা খুলতেই মাধবীর ঘর দেখা যায়। দশটা বেজেছে, আহার-রত স্বামীর সামনে পাখা হাতে বসে সে সহস্র অনুযোগ করে, "বা রে, অমন করে ঠুকরে খেলে চলবে না। সারাটা দিন যে গাধার খাটুনি খাটবে—।" স্বামী কপট গাম্ভীর্য্যে হাত গুটিয়ে বললে, "তুমি আমায় 'গাধা' বলে গালাগালি দেবে আর আমি খাব?"—মাধবী ভ্রূ তুলে চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল, "মাগো,—কখন আবার তেমন গালাগালি দিলুম?" একটুতেই তার অভিমান হয়, চোখের পাতা ভিজে ওঠে। তারপর মান-ভঞ্জনের পালা।

জুতোর ফিতেটি পর্য্যন্ত সে নিজের হাতে বেঁধে দেয়। শিলা তৃষিত চোখে চেয়ে থাকে। সার্থক—মাধবীর জীবনই সার্থক। গাড়ী নেই, হেঁটেই আপিস যায় স্বামী, মাধবী জানালার পাখী তুলে দাঁড়িয়ে আছে, মোড় ঘুরবার আগে একবার সহাস্য দৃষ্টিবিনিময় করে ওর স্বামী চোখের আড়াল হয়ে গেল। মাত্র কয়েক ঘণ্টার অদর্শন, তাতেই মাধবীর চোখ ছল্ ছল্ করছে—এত ছেলেমানুষ সে।

শিলার মন ধিক্কারে ভরে ওঠে, সামান্য একটা চিঠি,—তাতে বিরহীর ব্যাকুলতা নেই, প্রেমের উচ্ছ্বাস নেই, শুধু যেন শুভার্থী আত্মীয়ের চিরন্তন কুশল-প্রশ্ন। তাতেই সে একেবারে আনন্দে জগত-সংসার হারিয়ে ফেলেছিল। এমন কাঙাল—ছিঃ। ব্যবসা ক'রে, কেবল লাভ-ক্ষতির হিসাব রেখে সুদের পাকা হিসেবী হয়ে পড়েছে, চিঠিতেও সেই রকম ধারা। একটু বাজে খরচ করলে কি এমন ক্ষতি হত!

হাতের মুঠিতে চিঠিটা শক্ত করে চেপে ধরে তৃষ্ণার্ত্ত প্রাণের সমস্ত আকুলতা দিয়ে,—কিন্তু বৃথা—তা থেকে একবিন্দু অমৃত-নিঃসরণ হয় না। বিবেক তিরস্কার করে, 'পরশ্রীকাতরতা'! সে কি করে বোঝাবে, এ তার হিংসা নয়, দ্বেষ নয়। তবে কি? তাও তো সে প্রকাশ করে বলতে পারে না কি?

চিঠির জবাব দিতে বসে অজস্র অভিমান-অনুযোগ আকণ্ঠ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তবু প্রাণপণে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে। না, সে আর কাঙালের মতন ভিক্ষাপাত্র পেতে থাকবে না। সুদেবকে এখানে আসার জন্য যে জায়গায় মিনতি ছিল, বার বার কালির আঁচড়ে সেটা ঢেকে দিলে।—

এই রকম ঢেউ, রোগের অলক্ষ্য প্রাচীরে ঘা-

ফোটে, হয়ত দু'পক্ষ থেকেই, তবু প্রতীকারের উপায় নেই।

৩

বিনিদ্র রাত যেন আর কাটতে চায় না। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে মা জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, শিলা উঠে গিয়ে সেটা খুলে দিলে। বাইরে সীমাহীন অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে, মাথার ওপর কালো আকাশের অবাধ প্রসারিত বুকে অগণিত তারার বিন্দু—যেন হীরার কুচি।

সে দিকে চেয়ে চেয়ে বুকের ভেতর তোলপাড় করে ওঠে, কি যে তার নালিশ সে মুখ ফুটে জানাতে পারে না, শুধু ফোঁটার পর ফোঁটা চোখের জলে বালিশ ভিজে যায়।

"হ্যাঁ রে রাণি, উস্‌-খুস্ করছিস কেন ? ঘুম হচ্ছে না ?" মা'র উদ্বিগ্ন প্রশ্নের উত্তরে, রুদ্ধ কণ্ঠ কোন রকমে পরিষ্কার করে শিলা বললে, "কি জানি, মোটে ঘুম আসছে না।" মা চিন্তিত হয়ে বলেন—"কাল সকালেই তা'হলে ডাক্তার সাহেবকে একবার ডাকাই।"

অন্ধকারে শিলার চোখ জ্বলে ওঠে, বিদ্রোহী মন সবেগে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়।—না, না, সে আর এরকম অত্যাচার সইবে না। অন্ধ স্নেহের অবিশ্রাম উপদ্রবে তিলে তিলে আত্মহত্যা করতে আর সে পারে না। ঠোঁটের কোণে একটু বিদ্রূপের হাসি খেলে যায়—ডাক্তার সাহেবের চোদ্দপুরুষ এলেও পারবে না।

আরসীর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিদারুণ গ্লানিতে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। জীবনের বসন্তকাল—এই বয়সেই কি দশা হল, মাথার চুলগুলো পাতলা হয়ে গেছে, শীর্ণ পাণ্ডুর গাল, রক্তশূন্য ঠোঁট, দীপ্তিহীন চক্ষু। হাতের চুড়ি যেন গলে পড়ছে—মা গো। সুসজ্জিত ঐশ্বর্য্য সমারোহের মাঝে তার নিজের দীনতা আরো যেন প্রকট হয়ে ওঠে। নিষ্ফল আক্রোশে ইচ্ছে করে সব চুরমার করে দেয় ভেঙে—ঐ আরসী, ঘড়ি, পুতুল, ফুলদানী—সমস্ত।

৪

মাঝে সুদেব এসে তাকে দেখে গেছে, প্রায় ছ'মাস হয়ে গেল। মাত্র দু'দিন ছিল — তবু কি আনন্দেই না তার মুহূর্তগুলি ভরে উঠেছিল। তাও কি ছাই একটু প্রাণ খুলে গল্প করার যো আছে! মা হঠ্ করে ঘরে ঢুকে পড়ে বললে, "রাণি, এই সময়টা তোমার জ্বর আসে, এখন একটু চুপ করে থাক মা, লক্ষী মেয়ে।" সুদেব তাড়াতাড়ি শিলার হাত ছেড়ে দিয়ে অপ্রতিভ মুখে চুপ করে গেল, শিলা নিরুদ্ধ ক্রোধে দেওয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। সব বেসুরো হয়ে গেল। সুদেব ক্ষুব্ধ মৃদুস্বরে বললে, "সত্যি, এই জন্যেই এখানে আসতে আমার ইচ্ছে হয় না—বড় সঙ্কোচ হয়।"

ঠিক সেই সময়ে মাধবী হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়েই অপ্রস্তুত হয়ে পালিয়েছিল, সুদেব এক নিমেষের জন্য সেদিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল, সেটুকুও শিলার কাছে অসহ্য লাগে। বিরক্ত হয়ে ভাবলে, "এদিকে সরল হলে কি হবে, ভারী বেহায়া মেয়ে মাধবী! নিজের তো এই শ্রীহীন রুগ্ন চেহারা, আর মাধবী যেন স্বাস্থ্যের লাবণ্যে পরিপূর্ণ, তাতে যদি কেউ মুগ্ধ হয় আশ্চর্য্য কি! কিন্তু তবু—— ।"

স্বামীর হাত চেপে ধরে বলে ওঠে, "আচ্ছা, সত্যি বল তো, আমি মরে গেলে ঐ মাধবীর মতন একটি বউ পেলে তুমি খুব খুশী হও, না?" তার মাথায় হাত বুলিয়ে, সস্নেহ ভর্ৎসনা করে সুদেব বলেছিল, "ছিঃ, ওসব বাজে কথা ভেবে মন খারাপ কর কেন? তুমি ভাল হয়ে আবার কবে আমার লক্ষীছাড়া ঘরে যাবে, এই যে আমার এখনকার একমাত্র কামনা!" এ আশ্বাসে নিঃসংশয় হতে না পারলেও তার বুক কৃতজ্ঞতায় ভরে যায়। অকারণ বেদনায় চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। স্বামীর স্বাস্থ্যপূর্ণ সবল বক্ষে অবসন্ন মাথা রেখে পরম পরিতৃপ্তিতে চোখ বুজে আসে—স্বর্গ, এই কি? কতদিন—কতদিন সে বঞ্চিত হয়েছিল! দুর্ব্বল, শীর্ণ হাত দিয়ে সে জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন আশ্রয় করে থাকে—যাবে না—কক্ষণো সে এ ছেড়ে যাবে না—

স্বর্গেও নয়। তার এই নিষ্ফল স্পর্ধা দেখে বিধাতা অলক্ষ্যে মুখ টিপে হেসেছিলেন হয় তো!

সেই দু'টি দিনের স্মৃতিও ক্রমে মলিন হয়ে আসে। অবিরাম নাড়াচাড়া করে সে স্মৃতির উজ্জ্বলতা কমে গেছে। কখনো ভাবে, কেবল সমবেদনা···সবাই বলে "আহা", এমন কি সুদেবের দৃষ্টিতেও সেই ক্লান্তিকর করুণা—অনুরাগ নেই। কেন, এতই অসহায় দয়ার পাত্রী সে? চায় না সে কারুর দয়া।

৫

দুর্ব্বল শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বলতর হয়, অবশেষে বিছানার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধন। মাধবী কোন কোন দিন শিলার মাকে বলে, "মাসীমা, ওকে সুদেববাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলেই ভাল করতেন।" মা বললেন, "আগে বাছা আমার প্রাণে বাঁচুক, তারপর আর সব।" শিলা মনে মনে প্রতিধ্বনি করে, "হ্যাঁ, বুকটা শুধু ধুক্ ধুক্ করলেই হল, প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে গেলই বা।"

বাইরে গাড়ীর শব্দ শুনে কোটরগত চোখ চঞ্চল হয়ে ওঠে—কিন্তু গাড়ী থামে না। আবার নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বোজে। আর পারে না সে—।

শয্যালীন বিশীর্ণ দেহের দিকে চেয়ে মাধবীর মন সমবেদনায় ভিজে যায়, আহা, আর ক'দিনই বা বেচারী বাঁচবে! কপালের রুক্ষ চুল সরিয়ে দিয়ে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "কি কষ্ট হচ্ছে ভাই?" অশ্রুর প্রাবল্যে গলা টন্ টন্ করে ওঠে, মুখটা আড়াল করে শিলা বললে, "বিশেষ কিছুই নয়।" মাধবী আবার বললে, "সুদেববাবুকে দেখতে ইচ্ছে করছে না? তিনি আসবেন নিশ্চয়ই খবর পেলে।" তার আশ্বাসবাণীতে নিভে-যাওয়া প্রদীপ-শিখা আবার দপ্ করে জ্বলে উঠলো। একাগ্র দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চেয়ে ব্যগ্রস্বরে বলে, "সত্যি? সত্যি বলছ? তুমি জানো ঠিক?"—মিতভাষিণী শিলা হঠাৎ মুখর হয়ে উঠেছে, হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, "আচ্ছা মাধবি, সত্যি করে বল তো আমার বরকে তোমার পছন্দ হয় কি না? অমন চেহারা তুমি দেখছ কারুর? কি সুন্দর, নয়?" মাধবী অতর্কিত বিস্ময়ে চমকে ওঠে, কানের ডগা লাল হয়ে উঠেছে এর মধ্যে—"ছিঃ, ও কি বলছ ভাই—।" শিলা তাড়াতাড়ি আত্মসংবরণ করে বললে, "দূর, এমনি ঠাট্টা করছি।" তারপর পাণ্ডুর, রক্তহীন অধরে জোর করে বিবর্ণ হাসি টেনে এনে কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করে।

জীবন-দীপের শিখা মরণের বাতাসে কাঁপে, নিভলো বুঝি এবার। মা গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলেন, "সুদেবকে চিঠি দিয়েছি, দু'এক দিনের মধ্যে এসে পড়বে।" বক্ষস্পন্দন একটু দ্রুততর হয়। মা'র সতর্ক কান বাঁচিয়ে শিলা উদ্গত দীর্ঘশ্বাসটা চেপে ফেলে, ঝাপসা ব্যাকুল দৃষ্টি প্রসারিত করে বার বার দোরের দিকে চায়—ঐ জুতোর শব্দ হল না!

৬

"আহা মেয়েটা অকালে মরে গেল, এত ডাক্তার, এত ওষুধ কিছুতেই কিছু হল না!"

"ওর স্বামী তো এসে পড়েছিলো?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তখন একেবারে অচৈতন্য, চিনতে পারে নি।"—মাধবীদের স্বামী-স্ত্রীর আলোচনা হয়।

মাঝ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে সে ধড় মড় করে স্বামীর একান্ত সন্নিকটে সরে এল। অজিত হেসে বললে, "ভয় করছে বুঝি?"

"না, না, তুমি জানালা খুলে দেখ না, ঐ দেখ, ঝড়ো হাওয়ায় শিলার ঘরের জানালা খুলে গেল—, না বাপু, দাও বন্ধ করে। অন্ধকারে ঐ বড় তারাটা দেখলেই ওর চোখ মনে পড়ে, আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে! জানালার গরাদ ধরে কতদিন দেখেছি তাকে অমনি একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে থাকতে।"

"আচ্ছা পাগল, এমন ভীতু কেন তুমি।"—অজিত উঠে জানালা বন্ধ করে দিলে।

রুদ্ধ বাতায়ন ভেদ করে কোন্ বুভুক্ষু, অতৃপ্ত আত্মার অপলক দৃষ্টি এই সুখ-তন্দ্রাতুর দম্পতীর দিকে চেয়ে থাকে কি না, কে জানে!

নাচারী তোড়ী—তেতালা

সুন্দর বদন তিহারী রে
নিরখত সারস লজত ব্যোম গয়ে
হসত দশন অনার বিরছন মরি ।
মুরলী ধুন জব তান মান ধর
থগিত পবন যমুনা উজান বহে
গান বিসর গয়ে শুক সারী ॥

কথা ও সুর—সঙ্গীতনায়ক—
শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরসরস্বতী

স্বরলিপি—
শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, সঙ্গীতরত্নাকর

আস্থায়ী

০ ১ ২´ ৩ ০

{ মা ণা দা দা : পা মা জ্ঞা মা | পা -া পা -া : ণদা -া পা -া || } জ্ঞা পা পা পা |
{ সু ০ ন্দ র : ব দ ন তি | হা ০ রী ০ : রে ০ ০ ০ || } নি র খ ত |

১ ২´ ৩ ০

ণদা -া পা পা | মা পা পা মজ্ঞজ্ঞা | -া জ্ঞা সা সা : সণ্‌া সা মজ্ঞা মা |
সা ০ র স | ল জ ত ব্যো০০ | ০ ম গ য়ে : হ০ স ত দ |

১ ২´ ৩

পা দা মা পদা | ণর্সা র্সা ণা র্সা | ণা দা পা পা ||
শ ন অ না০ | ০০ র বি র | ছ ন ম রি ||

অন্তরা

০ ১ ২´ ৩ ০

{ মা পা পা পা | ণদা -া র্সা র্সা : র্সা -া র্সা র্সা | -া র্সা র্সা র্সা | পা দা দা র্জ্ঞা |
{ মু র লী ধু | ন ০ জ ব : তা ০ ন মা | ০ ন ধ র | থ গি ত প |

১ ২´ ৩ ০ ১
জ্ঞা জ্ঞা র্সা র্সা | ণা র্সা র্সা ণা | র্সা ণা দা পা | পা দা মা মা | পা দা ণা র্সা |
ব ন ষ মু | না ০ উ জা | ০ ন ব হে | গা ০ ন বি | স র গ মে |

২´ ৩
মা মা পদা ণর্সা | ণর্সণা দপা মজ্ঞা মা ||
শু ক সা০ ০০ | রী ০ ০০ ০০ ০ ||

তান

২´ ৩
১। ণসা জ্ঞমা পদা ণর্সা | জ্ঞর্জ্ঞা র্সণা দপা মপা |
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ |

২´ ৩
২। জ্ঞর্জ্ঞা সর্জ্ঞা জ্ঞর্সা ণর্সা | দণা র্সণা দপা মপা |
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ |

২´ ৩
৩। জ্ঞমা পদা ণর্সা জ্ঞর্জ্ঞা | র্সণা দপা দণা র্সা]
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০]

'নাচারী তোড়ী' তের প্রকার তোড়ীর মধ্যে অন্যতম। গোপেশ্বরবাবু সঙ্গীতশাস্ত্র আলোচনা করিয়া অন্যান্য লুপ্ত রাগিণীর সহিত এই রাগিণীও পুনরুদ্ধার করিয়াছেন।
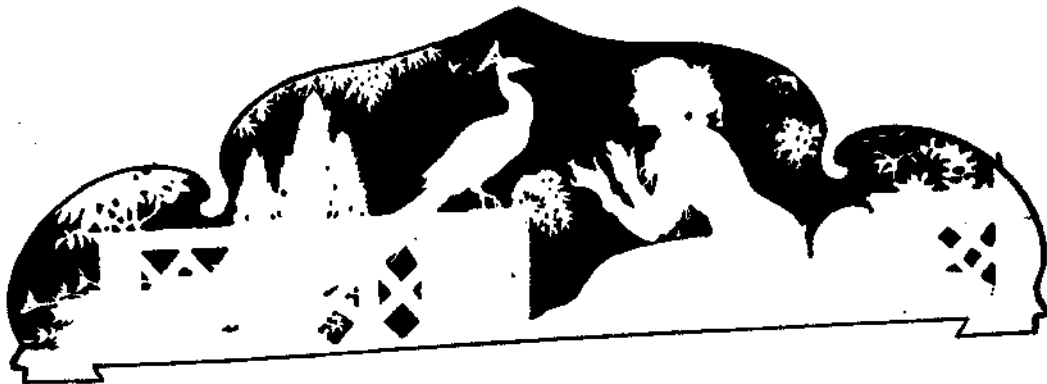
স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ, কে-টি

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

যশোহর জেলার কেশবপুর থানার অন্তর্গত বিদ্যানন্দকাঠি একটি বিখ্যাত গ্রাম। সেই গ্রামে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ ঘোষ বংশে রায় বাহাদুর স্বর্গীয় দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন।

দেবেন্দ্রচন্দ্র ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ওকালতি পাশ করিয়া ২৪ পরগণার জজ-আদালতে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সিনিয়ার সরকারী উকিল নিযুক্ত হন এবং বহুদিন যোগ্যতার সহিত সেই কার্য্য করিয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আলিপুর আদালত ও সরকারী উকিলের কার্য্য হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের সময় তাঁহার বয়স ৬৭ বৎসর ছিল। রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রচন্দ্র গত ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২৫-এ অক্টোবর ৭৫ বর্ষ বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার চরিত্র ছিল যেমন উদার, আইনের জ্ঞানও ছিল তেমনি গভীর; সুতরাং জীবনে তিনি যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কোনো কারণ নাই।

স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ, কে-টি

চারুচন্দ্র দেবেন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই বিদ্যার অনুরাগ চারুচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অতি দুরূহ ও কঠিন জিনিষ আয়ত্ত করিয়া তাঁহার শিক্ষকদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া দিতেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে চারুচন্দ্র হিন্দু স্কুল হইতে 'এনট্র্যান্স' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেই বৎসর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বি-এল পাশ করেন।

আইন ব্যবসার ক্ষেত্রে চারুচন্দ্রের গুরু ভারত-পূজ্য বিখ্যাত মনীষী বিচারপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে চারুচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করেন।

নিজ প্রতিভাবলে চারুচন্দ্রের প্রথম হইতেই আদালতে পসার জমিয়া উঠিয়াছিল। সেই সময় হইতেই চারুচন্দ্র দেশের অনেক সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অনেকে হয় ত' জানেন না যে, এক সময়ে চারুচন্দ্র বঙ্গ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে (Partition of Bengal) সুচিন্তিত প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য চারুচন্দ্র বিলাত যাইয়া 'লিন্‌কন্‌স ইন্'-এ ভর্ত্তি হন।

তথায় তিনি Lord Cozens Hardy-র ছাত্র ছিলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বার ফাইনাল পরীক্ষায় চারুচন্দ্র

প্রথম শ্রেণীর সম্মানলাভ করেন এবং 'লিন্‌কন্‌স্ ইন্' হইতে ৫০ পাউণ্ডের একটি বিশেষ পুরস্কার পান।

Lord Macnaughton-এর অনুমোদনে চারুচন্দ্রকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যারিষ্টারশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে চারুচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে আাড্‌ভোকেট রূপে প্রবেশ করেন।

বারো বৎসর চারুচন্দ্র হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি আইন-জ্ঞানের যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। তাঁহার তীক্ষ্ণ মনীষার দীপ্তি বহু জটিল মামলার ভিতর দিয়া দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিচারপতি Chitty অবসর গ্রহণ করিলে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে চারুচন্দ্রকে গভর্ণমেণ্ট 'Knight' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৩১ খৃঃ হইতে ১৯৩৪ খৃঃ মধ্যে তিনি চারিবার কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতির কার্য্য করিয়াছেন।

প্রধান বিচারপতির কাজ হইতে গত ৩০-এ জানুয়ারী তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টারদের মধ্যে চারুচন্দ্রই প্রথম প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন।

চারুচন্দ্র প্রথম বিচারপতির আসনে বসিলে, সকলেই বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সেই নিয়োগে ব্যারিষ্টার সভা (Bar) ও এটর্ণী সভা (Incorporated Law Society of Calcutta) তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন। পরে ব্যারিষ্টার সভা তাঁহাকে ভোজ দিয়াও আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করিলে স্যর চারুচন্দ্রের গুণ-মুগ্ধ বন্ধুগণ ও অন্যান্য সকলে মহারাজা স্যর প্রদ্যোৎ-কুমার ঠাকুরের ব্যারাকপুরের উদ্যানভবনে 'Emerald Bower'-এ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। পরে বিত্তানন্দকাঠি গ্রামের অধিবাসিগণও তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন। বিচারপতিরূপে চারুচন্দ্রের পাণ্ডিত্য, নির্ভীকতা, তাঁহার সরল অমায়িক ব্যবহার এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার সুবিচার করিবার ক্ষমতা, তাঁহাকে সকলের প্রিয় করে।

দেশের প্রতিও চারুচন্দ্রের অকৃত্রিম ভালবাসা আছে। এই ভালবাসার পরিচয় Islington Commission, Montague Chelmsford Reforms প্রভৃতি ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে গিয়া তিনি যে সব মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহার ভিতর দিয়াই পাওয়া যায়।

গত ১৫ বৎসর যাবৎ চারুচন্দ্র দেশের ও সমাজের বহু কল্যাণকর কার্য্যে সংশ্লিষ্ট আছেন। তাঁহার মত নির্ভীক, তেজস্বী ও আত্মবিশ্বাসী লোক সমাজে অতি বিরল। কি মানুষ হিসাবে, কি বিচারপতি হিসাবে, চারুচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা সকলের অনুকরণীয়। স্যর প্রভাসচন্দ্রের পরলোক গমনে সম্প্রতি স্যর চারুচন্দ্র বাংলার শাসন-পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

তাঁহার এই নবলব্ধ সম্মানে আমরা তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিতেছি এবং ভগবানের কাছে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

বিচিত্রা

মিশরের মমি ও তার পিরামিড

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

ইউরোপের একদল প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতের মত— নীল নদের ধারেই পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা গ'ড়ে উঠেছিল। অবশ্য এর বিরুদ্ধ মতও যে নেই, তা নয়। কিন্তু এই মতের বৈষম্য নিয়ে চুলচেরা বিচার না ক'রেও একথা নিঃসংশয়েই বলা যায় যে, প্রাচীনতম না হোক্, অতি-প্রাচীন একটা সভ্যতা যে এই নদটিকে ঘিরে' গ'ড়ে উঠেছিল তাতে কিছুমাত্র ভুল নেই। ইউরোপের বেশীর ভাগ স্থান যখন আলোকের কল্পনাও করে নি, তখন মিশরের সূর্য্য তার মধ্যাহ্ন আকাশে আগুন ছড়িয়ে পশ্চিমের দিক্‌চক্রবালে ঢ'লে পড়েছে। খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ ৫।৬ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশর যে সভ্য ছিল, তার প্রমাণ আজও তার মাটির তলে ছড়িয়ে আছে। বৈজ্ঞানিকদের যন্ত্রের চাপে এই মাটি যতই বিদীর্ণ হচ্ছে—সে সব প্রমাণ ততই সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে' উঠ্‌ছে।

কিন্তু এর নব-আবিষ্কৃত প্রমাণগুলো ছেড়ে দিলেও, মিশর যে একটা প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, তা এর অতি প্রাচীন পিরামিডের দিকে তাকালেও ধরা পড়ে। পিরামিডের প্রতি অংশে যে শিল্প-নৈপুণ্য ও স্থাপত্য-প্রতিভার পরিচয় আছে, অতি বড় সভ্য জাতির লোক ছাড়া আর কেহ তার পরিকল্পনাও করতে পারে না। একথা আজকার সভ্য জগতও অস্বীকার করে না। তাই পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য্যতম জিনিষের ভিতরে পণ্ডিতেরা মিশরের পিরামিডকেও একটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। কেবল তাই নয়, এই সাতটি জিনিষের ভিতরে পিরামিডকে তাঁরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতেও দ্বিধা করেন নি। সুতরাং মিশরের সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে হ'লে, সুরু কর্‌তে হয় তার পিরামিড দিয়ে।

পিরামিডই সম্ভবতঃ মিশরের প্রথম পাথরের গৃহ। মাটি দিয়ে ইট তৈরী ক'রে তাই রৌদ্রে শুকিয়ে নিয়ে গৃহ নির্ম্মাণ কর্‌বার রেওয়াজ মিশরে এই পিরামিড তৈরীর আগেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু ঘর তৈরীর কাজে যে পাথরও ব্যবহার করা যায়—তার পরিচয় পাওয়া যায় সব প্রথম এই পিরামিডে। কে এর প্রবর্ত্তক, তার নাম অবশ্য জানা যায় নি। কিন্তু

মিশরের পিরামিড

এ পদ্ধতি সুরু হ'য়েছে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩০০০ বৎসরেরও আগে। পাথরের খণ্ডগুলো পাহাড়ের গা থেকে কেটে, তাকে গৃহ নির্ম্মাণের কাজে লাগাবার উপযোগী ক'রে প্রথম ব্যবহার করা হয় মিশরের প্রথম রাজ-বংশের কোনো এক রাজার কবরে। এই কবরের উপরের অংশটি ছিল ইটে গাথা, কেবল মেঝেটাই ছিল পাথরের। কিন্তু পাথরের প্রথম গৃহ গ'ড়ে উঠ্‌বার সুযোগ আসে মিশরে যখন সেখানকার দ্বিতীয় রাজবংশের রাজত্ব চল্‌ছিল। এই বংশের রাজা খেজ খেমুই-এর (Khase Khemui) কবরের ভিতরকার

ঘর পাথর দিয়েই তৈরী করা হয়। এর পরে অতি দ্রুতগতিতে পাথরের গৃহ-নির্ম্মাণের 'আর্ট' বেড়ে ওঠে মিশরে। অল্পদিনের ভিতরে কারিগরেরা এই শিল্পটা এমন ভাবেই আয়ত্ত ক'রে ফেলেন যে, যে-পিরামিড বিশ্বের বিস্ময় তার সৃষ্টিও তাঁদের পক্ষে আর অসম্ভব হয় নি।

পিরামিডের পর্য্যায়ভুক্ত শিল্পের যে জিনিষটি সর্ব্বপ্রথমে তৈরী হয়েছিল সেটি হচ্ছে শক্করার সিঁড়ি-পিরামিড (step pyramid)। প্রাচীন মিশরীদের মৃত্যুলোকের দেবতা ছিলেন শোকারি। তাঁরি স্মৃতি-রক্ষার জন্য এ পিরামিড নির্ম্মিত হয়। পরিকল্পনার সমস্ত গৌরব শিল্পী ইমহোটেপের। আমাদের দেশে বিশ্বকর্ম্মার নাম যেমন সমস্ত বিরাট শিল্প-সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত হ'য়ে আছে, ইমহোটেপের নামের খ্যাতিও তেমনি মিশরে। তিনি একাধারে ছিলেন ডাক্তার, স্থপতি এবং ভাস্কর।

সিঁড়ির এই পিরামিডটিতে ছয়টি মঞ্চ আছে, এর উচ্চতা প্রায় ২০০ ফিট। গোড়াটা চতুষ্কোণ। দক্ষিণ ও পশ্চিমের দিকের মাপ প্রায় ৩৯৬ ফিট এবং উত্তর ও দক্ষিণের দিকের মাপ ৩৫২ ফিট। ভিতরে গর্ভ-গৃহে রাজা জেসারের (Zeser) মমি সমাহিত করা হয়েছে। রাজা জেসার মিশরের তৃতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সম্ভবতঃ খৃষ্টের জন্মের ২৯৮০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি রাজত্ব সুরু করেছিলেন।

চতুর্থ রাজবংশের প্রথম রাজা ছিলেন খুফু (Khufu)। পরবর্ত্তীকালে গ্রীকদের ভাষায় এই খুফুর নামই চিয়োপস্-এ (Cheops) রূপান্তর লাভ করে। তিনি তাঁর নিজের জন্য কায়রোর নিকটে গিজে (Gizeh) নামক স্থানে পিরামিড তৈরী করান। পিরামিড-গোষ্ঠীর ভিতরে তাঁর তৈরী এই পিরামিডই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ১৩ একর জমির উপরে তাঁর এই পিরামিড গ'ড়ে উঠেছিল। তৈরীর সময় উচ্চতা ছিল প্রায় ৫০০ ফিট। এর চার পাশের ধারগুলির দৈর্ঘ্য ৭৫৫ ফিট। ২৩ লক্ষ পাথর দিয়ে এই পিরামিডটি গঠিত হয়, প্রত্যেকখানি পাথরের ওজন গড়ে প্রায় আড়াই টন। কিন্তু ভিতরের কক্ষটি তৈরী করতে যে পাথরগুলোর ব্যবহার করা হয়, তার রূপ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। তাদের কোনো কোনো খানি দৈর্ঘ্যে ছিল ২৭ ফিট, উঁচুতে ৬ ফিট, চওড়ায় ৪ ফিট এবং ওজনে প্রায় ৫৪ টন ভারি। এই অতিকায় পাথরগুলি যে ভাবে সংগৃহীত হ'য়েছিল এবং সাজানো হ'য়েছিল তা ভাবতে গেলে বিস্ময়ে মন ভ'রে ওঠে। যে স্থানে পিরামিড তৈরী হ'য়েছিল তার কাছের কোনো পাহাড় থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয় নি। ৬০০ মাইল দূরের পাহাড় থেকে পাথরগুলোকে কেটে নীল নদের ভিতর দিয়ে ভাসিয়ে আনা হ'য়েছিল কায়রোর কাছে পিরামিড তৈরীর জন্য মনোনীত এই স্থানটিতে। এ যে দুঃসাধ্য ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়েও দুঃসাধ্য ব্যাপার হচ্ছে এগুলোকে যথাস্থানে স্থাপন করা। বর্ত্তমান যুগের মতো সেকালে ভার তোলবার অতি-আধুনিক যন্ত্রপাতির সৃষ্টি হয় নি, সুতরাং অত উঁচুতে তুলতে হয়েছে তাদের মানুষের সাহায্যেই। সে যুগের মানুষ যে কি অসাধ্য সাধন করেছে, মিশরের পিরামিড তার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শিল্প-রচনার উৎকর্ষের দিক থেকে, পরিকল্পনার বিরাটত্বের দিক থেকে, সুশৃঙ্খল কর্ম্ম-পদ্ধতির দিক থেকে যদি বিচার করা যায় তবে মিশরের পিরামিড যে অতুলনীয়, তা অস্বীকার করবার আর উপায় থাকে না।

হেরোডোটাসের লেখার ভিতর দিয়ে পিরামিডের শিল্পীদের অমানুষিক শক্তির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লেখা থেকেই আমরা জানতে পারি যে, খুফুর এই পিরামিড তৈরীর উদ্যোগ-পর্ব্বটা সমাধা করতেই পুরো ১০ বৎসরের প্রয়োজন হয়েছিল। আসল পিরামিডটা শেষ হয় ২০ বৎসরে। দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধ'রে প্রায় ১ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল পৃথিবীর এই বিরাট বিস্ময়কে গ'ড়ে তোলবার কাজে।

এই পিরামিড যাঁর পরিকল্পনার ফল তাঁর, অর্থাৎ রাজা খুফুর রাজ্যের ও রাজত্বের ইতিহাস বিশেষ কিছু

পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর একটি চমৎকার মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিকদের চেষ্টায়। হাতীর দাঁতের একটি আধারের উপরে এই মূর্তিটি অঙ্কিত। এই পিরামিডের মাটির নীচে যে গর্ভ-গৃহটি আছে, রাজার মমি রাখ্‌বার জন্যই যে সেটি নির্মিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে কারণেই হোক্, এ গৃহটি সম্পূর্ণ হ'তে পারে নি। তাই রাজার মমিটিকেও আর সেখানে রাখা হয় নি, তাকে রাখা হয়েছে মাটির উপরে ঠিক মাঝের ঘরটিতে। খুফুর এই পিরামিডের পাশেই তাঁর পরবর্তী দু'জন 'ফারাও'-এর পিরামিডও গ'ড়ে উঠেছে।

পরবর্তী যুগেও মিশরে আরো কতকগুলি পিরামিড তৈরী হয়েছিল। শিল্প-রচনার দিক থেকে সেগুলি ঢের নিম্নস্তরের। কিন্তু তা হ'লেও আর একটা দিক্ দিয়ে সেগুলোর সার্থকতা আজকার দিনে অল্প নয়। এই সব পিরামিডের ভিতর থেকেই আবিষ্কৃত হচ্ছে প্রাচীন মিশরের পুস্তকাবলী এবং পাথরে খোদাই করা শিলালিপিসমূহ। এই সব পুঁথি ও শিলালিপি থেকেই সে যুগের ইতিহাস সঙ্কলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে আজ পণ্ডিতদের কাছে। এই পুঁথিগুলো 'পেপিরি' নামে পরিচিত। নীল নদের তীরে মিশরে 'পেপিরাস' নামে এক রকমের গাছ পাওয়া যেত সে যুগে। সেই গাছের পাতায় সেকালের মিশরীরা রচনা করতেন তাঁদের গ্রন্থ। বইগুলোকে যে কবরের সঙ্গে সমাহিত করা হ'তো তার কারণ—এই সব গ্রন্থে পরলোকের সম্বন্ধে নানা-রকমের উপদেশ থাকৃত। রাজারা মনে করতেন, এরূপ একখানা গ্রন্থ সঙ্গে থাকলে পরলোকে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সুবিধে হ'বে তাঁদের। আর যেহেতু রাজাদের সঙ্গে থাকবে সেইজন্যই বইগুলোকে নানা চিত্তাকর্ষক কাহিনী ও ছবি দ্বারা পরিশোভিত করা হ'তো। ইংরেজীতে কাগজের নাম 'পেপার'। মিশরের 'পেপিরি' শব্দ থেকেই সম্ভবতঃ এই 'পেপার' শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। তা ছাড়া এই সব পিরামিডের ভিতরে পাওয়া যাচ্ছে আরো নানারকমের জিনিষ-পত্র—বিলাসের পণ্য, নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী, অলঙ্কার, বেশ-ভূষা প্রভৃতি। এগুলোও আজ সাহায্য করছে মিশরের অতি প্রাচীন বিলুপ্ত সভ্যতার রূপ নির্ণয়ে।

কিন্তু পিরামিডের ভিতরকার জিনিষ-পত্রের ভিতর যে জিনিষটে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য, সেটি হচ্ছে তার মমি। বস্তুতঃ এই মমি রাখ্‌বার জন্যই গ'ড়ে উঠেছে এই বিরাট শিল্প-সৌন্দর্য্যগুলি। পৃথিবীর মানুষ দেহধারী জীব। তাই দেহের প্রতি দরদের তার অন্তই নেই। মৃত্যুর পরেও সে চায় তাই তার এই নশ্বর দেহ-টাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে এবং এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই উদ্ভব হ'য়েছে মমির। মিশরীরা মনে করত যে, মৃত্যুর পর আত্মা আবার এসে দেহের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই দেহটাকে যদি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায় তবে আত্মার আর আশ্রয়হীন হ'য়ে থাক্‌বার প্রয়োজন হ'বে না। তাই তারা সাধনা সুরু করলে কি ক'রে দেহটাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়—তারি পথ খুঁজে' বা'র্ করবার। বিজ্ঞানের আলো-রেখাহীন সেই অন্ধকার যুগেও তারা এমন সব মালমশ্‌লার আবিষ্কার করলে যার সাহায্যে চার পাঁচ হাজার বছরের পুরানো মৃত দেহকে আজও আমরা অবিকৃত অবস্থায় দেখ্‌তে পাচ্ছি। অবশ্য সব মমির অবস্থা যে একই রকম ভালো আছে তা নয়। অনেক মমি অত্যন্ত জীর্ণ হ'য়ে গেছে। মৃদুস্পর্শেই সেগুলো যাচ্ছে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে। কতকগুলো আবার পাথরের মতো শক্ত হ'য়ে গেছে—রং-ও হয়েছে তাদের পাথরের মতোই কালো। সম্ভবতঃ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দেই পিরামিডের অন্ধকার অবরোধের ভিতর ইউরোপীয়েরা প্রথম প্রবেশ লাভের সুযোগ পান। হাওয়ার্ড ভাইস নামে একজন ইউরোপীয়ান একটি পিরামিডের প্রাচীর ফুটো ক'রে প্রবেশ করেন তার ভিতরে। এই পিরামিডটির ভিতরে ৫৬ ফিট মাটির নীচে ছিল রাজার মমি কাঠের কফিনে সুরক্ষিত। ঢাক্‌নার উপরে রাজার নাম, তাঁর শক্তি-সামর্থ্য ও ঐশ্বর্য্যের ইতিহাস লেখা ছিল। এই কফিনটি আবার সুরক্ষিত ছিল একটি পাথরের বাক্সের ভিতরে। বাক্সের

ভিতরে ক'রেই তিনি মমিটি বিলেতে চালান দেন। কিন্তু জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ায় ৮১ টন ওজনের এই বাক্সটিকে তিনি আর বিলেত পর্য্যন্ত আনতে পারেন নি। কোনো রকমে মমিটিকে বাঁচিয়ে তিনি নিয়ে এসেছিলেন তাকে লণ্ডনে। মমিটিকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে।

পিরামিড মমি রাখ্‌বার জন্য তৈরী হ'লেও, মমি যে কেবল পিরামিডের ভিতরেই থাক্‌ত, তা নয়। বস্তুতঃ পিরামিডগুলো জনকয়েক খেয়ালী রাজার সমাধি-স্তম্ভ মাত্র। তাদের সংখ্যা সবশুদ্ধ বড় জোড় ৭০।৭৫টি—তার বেশী হবে না। সুতরাং তার ভিতরে দেশের সব লোকের মমি রাখ্‌বার স্থান হওয়া সম্ভব নয়। অথচ আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহকে মমি ক'রে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা ও ইচ্ছে প্রায় সব লোকেরই ছিল। তাই মমি রাখ্‌বার স্থান দেশের ভিতর সর্ব্বত্র ছড়িয়েছিল। এই স্থান মানুষের অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমের হ'তো। গরীব দুঃখী যারা তারা পাহাড়ের গুহার ভিতরে কোনো নিরাপদ স্থান দেখে তাদের আত্মীয়-স্বজনের মমি-দেহ সমাহিত ক'রে আস্‌ত। বড় লোকেরা ইটের প্রাচীর দেওয়া ঘর তুলে' সমাহিত কর্‌ত তাদের আত্মীয়-স্বজনকে। আর রাজ-রাজড়ার মতো লোকদের মমি রাখা হ'তো পিরামিডে অথবা মস্তবে। বড়লোকদের সমাধি-প্রাঙ্গন—এই সব মস্তবও ছিল প্রাসাদের মতোই বিরাট জিনিষ। তাদের সঙ্গেও সংযুক্ত থাকৃত মন্দির, বিলাস-কক্ষ, শয়ন-গৃহ প্রভৃতি। তার দেওয়াল নানা রকমের কারুকার্য্য ও চিত্রে ভূষিত করা হ'তো। দেহ জীইয়ে রাখা হয়েছে, তার ভিতরে আত্মাও থাকবে—তাই জীবিত লোকের যে সব জিনিষের প্রয়োজন, তাও রাখা হ'তো এই সব সমাধিগৃহের ভিতরে। ধন-রত্ন, নানা রকমের অলঙ্কার, বহুমূল্য শিল্প-রচনা—এগুলো পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠ্‌ত এক একটা মস্তবের ভিতরে। মমি রাখার আধারগুলোও ছিল অপরূপ। তার কোনোটার গায়ে থাকৃত সোণার কাজ, কোনোটার বা রূপার কাজ। সুতরাং বড় লোকদের এক একটি মস্তব, এক একটি রাজ-ভাণ্ডার বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

মমি রাখ্‌বার আধার

মস্তবগুলির এই ঐশ্বর্য্যই এদের দিকে চোর-ডাকাতদের, বিশেষ ক'রে আরব দস্যুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরবর্ত্তী যুগে তাই সুরু হ'লো এগুলোর লুণ্ঠনের হিড়িক। বহু মস্তব লুণ্ঠিত হ'য়ে তার ধন-রত্ন বাইরে চ'লে গেল। আর এই লুণ্ঠনের ব্যাপার থেকেই যা' লোক-চক্ষুর অগোচরে ছিল, আজ তা' লোক-চক্ষুর সাম্‌নে এসে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছে। মমির নাম অনেকদিন আগেই জানা

গিয়েছিল। কিন্তু মমির পরিপূর্ণ রূপ চোখে দেখ্‌বার সুযোগ সভ্য জগতের খুব বেশী দিন আগে হয় নি। একবার এক সঙ্গে কতকগুলি রাজার মমি আবিষ্কৃত হয়। এই আবিষ্কারের গল্পটি একটু আশ্চর্য্য ধরণের—একেবারে আকস্মিক ব্যাপার বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। তাই তার কাহিনীটি এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

পূর্ব্বপুরুষের মৃতদেহের গায়ে হাত-পড়া যে-কোনো জাতি অত্যন্ত অগৌরবের কথা ব'লে মনে করে। সুতরাং মমির দেহ চোর-ডাকাতদের হাতে লাঞ্ছিত হ'তে দেখে একবার মিশরের এক রাজার মনে ঘা লাগ্‌ল। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পিরামিডে ছড়িয়ে-পড়া মৃতদেহগুলিকে প্রহরী বসিয়ে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি এক পাহাড়ের ধারে মাটির বহু নীচে ঘর তৈরী করিয়ে তার ভিতরে অনেকগুলি রাজার মমি রাখ্‌বার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে এই সুরক্ষিত স্থানটার উপরেও দৃষ্টি পড়্‌ল আরব দস্যুদের। তারা সেখান থেকেও ধন-রত্ন চুরি করতে সুরু ক'রে দিলে। এই ধন-রত্নের সঙ্গে মমির কাছে যে মন্ত্র-লেখা কাগজ রেখে দেওয়া হয় তাও চুরি হ'য়ে গেল। তারপর সেই সব কাগজের কতকগুলো এসে পড়্‌ল, ব্র্যাগ্‌স নামে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতের হাতে। কাগজগুলো দেখেই তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। কাগজগুলো যেখানে ছিল সেই স্থানের অনুসন্ধান তিনি সুরু ক'রে দিলেন। ফলে যে দস্যুটি মমির সেই নিভৃত অন্তঃপুরে ঢুকে' ধন-রত্ন অপহরণ ক'রেছিল তার সন্ধান পেতে তাঁর দেরী হ'লো না, আর তারি সাহায্যে মৃত্যুলোকের এই বিরাট রহস্যাগারে একদিন এসে তিনি হাজির হলেন। সেখানে তখনো প্রায় ২৫।৩০টি রাজার মৃতদেহ সঞ্চিত ছিল। অন্ধকার গিরিগুহার নিভৃত নিরালা হ'তে সেই সব মমি উদ্ধার ক'রে তিনি ইউরোপে প্রেরণ করলেন। আজ অবশ্য মমির টুক্‌রো ইউরোপে কাগজ-চাপা রূপেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কিছু দিন আগেও মমির সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ইউরোপের ছিল না।

কি ক'রে যে মিশরীরা মমি তৈরী করত তার সবগুলো পদ্ধতি জানা যায় নি। তবে সে সব পদ্ধতি যে অত্যন্ত জটিল ও বিজ্ঞান-সম্মত ছিল তাতেও ভুল নেই। মোটামুটি ভাবে তা এই রকমের ছিল—প্রথমে একখানা ধারালো পাথরের ফলা দিয়ে মৃতদেহের পেট চিরে' তার ভিতর হ'তে নাড়ি-ভুঁড়িগুলো বা'র ক'রে ফেলে দেওয়া হ'তো। এজন্য তারা লোহার ছুরি ব্যবহার করত না—কেন করত না তার কারণ আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নি। তারপর নানা উপাদানে তৈরী আরক পেটের ভিতরে ঢেলে দিয়ে ক্ষত স্থানগুলি আবার তারা সেলাই ক'রে দিত। মাথার মগজ বা'র ক'রে ফেলেও নাক, মুখ ও কানের ছিদ্র দিয়ে ঢেলে দেওয়া হ'তো তীব্র আরক। এই সব আরকের তেজে দেহের ভিতরকার পচনশীল পদার্থগুলো যখন বেরিয়ে আস্‌ত, তখন মৃতের সর্ব্বাঙ্গে মাখাতো তারা এক রকমের তীব্র মলম। মলম মাখিয়ে দেহটাকে ৬০।৭০ দিন ধরে 'নেট্রামে' ডুবিয়ে রেখে দেওয়া হ'তো। এই সব ব্যবস্থার ফলে মৃত দেহটা যখন নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনার হাত হ'তে মুক্ত হ'তো তখনই বেশ ভালো ক'রে ধুয়ে' তাকে সূক্ষ্ম বস্ত্রে জড়িয়ে মিশরীরা স্থাপন করত 'কফিনে'র ভিতরে। এক একটি মমি তৈরীর ব্যয় খুব সামান্য ছিল না। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের মমি তৈরী করতে মিশরীরা অকাতরেই অর্থ ব্যয় করত। সেজন্য তাদের কখনো কার্পণ্য করতে দেখা যায় নি।

মমির সম্বন্ধে নানা রকমের কাহিনী প্রচলিত আছে মিশরে। সেখানকার লোকদের ধারণা, মমি-দেহ দৈব শক্তির দ্বারা রক্ষিত। সুতরাং এই সব মমির গায়ে যারা হাত দেবে তাদের ধ্বংসও অনিবার্য্য। এ হয় ত' কেবল একটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু এ বিশ্বাস আশ্চর্য্য রকমের সত্যি হ'য়ে উঠ্‌তেও দেখা গিয়েছে দু' একজনের সম্পর্কে। নিম্নে তার দু' একটি কাহিনী উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

হারবার্ট ইন্‌গ্রাম জাতিতে ইংরেজ। তিনি 'গর্ডন-রিলিফ-একস্‌পিডিসনের' সঙ্গে মিশরে গিয়েছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে মমি-সংগ্রহের প্রতি একটা ঝোঁক ইউরোপের লোকদের যেন পেয়ে বসেছিল। এই ঝোঁককে mummy-craze বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ঝোঁকের খেয়ালেই ইন্‌গ্রাম কিনে' বসলেন একটি মমি। মমিটি একটি পুরোহিতের। তার পায়ের সঙ্গে যে পরিচয়-লিপি ছিল তাতে লেখা ছিল—এই পুরোহিতের মমি-দেহকে স্থানভ্রষ্ট করবার দুঃসাহস যেন কারো না হয়। এঁকে বিরক্ত করলে তার দুর্ভাগ্যের সীমা ও শেষ থাকবে না। তার অপমৃত্যু ঘটবে। এত বড় পৃথিবীতে তাকে সমাহিত করবার স্থানটুকুও মিলবে না। মৃত্যুর পর তার অস্থি-পঞ্জরের স্থান হ'বে জলের ভিতরে — সমুদ্রের গর্ভে। হারবার্ট অবশ্য কথাগুলো বিশ্বাস করলেন না। সুতরাং মমিটিকে হাত-ছাড়া করবার কল্পনাও স্থান পেলো না তাঁর মনে। তিনি সেটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলেন এবং তার কিছু দিন পরেই সোমালিল্যাণ্ডে গেলেন হাতী শিকার করবার জন্য তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে। নিবিড় অরণ্যের ভিতর হাতীর সাক্ষাৎ মিলল। তিনি বন্দুক ছুঁড়লেন হাতীর দেহ তাক ক'রে। গুলি লাগলও হাতীর গায়ে। কিন্তু সে গুলিতে হাতী মরল না, বরং ক্ষেপে গিয়ে তেড়ে এলো সে তাঁদের দিকেই। আবারও গুলি ছোঁড়ার জন্য তিনি বন্দুক তুলেছেন এমনি সময় ভয় পেয়ে তাঁর ঘোড়া গেল বিগড়ে, সে ছুটতে সুরু ক'রে দিলে বনপথ ধ'রে। এই অতর্কিতভাবে ছোটার সময় একটা গাছের শাখার সঙ্গে আঘাত লেগে হারবার্ট অশ্বচ্যুত হ'য়ে প'ড়ে গেলেন মাটিতে এবং সেখান থেকে উঠে' পালাবার আগেই হাতীটা এসে প্রথমে তাঁর দেহটাকে পায়ের তলায় ফেলে থেঁথ্‌লে দিলে, তারপর শুঁড় দিয়ে তুলে' দূরে ছুঁড়ে' ফেলে দিয়ে টলতে টলতে চ'লে গেল। সঙ্গীরা বন্ধুর এই শোচনীয় মৃত্যু দেখে হাহাকার ক'রে উঠলেন এবং তাঁর সেই নিষ্পেষিত মৃতদেহটা কুড়িয়ে নিয়ে তখনকার মতো তাঁরা সমাহিত ক'রে গেলেন একটা পাহাড়ের ধারে। তাঁরা স্থির ক'রেছিলেন, শিকার শেষ ক'রে ফিরবার সময় হারবার্টের মৃতদেহটাও ফের কুড়িয়ে নিয়ে যাবেন এবং দেশে ফিরে' সেইখানে যথারীতি তাঁকে সমাহিত করবার ব্যবস্থা করবেন। সুতরাং শিকার শেষ ক'রে দেশে ফিরবার সময় তাঁরা গেলেন আবার সেই পাহাড়ের ধারে। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ পাহাড়ের বুকে বন্যার তাণ্ডব নৃত্য জেগে উঠে' দেহটাকে কোথায় যে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, বহু খুঁজেও তার কোনো চিহ্ন আর তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেন নি। পুরোহিতের অভিশাপ হারবার্ট ইন্‌গ্রামের জীবনে এমনিভাবে অক্ষরে অক্ষরে ফ'লে গিয়েছিল।

ঠিক এতটা না হোক, কতকটা এমনি ধরণের দুর্ভাগ্যের কাহিনী জড়িত হ'য়ে আছে 'আমিনরার' একটি আচার্য্যানীর মমির সম্পর্কেও। মিশরের সমাধি রাজ্যের রহস্যাগার হ'তে যাঁরা তাকে উদ্ধার করেছিলেন, অনেকগুলি দুর্ভাগ্য ও দুর্ঘটনার আঘাত নেমে এসেছিল তাঁদের জীবনের উপরেও। তার বিবরণও বিস্ময়কর।

প্রাচীন থিবসের একটি মন্দিরের অধিস্বামিনী ছিলেন এই রমণীটি। খৃষ্টের জন্মের ষোল শ' বছর আগে, যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন তাঁর দেহ দিয়ে মমি তৈরি ক'রে মহাআড়ম্বরের সঙ্গে তাঁকে সমাহিত করা হ'য়েছিল সমাধি মন্দিরের ভিতরে। সেইখানে সেই কবরের ভিতরেই গভীর নিদ্রায় তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর। কিন্তু অবশেষে একদিন এই নিভৃত নিরালাতেও দৃষ্টি পড়ল দস্যুদের। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে সেই সমাধি-গর্ভ হ'তে অন্যান্য ধন-রত্নের সঙ্গে তাঁর মমিটিও চুরি ক'রে নিয়ে গেল একটি আরব দস্যু এবং তারপর কতকটা অপ্রত্যাশিত উপায়েই সেটি এসে পড়ে একজন ইংরেজের হাতে। এই ইংরেজটি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন নীল নদের দেশে। তাঁরা যখন লাক্সারে তখনই

সংবাদ পাওয়া গেল, নদীর ধারে একটি মমির বিচিত্র আধার পাওয়া গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ সদল বলে তাঁরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। তাঁরা দেখ্‌লেন আধারের গায় একখানা চমৎকার সুন্দর মুখ। কিন্তু মুখের প্রত্যেকটি রেখার ভিতর দিয়ে ফুটে' আছে একটা কঠিন, তীব্র, রূঢ় ভাব। ইংরেজ ভদ্রলোক মমিটির লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লেন না। তিনি সেটিকে আত্মসাৎ ক'রে নিলেন। কিন্তু তার ফল তাঁর পক্ষে ভালো হ'লো না। মমির কঠিন রুক্ষ দৃষ্টির ভিতর দিয়ে যে অপ্রসন্নতার ছায়া ফুটে' উঠেছিল তাই তাঁর জীবনেও রচনা করল মেঘের ছায়া। ফির্‌বার পথে বন্দুক সাফ্ করবার সময় তাঁর চাকরের হাত থেকে হঠাৎ একটা গুলি ফস্‌কে এসে লাগ্‌ল তাঁর হাতে। সুতরাং হাতখানিকে তাঁর বিসর্জ্জন দিতে হ'লো। পথে তাঁর সঙ্গীদের কয়েকজন একদিন কোথায় যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল জীবনে তাদের কোনো সন্ধান তিনি আর মিলাতে পারেন নি। পথেই তিনি শুন্‌লেন—অর্থের দিক দিয়েও তাঁর ক্ষতি হয়েছে বিস্তর। দেশে ফেরার পর তাঁর বোন্ এসে আব্‌দার ক'রে কেড়ে নিলেন তাঁর কাছ থেকে মমিটিকে। এর পরেই যে দুঃখের ছোঁয়াচ ভাই-এর জীবনে এসে লেগেছিল—তাই এসে স্পর্শ করলে ভগ্নীর ভাগ্যকেও। হঠাৎ পর পর বাড়ীতে তাঁর কয়েকজন মারা গেল, অর্থ-ক্ষতিও হ'লো প্রচুর। সংবাদ পেয়ে ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি একদিন এলেন তাঁদের বাড়ীতে। প্রেতলোকের আলোচনা ক'রে তিনি তখন বিস্তর যশ অর্জ্জন করেছেন। তিনি এসেই বল্‌লেন—বাড়ীতে ক্রুদ্ধ আত্মার আবির্ভাব হ'য়েছে। মমিটাকে শীগ্‌গির বাড়ী থেকে দূর ক'রে দাও। কিন্তু গৃহকর্ত্রীর মন তখনও তাতে সাড়া দিল না। এর পর এলেন এক-জন ফোটোগ্রাফার। তিনি মমির ফোটো নিলেন, কিন্তু 'প্লেট ডেভেলপ' করবার সময় দেখ্‌লেন তাঁর তোলা ছবির উপরে একটি বিকট বীভৎস মুখ ফুটে' উঠেছে—তার চোখে নিষ্ঠুর দৃষ্টি। সে দৃষ্টির ভিতর দিয়ে রোষ এবং প্রতিহিংসার ঝাঁঝ যেন ঝ'রে পড়্‌ছে। এর পর মমিটিকে কাছে রাখ্‌বার সাহস মহিলাটির আর হ'লো না, তিনি তাকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দিলেন।

মিশরের দিকে, মিশরের সভ্যতার দিকে আজ সভ্য জগতের নজর পড়েছে। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধান সুরু হ'য়েছে আজ মিশরের নানাস্থানে। যা এতকাল লোক-চক্ষুর আড়ালে ছিল তাই আজ ধীরে ধীরে ফুটে' উঠ্‌ছে মানুষের চোখের সাম্‌নে। ধ্বংস-স্তূপের ভিতর হ'তে থিবৃসের অসামান্য গৌরবের দীপ্তি এসে লাগ্‌ছে তাঁদের চোখে, শত শত বৎসরের অন্ধকারের অন্তরালে যে রহস্যাগার চাপা প'ড়ে গেছে তার গুপ্তদ্বার আজ তাঁদের সাম্‌নে উদ্‌ঘাটিত। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাঁদের সাহায্য নিতে হচ্ছে বহু প্রাচীন কালের ইতিহাস সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে এই পিরামিড ও মমি-গৃহগুলিরও কাছ থেকেই। এরাই ফুটিয়ে তুল্‌ছে পাঁচ হাজার বছর পরেও সেই সব রাজ-রাজ্‌ড়াদের চেহারাকে যাঁরা একদিন বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ সব গ'ড়ে তুলেছিলেন। আহ্‌মেশ, থোথমেশ, সেটি, রামেসিশ—আমরা এতদিন পরেও দেখ্‌তে পাচ্ছি তাঁদের বাস্তব দেহগুলোকে। এদেরি ভিতর দিয়ে আমরা পরিচয় পাচ্ছি সে যুগের লোকেদের প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার পদ্ধতির, তাদের আচার-ব্যবহারের, তাদের রীতি-নীতির। কি রকমের অলঙ্কার তাঁরা পরতেন, বেশ-ভূষা ও বস্ত্র তাঁদের কি রকমের ছিল, কি রকমের ছিল তাঁদের আহার্য্য ও পানীয়, কি ছিল তাঁদের বিলাস ও ব্যসন, তাঁদের সাহিত্য ও শিল্প—তার প্রত্যেকটির বাস্তব রূপের নির্ভুল পরিচয় দিচ্ছে আমাদের কাছে এই সব পিরামিড ও মমি।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধিৎসার ফলে মিশরের অনেক রহস্যের জট এর ভিতরেই খুলে' গেছে। কিন্তু তা'হলেও মিশরের সম্বন্ধে যা জানা গিয়েছে তার তুলনায়, যা জানা যায় নি তার পরিমাণ ঢের বেশী। এর কারণ—মিশরের অনেক পিরামিড ও মমির উপর থেকে রহস্যের যবনিকাটা এখনো পুরোপুরি খ'সে পড়ে নি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১

গত মাসের 'উদয়নে' আমি প্রসঙ্গতঃ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, গত ভূমিকম্পের প্রসাদে আমরা কি নেপাল নামক দেশের জিওগ্রাফি শিখেছি? নেপালের নাম আমরা সকলেই জানি, কিন্তু সে দেশের রূপ কি আমরা মনশ্চক্ষে দেখতে পাই? এর স্পষ্ট উত্তর হচ্ছে আমরা নেপালের জিওগ্রাফি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আর জিওগ্রাফির উপর যা গড়ে' ওঠে, অথবা মানুষে গড়ে' তোলে, অর্থাৎ ও-দেশের হিষ্টরিও আমরা জানিনে। এর কারণ এ দুই বিষয়ে স্কুলপাঠ্য কোনও পুস্তক অথবা পুস্তিকাও নেই,—যা মুখস্থ করে আমরা একজামিন পাশ করতে পারি, অর্থাৎ শিক্ষিত হই। যে জিনিষ আমরা চোখে দেখিনি, তার সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করি পরের মুখের কথা শুনে। কারণ পুঁথি পড়ার অর্থ হচ্ছে পরের কথা শোনা, পরের অভিজ্ঞতার প্রসাদে নিজে অভিজ্ঞ হওয়া। আমাদের জ্ঞানের আজও প্রধান ভিত্তি হচ্ছে শ্রুতি। এখন ভূমিকম্পপীড়িত নেপালের হিষ্টরি-জিওগ্রাফির সন্ধান নেওয়া যাক।

আমি যতদূর জানি, নেপালের একমাত্র ইতিহাস হচ্ছে, জগদ্বিখ্যাত Orientalist Sylvain Levi-র ফরাসী ভাষায় লিখিত 'Etude Historique D'un Royaume Hindou'। এ পুস্তক হচ্ছে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ, তবে সুলিখিত বলে, আমাদের মত অপণ্ডিত লোকের পক্ষেও দুষ্পাঠ্য নয়। যদিচ এ পুস্তকে নেপালী ভাষার philology, নেপালি জাতির ethnology, নেপালি ইতিহাসের chronology, নেপালের দেবদেবীর iconology প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের পণ্ডিতী বিচার আছে।

২

আমি উক্ত গ্রন্থ থেকে নেপালের হিষ্টরি-জিওগ্রাফি সম্বন্ধে যে যৎসামান্য জ্ঞান লাভ করেছি, সংক্ষেপে তার পরিচয় দেব—অবশ্য তার সর্ব্বপ্রকার ology-র পাশ কাটিয়ে। বলা বাহুল্য, গত ভূমিকম্পে নেপাল-সম্বন্ধে আমার মনে যে কৌতূহল উদ্রেক করে, সেই কৌতূহল চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যেই আমি উক্ত বিরাট গ্রন্থ পাঠ করি। নেপাল পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুরাজ্য বলে সে দেশের পরিচয় লাভ করবার আমার লোভ ছিল।

হিন্দুরাজ্য যে কি কি কারণে ভেঙে পড়ে, তা' আমরা কতকটা জানি; কিন্তু কি কি কারণে তা গড়ে' ওঠে, তা' আমরা মোটেই জানিনে। Sylvain Levi-র গ্রন্থের মহাগুণ হচ্ছে, এ ইতিহাস শুধু নেপালের রাজা-রাজড়ার ফর্দ নয়, নেপালীরা কি উপায়ে অসভ্য অবস্থা হতে সভ্য অবস্থায় উন্নীত হয়েছে, তারও ইতিহাস। যে জাতির মধ্যে সমাজ-বন্ধন আছে, যে জাতির অন্তরে ধর্ম্ম ও আর্ট উদ্ভূত হয়েছে, সে জাতিকেই আমরা সভ্য বলতে বাধ্য। 'সভ্যতা' শব্দ তার কোনও সঙ্কীর্ণ অর্থে এস্থলে আমি ব্যবহার করছিনে। আর এই ভারতবর্ষই নেপালকে ধীরে ধীরে সভ্য করে তুলেছে। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, ভারতবর্ষের ভাষাই নেপালীরা গ্রহণ করেছে। মনু বলেছেন যে, "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্ত স্মার্ত্ত এব চ"। তারপর মনু বলেছেন —

"এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥"

এই আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণরা কি উপায়ে, কি পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁদের আচার নামক পরমধর্ম্ম বিদেশীদের শিক্ষা দিয়েছেন, এ ইতিহাসে তারও পরিচয় পাওয়া যায়। নেপালে বহুকাল ধরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং কি কারণে ভারতবর্ষের মত সে দেশেও বৌদ্ধধর্ম্ম একটি অপদস্থ ধর্ম্মমাত্র হয়ে পড়েছে, তারও সন্ধান এ পুস্তকে মেলে। কিন্তু সে সব জানতে হলে মূলগ্রন্থ পাঠ করা প্রয়োজন। সঞ্জয় জম্বুদ্বীপের বর্ণনা সুরু করে বলেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র যখন ব্রহ্মবিদ্যার ধার ধারেনা, তখন স্থূল জিওগ্রাফির কথা বলা যাক্।

৩

এখন আমিও নেপালের স্থূল জিওগ্রাফির কথা বলব। নেপালের দেশী বিলেতী অসংখ্য ম্যাপ আছে, কিন্তু তার জিওগ্রাফি নেই। এর কারণ দেশী ম্যাপগুলি কাল্পনিক, ও বিলেতী ম্যাপগুলি আনুমানিক। নেপালী পণ্ডিতদের হাতে সে সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ছিল না, যার সাহায্যে একটা গোটা দেশের ম্যাপ তৈরী করা যায়। অপর পক্ষে বিদেশী লোকের ওদেশে প্রবেশ নিষেধ সুতরাং ইংরাজরা 'তরাই' থেকে theodolite-এর সাহায্যে যে মাপ-জোখ করেছেন সেই মাপ-জোখের উপরেই তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে। অর্থাৎ দূরবীক্ষণের প্রসাদে যতদূর ঈক্ষণ করা যায়, তাই তাঁদের সম্বল। পণ্ডিতরা বলেন যে, পুরাকালে ইজিপ্টে কৃষকদের খণ্ড খণ্ড ক্ষেত্রের যে চিঠা-নক্সা তৈরী করা হত,—যেমন বাঙলা দেশের জমিদারী সেরেস্তায় আজও হয়,—সেই সব মাপ-জোখ অবলম্বন করেই গ্রীকরা Geography ও তার সহোদর ভাই Geometry নামক বিজ্ঞান দু'টি গড়ে' তুলেছে। অর্থাৎ ভূমির জরিপই হচ্ছে আদি শাস্ত্র। আর এ জরিপ হচ্ছে রশির কিংবা নলের জরিপ। বিদেশী লোকের নেপালে প্রবেশ নিষেধ বলে, তারা ওদেশের এই মেঠো-জরিপ করতে পারে না। সুতরাং নেপাল নামক দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা আমাদের কাছে অবিদিত। নেপাল হচ্ছে হিমালয়ের ট্যাঁকে-গোঁজা দেশ, আর সে ট্যাঁক যা'তে অপরে কাটতে না পারে সেজন্য নেপাল রাজ্যের সতর্কতার আর অন্ত নেই। সম্ভবতঃ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুরাজ্য বাইরের সঙ্গে সম্পর্করহিত হয়ে একঘরে হয়েই টিঁকে থাকে।

আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, নেপাল হচ্ছে একটি valley। ভাল কথা, valley-র বাঙলা কি? উপত্যকা, না অধিত্যকা? অভিধানে দেখতে পাই—উপত্যকা মানে, পর্ব্বতের আসন্ন ভূমি; আর অধিত্যকা মানে, পর্ব্বতের উপরিভূমি। তাই যদি হয় ত' নেপাল হচ্ছে যুগপৎ উপত্যকা ও অধিত্যকা। আর এ valley-র আকার oblong, এবং এর মাথার উপরে তিব্বত ও পায়ের নীচে ভারতবর্ষ। এই কথাটি মনে রাখলেই নেপালের ইতিহাসের মোটা কথাটি জানতে পারব। আর এ দেশে তিনটি নগর আছে। কাঠমাণ্ডু, পাটন ও ভাটগাঁও। গত ভূমিকম্পের ধাক্কায় এ তিনটি নগরই অল্প-বিস্তর বিধ্বস্ত হয়েছে।

৪

নেপাল ভারতবাসীদের কাছে বহুকালাবধি অপরিচিত ছিল। বেদে, পুরাণে, রামায়ণ-মহাভারতে নেপালের নাম পর্য্যন্ত নেই; যদিচ রামায়ণে ভারত-বহির্ভূক্ত নানা দেশের নামাবলি আছে। সম্ভবতঃ পৈশাচী ভাষায় লিখিত 'বৃহৎকথা'য় নেপালের উল্লেখ ছিল। কারণ 'বৃহৎকথা'র যে দু'টি সংস্কৃত সংস্করণ অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, দু'টিতেই নেপালের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত কাব্য দু'খানি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মূল 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে রচিত। অপরপক্ষে মূল গ্রন্থখানি হয় লুপ্ত, নয় অনাবিষ্কৃত; সুতরাং সে গ্রন্থে যে নেপালের উল্লেখ ছিল, এমন কথা নির্ভয়ে বলা যায়না। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচির মুখে শুনেছি যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নেপালের না হোক্

নেপালের কম্বলের কথা আছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বয়েস খুব বেশী নয়। আমার বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষের ঈশান কোণে মনু যে অপরাজিত দেশের কথা বলেছেন, সেই দেশ হচ্ছে নেপাল। আর্যাদের অপরাজিত দেশই হচ্ছে ভারতবর্ষের অপরিচিত দেশ। আর্যাদের সন্ন্যাস অবলম্বন করে সে দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার বিধি ছিল। আর সম্ভবতঃ এই আর্য্য সন্ন্যাসীরাই সেদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করেন। সে যাই হোক্ যে দেশের মাথার উপর তিব্বত ও পায়ের নীচে ভারতবর্ষ, সে দেশে যে এই দুই জাতির মিশ্রণ ঘটবে—এ ত' স্বাভাবিক। ফলে নেপালীদের দেহে তিব্বতী ও হিন্দুস্থানী—উভয়বিধ রক্ত আছে। এবং এই নেপালেই হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মিলন ঘটেছে। কাঠমাণ্ডুতে পশুপতিনাথ ও স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির দু'টিই সর্ব্বাগ্রগণ্য। গত ভূমিকম্পে শিবের মন্দির খাড়া আছে, কিন্তু বুদ্ধের মন্দির ভেঙ্গে পড়েছে। হিন্দুধর্ম্মের গুণই এই যে, তা যুগ যুগ ধরে মরে বেঁচে থাকে। এরই নাম কি Survival of the fittest?

৫

কোনও দেশের জিওগ্রাফি লিপিবদ্ধ করতে হলে, আগে যেমন সে দেশের চৌহদ্দি নির্ণয় করা প্রয়োজন, কোনও দেশের হিষ্টরি লিখতে হলে, আগে তার কালেরও চৌহদ্দি নির্ণয় করা প্রয়োজন। এখন ঠিক কবে থেকে নেপাল হিষ্টরির অন্তর্ভূত হল—তা' বলা কঠিন।

যেমন রাজসরকারের চিঠা-নক্সা থেকেই জিওগ্রাফি উদ্ভূত হয়েছে, তেমনি রাজারাজড়ার বংশাবলী থেকে আমরা হিষ্টরি গড়েছি। এখন নেপালে রাজাদের একাধিক বংশাবলী আছে, সে সব বংশাবলী সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নাহলেও তাদের সাহায্যেই ও-দেশের হিষ্টরি আমাদের গড়তে হবে। পুরাণের বংশাবলীর ন্যায় নেপালের বংশাবলীও নিঃসন্দেহে গ্রাহ্য নয়। এ দুই কুলজির কথাই প্রমাণান্তরের অপেক্ষা রাখে।

কালিদাস বলেছেন—

"সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণ প্রবৃত্তয়ঃ।"

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবার বিষয়ে কালিদাসের মত গ্রাহ্য হতে পারে, বিশেষতঃ সৎলোকের পক্ষে। কিন্তু এ যুগে সত্যমিথ্যার বিচার আমরা অন্তঃকরণপ্রবৃত্তির সাহায্যে করতে পারিওনে, করিওনা। আমরা পুরাণের কথাও যাচিয়ে নিতে চাই, শিলালিপি প্রভৃতির সাহায্যে। Sylvain Levi এই সব বাহ্য প্রমাণের সাহায্যে নৈপালিক বংশাবলীর কথা যাচিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন। পাথরও অবশ্য মিথ্যা কথা কয়, কিন্তু আমাদের ধরে নিতে হবে যে, কাগজের উপর কলমের লেখার চাইতে পাথরের উপর বাটালি দিয়ে খোদা অক্ষর বেশি সত্য, কারণ বেশি টেঁকসই। তাঁর মতে নেপালের হিষ্টরি সুরু হয়েছে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে, কারণ সেই যুগেই সে দেশে প্রথম epigraphy পাওয়া যায়। তার পূর্ব্বের কথা প্রাগৈতিহাসিক।

৬

এখন বংশাবলীর কথা শোনা যাক। নেপালের প্রথম রাজবংশ ছিলেন (১) গোপালবংশ, তারপরে (২) আভীরবংশ, তারপরে (৩) কিরাতবংশ।

এই গোপাল ও আভীরবংশ, সংস্কৃতভাষায় যাদের ও নাম, তারা নয়। এরা হচ্ছে সব তিব্বতী লোক। প্রথমে তিব্বত থেকে লোক গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া চরাতে নেপাল উপত্যকায় নেমে আসে এবং সেখানেই বসবাস করে এবং তাদের মধ্যেই প্রধান ব্যক্তিরা ও-ভূভাগের রাজা হয়ে ওঠে। পরে কিরাতরা এ দেশ জয় করে, এদেশের রাজা হয়। এই কিরাতরাও তিব্বতী লোক। এই গোপাল, আভীর ও কিরাতরাও আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের নিকট নামে-পরিচিত ছিল, কিন্তু কেবলমাত্র নামেই।

এর পর ভারতবর্ষ থেকে লিচ্ছবিরা নেপাল-অধিত্যকায় উঠে যায়, আর কিরাত রাজবংশকে উচ্ছেদ করে নেপালের রাজা হয়ে বসে।

এই লিচ্ছবি কুল বৌদ্ধ ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। এদের রাজধানী ছিল বৈশালী। মনু এদের বলেছেন ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। আর গুপ্তবংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে লিচ্ছবি কুলের দৌহিত্র বলে সাহঙ্কারে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন। এই লিচ্ছবিরা ছিল বুদ্ধের উপাসক ও ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়। এই সময় থেকেই নেপালে তিব্বতী ও হিন্দুস্থানী এই দুই জাতির মিলন ও মিশ্রণ সুরু হয়। এবং নেপালে হিন্দু সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম হল এই সঙ্কীর্ণ জাতির ধর্ম্ম, এবং এদের ভাষা হয়ে উঠল একরকম সংস্কৃতের অপভ্রংশ। ভারতবর্ষের সভ্যতা তিব্বতী অসভ্যতার উপর জয়লাভ করলে। অর্থাৎ নেপাল ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত হয়ে পড়ল।

৭

এই লিচ্ছবিরাজ কালক্রমে ঠাকুর রাজাদের হস্তগত হল। প্রথম ঠাকুর রাজা অংশুবর্ম্মণ ছিলেন শেষ লিচ্ছবিরাজের জামাতা।

রাজা অংশুবর্ম্মণের কাল হতেই নেপাল যথার্থ ইতিহাসের অন্তর্ভূত হল। অংশুবর্ম্মণ ছিলেন হর্ষদেবের সমসাময়িক রাজা। অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকেই নেপালের যথার্থ ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। চীনদেশের ইতিহাসেও তাঁর নাম পাওয়া যায়। এবং তিব্বতের জনৈক প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতিকে তিনি কন্যাদান করতে বাধ্য হন। অংশুবর্ম্মণের কন্যাই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ তিব্বতকে ভারতবর্ষের Culture-এর বশীভূত করেন। তদবধি তিব্বতের ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হয়েছে। এই নেপালের ভিতর দিয়েই তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতা জন্মলাভ করেছে।

এই ঠাকুরবংশের পর মল্লবংশ নেপালের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হয়ে ওঠেন। মল্লজাতি বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ভগবান বুদ্ধ এই মল্লদের দেশেই দেহত্যাগ করেন। মনুসংহিতাতেও মল্লদের ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলে গণ্য করা হয়েছে। ব্রাত্যক্ষত্রিয় হচ্ছে সাবিত্রী-ভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ তারা, যাদের উপনয়ন হয় না। সম্ভবতঃ লিচ্ছবি ও মল্লরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল বলে বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্ম সব ত্যাগ করেছিল। অথবা এরা যোদ্ধাজাতি ছিল বলে মনু এদের ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত করে নিয়েছেন। সে যাই হোক, মল্লরাও যে ভারতবর্ষীয় লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই মল্লবংশীয় রাজারা সব বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু মনু প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি-নিষেধ নেপাল-বাসীদের উপর আরোপ করেন। এই মল্লদের রাজত্ব-কালেই তিব্বতীদের সঙ্গে হিন্দুস্থানীদের রক্তের; বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে বৈদিক ধর্ম্মের; চৈনিক আর্টের সঙ্গে হিন্দু আর্টের পূর্ণ মিশ্রণ ঘটে। ফলে নেপালের সভ্যতা একটি বিশিষ্ট বর্ণ-সঙ্কর সভ্যতা। এই উপত্যকাতেই ভারতবর্ষ মহাচীনের পাণিগ্রহণ করেছে—ফলে এই picturesque নেপালী সভ্যতা জন্মলাভ করেছে।

৮

পরে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গুরখারা নেপালরাজ্য জয় করে' সে দেশের অধিপতি হয়েছে, এবং আজ পর্য্যন্ত নেপাল গুরখারাজেরই অধীন। এই গুরখারা কোন্ দেশ থেকে এলো, আর তারা কোন্ জাতের লোক?

নেপালের পশ্চিমে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল এবং সে সব দেশ 'চব্বিশরাজ' বলেই পরিচিত। এই 'চব্বিশরাজে'র অন্যতম 'গোরক্ষ' রাজ্যই গুরখাদের আদি বাসভূমি। আর সিদ্ধযোগী গোরক্ষনাথই হচ্ছেন গুরখাদের কুলদেবতা।

কিম্বদন্তী এই যে, আলাউদ্দিনের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়ে একদল ক্ষত্রিয় চিতোর থেকে পালিয়ে এসে হিমালয়ের একটি উপত্যকায় আশ্রয় নেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের সঙ্গে বহু ব্রাহ্মণও ছিল। এবং এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে মিলে হিমালয়ে একটি ক্ষুদ্র হিন্দু-রাজ্য স্থাপন করেন। এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের অসবর্ণ বিবাহের ফলে এই গোরক্ষজাতির সৃষ্টি হয়। আর এই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' এই বচন অনুসরণ করে স্থানীয় অধিবাসিনী তিব্বতী রমণীদেরও প্রত্যাখ্যান করেননি! আর এই সব অনুলোম বিবাহের সন্তান-সন্ততিও নিম্নশ্রেণীর গুরখা বলে

পরিচিত সুতরাং এই গুরখা জাতিও বর্ণসঙ্করজাতি, আধা হিন্দুস্থানী, আধা তিব্বতী। এই গুরখারা প্রধানত: যুদ্ধব্যবসায়ী। এদের দেহে তিব্বতীদের শক্তি আছে আর মনে ক্ষত্রিয়দের বীর্য্য আছে। হিন্দুধর্ম্মই এদের জাতিধর্ম্ম। ফলে গুরখারা নেপালে একটি নব-হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেছে। সে দেশে অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে লোপ পায়নি, এক রকম মরে বেঁচে আছে। এই চীনে হিন্দুতে মেলামেশার ফলে নেপাল একটি museum হয়ে রয়েছে—শুধু প্রাচীন গ্রন্থের নয়, হিন্দু ও চৈনিক আর্টেরও। সুতরাং পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌দের কাছে এই ক্ষুদ্ররাজ্য একটি মহা লোভনীয় অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব নেপালের হিষ্টরি, জিওগ্রাফির পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। আশা করি এ প্রবন্ধ পড়ে নেপাল সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল জাগ্রত হবে।

৯

গত ভূমিকম্পের প্রসাদেই আমার মনে নেপাল সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মে এবং সেই কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যই Sylvain Levi-র বিরাট গ্রন্থ আমি পাঠ করেছি। সেই ইতিহাস থেকে আমি আর একটি সত্য উদ্ধার করেছি।

এ ভূমিকম্প নেপালে একটি প্রক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। সে দেশে ইতিপূর্ব্বেও এ দুর্ঘটনা বার বার ঘটেছে। শুনতে পাই ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা বলেছেন যে, হিমালয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে বলেই এ ভূমিকম্প ঘটেছে। তা যদি হয় ত' এরকম ভূমিকম্প ভবিষ্যতে আরও হবে, কারণ হিমালয় যথেষ্ট উঁচু হলেও আরও যে কত উঁচু হতে চায়, তা কেউ বলতে পারেনা। এখন ভবিষ্যতের কথা ছেড়ে দিয়ে, নেপালের অতীতের দু'-চারটি ঘটনার উল্লেখ করি।

(১) নেপালের একখানি প্রাচীন পুঁথি দৃষ্টে আমরা জানতে পাই যে, ১২৫৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখ হতে সুরু করে চার মাস ধরে সেখানে অবিরাম ভূমিকম্প হয়েছিল।

(২) তারপর রাজা শ্যামসিংহের রাজত্বকালে ১৪১০ খৃষ্টাব্দের ১১ই অগষ্ট তারিখে নেপালে একটি ভীষণ ভূমিকম্প হয়, যার ফলে ও-দেশ প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এই ভূমিকম্পের প্রবল ধাক্কায় মৎস্যেন্দ্র-নাথের মন্দির ও রাজপ্রাসাদ সব ধূলিশায়ী হয়।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, কিছুদিনের জন্য একটি ব্রাহ্মণ রাজবংশ নেপালের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। হরিসিংহ নামক মিথিলার জনৈক রাজা মুসলমানদের আক্রমণ রোধ করতে না পেরে নিজরাজ্য ত্যাগ করে পাত্রমিত্র, গুরুপুরোহিত সমভিব্যাহারে নেপালে গিয়ে আশ্রয় নেন, এবং অবশেষে নেপালরাজ্য জবরদখল করেন। তিনিই প্রথমে সংস্কৃত ধর্ম্ম-শাস্ত্র নেপালে প্রচার করেন। রাজা শ্যামসিংহ এই হরিসিংহের বংশধর ও ব্রাহ্মণবংশের শেষ রাজা। এর পর জয়স্থিতিমল্ল সে রাজ্যে মল্লরাজবংশ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জয়স্থিতিমল্ল ছিলেন এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের দৌহিত্র এবং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মহাভক্ত, যদিচ তিনি ছিলেন বৌদ্ধ।

১০

মৎস্যেন্দ্রনাথ হচ্ছেন নেপালের হিন্দুদের একটি প্রিয় দেবতা। আজ পর্য্যন্ত মৎস্যেন্দ্রনাথের রথযাত্রা নেপালের প্রধান উৎসব। ইনি ইহলোকে ছিলেন মানুষ, পরলোকে গিয়ে দেবতা হয়ে উঠেছেন। কি জন্য, তা' বলছি। কিম্বদন্তী এই যে, নেপাল উপত্যকা পূর্ব্বে একটি হ্রদমাত্র ছিল। পরে বৌদ্ধদেবতা মঞ্জুশ্রী পাহাড় ফুটো করে জল নিকাশের পথ করে দেওয়াতে জলমগ্ন যে দেশ আবির্ভূত হল, সেই দেশের নামই নেপাল। কারণ, নেপালী বৌদ্ধদের সর্ব্বপ্রধান দেবতা হচ্ছেন মঞ্জুশ্রী। এ কিম্বদন্তীর মূলে কোন সত্য আছে কি না, তা বলতে পারেন Geologist-রা।

নীচের জল চলে যাবার পর, নেপালদেশের উর্ব্বরতা নির্ভর করলে উপরের জল অর্থাৎ বৃষ্টির উপর। এক সময়ে ঘোর অনাবৃষ্টির ফলে নেপালের অধিবাসীরা অতি দুর্দ্দশাপন্ন হয়ে পড়েছিল। এমন সময় সিদ্ধযোগী

মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালে উপস্থিত হয়ে যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্রের কৃপায় সে দেশকে অনাবৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার করে অতিবৃষ্টির দেশ করে তুললেন। তদবধি তিনি সে দেশের রক্ষাকর্ত্তা দেবতা হয়ে উঠেছেন। এ কথাও সত্য কি না, তা বলতে পারেন Meteorologist-রা।

সে যাই হোক্, পণ্ডিত-সমাজের মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন যোগী গোরক্ষনাথের গুরু এবং সম্ভবতঃ বাঙালী। মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথ নামেও পরিচিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে যে সব প্রাচীন বাঙলার পদ সংগ্রহ করে এনেছেন, তার মধ্যে লুইপাদের পদগুলি নাকি মৎস্যেন্দ্রনাথের রচিত।

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচি মৎস্যেন্দ্রনাথের রচিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করছেন। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় মৎস্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধ না হিন্দু, বাঙালী না পাহাড়ী, তার বিচার থাকবে। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিত। পূর্ব্ব ভূমিকম্পে মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির ধরাশায়ী হয়েছিল, এ ভূমিকম্পে সেটি খাড়া রয়েছে। এর ফলে নাকি নেপালের যুবক-সম্প্রদায়ের মনে দেবদ্বিজের প্রতি ভক্তি পুনর্জীবিত হয়েছে।

১১

নেপালের ইতিহাসে আর একটি ভূমিকম্পের সন্ধান পাই।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৫-এ সেপ্টেম্বর একটি ভীষণ ভূমিকম্প সমগ্র নেপাল রাজ্যকে বিধ্বস্ত করেছিল। পৃথিবীর উপর্য্যুপরি চারটি ধাক্কায় কাঠমাণ্ডুতে ৬৪০টি, পাটনে ৪৮৪২টি, ভাটগাঁয়ে ২৭৪৭টি, সাখুতে ২৫৭টি এবং বানেপা সহরে ২৬৯টি ইমারত ভেঙে পড়ে। তারপর ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বাজ পড়ে' বারুদের গুদাম ধ্বসে যায়। আর তার এক পক্ষ পরে অতিবৃষ্টিতে সে দেশ ভেসে যায়।

এর থেকে দেখা যায় যে, যুগে যুগে নৈসর্গিক উৎপাতের ফল নেপালকে ভোগ করতে হয়েছে। তবে এতদিনে ভূমিকম্প বোধহয় নেপালের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। কারণ নেপালের মহারাজা বড়লাটকে বলে পাঠিয়েছেন যে, তিনি পরের কাছে কিছু সাহায্য চান না। নেপালীরা নিজের বাহুবলে আবার তাদের ভাঙা দেশকে গড়ে' তুলবে। আশা করি তারা তা করতে পারবে। হিমালয়ের ট্যাঁকে-গোঁজা নিকেলের সিকি প্রমাণ এই ক্ষুদ্র দেশের খর্ব্বকায় অধিবাসীদের এই আত্মনির্ভরতার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হতে হয়।

পূর্ব্বে যা বলেছি তার থেকেই অনুমান করতে পারেন যে, নেপাল হচ্ছে হিন্দুসভ্যতার যাদুঘর—ভাষান্তরে museum। এই যাদুঘরের প্রসাদেই আমরা আমাদের অতীতের অনেক সন্ধান পাবার আশা করি। এখনও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, যাদের আমরা নাম শুনেছি কিন্তু সাক্ষাৎ পাইনি। হয়ত তারা নেপালে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। আর মূল সংস্কৃত গ্রন্থেরও যদি আস্কারা করতে না পারি, তা'হলেও তার তিব্বতী অনুবাদ আমাদের হস্তগত হতে পারে। এই কারণে নেপালের পুস্তকাগার যে অক্ষুণ্ণ রয়ে গিয়েছে, এটি পণ্ডিতদের পক্ষে একটি মহা সুসংবাদ, এবং আমাদের পক্ষেও; কারণ আমরা পণ্ডিত নাহলেও তাঁদের আবহাওয়াতেই বাস করি।

১২

আমি আজ বৎসরাবধিকাল ধরে, 'উদয়ন'-পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে মাসের পর মাস 'ঘরে-বাইরে'র আলোচনা করে এসেছি। এ আলোচনা এক হিসেবে ও-পত্রের নামের অনুযায়ী হয়নি। কারণ আমার আলোচনার অন্তরে উষার অরুণ-আলোক ততটা নেই, যতটা আছে গোধূলির ধূসর ছায়া। আমি বর্ত্তমানে, কি ঘরে কি বাইরে, মানবজাতির মুখে কিংবা বুকে, এমন কোনও আশার বাণী শুনতে পাইনি, যা শুনে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। যে সব পুরোনো আচার, পুরোনো idea-র অনুসরণ করে মানুষ দিনের পর দিন উন্নতির সিঁড়ি ভাঙছিল,—সে সিঁড়ি যে ভেঙে পড়ছে, তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু এই ভাঙনের প্রসাদে নতুন কিছু যে গড়ে' উঠছে, তা তেমন প্রত্যক্ষ নয়;

ফলে আমি বর্তমান Economics, পলিটিক্স, শিক্ষা সম্বন্ধে এমন নানা কথা বলেছি, যাতে লোকের মন প্রসন্ন হয়না। বর্তমান সভ্যতার বিশৃঙ্খলার পরিচয় পেয়ে আমার মন প্রসন্ন হয়নি, কাজেই অপরের মনেও আশার সঞ্চার করতে পারিনি।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাকে মহামহিমময়রূপে কল্পনা করেন, আর সেই লুপ্ত সভ্যতাকে উদ্ধার করাই আমাদের কর্তব্য মনে করেন। অতীতকে যে ভবিষ্যতে রূপান্তরিত করা যায়—এই অদ্ভুত ধারণা আমি কস্মিনকালেও মনে পোষণ করিনি। সে অতীত আমাদের নেই, আর ভুলেও ফিরে আসবেনা। আর আমাদের ভবিষ্যৎ যে আমাদের মনোমত ভবিষ্যৎ হবে, তার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছেনা। এক্ষেত্রে কি অতীত, কি ভবিষ্যৎ, কোন কালই আমাদের মনের আশ্রয়ভূমি হতে পারেনা। এ মনোভাবকে লোকে pessimism বলতে পারেন, আর pessimism-টা এ যুগে নিন্দনীয়। সুতরাং আশা করি আগামী বৎসরের পয়লা তারিখ থেকে কোনও তরুণ লেখক optimism-এর সুর ধরবেন। আমি আজ থেকেই ক্ষান্ত কলম। এর পর যদি আমার লেখবার প্রবৃত্তি থাকে ত' আমি সেই সব বিষয়ে কথা কব—যে সব কথা ঘরেরও নয়, বাইরেরও নয়।

['উদ্বোধনে' সমালোচনার জন্য গ্রন্থকারগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের পুস্তক দুইখানি করিয়া পাঠাইবেন।]

Rupakari—By Mrs. Protima Tagore. With an introduction by Mr. Rathindranath Tagore. Price Re. 1-8.

শান্তিনিকেতন হতে প্রকাশিত শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী রচিত এ ক্ষুদ্র নক্সার বইখানি বেশ মনোজ্ঞ হয়েছে। এ শ্রেণীর রচনার যত অধিক প্রচার হয় ততই ভাল। চামড়ার তৈরী নানা শিল্পচেষ্টাকে রেখাঙ্কনের বিচিত্র রূপার্ঘ্যে ভূষিত করার জন্যই মুখ্যতঃ এই সমস্ত নক্সা কল্পিত হয়েছে। চিত্রকলার ক্ষেত্রে শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর অধিকার সামান্য নয়। এক সময় সে কৃতিত্ব বোলপুরের কলাভবনের সকল চেষ্টাকে মলিন করে দিয়েছিল। অসাধারণ বর্ণ-সুষমাব্যঞ্জনের অধিকারী হয়ে শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর চিত্রাঙ্কনী-প্রতিভা অতি বিচিত্র চিত্রলেখার মায়াজাল সৃষ্টি করেছিল। বহু ঘটা ও আয়োজনে যা হয় না, সহজ প্রতিভা তা পুষ্পিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের বোলপুরস্থ যজ্ঞাগারে অনেক আহুতি ও ইন্ধন ব্যয়িত হয়েছে—অনেক আয়োজন, আড়ম্বর ও আমন্ত্রণে তা ধূমায়িত হয়েছে কিন্তু নিঃশব্দ হোমশিখার সফলতা জ্বলে উঠেছে অন্যদিকে। কলালক্ষ্মী স্মিতমুখে দীপ্যমান হয়েছেন — অপ্রত্যাশিতভাবে বরাভয়করে অভিনব ক্ষেত্রে যা বহুকাল নিঃশব্দে অন্তঃসলিলা গঙ্গোত্রীধারায় অভিষিক্ত হয়ে এসেছিল। রবীন্দ্রনাথের বর্ণ ও তূলিকার অপরূপ সম্পদ এবং প্রতিমা দেবীর অসামান্য প্রতিভার রূপজগত—এ দু'টি ব্যাপারই রসার্ণীয়া শান্তিনিকেতনের সত্যিকার সাধনার অঙ্কুরীয়কস্পর্শে লাভ করেছে।

'রূপকরী'র নক্সাগুলি ঠিক সময়েই প্রকাশিত হয়েছে। নিরালম্ব চিত্র বা মূর্ত্তিসংগ্রহ ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি ভাব ও রূপগত ছন্দগুলি ঘটে, পটে সর্ব্বত্র বিস্তৃত না হয়ে পড়ে। কবিবর মরিসের (Morris) যুগে ইংলণ্ডে একটা গভীর চেষ্টা হয় যাতে করে অশনে, ভূষণে সর্ব্বত্রই রূপধারার একটা বিরাট প্রসার ঘটে। কয়েকখানি ছবি এঁকে নিজের বা জাতির শীলতাগত (cultural) উন্নয়ন কল্পনা করা মূঢ়তা মাত্র। সৌন্দর্য্যের সমগ্র ছন্দ জীবনের বহুমুখী প্রকাশেই ওতঃপ্রোত হওয়া চাই, তবেই সে সব সার্থক হয়। একদিকে শিল্পীরা প্রাচীন চিত্রের আদর্শে ছবি আঁকলে, আবার অন্যদিকে নিজের ব্যবহারের জন্য অদ্ভুত আসবাব-পত্র—টিনের মগ, কলাইকরা প্লেট্ বা জার্ম্মান পেয়ালা ইত্যাদির আবেষ্টনে মগ্ন হয়ে গেল—এ সব শুধু এই হত-ভাগ্য দেশেই সম্ভব হয়। সকল ছন্দবর্জ্জিত, সকল কারুতা হতে মুক্ত একান্ত বর্ব্বর জীবনযাত্রার সহিত ইদানীং চলেছে অলীক রূপানুকরণের লঘুতা।

ইদানীং সকল রকমের নক্সার খিচুড়ি বাহির হতে এসে দেশকে ছেয়ে ফেলেছে। এ সমস্ত নক্সাগুলিই দেশের চোখে পড়ছে বেশী অথচ ভারতীয় নক্সাসংগ্রহ জগতের ইতিহাসে সব চেয়ে মনোজ্ঞ ও বিপুল। এক সময় এখানকার ছাপা, সূক্ষ্ম ও জরির কাপড় প্রভৃতির রপ্তানির ভিতর দিয়ে সমগ্র য়ুরোপে ভারতের রূপাবলি বিস্তৃত হত। কাপড়-চোপড়ের ভিতর অতি আশ্চর্য্য নক্সাদি বোনা ও আঁকা হ'ত—যা ক্রমশঃ কৃত্রিম বিলাতী আমদানী নষ্ট করে দিয়েছে। এখনও মৃৎ ও কাংস্যপাত্র, কাষ্ঠশিল্প, শাল-কিংখাপ প্রভৃতির বহুমুখী লীলায়িত ব্যঞ্জনায় ভারতের রেখাগত প্রাণকম্পন দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়—সে সবের জীবন্ত সম্পর্ক হতে দেশ চ্যুত হয়ে গেছে। কাপড়-চোপড়ের ছন্দেও বিভ্রাট ঘটেছে। আফগানী, পারস্য, জাপানী ও চৈনিক পাচমিশালি দিয়ে আমরা আত্মবিরোধী পরিচ্ছদ রচনা করে দেশে তাক্ লাগাতে চাই—অথচ ভুলে যাই যে, সব দেশের বসন-ভূষণের ভিতর একটা ছন্দগত সংহতি ও সমবায় আছে—যা নষ্ট হয়ে যায় পঞ্চগব্যের আকারে।

রেখাছন্দের কারুতা চিরকালই জগতের লোভনীয় ব্যাপার ছিল। পশ্চিমে মধ্যযুগের গির্জ্জাগুলির রঙীন কাঁচের নক্সা, ইউরোপীয় অধ্যাত্ম আলোড়নের তালের সঙ্গে জড়িত। গ্রীক পাত্রের (vase) অলঙ্করণ গ্রীক সাধনার মর্ম্মবস্তুকে রেখান্তস্ত করেছে; মিশরীয় নক্সা, সরল রেখাকে অবলম্বন করে এক অপরূপ ধাঁধা সৃষ্টি করেছে। পারস্য glazed tile-এ চিত্রও নক্সার হরগৌরী মিলন হয়েছে, এবং পারস্য গালিচায় নক্সার একটা স্বাধীন ধর্ম্ম ফুটে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে প্রাচ্য অঞ্চলে চীন ও ভারতই শীর্ষস্থানীয়—যদিও জাপানী নক্সারও কোন কোন বিষয়ে তুলনা নেই। চৈনিক বর্ণরূপক (colour symbolism) সূচী-শিল্পের নক্সায় বৈচিত্র্য বাড়িয়েছে; জাপানে Momoyama দুর্গে রক্ষিত অসংখ্য পর্দ্দার নক্সা জাপানী শীলতার ঐশ্বর্য্যের প্রতিফলক। 'রূপকরী'তে মানুষের দেহরূপকে ছন্দে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুতঃ জগতের ইতিহাসে শুধু অজন্তাতেই এ শ্রেণীর সফল চেষ্টা আছে। প্রাকৃতিক রূপকে ছন্দগত নক্সাতে পরিণত করার বিপুল চেষ্টা ভারতের মত বাহিরে কোথাও হয় নি। এ ব্যাপারকে ইংরাজীতে 'Schematisation of forms' বলা হয়। প্রত্যেকটি নক্সাতেই একটা ছন্দগত প্রতিমা আছে—তাকে সফল ও সুশোভন করতে প্রাকৃতিক ধারাকে ভাঙ্গতে হয়। নেপাল, মহীশূর, ব্রহ্মদেশ ও পশ্চিম ভারতে আশ্চর্য্যভাবে এরূপ অজস্র ছন্দ জীবনলাভ করেছে। সে সব ছন্দ ক্রমশঃ অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়েছে। এ সমস্ত সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক রূপ একটা অবলম্বন মাত্র তা থাকে শুধু ছায়ার আকারে আলেয়ার মত—তারই ভিতর দিয়ে দীপ্যমান করতে হয় রেখার কালোয়াতী ও রূপচক্র।

অন্যান্য দেশে শুধু পৌনঃপুনিক (Repeat) ধর্ম্মেই রেখাগীতিকার সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে নক্সার রূপ শুধু তাতে পর্য্যবসিত হয় নি। Sidi Sayyed-এর

মসজিদের জানালার নক্সায় (window tracery) আছে বৈচিত্র্যের মধুর ঐক্য, অসমের সমতান—এটা একান্তভাবে ভারতের সৃষ্টি—মুরিস বা আরবা (Moorish) সৃষ্টিতে এ শ্রেণীর ব্যাপার পাওয়া যাবে না। Arabesque-এর গোলকধাঁধায় আছে মায়ার খেলা—রেখার ভেলকি। কিন্তু ভারতীয় শীলতার এই সাম্যবাদ বা বৈচিত্র্যের ভিতর সমতান সৃষ্টি অন্যত্র দুর্লভ। আশা করা যায়, যারা ভারতবর্ষে এ পথে অগ্রসর হবে, ভারতীয় ঐশ্বর্য্যের দশ দিক্ হতে দুর্লভ শীলতার অসংখ্য বাণীর সংস্পর্শ হতে তারা বঞ্চিত হবে না।

'রূপকরী'র কবিতাস্থানীয় সুশোভন রেখার স্বপ্নগুলি দেখে আমাদের বিশেষ আনন্দ হয়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পাদির প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকল্পে যে নূতন চেষ্টা হচ্ছে তা সার্থক ও সুশোভন হোক্, সকলেই এই আশা পোষণ করেন।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

শান্তি-সোপান—বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক এমাম গাজালী প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদক—খানবাহাদুর মৌলবী চৌধুরী কাজেমদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী। মূল্য—২৷৹।

গ্রন্থের ভূমিকাপাঠে অবগত হওয়া যায়, বর্ত্তমান মুসলিম সমাজের ধর্ম্মহীনতা ও আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণে অসমর্থ, অন্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মোল্লা-মৌলবী প্রবর্ত্তিত নানাবিধ অশিক্ষা ও কুশিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করেই অনুবাদক এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেছেন। আকারে ক্ষুদ্র হলেও গ্রন্থখানি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্বপূর্ণ বহু গবেষণায় পরিপূর্ণ। অনুবাদকার্য্যও সার্থক ও সুন্দর হয়েছে বলতে হবে, কেন না আগাগোড়া নির্জ্জলা ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে পূর্ণ হলেও বইখানির কোথাও ভাষার আড়ষ্টতা বা দুরূহ শব্দকাঠিন্য মনকে পীড়িত করে না। বরঞ্চ একটা সহজ লালিত্যই অনায়াসে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ভূমিকার স্থান বিশেষে আছে, "দুঃখের বিষয় আমাদের সমগ্র ধর্ম্মগ্রন্থই আরবি, পারসি বা উর্দ্দুতে লিখিত, বর্ত্তমান ছেলেদের মধ্যে কেহ কেহ উহা পাঠ করিতে পারিলেও বাঙ্গলার অধিকাংশ তরুণ ও অ-তরুণই ঐ সব গ্রন্থ পাঠ করিতে বা উহার রসাস্বাদন করিতে অসমর্থ।" বলা বাহুল্য, খান বাহাদুর কাজেমদ্দীন সাহেব পূর্ব্ব-বাঙ্গালার মুসলিম সমাজে সুপরিচিত অন্যতম নেতৃস্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি; তাঁর এ উক্তি চিন্তাশীল সমাজ হিতৈষীমাত্রেরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অনেকটা এই ভাষা-বৈগুণ্যের ফলেই এদেশের মুসলিম 'কালচার' বর্ত্তমানকালে কোনওরূপ সুষ্ঠু সুসমঞ্জস রূপ গ্রহণ করতে পারছে না। এবং সেইজন্যেই মুসলমানের ধর্ম্ম, তার সভ্যতা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য বিষয়ক মূল আরবী-পারসী বা উর্দ্দু গ্রন্থাদির অনুবাদ—মর্ম্মানুবাদ প্রভৃতির প্রসার যত হয় ততই কল্যাণকর।

সুফী মোতাহার হোসেন

আমার ব্যবসা' জীবন—রায় সাহেব শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সাধু প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪০। মূল্য—১৷৹ টাকা মাত্র।

যে জাতি ব্যবসাক্ষেত্রে তাহার অগৌরবের কাহিনী শুনিতে শুনিতে আত্মশক্তিতে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে, বিদেশীর দিগ্বিজয়ের ধ্বজা দেখিয়া কর্ম্মপ্রচেষ্টায় বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কাছে শ্রীযুক্ত সাধু মহাশয়ের ব্যবসা-জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস উপন্যাস বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম-বহুল জীবন এবং অশেষ শ্রমসাধ্য সাফল্য যুবক-বাংলার কর্ম্মশক্তির সম্মুখে একটি মহান্ আদর্শ সৃষ্টি করিবে সন্দেহ নাই। আজ বাংলার আর্থিক জীবনে যে বাণিজ্য-লক্ষ্মীর নব উদ্বোধন আরম্ভ হইয়াছে তাহার প্রাক্কালে সাধু মহাশয়ের জীবন-চরিত এক অভিনব প্রেরণার সন্ধান যোগাইবে। নানারূপ উত্থান-পতনের মধ্য দিয়াই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত সমৃদ্ধির বিকাশ হয়। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বর্ত্তমানকে আঁকড়াইয়া ধরাই যে সাফল্যের প্রকৃষ্ট উপায় তাহা এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীমণীন্দ্রমোহন মৌলিক

বিহারের পুনর্গঠন

ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত অঞ্চলের সাহায্যের জন্য ১৩ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে টাকা উঠেছে তার মোটামুটি হিসাব একটা ১৪ই মার্চ্চের সংবাদপত্র হতে সংগ্রহ করে দেওয়া গেল—

বড় লাট বাহাদুরের তহবিলে ৩১,৩৯,৮২৫ টাকা,
বিহার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটিতে ২০,৯৪,৩৭৬ টাকা,
কলিকাতার মেয়রের তহবিলে ৪,৫৩,০৫২ টাকা,
সঙ্কট-ত্রাণ সমিতিতে ১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৮৬,২৩৬ টাকা।

এই হচ্ছে বড় বড় দান—ছোট ছোট দানও কতকগুলি আছে। অবশ্য এইখানেই যে দান শেষ হয়েছে তা নয়। আরও কিছু টাকা যে উঠবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তা হলেও একথা বলা যায় যে, মোটা দান যেগুলো পাওয়ার তা পাওয়া গিয়েছে—এবং যে দান পাওয়া গিয়েছে তা এতই অকিঞ্চিৎকর যে, তার দ্বারা ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত অঞ্চলের দুঃখের কণাংশ মাত্রও দূর করা যাবে না। বিহারের গভর্ণর নিজেও বলেছেন এবং বিশেষজ্ঞদের আরও অনেকে মনে করেন যে, এই বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিকে আবার গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন হবে অন্ততঃ ৩০ কোটি টাকার। দানের অঙ্ক এক কোটি টাকাকেও ছাড়িয়ে ওঠে নি। সুতরাং বিধ্বস্ত অঞ্চলের নিঃসহায় অবস্থার কথা মনে করে দেশের মন যে উৎকণ্ঠিত ও ভীত হয়ে উঠবে তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই।

অবশ্য এই দানের অর্থই যে পুনর্গঠনের কাজের একমাত্র নির্ভর তা নয়। ভারত গভর্ণমেণ্টও সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই গঠনের কাজে। তাঁদের অর্থ কি ভাবে খরচ হবে তার একটা আভাসও পাওয়া গিয়েছে তাদের ঘোষণা থেকেই। তাঁরা মিউনিসিপ্যালিটি, জেলাবোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য এবং আখের ফসলের জন্য দেবেন ৭৫ লক্ষ টাকা, সরকারী ইমারতগুলির পুনর্গঠনের জন্য দেবেন ৫০ লক্ষ, ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দেবেন দুঃস্থদের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ঋণ-স্বরূপ। এ ছাড়া বিহার গভর্ণমেণ্টের দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-ভাণ্ডারে ২৫ লক্ষ টাকা জমা আছে। কৃষি-ঋণ স্বরূপে সে টাকাও তাঁরা দিতে পারেন। কিন্তু দুর্দ্দশা যত বড় তার তুলনায় এই সাড়ে তিন কোটি টাকাও ত' একটা অতি অকিঞ্চিৎকর অঙ্ক মাত্র।

কোন দেশে এই ধরণের নৈসর্গিক বিপদ যখন দেখা দেয়, তার প্রতিকারের পথ করে দিতে হয় সেই দেশের গভর্ণমেণ্টেরই। সুতরাং বিহারের পুনর্গঠনের দায়িত্বও গভর্ণমেণ্টের। বিহারের পুনর্গঠনের জন্য যদি আর সমস্ত দিকের ব্যয়-বাহুল্য সঙ্কোচও করতে হয়, তবে সেই ভাবে ব্যয় সঙ্কোচ করেই বিহারকে সাহায্য করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। সম্প্রতি বড়লাট বিহারের এই বিধ্বস্ত অঞ্চলটা পরিদর্শন করে গিয়েছেন। আশা করি, তাঁর এই পরিদর্শনের ভিতর দিয়ে বিহার তার পুনর্গঠনের পথও খুঁজে পাবে।

পরলোকে স্বামী শিবানন্দ

বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী শিবানন্দ গত ২০-এ ফেব্রুয়ারী পরলোকের পথে যাত্রা করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৮০ বছর পার হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং অসময়ে যে তিনি দেহ-রক্ষা করেছেন, তা বলা যায় না। তা ছাড়া তিনি

ছিলেন গৃহের সব রকমের বন্ধন হতে মুক্ত সন্ন্যাসী। তবু এই আত্ম-সমাহিত সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে যিনিই এসেছেন তিনিই তাঁর মৃত্যুতে আত্মীয়-বিয়োগের দুঃখ অনুভব করবেন।

জীবনের প্রথম বয়সে স্বামী শিবানন্দ স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম তিনি আসেন রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এবং তার পরেই তিনি পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের ভিতর ছিলেন তিনিও একজন। রামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্য তিনি সিংহলে গিয়েছিলেন, তারপর সেখান হতে ফিরে তিনি বেলুড়ে আসেন। কাশীর অদ্বৈত আশ্রম তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। স্বামী বিবেকানন্দ যে ১১ জন ট্রাষ্টির উপরে মঠ পরিচালনার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন, স্বামী শিবানন্দ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। ক্রমে তিনি মঠের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মধারা আজ বহু ক্ষেত্রে প্রবাহিত। এই বিরাট কর্ম্ম-ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন স্বামী শিবানন্দ। সুতরাং কর্ম্ম-শক্তি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি যে তাঁর ভিতরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই ছিল তা বলাই বাহুল্য। তাঁর মত পরহিতব্রত সাধুর তিরোধানে রামকৃষ্ণ মিশনের ক্ষতি ত' হলই, দেশেরও যে প্রচুর ক্ষতি হল তাতে সন্দেহ নেই।

ছাত্র-ছাত্রীর একসঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা

বাঙ্‌লায় নারীদের শিক্ষা ক্রমেই বেড়ে উঠছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্র ও ছাত্রীদের একত্রে বসে লেখা-পড়া করা সঙ্গত কি না সে প্রশ্নটাও জটিল হয়ে দেখা দিচ্ছে সমাজের ভিতরে। জ্ঞানার্জ্জনের পথ, নরই হোক আর নারীই হোক্, কারও বন্ধ করা চলে না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানার্জ্জনের পথের ভিতর দিয়েই শিক্ষার যা মূল উদ্দেশ্য তা যদি ব্যর্থ হয় তবে সে জ্ঞানেরও কোন সার্থকতা থাকে না। আর সেই জন্যেই সমস্যাটা হয়ে উঠেছে এত জটিল। ছেলেরা এবং মেয়েরা যে বয়সে স্কুল-কলেজে পড়ে, সেইটেই সব চেয়ে মানুষের পক্ষে সঙ্গিন বয়স। কারণ সেই বয়সেই নর-নারীর জীবনে জাগে একটা প্রকাণ্ড চঞ্চলতা, তখন মানুষ চলতে চায় খেয়ালের ঝোঁকে। কিন্তু ঝোঁকে চলা আর যাই হোক্ সহজে চলা যে নয়, তা বলাই বাহুল্য। মানুষের জীবনের চঞ্চলতাকে সংযত করে তার বিচার-বুদ্ধি। কিন্তু এ বয়সে বিচার-বুদ্ধিকে আমল না দেওয়াই হয়ে দাঁড়ায় মানুষের স্বাভাবিক চিত্ত-বৃত্তি। সুতরাং নর-নারীর এক সঙ্গে বসে শিক্ষা করার ভিতরে যে একটা বড় রকমের বিপদ আছে তাতে সন্দেহ নেই।

ইউরোপ এবং আমেরিকার দিকে তাকিয়েই আমরা সাধারণতঃ এদেশেও এক সঙ্গে বসে লেখা-পড়া করার এই ব্যবস্থার আমদানী করতে চাই। কিন্তু একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার যে, ভারতবর্ষকে ইউরোপ করে তুললেও তার উপকার করা হবে না। ভারতবর্ষের নিজের সভ্যতার একটা ধারা আছে। যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সমাজের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত এই সভ্যতার ধারাকে অব্যাহত রেখেই। তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের এই অবাধ মেলামেশার ফল যে ইউরোপ ও আমেরিকাতেও খুব ভাল হয়েছে তা নয়। এর ফল যে কি হয়েছে আমেরিকার নিজের হিসাব থেকেই দেখিয়ে দিচ্ছি। আমেরিকায় ১৫ বছর হতে ২৪ বছর বয়সের ভিতরে যারা আত্মহত্যা করে তাদের সংখ্যা বৎসরে ১২০০। আমেরিকার প্রত্যেকটি অপরাধের শতকরা ৮০টি সঙ্ঘটিত হয় ১৮ বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক-বালিকাদের দ্বারা। কুমারী অবস্থায় আমেরিকায় যাদের ছেলে হয় তাদের শতকরা ৪২টিই স্কুলের ছাত্রী এবং তাদের বয়স ১৬ বৎসরের কম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা আমেরিকার পক্ষে ভাল হয় নি। অন্ততঃ উপরের হিসাব থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা জাতির জীবনে কল্যাণপ্রদ হয় নি। সুতরাং এদিকে দিয়ে বাঙ্‌লা যদি ইউরোপ বা আমেরিকার অনুসরণ করে তবে তার ফল যে বাঙ্‌লার পক্ষেও ভাল হবে না, তা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়।

স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার ভিতরে অনেকখানি প্রভেদ। দেশের মেয়েরাও সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ করুক —এ কামনা আমরা করি। কিন্তু তারা স্বেচ্ছাচারিণী হোক্, এ কামনা আমরা কোনরূপেই করতে পারি নে। আর সেই জন্তই ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গে বসে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সঙ্গত কি না আজ তা বিশেষ করে ভেবে দেখবার সময় এসে পড়েছে। চোখের সামনে ইউরোপ এবং আমেরিকার যে সব দৃষ্টান্ত দেখা যাচ্ছে, তাই এ দিক দিয়ে সাবধান হবার প্রয়োজন, সচেতন হবার প্রয়োজন এনে দিয়েছে এ দেশের সামনেও।

মুসলমান সম্প্রদায় ও বাঙ্‌লা ভাষা

বাঙ্‌লা কাউন্সিলের মুসলমান সদস্তেরা মাননীয় আগা খাঁকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্ত একটি সভা আহ্বান করেছিলেন। এই সভায় তিনি বাঙ্‌লা ভাষা সম্বন্ধে মুসলমান সম্প্রদায়কে যে উপদেশ দিয়েছেন তা মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"বাঙ্‌লা ভাষা বাঙালী মুসলমানদের মাতৃ-ভাষা। এই ভাষারই চর্চ্চা তাঁদের করতে হবে। তা ছাড়া এ ভাষা তুচ্ছও নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্যশালী ভাষাগুলির ভিতরেই বাঙ্‌লা ভাষা স্থানলাভের যোগ্য। সুতরাং বাঙ্‌লার মুসলমানেরা যেন ইস্‌লাম ধর্ম্মের ও দর্শনের গ্রন্থগুলি বাঙ্‌লায় তর্জ্জমা করে প্রকাশ করেন এবং মুসলমান বালক-বালিকাদের জন্ত বাঙ্‌লা ভাষাতে পাঠ্যগ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন।"

এ কথা সহসা এমনভাবে তাঁর বলার অর্থ যে কি তা আমরা জানি নে। হয়ত বাঙ্‌লার মুসলমানদের সংস্পর্শে এসেই তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, বাঙালী মুসলমানেরা নিজেদের যতখানি বাঙ্‌লার লোক বলে মনে করেন, তার চেয়ে ঢের বেশী মনে করেন নিজেদের ইরাণ-তুরাণের লোক বলে। আর সেই জন্তই বাঙ্‌লার প্রতিও তাঁদের দরদ নেই, বাঙ্‌লা ভাষার প্রতিও তাঁদের দরদ নেই। বস্তুতঃ বাঙালী মুসলমান ছেলের হাতে-খড়ি দেওয়া হয় এই বাঙ্‌লা দেশেও উর্দ্দু, আরবি প্রভৃতি ভাষায়। ভাষার দিক্ দিয়ে যদি দেশের লোকের পরস্পরের সঙ্গে যোগ না থাকে তবে জাতি গঠনের পথেই বাধা পড়ে, যে একতা জাতির দাঁড়াবার প্রথম সোপান, তাই হয়ে ওঠে দুর্ব্বল ও হালকা। এ যে কত বড় সত্য কথা, বাঙ্‌লা প্রতি পদে আজ তার পরিচয় পাচ্ছে। বাঙ্‌লায় মুসলমান জন-নায়কেরা মাননীয় আগা খাঁর কথাটা ধীরভাবে যদি বিচার করে দেখেন তবে তাঁরাও উপকৃত হবেন, আর তাতে বাঙ্‌লা দেশেরও উপকার হবে।

সাহিত্য-সম্মেলন

আগামী গুড ফ্রাইডে-র ছুটির সময় তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ একটি সাহিত্য-সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছেন। ৪৬নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীটের 'কুমার সিং হলে' এই সভার অধিবেশন হবে। সভার কাজ নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা হয়েছে— (১) সাহিত্য-শাখা, (২) বিজ্ঞান-শাখা, (৩) বৃহত্তর বঙ্গশাখা, (৪) ইতিহাস শাখা, (৫) বাংলা ভাষা ও মুসলিম সাহিত্য শাখা, (৬) ধনবিজ্ঞান শাখা, (৭) চারুকলা ও লোক-সাহিত্য-শাখা, (৮) শিশু সাহিত্য ও মহিলা শাখা, (৯) গ্রন্থাগার আন্দোলন শাখা। মূল সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, অ্যাড্‌ভোকেট এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েছেন 'উদয়ন'-সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার দে।

গত বৎসরেও ঠিক এই সময়েই তালতলার পাবলিক লাইব্রেরী সাহিত্য-সম্মেলনের অনুষ্ঠান করেছিলেন। তাঁদের সে সভাও চমৎকার সাফল্যলাভ করেছিল। এর অনুষ্ঠাতাদের ভিতরে যোগ্য লোকের অভাব নেই। সুতরাং এবারকার সভাও যে সাফল্যলাভ করবে—এ আশা অসঙ্কোচেই করা যায়। আমরা এর পরিপূর্ণ সাফল্যই কামনা করি।

প্রাদেশিক স্বার্থপরতা

পাটের রপ্তানি হতে যে শুল্কটা আদায় হয় তা বাঙ্‌লারই প্রাপ্য। জোর করে তা ভারত-গভর্ণমেন্ট নিজেদের করে নিয়েছিলেন। এর বিরুদ্ধে অনেকদিন থেকে বাঙ্‌লায় আন্দোলন চলেছে। বাঙ্‌লার যাঁরা বিজ্ঞ রাজনীতিক তাঁরা ত' এর প্রতিবাদ করেছেনই, বাঙলার গভর্ণমেন্টও এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করেন নি। বাঙ্‌লার বাজেটের দুরবস্থা দেখে এবার ভারত গভর্ণমেন্ট এই রপ্তানি-শুল্কের কিয়ৎপরিমাণ বাঙ্‌লাকে ছেড়ে দেবেন স্থির করেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে বোম্বাই সহরে একটা হুলুস্থূল পড়ে গিয়েছে। বোম্বাই কাউন্সিলে এ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন সেখানকার সদস্যেরা, মেয়রের সভাপতিত্বে সভা করেও এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করা হয়েছে। অকারণে বোম্বাই-এর এই চাঞ্চল্য দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। যে জিনিষটা বাঙ্‌লার একান্তই নিজস্ব জিনিষ, তার খানিকটা যদি বাঙ্‌লার হাতে ফিরে এসেই থাকে তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করা আর যাই হোক, মহত্ত্বের পরিচায়ক নয়। বোম্বাই-ও মহত্ত্বের পরিচয় দিচ্ছে না তার এই অসহিষ্ণুতার দ্বারা। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশেরই কামধেনু হয়ে আছে বাঙ্‌লা। এই বাঙ্‌লার উপর সুবিধে নেওয়ার সুযোগ বোম্বাই কখনও ছেড়ে দেয় নি। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় বাঙ্‌লা যখন বিলাতী-বস্ত্র বর্জ্জন করেছিল বাঙলায় তখনও কাপড়ের মিল প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সুতরাং বস্ত্রের জন্য সেদিন বাঙ্‌লাকে নির্ভর করতে হয়েছিল বোম্বাই-এর উপরেই। তখন বোম্বাই কাপড়ের দর চড়িয়ে বাঙ্‌লাকে শোষণ করেছে। আজও যখন বাঙ্‌লার কৃষক দুর্দ্দশার একেবারে চরম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে, তখনও বোম্বাই-এর বাঙ্‌লাকে শোষণ করবার মনোভাব ঠিক তেমনিই আছে। কোন প্রদেশের এই ধরণের সঙ্কীর্ণতা বৃহত্তর ভারত গড়ে উঠবার পথেই বাধার সৃষ্টি করে। অথচ এই বৃহত্তর ভারত গড়ে উঠবার প্রয়োজন দেশের কাছে আজ যেমন ভাবে দেখা দিয়েছে, তেমন ভাবে আর কখনও দেখা দেয় নি। বোম্বাই-এর নিজের অসচ্ছলতা থাকতে পারে, তার জন্য গভর্ণমেন্ট যদি তাকে সাহায্য না করে থাকেন তবে তাঁদের কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করবার অধিকারও বোম্বাই-এর আছে। কিন্তু অন্যের ন্যায্য প্রাপ্য জিনিষ ফিরিয়ে দিয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করা কেবল অশোভন নয়, তা মানব-ধর্ম্মের দিক থেকেও অন্যায়। বোম্বাই-এর দুঃখ-দুর্দ্দশা যদি থাকে, আর তা দূর করবার জন্য যদি তাকে কোন অন্যায় কর-ভার হতে গভর্ণমেন্ট মুক্তি দেন তবে বাঙ্‌লা তাতে আনন্দিতই হবে, দুঃখিত হবে না।

আবার যুদ্ধের আশঙ্কা

বিশেষজ্ঞেরা আশঙ্কা করছেন পৃথিবীতে শীঘ্র আর একটা মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার অভিনয় হবে। এ যুদ্ধ সুরু হবে এশিয়াতে না ইউরোপে সে সম্বন্ধে এখনও তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন নি। তবে যুদ্ধ যে বাধবেই তার পরিচয় পাচ্ছেন তাঁরা যেমন এশিয়ায় তেমনি ইউরোপেও। এ উভয় মহাদেশেই কোন জাতি আজ আর কোন জাতিকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়। ফলে নিরস্ত্রীকরণ সভার বৈঠক হচ্ছে একদিকে, আর একদিকে ইউরোপের শক্তিসমূহ বাড়িয়ে চলেছেন তাঁদের লড়াইয়ের যন্ত্রপাতি, যান-বাহন ইত্যাদি। রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইতালী, ইংলণ্ড সব দেশেই চলছে এই রকমের ব্যাপার। লর্ড লণ্ডনডেরী ত' স্পষ্টই বলেছেন—"নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের জন্য যতটুকু না করলে নয়, আমরা কেবল তাই করতে পারি। কিন্তু তাই বলে গভর্ণমেন্ট অন্য শক্তিসমূহ হতে হীনবল হয়ে থাকবেন —এ কল্পনাও তাঁরা করতে পারেন না। জাতির ও সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্যই তা সম্ভব নয়।" এ যে ইংলণ্ডের কেবল মুখের কথা নয়, তাঁদের কাজের ভিতর দিয়েই তারও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বিমান-বহর বাড়াবার জন্য ইংলণ্ড এই বর্ত্তমান বৎসরেই ১,৭৫, ৬১,০০০ পাউণ্ড ব্যয় করবেন স্থির করেছেন। কেবল ইংলণ্ড নয়, সব দেশেই এমনিভাবে চেষ্টা চলেছে

যুদ্ধের সরঞ্জাম বাড়াবার। কিন্তু একটা যুদ্ধ বাধলে ক্ষতি যে কি হয়, তা গত মহাযুদ্ধের সময়কার ক্ষতির চেহারাটার দিকে তাকালেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। গতযুদ্ধে মৃত্যুর পরিমাণ ছিল—জার্মানীর ১৯ লক্ষ, ফ্রান্সের ১৫ লক্ষ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ১১ লক্ষ, রাশিয়ার ৫৫ লক্ষ।

যুদ্ধে যারা অঙ্গহীন বা পঙ্গু হয়ে গেছে তাদের সংখ্যা এক কোটি, মোট আহতের সংখ্যা দুই কোটি। ৪,৭৯,৮৫০ জন ব্রিটিশ সৈন্য যুদ্ধে তাদের কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলায় এখনও পেন্সন ভোগ করছে।

এ ক্ষতি ত' গেল মানুষের জীবনের দিক দিয়ে। অর্থের যে ক্ষতি হয়েছে তার বহরও বিরাট। যুদ্ধে সমগ্র পৃথিবীর মাসিক আনুমানিক ব্যয় ছিল সাড়ে তিন হাজার কোটি হতে পাঁচ হাজার কোটি পাউণ্ডের মধ্যে। সুতরাং আবার যদি যুদ্ধ বাধে তবে তার ফল যে কি হবে, উপরের অঙ্কগুলি থেকে তার একটা অনুমান করা কঠিন নয়। পৃথিবীর বড় বড় শক্তিগুলি এই সর্ব্বনাশের সম্ভাবনার কথা যে জানেন না, তাও নয়। তথাপি এই যুদ্ধ না কি অপরিহার্য্য! মানুষের সভ্যতা যে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তার পরিচয় তার এই সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির ক্ষুধা ও স্বার্থবুদ্ধির ভিতর দিয়েই পাওয়া যায়।

স্বর্গীয় গোলাপলাল ঘোন

গত ৪ঠা মার্চ্চ 'অমৃত বাজার পত্রিকা' অফিসে স্বর্গীয় গোলাপলাল ঘোষের চিত্রাবরণ উন্মোচনের জন্য একটি সভার অধিবেশন হয়ে গিয়েছে। বাগবাজারের 'শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট' এর উদ্যোগী ছিলেন এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। ৺গোলাপলাল ঘোষ বাংলার দুই বিখ্যাত মনীষী স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ এবং মতিলাল ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। যাঁরা গোলাপলাল এবং 'অমৃত বাজার'কে জানেন তাঁরা এ কথাও জানেন যে, 'অমৃত বাজারে'র বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের মূলে গোলাপলালের দান সামান্য নয়। গভীর অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের সঙ্গে 'অমৃত বাজার'কে গড়ে তুলবার কাজে তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। তাঁর সে কাজের ভিতর আড়ম্বর ছিল না—কিন্তু নিষ্ঠা ছিল, ঐকান্তিকতা

স্বর্গীয় গোলাপলাল ঘোষ

ছিল। সেই নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতাই 'অমৃত বাজার'কে আজ বাঙ্‌লার দৈনিক পত্রিকাগুলির ভিতরে এত বড় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গোলাপলালের কাজও যেমন আড়ম্বরহীন ছিল, জীবনও ছিল তেমনি আড়ম্বরহীন। সহজ, সাদাসিদে ভাবে তিনি জীবন যাপন করে গেছেন, অথচ তাঁর ভিতর যেমন ছিল তেজের দীপ্তি, তেমনি ছিল মনুষ্যত্বের গৌরব। এই জন্যই বাঙ্‌লার এই খাঁটি মানুষটির চিত্রাবরণ উন্মোচনের ব্যাপার, আর দশটি এই ধরণের ব্যাপারের

মত একটা সাধারণ অনুষ্ঠান বলে আমরা মনে করি না—এ জাতির একটা কর্ত্তব্যের অঙ্গ বলেই আমরা মনে করি।

রায় জলধর সেন বাহাদুরের জন্মতিথি

১২৬৬ সনের পয়লা চৈত্র তারিখে বাঙ্‌লার প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং এই চৈত্র মাসে তিনি ৭৫এর বয়সে পদার্পণ করলেন। বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যিকদের ভিতর সম্ভবতঃ তিনিই এখন বয়ঃজ্যেষ্ঠ। আমরা তাঁর এই জন্মতিথিতে তাঁকে সাদরে অভিনন্দিত করছি।

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

রায় জলধর সেন বাহাদুরের কাছে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ঋণ সামান্য নয়। বাঙ্‌লার ভ্রমণ-সাহিত্যের সৃষ্টি হয় ধরতে গেলে তাঁর হাতেই এবং তাঁর 'হিমালয়', 'প্রবাস চিত্র' প্রভৃতির মত সুখপাঠ্য, জ্ঞাতব্য তথ্য পরিপূর্ণ ভ্রমণ-কাহিনী বাঙ্‌লা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। বাঙ্‌লার কথা-সাহিত্যের রাজ্যেও তাঁর একটা বড় স্থান আছে। এ ছাড়া 'ভারতবর্ষে'র সম্পাদক হিসাবে তিনি বাঙ্‌লা সাহিত্যের যে উপকার করেছেন তার কথাও বাঙ্‌লা দেশে বিস্মৃত হওয়া কখনও সম্ভবপর হবে না। এক্ষেত্রে তিনি যে কাজ করেছেন, সে কাজ মালাকরের কিন্তু মালাকরও শিল্পী। যদি মালাকরের শিল্প-স্রষ্টার শক্তি না থাকে তবে ভাল ফুল তার হাতে মালা তৈরী হয় না। যে ভাল শিল্পী তার পরিচয় একটা দিক থেকে 'ভারতবর্ষে'র সাহিত্যের মহা উপকার সাধন করেছেন। 'ভারতবর্ষে'র বহু সাহিত্যিক তাঁর নিজের আবিষ্কার। লিখবার শক্তি আছে অথচ সাহস নেই এমন অনেক সাহিত্যিককে তিনি উৎসাহ দিয়ে, সুযোগ দিয়ে লিখতে প্রবৃত্ত করান। আজ বাঙ্‌লা সাহিত্য তাঁদের রচনায় সমৃদ্ধ। প্রতিষ্ঠা এবং যশ রায় বাহাদুর জলধর সেনের মনে একটুকু অহমিকার সৃষ্টি করে নি। তাঁর চরিত্রের এই দিকটা আমাদের সকলেরই অনুকরণের যোগ্য। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর মত সর্ব্বজন-প্রিয় লোক খুব অল্পই দেখা যায়। আমরা আরও বহুবার তাঁর এই জন্মতিথির পুনরাবর্ত্তন কামনা করি।

ভূমিকম্পে মহিলাদের সাহায্য

গত ২০-এ ফেব্রুয়ারী, শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী ও শ্রীমতী লাবণ্য দেবীর উদ্যোগে ৭৭।১_নং লোয়ার সার্কুলার রোডে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন চ্যাটার্জ্জির ত্রিতলস্থ প্রশস্ত 'হলে' একটি নাটকের অভিনয় হয়ে গিয়েছে। এই অভিনয় করেছিলেন মহিলারা

। অভিনয়ের উদ্দেশ্য
ও অঞ্চলের সাহায্যের
সুতরাং প্রবেশাধিকারের

শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী

জন্য টিকিট করা হয়েছিল। বিক্রয়-লব্ধ অর্থ এঁরা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হাতে দিয়ে এসেছেন। অভিনয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন এর উদ্যোক্তারাই অর্থাৎ শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবী ও শ্রীমতী লাবণ্য দেবী। 'উদয়ন'-কর্তৃপক্ষ ছাপার খরচা বহন করেছিলেন। অভিনয়ও খুব ভাল হয়েছিল। যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের ভিতর কুমারী রাধিকা ঘোষ,

শ্রীমতী লাবণ্য দেবী

কুমারী লতিকা দে, কুমারী নীলিমা দে ও কুমারী সুনন্দা ও চিত্রা চ্যাটার্জ্জীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কুমারী শোভা ও বিভা ঘোষের চেষ্টায় এ অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।